বাঙ্গালীর ইতিহাস

আদি পর্ব

বাঙ্গালীর ইতিহাস

আদি পর্ব

নীহাররঞ্জন রায়

বুক্ এম্পোরিয়ম
কলিকাতা

প্রকাশক

প্রশান্তকুমার সিংহ

বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড : ২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট : কলিকাতা

*

মুদ্রাকর

শক্তি দত্ত, দি প্রিন্টিং হাউস, ৭, শাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

*

প্রচ্ছদপট ব্লক ও মুদ্রণ

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও, ৭২/১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

*

বাঁধাই

বেংগল বাইণ্ডার্স, ১০১ বি, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

*

প্রচ্ছদপট ও নামপত্র

পরিকল্পনা—গ্রন্থকার

অঙ্কন

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাণকৃষ্ণ পাল

*

মানচিত্র

বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের সৌজন্যে

*

চিত্র

বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ

এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষ-চিত্রশালার

সৌজন্যে

"সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মা গো
তোমায় ভালোবেসে।"

—রবীন্দ্রনাথ—

যাঁহাদের চরণতলে দেশের ইতিহাসে
আমার দীক্ষা

•

যাঁহারা এ-পথের পূর্বগামী পথিক

•

যাঁহাদের চর্চা ও মননের ফলে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি
আমার চিত্তের নিকটতর হইয়াছে

•

যাঁহাদের জীবন-সাধনা আমাকে
দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালবাসিতে শিখাইয়াছে

•

সেই জীবিত ও মৃত, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সাধকদের
উদ্দেশ্যে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

পরিচয়-পত্র

অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙালীর ইতিহাস" একখানি অমূল্য গ্রন্থ। বহু বৎসর ধরিয়া ইহা আমাদের অবশ্য-পঠিতব্য প্রামাণিক পুস্তক বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পথনির্দেশ করিবে।

নীহাররঞ্জন বিনয়ের সঙ্গে বলিয়াছেন, '...আমি কোনও নূতন শিলালিপি বা তাম্রপট্টের সন্ধান পাই নাই, কোনও নূতন উপাদান আবিষ্কার করি নাই।...যে-সমস্ত তথ্য ও উপাদান পণ্ডিত-মহলে অল্পবিস্তর পরিচিত ও আলোচিত, প্রায় তাহা হইতেই আমি সমস্ত তথ্য ও উপকরণ আহরণ করিয়াছি।...আমি শুধু প্রাচীন *বাংলার ও প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাস একটি নূতন* কার্যকারণসম্বন্ধগত যুক্তিপরম্পরায় একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর দিয়া বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি মাত্র।...এই যুক্তি ও দৃষ্টি অনুসরণ করিলে প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের সামগ্রিক সর্বতোভদ্র রূপ দৃষ্টিগোচর হয় ..। নূতন নূতন উপাদান প্রায়শ আবিষ্কৃত হইতেছে।..আমি শুধু কাঠামো রচনার প্রয়াস করিয়াছি—ভবিষ্যৎ বাঙালী ঐতিহাসিকেরা ইহাতে রক্ত-মাংস যোজনা করিবেন, এই আশা ও বিশ্বাসে।...' (২৪-২৫ পৃ)।

মনীষার যে সমৃদ্ধি এই গ্রন্থে পরিস্ফুট, সেই সমৃদ্ধি যাঁহার আছে তিনি বিনয়ী হইবেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। তবু, নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, যতদিন পর্যন্ত আরও নূতন তথ্য প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত না হইবে, যতদিন পর্যন্ত সুদীর্ঘ গবেষণার

ফল আরও ব্যাপক ও গভীর ভাবে বাঙালীর প্রাচীন জীবনের ইতিহাস আলোকিত না করিবে, ততদিন পর্যন্ত এই গ্রন্থের অতি উচ্চ আসন আর কেহ অধিকার করিতে পারিবে না, ইহার মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকিবে। ইতিহাসের যে বিরাট দৃশ্য এই গ্রন্থে উদ্‌ঘাটিত এবং যে মহামূল্যবান্ বিভাগটি এই গ্রন্থের অন্তর্গত তাহা বুঝিতে হইলে এবং তাহাতে বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই গ্রন্থ পুংখানুপুংখ রূপে পাঠ এবং নীহাররঞ্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্যগুলি বারবার আলোচনা করা ভিন্ন অন্য গতি নাই। এই গ্রন্থ আমাদের দেশের ইতিহাস আলোচনায় নূতন পথ রচনা ও নূতন আদর্শ স্থাপন করিল। পরবর্তী গবেষকরা ইহাকে ভিত্তিরূপে লইয়া কাজ আরম্ভ না করিলে আমাদের নিজের ইতিহাসের ক্ষেত্রে জ্ঞানবিস্তার সম্ভব হইবে না।

ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া, ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতেও সমগ্র বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ইহা একটি অনন্যপূর্ব গ্রন্থ। ইতিহাস-বিষয়েই শুধু নয়, সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে এত বিশদ, এত পূর্ণাঙ্গ, এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রচিত গ্রন্থ ইহার আগে কেহই লেখেন নাই। শুধু ইহার আকারে নহে, শাখা-পল্লবে নহে, বিষয়-নির্বাচনে নহে,—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি নীহাররঞ্জনের অটুট নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, অসংখ্য ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গির সজীব বৈশিষ্ট্য, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, উচ্চস্তরের বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা, এবং সর্বোপরি সত্যে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন চিন্তা করিবার শক্তি এই গ্রন্থকে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের জগতে অদ্বিতীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। গ্রন্থকার অনেক নূতন শব্দ চয়ন করিতে, নূতন পদাংশ

ও বাক্‌ভঙ্গি ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; দুরূহ ভাব ও অনভ্যস্ত ভঙ্গি ও চিন্তা আত্মস্থ করিয়া অর্থ ও ব্যঞ্জনাময় ভাষায় সেগুলি ব্যক্ত করিয়াছেন। তথ্যবহুল মননশীল গ্রন্থ বাংলা ও ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় খুব বেশি রচিত হয় নাই; এমতাবস্থায় এই কাজটি যেমন কঠিন তেমনি নূতন। অথচ, নীহাররঞ্জনের ভাষার বেগ ও উদ্দীপনা দেখিয়া মনে হয়, এ-কাজ যেন তিনি খুব সহজেই করিয়াছেন। বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একাত্মতা না হইলে এই সাফল্য সম্ভব নয়। কোথাও কোথাও তাঁহার বিবরণ ও মন্তব্যের ভাষা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে এই ধরনের সার্থক প্রয়াস আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

ইংরাজি ভাষায় এই গ্রন্থ রচিত হইলে নীহাররঞ্জন ব্যক্তিগত ভাবে উপকৃত হইতেন; গ্রন্থের প্রচার বেশি হইত, তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সুদূরব্যাপী হইত। কিন্তু তিনি যে তাহা করেন নাই ইহা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগেরই প্রমাণ।

বিষয়-গৌরবেও এই গ্রন্থ অনন্যপূর্ব। এই গ্রন্থের নাম রাখা হইয়াছে বাংলার ইতিহাস নহে, বাঙালীর ইতিহাস; অর্থাৎ, ইহা বাংলা দেশের রাজা, রাজকর্মচারী, যুদ্ধবিগ্রহ, শাসন-বিস্তার প্রভৃতি বর্ণনার উদ্দেশ্যে লিখিত নহে, কারণ, সেরূপ "এহ বাহ্য" ইতিহাস তো আগে অনেক লেখা হইয়াছে। এই গ্রন্থ বাঙালীর লোক-ইতিহাস; ইহাতে বাঙালীর জনসাধারণের, বাঙালী জাতির সমগ্র জীবন-ধারার যথার্থ পরিচয় দিবার জন্য আদ্যন্ত চেষ্টা করা হইয়াছে।

সুতরাং, বলা যাইতে পারে, এই ঐতিহাসিক কাব্যটির "নায়ক" রাজবংশ নহে, ধনীসমাজ নহে, পণ্ডিতবর্গ নহে, জাতীয় চিন্তার শিক্ষিত নেতাদের সমাজ নহে— যাহাদের বলা হয় জনসাধারণ, যাহারা উচ্চ বর্ণসমাজের বাহিরে, পৌরাণিক ও স্মৃতিশাসিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহিরে, যাহারা রাষ্ট্রের দরিদ্র ভূমিহীন বা স্বল্প ভূমিবান প্রজা বা সমাজ-শ্রমিক তাহারাই এই ইতিকথার "নায়ক"—যদিও নীহাররঞ্জন প্রথমোক্ত শ্রেণী ও সমাজের লোকদের কথাও ভুলেন নাই, তাহাদের ইতিহাসও বাদ দেন নাই। এই নিম্নতর কিন্তু বৃহত্তম সামাজিক স্তরকে প্রধান আলোচ্য বিষয় করাই এই গ্রন্থের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য ও অনন্যপূর্বত্ব। অথচ, এইরূপ সামাজিক ইতিহাসই বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকায় পণ্ডিত সমাজে সর্বোচ্চ শ্রেণীর ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা হয়।

সত্য বটে, ইহার পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত (ইংরাজি ভাষায়) বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে, *এবং খুব সংক্ষিপ্তাকারে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন-রচিত* "প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী" (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ পুস্তিকা-মালা, ১২ নং) বাংলা পুস্তিকাটিতে এইরূপ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আভাস পাওয়া গিয়াছিল। সেই দুই গ্রন্থের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে আংশিক আলোচনার স্থান মাত্র ছিল, তাহাদের পরিকল্পনাও ছিল অন্য প্রকৃতির।

অধ্যাপক নীহাররঞ্জনের বিরাট গ্রন্থের সমস্তটারই বিষয়বস্তু হইতেছে বাংলার লোকদের দৈনন্দিন জীবন, সমাজ, ধর্মকর্ম, সংস্কৃতি, ধনসম্পদ প্রভৃতি। অর্থাৎ, বাঙালী জাতি কি করিয়া ক্রমে ক্রমে আজিকার বাঙালীতে বিবর্তিত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা।

বাংলার লোকেরা একেবারে আদিতে কেমন ছিল, কখন কোথা হইতে কে আসিল, এই ভূখণ্ডের নদনদী-পাহাড়-প্রান্তর-বন-খাল-বিল কালক্রমে কিরূপে পরিবর্তিত হইল, ভৌগোলিক প্রভাব এই প্রদেশের বাসিন্দাদের মধ্যে কোথায় কি কি কাজ করিয়াছে, বাঙালীর দেহে কোন্ কোন্ জাতির রক্ত কি পরিমাণে মিশিয়াছে, অতীত যুগের ভূমিসংস্থা, কৃষি-পদ্ধতি, শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য, অশন-বসন, ধর্ম ও ক্রিয়াকাণ্ড, শিল্প-বিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য, এক কথায় প্রাচীন বাঙালী জীবনের সকল দিক্ হাজার বৎসর ধরিয়া কালের স্রোতের আঘাতে আঘাতে কেমন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ লইল—এই সব তলাইয়া বুঝিবার এবং যুক্তি প্রমাণ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে, এবং আমার সংশয় নাই, নীহাররঞ্জনের চেষ্টা অসামান্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

ঐতিহাসিক গবেষণার অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে তাঁহারাই শুধু বুঝিতে পারিবেন, এই সুকঠিন কার্যে কি অসীম ধৈর্য, কি অক্লান্ত শ্রমশীলতা, কি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, কি মার্জিত অথচ সূক্ষ্ম বোধ ও বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। এক ব্যক্তির পক্ষে একক ভাবে এই ধরনের গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত দুরূহ সাধনা, এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভ আরও দুরূহ। *নীহাররঞ্জন তাঁহার সাধনায় অপূর্ব সিদ্ধিলাভ* করিয়াছেন।

নীহাররঞ্জনের সুবৃহৎ গ্রন্থে কোথাও আমাদের প্রচলিত 'অমুক জাতির ইতিহাস'-শ্রেণীর বইগুলির 'গুলিখুরী' মত্ ও প্রবাদে অন্ধ বিশ্বাস নাই। আমার পরিচিত জনৈক বাঙালী লেখক তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ভাদুড়ী বংশ চম্বল নদীর দক্ষিণে (আগ্রা ও গোয়ালিয়রের মাঝামাঝি) 'ভাদাওর্' প্রদেশ হইতে আসিয়াছিল, এবং তাহাদের আদি পুরুষ সেখানে সামন্ত

ছিলেন! তিনি যদি দিল্লীর বাদশাহ্‌দের ইতিহাস পড়িতেন, তবে অতি সহজেই জানিতে পারিতেন যে, 'ভাদাওরীয়া' একটি ক্ষত্রিয় রাজপুত বংশ, ব্রাহ্মণ নহে; তাঁহাদের অনেকে বাদ্‌শাহ্‌দের মনসবদার ছিলেন।

এইরূপ জ্ঞানহীন বিচারবুদ্ধিহীন আলোচনার কোন চিহ্নই এই গ্রন্থে নাই। সর্বাপেক্ষা প্রশংসার বিষয় এই যে, নীহাররঞ্জন পণ্ডিত-সুলভ অহংকারে কোথাও নিজ মত্‌ গায়ের জোরে প্রচারের চেষ্টা করেন নাই; সর্বত্রই তিনি পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের মতামত্‌ শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করিয়া, নূতন যুক্তি দিয়া, সমস্ত প্রমাণপঞ্জী বিচার করিয়া, তাহার পর নিজের সিদ্ধান্ত পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। পরের ও নিজের উপাদানের নাম, পাঠনির্দেশ প্রভৃতি দিয়া পাঠক যাহাতে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে এবং নিজের স্বাধীন মত্‌ গঠন করিতে পারে, সে কাজে তিনি সাহায্যের ত্রুটি করেন নাই। ইহার পরও মুখবন্ধের শেষে তিনি লিখিয়াছেন, '...আমার কোনও কথাই শেষ কথা নয়।...এই কাঠামো রচনার প্রয়াস সত্যে পৌঁছিবার নিম্নতর স্তর; এই স্তর যদি ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিককে সত্যে পৌঁছিতে কিছুমাত্র সহায়তা করে, তবেই আমার জাতির এই ইতিহাস রচনা সার্থক।' ইহাই তো যথার্থ ঐতিহাসিকের, যথার্থ জ্ঞানীর উক্তি।

অধ্যাপক নীহাররঞ্জনের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার সুবিস্তৃত বিষয়সূচী এবং গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় না পড়িলে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে না; সে-সম্বন্ধে পরিচয়-পত্রে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু এই গ্রন্থের দু'একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা আবশ্যক।

এই গ্রন্থ আমাদের একটি নূতন জিনিস দিতেছে। বাংলা দেশের যে 'পলিটিক্যাল হিষ্ট্রী' অর্থাৎ জড়

ঘটনাগুলি আমরা পূর্বস্থরীদের গবেষণার ফলে প্রায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধরূপে আজ জানিতে পারিয়াছি সেই ঘটনাগুলির মূল কারণ কি কি, কোন্ কোন্ শক্তির প্রভাবে আমাদের জনসমষ্টির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বর্তমানের আকার ধারণ করিয়াছে, এবং সেই সেই শক্তিগুলি কি প্রণালীতে কোন্ কোন্ সুযোগে কাজ করিয়াছে, গভীর চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় নীহাররঞ্জন সর্বত্র তাহার সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, ইংরাজিতে যাহাকে বলে 'the why and how of the people's evolution', তাহাই গ্রন্থকার বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাষ্ট্র, দৈনন্দিন জীবন, শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, ধর্মকর্ম যখনই যাহার আলোচনা তিনি করিয়াছেন, প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে, বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে কাহার কি সম্বন্ধ তাহার বিচার ও আলোচনাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য, এবং তাহাই এই গ্রন্থের সুগভীর বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই বাঙালী জাতির অভিব্যক্তির সর্বাঙ্গ চিত্রটি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সর্বশেষ অধ্যায়ে নীহাররঞ্জন যে-ভাবে আমাদের প্রাচীন জীবনপ্রবাহের সমগ্র ধারাটিকে, 'বাঙালী জীবনের মৌলিক ও গভীর চরিত্রটিকে' ধরিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তথ্যের ও যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া এমনভাবে এত বড় ও সার্থক চেষ্টা ইতিপূর্বে আর কেহ করেন নাই। ঐতিহাসিকের কর্তব্য জ্ঞানের ও সামাজিক অনুভূতির এমন পরিচয় আমাদের দেশে ইতিহাস-চর্চায় বিরল, অথবা নাই বলিলেই চলে।

সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য, দেশের ও দেশের জনসাধারণের প্রতি নীহাররঞ্জনের গভীর অনুরাগ। তথ্যবহুল পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার ভিতরেও সেই

অনুরাগ ধরা না পড়িয়া যায় নাই। আর, সেই অনুরাগ হৃদয়ে না থাকিলে গ্রন্থকার হয়ত এই বিরাট গ্রন্থ-রচনার অনুপ্রেরণাই পাইতেন না।

তথ্যবিবৃতি বা আলোচনায় এই সুবৃহৎ গ্রন্থের ত্রুটিবিচ্যুতি কোথাও নাই এমন কথা আমি বলিতে পারি না, গ্রন্থকারও সেই দাবি করেন নাই, এবং কেহই তাহা করিবেন না। ছিদ্রান্বেষী হইলে তেমন ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু ধরা পড়িবে, বিচিত্র নয়। কিন্তু সেই ধরনের দৃষ্টি লইয়া এ-গ্রন্থ যাঁহারা পড়িবেন তাঁহারা শুধু ক্ষতিগ্রস্তই হইবেন; তাঁহাদের কাছে এই গ্রন্থের অপূর্বত্ব ও গভীর মহিমা ধরা পড়িবে না। সেই মহিমাই বিচারের বস্তু, গ্রহণের বস্তু, ছিদ্রগুলি নয়।

এই বিরাট অথচ পুংখানুপুংখ তথ্য ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থখানি বড় আকারে প্রায় নয়শত পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। এখানি আদিপর্ব মাত্র, অর্থাৎ মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয় পর্যন্ত পৌছিয়া এই খণ্ডের গ্রন্থকার থামিয়াছেন। মুস্‌লিম্ ও ইংরাজযুগে এই ধরনের বাঙালীর ইতিহাস রচনা এখনও বাকী আছে। একজন লোকের জীবনে, অথবা একজন পণ্ডিতের একক শ্রমে কি তাহা এই আদিপর্বের মত সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধরূপে রচনা করা সম্ভব হইবে? নীহাররঞ্জন অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। সেই আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করি, ভগবান তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাকে সেই ক্ষমতা দান করুন যাহার বলে তিনি বাকী দুই যুগের ইতিহাসও এমনই সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধরূপে রচনা করিতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহার কীর্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

যদি কেহ এই গ্রন্থের অন্ধকার অংশগুলি পড়িয়া

অসন্তুষ্ট হন তবে তিনি *Coulton*-প্রণীত ***Social life in mediaeval England*** (1916) গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখুন। পেন্‌গুইন-সিরিজে নব-প্রকাশিত ***Britain under the Romans*** বইখানাও পড়িয়া দেখুন। তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ দেশে ঐ প্রাচীন যুগেও কত অধিক পরিমাণে এবং কত বিচিত্র ধরনের ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গিয়াছে; তাহার তুলনায় বাংলাদেশের হিন্দুযুগের নিদর্শন অত্যন্ত স্বল্প। এরূপ উপাদানবৃক্ষহীন ঐতিহাসিক মরুভূমিতে নীহাররঞ্জন যে ফসল ফলাইয়াছেন তজ্জন্য তিনি ধন্য ও সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতার পাত্র।

এই গ্রন্থের বহুল প্রচার আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যে আমার দুইটি মন্তব্য গ্রন্থকার ও প্রকাশক উভয়কেই জানাইতেছি। প্রথমত, সরল বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থের অনধিক ২৫০ পৃষ্ঠায় একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ অবিলম্বেই প্রকাশিত হওয়া উচিত, এবং মূল্যেও তাহা সহজলভ্য হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, সঙ্গে সঙ্গে অনধিক ৩৫০ পৃষ্ঠায় ইহার একটি ইংরাজী সারাংশও প্রকাশিত করা আবশ্যক। তাহা হইলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ঐতিহাসিকেরা নিজ নিজ জাতির ইতিহাস রচনার একটি আদর্শ লাভ করিবে, যাহা এদেশের সাহিত্য ও ইতিহাস-চর্চায় একেবারেই নাই।

যদুনাথ সরকার

নিবেদন

বাংলা ১৩৪৬ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ আমাকে অধরচন্দ্র-বক্তৃতা-মালায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে-কোনো একটি পর্ব বা দিক সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করেন। সেই আহ্বানের উত্তরে 'বাঙালীর ইতিহাসের কাঠামো' একটি রচনা করিয়া পরিষদ-মন্দিরে তাহা পাঠ করি, পর পর তিনটি বিশেষ অধিবেশনে। এই তিন অধিবেশনেই সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়, এবং তিন দিনই বক্তৃতার শেষে সভাপতির মন্তব্যে তিনি আমাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করেন, এবং কাঠামোটিকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে রূপান্তরিত করিতে বলেন। সেই বক্তৃতা তিনটি পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে পর সহৃদয় সতীর্থরাও অনেকে প্রচুর উৎসাহ প্রকাশ এবং আচার্য যদুনাথের কথারই প্রতিধ্বনি করেন। কিন্তু, তখন ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড রচনা ও সম্পাদনাধীন; কাজেই কাঠামোটিকে রক্ত-মাংসে ভরিয়া পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-রচনার কথা তখনও ভাবি নাই। স্বভাবতই মনে হইয়াছিল, সে-প্রয়োজন তো ঐ-গ্রন্থেই মিটিবে।

কিছুদিন পরই, বোধ হয় বাংলা ১৩৪৯ সালে, ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবৃহৎ গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ করিল শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদনায়। এ-গ্রন্থ বাংলার ও বাঙালীর মনীষার গৌরব, সন্দেহ নাই; তবু মনে হইল, আমার কাঠামোটি অবলম্বন করিয়া আদিপর্বের বাঙালীর একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-রচনার প্রয়োজন বোধ হয় থাকিয়াই গেল। আমার এই ধারণা কতটা সত্য বা মিথ্যা তাহার বিচার এখন পাঠকদের হাতে। কিন্তু, আচার্য যদুনাথ ইতিমধ্যে একাধিকবার আমার কর্তব্য পালনের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, এবং সে-কর্তব্য পালনের সুযোগও করিয়া দিলেন তদানীন্তন বাংলার রাজসরকার। রাজরোষে আমি বন্দী হইলাম। জেলখানার সেই নির্বাধ অবসরে আমার মূল কাঠামোর দশটি সুদীর্ঘ অধ্যায় রচনা যখন শেষ হইল তখন একদিন হঠাৎ মুক্তি পাইলাম। ইহার কিছুকাল পরই 'বুক এম্‌পোরিয়মের' তদানীন্তন কর্মকর্তা, বন্ধু শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে পাণ্ডুলিপি ঢুকিল প্রেসে; ভাবিলাম, ছাপার কাজ অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর বাকী পাঁচটি অধ্যায়ের রচনাও অগ্রসর হইবে। তাহাই ধীরে ধীরে হইতেছিল; কিন্তু হঠাৎ একদিন ধূমায়িত সাম্প্রদায়িক বিরোধ অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়া কলিকাতার জীবন বিপর্যস্ত করিয়া দিল। এক বৎসরেরও অধিককাল একটি অক্ষরও ছাপা হইল না। আজ তাহার দুই বৎসর পর বাকী রচনা ধীরে ধীরে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাপাও শেষ হইয়া গ্রন্থটি অবশেষে মুক্তিলাভ করিল।

আমিও মুক্তি পাইলাম বলিয়া মনে হইতেছে।

এ-গ্রন্থ রচনা যখন আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন বাংলাদেশ অখণ্ড এবং বৃহৎ ভারতবর্ষের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত ; আজ গ্রন্থ-রচনা যখন শেষ হইল রাষ্ট্রবিধাতাদের ইচ্ছায় ও কূট কৌশলে দেশ তখন দ্বিখণ্ডিত এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাহার অনাদিকালের নাড়ীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। দুই হাজার বৎসরের ইতিহাসে বাংলাদেশ কখনও এত গভীর ও ব্যাপক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় নাই। ইহার ফলে আজ বাঙালী জীবন যে-ভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে ও হইতেছে, সপ্তম-অষ্টম শতকের মাৎস্যন্যায় এবং ত্রয়োদশ শতকের রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি বিপর্যয়েও তাহা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়না। কিন্তু রাষ্ট্রবিধাতাদের ইচ্ছা যাহাই হউক, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সীমানার এপার-ওপার লইয়া বাংলাদেশ ও বাঙালী এক এবং অখণ্ড। এই গ্রন্থে আমি সেই এক এবং অখণ্ড দেশ ও জাতিরই ধ্যান করিয়াছি। অন্যতর ধ্যান সম্ভব নয় ; বহুদিন পর্যন্ত তাহা সম্ভবও হইবেনা।

যত অধ্যয়ন, বীক্ষণ, মনন, আলোচনা ও গবেষণাই এই গ্রন্থের পশ্চাতে থাকুক বা না থাকুক, জ্ঞানস্পৃহা আমাকে এই গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত করে নাই। প্রথম যৌবনে প্রাণের আবেগে এবং স্বদেশব্রতের দুর্দম দুরন্ত নেশায় বাংলার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আমাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। তখন বিস্তৃত বাংলার কৃষকের কুটীরে, নদীর ঘাটে, ধানের ক্ষেতে, বটের ছায়ায়, সহরের বুকে, নির্জন প্রান্তরে, পদ্মার চরে, মেঘনার ঢেউয়ের চূড়ায় এই দেশের এবং এই দেশের মানুষের একটি রূপ আমি দেখিয়াছিলাম, এবং তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম। পরিণত যৌবনেও বারবার বাংলার ও ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়াছি —নানা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ; আজও তাহার বিরাম নাই। যত দেখিয়াছি, যত নিকটে গিয়াছি, তত সেই ভালবাসা গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে। এই ভালবাসার প্রেরণাতেই আমি এই গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম—ভালবাসাকে জ্ঞানের বস্তুভিত্তিতে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাদানের উদ্দেশ্যে, দেশকে আরও গভীর আরও নিবিড় করিয়া পাইবার উদ্দেশ্যে। আমার বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি প্রাচীন পুঁথির পাতায় নাই, রাজকীয় লিপিমালায়ও নয় ; সে-দেশ ও জাতি আমার চোখের সম্মুখে ও হৃদয়ের মধ্যে বিস্তৃত ও বিচরমান। প্রাচীন অতীত আজিকার সদ্য বর্তমানের মতই আমার কাছে সত্য ও জীবন্ত। সেই সত্য জীবন্ত অতীতকে আমি ধরিতে চাহিয়াছি এই গ্রন্থে—মৃতের কঙ্কালকে নয়।

দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, দেশচ্ছেদ, প্রাস্তীয় দ্বেষ ও হিংসা, চারিত্রদৈন্য, আর্থিক দুর্গতি প্রভৃতি সকল শত্রু মিলিয়া আজ বাংলাদেশকে এবং মূঢ়, আশাহত বাঙালী জাতিকে চরম দুর্গতির মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই চরম দুর্গতি আজ দৈহিক যন্ত্রণার মত আমার এবং আমার মত অনেকের সমস্ত দেহমনকে উৎপীড়িত করিতেছে। এই সময়ে যে এই গ্রন্থ বাঙালী পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারিলাম ইহাই আমার পরম সান্ত্বনা ও আত্মপ্রসাদ। এই গ্রন্থ যদি বাঙালী জাতির প্রাণে কিছু আশার সঞ্চার করিতে পারে, ভবিষ্যতের কিছু

ইঙ্গিত দিতে পারে, দেশ ও জাতির প্রতি কিছু শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জাগাইতে পারে, নিজেদের কিছু সত্য পরিচয় চিত্তের নিকটতর করিতে পারে, এবং সেই ভালবাসা ও পরিচয়ের সম্পদ লইয়া বৃহৎ ভারতবর্ষের সঙ্গে আত্মীয়-বন্ধনে নিজকে বাঁধিতে পারে, তাহা হইলেই ঐতিহাসিকের চরম পুরস্কার ও সার্থকতা লাভ ঘটিয়া গেল। আর কিসেরই বা প্রয়োজন!

•

দীর্ঘকাল ধরিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, দীর্ঘতর কাল ব্যাপিয়া গ্রন্থের বিষয়বস্তু ধ্যান করিয়াছি, সতীর্থ ও সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি, পূর্বগামী ও সমসাময়িক পণ্ডিত-মনীষীদের রচনার মধ্যে বিচরণ করিয়াছি। তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করিয়া শেষ করা যায় না, কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়া ঋণশোধ করিবার ইচ্ছাও আমার নাই। তবু যতটা সম্ভব যথাস্থানে নামোল্লেখ ও ঋণস্বীকারে ত্রুটি করি নাই। তাহা সত্ত্বেও হয়তো এমন অনেকেই রহিলেন যাঁহাদের নামোল্লেখ করা হয় নাই; তেমন হইয়া থাকিলে আমার একান্ত অনিচ্ছা ও অনবধানতাবশতই হইয়াছে। তাঁহারা যেন দয়া করিয়া আমার এই ত্রুটি মার্জনা করেন। অনেক সতীর্থ, এবং এই পথের পথিক নহেন এমনও অনেকে, সহৃদয় বন্ধুবৎসলতায় দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া ধৈর্য ধরিয়া এই গ্রন্থের অনেক অংশের পাঠ শুনিয়াছেন, তর্ক করিয়াছেন, আলোচনা করিয়াছেন—আমাকেই বাধিত ও উপকৃত করিবার জন্য। তাঁহাদের সকলকে আজ আমার বিনীত কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আর, বন্ধুত্বের যাহা ঋণ তাহা তো শোধ করা যায়না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ বাঙালী জাতির গৌরবময় প্রিয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান ও উহার কর্মকর্তারাই আমাকে প্রাথমিক কাঠামো রচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন; সেই প্রবর্তনারই পরিণতি এই গ্রন্থ। আজ গ্রন্থ-রচনা যখন শেষ হইল তখন পরম শ্রদ্ধায়, সকৃতজ্ঞ অন্তরে পরিষদ ও পরিষদ-কর্মকর্তাদের স্মরণ করিতেছি, এবং সর্বাগ্রে এই গ্রন্থ তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছি।

এই গ্রন্থ-রচনায় একজন মহদাশয় মনীষীর প্রেরণা ও উৎসাহ কিছুতেই উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। শ্রদ্ধেয় আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়ের প্রেরণা ও উৎসাহ আগাগোড়া দীপ্যমান না থাকিলে এ-গ্রন্থ-রচনা শেষ হওয়া দূরে থাক, সূত্রপাতই হয়তো হইত না। তাঁহার ইতিহাস-ধ্যানের আদর্শ, তাঁহার স্নেহ ও শুভেচ্ছা আমার জীবনের পরম ঐশ্বর্য। তাঁহার কাছে সত্যই আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। তিনি কৃপাবশে পরম স্নেহে এই গ্রন্থের একটি পরিচয়-পত্র রচনা করিয়া দিয়াছেন; তাহাই ইহার শিরোভূষণ।

আমার সকল প্রকার কর্ম প্রচেষ্টায় এবং ধ্যানে ও মননে প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাইয়া আসিতেছেন শ্রীমতী মণিকা দেবী; এই গ্রন্থের পশ্চাতেও সে-প্রেরণা ও উৎসাহ অনুক্ষণ জাগ্রত ছিল। সাংসারিক ক্ষয় ও ক্ষতি যাহা তাহাও তাঁহাকেই সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ তাহাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নাই।
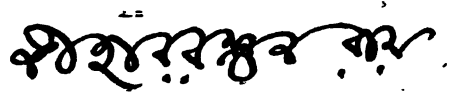
আমার স্নেহাস্পদ প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান প্রভাসচন্দ্র মজুমদার ও সুনীলকুমার রায় এই গ্রন্থের নাম-সূচী সংকলনে আমাকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন। তাহাদিগকে আমার একান্ত শুভকামনা ও সস্নেহ আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সতীর্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী, সোদরোপম শ্রীমান পুলিনবিহারী সেন এবং আমার প্রীতিভাজন প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে অধ্যাপক শ্রীমান সুধীররঞ্জন দাশ নানাদিক দিয়া আমার শ্রমলাঘব করিয়া পরম উপকার করিয়াছেন। ইঁহাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়-বন্ধন এত ঘনিষ্ঠ যে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া সে-বন্ধনের অমর্যাদা করিব না।

গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশনা ব্যাপারে শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, প্রফুল্লকুমার বসু, শক্তি দত্ত, দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ ও আশুতোষ-চিত্রশালার কর্মকর্তারা নানাভাবে আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সে-ঋণ শোধ করা যায় না।

এই ধরনের তথ্যবহুল ও গবেষণানির্ভর গ্রন্থে সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত পাদটীকা থাকার প্রচলিত রীতি আমার অজ্ঞাত বা অনভ্যস্ত নয়; তবু, আমি পাদটীকা ব্যবহার করি নাই, অধ্যায়-শেষে এক একটি করিয়া সংক্ষিপ্ত পাঠপঞ্জী দিয়াছি মাত্র। আমার যুক্তি এই যে, সাধারণ পাঠক যাঁহারা তাঁহাদের পাদটীকার প্রয়োজন নাই, তথ্য জানাতেই তাঁহাদের আগ্রহ এবং তথ্যবিবৃতিই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। পাদটীকাকণ্টকিত গ্রন্থের প্রতি তাঁহাদের বিরাগ সর্বজনবিদিত। আর, যাঁহারা পণ্ডিত ও গবেষক, যাঁহারা তথ্যের মূল পর্যন্ত পৌঁছিতে চাহেন, তাঁহাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, এই গ্রন্থে এমন কোনো উপাদান আমি ব্যবহার করি নাই, এমন কোনো তথ্য বহন করিয়া আনি নাই যাহা তাঁহাদের কাছে অজ্ঞাত, যাহা এতদিন ছিল লোকচক্ষুর অগোচরে বা যাহা ছিল অনাবিষ্কৃত। আমি সুজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত, অনাদৃত ও অবহেলিত তথ্যগুলি নূতন করিয়া সাজাইয়াছি মাত্র, নূতন শৃঙ্খলায় বাঁধিয়াছি মাত্র, নূতন অর্থনির্দেশ সন্ধান করিয়া নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি মাত্র। তাহার জন্য তো পাদটীকার অলঙ্কারে পাণ্ডিত্যের ঐশ্বর্য-প্রকাশের কোনো প্রয়োজন নাই। তাহা ছাড়া, এইটুকুই শুধু বলিতে পারি, কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণকেই আমি সজ্ঞানে বিকৃত করি নাই বা এমন কোনো উপাদান ও সাক্ষ্যপ্রমাণ ব্যবহার করি নাই যাহা অবিসংবাদিত ভাবে মিথ্যা বা অগ্রাহ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যেখানে সংশয় বিদ্যমান অথবা যাহা শুধু অনুমান সেখানে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রাখিতে ত্রুটি করি নাই। গ্রন্থশেষে প্রাচীন বাংলার লিপিমালার একটি পঞ্জীও সংকলন করিয়া দিয়াছি; যাঁহাদের প্রয়োজন তাঁহারা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

প্রুফ-সংশোধন ব্যাপারে আমি বরাবরই অত্যন্ত অপটু; তাহা ছাড়া, এই ধরনের গ্রন্থে সে-কাজ আগাগোড়া নিজে একা করা ছাড়া উপায় ছিল না, এবং তাহাও অন্য নানা

কাজের ভিড়ের মধ্যে। সেই কারণে, এবং কিছুটা নিজের অজ্ঞতা এবং অনবধানতায় কিছু বর্ণাশুদ্ধি ও অন্যান্য নানা প্রকারের ভুলচুক থাকিয়া গেল। তবে, আশা করি, তথ্যগত মারাত্মক ভুল, অথবা এমন ভুল যাহাতে ব্যাখ্যা বা অর্থই হইয়া যায় বিপরীত, তেমন বেশি নাই। যদি থাকে সহৃদয় পাঠক দয়া করিয়া আমাকে জানাইলে উপকৃত হইব, এবং পরবর্তী সংস্করণে সঋণস্বীকার তাহা সংশোধন করিতে পারিব। তবু, গ্রন্থান্তে একটি সংশোধন ও সংযোজন জুড়িয়া দিয়া অপরাধ কিছুটা স্খালনের চেষ্টা করিয়াছি; কৌতূহলী পাঠক আগেই তাহা দেখিয়া যথাস্থানে সংশোধন করিয়া লইবেন। আর যাহা বাকী রহিল তাহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা ছাড়া উপায় নাই। ইতি,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয়-সূচী

ধ্রুব-পদ

উৎসর্গ-পত্র

পরিচয়-পত্র

[আচার্য যদুনাথ সরকার]

নিবেদন

*

ভূমিকা

*

বস্তুভিত্তি

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ইতিহাসের গোড়ার কথা ২৯—৮১ পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায় ঃ দেশ-পরিচয় ৮২—১৫৬ পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায় : ধন-সম্বল ১৫৭—২০৫ পৃষ্ঠা

*

সমাজ-বিন্যাস

পঞ্চম অধ্যায় : ভূমি-বিন্যাস ২০৯—২৫৫ পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায় : বর্ণ-বিন্যাস ২৫৭—৩২৩ পৃষ্ঠা

সপ্তম অধ্যায় : শ্রেণী-বিন্যাস ৩২৪—৩৪৮ পৃষ্ঠা

অষ্টম অধ্যায় : গ্রাম ও নগর-বিন্যাস ৩৪৯—৩৯০ পৃষ্ঠা

নবম অধ্যায় : রাষ্ট্র-বিন্যাস ৩৯১—৪৩২ পৃষ্ঠা

দশম অধ্যায় : রাজবৃত্ত ৪৩৩—৫২৯ পৃষ্ঠা

*

সংস্কৃতি

একাদশ অধ্যায় : দৈনন্দিন জীবন ৫৩৩—৫৭৩ পৃষ্ঠা

দ্বাদশ অধ্যায় : ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণা ৫৭৪—৬৮০ পৃষ্ঠা

ত্রয়োদশ অধ্যায় : জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা ৬৮১—৭৫৮ পৃষ্ঠা

চতুর্দশ অধ্যায় : শিল্পকলা ৭৫৯—৮২৫ পৃষ্ঠা

*

শেষ কথা

পঞ্চদশ অধ্যায় : ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮২৯—৮৬৬ পৃষ্ঠা

*

পরিশিষ্ট

*

চিত্র ও মানচিত্র সূচী

চিত্র

১২। সমপদস্থানক বিষ্ণু। রংপুর; কলিকাতা চিত্রশালা। একাদশ শতক। ব্রোঞ্জধাতু।
১৩। ময়ূরবাহন কার্তিক। কালিগ্রাম, রাজসাহী। দ্বাদশ শতক। কালোপাথর।
১৪। বংশীগোপাল। কান্‌সাট্, মালদহ। পঞ্চদশ শতক। নিমকাঠ।
১৫। মন্দিরদ্বার-পার্শ্ব। রাজসাহী। দশম শতক। কালোপাথর।
১৬। বিষ্ণুপট্ট। সেরপুর, বগুড়া। একাদশ শতক। কালোপাথর।
১৭। ধনুর্ধারী যোদ্ধা। পাহাড়পুর, রাজসাহী। অষ্টম শতক। পোড়ামাটি।
১৮। পথিক। পাহাড়পুর, রাজসাহী। অষ্টম শতক। পোড়ামাটি।
১৯। বাদ্যরত পুরুষ। পাহাড়পুর, রাজসাহী। অষ্টম শতক। পোড়ামাটি।
২০। বংশীবাদক। পাহাড়পুর, রাজসাহী। অষ্টম শতক। পোড়ামাটি।
২১। যোদ্ধা। পাহাড়পুর, রাজসাহী। অষ্টম শতক। পোড়ামাটি।
২২। মৃৎভাণ্ড বাদক। পাহাড়পুর, রাজসাহী। অষ্টম শতক। পোড়ামাটি।
২৩। শবর দম্পতি। পাহাড়পুর, রাজসাহী। অষ্টম শতক। পোড়ামাটি।
২৪। শীকারী শবর ভীত ত্রস্ত পুত্র। পাহাড়পুর, রাজসাহী। অষ্টম শতক। পোড়ামাটি।
২৫। পতাকাবাহী সৈনিক। পাহাড়পুর, রাজসাহী। অষ্টম শতক। পোড়ামাটি।
২৬। হাটফেরত পিতাপুত্র। পাহাড়পুর, রাজসাহী। অষ্টম শতক। পোড়ামাটি।
২৭। শবর দম্পতি। পাহাড়পুর, রাজসাহী। অষ্টম শতক। পোড়ামাটি।
২৮। শরাহত হরিণ। পাহাড়পুর, রাজসাহী। অষ্টম শতক। পোড়ামাটি।
২৯। করতালবাদ্যরত পুরুষ। পাহাড়পুর, রাজসাহী। অষ্টম শতক। পোড়ামাটি।
৩০। রজ্জু বন্ধন। পাহাড়পুর, রাজসাহী। অষ্টম শতক। পোড়ামাটি।
৩১। নৃত্যপর সন্ন্যাসী ভিখারী। পাহাড়পুর, রাজসাহী। অষ্টম শতক। পোড়ামাটি।
৩২। বিশ্রামরত দ্বারপাল। পাহাড়পুর, রাজসাহী। অষ্টম শতক। বেলে পাথর।

মানচিত্র

১। বাংলার নদনদী
২। জাও দ্য ব্যারোস-কৃত (১৫৫০) বাংলার ভূমি ও নদনদী নক্‌সা
৩। ফান ডেন্ ব্রোক-কৃত (১৬৬০) বাংলার ভূমি ও নদনদী নক্‌সা
৪। রেনেল-কৃত (১৭৬৪-৭৬) বাংলার ভূমি ও নদনদী নক্‌সা
৫। প্রাচীন বাংলার জনপদ-বিভাগ
৬। প্রাচীন রাঢ় দেশ

চিত্র ও মানচিত্রের ব্লকগুলি বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ও আশুতোষ চিত্রশালার সৌজন্যে প্রাপ্ত

বাঙালীর ইতিহাস

আদিপর্ব

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের যুক্তি

১

বাংলার ইতিহাস ও বাঙালীর ইতিহাসে প্রভেদ কোথায়, এ-কথা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। যে-বিষয়ের আলোচনার জন্ম এই গ্রন্থ, তাহাকে বাংলার ইতিহাস বলিলে আপত্তি করিবার কিছু নাই; তবু, বাঙালীর ইতিহাস যখন বলিতেছি তখন তাহার কারণ নিশ্চয়ই একটু আছে।

বাঙালীর ইতিহাসের অর্থ

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ইংরাজি ভাষায় রচিত বাংলার পাল রাজবংশের কাহিনী, এবং "বাঙ্গালার ইতিহাস" বহুদিন প্রাচীন বাংলার প্রামাণিক ইতিহাস বলিয়া গণ্য ছিল। কয়েক বৎসর আগে শেষোক্ত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; এখনও যে সে-গ্রন্থের মূল্য পণ্ডিত মহলে স্বীকৃত ইহাই তাহার প্রমাণ। স্বর্গত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের "গৌড়রাজমালা"ও ঐতিহাসিকের কাছে সুপরিচিত এবং মূল্যবান গ্রন্থ। "গৌড়রাজমালা" প্রকাশিত হইবার পর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বিনয়চন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র রায়, রাধাগোবিন্দ বসাক, প্রমোদলাল পাল, স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার, গিরীন্দ্রমোহন সরকার এবং আরও অনেক প্রখ্যাত পণ্ডিত ও মনীষী প্রাচীন বাংলার রাজকীয় ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় রচনা করিয়া তুলিয়াছেন। একথা আজ অনস্বীকার্য যে ইঁহাদের এবং অন্যান্য আরও অনেক গবেষকের সম্মিলিত চেষ্টা ও সাধনার ফলে আজ প্রাচীন বাংলার ইতিহাস আমাদের কাছে অল্পবিস্তর সুপরিচিত; অন্তত মোটামুটি কাঠামো সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা কিছু নাই। কিন্তু, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের গবেষণার ফলে, সমবেত চেষ্টার ফলে, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের যাহা জানিবার সুযোগ হইয়াছে তাহার অধিকাংশই প্রাচীন রাজবংশাবলীর কথা—রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং জয়পরাজয়ের কথা। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি এবং রাজকর্মচারীদের সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ জানিবার সুযোগও হইয়াছে। প্রাচীন বাংলা দেশ সম্বন্ধে যে সমস্ত লেখমালা ও যে কয়েকখানি সাহিত্যগ্রন্থ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতেও এইসব

রাজকীয় সংবাদ ছাড়া কিংবা রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতির কথা ছাড়া আর কিছু আহরণ করিবার চেষ্টা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও বিশেষ কিছু হয় নাই। কোনও কোনও সম্পাদক, যথা স্বর্গত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, ননীগোপাল মজুমদার, গঙ্গামোহন লস্কর, পারজিটার, নগেন্দ্রনাথ বসু, লালমোহন বিদ্যানিধি, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কীলহর্ন, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, রাধাগোবিন্দ বসাক, দীনেশচন্দ্র সরকার, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতেরা সমাজ সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমাজ সর্বত্রই বর্ণাশ্রমবদ্ধ সমাজ, এবং তাঁহাদের আহৃত সমাজ-সংবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চতর বর্ণের সমাজ-সংবাদ। এ-যাবৎ 'সামাজিক অবস্থা' বলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'সমাজ' কথাটা অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে, উচ্চতর বর্ণ-সমাজ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং সে-সংবাদও অত্যন্ত অপ্রচুর। মোটামুটি ইহাই ছিল কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও বাংলার ইতিহাসের উপাদান। গ্রন্থাকারে বা প্রবন্ধাকারে যত প্রাচীন বাংলার ইতিহাসাধ্যায় রচিত হইয়াছে তাহাতে রাজা, রাজ্য, রাজকর্মচারী, রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি এবং উচ্চতর বর্ণ-সমাজ সংপৃক্ত সংবাদ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। ইহাই আমাদের বাংলার ইতিহাস।

আরও কিছু আছে। ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধেও আমাদের কিছু কিছু জানিবার সুযোগ আছে। এবিষয়ে সর্বাগ্রে স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম করিতে হয়। প্রাচীন বাংলার সাহিত্য এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের সজাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার এবং স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে শিল্প, সাহিত্য, ভাষা ও ধর্ম-সংপৃক্ত সংবাদ আহরণ ও আলোচনায় স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু গিরীন্দ্রমোহন সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সরসীকুমার সরস্বতী, অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশ প্রভৃতি পণ্ডিত ও মনীষীরা নানাদিকে উল্লেখযোগ্য উদ্যম প্রকাশ করিয়া বাংলার ইতিহাসের সীমা ও পরিধি বিস্তৃত করিয়াছেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ঢাকার সরকারী চিত্রশালা এবং বাংলার ও বাংলার বাহিরের অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সাধারণ ও ব্যক্তিগত প্রত্নবস্তু সংগ্রহের সহায়তায় প্রাচীন বাংলার ভাষা ও সাহিত্য, ধর্ম ও শিল্প সম্বন্ধে আজ আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টি অনেকটা সুস্পষ্ট। ইঁহারা এবং এই সব প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের পথ সুগম করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও একথা সত্য ছিল যে, কি বাংলা কি ইংরাজি, কি অপর কোনও ভাষায় প্রাচীন বাংলার সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ একটা রূপ কেহ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন নাই। ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতাম তাহার অধিকাংশই বর্ণ-ধর্মের কথা,—সে-ধর্ম বৌদ্ধই হউক আর পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মই হউক—, সভাশিল্প বা নাগর সমাজের অভিজাত শিল্পের কথা, সংস্কৃত সভা-সাহিত্যের কথা। যে-ধর্ম

বর্ণাশ্রমীদের, যে-শিল্প বা সাহিত্য রাজসভায় বা বিত্তশালী বণিক অথবা গৃহস্থের পোষকতায় পুষ্ট ও লালিত, যে-শিল্প বা সাহিত্য বর্ণাশ্রম ধর্মের, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও শিল্পশাস্ত্রের অনুশাসন, সাধন-পদ্ধতি এবং লক্ষণ দ্বারা শাসিত, সেই ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের কথাই এ-যাবৎ আমরা পড়িয়া আসিয়াছি। লোক-ধর্ম, লোক-শিল্প, লোক-সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা বহুদিন একেবারে সজাগই ছিলাম না। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মাঝে মাঝে আমাদের একটু সজাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র।

বহুদিন আগে বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না * * *"। তিনি শুধু রাজা ও রাষ্ট্রের ইতিহাস-রচনা কামনা করেন নাই; চাহিয়াছিলেন বাংলার সেই ইতিহাস যে-ইতিহাস বলিবে

* * * রাজশাসন প্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপে হইত। রাজসৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি? * * * কতপ্রকার রাজকর্মচারী ছিল, * * *? কে বিচার করিত * * * রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত, তাহাদের সুখ দুঃখ কিরূপ ছিল? চৌর্য, পূর্ত, স্বাস্থ্য এসকল কিরূপ ছিল? * * * কোন্ ধর্ম কতদূর প্রচলিত ছিল? * * * তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরূপ? সমাজ ভয় কিরূপ? ধর্মভয় কিরূপ * * * বাণিজ্য কিরূপ, কি কি শিল্পকার্যে পারিপাট্য ছিল? কোন্ কোন্ দেশোৎপন্ন শিল্প কোন্ কোন্ দেশে পাঠাইত? * * * ভিন্ন দেশ হইতে কি কি সামগ্রী আমদানি হইত, পণ্যকার্য কি প্রকারে নির্বাহ হইত?"

আজ বহুদিন পর বঙ্কিমচন্দ্রের এই কামনা কিছু সার্থক হইয়াছে, বলা যায়। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের সুযোগ্য সম্পাদনায় এবং প্রভূত শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ইংরাজি ভাষায় রচিত বাংলার ইতিহাসের সুবৃহৎ প্রথম খণ্ড, অর্থাৎ প্রাচীন বাংলার পরিপূর্ণ, সুপরীক্ষিত, সুআলোচিত তথ্যবহুল একটি সামগ্রিক ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় সাতশত পৃষ্ঠায় বারোজন বাঙালী পণ্ডিত ও মনীষীর সমবেত প্রচেষ্টায় প্রস্তুত এই গ্রন্থকে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিগত ৭৫ বৎসরের সম্মিলিত গবেষণার সমষ্টিগত ফল বলা যাইতে পারে। আলোচনারম্ভেই যে-অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে, এই গ্রন্থ প্রকাশের ফলে সেই অভাব কিছুটা মিটিয়াছে, একথা বোধ হয় বলা যায়। এ-গ্রন্থ বাঙালীর পাণ্ডিত্য ও মনীষার গৌরব, এমন উক্তি করিলে খুব অত্যুক্তি কিছু করা হয় না। সম্প্রতি রমেশবাবু এই সুবৃহৎ গ্রন্থের একটি বাংলা সংক্ষিপ্ত সারও প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাংলার এই ইতিহাসকে বাঙালীর ইতিহাস বোধ হয় বলা চলে না। তাহার কারণ একটু সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে। প্রথমত, ইতিহাসের কোনও যুক্তি, কার্যকারণ সম্বন্ধের কোনও ব্যাখ্যা বা ইঙ্গিত এই ইতিহাস-পরিকল্পনার পশ্চাতে নাই; এবং তাহা না থাকিবার ফলে প্রত্যেকটি অধ্যায় সুপরীক্ষিত সুআলোচিত তথ্যবহুল হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রন্থে সমসাময়িক বাঙালীর সমগ্র জীবন-ধারার যথার্থ পরিচয় ফুটিয়া

উঠিতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন বাংলায় যাঁহাদের বলা যায় জনসাধারণ, যাঁহারা বর্ণসমাজের বাহিরে, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহিরে অথবা বৌদ্ধধর্মের বাহিরে, যাঁহারা রাষ্ট্রের দরিদ্র ভূমিহীন বা স্বল্পভূমিবান প্রজা বা সমাজ-শ্রমিক প্রভৃতি তাঁহাদের কথা এই গ্রন্থে যথেষ্ট স্থান পায় নাই; অথচ তাঁহারাই যে ছিলেন সংখ্যা-গরিষ্ঠ এ-সম্বন্ধে তো সন্দেহ নাই। যে লোকধর্ম, লৌকিক দেবদেবী, গ্রাম্য জনসাধারণের জীবন যাত্রা, গ্রামের সঙ্গে নগরের পার্থক্য ও যোগাযোগের অধিকতর তথ্য, যে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর সমগ্র জীবনধারা প্রবহমাণ তাহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রভৃতি জনসাধারণের এই ইতিহাসকে পূর্ণতর ও উজ্জ্বলতর করিতে পারিত, তাহা পরিপূর্ণ মর্যাদায় এই গ্রন্থভুক্ত হইতে পারে নাই। সত্য বটে, ইহাদের কথা বলিবার মত যথেষ্ট তথ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই; তবু যতটুকু জানা যায় ততটুকু অন্তত প্রাচীন বাংলাদেশকে বেশি জানা। তৃতীয়ত, এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি অধ্যায় বিচ্ছিন্ন; একে অন্যের সঙ্গে অপরিহার্য অনিবার্য সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত নয়। সুলিখিত এবং তথ্যবহুল রাজকাহিনী ও রাষ্ট্র-যন্ত্রের আলোচনা এই গ্রন্থের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি অধিকার করিয়া আছে; কিন্তু এত বেশি মূল্য পাওয়া সত্ত্বেও রাজ্য ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন দিকের যোগাযোগ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সচেতনতা এই অধ্যায় গুলিতে নাই। ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যায় দুইটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তথ্যবহুল এবং অত্যন্ত সুলিখিত; কিন্তু ইহাদের মধ্যেও সাহিত্যের সঙ্গে সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রের এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সম্বন্ধের ইঙ্গিত অত্যন্ত কম। ধর্মের অধ্যায়ে লোক-ধর্ম, লৌকিক দেব-দেবীর অস্তিত্বের স্বীকৃতি প্রায় নাই বলিলেই চলে; অথচ, বাংলাদেশে উচ্চতর বর্ণসমাজে যে-ধর্মের প্রচলন তাহার ভিত্তিভূমিই হইতেছে লোকধর্ম, লৌকিক দেবদেবী ও লৌকিক আচারানুষ্ঠান। সমাজ কথাটিও অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; তবু জনসাধারণের কথা যাহা কিছু সমাজ-অধ্যায়েই আছে; একমাত্র এই অধ্যায় এবং ইহার পরবর্তী অর্থনৈতিক অবস্থার অধ্যায়েই জনসাধারণ আমাদের দৃষ্টির বাহিরে পড়িয়া থাকে নাই। কিন্তু, এসব ক্ষেত্রেও ধর্ম, সমাজ ও আর্থিক অবস্থার সঙ্গে রাজা ও রাষ্ট্রের এবং বর্ণ-বিন্যস্ত, শ্রেণী-বিন্যস্ত বৃহত্তর সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা যথেষ্ট করা হয় নাই।

রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আর্থিক বিন্যাস প্রভৃতি সমস্ত কিছুই গড়িয়া তোলে মানুষ; এই মানুষের ইতিহাসই যথার্থ ইতিহাস। এই মানুষ সম্পূর্ণ মানুষ; তাহার একটি কর্ম অন্য আর একটি কর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, এবং বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে দেখা ও পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না—একটি কর্মের সঙ্গে অপরাপর কর্মকে যুক্ত করিয়া দেখিলে তবে তাহার সম্পূর্ণ রূপ ও প্রকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। দেশকালধৃত মানুষের সমাজ সম্বন্ধেও একথা সত্য এবং সর্বত্র স্বীকৃত। এই সত্য স্বীকৃতি না পাইলে ইতিহাস যথার্থ ইতিহাস হইয়া উঠিতে পারে না। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত যে ভারতবর্ষের ইতিহাস ব্রিটিশ ইতিহাস রচনার আদর্শ এবং আমরা আমাদের দেশে যে-আদর্শ ও পদ্ধতি এ-যাবৎ

অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি তাহার মূলে পূর্বোক্ত সত্যের স্বীকৃতি যথেষ্ট নাই। ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির যুক্তি না তুলিয়াও বলা যায়, ঊনবিংশ শতকের মধ্যপাদ হইতেই মানবিক তথ্য ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও আলোচনায় এই সত্য স্বীকৃত যে, মানুষের সমাজই মানুষের সর্বপ্রকার কর্মকৃতির উৎস, এবং সেই সমাজের বিবর্তন-আবর্তনের ইতিহাসই দেশকালধৃত মানব-ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করে। আমাদের দেশে ইতিহাসালোচনায় এই সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টি ও আলোচনা-পদ্ধতি আজও পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে নাই। তাহা ছাড়া, আমাদের দেশে রাজকাহিনী এবং রাষ্ট্রযন্ত্র-কাহিনী আজও ঐতিহাসিক গবেষণা ও আলোচনার একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার কারণ অবশ্য সহজবোধ্য ও সুপরিজ্ঞাত। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে রাজসভায় রাজা ও রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় যে-সব গ্রন্থ রচিত হইত তাহার মধ্যে রাজকাহিনী, রাষ্ট্রকাহিনী-গ্রন্থের অপ্রাচুর্য ছিল না—রাজসভায় তাহা হইয়াই থাকে—কিন্তু এই সব গ্রন্থে দেশের সমাজ-বিন্যাস বা জ্ঞান-বিজ্ঞান সৃষ্টি ও আলোচনার যথেষ্ট স্থান বা মূল্য ছিল না। অথচ, রাজা ও রাষ্ট্র ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় কখনও একান্ত হইয়া উঠে নাই। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র আমাদের জীবন ছিল একান্তই সমাজকেন্দ্রিক, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নয়; আমাদের দৈনন্দিন জীবন, আমাদের যাহা কিছু কর্মকৃতি সমস্তই আবর্তিত হইত সমাজকে ঘিরিয়া। কিন্তু, ঊনবিংশ শতকে ইতিহাস-রচনার যে রীতিপদ্ধতি ও আদর্শের সন্ধান আমরা ইংরাজি শিক্ষার ভিতর দিয়া পাইয়াছি তাহা একান্তই রাজা ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। বিংশ শতকে তাহা অনেকটা সমাজ ও সংস্কৃতি-আলোচনার দিকে মোড় ফিরিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও সমাজকেন্দ্রিক হইয়া ওঠে নাই।

অথচ, দেশে রাজা বা রাজপাদোপজীবী কয়জন? রাষ্ট্রশাসনযন্ত্র যাঁহারা পরিচালনা করেন তাঁহারাই বা কয়জন? যুদ্ধবিগ্রহ নিত্য হইত না, সমগ্র ইতিহাসে তাহার স্থান কতটুকু? আজিকার দিনের সামগ্রিক যুদ্ধের মত তখনকার দিনের যুদ্ধবিগ্রহ সমাজের মূল ধরিয়া টান দিত না। যুদ্ধ সাধারণত যুদ্ধের স্থান, রাজা, সেনাধ্যক্ষ, সৈন্যবাহিনী, রাজসভা, রাজকর্মচারী ইহাদের মধ্যেই আবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ থাকিত। যুদ্ধের ফলাফল নিকট ও দূর ভবিষ্যৎকে একান্ত ভাবে রূপান্তরিতও করিতে পারিত না। রাজা ও রাজসভার বাহিরে ছিল অগণিত জনসাধারণ, বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস দ্বারা শাসিত, বিভিন্ন শ্রেণীর সীমায় সীমিত, ঠিক এখনও বাংলা দেশে যেমনটি আমরা দেখি। তবু, বর্তমান কালে, রাষ্ট্র যতটা সর্বগ্রাসী, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যতটা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, প্রাচীন কালে এমনটি এতটা হইবার সুযোগ ছিল না। এক রাজা পরাজিত হইয়াছেন, অন্য রাজা রাজমুকুট পরিয়া রাজসিংহাসনে বসিয়াছেন; তাহাতে অগণিত জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের বৈপ্লবিক রূপান্তর কিছু ঘটে নাই, বৃহত্তর

সমাজ-ব্যবস্থারও খুব দ্রুত উলোট-পালোট কিছু হইয়া যায় নাই—যাহা হইয়াছে তাহা ধীরে ধীরে এবং সমাজের উচ্চতর স্তরে।

আসল কথা, প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজা ও রাষ্ট্রযন্ত্র সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার রক্ষক ও নিয়ামক মাত্র। রাজা ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল এই সমাজ-ব্যবস্থাকে রক্ষণ ও পালন করা, আর সমাজের দায়িত্ব রাজা ও রাষ্ট্রকে প্রতিপালন করা। সমাজ আছে বলিয়াই রাষ্ট্র এবং রাজাও আছেন, সমাজহীন রাষ্ট্র কল্পনাও করা যায় না। রাজা ও রাষ্ট্রের পক্ষে ধন যেমন অপরিহার্য, সমষ্টির পক্ষেও তাহাই। ধন-ব্যবস্থা, ভূমি-ব্যবস্থা, শ্রেণী-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সমস্তই সামাজিক ধনকে কেন্দ্র করিয়া; ধন না হইলে রাজা ও রাষ্ট্র প্রতিপালিত হয় না। এই ধন উৎপাদনের তিন উপায় প্রাচীন বাংলায় দেখিতে পাওয়া যায়—কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। এই তিন উপায় তিন শ্রেণীর করায়ত্ত—ভূমিবান শ্রেণী, শিল্পী শ্রেণী, বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণী। এই তিন উপায়ে উৎপাদিত অর্থদ্বারা সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইত, এবং সদ্যকথিত তিন শ্রেণী ও রাষ্ট্র মিলিয়া উৎপাদিত ধন-বণ্টনের ব্যবস্থা করিতেন। কাজেই, রাজা ও রাষ্ট্র ছাড়া সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এই তিন শ্রেণীর অর্থাৎ ধনোৎপাদক শ্রেণীর একটা বিশেষ স্থান ছিল, এবং রাজা ও রাজকর্মচারীদের অপেক্ষা ইঁহারা যে সংখ্যায় অনেক বেশি ছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ, ইঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানিবার সুযোগ নাই। ধনোৎপাদন প্রণালী, ধনবণ্টন, ভূমি-ব্যবস্থায় ভূমিবানদের সঙ্গে ভূমিহীন কৃষককুল ও কৃষিশ্রমিকদের সম্বন্ধ, শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাষ্ট্র ও সমাজের সম্বন্ধ, শ্রেণী-ব্যবস্থা ও বর্ণ-ব্যবস্থায় বর্ণের সঙ্গে শ্রেণী, বর্ণের সঙ্গে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের সঙ্গে শ্রেণীর সম্বন্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের কিছু জানিবার সুযোগ আজও অতি অল্পই আছে।

এই মাত্র যে ধনোৎপাদক শ্রেণী ও কৃষিশ্রমিকদের কথা বলিলাম, ইঁহাদের জীবনাচরণ যে শুধুই ধনসর্বস্ব, ধনকেন্দ্রিক ছিল, একথা বলা চলে না। ইঁহাদের রক্ষা ও পালন যাঁহারা করিতেন সেই রাজা ও রাজপাদপোজীবীদের জীবনে ধর্ম ও শিল্পের, শিক্ষা ও সাহিত্যের, এক কথায় সংস্কৃতিরও প্রয়োজন ছিল। সেই সংস্কৃতি স্বভাবতই এমন হওয়া প্রয়োজন ছিল যাহা তদানীন্তন সমাজ-সংস্থানের পরিপন্থী নয়। এই সংস্কৃতির পুষ্টি ও পালন ধনসাপেক্ষ; সেই ধন সমাজের উদ্বৃত্ত ধন। দৈনন্দিন একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করিয়া যে-ধন থাকিত সেই ধনের কিয়দংশ যাঁহারা দিতেন ও দিতে সমর্থ ছিলেন তাঁহারাই পরোক্ষভাবে উচ্চতর সমাজস্তরের সংস্কৃতির আদর্শ নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন, ইহাই তো স্বাভাবিক। অপরোক্ষভাবে ইহাকে রূপদান করিতেন সমাজের বুদ্ধিজীবীরা—ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদেরা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলকরা, এবং ইঁহাদের প্রায় সকলই ছিলেন বৌদ্ধ অথবা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রয়ী। শিক্ষা ও ধর্মাচরণের, সামাজিক স্মৃতি ও ব্যবহারাদি, নিয়ম-আচার প্রভৃতি প্রণয়নের দায়িত্ব ছিল তাঁহাদের। এই দায়িত্ব তাঁহারা পালন করিতেন বলিয়া সমাজের মধ্যে সমর্থ শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ জৈন-বৌদ্ধ যতি ও ব্রাহ্মণদের প্রতিপালন

ও ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিত। সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ইহাদের বর্ণ ও শ্রেণীগত স্থান ও ব্যবহার, রাষ্ট্রের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ, ধনোৎপাদক ও বণ্টক শ্রেণীদের সঙ্গে সম্বন্ধ ইত্যাদি ব্যাপার, এবং ইহাদের সৃষ্ট সংস্কৃতির আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করিয়া লইবার সুযোগ আজও কম। ইহারা ছাড়া, সমাজের নিম্নতর স্তরগুলিতে নিরক্ষর জনসাধারণেরও একটা মানস-জীবন ছিল, সংস্কৃতি ছিল। এ-সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান স্বল্পই। অথচ, ইহারাও সমাজের বিশেষ একটি অঙ্গ, এবং এই সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ ও ইতিহাস বাংলার ও বাঙালীর ইতিহাসেরই কথা।

রাজা, রাজপাদোপজীবী, শিল্পী, বণিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, ভূমিবান সম্প্রদায় প্রভৃতি শ্রেণীর অসংখ্য লোকের বিচিত্র প্রয়োজনের সেবার জন্য ছিল আবার অগণিত জনসাধারণ। ইহাদের অশন বসন, বিলাস আরাম, সুখ সুবিধা, দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র কর্তব্য প্রভৃতি সম্পাদনার জন্য প্রয়োজন হইত নানা শ্রেণীর, নানা বৃত্তির সমাজসেবক ও সমাজশ্রমিক শ্রেণীর অসংখ্যতর 'ইতর' জনের—প্রাচীন লিপিমালায় যাঁহাদের বলা হইয়াছে 'অকীর্তিত' বা অনুল্লিখিত জনসাধারণ। ইহাদের ছাড়াও সমাজ চলিতনা; এই অকীর্তিত জনসাধারণও সমাজের অঙ্গ বিশেষ, এবং সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ইহাদেরও স্থান ছিল। অথচ, ইহাদের কথাও আমরা কমই জানি। ইহাদেরও ধর্মবিশ্বাস ছিল, দেবদেবী ছিল, পূজানুষ্ঠান ছিল, সংস্কৃতির একটা ধারা ছিল। উৎপাদিত ধনের খানিকটা—খুব স্বল্পতম অংশ সন্দেহ নাই—ইহাদের হাতে আসিত কোনও না কোন সূত্র ধরিয়া। এসব সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আজও যথেষ্ট সচেতন নয়।

কাজেই, রাজা, রাষ্ট্র, রাজপাদোপজীবী, শিল্পী, বণিক, ব্যবসায়ী, শ্রেষ্ঠী, মানপ, ভূমিবান মহত্তর, ভূমিহীন কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবক, সমাজশ্রমিক, "অকীর্তিতান্ আচণ্ডালান্" প্রভৃতি সকলকে লইয়া প্রাচীন বাংলার সমাজ। ইহাদের সকলের কথা লইয়া তবে বাঙালীর কথা, বাঙালীর ইতিহাসের কথা। এই অর্থেই আমি "বাঙালীর ইতিহাস" কথাটি ব্যবহার করিতেছি। বাঙালী-সমাজও এই বৃহত্তর অর্থেই বুঝিতেছি।

অথচ এই অর্থে বাংলার অথবা বাঙালীর ইতিহাস সম্বন্ধে মনীষী ঐতিহাসিকেরা সকলেই কিছু একেবারে সজাগ ছিলেন না, একথা সত্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আগে বলিয়াছি; তাঁহার মন দেশকালধৃত ইতিহাসের এই সমগ্ররূপ সম্বন্ধে সচেতন ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বহুদিন পরে আর এক বাঙালী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেও এই বাঙালীর ইতিহাসের কল্পনা ধরা দিয়াছিল। "গৌড়রাজমালা" গ্রন্থের ভূমিকায় স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং জয় পরাজয়—ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথা। তথাপি কেবল এই সকল কথা লইয়াই ইতিহাস সংকলিত হইতে পারেনা। বাঙালীর ইতিহাসের প্রধান কথা—বাঙালী জনসাধারণের কথা।" এই বাঙালী জনসাধারণের কথা এযাবৎ বাংলার ইতিহাসে সম্যক কীর্তিত হয় নাই।

২

কেন হয় নাই তাহার কারণ খুঁজিতে খুব বেশি দূর যাইতে হয় না। উনবিংশ শতকের শেষপাদে এবং বিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে ঐতিহাসিক গবেষণার যে-পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশে, তথা ভারতবর্ষে, প্রচলিত সে-পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি আমরা পাইয়াছি সমসাময়িক য়ুরোপীয়, বিশেষভাবে ইংরাজি ঐতিহাসিক আলোচনা-গবেষণার রীতিপদ্ধতি ও আদর্শ হইতে। এই আদর্শ, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি একান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এবং রাজা ও রাষ্ট্রই এই গবেষণার কেন্দ্র। সামাজিক চেতনা এই আদর্শ ও পদ্ধতিকে উদ্বুদ্ধ করে নাই। স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায়, রাষ্ট্রই সকল ব্যবস্থার নিয়ন্তা; যেদিকে তাকানো যায়, সেইদিকেই রাষ্ট্রের সুদীর্ঘবাহু বিস্তৃত, ইহাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে; এবং সেই রাষ্ট্রও কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ ব্যক্তি-সমষ্টিকেই যেন আশ্রয় করিয়া আছে, ইহাই সর্বজনগোচর হয়। অথচ, সেই রাষ্ট্রের পশ্চাতে যে বৃহত্তর সমাজ এবং সমাজের মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ স্বার্থের লীলাধিপত্য তাহা সহজে চোখে ধরা পড়ে না। সমাজবিকাশের অমোঘ নিয়মের বশেই যে রাজা ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি, একথা উনবিংশ শতকের ইংরাজি ঐতিহাসিক আলোচনা-গবেষণা স্বীকার করে নাই। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রেও তেমনই তখনও পর্যন্ত ইংলণ্ডে এবং য়ুরোপেও অধিকাংশ পণ্ডিত মহলে ফরাসী বিপ্লবের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের, কার্লাইলের বীর ও বীরপূজাদর্শের বিজয়-পতাকা উড়িতেছে। এদেশে আমরা তাহার অনুকরণ করিয়াছি মাত্র। ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি সেই জন্যই বিশেষভাবে রাজা ও রাষ্ট্রের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং সমাজ সম্বন্ধেও তথ্য যখন আহৃত ও আলোচিত হইয়াছে, তখন 'সমাজ' অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থেই গ্রহণ ও প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু উনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদ হইতেই য়ুরোপের কোথাও কোথাও, বিশেষভাবে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানিতে, সমাজবিকাশের বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গবেষণার সূত্রপাত হয়, এবং তাহার ফলে সর্বত্র পণ্ডিত সমাজ একথা স্বীকার করিয়া লন যে, ধনোৎপাদনের প্রণালী ও বণ্টন-ব্যবস্থার উপরই বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন কালের বৃহত্তর সমাজ-সংস্থান নির্ভর করে, বিভিন্ন বর্ণ, শ্রেণী ও স্তর এই ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া ওঠে। এই ব্যবস্থাকে রক্ষণ ও পালন করিবার জন্যই রাজা ও রাষ্ট্র প্রয়োজন হয়; এবং এই সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করিবার জন্যই একটি বিশেষ সংস্কৃতির উদ্ভব ও পোষণের প্রয়োজন হয়। সমাজ-বিকাশের এই বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ক্রমশ সমগ্র য়ুরোপে ছড়াইয়া পড়ে, এবং বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মধ্যেও এই ব্যাখ্যার প্রভাব দেখা দেয়। য়ুরোপে যাহা

উপরোক্ত অর্থে বাঙালীর ইতিহাস কেন রচিত হইতে পারে নাই

উনবিংশ শতকের শেষ পাদেই আরম্ভ হইয়াছিল, এবং যাহার ঢেউ কতকটা বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্ততটে আসিয়া আঘাত করিয়াছিল, বিংশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ইংলণ্ডেও তাহার প্রবর্তনা দেখা দেয়। ইহার কিছুদিন আগে হইতেই সমাজ, সামাজিক ধন, রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ, রাষ্ট্র, ধর্ম এবং সংস্কৃতি প্রভৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধ ইত্যাদি লইয়া প্রামাণিক গ্রন্থ ইংলণ্ডেও রচিত হইতেছিল; কিন্তু জনতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার প্রসার ও প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই নূতন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির রূপ ক্রমশ আরও সুস্পষ্ট হইতেছে। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক আলোচনা-গবেষণায় এই ইঙ্গিত বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদেও ধরা পড়িল না! এই জন্যই আজ পর্যন্ত বাঙালীর বা ভারতবাসীর ইতিহাস রচিত হইতে পারিল না।

উপরোক্ত ধ্যান ও ধারণাগত কারণ ছাড়া সমগ্র জনসাধারণের ইতিহাস রচিত না হওয়ার একটা বস্তুগত কারণও আছে—তাহা জনসাধারণের ইতিহাস-রচনার উপযোগী উপাদানের অভাব। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে সমগ্রভাবেই এই অভিযোগ করা চলে, বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে তো চলেই। রাজা, রাজবংশ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রাদর্শ, রাজকর্মচারী ইত্যাদির কথাই প্রভূত যত্নে তিল তিল করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, তবে আজ আমরা এতদিনের পর আমাদের ইতিহাসের অল্পবিস্তর স্পষ্ট একটা রূপ দেখিতে পাইতেছি। এখনও এমন কাল ও এমন দেশখণ্ড আছে যাহার ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলন অত্যন্ত আয়াস সাধ্য। রাজা ও রাষ্ট্রের ইতিহাস সম্বন্ধেই যেখানে এই অবস্থা, সেখানে বৃহত্তর সমাজ ও সমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে উপাদানের অপ্রাচুর্য থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি! সমগ্র ভারতবর্ষের কথা বলিয়া লাভ নাই; বাঙালীর ইতিহাস রচনা করিতে বসিয়া বাংলা দেশের কথাই বলি। বাংলার রাষ্ট্র ও রাজবংশাবলীর ইতিহাস যতটুকু আমরা জানি তাহার বেশির ভাগ উপাদান জোগাইয়াছে প্রাচীন লেখমালা। এই লেখমালা শিলালিপিই হউক আর তাম্রলিপিই হউক, ইহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় রাজসভাকবি রচিত রাজার অথবা রাজবংশের প্রশস্তি—কোনও বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে রচিত বিবরণ, বা কোনও ভূমিদান বিক্রয়ের দলিল, অথবা কোনও মূর্তি বা মন্দিরে উৎকীর্ণ উৎসর্গ-লিপি। ভূমি দান-বিক্রয়ের দলিলগুলিও সাধারণত রাজা অথবা রাজকর্মচারীদের নির্দেশে রচিত ও প্রচারিত। এই লেখমালার উপাদান ছাড়া কিছু কিছু সাহিত্য-জাতীয় উপাদানও আছে; ইহাদের অধিকাংশই আবার রাজসভার সভাপণ্ডিত, সভাপুরোহিত, রাজগুরু অথবা রাষ্ট্রের প্রধান কর্মচারীদের দ্বারা রচিত স্মৃতি, ব্যবহার ইত্যাদি জাতীয় গ্রন্থ। ধোয়ীর "পবনদূত", সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত", শ্রীধরদাসের "সদুক্তিকর্ণামৃত"-জাতীয় দুই চারিখানি কাব্যগ্রন্থও আছে—সেগুলি অধিকাংশ রাজা বা রাজসভাপুষ্ট কবিদের দ্বারা রচিত। বৃহদ্ধর্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত এবং ভবিষ্যপুরাণের মত দুই তিনটি অর্বাচীন পুরাণ গ্রন্থও আছে; এগুলি রাজসভায় রচিত হয়তো নয়, কিন্তু রাজসভা, রাজবংশ অথবা অভিজাত সম্প্রদায়

কর্তৃক পুষ্ট ও লালিত ব্রাহ্মণ্য বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের রচনা। ইহা ছাড়া, অন্যান্য প্রদেশের সমসাময়িক লিপিমালা এবং গ্রন্থাদি হইতে কিছু কিছু উপাদান পাওয়া যায়; কিন্তু এগুলির স্বরূপও প্রায় একই প্রকারের। ফাহিয়ান্, য়ুয়ান-চোয়াঙ্, ইৎসিঙের মতন বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী, গ্রীক ও মিশরীয় ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকদের বিবরণী, তিব্বতে ও নেপালে প্রাপ্ত নানা বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়গত বিভিন্ন বিষয়ক পুঁথিপত্র হইতেও কতক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে, এখনও হইতেছে। কিন্তু, একথা মনে রাখা প্রয়োজন, বিভিন্ন বিদেশী পর্যটকেরা রাজ-অতিথিরূপে বা রাষ্ট্রের সহায়তায় এই দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। বিদেশী পাশ্চাত্ত্য ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকের রচনাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখকদের শ্রেণী ও সম্প্রদায়গত স্বার্থদৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। আর, তিব্বতে-নেপালে প্রাপ্ত পুঁথিগুলি তো একান্তভাবে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের ছত্রছায়ায় বসিয়াই লেখা হইয়াছিল। যতগুলি উপাদানের উল্লেখ করা হইল তাহার অধিকাংশই রাজসভা, ধর্মগোষ্ঠী বা বণিকগোষ্ঠীর পোষকতায় রচিত। তবে, রাজা, মন্ত্রী বা রাজবংশের অথবা অন্য কোন অভিজাত বংশের প্রশস্তিলিপিগুলি হইতে এবং "রামচরিতে"র মত সাহিত্যগ্রন্থ হইতেই রাজ্য- ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে; আর, "আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প"-জাতীয় অন্যান্য ধর্ম অথবা সাহিত্যগ্রন্থ, অন্যান্য স্মৃতি, ব্যবহার ও পুরাণগ্রন্থ হইতে কিংবা ভূমিদান-বিক্রয়ের তাম্রপট্ট হইতে যে-সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা পরোক্ষ। বাণভট্টের "হর্ষচরিত", বিল্‌হনের "বিক্রমাংক-দেবচরিত" বা কহ্‌লনের "রাজতরঙ্গিণী"র মতন কোনও ইতিহাস-গ্রন্থ প্রাচীন বাংলার ইতিহাস-রচনায় সহায়তা করিতেছে না। এই অবস্থায়, রাজা, রাজবংশ, রাষ্ট্র ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস রচনার উপাদানই তো অপূর্ণ ও অপ্রচুর, সামাজিক ইতিহাসের তো কথাই নাই। তবে, ইহাদের ইতিহাসের উপাদান অপূর্ণ ও অপ্রচুর হইলেও অন্যপক্ষের পক্ষপাতিত্ব দোষ ইহাদের উপর আরোপ করা যায় না; কারণ এসমস্ত উপাদানই রাজা অথবা রাজবংশের কিংবা তাঁহাদের সমশ্রেণীর পোষকতায় লালিত ও বর্ধিত বুদ্ধিজীবী, বণিক বা ধর্মগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আশ্রয়ে রচিত।

উপরোক্ত উপাদানগুলি বাংলার বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাসেরও উপাদান। সমাজ সম্বন্ধে যে-সংবাদ ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা যে শুধু পরোক্ষ সংবাদ তাহাই নয়, শুধু যে অপূর্ণ ও অপ্রচুর তাহাই নয়, কতকটা একদেশীয়, একপক্ষীয় হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথমত, সামাজিক ইতিহাসের সংবাদ দেওয়া তাহাদের উদ্দেশ্য নয়। যতটুকু সংবাদ পাওয়া যায় তাহা পরোক্ষভাবে, বিবৃত ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকের জন্য যতটুকু প্রয়োজন হইয়াছে তাহার প্রসঙ্গক্রমে। সেই দিক হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহাই মূল্যবান এবং ঐতিহাসিকের নিকট গ্রহণযোগ্য সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়ত, যেহেতু [illegible] এইসব উপাদানের উৎপত্তিস্থল হইতেছে রাজসভা, অভিজাত সম্প্রদায় বা ধর্মগোষ্ঠী, সেইহেতু

স্বভাবতই তাহাদের মধ্যে সমাজের অন্যান্য শ্রেণী বা গোষ্ঠী সম্বন্ধে যে-সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা অত্যন্ত স্বল্প শুধু নয়, অপক্ষপাত দৃষ্টিও তাহার মধ্যে নাই। শিল্পী ও বণিকশ্রেণী, ক্ষেত্রকর ও সমাজ-শ্রমিক শ্রেণীর মতন সমাজের এমন প্রয়োজনীয় শ্রেণীদের সম্বন্ধেও এইসব উপাদান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীরব। তাহা ছাড়া, প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, বিশেষভাবে সামাজিক ইতিহাস রচনায় যে-সাহায্য সমকালীন ধর্ম, স্মৃতি, সূত্র এবং অর্থশাস্ত্র জাতীয় গ্রন্থাদি হইতে পাওয়া যায়, প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাস রচনায় সেই ধরনের সাহায্য একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। অবশ্য, অনেকে ধরিয়া লন যে, এই জাতীয় গ্রন্থাদিতে বর্ণিত সামাজিক অবস্থা তদানীন্তন বাংলাদেশেও হয়তো প্রচলিত ছিল; তবু, যেহেতু এই জাতীয় কোনও গ্রন্থ বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া নিঃসংশয়ে বলা যায় না, সেই কারণে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনায় তাহাদের প্রমাণ অনুমানের অধিক মূল্য বহন করে না, এবং ঐতিহাসিকের কাছে অনুমানসিদ্ধ প্রমাণের মূল্য খুব বেশি নয়, যদি সমাজবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা তাহা সিদ্ধ ও সমর্থিত না হয়। এই সব কারণেও বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাস রচনার দিকে, তথা বাঙালীর ইতিহাস রচনার দিকে, আমাদের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই।

৩

বাঙালীর সমাজ-বিন্যাসের ইতিহাসই বাঙালীর ইতিহাস

বস্তুত, সমাজবিন্যাসের ইতিহাসই প্রকৃত জনসাধারণের ইতিহাস। প্রাচীন বাংলার সমাজবিন্যাসের ইতিহাসই এই গ্রন্থের মুখ্য আলোচ্য বলিয়া ইহার নামকরণ করিয়াছি. বাঙালীর ইতিহাস। রাজা ও রাষ্ট্র এই সমাজবিন্যাসে যতটুকু স্থান অধিকার করে ততটুকুই আমি ইহাদের আলোচনা করিয়াছি। এই সমাজবিন্যাসের বস্তুগত ভিত্তি, সমাজের বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণী, সমাজে ও রাষ্ট্রে তাহাদের স্থান, তাহাদের দায় ও অধিকার, বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ, রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্বন্ধ, সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি, ইত্যাদি সমস্তই প্রাচীন বাংলার সমাজবিন্যাসের, তথা জনসাধারণের ইতিহাসের আলোচনার বিষয়। এই সমাজবিন্যাসের ইতিহাস রচনার কতকটা পরিচয় পাওয়া জার্মান পণ্ডিত ফিক্ (Fick) রচিত বুদ্ধদেবের সমসাময়িক উত্তরপূর্ব ভারতবর্ষের ইতিহাস-গ্রন্থে (Die Socialo Gielderung in Nordostlichen zu Buddhas Zeit)। অবশ্য, জাতকের অসংখ্য গল্পে এবং প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে তদানীন্তন সমাজ-বিন্যাসের যে-সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপাদানে সে স্পষ্টতা বা সম্পূর্ণতা একেবারেই নাই। তবু, সমাজ-তাত্ত্বিক রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক উপাদান সযত্নে বিশ্লেষণ করিলে আজ মোটামুটি একটা কাঠামো গড়িয়া তোলা একেবারে অসম্ভব হয়তো নয়। বর্তমান

গ্রন্থে তাহার চেয়ে বেশি কিছু করা হইতেছে না, বোধ হয় সম্ভবও নয়। বাংলা দেশে ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কারের চেষ্টা খুব ভাল করিয়া হয় নাই; এক পাহাড়পুর নানাদিক দিয়া প্রাচীন বাংলার জনসাধারণের ইতিহাসে অভিনব আলোকপাত করিয়াছে; কিন্তু, তেমন উদ্যম অন্যত্র এখনও দেখা যাইতেছে না। বেশির ভাগ উপাদানের আবিষ্কার আকস্মিক এবং পরোক্ষ। তবু, ক্রমশ নূতন উপাদান সংগৃহীত হইতেছে, এবং আজ যাহা কাঠামো মাত্র, ক্রমশ আবিষ্কৃত উপাদানের সাহায্যে হয়তো সেই কাঠামোকে একদিন রক্তে মাংসে ভরিয়া সমগ্র একটা রূপ দেওয়া সম্ভব হইবে।

সমাজবিন্যাসের অথবা বৃহত্তর অর্থে সামাজিক ইতিহাস রচনার একটা সুবিধাও আছে, রাষ্ট্রীয় ইতিহাস রচনায় যাহা নাই। রাষ্ট্রীয়, বিশেষভাবে রাজবংশের ইতিহাসে সন তারিখ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য। কোন্ রাজার পরে কোন্ রাজা, কে কাহার পুত্র অথবা দৌহিত্র, কোন্ যুদ্ধ কবে হইয়াছিল ইত্যাদির চুলচেরা বিচার অপরিহার্য। সন তারিখ লইয়া সেইজন্য প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনায় এত বিতর্ক। এই ইতিহাসে ঘটনার মূল্যই সকলের চেয়ে বেশি এবং সেই ঘটনার কালপরম্পরার উপরই ইতিহাসের নির্ভর। সামাজিক ইতিহাস রচনায় এই জাতীয় ঘটনার মূল্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম; সন তারিখের মোটামুটি কাঠামোটা ঠিক হইলেই হইল—যদি না কিছু রাষ্ট্রীয়, অথবা সামাজিক উপপ্লব সমাজের চেহারাটাই ইতিমধ্যে একবারে বদলাইয়া দেয়। তাহার কারণ সহজেই অনুমেয়। সামাজিক বর্ণবিভাগ, শ্রেণীবিভাগ, ধনোৎপাদন ও বণ্টন প্রণালী, জাতীয় উপাদান, ভূমিব্যবস্থা, বাণিজ্যপথ ইত্যাদি, এক কথায় সমাজবিন্যাস প্রাচীন পৃথিবীর রাজা বা রাজবংশের হঠাৎ পরিবর্তনে রাতারাতি কিছু বদলাইয়া যায় নাই; অন্তত প্রাচীন বাংলায় বা ভারতবর্ষে তাহা হয় নাই। প্রাচীন পৃথিবীতে সর্বত্রই এইরূপ। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বৃহৎ কিছু একটা উপপ্লব সংঘটিত হইলে সমাজবিন্যাসও বদলাইয়া যায়; কিন্তু তাহাও একদিনে, দুই দশ বৎসরে হয় না। বহুদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে এই বিবর্তন চলিতে থাকে, সমাজপ্রকৃতির নিয়মে। অবশ্য, বর্তমান যুগে জাগতিক বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে এই বিবর্তন অত্যন্ত দ্রুত সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সব আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত তাহা ধীরে ধীরেই হইত। আর্যদের ভারতাগমন প্রাচীন কালের একটি বৃহৎ সামাজিক উপপ্লবের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনার্য অথবা আর্যপূর্ব সমাজবিন্যাস ছিল একরকম; তারপর আর্যেরা যখন তাঁহাদের নিজেদের সমাজবিন্যাস লইয়া আসিলেন তখন দুই আদর্শে একটি প্রচণ্ড সংঘাত নিশ্চয়ই লাগিয়াছিল। সেই সংঘাত ভারতবর্ষে চলিয়াছিল হাজার বৎসর ধরিয়া, এবং ধীরে ধীরে তাহার ফলে যে নূতন ভারতীয় সমাজবিন্যাস গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাই পরবর্তী হিন্দুসমাজ। আর্যপূর্ব জাতিদের মধ্যে কেহ কেহ যখন লৌহ ধাতুর আবিষ্কার করিয়াছিল,

উপাদান সম্বন্ধে সাধারণ দুই একটি কথা

তখনও এই রকমই একটা সামাজিক বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল, কারণ এই আবিষ্কারের ফলে ধন-উৎপাদনের প্রণালী গিয়াছিল বদলাইয়া, এবং তাহার ফলে সমাজবিন্যাসও বদলাইতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু এই পরিবর্তনও একদিনে হয় নাই। প্রাচীন বাংলায় ঐতিহাসিক কালে—প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা আমি বলিব না, তাহার কারণ সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া আমরা কিছুই জানি না—এমন কোন সামাজিক উপপ্লব দেখা দেয় নাই। যুদ্ধবিগ্রহ যথেষ্ট হইয়াছে, ভিন্নদেশাগত রাজা ও রাজবংশ বহুদিন ধরিয়া বাংলা দেশে রাজত্বও করিয়াছেন, ভিন্নদেশাগত মুষ্টিমেয় সৈন্য ও সাধারণ প্রাকৃত জন নানা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এদেশে নিজেদের রক্ত মিশাইয়া দিয়া বাঙালীর সঙ্গে এক হইয়াও গিয়াছেন, কিন্তু এইসব ঐতিহাসিক পরিবর্তন বিপ্লবের আকার ধারণ করিয়া সমাজের মূল ধরিয়া টানিয়া সমাজবিন্যাসের চেহারাটাকে একেবারে বদলাইয়া দিতে পারে নাই। অদল বদল যে একেবারে হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহা খুব ধীরে ধীরে হইয়াছে, এখানে সেখানে কোন কোন সমাজ-অঙ্গের রং ও রূপ একটু আধটু বদলাইয়াছে, কোনও নূতন অঙ্গের যোজনা হইয়াছে, কিন্তু মোটামুটি কাঠামোটা ঠিকই থাকিয়া গিয়াছে। অদল বদল যাহা হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক ও সমাজবিজ্ঞানের নিয়মের বশেই হইয়াছে। কাজেই, রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের 'অজ্ঞাত যুগ' সামাজিক ইতিহাসের দিক হইতে একেবারে অজ্ঞাত নাও হইতে পারে। পূর্বের এবং পরের সমাজবিন্যাসের ইতিহাস যদি জানা থাকে তাহা হইলে মাঝখানের ফাঁকটা কল্পনা ও অনুমান দিয়া ভরাট করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এবং তাহা ঐতিহাসিক সত্যের পরিপন্থী না হওয়াই স্বাভাবিক। প্রাচীন বাংলার সমাজবিন্যাসের ইতিহাসেও একথা প্রযোজ্য।

কিন্তু, সুবিধার কথা যদি বলিলাম, অসুবিধার কথাও বলি। আগেই বলিয়াছি, জনসাধারণের ইতিহাস রচনার যে-সব উপাদান আমাদের আছে, তাহার অধিকাংশ রাজসভা বা ধর্মগোষ্ঠীর আশ্রয়ে রচিত। রাজসভা বা ধর্মগোষ্ঠী সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য তাহার অনেকাংশ এই সব উপাদানের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর যে অগণিত জনসাধারণ তাহাদের বা তাহাদের আশ্রয়ে রচিত কোনও উপাদানই আমরা পাই না কেন? যে বণিক-সম্প্রদায় দেশে বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেন তাঁহারা মূর্খ বা নিরক্ষর ছিলেন না, এমন অনুমান সহজেই করা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি যতদিন ছিল ততদিন সমাজে তাঁহাদের স্থান বেশ উপরেই ছিল, রাষ্ট্র এবং সমাজ পরিচালনায় তাঁহাদের প্রভুত্বও কম ছিলনা—একথা অনুমান-সাপেক্ষ নয়, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে,—তথাপি তাঁহাদের কথা বিশেষভাবে কেহ বলে নাই। ইহা আশ্চর্য, সন্দেহ কি? তাঁহারা নিজেরাও কেহ কিছু সাক্ষ্য রাখিয়া যান নাই। শিল্পী ও ক্ষেত্রকর সম্প্রদায় সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। আর, চণ্ডাল পর্যন্ত যে অকীর্তিত জনসাধারণ তাঁহাদের কথা নাই বলিলাম। ইহারা তো নিরক্ষরই ছিলেন; সমাজে

ইহাদের আধিপত্য বা অধিকার বলিয়া কিছু ছিল, এমন প্রমাণও নাই। কাজেই, ইহাদের সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছু জানিনা তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু কি শিল্পী-মানপ-ব্যাপারী-বণিক, কি ক্ষেত্রকর, কি নিম্নতম সম্প্রদায়, ইহারা রাজসভা বা ধর্মগোষ্ঠীদ্বারা কীর্তিত কিংবা কীর্তনযোগ্য বিবেচিত না হইলেও, ইহাদের সকলের দৈনন্দিন সুখদুঃখের, জীবনসমস্তার, নিজের বৃত্তি-সংপৃক্ত নানা প্রশ্নের, এবং সাফল্য-অসাফল্যের প্রকাশ ও পরিচয় তদানীন্তন বাঙালী সমাজের মধ্যে কোথাও না কোথাও ছিলই; হয়তো সকল শ্রেণীর প্রকাশ ও পরিচয় সমভাবে একত্র কোথাও হইত না; হয়তো বিশেষ শ্রেণীর জীবনধারার প্রকাশ ও পরিচয় শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত। কিন্তু যেভাবেই তাহা হউক, তাহা কোথাও লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে নাই; সভাকবি, রাজপণ্ডিত, অভিজাতসমাজপুষ্ট কবি ও লেখক, বা ধর্মগোষ্ঠীর নেতাদের কাছে এইসব প্রকাশ ও পরিচয় লিপিযোগ্য বা গ্রন্থনযোগ্য মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। স্মৃতি-ব্যবহার-পুরাণ গ্রন্থাদিতে পরোক্ষভাবে কিছু কিছু সংবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চতর বর্ণসমাজের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রসঙ্গে। তাহা ছাড়া, রাজসভা ও ধর্মগোষ্ঠী উভয়েরই লেখ্য ভাষা ছিল সংস্কৃত; অথচ, এই 'দেবভাষা' যে প্রাকৃতজনের ভাষা ছিল না তাহা তো সর্বজনস্বীকৃত—বাংলার লিপিমালায়ও তাহার প্রমাণ বিক্ষিপ্ত। প্রাচীন বাংলার প্রাকৃতজনের এই ভাষার বিশেষ কিছু পরিচয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং অধুনা সুপরিচিত চর্যাগীতিগুলির ভাষা হয়ত দশম-দ্বাদশ শতকের এই প্রাকৃত ভাষা, কিন্তু সন্ধাভাষায় রচিত এই দোঁহা ও গানগুলিকে ঐতিহাসিক উপাদানরূপে পুরোপুরি গ্রহণ করা সর্বত্র সম্ভব নয়। ধর্মের ইতিহাসে অবশ্য এই পদগুলির বিশেষ মূল্য আছে। ডাক ও খনার বচনগুলিতেও কিছু কিছু ইতিহাসের উপাদান আছে। পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন যে, এই বচনগুলিতে সমাজের যে-পরিচয় টুকরা টুকরা ভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহা নিঃসংশয়ে খ্রীষ্টীয় দশম অথবা একাদশ শতকের, কিন্তু ঐতিহাসিকের বিপদ এই যে, এই বচনগুলি বর্তমানে আমরা যে-রূপে পাই, সে-ভাষায় বর্তমানে ইহারা আমাদের হাতে আসিয়াছে, সে-রূপ ও সে-ভাষা এত প্রাচীন নয়। কাজেই মুখে মুখে প্রচলিত বচনগুলি পরবর্তীকালে ক্রমশ যখন লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন যে সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক যুগের সমাজের পরিচয় কিছু কিছু তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে নাই তাহার নিশ্চয়তা কি? "শূন্যপুরাণ", "গোপীচাঁদের গীত", "সেখ শুভোদয়া", "আদ্যের গম্ভীরা", মুর্শিদ্যা গান, প্রাচীন রূপকথা, ইত্যাদি সম্বন্ধেও এই সন্দেহ প্রযোজ্য, যদিও ইহাদের বিষয়বস্তু প্রাচীনতর কাল সম্পর্কিত। মধ্যযুগের আরও দুই চারটি বাংলা বই সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। আসল কথা হইতেছে, জনসাধারণ প্রাকৃতজনসুলভ ভাব ও ভাষায় তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনের যে-সব সুখ

দুঃখ, ক্ষুদ্র বৃহৎ জীবন-সমস্যা ইত্যাদি প্রকাশ করিত গানে গল্পে বচনে গাথায় রূপকথার আড়ালে, তাহা কেহ লিখিয়া রাখে নাই, লোকের মুখে মুখেই তাহা গীত ও প্রচারিত হইয়াছে, এবং বহুদিন পরে তাহা হয়তো লিপিবদ্ধ হইয়াছে যখন প্রাকৃত জনের ভাষা লেখ্য-মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু মুশকিল হইতেছে, এই সব প্রমাণ স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বয়ংসিদ্ধ প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করিবার উপায় নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত সমসাময়িক প্রমাণ দ্বারা তাহা সমর্থিত না হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন লিপিমালা এবং কিছু কিছু ধর্ম ও সাহিত্য-গ্রন্থই বাঙালীর ইতিহাসের উপাদান এবং ইহাদের সাক্ষ্যই প্রামাণিক। এই লিপিগুলি সমস্তই সমসাময়িক; স্মৃতি, পুরাণ, ব্যবহার এবং কাব্যগ্রন্থগুলিও তাহাই। কোথাও কোথাও কিছু কিছু পরবর্তী অথবা পূর্ববর্তী প্রামাণিক লিপি ও গ্রন্থের সহায়তা আমি গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সমসাময়িক প্রামাণিক সাক্ষ্য দ্বারা তাহা সমর্থিত না হইয়াছে ততক্ষণ আমার বক্তব্যের পক্ষে অনুমানের অধিক মূল্য কখনও আমি দাবি করি নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি বাংলাদেশের সাক্ষ্য প্রমাণই গ্রহণ করিয়াছি, তবে মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও কোনও সাক্ষ্য বা উক্তি সুস্পষ্ট করিবার জন্য প্রতিবেশী কামরূপ অথবা বিহার অথবা উড়িষ্যার সাক্ষ্য-প্রমাণও উল্লেখ করিয়াছি। সেগুলি প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত না হইলেও একথা অনুমান করিতে বাধা নাই যে, বাংলাদেশেও হয়তো অনুরূপ রীতি প্রচলিত ছিল।

বাংলাদেশের লিপিগুলি কালানুযায়ী সাজাইলে খৃষ্টপূর্ব আনুমানিক দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া তুর্কী বিজয়েরও প্রায় শতবর্ষ কাল পর পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়। তবে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্তই ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যায়, এবং এই সাত আট শত বৎসরের সামাজিক ইতিহাসের রূপই কতকটা স্পষ্ট হইয়া চোখের সম্মুখে ধরা দেয়। পঞ্চম শতকের আগে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং একান্ত অনুমানসিদ্ধ। লিপিগুলির সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যবহারের আর একটু বিপদও আছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতকে উৎকীর্ণ দামোদরপুরে (পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি) প্রাপ্ত কোনও তাম্রপট্টে ভূমিব্যবস্থা অথবা রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে যে-খবর পাওয়া যায় তাহা যে দশম অথবা একাদশ শতকে সমতটমণ্ডল অথবা খাড়িমণ্ডল, কিংবা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্য কোনও মণ্ডল বা বিষয় সম্বন্ধে সত্য হইবে, এমন মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এমন কি সেই শতকেরই বাংলার অন্য কোনও ভুক্তি অথবা বিষয় সম্বন্ধে সত্য হইবে, তাহাও বলা যায় না। কাজেই যে-কোনও লিপিবর্ণিত যে-কোনও অবস্থা সমগ্রভাবে বাংলা দেশ সম্বন্ধে অথবা সমগ্র প্রাচীনকাল সম্বন্ধে প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। বস্তুত, দেখা যায়, একই সময়ে বাংলার বিভিন্ন স্থানে একই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা, রীতি ও পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এইজন্যই সাক্ষ্যপ্রমাণ উল্লেখ করিবার সময় ইচ্ছা করিয়াই আমি লিপি

বর্ণিত স্থান ও কালের উল্লেখ সর্বত্রই করিয়াছি ; এবং সেই স্থান ও কালেই বর্ণিত বিষয় প্রযোজ্য, এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছি। তারপর বিশেষ কোন নিয়ম বা পদ্ধতি কতটুকু অন্য কাল ও অন্য স্থান সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কি পরিমাণে সমগ্র বাংলা দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাহা লইয়া পাঠক অনুমান যদি করিতে চান তাহাতে ঐতিহাসিকের দায়িত্ব কিছু নাই।

৪

সমাজ-বিন্যাসের ইতিহাস বলিতে হইলে প্রথমেই বলিতে হয় নরতত্ত্ব ও জনতত্ত্বের কথা এবং তাহারই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত ভাষাতত্ত্বের কথা। সেইজন্য বাঙালীর ইতিহাসের গোড়ার কথা বাঙালীর নরতত্ত্বের কথা, বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর ভাষার কথা, বাঙালীর জন, ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্পষ্ট উষাকালের কথা। বাঙালীর আর্যত্ব কতখানি? পণ্ডিতেরা আর্যভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর যে একাধিক ধারার কথা বলেন, যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই আর্যত্ব কি ঋগ্বেদীয় আর্যভাষীদের না পামীর মালভূমি ও তক্‌লামাকান্ মরুভূমি হইতে আগত আল্‌পাইন আর্যভাষীদের, নর্ডিক না প্রাচ্য আর্যভাষীদের, না আর কাহারও? আর্যপূর্ব জনদের কাহারা বাংলা দেশের অধিবাসী ছিলেন ; এই আর্যপূর্ব বাঙালীদের মধ্যে নেগ্রিটো, অষ্ট্রিক্, বা ভূমধ্যীয় নরগোষ্ঠীর আভাস কতটুকু দেখা যায়, কোথায় কোথায় দেখা যায়? মোঙ্গোলীয় ও ভোট-চীন নরগোষ্ঠীর কিছু আভাস বাঙালীর রক্তে, বাঙালীর দেহগঠনে আছে কি? থাকিলে কতটুকু এবং বাংলার কোন্ কোন্ জায়গায়? আর্য ও আর্যপূর্ব জাতিদের রক্ত ও দেহগঠন বাঙালীর রক্ত ও দেহগঠনে কতটুকু, কি পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে? ঐতিহাসিক কালে ভারতবর্ষের বাহিরের ও ভিতরের অন্যান্য প্রদেশের কোন্ কোন্ নরগোষ্ঠীর লোক বাংলাদেশে আসিয়াছে, এবং বাঙালীর রক্ত ও দেহগঠন কতখানি রূপান্তরিত করিয়াছে? বাংলাদেশে যে-বর্ণবিভাগ দেখা যায় তাহার সঙ্গে নরতত্ত্বের সম্বন্ধ কতটুকু? ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ইত্যাদি বর্ণের লোকেরা কোন্ নরগোষ্ঠীর? সমাজে জলচল ক্ষুদ্রবর্ণের লোকেরা কোন্ নরগোষ্ঠী? জল-অচল নিম্ন বা অন্ত্যজ পর্যায়ের যে অসংখ্য লোক তাহারাই বা কোন নরগোষ্ঠী? রজক, নাপিত, কর্মকার, সূত্রধর ইত্যাদিরাই বা কে? সব প্রশ্নের উত্তর বাংলার নরতত্ত্ব গবেষণার বর্তমান অবস্থায় পাওয়া যাইবে না ; তবু, যতটুকু নির্ধারিত হইয়াছে তাহারই বলে মোটামুটি একটা কাঠামো গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। বাঙালীর জন-গঠনের এই গোড়াকার কথাটা না জানিলে প্রাচীন বাংলার শ্রেণী ও বর্ণ-বিভাগ, রাষ্ট্রের স্বরূপ, এক কথায় সমাজের সম্পূর্ণ চেহারাটা ধরা পড়িবে না।

১
এই গ্রন্থের যুক্তি পর্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায় বাঙালীর ইতিহাসের গোড়ার কথা

বাঙালীর ইতিহাসের দ্বিতীয় কথা, বাংলার দেশ-পরিচয়। বাংলা দেশের নদনদী পাহাড়প্রান্তর বনজনপদ আশ্রয় করিয়া ঐতিহাসিক কালের পূর্বেই যে-সমস্ত বিভিন্ন কোম

একসঙ্গে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল তাহাদের বন্ধনসূত্র ছিল পূর্বভারতের ভাগীরথী-করতোয়া-লৌহিত্য বিধৌত বিন্ধ্য-হিমালয় বাহু বিধৃত ভূভাগ। এই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের জল ও বায়ু এই দেশের অধিবাসীদিগকে গড়িয়াছে; ইহার ভূমির উর্বরতা কৃষিকে ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপায় করিয়া রচনা করিয়াছে; ইহার অসংখ্য মৎস্যবহুল নদনদী, তাহাদের শাখা ও উপনদীগুলি অন্তর্বাণিজ্যের সাহায্য করিয়া ধনোৎপাদনের আর একটি উপায় সহজ ও সুগম করিয়াছে। ইহার সমুদ্রোপকূল শুধু যে বহির্বাণিজ্যের সাহায্য করিয়াছে তাহাই নয়, দেশের কোনও কোনও উৎপন্ন দ্রব্যের স্বরূপও নির্ণয় করিয়াছে। তাহা ছাড়া, এই দেশের প্রাচীন যে রাষ্ট্র ও জনপদবিভাগ তাহাও নির্ণীত হইয়াছে বাংলার নদনদীগুলির দ্বারা। বাংলার এই নদনদীগুলি, এই বন ও প্রান্তর, ইহার জলবায়ুর উষ্ণ জলীয়তা, ইহার ঋতু-পর্যায়, ইহার বিধৌত নিম্নভূমিগুলি, বনময় সমুদ্রোপকূল সমস্তই এই দেশের সমাজবিন্যাসকে কমবেশি প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কাজেই বাংলাদেশের সত্য ভৌগোলিক পরিচয়ও বাঙালীর ইতিহাসেরই কথা।

তৃতীয় অধ্যায়
দেশ-পরিচয়

জাতি এবং দেশ হইতেছে সমাজ-রচনার ঐতিহ্য ও পরিবেশ। কিন্তু, পূর্বেই বলিয়াছি, সমাজ-সৌধের বস্তুভিত্তি হইতেছে ধন। কাজেই প্রাচীন বাংলার ধনসম্বল কি ছিল, ধনোৎপাদনের কি কি উপায় ছিল, কি কি ছিল উৎপন্ন বস্তু, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি কিরূপ ছিল, এই সব তথ্য বাঙালীর ইতিহাসের তৃতীয় কথা। এই তিন কথা লইয়া বাঙালীর ইতিহাসের বস্তুভিত্তি এবং এই ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠিয়াছিল প্রাচীন বাঙালীর সমাজবিন্যাস।

চতুর্থ অধ্যায়
ধনসম্বল

এই মাত্র বলিলাম, প্রাচীন বাংলায় কৃষি ছিল ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রথম ও প্রধান উপায়। কৃষির সঙ্গে দেশের ভূমিব্যবস্থা জড়িত। এই ভূমিব্যবস্থার উপরই দেশের অগণিত জনসাধারণের মরণ বাঁচন নির্ভর করিত, এখনও যেমন করে। ভূমি কয় প্রকার ছিল, ভূমির উপর রাজার অধিকারের স্বরূপ কি ছিল, প্রজার অধিকারই বা কতটুকু ছিল, ভূমির মূল্যগ্রাহী কে ছিলেন, ভূমিদানের প্রেরণা কি ছিল, ভূমির সীমানির্দেশের রীতি ও উপায় কি ছিল, রাজস্ব কিরূপ ছিল, প্রজার দায়িত্ব কি ছিল, খাসপ্রজা, নিম্ন প্রজা, ভূমিহীন প্রজা ইত্যাদি ছিল কিনা, এক কথায় ভূমিব্যবস্থার কথা বাঙালীর ইতিহাসের পঞ্চম এবং সমাজবিন্যাসের প্রথম কথা।

পঞ্চম অধ্যায়
ভূমিবিন্যাস

প্রাচীন ও বর্তমান বাংলার সমাজবিন্যাসের দিকে তাকাইলে যে-জিনিস সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয় তাহা বর্ণ-উপবর্ণের নানা স্তর উপস্তরে বিভক্ত সুনির্দিষ্ট সীমায় সীমীত বাঙালীর বর্ণসমাজ। বাংলাদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, প্রাচীনকালেও ছিল বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট প্রমাণ নাই; অল্পসংখ্যক থাকিলেও তাঁহাদের কোনও প্রাধান্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহার কারণ কি? ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য

ষষ্ঠ অধ্যায়
বর্ণবিন্যাস

বাংলাদেশে কি ভাবে কখন প্রতিষ্ঠিত হইল? বৈদ্য-কায়স্থ বৃত্তিধারী লোকেরাই বা কি করিয়া কখন বর্ণবদ্ধ হইলেন? এবং, ব্রাহ্মণদের পরেই তাঁহাদের স্থান নির্ণীত হইল কিরূপে? অন্যান্য সংকর পর্যায়ের বিচিত্র জাতের এবং ম্লেচ্ছ-পতিত-অন্ত্যজ পর্যায়ের যে-সব লোকদের কথা প্রাচীন লেখমালায় ও সাহিত্যগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ, প্রত্যেকের স্বরূপ কি, বৃত্তি কি, দায় কি, অধিকার কি ছিল? বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, রাষ্ট্রে বিভিন্ন বর্ণের স্থান কিরূপ ছিল, রাজবংশের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে বর্ণবিন্যাসের সম্বন্ধ কি ছিল, ইত্যাদি সকল কথাই বাঙালীর ইতিহাসের কথা। এই কথা লইয়া বাঙালীর ইতিহাসের ষষ্ঠ অধ্যায়।

আগে যে বাংলার জনসাধারণের কথা বলিয়াছি তাঁহারা সকলেই তো কিছু কৃষক বা ক্ষেত্রকর ছিলেন না। এখনকার মত তখনও বৃহৎ একটা চাকুরিজীবী সম্প্রদায়ও ছিল। ইহাদের অধিকাংশই ছিলেন রাজকর্মচারী। তাহা ছাড়া, ছোট ছোট মানপ বা দোকানদার হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় বণিক, শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, ব্যাপারী ইত্যাদির সংখ্যাও কম ছিল না। কৃষক বা ক্ষেত্রকররা তো ছিলেনই। তাহা ছাড়া, অধ্যাপনা, দেবপূজা, পৌরোহিত্য, নীতিপাঠ, ধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চা প্রভৃতি নানা বৃত্তি লইয়া ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণেরও স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি ছিলেন। সকলের শেষে সমাজের নিম্নতম বর্ণস্তর ও শ্রেণীতে চণ্ডাল পর্যন্ত অন্যান্য অকীর্তিত লোকও ছিলেন অগণিত। প্রাচীন বাঙালী সমাজ এইসব নানা শ্রেণীতে বিন্যস্ত ছিল। এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তি, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ, তাহাদের দায় ও অধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে যে স্বল্প কথা জানা যায় তাহা লইয়া বাঙালীর ইতিহাসের সপ্তম অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়
শ্রেণীবিন্যাস

বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর অগণিত জনসাধারণ বাস করিতেন হয় গ্রামে না হয় নগরে। এখনকার মত তখনও বোধ হয় বর্তমান কালাপেক্ষাও অধিকসংখ্যক লোক গ্রামেই বাস করিতেন। জনসাধারণ বলিতে তখন প্রধানত এই অগণিত গ্রামবাসীদেরই বুঝাইত, এমন মনে করা অযৌক্তিক নয়। এক একটা গ্রাম কি করিয়া গড়িয়া উঠিত তাহার দুই একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রামের সংস্থান কিরূপ ছিল, নগরের সংস্থান কিরূপ ছিল? ইহাদের বিশেষ বিশেষ রূপ কি ছিল? গ্রাম ও নগর এই দুয়ের সভ্যতার পার্থক্য কিরূপ ছিল? ধর্ম ও শিক্ষাকেন্দ্র, বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির চেহারা কিরূপ ছিল? সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হয়ত মিলিবে না; তবু, যতটুকু জানা যায় ততটুকু জানাই প্রাচীন বাংলাদেশ ও বাঙালীকে জানা। এই জানার চেষ্টায় বাঙালীর ইতিহাসের অষ্টম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়
গ্রাম ও নগরবিন্যাস

এই যে বিভিন্ন শ্রেণী ও বর্ণের বিচিত্র জনসাধারণ, ইহাদের দৈনন্দিন জীবনের যে বিচিত্র কর্ম, বিচিত্র দায় ও অধিকার তাহা ইহারা নির্বিবাদে পরস্পরের স্বার্থের সংঘাত বাঁচাইয়া নির্বাহ করিতেন কি করিয়া? ক্ষেত্রকর যে হলচালনা করিতে গিয়া নিজের

জমির সীমা ডিঙাইয়া প্রতিবেশীর জমি লোভ করিবেন না, তাহা দেখিবে কে? যে-বণিক পুণ্ড্র অথবা চম্পাপুরী-পাটলিপুত্র হইতে গরুর গাড়ির বহরে অথবা নদীপথে সপ্তডিঙ্গায় পণ্য সাজাইয়া চলিয়াছেন তাম্রলিপ্তি, পথে দস্যু তাঁহাকে হত্যা করিয়া পণ্য লুটিয়া লইবেনা, এই আশ্বাস তাঁহাকে দিবে কে? প্রত্যেকে স্বধর্মে ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপন আপন রুচি ও কর্তব্যানুযায়ী জীবন যাপন করিয়া যাইতে পারিবেন, এই আশ্বাস সমাজ দিতে না পারিলে সমাজবিন্যাস সম্ভব হইতে পারে না। এই আশ্বাস দিবার, প্রত্যেককে স্বধর্মে ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার যন্ত্র হইতেছে রাষ্ট্র। ভিতর ও বাহিরের হাত হইতে দেশ ও রাজ্যকে রক্ষা করিবার যন্ত্রও এই রাষ্ট্র। সমাজ নিজের প্রয়োজনেই এই রাষ্ট্রযন্ত্র সৃষ্টি করে, এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান পরিচালককে রাজা বা প্রধান বা নায়ক বলিয়া স্বীকার করে, তাঁহার ও তাঁহার রাজপুরুষদের এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ম নির্দেশ মানিয়া চলে, রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার ব্যয়ভার নির্বাহ করে, রাজাকে শ্রদ্ধাদান করে, এবং তাঁহার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বপ্রকার বাধ্যতা স্বীকার করে। ইহাই মহাভারতের শান্তিপর্ব-বর্ণিত রাজধর্ম, অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপের সামাজিক সর্তের মূল সূত্র। প্রাচীন বাংলায় এই রাজা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বরূপ কি ছিল? রাষ্ট্রপ্রধান কাহারা ছিলেন, রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা কাহারা করিতেন? রাষ্ট্রের আয় ব্যয় কি ছিল? রাজস্ব কি কি ছিল, কিরূপ ছিল? রাষ্ট্রের সঙ্গে বর্ণ ও শ্রেণীর সম্বন্ধ কি ছিল, গ্রাম ও নগরগুলির সম্বন্ধ কি ছিল? ধনোৎপাদনে ও বণ্টনে রাষ্ট্রের আধিপত্য কতটুকু ছিল? রাষ্ট্রের আদর্শ বিভিন্ন কালে কিরূপ ছিল? রাষ্ট্রের সঙ্গে সামাজিক সংস্কৃতির যোগ কিরূপ ছিল? এইসব বিচিত্র প্রশ্নের যথালভ্য উত্তর লইয়া বাঙালীর ইতিহাসের নবম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়
রাষ্ট্রবিন্যাস

ধনসম্বল, ভূমিবিন্যাস, বর্ণবিন্যাস, শ্রেণীবিন্যাস, গ্রাম ও নগর বিন্যাস, রাষ্ট্রবিন্যাস প্রভৃতি সব কিছুর সঙ্গে দেশের ইতিবৃত্ত কথা, অর্থাৎ বিভিন্ন পর্ব-বিভাগের কথা, রাষ্ট্রীয় উত্থান পতনের কথা, রাজা ও রাজবংশের পরিচয়, রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিণতি, বিগ্রহ ও বিপ্লব, শান্তি ও সংগ্রাম প্রভৃতির বিবরণ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সমাজবিন্যাস ও রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্ত একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করে, এবং দুইয়ে মিলিয়া ইতিহাস চক্রকে আবর্তিত করে। সেইজন্যই সমাজবিন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসাবে এবং অন্যতম প্রধান প্রভাবক হিসাবে রাজবৃত্ত-কথা অবশ্য জ্ঞাতব্য—রাজা এবং রাজবংশের স্থূল ও বিস্তৃত বিবরণ হিসাবে নয়, সমাজের সঙ্গে ইহাদের এবং বিভিন্ন রাজপর্ব ও রাষ্ট্রাদর্শের সম্বন্ধের দিক হইতে। সেইজন্যই রাজবৃত্ত কথা লইয়া এই ইতিহাসের অন্যতম সুদীর্ঘ অধ্যায়।

দশম অধ্যায়
রাজবৃত্ত

সর্বশেষে আসিতেছে প্রাচীন বাঙালীর মানস-সংস্কৃতির কথা। সংস্কৃতির প্রয়োজন কি? মানুষ ত শুধু খাইয়া পরিয়া দেহগত জীবনধারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে না। তাহার

একটা মানসগত জীবনও আছে। এই মানসগত জীবন সকল মানুষের সমান নয়। যে শ্রেণী অথবা সমাজের সামাজিক ধনসঞ্চয় যত বেশি সেই শ্রেণী ও সমাজের মানসজীবন তত উন্নত। এই মানসজীবনের প্রকাশই সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি সকল শ্রেণী ও বর্ণের লোকদের এক নয়, এক হইতে পারে না। সংস্কৃতির মূলে আছে কায়িক শ্রম হইতে অবসর; যে শ্রেণী ও বর্ণের সামাজিক ধনসঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত ধন বেশি তাহারাই সেই ধনের বলে সেই শ্রেণী ও বর্ণের ও অন্য শ্রেণী ও বর্ণের কতকগুলি লোককে ধনোৎপাদনগত কায়িক শ্রম হইতে মুক্তি দিয়া অবসরের সুযোগ দিতে পারে। সেই সুযোগে তাঁহারা চিন্তা, অধ্যয়ন, শিল্পচর্চা ইত্যাদি করিতে পারেন, এবং তাঁহারা তাঁহাদের শ্রেণীগত, নিজস্ব ও বৃহত্তর সমাজগত মানসের চিন্তা, কল্পনা, ভাব ও অনুভবকে রূপদান করিতে পারেন। প্রাচীন বাংলায়ও তাহাই হইয়াছিল; ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহাই হউক, প্রাচীন বাংলায় সংস্কৃতির রূপ আমরা দেখিতে পাই ধর্মকর্মের ক্ষেত্রে, শিল্পকলায় ও নৃত্যগীতে, সাহিত্যে, জ্ঞানবিজ্ঞানে, ব্যবহারিক অনুশাসন, সামাজিক অনুশাসন ইত্যাদিতে। এই সংস্কৃতির অর্ধেক পুরাতন ঐতিহ্য-জাত; এই ঐতিহ্যের মধ্যে থাকে জনগত, বর্ণগত রক্তের স্মৃতি, পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতির স্মৃতি; বাকি অর্ধেক সমসাময়িক সমাজবিন্যাসের প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে। কাজেই অতীতের স্মৃতি ও বর্তমানের প্রয়োজন, এই দুই বস্তুই বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালের সংস্কৃতির মধ্যে জড়াজড়ি করিয়া মিশাইয়া থাকে। প্রাচীন বাংলায়ও তাহাই হইয়াছিল, এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বশেই হইয়াছিল। প্রাচীন বাংলার এই সংস্কৃতির স্বরূপটি কি, সত্যকার চেহারাটা কি তাহা জানিবার প্রয়াস লইয়াই আমার বাঙালীর ইতিহাসের শেষ কয়েকটি অধ্যায়। সুস্পষ্ট স্বরূপ হয়ত জানা যাইবে না, জানিবার যথেষ্ট উপাদানও এ-যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই; তবু, চেষ্টা করিতে দোষ নাই, মোটামুটি আভাস একটু পাওয়া যাইবে তো! তাহা ছাড়া, মানস-সংস্কৃতি প্রকাশ পায় নরনারীর দৈনন্দিন জীবনচর্যার ভিতর দিয়া, তাহাদের আহার-বিহারে, বসন-ব্যসনে, আচার-ব্যবহারে। জনসাধারণের জীবনেতিহাস জানিতে হইলে এসমস্ত বিষয়ের আলোচনা অপরিহার্য।

প্রাচীন বাঙালীর মানস-সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান পরিচয় তাঁহাদের ধর্মকর্মে। বিচিত্র ধর্মসংস্কার, বিশ্বাস, পূজা, আচার-অনুষ্ঠান, বারমাসে তের পার্বণ, অসংখ্য দেবদেবী ও অন্যান্য প্রতীক লইয়াই প্রাচীন বাঙালীর জীবন; তাঁহার দৈনন্দিন জীবনও এইসব লইয়াই একই সঙ্গে মধুর ও দায়িত্বময়। তাঁহার প্রাগৈতিহাসিক কৌম বিশ্বাস, সংস্কার, পূজা, আচার,

একাদশ অধ্যায়
ধর্মকর্ম

অনুষ্ঠান ইত্যাদির উপর উত্তর কালে ক্রমে ক্রমে জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি আর্যধর্মের, নানাপ্রকার তান্ত্রিক আচার, পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান ইত্যাদির প্রভাব পড়িয়া যে ধর্ম-বিশ্বাস, কর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি বিবর্তিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের পার্থক্য প্রচুর। সমাজবিন্যাসের উপরও এই সব বিশ্বাস-অনুষ্ঠানের

প্রভাব কম পড়ে নাই। বিশেষ বিশেষ বর্ণ ও শ্রেণীতে বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের প্রচারের মধ্যেও সমসাময়িক সমাজবিন্যাসের পরিচয় সুস্পষ্ট। ধর্মকর্মের বিবর্তন-ইতিহাসের ভিতর দিয়াও সেইজন্য জনসাধারণের জীবনের এবং সমাজ বিন্যাসের ইতিহাস উজ্জলতর হয়। সেইজন্য ধর্মকর্মের কথা লইয়া প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের একাদশ অধ্যায়।

এই ধর্মকর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা, নৃত্যগীত ইত্যাদি। শিল্পই হউক আর নৃত্যগীতই হউক, ইহাদের প্রথম ও প্রধান আশ্রয় ছিল ধর্মকর্ম; ধর্মকর্মানুষ্ঠান উপলক্ষেই নৃত্যগীতের প্রচলন হইয়াছিল বেশি; মূর্তি ও মন্দির ইত্যাদি তো একান্তভাবেই ধর্মাশ্রয়ী। রাজপ্রাসাদ, অভিজাত বংশীয়দের বাসগৃহ ইত্যাদি ইটকাঠে নির্মিত হইত সন্দেহ নাই; মূর্তিতে চিত্রে গৃহ সজ্জিত হইত; কিন্তু কাল, প্রকৃতি ও মানুষের ধ্বংসলীলার হাত এড়াইয়া আজ আর তাহাদের চিহ্ন বর্তমান নাই—যে দুইচারিটি চিহ্ন বহু আয়াসে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই ধর্মকর্মাশ্রিত। শিল্পকলা-নৃত্যগীতের দিক হইতে ইহাদের যে বিশুদ্ধ শিল্পমূল্য বা সংস্কৃতিমূল্য তাহা তো আছেই; ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে প্রাচীন বাংলার শিল্পকলার একটি বিশেষ স্থানও আছে; কিন্তু বাঙালীর ইতিহাসে তাহার আলোচনার মূল্য সমাজমানসের দিক হইতেই বেশি; এবং তাহাই মুখ্য। এই শিল্পকলা-নৃত্যগীতের মধ্যে প্রাচীন বাঙালীর মন, তাঁহাদের সমাজবিন্যাস, পরিবেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই আমাদের প্রধান আলোচ্য। এই আলোচনা লইয়া আমাদের ইতিহাসের দ্বাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়
শিল্পকলা

ধর্মকর্ম শিল্পকলার মত সমাজমানসের অভিব্যক্তি দেখা যায় সমসাময়িক সাহিত্যে, জ্ঞানবিজ্ঞানে ও শিক্ষাদীক্ষায়। প্রাচীন বাংলায় ইহাদেরও প্রধান আশ্রয় ধর্মকর্ম, ধর্মবিশ্বাস, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি। ইহারা সমস্তই মানসোৎকর্ষের বা অপকর্ষের, এক কথায় সংস্কৃতির লক্ষণ, সন্দেহ নাই। ইহাদের কতক অংশ গড়িয়া উঠিয়াছিল দৈনন্দিন জীবনচর্যার এবং বৃহত্তর সমাজচর্যার বা অন্য ব্যবহারিক প্রয়োজনে, কতক একান্তই সৃষ্টির প্রেরণায়—বুদ্ধিগত, ভাবকল্পনাগত, চিন্তাগত, অভিজ্ঞতাগত মানসের আত্মপ্রকাশের যে স্বাভাবিক বৃত্তি তাহারই প্রেরণায়। এই আত্মপ্রকাশের রূপ ও রীতি বহুলাংশে সমাজবিন্যাস দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। আবার, সমাজবিন্যাসও ইহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এই উভয়ের ঘাতপ্রতিঘাতেই যে শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি যুগে যুগে বিবর্তিত হইতে থাকে, এ-তত্ত্ব বর্তমান সমাজতত্ত্বাদর্শে ও আলোচনায় স্বীকৃত। সেইজন্যই প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে ধর্মকর্ম-শিল্পকলার মত শিক্ষাদীক্ষা-সাহিত্য-বিজ্ঞানের আলোচনাও সমসাময়িক সমাজবিন্যাস ও সমাজমানসের পরিচয় হিসাবেই বেশি, বিশুদ্ধ সাহিত্য বা বিজ্ঞানমূল্যের

ত্রয়োদশ অধ্যায়
শিক্ষাদীক্ষা-জ্ঞানবিজ্ঞান-সাহিত্য

দিক হইতে ততটা নয়। এই শিক্ষাদীক্ষা-জ্ঞানবিজ্ঞান-সাহিত্য লইয়া বাঙালীর ইতিহাসের ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জনসাধারণের মানস-সংস্কৃতির পরিচয় শুধু ধর্মকর্ম, শিল্পকলা, সাহিত্য-বিজ্ঞানের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকে না। শিথিলভাবে বলিতে গেলে, ইহারা মানস-সংস্কৃতির পোষাকী দিক্; কিন্তু, সংস্কৃতির আর একটা আটপৌরে দিক আছে, এবং সেই দিক্‌টাতেই জনসাধারণের জীবনচর্যার ঘনিষ্ঠতম পরিচয়। আহার-বিহার, বসন-ব্যসন, আমোদ-আহ্লাদ, দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ, উৎসব-আচার-ব্যবহার প্রভৃতির মধ্যে এই পরিচয় যেমন পাওয়া যায় এমন আর কোথাও নয়। দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে দিকটা লইয়া জনসাধারণের জীবনেতিহাসের অন্যতম প্রধান, অপরিহার্য এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য অধ্যায়।

চতুর্দশ অধ্যায়
আহার-বিহার, বসন-ব্যসন, আচার-ব্যবহার, দৈনন্দিন জীবন

ইতিহাস শুধু তথ্য মাত্র নয়। যে তথ্য কথা বলে না, কার্যকারণ সম্বন্ধের ইঙ্গিত বহন করেনা, যাহার কোনও ব্যঞ্জনা নাই, শুধুই বিচ্ছিন্ন তথ্য মাত্র, তথ্য কোনও যুক্তিসূত্রে গ্রথিত নয়, ইতিহাসে তাহার কোনও মূল্য নাই। সমস্ত তথ্যের পশ্চাতে কার্যকারণ পরম্পরার অমোঘ নিয়ম সর্বদা সক্রিয়। এই নিয়মটি ধরিতে পারা, দেশকালধৃত নরনারীর গতি-পরিণতির প্রকৃতিটি ধরিতে পারা, সমাজের প্রবহমাণ ধারাস্রোতের পশ্চাতের ইঙ্গিতটি জানাই ঐতিহাসিকের কর্তব্য। কার্যকারণ পরম্পরায়, যুক্তিশৃঙ্খলায় তথ্য সন্নিবেশ করিয়া যাইতে পারিলে তবেই সেই অমোঘ নিয়মটি, ইঙ্গিত ও প্রকৃতিটি জানা যায়। প্রাণহীন, নীরব, নীরস তথ্য তখন সজীব, মুখর ও সরস হইয়া উঠে। আমার তথ্য সন্নিবেশের মধ্যে ইতিহাসের সেই সজীব মুখরতা পরিস্ফুট হইবে কিনা জানিনা; তবু সকল তথ্যের পশ্চাতে বাঙালীর আদি ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির একটি সমগ্র ইঙ্গিত আমি মনন-কল্পনার মধ্যে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। সে-ইঙ্গিত আলোচ্য অধ্যায়গুলির স্থানে স্থানে পাওয়া যাইবে, বিশেষভাবে পাওয়া যাইবে রাজবৃত্ত অধ্যায়ে। তবু, সর্বশেষ অধ্যায়ে ইতিহাসের ইঙ্গিতটি একটি অখণ্ড অথচ সংক্ষিপ্ত সমগ্রতায় উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

পঞ্চদশ অধ্যায়
ইতিহাসের ইঙ্গিত

৫

আমি কোনও নূতন শিলালিপি বা তাম্রপট্টের সন্ধান পাই নাই, কোনও প্রাচীন গ্রন্থের খবর নূতন করিয়া জানি নাই, কোনও নূতন উপাদান আবিষ্কার করি নাই। যে-সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ বা লেখমালা সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়াছে, অথবা সংকলন-সম্পাদনের অপেক্ষা করিতেছে নানা গ্রন্থাগার ও চিত্রশালায়, যে-সমস্ত তথ্য ও উপাদান পণ্ডিতমহলে অল্পবিস্তর পরিচিত ও আলোচিত, প্রায় তাহা হইতেই আমি সমস্ত তথ্য ও উপকরণ আহরণ করিয়াছি। কাজেই পূর্ববর্তী প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষকদের সকলের কাছেই

আমি ঋণী, বিশেষভাবে ঋণী এই অধ্যায়ের প্রথমেই যে-সব মনীষীদের নামোল্লেখ করিয়াছি তাঁহাদের কাছে। এই ঋণ সগৌরবে ঘোষণা করিতে এতটুকু দ্বিধা আমার নাই—ইহারা যে কোনও দেশের গৌরব, এবং ইহাদেরই অকুণ্ঠ অবারিত দানের ঘোষণা এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে। এই সমস্ত পূর্বাবিষ্কৃত উপাদান ও পূর্বস্থরীদের রচনা আমার সম্মুখে বর্তমান না থাকিলে এই প্রয়াস অসম্ভব হইত। আমি শুধু প্রাচীন বাংলার ও প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাস একটি নূতন কার্যকারণ সম্বন্ধগত যুক্তিপরম্পরায় একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর দিয়া বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি মাত্র। এই যুক্তিপারম্পর্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ-বিজ্ঞান সম্মত ঐতিহাসিক যুক্তি ও দৃষ্টি বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বিশ্বাস করেন, আমিও করি। আমার বিশ্বাস, এই যুক্তি ও দৃষ্টি অনুসরণ করিলে প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের যে সামগ্রিক সর্বতোভদ্র রূপ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অন্য উপায়ে সম্ভব নয়।

তাহা ছাড়া, এই যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আমি প্রাচীন বাংলা ও বাঙালীর সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার প্রয়াসও করিতেছি না। সে-সময় হয়ত এখনও আসে নাই। নূতন নূতন উপাদান প্রায়শ আবিষ্কৃত হইতেছে। বর্তমানে উপাদান সুপ্রচুর নয়, উপাদানলব্ধ সংবাদও অল্পতর। আমি শুধু কাঠামো রচনার প্রয়াস করিয়াছি—ভবিষ্যৎ বাঙালী ঐতিহাসিকেরা ইহাতে রক্তমাংস যোজনা করিবেন, এই আশা ও বিশ্বাসে। আরও একটু আশা এই যে, এই যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বর্তমান সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাঁহারা বাংলার মধ্য ও উত্তরপর্বের ইতিহাসও রচনা করিয়া তুলিবেন। সুযোগ ও অবসর ঘটিলে নিজের উপরও সে কর্তব্য পালনের দায়িত্ব রহিল, তাহা অস্বীকার করিতেছি না।

আমার কোনও কথাই শেষকথা নয়। সত্যসন্ধী ঐতিহাসিকের কাছে শেষ কথা কিছু নাই ; তাঁহার সব কথাই experiments with truth মাত্র। এই কাঠামো রচনার প্রয়াস সত্যে পৌছিবার নিম্নতম স্তর ; এই স্তর যদি ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিককে সত্যে পৌছিতে কিছুমাত্র সহায়তা করে, তবেই আমার দেশের এবং আমার জাতির এই ইতিহাস-রচনা সার্থক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের গোড়ার কথা

১

একদা রবীন্দ্রনাথ ভারততীর্থকে অগণিত জাতির মিলনক্ষেত্র কল্পনা করিয়া বলিয়াছিলেন,

কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা,
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হ'তে
এ-সমুদ্রে হ'ল হারা।

ভারততীর্থের অন্যতম প্রান্তিক দেশ বঙ্গভূমি সম্বন্ধেও একথা সমান প্রযোজ্য। গঙ্গা-করতোয়া-লৌহিত্য বিধৌত, সাগর-পর্বতধৃত, রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ-সমতট এই চতুর্জনপদসম্বদ্ধ বাংলা দেশে প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া তুর্কী অভ্যুদয় পর্যন্ত কত বিভিন্ন জন, কত বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা বহন করিয়া আনিয়াছে, এবং একে একে ধীরে কোথায় কে কি ভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছে ইতিহাস তাহার সঠিক হিসাব রাখে নাই। সজাগ চিত্তের ও ক্রিয়াশীল মননের রচিত কোনও ইতিহাসে তাহার হিসাব নাই একথা সত্য, কিন্তু মানুষ তাহার রক্ত ও দেহগঠনে, ভাষায় ও সভ্যতার বাস্তব উপাদানে এবং মানসিক সংস্কৃতিতে তাহা গোপন করিতে পারে নাই। সকলের উপর এই বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা তাহার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছে বাঙালীর প্রাচীন সমাজবিন্যাসের মধ্যে। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে সে-ইঙ্গিত কিছুতেই ধরা পড়িবার কথা নয়।

জনতত্ত্বের ভূমিকা

বাংলা দেশে জনতত্ত্ব গবেষণার মাত্র শৈশবাবস্থা। একথা অবশ্য সকলেই জানেন, বাঙালী এক সংকর জন,[১] কিন্তু কথাটা ঐখানেই শেষ হইয়া যায় না, বরং ঐখানেই কথার আরম্ভ। অথচ, কি কি মূল উপাদানের জৈব সমন্বয়ের ফলে বাঙালী আজ এক সংকর জনে

---

১ এই নিবন্ধে 'জন' সাধারণত ইংরাজী 'people' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; 'caste' বুঝাইতে 'বর্ণ' ও বাংলা চল্‌তি 'জাত্' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। প্রাণীতত্ত্ব বা নরতত্ত্বগত 'race' বুঝাইতে 'নর' এবং 'নরগোষ্ঠী' এবং 'tribe' অর্থে হিন্দুস্থানী 'কোম' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইংরাজী 'race' ও 'people' এই দুইটি শব্দ লইয়া নানাপ্রকার বিভ্রমের সৃষ্টি ঐতিহাসিকদের মধ্যে দুর্লভ নয়। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ নৃতাত্ত্বিক ফন্ আইকস্টেড্টের (Eikstedt) উক্তি স্মরণীয়:

পরিণত হইয়াছে, একথা কমবেশি নিশ্চয় করিয়া বলিবার মতন যথেষ্ট উপকরণ দেশের সর্বত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকিলেও নৃতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকের দৃষ্টি সেদিকে আজ পর্যন্ত বিশেষ আকৃষ্ট হয় নাই। কেন হয় নাই তাহার কারণ কষ্টবোধ্য না হইলেও এখানে তাহার আলোচনা অবান্তর। বাঙালীর জনতত্ত্ব নিরূপণ শুধু নৃতাত্ত্বিকের কাজ নয়; তাঁহার সঙ্গে ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকের জ্ঞান ও দৃষ্টির একত্র মিলন না হইলে বাঙালীর জনরহস্য উন্মোচন করা প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। যে-জন যত বেশি সংকর সে-জনের ক্ষেত্রে এ-কথা তত বেশি প্রযোজ্য।

বাঙালীর জনতত্ত্ব নিরূপণের একতম এবং প্রধানতম উপায় বাংলাদেশের আচণ্ডাল সমস্ত বর্ণের এবং সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের, বিশেষভাবে প্রত্যন্তশায়ী জনপদবাসীদের সকলের, রক্ত ও দেহগঠনের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ, এক কথায় নরতত্ত্বের পরিচয়। আমাদের দেশের নৃতত্ত্ব গবেষণায় রক্তবিশ্লেষণ এখনও সাধারণভাবে পণ্ডিতদের দৃষ্টির পরিধির মধ্যে ধরা দেয় নাই। দুই একজন একটু আধটু পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। দেহগঠনের বিশ্লেষণেরও এ-পর্যন্ত যাহা স্বীকৃত ও অনুসৃত হইয়াছে তাহা শুধু নরমুণ্ড, নরকপাল ও নাসিকার পরিমিতি ও পরস্পর অনুপাত এবং চুল, চোখ ও চামড়ার রং আশ্রয় করিয়া। য়ুরোপে, বিশেষ করিয়া জার্মানী ও অস্ট্রিয়ায়, গায়ের চামড়ার উপাদানবৈশিষ্ট্য, কেশমূল, কেশবৈশিষ্ট্য, নখবৈশিষ্ট্য, হাত ও পায়ের তালু প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানাগুণ ও বৈশিষ্ট্য লইয়া যে সব আলোচনা হইয়াছে আমাদের দেশের নরতত্ত্ব গবেষণায় আজ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদেও তাহা অল্পই স্থান পাইয়াছে। নরমুণ্ড, কপাল ও নাসিকার পরিমিতি ও পরস্পর অনুপাত বিশ্লেষণ যাহা হইয়াছে তাহাও যথেষ্ট নয়। বহুদিন আগে রিজ্‌লী (Risley) সাহেব বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের জনসাধারণের কিয়দংশের পরিমিতি গণনা করিয়াছিলেন; আজ পর্যন্ত নৃতত্ত্ববিদেরা সাধারণত সেই গণনার উপরই নির্ভর করিয়া আসিয়াছেন। সাম্প্রতিক কালে ফন্ আইকস্টেড্‌ট্, জে এইচ্ হাটন্, বিরজাশঙ্কর গুহ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, রমাপ্রসাদ চন্দ, শরৎচন্দ্র রায়, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, মীনেন্দ্রনাথ বসু, তারকচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত কিছু কিছু নূতন পরিমিতি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু লোকসংখ্যার অনুপাতে তাহা খুবই অল্প, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া, যে সব নিদর্শন

"It (i.e., raciology) is the comparative natural history of the zoological groups of mankind. Such a group or zoological race is characterised by a great number of individuals with a typical combination of many normal and hereditary traits both of body and behaviour. It is always several such races, such biological types of forms, which constituted a people, nation or tribe. These form a linguistic, a political or a small social unit, but not zoological units. All indeed are at the same time biological units. * * * The difference between a people and a race therefore is that the people show many different zoological types of same and very near descent, but the race exhibits only one single zoological type of same and more distant descent".

আহরণ ইহারা করিয়াছেন, সর্বত্র সেগুলির প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করা যায় না, অর্থাৎ সমাজের সকল বর্ণ ও শ্রেণী-স্তরের ও দেশের সকল স্থানের জনসাধারণের মধ্য হইতে নিদর্শন নির্বাচন সর্বত্র যথার্থ ও যথেষ্ট হইয়াছে, বর্ণ, শ্রেণী ও স্থানের ইতিপরম্পরাগত মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তাহা ছাড়া, পরিমিতি গণনায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে ব্যক্তিগত ভুল থাকার সম্ভাবনা, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবু, যতটুক হইয়াছে, যেভাবে হইয়াছে তাহা হইতে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এবং ভাষা, বাস্তব সভ্যতা ও মানসিক সংস্কৃতি-বিকাশের ইতিহাসের সাহায্যে সেই ইঙ্গিতগুলি ফুটাইয়া তোলা হয়তো অসম্ভব নয়।

বাঙালীর জনতত্ত্ব নিরূপণের কিছুটা সহায়ক উপায়, বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ। অবশ্য একথা সত্য যে, ভাষা বিশ্লেষণের সাহায্যে নরতত্ত্ব ঠিক নির্ণয় করা চলে না; কারণ মানুষ নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অথবা ধর্মগত কারণে ভাষা বদলায়; এক জন অন্য জনের ভাষা গ্রহণ করে এবং সেই ভাষাই দুই তিন পুরুষ পরে নিজেদের জাতীয় ভাষায় পরিণতি লাভ করে; ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কাজেই ভাষার উপর নির্ভর করিয়া নরতত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা স্বভাবতই অযৌক্তিক এবং বিজ্ঞানসম্মত পন্থার বিরোধী; তবে জন নির্ণয়ে ভাষা-বিশ্লেষণ যে অন্যতম সহায়ক একথাও একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কোনও জনের ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া যদি দেখা যায় সেই ভাষার জীবনচর্যার মূল শব্দগুলি কিংবা পদরচনা রীতি কিংবা পদভঙ্গি অথবা মানুষ ও স্থান ইত্যাদির নাম অন্য কোনও জনের ভাষা হইতে গৃহীত বা উদ্ভূত, তখন স্বভাবতই এ অনুমান করা চলে যে, সেই পূর্বোক্ত জনের সঙ্গে শেষোক্ত জনের রক্ত সংমিশ্রণ না হোক, মেলামেশা ঘটিয়াছে। এই মেলামেশা নানা সামাজিক ও অন্যান্য কারণে সমাজ-কাঠামোর সকল স্তরে নাও হইতে পারে, যে যে স্তরে হইয়াছে সেখানেও সর্বত্র সমভাবে হইয়াছে একথাও বলা যায় না। যাহাই হউক, ভাষা বিশ্লেষণের ইঙ্গিত নরগোষ্ঠী নির্ধারণে না হউক জন-নিরূপণে অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে; আর সেই ইঙ্গিতের মধ্যে যদি নরতত্ত্ব-বিশ্লেষণলব্ধ ইঙ্গিতের সমর্থন পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূরক সাক্ষ্য হিসাবে জনতত্ত্ব নির্ণয়ের কাজেও লাগিতে পারে।

বাংলা দেশ ও বাংলার সংলগ্ন প্রত্যন্ত দেশগুলির ভাষার বিশ্লেষণ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। আচার্য গ্রীয়ার্সন হইতে আরম্ভ করিয়া সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পর্যন্ত কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত বাংলা ভাষার জন্ম ও জীবনকথা নিরূপণ করিতে সার্থক প্রয়াস করিয়াছেন। ফরাসী পণ্ডিত জঁ্যা পশিলস্‌কি (Jean Przyluski), জুল ব্লখ্‌ (Jules Bloch) ও সিলভ্যাঁ লেভি এবং তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় আর্যপূর্ব ও দ্রাবিড়পূর্ব ভারতীয় ভাষা ও জন সম্বন্ধে যে মূল্যবান গবেষণার সূত্রপাত করিয়া দিয়াছেন, তাহাও প্রাচীন বাংলার ভাষা ও জন সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করিয়াছে, এবং তাহার ফলে বাংলার জন-নিরূপণ সমস্যা সহজতর হইয়াছে।

বাঙালীর জনতত্ত্ব নিরূপণের অন্যতম সহায়ক উপায়, প্রাচীন ও বর্তমান বাস্তব সভ্যতা ও মানসিক সংস্কৃতির বিশ্লেষণ। ভাষায় যেমন তেমনই বাস্তব সভ্যতা ও মানসিক সংস্কৃতিতেও বিভিন্ন জনের সংমিশ্রণের ইতিহাস লুক্কায়িত থাকে। প্রত্যেক জনের ভিতরও এই দুই বস্তু একটা রূপ গ্রহণ করে, এবং নানা উপায় ও উপকরণ, রীতি ও অনুষ্ঠান, আদর্শ ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কালচক্রের আবর্তে সেই জন যখন অন্য জনের দ্বারা পরাভূত অথবা মিত্র বা শত্রুরূপে পরস্পরের সম্মুখীন হয়, একের সঙ্গে অন্যের আদান প্রদান ঘটে তখন কোন জনই নিজের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অন্যের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে পারে না। ব্যক্তির জীবনে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা ঘটে জনের জীবনেও তাহাই। অবশ্য, অধিকতর পরাক্রান্ত ও বীর্যবান যে জন সে প্রভাবান্বিত বেশি করে, নিজে প্রভাবান্বিত হয় কম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও স্তরে এই নৈকট্যের ফলে কমবেশি আদান প্রদান চলিতেই থাকে এবং একটা সমন্বয়ও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। জীবধর্মের নিয়মই এইরূপ। আঘাত হইলেই প্রত্যাঘাতও অনিবার্য এবং দুইএ মিলিয়া একটা সমন্বিত গতিও সমান অনিবার্য। বাংলা দেশে প্রাচীনকালে, এবং কতকটা বর্তমানেও, যে সমন্বিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিশ্লেষণ করিলে বিভিন্ন জনের বাস্তব সভ্যতা ও মানসিক সংস্কৃতির কিছু কিছু পরিচয় সহজেই ধরা পড়ে, এবং ভাষা ও নৃতত্ত্ব বিশ্লেষণের সাহায্যে তাহা হইতে জন-নির্ণয়ের কাজটাও কিছুটা সহজ হয়। একথা অবশ্যই সত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ একক কখনই জন-নির্দেশক হইতে পারে না। কিন্তু, তাহা যে ইঙ্গিত দেয়, ভাষা ও নৃতত্ত্বের ইঙ্গিতের সঙ্গে তাহা যোগ করিলে জনতত্ত্বের স্বরূপ তাহাতে অল্পবিস্তর ধরা পড়িতে বাধ্য।

এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণের কাজ আমাদের দেশে খুব যে অগ্রসর হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সংস্কৃতি, বিশেষভাবে ধর্ম ও মূর্তিতত্ত্ব এবং আচার-অনুষ্ঠানের বিশ্লেষণ কিছু কিছু যদি বা হইয়াছে, বাস্তব সভ্যতার বিশ্লেষণ একেবারেই হয় নাই। এক্ষেত্রে ভাষা বিশ্লেষণের সাহায্য অপরিহার্য। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ যাহা হইয়াছে তাহার মধ্যে সমাজের উচ্চ ও নিম্নস্তরের লোকাচার ও লোকধর্ম অল্পই স্থান পাইয়াছে এবং পুরাণানুমোদিত ধর্মের স্থানও যথেষ্ট হয় নাই; অথচ জনতত্ত্বের অনেক নিশানা ঐ গুহাগুলির মধ্যে নিহিত।

এই সমস্ত উপায় ও উপকরণ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জানিবার উপায় নাই এবং জন ও ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন এই উপলক্ষে মনকে অধিকার করা সম্ভব, তাহার সব কিছুর উত্তর পাওয়া যাইবে, তাহাও বলা যায় না। তবে মোটামুটি কাঠামোটা ধরা পড়িতে পারে, এই আশা করা যায়। বাঙালীর ইতিহাসের জন্য বাংলা দেশের নরতত্ত্ব ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে যে সব আলোচনা-গবেষণা ইত্যাদি হইয়াছে তাহার বিশদ ও বিস্তারিত পরিচয় ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন এখানে কিছু নাই; এই আলোচনা ও গবেষণার

মোটামুটি ফলাফল একত্র করিতে পারিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণের ফলাফলের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিলেই ইতিহাসের প্রয়োজন মিটিতে পারে।

ভারতবর্ষে বায়ানা নামক স্থানে প্রস্তরীভূত নরমুণ্ডের কঙ্কাল, দক্ষিণ-ভারতে আদিত্য-নল্লুরে প্রাপ্ত কতকগুলি মুণ্ড-কঙ্কাল, মহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত কতকগুলি নরকঙ্কাল এবং তক্ষশিলার ধর্মরাজিক বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত কয়েকটি বৌদ্ধভিক্ষুর দেহাবশেষ ভারতীয় নরতত্ত্ব জিজ্ঞাসার মীমাংসায় যে-পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে, বাংলা দেশের জন নির্ণয়ে তেমন সাহায্য পাইবার উপায় এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বস্তুত, এ যাবৎ বাংলা দেশের কোথাও প্রাগৈতিহাসিক বা ঐতিহাসিক কোনও যুগেরই কোনও নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাগৈতিহাসিক লৌহ অথবা প্রস্তর যুগের বিশেষ কোনও বাস্তবাবশেষও বাংলাদেশে এপর্যন্ত এমন কিছু পাওয়া যায় নাই যাহার ফলে সেই যুগের সভ্যতা এবং সেই সূত্রে নরতত্ত্ব নির্ণয়ের ইঙ্গিত কতকটা পাওয়া যাইতে পারে! কিন্তু যাহা আমাদের নাই তাহা লইয়া দুঃখ করিয়াও লাভ নাই। যতটুকু যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা লইয়াই একটা হিসাব-নিকাশ আপাতত করা যাইতে পারে।

২

বাংলার বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর জনসাধারণের দেহগঠনের, বিশেষভাবে কেশবৈশিষ্ট্য, চোখ ও চামড়ার রং, নাসিকা, কপাল ও নরমুণ্ডের আকৃতি ইত্যাদির পরিমিতি গ্রহণ করিয়া এ-পর্যন্ত যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা সংক্ষেপে জানিয়া লওয়া যাইতে পারে। সকলের পরিমিতি একই মানদণ্ড অনুসারে গৃহীত হয় নাই; পণ্ডিতদের মধ্যে পরিমিতি-গণনার যে বিভিন্নতা দেখা যায় ইহা তাহার অন্যতম কারণ। তবে, মোটামুটি বৈশিষ্ট্যগুলি ধরিতে পারা খুব কঠিন নয়। সর্বত্রই প্রধান প্রধান ধারার কথাই উল্লেখ করা সম্ভব; উপধারাগুলির ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া চলে; অথচ প্রধান প্রধান ধারার সঙ্গে উপধারা মিলিয়া এক হইয়াই বাঙালীর জন-সাংকর্যের সৃষ্টি হইয়াছে, একথা ভুলিলে চলিবে না।

বাংলার বর্ণবিন্যাস ও জনতত্ত্ব

বৃহদ্ধর্মপুরাণ একটি উপপুরাণ; ইহার তারিখ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক; তুর্কি-বিজয়ের অব্যবহিত পরবর্তীকালে রাঢ়দেশে ইহার রচনা বলিয়া অনুমান করিলে খুব অন্যায় হয় না। বর্ণ ব্রাহ্মণ বাদ দিয়া সমসাময়িক বাংলা দেশের জনসাধারণ যে ছত্রিশটি জাত্-এ বিভক্ত ছিল, তাহার একটু পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থটির রচয়িতা ব্রাহ্মণের শূদ্রবর্ণের লোকদিগকে তদানীন্তন বর্ণবিভাগানুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন:

(১) উত্তম সংকর বিভাগ: করণ (সৎশূদ্র), অম্বষ্ঠ(বৈদ্য), উগ্র, মাগধ, গান্ধিক বণিক, শাংখিক, কংসকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্মকার, গোপ, দাস (চাষী), রাজপুত্র, নাপিত, মোদক, বারজীবি, সূত (সূত্রধর), মালাকর, তাম্বূলী ও তৌলিক। (২০)

(২) মধ্যম সংকর বিভাগ : তক্ষণ, রজক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, আভীর, তৈলকারক, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবাক (শাবার), শেখর ও জালিক। (১২)

(৩) অন্ত্যজ বা অধম সংকর (বর্ণাশ্রম-বহিষ্কৃত) : মলেগ্রহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, চর্মকার, ঘন্টজীবী বা ঘট্টজীবী, ডোলাবাহী, মল্ল ও তক্ষ। (৯)

ইহা ছাড়া তিনি অবাঙালী ও বৈদেশিক ম্লেচ্ছ কয়েকটি কোমের নামও করিয়াছেন, স্বতন্ত্র বিভাগের অধীনে, যথা, দেবল বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, গণক-গ্রহবিপ্র, বাদক, পুলিন্দ, পুক্কশ, খশ, যবন, সুহ্ম, কম্বোজ, শবর, খর ইত্যাদি। উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, বৃহদ্ধর্মপুরাণ যদিও বলিতেছেন ছত্রিশটি জাত বা বর্ণ-উপবর্ণের কথা, নাম করিবার সময় করিতেছেন একচল্লিশটির। পাঁচটি যে পরবর্তীকালের যোজনা, এ-অনুমান সেই হেতু অসংগত নয়। এখনও আমরা ছত্রিশ জাত্-এর কথাই তো প্রসঙ্গত বলিয়া থাকি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডও খুব সম্ভব বাংলা দেশের রচনা এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণের প্রায় সমসাময়িক। এই পুরাণেও সমসাময়িক বাংলার বিভিন্ন জাত্-এর একটা অনুরূপ তালিকা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থেরই বর্ণবিন্যাস অধ্যায়ে এ'সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাইবে; এখানে বর্তমান প্রয়োজনে সে-তালিকার আর কোনও প্রয়োজন নাই।

বর্ণ ও জনের দিক হইতে এই বিভাগ যে কৃত্রিম একথা অনস্বীকার্য; তাহা ছাড়া *বর্ণ তো কিছুতেই জন-নির্দেশক হইতে পারে না।* আর, একটু মনোযোগ করিলেই দেখা যাইবে, ইহার প্রথম দুইটি বিভাগ ব্যবসায়কর্মগত এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগ দুইটি কতকটা জনগত। প্রথম বিভাগটি জলচল ও দ্বিতীয় বিভাগটি জল-অচল বর্ণের বলিয়া অনুমেয়; কাজেই কি কর্মবিভাগ কি জনবিভাগ কোনও দিক হইতেই ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক যুক্তি হয়তো মিলিবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিক কেনই বা মধ্যম সংকর, আর গন্ধবণিক ও কংসবণিক কেনই বা উত্তম সংকর, অথবা তৈলকার কেনই বা মধ্যম সংকর। বস্তুত, বর্ণবিভাগ যেখানে ব্যবসায়কর্মগত সেখানে প্রত্যেক বর্ণের মধ্যেই বিভিন্ন জনের বর্ণ আত্মগোপন করিয়া থাকিবেই; এই বর্ণগুলি সেইজন্যই সংকর এবং স্মৃতি ও পুরাণে বারবার যে বর্ণসংকর ও জাতিসংকর কথা ব্যবহার করা হইয়াছে ইহার ইঙ্গিত ইতিহাস ও নরতত্ত্বের দিক হইতে নিরর্থক ও অযৌক্তিক নয়। ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে সাংকর্যের কথা যে বলা হয় নাই তাহার কারণ হয়ত এই যে, এই সব পুরাণ ও স্মৃতি প্রায়শ তাঁহাদেরই রচনা; অথচ নরতত্ত্বের দিক্ হইতে দেখা যাইবে এই জাতিসাংকর্য অম্বষ্ঠ ও করণদের সম্বন্ধে যতখানি সত্য ঠিক্ ততখানি সত্য ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধেও। জনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই কথাটা ভাল করিয়া ধরা পড়িবে এবং তখন দেখা যাইবে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা যে পরিমাণে সংকর, বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তম ও মধ্যম সংকর বিভাগের অধিকাংশ বর্ণই সেই পরিমাণে এবং প্রায় একই বৈশিষ্ট্যে সংকর।

বাঙালী ব্রাহ্মণদের দেহদৈর্ঘ্য মধ্যমাকৃতি; মুণ্ডের আকৃতিও মাধ্যমিক (mesocepha-

lic), অর্থাৎ গোলও নয়, দীর্ঘও নয়; নাসিকা তীক্ষ্ণ ও উন্নত। বিরজাশংকর গুহ মহাশয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের যে-পরিমিতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু, সাম্প্রতিক কালে যাঁহারা এই বর্ণের মুণ্ডাকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাঁহারা মনে করেন যে, উত্তর বা দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র বা বৈদিক সকল পর্যায়ের ব্রাহ্মণদের মধ্যেই গোল মাথার (brachycephalic) একটা সুস্পষ্ট ধারা একেবারে অস্বীকার করা যায় না.; কায়স্থদের মধ্যেও তাহাই। সঙ্গে সঙ্গে এই তিন পর্যায়ের ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবার চ্যাপ্টা বিস্তৃত নাসার (platyrrhine) একটা অস্পষ্ট ধারাচিহ্নও অনস্বীকার্য, যদিও গোল এবং মধ্যমাকৃতির মুণ্ড ও উন্নত সুগঠিত নাসাই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু, এই বিশ্লেষণের পরেও একথা বলা প্রয়োজন যে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে দীর্ঘ মস্তিষ্কাকৃতির (dolicocephalic) স্বল্প হইলেও একটা অনুপাত ধরা পড়ে। একথা সাধারণভাবে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমিতি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও সত্য; কারণ, আগেই বলিয়াছি, প্রধান ধারার উল্লেখই সম্ভব, উপধারাগুলির ইঙ্গিত করা যায় মাত্র।

ব্রাহ্মণদের দেহগঠন সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, বাঙালী কায়স্থদের দেহবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও তাহা সত্য। বস্তুত মুণ্ড ও নাসাকৃতির দিক হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মোটামুটি কোনও পার্থক্যই নৃতত্ত্ববিদের চোখে ধরা পড়ে না; নরতত্ত্বের দিক হইতে ইহারা সকলেই একই নরগোষ্ঠী। ব্রাহ্মণদের মত ইহারাও মধ্যমাকৃতি, ইহাদেরও চুলের রং কালো, চোখের মণি মোটামুটি পাতলা হইতে ঘন-বাদামী যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে কালো বলিয়াই মনে হয়। গায়ের রং পাতলা বাদামী হইতে আরম্ভ করিয়া পাতলা গৌর। কাহারও কাহারও মতে রাঢ়ীয় কায়স্থদের মধ্যে দীর্ঘ অনুন্নত করোটির প্রাধান্যও দেখা যায়, মধ্যমাকৃতির বৈশিষ্ট্য সেখানে কম। কিন্তু এই কমবেশি যেহেতু মানদণ্ডনির্ভর এবং যেহেতু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানদণ্ড ব্যবহার করিয়া পরিমিতি গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই হেতু শেষোক্ত মত সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য যে সমস্ত জাতির দেহবৈশিষ্ট্য-পরিমিতি গ্রহণ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কায়স্থ, গোয়ালা, কৈবর্ত, পোদ্র, বাগদী, বাউরী, চণ্ডাল, মালো, মালী, মুচি, রাজবংশী, সদ্‌গোপ, বুনা, বাঁশফোঁড়, কেওড়া, যুগী, সাঁওতাল, নমঃশূদ্র, ভূমিজ, লোহার মাঝি (বেদে), তেলি, সুবর্ণ বণিক, গন্ধবণিক, ময়রা, কলু, তন্তুবায়, মাহিষ্য, তাম্লী, নাপিত এবং রজকই প্রধান। ইহা ছাড়া যশোহর ও খুলনা অঞ্চলের নলুয়া (মুসলমান) এবং পূর্ববাংলার মুসলমানদের কিছু কিছু পরিমিতিও গণনা করা হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত জাত-এরই পরিমিতি-গণনা সমসংখ্যায় হইয়াছে এবং দেশের সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত হইয়াছে, একথা বলা যায় না। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও পোদদের পরিমিতি গণনা করিয়াছেন বিরজাশংকর গুহ মহাশয়। পশ্চিম বাংলার কয়েকটি জেলারসাঁওতাল, ভূমিজ, বাউরী, বাগদী, লোহার মাঝি, তেলি, সুবর্ণ ও গন্ধবণিক, ময়রা, কলু, তন্তুবায়, মাহিষ্য, তাম্লী,

নাপিত, রজক ইত্যাদি গণনা করিয়াছেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়; বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পরিমিতি লইয়াছেন তারকচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং হারাণচন্দ্র চাকলাদার লইয়াছেন কলিকাতার ব্রাহ্মণ ও বীরভূমের মুচিদের। রিজ্‌লী গণনা করিয়াছেন সদ্‌গোপ, রাজবংশী, মুচি, মালী, মালো, কৈবর্ত, গোয়ালা, চণ্ডাল, বাউরী, বাগদী এবং পূর্ব বাংলার মুসলমানদের, কিন্তু অমুসলমান নিদর্শনগুলি কোথা হইতে আহৃত তাহা বলেন নাই। মীনেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গণনা করিয়াছেন উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ বাংলার আটটি জেলার বুনা, নলুয়া (মুসলমান), বাঁশফোড়, মুচি, রাজবংশী, মালো (এই দুই বর্ণেরই ব্যবসা মাছ ধরা ও মাছ বিক্রয়), কেওড়া ও যুগীদের। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত, রাজবংশী, পোদ্‌ এবং বাগদীদের পরিমিতি গণনা করিয়াছেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। মোটামুটিভাবে এই সব বর্ণ ও শ্রেণীগুলির মধ্যে বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর ও অন্ত্যজ এই বিভাগ তিনটির প্রতিনিধিদের অনেকেরই সন্ধান মিলিবে। নমঃশূদ্র বর্ণের যে অসংখ্য জনসাধারণ মধ্য ও বর্তমান যুগের একটি বলিষ্ঠ বর্ণ ও শ্রেণী স্তর তাঁহাদের দেহগঠনের পরিমিতি যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হাটন ও রিজ্‌লীর নাম করিতেই হয়।

ইঁহাদের সকলের সম্মিলিত বিশ্লেষণ হইতে দেহগঠন, চোখ ও চামড়ার রং, কেশ বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য সহজেই ধরা পড়ে। ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে নমঃশূদ্রদের কথা বলিতেই হয়, কারণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের লোকদের সঙ্গে নরতত্ত্বের দিক হইতে ইহাদের কোনও পার্থক্য নাই, একথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়। উচ্চ বর্ণের লোকদের মত ইহারাও দৈর্ঘ্যে মধ্যমাকৃতি, মুণ্ডের গঠন মাধ্যমিক, এবং নাসা তীক্ষ্ণ ও উন্নত; ইহাদের চোখ ও চামড়ার রংও মোটামুটিভাবে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদেরই মত, অথচ স্মৃতিশাসিত হিন্দুসমাজে ইহাদের স্থান এত নিচে যে নরতত্ত্বের পরিমিতি গণনার মধ্যে তাহার কোনও যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে-যুক্তি হয়ত পাওয়া যাইবে জাত-সংঘর্ষের ইতিহাসের মধ্যে, অথবা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও নমঃশূদ্রদের ছাড়া আর যে-সব বর্ণের উল্লেখ আগে করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গান্ধিক বণিক, সদ্‌গোপ ও গোয়ালা (গোপ), কৈবর্ত (চাষী ও মাহিষ্য), নাপিত, ময়রা (মোদক), বারুই (বারজীবি অর্থাৎ পানের বরজ যাহার উপজীবিকা), তাম্‌লী (তাম্বুলী—যে পান বিক্রয় করে) এবং যুগী (তন্তুবায়) নিঃসন্দেহেই বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তম সংকর পর্যায়ভুক্ত ; এবং কলু বা তেলি (তৈলকারক), রজক, সুবর্ণবণিক এবং মালী মধ্যম সংকর পর্যায়ভুক্ত। চণ্ডাল বা চাঁড়াল, মুচি (চর্মকার), দুলিয়া (ডোলাবাহী), মালো এবং কেওড়া, মল্ল, ধীবর প্রভৃতি অন্ত্যজ পর্যায়ের।

এইগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি জাতের লোকদের সম্বন্ধে এবং উল্লিখিত জাতগুলি সম্বন্ধেও অতিরিক্ত কিছু কিছু পরিমিতি-গণনা বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদেরা করিয়াছেন। এই সব নরতত্ত্বগত পরিমিতি-গণনায় যাহা পাওয়া যায় তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উচ্চ বর্ণের

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বর্ণের বাঙালী দেহ-দৈর্ঘ্যের দিক হইতে মধ্যমাকৃতি; নমঃশূদ্রেরাও তাহাই। উত্তম সংকর বিভাগের বাঙালীও সাধারণত মধ্যমাকৃতি কিন্তু খর্বতার দিকেও একটা ঝোঁক খুব স্পষ্ট। মালী ছাড়া মধ্যম সংকর বর্ণের লোকেরাও তদনুরূপ; মালীরা খর্বাকৃতি। অন্ত্যজ পর্যায়ের বা বর্তমানের তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতের লোকেরা সাধারণত খর্বাকৃতি; কিন্তু ইহাদের মধ্যেও কোন কোন জাত স্পষ্টতই মধ্যমাকৃতি এবং অনেক জাতের মধ্যেই মধ্যমাকৃতির দিকে ঝোঁক কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। মুণ্ডাকৃতির দিক হইতে দেখিতে গেলে, সাধারণত ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণ এবং নমঃশূদ্রেরা যেমন গোলাকৃতি, উত্তম সংকর পর্যায়ের অধিকাংশ বর্ণ তেমনই। আবার কোনও কোনও নিম্ন উপ-বর্ণের মধ্যে, যেমন পশ্চিম বাংলার ভূমিজ ও সাঁওতালদের মধ্যে, গোলের দিকেও একটু ঝোঁক উপস্থিত। এই ধরনের ঝোঁক অবশ্য কিছু কিছু অন্য বর্ণের মধ্যেও একবারে অনুপস্থিত নয়। তেমনই আবার কতকগুলি বর্ণের মধ্যে দৈর্ঘ্যের দিকে ঝোঁক অত্যন্ত স্পষ্ট, যেমন মাহিষ্য, নাপিত, ময়রা, সুবর্ণবণিক, মুচি, বুনা, বাগ্‌দী, বেদে, পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান প্রভৃতিদের মধ্যে। কতগুলি বর্ণ তো স্পষ্টতই দীর্ঘমুণ্ডাকৃতি, যেমন উত্তর- মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গের জেলে রাজবংশীরা, বাঁশফোঁড়, মালী, বাউড়ী, তাম্‌লী, তেলি প্রভৃতি উপবর্ণের লোকেরা। নাসাকৃতির দিক হইতে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ ও নমঃশূদ্র বর্ণের লোকেরা সকলেই সাধারণত তীক্ষ্ণ ও উন্নতনাস। সুবর্ণবণিকদের মধ্যে তীক্ষ্ণ ও উন্নত নাসা হইতে চ্যাপ্টা পর্যন্ত সব ধারাই সমভাবে বিদ্যমান; পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যেও তাহাই। ময়রাদের নাসাকৃতি মধ্যম কিন্তু তীক্ষ্ণতার দিকে ঝোঁক স্পষ্ট। উত্তম ও মধ্যম সংকর পর্যায়ের, এমন কি অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ পর্যায়ের অধিকাংশ বর্ণেরই নাসাকৃতি মধ্যম, তবে কোনও কোনও বর্ণের লোকদের মধ্যে, যেমন গন্ধবণিক, নাপিত, তেলি, কলু, মালো প্রভৃতির, চ্যাপ্টার দিকে ঝোঁক সহজেই ধরা পড়ে। আবার কতগুলি বর্ণের নাসাকৃতি একেবারেই চ্যাপ্টা, যেমন, বেদে, ভূমিজ, বাগদী, বাউরী, তাম্‌লী, তন্তুবায়, রজক, মালী, মুচি, বাঁশফোঁড়, মাহিষ্য প্রভৃতি। সাঁওতালদের নাসিকাকৃতিও চ্যাপ্টা, কিন্তু মধ্যমাকৃতির দিকে ঝোঁক আছে।

কয়েকটি ধারণা এইবার মোটামুটি কিছুটা স্পষ্ট হইল। সাধারণভাবে বলা যায়, বাঙালীর চুল কালো, চোখের মণি পাতলা হইতে ঘন বাদামী বা কালো, গায়ের রং সাধারণত পাত্‌লা হইতে ঘন বাদামী, নিম্নতম শ্রেণীতে চিক্কণ ঘনশ্যাম পর্যন্ত। দেহ-দৈর্ঘ্যের দিক হইতে বাঙালী মধ্যমাকৃতি, খর্বতার দিকে ঝোঁকও অস্বীকার করা যায় না। বাঙালীর মুণ্ডাকৃতি সাধারণত দীর্ঘ, উচ্চ বর্ণস্তরে গোলের দিকে বেশি ঝোঁক। নাসাকৃতিও মোটামুটি মধ্যম, যদিও তীক্ষ্ণ ও উন্নত নাসাকৃতি উচ্চতর বর্ণের লোকদের ভিতর সচরাচর সুলভ।

বাংলা দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর উচ্চ ও নিম্নজাতের এবং বাঙালী মুসলমানদের কিছু কিছু রক্তবিশ্লেষণ কোথাও কোথাও হইয়াছে। মিসেস ম্যাকফারলেন, রবীন্দ্রনাথ বসু, মীনেন্দ্রনাথ

বন্ধু শশাঙ্কশেখর সরকার, অনিল চৌধুরী, মাখনলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহাদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের সম্মিলিত গবেষণার ফল মোটামুটি বাঙালীর জন-সাংকর্যের ইঙ্গিত সমর্থন করে। ডক্টর ম্যাকফারলেনের মতে, বর্ণ, বর্ণেতর ও অস্পৃশ্য বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে যে রক্তবৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যেও তাহাই। বাঙালী মুসলমানেরা যে বাঙালী হিন্দুদেরই সমগোত্রীয় ইহা তাহার আর একটি প্রমাণ।

কিন্তু এতক্ষণ বাঙালী জাতির দেহ-গঠনের যে-সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইল, তাহা আসিল কোথা হইতে? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষে যে-সব জন ছিল ও পরে যে-সব জন একের পর এক এদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছে, প্রবহমাণ রক্তস্রোতে নিজেদের রক্ত মিশাইয়াছে, মৈত্রী ও বিরোধের মধ্য দিয়া একে অন্যের নিকটতর হইয়াছে, তাহাদের হিসাব লইতে হয়। কিন্তু তাহা করিবার আগে একটি সুপ্রচলিত মতবাদ সম্বন্ধে একটু বিচারের অবতারণা করা প্রয়োজন। এই মতটি নরতাত্ত্বিক হার্বার্ট রিজ্‌লীর।

বাংলাদেশের উচ্চবর্ণগুলির ভিতর এবং অন্যান্য বর্ণের ভিতরও চওড়া নাসিকাকৃতি এবং গোল মুণ্ডাকৃতির একটা সুস্পষ্ট ধারা বিদ্যমান, একথা আগেই বলা হইয়াছে। বাঙালীর এই সব বৈশিষ্ট্যের যুক্তি খুঁজিতে গিয়া বহু দিন আগে রিজ্‌লী সাহেব বলিয়াছিলেন, বাঙালীরা প্রধানত মোঙ্গোলীয় ও দ্রবিড় নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন। তিব্বত-চৈনিক গোষ্ঠীর চীনা, বর্মী, ভোটিয়া, নেপালী প্রভৃতি জনের লোকেরা তো আমাদের সুপরিচিত। ইহারা খর্বকায়, স্বল্পশ্মশ্রু এবং পীতাভ বর্ণ। ইহাদের করোটি প্রশস্ত, নাসাকৃতি সাধারণত চ্যাপ্টা। আর, রিজ্‌লী যাহাদের বলিয়াছেন দ্রবিড়, সেই নরগোষ্ঠী তাঁহার মতে সিংহল হইতে গঙ্গার উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায়, ইহাদের মুণ্ডাকৃতি দীর্ঘ, নাসাকৃতি চ্যাপ্টা। রিজ্‌লী মনে করেন, এই দুই নরগোষ্ঠীর মিশ্রণে উৎপন্ন মোঙ্গোল-দ্রবিড় নরগোষ্ঠী বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া আসাম পর্যন্ত এবং উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাদের মাথা গোল হইতে মধ্যমাকৃতি, নাসা মধ্যম হইতে চ্যাপ্টা। ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের ভিতর উন্নত ও সুগঠিত নাসার প্রাধান্য দেখা যায়। মোঙ্গোলীয়দের মাথা প্রশস্ত (অর্থাৎ চওড়া, brachycephalic), কিন্তু তাহাদের নাক চ্যাপ্টা; বাঙালীদের প্রশস্ত মুণ্ডের ধারা মোঙ্গোলীয় শোণিতের দান, আর ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের উন্নত সুগঠিত নাসা ভারতীয় আর্য রক্তের দান, ইহাই হইতেছে রিজ্‌লীর মত্। এই মত অনুসরণ করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর পর্যন্ত সমস্ত পূর্বভারতে মোঙ্গোলীয় প্রভাব উপস্থিত; দ্রবিড় বলিয়া একটি নরগোষ্ঠী আছে এবং ইহাদের মাথা দীর্ঘ —এই দুই নরগোষ্ঠীর সাংকর্যে বাঙালীর উৎপত্তি; কাজেই বাঙালীর মুণ্ডাকৃতি মধ্যম এবং তাহার মধ্যে দুই প্রান্তের গোল ও দীর্ঘ দুই ধারাই বর্তমান। উচ্চ-বর্ণের লোকদের মধ্যে যে উন্নত সুগঠিত নাসামান দেখা যায় তাহা ভারতীয় আর্য রক্তের দান।

রিজ্‌লীর মত যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য মনে না করিবার কারণ অনেক। দ্রবিড় প্রথমত কোনও নরগোষ্ঠীর নাম নয়, এমন কি জনের নামও নয় ভাষাতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগের অন্যতম নাম মাত্র। দ্বিতীয়ত, গঙ্গাতট হইতে আরম্ভ করিয়া সিংহল পর্যন্ত দ্রবিড় ভাষা প্রচলিত নাই; মধ্যভারতের জঙ্গলময় আটবী ও পার্বত্য ভূমিতে অষ্ট্রিক ভাষাভাষী লোকের বাস এখনও বিদ্যমান। তৃতীয়ত, রিজ্‌লী যে-সব তথাকথিত দ্রবিড় উপজাতিদের নাম করিয়াছেন, মস্তিষ্কাকৃতির দিক হইতে তাহারা সকলেই মোটামুটি দীর্ঘমুণ্ড হইলেও প্রত্যেক সমাজের উচ্চতম ক্রমগুলিতে গোল মুণ্ডাকৃতিরও কিছু অভাব নাই। নাসাকৃতিও মোটামুটি উন্নত ও তীক্ষ্ণ হইতে একেবারে চ্যাপ্টা পর্যন্ত। কাজেই দ্রবিড় ভাষাভাষী বিচিত্র জন লইয়া সমষ্টিটাকেই দ্রবিড় বলাটা খুব যুক্তিসংগত নয়। চতুর্থত, রিজ্‌লী যাহাদের বলিয়াছিলেন দ্রবিড়, নরতত্ত্বের বিশ্লেষণে তাহাদের মধ্যে অন্তত দুইটি বিভিন্ন জনের অস্তিত্ব ধরা পড়ে: (১) আদি-নিগ্রোবটু: ইহাদের মাথা দীর্ঘ ও উচ্চ, নাক তীক্ষ্ণ, ও সুউচ্চ, (২) আদি-অষ্ট্রেলীয়: ইহাদের মাথা দীর্ঘ ও অনুচ্চ, নাক মধ্যম। ইহাদের সঙ্গে বাঙালীর জনতত্ত্বের সম্বন্ধ কি এবং কোথায়, এবং থাকিলে কতটুকু সে-আলোচনা পরে করা যাইবে; আপাতত এইটুকু বলা চলে, রিজ্‌লী-কথিত দ্রবিড় নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের কাছে অগ্রাহ্য। রিজ্‌লী-কথিত মোঙ্গোলীয় প্রভাব সম্বন্ধে প্রথমেই বলিতে হয়, বাংলার ও ভারতের পূর্ব ও উত্তরশায়ী প্রত্যন্তদেশগুলির সকল ভোট-চৈনিক গোষ্ঠীর লোকেরাই গোল মুণ্ডাকৃতি নয়। দ্বিতীয়ত, আর্যদের ভারতাগমনের পূর্বে, আর্যভাষা বিস্তৃতিলাভের আগে, বাংলা, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর পর্যন্ত মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোকেরা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, ইতিহাসে এমন কোনও প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দীর্ঘকরোটি কোচ্, পলিয়া, বা উত্তর-বাংলার বাহে, রাজবংশী প্রভৃতি ভোট-চৈনিক গোষ্ঠীর লোকেরা হিমালয় অঞ্চল বা ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা হইতে আসিয়া ঐতিহাসিক যুগেই উপনিবিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয়ত, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার এই সব মোঙ্গোলীয়েরা বেশির ভাগই দীর্ঘমুণ্ড; কাজেই, বাঙালীর মধ্যে যে গোল মুণ্ডাকৃতি দেখা যায় তাহা এইসব মোঙ্গোলীয় জাতির প্রভাবের ফলে হইতেই পারে না। উত্তরের লেপ্‌চা, ভোটানী, চট্টগ্রামের চাক্‌মা প্রভৃতি লোকেরা গোলমুণ্ড বটে, কিন্তু ইহাদেরই রক্তপ্রভাবে যদি বাঙালীর মাথা গোল হইত তাহা হইলে স্বভাবতই এই সব দেশের কাছাকাছি দেশখণ্ড গুলিতেই গোলমুণ্ড, প্রশস্তনাসা বাঙালীদের দেখা যাইত, কিন্তু সত্য এই যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলি বেশি দেখা যায় দক্ষিণে, পূর্বে ও উত্তরে নয়। চতুর্থত, মোঙ্গোলীয় জাতির লোকদের বঙ্কিম চক্ষু, শক্ত চুল, অক্ষিকোণের মাংসের পর্দা 'উন্নত গণ্ডাস্থি, কেশস্বল্পতা, চ্যাপ্টা নাসাকৃতি এবং পীতাভ বর্ণ বাংলাদেশে আমরা আরও বেশি করিয়া গভীর ও ব্যাপকভাবে পাইতাম, যদি যথার্থই মোঙ্গোলীয় প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকিত। পঞ্চমত, বিরজাশংকর গুহ মহাশয় বাংলার উত্তর

ও পূর্বপ্রান্তশায়ী মোঙ্গোলীয় অধিবাসিদের পরিমিতি গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গারো, খাসিয়া, কুকী, এমন কি মৈমনসিংহের উত্তরতম প্রান্তের গারোদের এবং অন্যান্য কোমের লোকদের মুণ্ডাকৃতি মধ্যম, খুব বড় জোর গোলের দিকে একটু ঝোঁক আছে। কাজেই বাঙালীদের মধ্যে যে গোলমুণ্ডের দিকে ঝোঁক তাহা মোঙ্গোলীয় জনদের গোলমুণ্ড অথবা মধ্যমমুণ্ডের প্রভাবের ফল হইতে পারে না। এই সব নানা কারণে রিজ্‌লীর মোঙ্গোলীয়-দ্রবিড় সাংকর্যের মত এখন আর গ্রাহ্য নয়।

কিন্তু, রিজ্‌লী বাঙালীর জনতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশে খুব ভুল কিছু করেন নাই; ভুল করিয়াছিলেন সেই বৈশিষ্ট্যের মূল অনুসন্ধানে। মূল যে মোঙ্গোলীয়-দ্রবিড় সংমিশ্রণের মধ্যে নাই, এবিষয়ে নরতত্ত্ববিদেরা এখন আর কিছু সন্দেহ করেন না; সেই মূলের সন্ধান পাওয়া যায় ভারতীয় নরতত্ত্বের নব-নির্ণীত ইতিহাসের মধ্যে। কাজেই, তাহার পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক নয়। এই নব-নির্ণীত ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ ও নির্দোষ নয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতীয় নরতত্ত্বের এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর জনরহস্যের মোটামুটি কাঠামোটা আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়িতে বাধে না।

৩

নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন ভারতীয় জনসৌধের প্রথম স্তর নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জন। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এবং মালয় উপদ্বীপে যে নেগ্রিটো জনের বসবাস ছিল এ তথ্য বহু পুরাতন। কিছুদিন আগে হাটন, লাপিক (Lapique) ও বিরজাশংকর গুহ মহাশয় দেখাইয়াছিলেন যে, আসামের অঙ্গমি নাগাদের মধ্যে এবং দক্ষিণ ভারতের পেরাম্বকুলম এবং আন্নামালাই পাহাড়ের কাদার ও পুলায়ানদের ভিতর নিগ্রোবটু রক্তপ্রবাহ স্পষ্ট। ভারতীয় নিগ্রোবটুদের দেহবৈশিষ্ট্য কিরূপ ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় কম, কারণ বহুযুগ পূর্বেই ভারতবর্ষের মাটিতে তাহারা বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তবে, বিহারের রাজমহল পাহাড়ের আদিম অধিবাসীদের কাহারও কাহারও মধ্যে কখনও কখনও যে-ধরনের ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণাভ ঘনশ্যাম, ঊর্ণাবৎ কেশযুক্ত, দীর্ঘ মুণ্ডাকৃতির দেহবৈশিষ্ট্য দেখা যায়, কাদারদের মধ্যে যে মধ্যমাকৃতি নরমুণ্ডের দর্শন মেলে, তাহা হইতে এই অনুমান করা যায় যে, ভারত ও বাংলার নিগ্রোবটুরা দেহগঠনে কতকটা তাহাদের প্রতিবাসী নিগ্রোবটুদের মতনই ছিল; বিশেষভাবে, মালয় উপদ্বীপের সেমাং জাতির দেহগঠনের সঙ্গে তাহাদের সাদৃশ্য ছিল বলিয়া গুহ মহাশয় অনুমান করেন। বাংলার পশ্চিম প্রান্তে রাজমহল পাহাড়ের বাগ্‌দীদের মধ্যে, সুন্দরবনের মৎস্যশিকারী নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে, মৈমনসিংহ ও নিম্নবঙ্গের কোনও কোনও স্থানে কচিৎ কখনও, বিশেষভাবে সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকদের ভিতর, যশোহর জেলার বাঁশফোড়দের মধ্যে মাঝে মাঝে যে কৃষ্ণাভ ঘনশ্যামবর্ণ, প্রায় ঊর্ণাবৎ কেশ, পুরু উল্টানো

ভারতীয় জনতত্ত্বে বাঙালীর স্থান

াট্ট, খর্বকায়, অতি চ্যাপ্টা নাকের লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তো নিগ্রোবটু রক্তেরই ফল বলিয়া মনে হয়। নিগ্রোবটুদের এই বিস্তৃতি হইতে অনুমান করা চলে যে, এখন তাহাদের অবশেষ প্রমাণসাপেক্ষ হইলেও এক সময়ে এই জাতি ভারতবর্ষে এবং বাংলার স্থানে স্থানে সুবিস্তৃত ছিল। কিন্তু বিচিত্র জনসংঘর্ষের আবর্তে তাহারা টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই। জর্মান পণ্ডিত ফন্ আইকস্টেড্ট্ কিন্তু ভারতবর্ষে নিগ্রোবটুদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, এদেশে সন্ধান-সম্ভাব্য আদিমতম স্তরে নিগ্রোবটুসম অর্থাৎ কতকটা ঐ ধরনের দেহলক্ষণবিশিষ্ট একটি নরগোষ্ঠীর বিস্তার ছিল, কিন্তু তাহারা যে নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু নরগোষ্ঠীরই লোক, একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

নিম্নবর্ণের বাঙালীর এবং বাংলার আদিম অধিবাসীদের ভিতর যে-জনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি, নরতত্ত্ববিদেরা তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন আদি-অস্ট্রেলীয় (proto-Australoid)। তাঁহারা মনে করেন যে, এই জন এক সময় মধ্য-ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-ভারত, সিংহল হইতে একেবারে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোটামুটি ভাবে ইহাদের দেহ-বৈশিষ্ট্যের স্তরগুলি ধরা পড়ে ভারতবর্ষের, বিশেষভাবে মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে, সিংহলের ভেড্ডাদের মধ্যে এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে। এই তথ্যই বোধ হয় আদি-অস্ট্রেলীয় নামকরণের হেতু। যাহা হউক, মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতের আদিম অধিবাসীরা যে খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্তনাস, তাম্রকেশ এই আদি-অস্ট্রেলীয়দের বংশধর এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। পশ্চিম-ভারতে এবং উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশে যে-সব লোকের স্থান হিন্দু সমাজবিন্যাসের প্রান্ততম সীমায় তাহারা, মধ্য-ভারতের কোল, ভীল, করোয়া, খারওয়ার, মুণ্ডা, ভূমিজ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি লোকেরা, দক্ষিণ-ভারতের চেঞ্চু, কুরুব, য়েরুব প্রভৃতি লোকেরা সকলেই সেই আদি-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর লোক। বেদে যে নিষাদদের উল্লেখ আছে, বিষ্ণু-পুরাণে যে নিষাদদের বর্ণনা করা হইয়াছে অঙ্গার-কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায়, চ্যাপ্টামুখ বলিয়া, ভাগবত-পুরাণ যাহাদের বর্ণনা করিয়াছেন কাককৃষ্ণ, অতি খর্বকায়, খর্ববাহু, প্রশস্তনাস, রক্তচক্ষু এবং তাম্রকেশ বলিয়া—সেই নিষাদরাও আদি-অস্ট্রেলীয়দেরই বংশধর বলিয়া অনুমান করিলে অন্যায় হয় না। পুরাণোক্ত ভীল্ল-কোল্লরাও তাহাই। বর্তমান বাংলাদেশের, বিশেষভাবে রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা, বাঁশফোড়, মালপাহাড়ী প্রভৃতিরা যে সেই আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে সম্পৃক্ত এ-অনুমান নরতত্ত্ববিরোধী নয়। এই আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে পূর্বতন নিগ্রোবটুদের কোথায় কোথায় কতখানি রক্তমিশ্রণ ঘটিয়াছিল তাহা বলা কঠিন, তবে কোথাও কোথাও কিছু কিছু যে ঘটিয়াছিল তাহা অনস্বীকার্য। তাহা না হইলে মধ্য-ভারতের, দক্ষিণ-ভারতের এবং বাংলা দেশের আদি-অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে দেহ-বৈশিষ্ট্যের যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহার যথেষ্ট ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে বলা উচিত, ফন্ আইক্স্টেড্ট্ মোটামুটি এই আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর যে অংশ মধ্য ও পূর্ব-ভারতবর্ষের অধিবাসী তাহাদের

নামকরণ করিয়াছেন 'কোলিড্' এবং সিংহলীয় অংশের 'ভেড্ডিড্'। 'কোলিড্' বা 'কোলসম' নামকরণ ভারতীয় ঐতিহ্যের সমর্থক; সেই কারণে আইক্‌স্টেড্‌টের এই নামকরণ গ্রহণযোগ্য।

ভারতবর্ষের জনবহুল সমতল স্থানগুলিতে যে জনের বাস তাহাদের মধ্য হইতে পূর্বোক্ত আদিম অধিবাসীদের দেহলক্ষণগুলি বাদ দিলে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। এই জনের লোকেরা দেহদৈর্ঘ্যে মধ্যমাকৃতি, ইহাদের মুণ্ডাকৃতি দীর্ঘ ও উন্নত, কপাল সংকীর্ণ, মুখ খর্ব এবং গণ্ডাস্থি উন্নত, নাসিকা লম্বা ও উন্নত কিন্তু নাসামুখ প্রশস্ত, ঠোঁট পুরু এবং মুখগহ্বর বড়, চোখ কালো এবং গায়ের চামড়া সাধারণত পাত্‌লা হইতে ঘন বাদামী। দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ লোক এবং উত্তর-ভারতের নিম্নতর শ্রেণীর প্রায় সকলেই উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দীর্ঘমুণ্ড জনের বংশধর এবং এই দীর্ঘমুণ্ড জনেরাই ভারতীয় জন-প্রবাহে যে দীর্ঘমুণ্ড ধারা বহমান তাহার উৎস। বাংলাদেশেও উত্তম ও মধ্যম সংকর এবং অন্ত্যজ পর্যায়ে যে দীর্ঘমুণ্ডের ধারাচিহ্ন দেখা যায়, তাহাও মূলত এই নরগোষ্ঠীরই দান। এই গোষ্ঠীর আদি বাসস্থান কোথায় এবং বিস্তৃতি কোথায় ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই, তবে বিরাজশংকর গুহ মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এক সময় এই দীর্ঘমুণ্ড গোষ্ঠী উত্তর-আফ্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম দেশগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; পরে নব্যপ্রস্তর যুগে ইহারা ক্রমশ মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতে বিস্তৃতি লাভ করে এবং এইসব দেশে আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে ইহাদের কিছু রক্ত সংমিশ্রণ ঘটে।

এই সদ্যকথিত জন ছাড়া আরও দুইটি দীর্ঘমুণ্ড জন কিছু পরবর্তী কালেই ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই দুই জনের কিছু কিছু কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গিয়াছে সিন্ধু নদীর উপত্যকায়। মাকরান্, হরপ্পা ও মহেন্-জো-দড়োর নিম্নস্তরে প্রাপ্ত কঙ্কালগুলি হইতে মনে হয় ইহাদের মধ্যে একটির দেহগঠন ছিল সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ, মগজ বড়, ভ্রূ-অস্থি স্পষ্ট, কানের পেছনের অস্থি বৃহৎ। এই সব দেহলক্ষণ পঞ্জাবের সমরকুশল, দৃঢ় ও বলিষ্ঠ কোনও কোনও শ্রেণী ও বর্ণের ভিতর এখনও দেখা যায়। কিন্তু এই জন পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে আর অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয় দীর্ঘমুণ্ড জনের পরিচয়ও মহেন্-জো-দড়োর কোনও কোনও কঙ্কালাবশেষ হইতেই পাওয়া যায়। এই জনের লোকদের দেহগঠন তত সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ নয়, বরং ইহারা দৈর্ঘ্যেও একটু খর্ব, কিন্তু মুখাবয়ব তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট, নাসিকা তীক্ষ্ণ ও উন্নত, কপাল ধনুকের মত বঙ্কিম। ইহাদের মধ্যে ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর দেহলক্ষণের সাদৃশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট, এবং অনুমান করা যায়, সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার যে-পরিচয় হরপ্পা ও মহেন্-জো-দড়োতে আমরা পাইয়াছি তাহা ইহাদেরই সৃষ্টি। উত্তর-ভারতে সর্বত্র সকল বর্ণের মধ্যেই, বিশেষভাবে উচ্চবর্ণের লোকদের ভিতর, এই দীর্ঘমুণ্ড নরবংশের রক্তধারা প্রবহমাণ এবং এই রক্তপ্রবাহের তারতম্যের ফলেই উত্তর-

ারত ও দক্ষিণ-ভারতের লোকদের মধ্যে দেহ-গঠনের সুস্পষ্ট তারতম্য দেখা যায়, যদিও ক্ষিণ-ভারতে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এ-ধারার কিছুটা অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। াংলাদেশে এই দীর্ঘমুণ্ড জনের রক্ত-প্রবাহের ধারা কতখানি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল তাহা নশ্চয় করিয়া বলা যায় না; কতকটা স্রোতস্পর্শ যে লাগিয়াছিল সে-সম্বন্ধে সন্দেহ কি?

উপরোক্ত দীর্ঘমুণ্ড জনেরা যে জনস্তর গড়িয়া তুলিয়াছিল, উত্তর-পশ্চিম হইতে তাহার উপর এক গোলমুণ্ড জন আসিয়া নিজেদের রক্তপ্রবাহ সঞ্চারিত করিল; মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইহাদের সঙ্গে গোলমুণ্ড মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর কোনই সম্বন্ধ নাই। এই জনের সর্বপ্রাচীন সাক্ষ্য সংগৃহীত হইয়াছে হরপ্পা ও মহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত মুণ্ড-কঙ্কাল হইতে। ইহাদের সঙ্গে পূর্ব-ইউরোপের দীনারীয় এবং কতকাংশে আর্মানীয় জাতির সম্বন্ধ সুস্পষ্ট। এই জাতিই লাপোং (De Lapong), রিপ্‌লী (Ripley), লুস্‌সান্ (Luschan) ও রমাপ্রসাদ চন্দ-কথিত অ্যালপাইন (Homo Alpinus) নরগোষ্ঠী, বিরজাশংকর গুহ-কথিত অ্যাল্‌পো-দীনারীয় নরগোষ্ঠী, ফন্ আইক্‌স্টেড্‌ট্-কথিত পশ্চিম ও পূর্ব 'ব্র্যাকিড্' বা গোলমুণ্ড নরগোষ্ঠী। বাংলা দেশের উচ্চবর্ণের ও উত্তম সংকর বর্ণের জনসাধারণের মধ্যে যে গোল ও মধ্যম মুণ্ডাকৃতি, তীক্ষ্ণ ও উন্নত এবং মধ্যম নাসাকৃতি ও মাধ্যমিক দেহদৈর্ঘ্যের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনেকাংশে এই নরগোষ্ঠীরই দান। বস্তুত, বাংলাদেশের যে জন ও সংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রায় সমগ্র মূল রূপায়নই প্রধানত অ্যালপাইন ও আদি-অষ্ট্রেলীয়, এই দুই জনের লোকদের কীর্তি। পরবর্তীকালে আগত আর্যভাষাভাষী আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ ও সংস্কৃতি তাহার উপরের স্তরের একটি ক্ষীণ প্রবাহ মাত্র এবং এই প্রবাহ বাঙালীর জীবন ও সমাজ-বিন্যাসের উচ্চতর স্তরেই আবদ্ধ; ইহার ধারা বাঙালীর জীবন ও সমাজের গভীর মূলে বিস্তৃত হইতে পারে নাই। যাহাই হোক, পামীর মালভূমি, তাক্‌লাকামান্ মরুভূমি, আল্পস্ পর্বত, দক্ষিণ-আরব ও ইউরোপের পূর্বদেশবাসী এই অ্যালপাইন জনের বংশধরেরা বর্তমান ভারতবর্ষে ছড়াইয়া আছে নানাস্থানে—গুজরাটে, কর্ণাটে, মহারাষ্ট্রে, কুর্গে, মধ্যভারতে, বিহারে, 'নাগর' ব্রাহ্মণদের মধ্যে, বাংলায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এবং উপরের বর্ণস্তরের সকল লোকদের মধ্যে। সর্বত্র সমানভাবে একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নাই, একথা সত্য; কিন্তু ভারতবর্ষে গোলমুণ্ড, উন্নতনাস মানুষের রক্তধারা যেখানে যে-পরিমাণে আছে তাহার মূলে এই গোলমুণ্ড, উন্নতনাস অ্যালপাইন নরগোষ্ঠী উপস্থিত। ফন্ আইক্‌স্টেড্‌টের মতে এই নরগোষ্ঠীর তিন শাখা: পশ্চিম ব্র্যাকিড্ যাহাদের বংশধর বর্তমান মহারাষ্ট্র ও কুর্গের অধিবাসীরা, গাঙ্গেয় উপত্যকার দীর্ঘদেহ ব্র্যাকিড্‌রা এবং বাংলা ও উড়িষ্যার পূর্ব ব্র্যাকিড্‌রা। এই তিন শাখাই, তাঁহার মতে, আর্যভাষী 'ইণ্ডিড্' নামক বৃহত্তর নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু যে-জন বিশিষ্ট ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্মদাতা এবং যাহারা পূর্বতন

ভারতীয় সংস্কৃতির আমূল রূপান্তর সাধন করিয়া তাহাকে নবকলেবর নবরূপ দান করিয়াছিল, তাহারা এই অ্যালপাইন নরগোষ্ঠী হইতে পৃথক। এই নূতন জনের নরতত্ত্ববিদদত্ত নাম হইতেছে আদি-নর্ডিক্ (proto-Nordic)। এই আদি-নর্ডিক্ জনই বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টিকর্তা। ভারতবর্ষে ইহাদের সুপ্রাচীন কোনও কঙ্কালাবশেষ আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে, তক্ষশিলার ধর্মরাজিক বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে কয়েকটি নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে অনুমান হয়, ইহাদের মুখাবয়ব দীর্ঘ, সুদৃঢ় ও সুগঠিত নাসিকা সংকীর্ণ ও সুউন্নত, মুণ্ডাকৃতি দীর্ঘ হইলেও গোলের দিকে ঝোঁক সুস্পষ্ট এবং নীচের দিকের চোয়াল দৃঢ়। মাথার খুলি এবং মুখাবয়ব হইতে মনে হয়, ইহাদের দেহ ছিল খুব বলিষ্ঠ ও দৃঢ়সংবদ্ধ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান, হিন্দুকুশ পর্বতের কাফীর প্রভৃতি কোমের লোকেরা, পঞ্জাব ও রাজপুতনার উচ্চশ্রেণী ও বর্ণের লোকেরা ইহাদেরই বংশধর, যদিও শেষোক্ত দুই স্থানে পূর্বতন দীর্ঘমুণ্ড জাতির সঙ্গে ইহাদের সংমিশ্রণ একটু বেশি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে সর্বত্রই ইহাদের ধারাচিহ্ন পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সর্বত্র খুব বলিষ্ঠ ও বেগবান নয়। উত্তর-য়ুরোপের নর্ডিক জাতির সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তবে পার্থক্যও আছে, বিশেষভাবে চুল ও গায়ের রঙে। ভারতীয় নর্ডিক জাতির চুলের রং সাধারণত ঘন বাদামী হইতে ঘনকৃষ্ণ এবং চামড়া বাদামী হইতে রক্তিম গৌর। উত্তর-য়ুরোপের নর্ডিকদের চামড়া রক্তিম শ্বেত এবং কেশ পাত্‌লা বাদামী হইতে শ্বেতোপম। এই পার্থক্য কতকটা জলবায়ু-নির্ভর সন্দেহ নাই, কিন্তু মূলত কতকটা পূর্বাপর ইতিহাসগত তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সম্ভবত, বৈদিক আর্যসভ্যতার নির্মাতা নর্ডিকেরাই আদি-নর্ডিক, এবং ইহারাই পরবর্তী কালে উত্তরে য়ুরোপখণ্ডে গিয়া ক্রমশ নূতন দেহলক্ষণ উদ্ভব করিয়াছিল। ফন্ আইক্‌স্টেড্‌ট্ এই বলিষ্ঠ ও দুর্জয় নরগোষ্ঠীর নামকরণ করিয়াছেন 'ইণ্ডিড্'। যাহাই হউক, ইহাদেরই আর্য ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঐতিহাসিক কালে বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে বাংলাদেশে সঞ্চারিত হইয়া পূর্বতন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করিয়া নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু বাঙালীর রক্ত ও দেহগঠনে এই আদি-নর্ডিক জনের রক্ত ও দেহগঠন-বৈশিষ্ট্যের দান অত্যন্ত অল্প; সে ধারা শীর্ণ ও ক্ষীণ, এত শীর্ণ ও ক্ষীণ যে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও তাহা খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সত্ত্বেও সহসা ধরা পড়ে না। বর্তমান যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতনা বা পঞ্জাবের যুক্তপ্রদেশের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নরতত্ত্বের দিক হইতে বাঙালী ব্রাহ্মণের কোন সম্বন্ধই যে প্রায় নাই তাহার কারণ এই তথ্যের মধ্যে নিহিত। ঐ সব দেশের ব্রাহ্মণেরা যে সামাজিক ক্ষেত্রে বাঙালী ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের সম্পূর্ণ দাবি স্বীকার করেন না তাহার অন্যতম কারণ এই জন-পার্থক্য নয় কি?

ইহা ছাড়াও আর একটি খর্বদেহ দীর্ঘমুণ্ড জাতির অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন নরতত্ত্ববিদ্ ফিশার (Fischer) সাহেব, এবং ইহাদের নামকরণ করিয়াছেন প্রাচ্য বা

Oriental বলিয়া। ইহারা পাতলা গৌর, কিন্তু ইহাদের চুল ও চোখ কৃষ্ণবর্ণ এবং নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত। উত্তর আফগানিস্থানের বাদক্ষীরা দীর্ হইতে খাইবার গিরিবর্ত্ম পর্যন্ত যে সব লোক বাস করে, চিত্রল হইতে হিমালয়ের সানুদেশ ধরিয়া নেপালের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত যে সব পার্বত্য জনের বাস, ইহারা সকলেই কমবেশি সেই প্রাচ্য জনের বংশধর। পঞ্জাবে হিন্দু সমাজের কোন কোন শ্রেণীতে এবং মুসলমানদের উচ্চশ্রেণীতে এই জনের শীর্ণ প্রবাহ কিছুটা ধরা পড়ে, কিন্তু বাংলাদেশে ইহাদের রক্তধারা আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই, এমন কি পর্বতশায়ী উত্তরাংশেও নয়। ফন্ আইকস্টেড্‌ট এই নরগোষ্ঠীর নামকরণ করিয়াছেন 'উত্তর-ইণ্ডিড্' বলিয়া; এবং ডেনিকার ও জিউফ্রিডা-রাগ্‌গেরী ইহাদেরই বোধ হয় বলিয়াছেন 'ইন্দো-আফগানীয়'।

মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পরবর্তী ঐতিহাসিক কালে। এই সব মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতবর্ষের জনপ্রবাহে ইহাদের স্পর্শ গভীরভাবে কোথাও লাগে নাই, একমাত্র আসাম, উত্তরে হিমালয়শায়ী নেপাল-ভোটান এবং পূর্ব প্রান্তে ব্রহ্মদেশশায়ী প্রত্যন্ত জনপদ ও অরণ্যবাসী লোকদের মধ্যে ছাড়া। চৈনিক তুর্কীস্থানের তুর্কী ভাষাভাষী অথবা খিরগিজ, উজবেক প্রভৃতি লোকদের মত যথার্থ মোঙ্গোলীয় জন বা কোম আজ পর্যন্ত ভারতীয় নরতত্ত্বের বহির্ভূত। তবে উত্তরে হিমালয় সানুদেশবাসী লিম্বু, লেপচা, রংপা প্রভৃতি কোমের লোকদের মধ্যে তিব্বতী রক্তধারা সুস্পষ্ট। ইহাদের দেহাকৃতি মধ্যম হইতে দীর্ঘ, মুণ্ডাকৃতি গোল, গণ্ডাস্থি উন্নত এবং নাসিকাকৃতি দীর্ঘ ও চ্যাপ্টা। নেপালেও এই রক্তধারার প্রভাব ধরা পড়ে, তবে উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে ক্রমশ ক্ষীয়মাণ।

আসামের উত্তর ও পূর্বপ্রান্তশায়ী পার্বত্য দেশগুলিতে আবার একটি পৃথক মোঙ্গোলীয় রক্তধারার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের মুণ্ডাকৃতি গোল নয়, গোলের ঠিক উল্টা অর্থাৎ দীর্ঘ, এবং অক্ষিপুট সম্মুখীন। ইহারা যে মোঙ্গোলীয় তাহার প্রমাণ ইহাদের চ্যাপ্টা নাক, উন্নত গণ্ডাস্থি, বঙ্কিম চক্ষু, উদ্দণ্ড কেশ এবং কেশবিহীন দেহ ও মুখমণ্ডল। দক্ষিণ-পশ্চিম চীন হইতে ইহারা ক্রমশ ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও পূর্বদক্ষিণ সমুদ্রশায়ী দেশ ও দ্বীপগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; পথে উত্তর-পূর্ব আসামে এবং উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিরি, নাগা, বোদো বা মেচ প্রভৃতি লোকদের ভিতর, কোচ, পালিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি লোকদের ভিতর ইহাদের একটি ধারাপ্রবাহ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। আসামে এই ধারা সর্বত্রই সমাজের সকল স্তরেই প্রবহমাণ, তবে উচ্চবর্ণগুলির ভিতর গোলমুণ্ড অ্যালপাইন এবং কিছু পরিমাণে দীর্ঘমুণ্ড আদি-নর্ডিক ধারাও সুস্পষ্ট, এবং শেষোক্ত দুই ধারাই আসামের হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাধৃত ধারাটির একটি প্রবাহ ঐতিহাসিককালে বাংলাদেশে আসিয়া ঢুকিয়া পড়ে, এবং রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে এইভাবেই খানিকটা মোঙ্গোলীয় প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু তাহা সাধারণত সমাজের নিম্নস্তরে।

কিন্তু, ব্রহ্মদেশে যে মোঙ্গোলীয় জনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, তাহারা খর্বদেহ, তাঁহাদের মুণ্ডাকৃতি গোল, দীর্ঘ নয়, এবং চামড়ার রং আরও ঘোর। দীর্ঘমুণ্ড অহোমীয় মোঙ্গোলীয়দের সঙ্গে ইহাদের আত্মীয়তা থাকিলেও ইহারা একগোত্রীয় নয়; বরং ব্রহ্মদেশীয় গোলমুণ্ড মোঙ্গোলীয়দের সঙ্গে সমগোত্রীয়তা আছে ত্রিপুরা জেলার চাকমাদের, টিপ্‌রাইদের, এবং আরাকানের এবং চট্টগ্রামাঞ্চলের মগদের। বাংলাদেশের অন্যত্র কোথাও এই ব্রহ্ম-মোঙ্গোলীয় প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না এবং বাংলার জনগণের রক্তপ্রবাহে ইহারা বিশেষ কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই।

ভারতবর্ষের নরগোষ্ঠীপ্রবাহ সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, পাশ্চাত্য ও ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকেরা মোটামুটি তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে লাইপ্‌ত্‌সিগ স্যাক্সন ইনস্টিটিউটের ভারতীয় নৃতত্ত্বাভিযানের নেতা ব্যারন্ ফন্ আইক্‌স্টেড্‌ট্ সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া যে সুবিস্তৃত শারীর-পরিমিতি গণনা করিয়াছেন, তাহার ফলে ভারতীয় নরগোষ্ঠী-প্রবাহে কিছু নূতন আলোকপাত হইয়াছে। ফন্ আইকস্টেড্‌টের বিশ্লেষণ ও মতামত আমাদের দেশে বহুল প্রচারিত নয়; অথচ নানা কারণে তাঁহার মতামত আলোচিত হইবার দাবি রাখে। প্রথমত, ভারতীয় নরতত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার গণনা ও বিশ্লেষণের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তিনিই সকলের চেয়ে বেশি সংখ্যায় পরিমিতি লইয়াছেন। তৃতীয়ত, সমস্ত পরিমিতি একই মানদণ্ডানুযায়ী গৃহীত হইয়াছে; এবং চতুর্থত, যে বিচারপদ্ধতি অনুযায়ী পরিমিতি বিশ্লেষিত হইয়াছে তাহা একান্ত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। পূর্বতন সকল মতামত বিচার করিয়া এবং সুবিস্তৃত ও সুগভীর গবেষণার ফলে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয় লওয়া এ-প্রসঙ্গে অবান্তর নয়। তিনি বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর যে নামকরণ করিয়াছেন, তাহা অনন্যপূর্ব না হইলেও একটু অসাধারণ; কিন্তু, কিছু গভীর ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, নামকরণ যাহাই হোক, বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর যে যে বিশিষ্ট দেহলক্ষণের উপর এই নামকরণের নির্ভর সেই দেহলক্ষণ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতের বিভিন্নতা খুব বেশি নাই। শ্রেণী নির্ধারণ সম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা অবশ্যই লক্ষণীয়।

ফন্ আইকস্টেড্‌টের মতে ভারতবর্ষে মোটামুটি তিনটি নরগোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ উপস্থিত। প্রত্যেক গোষ্ঠীতেই কয়েকটি শাখাগোষ্ঠী সংলগ্ন।

(১) ভেড্ডিড্ বা ভেড্ডীয় নরগোষ্ঠী—উত্তর-দাক্ষিণাত্যের পাত্‌লা রং ও বলিষ্ঠ গড়নের উত্তর-গোণ্ডীয় লোকেরা এবং দক্ষিণ-ভারতের ঘোরকৃষ্ণ 'মেলিড' ও সিংহলের ভেড্ডারা এই ভেড্ডিড্ বা ভেড্ডীয় নরগোষ্ঠীর শাখা। লক্ষণীয় যে, কোল-মুণ্ডা নরগোষ্ঠীকে ফন্ আইক্‌স্টেড্‌ট্ এই বৃহত্তর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিতেছেন না।

(২) 'মেলানিড্' বা ভারতীয় 'মেলানিড্'—এই নরগোষ্ঠীর প্রধান বাসস্থান দক্ষিণ-ভারতের সমতল প্রদেশ এবং বর্তমান তামিলভাষী লোকেরা ইহাদের বংশধর। উত্তরে

হো'দের মধ্যে এই 'মেলানিড্' রক্তস্পর্শ সুস্পষ্ট এবং আরও উত্তরে গাঙ্গেয় উপত্যকায় ইহাদের কোনও কোনও ক্ষুদ্রতর শাখার দর্শন দুর্লভ নয়, বিশেষত, তথাকথিত নিম্নজাত্দের ভিতর। কোলীয়রাও ইহাদেরই একটি সুবৃহৎ শাখা। এই হিসাবে ফন্ আইক্স্টেড্ট্ কোল-মুণ্ডা নরগোষ্ঠীকে বর্তমান দ্রবিড়ভাষী 'মেলানিড্' নরগোষ্ঠীর আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেছেন; কোল-মুণ্ডা-খাসিয়ারা যে অন্য পৃথক নরগোষ্ঠীর লোক তাহা বলিতেছেন না। তাহা ছাড়া, অন্যান্য নৃতাত্ত্বিকেরা বর্তমান দ্রবিড়ভাষী লোকদের যে দেহলক্ষণ সমূহের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের সঙ্গে ভারতবহির্ভূত মিশর-এশীয় বা ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর আত্মীয়তার সন্ধান পাইতেছেন, মোটামুটি সেই দীর্ঘমুণ্ড উন্নতনাস নরগোষ্ঠীর লোকদেরই তিনি বলিতেছেন ভারতীয় 'মেলানিড্'।

(৩) 'ইণ্ডিড্' বা ভারতীয় নরগোষ্ঠী—ইহাদের প্রধানত তিন শাখা: (ক) যথার্থ 'ইণ্ডিড্'; ইহারাই মোটামুটি যাহাদের আগে বলা হইয়াছে আদি-নর্ডিক; (খ) উত্তর 'ইণ্ডিড্'; অর্থাৎ, মোটমুটিভাবে ফিশার যাহাদের বলিয়াছেন প্রাচ্য বা 'ওরিয়েণ্টাল'; এবং (গ) 'ব্র্যাকিড্'; ইহারা আর একটি গোলমুণ্ড নরগোষ্ঠী, অর্থাৎ মোটামুটিভাবে আগে যাহাদের আগে বলা হইয়াছে অ্যালপাইন বা আল্পো-দীনারীয়। এই 'ব্রাকিড্'দের আবার তিন উপধারা; (অ) মহারাষ্ট্র দেশের 'পশ্চিম ব্রাকিড', (আ) বাংলা ও উড়িষ্যার 'পূর্ব ব্রাকিড্', এবং (ই) গাঙ্গেয় উপত্যকার 'দীর্ঘদেহ ব্রাকিড্'। যথার্থ 'ইণ্ডিড্'দের বিস্তার বিনশন-প্রয়াগধৃত আর্যাবর্তে বা মধ্যদেশে, দক্ষিণ ভারতের কেরল ভূমিতে এবং মিশ্রিতরূপে সিংহল দ্বীপেও।

ফন্ আইকস্টেড্ট্ আরও বলেন যে, দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাংশের কোনও কোনও অধিবাসীদের ভিতর আদি-মোঙ্গোলীয় রক্তপ্রভাব সুস্পষ্ট, এবং তাহা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক কোলভাষী লোকদের রক্তধারা দ্বারা স্পৃষ্ট। এই আদি-মোঙ্গোলীয় প্রভাব ভারতবর্ষের সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত নয়, তবে এখানে ওখানে আকীর্ণ চিহ্ন পৃথক পৃথক ভাবে নানাস্থানে ধরা পড়ে। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষে এই মোঙ্গোলীয় প্রভাব খুব সুপ্রাচীন নয়।

দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসীরা, তাঁহার মতে, নৃতত্ত্বের দিক হইতে অধিকতর সমন্বিত, এবং সমন্বয়ের মূল ভিত হইতেছে সুবিস্তৃত আদিমতম নেগ্রিড্ রক্তপ্রবাহ। এই সমন্বিত নরগোষ্ঠীই ফন্ আইকস্টেড্ট্ কথিত 'মেলানিড্' নরগোষ্ঠী এবং তাহাদেরই বংশধর বর্তমান মধ্যস্তরের তামিল। উচ্চ ও নিম্নস্তরে এই সমন্বয়ের সমগ্র ও সুস্পষ্ট রূপটি ধরা পড়ে না, কারণ উভয় স্তরেই অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক বা প্রাচীনতর কালের অন্য নরগোষ্ঠীর রক্তস্পর্শ লাগিয়াছে—উচ্চস্তরে বোধ হয় 'ইণ্ডিড্দের' এবং নিম্নস্তরে প্রাচীনতর 'মালিড্'দের। এই 'মালিড্'রা পর্বতবাসী ভেড্ডিড নরগোষ্ঠীর সঙ্গে কমবেশি আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। ইহাদের কাহারও মধ্যেই অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের নিগ্রোবটু রক্তস্পর্শের চিহ্নমাত্র নাই,

যদিও আদিমতম নিগ্রোবটু রক্তস্পর্শের কমবেশি প্রভাব সকলের মধ্যেই আছে, তবে সে প্রভাবও বহুদিন আগেই শুকাইয়া উবিয়া গিয়াছে।

সংখ্যায় ও বিস্তৃতিতে ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ নরগোষ্ঠী হইতেছে 'ইণ্ডিড্'রা। ফন্ আইক্স্টেড্টের মতে ইহারাই প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার উত্তরাধিকারী এবং দ্রবিড় ও বিশিষ্ট "ভারতীয়" আত্মিক সাধনার যথার্থ প্রতিনিধি। 'ইণ্ডিড্' নরগোষ্ঠীর উত্তর-পশ্চিমাংশ বারবার মধ্য এসিয়ার নানা জন ও কোম দ্বারা আক্রান্ত ও পর্যুদস্ত হইয়াছে; আর্যভাষা কিন্তু তাহাতে কখনও শিথিলমূল হয় নাই, বরং তাহার প্রতাপ বরাবরই অম্লান ও অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু আর্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ও মানস-সংস্কৃতি বারবার রূপান্তর ও সমন্বয় লাভ করিয়াছে। আর্যভাষাকে আশ্রয় করিয়া কিছু নর্ডিক রক্তপ্রবাহ, পরবর্তীকালে কিছু শক ও হূণ রক্তপ্রবাহ এবং আরও পরবর্তীকালে মুসলমান অভিযান আশ্রয় করিয়া কিছু 'ওরিয়েণ্টাল' বা প্রাচ্য নরগোষ্ঠীর রক্তধারা 'ইণ্ডিড্' প্রবাহে সঞ্চারিত হইয়াছে। মূলে এই 'ইণ্ডিড্' নরগোষ্ঠী আদিমতম ভেড্ডীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে সংপৃক্ত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই উত্তর হইতে 'ইণ্ডিড্'দের দক্ষিণমুখী চাপে ক্রমশ 'মেলানিড্' নরবংশের সৃষ্টি এবং ভেড্ডিড্দের চাপে ক্রমশ 'মালিড্'দের।

'ইণ্ডিড্' ও 'মেলানিড্' নরগোষ্ঠী ও তাহাদের ভাষা সম্বন্ধে ফন্ আইকস্টেড্টের উক্তি উদ্ধারযোগ্য এবং আমার মনে হয়, দ্রবিড়ভাষীদের নরতত্ত্ব সম্বন্ধে একান্ত সাম্প্রতিক কালেও নরতাত্ত্বিকদের মধ্যে যে জিজ্ঞাসা বর্তমান তাহার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা এই উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়।

> "The originally Dravidian Indids, whose descendants adopted the Aryan language, pushed over the Melanids, who in their turn adopted Dravidian idioms for which they are now the typical representatives. So, race and language do no more in India in any way coincide. Races remained, but languages were shoven southward...The disturbing results of the idea of a Dravidian "race" are therefore easy to understand. The Dravida speakers of today are no more the same as four millenniums ago. At that time they were of Indid race, today they are prevailingly of Melanid race."

এই সুদীর্ঘ জাতিপ্রবাহের ইতিহাস আলোচনায় একটি তথ্য সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। সেটি এই: নরতত্ত্বের দিক হইতে বাংলার জনসমষ্টি মোটামুটি দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্তনাস আদি-অস্ট্রেলিয় বা 'কোলিড্', দীর্ঘমুণ্ড, দীর্ঘ ও মধ্যোন্নত নাস মিশর-এশীয় বা 'মেলানিড্', এবং বিশেষভাবে গোলমুণ্ড উন্নতনাস অ্যালপাইন বা 'পূর্ব ব্রাকিড্', এই তিন জনের সমন্বয়ে গঠিত। নিগ্রোবটু রক্তেরও স্বল্প প্রভাব উপস্থিত, কিন্তু তাহা সমাজের খুব নিম্নস্তরে এবং সংকীর্ণ স্থানগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। মোঙ্গোলীয় রক্তের কিছুটা প্রভাবও আছে, কিন্তু তাহাও উত্তর ও পূর্বদিকে সংকীর্ণ স্থানগণ্ডির সীমা অতিক্রম করে নাই। আদি-নর্ডিক বা খাঁটি 'ইণ্ডিড্' রক্তপ্রবাহও অনস্বীকার্য, কিন্তু সে ধারা অত্যন্ত শীর্ণ ও ক্ষীণ।

মোটামুটিভাবে ইহাই বাংলা ভাষাভাষী জন-সৌধের চেহারা, এবং এই জন-সৌধের উপরই বাঙালীর ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিচিত্র সংকর জন লইয়াই বাংলার ও বাঙালীর ইতিহাসের সূত্রপাত।

বাঙালীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ এবং উত্তর-ভারতের বিভিন্ন বর্ণের এবং জনের উপরোক্ত নরতাত্ত্বিক বিবরণের তুলনামূলক আলোচনা হইতে বাঙালীর বিভিন্ন বর্ণ বা জাত সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে এখন কতকগুলি ইঙ্গিত ধরিতে পারা যায়। খুব সংক্ষেপে প্রধান ও অপ্রধান কয়েকটি বর্ণ সম্বন্ধে সে-ইঙ্গিত বিবৃত করিলেই সমগ্র চেহারাটি পরিষ্কার হইবে।

ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের সম্বন্ধেই আগে বলা যাইতে পারে। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণরাই একমাত্র জাত যাহাদের সঙ্গে পঞ্জাবের ব্রাহ্মণদের এবং উত্তর-ভারতের অন্যান্য উচ্চবর্ণের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বাঙালী ব্রাহ্মণদের বেশি নরতাত্ত্বিক আত্মীয়তা দেখা যায় বাঙালী বৈদ্য ও কায়স্থদের সঙ্গে। বস্তুত, বাঙালী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ নরতত্ত্বের দিক হইতে একই গোষ্ঠীর লোক বলিলে কিছু অবৈজ্ঞানিক কথা বলা হয় না। নরতত্ত্বের দিক হইতে বলিতে পারা যায়, যে-সব জাত (অর্থাৎ বৈদ্য-কায়স্থ, বৃহদ্ধর্মপুরাণের করণ ও অম্বষ্ঠ) দেহ-বৈশিষ্ট্যে ব্রাহ্মণদের যত সন্নিকটে, বাংলাদেশে সেই সব জাত-এর সামাজিক কৌলীন্য তত বেশি। বাঙালী ব্রাহ্মণদের (এবং কায়স্থ-বৈদ্যদের) সঙ্গে পূর্ব-ভারতীয় আদিমতম অধিবাসীদের (যেমন, ছোটনাগপুর অঞ্চলের সাঁওতালদের, উত্তরাঞ্চলের গারো-খাসিয়াদের, নিম্নবঙ্গের রাজবংশী-বুনা ইত্যাদিদের), কিংবা নিম্নতম বর্ণ ও শ্রেণীর লোকদের (পোদ্-বাগদী প্রভৃতি) রক্তসংমিশ্রণ বেশি ঘটিয়াছে, এমন প্রমাণ নাই। ঘটে যে নাই তাহার খানিকটা প্রমাণ পাওয়া যায় বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে এবং ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের, বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের, সামাজিক আচার-ব্যবহারে। নির্বিচার আন্তর্বিবাহ ও আন্তর্ভোজনে একটা আপত্তি বরাবরই তাহাদের ছিল, যদিও সেই আপত্তি সুপ্রাচীন কালে সর্বত্র সব সময় খুব কার্যকরী হয় নাই। আর এই সব আপত্তি ও সংস্কার তো খুবই ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল, একদিনেই তাহা কার্যকরী করা সম্ভবও হয় নাই। সেই হেতুই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৈদ্য-কায়স্থদের একটা নরতাত্ত্বিক আত্মীয়তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বাংলার অন্য কোন বর্ণ বা জাত-এর সঙ্গে সেই আত্মীয়তার প্রমাণ নাই। আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নাই যে, বাঙালী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মধ্য-ভারতের ব্রাহ্মণদের নরতাত্ত্বিক আত্মীয়তা বাঙালী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের নরতাত্ত্বিক আত্মীয়তা অপেক্ষা অনেক কম; বরং বাঙালী ব্রাহ্মণের আত্মীয়তা মধ্য-ভারতীয় অব্রাহ্মণদের সঙ্গে বেশি। উচ্চতম বর্ণের বিহারীদের সঙ্গে বাংলার উচ্চতম বর্ণের লোকদের কিছুটা আত্মীয়তা আছে। বাংলা-বিহারের ভৌগোলিক নৈকট্যে এবং ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে সে মিল থাকা তো খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু সে-মিলও বাঙালী বৈদ্য-কায়স্থদের সঙ্গে মিলের চেয়ে অনেক কম। এই

সব কারণে মনে হয়, বাঙালী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ বর্ণের লোকেরা একটি বিশেষ ঐক্যবদ্ধ নরগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, এবং নরতত্ত্বের দিক হইতে তাহারা একই গোষ্ঠীবদ্ধ। বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত উত্তম সংকর বর্ণের অনেক বর্ণই এই নরগোষ্ঠীর সঙ্গে অল্প বিস্তর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ—এই অনুমানও বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে করা চলে। অন্তত, বাঙালী কায়স্থরা যে বাঙালী সদ্‌গোপ ও কৈবর্তদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ, ইহা ত নরতাত্ত্বিক পরিমিতি-গণনা হইতেই ধরা পড়ে; সদ্‌গোপদের সঙ্গে কায়স্থদের তো কোনই পার্থক্য নাই। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ তো বলেন, কায়স্থ, সদ্‌গোপ ও কৈবর্তরাই যথার্থত বঙ্গজন প্রতিনিধি। বস্তুত, বাংলাদেশের সমস্ত বর্ণের (বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত উত্তম ও মধ্যম সংকর বর্ণের) সঙ্গে কায়স্থদের আত্মীয়তাই সবচেয়ে বেশি। বাংলার বাহিরে এক বিহারে কিছুটা ছাড়া অন্যত্র কোনও বর্ণের সঙ্গেই ইহাদের বিশেষ কোনও মিল নাই, এবং এই তথ্য সদ্‌গোপ ও কৈবর্তদের সম্বন্ধেও সত্য। কায়স্থ, সদ্‌গোপ ও কৈবর্তদের সঙ্গে (সদ্‌গোপ ও কৈবর্তরা ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ-কথিত সৎশূদ্র) সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া বা বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত অন্ত্যজ বর্ণের লোকদের কোনই রক্তসংমিশ্রণ ঘটে নাই একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, তেমনই নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, ছোটনাগপুর অঞ্চলের সাঁওতাল প্রভৃতিদের সঙ্গে বাংলার পোদ, বাগ্দী, বাওড়ী প্রভৃতি উপবর্ণের লোকদের সুপ্রচুর রক্তসংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। নমশূদ্রদের সম্বন্ধে নরতাত্ত্বিক পরিমিতি-গণনার ফলাফল একটু চাঞ্চল্যকর। এ তথ্য অন্যত্রও উল্লেখ করিয়াছি যে, দেহ-বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে ইহারা উত্তর-ভারতের বর্ণ-ব্রাহ্মণদের সমগোত্রীয়; বস্তুত উত্তর-ভারতের বর্ণ-ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের চেয়েও বাঙালী নমশূদ্রদের আত্মীয়তা বেশি। অথচ, এই নমশূদ্রেরা আজ সমাজের একেবারে নিম্নতম স্তরে! আমরা তাহাদের চণ্ডাল বা চাঁড়াল বলিয়া জানি, এবং বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ রচনার কালেই ইহারা অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত। এই সামাজিক তথ্যের সঙ্গে নরতত্ত্বপ্রমাণগত তথ্যের যুক্তি ও ইতিহাসসম্মত ব্যাখ্যা এখনও কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

যাহাই হউক, উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি, বাংলার বিভিন্ন জেলার বিচিত্র বর্ণসমূহের ভিতর আপেক্ষিক সূক্ষ্ম ও স্থূল পার্থক্য, একই বর্ণের মধ্যে দেহপরিমিতির ভেদবৈচিত্র্য ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিচার করিলে বলিতেই হয়, এ-সমস্তই বিচিত্র নর-সাংকর্যের দ্যোতক। জন-সাংকর্যের, নরতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যের জৈব মিশ্রণের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে! বস্তুত, স্মরণাতীত কাল হইতে এই ধরনের জন-সাংকর্যের দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের অন্যত্র খুব সুলভ নয়। এই মিশ্রণ এত গভীর ও ব্যাপক যে, নরতত্ত্বের দিক হইতে কোনও বিশিষ্ট বর্ণ, যত উচ্চ বা নিম্নই হউক না কেন, বা কোন বিশিষ্ট স্থানের অধিবাসীদের একান্তভাবে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার উপায় নাই।

৪

জনপ্রবাহ তো একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা; সে-ধারা কখনও একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া ঠেকিয়া যাইতে পারে না এবং তাহার ইতিহাস কোথাও শেষ হইয়া যায় না। সেই ধারা এখনও বহমান। কাজেই, প্রাচীন বাংলাদেশে ঐতিহাসিককালে সেই চিরবহমান ধারায় আরও কোনও কোনও জনের রক্তস্পর্শ লাগিয়াছে কি না, লাগিলে কতটুকু লাগিয়াছে এবং সেই প্রবহমাণ ধারাকে কি ভাবে কতটুকু রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছে বা পারে নাই, তাহার পরিচয়ও এই সঙ্গেই লওয়া প্রয়োজন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে গ্রীক ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বিদ টলেমি (Ptolemy) তাঁহার 'ইণ্ডিকা'-গ্রন্থে গঙ্গার পূর্বশায়ী দেশগুলির পরিচয় দিতে গিয়া মুরুণ্ড (Murandooi) নামে এক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্জাব অঞ্চলে এক মুরুণ্ড উপ-কোমের উল্লেখ গ্রীক ঐতিহাসিকরা একাধিকবার করিয়াছেন; ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই মুরুণ্ডেরা সুপরিচিত। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে এই মুরুণ্ডদের উল্লেখ আছে কুষাণবংশীয় দেবপুত্রসাহী-সাহানুসাহী এবং শকদের সঙ্গে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, এই মুরুণ্ডরা জন হিসাবে শক-কুষাণদেরই সমগোত্রীয়। শক-কুষাণেরা এক মিশ্র জন। পূর্ব-ভারতে গঙ্গার পূর্বাঞ্চলে যে মুরুণ্ডদের কথা টলেমি বলিতেছেন, তাহারা পঞ্জাবের মুরুণ্ডদেরই একটি শাখা হওয়া বিচিত্র নয়। তবে, এই মুরুণ্ডরা বাংলাদেশে নূতন কোনও রক্তপ্রবাহ বহন করিয়া আনে নাই, তাহা কতকটা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

ঐতিহাসিক কালে বাংলার জনপ্রবাহ

বাংলার বাহিরের অনেক রাজবংশের পরাক্রান্ত রাজারা সৈন্যসামন্ত লইয়া বহুবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছেন, কমবেশি অংশ জয় করিয়াছেন, এবং তাহার পর বিজয়গর্ব লইয়া, বহুবিধ ঐশ্বর্য লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ বিজেতা প্রভুর সঙ্গেই ফিরিয়া গিয়াছে। কিছু যাহারা স্থায়ী বাসিন্দারূপে হয়তো থাকিয়া গিয়াছে তাহারা জনসমুদ্রে জলবিন্দুবৎ কোথায় যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার কোনও হিসাব নাই। ইহারা ছাড়া, পাল ও সেনরাজাদের পট্টোলীগুলিতে এবং সমসাময়িক বাংলার অন্যান্য লিপিতে দেখা যায় অনেক অবাঙালী ভারতীয় কোম-উপকোমের উল্লেখ। ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলীগুলিতে দান-বিক্রয় যাহাদের নিকট বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে, সেখানে বিভিন্ন রাজকর্মচারী, স্থানীয় মহত্তর, গৃহস্থ, কুটুম্ব ইত্যাদির পরই নাম করা হইতেছে নানা কোম ও উপকোমের। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মদনপালের মনহলি পট্টোলীর তালিকাটি উদ্ধার করা যাইতে পারে; রাজকর্মচারীদের পরেই তালিকাগত করা হইয়াছে "গৌড়-মালব-চোড়-খস-হূণ-কুলিক-কর্ণাট্-লাট-ভট্ট" প্রভৃতি (রাজ)-সেবকদের। ইহাদের মধ্যে মালব, চোড়, খস, হূণ, কুলিক, কর্ণাট, লাট সকলেই অবাঙালী; হূণেরা তো

মূলত অ-ভারতীয়, কিন্তু ইতিপূর্বেই তাহারা অন্তত চার পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া এদেশে বাস করিয়া ভারতীয় বনিয়া গিয়াছে। আমার ধারণা—অন্যত্র এ-ধারণার কারণ বলিতে চেষ্টা করিয়াছি—এই সব অবাঙালী কোমের লোকেরা বাংলাদেশে আসিয়াছিল বেতনভুক্‌ সৈনিকরূপে, না হয় রাজ-সরকারে একান্ত নিম্নস্তরের কর্মচারীরূপে। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণেও এই রকম কয়েকটি ভিন্‌-প্রদেশী কোমের খবর পাইতেছি, যথা—খস, যবন, কম্বোজ, খর, দেবল বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। যে-ভাবেই হউক্‌, এই সব লোকেরা ক্রমশ বাংলাদেশেরই বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিল এবং এ-দেশেরই বিশাল জনসমুদ্রে নিজেদের বিলীন করিয়া দিয়াছিল। বাংলাদেশের জনপ্রবাহের বেগবান ধারায় কবেই ইহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কর্ণাট হইতে কল্যাণের চালুক্য রাজবংশ, তামিলভূমি হইতে চোল রাজবংশ একাদশ শতকে বাংলাদেশে সার্থক বিজয়াভিযান প্রেরণ করিয়াছিল, যে-সব সৈন্যসামন্ত এই সব অভিযানের সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাদের কিছু কিছু এই দেশে থাকিয়া যাওয়া অসম্ভবও নয়। ইহাদের আগে মালবরাজ যশোধর্মনও এক অভিযানে পূর্বভারতে আসিয়াছিলেন। প্রতিহার বংশীয় রাজারাও বাংলা দেশে একাধিক বিজয়াভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। শৈলবংশীয় রাজারাও এক সময়ে এদেশে এক সমরাভিযান পাঠাইয়াছিলেন। এই সব বিচিত্র সেনাবাহিনীর কিছু কিছু অংশ হয়তো পশ্চাতে থাকিয়া গিয়াছিল এবং তাহারাই যে পরবর্তীকালে মালব, চোড (চোল), কর্ণাট, লাট প্রভৃতি নামে রাজসেবক হইয়া পাল ও সেন লিপিগুলিতে দেখা দেয় নাই, তাহা কে বলিবে? হূণ, খস ইত্যাদিরাও হয়তো এইভাবেই আসিয়া থাকিবে। খসেরা তো হিমালয়ের সানুদেশের পার্বত্য জন, মোঙ্গোলীয় রক্তের প্রভাব ইহাদের মধ্যে থাকা বিচিত্র নয়। ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে বাংলাদেশের মন্দিরে লাটদেশীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের উল্লেখ আছে, আদি-মধ্যযুগের দু'একটি লিপিতে বাংলার বাহিরের ভিন্ন-প্রদেশাগত ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। অন্যান্য বর্ণের লোকেরাও নিশ্চয়ই নানা কাজে এদেশে আসিয়াছিল এবং অনেকেই কালক্রমে এদেশেরই বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অন্ধ্রাও পাল আমলে, বোধ হয় তাহারও আগে, বাংলাদেশে আসিয়াছিল। একটু অন্য প্রসঙ্গে লিপিগুলিতে ইহাদেরও নাম পাওয়া যায় একেবারে চণ্ডালদের সঙ্গে। কেন যে সমাজের একেবারে নিম্নতম স্তরে চণ্ডালদের সঙ্গে ইহাদের স্থান নির্ণীত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায় না। যাহাই হউক, যে-ভাবেই আসিয়া থাকুক, এবং সমাজের যে স্তরেই থাকুক, অগণিত জনপ্রবাহের মধ্যে ইহারা সংখ্যায় এত স্বল্প এবং ইহাদের প্রত্যেকের ধারা এত ক্ষীণ যে, নরতত্ত্বের দিক হইতে আজ আর তাহাদের পৃথক করিয়া চিনিয়া লইবার উপায় নাই, বিরাট বেগবান প্রবাহের মধ্যে তাহারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, ইহারা সকলেই তো পূর্ববর্ণিত কোনও না কোনও বৃহত্তর জনের অঙ্গীভূত ছিল এবং সে-সব জাতি ঐতিহাসিক যুগের পূর্বেই বাংলাদেশে তাহাদের রক্তপ্রবাহ সঞ্চার করিয়া গিয়াছিল; যাহারা পারে নাই, তাহাদের ঐতিহাসিক

বংশধরেরা পরবর্তীকালে যে স্বল্প সংখ্যায় বাংলাদেশে আসিয়াছিল, যে ক্ষীণ ধারা সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহাতে সুস্পষ্ট নিদর্শন আঁকিয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না।

রাজা-রাজকুমারেরা অনেক সময় ভারতবর্ষেরই ভিন্‌প্রদেশী রাজকুমারীদের বিবাহ করিয়া আনিতেন; বাঙালী পাল-রাজারাই করিতেন, কর্ণাট দেশাগত সেন-রাজারা তো করিতেনই। পুরুষানুক্রমে কয়েক পুরুষ ধরিয়া এইরূপ হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্তও আছে। রাজারাজড়ার তো কোন বর্ণ নাই; কাজেই মহিষী নির্বাচন করিতে গিয়া জন-বর্ণ দেখিবারও প্রয়োজন হইত না, রাজবংশ, প্রভুবংশ হইলেই চলিত; এখনও তো তাহাই চলে! বিশেষত, রাষ্ট্রীয় ও সামরিক কারণ থাকিলে তো কথাই নাই। কিন্তু এই ধরনের দৃষ্টান্তও বিরাট জনগণপ্রবাহে জলবিন্দুবৎ; কাজেই, মুষ্টিমেয় ভিন্নপ্রদেশাগত নারীও বিশাল জনসমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

সদ্যবর্ণিত এই সব দৃষ্টান্ত ছাড়া বাংলার ইতিহাসে কয়েকটি রাজবংশের পরিচয় আছে যাহারা বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বাংলায় আসিয়া নিজেরা রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া এদেশের কমবেশি অংশে রাজত্ব করিয়াছেন, পুরুষানুক্রমে বসবাস করিয়াছেন এবং এই দেশেরই বিরাট জনগণপ্রবাহে কালক্রমে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। তুর্কী বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে এই রকম তিন চারিটি প্রধান প্রধান রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে খড়্গ নামে একটি রাজবংশ সমতট অঞ্চলে প্রায় তিন চার পুরুষ ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন; খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, দেবখড়্গ ও রাজ-রাজভট—এই চারিজন রাজার নাম আমরা জানি। খড়্গ এই উপান্ত নামটি কেমন যেন সন্দেহজনক এবং ভিন্‌প্রদেশী অবাঙালী নাম বলিয়াই মনে হয়, অথচ ইহারা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন জানিবার উপায় নাই। তিন পুরুষ ধরিয়া ইহারা অন্তত উপান্ত নামে নিজেদের জন-পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু চতুর্থ পুরুষে তাহা পরিত্যাগ করিয়া একেবারে যেন দেশী বাঙালী বনিয়া গিয়াছিলেন। দশম শতকে কম্বোজাখ্য আর এক রাজবংশ গৌড়ে কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে প্রাপ্ত একটি স্তম্ভলিপিতে ইহারা "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন; ইর্‌দা তাম্রপট্টেও ইহাদের উল্লেখ আছে। এই কাম্বোজান্বয়জ রাজারা কাহারা? কোথা হইতে ইহারা আসিয়াছিলেন? দেবপালের মুঙ্গের শাসনে এক কাম্বোজের উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই কাম্বোজদেশ যে উত্তর-পশ্চিমের গন্ধার দেশের সংলগ্ন দেশ, এসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু বাণগড় স্তম্ভলিপি ও ইর্‌দাপট্টের কাম্বোজ যে মুঙ্গের-শাসনের কাম্বোজ, আমার তাহা মনে হয় না। বহুদিন আগে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিয়াছিলেন এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা সমর্থন করিয়াছিলেন যে, এই কাম্বোজরা তিব্বত, ভোটান প্রভৃতি হিমালয়ের সানুদেশের কোন মোঙ্গোলীয় জনের শাখা, এবং বর্তমান উত্তর-বঙ্গের কোচ্‌-পলিয়া-রাজবংশীদের পূর্বপুরুষ। সুনীতিবাবু কাম্বোজের সঙ্গে কোচ্‌ শব্দের একটা শব্দতাত্ত্বিক যোগও অনুমান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এই মত এখন পরিত্যাগ করিয়াছেন;

কেন করিয়াছেন, জানি না। আসামের পূর্বতম প্রান্তে চীনদেশের সীমায় [illegible] অঞ্চলকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রাচ্য ভৌগোলিক ও ব্যবসায়ীরা গন্ধার বলিয়াই অভিহিত করিতেন; ত্রয়োদশ শতকেও রসিদ-উদ্-দীন্ এই দেশকে গন্ধার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই গন্ধারেরই সংলগ্ন এক কাম্বোজদেশ ছিল না, কে বলিবে? বিশেষত, পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী চম্পাভূমি-সংলগ্ন কম্বুজদেশ যখন পূর্ব হইতেই এত সুপরিচিত? তাহা ছাড়া, ব্রহ্মদেশের পেগু শহরের নিকটস্থ পঞ্চদশ শতকের সুদীর্ঘ কল্যাণী শিলালিপিতে রাজা ধম্মচেতি ঐ দেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও ধর্মসংস্কারের যে-বিবরণ উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে কম্বোজ-সঙ্ঘ নামে এক বৌদ্ধ ধর্মগোষ্ঠীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যে সেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কাম্বোজদের সঙ্গে সম্পৃক্ত একথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আমার তো মনে হয়, আসামের পূর্ব-সীমান্তের গন্ধার-সংলগ্ন একটা কম্বোজ দেশ ছিল, এবং বাংলার কাম্বোজ-রাজবংশ সেই দেশ হইতে আগত। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ইহারা মোঙ্গোলীয় পরিবার-অন্তর্ভুক্ত ছিল, এই অনুমান অসংগত নয়, এবং বাণগড় শিলালিপির সাক্ষ্য স্বীকার করিলে ইহারা যে এদেশে আসিয়া এ-দেশের শৈবধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে বাংলাদেশে যে-সব অবাঙালী জনের নাম করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কম্বোজ অন্যতম। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হইতে একাধিক মোঙ্গোলীয় জন যে প্রাচীনকালে বাঙালীর জনপ্রবাহে রক্তধারা মিশাইয়াছে, একথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুত, বাংলা ও আসামের প্রাচীন ইতিহাসে এই অঞ্চল হইতে একাধিক সমরাভিযান ব্রহ্মপুত্র-করতোয়া অতিক্রম করিয়া বাংলাদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের স্বল্পকালস্থায়ী উত্তর-বঙ্গ ও কর্ণসুবর্ণাধিকার তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত।

আর এক বর্মণ রাজবংশ একাদশ ও দ্বাদশ শতকে পূর্ববঙ্গে প্রায় পাঁচ ছয় পুরুষ ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই বর্মণেরা বাংলার দক্ষিণে কোন প্রদেশ, সম্ভবত উড়িষ্যা অন্ধ্রদেশ অঞ্চল হইতে আগত। কিন্তু যে ভিন্নপ্রদেশাগত রাজবংশ বাংলাদেশে আসিয়া প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং বাঙালীর সম-সাময়িক সমাজবিন্যাসকে আমূল বদলাইয়া স্মৃতি-শাসনের রূপান্তর ঘটাইয়া সমাজের উচ্চস্তরে নূতন এক সমাজবিন্যাস গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেই সেন-রাজবংশের কথা এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সেন-রাজারা নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন "কর্ণাট-ক্ষত্রিয়" বলিয়া। তাঁহারা যে দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটদেশ হইতে আসিয়াছিলেন, একথা আজ সর্বজনবিদিত। কর্ণাটদেশবাসী চালুক্য রাজবংশ একাদশ শতকে বাংলা ও বিহারে একাধিক সমরাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন; এই সব অভিযানের সঙ্গে যে-সব সৈন্যসামন্তরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই যে পরবর্তীকালে তিরহুত ও নেপালে "কর্ণাটক" রাজবংশ, রাঢ়ে ও বঙ্গে "কর্ণাট-ক্ষত্রিয়" রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এ অনুমান ইতিহাস-সম্মত। সেন-রাজারা সাধারণত

বৈবাহিক আদান-প্রদান ভিন্‌ প্রদেশের রাজবংশের সঙ্গেই করিতেন—রাজরাজড়া তো তাহা করিয়াই থাকেন—; কিন্তু একথাও সত্য যে, দুই শত বৎসরে তাঁহারা একেবারে বাঙালী বনিয়া গিয়াছিলেন এবং বাঙালীর জনপ্রবাহে নিজেদের বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন। কর্ণাটদেশের উচ্চবর্ণের লোকেরা তো জন হিসাবে মোটামুটি গোলমুণ্ড, উন্নতনাস অ্যালপাইন পরিবারভুক্ত; উচ্চবর্ণের বাঙালীরাও তাহাই; কাজেই, কর্ণাট-ক্ষত্রিয় সেন-রাজবংশ বাংলাদেশে এমন নূতন কোনও রক্তধারা বহন করিয়া আনেন নাই, যাহা বাংলাদেশে ছিল না; আনিলেও সে ধারা এত ক্ষীণ ও শীর্ণ যে, বেগবান স্রোতপ্রবাহে কোথায় যে তাহা মিশিয়া গিয়াছে, আজ আর তাহা ধরা পড়িবার উপায় নাই।

তুর্কী বিজয়ের পরও বাংলাদেশে এই ধরনের শীর্ণ ক্ষীণ রক্তধারার স্পর্শ কিছু কিছু লাগিয়াছে। ভারতবর্ষের বাহির হইতে যেটুকু আসিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত দু'চারিটি দেওয়া যায়। কিছু কিছু আরবী মুসলমান পরিবার বাণিজ্য ব্যপদেশে বাংলাদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছে; নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলে এবং বাংলার অন্যান্য জেলায়ও স্বল্পসংখ্যায় ইহাদের দর্শন মেলে। শতাব্দীর পর শতাব্দীর আবর্তে ইহারা বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। নেগ্রিটো রক্তসংপৃক্ত হাব্‌সীদের কথাও বলা যায়; বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ ছয়জন হাব্‌সী সুলতান বহুদিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছেন; তাহা ছাড়া দিল্লী-আগ্রার অনুকরণে এদেশেও হাব্‌সী প্রহরী রাখার চলন কিছু কিছু ছিল। ইহারাও বাঙালীর রক্তেই নিজেদের রক্ত মিশাইয়াছে; তাহার কচিৎ নিদর্শন হঠাৎ চোখে পড়িয়া যায় বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের উচ্চস্তরেও; কৃষ্ণ বর্ণ, প্রশস্ত নাসা, ঊর্ণাবৎ রুক্ষ কেশ, পুরু উল্‌টানো ঠোঁট দেখিয়া হঠাৎ চমক লাগিয়া যায়। আরাকানী মগ প্রভাবও উল্লেখ করা যায়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুর উৎপাতে বাংলার সমুদ্র উপকূলশায়ী জেলাগুলি পর্যুদস্ত হইয়াছিল; ইহারা চুরি ডাকাতি করিয়া মেয়ে ধরিয়া লইয়া আসিত আরাকান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এবং এদেশ হইতে বাহিরে লইয়া যাইত। এই সব মেয়ে বিক্রয় করাই ছিল ইহাদের ব্যবসা। বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থান ছিল এই ব্যবসার কেন্দ্র। এইভাবে কিছু কিছু মগ রক্তও বাঙালীর রক্তপ্রবাহে সঞ্চারিত হইয়াছে। "ভরার মেয়ে"র যে গীত ও প্রবাদ-কাহিনী আমাদের দেশে প্রচলিত তাহাও নিরর্থক স্বপ্নকল্পনা মাত্র নয়। এইভাবেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলাদেশে জাতি-সমন্বয় চলিয়াছে, চলিতেছে এবং সমগ্র জীবনপ্রবাহকে সমন্বিত গতি ও রূপদান করিতেছে।

৫

এ পর্যন্ত বাঙালীর জনতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া যাহা পাওয়া গেল ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণের মধ্যে তাহার সমর্থন কতটুকু পাওয়া যায়, তাহা এখন দেখা যাইতে পারে। এ-চেষ্টা আচার্য

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একাধিকবার সার্থক ভাবেই করিয়াছেন; তবু মনে হয়, জনতত্ত্ব বিশ্লেষণ-লব্ধ তথ্যের দিকে দৃষ্টি আর একটু সজাগ রাখিয়া বাংলাদেশের জন ও ভাষাপ্রবাহের আলোচনা এবং পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়ের অবকাশ এখনও যথেষ্ট আছে। বস্তুত, পশিলুস্কি, ব্লক্, লেভি, বাগ্চী ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেদিকে গবেষণার সূত্রপাত করিয়াছেন, সেদিকে সমস্ত সম্ভাবনা এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সংস্থান ও গ্রাম্যজীবনের সমস্ত খুঁটিনাটির জ্ঞান লইয়া প্রবোধবাবু ও সুনীতিবাবুর ইঙ্গিতগুলি ফুটাইয়া তোলার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে এবং আমার বিশ্বাস সেই ফলাফলগুলি নরতত্ত্ব গবেষণার ফলাফলের সঙ্গে যোগ করিলে বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে।

জন ও ভাষাতত্ত্ব

ভারতবর্ষ ও পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জগুলির বিচিত্র ভাষার সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত গবেষণার ফলে আজ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, আনাম, মালয়, তালৈঙ্, খাসিয়া, কোল (অথবা মুণ্ডা), সাঁওতাল, নিকোবর, মালাক্কা প্রভৃতি ভূমির বিচিত্র বিভিন্ন অধিবাসীরা যে-সব ভাষায় কথা বলে, তালৈঙ্ ও খ্মেরে গোষ্ঠীর প্রাচীন সাহিত্য যে-সব ভাষায় রচিত, সেই ভাষাগুলি একই পরিবারভুক্ত। এই সুবৃহৎ ও সুবিস্তৃত ভাষা-পরিবারের পুরাতন নাম অস্ট্রো-এশীয়, আধুনিক নামকরণ অস্ট্রিক। একটু মনঃসংযোগ করিলেই ধরা পড়িবে, এই সব অধিবাসীরা সকলই জন হিসাবে একই গোষ্ঠীর নয়; আনাম বা মালয়-মালাক্কা অঞ্চলে অস্ট্রেলয়েড্ রক্তের সঙ্গে মোঙ্গোলীয় রক্তের বহুল সংমিশ্রণ হইয়াছে, অথচ কোল অথবা সাঁওতালদের মধ্যে মোঙ্গোলীয় প্রবাহ নাই, কিন্তু আদি-অস্ট্রেলয়েড্ রক্তে অন্য জাতির রক্ত-প্রবাহ কমবেশি সঞ্চারিত হইয়াছে। খাসিয়াদের তো মোটামুটি মোঙ্গোলীয় রক্তবহুলই বলা চলে। ইহা হইতে স্বতঃই অনুমান হয়, ঐসব ভূখণ্ডে সন্ধান-সম্ভাব্য আদিমতম স্তরে সর্বত্রই অস্ট্রিক্ ভাষার প্রচলন ছিল এবং যাহাদের মধ্যে ছিল তাহাদের পরিচয় যতটা পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেখা যাইবে, ইহারা প্রায় সকলেই আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত, যেমন মুণ্ডা, কোল ও সাঁওতালেরা, ভূমিজ ও শবরেরা, মালয় ও আনাম অঞ্চলের অধিবাসীরা, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা। পরবর্তী কালে ইহাদের মধ্যে কমবেশি অন্য জনের রক্ত সংমিশ্রণ হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই হইয়াছে, এমন কি অনেক জায়গায় নূতন কোনও জন তাহাদের একেবারে আত্মসাৎও হয়তো করিয়া ফেলিয়াছিল, যেমন করিয়াছে মালয়ে, আনামে, নিম্ন ব্রহ্মে যেখানে তালৈঙ্ ভাষাভাষী লোকের বাস, প্রভৃতি জায়গায়; কিন্তু পুরাতন জনের ভাষা তাহারা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং নানা জন-বিবর্তনের ভিতর দিয়াও সেই ভাষাপ্রবাহ আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। উপরোক্ত তথ্য হইতে আর একটি তথ্য ধরা পড়ে যে, এই অস্ট্রিক ভাষা এক সময় মধ্য-ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া সাঁওতাল-ভূমি, আসাম, নিম্ন ব্রহ্ম, মালয়, আনাম, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সমস্ত ভূখণ্ডে বিস্তৃত ছিল।

লক্ষণীয় ইহাই যে, এই সমস্ত ভূখণ্ডই এক সময়ে আদি-অস্ট্রেলীয়দের বাসভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বলিয়াছি, উপরোক্ত ভাষাগুলি সবই অস্ট্রিক পরিবারের; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একথাও বলা উচিত ছিল যে, এক পরিবারভুক্ত হইলেও ইহাদের মধ্যে আত্মীয়তার তারতম্য আছে; যেমন, তালৈঙ্, মন্-খ্মেরের সঙ্গে কোলগোষ্ঠীর আত্মীয়তা বেশি; খাসিয়ার সঙ্গে নিকোবরীর। কোল-মুণ্ডা খুব সম্পন্ন গোষ্ঠী; সাঁওতালী, মুণ্ডারী, ভূমিজ, হো, কোড়া, অসুরী, খাড়িয়া, জুয়াং, শবর, গদব প্রভৃতি সকল বুলিই এই গোষ্ঠীর এবং মধ্য-ভারতের পূর্বভাগ জুড়িয়া এই সব বুলিভাষী লোকদের বাস। আশ্চর্যের বিষয়, ইহারা সকলেই আদি-অস্ট্রেলীয়। এই কারণেই অনুমান হয়, আদি-অস্ট্রেলীয়দের ভাষাই হয়ত ছিল যাহাকে আমরা এখন বলিতেছি অস্ট্রিক। যাহা হউক, এই ভূখণ্ডের দক্ষিণেই দ্রবিড়ভাষী জনপদ এবং তাহার ফলে বলবত্তর দ্রবিড়ভাষা কোলভাষার ভূখণ্ডে কোথাও কোথাও ঢুকিয়া পড়িয়াছে। অথচ, একথা আজকাল সর্বজনস্বীকৃত যে, দ্রবিড় ভাষার সঙ্গে মুণ্ডার কোনও সম্বন্ধই নাই। আবার অন্যদিকে, উত্তরে হিমালয়ের সানুদেশে এমন কতগুলি বুলি আজও প্রচলিত যেগুলি ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর ভাষা হইলেও তাহাদের এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে যাহা মুণ্ডা ভাষারই বিশিষ্ট লক্ষণ। এই লক্ষণগুলি যে সেই সব দেশে এক সময়ে বহুল প্রচারিত মুণ্ডা বা অস্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষার লুপ্তাবশেষ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শতদ্রু উপত্যকার কনবারী বুলি হইতে আরম্ভ করিয়া নেপালের কনাষী, বুনান্, রংকস, দারমিয়া, চৌদাংসী, বিয়াংসী, ধীমাশ প্রভৃতি বুলি পর্যন্ত প্রত্যেকটিতেই এই লুপ্তাবশেষ ধরা যায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অস্ট্রিক ভাষার বিস্তৃতি শুধু পূর্বোক্ত দেশগুলিতেই নয়, এক সময় উত্তর-ভারতের অনেক স্থলেই ছিল। পরবর্তী যুগে দ্রবিড় ও আর্যভাষা পশ্চিম দিকে এবং ভোট-বর্মী ভাষা পূর্বদিকে এই ভাষাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া অধিকাংশ স্থলেই ইহাকে গ্রাস করিয়া একেবারে হজম করিয়া ফেলিয়াছে; যে-সব ক্ষেত্রে তাহা পারে নাই, বা নানা প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণে তাহা সম্ভব নাই, সেই সব স্থানেই কোনও মতে দ্বীপের মতন আশ্রয়ের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক লোকের বুলিতে আবদ্ধ হইয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে।

উত্তর ও পূর্ব-ভারতে সর্বত্র, কাশ্মীরে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে, কর্ণাটে, বিহারে, উড়িষ্যায়, বাংলায়, আসামে, হিন্দুস্থানে, রাজপুতনায়, পঞ্জাবে, সীমান্তপ্রদেশে, বিশেষভাবে গাঙ্গেয় উপত্যকায় সর্বত্র আর্যভাষার প্রবল প্রতাপ। এই আর্যভাষাই আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন। এই আর্যভাষার প্রধান রূপ সংস্কৃত, যাহা প্রাকৃতজনের মধ্যে প্রাকৃত। এই প্রাকৃত-সংস্কৃতের অপভ্রংশ হইতে বর্তমান উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম-ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির উৎপত্তি। বাংলাভাষা তাহার মধ্যে অন্যতম। এখন, যদি একথা প্রমাণ করা যায় যে, এই প্রাকৃত-সংস্কৃতের ভিতর অস্ট্রিক ভাষার শব্দ ও পদরচনা রীতির প্রভাব আছে (হয় তাহা নিছক্ অস্ট্রিকরূপে, অথবা সংস্কৃতকরণের ছদ্মবেশে) তাহা হইলে বুঝিতে

হইবে আর্যভাষাভাষী লোকদের আদিমতর স্তরে অষ্ট্রিকভাষাভাষী লোকের বাস ছিল এবং এ তথ্যও ধরা পড়িবে যে, অষ্ট্রিকভাষী লোকের যে বিস্তৃতি আমরা আগে দেখিয়াছি তাহাপেক্ষাও তাহাদের বিস্তৃতি আরও ব্যাপক আরও গভীর ছিল। ঠিক এই তথ্যটাই সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, পশিলুস্কি-ব্লক-লেভী-বাগ্‌চী-স্টেনকোনো-চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা। তাঁহাদের সুবিস্তৃত ও সুগভীর গবেষণার সকল কথা বলিবার প্রয়োজন নাই; অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা দেখিয়া লইতে পারিবেন। আপাতত একথা বলিলেই ইতিহাসের প্রয়োজন মিটিতে পারে যে, ইঁহারা দেখাইয়াছেন, প্রাকৃতে-সংস্কৃতে হয় অষ্ট্রিকরূপে না হয় সংস্কৃত-প্রাকৃতের ছদ্মবেশে, বিশুদ্ধ প্রাকৃত-সংস্কৃত ভাষায় ও প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে এমন অসংখ্য শব্দ ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে, এমন ব্যাকরণ ও পদরচনা রীতি আছে যাহা মূলে অষ্ট্রিক্ ভাষা হইতে গৃহীত; এবং এই গ্রহণ সুপ্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। বাঙালীর ইতিহাসে এমন কতগুলি শব্দ ও রীতির উদ্ধার করা যাইতে পারে, যাহা একান্তভাবে না হউক অন্তত বহুলভাবে বাংলা দেশে এবং বাংলার সংলগ্ন দেশ গুলিতেই প্রচলিত। সব নির্ধারিত শব্দ উদ্ধার করা সম্ভব নয়, তাহার তালিকা উল্লিখিত পণ্ডিতদের রচনায় পাওয়া যাইবে; আমি শুধু সেই সব শব্দই উদ্ধার করিতেছি যেগুলির সঙ্গে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও প্রায় অবিচ্ছেদ্য।

আসামে ও বাংলা দেশে এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়িতে (বিশ বা বিংশ নয়) এক পণ, অর্থাৎ ৮০টায় এক পণ গণনার রীতি প্রচলিত আছে। হাটে বাজারে পান, সুপারি, কলা, বাঁশ, কড়ি, এমন কি ছোট মাছ ইত্যাদি দ্রব্যও এখনও এই ভাবেই গণনা করিয়া ক্রয়বিক্রয় করা হয়। এই কুড়ি শব্দটি এবং এই গণনা রীতিটি দুইই অষ্ট্রিক্। সাঁওতালী ভাষায় উপুণ বা পুণ বা পণ কথাটির অর্থ ৮০ এবং সঙ্গে সঙ্গে ৪-ও। মূল অর্থ চার। অষ্ট্রিক্‌ভাষাভাষী লোকদের ভিতর কুড়ি শব্দ মানবদেহের কুড়ি অঙ্গুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত; কুড়িই তাহাদের সংখ্যা গণনার শেষ অঙ্ক এবং কুড়ি লইয়া এক মান। কাজেই এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়িতে (৪×২০=৮০) এক পণ। এই অর্থে আশিও পণ, চারও পণ। এই পণও তাহা হইলে অষ্ট্রিক শব্দ। আবার কুড়ি গোণ্ড বা গণ্ডাতে এক পণ (=৮০), এ-ও অষ্ট্রিক ভাষারই গণনা। অর্থাৎ একগোণ্ডা বা গণ্ডতে চার সংখ্যা; প্রত্যেক কুড়িতে (৪×৫) পাঁচটি গোণ্ড। এই গোণ্ড বা গণ্ডই বাংলায় গণ্ডা যাহা চার সংখ্যার সমান। চার কুড়িতে এক গণ্ডা। এই গণ্ডা হইতেই খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম দ্বিতীয় শতকের প্রাকৃত মহাস্থান শিলালিপির গণ্ডকমুদ্রা। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এই গণ্ডক মুদ্রার প্রচলন বাংলা দেশে ছিল। গণ্ডক শব্দের অভিধানগত অর্থই হইতেছে: ভাগ, একপ্রকার গণনারীতি, চার সংখ্যায় এক মান ধরিয়া গণনার রীতি, চার কুড়ি

মূল্যের একপ্রকার মুদ্রা। দেখা গেল, এই সমস্ত গণনা-পদ্ধতিটাই অষ্ট্রিকভাষাভাষী লোকদের। আর কড়ি মুদ্রা যেখানে গণনা-ক্রমে এতটা স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেখানে ইহা তো সহজেই অনুমেয় যে, এই গণনাপদ্ধতি আদিম ভারত ও বৃহত্তর ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য-সমৃদ্ধ সভ্যতার সৃষ্টি। বাংলা গুঁড়ি বা গুঁড়া ও গুঁটি, এই শব্দগুলিও গোণ্ড বা গণ্ডা শব্দ হইতে উদ্ভূত।

বাংলা খাঁ খাঁ (করে ওঠা), খাঁখার (দেওয়া), বাঁখারি (বাখারি বা চেড়া বাঁশ), বাদুড়, কানি (ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রা), জাং (জঙ্ঘা), ঠেঙ্গ (গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্যন্ত পায়ের অংশ), ঠোঁট, পাগল, বাসি, ছাঁচ, ছাঁচতলা, ছোক্কা, কলি (চুন), ছোট, পেট, খোস (পুরাতন বাংলায়, কচ্ছু), ঝোড় বা ঝাড়, ঝোপ, পুরাতন বাংলায় চিখিল (কাদা), ডোম (প্রাচীন বাংলার ডোম্ব-ডোম্বী), চোঙ, চোঙ্গা, মেড়া (=ভেড়া), বোয়াল (মাছ), করাত, দা' বা দাও, বাইগণ (বেগুন=সংস্কৃত বাতিঙ্গন, বাতিগণ) গগার (জলময় গর্ত বা প্রণালী), গড়, বরজ (পানের), লাউ, লেবু-লেম্বু, কলা, কামরাঙ্গা, ডুমুর প্রভৃতি সমস্ত শব্দই মূলত অষ্ট্রিক্‌গোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। বাংলার প্রাচীন জনপদ বিভাগের মধ্যে পুণ্ড-পৌণ্ড্র, তামলিত্তি-তাম্রলিপ্তি-দামলিপ্তি এবং বোধ হয় গঙ্গা (নদী) ও বঙ্গ এই দুটি নামও এই একই অষ্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষার দান। কপোতাক্ষ ও দামোদর, অন্তত এই দু'টি নদীর নামও কোল কব-দাক্ এবং দাম-দাক্ হইতে গৃহীত। কোল দা বা দাক্=জল এবং দা বা দাক্ হইতেই সংস্কৃত উদক। অষ্ট্রিকভাষাভাষী লোকেরা নিজেদের ভাষার কথা দিয়াই দেশের পাহাড় পর্বত নদনদী গ্রাম জনপদ ইত্যাদির নামকরণ করিয়াছিল, এই অনুমানই তো যুক্তি ও ইতিহাসসম্মত। তাহার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও বাংলা বুলিতে লাগিয়া আছে, যেমন শিয়ালদহ বা শিয়াল-দা, ঝিনাইদহ বা ঝিনাই-দা, বাঁশদহ বা বাঁশ-দা (দহ=জলভরা গর্ত, নদীগর্ভের গর্ত); মুণ্ডা ঢেঙ্কি= বাংলা ঢেঁকি, মুণ্ডা মোটো=বাংলা মোটা। লেভি সাহেব তো বলেন, পুলিন্দ-কুলিন্দ, মেকল-উৎকল, উণ্ড্র-পুণ্ড্র-মুণ্ড, কোসল-তোসল, অঙ্গ-বঙ্গ, কলিঙ্গ-তিলিঙ্গ এবং সম্ভবত তক্কোল-কক্কোল, অচ্ছ-বচ্ছ, এই ধরনের জাতিবাচক যমজ নামকরণ পদ্ধতিটাই অষ্ট্রিক। তাঁহার বচনটি উদ্ধৃতির যোগ্য—

> "Pulinda-Kulinda, Mekala-Utkala (with the group Udra-Pundra-Munda), Kosala-Tosala, Anga-Vanga, Kalinga-Tilinga form the links of a long chain which extends from the eastern confines of Kashmir up to the centre of the peninsula. The skeleton of the "ethnical system" is constituted by the heights of the central plateau; it participates in the life of all the great rivers of India except the Indus in the west and Kaveri in the south. Each of these groups forms a binary whole; each of these binary resites is united with another member of the system. In each ethnic pair the twin bears the same name, differentiated only by the initial K and T; K and P; zero and V, or M or P. This process of formation is foreign to Indo-European; it is foreign to Dravidian; it is on the contrary

characteristic of the vast family of languages which are called Austro-Asiatic, and which covers in India the group of the Munda languages, often called also Kolarian."

"আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প" (অষ্টম শতক) নামক গ্রন্থে এই ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি মন্তব্য আছে এবং সম্ভবত প্রচলনস্থান সম্বন্ধেও একটু ইঙ্গিত আছে। তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের মতে কামরাঙ্গা ফলের উৎপত্তি স্থান ছিল কর্মরঙ্গাখ্যদ্বীপে (=য়ুয়ান্‌চোয়াঙের কামলঙ্ক, চীনা গ্রন্থের লংকীয়া, লংকীয়া-সু,), নাড়িকের দ্বীপে (নারিকেল দ্বীপ), বারুসকদ্বীপে (বর্তমান, বারোস্) নগ্নদ্বীপ (বর্তমান, নিকোবর) বলিদ্বীপ এবং যবদ্বীপে। এই সব দ্বীপের ভাষা 'র'-কার বহুল, অস্ফুট, অব্যক্ত (অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য ?) এবং নিষ্ঠুর (কর্কশ, রূঢ়)।

কর্মরঙ্গাখ্যদ্বীপেষু নাড়িকের সমুদ্ভবে।
দ্বীপে বারুসকে চৈব নগ্ন বলি সমুদ্ভবে॥
যবদ্বীপে বা সত্ত্বেষু তদন্যদ্বীপ সমুদ্ভবা।
বাচা রকারবহুলাতু বাচা অস্ফুটাং গতা॥
অব্যক্তা নিষ্ঠুরা চৈব সক্রোধপ্রেতযোনীষু।

যে-বৈশিষ্ট্যের কথা "মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে"র লেখক উল্লেখ করিয়াছিলেন, আর্যভাষার দৃষ্টিভঙ্গি হইতে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা সম্বন্ধে তাহা বলা কিছু অযৌক্তিক নয়। অস্ট্রিক ভাষায় 'ল' ও 'র'র বাহুল্য সত্যই লক্ষ্য করিবার মত। এই অসুর ভাষাভাষী লোকদেরই ঋগ্বেদে 'অসুর' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিলে অন্যায় হয় না।

"আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প"-গ্রন্থের আর একটি সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকারের মতে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকেরা অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর বঙ্গের লোকেরা 'অসুর' ভাষাভাষী: "অসুরানাং ভবেৎ বাচা গৌড়পুণ্ড্রোদ্ভবা সদা"। কোল-মুণ্ডা গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বুলির নাম এখনও 'অসুর' বুলি; কাজেই এই বুলিই এক সময় গৌড়ে-পুণ্ড্রে বহুল প্রচলিত ছিল, এ-অনুমান সহজেই করা চলে। মধ্যভারতের পূর্বখণ্ডে যে-সব লোকেরা অসুর বুলিতে কথা বলিত তাহারা আদি-অস্ট্রেলীয় পরিবারের লোক, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ বোধ হয় নাই। গৌড়-পুণ্ড্রের আদিমতর স্তরেও এই আদি-অস্ট্রেলীয়দের বিস্তৃতি ছিল, একথাও নরতত্ত্ববিশ্লেষণ হইতে আগেই জানা গিয়াছে। ভাষার সাক্ষ্য হইতেও তাহা অনেকটা পরিষ্কার হইল। "মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে"র গ্রন্থকার তাহা পরিষ্কার করিয়াই বলিলেন। আসামেও যে প্রাচীনতর কালে এই 'অসুর' ভাষাভাষী লোকের বিস্তৃতি ছিল, তাহা অনুমানেরও একটু কারণ আছে। কামরূপের বর্মণ রাজবংশের আদিপুরুষ সকলেই 'অসুর' বলিয়া পরিচিত; অন্তত, সপ্তম শতকের রাজারা তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের অসুর বলিয়াই জানিতেন এবং মহিরাঙ্গ অসুর, দানবাসুর, হাটকাসুর, সম্বরাসুর, রত্নাসুর, নরকাসুর প্রভৃতি পূর্বপুরুষদের বংশধর বলিয়াই নিজেদের পরিচয়

দিয়াছেন। ইহারা অস্থর ভাষাভাষী ছিলেন বলিয়াই কি ইহাদের নামে তাহার চিহ্ন থাকিয়া গিয়াছে ?

আর একটি প্রাচীনতর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়াই এই অষ্ট্রিক—আদি-অস্ট্রেলীয় প্রসঙ্গ শেষ করিব। জৈনদের "আচারঙ্গ সূত্র"-গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মহাবীর (খ্রীষ্টপূর্ব, ষষ্ঠ শতক) যখন পথহীন লাঢ় (রাঢ়দেশ), বজ্জভূমি ও সুব্ভভূমিতে (মোটামুটি, দক্ষিণ-রাঢ়) প্রচারোদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন এই সব দেশের অধিবাসীরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। কতগুলি কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে কামড়াইতে আরম্ভ করে, কিন্তু কেহই এই কুকুরগুলিকে তাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হয় নাই। বরং লোকেরা সেই জৈন ভিক্ষুকে আঘাত করিতে আরম্ভ করে এবং ছু ছু (খুক্খু) বলিয়া চীৎকার করিয়া তাঁহাকে কামড়াইবার জন্য কুকুরগুলিকে লেলাইয়া দেয়। বাংলা দেশে এখনও লোকে কুকুর ডাকিবার সময় চু চু বা তু তু বলে। অষ্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীতে কুকুরের প্রতিশব্দ হইতেছে 'ছক্' (খ্মের), 'ছ্যাকে' (কোন্ টু), 'ছো' (প্রাচীন খ্মের), 'ছো' (আনাম, সেদাং, কাসেং), 'অছো (তারেং), 'ছু' (সেমাং), 'ছুও', 'ছু-ও' (সাকেই)। এই তথ্য হইতে বাগচী মহাশয় মনে করেন যে, বাংলা চু চু বা তু তু মূলত অষ্ট্রিক প্রতিশব্দ হইতেই গৃহীত এবং চু চু বা তু তু সংস্কৃত কুকুরার্থক বাংলা বা দেশজ শব্দ ; ওটা শুধু ধ্বন্যাত্মক ডাক্ মাত্র নয়, চু চু বা তু তু বলিতে কুকুরই বুঝায়। এ অনুমান সত্য হইলে রাঢ়ে-সুহ্মে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। আর, ছিল যে তাহার অন্য প্রমাণ, এই দুই ভূখণ্ডে এখনও অষ্ট্রিক ভাষাভাষী পরিবারভুক্ত অনেক সাঁওতাল ও কোলদের বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

অষ্ট্রিক ভাষা হইতে যেমন, ঠিক তেমনই দ্রবিড় ভাষা হইতেও আর্যভাষা সংস্কৃতে-প্রাকৃতে-অপভ্রংশে অনেক শব্দ, পদরচনা ও ব্যাকরণ-রীতি ইত্যাদি ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আর্যভাষাভাষী লোকেরা যে দ্রবিড়ভাষাভাষী লোকদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, এই তথ্য তাহার প্রমাণ। সংস্কৃত ভাষা বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এবং প্রাকৃত-অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত বাংলা ভাষায় এই দ্রবিড়স্পর্শ কোন্ দিকে কতখানি লাগিয়াছে, তাহার ইঙ্গিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দিয়াছেন কতকটা বিস্তৃতভাবেই। এখানে তাঁহার সকল কথা বলিবার প্রয়োজন নাই ; অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা দেখিয়া লইতে পারেন। তাঁহার বহু শ্রম ও বহু মননলব্ধ গবেষণার ফলাফল আজ প্রায় সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করিয়াছে ; এই গৌরব সমগ্র বাঙালী জাতির। বক্ষ্যমাণ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য এই :

"Is there any evidence about the class of speech that prevailed in Bengal before the coming of the Aryan tongue ? There is, of course, the presence of Kol and Dravidian speakers (the Santals, the Malers, the Oraons) in the western fringes of the Bengali area, and of the Boda and Mon-Khmer speakers in the northern and eastern frontiers. There are, again, some unmistakably Dra-

vidian affinities in Bengali phonetics, morphology, syntax and vocabulary; but these agreements with Dravidian are not confined to Bengali alone but are found in other NIA (New Indo-Aryan) also. Apart from that, local nomenclature in Bengal may be expected to throw some light on the question...The study of Bengali toponomy is rendered extremely difficult from the fact that old names, when they were not Sanskrit, have suffered from mutilation to such an extent that it is often impossible to reconstruct their original forms; especially when they are non-Aryan. Fortunately for us, Bengal inscriptions, from the 5th century onwards, like the inscriptions found elsewhere in India, and occasionally works written in pre-Moslem Bengal, have preserved old forms of some scores of these names. But it is a pity that generally there was an attempt to give these names a Sanskrit look."

তৎসত্ত্বেও এই সব লিপি হইতে অসংখ্য নাম ও প্রমাণ উদ্ধার করিয়া সুনীতিবাবু দেখাইয়াছেন যে, নামগুলিতে দ্রবিড় প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁহার সুদীর্ঘ তালিকা উদ্ধার করিতে গেলে প্রসঙ্গের বিস্তৃতি বাড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় আমি আর তাহা করিলাম না। তিনি আরও বলেন,

"In the formation of these names, we find some words which are distinctly Dravidian; e. g. -jola, -jota, joti, -jotika etc.; hitti, hitthi-vithi, -hist(h)i etc.: -gadda,-gaddi; pola-vola and probably also -handa, -vada, -kunda,-kundi, and cavati, cavada etc.: and besides there are many others which have a distinct non-Aryan look. The last word, as in Pindara-viti-jotika, Uktara-yota (jota), Dharmmayo-jotika, Nada-joti, Camyala-joti, Sik(ph)-gadi-joti, meaning channel, water-course, river, water, is found in modern Bengal place-names ..An investigation of place-names in Bengal, as in other parts of Aryan India, is sure to reveal the presence of non-Aryan speakers, mostly Dravidian, all over the land before establishment of the Aryan tongue."

এই প্রসঙ্গে অসংখ্য প্রাচীন ও বর্তমান বাংলা দেশের স্থানের নাম, নামের উপান্ত 'ড়া' (বাঁকুড়া, হাওড়া, রিষড়া, বগুড়া), 'গুড়ি' (শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি), জুলি (নয়নজুলি), জোল (নাড়াজোল), জুড় (ডোমজুড়), ভিটা, কুণ্ড প্রভৃতি শব্দ উদ্ধার করিয়া তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহারা দ্রবিড় ভাষার।

কিন্তু, নরতত্ত্ববিদদের কাছে এই দ্রবিড়ভাষাভাষী লোকদের সমস্যা বড় জটিল। সাম্প্রতিক নরতাত্ত্বিক পরিভাষায় দ্রবিড় নরগোষ্ঠীর কোনও অস্তিত্বই নাই। দ্রবিড় ভাষার নাম; নরগোষ্ঠীর নয়। প্রাক্-আর্য যুগে এই দ্রবিড়ভাষাভাষী লোক কাহারা ছিল? ঐতিহাসিক যুগে দামিল-দ্রমিল-তামিল জাতির লোকদের ভাষা দ্রবিড় সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারা কাহাদের বংশধর?

পূর্বে নরতত্ত্ব বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে, আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর পর একে একে তিনটি দীর্ঘমুণ্ড জাতি ভারতবর্ষের জনপ্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় ধারাটি পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া পূর্বে বা দক্ষিণে বোধ হয় আর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

প্রথম ধারাটি মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং সেখানে পূর্বতন আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে তাহাদের খানিকটা সংমিশ্রণও ঘটিয়াছিল। তৃতীয় ধারাটির সঙ্গে সুমেরীয়-আসীরীয়-বাবলনীয় প্রভৃতি ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ এবং এই ধারাটিই হরপ্পা, মহেন-জো-দড়োর প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার জননী। ইহারা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল উত্তর-ভারতের সর্বত্র; তবে উত্তর-পূর্ব ভারতে গঙ্গা-যমুনার উপত্যকায় পূর্বতন আদি-অস্ট্রেলীয় কোল-মুণ্ডা-শবর-নিষাদ-অসুরদের বিস্তৃতি ও প্রতাপ প্রবলতর থাকায় ইহারা বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-ভারতে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। পরবর্তী কালে অ্যালপো-দীনারীয় ও আদি-নর্ডিক আর্য ভাষাভাষী জাতির বিভিন্ন তরঙ্গাঘাতে উত্তর-ভারত হইতেও ইহারা ক্রমশ স্তরে স্তরে পূর্বে ও দক্ষিণে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। এই প্রথম ও তৃতীয় ধারার দীর্ঘমুণ্ড দুইটি নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে যে-জন গড়িয়া উঠে তাহারাই খুব সম্ভব দ্রবিড় ভাষাগোষ্ঠীর বর্তমান তামিল-তেলেগু-মালয়ালী ভাষাভাষী লোকদের পূর্বপুরুষ। তবে, সিন্ধুনদের নিম্ন-উপত্যকায় বেলুচিস্থানের দ্রবিড়ভাষী ব্রাহুইদের অস্তিত্ব হইতে অনুমান হয়, এই দ্রবিড় ভাষা ছিল সিন্ধু উপত্যকাস্থিত তৃতীয় ধারার দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীর ভাষা; অবশ্য এই অনুমান যথেষ্ট সিদ্ধ বলিয়া কিছুতেই গণ্য হইতে পারে না। যাহাই হউক, বাংলা-দেশে দ্রবিড় ভাষার প্রচলনের দায়িত্ব প্রধানত এই দুই ধারার দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠী দুইটির।

অ্যাল্‌পো-দীনারীয় জাতির লোকেরা আর্যভাষাভাষী, কিন্তু তাহাদের ভাষার স্বরূপ কি ছিল, তাহা সঠিক বলিবার উপায় প্রায় নাই বলিলেই চলে। গ্রীয়ার্সন সাহেব গুজরাত্, মহারাষ্ট্র, মধ্যভারত, উড়িষ্যা, কতকাংশে বিহার, বঙ্গদেশ ও আসামের Outer Aryans বা বেদ-বহির্ভূত যে-সব আর্যভাষাভাষী লোকদের কথা বলেন এবং বৈদিক আর্যভাষা হইতে উদ্ভূত সিন্ধু-গঙ্গা উপত্যকার হিন্দি, রাজস্থানী প্রভৃতি ভাষা হইতে পৃথক্‌ গুজরাটি, মারাঠী, ওড়িয়া, বাংলা, অহমীয়া প্রভৃতি আর্যভাষার যে-কথা ইঙ্গিত করেন তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বাংলা, মারাঠী, ওড়িয়া, গুজরাটী, অহমীয়া ইত্যাদি ভাষার মূল, প্রধান ও বিশিষ্ট রূপই যে অ্যাল্‌পো-দীনারীয় জাতির ভাষারূপ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। কারণ, গ্রীয়ার্সনের এই "Outer Aryans" যে অ্যালপাইন জাতিরই অন্যতম শাখা রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বহুদিন আগেই তাহা সুপ্রমাণ করিয়াছেন এবং নরতত্ত্ববিদেরা প্রায় সকলেই তাহা স্বীকার করেন।

মোঙ্গোলীয় ভোট-ব্রহ্ম ভাষার প্রভাব প্রাচীন অথবা বর্তমান বাংলায় প্রায় নাই বলিলে খুব অযৌক্তিক হয় না। নরতত্ত্বের দিক হইতে মোঙ্গোলীয় রক্তপ্রবাহ বাঙালীর মধ্যে যেমন ক্ষীণ ও শীর্ণ মোঙ্গোলীয় ভাষা-প্রভাবও তাহাই। তবে উত্তরতম ও পূর্বতম প্রান্তের মোঙ্গোলস্পৃষ্ট লোকদের ভিতর চল্‌তি বুলিতে কিছু কিছু ভোট-ব্রহ্ম শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। আর, অন্তত একটি নদীর নাম যে ভোট-ব্রহ্ম ভাষা হইতে গৃহীত তাহা

নিঃসংশয়ে বলা যায়; এই নদীটি দিস্তাং বা তিস্তা যাহার পরবর্তী সংস্কৃত রূপ ত্রিস্রোতা।

যাহা হউক, অষ্ট্রিক, দ্রবিড় ও বেদ-বহির্ভূত আর্য ভাষা-প্রবাহের উপর তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল বৈদিক আর্যভাষা-প্রবাহের প্রবল স্রোত। একদিনে নয়, দু-দশ বৎসরে নয়, শত শত বৎসর ধরিয়া এবং কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই ভাষা সমস্ত পূর্বতন ভাষা-প্রবাহকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের নবরূপ দান করিয়া তাহাদের সংস্কৃতিকরণ সাধন করিয়া নিজের এক স্বতন্ত্র রূপ গড়িয়া তুলিল। তাহার ফলে যে সংস্কৃত ভাষার বিকাশ হইল তাহাতে অষ্ট্রিক ও দ্রবিড় শব্দ, পদরচনারীতি, ব্যাকরণ-পদ্ধতি সমস্তই কিছু কিছু ঢুকিয়া পড়িল। সাম্প্রতিক কালে শব্দ ও ভাষাতাত্ত্বিকেরা তাহা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। বাংলা দেশেও তাহার প্রচলন হইল. কিন্তু দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতকের সংস্কৃত লিপিগুলিতে দেখা যাইবে, সেই সংস্কৃত ভাষায়ও এমন সব শব্দের দেখা পাওয়া যাইতেছে, এমন ব্যাকরণ-বৈশিষ্ট্যের দর্শন মিলিতেছে যাহা বাংলার বাহিরে দেখা যায় না; 'বরজ', 'ডালিম্ব' (সংস্কৃত দাড়িম্ব নয়), 'লগ্‌গাবয়িত্বা' (লাগাইয়া অর্থে) ইত্যাদি তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

একান্তভাবে ভাষার দিক হইতে এই আর্যীকরণ সম্বন্ধে সুনীতিবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই উদ্ধৃতির ভিতর আর্য বা অনার্য বলিতে তিনি আর্য ভাষা ও অনার্য ভাষাকেই বুঝাইতেছেন; যেখানে আর্য বা অনার্য নরগোষ্ঠী বলিতেছেন, সেখানেও আমি আর্য বা অনার্য-ভাষাভাষী নরগোষ্ঠী হিসাবেই বুঝিতেছি; কারণ, আমি আগেই বলিয়াছি নরতত্ত্বের দিক হইতে আর্য-নরগোষ্ঠী বা দ্রবিড় নরগোষ্ঠী এই ধরনের কথা ব্যবহার করা অযৌক্তিক। অ্যালপো-দীনারীয় নরগোষ্ঠীর লোকেরাও আর্য ভাষাভাষী, আবার আদি-নর্ডিকেরাও তাহাই; আর দ্রবিড় ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে যে বিভিন্ন জন বিদ্যমান, সে-ইঙ্গিতও আগেই করিয়াছি। এই কথাটা যাহাতে আমরা বিস্মৃত না হই সেই জন্য বন্ধনীর ভিতর আমি তাহা উল্লেখ করিয়া দিতেছি।

"ভারতবর্ষের সু-সভ্য, অর্ধ-সভ্য ও অ-সভ্য, সব রকমের অনার্য [ভাষাভাষী] আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আর্য [ভাষী]দের প্রথম সংস্পর্শ হয় তো বিরোধময়ই হইয়াছিল। কিন্তু অনার্য [ভাষাভাষী] ভারতে আর্য [ভাষী]দের উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পর হইতেই উভয় শ্রেণীর মানুষ—অনার্য[ভাষী] ও আর্য[ভাষী]—পরস্পরের প্রতিবেশ-প্রভাবে পড়িতে থাকে। আর্য[ভাষী]রা বিদেশ হইতে আগত এবং পার্থিব সভ্যতায় তাহারা খুব উচ্চে ছিল না। আর্য[ভাষী]দের ভাষা আসিয়া দ্রবিড় ও অষ্ট্রিক্ ভাষাগুলিকে হীনপ্রভ করিয়া দিল; উত্তর-ভারতের কোল ও দ্রবিড়[ভাষী] অনার্য[ভাষী]দের মধ্যে ঐক্য বিষয়ক ভাষার অভাব ছিল, আর্য[ভাষী] নরগোষ্ঠীর বিজেতৃ-মর্য্যাদা লইয়া আর্যভাষা সে অভাব পূর্ণ করিল।...আর্য[ভাষী নরগোষ্ঠীর] ভাষা ও আর্য[ভাষী নরগোষ্ঠীর] ধর্ম—বৈদিক

ধর্ম ও বৈদিক হোম-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান—অনার্য[ভাষী]রা শিরোধার্য করিয়া লইল; অনার্য[ভাষী] আর্য[ভাষী]র পুরোহিত-ব্রাহ্মণের শিক্ষাও মানিল। কিন্তু অনার্য[ভাষী] নরগোষ্ঠীর ধর্ম মরিল না, তাহাদের ইতিহাস-পুরাণও মরিল না; ক্রমে অনার্য[ভাষী নরগোষ্ঠী]র ধর্ম ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক- দেবতাবাদে পৌরাণিক পূজাদিতে, যোগচর্যায়, তান্ত্রিক মতবাদে ও অনুষ্ঠানে আর্য[ভাষী]দের বংশধরদিগের দ্বারাও গৃহীত হইল। আর্য ও অনার্য [ভাষাভাষী নরগোষ্ঠী] এই টানা ও পড়িয়ান্ মিলাইয়া হিন্দু-সভ্যতার বস্ত্রবয়ন করা হইল।

"উত্তর-ভারতের গঙ্গাতীরের আর্য [ভাষী নরগোষ্ঠীর] সভ্যতার পত্তন এইরূপে হইল। এই সভ্যতায় আর্য [ভাষী নরগোষ্ঠী] অপেক্ষা অনার্য [ভাষী নরগোষ্ঠী]র দানই অনেক বেশি—কেবল আর্য [ভাষী]দের ভাষা ইহার বাহন হইল। আর্য[ভাষী]দের আগমনের সময় হইতেই হইতেছিল; গঙ্গাতীরবর্তী দেশসমূহে ইহা আরও অধিক পরিমাণে হইল।...বাঙ্গালা দেশে আর্য-ভাষা লইয়া যখন উত্তর ভারতের—বিহার ও হিন্দুস্থানের—লোকেরা দেখা দিল, যখন উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য-অনার্য[ভাষী নরগোষ্ঠী] সৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন মতবাদ বাঙ্গালা দেশে আসিল, তখন উত্তর-ভারতে মোটামুটি এক সংস্কৃতি ও এক জাত হইয়া গিয়াছে। রক্তের বিশুদ্ধি বোধহয় তখন কোনও আর্য[ভাষী] বংশীয়ের ছিল না।"

ভাষা-বিশুদ্ধিও যে ছিল আর্যভাষী নরগোষ্ঠীর তাহাও তো মনে হয় না।

৬

সংক্ষেপে জনতত্ত্ব ও ভাষাপ্রসঙ্গ লইয়া বাঙালীর গোড়া পত্তনের কথা বলা হইল। এইবার বাস্তব সভ্যতার উপাদান-উপকরণ এবং তাহার সঙ্গে বাঙালীর ও বাংলাদেশের সম্বন্ধের একটা দিগ্‌দর্শন করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

জনপ্রবাহ ও বাস্তব সভ্যতা

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ। এই কৃষিই আমাদের প্রধান ধনসম্বল; এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ পর্যন্ত যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা আমাদের দেশে চলিয়া আসিয়াছে তাহাকে যদি একান্তভাবে কৃষি-সভ্যতা ও সংস্কৃতি আখ্যা দেওয়া যায় তাহা হইলে খুব অন্যায় হয় না। বারিবহুল নদনদীবহুল সমতল প্রধান বাংলাদেশে উত্তর-ভারতের অন্য প্রদেশাপেক্ষা কৃষির এক সমৃদ্ধতর রূপ দেখা যায়। এই কৃষিকার্য যে অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় লোকেরাই আমাদের দেশে প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করিবার কারণ আছে। প্‌শিলুস্কি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, 'লাঙ্গল' কথাটাই অস্ট্রিক্‌ভাষীদের ভাষা হইতে গৃহীত। আনামীয় ভাষায় এই 'লাঙ্গল' শব্দের মূলের অর্থ 'চাষ করা' এবং 'চাষ করিবার যন্ত্র' দুই বস্তুকেই বুঝায়। খুব প্রাচীনকালেই 'লাঙ্গল' শব্দটি আর্যভাষায় গৃহীত হইয়াছিল। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, আর্যভাষীরা চাষ কার্য জানিতেন না এবং সেইহেতু যে যন্ত্র দ্বারা চাষ করা হয় সে-যন্ত্রের

সঙ্গেও তাঁহাদের পরিচয় ছিল না। এই দুইই তাঁহারা পাইয়াছিলেন মূলত অষ্ট্রিক্ ভাষাভাষী লোকদের নিকট হইতে। তীক্ষ্মমুখ কাষ্ঠ-দণ্ড যন্ত্রের সাহায্যে প্রধানত যে বস্তুর চাষ এই অষ্ট্রিক্‌ভাষী লোকেরা করিত তাহা ধান, এবং এই ধানই ছিল তাহাদের প্রধান খাদ্যবস্তু। অষ্ট্রিক্‌ভাষী লোকেদের ভিতর যে কৃষি-সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, সমতলভূমিতে ও স্তরে স্তরে পাহাড়ের গা কাটিয়া চাষের ব্যবস্থা করিয়া তাহারা বন্য ধানকে লোকালয়ের কৃষিবস্তু করিয়া লইয়াছিল এবং তাহাই ছিল তাহাদের প্রধান উপজীব্য। অষ্ট্রিক্‌ভাষী লোকদের বিস্তৃতি ভারতবর্ষে যে-যে স্থানে ছিল সর্বত্রই এই ধান চাষেরও প্রচলন হইয়াছিল; তবে বারিবহুল নদনদীবহুল সমতলভূমিতেই যে ধান বেশি জন্মাইত, ইহা তো খুবই স্বাভাবিক। সেইজন্যই আসামে, বাংলাদেশে উড়িষ্যায়, দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্রশায়ী সমতল দেশগুলিতে তাহার প্রসার লাভ করিয়াছিল বেশি; উত্তর-ভারতে তত নয়। এখনও তাহাই। পরবর্তীকালে দ্রবিড়ভাষী দীর্ঘমুণ্ড লোকেরা ভারতবর্ষে যব ও গম চাষের প্রচলন করে এবং যব ও গম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ বিহার পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। যব ও গম ধানের মত তত বারিনির্ভর নয়; উত্তর-ভারতে এই দুই বস্তুর চাষের বিস্তৃতি অনেকটা সেই কারণেই। জন-বিস্তৃতি ও জলবায়ুর কারণ দুটি একত্র করিলেই বুঝা যাইবে, উত্তর-ভারতের লোকেরা কেন আজ পর্যন্তও সাধারণত রুটিভুক্ এবং বাংলা-আসাম-উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্রশায়ী সমতলভূমির লোকেরা কেন ভাত-ভুক্।

ধান ছাড়া অষ্ট্রিক্‌ভাষী লোকেরা কলা, বেগুন, লাউ, লেবু, পান (বর), নারিকেল, জাম্বুরা (বাতাবি নেবু), কামরাঙ্গা, ডুমুর, হলুদ, সুপারি, ডালিম ইত্যাদিরও চাষ করিত। এই কৃষিদ্রব্যের নামের প্রত্যেকটিই মূলত অষ্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষা হইতে গৃহীত, এবং ইহার প্রত্যেকটিই বাঙালীর প্রিয় খাদ্যবস্তু। এই সব শব্দের সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ ও বাংলা রূপ লইয়া যে-সব সুবিস্তৃত বিচার ও গবেষণা হইয়াছে তাহার মধ্যে ইতিহাসের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। আমি সেই শব্দতাত্ত্বিক আলোচনার বিস্তৃত পুনরুক্তির অবতারণা এখানে আর করিলাম না। কিন্তু চাষবাসের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইলেও গো-পালন ইহারা জানিত বলিয়া মনে হয় না। বস্তুত, অষ্ট্রিকভাষী লোকদের মধ্যে আজও গো-পালনের প্রচলন কম; যাহাদের মধ্যে আছে তাহারা পরবর্তীকালে আর্যভাষীদের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যতদূর সম্ভব, গো-পালন আর্যভাষীদের সঙ্গে জড়িত।

তবে, তুলার কাপড়ের ব্যবহার অষ্ট্রিক-ভাষীদেরই দান। কর্পাস (কার্পাস) শব্দটিই মূলত অষ্ট্রিক্। তাঁতী বা তন্তুবায়েরা যে প্রাচীন ও বর্তমান বাঙালী সমাজের নিম্নতর স্তরের ইহার মধ্যে কি তাহার কিছুটা কারণ নিহিত? পট (পট্ট বস্ত্র, বাংলা পট্, পাট), কর্পট (=পট্টবস্ত্র) এই দুটি শব্দও মূলত অষ্ট্রিক্ ভাষা হইতে গৃহীত। মেড়া বা ভেড়ার সঙ্গে ইহারা পরিচিত ছিল। ভেড়ার লোম কি ইহারা কাজে লাগাইত? 'কম্বল' কথাটি কিন্তু

মূলত অষ্ট্রিক, এবং আমরা যে-অর্থে কথাটি ব্যবহার করি, সেই অর্থেই এই ভাষাভাষী লোকেরাও করে।

বুঝা গেল, অষ্ট্রিক্‌ভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়েরা ছিল মূলত কৃষিজীবী। কিন্তু ইহাদের সবারই জীবিকা ছিল কৃষিকার্য একথা বলা যায় না। কতকগুলি শাখা অরণ্যচারীও ছিল। এই অরণ্যচারী নিষাদ ও ভীল, কোল শ্রেণীর শবর, মুণ্ডা, গদব, হো, সাঁওতাল প্রভৃতিরা প্রধানত ছিল পশু-শিকারজীবী এবং পশু-শিকারে ধনুর্বাণই ছিল তাহাদের প্রধান অস্ত্রোপকরণ। বাণ, ধনু বা ধনুক, পিনাক এই সব কটি শব্দই মূলত অষ্ট্রিক্। ইহারা যে-সব পশুপক্ষী শিকার করিত, অনুমান করা যায়, তাহাদের মধ্যে হাতি, মেড়া (ভেড়া), কাক, কর্কট (কাঁকড়া) এবং কপোতের (যাহার অর্থ শুধু পায়রাই নয়, যে কোনও পক্ষীও) নাম করা যাইতে পারে। গজ, মাতঙ্গ, গণ্ডার (হস্তী অর্থে) এবং কপোত মূলত অষ্ট্রিক্ ভাষা হইতে গৃহীত। অন্যান্য অস্ত্রোপকরণের মধ্যে দা ও করাতের নামোল্লেখ করা যায়; ইহারাও অষ্ট্রিক্‌গোষ্ঠির ভাষালব্ধ বলিয়া শব্দতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন।

সমুদ্রতীরশায়ী দেশ, দ্বীপ ও উপদ্বীপবাসী অষ্ট্রিক্‌ভাষী মেলানেশীয়, পলিনেশীয় প্রভৃতি লোকেরা জলপথে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য গুঁড়িকাঠের এক প্রকার লম্বা ডোঙ্গা (এই কথাটিও অষ্ট্রিক্) এবং লম্বা লম্বা খণ্ড খণ্ড গুঁড়িকাঠ একত্র করিয়া ভাসমান ভেলার আকারে বড় বড় নৌকা তৈয়ারি করিত, এ-তথ্য জনতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করিয়াছেন। গুঁড়িকাঠের তৈরি ডিঙ্গা, ছোট নৌকা এখনও নদীখালবিলবহুল নিম্ন, পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গে বহুল প্রচলিত। যাহাই হউক, এই সব ডোঙ্গা, ডিঙ্গা ও ভেলায় চড়িয়াই প্রাচীন অষ্ট্রিক্‌ভাষী লোকেরা নদী ও সমুদ্রপথে যাতায়াত করিত এবং এইভাবেই তাহারা একটা বৃহৎ সামুদ্রিক বাণিজ্যও গড়িয়া তুলিয়াছিল।

বস্তুত, বাংলা তথা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অষ্ট্রিক্‌ভাষী জাতিদের দানের এত প্রাচুর্য দেখিয়াই লেভি সাহেব বলিয়াছিলেন,

> "We must know whether the legends, the religion and the philosophical thoughts of India do not owe anything to this past. India had been too exclusively examined from the Indo-European stand-point. It ought to be remembered that India is a great maritime country...the movement which carried the Indian colonisation (in historical times) towards the Far East..was far from inaugurating a new route. Adventurers, traffickers and missionaries profited by the technical progress of navigation and followed under better conditions of comfort and efficiency, the way traced from time immemorial, by the mariners of another race, whom Aryan or Aryanised India despised as savages."

নির্মলকুমার বসু মহাশয় আর একটি জনগত তথ্যের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ অযৌক্তিক নয়। আসামে, বাংলাদেশে, উড়িষ্যায়, দক্ষিণ-ভারতের সর্বত্র, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে সকল স্থানেই লোকেরা সাধারণত রান্নার কাজে সরিষা, নারিকেল, অথবা তিল তৈলের ব্যবহার করিয়া থাকে। সেলাইবিহীন উত্তর ও নিম্নবাস,

সাধারণত ধুতি, চাদর, উড়্নি, উত্তরীয় ইত্যাদির ব্যবহারই এইসব দেশের জনসাধারণের পরিধেয়। আর, যে-পাদুকার ব্যবহার ইহারা করে তাহার পশ্চাদ্ভাগ উন্মুক্ত। বিহারের পশ্চিম প্রান্ত হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীরা কিন্তু পরিবর্তে ব্যবহার করে যুক্ত, সেলাই করা জামা কাপড় এবং বদ্ধ-গোড়ালি পাদুকা। এই পার্থক্যের মধ্যে জন-পার্থক্যের ইঙ্গিত যে আছে তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, কারণ, জলবায়ুর পার্থক্য দ্বারা ইহার সবটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

এ-পর্যন্ত অষ্ট্রিক্‌ভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়দের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, ইহাদের মধ্যে যে সব শ্রেণী সভ্য তাহারা যে বাস্তব সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা গ্রামীণ, একান্তভাবে গ্রামকেন্দ্রিক। কৃষিজীবী বলিয়া খাদ্যাভাব ইহাদের মধ্যে বড় একটা ছিল না এবং লোক সমৃদ্ধিও যথেষ্ট ছিল এ অনুমানও করা যাইতে পারে। বর্তমান অস্ট্রিক-ভাষী লোকদের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ইহাদের কোনও কোনও প্রাগ্রসর শাখার সমাজবন্ধন নিজেদের গ্রাম অতিক্রম করিয়াও বিস্তৃত হইত। মুণ্ডাদের মধ্যে কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া গ্রামসঙ্ঘের মত একটা সমাজবন্ধন এখনও দেখা যায়। শরৎকুমার রায় মহাশয় তো মনে করেন, "পঞ্চায়ত প্রথা সম্ভবত ভারতে প্রথম ইহাদেরই প্রবর্তিত। পঞ্চায়তকে ইহারা সত্যসত্যই ধর্মাধিকরণ জ্ঞানে মান্য করে। এখনও আদালতে সাক্ষ্য দিবার পূর্বে মুণ্ডা সাক্ষী তাহার জাতি-প্রথা অনুসারে পঞ্চের নাম লইয়া এই বলিয়া শপথ করে, 'সিরমারে-সিঙ্গবোঙ্গা ওতেরে পঞ্চ', অর্থাৎ—আকাশে সূর্য-দেবতা, পৃথিবীতে পঞ্চায়ত।" তিনি একথাও বলেন যে, "ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতির কিংবদন্তী আছে যে, এক সময়ে ভারতে ইহাদের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গণতন্ত্র (?) রাজ্য ছিল। রাজশক্তির চিহ্নস্বরূপ মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি জাতির প্রত্যেক গ্রামসঙ্ঘ ও গ্রামে এখনও বিভিন্ন চিহ্ন অঙ্কিত পতাকা সযত্নে ও সসম্মানে রক্ষিত হয়। মধ্যপ্রদেশে দ্রবিড়[ভাষী]পূর্ব গন্দ্ জাতির শক্তিশালী সমৃদ্ধ রাজ্য আধুনিক কাল পর্যন্ত ছিল। গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় রাজ্যাধিকারের কিংবদন্তী মুণ্ডা প্রভৃতি কয়েকটি জাতির মধ্যে এখনও বর্তমান।"

অষ্ট্রিক্ ভাষাভাষী লোকদের বাস্তব সভ্যতার কিছুটা আভাস পাওয়া গেল এবং সে-সভ্যতা বাংলাদেশে কতখানি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহারও খানিকটা ধারণা ইহার ভিতর পাওয়া গেল। দীর্ঘমুণ্ড দ্রবিড়-ভাষাভাষী লোকদের বাস্তব সভ্যতার উপাদান-উপকরণ আরও প্রচুর। মিশর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণ পর্যন্ত এক দীর্ঘমুণ্ড জন এবং পরবর্তীকালে ভূমধ্য জন-সংপৃক্ত আর এক দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠী, এই দুইজনের রক্তধারার সংমিশ্রণে ভারতবর্ষে সিন্ধুনদের উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত এবং উত্তর-ভারতেরও প্রায় সর্বত্রই এক বিরাট নরগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের কোনও কোনও স্থানে, উত্তর-ভারতের ২।৪টি স্থানে আকস্মিক আবিষ্কারে, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ কাহিনীতে, কিন্তু বিশেষভাবে হরপ্পা, মহেন্-জো-দাড়ো

এবং নাল প্রভৃতি নিম্ন-সিন্ধু উপত্যকার একাধিক স্থানের প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই নরগোষ্ঠীর বাস্তব সভ্যতার যে-চিত্র আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে তাহা আজ সর্বজনবিদিত। সাম্প্রতিককালে এ সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণাও হইয়াছে প্রচুর। তাহার বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নয়, প্রয়োজনও কিছু নাই। তবু এই নরগোষ্ঠীর সভ্যতার উপাদান-উপকরণের মোটামুটি একটু পরিচয় লইলে ভারতবর্ষের এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সভ্যতার অন্যতম মূল সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা যাইবে।

নব্য প্রস্তর যুগের এই দ্রবিড় ভাষাভাষী লোকেরাই ভারতবর্ষের নাগর-সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা। আর্যভাষায় 'উর', 'পুর', 'কুট' প্রভৃতি নগর-জ্ঞাপক যে-সব শব্দ আছে সেগুলি প্রায় সবই দ্রবিড় ভাষা হইতে উদ্ভূত। রামায়ণে স্বর্ণলঙ্কার বিবরণ, মহাভারতে ময়দানবের গল্প, মহেন্-জো-দড়োর নগরবিন্যাসের উন্নত ও সমৃদ্ধরূপ, ভারতের বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ সমস্তই প্রাক্-আর্যভাষী দীর্ঘমুণ্ড দ্রবিড়-ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর নগর-নির্ভর সভ্যতার দিকে ইঙ্গিত করে, একথা কতকটা নিঃসংশয়ে অনুমান করা চলে। নগর-নির্ভর সভ্যতা জটিল; এবং এই সভ্যতার উপাদান-উপকরণ বহুল এবং জটিল হইতে বাধ্য। বিচিত্র খনিজ বস্তুর ব্যবহার তাহার অন্যতম প্রমাণ। এই গোষ্ঠীর লোকেরা সোনা, রূপা, সীসা, ব্রোঞ্জ ও টিনের ব্যবহার জানিত; শিলাজতু, নানাপ্রকারের পাথর, জান্তব হাড়, পোড়ামাটি, ও নানাপ্রকার খনিজ ও সামুদ্রিক দ্রব্য ইত্যাদি নিজেদের বিচিত্র প্রয়োজনে, অলংকরণে, বিচিত্র রূপে ও রচনায় ব্যবহার করিত। বর্শা, ছুরি, খড়্গ, কুঠার, তীর, ধনুক, মুষল, বাঁটুল, তরবারি, তীরের ফলা ইত্যাদি ছিল ইহাদের অস্ত্রোপকরণ। পাথরের হলমুখ, চকমকি পাথরের ছুরি ও কুঠার, নানাপ্রকার ধাতু ও মাটির থালাবাটি ইত্যাদি বিচিত্র রূপের নিত্য ব্যবহার্য গৃহোপকরণ, মাটির তৈয়ারি নানাপ্রকারের খেলনা, তামা ও ব্রোঞ্জের দেহসজ্জো-পকরণ, খেলার জন্য গুটি, গুলি ও পাশা ইত্যাদি অসংখ্য, বিভিন্ন ও বিচিত্র উপাদান এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। গরুর গাড়িও এই সভ্যতারই দান বলিয়া মনে হয়। সুতাকাটা, কাপড় বোনা তো ইহারা জানিতই। যব ও গম, মাছ, মেষ, শূকর ও কুক্কুট-মাংস ছিল ইহাদের প্রিয় খাদ্যবস্তু; বৃহৎ বৃষ (ককুদ্মান্), গরু, মহিষ, মেষ, হাতি, উট, শূকর, ছাগল, কুক্কুট বা মুরগি, কুকুর ও ঘোড়া (?) ছিল ইহাদের গৃহপালিত জন্তু। ইহাদের বিলাস-দ্রব্যের প্রাচুর্য এবং আরাম উপভোগের উপকরণের যে-পরিচয়, নানাপ্রকার হস্ত ও কারুশিল্পের যে-পরিচয় সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষে এবং রামায়ণ-মহাভারতের নানা গল্পের মধ্যে পাওয়া যায় তাহাতেও এক সমৃদ্ধ নগর-নির্ভর সভ্যতার দিকে ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। তাম্র-প্রস্তরযুগের চিত্রকলার, জ্যামিতিক রেখাঙ্কন এবং অলংকরণের, মাটির পুতুল ও খেলনায় চারুকলার যে-রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত তাহারও কিছুটা এই দ্রবিড়ভাষী দীর্ঘমুণ্ড নর-গোষ্ঠীরই সৃষ্টি একথা মনে করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। ছোট বড় রাস্তা, জলনিঃসরণের প্রণালী, বড় ছোট একাধিক তলাবিশিষ্ট ইটকাঠের বাড়ি, দুর্গ, সিঁড়ি, খিলানযুক্ত দরজা,

জানালা, স্নানাগার, কূপ, জলকুণ্ড, প্রাঙ্গণ, পূজামন্দির, মৃতদেহ সংকার-স্থান প্রভৃতি নগর-বিন্যাসের যাহা কিছু অত্যাবশ্যক উপাদান, তাম্র-প্রস্তরযুগীয় দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীর রচিত বাস্তব সভ্যতায় তাহার কিছুরই যে অভাব ছিল না হরপ্পা ও মহেন্-জো-দাড়োর ধ্বংসাবশেষ তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ, সোনা, কাঠ ইত্যাদির ব্যবহার এবং এসব বস্তুর সাহায্যে যে কারুশিল্প ইহারা জানিত তাহার একটু পরোক্ষ প্রমাণ ভাষাতত্ত্বের মধ্যেও পাওয়া যায়। বাংলা কামার (পরবর্তী সংস্কৃত কর্মকার) তো দ্রবিড় ভাষার 'কর্মার' শব্দ হইতেই গৃহীত। চারুশিল্পের সঙ্গে পরিচয়ের প্রমাণ, 'রূপ' ও 'কলা' এই দুইটি দ্রবিড় শব্দ। মৃৎপাত্র যে তৈরি করিত তাহার নাম হইতেছে 'কুলাল'; বানর, গণ্ডার ও ময়ূরের সঙ্গে পরিচয়ের প্রমাণ 'কপি', 'মর্কট', 'খড়্গ' (জন্তু অর্থে) ও 'ময়ূর' প্রভৃতি দ্রবিড় ভাষার শব্দ। চালের যে ক'টি শব্দ আছে সংস্কৃত ভাষায়, তাহার মধ্যে অন্তত দুইটি, 'তণ্ডুল' ও 'ব্রীহি', দ্রবিড়-ভাষা হইতে গৃহীত। লক্ষণীয় ইহাই যে, এই প্রত্যেকটি শব্দই ঋগ্বেদ ও ব্রাহ্মণ হইতে আহৃত। আর্য সভ্যতার প্রথম স্তরের ইতিহাসেই দ্রবিড় সভ্যতার বাস্তব উপকরণগত এইরূপ অনেক শব্দ ঢুকিয়া পড়িয়াছে। পরবর্তীকালে সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে বস্তুবাচক আরও কত অসংখ্য শব্দ যে ঢুকিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এইসব বস্তুর সঙ্গে যদি পূর্ব হইতেই আর্যভাষীদের পরিচয় থাকিত তাহা হইলে হয়ত তাহাদের ভাষায় সেইসব বস্তুর নামও থাকিত; ছিল না, বলিয়াই হয়তো এমন ভাষাভাষী লোকদের নিকট হইতে তাহা ধার করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইতে হইয়াছে যাহাদের মধ্যে সেই সব বস্তু ছিল এবং সেইহেতু তাহাদের নামও ছিল, এবং যাহাদের সঙ্গে আর্যভাষীদের পাশাপাশি বাস করিতে হইয়াছে, কখনও শত্রুভাবে, কখনও মিত্রভাবে। এইসব বস্তুবাচক অসংখ্য শব্দের ইতিহাসের মধ্যে দ্রবিড় ভাষাভাষীর উন্নত বাস্তব সভ্যতার ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট।

দ্রবিড় ভাষাভাষী বিভিন্ন দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ বাংলাদেশে কতখানি সঞ্চারিত হইয়াছে বা হয় নাই তাহার ইঙ্গিত আগেই করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের ভাষা ও বাস্তব সভ্যতার চলমান প্রবাহ যে বাংলার ভাষা ও সভ্যতার প্রবাহে স্রোতধারা সঞ্চার করিয়াছে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। বাংলা দেশে এই ভাষা-প্রভাবের ও সভ্যতার বাহক, যতদূর অনুমান করা যায়, দ্রবিড়-ভাষাভাষী লোকেরা নিজেরা ততটা নয় যতটা আর্যভাষীরা নিজেরা। বাংলাদেশের আর্যীকরণের আগে অ্যালপো-দীনারীয় ও আদি-নর্ডিক লোকেরা যতটা দ্রবিড়-ভাষীদের ভাষা ও বাস্তব সভ্যতা আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহারই অনেকখানি অংশ আর্যীকরণের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা দেশে সঞ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তবে, প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাগে নাই এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। বাংলা ভাষার কিছু কিছু শব্দ ও পদরচনা রীতি এবং ব্যাকরণ পদ্ধতিতে যে দ্রবিড় প্রভাব সুস্পষ্ট তাহা তো আগেই বলা হইয়াছে; বাস্তব সভ্যতায় এই দ্রবিড়-ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ

প্রভাব এতটা সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র না হইলেও সাধারণভাবে ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র না হইবার কারণ, আর্যভাষী অ্যালপো-দীনারীয় ও আদি-নর্ডিক লোকেরা সেই প্রভাবকে একান্তভাবে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল এবং আজ আমরা তাহাকে আর্যভাষী লোকের সভ্যতার অঙ্গীভূত করিয়াই দেখি। তবু মনে হয়, বাঙালীর টাটকা ও শুকনা মৎস্যাহারে অনুরাগ, মৃৎশিল্প ও অন্যান্য কারুশিল্পে দক্ষতা, চারুশিল্পের অনেক জ্যামিতিক নক্সা ও পরিকল্পনা, নগর-সভ্যতার যতটুকু সে পাইয়াছে তাহার অভ্যাস ও বিকাশ, বিলাসোপকরণের অনেক সামগ্রী, জলসেচনে উন্নততর চাষের অভ্যাস প্রভৃতি দ্রবিড়-ভাষাভাষী নরগোষ্ঠী প্রবাহেরই ফল। মহেন্-জো-দড়োর ও হরপ্পার দীর্ঘমুণ্ড লোকেরা যে মৎস্যাহারী ছিল তাহার প্রমাণ সুবিদিত; বৈদিক আর্যেরা ছিলেন মাংসাহারী; কিন্তু পরবর্তীকালে নানাকারণে, বিশেষতঃ বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর অহিংসাবাদের অভ্যুদয়ে প্রাণীহত্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে মাংসাহারের এবং মৎস্যাহারের প্রতি একটা বিরাগ আর্য ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং আর্য সংস্কৃতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দ্রবিড়ভাষী লোকদের দেশেও তাহা সংক্রামিত হয়। বাংলা দেশে এই সংস্কৃতির বিস্তার অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছিল বলিয়া এদেশে মৎস্যাহারের প্রতি বিরাগ উৎপাদন ততটা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য, এদেশের নদনদীবহুল জলবায়ু এবং মাছের সহজলভ্যতা এই অনুরাগের আর একটি প্রধান কারণ, একথাও অস্বীকার করা যায় না। তাহা ছাড়া, আগে হইতেই অষ্ট্রিক্ ভাষাভাষী লোকদের ভিতরও মৎস্যাহারের প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়।

অ্যাল্‌পো-দীনারীয় নরগোষ্ঠীর বাস্তব-সভ্যতার রূপ যে কি ছিল, তাহা বলিবার কিছু উপায় নাই। নানা কারণে মনে হয়, বৈদিক আর্যভাষীদের ভাষা ও সভ্যতা হইতে তাহার এক পৃথক অস্তিত্ব ছিল। পূর্ব-ভারতের অ্যাল্‌পো-দীনারীয় অবৈদিক আর্যভাষীদিগকে বৈদিক আর্যভাষীরা ঘৃণার চক্ষেই দেখিত এবং তাহাদের অভিহিত করিত "ব্রাত্য" বলিয়া। এই "ব্রাত্য" অবৈদিক আর্যদের ভিতর হইতেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সূচনা বলিয়া অনুমান করিলে ইতিহাস-অসম্মত কিছু বলা হয় না। আর, যেহেতু ইহারাও ছিল আর্যভাষী, সেই হেতু যে নিজেদের ধর্মানুশাসনগুলিকে বলিত 'আর্যসত্য', তাহাতেও কিছু অন্যায় হয় নাই। "ব্রাত্যষ্টোম" যজ্ঞ করিয়া ইহাদের শুদ্ধিসাধন করিয়া নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিবার একটা কৌশল বৈদিক আর্যেরা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহারা যে (বৈদিক ভাবে ও ধ্যানে, অর্থাৎ বৈদিক ধর্মে) "অ-দীক্ষিত" তাহা বলিতেও ছাড়েন নাই। এই তথ্য হইতে মনে হয়, এই অ্যাল্‌পো-দীনারীয় অবৈদিক আর্যভাষীদের স্বতন্ত্র একটা বাস্তবসভ্যতার রূপও ছিল; কিন্তু তাহা অনুমান করিবার উপায় আজ আর কিছু অবশিষ্ট নাই।

বৈদিক আর্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ছিল একান্তই প্রাথমিক স্তরের। খড়, বাঁশ, লতা-পাতার স্বল্পকালস্থায়ী কুঁড়ে ঘরে অথবা পশুচর্মনির্মিত তাঁবুতে ইহারা বাস করিত, গো-পালন জানিত, পশুমাংস পোড়াইয়া তাহাই আহার করিত এবং দলবদ্ধ হইয়া এক জায়গা হইতে অন্য

জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত। যাযাবরত্ব ত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়া স্থিতিলাভ করিবার পর পূর্ববর্তী অষ্ট্রিক ও দ্রবিড় ভাষাভাষী লোকদের সংস্পর্শে আসিয়া যথাক্রমে কৃষি অর্থাৎ গ্রাম্য সভ্যতা এবং নাগর-সভ্যতার সঙ্গে ধীরে ধীরে তাহাদের পরিচয় ঘটিল এবং ক্রমে তাহারা দুই সভ্যতাকেই একান্তভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব এক নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিল। এই সভ্যতার বাহন হইল আর্যভাষা। এই দুই সভ্যতার সমন্বিত আর্যীকরণই হইল আর্যভাষীদের বিরাট কীর্তি, অথচ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে তাহাদের একান্ত *নিজস্ব কিছু তাহাতে বিশেষ নাই।*

বাংলা দেশ ও বাঙালীর বাস্তব সভ্যতার রূপ শুধু প্রাচীনকালেই নয়, উনবিংশ শতক পর্যন্ত একান্তভাবেই গ্রামীণ, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। দ্রবিড়-ভাষাভাষী লোকদের উদ্ভূত নাগর-সভ্যতার স্পর্শ বাংলা দেশে খুব কমই লাগিয়াছে; সেইজন্যই সুদীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে নগরের প্রাধান্য নাই বলিলেই চলে। উত্তর ভারতে রাজগৃহ, পাটলীপুত্র, সাকেত, শ্রাবস্তী, হাস্তিনপুর, পুরুষপুর, শাকল, অহিচ্ছত্র, কান্যকুব্জ, তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, বিদিশা, কৌশাম্বী প্রভৃতি, দক্ষিণ-ভারতের অসংখ্য সামুদ্রিক বাণিজ্যের বন্দর, পুর, নগর প্রভৃতি ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, বাংলা দেশে বাংলার ইতিহাসে নগর-নগরী সে-স্থান অধিকার করিয়া নাই। বস্তুত বাংলাদেশে নগরের সংখ্যাও কম এবং বাঙালীর সমাজবিন্যাসে নগরের প্রাধান্যও কম। একথা অন্যত্র আরও পরিষ্কার করিয়া বলিবার সুযোগ হইয়াছে; এখানে এইটুকু বলিলেই চলিতে পারে যে, নাগর-সভ্যতার স্পর্শ বাংলা দেশে যে যথেষ্ট লাগে নাই, তাহার কারণ বাংলা দেশ চিরকালই ভারতের একপ্রান্তে নিজের কৃষি ও গ্রামীণ সভ্যতা লইয়া পড়িয়া থাকিয়াছে; সর্বভারতীয় প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে তাহার যোগ আর্যভাষা ও আর্যসভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়াই এবং সেই সূত্রে সে দ্রবিড় ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির যতটুকু প্রবাহ-স্পর্শ পাইয়াছে, তাহাই বোধ হয় তাহার দ্রবিড়ী উপাদান এবং সে-উপাদান তাহার মূল অষ্ট্রিক্ উপাদানকে একান্তভাবে বিলোপ করিতে পারে নাই। ঐতিহাসিক কালেও দক্ষিণ হইতে নানা সমরাভিযান এবং আদানপ্রদানের ফলে বাংলা দেশে কিছু কিছু দক্ষিণী দ্রবিড়-প্রভাব আসিয়াছে, সন্দেহ নাই; বাংলাদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় ভাষায়, বাস্তব সভ্যতার কিছু কিছু উপাদান-উপকরণে এবং মানস-সংস্কৃতিতে। তাহা স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার স্থান এখানে নয়।

৭

বাস্তব-সভ্যতার উপাদান উপকরণ এবং তাহার সঙ্গে জনপ্রবাহের সম্বন্ধের কিছু আভাস লইতে চেষ্টা করা গেল। এইবার মানস-সংস্কৃতি এবং জনপ্রবাহের খানিকটা সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাইতে পারে।

অষ্ট্রিক-ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়দের কথাই সর্বাগ্রে বলিতে হয়, কারণ ভারতীয় নিগ্রোবটুদের মানস-সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রায় কিছুই আমরা জানি না। অষ্ট্রিক-ভাষাভাষী প্রাচীন ও বর্তমান জনদের সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় এবং অনুমান করা যায়, তাহাতে মনে হয়, ইহারা অতি সরল ও নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিল। ঐতিহাসিক যুগে ইহাদের বিবর্তন ও পরিবর্তনের গতি ও প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও সংহতির কিছু অভাব ছিল; সহজেই ইহারা পরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিত এবং আত্মসমর্পণ করিয়াই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিত। বারবার অধিকতর পরাক্রান্ত জাতির নিকট রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বশ্যতা স্বীকার করিয়াও যে ইহারা নিজেদের জনগত বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি আজও বজায় রাখিতে পারিয়াছে, তাহাতে মনে হয় এই বশ্যতা স্বীকার করিয়াও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখাই ইহাদের প্রাণশক্তির মূল। বর্তমান শবর বা সাঁওতাল, ভূমিজ বা মুণ্ডা প্রভৃতির প্রকৃতি একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলে মনে হয়, ইহারা কিছুটা কল্পনাপ্রবণ, দায়িত্ববিহীন, অলস, ভাবুক এবং কতকটা কাম-পরায়ণও বটে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এত বিবর্তন-পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তাহাতে বিশেষ বদলায় নাই।

জনপ্রবাহ ও মানস-সংস্কৃতি

এই অষ্ট্রিক-ভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়েরা মানুষের একাধিক জীবনে বিশ্বাস করিত, এখনও করে। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার আত্মা কোনও পাহাড় অথবা গাছ অথবা কোন জন্তু বা পক্ষী বা অন্য কোনও জীবকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে, ইহাই ছিল ইহাদের ধারণা; পরবর্তীকালে এই ধারণাই হিন্দু পুনর্জন্মবাদ ও পরলোকবাদে রূপান্তরিত হয়। মৃতদেহ ইহারা কাপড় অথবা গাছের ছালে জড়াইয়া বৃক্ষস্কন্ধে অথবা ডালে ঝুলাইয়া রাখিত, বা মাটির নিচে কবর দিয়া তাহার উপর বড় বড় পাথর সোজা করিয়া পুঁতিয়া দিত, অথবা স্ত্রীলোক হইলে কবরের উপর লম্বালম্বি করিয়া শোয়াইয়া দিত (গদ্‌, কোরক, খাসিয়া প্রভৃতিরা এখনও ঠিক যেমনটি করে), মৃত ব্যক্তিকে মাঝে মাঝে আহার্যও দান করিত, এখনও করে। এইসব বিশ্বাস ও রীতিই পরবর্তী কালে হিন্দুসমাজে গৃহীত হইয়া শ্রাদ্ধাদি কার্যে, মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান ইত্যাদি ব্যাপারে রূপান্তরিত হইয়াছে। লিঙ্গ-পূজাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। 'লিঙ্গ' শব্দটিই তো অষ্ট্রিক ভাষার দান, এবং কোনও কোনও নৃতত্ত্ববিদ খাসিয়াদের সমাধির উপর যে দীর্ঘাকার পাথর দাঁড় করান এবং শোয়ান থাকে তাহাকে যথাক্রমে লিঙ্গ ও যোনি বলিয়া অনুমানও করিয়াছেন। বস্তুত, পলিনেশীয় ভাষায় এখনও 'লিঙ্গ' তাহার সুপরিচিত অর্থেই ব্যবহৃত হয় এবং তাহার তুষ্টি বিধানের চেষ্টাও সুবিদিত। প্‌শিলুস্কি এই সম্বন্ধে বলিতেছেন,

"The phallic cults, of which we know the importance in the ancient religions of Indo-China, are generally considered to have been derived from Indian

Saivism. It is more probable that the Aryans have borrowed from the aborigines of India the cult of Linga as well as the name of the idol. These popular practices despised by the Brahmanas were ill-known in old times. If we try to know them better, we will probably be able to see clearly why so many non-Aryan words of the family of Linga have been introduced into the language of the conquerors."

অষ্ট্রিক-ভাষীরা বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফলমূল, ফুল, কোন বিশেষ স্থান, বিশেষ বিশেষ পশু, পক্ষী ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহার পূজা করিত ; এখনও খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, শবর ইত্যাদি কোমের লোকেরা তাহা করিয়া থাকে। বাংলাদেশে পাড়াগাঁয়ে গাছ-পূজা তো এখনও বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে সেঁওড়া গাছ ও বটগাছ ; আর, পাথর ও পাহাড় পূজাও একেবারে অজ্ঞাত নয়। বিশেষ বিশেষ ফল-ফুল-মূল সম্বন্ধে যে-সব বিধি-নিষেধ আমাদের মধ্যে প্রচলিত, যে-সব ফলমূল আমাদের পূজার্চনায় উৎসর্গ করা হয়, আমাদের মধ্যে যে নবান্ন উৎসব প্রচলিত, আমাদের ঘরের মেয়েরা যে-সব ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি করিয়া থাকেন, ইত্যাদি, বস্তুত, আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচার-অনুষ্ঠানই এই আদিম অষ্ট্রিক-ভাষাভাষী জনদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, ইহাদের অনেকগুলিই কৃষি ও গ্রামীণ সভ্যতার স্মৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। আমাদের নানা আচারানুষ্ঠানে, ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আজও ধান, ধানের গুচ্ছ, দূর্বা, কলা, হলুদ, সুপারি, নারিকেল, পান, সিন্দূর, কলাগাছ প্রভৃতি অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। লক্ষণীয় এই যে, ইহার প্রত্যেকটিই অষ্ট্রিক-ভাষাভাষী জনদের দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। বাংলাদেশে, বিশেষভাবে পূর্ববাংলায়, এক বিবাহ ব্যাপারেই 'পানখিলি', 'গাত্রহরিদ্রা', 'গুটিখেলা', 'ধান ও কড়ির স্ত্রী-আচার' প্রভৃতি যে-সব অবৈদিক, অস্মার্ত ও অব্রাহ্মণ্য, অপৌরাণিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি দেখা যায় তাহাও তো এই কৃষি-সভ্যতা ও কৃষি-সংস্কৃতির স্মৃতিই বহন করে। ধান্যশীর্ষপূর্ণ যে লক্ষ্মীর ঘটের পূজা বাংলাদেশে প্রচলিত তাহার অনুরূপ পূজা তো এখনও ওঁরাও-মুণ্ডাদের মধ্যে দেখা যায় ; ইহাদের 'সরণা' দেবীর মাথায় ধান্যশীর্ষের জটার কল্পনা সুপ্রাচীন। শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে অথবা অন্য কোনও শুভ কাজের প্রারম্ভে 'আভ্যুদয়িক' করিয়া পিতৃপুরুষের যে-পূজা আমরা করিয়া থাকি, তাহাও তো আমরা এই অষ্ট্রিক-ভাষী লোকদের নিকট হইতেই শিখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। এই ধরনের পিতৃপুরুষের পূজা এখনও সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, শবর, ভূমিজ, হো ইত্যাদির মধ্যে সুপ্রচলিত। শরৎকুমার রায় মহাশয় তো বলেন, "ভারতে শক্তিপূজার প্রবর্তন সম্ভবত ইহারাই প্রথম করে। ওঁরাও প্রভৃতি জাতির চাণ্ডী নামক দেবতার সহিত হিন্দু চণ্ডীদেবীর সাদৃশ্য দেখা যায়। অর্ধরাত্রে উলঙ্গ হইয়া চাণ্ডীর ওঁরাও অবিবাহিত যুবক-পূজারী 'চাণ্ডী স্থানে' গিয়া পূজা করে।" বাংলাদেশে হোলি বা হোলাক উৎসব এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে চড়ক-ধর্মপূজার মিশ্রিত সমন্বিত রূপ বিশ্লেষণ করিলে এমন কতকগুলি উপাদান ধরা পড়ে যাহা মূলত আর্যপূর্ব আদিম

নরগোষ্ঠীদের মধ্যে এখনও প্রচলিত। নিম্নশ্রেণী ও নিম্নবর্ণের অনেক ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধেই একথা বলা যাইতে পারে।

দ্রবিড়-ভাষী লোকদের মানসপ্রকৃতিও ইহাদের প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পকলা এবং প্রাগৈতিহাসিক তাম্র-প্রস্তর যুগের ধ্বংসাবশেষ হইতে কিছু কিছু অনুমান করা যায়। মনে হয়, ইহারা খুব কর্মঠ ও উদ্যমশীল, সংঘশক্তিতে দৃঢ়, শিল্প-সুনিপুণ এবং কতকটা অধ্যাত্মরহস্যসম্পন্ন প্রকৃতির লোক ছিল। প্রাচীন তামিল সাহিত্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে ইহাদের প্রকৃতিতে ভাবুকতার এবং সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে "সভ্যতার উন্নতির সহিত শ্রেণীবিভাগের বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দ্রবিড় সমাজের শ্রেণীবিভাগে সর্বোচ্চ ছিল 'মাল্লের' বা রাজা, তারপর পর্যায় অনুসারে 'বল্লাল' বা সামন্ত রাজা [বল্লালসেনের নামের বল্লালের সঙ্গে এই বল্লাল কথাটির কি কোন অর্থগত সম্বন্ধ আছে?], তারপর 'বেল্লাল' বা ক্ষেত্রস্বামী বা কৃষক, তারপর 'বণিত' বা ব্যবসায়ী। এই সব শ্রেণী ছিল উচ্চ বা 'মলোর', তারপর শ্রমজীবী বা 'বিলইবলার', আর সর্বনিম্নে দাস জাতি বা 'আদিওর'। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার বহু বিভাগ ছিল। উচ্চ-নীচ ভেদ-প্রবণতা দ্রবিড় ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। উহাদের অস্পৃশ্যতাবোধ ক্রমে ভারতের বর্তমান বংশগত অনমনীয় জাতিভেদ প্রথায় পরিণত হইল। সম্ভবত দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর মধ্যে হঠযোগের প্রচলন হওয়ায় এই অস্পৃশ্যতাবোধ আরও প্রবল হইয়াছিল। পরিশেষে ইহারা যখন আর্য-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসিল, তখন দেখিল আর্যেরা শুচিপ্রবণতার জন্য অপরিচ্ছন্ন দ্রবিড়পূর্ব নরগোষ্ঠীর সংস্পর্শ বর্জনের প্রচেষ্টা করিতেন। তাহাতে এই দ্রবিড়দের বাহ্য শুচিবোধ আরও উত্তেজিত হইল?" শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ স্বীকার না করিয়াও বলা যাইতে পারে, দ্রবিড়-ভাষাভাষী লোকদের অস্পৃশ্যতাবোধ এবং শ্রেণী-পার্থক্য পরবর্তীকালে আর্যভাষী সমাজে খানিকটা সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যোগধর্ম ও আনুষঙ্গিক সাধনপদ্ধতি যে ইহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহা তো প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতাই অনেকটা প্রমাণ করিয়াছে।

আর্য এবং পরবর্তী পৌরাণিক হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা, মন্দির, পশুবলি, অনেক দেবদেবী, যথা, শিব ও উমা, শিবলিঙ্গ, বিষ্ণু ও শ্রী প্রভৃতি যে-স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার মূলে দ্রবিড়ভাষী লোকদের প্রভাব অনস্বীকার্য। যাগযজ্ঞও, যতদূর জানা যায়, ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর মধ্যেই যেন বেশি প্রচলিত ছিল; প্রাচীন মিশরে, আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যজ্ঞবেদীর নিদর্শন কিছু কিছু মিলিয়াছে এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অরণি ও ব্রীহি, যজ্ঞের যে দু'টি প্রধান উপাদান, এই দুইটি শব্দই সম্ভবত মূলত দ্রবিড় ভাষার সঙ্গে সংপৃক্ত। অবশ্য ইহাও হইতে পারে, যাগযজ্ঞ ভারতীয় আর্যভাষী আদি-নর্ডিক-দেরই উদ্ভূত ধর্মানুষ্ঠান; কিন্তু যেহেতু ভারতের অন্যান্য নর্ডিক নরগোষ্ঠীর মধ্যে তাহার প্রচলন

দেখা যায় না, সেই হেতু এই অনুমান একান্ত অসংগত নাও হইতে পারে যে, ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসিয়াই আবেস্তীয় আর্যভাষী ও ঋগ্বেদীয় আর্যভাষীরা এই যাগযজ্ঞের পরিচয় লাভ *করিয়াছিল এবং ঋগ্বেদীয় আর্যভাষীরা ভারতবর্ষে আসিবার আগেই তাহা হইয়াছিল, এমনও অসম্ভব নয়। পশুবলি যে ভূমধ্য নরগোষ্ঠী সংপৃক্ত প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুতীরবাসী লোকদের* মধ্যে প্রচলিত ছিল, মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ তাহা কতকটা প্রমাণ করিয়াছে। এই মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই লোকের বাসের অনুপযোগী ক্ষুদ্র বৃহৎ এমন কয়েকটি গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে যেগুলিকে কতকটা নিঃসংশয়েই মন্দির বা পূজাস্থান ইত্যাদি বলা যায়। কেহ কেহ তাহা স্বীকারও করিয়াছেন। এক্ষেত্রেও আশ্চর্য এই যে, 'পূজন' বা 'পূজা', এবং পুষ্প (এই শব্দ দুইটি ঋগ্বেদেই আছে) এই দু'টি শব্দই দ্রবিড় ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে সংপৃক্ত। লিঙ্গ পূজা এবং মাতৃকাপূজা যে সিন্ধুতীরের প্রাগৈতিহাসিক লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহাও প্রমাণ করিয়াছে হরপ্পা-মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ। অবশ্য, এ দু'টি পূজা সর্পপূজার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অনেক আদিম অধিবাসীদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তবু ভারতবর্ষে ইহার যে-রূপ আমরা দেখি তাহা যে আর্যভাষীরা ভারতীয় আর্যপূর্ব ও অনার্য লোকদের সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশ গড়িয়া তুলিয়াছিল, এই অনুমানই যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হয়। লিঙ্গপূজাই ক্রমশ শিবের সঙ্গে জড়িত হইয়া শিবলিঙ্গ ও শক্তিযোনি পূজায় রূপান্তরিত হয় এবং মাতৃকা-পূজা ও সর্পপূজা ক্রমশ যথাক্রমে শক্তিপূজায় ও মনসাপূজায়। দ্রবিড়-ভাষীদের আণ-মন্দি=পুং বানর-দেবতার ক্রমশ বৃষকপি এবং পরবর্তী কালে হনুমান-দেবতায় রূপান্তর অসম্ভব নয়। তেমনই অসম্ভব নয় দ্রবিড়-ভাষীদের বিণ্ বা আকাশ-দেবতার রূপান্তর বিষ্ণুতে এবং তাহা সুপ্রাচীনকালেই হয়তো হইয়াছিল। বৈদিক বিষ্ণুর যে-রূপ আমরা দেখি তাহাতে যেন দ্রবিড়ভাষীদের আকাশ-দেবতার স্পর্শ লাগিয়া আছে। শিব সম্বন্ধে একথা আরও বেশি প্রযোজ্য। শ্মশান-প্রান্তর-পর্বতের রক্ত-দেবতা একান্তই দ্রবিড়-ভাষীদের শিবন্ যাহার অর্থ লাল বা রক্ত এবং শেম্বু যাহার অর্থ তাম্র; ইনিই ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া আর্য দেবতা রুদ্রের সঙ্গে এক হইয়া যান। পরে শিবন্=শিব, শেম্বু=শম্ভু রুদ্র-শিব এবং মহাদেবে রূপান্তর লাভ করেন। এই ধরনের সমন্বিত রূপ পৌরাণিক অনেক দেবদেবীর মধ্যেই দেখা যায়, একথা ক্রমশ পণ্ডিতদের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করিতেছে। দৃষ্টান্ত বাহুল্যের আর প্রয়োজন নাই। এই সমন্বিত রূপই আর্যভাষীদের মহৎ কীর্তি এবং ভারতীয় ঐতিহ্যে তাহাদের সুমহান দান।

মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয় সেখানকার লোকেরা মৃতদেহ কবরস্থ করিত, কেহ কেহ আবার খানিকটা পোড়াইয়া শুধু অস্থিগুলি কবরস্থ করিত।

অ্যাল্পো-দীনারীয় নরগোষ্ঠীর মানস-সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছুই বলিবার উপায় নাই। তবে, মহেন্-জো-দড়োর উপরিতম স্তরের ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয় ইহারা মৃতদেহ বা শব (এটি দ্রবিড়গোষ্ঠীর শব্দ) আগে পোড়াইয়া ভস্মশেষ একটি পাত্রে রাখিয়া তাহা কবরস্থ

করিত। আগেই বলিয়াছি, আর্যভাষী নর্ডিকেরা ইহাদের ভাষাজাতি অ্যাল্‌পো-দীনারীয় লোকদের প্রীতির চক্ষে তো দেখিতই না বরং "ব্রাত্য" বা পতিত্ বলিয়া ঘৃণা করিত। এই "ব্রাত্য"রাও অন্যদিকে বৈদিক আর্যভাষীদের যাগযজ্ঞ, আচারানুষ্ঠান প্রভৃতিকে প্রীতির চক্ষে দেখিত না। এক কথায় এই দুই গোষ্ঠীর মানস-সংস্কৃতি একেবারেই বিভিন্ন ছিল, একথা অনুমান কতকটা নিঃসংশয়েই করা যায়।

ভারতীয়, তথা বাংলাদেশের মানস-সংস্কৃতিতে মোঙ্গোলীয় ভোটব্রহ্ম বা চৈনিক বা অন্য কোনও নরগোষ্ঠীর স্পর্শ বিশেষ কিছু লাগে নাই। লাগিলেও তাহা এত ক্ষীণ যে, আজ আর তাহা ধরিবার কোনই উপায় নাই।

বাংলাদেশে, শুধু বাংলাদেশেই বা কেন, সমগ্র উত্তর-ভারতেই আজ বিশুদ্ধ নিগ্রোবটু অবলুপ্ত; বহুদিন আগেই তাহারা কোথায় যে বিলীন হইয়া গিয়াছে আজ আর তাহা বুঝিবারও উপায় নাই।

"অস্ট্রিক্, মিশ্র অস্ট্রিক ও নেগ্রিটো; দ্রবিড়, মিশ্র দ্রবিড় ও অস্ট্রিক্; মিশ্র নেগ্রিটো ও দ্রবিড় এবং মিশ্র অস্ট্রিক্-নেগ্রিটো-দ্রবিড়, এই সব জনগণ, যখন উত্তর ভারতের অনার্য জনরূপে নিজ মিশ্র ধর্ম ও সংস্কৃতি লইয়া বাস করিতেছে, যখন দেশ ছিল খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত, এবং দেশে কোনও ঐক্য-বিধায়িনী কেন্দ্রাভিমুখী শক্তিও ছিল না;—এমন সময়ে ধীরে ধীরে প্রচণ্ড শক্তিশালী, একান্তরূপে কর্মী, অপূর্ব কল্পনাশীল, disciplined বা শৃঙ্খলা-সম্পন্ন, সুদৃঢ়রূপে সংঘবদ্ধ, গুণগ্রাহী কিন্তু আত্মসমাহিত, বাস্তব সভ্যতায় কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ অথচ নূতন বস্তু উপযোগী হইলে গ্রহণ করিতে সদা-চেষ্টিত, এমন আর্য (ভাষী) জাতি ভারতে দেখা দিল। আর্য(ভাষী)রা আসিয়া খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্মরাজ্য পাশে, এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির গ্রন্থিতে বাঁধিয়া দিল। * * * ভারতবর্ষে তাহারা বৈদিকধর্ম ও দেবতাবাদ এবং বেদের কিছু কিছু মন্ত্র বা সূক্ত লইয়া আসিল; তাহারা আনিল তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি; সেই সংস্কৃতিতে বাবিল ও আসুরীয় এবং পশ্চিম-এশিয়ার অন্য সভ্য (ভূমধ্য) নরগোষ্ঠীর প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।"

৮

শতাব্দীর বিরোধ-মিলনের মধ্য দিয়া কেমন ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বুকে আর্যভাষী আদি-নর্ডিকেরা এক সমন্বিত জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিল। সে-জনের রক্তবিশুদ্ধতা আর রহিল না, তাহার রক্তে বিচিত্র রক্তধারার স্রোতধ্বনি রণিত হইতে লাগিল, কোথাও ক্ষীণ, কোথাও উচ্চ গ্রামে। এই সমন্বিত জনের নাম ভারতীয় জন। সে-ধর্মও আর বেদ-ব্রাহ্মণের ধর্ম রহিল না; তাহার মধ্যে বিভিন্ন বিচিত্র পূর্বতন ধর্মের আদর্শ, আচার, অনুষ্ঠান সব মিলিয়া মিশিয়া এক নূতনধর্ম গড়িয়া উঠিল; তাহার নাম পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। সে-সভ্যতাও বৈদিক আর্যভাষীর সভ্যতা থাকিল না; বিচিত্র পূর্বতন সভ্যতার উপাদান-উপকরণ আহরণ করিয়া

তাহার এক নূতন রূপ ধীরে ধীরে পৃথিবীর দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল; এই নূতন সমন্বিত সভ্যতার নাম ভারতীয় সভ্যতা। আর সেই সংস্কৃতিই কি বেদ-ব্রাহ্মণের সংস্কৃতি থাকিতে পারিল? তাহার মানসলোকে কত যে পূর্বতন জন ও সংস্কৃতির সৃষ্টি-পুরাণ, দেবতাবাদ, ভয়-বিশ্বাস, ভাব-কল্পনা, স্বভাব-প্রকৃতি, ইতিকাহিনী, ধ্যানধারণা আশ্রয়লাভ করিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলকে আশ্রয় দিয়া, সকলের মধ্যে আশ্রয় পাইয়া, সকলকে আত্মসাৎ করিয়া, সকলের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া এই সংস্কৃতিও এক নূতন সমন্বিত রূপ লাভ করিল; তাহার নাম ভারতীয় সংস্কৃতি। আজ আবার গত সাতশত বৎসর ধরিয়া আর এক বৃহৎ সমন্বয় চলিতেছে এবং তাহার ফলে আমাদের এই বৃহৎ দেশখণ্ডে আর এক নূতন জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিরূপ লাভ করিতেছে।

এই সমন্বিত জন, ধর্ম, সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও একটি চলমান প্রবাহ। এই প্রবাহ আজও চলিতেছে। পরবর্তীকালে ইতিহাসের আবর্তচক্রে বারবার নূতন নূতন জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিচিত্ররূপে তাহাদের বিরোধ-মিলন ঘটিয়াছে, আজও ঘটিতেছে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। Thesis, Antithesis, Synthesis—চলমান প্রবাহ, বিরুদ্ধ প্রবাহ, সমন্বিত প্রবাহ, ইহাই জীবনের গতিধর্ম। এই গতিধর্ম স্মৃতি-ঐতিহ্যবহ; এই ধর্মই জীবনীশক্তি, প্রাণশক্তি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই ধর্মের বিকাশের দিকে তাকাইয়াই বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে:

রণধারা বাহি জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরি পর্বত
যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে,
কেহ নহে নহে দূর—
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তার বিচিত্র সুর।

যাহাই হউক, যে সমন্বিত জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা এইমাত্র বলিলাম, তাহার জন্মনীড় হইল উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশ। তাহাদের বাহন হইল আর্যভাষা। এই আর্যভাষাকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে গাঙ্গেয় প্রদেশের ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবাহ বাংলাদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতে। আদিমতম স্তরে আদি-অস্ট্রেলীয়, তারপর দীর্ঘমুণ্ড ভূমধ্য নরগোষ্ঠী, গোলমুণ্ড অ্যাল্‌পো-দীনারীয় নরগোষ্ঠী এবং সর্বশেষে উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশের মিশ্র আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর ক্ষীণ ধারা—এই কয়েকটি ধারার মিলনে বাঙালী জনের সৃষ্টি। অ্যাল্‌পো-দীনারীয় প্রবাহ-পূর্ব আদিম-বাঙালী মুখ্যত অনার্য; আর্য-প্রবাহ প্রথম আনিল অ্যাল্‌পো-দীনারীয় জাতিই; তারপর

দ্বিতীয় প্রবাহ ক্ষীণ ধারায় আনিল আদি-নর্ডিকেরা, কিন্তু উত্তর-ভারতেই সেই প্রবাহ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক, উত্তর-ভারতের মিশ্র আদি-নর্ডিকদের এবং কিয়ৎপরিমাণে অ্যাল্‌পো-দীনারীয়দের আর্যভাষাই সৃজ্যমান বাঙালী জনকে একটা নূতন মানসরূপ দান করিল; আদিম বাঙালীর আদি-অস্ট্রেলীয় ও দ্রবিড় মন ও প্রকৃতির উপর ব্রাত্য অ্যালপো-দীনারীয় এবং মিশ্র আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর মন ও প্রকৃতির চন্দনানুলেপন পড়িল এবং তাহাই বাঙালীকে, বাঙালী-চরিত্রকে একটা স্ফুটতর বৈশিষ্ট্য দান করিল। এই বিবর্তন-পরিবর্তন এক দিনে হয় নাই, হাজার বৎসরেরও (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতে খ্রীষ্টপরবর্তী ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত মোটামুটি) অধিককাল ধরিয়া তাহা চলিয়াছিল। কিন্তু, সে তথ্য এবং তথ্যগত বিবরণ ইতিবৃত্তের কথা; এ-অধ্যায়ে তাহার স্থান নাই।

এই অধ্যায়ে আমি যাহা করিতে চেষ্টা করিলাম, যে-ভাবে অস্ফুট অপরিস্রুত ঐতিহাসিক উষাকালের রেখাচিত্র আঁকিতে, যে-সব ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিলাম, ঐতিহাসিকেরা সকল ক্ষেত্রে তাহা স্বীকার করিবেন, আমি তাহা আশা করি না। সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট পাথুরে প্রমাণ না পাইলে সাধারণত ইতিহাসের দাবি মেটে না; অথচ যে প্রাগৈতিহাসিক কালের কাহিনী এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সেই কালের ঐতিহাসিক-গ্রাহ্য প্রমাণ সুদুর্লভ। তবু, মানুষের জানিবার আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার, সেই আগ্রহে মানুষ নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করে; নরতত্ত্ব, জনতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব তাহার কয়েকটি উপায় মাত্র। এই সব উপায়ের সাহায্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা এ-পর্যন্ত যে-সব নির্ধারণে পৌঁছিয়াছেন, তাহাই বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া, কিছু রাখিয়া কিছু ছাঁটিয়া, কিছু বাছিয়া, নানা ইঙ্গিতগুলি ফুটাইয়া আমার এই রেখাচিত্র। ঐতিহাসিক কালে বাংলার ও বাঙালীর যে-ইতিহাস আমাদের চোখের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়, তাহার সকল তথ্য, সকল ইঙ্গিত, সকল ভাব-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা, উপাদান-উপকরণ, আচার-অনুষ্ঠান, গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি ঐতিহাসিককালের তথ্য-প্রমাণের মধ্যে পাওয়া যায় না, সে তথ্য ও প্রমাণ ঐতিহাসিক কাল অতিক্রম করিয়া প্রাগৈতিহাসিক কালের মধ্যে বিস্তৃত। বাঙালীর ইতিহাস বলিতে বসিয়া সেইজন্য সেই অস্ফুট কাল সম্বন্ধে এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবের অবতারণা করিতে হইল। শুধু প্রাচীন নয়, আজিকার বাঙালীরও এই ক্ষীণালোকদীপ্ত উষার ইতিহাস যতটুকু সাধ্য জানা প্রয়োজন। এই ইতিহাস বাদ দিলে বাঙালীর ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না; এই কারণেই আমি এমনভাবে এমন ইঙ্গিতে এই ইতিহাস উপস্থিত করিলাম যাহার ফলে বাঙালীর এবং বাংলার জীবন-প্রবাহের মূল উৎস আমাদের হৃদয়মনের নিকটতর হইতে পারে। "আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যা বেলায় দীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সল্‌তে পাকানো।" এই অধ্যায় সেই 'সকাল বেলায় সল্‌তে পাকানো'।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

১। শরৎচন্দ্র রায়—ভারতবর্ষের মানব ও মানবসমাজ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৫, ৪৫ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

২। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—(ক) বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা। দ্বিতীয় সং। কলিকাতা।
(খ) জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য। দ্বিতীয় সং। কলিকাতা।

৩। বিজয়চন্দ্র মজুমদার—বাংলা ভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদান। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২০, ২০ ভাগ।

৪। Bagchi, P. C. *trans.* and *ed.*—Pre-Aryan and Pre-Dravidian. (Eng. trans. of papers by S. Levi, J. Przyluski and J. Bloch; also original papers by S. K. Chatterji and P. C. Bagchi). Calcutta University.

৫। Basu, M. N.—(a) *Published and unpublished notes placed at my disposal.*
(b) Blood groups of the Naluas of Bengal. Nature. 1938, p 649.

৬। Basu, N. K.—(a) Collected papers, published and unpublished, placed at my disposal.
(b) The Spring festival of India. Man in India, VIII. 1927. 112-85 pp.

৭। Basu, R. N.—(a) Blood groups among the Khasis. Nature. Oct. 29. 1938, p. 797,
(b) Anthropometry and blood types of the Bangaja Kayasthas of Bengal. Ind. Science Congress. Abstracts. 1941. (Anthropological Section).

৮। Census of India, Report on the—1931. Vol. 1. part III. xxxix—lxiii pp. Vol. V. part I p. 432 ff.

৯। Chanda, R. P.—Indo-Aryan Races. I. Rajsahi.

১০। Chakladar, H. C.—Presidential Address. Anthropological Section. Proc. of the Ind. Sc. Congress. 1936. 359—90 pp.

১১। Chakravarti, M. L.—Unpublished data re: Blood grouping

১২। Chatterji, S. K.—(a) Origin and development of the Bengali language. 2 Vols. Calcutta University.
(b) Indo-Aryan and Hindi.

১৩। Caldwell—Compartive grammar of Dravidian.

১৪। Chattopadhyaya, K. P.—The Cadak festival in Bengal. J. A. S. B. Letters. Vol. I. 1935. 397—406 pp. and plates.

১৫। Chaudhuri, A.—*in* Man in India 1936. p. 18 ff.

১৬। Datta, B. N.—Collected papers on Indian Anthropology, bound in one volume, Calcutta University Library.

১৭। De-Terra, Helmet—Scientific Field Reports of the Yale-Cambridge North-India expedition. Misc. American Philosophical Soc. I. 1936.

১৮। Guha, B. S.—An outline of racial ethnology of India, *in* Outline of Field Sciences of India. Ind. Sc. Congress Asscn. 1937.

১৯। Konow, S.—Notes on Dravidian Philology. Ind. Ant. 1903. 449—485 pp.

২০। Lingustic Survey of India. Vol. V. p. 276 ff.

২১। Majumdar, B. C.—Origin of the Bengali language. Calcutta University.

২২। Macfarlane—Inter-caste differences in blood group distribution in Bengal. Ind. Sc. Congress. Abstracts. 1938. pp. 199—200. (Anthropological Section).

দ্বিতীয় অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

২৩। MacKay—Indus Valley Civilisation.

২৪। Mahalanobis, P. C.— *in* J. A. S. B. New Series, XIII, 301—33 pp.

২৫। Risely, H.—(a) Peoples of India.

(b) Tribes and Castes of Bengal. 2 Vols.

(c) Anthropometric data of Bengal. 2 Vols.

২৬। Raychaudhuri, T. C.—Varendra Brahmins of Bengal. Man in India. 1929.

২৭। Sarkar, S. S.—Blood grouping investigations in India with special reference to Santhal Parganas, Behar. Trans. of the Bose Research Institute. XII, 1936—37.

২৮। Sewell, R. B. S. (with Guha, B. S.)— *in* Mohen-jo-daro and Indus Valley Civilisation, Vol. II. 1931.

২৯। Taylor, M.—*in* Trans. of the Royal Irish Academy. XXIV. 1873.

৩০। Von Eicksted—(a) Rassengeschichte von Indien mit bosonderer Berucksichtigung von Mysore. Zeits. f. Morph. v. Anthropologie. XXXII. 1933.

(b) The history of anthropological research in India, being the Intro. to L. A. K. Iyer's "The Travancore tribes and Castes", Vol. II, 1939.

তৃতীয় অধ্যায়

দেশ-পরিচয়

১

দেশ ও জাতির বাস্তব ইতিহাস জানিতে হইলে সর্বাগ্রে দেশের যথার্থ ভৌগোলিক পরিচয় লওয়া প্রয়োজন। মহাকালের কোনও রূপ নাই; কাল অনন্ত, অব্যয় এবং অরূপ। দেশের আধারকে আশ্রয় করিয়া, অসংখ্য বস্তু ও প্রাণীরূপ পাত্রকে অবলম্বন করিয়া তবে সেই কাল নিজের সীমায়িত রূপ প্রকাশ করে। দেশ এবং পাত্র নিরপেক্ষ কালের কোনও রূপের কল্পনা এবস্ট্রাক্ট কল্পনা মাত্র, তাহার বস্তুগত ভিত্তি নাই; দেশ এবং পাত্র, অর্থাৎ দেশান্তর্গত বস্তু ও প্রাণী জগৎ কালকে তাহার বস্তুপ্রতিষ্ঠা দান করে। তখনই সম্ভব হয় কালের বাস্তব স্বরূপ উপলব্ধি করা। তাই, ইতিহাসের অর্থই হইতেছে কাল, দেশ ও পাত্রের যথাযথ বর্ণনা এবং এই ত্রয়ীর সম্মিলিত রূপ ও তাহার ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ করা। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই ত্রয়ীর তৃতীয়টির, অর্থাৎ পাত্রের (দেশান্তর্গত প্রাণীজগতের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী সেই মানুষের) আদি কথা বলিয়াছি। এই মানুষকে লইয়াই তো মানুষের গর্ব, এবং মনুষ্য সমাজের কথাই ইতিহাসের কথা; কাজেই পরবর্তী সকল অধ্যায়ে তাহাদের কথাই সবটুকু জুড়িয়া থাকিবে। বর্তমান অধ্যায়ে ত্রয়ীর দ্বিতীয়টির অর্থাৎ দেশের বাস্তব বিবরণের কথা বলিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে; কারণ দেশই হইতেছে মানুষের ইতিহাসের ভিত্তি ও পরিবেশ। দেশের বস্তুগত রূপ বহুল পরিমাণে দেশান্তর্গত মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, সাধনা-সংস্কৃতি, আহার-বিহার, বসন-ব্যসন, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি নির্ণয় করে। কাজেই বাংলা দেশের মানুষের কর্মকৃতির কথা বলিবার আগে বাংলা দেশের বস্তুগত ভৌগোলিক পরিচয় লওয়া অযৌক্তিক হইবে না।

যুক্তি

২

কোনও স্থান বা দেশের রাষ্ট্রীয় সীমা এবং উহার ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমা সর্বত্র সকল সময় এক না-ও হইতে পারে। রাষ্ট্রীয় সীমা পরিবর্তনশীল; রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রসার ও সংকুচনের সঙ্গে সঙ্গে, কিংবা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রসীমা প্রসারিত ও সংকুচিত হইতে পারে, প্রায়শ হইয়াও থাকে; প্রাচীনকালে হইত, এখনও হয়। প্রাকৃতিক সীমা, যেমন নদনদী, পাহাড়পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি

সীমা নির্দেশ

কখনও কখনও রাষ্ট্রসীমা নির্দ্ধারণ করে সন্দেহ নাই; প্রাচীন ইতিহাসে তাহাই ছিল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু, বর্ত্তমান কালে রাষ্ট্রসীমা অনেক সময়ই প্রাকৃতিক সীমাকে অবজ্ঞা করিয়া চলে; বর্ত্তমান যন্ত্র-বিজ্ঞান রাষ্ট্রকে সেই অবজ্ঞার শক্তি দিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, বর্ত্তমান বাংলাদেশের পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণ সীমা কোনও প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা নির্দিষ্ট হয় নাই। কোথায় যে বাংলাদেশের শেষ, কোথায় যে বিহারের আরম্ভ, কোথায় যে মেদিনীপুর শেষ হইয়া উড়িষ্যার আরম্ভ, কোথায় যে ত্রিপুরা, মৈমনসিং জিলা শেষ হইয়া শ্রীহট্ট জেলার আরম্ভ, বলা কঠিন। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সীমা প্রধানত নির্ণীত হয় ভূপ্রকৃতিগত সীমা দ্বারা, এবং তাহা সাধারণত অপরিবর্ত্তনীয়। দ্বিতীয়ত এক জনত্ব দ্বারা, এবং তৃতীয়ত ভাষার একত্ব দ্বারা। সাধারণত দেখা যায় বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সীমার আবেষ্টনীর মধ্যেই জাতি ও ভাষার একত্ব-বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠে। অন্তত, প্রাচীন বাংলায় তাহাই হইয়াছিল। জন ও ভাষার এই একত্ব-বৈশিষ্ট্য বাংলা দেশে নিঃসন্দেহে একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই একত্ব দানা বাঁধিতে বাঁধিতে একেবারে প্রাচীন যুগের শেষাশেষি আসিয়া পৌঁছিয়াছে; বস্তুত, মধ্যযুগের আগে তাহার পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় নাই। বাংলার বিভিন্ন জনপদরাষ্ট্র তাহাদের প্রাচীন পুণ্ড্র-গৌড়-সুহ্ম-রাঢ়া-তাম্রলিপ্তি-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল ইত্যাদির ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করিয়া এক অখণ্ড ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্বন্ধে যখন আবদ্ধ হইল, যখন বিভিন্ন স্বতন্ত্র নাম পরিহার করিয়া এক বঙ্গ বা বাংলা নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ করিল তখন বাংলার ইতিহাসের প্রথম পর্ব অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচ্যদেশীয় প্রাকৃত ও মাগধী প্রাকৃত হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া, অপভ্রংশ পর্যায় হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাংলা ভাষা যখন তাহার যথার্থ আদিম রূপ প্রকাশ করিল তখন আদিপর্ব শেষ না হইলেও প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। এই জন ও ভাষার একত্ব-বৈশিষ্ট্য লইয়াই বর্ত্তমান বাংলাদেশ, এবং সেই দেশ চতুর্দ্দিকে বিশিষ্ট ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা বেষ্টিত। বর্ত্তমান রাষ্ট্রসীমা এই প্রাকৃতিক ইঙ্গিত অনুসরণ করে নাই সত্য, কিন্তু ঐতিহাসিককে সেই ইঙ্গিতই মানিয়া চলিতে হয়, তাহাই ইতিহাসের নির্দ্দেশ।

বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সীমায় সীমিত, জাতি ও ভাষার একত্ব-বৈশিষ্ট্য লইয়া আজিকার যে বাংলাদেশ সেই দেশের উত্তর-সীমায় সিকিম এবং হিমালয়-কীরিট কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র তুষারময় শিখর; তাহারই নিম্ন উপত্যকায় বাংলার উত্তরতম দারজিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা। এই দুই জেলার পশ্চিমে নেপাল, পূর্বে ভোটান রাজ্যসীমা। গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আমলেই দেখিতেছি, নেপাল তাঁহার রাজ্যের পূর্বতম অংশের উত্তরতম প্রত্যন্ত দেশ। দারজিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার এই তিনটি জেলাই প্রধানত পার্বত্য কোমদ্বারা অধ্যুষিত; কোচ, রাজবংশী, ভোটিয়া ইহারা সকলেই ভোট-ব্রহ্ম জনের বিভিন্ন শাখা-উপশাখা। কিন্তু, উত্তর-পূর্ব দিকে রংপুর-কোচবিহারের

উত্তর সীমা

বর্তমান রাষ্ট্রসীমা কিছু প্রাকৃতিক সীমা নয়, সে-সীমা একেবারে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নদই প্রাচীনকালে পুণ্ড্রবর্ধন ও কামরূপ রাজ্যের যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম সীমা নির্দেশ করিত। সত্য, কামরূপের রাষ্ট্রসীমা কখনও কখনও করতোয়া অতিক্রম করিয়া বাংলার উত্তরতম জেলাগুলি—রংপুর-কোচবিহার-জলপাইগুড়ি—অতিক্রম করিয়া উত্তর-বিহারের প্রাচীন কোশীনদ স্পর্শও হয়তো করিত; তৎসত্ত্বেও ব্রহ্মপুত্রই (এবং কখনও কখনও হয়তো করতোয়া) যে ছিল মোটামুটি কামরূপ রাজ্যসীমা, এসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক কালের অধিকাংশ পর্বেই ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণ উপত্যকাভূমিতে কামরূপের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রভুত্ব বিস্তৃত ছিল। এই হিসাবে বর্তমান গোয়ালপাড়া জেলার অধিকাংশই পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সীমাভুক্ত ছিল এই অনুমান অসংগত নয়; মধ্যযুগে তো উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিমতম প্রান্ত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিলই।

বাংলার পূর্ব-সীমায় উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ, মধ্যে গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়; দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান শৈলমালা। গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া শৈলশ্রেণীর বিন্যাস দেখিলে স্পষ্টতই বুঝা যায় বাংলার সীমা এই পার্বত্যদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বস্তুত, গোয়ালপাড়া

পূর্ব-সীমা

জেলার মত শ্রীহট্ট, এবং কাছাড় জেলার কিয়দংশের লোকও বাংলা ভাষাভাষী, এবং সামাজিক স্মৃতিশাসন, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতিও বাংলা ভাষাভাষীর; জন এবং জাতও বাঙালীর এবং বাংলার। তাহা ছাড়া, বরাক ও সুরমা নদীর উপত্যকা মেঘনা-উপত্যকারই (মৈমনসিং-ত্রিপুরা-ঢাকা) উত্তরাংশ মাত্র। এই দুই উপত্যকার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমা কিছু নাই বলিলেই চলে, এবং এই কারণেই প্রাচীন ও মধ্য-যুগে পূর্ববাংলার এই কয়টি জেলার, বিশেষভাবে ত্রিপুরা ও পূর্ব-মৈমনসিং জেলার সংস্কার ও সংস্কৃতি এত সহজে শ্রীহট্টে-কাছাড়ে বিস্তার লাভ করিতে পারিয়াছিল। এখনও শ্রীহট্ট-কাছাড়ের হিন্দু-মুসলমানের সমাজ ও সংস্কৃতি বাংলার পূর্বতম জেলাগুলির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। শুধু তাহাই নয়, লৌকিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনও বাংলার এই জেলাগুলির সঙ্গে। সিলেট্-সরকার আকবরের আমলে সুবা বাংলার অন্তর্গত ছিল; ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এই দুই জেলা ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত ছিল। শ্রীহট্টের দক্ষিণে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী এই দুই জেলা হইতে শ্রীহট্টকে পৃথক করিয়াছে। ত্রিপুরার উত্তরে ও পূর্বে ত্রিপুরা শৈলমালা পার্বত্য চট্টগ্রামকে ত্রিপুরা হইতে পৃথক করিয়াছে; দক্ষিণ-ত্রিপুরার সঙ্গে নোয়াখালি এবং সমতল চট্টগ্রামের যোগাযোগ। যাহা হউক, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাংলাদেশকে লুসাই জেলা এবং ব্রহ্মদেশ হইতে পৃথক করিয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট। এই সব কারণেই এই দুটি শৈলশ্রেণী বাংলার পূর্ব-দক্ষিণ সীমা-নির্দেশক।

বাংলার বর্তমান পশ্চিম-সীমা পূর্ব-সীমাপেক্ষাও অধিক খর্বীকৃত হইয়াছে। উত্তর প্রান্তে

পশ্চিম-সীমা

মালদহ ও দিনাজপুর জেলার উত্তর ও পশ্চিম সীমাই আধুনিক বাংলার সীমা নির্দেশ করিতেছে। অথচ, প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই সীমা

দক্ষিণে গঙ্গার তট বাহিয়া একেবারে বর্তমান দ্বারভাঙ্গা জেলার পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্বারভাঙ্গা তো দ্বারবঙ্গ (বা বঙ্গের দ্বার) শব্দেরই আধুনিক বিকৃত রূপ। পূর্ণিয়া সরকার তো আকবরের আমলেও বাংলা-সুবার অন্তর্গত ছিল। তাহা ছাড়া, কি ভূমি-প্রকৃতিতে কি প্রাচীন ভাষায় উত্তর-বিহার ও মিথিলার সঙ্গে উত্তর-বঙ্গ বা গৌড়-পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর পার্থক্য অল্পই ছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে মিথিলাই তো ছিল অন্যতম বিদ্যা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র যাহাকে বাংলার পণ্ডিতেরা পরমতীর্থ বলিয়া মনে করিতেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি বাঙালীরও পরম প্রিয় কবি। উত্তর-বঙ্গের এবং শ্রীহট্টের কোথাও কোথাও বহুদিন পর্যন্ত মৈথিল স্মৃতির প্রচলন ছিল, এখনও আছে ; বাচস্পতি মিশ্রের স্মৃতি এখনও শ্রীহট্টের কোনও কোনও টোলে পঠিত হইয়া থাকে, প্রচুর প্রাচীন পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগারে বাচস্পতি মিশ্রের স্মৃতিগ্রন্থের অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। এই দুই ভূমির, অর্থাৎ উত্তর-বঙ্গ ও উত্তর-বিহারের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান রচিত হইয়াছে মধ্যযুগে ; প্রাচীনকালে এই ব্যবধান ছিল না, এই দুই ভূমি একই ভূমি বলিয়া গণ্য হইত, এমন মনে করিবার ঐতিহাসিক কারণ বিদ্যমান। এই দুই ভূমির মধ্যে প্রাকৃতিক ব্যবধানও কিছু নাই, ভূ-প্রকৃতিরও কিছু বিভিন্নতা নাই। উত্তর-বিহারের দক্ষিণ সীমা ধরিয়া, রাজমহল পাহাড়ের ভিতর দিয়া, মালদহের পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা ঘেঁষিয়া গঙ্গা বাংলাদেশে আসিয়া ঢুকিয়াছে। রাজমহল ও গঙ্গার দক্ষিণে বর্তমান সাঁওতাল পরগণা প্রাচীন উত্তর-রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিমতম অংশ—ভবিষ্য পুরাণে এই ভূমিকে বলা হইয়াছে অজলা, উষর, জঙ্গলময় ভূমি, যেখানে কিছু কিছু লৌহ আকর আছে, যেখানে তিনভাগ জঙ্গল, একভাগ গ্রাম, স্বল্পভূমি মাত্র উর্বর। ভবদেব ভট্টের একাদশ শতকীয় লিপিতেও এই ভূমিকে বলা হইয়াছে উষর ও জঙ্গলময়। ইহাই য়ুয়ান-চোয়াঙ্‌ বর্ণিত কজঙ্গল। সপ্তম শতকে রাজা জয়নাগের (রাজধানী, কর্ণসুবর্ণ ?) বপ্পঘোষবাট পট্টোলীতে ঔদুম্বরিক বিষয় নামে একটি ক্ষুদ্র জনপদের উল্লেখ আছে। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ঔদম্বর-সরকার পূর্ণিয়া-সরকারের দক্ষিণ সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে মুরশিদাবাদ-বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজমহল (তদানীন্তন আকমহল) এই ঔদম্বর সরকারের অন্তর্গত ছিল। বস্তুত, রাজমহল ও সাঁওতাল পরগণার কিয়দংশ যে বাংলার অন্তর্গত ছিল, এসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বাঁকুড়ার পশ্চিম-সীমায় মানভূম জিলা বর্তমান বিহারের অন্তর্গত ; অথচ, এই মানভূম প্রাচীন মল্লভূমি—মালভূমেরই অন্তর্গত। বাঁকুড়া ও মানভূমের ভিতর কোনও প্রাকৃতিক সীমা নাই ; সেই সীমা মানভূম অতিক্রম করিয়া একেবারে ছোট-নাগপুরের শৈলশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই শৈলশ্রেণীই এই দিকে প্রাচীন বাংলার সীমা। ভাষায়, ভূ-প্রকৃতিতে, সমাজ ও কৌমবিন্যাসে সাঁওতাল পরগণার সঙ্গে যেমন উত্তর-বীরভূমের, তেমনই মানভূমের সঙ্গে বাঁকুড়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। দক্ষিণে মেদিনীপুরের পশ্চিম-দক্ষিণ সীমায় বালেশ্বর জেলা উড়িষ্যার অন্তর্গত, এবং সিংভূম বিহারের। এই দুইটি

জেলারই কতকাংশ মেদিনীপুর জেলার যথাক্রমে কাঁথি, সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত—ভাষায়, ভূ-প্রকৃতিতে, সামাজিক সংস্কৃতিতে এবং কৌমবিন্যাসে। সম্প্রতি মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত মহারাজ শশাঙ্কের যে তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে, উৎকল দেশও সপ্তম শতকে দণ্ডভুক্তির (বর্তমান দাঁতনের) অন্তর্গত ছিল। যে-কোনও প্রাকৃতিক ভূমি-নকশা বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে রাজমহল হইতে এক অনুচ্চ শৈলশ্রেণী এবং গৈরিক পার্বত্যভূমি দক্ষিণে সোজা প্রসারিত হইয়া একেবারে ময়ূরভঞ্জ-কেওঞ্ঝর-বালেশ্বর স্পর্শ করিয়া সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই শৈলমালা এবং গৈরিক মালভূমিই সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর, মানভূম, সিংভূম, এবং ময়ূরভঞ্জ-বালেশ্বর-কেওঞ্ঝর শৈলমালার অরণ্যময় গৈরিক উচ্চভূমি এবং বাংলার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পশ্চিম-সীমা। বাংলার ভাষা, সমাজবিন্যাস, জন ও কৌম-বিন্যাস এবং উত্তর-রাঢ় ও পশ্চিম-দক্ষিণ মেদিনীপুরের ভূপ্রকৃতি এই সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

দক্ষিণ-সীমা

বাংলার দক্ষিণ-সীমায় বঙ্গোপসাগর এবং তাহারই তট ঘিরিয়া মেদিনীপুর-চব্বিশ পরগণা-খুলনা-বরিশাল-ফরিদপুর-ঢাকা ও ত্রিপুরার দক্ষিণতম প্রান্ত (অর্থাৎ চাঁদপুর)-নোয়াখালি-চট্টগ্রামের সমতট ভূমির সবুজ বনময় অথবা বৃক্ষশস্যশ্যামল আস্তরণ। এই আস্তরণ অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ নদনদী-খাটিখাড়ি-খালনালা-বিলজলা-হাওর (হায়র = সায়র = সাগর) ইত্যাদিতে সমাচ্ছন্ন। এই জেলাগুলির অধিকাংশ নিম্নভূমি ক্রমশ গড়িয়া উঠিয়াছে অসংখ্য নদনদী বাহিত পলিমাটি এবং সাগরগর্ভতাড়িত বালুকারাশির সমন্বয়ে, প্রাগৈতিহাসিককালে,—এবং কতকটা ঐতিহাসিক কালেও।

সূত্র-সংক্ষিপ্ততায় এইভাবে বোধ হয় বাংলার সীমা-নির্দেশ করা চলে : উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয়ধৃত নেপাল, সিকিম ও ভোটান রাজ্য ; উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা ; উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি ; পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত ; পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম-কেওঞ্ঝর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই প্রাকৃতিক সীমাবিধৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়-পুণ্ড্র-বরেন্দ্রী-রাঢ়া-সুহ্ম তাম্রলিপ্তি-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল প্রভৃতি জনপদ ; ভাগীরথী-করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-মেঘনা এবং আরও অসংখ্য নদনদী বিধৌত বাংলার গ্রাম, নগর, প্রান্তর, পাহাড়, কান্তার। এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি। একদিকে সুউচ্চ পর্বত, দুইদিকে কঠিন শৈলভূমি, আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র ; মাঝখানে সমভূমির সাম্য—ইহাই বাঙালীর ভৌগোলিক ভাগ্য। আজ হিমালয় আমাদের নাম মাত্রই ; সমুদ্রও বুঝি নাম মাত্র ; তাম্রলিপ্তি সত্যই সকরুণ স্মৃতি। সাম্প্রতিক বাংলার উত্তরে টেরাই বনভূমি, দক্ষিণে সুন্দরবন ও তৃণাস্তীর্ণ জলাভূমি। এই দুইয়ে মিলিয়া যেন বাংলা দেশকে উষ্ণ জলীয়তার ক্লান্ত অবসাদে ঘিরিয়া

ধরিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর এক বাঙালী কবির লেখনীতে এই ভৌগোলিক ভাগ্য সুন্দর কাব্যময় রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কবিতাটি সমগ্র উদ্ধৃতির দাবি রাখে।

"হিমালয় নাম মাত্র
আমাদের সমুদ্র কোথায় ?
টিম্ টিম্ করে শুধু খেলো দুটি বন্দরের বাতি।
সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়েনা সেথা ;
—তাম্রলিপ্তি সকরুণ স্মৃতি।
দিগন্ত-বিস্তৃত স্বপ্ন সমতল উর্বর ক্ষেতের আছে বটে ;
কত উগ্র নদী সেই স্বপনেতে গেল মজে হেজে ;
একা পদ্মা মরে মাথা কুটে।

"উত্তরে উত্তুঙ্গ গিরি
দক্ষিণেতে দুরন্ত সাগর
যে দারুণ দেবতার বর
মাঠভরা ধান দিয়ে শুধু
গান দিয়ে নিরাপদ খেয়া তরণীর
পরিতৃপ্ত জীবনের ধন্যবাদ দিয়ে
তারে কভু তুষ্ট করা যায় !

"ছবির মতন গ্রাম
স্বপনের মতন শহর
যতো পারো গড়ো,
অর্চনার চূড়া তুলে ধরো
তারাদের পানে ;
তবু জেনো আরো এক মৃত্যুদীপ্ত মানে
ছিল এই ভূখণ্ডের,
—ছিল সেই সাগরের পাহাড়ের দেবতার মনে,
সেই অর্থ লাঞ্ছিত যে তাই,
আমাদের সীমা হ'লো
দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে টেরাই !"

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

৬

বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাংলার ছোট-বড় অসংখ্য নদনদী। এই নদনদীগুলিই বাংলার প্রাণ; ইহারাই বাংলাকে গড়িয়াছে, বাংলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে যুগে যুগে, এখনও করিতেছে। এই নদনদীগুলিই বাংলার আশীর্বাদ; এবং প্রকৃতির তাড়নায়, মানুষের অবহেলায় কখনও কখনও বোধ হয় বাংলার অভিশাপও। এই সব নদনদী উচ্চতর ভূমি হইতে প্রচুর পলি বহন করিয়া আনিয়া বঙ্গের ব-দ্বীপের নিম্নভূমিগুলি গড়িয়াছে, এখনও সমানে গড়িতেছে; সেই হেতু বদ্বীপ-বঙ্গের ভূমি কোমল, নরম ও কমনীয়; এবং পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের কিয়দংশ ছাড়া বঙ্গের প্রায় সবটাই ভূতত্ত্বের দিক হইতে নবসৃষ্টভূমি (new alluvium)। এই কোমল, নরম ও নমনীয় ভূমি লইয়া বাংলার নদনদীগুলি ঐতিহাসিক কালে কত খেলাই না খেলিয়াছে; উদ্দাম প্রাণলীলায় কতবার যে পুরাতন খাত ছাড়িয়া নূতন খাতে, নূতন খাত ছাড়িয়া আবার নূতনতর খাতে বর্ষা ও বন্যার বিপুল জলধারাকে দুরন্ত অশ্বের মত, মত্ত ঐরাবতের মত ছুটাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সহসা খাত-পরিবর্তনে কত সুরম্য নগর, কত বাজার-বন্দর, কত বৃক্ষশ্যামল গ্রাম, শস্যশ্যামল প্রান্তর, কত মঠ ও মন্দির, মানুষের কত কীর্তি ধ্বংস করিয়াছে, আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, কত দেশখণ্ডের চেহারা ও সুখ-সমৃদ্ধি একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে তাহার হিসাবও ইতিহাস সর্বত্র রাখিতে পারে নাই। প্রকৃতির এই দুরন্ত লীলার সঙ্গে মানুষ সর্বদা আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই, অনেক সময়ই হার মানিয়াছে; তাহার উপর আবার দূরদৃষ্টিহীন মানুষের দুর্বুদ্ধি সাময়িক লোভ ও লাভের হিসাব বড় করিয়া দেখিতে গিয়া জল-নিকাশের এবং প্রবাহের এই সব স্বাভাবিক পথগুলির সঙ্গে যথেচ্ছচারের ত্রুটি করে নাই, এখনও তাহার বিরাম নাই। তাহার ফলে এই সব নদনদীগুলি বন্যায় মহামারীতে দেশকে ক্ষণে ক্ষণে উজাড় করিয়া দিয়া, অথবা সুবিস্তৃত দেশখণ্ডকে শস্যহীন শ্মশানে পরিণত করিয়া মানুষের উপর প্রতিশোধ লইতে ত্রুটি করে না। প্রাচীন কালে এই নদনদীগুলির প্রবাহপথের, এবং দুরন্ত প্রাণলীলার সঠিক এবং সুস্পষ্ট ইতিহাস আমাদের কাছে উপস্থিত নাই; পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক হইতে নদনদীগুলির ইতিহাস যতটা সুস্পষ্ট ধরিতে পারা যায় নানা দেশী-বিদেশী বিবরণের এবং নকশার সাহায্যে, প্রাচীন বাংলা সম্বন্ধে তাহা কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে নদনদীগুলির প্রবাহপথের যে চেহারা, তাহাদের যে আকৃতি-প্রকৃতি এখন আমাদের দৃষ্টি ও বুদ্ধিগোচর, প্রাচীন বাংলায় সেই চেহারা সেই আকৃতি-প্রকৃতি অনেকেরই ছিল না। অনেক পুরাতন পথ মরিয়া গিয়াছে, প্রশস্ত খরতোয়া নদী সংকীর্ণা ক্ষীণস্রোতা হইয়া পড়িয়াছে; অনেক নদী নূতন খাতে নূতনতর আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরাতন নামও

নদনদী

হারাইয়া গিয়াছে, নদীও হারাইয়া গিয়াছে; নূতন নদীর নূতন খাতের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব নদনদীর ইতিহাসই বাংলার ইতিহাস। ইহাদেরই তীরে তীরে মানুষ-কৃষ্ট সভ্যতার জয়যাত্রা; মানুষের বসতি, কৃষির পত্তন, গ্রাম, নগর, বাজার, বন্দর, সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিল্প-সাহিত্য, ধর্মকর্ম সব কিছুর বিকাশ। বাংলার শস্যসম্পদ একান্তই এই নদীগুলির দান। উচ্ছলিত উচ্ছ্বসিত উদ্দাম বন্যায় মানুষের ঘরবাড়ি ভাঙ্গিয়া যায়, মানুষ গৃহহীন পশুহীন হয়; আবার এই বন্যাই তাহার মাঠে মাঠে সোনা ফলায় পলি ছড়াইয়া, এই পলিই সোনার সারমাটি। বাঙালী তাই এই নদীগুলিকে ভয়ভক্তি যেমন করিয়াছে, ভালও তেমনই বাসিয়াছে; রাক্ষসী কীর্তিনাশা বলিয়া গাল যেমন দিয়াছে, তেমনই ভালবাসিয়া নাম দিয়াছে ইচ্ছামতী, ময়ূরাক্ষী, কবতাক্ষ (কপোতাক্ষ), চূর্ণী, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, মধুমতী, কৌশিকী, দামোদর, অজয়, করতোয়া, ত্রিস্রোতা, মহানন্দা, মেঘনা (মেঘনাদ বা মেঘানন্দ), সুরমা, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র)। বস্তুত, বাংলার, শুধু বাংলারই বা কেন, ভারতবর্ষের নদীগুলির নাম কি সুন্দর অর্থ ও ব্যঞ্জনাময়!

বাংলার এই নদীগুলি সমগ্র পূর্ব-ভারতের দায় ও দায়িত্ব বহন করে। উত্তর-ভারতের প্রধানতম দুইটি নদীর—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের—বিপুল নদীজলধারা, পলিপ্রবাহ, এবং পূর্ব-যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসামের বৃষ্টিপাতপ্রবাহ বহন করিয়া সমুদ্রে লইয়া যাইবার দায়িত্ব বহন করিতে হয় বাংলার কমনীয় মাটিকে। সেই মাটি সর্বত্র এই সুবিপুল জলপ্রবাহ বহন করিবার উপযুক্ত নয়। এই জলপ্রবাহ নূতন ভূমি যেমন গড়ে, মাঠে যেমন শস্য ফলায়, তেমনই ভূমি ভাঙ্গেও, শস্য বিনাশও করে। বাঙালী ক্রোধভরে পদ্মাকে বলিয়াছে কীর্তিনাশা; পদ্মা বাঙালীর অনেক কীর্তিই নষ্ট করিয়াছে সত্য—করিবে না-ই বা কেন? গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার সুবিপুল জলধারা নিম্নতম প্রবাহে সে একা বহন করে, তাহাতে আসিয়া নামে প্রচুর বৃষ্টিপ্রবাহ, নিম্নভূমির সাগরপ্রমাণ বিল-হাওরের অগাধ জলরাশি। দুর্দম মত্ততার অধিকার তাহার না থাকিলে থাকিবে কাহার? এবং, সেই মত্ততা নরম নমনীয় নূতন মাটির উপর! ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে ও হইতেছে। অথচ, এই মেঘনা-পদ্মাই তো আবার স্বর্ণশস্যের আকর; এই পদ্মার দুই তীরেই তো বাংলার ঘনতম মনুষ্য বসতি, সমৃদ্ধ ঐশ্বর্যের লীলা। মানুষ যদি পদ্মা-মেঘনাকে বশে আনিতে না পারিয়া থাকে, সে যদি আপন দুর্বুদ্ধি বশে ইহাদের মত্ততাকে আরও নির্মম আরও দুরন্ত করিয়া থাকে, তবে সেই দোষ পদ্মা-মেঘনার নয়! কিন্তু, ইতিহাস আলোচনায় এসব জল্পনা হয়ত অবান্তর!

বাংলার ভূ-প্রকৃতিতে নদীর খাত যুগে যুগে পরিবর্তিত হওয়া, পুরাতন নদী মজিয়া মরিয়া যাওয়া, নূতন নদীর সৃষ্টি কিছুই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ষোড়শ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতকের শেষ—এই চারি শতাব্দীর মধ্যে বাংলার প্রধান অপ্রধান ছোট বড় কত নদনদী যে কতবার খাত বদলাইয়াছে, কত পুরাতন নদী মরিয়াছে, কত নূতন নদীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কিছু কিছু

উপাদান

হিসাব পাওয়া যায় বাংলার সমসাময়িক ভূমি-নক্শায়। বর্তমান বাংলার নদীগুলির যে প্রবাহপথ, আকৃতি-প্রকৃতি এখন আমরা দেখিতেছি, একশত বৎসর পূর্বেও এই সব নদনদীর এই প্রবাহপথ, আকৃতি-প্রকৃতি ছিল না। ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতকের মধ্যে Jao de Barros (1550), Gastaldi (1561), Hondivs (1614), Cantelli da Vignolla (1683), Van den Broucke (1660), G. Delisle (1720-1740), Izzak Tirion (1730), *F. de Witt* (*1726*), de l' Auville (1752), Thornton, Rennel (1764-*1776*), প্রভৃতি পর্তুগীজ, ডাচ্ ও ইংরাজ বণিক, রাজকর্মচারী ও পণ্ডিতেরা বাংলা ও ভারতবর্ষের অনেকগুলি নক্শা রচনা করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে বাংলার নদনদী ও জনপদগুলির ক্রমপরিবর্তমান আকৃতি, পুরাতন নদীর মৃত্যু, নূতন নদীর জন্ম সমস্তই এই নক্শাগুলিতে ধরিতে পারা যায়। আমাদের চোখের উপর এই পরিবর্তন এখনও চলিতেছে; যমুনার খাতে ব্রহ্মপুত্রের নূতনতর প্রবাহ, ভৈরব, কুমার প্রভৃতি নদীর আসন্ন মৃত্যু ইত্যাদি তো সেদিনকার স্মৃতি। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক হইতে নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া নদনদীগুলির—এবং সঙ্গে সঙ্গে জনপদগুলিরও—ক্রমপরিণতি এখন অনেকটা স্পষ্ট। শুধু নক্শাগুলিতেই নয়, ইব্ন্ বতুতা (1328-1354), বারণি (চতুর্দশ শতক), রাল্ফ ফিচ্ (Ralph Fitch, 1583-91), Fernandes (1598), Fonseca (1599), প্রভৃতি বিদেশি পর্যটকদের বিবরণী, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, গোবিন্দদাসের কড়চা, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল জাতীয় সাহিত্যগ্রন্থ এবং মুসলমান লেখকদের সমসাময়িক ইতিহাসেও এই পরিবর্তনের চেহারা ধরিতে পারা কঠিন নয়। সাম্প্রতিক কালে নদীমাতৃক বাংলার এই ক্রমপরিবর্তমান আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনাও যথেষ্ট হইয়াছে। কাজেই এখানে সে-সব কথার পুনরালোচনা করিয়া লাভ নাই। ষোড়শ শতকের পরেই শুধু নয়, আগেও বাংলার প্রধান প্রধান নদনদীগুলি যুগে যুগে এই ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া গিয়াছে, এমন অনুমান কিছুতেই অসংগত নয়; তাহার কিছু কিছু প্রমাণও আছে। কারণ, প্রাচীন সাহিত্যে, টলেমির নকশায় ও প্রাচীন লিপিমালায় বাংলার দুই চারিটি নদনদীর প্রবাহপথ সম্বন্ধে যে-ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা বর্তমান প্রবাহপথ তো নয়ই, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রবাহপথের সঙ্গেও তাহার মিল নাই। অষ্টাদশ শতকে রেনেলের, সপ্তদশ শতকে ফান্ ডেন্ ব্রোকের, এবং ষোড়শ শতকে জাও ডি বারোসের নক্শায় নদনদীগুলির গতিপথ অনেকটা পরিষ্কার দেখান হইয়াছে। এই তিন নক্শার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া পশ্চাদ্ক্রম অনুসরণ করিলে হয়তো মধ্যযুগপূর্ব বাংলার নদনদীর চেহারা ধরিতে পারা খানিকটা সহজ হইবে। টলেমির নক্শা (দ্বিতীয় শতক) নানা দোষে দুষ্ট, ঐতিহাসিকদের কাছে তাহা অজ্ঞাত নয়। সুতরাং সেই নক্শার উপর খুব বেশি নির্ভর করা চলে না; তবু কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া একেবারে অসম্ভব না ও হইতে পারে।

গঙ্গা-ভাগীরথী লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে। রাজমহলের সোজা উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার তীর প্রায় ঘেঁষিয়া তেলিগড় ও সিক্রিগলির সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম—বাংলার প্রবেশ পথ। এই পথের মুখের নিকটেই কেন লক্ষ্মণাবতী-গৌড়, পাণ্ডুয়া, টাণ্ডা, রাজমহল মধ্যযুগে বহুদিন একের পর এক বাংলার রাজধানী ছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নয়; সামরিক ও রাষ্ট্রীয় কারণেই তাহা প্রয়োজন হইয়াছিল।

গঙ্গা-ভাগীরথী

এই গিরিবর্ত্ম দুইটি ছাড়িয়া রাজমহলকে স্পর্শ করিয়া গঙ্গা বাংলার সমতল ভূমিতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ফান্ ডেন ব্রোকের (১৬৮০) নক্শায় দেখিতেছি, রাজমহলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া, মুর্শিদাবাদ-কাসিমবাজারের মধ্যে গঙ্গার তিনটি দক্ষিণ-বাহিনী শাখার জল কাসিমবাজারের একটু উত্তর হইতে একত্র বাহিত হইয়া সোজা দক্ষিণ বাহিনী হইয়া চলিয়া গিয়াছে সমুদ্রে, বর্তমান গঙ্গা-সাগরসঙ্গম তীর্থে। কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী পর রেনেলের নক্শায় দেখিতেছি, রাজমহলের দক্ষিণ-পূর্বে তিনটি বিভিন্ন শাখা একটি মাত্র শাখায় রূপান্তরিত এবং তাহাই (সুতি হইতে গঙ্গাসাগর) দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গা। যাহাই হউক, রেনেল কিন্তু এই দক্ষিণ বাহিনী নদীটিকে গঙ্গা বলিতেছেন না; তিনি গঙ্গা বলিতেছেন আর একটি প্রবাহকে, যে-প্রবাহটি অধিকতর প্রশস্ত, জীবন্ত এবং দুর্দাম, যেটি পূর্ব-দক্ষিণ বাহিনী হইয়া বর্তমান বাংলার হৃদয়-দেশের উপর দিয়া তাহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে অবতরণ করিয়াছে, আমরা যাহাকে বলি পদ্মা। ফান্ ডেন ব্রোক্ এবং রেনেল দুজনের নক্শাতেই দেখিতেছি গঙ্গার সুবিপুল জলধারা বহন করিতেছে পদ্মা; দক্ষিণ-বাহিনী নদীটি ক্ষীণতরা। ফান্ ডেন ব্রোক্ বা রেনেল যে-নামেই এই দুইটি নদীকে অভিহিত করুন না কেন, দেশের ঐতিহ্যে এই নদী দুইটির নাম কি ছিল দেখা যাইতে পারে। ফান্ ডেন ব্রোকের আড়াই শত বৎসর আগে কবি কৃত্তিবাসের কাল (১৩২০ শক=১৪১৫-১৬ খ্রী)। কৃত্তিবাসের পিতৃভূমি ছিল বঙ্গে (পূর্ব-বাঙ্গালায়); তাঁহার পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা বঙ্গ(ভাগ) ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন, যে-ফুলিয়ার "দক্ষিণে-পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী"। নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত দক্ষিণ-বাহিনী নদী আমরা যাহাকে বলি ভাগীরথী (বর্তমান হুগলী নদী) তাহার কথাই কৃত্তিবাস বলিতেছেন। কিন্তু,

ছোট গঙ্গা
বড় গঙ্গা

এই গঙ্গা ছোট গঙ্গা। কারণ, এগার পার হইয়া কৃত্তিবাস যখন বার বৎসরে প্রবেশ করিলেন তখন "পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়-গঙ্গা পার" এবং সেখানে নানা বিদ্যা অর্জন করিয়া তদানীন্তন গৌড়েশ্বর রাজা কংস বা গণেশের সভায় রামায়ণ রচনা করিলেন। নিশ্চিত যে, এই বড় গঙ্গাই পদ্মা। এই কথার আরও সমর্থন পাওয়া যায় কৃত্তিবাস-রামায়ণের অন্যতম একটি পুঁথিতে। কৃত্তিবাস নিজ বাল্যজীবনের কথা বলিতেছেন,

পিতা বনমালী মাতা মাণিক [মেনকা] উদরে।
জনম লভিল শুভা ছয় সহোদরে॥
ছোটগঙ্গা বড়গঙ্গা বড় বলিন্দা [নিঃসন্দেহে, বরেন্দ্র-বরেন্দ্রী] পার।
যথা তথা কর্য্যা বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার॥
রাঢ়ামধ্যে [রাঢ় মধ্যে ?] বন্দিনু আচার্য চূড়ামণি।
যার ঠাঁই কৃত্তিবাস পড়িলা আপনি॥

স্পষ্টতই গঙ্গার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বাহিনী দুই প্রবাহকেই কৃত্তিবাস যথাক্রমে ছোট গঙ্গা ও বড় গঙ্গা বলিতেছেন, এবং তদানীন্তন ভাগীরথী পথের সুন্দর বিবরণ দিতেছেন। সে কথা পরে উল্লেখ করিতেছি। আপাতত এইটুকু পাওয়া গেল যে, পঞ্চদশ শতকের গোড়াতেই পদ্মা বৃহত্তরা নদী, উহাই বড় গঙ্গা। কিন্তু যত প্রশস্ততরা, যত দুর্মর দুর্দান্তই হোক না কেন, ঐতিহ্য মহিমায় কিংবা লোকের শ্রদ্ধাভক্তিতে বড় গঙ্গা ছোট গঙ্গার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। হিন্দুর স্মৃতি-ঐতিহ্যে গঙ্গার জলই পাপ মোচন করে, পদ্মার নয়; পদ্মা কীর্তিনাশা; পদ্মা ভীষণা ভয়ংকরী উন্মত্তা।

গঙ্গা-ভাগীরথীই যে প্রাচীনতরা এবং পুণ্যতোয়া নদী, ইহাই যে হিন্দুর পরম তীর্থ জাহ্নবী এই সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য এবং লিপিমালা একমত। পদ্মাকে গঙ্গা কখনও কখনও বলা হইয়াছে, কিন্তু ভাগীরথী-জাহ্নবী একবারও বলা হয় নাই। বাংলা দেশের গ্রন্থ ও লিপিই এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি। ধোয়ীর পবনদূতে ত্রিবেণী-সংগমের ভাগীরথীকেই বলা হইয়াছে গঙ্গা; লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর পট্টোলীতে বর্ধমানভুক্তির বেতড্ড চতুরকের (হাওড়া জেলার বেতড়) পূর্ববাহিনী নদীটির নাম জাহ্নবী; বল্লালসেনের নৈহাটি লিপিতে গঙ্গা-ভাগীরথীকেই বলা হইয়াছে "সুরসরিৎ" [স্বর্গনদী বা দেবনদী]; রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে উত্তর-রাঢ় পূর্বসীমায় গঙ্গাতীরশায়ী—যে-গঙ্গার সুগন্ধ পুষ্পবাহী জল অসংখ্য তীর্থঘাটে ঢেউ দিয়া দিয়া প্রবাহিত হইত: "The Ganga whose waters bearing fragrant flowers dashed against the bathing places"। এই সব bathing places তীর্থঘাট, এবং পুষ্পম্লান পূজার ফুল, সন্দেহ কি! এই পূজা ভাগীরথীরই ভাগ্যে জোটে, পদ্মার নয়!

পদ্মা বা বড় গঙ্গার কথা পরে বলার সুযোগ হইবে; ভাগীরথী বা ছোট গঙ্গার কাহিনী আগে শেষ করিয়া লই। যাহাই হউক, পঞ্চদশ শতকে ভাগীরথী সংকীর্ণতোয়া সন্দেহ নাই, কিন্তু তখন তাহার প্রবাহ আজিকার মত ক্ষীণ নয়; সাগরমুখ হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে চম্পা-ভাগলপুর পর্যন্ত সমানে বড় বড় বাণিজ্যতরীর চলাচল তখনও অব্যাহত। ফান্ ডেন ব্রোকের নকশায় এই পথের দুই ধারের নগর-বন্দরের এবং পূর্ব ও পশ্চিমাগত শাখা-প্রশাখা নদীগুলির সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। নকশা খুলিলেই তাহাদের পরিচয় পাওয়া যাইবে, এবং ভাগীরথীই যে সংকীর্ণতর হওয়া সত্ত্বেও প্রধানতর প্রবাহ তাহার প্রমাণ পাওয়া

যাইবে। সাম্প্রতিক কালে বহু প্রমাণ-প্রয়োগের সাহায্যে এই প্রবাহের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। ফান্ ডেন ব্রোকের কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর আগে বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁহার মনসামঙ্গলে এই প্রবাহপথের যে বিবরণ দিয়েছেন তাহা সুপরিচিত নয়। কাজেই, এখানে তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিপ্রদাসের চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যতরী রাজঘাট, রামেশ্বর পার হইয়া সাগরমুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে; পথে পড়িতেছে, অজয় নদী, উজানী, শিবা নদী (বর্তমান শিয়ালনালা), কাটোয়া, ইন্দ্রাণী নদী, ইন্দ্রঘাট, নদীয়া, ফুলিয়া, গুপ্তিপাড়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, (সপ্তগ্রাম যে গঙ্গা-সরস্বতী-যমুনা সংগমে বিপ্রদাস তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই), কুমারহাট, ডাইনে হুগলী, বামে ভাটপাড়া, পশ্চিমে বোরো, পূর্বে কাকিনাড়া, তারপর মুলাজোড়া, গাড়ুলিয়া, পশ্চিমে পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, ডাইনে চাঁপদানি, বামে ইচ্ছাপুর, বাকিবাজার, নিমাইতীর্থ (বর্তমান বৈদ্যবাটি), চানক, মাহেশ, খড়দহ, শ্রীপাট, ডাইনে রিসিড়া (রিষড়া), বামে সুকচর, পশ্চিমে কোন্নগর, ডাইনে কোতরং, বামে কামারহাটি, পূর্বে আড়িয়াদহ (এড়েদহ), পশ্চিমে ঘুষুড়ি, তারপর পূর্বকূলে চিত্রপুর (চিৎপুর), কলিকাতা, (পশ্চিমকূলে) বেতড় (একাদশ শতক লিপির বেতড্ড চতুরক), তারপর কালিঘাট, চূড়াঘাট,, বারুইপুর, ছত্রভোগ, বদরিকাকুণ্ড, হাথিয়াগড়, চৌমুখী, শতমুখী, এবং সর্বশেষে সাগরসংগমতীর্থ যেখানে "তীর্থকার্য শ্রাদ্ধ কৈল পবিত্র তর্পণ॥ তাহার মেলান ডিঙ্গা সংগমে প্রবেশে। তীর্থকার্য কৈল রাজা পর[ম] হরিষে॥" সাগর-সংগমের নিকট গঙ্গা তো সত্যই চারিমুখে শতমুখে কেন, অসংখ্য খাল-নালায় শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, যুধিষ্ঠির পঞ্চশতমুখী গঙ্গার সাগরসংগমে তীর্থস্নান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বিপ্রদাসের উপরোক্ত বর্ণনার সঙ্গে ফান্ ডেন ব্রোকের নক্‌শার বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রেই এক। নদীয়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী (Tripeni), সপ্তগ্রাম (Coatgam), হুগলি (Oegli, পর্তুগীজ বণিকদের Ogulium), কলিকাতা (ফান্ ডেন্ ব্রোক Collecate এবং Calcutta নামে প্রায় সংলগ্ন দুইটি বন্দরের নাম করিতেছেন—একটি বিপ্রদাসের কলিকাতা এবং অপরটি কালিঘাট বলিয়া মনে হয়) প্রভৃতি নাম পাওয়া যাইতেছে। লক্ষণীয় এই, পঞ্চদশ শতকেই বিপ্রদাস হুগলী ও কলিকাতার উল্লেখ করিতেছেন, এবং ইহাই হুগলী ও কলিকাতার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ। তবে, সন্দেহ হয়, বিপ্রদাসের মূল তালিকায় পরবর্তী কালের গায়েনরা হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি নাম সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন; মূল তালিকায় এ-দুটি নাম ছিল না। পঞ্চদশ শতকে কলিকাতার উল্লেখ সত্যই যথেষ্ট সন্দেহজনক! ১৪৯৫-র (বিপ্রদাসের) পরে এবং ১৬৬০-র (ফান্ ডেন্ ব্রোকের) আগে বরা(হ)নগর, চন্দননগর, প্রভৃতি বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে; শুধু যে ফান্ ডেন্ ব্রোকই ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নয়, জাঁও ডি ব্যারোসের নক্‌শায়ও অগ্রপাড়া (Agrapara), বরাহনগরের (Bernagar) উল্লেখ পাইতেছি, সপ্তগ্রামের (সাতগাঁও

Satigam) সঙ্গে। ইতিহাসের তথ্যও তাহাই। হুগলীও শ্লোকের সময় কাঁপিয়া উঠিয়াছে।

যাহাই হউক, বিপ্রদাস ও ফান্ ডেন্ ব্রোকের নিকট হইতে কয়েকটি প্রধান প্রধান তথ্য পাওয়া গেল। প্রথমত, ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহই, অন্তত কলিকাতা পর্যন্ত, পঞ্চদশ-সপ্তদশ শতকের প্রধানতম প্রবাহ; দ্বিতীয়ত, ত্রিবেণী বা মুক্তবেণীতে সরস্বতী-ভাগীরথী-যমুনা সংগম; তৃতীয়ত, কলিকাতা ও বেতড়ের দক্ষিণে বর্তমানে আমরা যাহাকে বলি আদিগঙ্গা। সেই আদিগঙ্গার খাতেই ভাগীরথীর সমুদ্র যাত্রা; অন্তত বিপ্রদাসের চাঁদ সওদাগর সেই পথেই যে গিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। সপ্তদশ শতকে ফান্ ডেন ব্রোকের নক্‌শায় দেখা যায় তখনও আদিগঙ্গার খাত খুব প্রশস্ত, কিন্তু সেই খাতে কোনও গ্রাম-নগর-বন্দরের উল্লেখ নাই। হইতে পারে, এই খাতে বৃহৎ নৌকা চলাচল বিশেষ আর হইতেছে না। এই অনুমানের কারণ, এক শত বৎসর পরে রেনেলের নক্‌শায় দেখিতেছি, আদিগঙ্গার কোনও চিহ্নই নাই, অর্থাৎ এই এক শতকের মধ্যে আদিগঙ্গা তাহার বর্তমান আকৃতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহাই ইতিহাসগত; কারণ, শোনা যায়, নবাব আলীবর্দীর আমলে কলিকাতা-বেতড়ের দক্ষিণে বর্তমান ভাগীরথী প্রবাহের প্রবর্তন হইয়াছিল। আদিগঙ্গা পলি পড়িয়া চলাচলের অযোগ্য হইলে আলীবর্দী নাকি বর্তমান সোজা দক্ষিণবাহী প্রবাহটির মুখ খুলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু, আলীবর্দী নূতন প্রবাহপথ কাটিয়া বাহির করেন নাই; এ-পথ আদিগঙ্গা অর্থাৎ পঞ্চদশ শতক অপেক্ষাও পুরাতন, এবং বোধ হয় সরস্বতীর প্রাচীনতর খাতের দক্ষিণতম অংশ।

আদিগঙ্গা

পঞ্চদশ শতকের (বিপ্রদাসের) আগে ভাগীরথী অন্তত আংশিকত এই সরস্বতীর খাত দিয়াই সমুদ্রে প্রবাহিত হইত, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। আনুমানিক ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতার দক্ষিণে উলুবেড়িয়া-গঙ্গাসাগরখাতে ভাগীরথী প্রবাহিত হইত, এমন লিপি-প্রমাণ বিদ্যমান। পুরাণে, বিশেষত মৎস্য ও বায়ু পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, তাম্রলিপ্ত দেশের ভিতর দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত; এবং সম্ভবত সমুদ্র-সন্নিকট গঙ্গার তীরেই ছিল তাম্রলিপ্তির সুবৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। এ-সম্বন্ধে মৎস্য পুরাণের উক্তিকে পৌরাণিক উক্তির প্রতিনিধি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। হিমালয়-উৎসারিত পূর্ব-দক্ষিণবাহী সাতটি প্রবাহকে এই পুরাণে গঙ্গা বলা হইয়াছে; এই সাতটির মধ্যবর্তী প্রবাহটির ভাগীরথী নামকরণ-প্রসঙ্গে ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়নের সুবিদিত গল্পটিও এইখানে বিবৃত করা হইয়াছে। এই পুরাণে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, কুরু, ভরত, পঞ্চাল, কৌশিক ও মগধ দেশ পার হইয়া বিন্ধ্যশৈলশ্রেণী গাত্রে (রাজমহল-সাঁওতালভূমি-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম শৈলমূলে) প্রতিহত হইয়া ব্রহ্মোত্তর (উত্তর-রাঢ়), বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্ত (সুহ্ম) দেশের ভিতর দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইত। প্রাচীন বাংলার ভাগীরথীর প্রবাহপথের ইহার চেয়ে সংক্ষিপ্ত সুন্দর সুস্পষ্ট বিবরণ আর কি

গঙ্গার প্রাচীনতম প্রবাহ

হইতে পারে? একটু পরেই আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, উত্তর ও দক্ষিণ-বিহারের ভিতর দিয়া রাজমহলের নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়া রাজমহল সাঁওতালভূমি-ছোটনাগপুর-মালভূম-ধলভূমের শৈলভূমিরেখা ধরিয়া যে অগভীর বিল ও নিম্নজলাভূমি সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত সেই ভূমিরেখাই ভাগীরথীর সন্ধান-সম্ভাব্য প্রাচীনতম খাত। যাহাই হউক, পুরাণ-বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এক্ষেত্রে ভাগীরথী-প্রবাহের কথাই ইঙ্গিত করা হইতেছে, এবং ইহাকেই বলা হইতেছে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ। এই প্রবাহ উত্তর-রাঢ়দেশের ভিতর দিয়া দক্ষিণবাহী, এবং তাহার পূর্বে বঙ্গ, পশ্চিমে তাম্রলিপ্ত, এই ইঙ্গিতও যেন মৎস্য পুরাণে পাওয়া যাইতেছে। ইহাই তো ইতিহাস-সম্মত। ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা-আনয়নের গল্প রামায়ণেও আছে, এবং সেখানেও গঙ্গা বলিতে রাজমহল-গঙ্গাসাগর প্রবাহকেই যেন বুঝাইতেছে। যুধিষ্ঠির গঙ্গাসাগর-সংগমে তীর্থস্নান করিতে আসিয়াছিলেন, এবং সেখান হইতে গিয়াছিলেন কলিঙ্গ দেশে। রাজমহল-গঙ্গাসাগর প্রবাহই যে যথার্থত ভাগীরথী ইহাই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের ইঙ্গিত, এবং এই প্রবাহের সঙ্গেই সুদূর অতীতের সূর্যবংশীয় ভগীরথ রাজার স্মৃতি বিজড়িত। উইলিয়ম উইলকক্স সাহেব এই ভগীরথ-ভাগীরথী কাহিনীর যে পৌর্তিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা ইতিহাস-সম্মত বলিয়া মনে হয় না। পদ্মা-প্রবাহ অপেক্ষা ভাগীরথী-প্রবাহ যে অনেক প্রাচীন এ-সম্বন্ধেও কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। যাহা হউক, জাও ডি ব্যারোসের (১৫৫০) এবং ফান্ ডেন ব্রোকের নকসায় (১৬৬০) পুরাণোক্ত প্রাচীন প্রবাহপথের ইঙ্গিত বর্তমান বলিয়া মনে হয়। এই দুই নকশার তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, সপ্তদশ শতকে জাহানাবাদের নিকটে আসিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দামোদরের একটি প্রবাহ (ক্ষমানন্দ-কথিত বাঁকা দামোদর) উত্তর-পূর্ব বাহিনী হইয়া নদীয়া-নিমতার দক্ষিণে গঙ্গায়, এবং আর একটি প্রবাহ দক্ষিণ বাহিনী হইয়া নারায়ণগড়ের নিকটে রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার সঙ্গে মিলিত হইয়া তম্বোলি বা তমলুকের পাশ দিয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। আর, মধ্য ভূখণ্ডে ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের নিকট হইতে তৃতীয় আর একটি প্রবাহ (অর্থাৎ সরস্বতী) ভাগীরথী হইতে বিযুক্ত হইয়া পশ্চিম দিকে দক্ষিণ বাহিনী হইয়া কলিকাতা বেতড়ের দক্ষিণে পুনর্বার ভাগীরথীর সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। এক শতাব্দী আগে, ষোড়শ শতকে জাও ডি

সরস্বতী

ব্যারোসের নকশায় দেখিতেছি সরস্বতীর একবারে ভিন্নতর প্রবাহপথ। সপ্তগ্রামের (Satigam) নিকটেই সরস্বতীর উৎপত্তি, কিন্তু সপ্তগ্রাম হইতে সরস্বতী সোজা পশ্চিম বাহিনী হইয়া যুক্ত হইতেছে দামোদর-প্রবাহের সঙ্গে, বাঁকা দামোদর সংগমের নিকটেই। এই বাঁকা দামোদরের কথা বলিয়াছেন সপ্তদশ শতকের (১৬৪০) কবি ক্ষমানন্দ তাঁহার মনসামঙ্গল কাব্যে, সে কথা পরে উল্লেখ করিয়াছি। যাহাই হউক, দামোদর বর্ধমানের দক্ষিণে যেখান হইতে দক্ষিণবাহী হইয়াছে সেইখানে সরস্বতীর সঙ্গে তাহার সংযোগ—ইহাই জাও ডি ব্যারোসের নকশার ইঙ্গিত। আমার অনুমান, এই প্রবাহপথই গঙ্গা-

ভাগীরথীর প্রাচীনতর প্রবাহপথ, এবং সরস্বতীর পথ ইহার নিম্ন অংশ মাত্র। তাম্রলিপ্তি হইতে এই পথে উজান বাহিয়াই বাণিজ্যপোতগুলি পাটলিপুত্র-বারাণসী পর্যন্ত যাতায়াত করিত। এবং এই নদীতেই পশ্চিম দিকে ছোটনাগপুর-মানভূমের পাহাড় হইতে উৎসারিত হইয়া স্ব-স্বতন্ত্র অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদ তাহাদের জলস্রোত ঢালিয়া দিত। ইহাই প্রাচীন বাংলার গঙ্গা-ভাগীরথীর নিম্নতর প্রবাহ। এখনও ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, শিলাই, দ্বারকেশ্বর প্রভৃতি নদনদী ভাগীরথীতে জলধারা মেশায় সত্য, কিন্তু ইহাদের ভাগীরথী সংগমস্থান ভাগীরথী প্রবাহপথের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পূর্বদিকে সরিয়া আসিয়াছে; এবং ইহাদের, বিশেষভাবে দামোদর এবং রূপনারায়ণের, প্রবাহপথও নিম্নপ্রবাহে ক্রমশঃ অধিকতর দক্ষিণবাহী হইয়াছে। বর্ধমানের দক্ষিণে দামোদরের প্রবাহপথের পরিবর্তন খুব বেশি হইয়াছে। ফান্ ডেন ব্রোকের নক্শায় (১৬৬০) দেখা যায় বর্ধমানের দক্ষিণ-পথে দামোদরের একটি শাখা সোজা উত্তর-পূর্ববাহী হইয়া আম্বোনা (Ambona)-কালনার কাছে ভাগীরথীতে পড়িতেছে। ক্ষমানন্দ বা ক্ষেমানন্দ দাসের (কেতকদাস) মনসামঙ্গলে (১৬৪০ আনুমানিক) এই শাখাটিকেই বুঝি বলা হইয়াছে "বাঁকা দামোদর"। এই বাঁকা নদীর তীরে তীরে যে-সব স্থানের নাম কেতকদাস-ক্ষমানন্দ করিয়াছেন তাহার তালিকা: কুঝাটি বা ওঝটি, গোবিন্দপুর, গাঙ্গপুর, দে-পুর, নেয়াদা বা নর্মদাঘাট, কেজুয়া, আদমপুর, গোদাঘাট, কুকুরঘাটা, হাসনহাটি, নারিকেলডাঙ্গা, বৈগুপুর ও গহরপুর; গহরপুরের পরেই বাঁকা দামোদর "গঙ্গার জলে মিলি"য়া গেল। দামোদরের দক্ষিণবাহী প্রবাহপথেই যে এক সময় সরস্বতীর প্রবাহপথ ছিল, আমার এ অনুমান আগেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। জাও ডি বারোসের নক্শার ইঙ্গিত তাহাই। পরে সরস্বতী এই পথ পরিত্যাগ করিয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার প্রবাহপথে কিছুদিন প্রবাহিত হইত। বস্তুত, রূপনারায়ণের নিম্নপ্রবাহ একদা সরস্বতীরই প্রবাহপথ বলিয়া মনে হয়। যাহাই হউক অষ্টম শতকের পরেই সরস্বতী-ভাগীরথীর এই প্রাচীনতর প্রবাহপথের মুখ এবং নিম্নতম প্রবাহ শুকাইয়া যায়, এবং তাহার ফলেই তাম্রলিপ্ত বন্দর পরিত্যক্ত হয়। অষ্টম হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যে কোনও সময় সরস্বতী তাহার প্রাচীনতর পথ পরিত্যাগ করিয়া বর্তমানের খাত প্রবর্তন করিয়া থাকিবে এবং সেই খাতেও কিছুদিন ভাগীরথীর প্রবলতর স্রোত চলাচল করিয়া থাকিবে। চতুর্দশ শতকের গোড়াতেই সপ্তগ্রামে মুসলমানদের অন্যতম রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এ তথ্য সুবিদিত। কিন্তু দশম শতক হইতে নিম্নপ্রবাহে কলিকাতা-বেতড় পর্যন্ত ভাগীরথীর বর্তমান পথই প্রধানতম পথ এবং আরও দক্ষিণে আদি-গঙ্গার পথ। আলীবর্দীর সময়ে আদিগঙ্গা পরিত্যক্ত হইয়া মধ্যযুগের সরস্বতীর পরিত্যক্ত পথেই গঙ্গা-ভাগীরথীর পথ প্রবর্তিত হয়। বিপ্রদাসের চাঁদ সদাগর ত্রিবেণীর পরেই সরস্বতীতীরে সপ্তগ্রামের সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধিশালী

অজয়, দামোদর রূপনারায়ণ

বন্দর-নগর তাঁহার বর্ণনাই তাহা প্রমাণ করিতেছে। কিন্তু সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া চাঁদ সদাগর সরস্বতীর পথে আর অগ্রসর হইতেছে না, তিনি বর্তমান ভাগীরথীর প্রবাহে ফিরিয়া আসিতেছেন; কারণ, সপ্তগ্রামের পরেই উল্লেখ পাইতেছি কুমারহাট এবং হুগলীর। মনে হয় ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দেই সরস্বতীর পথে বেশিদূর আর অগ্রসর হওয়া যাইতেছে না, এবং সেই পথে বৃহৎ বাণিজ্যতরী চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে দেখিতেছি ফান্ ডেন ব্রোকের নক্শায় Oegli বা হুগলী খুব ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, তখনও Tripeni (ত্রিবেণী), Coatgam (সাতগাঁ) বিদ্যমান, কিন্তু উভয়েই মুমূর্ষু। ইহাই ইতিহাসগত। কারণ আগরপাড়া (Agrapara) বরাহনগর (Bernagar) ইত্যাদির উল্লেখ বরোসের নক্শাতে দেখিতেছি (১৫৫০), তাঁহার নক্শায় কিন্তু হুগলীর উল্লেখ নাই। ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে ফ্রেড্রিক সাহেব স্পষ্ট বলিতেছেন, বাতোর (Bator) বা বেতড়ের উত্তরে সরস্বতীর প্রবাহ অত্যন্ত অগভীর হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য ছোট ছোট জাহাজ যাওয়া আসা করিতে পারে না। নিশ্চয়ই এই কারণে পর্তুগীজেরা ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তগ্রামের পরিবর্তে হুগলীতেই তাহাদের বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহার পর ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফান্ ডেন ব্রোক Oegli খুব মোটা মোটা অক্ষরে উল্লেখ করিবেন তাহা মোটেই আশ্চর্য নয়!

যমুনা

ত্রিবেণী-সংগমের অন্যতম নদী যমুনা, এ-কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। এই যমুনা এখন খুঁজিয়া বাহির করা আয়াসসাধ্য, কিন্তু পঞ্চদশ শতকে বিপ্রদাসের কালের "যমুনা বিশাল অতি"। ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে বিপ্রদাস বলিতেছেন, "গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি, অধিষ্ঠান উমা মাহেশ্বরী"। রেনেলের নক্শায় যমুনা অতি খর্ব, ক্ষীণ একটি রেখা মাত্র।

গঙ্গা-ভাগীরথীর দক্ষিণ বা নিম্ন প্রবাহ ছাড়িয়া এইবার উত্তর প্রবাহের কথা একটু বলা যাইতে পারে। এ-সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ অত্যন্ত কম; অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই। প্রাচীন গৌড়ের প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণে এখন ভাগীরথী ও পদ্মা দ্বিধা বিভক্ত হইতেছে, কিন্তু প্রাচীন বাংলায়, অন্ততঃ সপ্তদশ শতকপূর্ব বাংলায় গৌড়-লক্ষণাবতী ছিল গঙ্গার পশ্চিম তীরে, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। বস্তুত, ডি ব্যারোস (১৫৫০) এবং গ্যাস্টাল্ডির (Gastaldi, ১৫৬১) নক্শা দুটিতেই গৌড়ের (Gorij; গ্যাস্টাল্ডির নক্শায় Gaur) অবস্থান গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে, এবং রাঢ় (আও ডি ব্যারোসের নক্শায় Rara) দেশের উত্তরে বা স্বল্প উত্তর-পশ্চিমে। মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণ হইতেও মনে হয়, গৌড় ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেই অবস্থিত ছিল।

গঙ্গার উত্তর প্রবাহ

রাজমহল পার হইয়া গঙ্গা খুব সম্ভবত তখন খানিকটা উত্তর ও পূর্ব বাহিনী হইয়া গৌড়কে পশ্চিম বা ডাইনে রাখিয়া রাঢ় দেশের মধ্য দিয়া দক্ষিণ বাহিনী হইত। বর্তমান কালিন্দী ও মহানন্দা খুব

সম্ভব এই উত্তর ও পূর্ব প্রবাহ-পথের প্রাচীন স্মৃতি বহন করে। যাহা হউক, ইহা হইতেছে আনুমানিক দ্বাদশ-ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতকের কথা; কিন্তু সপ্তদশ শতকেই গঙ্গা-ভাগীরথী এই পথ পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান পথ প্রবর্তন করিয়াছে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকেরও আগে গঙ্গা-ভাগীরথীর উত্তর-প্রবাহের একটি প্রাচীনতর পথ বোধ হয় ছিল, এবং এ-পথটি বর্তমান প্রবাহপথের পশ্চিমে। পূর্ণিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূমের নিম্ন সমভূমি ঘেঁষিয়া দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত ঝিল্ ও নিম্ন জলাভূমিময় এক সুদীর্ঘ দক্ষিণবাহী রেখা চলিয়া গিয়াছে। এই রেখা এখনও বর্তমান। এই রেখাই গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রাচীনতম প্রবাহপথের নির্দেশক বলিয়া আমার ধারণা। ইহারই নিম্নতর প্রবাহে আমি ইতিপূর্বে দামোদর-সরস্বতী-রূপনারায়ণের কিয়দংশের প্রবাহপথের ইঙ্গিত করিয়াছি। এই সমগ্র প্রবাহপথ সম্বন্ধে আমার ধারণা যে নিছক কল্পনামাত্র নয় তাহা মৎস্যপুরাণোক্ত গঙ্গার প্রবাহপথের বর্ণনা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। মৎস্যপুরাণে আছে কৌশিক (উত্তর-বিহার) ও মগধ (দক্ষিণ-বিহার) পার হইয়া গঙ্গা বিন্ধ্যপর্বতের গাত্রে (রাজমহল-সাঁওতালভূম-ছোটনাগপুর-মালভূম-ধলভূম শৈলমূলে) প্রতিহত হইয়া ব্রহ্মোত্তর অর্থাৎ মোটামুটি উত্তর-রাঢ়, বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্তি দেশের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত। ভাগীরথীর পূর্বতীর বঙ্গ, পশ্চিম তীর তাম্রলিপ্তি, উত্তরতর প্রবাহে উত্তর-রাঢ়।

গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহপথের প্রাচীন ইতিহাস এখন এইভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে: (১) ঐতিহাসিক কালের সন্ধান-সম্ভাব্য প্রাচীনতম পথ—পূর্ণিয়ার দক্ষিণে রাজমহল পার হইয়া গঙ্গা রাজমহল-সাঁওতালভূমি-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূমের তলদেশ দিয়া সোজা দক্ষিণ বাহিনী হইয়া সমুদ্রে পড়িত; এই প্রবাহেই ছিল অজয়, দামোদর এবং রূপনারায়ণের সংগম। এই তিনটি নদীই তখন নাতিদীর্ঘ। এবং এই প্রবাহেরই দক্ষিণতম সীমায় তাম্রলিপ্তি বন্দর। (২) ইহার পরের পর্যায়েই গঙ্গার পূর্বদিক যাত্রা সুরু হইয়াছে। রাজমহল হইতে গঙ্গা-ভাগীরথী খুব সম্ভবত বর্তমান কালিন্দী ও মহানন্দার খাতে উত্তর ও পূর্ব বাহিনী হইয়া গৌড়কে ডাইনে রাখিয়া পরে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাহিনী হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। কিন্তু তখন এই প্রবাহ ১নং খাতের আরও পূর্বদিকে সরিয়া আসিয়াছে। তবে, তখনও দামোদর এবং রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার জল ভাগীরথীতে পড়িতেছে এবং তাম্রলিপ্তি বন্দরও জীবন্ত। অর্থাৎ, এই পর্যায় অষ্টম শতকের আগেই। (৩) তৃতীয় পর্যায়েও গৌড় গঙ্গার পশ্চিম তীরে; কিন্তু তাম্রলিপ্তি বন্দর পরিত্যক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ দামোদর-রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার এবং কিছুদিনের জন্য সরস্বতীরও জল লইয়া ভাগীরথীর যে পশ্চিমতর প্রবাহ তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কলিকাতা বেতড় পর্যন্ত ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহপথের এবং বেতড়ের দক্ষিণে আদিগঙ্গা পথের প্রবর্তন হইয়াছে। এই পথেরই পরিচয় বিপ্রদাস (১৪৯৫) হইতে আরম্ভ করিয়া ফান্ ডেন্ ব্রোক (১৬৬০), ডু ল'

অভিল (de l' Auvlle, 1752), এফ্ ডি হ্বিট্ (F. de Witt, 1726), ইজাক্ টিরিয়ন (Izaak Tirion, 1730), থর্নটন্ (Thornton), প্রভৃতি সকলেরই নক্শায় পাওয়া যাইতেছে। আলীবর্দীর সময়ে (অর্থাৎ, মোটামুটি ১৭৫০) আদিগঙ্গা পরিত্যক্ত হওয়াতে বেতড়ের দক্ষিণে পুরাতন সরস্বতীর খাতে কি করিয়া ভাগীরথীকে প্রবাহিত করা হয় তাহা তো আগেই বলিয়াছি। তাই বোধ হয়, রেনেলের নক্শায় (১৭৬৪-৭০) আদিগঙ্গার কোনও চিহ্নই প্রায় নাই। কর্ণেল টলি (Tolly) সাহেব এই খাতের খানিকটা অংশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৭৮৫); তাঁহার নামানুসারেই Tolly's Nullah এবং Tollygunje যথাক্রমে এই খাত এবং বামতীরের পল্লীটির বর্তমান নামকরণ।

ভাগীরথী বা ছোটগঙ্গার কথা বলা হইল; এইবার বড়গঙ্গা বা পদ্মার কথা বলা যাইতে পারে। রেনেল সাহেব তো ইহাকে গঙ্গাই বলিয়াছেন। আগেই বলিয়াছি, পদ্মা অর্বাচীনা নদী; কিন্তু পদ্মাকে যতটা অর্বাচীনা পণ্ডিতেরা সাধারণত মনে করিয়া থাকেন ততটা অর্বাচীনা হয়তো সে নয়। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তো মনে করেন ষোড়শ শতক হইতে গঙ্গার পূর্বযাত্রার অর্থাৎ পদ্মার সূত্রপাত। ইহা ইতিহাস-বিরুদ্ধ বলিয়াই যেন মনে হয়। রেনেল ও ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শায় পদ্মা বেগবতী নদী। সিহাবুদ্দিন তালিস (১৬৬৬) ও মির্জা নাথনের (১৬৬৪) বিবরণীতে দেখিতেছি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সংগমের উল্লেখ, ইচ্ছামতীর সংগমে, ইচ্ছামতীর তীরে যাত্রাপুর এবং তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে ডাকচর, এবং ঢাকার দক্ষিণে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলিত প্রবাহের সমুদ্রযাত্রা—ভলুয়া এবং সন্দ্বীপের পাশ দিয়া। যাত্রাপুর হইতে ইচ্ছামতী বাহিয়া পথই ছিল তখন ঢাকায় যাইবার সহজতম পথ, এবং সেই পথেই টেভারনিয়ার (১৬৬৬) এবং হেজেস্ (১৬৮২) যাত্রাপুর হইয়া ঢাকা গিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও সর্বত্র গঙ্গার এই প্রবাহের পদ্মা নামকরণ দেখিতেছিনা। এই নামকরণ দেখিতেছি আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে (১৫৯৬-৯৭), মির্জা নাথনের বহারিস্তান-ই-ঘায়বি গ্রন্থে, ত্রিপুরা রাজমালায় এবং চৈতন্যদেবের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ-প্রসঙ্গে। আবুল ফজলের মতে কাজিহাটার কাছে গঙ্গা দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে; একটি প্রবাহ পূর্ব বাহিনী হইয়া পদ্মাবতী নাম লইয়া চট্টগ্রামের কাছে গিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। মির্জা নাথন বলিতেছেন, করতোয়া বালিয়ার কাছে একটি বড় নদীতে আসিয়া পড়িতেছে; এই বড় নদীটির নাম অন্যত্র বলা হইয়াছে পদ্মাবতী। ত্রিপুরা-রাজ বিজয়মাণিক্য ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা হইতে ঢাকায় আসিয়া ইচ্ছামতী বাহিয়া যাত্রাপুরে আসিয়া পদ্মাবতীতে তীর্থস্নান করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবও (জন্ম, ১৪৮৫) ২২ বৎসর বয়সে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে আসিয়া পদ্মাবতীতে তীর্থস্নান করিয়াছিলেন, কোনও কোনও চৈতন্য-জীবনীতে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকেই পদ্মা এবং ইচ্ছামতী প্রসিদ্ধা নদী, তাহার কিছু তীর্থ-মহিমাও আছে, এবং ঢাকা পার হইয়া চট্টগ্রামের নিকটে তাহার সাগরমুখ এ-তথ্য

তাহা হইলে অনস্বীকার্য। ষোড়শ শতকের জাও ডি ব্যারোস্ এবং সপ্তদশ শতকের ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্‌শায়ও এই তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া কঠিন নয়। পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় কৃত্তিবাস যে এই পদ্মাবতীকেই বলিতেছেন বড় গঙ্গা তাহা তো আগেই দেখিয়াছি। চতুর্দশ শতকে ইব্‌ন্ বতুতা (১৩৪৫-৪৬) চীন দেশ যাইবার পথে সমুদ্র তীরবর্তী চট্টগ্রামে (Chhadkawan —চাটগাঁ) নামিয়াছিলেন। তিনি চট্টগ্রামকে হিন্দুতীর্থ গঙ্গা নদী এবং যমুনা (Jaun) নদীর সংগমস্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যমুনা বা Jaun বলিতে বতুতা ব্রহ্মপুত্রই বুঝাইতেছেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তিনি বলিতেছেন, "The first town of Bengal, which we entered, was Chhadkawan (Chittagong), situated on the shore of the vast ocean. The river Ganga, to which the Hindus go in pilgrimage, and the river Jaun (Jamuna) have united near it before falling into the sea." তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অন্তত চতুর্দশ শতকেও গঙ্গার পদ্মাবতী-প্রবাহ চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং তাহার অদূরে সেই প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র-প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হইত। তটভূমি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম এখন অনেক পূর্ব-দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে, ঢাকাও এখন আর গঙ্গা-পদ্মার উপরে অবস্থিত নয়; পদ্মা এখন অনেক দক্ষিণে নামিয়া গিয়াছে, ঢাকা এখন পুরাতন গঙ্গা-পদ্মার খাত অর্থাৎ বুড়ীগঙ্গার উপর অবস্থিত; আর, পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের (যমুনা) সংগম এখন গোয়ালন্দের অদূরে; এই মিলিত প্রবাহ আরও পূর্ব-দক্ষিণে গিয়া চাঁদপুরের অদূরে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হইয়া সন্দ্বীপের (স্বর্ণদ্বীপ—সোনাদ্বীপ—সন্দ্বীপ) নিকট গিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। বস্তুত, সমতটীয় বাংলায়, বিশেষত, তাহার পূর্বাঞ্চলে বরিশাল হইতে আরম্ভ করিয়া চাঁদপুর পর্যন্ত পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা যে কি পরিমাণে ভাঙ্গাগড়া চালাইয়াছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, তাহা জাও ডি ব্যারোস হইতে আরম্ভ করিয়া রেনেল পর্যন্ত নক্‌শাগুলো বিশ্লেষণ করিলে খানিকটা ধারণাগত হয়। কিন্তু তাহা আলোচনার স্থান এখানে নয়। প্রাচীন বাংলায় গঙ্গার এই পূর্ব-প্রবাহের অর্থাৎ পদ্মা বা পদ্মাবতীর আকৃতি-প্রকৃতি কি ছিল তাহাই আলোচ্য। পঞ্চদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতক পর্যন্ত পদ্মার প্রবাহপথের অদলবদল বহু আলোচিত; কাজেই, এখানে তাহার পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই।

চতুর্দশ শতকে ইব্‌ন্ বতুতার বিবরণের আগে বহুদিন এই প্রবাহের কোনও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। দশম শতকের শেষে একাদশ শতকের গোড়ায় চন্দ্রবংশীয় রাজারা বিক্রমপুর-চন্দ্রদ্বীপ-হরিকেল অর্থাৎ পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গের অনেকাংশ জুড়িয়া রাজত্ব করিতেন। এই বংশের মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র তাঁহার ইদিলপুর পট্টোলী দ্বারা 'সতট-পদ্মাবতী বিষয়ের' অন্তর্গত 'কুমারতালক মণ্ডলে' একখণ্ড ভূমিদান করিয়াছিলেন। সতট-পদ্মাবতী বিষয় পদ্মানদীর দুই তীরবর্তী প্রদেশকে বুঝাইতেছে, সন্দেহ নাই; পদ্মাবতীও নিঃসন্দেহে আবুলফজল-ত্রিপুরা রাজমালা-চৈতন্য

গড়াই
মধুমতী
শিলাইদহ

জীবনী-উল্লিখিত পদ্মাবতী, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই। কুমারতালক মণ্ডলের উল্লেখ আরও লক্ষণীয়। কুমারতালক, এবং বর্তমান গড়াই নদীর অদূরে ফরিদপুরের অন্তর্গত কুমারখালি দুইই কুমার নদীর ইঙ্গিত বহন করে, তাহা নিঃসন্দেহ। বর্তমান কুমার বা কুমার নদী পদ্মা-উৎসারিত মাথাভাঙ্গা নদী হইতে বাহির হইয়া বর্তমান গড়াইর সঙ্গে মিলিত হইয়া বিভিন্ন অংশে গড়াই, মধুমতী, শিলা(ই)দহ, বালেশ্বর নাম লইয়া হরিণঘাটায় গিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। এ অনুমান যুক্তিসংগত যে, এই সমস্ত প্রবাহটিরই যথার্থ নাম ছিল কুমার এবং কুমারই পরে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। তবে শিলা(ই)দহ নামটি পুরাতন বলিয়াই যেন মনে হয়। ফরিদপুরে প্রাপ্ত ধর্মাদিত্যের একটি পট্টোলীতে শিলাকুণ্ড নামে একটি জলাশয়ের উল্লেখ আছে। শিলাকুণ্ড ও শিলা(ই)দহ একই নাম হইতেও পারে; দুয়েরই অর্থ প্রায় এক। এই কুমার নদীর সাগর-মোহানার মুখ (হরিণ-ঘাটা) বা কৌমারকই বোধ হয় (দ্বিতীয় শতকের) টলেমির গঙ্গার পঞ্চমুখের তৃতীয় মুখ কাম্বেরীখন (Kamberikhon)। যাহা হউক, সতট-পদ্মাবতী বিষয়ের উল্লেখ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, দশম-একাদশ শতকেই পদ্মা বা পদ্মাবতীর প্রবাহ ইদিলপুর-বিক্রমপুর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং ঐদিক দিয়াই বোধ হয় সাগরে প্রবাহিত হইত; কুমারতালক মণ্ডলের (যে-মণ্ডল কুমার নদীর তল বা অববাহিকা, নদীর দুই ধারের নিম্নভূমি) উল্লেখ হইতে অনুমান হয় কুমার নদীও তখন বর্তমান ছিল এবং পদ্মাবতীর সঙ্গে তাহার যোগও ছিল। সাত শত বৎসর পর রেনেলের নকশায় তাহা লক্ষ্য করা যায়, এবং গড়াই-মধুমতী-শিলা(ই)দহ-বালেশ্বর যদি কুমারের সঙ্গে অভিন্ন না হয় তাহা হইলে সে যোগ এখনও বর্তমান।

কুমার

ইদিলপুর পট্টোলীর প্রায় সমসাময়িক একটি সাহিত্যগ্রন্থেও বোধ হয় গুহ্য রূপকছলে পদ্মানদীর উল্লেখ আছে। দশম-দ্বাদশ শতকের বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম-সাধনার গুহ্য আচার-আচরণ সম্বন্ধে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার যে-সমস্ত পদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয়ের কল্যাণে আজ সুপরিচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি পদের প্রথম চার লাইন এইরূপ:

> বাজণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
> অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ॥
> আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
> নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥ [৪৯ নং পদ, ভুসুকু সিদ্ধাচার্যের রচনা]

সিদ্ধাচার্য ভুসুকু একাদশ শতকের মধ্যভাগের লোক। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ মনে করেন ভুসুকু তাঁহার গুরু দীপংকর-অতীশ-শ্রীজ্ঞানের পঞ্চশিষ্যের অন্যতম এবং "এই বাঙ্গাল দেশেরই এক প্রাচীন কবি।"[৮] উদ্ধৃত লাইন চারিটির আপাত অর্থ এই: 'পদ্মাখালে বজ্রনৌকা পাড়ি বাহিতেছি। অদ্বয়-বঙ্গালে ক্লেশ লুটিয়া লইল। ভুসু, তুই আজ (যথার্থ) বঙ্গালী

হইলি। চণ্ডালীকে তুই নিজ ঘরনী করিয়া লইয়াছিস্।' এখানে পদ্মাখাল, বঙ্গাল, বঙ্গালী প্রভৃতি শব্দের এবং সমস্ত পদটির সহজিয়া মতানুগত গুহ্য অর্থ তো আছেই, তবে সেই গুহ্য অর্থ গড়িয়া উঠিয়াছে কয়েকটি বস্তুসম্পর্কগত শব্দকে অবলম্বন করিয়া। ভুসুকু বঙ্গালী অর্থাৎ পূর্ব-দক্ষিণ বঙ্গবাসী ছিলেন। ১০২১-২৫ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রচোল দক্ষিণ-রাঢ়ের পরেই বঙ্গাল দেশ জয় করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্বতীরে বর্তমান দক্ষিণ-বঙ্গই বঙ্গালদেশ এবং এই বঙ্গাল দেশ অন্তত বিক্রমপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি যখন বঙ্গালী এবং বঙ্গাল দেশের সঙ্গে পদ্মাখালের কথা বলিতেছেন, তখন পউআ খাল এবং পদ্মাবতী নদী যে এক এবং অভিন্ন, একথা স্বীকার করিতে আপত্তি হইবার কারণ নাই। তাহা হইলে, ইদিলপুর লিপি এবং ভুসুকুর এই পদটিই পদ্মা বা পদ্মাবতী নদীর প্রাচীনতম নিঃসংশয় ঐতিহাসিক উল্লেখ। তবে, পদ্মা তখনও হয়তো এত বড় নদী হইয়া উঠে নাই; বোধ হয় খালোপমই ছিল।

দশম-একাদশ শতকে পদ্মার উল্লেখ দেখা গেল। কিন্তু পদ্মা যে গঙ্গা-ভাগীরথীর অন্যতম শাখা খুব প্রাচীন লোকস্মৃতির মধ্যে তাহা বিধৃত হইয়া আছে। দক্ষিণবাহী গঙ্গা-ভাগীরথী হইতে পদ্মার উৎপত্তি কাহিনী বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, দেবী ভাগবত, মহাভাগবত পুরাণ এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের একটিও অবশ্য খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের আগের রচিত গ্রন্থ নয়, কিন্তু কাহিনীগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বযাত্রার প্রবাহপথ অর্থাৎ পদ্মা দশম-একাদশ শতক হইতেও প্রাচীন। তবে, তখন বোধ হয় পদ্মা এত প্রশস্তা ও বেগবতী নদী ছিল না, হয়তো ক্ষীণতোয়া সংকীর্ণ ধারাই ছিল। তাহা না হইলে কামরূপ হইতে সমতট যাইবার পথে য়ুয়ান-চোয়াঙ্‌কে এই নদীটি পার হইতে হইত এবং তাহার বিবরণীতে আমরা নদীটির উল্লেখও পাইতাম। এই অনুল্লেখ হইতে মনে হয় পদ্মা তখন উল্লেখযোগ্য নদী ছিল না। তাহা ছাড়া, ষষ্ঠ শতকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি হিমবচ্ছিখর হইতে দ্বাদশ শতকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; পদ্মা আজিকার মতন ভীষণা প্রশস্তা হইলে হয়তো একই ভুক্তি পদ্মার দুই তীরে বিস্তৃত হইত না। জ্যোতির্বেত্তা ও ভৌগোলিক টলেমি (Ptolemy, 150 A. D.) তাঁহার আন্তর্গাঙ্গেয় (India intra-Gangem) ভারতবর্ষের নক্‌শা ও বিবরণীতে তদানীন্তন গঙ্গা-প্রবাহের সাগরসংগমে পাঁচটি মুখের উল্লেখ করিয়াছেন। টলেমির নক্‌শা ও বিবরণ নানা দোষে দুষ্ট এবং সর্বত্র সকল বিষয়ে খুব নির্ভরযোগ্যও নয়। তবু, তাঁহার সাক্ষ্য এবং পরবর্তী ঐতিহাসিক উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া কিছু কিছু অনুমান ঐতিহাসিকেরা করিয়াছেন, এবং এই সব মোহানা অবলম্বনে প্রাচীন ভাগীরথী-পদ্মার প্রবাহপথেরও কিছু আভাস দিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা শক্ত; তবে মোটামুটি মতামত গুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে যথাক্রমে এই মোহানাগুলির নাম: (১) Kambyson; তারপর Poloura নামে নগর; (২) Mega (great); (৩) Kamberi-

khon ; তারপর Tilogrammon নামে এক নগর ; (৪) Pseudostomon (false mouth); এবং সর্বশেষে পূর্বতম মোহানা (৫) Antibole (thrown back)। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই মোহানাগুলিকে যথাক্রমে (১) তাম্রলিপ্তি-নিকটবর্তী গঙ্গাসাগর মুখ, (২) আদিগঙ্গা বা রায়মঙ্গল-হরিয়াভাঙ্গা মুখ, (৩) কুমার-হরিণঘাটা মুখ, (৪) দক্ষিণ সাহাবাজপুর মুখ, এবং (৫) সন্দীপ-চট্টগ্রাম মধ্যবর্তী আড়িয়ল খাঁ নদীর নিম্নতম প্রবাহমুখ বলিয়া মনে করেন। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় মনে করেন, (১) কালিদাস-কথিত কপিশা বা বর্তমান কাসাইর মুখ, (২) ভাগীরথীর সাগরমুখ (৩) কুমার-কুমারক-হরিণঘাটা মুখ, (৪) পদ্মা-মেঘনার সম্মিলিত প্রবাহমুখ, এবং (৫) বুড়ীগঙ্গা মুখই যথাক্রমে 'টলেমি-কথিত গঙ্গার পঞ্চমুখ। এই দুই মতের মধ্যে ১ ও ২নং ছাড়া আর কোথাও খুব মূলগত বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই ; ২নং মুখের পার্থক্যও খুব মূলগত নয়। ৩, ৪, ও ৫ নং মুখ সম্বন্ধে যদি সন্তোক্ত মত দুইটি সত্য হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হয় টলেমির সময়েই অন্তত ঢাকা-ফরিদপুর অঞ্চল পর্যন্ত গঙ্গার পূর্ব-দক্ষিণবাহী প্রবাহপথ অর্থাৎ পদ্মার প্রবাহপথের অস্তিত্ব ছিল। খুব অসম্ভব নাও হইতে পারে, তবে, এসম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।

পদ্মার প্রাচীনতম প্রবাহপথের নিশানা সম্বন্ধেও নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। ফান্ ডেন্ ব্রোকের (১৬৬০) নক্‌শায় দেখা যাইতেছে পদ্মার প্রশস্ততর প্রবাহের গতি ফরিদপুর-বাখরগঞ্জের ভিতর দিয়া দক্ষিণ সাহাবাজপুরের দিকে। কিন্তু ঐ নক্‌শাতেই প্রাচীনতর পথটিরও কিছুটা ইঙ্গিত বোধ হয় আছে। এই পথটি রাজসাহীর রামপুর-বোয়ালিয়ার পাশ দিয়া চলন বিলের ভিতর দিয়া ধলেশ্বরীর খাত দিয়া ঢাকার পাশ দিয়া মেঘনা-খাড়ীতে গিয়া সমুদ্রে মিশিত। ঢাকার পাশের নদীটিকে যে বুড়ীগঙ্গা বলা হয়, তাহা এই কারণেই ; ঐ বুড়ীগঙ্গাই প্রাচীন পদ্মা-গঙ্গার খাত। কিন্তু তাহারও আগে কোন্ পথে পদ্মা প্রবাহিত হইত, সে-সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন।

ধলেশ্বরী
বুড়ীগঙ্গা

পদ্মার প্রধান প্রবাহ ছাড়া পদ্মা হইতে উৎসারিত আরও কয়েকটি নদীর প্রবাহপথে ভাগীরথী-পদ্মার জল নিষ্কাশিত হয়। ইহাদের ভিতর জলাঙ্গী এবং চন্দনা নদী দুইটি পদ্মা হইতে ভাগীরথীতে প্রবাহিত ; এবং দুইটি নদীই ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্‌শায় দেখানো আছে। চন্দনা তদানীন্তন যশোহরের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইত। পদ্মা হইতে সমুদ্রে প্রবাহিত প্রাচীন নদীগুলির মধ্যে কুমারই প্রধান এবং প্রাচীনতম। কিন্তু কুমার এখন মরণোন্মুখ। মধ্যযুগে এই নদীগুলির মধ্যে ভৈরবও ছিল অন্যতম ; সেই ভৈরবও মরণোন্মুখ। বর্তমানে সাগরগামী পদ্মাশাখাগুলির মধ্যে মধুমতী ও আড়িয়ল খাঁই প্রধান। ধলেশ্বরী-বুড়ীগঙ্গা যেমন পদ্মার উত্তরতম প্রবাহপথের স্মারক, আড়িয়ল খাঁ (মির্জা নাথনের অওল খাঁ)

জলাঙ্গী
চন্দনা

ভৈরব
মধুমতী
আড়িয়াল খাঁ

তেমনই দক্ষিণতম প্রবাহপথের স্তোতক। যাহা হউক, মধুমতী ও আড়িয়াল খাঁ, এই দুইটি নদীর অস্তিত্ব সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের নক্সাগুলিতেই দেখা যাইতেছে, যদিও বর্তমানে প্রবাহপথ অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভাগীরথী পদ্মার বিভিন্ন প্রবাহপথের ভাঙা-গড়ার ইতিহাস অনুসরণ করিলেই বুঝা যায়, এই দুই নদীর মধ্যবর্তী সমতটীয় ভূভাগে, অর্থাৎ নদী দুইটির অসংখ্য খাড়ি-খাড়িকাকে লইয়া কি তুমুল বিপ্লবই না চলিয়াছে যুগের পর যুগ। এই দুইটি নদী এবং তাহাদের অগণিত শাখাপ্রশাখা বাহিত সুবিপুল পলিমাটি ভাগীরথী-পদ্মা মধ্যবর্তী খাড়িময় ভূভাগকে বারবার তছনছ করিয়া বারবার তাহার রূপ পরিবর্তন করিয়াছে। পদ্মার খাড়িতে ফরিদপুর অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথীর তীরে ডায়মণ্ড হারবারের সাগরসংগম পর্যন্ত বাখরগঞ্জ, খুলনা, চব্বিশ-পরগণার নিম্নভূমি ঐতিহাসিক

বাংলার খাড়ি
ভাটি

কালেই কখনও সমৃদ্ধ জনপদ, কখনও গভীর অরণ্য, অথবা অনাবাসযোগ্য জলাভূমি, কখনও বা নদীগর্ভে বিলীন, আবার কখনও খাড়ি-খাড়িকা অন্তর্হিত হইয়া নূতন স্থলভূমির সৃষ্টি। ফরিদপুর জেলায় কোটালিপাড়া অঞ্চল ষষ্ঠ শতকের একাধিক তাম্রপট্টোলীতে নব্যাবকাশিকা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; নব্যাবকাশিকা সেই ভূমি যে-ভূমি (বা অবকাশ) নূতন সৃষ্ট হইয়াছে। ষষ্ঠ শতকে নব্যাবকাশিকা সমৃদ্ধ জনপদ এবং নৌ-বাণিজ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ কেন্দ্র, অথচ আজ এই অঞ্চল নিম্নজলাভূমি। পট্টোলীগুলি হইতে মনে হয়, নৌকাদ্বারাই এই সব অঞ্চলে যাওয়া আসা করিতে হইত। আশ্চর্যের বিষয় এই, ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদে সেনরাজ বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষৎ লিপিতে বঙ্গের নাব্য অঞ্চলে রামসিদ্ধি পাটক নামে একটি গ্রামের উল্লেখ আছে। এই গ্রাম বাখরগঞ্জ জেলার গৌরনদী অঞ্চলে। এই নাব্য অঞ্চলেরই অন্তর্ভুক্ত বিনয়তিলক গ্রামের পূর্ব-সীমায় ছিল সমুদ্র। শ্রীচন্দ্রের (দশম-একাদশ শতক) রামপাল পট্টোলীতে নান্য মণ্ডলের উল্লেখ আছে; কেহ কেহ মনে করেন ইহার যথার্থ পাঠ নাব্য মণ্ডল, এবং ঐ পট্টোলীর নাব্যমণ্ডলান্তর্গত নেহকাষ্ঠি গ্রাম বাখরগঞ্জ জেলার বর্তমান নৈকাঠি গ্রাম। এই অনুমান মিথ্যা নয় বলিয়াই মনে হয়। যাহাই হউক, প্রাচীন বাংলায় নব্যাবকাশিকা নবসৃষ্ট ভূমি এবং ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ অঞ্চল নাব্য অর্থাৎ নৌ-যাতায়াতলভ্য এবং তাহার পূর্ব-সীমায় সমুদ্র। খুলনার নিম্ন অঞ্চলে তো ভাঙ্গা-গড়া মধ্যযুগে এবং খুব সাম্প্রতিক কালেও চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে। মধ্যযুগে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা, তারনাথ প্রভৃতি লেখকেরা, ময়নামতীর গানের রচয়িতা প্রভৃতি ভাগীরথীর পূর্বতীর হইতে সুবা বাংলার পূর্বদিকে বেঙ্গলা (Bengala—ঢাকার বাঙ্গালা-বাজার?) পর্যন্ত, বোধ হয় চট্টগ্রাম পর্যন্ত, সমস্ত নিম্নাঞ্চলটাকেই বাটি বা ভাটি নামে অভিহিত করিয়াছেন। আবুল ফজল বাটি বা ভাটি বলিতে সুবা বাংলার পূর্বাঞ্চল বুঝিয়াছেন।

মাণিকচন্দ্র রাজার গানেও "ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি"—এই ভাটিরও ইঙ্গিত সমুদ্রশায়ী এই সব খাড়ি-খাড়িকাময় নিম্নভূমির দিকে, অর্থাৎ, বঙ্গালভূমির দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে। এই ভাটিরই কিয়দংশ প্রাচীন বাংলার সমতট, এইরূপ অনুমান বোধ হয় খুব অসংগত নয়। অর্থের দিক হইতে সমতট হইতেছে সেই ভূমি যে-ভূমি (সমুদ্র) তটের সঙ্গে সমান, অর্থাৎ জোয়ারের জল যে-পর্যন্ত প্রবেশ করে; ভাটি অর্থও প্রায় তাহাই।

কিন্তু, সবচেয়ে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়াছে বর্তমান সুন্দরবন অঞ্চলে, চব্বিশপরগণা-খুলনা-বাখরগঞ্জের নিম্নভূমিতে; এবং সমস্ত পরিবর্তনটাই ঘটিয়াছে মধ্যযুগে। কারণ, এই অঞ্চলের পশ্চিম দিকটায় অর্থাৎ চব্বিশ-পরগণা জেলার নিম্নাঞ্চলে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সমানে সমৃদ্ধ ঘন বসতিপূর্ণ জনপদের চিহ্ন প্রায়ই আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। জয়নগর থানায় কাশীপুর গ্রামের সূর্যমূর্তি (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক); ডায়মণ্ড-হারবারের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বকুলতলা গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের পট্টোলী (দ্বাদশ শতক), এবং ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মলয় নামক স্থানে প্রাপ্ত জয়নাগের তাম্র-পট্টোলী (সপ্তম শতক); রাক্ষসখালি দ্বীপে প্রাপ্ত ডোম্মনপালের পট্টোলী (দ্বাদশ শতক); ঐ দ্বীপেই প্রাপ্ত লিপি-উৎকীর্ণ এক ঝাঁক মাটির শীলমোহর (একাদশ শতক); খাড়ি পরগণায় প্রাপ্ত অসংখ্য পাথরের মূর্তি, ২।৪টি ভগ্নমন্দির, কালিঘাটে প্রাপ্ত গুপ্তমুদ্রা, ইত্যাদি সমস্তই চব্বিশ-পরগণা জেলার নিম্নভূমিতে প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধ জনপদের ইঙ্গিত করে। সেন রাজাদের ও ডোম্মনপালের আমলে খাড়িমণ্ডল ও খাড়িবিষয় পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ বিভাগই ছিল। অথচ, আজ এই সব অঞ্চল প্রায় পরিত্যক্ত; কিছুদিন আগে তো সমস্তটা জুড়িয়া গভীর অরণ্যই ছিল, এখনও বহু অংশেই অরণ্য; কিছু কিছু অংশে মাত্র নূতন আবাদ ও বসতি হইতেছে। খুলনার দিকে এবং বাখরগঞ্জের কিয়দংশে তো এখনও গভীর অরণ্য। রাল্‌ফ্ ফিচ্ (Ralph Fitch, 1583-91) বলিতেছেন, Bengala দেশ ব্যাঘ্র, বন্য-মহিষ ও বন্য-মুরগী (হাঁস) অধ্যুষিত বনময় জলাভূমি। ধর্মপালের খালিমপুর লিপি, দেবপালের নালন্দা লিপি এবং লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া লিপিতে ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল নামে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত একটি স্থানের উল্লেখ আছে। নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে (যে-সমুদ্রতট ব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত) মনে হয়, চব্বিশ-পরগণা, খুলনা, বাখরগঞ্জের দিকেই যেন স্থানটির ইঙ্গিত। এ-অনুমান সত্য হইলে স্বীকার করিতে হয়, নবম—দ্বাদশ শতকে দক্ষিণ-বঙ্গের অন্তত কিয়দংশ গভীর অরণ্যময় ছিল। ব্যাঘ্রতটী বাগড়ী হইলেও হইতে পারে, না-ও হইতে পারে।

সুন্দরবন

আকবরের আমলে ঈশা খাঁ আফ্‌গান ভাটি অঞ্চলের সামন্তপ্রভু ছিলেন; সেই সময়ে মাহ্‌মুদাবাদ ও খলিফাতাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিল বর্তমান ফরিদপুর, যশোর এবং নোয়াখালি জেলার কিয়দংশ, এবং এই দুই সরকারান্তর্গত বহুলাংশ গভীর অরণ্যময় ছিল। খান

জাহান আলীর আমলে (ষোড়শ শতকে) যশোর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে গভীর অরণ্য; তিনি সুন্দরবনের অনেক অংশে নূতন আবাদ করাইয়াছিলেন। যুসুফ্ সাহ্, সৈয়দ হোসেন সাহ, নসরৎ সাহ (১৪৯৪, ১৪৯৪, ১৫২০) প্রভৃতি সুলতানেরাও এই সব অরণ্যের কিছু কিছু নূতন আবাদ করাইয়াছিলেন, প্রধানত ফরিদপুর ও যশোরে। এই দুই জেলার অনেক অংশ ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিল; বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে ফতেহাবাদের উল্লেখ আছে (পঞ্চদশ শতক)। জেসুইট্ পাদ্রী ফারনান্ডিজ্ (Fernandus, 1598) হুগলি হইতে শ্রীপুর (খুলনা জেলায় ইচ্ছামতীর তীরে, বর্তমান টাকির উল্টা দিকে) হইয়া চট্টগ্রামের সমস্ত পথটাই ব্যাঘ্রসংকুল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এক বৎসর পর ফন্‌সেকা (Fonseca, 1599) বাক্‌লা হইতে সপ্তগ্রামের (সাতগাঁ = Chandeecan) পথ বানর ও হরিণ অধ্যুষিত বনময় ভূমি বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। পূর্বোক্ত ফিচ্ সাহেব (১৫৮৩-৯১) বলিতেছেন, বাক্‌লা বন্দরের পাশ ঘিরিয়াই জঙ্গল। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে প্রতাপাদিত্য যশোরে সুন্দরবন অঞ্চলেই নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রয়োদশ শতকের পর কোনও সময় চব্বিশ-পরগণা জেলার নিম্নভূমি কোনও অজ্ঞাত অনির্ধারিত কারণে পরিত্যক্ত হয়; এই কারণ কোন প্রাকৃতিক কারণ হইতে পারে, কোনও রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কারণও হইতে পারে। তাহার পর হইতেই এই অঞ্চল গভীর অরণ্যময়। যশোর-খুলনা ও ফরিদপুর-বাখরগঞ্জের কিছু কিছু নিম্নভূমি হিন্দু আমলেই ধীরে ধীরে ক্রমশ সমৃদ্ধ জনপদে গড়িয়া উঠিতেছিল, এবং নূতন নূতন আবাদ তথাকথিত পাঠান আমলেও নূতন জনপদ গড়িয়া তুলিতেছিল, কিন্তু প্রকৃতির তাণ্ডব এবং মানুষের ধ্বংসলীলা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকেই ইহার উপর যবনিকা টানিয়া দেয়। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় ফতেহাবাদ সরকারে অসংখ্য ঘরবাড়ি, নৌকা, এবং দুই লক্ষ লোক নষ্ট হইয়া যায়। ইহার উপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইল মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের উন্মত্ত হত্যা ও লুণ্ঠনলীলা; এবং তাহার ফলে বাখরগঞ্জ এবং খুলনার নিম্নভূমি একেবারে জনমানবহীন গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়া গেল। রেনেলের নক্‌শায় (১৭৬১) দেখা যাইবে, বাখরগঞ্জ জেলার সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল জুড়িয়া লেখা আছে, "মগদের অত্যাচারে পরিত্যক্ত জনমানবহীন" ("Country depopulated by the Maghs.")।

পদ্মার পূর্ব-দক্ষিণতম প্রবাহে উত্তর হইতে লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র অতি প্রাচীন নদ এবং তাহার তীর্থ-মহিমাও নেহাৎ অর্বাচীন নয়। ততটা না হউক, ব্রহ্মপুত্রও পদ্মা-ভাগীরথীর ন্যায় অন্তত কয়েকবার খাত পরিবর্তন করিয়া যমুনা-পদ্মার পথে বর্তমান খাত গ্রহণ করিয়াছে এবং চাঁদপুরের দক্ষিণে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হইয়া সমুদ্রে অবতরণ করিয়াছে। গারো পাহাড়ের পশ্চিমের মোড় পর্যন্ত উত্তর-প্রবাহে লৌহিত্যের খাত পরিবর্তনের প্রমাণ বিশেষ কিছু নাই; পার্বত্যপথ, খাত পরিবর্তনের সুযোগও কম। কিন্তু গারো পাহাড়ের পশ্চিম-দক্ষিণ মোড় ঘুরিয়াই লৌহিত্য ঐ পাহাড়ের পূর্ব-দক্ষিণ তলভূমি ঘেঁষিয়া,

লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র

দেওয়ানগঞ্জের পাশ দিয়া, শেরপুর-জামালপুরের ভিতর দিয়া, মধুপুর গড়ের পাশ দিয়া, মৈমনসিংহ জেলাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, বর্তমান ঢাকা জেলার পূর্বাঞ্চল ভেদ করিয়া, সুবর্ণগ্রাম বা সোনার গাঁ'র দক্ষিণ-পশ্চিমে লাঙ্গলবন্দের পাশ দিয়া ধলেশ্বরীতে প্রবাহিত হইত। এই খাত এখনও বর্তমান, কিন্তু বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে প্রায় মৃত বলিলেই চলে। এই খাতই প্রাচীন এবং ব্রহ্মপুত্রের যাহা কিছু তীর্থমহিমা তাহা এই খাতেরই; এখনও জামালপুর-মৈমনসিংহ-লাঙ্গলবন্দে অষ্টমী-স্নান পূর্ব-বাংলার অন্যতম প্রধান ধর্মোৎসব। ফান্ ডেন ব্রোক (১৬৬০), ইজাক্ টিরিয়ন (১৭৩০) এবং থর্নটনের নক্সায় Salhet (Sylhet) বা শ্রীহট্টকে কেন যে এই প্রবাহপথের পশ্চিমে দেখান হইয়াছে তাহা বলা শক্ত; শ্রীহট্টের অবস্থিতি সম্বন্ধে বোধ হয় ইঁহাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান কিছু ছিল না। রেনেল (১৭৬৪-১৭৭৬) কিন্তু শ্রীহট্টের অবস্থিতি ঠিক দেখাইয়াছেন। যাহা হউক, ঢাকা জেলার উত্তরে এই ব্রহ্মপুত্র প্রবাহেরই ডান দিক হইতে একটি শাখা-প্রবাহ নির্গত হইয়াছে; ইহার নাম লক্ষ্যা (শীতললক্ষ্যা বা শীতলক্ষ্যা) বা ফান্ ডেন্ ব্রোকের Lecki। লক্ষ্যা ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিক দিয়া ব্রহ্মপুত্রেরই সমান্তরালে প্রবাহিত হইয়া বর্তমান ঢাকার দক্ষিণে (ব্রহ্মপুত্র-ধলেশ্বরী সংগমের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে) নারায়ণগঞ্জের নিকটে ধলেশ্বরীর সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইত। লক্ষ্যার এই প্রবাহ এখনও বর্তমান কিন্তু ধারা ক্ষীণ, অথচ ফান্ ডেন ব্রোকের আমলে এবং তারপরে উনবিংশ শতকের গোড়ায়ও লক্ষ্যা প্রশস্তা বেগবতী নদী। লক্ষ্যার কথা ছাড়িয়া ব্রহ্মপুত্রের মূল প্রবাহে ফিরিয়া আসা যাইতে পারে। ফান্ ডেন ব্রোক, ইজাক্ টিরিয়ন, থর্নটন, রেনেল ইত্যাদি সকলের নক্শা আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, সপ্তদশ শতকে ফান্ ডেন ব্রোকের আগেই ব্রহ্মপুত্র এই খাত পরিত্যাগ করিয়াছিল। কারণ, এই নক্শাগুলিতে দেখা যায় ব্রহ্মপুত্র আর ধলেশ্বরীতে প্রবাহিত হইতেছে না; বর্তমান ঢাকা জেলার সীমায় পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্বে মৈমনসিংহের ভিতর দিয়া আসিয়া পূর্ব-দক্ষিণতম কোনে ভৈরব-বাজার বন্দরের নিকট উত্তরাগত সুরমা-মেঘনার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের মিলন ঘটিতেছে, এবং উভয়ের সম্মিলিত ধারা চাঁদপুরের দক্ষিণে সন্দ্বীপের উত্তরে গিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। ভৈরব-বাজারের নিকট হইতে সমুদ্র পর্যন্ত এই ধারা রেনেলের সময়েও মেঘনা (Megna) নামেই খ্যাত। ব্রহ্মপুত্রের সম্মোক্ত প্রবাহই তাহার পূর্বতম প্রবাহ; কিন্তু ব্রহ্মপুত্র এই প্রবাহও পরিত্যাগ করে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি কোনও সময়ে; জলপ্রবাহ এখনও বিদ্যমান কিন্তু ধারা ক্ষীণ এবং গ্রীষ্মে মৃতপ্রায়। মেঘনা প্রধানত তাহার নিজের জলরাশিই সমুদ্রে নিষ্কাশিত করে। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি হইতে ব্রহ্মপুত্রের অন্যতম শাখা যমুনা প্রবলতরা হইয়া উঠে, এবং বর্তমানে মৈমনসিংহের উত্তর-পশ্চিমতম কোনে ফুলছড়ির নিকট হইতে উৎসারিতা, বগুড়া-পাবনার পূর্বসীমা বাহিতা এই যমুনাই ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশি বহন করিয়া আনিয়া এখন গোয়ালন্দের কাছে পদ্মাপ্রবাহে ঢালিয়া দিতেছে।

লক্ষ্যা

সপ্তদশ শতক হইতে লৌহিত্য-ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ-ইতিহাস সুস্পষ্ট; তাহার আগেকার ইতিহাসও কতকটা ধরিতে পারা কঠিন নয়, এবং দেওয়ানগঞ্জ-জামালপুর-লাঙ্গলবন্দ-ধলেশ্বরীর পথে সে-ইঙ্গিতও কিছু পাওয়া যাইতেছে। এ-পথ চতুর্দশ-ষোড়শ শতকের হইতে পারে, প্রাচীনতরও হইতে পারে। কিন্তু তারও আগে এই পথের ইতিহাস কোথাও পাইতেছি না। লৌহিত্য-ব্রহ্মপুত্রের উল্লেখ পুরাণে, প্রাচীন সাহিত্যে (যথা, মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে) এবং লিপিমালায় একেবারে অপ্রচুর নয়, এবং তাহা সুবিদিত। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন কামরূপরাজ্য ছিল এই লৌহিত্যের তীরে। গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্ত একবার লৌহিত্যতীরে কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মণের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন (ষষ্ঠ শতকের শেষাশেষি)। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই সব প্রাচীন উল্লেখ সাধারণত লৌহিত্যের উত্তর-প্রবাহ সম্বন্ধে। দক্ষিণ-প্রবাহে যেখানে বারবার খাত পরিবর্তন হইয়াছে সে-সম্বন্ধে কোনও প্রাচীন ঐতিহাসিক উল্লেখ এখনও পাওয়া যাইতেছে না।

মেঘনা সম্বন্ধে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। খাসিয়া-জৈন্তিয়া শৈলমালা হইতে মেঘনার উদ্ভব, কিন্তু উত্তর-প্রবাহে মেঘনা সুরমা নামেই খ্যাত এবং এই নামটি প্রাচীন। সুরমা শ্রীহট্ট জেলার ভিতর দিয়া মৈমনসিংহ জেলার নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ মহকুমার পূর্বসীমা স্পর্শ করিয়া আজমিরিগঞ্জ বন্দর ও অদূরবর্তী বানিয়াচঙ্গ গ্রাম বাম তীরে রাখিয়া ভৈরব-বাজারে এক সময় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইত। নিম্নতর প্রবাহের কথা ব্রহ্মপুত্র-প্রসঙ্গেই বলিয়াছি। সুরমা যেখান হইতে পশ্চিমাগতি ছাড়িয়া দক্ষিণাগতি লইয়াছে (বর্তমান মার্কুলি স্টীমার স্টেশনের নিকট) সুরমা সেখান হইতে মেঘনা নামও লইয়াছে। রেনেলের নকশায় এই পথ সুস্পষ্ট দেখান আছে; আজমিরিগঞ্জ-বানিয়াচঙ্গও বাদ পড়ে নাই। এই নদীপথের উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন হইয়াছে, ঐতিহাসিক প্রমাণ এমন কিছু নাই। মেঘনার নিম্ন-প্রবাহের দুই তীরে সমৃদ্ধ জনপদের পরিচয় চতুর্দশ শতকে ইব্‌ন্ বতুতার বিবরণেই পাওয়া যায়; ১৫ দিন ধরিয়া মেঘনার পথে তিনি গিয়াছিলেন; দুই ধারে ঘন বসতিময় গ্রাম, ফলের উদ্যান, মনে হইয়াছিল যেন কোনো বাজারের মধ্য দিয়া যাইতেছেন। মেঘনা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি অনুমানের উল্লেখ এ-প্রসঙ্গে হয়তো অবান্তর হইবে না। চলিত লোকবচনে ও স্মৃতিতে এই উৎপত্তি মেঘনাদ বা মেঘানন্দ শব্দ হইতে। কিন্তু টলেমি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে গঙ্গার অন্যতম মুখের নাম করিয়াছেন Mega (=great) বলিয়া। এই Mega=Megna (Magna=great) নদী হইতে মেঘনাদ=মেঘানন্দ=মেঘনা নামের উৎপত্তি একেবারে ইতিহাস-বিরুদ্ধ না-ও হইতে পারে। তবে, ইহা একান্তই অনুমান।

উত্তর-বঙ্গের নদনদীগুলির কথা এইবার বলা যাইতে পারে। উত্তর-বঙ্গের সর্ব প্রধান নদী করতোয়া। এই নদীর ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং ইহার তীর্থমহিমা বহুখ্যাত। পুরাণে বারবার করতোয়া-মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, করতোয়া-মাহাত্ম্য

নামে একখানা সুপ্রাচীন পুঁথি এখনও করতোয়ার তীর্থমহিমা ঘোষণা করে। মধুভারতে বলা হইয়াছে, "বৃহৎপরিসরা পুণ্যা করতোয়া মহানদী"; মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা অধ্যায়েও করতোয়া পুণ্যতোয়া বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং গঙ্গাসাগরসংগম তীর্থের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী প্রাচীন পুন্দনগল (=পুণ্ড্রনগর=বর্তমান মহাস্থানগড়, বগুড়ার অদূরে) এই করতোয়ার উপরই অবস্থিত ছিল। খুব প্রাচীন কালেও যে করতোয়া বর্তমান বগুড়া জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত তাহা মহাস্থানের অবস্থিতি এবং করতোয়া-মাহাত্ম্য হইতেই প্রমাণিত হয়। সপ্তম শতকে য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ পুণ্ড্রবর্ধন হইতে কামরূপ যাইবার পথে বৃহৎ একটি নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন; তিনি এই নদীটির নাম করেন নাই, কিন্তু টাং-সু (T'ang-shu) গ্রন্থের মতে এই নদীর নাম ক-লো-তু বা Ka-lo-tu। Watters সাহেব Ka-lo-tuকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। নিঃসন্দেহে ইহা ভুল। Ka-lo-tu স্পষ্টতই করতোয়া; এই নদীই যে সপ্তম শতকে পুণ্ড্রবর্ধন ও কামরূপের মধ্যবর্তী সীমা, এ-খবরও টাং-সু গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতের কবি-প্রশস্তিতেও এই তথ্যের আংশিক সমর্থন পাওয়া যাইতেছে; সেখানে স্পষ্টতই বলা হইতেছে, বরেন্দ্রী দেশ (লিপিমালার বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী মণ্ডল) গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী দেশ। যাহা হউক, এই সব উল্লেখ, এবং লিপিমালার যে সব গ্রাম ও নগর বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বলা হইয়াছে (যেমন বায়ীগ্রাম=বৈগ্রাম, বর্তমান দিনাজপুর জেলায় হিলির নিকটে; কোলঞ্চ=ক্রোড়ঞ্চ, বোধ হয় দিনাজপুর জেলায়; কান্তাপুর=কান্তনগর, বর্তমান দিনাজপুর জেলায়; নাটারি=নাটোর, বর্তমান রাজসাহী জেলায়; পদুবন্বা=পাবনা? ইত্যাদি) তাহাদের অবস্থিতি বিশ্লেষণ করিলে সন্দেহ করিবার কারণ থাকেনা যে, সপ্তম শতকে বরেন্দ্রীর পূর্বদিক ঘিরিয়া, প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের পূর্ব-সীমা দিয়া, করতোয়া প্রবাহিত হইত। করতোয়া-মাহাত্ম্য পাঠে মনে হয়, এক সময়ে করতোয়া স্ব-স্বতন্ত্র নদী হিসাবে গিয়া সাগরে পড়িত, কিন্তু তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। লোক-স্মৃতি সাগর বলিতে বোধ হয় কোন বৃহৎ জলস্রোতকেই বুঝিয়া ও বুঝাইয়া থাকিবে। অন্তত, মধ্যযুগে করতোয়ার জল নিঃশেষিত হইতেছে প্রশস্ত পদ্মা-ধলেশ্বরী সংগমে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা পরে বলিতেছি।

করতোয়া

করতোয়া ভোটান-সীমান্তেরও উত্তরে হিমালয় হইতে উৎসারিত হইয়া দারজিলিং-জলপাইগুড়ি জেলার ভিতর দিয়া বাংলা দেশে প্রবেশ করিয়াছে। এই উত্তরতম প্রবাহে ইহার নাম করতোয়া নয়, দিস্তাং বা তিস্তা যাহার সংস্কৃতীকরণ হইয়াছে ত্রিস্রোতা। জলপাইগুড়ি হইতে তিস্তার (ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শায় Tiesta) তিনটি স্রোত তিন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে; দক্ষিণবাহী পূর্বতম স্রোতের নাম করতোয়া; দক্ষিণবাহী মধ্যবর্তী স্রোতধারার নাম আত্রাই; দক্ষিণ-

তিস্তা

বাহী পশ্চিমতম স্রোতের নাম পূর্ণভবা বা পুনর্ভবা। পুনর্ভবা উনবিংশ শতকে আইয়রগঞ্জের নিকটে মহানন্দার সঙ্গে মিলিত হইত, এবং মহানন্দা রামপুর-বোয়ালিয়ার নিকটে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হইত। কিন্তু, তাহার আগে এক সময় মহানন্দা (এবং পুনর্ভবা) লক্ষণাবতী-গৌড়ের ভিতর দিয়া আসিয়া করতোয়ায়, নিজ প্রবাহের জল নিষ্কাশিত করিত, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। রেনেলের নক্‌শায় সে-পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু ফান্ ডেন্ ব্রোকের আমলে মহানন্দার গতি আরও পশ্চিমে। আত্রাই (তঙ্গন-আত্রাই) তিস্তা হইতে নির্গত হইয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া চলন বিলের ভিতর দিয়া জাফরগঞ্জের নিকটে করতোয়ার সঙ্গে মিলিত হইত। ফান্ ডেন্ ব্রোক্, ইজাক্ টিরিয়ন্, থর্নটন, সকলের নক্‌শাতেই আত্রাই-করতোয়া সংগম সুস্পষ্ট দেখান আছে। এই নক্‌শাগুলিতেই দেখা যায়, আত্রাইর ছোট একটি শাখা পশ্চিমবাহী হইয়া গিয়া পদ্মায় পড়িয়াছে; কিন্তু তঙ্গন-আত্রাই পথই প্রধান প্রবাহপথ। দেখা যাইতেছে, তিস্তা হইতে নির্গত দুইটি স্রোতই উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়া প্লাবিত করিয়া তাহাদের জলরাশি শেষ পর্যন্ত ঢালিয়া দিত তৃতীয় স্রোতটিতে অর্থাৎ করতোয়ায়; তাহা ছাড়া, সে নিজের এবং উত্তরতম প্রবাহ তিস্তার সমস্ত জলধারা তো বহন করিতই। এই সব কারণেই ষোড়শ শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত করতোয়া ছিল অত্যন্ত প্রশস্তা বেগবতী নদী। সপ্তদশ শতকের গোড়াতে মির্জা নাথনের বিবরণী (১৬০৮) পড়িলে মনে হয়, সাহাজাদপুরের (পাবনা) দক্ষিণে করতোয়া বক্র, সংকীর্ণ ও ক্ষীণতোয়া হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ করতোয়া মৃতপ্রায়; আত্রাই-পুনর্ভবারও একই দশা! কিন্তু সপ্তদশ শতকেও অবস্থা তত খারাপ হয় নাই। ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্‌শায় (১৬৬০) আত্রাই ও করতোয়া দুয়েরই আকৃতি প্রশস্ত। টেভারনিয়ার ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে উত্তরাগত একটি বড় নদীর নাম করিতেছেন Chativor; এই Chativor তো করতোয়া বলিয়াই মনে হয়। তাহা ছাড়া, জাও ডি ব্যারোস (১৫৫০) এবং কাস্তেল্লি দা ভিনোলা (১৬৮৩) এই দুইজনই তাঁহাদের নক্‌শায় উত্তর হইতে সোজা দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত লম্ববান একটি নদী দেখাইতেছেন; ইহার নাম কাওর (Caor)। কাওরকেও করতোয়া বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। ইহাদের নক্‌শা যথাযথ নয় এবং এবং হয়তো সর্বত্র সর্বথা নির্ভরযোগ্যও নয়; তবু সমসাময়িক বাংলার নদনদী বিন্যাসের আভাস এই সব নক্‌শায় খানিকটা নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। হয়তো ইঁহাদের কাছে মনে হইয়াছিল, অথবা লোকস্মৃতিতে বা লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে, করতোয়া সাগরগামিনী নদী। Caor যে করতোয়া তাহার একটু পরোক্ষ প্রমাণ ডি ব্যারোস নিজেই দিতেছেন। তাঁহার নক্‌শায় দেখিতেছি করতোয়া Reino de Comotah বা কামতা রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। কামতা বর্তমান রংপুর-কোচবিহার। করতোয়া-আত্রাইর সম্মিলিত প্রবাহ এক সময় হয়তো ব্রহ্মপুত্রে গিয়া মিশিত। এ-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু নাই; তবে হাণ্টার সাহেব শুনিয়াছিলেন, করতোয়া-

পুনর্ভবা, মহানন্দা আত্রাই

বাসীরা করতোয়াকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়াই জানিত। ফান্ ডেন ব্রোকের নক্‌শায় করতোয়া ব্রহ্মপুত্রে গিয়া পড়িতেছে বলিয়া যেন মনে হয়। যাহাই হউক, বুঝা যাইতেছে সপ্তদশ শতকে করতোয়া (এবং আত্রাইও) উল্লেখযোগ্য নদী। অষ্টাদশ শতকে রেনেলের নক্‌শায়ও আত্রাই এবং করতোয়ার সেই মোটামুটি সমৃদ্ধ রূপ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এবং করতোয়া তদানীন্তন রংপুর-দিনাজপুরের ভিতর দিয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া, পুঁটিয়ার (Pootyah) কিঞ্চিৎ উত্তর হইতে পদ্মার সঙ্গে প্রায় সমান্তরালে, পূর্ব-দক্ষিণ বাহিনী হইয়া পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের সংগমস্থানের নিকটে, পদ্মায় গিয়া পড়িতেছে। কিন্তু ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের হিমালয়-সানুর বিরাট বন্যায় আত্রাই-করতোয়ার সমৃদ্ধি বিনষ্ট হইয়া গেল। উত্তর-প্রবাহে যে-তিস্তা এই নদী দুইটির সমৃদ্ধির মূলে সেই তিস্তা এই বিরাট বন্যার বিপুল জলরাশি বহন করিতে না পারিয়া পূর্ব-দক্ষিণ দিকে একটি প্রায় অবলুপ্ত প্রাচীন সংকীর্ণ নদীর খাত্ ভাঙ্গিয়া সবেগে ফুলছড়ি ঘাটে ব্রহ্মপুত্রে গিয়া বিপুল জলরাশি ঢালিয়া দিল। সেই সময় হইতে তিস্তা ব্রহ্মপুত্রমুখী, সে আর পুনর্ভবা-আত্রাই-করতোয়ায় হিমালয় নদীমালার জল প্রেরণ করেনা। এবং, আজ যে এই নদী তিনটি, বিশেষভাবে করতোয়া, ক্ষীণা হইতে ক্ষীণতরা হইতেছে তাহার কারণও তাহাই। তবু, উনবিংশ শতকের গোড়ায়ও করতোয়ার কিছু খ্যাতি-সমৃদ্ধি ছিল বলিয়া মনে হয়; ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক য়ুরোপীয় লেখক বলিতেছেন, করতোয়া "was a very considerable river, of the greatest celebrity in Hindu fable"।

উত্তর-বঙ্গের আর একটি প্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন নদী কৌশিকী (বা বর্তমান কোশী)। এই কোশী উত্তর-বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ভিতর দিয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া গঙ্গায় প্রবাহিত হয়। অথচ, এই নদী এক সময় ছিল পূর্ববাহী এবং ব্রহ্মপুত্রগামী; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সমস্ত উত্তর-বঙ্গ জুড়িয়া ধীরে ধীরে খাত পরিবর্তন করিতে করিতে কোশী পূর্ব হইতে একেবারে পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। কোশী প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার নদী বিন্যাসের ইতিহাসে এক বিরাট বিস্ময়। কোশী (এবং মহানন্দার) এইরূপ বিস্ময়কর খাত পরিবর্তনের ফলেই গৌড়-লক্ষ্মণাবতী-পাণ্ডুয়া অঞ্চল নিম্ন জলাভূমিতে পরিণত হইয়া অস্বাস্থ্যকর এবং অনাবাসযোগ্য হইয়া উঠে, বন্যার প্রকোপে বিধ্বস্ত হয়, এবং অবশেষে পরিত্যক্ত হয়। কোচবিহার হইতে হুগলীর পথে র‍্যাল্‌ফ ফিচ্ (১৫৮৩-৯১) গৌড়ের ভিতর দিয়া আসিয়াছিলেন; এই পথে "we found but few villages but almost all wilderness, and saw many buffes, swine, and deere, grasse longer than a man, and very many tigers." সমস্ত উত্তর-বঙ্গ জুড়িয়া অসংখ্য মরা নদীর খাত, নিম্ন জলাভূমি এখনও দৃষ্টিগোচর হয়; স্থানীয় লোকেরা ইহাদের বলে বুড়ী কোশী বা মরা কোশী। মালদহের উত্তরে ও পূর্বে যে সব বিল ঝিল ইত্যাদি এখনও দেখা যায় সেগুলি এই কোশী ও মহানন্দার খাত হওয়া অসম্ভব নয়।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের আগে প্রাচীন বাংলার নদনদীগুলির যে-পরিচয় পাওয়া গেল

তাহার মধ্যে দেখিতেছি গঙ্গা-ভাগীরথী, পদ্মা-পদ্মাবতী, করতোয়া এবং লৌহিত্য-ব্রহ্মপুত্রই প্রধান। গঙ্গা-ভাগীরথীর ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত অজয়, দামোদর, সরস্বতী ও যমুনা প্রসিদ্ধ নদী। ইহাদের নাম প্রাচীন গ্রন্থ বা লিপি অথবা ঐতিহ্য-স্মৃতির মধ্যেও পাওয়া যাইতেছে। পশ্চিম হইতে সমুদ্রবাহিনী কপিশা বা কাসাইও প্রাচীনা নদী। পদ্মা-প্রবাহও যে কম প্রাচীন নয় তাহাও দেখা গিয়াছে, এবং তাহারই শাখা কুমার নদীর নিঃসংশয় উল্লেখ টলেমির বিবরণীতেই পাওয়া যাইতেছে। করতোয়াও সুপ্রাচীন প্রবাহ; কোশী-মহানন্দা-আত্রাই-পুনর্ভবার খুব প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু ইহারাও সুপ্রাচীন বলিয়াই মনে হয়—অন্তত, কোশী-মহানন্দার প্রাচীন প্রবাহপথের ইঙ্গিত মিলিতেছে। ত্রিস্রোতা নামটিও প্রাচীন ঐতিহ্য-স্মৃতিবহ। লৌহিত্যের উল্লেখও খুব প্রাচীন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই সব নদনদীর প্রবাহপথের কতকটা ইতিহাস এইখানে ধরিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। বাংলাদেশ ও বাঙালীর ইতিহাস আলোচনা কালে এই কথা সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মধ্যযুগে এই সব নদনদীর প্রবাহপথ বারবার যেমন পরিবর্তিত হইয়াছে, প্রাচীন কালেও সেইরূপই হইয়াছে, বিশেষত, পদ্মা ও গঙ্গার নিম্ন-প্রবাহে, নিম্ন-বঙ্গের সমস্ত তট জুড়িয়া, এমন কি উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গেও। বর্তমানেও এই ভাঙা-গড়া চলিতেছে।

৪

যাতায়াত ও বাণিজ্যপথ *

সাধারণভাবে এবং সংক্ষিপ্ত উপায়ে দেশ-পরিচয় লিখিতে বসিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বা নগর হইতে নগরান্তরে যাতায়াতের পথের উল্লেখ করিয়া লাভ নাই। যে-সব গ্রামের উল্লেখ প্রাচীন বাংলার লিপিগুলিতে পাওয়া যায় সেগুলি একটু বিশ্লেষণ করিলে প্রায়ই দেখা যায়, গ্রামের প্রান্তসীমায় রাজপথের উল্লেখ; অনেক সময় এই পথগুলিই এক বা একাধিক দিকে গ্রামসীমা অথবা কোনও ভূমিসীমা নির্দেশ করে, এবং সেই হিসাবেই পথগুলির উল্লেখ। অনুমান করিতে বাধা নাই, এই পথগুলিই গ্রাম হইতে গ্রামে ও নগরে বিস্তৃত ছিল। এই রকম দু'একটি পথের উল্লেখ পরবর্তী গ্রাম ও নগর অধ্যায়ে করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দামোদরদেবের চট্টগ্রাম লিপিতে কামনপিণ্ডিয়া গ্রামের ডাম্বারডাম পল্লীর একখণ্ড ভূমির পূর্বদিকে এক রাজপথের উল্লেখ আছে। কিছুদিন আগে ধনোরার অদূরে দুইটি বাঁধান রাজপথের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। জঙ্গল কাটিয়া অথবা মাটি ভরাট করিয়া নূতন নূতন গ্রাম ও নগর পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের যাতায়াত পথ ক্রমশ বিস্তৃত হইয়াছে, এই অনুমান করা চলে। এই সব সাধারণ স্থলপথ ছাড়া নদীমাতৃক দেশের অসংখ্য নদনদী, খাটা-খাটিকা, খাল-বিল, যানিকা-স্রোতিকা ইত্যাদি বাহিয়া জলপথ তো ছিলই। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে যত লিপি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রায়

* এই প্রসঙ্গে ধনসম্বল অধ্যায়ে নৌ-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিবরণ দ্রষ্টব্য।

প্রত্যেকটিতেই এই সব জলস্রোতের উল্লেখ সুপ্রচুর; এবং ইহাদের প্রেক্ষাপটে যখন সঙ্গে সঙ্গে লিপিগুলিতে দেখা যায়, এবং সমসাময়িক ও প্রাচীনতর সাহিত্যে পড়া যায় নৌসাধনোত্তম, সমুদ্রাশ্রয়ী বাঙালীর কথা, তাহাদের অসংখ্য নৌবাট, নৌবিতান, নৌদণ্ডক, নাবাতক্ষেণী, প্রভৃতির কথা, গূঢ় অধ্যাত্ম-সংগীতে (যেমন, চর্যাপদে) নদনদী, নৌকা, নৌকার নানা উপাদান (যথা, দাঁড়, হাল, মাস্তুল, পাল, লগি, নোঙরের কাছি) ইত্যাদির উপমা, তখন সহজেই মনের মধ্যে এই ধারণা জন্মায় যে, জলপথে নৌকাযোগে যাতায়াতই ছিল স্থলপথে যাতায়াত অপেক্ষা প্রশস্ততর। লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এই নৌকা যাতায়াত পূর্ব-বঙ্গে, পুণ্ড্রবর্ধনে এবং সমতটে, অর্থাৎ নদনদীবহুল নিম্নশায়ী দেশগুলিতেই বেশি ছিল।

এই সব সাধারণ যাতায়াত পথছাড়া দেশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্যন্ত এবং দেশেরও সীমা অতিক্রম করিয়া দেশান্তরে যে-সব স্থল ও জলপথ বিস্তৃত ছিল, যে-সব পথ বাহিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী অসংখ্য নরনারী তীর্থযাত্রা, দেশভ্রমণ, ও বিচিত্রকর্ম উপলক্ষে— সর্বোপরি শ্রেষ্ঠী, বণিক ও সার্থবাহের দল ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে—দেশের বিভিন্ন গ্রামে, নগরে, তীর্থে এবং বাণিজ্যকেন্দ্রে, দেশান্তরের নগরে-বন্দরে যাতায়াত করিত, দেশ-পরিচয় প্রসঙ্গে সেই সব সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত বহুজন পদলাঞ্ছিত পথগুলির বিবরণই উল্লেখযোগ্য। এই সব পথ দেশের শুধু যাতায়াত পথ নয়, বাণিজ্যপথও বটে এবং এই সব পথ বাহিয়াই বাংলা দেশে লক্ষ্মীর আনাগোনা। এই সব বহু পথই বর্তমান রেলপথগুলির পূর্ব পর্যন্ত শুধু লক্ষ্মীর নয়, সরস্বতীরও আনাগোনার পথ ছিল; রেলপথগুলি সাধারণত সেই সব সুপ্রাচীন পথ বাহিয়াই প্রতিষ্ঠিত। জীবনধারণের প্রয়োজনে, জীবনবিকাশের প্রেরণায় মানুষ সুপ্রাচীন কালে দুর্গম বনজঙ্গল কাটিয়া, পাহাড় ভাঙ্গিয়া, নদী ডিঙ্গাইয়া, যে-সব পথের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে সে-সব পথ একদিনে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় না। মানুষের ব্যবহারের মধ্যে, তাহার স্মৃতি ও সংস্কারের মধ্যে, নূতন পথের মধ্যে সেই সব প্রাচীন পথ বাঁচিয়া থাকে। পৃথিবীতে সর্বত্রই তাহা ঘটিয়াছে, বাংলা দেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। নদনদী-প্রবাহ সুপ্রাচীন কালে জলপথ নির্ণয় করিত, এখনও করে; নদীর খাত যখন বদলায় সঙ্গে সঙ্গে পথও বদলায়; খাত মরিয়া গেলে নূতন খাতে জলপ্রবাহ ছুটিয়া চলে, জলপথও তাহার অনুসরণ করে। সমুদ্রস্রোত ও বিভিন্ন ঋতুর বায়ুপ্রবাহ প্রাচীনকালে সমুদ্রপথ নির্ণয় করিত; বাষ্প-জাহাজ পর্বের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে ইহাই ছিল নিয়ম; বাংলাদেশেও তাহার ব্যত্যয় ঘটে নাই।

দুঃখের বিষয়, প্রাচীন বাংলার অন্তর্বাণিজ্যের স্থলপথের বিবরণ স্বল্প। লিপিগুলিতে, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণীতে এবং কিছু সমসাময়িক সাহিত্যে কয়েকটি মাত্র প্রান্তাতিপ্রান্ত সুদীর্ঘ পথের ইঙ্গিত ধরিতে পারা যায়। বিদেশী পর্যটক ও ঐতিহাসিকেরা বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধেই কৌতূহলী ছিলেন এবং সেই সব বাণিজ্যপথের বিবরণই তাঁহারা যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। তবু, ফাহিয়ান্ বা য়ুয়ান-চোয়াঙের মত পর্যটক যাঁহারা বাংলার এক

জনপদ হইতে অন্য জনপদে কিছু কিছু ঘোরাঘুরি করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহারা প্রসঙ্গত অন্তর্দেশের পথের ইঙ্গিতও কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। ইৎসিঙের বিবরণে, সোমদেবের কথাসরিৎসাগরের মত গ্রন্থে, ২।৪টি জাতকের গল্পে, লিপিমালায় ২।১টি আকস্মিক উল্লেখেও এই জাতীয় পথের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সব পথ শুধু অন্তর্বাণিজ্যপথ নয়; বরং এই সব পথ বাহিয়াই বাংলা দেশ প্রাচীনকালে সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সকল প্রকার যোগরক্ষা করিত।

সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে পুণ্ড্রবর্ধন হইতে পাটলিপুত্র পর্যন্ত একটি সুবিস্তৃত পথের উল্লেখ আছে। ইৎসিঙ্ (সপ্তম শতকের তৃতীয় পাদের শেষাশেষি) তাম্রলিপ্তি

আন্তর্দেশিক স্থলপথ

হইতে বুদ্ধগয়া পর্যন্ত পশ্চিমাভিমুখী একটি পথের ইঙ্গিত দিতেছেন। হাজারিবাগ জেলায় দুধপানি পাহাড়ের আনুমানিক অষ্টম শতকের একটি শিলালিপিতে অযোধ্যা হইতে তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ পথের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ (সপ্তম শতকের দ্বিতীয় পাদ) বারাণসী, বৈশালী, পাটলীপুত্র, বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, নালন্দা, অঙ্গ-চম্পা প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন কজঙ্গলে। আমি এই গ্রন্থেই অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কজঙ্গল দেশ আংশিকত বর্তমান উত্তর-রাঢ়, বাঁকুড়া-বীরভূমের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তবর্তী অনুর্বর জঙ্গলময় প্রদেশ। কজঙ্গল হইতে তিনি গিয়াছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনে (উত্তরবঙ্গ—বগুড়া-রাজসাহী-রংপুর-দিনাজপুর), পুণ্ড্রবর্ধন হইতে পথে এক প্রশস্ত নদী পার হইয়া কামরূপ; কামরূপ হইতে সমতট, (ত্রিপুরা, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, ২৪ পরগণার নিম্নভূমি); সমতট হইতে তাম্রলিপ্তি (দক্ষিণ-পূর্ব মেদিনীপুর); তাম্রলিপ্তি হইতে কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলার কানসোনা); এবং কর্ণসুবর্ণ হইতে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ। য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণীতে তাহা হইলে মোটামুটি আন্তর্দেশিক পথগুলির একটু ইঙ্গিত পাইতেছি। কজঙ্গল বা উত্তর-রাঢ় অঞ্চল হইতে একটি পথ ছিল পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত বিস্তৃত। চম্পা (বর্তমান ভাগলপুর জেলা) হইতে তিনি আসিয়াছিলেন কজঙ্গলে। ভাগলপুর হইতে বর্তমানে যে রেলপথ রাজমহল পাহাড়ের ভিতর দিয়া নানা শাখা-প্রশাখায় দক্ষিণমুখী হইয়া চলিয়া গিয়াছে সিউড়ি-রানীগঞ্জ-বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর-পুরুলিয়ার দিকে এই পথই ছিল য়ুয়ান্-চোয়াঙের পথ। কজঙ্গল হইতে উত্তরমুখী হইয়া এই পথ ধরিয়াই য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ রাজমহল বা রাজমহলের কিছুটা দক্ষিণে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া পরে পূর্বমুখী হইয়া পুণ্ড্রবর্ধনে গিয়াছিলেন। এখন ই-আই-আর পথের বর্ধমান-রানীগঞ্জ-সিউড়ি হইতে রওয়ানা হইয়া লালগোলা ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া বি-এ-আর পথে উত্তরবঙ্গে যাওয়া যায়, এবং সেখান হইতে সোজা রেলপথ ধরিয়া কামরূপ। এই রেলপথও প্রাচীন রাজপথই অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু, কামরূপ হইতে সমতটের পথ এখন বর্তমান কালে আর খুব পরিষ্কার ধরিতে পারা যায় না; ধলেশ্বরী-যমুনা-পদ্মা এই পথকে এমনভাবে ভাঙ্গিয়া বাঁকাইয়া দিয়াছে যে, তাহার রেখা

কল্পনায় আনা হয়তো যায়, কিন্তু সুস্পষ্ট ধরিতে পারা কঠিন। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ বোধ হয় স্থলপথে পদব্রজেই আসিয়াছিলেন, বিবরণী পাঠে এই কথাই মনে হয়; বর্তমান ভূমি-নক্সা অনুযায়ী অন্তত দুইবার তাঁহার দুইটি সুপ্রশস্ত নদী, যমুনা ও পদ্মা অতিক্রম করা উচিত, কিন্তু তাহার উল্লেখ বিবরণীতে কিছু নাই। মনে হয়, যমুনা বা পদ্মার আজিকার কিংবা মধ্যযুগের মত প্রশস্ত অস্তিত্ব তখন ছিল না। অথচ, এখন এই দুইটি নদীই বি-এ-আর পথের গতি নির্ণয় করিতেছে। গৌহাটিতে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া এক পথ বগুড়া-সান্তাহার-ঈশ্বরদী (পদ্মা) কলিকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত; আর এক পথ জগন্নাথগঞ্জ (যমুনা)-সিরাজগঞ্জ-ঈশ্বরদী (পদ্মা) হইয়া কলিকাতা। দুটি পথই বাঁকিয়া চুরিয়া নদনদী এড়াইয়া অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত। যাহাই হউক, সমতট হইতে ভাগীরথী পার হইয়া তমলুকের পথে তো এখনও বি-এন্-আর পথ সোজা চলিয়া গিয়াছে, এবং ভাগীরথীতীর হইতে উত্তরাভিমুখী মুর্শিদাবাদ (কর্ণসুবর্ণ) ছাড়াইয়া ই-আই-আর পথের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা এখনও বিস্তৃত। মুর্শিদাবাদ হইতে ওড্র বা উড়িষ্যা পর্যন্তও ই-আই-আর ও বি-এন-আর পথে প্রাচীন রাজপথের ইশারা সহজেই পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদ যে সব সুদীর্ঘ পথগুলির দ্বারা পরস্পরযুক্ত ছিল সেই সব পথের ইঙ্গিত য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণ হইতে পাওয়া গেল। এই সব পথ তিনি নিজে আবিষ্কার করেন নাই। তাঁহার বহু আগে হইতেই বহু যানের চক্রপেষণে, বহু পশু ও বহু মানবের পদতাড়নায় এই সব পথ প্রশস্ত হইয়াছিল, তাঁহার পরেও বহুকাল পর্যন্ত এইসব পথ ক্রমাগত ব্যবহৃত হইয়া আজিকার রেলপথে বিবর্তিত হইয়াছে। কোথাও রেলপথ প্রাচীন পথকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে, কোথাও প্রাচীন পথ রেলপথগুলির পাশাপাশি চলিয়াছে। বস্তুত, ভারতবর্ষের কোনো রেলপথই নূতন সৃষ্ট নবাবিষ্কৃত পথ নয়, প্রত্যেকটিই প্রাচীন পথের নিশানা ধরিয়া চলিয়াছে।

অন্তর্দেশের পথ ছাড়িয়া দেশ হইতে দেশান্তরের পথগুলির ইঙ্গিত এইবার ধরিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে, বাংলা দেশ হইতে তিনটি প্রধান পথ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ছিল। একটি পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তর-বঙ্গ হইতে মিথিলা বা উত্তর-বিহার ভেদ করিয়া (বর্তমান বি-এন্-ডব্লিউ-আর এইপথ অনুসরণ করিয়াছে) চম্পা (ভাগলপুর) হইয়া পাটলিপুত্রের ভিতর দিয়া বুদ্ধগয়া স্পর্শ করিয়া (অথবা, পাটনা-আরা হইয়া) বারাণসী-অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; সেখান হইতে একেবারে সিন্ধু-সৌরাষ্ট্র-গুজরাটের বন্দর পর্যন্ত। বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষায় গৌড় হইতে গুজরাট পর্যন্ত বাণিজ্য-পথের ইঙ্গিত আছে।

বহির্দেশী স্থলপথ

পশ্চিমমুখী পথ

য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণী ও কথাসরিৎসাগরের গল্প হইতে এই পথের আভাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পথটিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণীতেই। এই পথটি তাম্রলিপ্তি হইতে উত্তরাভিমুখী হইয়া কর্ণসুবর্ণের ভিতর দিয়া রাজমহল-চম্পা স্পর্শ করিয়া পাটলিপুত্রের দিকে চলিয়া গিয়াছে। তৃতীয়

পথটির আভাস পাওয়া যাইতেছে ইৎসিঙের বিবরণ এবং পূর্বোল্লিখিত হাজারীবাগ জেলার দুধপানি পাহাড়ের আনুমানিক অষ্টম শতকীয় লিপিটিতে। এই পথ তাম্রলিপ্তি হইতে সোজা উত্তর-পশ্চিমাভিমুখী হইয়া বুদ্ধগয়ার ভিতর দিয়া অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই তিনটি পথ আশ্রয় করিয়াই প্রাচীন বাংলা দেশ উত্তর-ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করিত; বাংলা ও উত্তর-ভারতের যে-কোনও বর্তমান রেলপথের নক্‌শা খুলিলেই দেখা যাইবে; এই রেলপথগুলি সেই সব প্রাচীন পথই অনুসরণ করিয়াছে।

বাংলার পূর্বদিকে কামরূপ রাজ্য, উত্তরে চীন ও তিব্বত। উত্তর-বঙ্গ ও কামরূপের ভিতর দিয়া বাংলাদেশ এই উত্তরশায়ী দেশ দুটির সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করিত। এই পথের বিবরণ পাওয়া যায় য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ এবং কিয়া-তানের ভ্রমণ বৃত্তান্তে, চীন-রাজদূত চাঙ্-কিয়েনের প্রতিবেদনে, এবং বোধ হয় মুহম্মদ ইব্‌ন্ বখতিয়ারের আসাম-তিব্বত অভিযান সংক্রান্ত সুবিখ্যাত শিলালিপিটিতে। তবকাত্-ই-নাসিরী গ্রন্থেও বোধ হয় কামরূপের ভিতর দিয়া তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত এই পথের উল্লেখ আছে। এই সাক্ষ্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে পথটির আভাস স্পষ্ট হইতে পারে। পুণ্ড্রবর্ধন হইতে কামরূপ এবং কামরূপ হইতে সমতট পর্যন্ত দুইটি সুদীর্ঘ পথ যে ছিল, য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণী এসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই রাখে না; ইতিপূর্বেই তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই দুই পথ দিয়া প্রাচীন কামরূপ এবং সুবর্ণকুড্যকের সমৃদ্ধ ও সুচারু বস্ত্রশিল্প, অগুরু, চন্দন, হাতী প্রভৃতি বাংলাদেশে আমদানি হইত, এবং বাংলার সামুদ্রিক বন্দর ও আন্তর্দেশিক বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ও ভারতবর্ষের বাহিরে রপ্তানি হইত।

উত্তর-পূর্বমুখী পথ

কিন্তু কামরূপই পূর্বাভিমুখী এই পথের শেষ সীমা নয়। য়ুয়ান্-চোয়াঙের অন্তত সাতশত বৎসর আগে চাঙ্-কিয়েন (Chang-Kien) নামে এক চৈনিক রাজদূতের প্রতিবেদনে দক্ষিণ-চীন হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-ব্রহ্ম ও মণিপুরের ভিতর দিয়া কামরূপ হইয়া আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুদীর্ঘ প্রান্তাতিপ্রান্ত পথের ইঙ্গিত ধরিতে পারা যায়। চাঙ্-কিয়েন (খ্রী পূ ১২৬) ব্যাকট্রিয়ার বাজারে দক্ষিণ-চীনের য়ুন্নান এবং সুজেচোয়ান প্রদেশে জাত রেশমী বস্ত্র এবং সূক্ষ্ম বাঁশ দেখিতে পাইয়া খোঁজ লইয়া জানিয়াছিলেন, এই সমস্ত দ্রব্য আসিত চীন হইতে আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর-ভারতবর্ষ জুড়িয়া লম্ববান সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া, সার্থবাহ দলের পশু ও শকটবাহিনী ভর্তি হইয়া। সুজেচোয়ান হইতে কামরূপ পর্যন্ত এই পথের খবর য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ সপ্তম শতকেও শুনিয়াছিলেন কামরূপবাসীদের নিকট হইতে; কঠিন পার্বত্য পথ দুই মাসে অতিক্রম করিতে হইত, এখবরও য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ পাইয়াছিলেন। নবম শতাব্দীর গোড়ায় কিয়া-তান্ (৭৮৫-৮০৫ খ্রী) নামে আর

উত্তরব্রহ্ম-মণিপুর-কামরূপ-আফগানিস্থান পথ

একজন চীনা পরিব্রাজক টঙ্কিন সহর হইতে কামরূপ পর্যন্ত আর একটি পথের খবর বলিতেছেন। কামরূপে আসিয়া এই পথটি চাঙ্-কিয়েন বর্ণিত পথের সঙ্গে মিলিত হইত, এবং সেখান হইতে করতোয়া নদী পার হইয়া, পুণ্ড্রবর্ধনের ভিতর দিয়া, গঙ্গা পার হইয়া কজঙ্গল এবং সেখান হইতে মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কজঙ্গল হইতে পুণ্ড্রবর্ধন হইয়া কামরূপের যে পথের কথা কিয়া-তান্ বলিতেছেন সেই পথই সপ্তম শতকে য়ুয়ান্-চোয়াঙের পথ ছিল।

চাঙ্-কিয়েন্ বর্ণিত পথটির এবং অন্য আর একটি পথের আরও ইঙ্গিত অন্য দুইটি সাক্ষ্য হইতে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। তবকাত্-ই-নাসিরী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, মুহম্মদ ইব্ন্ বখ্তিয়ার নুদিয়া জয় ও ধ্বংস করিয়া, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীতে নিজ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তিব্বত জয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পথে তাঁহাকে একটি সুপ্রশস্তা খরস্রোতা নদী (খরতোয়া = করতোয়া ?) পার হইতে হয়; সেই নদীর কূল ধরিয়া দশ দিনের পথের পর ২০টি পাষাণনির্মিত খিলানযুক্ত একটি সেতু পার হন। সেই সেতু পার হইয়া আরও ১৬ দিনের পথের পর একটি প্রাকার-বেষ্টিত দুর্গরক্ষিত নগর দেখিতে পান, এবং সংবাদ পান যে, সেখান হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে করবত্তন, করপত্তন বা করমবত্তন নামে একটি জায়গায় ৫০,০০০ হাজার তুরুস্ক (?) সৈন্য আছে, সেখানে বহু ব্রাহ্মণের বাস, এবং সেখানকার বাজারে প্রতিদিন সকাল বেলা ১৫০০ টাঙ্গন (টাট্টু) ঘোড়া বিক্রয় হয়। লক্ষ্মণাবতীতে যে-সব ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায় সে-সমস্তই সেই বাজারে কেনা। ঐ দেশের পথ-ঘাট পার্বত্যদেশ ভেদ করিয়া বিলম্বিত। তিব্বত হইতে কামরূপ পর্যন্ত এই পার্বত্য পথে ৩৫টি গিরিবর্ত্ম আছে এবং সেই সব গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়াই লক্ষ্মণাবতী পর্যন্ত ঘোড়াগুলিকে আনা হয়। এই বিবরণ কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। প্রাকার-বেষ্টিত দুর্গরক্ষিত নগরটি কোন্ নগর তাহা নির্ণীত হয় নাই। করবত্তন, করপত্তন বা করমবত্তন কোন্ স্থান নির্দেশ করে, তাহাও বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, করমবত্তনের ঘোড়ার হাট দিনাজপুর জেলার নেকদমার হাট; সেই হাটে নাকি এখনও বহু ঘোড়া বিক্রয় হয়, এবং সে-সব ঘোড়া তিব্বত ভোটানের টাট্টু ঘোড়া। কিন্তু, করমপত্তন হাট দিনাজপুর জেলায় হওয়া একটু কঠিন। গৌড় হইতে দিনাজপুর জেলার যে কোন ও স্থান ২৬ দিনের পথ হইতে পারে না—দশ সহস্র সৈন্য লইয়া হাঁটিলেও নয়। তাহা ছাড়া, অন্য যুক্তিও আছে; তাহা এখনই বলিতেছি। যাহাই হউক, বখ্তিয়ার তিব্বত পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন নাই; মধ্যপথেই পর্যুদস্ত হইয়া নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। মিন্হাজ্ তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। মিন্-হাজের বিবরণ সব বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও বখ্তিয়ার যে কামরূপের ভিতর দিয়া ব্যর্থ একটা উত্তরাভিযান চালাইয়াছিলেন তাহা বর্তমান গৌহাটির নিকটে ব্রহ্মপুত্রের তীরে কানাই বরশীবোয়া নামক স্থানে পাষাণগাত্রে খোদিত একটি শিলালিপিতেই সুপ্রমাণিত। এই লিপিটির পাঠ এইরূপ:

"শাকে ১১২৭ [= ১২০৬, ২৭শে মার্চ, আনুমানিক]
শাকে তুরগ যুগ্মেশে মধুমাস ত্রয়োদশে।
কামরূপং সমাগত্য তুরুষ্কাঃ ক্ষয়মাযযুঃ॥

লিপিটির নিকটেই পাথরের খিলানযুক্ত একটি সেতু আছে। এই সেতুই কি মিন্‌হাজ কথিত ৩২ খিলান যুক্ত পাষাণ-সেতু? এই সেতু পার হইয়া আরও ১৬ দিনের পথ হাটিয়া বখ্‌তিয়ার যেখানে পৌছিয়াছিলেন সেখান হইতেও আরও ২৫ ক্রোশ দূরে করমবতনের হাট। কাজেই করমবতন দিনাজপুর জেলায় হইতেই পারে না। বরং মনে হয়, শিলালিপি ও মিন্‌হাজ-কথিত সেতু, প্রাকারবেষ্টিত দুর্গরক্ষিত নগর এবং করমবতনের হাট সমস্তই কামরূপসীমা হইতে তিব্বতের সুদুর্গম পার্বত্য পথে অবস্থিত ছিল। এই পথে অসংখ্য গিরিবর্ত্ম ছিল, এ খবর মিথ্যা না-ও হইতে পারে। যাহাই হউক, কামরূপ হইতে তিব্বত পর্যন্ত একটি দুর্গম গিরিপথ ছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবসর কম। কামরূপে আসিয়া এই পথ চাঙ্‌-কিয়েন্‌ কথিত চীন-ভারত-আফগনিস্থান প্রান্তাতিপ্রান্ত সুদীর্ঘ পথের সঙ্গে মিলিত হইত। হইতে পারে, এই পথ দিয়াও বৌদ্ধপণ্ডিত ও পরিব্রাজকেরা এবং তিব্বতী দূতেরা মগধ ও বঙ্গদেশ হইতে তিব্বতে যাতায়াত করিতেন। গৌহাটি শহরের নিকট ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া সোজা পঁচিশ মাইল উত্তরে একটি জায়গায় এখনও বৈশাখী পূর্ণিমায় এক বিরাট মেলা বসে; সেই মেলায় বহু তিব্বতী ব্যবসায়ী কম্বল, ভেড়া, ঘোড়া ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসে।

কিন্তু তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগের আর একটি পার্বত্য পথ বোধ হয় ছিল। এই পথ উত্তর-বঙ্গের জলপাইগুড়ি-দারজিলিং অঞ্চল হইতে সিকিম, ভোটান্‌ পার হইয়া হিমালয় গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়া তিব্বতের ভিতর দিয়া চীনদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পেরিপ্লাস-গ্রন্থে (প্রথম শতক) বোধ হয় এই পথের একটু ইঙ্গিত আছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে চীন দেশ হইতে যে রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যাদি বঙ্গদেশে আসিত তাহা পূর্বোক্ত কামরূপের পথ বা এই সদ্যোক্ত পথ বাহিয়া আসিত বলিয়াই তো মনে হয়। এখনও কালিম্পং বা গ্যাংটকের বাজারে যে সব পার্বত্য টাট্টু ঘোড়া, কম্বল, কাঁচা হলুদ, কাঁচা সোনার অলংকার, নানা বর্ণের পাথর ইত্যাদি বিক্রয় হয় তাহা প্রায় সমস্তই আসে তিব্বত ও ভোটান হইতে, ঐ দেশীয় লোকেরাই তাহা লইয়া আসে।

উত্তরে তিব্বতগামী পথ

কামরূপ হইতে তিব্বতের পথ বা জলপাইগুড়ি-দারজিলিং হইতে তিব্বতের পথ ইহার কোনওটাই এখন আর বহুল ব্যবহৃত নয়। পার্বত্য প্রদেশের লোকেরাই শুধু এই পথ ব্যবহার করিয়া থাকে বঙ্গ ও আসামের সমভূমিতে আসিবার প্রয়োজনে—কম্বল, ঘোড়া, সোনা, পাথর ইত্যাদির বিনিময়ে লবণ, বিলাস-দ্রব্য ইত্যাদি কিনিবার জন্য। কামরূপ হইতে উত্তর-পূর্ব আসাম ও মণিপুরের ভিতর দিয়া, উত্তর ব্রহ্মের ভিতর দিয়া, যে-পথ দক্ষিণ-পূর্ব চীনে চলিয়া গিয়াছে, যে-পথের কথা চাঙ্‌-কিয়েন্‌ বলিয়াছেন সেই পথে লোক যাতায়াত

বরাবরই কিছু কিছু ছিল ; মধ্য যুগেও ছিল, এবং বর্তমান যুগেও আছে। আসামে ও বাংলায় গোপনে আফিম আমদানী তো এই পথেই হইয়া থাকে। কিন্তু গত ভারত-ব্রহ্ম-চীন-জাপান যুদ্ধের তাগাদায় এই পথ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশ হইতে পূর্বাভিমুখী আর আর একটি স্থলপথের উল্লেখ করিতেই হয়। এ-পথটি পূর্ব-বাংলার ত্রিপুরা জেলার লালমাই-ময়নামতী (প্রাচীন পট্টিকেরা রাজ্য) অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া সুরমা ও কাছাড় উপত্যকার (বর্তমান, শ্রীহট্ট-শিলচর) ভিতর দিয়া, লুসাই পাহাড়ের উপর দিয়া, মণিপুরের ভিতর দিয়া, উত্তর ব্রহ্মদেশ ভেদ করিয়া, মধ্য-ব্রহ্মদেশে পাগান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পট্টিকেরা রাজ্যের সঙ্গে একাদশ ও দ্বাদশ শতকে ব্রহ্মদেশের পাগান রাষ্ট্রের খুব ঘনিষ্ঠ বৈবাহিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। এই দুই রাজ্যের সংযোগ ছিল এই সদ্যোক্ত পথে। এই পথের সংবাদও স্থানীয় লোক ছাড়া আর সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল, অথচ মধ্যযুগে মণিপুর-ব্রহ্মযুদ্ধের সৈন্যসামন্ত তো এই পথ দিয়াই যাওয়া আসা করিয়াছে। চোরাই ব্যবসাও বরাবরই এই পথে চলিত। আজ প্রয়োজনের তাড়নায় সেই পথ আবার বহুজনের পদচারণে প্রশস্ত হইয়াছে।

ত্রিপুরা-মণিপুর পথ

আর একটি পথের প্রতি একান্ত সাম্প্রতিক কালের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই পথ দক্ষিণশায়ী চট্টগ্রাম হইতে আরাকানের ভিতর দিয়া নিম্ন-ব্রহ্মের প্রোম বা প্রাচীন শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। আনুমানিক নবম-একাদশ শতকে আরাকানে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের আধিপত্য সুবিদিত। চট্টগ্রামের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও সমান সুপরিচিত। মধ্যযুগে আরাকান মুসলমান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের প্রচুর সমৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল ; এই সাহিত্যের সঙ্গে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। আজ প্রয়োজনের তাড়নায় এই চট্টগ্রাম-আরাকান-প্রোম পথও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অবশ্য এই পথের সমান্তরালবাহী সমুদ্রকূলশায়ী জলপথ তো সঙ্গে সঙ্গে ছিলই।

চট্টগ্রাম-আরাকান পথ

আর একটি স্থল পথের উল্লেখ করিলেই স্থলপথ বৃত্তান্ত শেষ হইবে। এই পথটি তাম্রলিপ্তি-তমলুক হইতে, কর্ণসুবর্ণ হইতে, সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া বাংলা-দেশকে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছে। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ এই পথ ধরিয়াই কর্ণসুবর্ণ হইতে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ, দক্ষিণ-কোশল, অন্ধ্র হইয়া দ্রাবিড়, চোল, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন। পাল ও সেন রাজারা এই পথেই দক্ষিণ দেশ আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পশ্চিম-চালুক্যবংশীয় বিক্রমাদিত্য, চোলরাজ রাজেন্দ্রচোল, এবং পূর্ব-গঙ্গবংশের রাজারা এই পথেই বঙ্গদেশ আক্রমণে সৈন্যচালনা করিয়াছিলেন। এই পথেই চৈতন্যদেব নীলাচল এবং দক্ষিণ-ভারতে গিয়াছিলেন। এই পথেই বর্তমান কালের বি-এন্-আর এবং মাদ্রাজ-রেলপথ বিস্তৃত।

তাম্রলিপ্তি হইতে দক্ষিণমুখী পথ

স্থলপথের কথা বলা হইল। এইবার আন্তর্দেশিক নদী বা সামুদ্রিক জলপথের কথা বলা যাইতে পারে। এ-সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন সাক্ষ্য কয়েকটি জাতক-কাহিনী হইতে পাওয়া যায়। শঙ্খ জাতক, সমুদ্দবাণিজ্জ জাতক, মহাজনক জাতক ইত্যাদি গল্পে দেখা যায় মধ্যদেশের বণিকরা বারাণসী বা চম্পা হইতে জাহাজে করিয়া গঙ্গা-ভাগীরথী পথে তাম্রলিপ্তি আসিত এবং সেখান হইতে বঙ্গসাগরের কূল ধরিয়া সিংহলে, অথবা উত্তাল সমুদ্র অতিক্রম করিয়া যাইত সুবর্ণভূমিতে (নিম্ন-ব্রহ্মদেশ)। সুবর্ণভূমির পথে বহুদিন বণিকেরা কূলভূমির চিহ্ন পর্যন্ত দেখিতে পাইত না। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে সম্ভবত স্ট্র্যাবো এই তথ্য আহরণ করিয়াছিলেন যে, ভাগীরথী-গঙ্গার উজান বাহিয়া সাগরমুখের বন্দর হইতে বাণিজ্যতরী গুলি প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্রের তদানীন্তন রাজধানী পাটলিপুত্র পর্যন্ত যাওয়া আসা করিত। নদীপথে গঙ্গা-ভাগীরথী বাহিয়াই বঙ্গদেশের সঙ্গে উত্তর-ভারতের যোগাযোগ ছিল। এই তথ্য নিঃসন্দেহ, এবং জলপথে তাহাই তো একমাত্র পথ। এ-পথ প্রাগৈতিহাসিক পথ এবং রেলপথে দ্রুত বাণিজ্য-সম্ভার যাতায়াতের সূত্রপাতের আগে বাণিজ্যলক্ষ্মীর যাতায়াত এই পথেই ছিল বেশি। উনবিংশ শতকেও বাঙালী এই নৌকা পথে কাশীধামে যাওয়া আসা করিত, এই স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। প্রাচীন বাংলার অন্য দুইটি প্রধানতম নদনদী, করতোয়া এবং ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্য-পথে বাণিজ্যলক্ষ্মীর যাতায়াতের সাক্ষ্য বড় একটা পাওয়া যায় না। তবে, কামরূপ হইতে কর্ণসুবর্ণ এক জলপথের ইঙ্গিত বোধ হয় পাওয়া যায় য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণীতে, হর্ষবর্ধন-ভাস্করবর্মা-সংবাদ প্রসঙ্গে। কিন্তু, এই জলপথ কি ব্রহ্মপুত্র ভাটি এবং গঙ্গা উজান বাহিয়া, না কামরূপ হইতে স্থলপথে উত্তর-বঙ্গের ভিতর দিয়া তাহার পর কোশী বা মহানন্দার ভাটি বাহিয়া গঙ্গাতীরস্থ কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত, তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। যাহা হউক, একথা অনুমান করিতে কিছুমাত্র কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না যে, উত্তর-আসামের রেশমজাতীয় বস্ত্রসম্ভার, বাঁশ, কাঠ, চন্দনকাঠ, পান, গুবাক্ বা সুপারি, তেজপাতা ইত্যাদি ব্রহ্মপুত্র-সুরমা-মেঘনা বাহিয়াই বাংলাদেশে আসিত। বাঁশ, কাঠ, ঘর ছাইবার খড় ইত্যাদি তো এখনও ভাটির স্রোতে ভেলায় ভাসাইয়া বাংলাদেশে আনা হয়। পাট এবং ধান চাল তো আজও নৌকাপথেই আমদানি রপ্তানি হয় বেশি, বিশেষত পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন স্থানে এবং আসামে ও সুরমা উপত্যকা অঞ্চলে। করতোয়া (খরতোয়া ?) যে এক সময় খুবই প্রশস্তা ও খরস্রোতা নদী ছিল এবং সোজা গিয়া সমুদ্রে পড়িত একথা তো আগেই বলিয়াছি। উত্তর-বঙ্গ ও দক্ষিণ-বঙ্গে যোগাযোগ এই নদীপথেই ছিল, সন্দেহ করিবার কারণ নাই। একথাও আগে বলিয়াছি যে, এই নদীমাতৃক দেশে স্থলপথ অপেক্ষা নদীপথেই যাতায়াত ও বাণিজ্য প্রশস্ততর ছিল; লিপি এবং সমসাময়িক সাহিত্যেই যে শুধু সে-ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাই নয়; মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি পর্যন্ত লোকের অভ্যাস ও সংস্কারের মধ্যেও তাহার আভাস ও ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

অন্তর্দেশীয় নদীপথ

নদীপথে আন্তর্দেশিক বাণিজ্য অপেক্ষা প্রাচীন বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং বাণিজ্য-পথের সাক্ষ্য-প্রমাণ অনেক বেশি পাওয়া যায়। জাতকের গল্পে তাম্রলিপ্তি হইতে সিংহল ও সুবর্ণদ্বীপ যাত্রার কথা বলিয়াছি। দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলের পথের কথাই আগে বলা যাক্। সিংহলী ইতিগ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশে উল্লিখিত লাঢ়দেশী রাজপুত্র বিজয়সিংহ কর্তৃক সমুদ্রপথে সিংহল গমন এবং দ্বীপটি অধিকার ইত্যাদির গল্পৈতিহ্য বাঙালী কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কল্যাণে সুপরিচিত। কিন্তু এই লাঢ়দেশ কি প্রাচীন বাংলার রাঢ় জনপদ, না প্রাচীন গুজরাত বা লাটদেশ, এই লইয়া পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে, এবং এই সম্পর্কীয় আলোচনা নানা ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক এবং শব্দতাত্ত্বিক বিতর্কে কণ্টকিত। কিন্তু এ-সাক্ষ্য ছাড়াও এই সম্বন্ধে অন্য প্রাচীন সাক্ষ্য বিদ্যমান। পেরিপ্লাসের সাক্ষ্য আগে উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বঙ্গদেশের সঙ্গে দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল; সমুদ্রমুখে গঙ্গাবন্দর হইতে বাণিজ্যসম্ভার কোলণ্ডিয়া (Colandia) নামক এক প্রকার জাহাজে বোঝাই হইত এবং সেই জাহাজগুলি দক্ষিণ-ভারতে ও সিংহলে যাতায়াত করিত। প্লিনিও এই সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, আগে প্রাচ্যদেশ হইতে সিংহলে যাইতে ২০ দিন লাগিত, পরে (অর্থাৎ প্লিনির সময়ে এবং কিছু আগে) লাগিত মাত্র সাত দিন ('a seven days' sail according to the rate of speed of our ships')। চতুর্থ শতকে ফাহিয়ান্ যখন তাম্রলিপ্তি হইতে এক বাণিজ্য-জাহাজ চড়িয়া সিংহল যান তখন লাগিয়াছিল চৌদ্দ দিন ও রাত্রি। সিংহল তো খ্রীষ্টপূর্বকাল হইতেই বৌদ্ধধর্মের এক বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং কালক্রমে এই হিসাবে এই দ্বীপটির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। ফাহিয়ানের পর হইতেই বহু চীন বৌদ্ধ পরিব্রাজক সিংহলে-বাংলাদেশে আসা-যাওয়া করিতেন এবং তাহা সন্তোক্ত সমুদ্রপথেই। সপ্তম শতকে ইৎসিঙের বিবরণী পাঠে জানা যায়, ঐ সময় অসংখ্য চীনদেশীয় বৌদ্ধ শ্রমণ সিংহল হইতে বাংলায় এবং বাংলা হইতে সিংহলে ঐ পথে যাতায়াত করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই সূত্র ধরিয়াই মহাযান বৌদ্ধধর্ম এবং কিছু কিছু নাগরী লিপির বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থও সিংহলে প্রসারলাভ করিয়াছিল। অষ্টম শতকের পর বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হওয়ার পরে বহুদিন এই পথের কথা আর শোনা যায় না; তবে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য পাঠ করিলে মনে হয়, তখন এই পথ ধরিয়া অর্থাৎ সমুদ্রোপকূল বাহিয়া সিংহল হইয়া গুজরাত পর্যন্ত সমুদ্রপথ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল, অথবা এই সব পথের সুপ্রাচীন স্মৃতি প্রচলিত গল্প-কাহিনীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, যেমন মনসামঙ্গল কাব্য-গুলিতে। সিংহল হইতে মালয়, নিম্ন-ব্রহ্ম, সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ, চম্পা, কম্বোজের সমুদ্রপথ তো ছিলই, এবং তাহার প্রমাণও সুপ্রচুর।

বহির্দেশী সমুদ্রপথ

বঙ্গ-সিংহল পথ

তাম্রলিপ্তি হইতে নিম্ন-ব্রহ্মদেশ বা সুবর্ণভূমির দ্বিতীয় সমুদ্রপথের ইঙ্গিত যে

মহাজনক জাতকের গল্পে পাওয়া যাইতেছে, সে-কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। এই পথ সম্ভবত ছিল চট্টগ্রাম-আরাকানের সমুদ্রোপকূল বাহিয়া। একাদশ শতকে এবং পরে মধ্যযুগে চট্টগ্রামের সঙ্গে আরাকানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আনাগোনা যে এই পথেই অনেকটা হইত তাহা কতকটা অনুমান করা চলে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও বাংলার সঙ্গে নিম্ন-ব্রহ্মের সামুদ্রিক বাণিজ্যের এবং এই বাণিজ্যপথের সুদূর স্মৃতি ধরিতে পারা কঠিন নয়। সুপারগ জাতক নামে আর একটি জাতকের গল্পেও পূর্ব-ভারতের বণিকদের সুবর্ণভূমিতে যাত্রার কথা আছে। মধ্যযুগে চীন বণিক ও পরিব্রাজকেরা (যেমন, মা-হুয়ান), আরব বণিকেরা এবং পরে পর্তুগীজ বণিকেরা সপ্তগ্রাম ও চেং-টি-গান্ বা চট্টগ্রাম হইতে এই সমুদ্রোপকূল বাহিয়াই আরাকান ও নিম্ন-ব্রহ্মদেশে যাওয়া আসা করিতেন, এমন প্রমাণ একেবারেই দুর্লভ নয়। ইৎসিঙ্ সপ্তম শতকেই বলিতেছেন, হিউয়েন-তা নামে একজন চীন পরিব্রাজক মালয় উপদ্বীপের সমুদ্রকূলবর্তী কেডা (Keldah) হইতে সোজা তাম্রলিপ্তি গিয়াছিলেন। এই পথটির আভাস বোধ হয় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক হইতেই পাইতেছি। মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের যে-লিপিটি মালয়-উপদ্বীপে পাওয়া গিয়াছে সেই লিপিটিতে দেখিতেছি, বুদ্ধগুপ্ত রক্তমৃত্তিকা হইতে সমুদ্রপথে গিয়াছিলেন মালয়ে বাণিজ্য-ব্যপদেশে। এই রক্তমৃত্তিকা মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি (য়ুয়ান্-চোয়াঙের লো-টো-মো-চিহ্) বা চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গামাটিও হইতে পারে; শেষেরটি হওয়াই অধিকতর সম্ভব। নবম শতকের মাঝামাঝি দেবপালের নালন্দা-লিপিতেও বঙ্গসাগর বাহিয়া এক সমুদ্রপথের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। তখন তাম্রলিপি বন্দর অবলুপ্ত; বাংলার আর কোনও সামুদ্রিক বন্দরের উল্লেখও পাইতেছি না। কাজেই, এই পথ সমুদ্রতীর বাহিয়া, না কোনাকোনি বঙ্গসাগর বাহিয়া, উড়িষ্যার কোনো বন্দর হইয়া, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতেছে না।

তাম্রলিপ্তি-আরাকান-ব্রহ্ম-মালয়-যবদ্বীপ-সুবর্ণদ্বীপ পথ

তৃতীয় আর একটি পথের কথাও বলিতে হয়। এই পথের সর্বপ্রাচীন সংবাদ দিতেছেন ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বেত্তা টলেমি। তাম্রলিপ্তি হইতে যাত্রা করিয়া জাহাজগুলি সোজা আসিত উড়িষ্যা দেশের পলৌরা (Paloura) বন্দরে, এবং সেখান হইতে কোনাকোনি বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়া যাইত মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ-উপদ্বীপগুলিতে।

তাম্রলিপ্তি-পলৌরা-মালয়-সুবর্ণভূমি-পথ

৫

নদনদী ও পাহাড়-পর্বত মিলিয়া বাংলার ভূ-প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে, এবং তাহা ইতিহাস আরম্ভ হইবার পূর্বেই। ঐতিহাসিক কালেও ভূ-প্রকৃতির কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে,

ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু : লোক-প্রকৃতি

সন্দেহ নাই, বিশেষত নবগঠিত ভূমিতে—new alluviumএ। নদীর পলি পড়িয়া, বন্যার দ্বারা তাড়িত মাটি উচ্চভূমিতে বাধা পাইয়া, কিংবা ভূমিকম্প বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে নূতন ভূমির সৃষ্টি বা পুরাতন ভূমি পরিত্যক্ত হয়। বাংলা দেশেও তাহা হইয়াছে; নূতন ভূমির সৃষ্টি হইয়াছে অল্পবিস্তর, কিন্তু তাহাতে প্রাগৈতিহাসিক কালের নবগঠিত ভূমি বা new alluviumই প্রসারিত হইয়াছে। পুরাতন ভূমি পরিত্যক্তও হইয়াছে, বিনষ্ট হইয়াছে—সাধারণত নদীর প্রবাহপথের পরিবর্তনের ফলে; কিন্তু, তাহাতে ভূ-প্রকৃতির মৌলিক কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই, পুরাভূমিতেও (old alluvium) নয়, নবভূমিতেও (new alluvium) নয়।

ভূ-প্রকৃতির দিক হইতে বাংলাদেশের চারিটি বিভাগ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। পশ্চিমে বাংলার একটা সুবৃহৎ অংশ পুরাভূমি। রাজমহলের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পুরাভূমি প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজমহল, সাঁওতালভূম, মানভূম, সিংহভূম, ধলভূমের পূর্বশায়ী মালভূমি এই পুরাভূমির অন্তর্গত; তাহারই পূর্বদিক ঘেঁষিয়া মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশের উচ্চতর গৈরিকভূমি; ইহাও সদ্যোক্ত পুরাভূমির অন্তর্গত। মালভূমি অংশ একান্তই পার্বত্য, বনময়, অজলা এবং অনুর্বর। এখনও এই অংশে গভীর শালবন, পার্বত্য আকর ও কয়লার খনি এবং ইহা সাধারণত অনুর্বর। প্রাচীন উত্তর-রাঢ়ের অনেকখানি অংশ, দক্ষিণ-রাঢ়ের পশ্চিমাংশ এবং তাম্রলিপ্তি রাজ্যেরও কিয়ৎ-পশ্চিমাংশ এই মালভূমি এবং উচ্চতর গৈরিক ভূমির অন্তর্গত। দক্ষিণ-রাঢ়ের রানীগঞ্জ-আসানসোলের পার্বত্য অঞ্চল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চল, বন-বিষ্ণুপুর রাজ্য, মেদিনীপুরের শালবনী-ঝাড়গ্রাম-গোপীবল্লভপুর অঞ্চল সমস্তই এই পুরাভূমিরই নিম্ন অংশ। এই সব পার্বত্য ও গৈরিক অঞ্চল ভেদ করিয়াই ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী (শিলাই), কপিশা (কাসাই), সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদনদী সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। এখনও ইহারা ইহাদের জলস্রোতে পার্বত্য লালমাটি বহন করিয়া আনে। সমতলভূমি এই নদনদীগুলির জল ও পলিতে উর্বর। এই উর্বর সমতলভূমি নবগঠিত ভূমি—সদ্যোক্ত নদনদীগুলি এবং ভাগীরথী প্রবাহদ্বারা সৃষ্ট ভূমি। মুর্শিদাবাদের বহুলাংশ, বর্ধমানের পূর্বাংশ, বাঁকুড়ার স্বল্প অংশ, হুগলি-হাওড়া, এবং মেদিনীপুরের পূর্বাংশ এই নবসৃষ্ট ভূমি—বৃক্ষশ্যামল, শস্যবহুল।

পশ্চিমাংশের পুরাভূমি এবং নবভূমি

পশ্চিম-বঙ্গের এই যে ভূ-প্রকৃতি ইহার প্রাচীন সমর্থন কিছু কিছু পাওয়া যায়। ভট্ট ভবদেব রাজা হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন (একাদশ শতক)। তিনি তাঁহার ভুবনেশ্বর শিলালিপিতে রাঢ় দেশের অজলা জাঙ্গলময় প্রদেশের উল্লেখ করিয়াছেন। ভবিষ্য-পুরাণের ব্রহ্মখণ্ড অংশে রাঢ়ীখণ্ডজাঙ্গল নামে এক দেশের উল্লেখ আছে; বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর,

বীরভূম ও অজয় নদ এই দেশের অন্তর্গত, ইহার তিনভাগ জঙ্গল, একভাগ গ্রাম ও জনপদ, অধিকাংশ ভূমি উষর, স্বল্পমাত্র ভূমি উর্বর। এখানে কোথাও কোথাও লৌহ আকর আছে। আমি অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ভবিষ্যপুরাণ ও ভবদেবভট্ট-কথিত এই দেশের একাংশে য়ুয়ান্-চোয়াঙ্-রামচরিত-বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি কথিত কয়ঙ্গল—কজঙ্গল—কজাঙ্গল—ক-চু-ওয়েন-কি'-লো। বর্তমান কাঁকজোল এই ভূখণ্ডের স্মৃতিমাত্র বহন করে। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ চম্পা হইতে কজঙ্গল গিয়াছিলেন। এই দেশের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু সম্বন্ধে তাঁহার কিছু বক্তব্য আছে। তিনি বলিতেছেন (সপ্তম শতক), এই স্থানের উত্তর-সীমা গঙ্গা হইতে খুব বেশি দূরে নয়; ইহার দক্ষিণের বনপ্রদেশে বন্যহস্তী প্রচুর। তাঁহার সময়ে এই রাজ্য পররাষ্ট্রের অধীন, রাজধানীতে লোক ছিল না এবং লোকেরা গ্রামে এবং নগরেই বাস করিত। তাঁহারা স্পষ্টাচারী (straight-forward), গুণবান এবং বিদ্যাচর্চার প্রতি ভক্তিমান ছিল। দেশটি সমতল, ভূমি জলীয় এবং সুশস্যপ্রসূ, বায়ু উষ্ণ। য়ুয়ান্-চোয়াঙের বর্ণনা হইতে মনে হয়, তিনি কজঙ্গলের যে অংশে দামোদর-অজয়-ভাগীরথী উপত্যকা সেই অংশের উপত্যকা-ভূমির কথা বলিতেছেন —যে-অংশে বৈদ্যনাথ-বক্রেশ্বর-বীরভূম সেই অংশের কথা নয়। দক্ষিণের বনপ্রদেশ বন-বিষ্ণুপুর অঞ্চল বলিয়াই তো মনে হইতেছে। দামোদর-অজয়-ভাগীরথী উপত্যকার ভূমিই সমতল, জলীয়, সুশস্যপ্রসূ এবং বায়ু উষ্ণ।

কজঙ্গল

য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ তাম্রলিপ্তি-রাজ্যেও গিয়াছিলেন, এবং তাহার বর্ণনাও রাখিয়া গিয়াছেন। তাম্রলিপ্তির ভূমিও সমতল এবং জলীয়; বায়ু উষ্ণ; ফুলফলশস্য প্রচুর। লোকের আচার ব্যবহার রূঢ়, কিন্তু তাহারা খুব সাহসী। এই দেশে স্থল ও জলপথের সমন্বয়, এবং ইহার রাজধানী তাম্রলিপ্তির বন্দর সমুদ্রের একটি খাড়ির উপর অবস্থিত। এক্ষেত্রেও য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ মেদিনীপুরের পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ অংশের কথা বলিতেছেন—পশ্চিমের পার্বত্য অংশের কথা নয়।

তাম্রলিপ্তি

য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ তাম্রলিপ্তি হইতে গিয়াছিলেন কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে। কর্ণসুবর্ণ তাঁহার সময়ে লোকবহুল জনপদ, এবং জনসাধারণের আর্থিক সমৃদ্ধিও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভূমি ছিল সমতল এবং জলীয়, ফল ফুল শস্য ছিল প্রচুর; কৃষিকর্ম ভাল; বায়ু নাতিশীতোষ্ণ। জনসাধারণ সুচরিত্র এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের পোষক। য়ুয়ান্-চোয়াঙের কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলার কানসোনা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই অনুমানের সমর্থন চীন-পরিব্রাজকের বিবরণীতেই পাওয়া যায়। কর্ণসুবর্ণের রাজধানীর সন্নিকটেই তিনি লো-টো-মো-চিহ্ নামক এক সুবৃহৎ বৌদ্ধ-বিহারের উল্লেখ এবং বর্ণনা করিয়াছেন। লো-টো-মো-চিহ্ (= রক্তমত্তি = রক্তমৃত্তিকা) বর্তমান রাঙ্গামাটি; রাঙ্গামাটি মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত। রাঙ্গামাটি নামটি অর্থব্যঞ্জক। এই রাঙ্গামাটি সমতলভূমি হইলেও রাজমহল-সাঁওতালভূমের পার্বত্য গৈরিক মাটি এই ভূমির নিম্ন ও উপরিস্তরে অপ্রতুল নয়।

কর্ণসুবর্ণ

পুরাভূমি বা old alluviumর কিছু কিছু চিহ্ন যে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহার ইঙ্গিত রাঙ্গামাটি, লালবাগ প্রভৃতি নামের স্মৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। বাংলার অন্যত্রও যেখানে যেখানে স্থান-নামের সঙ্গে রাঙ্গা, লাল, রং প্রভৃতি শব্দ জড়িত সেই সব স্থান লক্ষণীয়। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ঘেঁষিয়া রাঙ্গামাটি জনপদ এখনও বিদ্যমান। হয়তো ইহাই মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের রক্ত-মৃত্তিকা। কুমিল্লা শহরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে লালমাটি বা লালমাই পাহাড় (ইহাই কি শ্রীচন্দ্রের রামপাল ও ধুল্লা লিপির রোহিতগিরি ?)। রেনেলের নক্শায় দেখা যাইবে, ব্রহ্মপুত্রের উত্তর-প্রবাহের পশ্চিমে (রংপুর জেলা), উত্তরে (গোয়ালপাড়া-কামরূপ জেলা), এবং দক্ষিণে (গোয়ালপাড়া-কামরূপ জেলা) একাধিক রাঙ্গামাটির উল্লেখ ও পরিচয় (Rangamatta, Rangamatty, Rangamati = রাঙ্গামাটি, সন্দেহ থাকিতে পারে না)। ইহার কিছু সমর্থন করতোয়া-মাহাত্ম্য গ্রন্থেও পাওয়া যায়—"পশ্চিমে করতোয়ায়া লোহিনী যত্র মৃত্তিকা"। বর্তমান রংপুর জেলার রংপুর নামও এই রাঙ্গামাটির স্মৃতিবহ বলিয়া আমি মনে করি। রাঙ্গাপুর = বিদেশী Rungpour (যেমন, রেনেলের নক্শায়) = রঙ্গপুর = রংপুর হওয়া একেবারে অসম্ভব কিছুই নয়। তাহা ছাড়া, আমিনগাঁও-এর পথে রাঙ্গিয়া রেল স্টেশন, তেজপুরের পথে রাঙ্গাপাড়া স্টেশন, রাঙ্গাগ্রাম প্রভৃতি সমস্তই রেনেলের রাঙ্গামাটির সমর্থক; কারণ এগুলি সমস্তই ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে, উত্তরে এবং দক্ষিণে। রংপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বরেন্দ্রী, মুসলমান ঐতিহাসিকদের বরিন্দ্। বরেন্দ্রীর মাটি লাল, এবং তাহা একান্তই পুরাভূমি। এই পুরাভূমির বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন রেখা চলিয়া গিয়াছে রাজমহলের নিকট গঙ্গা পার হইয়া ধলভূম-মানভূম-সিংভূম ধরিয়া সমুদ্রতীর পর্যন্ত। উত্তর-রাঢ় ও দক্ষিণ-রাঢ়ের পশ্চিমাংশ এবং মুর্শিদাবাদ এই পুরাভূমিরই বিস্তৃতাংশ। পূর্ব-দক্ষিণ দিকে এই পুরাভূমিই গারো পাহাড় (মধুপুর গড় সহ), পার্বত্য ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম হইয়া সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

পুরাভূমি বা রাঙ্গামাটির বিস্তৃতি

য়ুয়ান্-চোয়াঙের কজঙ্গল-তাম্রলিপ্তি-কর্ণসুবর্ণ বিবরণ পড়িয়া মনে হয়, এই পরিব্রাজক পশ্চিম-বঙ্গের সমতল ভূমির ভূখণ্ডের সঙ্গেই পরিচিত হইয়াছিলেন। এই সমতলভূমির পশ্চিমাঞ্চলের উত্তর অংশে ভবিষ্যপুরাণ-কথিত, বৈদ্যনাথ-বক্রেশ্বর-বীরভূমধৃত, ঊষর ও জাঙ্গলময় যে রাঢ়ীখণ্ডজাঙ্গলভূমি সেই ভূখণ্ডের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় নাই; কিংবা ভবদেবভট্ট রাঢ়দেশের যে অজলা জাঙ্গলময় (= জঙ্গলময় হইতে পারে, আবার জাঙ্গল= জাঙ্গাল = উচ্চ বাঁধভূমিময়) ভূমির কথা বলিতেছেন তাহার পরিচয়ও তিনি পান নাই। কজঙ্গল-তাম্রলিপ্তি-কর্ণসুবর্ণ এই তিনটি রাজ্যেরই যে-সমতলভূমি জলীয় এবং ফলমূল শস্যপ্রসূ, যাহার জলবায়ু উষ্ণ অথবা নাতিশীতোষ্ণ, এবং যে-ভূমি লোকবহুল সেই ভূমি-ভাগের সঙ্গেই তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল। তিনি আসিয়াছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী এবং উৎসুক শিক্ষার্থী হিসাবে; বৌদ্ধধর্মসংঘ ও বিহারগুলির পরিচয় লাভ, পণ্ডিত ও ধর্মগুরুদের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচয় লাভই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সব বৌদ্ধ

বিহার বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রগুলি সাধারণত সহজগম্য এবং লোকালয়প্রধান স্থানেই অবস্থিত ছিল। সুপরিচিত, বহুজনপদচিহ্নিত পথ ধরিয়াই তিনি সে-সব স্থানে গিয়াছিলেন। কাজেই ঊষর, অনুর্বর ও জাঙ্গলময়, এবং সেই হেতু গ্রাম ও নগরবিরল, জনবিরল স্থানগুলিতে যাওয়ার কোনও প্রয়োজনই তাঁহার হয় নাই।

পূর্বোক্ত পুরাভূমির একটি রেখা রাজমহলের উত্তরে গঙ্গা পার হইয়া মালদহ-রাজসাহী দিনাজপুর-রংপুরের ভিতর দিয়া, ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া ঐ নদীর দুইতীরে বিস্তৃত হইয়া আসামের শৈলশ্রেণী স্পর্শ করিয়াছে। এই পুরাভূমি রেখার মাটি পার্বত্য গৈরিক স্থূল বালিময়। রংপুর-গোয়ালপাড়া-কামরূপেই এই রেখার বিস্তৃতি বেশি, রেনেলের নকশায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তর-বঙ্গের রাঙ্গামাটি প্রসঙ্গ আগেই বলিয়াছি। তাহা ছাড়া বগুড়া-রাজসাহীর উত্তর, দিনাজপুরের পূর্ব, এবং রংপুরের পশ্চিম স্পর্শ করিয়া এই রেখার একটি বিস্তৃত স্ফীতি—উচ্চ গৈরিক ভূমি—দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাই মুসলমান ঐতিহাসিকদের বরিন্দ্, বরেন্দ্রভূমির কেন্দ্রবিন্দু। এই বরিন্দের উত্তরে হিমালয়ের তরাই-পর্বতসানুর অস্বাস্থ্যকর জলীয় নিম্নভূমিতে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জিলা, পূর্ণিয়ার কিয়দংশ। বরেন্দ্রীর কেন্দ্রবিন্দু বরিন্দের গৈরিকভূমি অনুর্বর, পুরাভূমি; কিন্তু পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ ঘিরিয়া তঙ্গন-আত্রাই, মহানন্দা-কোশী, পদ্মা-করতোয়ার জল ও পলিমাটিদ্বারা গঠিত নবভূমি। উপরোক্ত পুরাভূমিরেখাটুকু ছাড়া নবভূমির বাকি সবটাই সমতলভূমি, সুশস্যপ্রসূ, জলীয় এবং শ্যামল। বরিন্দ্ জনবিরল, এমন কি মালদহ-রংপুরের পুরাভূমি রেখাও অপেক্ষাকৃত জনবিরল, এবং মাটির রং গৈরিক; ঘন লোকবসতি সাধারণত পদ্মা-আত্রাই-করতোয়ার সমতলভূমিতেই দেখা যায়। প্রাচীন কালেও পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর সমৃদ্ধ জনপদগুলি সমস্তই এই নদনদী প্লাবিত সমতলভূমিতে।

উত্তর-বঙ্গের পুরাভূমি ও নবভূমি

বরিন্দ-বরেন্দ্রী

রামচরিতে বরেন্দ্রভূমির যে শস্যসমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, যে ঐশ্বর্যবিবরণ পড়া যায় এবং যাহার কথা ধনসম্বল অধ্যায় প্রসঙ্গে এবং অন্যত্র নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সমৃদ্ধি সাধারণত এই সমতল ভূমির। তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। নদনদী বাহিয়াই বাংলার প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতি সমৃদ্ধির জয়যাত্রা, এবং সমতলভূমিতে নদনদীর তীরেই গ্রাম-নগর-বন্দরের পত্তন, মানুষের ঘনতম বসতি, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার।

বরেন্দ্রভূমি প্রাচীন পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধনেরই এক সুবৃহৎ অংশ, এমন কি কখনও কখনও সমার্থকও। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ ভ্রমণ ব্যপদেশে পুণ্ড্রবর্ধনেও আসিয়াছিলেন। তখন এই দেশ সমৃদ্ধ, জনবহুল, প্রতি জনপদে দীঘি, আরাম-কানন, পুষ্পোদ্যান ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; ভূমি সমতল এবং জলীয়, শস্যসম্ভার সুপ্রচুর, জলবায়ু মৃদু। জনসাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবান। আগে বলিয়াছি, উত্তর-বঙ্গ এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু প্রায় একই

পুণ্ড্রবর্ধন

প্রকার—সেখানেও একই ভূমির বিস্তার। য়ুয়ান্-চোয়াঙের কামরূপ-বিবরণ সেই জন্যই পুণ্ড্রবর্ধনের সঙ্গে একবারে হুবহু মিলিয়া যায়। সেখানেও ভূমি সমতল এবং জলীয়, শস্যসম্ভার নিয়মিত এবং জলবায়ু মৃদু। 'কামরূপের লোকেরা খর্ব ও কৃষ্ণকায়; সদাচারী হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের প্রকৃতি হিংস্র। বিদ্যার্থী হিসাবে তাহারা খুব অধ্যবসায়ী এবং তাহাদের ভাষা মধ্যদেশ হইতে পৃথক। এই দেশের দক্ষিণ-পূর্ব বনভূমিতে (গারো ও খাসিয়া পাহাড়ে ?) যূথবদ্ধ হইয়া বন্যহস্তী উৎপাত করিয়া চরিয়া বেড়ায় (এখনও করে); তাহার ফলে এখান হইতে যুদ্ধের প্রয়োজনে হস্তী যথেষ্ট পাওয়া যায়'।

পশ্চিম-বাংলায় যেমন উত্তর-বঙ্গেও তেমনই, য়ুয়ান্-চোয়াঙের পরিচয় পুণ্ড্রবর্ধনের সমতল ভূমির সঙ্গে। কেন্দ্রভূমি বরিন্দের সঙ্গে বোধ হয় তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই। যাহাই হউক, রাঢ় এবং উত্তর-বঙ্গের ভূ-প্রকৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা ও ভাগীরথীর ইতিহাস একত্রে স্মরণ ও বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, এক সময় পুণ্ড্র-বরেন্দ্রভূমির সঙ্গে রাঢ়ভূমির, বিশেষত মুর্শিদাবাদ বীরভূম-বর্ধমানের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ভাগীরথী যখন গৌড়কে ডাইনে রাখিয়া উত্তর-পূর্ববাহী হইয়া পরে দক্ষিণবাহী হইত, পদ্মা যখন আরও সোজা পূর্ববাহী ছিল তখন তো পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর কিছুটা অংশ (মালদহ জেলা) রাঢ়ভূমির সঙ্গে যুক্তই ছিল। কিন্তু ইহার পরও গঙ্গা বরেন্দ্র-পুণ্ড্র এবং রাঢ়ভূমির মধ্যে কখনও খুব বড় বাধা হইয়া দেখা দেয় নাই। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রাচীন বাংলার এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে বরাবরই ছিল। আজ উত্তর-বাংলার সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগ পূর্ব-বাংলার বেশি, কিন্তু প্রাচীন কালে তাহা কমই ছিল, ছিল না বলিলেই চলে। দিনাজপুর-রাজসাহী-মালদহের লোকভাষার প্রকৃতিও রাঢ়ের পূর্বাঞ্চলের লোকভাষা-প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ। কিন্তু তাহা আলোচনার স্থান এখানে নয়। তবে, একথা অনস্বীকার্য যে, মোটামুটিভাবে পুণ্ড্র-বরেন্দ্রী এবং রাঢ়-তাম্রলিপ্তিই বাংলাদেশের প্রাচীনতর পলিভূমি।

রাঢ়-পুণ্ড্রের যোগাযোগ

পূর্ব-বাংলা একান্তই নবভূমি এবং এই নবভূমি পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র এবং সুরমা-মেঘনার সৃষ্টি। এই নবভূমির উত্তরে, পূর্বে এবং পূর্ব-দক্ষিণে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রামের শৈলশ্রেণী; ইহাদের অব্যবহিত সানু ও তলদেশ পার্বত্য না হইলেও কোথাও কোথাও গৈরিক বালুকাময়, কখনও কখনও বালির শক্ত স্তরময়—যেমন চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা-শ্রীহট্ট-কাছাড় জেলার কোন কোন স্থানে। চট্টগ্রামের পার্বত্য-চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্বত্য-ত্রিপুরা অঞ্চল, কাছাড় জেলার উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশে হালিয়াকান্দি অঞ্চল, এবং শ্রীহট্ট জেলার পূর্বাঞ্চলকে মোটামুটি পুরাভূমির অন্তর্গতই বলিতে হয়। তাহা ছাড়া, ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলার বিস্তৃত একটি অংশ জুড়িয়া গৈরিক পার্বত্য গজারী-বনময় একখণ্ড পুরাভূমির স্ফীতি দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা মধুপুর গড় নামে খ্যাত। ঢাকা জেলায় ভাওয়ালের গড়ও তাহাই। মধুপুর গড়ের উপরের স্তরের মাটি যেন

পূর্ব-বঙ্গের পুরাভূমি ও নবভূমি

লাল কাদা জমানো মাটি, কিন্তু তাহার নিচের স্তরেই লাল বালি ; এই বালি ও অজয়-বরাকর উপত্যকার লাল বালি একই গৈরিক পার্বত্য মাটি। পূর্ব-বাংলার আর সমস্ত ভূমিই জলীয় সমতল ভূমি অর্থাৎ নবগঠিত ভূমি এবং এই ভূমি সর্বত্র খালবিল ও সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি দ্বারা আচ্ছন্ন। কিন্তু তাহা হইলেও এই নবগঠিত ভূমির দুইটি বিভাগ সুস্পষ্ট। ইহারই মধ্যে মৈমনসিং, ঢাকা, ফরিদপুর, সমতল-ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের বহুলাংশের গঠন পুরাতন (old formation) ; এবং খুলনা, বাখরগঞ্জ, সমতল-নোয়াখালি ও সমতল-চট্টগ্রামের গঠন নূতন (new formation)। শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড অঞ্চলে প্রাপ্ত নিধনপুর তাম্রপট্টোলী (সপ্তম শতক), ভাটেরায় প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের পট্টোলী (একাদশ শতক), বন্দর বাজারে প্রাপ্ত লোকনাথের মূর্তি (দশম-একাদশ), ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত লোকনাথের পট্টোলী (অষ্টম শতক) এবং তৎপরবর্তী অগণিত লিপি ও মূর্তি, ফরিদপুরে প্রাপ্ত ধর্মাদিত্য-গোপচন্দ্র ইত্যাদির পট্টোলী (ষষ্ঠ-সপ্তম শতক), ঢাকা জেলায় প্রাপ্ত অসংখ্য মূর্তি ও লিপি এই সব ভূখণ্ডে প্রাচীনকাল হইতেই বহুদিনস্থিত সমৃদ্ধ সভ্যতা এবং জনাবাসের দ্যোতক। এইসব *ভূখণ্ড পুরাতন গঠন, এবং ইহাদের অবলম্বন করিয়াই প্রাচীন বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্বাঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।* এই সব ভূখণ্ডের তুলনায় খুলনা-বাখরগঞ্জ-নোয়াখালি-সমতল চট্টগ্রাম নূতন, এবং লক্ষণীয় এই যে, এই সব ভূখণ্ডে বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বড় একটি চিহ্ন এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। চট্টগ্রামে বহু মূর্তি এবং কয়েকটি লিপি, নোয়াখালিতে দু'একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহার একটিও নবগঠিত সমতলাংশে নয়।

মধুপুর গড়

নবভূমির দুইভাগ

মধ্য বা দক্ষিণ-বঙ্গে পুরাভূমির অস্তিত্ব কোথাও নাই ; এই ভূমি একেবারে পদ্মা-ভাগীরথী-মধুমতীর সৃষ্টি, এবং বাংলার নব-ভূমির অন্তর্ভুক্ত ; শতাব্দীর পর শতাব্দীর পলিমাটি জমিয়া জমিয়া এই ভূখণ্ডকে একধারে বন্যা ও অন্য ধারে সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে। খাড়িমণ্ডল-ব্যাঘ্রতটী-সমতট, প্রভৃতি নাম লক্ষণীয়। নদীয়া জেলার কিয়দংশ, যশোর, খুলনা, এবং চব্বিশ-পরগণা এই ভূখণ্ডের অন্তর্গত। সমতট অবশ্যই সমতল-ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—তাহার একাধিক লিপি প্রমাণ বিদ্যমান—কিন্তু সমতল-ত্রিপুরাও তো ফরিদপুরের মত নবভূমিরই অংশ। তবে ইহাদের মধ্যে নদীয়া-যশোর, এবং বোধ হয় চব্বিশ-পরগণা ফরিদপুর-ঢাকা-ত্রিপুরার মত পুরাতন গঠন, আর, খুলনা-বাখরগঞ্জ সমতল-নোয়াখালি বা সমতল-চট্টগ্রামের মত নূতন গঠন। চব্বিশ-পরগণার গাঙ্গেয় অঞ্চল তো সুপ্রাচীন জনাবাস ও সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়াই মনে হয়।

মধ্য বা দক্ষিণ-বঙ্গের নবভূমি

য়ুয়ান-চোয়াঙ্ সমতটেও আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন, এই সমতট সমুদ্র-তীরবর্তী দেশ ; ইহার ভূমি জলীয় এবং সমতল। ইহার শস্যসম্ভার বা জন-সমৃদ্ধি সম্বন্ধে

তিনি কিছুই বলেন নাই। য়ুয়ান্-চোয়াঙের সমতট তদানীন্তন যশোর-ফরিদপুর-ঢাকা অঞ্চল বলিয়াই যেন মনে হয়; অন্তত খুলনা-বাখরগঞ্জের ভূখণ্ড যে নয় এ-অনুমান বোধ হয় করা চলে। তখন বোধ হয় এই সব অঞ্চল ভাল করিয়া গড়িয়াই উঠে নাই। আগেই দেখিয়াছি, ষষ্ঠ শতকে ফরিদপুরের কোটালিপাড়া অঞ্চল নূতন সৃষ্ট হইয়াছে মাত্র, তখনও তাহার নাম "নব্যাবকাশিকা", এবং সম্ভবত এই জনপদ তখন প্রায় সমুদ্রতীরবর্তী। বাখরগঞ্জের "নাব্য" অঞ্চল তাহার অনেক পরের সৃষ্টি। ঐতিহাসিক কালে নূতন ভাঙা-গড়া উলট্-পালট্ বাংলার এই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলেই বেশি হইয়াছে।

সমতট

জলবায়ু সম্বন্ধে য়ুয়ান্-চোয়াঙের সাক্ষ্য ভূ-প্রকৃতি প্রসঙ্গে কিছু কিছু জানা গিয়াছে; মোটামুটি একটা ধারণা তাহা হইতেই পাওয়া যায়। বাংলার জলবায়ু এখনও নাতি-শীতোষ্ণ; তবে পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষত বীরভূমে, বর্ধমানের পশ্চিমাংশে এবং কতকটা মেদিনীপুরেও, গ্রীষ্মের তাপ প্রখরতর; অন্যত্র গ্রীষ্মের বায়ু উষ্ণ জলীয়। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ তাহা লক্ষ্য ও বিবরণীবদ্ধ করিতে ভোলেন নাই। কিন্তু বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হইতেছে পূর্ব ও উত্তর-বঙ্গে বারিপাতবাহুল্য। এই বারিপাত ভারত-মহাসাগর বাহিত মৌসুমী বায়ু সঞ্জাত। এই বায়ু হিমালয়, গারো, খাসিয়া, ও জৈন্তিয়া পাহাড়ে প্রতিহত হইয়া সমগ্র উত্তর ও পূর্ব-বাংলাকে, বিশেষভাবে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, মৈমনসিং, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, বরিশালকে অবিরল বারিপাতে ভাসাইয়া দেয়। আর একটি বায়ু-প্রবাহ বসন্তের। ফাল্গুন-চৈত্র মাসের দক্ষিণা বাতাসের রূপকচ্ছলে কিঞ্চিৎ আভাস বোধ হয় ধোয়ী কবির পবনদূতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেন যখন দিগ্বিজয় উদ্দেশে দক্ষিণ-ভারতে গমন করেন তখন কুবলয়বতী নামে মলয় পর্বতের এক গন্ধর্ব নারী তাঁহার প্রতি প্রেমাকৃষ্টা হন; বসন্তাগমে কুবলয়বতী লক্ষ্মণসেনের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া বসন্ত পবনকে দূত করিয়া প্রেরণ করেন। এই বসন্ত পবন উত্তর-পূর্ববাহী, এবং যেহেতু ইহা মলয় পর্বত স্পর্শ করিয়া আসে সেই হেতু কাব্যসাহিত্যে বসন্তের বাতাসের নাম মলয় পবন। কুবলয়বতী পবনদূতকে মলয় পর্বত হইতে উত্তর-পূর্ববাহী হইয়া গৌড়ে লক্ষ্মণসেন সমীপে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন; দূত সে আদেশ পালন করিয়াছিল, তবে পথে হয়ত বিভ্রান্ত হইয়া অনেক বিপথ বিদিক ঘুরিয়া তবে রাজধানী বিজয়পুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। যাহা হউক, এই কাহিনীতে বাংলার বসন্তকালীন পবন-প্রবাহের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। সংকলনকর্তা শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত নামক সংকলন গ্রন্থে বিভিন্ন বাঙালী কবির রচিত বায়ু-প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক বর্ণনাময় কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত আছে। দক্ষিণ-বায়ুর বর্ণনা প্রসঙ্গে দক্ষিণাপথের বিভিন্ন দেশের তরুণীদের আশ্রয়ে দুইজন অজ্ঞাতনামা কবি

জলবায়ু

বসন্ত বায়ু

বেশ রোম্যান্টিক কবি-কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন। বারিবাহী মৌসুমী বায়ুর কোনও বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক উল্লেখ ও বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে না; তবে, রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে বঙ্গাল দেশের অবিরল বারিপাতের একটু সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। বঙ্গাল দেশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, এই দেশে বারিপাতের কখনও বিরাম ছিল না (Vangaladesa where the rain water never stopped)। বর্ষার অবিরল বৃষ্টিপাত

বর্ষা ও হেমন্তের বাংলা

তো এখনও পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। একাদশ-দ্বাদশ শতকের বাংলার বর্ষার একটি বাস্তব সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন কবি যোগেশ্বর (ইনি বাঙালী ছিলেন, এতটুকু সন্দেহ নাই)—এবং ছবিটি গ্রাম্য-নায়ক তথা কৃষক-যুবকের সুখস্বপ্নেরও। উদ্ধার-লোভ সংবরণ করা কঠিন।

ব্রীহিঃ স্তম্বকারিঃ প্রভূত পয়সঃ প্রত্যাগতা ধেনবঃ
প্রত্যুজ্জীবিতমিক্ষুনা ভূশমিতি ধ্যায়ন্নপেতাঙ্গধীঃ।
সাক্রোশীর কুটুম্বিনী স্তনভর বালুস্তম্ভ ক্রমো।
দেবে নীরমুদারমুজ্ঝতি সুখং শেতে নিশাং গ্রামণীঃ॥ [সদুক্তিকর্ণামৃত, ২।৮৪।৩]

প্রচুর জল পাইয়া ধান চমৎকার গজাইয়া উঠিয়াছে, গরুগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে; ইক্ষুর সমৃদ্ধিও দেখা যাইতেছে; [কাজেই] অন্য কোনও ভাবনা আর নাই; ঘর্মক্লান্তিমুক্ত স্ত্রীও ঘরে এই অবসরে উশীর প্রসাধন করিতেছে; বাহিরে আকাশ হইতে জল ঝরিতেছে প্রচুর, গ্রাম্য [যুবক] সুখে শুইয়া আছে।

প্রাচ্যদেশ বাংলা দেশ যে প্রচুর জল এবং প্রচুর বারিপাতেরই দেশ, তাহা তো পাল লিপির প্রসিদ্ধ "দেশে প্রাচি প্রচুর পয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং" পদেই প্রমাণ। আর, গুরু গম্ভীর ঘন বর্ষায় মেদুর আকাশকে "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম" বলিয়া বাঙালী কবি জয়দেব যে অভিনন্দন জানাইয়াছেন, এবং তার শ্যাম-মহিমাকে যে-চিত্রে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা তো বাঙালীর একান্তই সুপরিচিত এবং তাহা বাংলাদেশ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়।

যে সদুক্তিকর্ণামৃত কাব্য-সংকলন গ্রন্থ হইতে বর্ষায় বাংলার উপরোক্ত চিত্রটি উদ্ধার করা হইয়াছে, সেই গ্রন্থ হইতেই হেমন্তের বাংলার আর একটি ছবি উদ্ধারের লোভ সংবরণ করা গেল না; এটি একটি অজ্ঞাতনামা, (বোধ হয় বাঙালী) কবির রচনা, এবং ধান্য ও ইক্ষু-সমৃদ্ধ বাংলার অগ্রহায়ণ-পৌষের অনবদ্য মধুর বাস্তব চিত্র।

শালিচ্ছেদ-সমৃদ্ধ হালিকগৃহাঃ সংসৃষ্ট-নীলোৎপল-
স্নিগ্ধ-শ্যাম-যব-প্ররোহ-নিবিড়ব্যাদীর্ঘ-সীমোদরাঃ।
মোদন্তে পরিবৃত্ত-ধেম্বনডুহচ্ছাগাঃ পলালৈর্নবৈঃ
সংসক্ত-ধ্বনদিক্ষুযন্ত্রমুখরা গ্রামা গুড়ামোদিনঃ॥ [সদুক্তি, ২।১৩৬।৫]।

কৃষকের বাড়ি কাটা শালিধান্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে [আঁটি আঁটি কাটা ধান আঙিনায় স্তূপীকৃত হইয়াছে—পৌষ মাসে এখনও যেমন হয়]; গ্রাম-সীমান্তের ক্ষেতে যে প্রচুর যব হইয়াছে তাহার শীষ নীলোৎপলের মত স্নিগ্ধ শ্যাম; গরু, বলদ ও ছাগগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নূতন খড় পাইয়া আনন্দিত; অবিরত ইক্ষুযন্ত্র ধ্বনিমুখর [আখ-মাড়াই কলের শব্দে মুখরিত] গ্রামগুলি [নূতন ইক্ষু] গুড়ের গন্ধে আমোদিত।

লোক-প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত য়ুয়ান্‌-চোয়াঙের সাক্ষ্য হইতে ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়াছে। কজঙ্গলের লোকেরা স্পষ্টাচারী, গুণবান এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান; পুণ্ড্রবর্ধনের লোকেরাও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবান; কামরূপের লোকেরা সদাচারী হওয়া সত্ত্বেও হিংস্র প্রকৃতির; তাম্রলিপ্তির লোকেরা রূঢ়াচারী কিন্তু তাহারা কর্মঠ ও সাহসী; সমতটের লোকেরা কর্মঠ; কর্ণসুবর্ণের লোকেরা ভদ্র ও সচ্চরিত্র এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের সুপোষক; তাম্রলিপ্তির লোকেরাও জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুরাগী। কিন্তু লোক-প্রকৃতির ব্যক্তিগত বিবরণ যথেষ্ট বস্তুগত ও প্রামাণিক সাক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। প্রথমত, এ-ব্যাপারে দর্শক বা পর্যবেক্ষকের ব্যক্তিগত রুচি-অরুচির প্রশ্ন অনিবার্য; দ্বিতীয়ত, দুই একটি বিচ্ছিন্ন, প্রসঙ্গবর্জিত উদাহরণ হইতে সাধারণ ভাবে কয়েকটা মন্তব্যে পৌঁছানও এই সব লেখক ও পর্যবেক্ষকদের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়! তৎসত্ত্বেও বিদেশী ও ভিন্‌প্রদেশী লোকেরা বিভিন্ন সময়ে বাঙালীর লোক-প্রকৃতি সম্বন্ধে কি কি বিভিন্ন ধারণা পোষণ করিতেন তাহার একটু হিসাব লওয়া হয়তো নিরর্থক নয়।

লোক-প্রকৃতি

কামসূত্র-রচয়িতা বাৎস্যায়ন (তৃতীয়-চতুর্থ শতক) বলিতেছেন, তাঁহার সময়ে প্রাচ্য-দেশের লোকেরা মধ্যদেশের জনসাধারণ অপেক্ষা যৌন ও মিথুন ব্যাপারে অনেক বেশি শিষ্ট ছিল। প্রাচ্যদেশের অন্যান্য অনেক বিভাগের সঙ্গে গৌড় ও বঙ্গ এই দুইটি বিভাগ তিনি জানিতেন; কাজেই তাঁহার এই মন্তব্য গৌড়-বঙ্গ সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই প্রযোজ্য। কদর্যতম যৌন অনাচার হইতে তাহারা মুক্ত ছিল; তবে এই দেশেরই রাজান্তঃপুরের—সব দেশে কালেই যেমন হইয়া থাকে—মহিলারা তাহাদের কামবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিতেন। গৌড়বাসীরা সুপুরুষ ছিল, এ-সাক্ষ্য বাৎস্যায়ন দিতেছেন, এবং গৌড়-নারীরা যে মৃদুভাষিণী, মৃদু অঙ্গা এবং অনুরাগবতী ছিলেন তাহাও বলিতেছেন। তাহা ছাড়া তিনি একটি কৌতূহলোদ্দীপক খবরও দিতেছেন, তাহা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। গৌড়-পুরুষেরা আঙুলের সৌন্দর্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লম্বা লম্বা নখ রাখিতেন. এবং মহিলারা নাকি তাহাতে খুব আকৃষ্টা হইতেন। গৌড়দেশের বিভিন্ন নগরের নাগরক এবং বিদগ্ধ নারীদের নানাপ্রকার কাম এবং বিলাস-লীলার বিবরণ পড়িলে বাংলার নগর-সভ্যতা তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম শতকে যৌনব্যাপারে খুব যে নীতি ও সংযমপরায়ণ ছিল, অবশ্য বর্তমান আদর্শে, তাহা তো মনে হয়না। কিন্তু, এ-প্রসঙ্গ গ্রন্থের অন্যত্র যথাযোগ্য আলোচিত হইয়াছে।

গৌড়
বঙ্গ

গৌড়বাসী সম্বন্ধে আরও খবর পাওয়া যাইতেছে। বাঙালীদের বিদ্যাচর্চায় অনুরাগের সাক্ষ্য য়ুয়ান-চোয়াঙের নিকট হইতে আগেই পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণে, নানা তিব্বতী গ্রন্থে, অসংখ্য ভিন্‌ প্রদেশের লিপিমালা এবং

সাহিত্যগ্রন্থ হইতে অনবরতই দেখা যাইতেছে, এখনকার মত প্রাচীন কালেও বাঙালী ছাত্র ও শিক্ষকরূপে ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং ভারতবর্ষের বাহিরে যাতায়াত করিত। কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার দশোপদেশ গ্রন্থে কাশ্মীরে গৌড়দেশের ছাত্রদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন, এই সব ছাত্রদের দেহ এত ক্ষীণ যে, হস্তস্পর্শেই ইহাদের দেহ ভাঙিয়া পড়িবে বলিয়া যেন মনে হয়, কিন্তু কাশ্মীরের জল-হাওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই তাহাদের প্রকৃতি উদ্ধত হইয়া উঠে, এবং স্বল্পমাত্র উত্তেজনাতেই একেবারে সহসা মারমুখী হইয়া উঠে। একবার এইরূপ একটু উত্তেজনার ফলে তাহারা এক দোকানদারকে জিনিসের দাম দিতে অস্বীকার করে এবং মুহূর্ত মধ্যেই ছুরিকাঘাতে উদ্যত হয়। গৌড়বাসীর এই অচির-ক্রোধপরায়ণতা এবং কলহপ্রিয়তা মিতাক্ষরা-লেখক বিজ্ঞানেশ্বরও বেশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে (আনুমানিক, পঞ্চম শতক) রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সুহ্মদের উল্লেখ আছে ; কবি বলিতেছেন, বেতস লতা যেমন অবনত হইয়া নদীর স্রোতাবেগ হইতে আত্মরক্ষা করে, সুহ্মদেশীয় লোকেরা অবনত হইয়া উদ্ধত-উচ্ছেদকারী সেই রঘুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কবির এই উক্তির মধ্যে সুহ্মদেশীয়দের লোক-প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত আছে কিনা বলা শক্ত, কারণ টীকাকার মল্লিনাথ বৈতসীবৃত্তি সম্বন্ধে এ-প্রসঙ্গে কৌটিল্যের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন: বলীয়সাভিযুক্তো দুর্বলঃ সর্বত্রানুপ্রণতো বেতসধর্মমাতিষ্ঠেৎ। সুহ্মেরা রঘু সম্বন্ধেই এইরূপ বৈতসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, না দুর্বল বলিয়া এইরূপ বৃত্তিই ছিল জনসাধারণের প্রকৃতি তাহা বলা কঠিন।

সুহ্ম
রাঢ়

মহাবীর ও তাঁহার কয়েকজন শিষ্যকে ধর্মপ্রচারোদ্দেশে পথহীন লাঢ়দেশে, বজ্জ (ব্রহ্ম ?) ও সুহ্মভূমিতে, ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক, খ্রীষ্ট পূর্ব)। এই গল্পটি জৈনদের ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্রে বর্ণিত আছে ; অন্যত্র তাহা সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছি। এই উপলক্ষে, এই কাহিনীটিতে রাঢ়বাসীদের রূঢ় আচরণের এবং বজ্জভূমিবাসীদের কুখাদ্য ভক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত আছে। তাহা ছাড়া, আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প (অষ্টম শতক) গ্রন্থে গৌড় ও পুণ্ড্রের ভাষাকে অসুরভাষা বলা হইয়াছে, সে-কথাও আগে অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি। মহাভারতে সমুদ্রতীরবাসী বঙ্গদের ম্লেচ্ছ এবং ভাগবত পুরাণে সুহ্মদের 'পাপ' কোম বলা হইয়াছে। বোধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হইয়াছে, মধ্যদেশ বা আর্যাবর্ত হইতে বঙ্গদেশে গেলে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ; এই দুই দেশ অশিষ্টভূমির অন্তর্গত এবং লোকেরা 'সংকীর্ণ-যোনয়ঃ'। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, এই সমস্ত উক্তি আর্যভাষাভাষী, আর্য-সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকদের উক্তি, এবং গৌড়-পুণ্ড্র-বঙ্গের অনার্য বা আর্যপূর্ব লোকদের ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ইহাদের জ্ঞানও ছিলনা, শ্রদ্ধা-ভক্তিও ছিলনা ; তাঁহারা সেই সুপ্রাচীনকালে ইহাদের অবজ্ঞার চোখেই দেখিতেন। কিন্তু আশ্চর্য এই,

রাঢ়দেশবাসী মুকুন্দরামও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রাঢ়দেশবাসীকে একটু রূঢ় এবং হিংস্র প্রকৃতির লোক বলিয়াছেন। রাঢ়দেশের লোকেরা যে একটু রূঢ় এবং অশিষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের একটি পদেও সুস্পষ্ট। মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন :

অকট হিংসক রাড় চৌদিকে পশুর হাড়।
কৃতাঞ্জলি বীর কহে হই গ গোয়াড়।
লোকে না পরস করে সভে বলে রাড় ॥

ঘনরাম লিখিয়াছেন :

জাতি রাঢ় আমি রে,করমে রাঢ় তু।

দক্ষিণ-রাঢ়ের ব্রাহ্মণেরা যে দাম্ভিক প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহার একটু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে। কৃষ্ণমিশ্র এই ব্রাহ্মণদের একটু ব্যঙ্গই করিয়াছেন! অহংকাররূপী ব্রাহ্মণের যে-চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহা উজ্জ্বল এবং উপভোগ্য। জন্মদেশ, জনপদ এবং নগরের, পিতার এবং নিজের অহংকৃত পরিচয়ের পর ব্রাহ্মণ অহংকার বলিতেছেন,

নাস্মাকং জননী তথোজ্জ্বলকুলা সচ্ছ্রোত্রিয়াণাং পুনর্
ব্যূঢ়া কাচন কন্যকা খলু ময়া তেনাস্মি তাতাধিকঃ।
অস্মচ্ছ্যালকভাগিনেয়দুহিতা মিথ্যাভিশপ্তা যতস্
তৎসম্পর্কবশান্ময়া স্বগৃহিণী প্রেয়স্যপি প্রোজ্ঝিতা ॥

ব্রাহ্মণ অহংকারের আত্মশ্লাঘার প্রতি শ্লেষ সত্যই উপভোগ্য!

কবি ধোয়ীও দক্ষিণ-রাঢ়ের (সুহ্ম দেশের) প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছেন, "রসময় সুহ্মদেশঃ।"

রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী গ্রন্থে হরিকেল (চন্দ্রদ্বীপ-শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা-মৈমনসিং অঞ্চল) দেশের নারীদের খুব স্তুতিবাদ করা হইয়াছে, এবং রাঢ় ও কামরূপের নারীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতরা বলা হইয়াছে। রাজশেখর গৌড়াঙ্গনাগণের বেশভূষার বর্ণনা করিয়া যে স্তুতিবাদ করিয়াছেন সদুক্তিকর্ণামৃত নামক কাব্য-সংকলন গ্রন্থে (১২০৬) তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থেই কোনও এক অজ্ঞাত কবির রচিত (পূর্ব-) বঙ্গীয় নারীদের সাজ সজ্জা বর্ণনার একটি শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে। অন্য আর একজন কবি বাংলার গ্রাম্য তরুণীর বর্ণনা দিয়া আর একটি শ্লোক বাঁধিয়াছেন : তাহাও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই সব শ্লোক অন্যত্র উদ্ধার ও আলোচনা করিয়াছি (আহার-বিহার, বসন-ব্যসন, দৈনন্দিন জীবন প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

প্রাচীন বাংলার ফলফুল-বৃক্ষলতা-শস্য সম্ভারের এবং অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য ইত্যাদির পরিচয় দেশ-পরিচয়েরই অংশ; ধনসম্বল অধ্যায়ে এ-সম্বন্ধে সবিস্তার উল্লেখ করা হইয়াছে ধান, যব, পাট, ইক্ষু, সরিষা, আম, মহুয়া, কাঁটাল, নানাবিধ বস্ত্র-সম্ভার, ধাতুদ্রব্য, খনিজদ্রব্য,

লবণ, পান, গুবাক্, নারিকেল, বাঁশ, মাছ, ডালিম, ডুমুর (পর্কটী), খেজুর, পিপ্পল, এলাচ ইত্যাদি শস্য ও দ্রব্যসম্ভার কোথায় কি উৎপাদিত হইত তাহাও সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। জীবজন্তু সম্বন্ধেও একই কথা। বর্তমান ও পূর্বোক্ত অধ্যায়েই ব্যাঘ্র, হস্তী, হরিণ, ঘোড়া, বানর, গরু, ভেড়া, ছাগল, কুক্কুট, বরাহ, নানা প্রকারের মাছ ইত্যাদির কথাও বলা হইয়াছে।

৬

আমাদের এই দেশের নাম বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশ। মুঘল আমলে এই দেশ সুবা বাংলা নামে পরিচিত ছিল। আবুল ফজল তাঁহার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বাংলা-বাঙ্গালা নামের ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল্ (সংস্কৃত আলি, পূর্ববঙ্গীয় আইল) যুক্ত হইয়া বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাই আবুল ফজলের ব্যাখ্যা। আল্ শুধু শস্যক্ষেত্রের আলি নয়, আল ছোটবড় বাঁধও বটে। এই নদীমাতৃক বারিবহুল দেশে বৃষ্টি, বন্যা এবং জোয়ারের স্রোত ঠেকাইবার জন্য ছোটবড় বাঁধ বাঁধা কৃষি ও বাস্তুভূমির যথার্থ পরিপালনের পক্ষে অনিবার্য। যে-সব ভূখণ্ডে বারিপাত কম, ভূমি সাধারণত উষর, সেখানেও বর্ষার জল ধরিয়া রাখিবার জন্য ছোট বড় বাঁধ বাঁধা প্রয়োজন হইত, এখনও হয়—যেমন বীরভূম অঞ্চলে। প্রাচীন লিপিতে এই ধরনের বাঁধের পুনঃপুন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন, বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া লিপিতে এবং অন্যান্য অসংখ্য লিপিতে। এ রকম দুই চারিটি বৃহৎ বাঁধ এখনও প্রাচীন অভ্যাসের স্মৃতি বহন করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রংপুর-বগুড়ার ভীমের (কৈবর্তরাজ ভীমের ?) জাঙ্গাল বা ভীমের ডাইঙ্গ, বীরভূমের সিউড়ি অঞ্চলের দুই চারিটি বাঁধের উল্লেখ করা যায়। আমার অনুমান, আবুল ফজলের ব্যাখ্যার অর্থ এই : যে-বঙ্গদেশ আল্ বা আলিবহুল, যে-বঙ্গদেশের উপরিভূমির বৈশিষ্ট্যই হইতেছে আল্ সেই দেশই বাঙ্গালা বা বাংলা দেশ। এই আল্গুলিই আবুল ফজলের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাঁহার ব্যাখ্যা পড়িলে এই কথাই মনে হয়। Gastaldi (1560), Hondivs (1613), Hermann Moll (1710), Van den Broucke (1660), Izzak Tirion (1730), F. de Witt (1726) প্রভৃতির নক্শায়, মধ্যযুগের য়ুরোপীয় পর্যটকদের বিবরণীতে সর্বত্রই এই দেশের নাম পাইতেছি Bengala, এবং ইহার দক্ষিণের সাগরটির নাম Golfo de Bengala বা Gulf of Bengal বলিয়া। মধ্যযুগের বাংলা—বাঙ্গালা—Bengala একই নাম। Marco Polo এই দেশের নাম বলিতেছেন Bangala, যদিও তাঁহার অবস্থিতি নির্দেশ স্পষ্টই ভ্রমাত্মক। যাহাই হউক, বাঙ্গালা-Bengala-Bangala-বাংলা নাম বর্তমান বঙ্গদেশের মোটামুটি প্রায় সমস্তটারই—কোনও কোনও দিকে বর্তমান সীমা অতিক্রমও করিয়াছে—উপর প্রয়োগ

জনপদ বিভাগ

বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি

করা হইয়াছে, মধ্যযুগীয় সাক্ষ্যে তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রাচীন বাংলায় বঙ্গ-বঙ্গাল বলিতে যে-দেশখণ্ড বুঝাইত তাহা বর্তমান বঙ্গ বা বাংলা দেশের সমার্থক নয়, বরং তাহার একটি অংশ মাত্র। প্রাচীন বাংলা দেশ যে-সব জনপদে বিভক্ত ছিল বঙ্গ ও বঙ্গাল তাহার দুইটি বিভাগ মাত্র। এই দুইটি বিভাগের নাম হইতেই বর্তমান এবং মধ্যযুগীয় সমগ্র বাংলাদেশের নামটির উৎপত্তি। কাজেই, প্রাচীন বাংলার জনপদ-বিভাগের কথা বলিতে গিয়া সর্বাগ্রে এই বিভাগ দুইটির কথাই বলিতে হয়।

কিন্তু তাহার আগে জনপদ-বিভাগ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়া লওয়া দরকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিশেষত প্রাচীনতর সাক্ষ্যে, জনপদগুলির নাম যে ভাবে আমরা পাই, তাহা ঠিক জনপদ বা স্থানের নাম নয়—কোমের নাম, যথা বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ, পুণ্ড্রাঃ, গৌড়াঃ, অর্থাৎ বঙ্গ জনাঃ, গৌড় জনাঃ, পুণ্ড্র জনাঃ, রাঢ়াঃ জনাঃ, বঙ্গ-গৌড়-পুণ্ড্র-রাঢ় কোম (tribe অর্থে)। এই সব জনাঃ বা কোম যে-সব অঞ্চলে বাস করিত, পরে তাহাদের, অর্থাৎ সেই সেই অঞ্চলের নাম হইল বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র ইত্যাদি। এইভাবে বহুবচনে জনবাচক অর্থে এই সব নামের ব্যবহার একাদশ-দ্বাদশ শতকের সাক্ষ্য প্রমাণেও দেখা যায়। দু'এক ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রমও আছে, যেমন সুব্‌ভ বা সুহ্মভূমি, বজ্‌জ্‌ বা বজ্রভূমি (ব্রহ্মভূমি ?)। দ্বিতীয়ত, জন হইতে বা জনকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত এক একটি জনপদে এক এক সময়ে এক একটি রাষ্ট্র বা রাজবংশের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে, এবং অনেক সময়ে তাহাদের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য সংকোচ বা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জনপদটির সীমাও সংকুচিত বা বিস্তারিত হইয়াছে। পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রদের জনপদকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য (সপ্তম শতক) এবং পরে পাল ও সেনরাজাদের আমলে পুণ্ড্র-পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি বা পৌণ্ড্রভুক্তি ; এই ভুক্তিটি এক সময় হিমালয়-শিখর হইতে আরম্ভ করিয়া (দামোদরপুর লিপি, পঞ্চম শতক) সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল (দ্বাদশ শতকে বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদ্ লিপি দ্রষ্টব্য)। ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মেহার লিপি অনুসারে ত্রিপুরা জেলাও এই ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। অথচ, প্রাচীন পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছিল বগুড়া-দিনাজপুর-রাজসাহী-রংপুর জেলাকে কেন্দ্র করিয়া। বর্ধমান রাঢ় দেশের একটি অংশমাত্র ছিল, অথচ এক সময় এই বর্ধমান রাষ্ট্রবিভাগে রূপান্তরিত হইয়া বর্ধমানভুক্তি নাম লইয়া শুধু উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়দেশকেই নয়, দণ্ডভুক্তি মণ্ডলকেও গ্রাস করিয়াছিল। দণ্ডভুক্তি মেদিনীপুর জেলার বর্তমান দাঁতন অঞ্চল ; এই অঞ্চল সপ্তম শতকে তাম্রলিপ্তি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণ হইতে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। সুহ্মদেশ মোটামুটি দক্ষিণ-রাঢ়ের সমার্থক ; মহাভারতে তাম্রলিপ্তিকে সুহ্মদেশ হইতে পৃথক বলা হইয়াছে ; অধিকাংশ প্রাচীন সাক্ষ্যের ইঙ্গিতও তাহাই। কিন্তু দশকুমার-চরিত গ্রন্থে দামলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তকে সুহ্মের অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে। জৈন প্রজ্ঞাপনায় তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্তকে আবার বঙ্গের অন্তর্ভুক্তও বলা হইয়াছে, অথচ প্রাচীন সাক্ষ্যের

সর্বত্রই ইঙ্গিত এই যে, বঙ্গ ভাগীরথীর পূর্ব তীরে। এই সব দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই বুঝা যায়, রাষ্ট্র-পরিধির বিস্তার ও সংকোচের সঙ্গে সঙ্গে এক এক সময় এক এক জনপদের সীমাও বিস্তারিত ও সংকুচিত হইয়াছে, সব জনপদের সীমা সকল সময় এক থাকে নাই। আসল কথা, প্রাকৃতিক সীমা ও রাষ্ট্রসীমা সর্বত্র সকল সময় এক হয় না, প্রাচীন বাংলায়ও হয় নাই, জনপদ বৃত্তান্ত পাঠের সময় একথা মনে রাখা প্রয়োজন। এই জনপদকথা বলিবার সময় সেইজন্য প্রাকৃতিক সীমা-নির্ধারণের চেষ্টাই প্রথম কর্তব্য, যদিও তাহা সহজসাধ্য নয়, সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রায়শ সুদুর্লভ। দ্বিতীয় কর্তব্য, বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট জনপদের রাষ্ট্র *সীমার বিস্তার ও সংকোচ, এবং তাহার বিভিন্ন রাষ্ট্রগত* ও সংস্কৃতিগত বিভাগের নির্দেশ। এ-কাজও অত্যন্ত কঠিন; কারণ এ-ক্ষেত্রেও সাক্ষ্য-প্রমাণ সুলভ নয়। তবু, যতটা সম্ভব মোটামুটি একটা ধারণা গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা যাইতে পারে। তৃতীয়ত, খুব প্রাচীন কাল হইতেই নানা প্রসঙ্গে বাংলার বিভিন্ন জনপদের উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থাদি এবং লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। এই সব উল্লেখ সুবিদিত এবং বহু আলোচিত; কাজেই, এ-প্রসঙ্গে তাহার পুনরালোচনার কিছু প্রয়োজন নাই। যে-সব উল্লেখ, যে-সব সাক্ষ্য-প্রমাণ জনপদ-গুলির সীমা ও অবস্থিতি নির্ণয়ের সহায়ক, শুধু তাহাদের উল্লেখ ও আলোচনাই এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। তাহা ছাড়া, প্রাচীনতর উল্লেখ যাহা পাইতেছি তাহা সমস্তই আর্যভাষাভাষী আর্য-সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকদের গ্রন্থ হইতে, যাহারা আর্যপূর্ব বা অনার্য ভাষা ও সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধাবান ছিলেন না এমন লোকদের নিকট হইতে, এ-কথাও মনে রাখা দরকার।

বঙ্গ অতি প্রাচীন দেশ। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বোধ হয় সর্বপ্রথম এই দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; "বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ" পদে বঙ্গজনদের বগধদের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে। বগধ বোধ হয় মগধ, এই অনুমান অনৈতি-

বঙ্গ

হাসিক না-ও হইতে পারে। এই গ্রন্থের ঋষিরা বঙ্গকে মগধের প্রতিবেশী জনপদ বলিয়াই জানিতেন বলিয়া মনে হয়। বোধায়নের ধর্মসূত্রে বঙ্গ জনপদটিকে কলিঙ্গ জনপদের প্রতিবেশী বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এমন অনুমান করিলে ভুল হয় না; আরট্ট, পুণ্ড্র, সৌবীর, বঙ্গ ও কলিঙ্গজনেরা একেবারে বৈদিক সংস্কৃতি বহির্ভূত, এবং তাহাদের দেশে যাতায়াত করিলে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, বোধায়ন এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন। মহাভারতে দেখিতেছি, ভীম দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া মুদ্গগিরি (মুঙ্গের-) রাজকে হত্যা করিয়া কোশী নদী তীরবর্তী পুণ্ড্র-রাজকে পরাজিত করেন; তাহার পর, পর পর তিনি বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম, প্রসুহ্ম রাজাদের এবং অনেক ম্লেচ্ছ কোমদের পরাভূত করেন। মহাভারতের আদিপর্বে বঙ্গজনদের উল্লেখ করা হইয়াছে অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্মজনদের সঙ্গে; সভাপর্বে পুণ্ড্রদের সঙ্গে। রামায়ণেও অন্যান্য জনদের সঙ্গে বঙ্গজনদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; ইহারা সকলেই অযোধ্যার অভিজাত-বংশীয়দের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, এইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সিংহলী মহাবংশ গ্রন্থে বঙ্গজনেরা লাল(রাঢ়)-জনদের সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রজ্ঞাপনা নামক একটি জৈন উপাঙ্গে বঙ্গজনদের সঙ্গে লাল(রাঢ়)-জনদের উল্লেখ করিয়া উভয়কেই আর্য বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্তিকে বঙ্গজনদের অধিকারে বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। মহাভারতের উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, বঙ্গ পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি ও সুহ্মের সংলগ্ন দেশ, এবং প্রত্যেকটি দেশই স্ব-স্বতন্ত্র; কিন্তু জৈন উপাঙ্গটির ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, কোনও সময়ে তাম্রলিপ্তি বোধ হয় বঙ্গের অধিকারভুক্ত হইয়া থাকিবে। বঙ্গের উল্লেখ গুণ্টুর জেলার নাগার্জুনীকোণ্ড (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক) শিলালিপিতে, রাজা চন্দ্রের (চতুর্থ শতক) মেহেরৌলি স্তম্ভলিপি এবং বাতাপীর (বাদামী) চালুক্যরাজ পুলকেশীর মহাকূট স্তম্ভ-লিপি(সপ্তম শতক)তেও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের একটিতেও বঙ্গের অবস্থিতি নির্দেশ পাওয়া যায় না। কালিদাসের (চতুর্থ শতক ?) রঘুবংশে এই নির্দেশ যেন অনেকটা স্পষ্ট। এই কাব্যের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে পর পর পাঁচটি শ্লোক আছে। প্রথম দুইটি শ্লোকে তালীবনশ্যাম উপকূলে সুহ্ম জনদের পরাজয়ের কথা আছে; তার পরেই তিনি নৌসাধনোদ্যত বঙ্গজনদের পরাভূত করিয়া "গঙ্গাস্রোতোঽন্তরে" জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্গজনদের উৎখাত এবং প্রতিরোপিত করিয়া পরে তিনি কপিশা (কাসাই) নদী পার হইয়া উৎকলদিগের প্রদর্শিত পথে কলিঙ্গ অভিমুখে গিয়াছিলেন। টীকাকার মল্লিনাথ 'গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু' পদটির টীকা করিয়াছেন 'গঙ্গায়াঃ প্রবাহনাম দ্বীপেষু'; এবং আধুনিক ঐতি-হাসিকেরাও 'গঙ্গাস্রোতের মধ্যে' এই অর্থই করিয়াছেন। এই অর্থ মানিয়া লইলে স্বীকার করিতে হয়, কালিদাসের সময়েও তাম্রলিপ্তি বঙ্গজনপদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং রঘু সুহ্ম অর্থাৎ মোটামুটি দক্ষিণ-রাঢ় জয় করিয়া বঙ্গ জয় করেন, এবং পরে কপিশা পার হইয়া উৎকলে যান। কিন্তু মহোদধির তালীবনশ্যামোপকণ্ঠে উপনীত হইয়া সুহ্ম জয়ের উল্লেখ হইতে আমার মনে হয়, তদানীন্তন তাম্রলিপ্তি সুহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দশকুমারচরিত গ্রন্থে দামলিপ্ত (তাম্রলিপ্ত) সুহ্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হওয়াই স্বাভাবিক; উভয়েই গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমান্ত সংলগ্ন দেশ, এবং তাম্রলিপ্তিই যথার্থত সমুদ্রতীরবর্তী তালীবনশ্যাম ভূখণ্ড বলিয়া বর্ণিত হওয়া যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলে, বঙ্গ গঙ্গাস্রোতের বামে বা পূর্বদিকে হওয়া উচিত; আমার মনে হয়, 'গঙ্গা-স্রোতোঽন্তরেষু' বলিয়া কালিদাস গঙ্গাস্রোতের অপর দিকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন; অন্তরেষু অর্থাৎ পার হইয়া। পরবর্তী সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণে গঙ্গা-ভাগীরথীই যে বঙ্গের পশ্চিম সীমা, এই ইঙ্গিত বারবার পাওয়া যায়। বঙ্গ জয়ের পর রঘু আবার পশ্চিমদিকে ফিরিয়া সুহ্মের ভিতর দিয়া, কপিশা পার হইয়া উৎকল-কলিঙ্গে গিয়াছিলেন।

বঙ্গের পশ্চিম সীমা

বৃহৎসংহিতায় উপবঙ্গ নামে একটি জনপদের উল্লেখ আছে। আনুমানিক ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে রচিত দিগ্বিজয়-প্রকাশ নামক গ্রন্থে উপবঙ্গ বলিতে যশোর ও তৎসংলগ্ন

কয়েকটি কাননময় অঞ্চলের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে (উপবঙ্গে যশোরাদ্যাঃ দেশাঃ কাননসংযুক্তাঃ)। মনোরথপুরণি এবং অপদান নামক পালি বৌদ্ধগ্রন্থে বঙ্গান্তপুত্ত এবং বঙ্গীশ এই দুইটি অভিধা হইতে মনে হয়, বঙ্গ শব্দটির সঙ্গে এই দুইটি অভিধার কোনও প্রকার যোগ ছিল, কিন্তু তাহাতে বঙ্গ, উপবঙ্গ, বঙ্গান্ত দেশের অবস্থিতির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রবঙ্গ নামে আর একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রবঙ্গ পরবর্তী কালের অনুত্তর বঙ্গ বা দক্ষিণ-বঙ্গের মত বঙ্গেরই একটি অংশ; কিন্তু ইহারও অবস্থিতি সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত আমাদের জানা নাই।

উপবঙ্গ
বঙ্গ ও প্রবঙ্গ
অনুত্তর বঙ্গ

গুপ্ত আমলে বঙ্গের দুইটি বিভাগ ছিল বলিয়া মনে হয়। সমাচারদেবের ঘুগ্রাহাটি লিপিতে দেখিতেছি, সুবর্ণবীথিতে একজন উপরিকের শাসনকেন্দ্র ছিল। এই সুবর্ণবীথি নব্যাবকাশিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। নব্যাবকাশিকা যে ঢাকা-ফরিদপুর অঞ্চলের (ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের) নবগঠিত ভূমি তাহা তো আগেই বলিয়াছি। ঢাকা জেলার বর্তমান সুবর্ণগ্রাম (সোনার গাঁ), সোনারং, সোনাকান্দি প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে প্রাচীন সুবর্ণবীথির একটি অর্থগত যোগ আছে, এ-অনুমান বোধ হয় সংগত। সুবর্ণবীথির অন্তর্গত ছিল বারকমণ্ডল, এবং লিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে বারকমণ্ডল ছিল প্রাক্-সমুদ্রশায়ী। বারকমণ্ডল-মধ্যবর্তী ঞ্চ-বিলাটি বর্তমান ফরিদপুর সহরের নিকটবর্তী ধুলট।

পাল ও সেন আমলে বঙ্গ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া বারবার বলা হইয়াছে, কিন্তু গুপ্ত আমলে বঙ্গ এবং পুণ্ড্রবর্ধন দুই পৃথক রাষ্ট্রবিভাগে ছিল বলিয়া মনে হয়।

পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতে বঙ্গের উল্লেখ বারবার পাওয়া যায়। প্রতিহার-রাজ ভোজদেবের গওআলিয়র প্রশস্তিতে দ্বিতীয় নাগভট কর্তৃক বঙ্গপতি (ধর্মপাল) এবং বৃহদ্বঙ্গদিগকে (বৃহদ্বঙ্গান্) পরাভূত করিবার কথা উল্লিখিত আছে (নবম শতক)। পালরাজ রামপালের মন্ত্রীপুত্র, কুমারপালের প্রধানামাত্য বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে (একাদশ শতক) অনুত্তর-বঙ্গের সমরবিজয়-ব্যাপারের উল্লেখ আছে; সেই প্রসঙ্গে "নৌবাটহীহীরব" এবং "কিঙ্কোৎ-পাতুক-কেনিপাত-পতন-প্রোত্সর্পিতৈঃ শীকরৈঃ" পদ দুইটির উল্লেখ হইতে অনুত্তর-বঙ্গ যে দক্ষিণ-বঙ্গ এ-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। মনে হয়, একাদশ শতকের শেষাশেষি বঙ্গের দুইটি বিভাগ কল্পিত হইয়াছিল: একটি বঙ্গের উত্তরাঞ্চল, আর একটি অনুত্তর বা বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল। অনুমান হয়, বঙ্গের উত্তরাঞ্চলের উত্তর সীমা ছিল পদ্মা এবং সমুদ্রশায়ী খালনালা সমাকীর্ণ দক্ষিণাঞ্চল ছিল অনুত্তর-বঙ্গ। অথবা, এমনও হইতে পারে, অনুত্তর-বঙ্গ কোনও বিশিষ্ট স্থানের নাম (proper name) নয়, দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলের বর্ণনাত্মক নাম মাত্র। যাহাই হউক, কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন এই দুই সেনরাজদের আমলে বঙ্গের অন্তত দুইটি বিভাগের নাম পাওয়া যাইতেছে; একটি বিক্রমপুর-ভাগ, অপরটি নাব্য (ভাগ) বা নাব্য (?)

মণ্ডল। চন্দ্র ও সেন রাজাদের অনেক লিপিই তো বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে উৎসারিত। কেশবসেনের ইদিলপুর লিপি ও বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া লিপিতে বিক্রমপুর-ভাগ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদ লিপিতে পাইতেছি নাব্যভাগের উল্লেখ; তাহাও পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির বঙ্গ-বিভাগের অন্তর্গত, এবং সেই পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির এবং নাব্যভাগের পূর্বতম সীমায় সমুদ্র, তাহা সাহিত্য-পরিষদের লিপিটিতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই লিপিটির নাব্যভাগ অন্তর্গত রামসিদ্ধি পাটক বাখরগঞ্জ জেলার গৌর নদী অঞ্চলের একটি গ্রাম। চন্দ্ররাজ শ্রীচন্দ্রের রামপাল-পট্টোলীর নাব্যমণ্ডল এবং তদন্তর্ভুক্ত নেহকাষ্ঠি যথাক্রমে নাব্যমণ্ডল এবং নৈকাঠি (বাখরগঞ্জ জেলা) হওয়াও কিছুই বিচিত্র নয়। এই প্রসঙ্গে ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের ফরিদপুর লিপির নব্যাবকাশিকার সঙ্গে নাব্যের সম্ভাব্য সম্বন্ধেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাহাই হউক, এই সব লিপিপ্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে, বাখরগঞ্জ জেলা এবং আরও পূর্বদিকে সমুদ্র পর্যন্ত অঞ্চল সমস্তটাই নাব্য নামে পরিচিত হইয়াছিল; এবং বর্তমান বিক্রমপুর পরগণা সমগ্র এবং ইদিলপুর পরগণার কিয়দংশ লইয়া ছিল বিক্রমপুর-ভাগ (কেশবসেনের ইদিলপুর লিপি)। সেন লিপিতে বঙ্গ তো শুধু বঙ্গ নয়, সে যে "মধুক্ষীরক বঙ্গ"—প্রচুর পয়ঃ যে দেশে সে-দেশকে কবি মধুক্ষীরক বলিবেন আশ্চর্য কি?

বঙ্গের অবস্থিতি সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন-কামসূত্রের টীকাকার যশোধর তাঁহার জয়মঙ্গল নামীয় টীকায় বলিতেছেন: "বঙ্গা লৌহিত্যাৎ পূর্বেন" অর্থাৎ বঙ্গ লৌহিত্যের পূর্বদিকে। যশোধরের এই উক্তি বিশ্বাস করা কঠিন। প্রথমত, প্রাচ্য দেশগুলি সম্বন্ধে যশোধরের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, কতকগুলি অত্যন্ত মারাত্মক রকমের ভুল তাঁহার টীকায় দেখা যায় এবং সেগুলি ইতিপূর্বেই পণ্ডিতদের লক্ষ্যগোচর হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইতিপূর্বেই আমরা দেখিয়াছি, সমস্ত বিক্রমপুর পরগণা এবং ফরিদপুর-বাখরগঞ্জেরও কিয়দংশ বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই সমস্ত ভূখণ্ডই ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিকে। বর্তমান যমুনাও যদি ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীনতর কোনও প্রবাহপথ হইয়া থাকে তাহা হইলেও ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ প্রাচীন বঙ্গ বহির্ভূত হইয়া পড়ে। কাজেই যশোধরের উক্তি অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়।

কোষকার হেমচন্দ্র তাঁহার অভিধান-চিন্তামণিতে (দ্বাদশ শতক) বঙ্গ ও হরিকেলি জনপদ এক ও সমার্থক বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন; "চম্পাস্তু অঙ্গা বঙ্গাস্তু হরিকেলিয়াঃ"। প্রাচ্যদেশের পূর্বতম সীমায় হরিকেল নামক দুই চীন পরিব্রাজকের (সপ্তম শতক) বিবরণীতে। আনুমানিক অষ্টম শতকে রচিত আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল তিনটি স্ব-স্বতন্ত্র কিন্তু প্রতিবেশী জনপদ বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এই তিনটি জনপদেই অসুর বুলি প্রচলিত ছিল, তাহাও বলা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য (ম্য) এবং রূপচিন্তামোণিকোষ (রূপচিন্তামণিকোষ; পঞ্চদশ শতক) নামক দুইটি

হরিকেল
হরিকেলি
হরিকোলা

পাণ্ডুলিপিতে শ্রীহট্ট এবং হরিকোলা নামক জনপদ দুইটিকে এক এবং সমার্থক বলা হইয়াছে। রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী-গ্রন্থে (নবম শতক) হরিকেলি জনপদের নারীদের খুব স্তুতিবাদ করা হইয়াছে, এবং তাহারা পূর্বদেশবাসিনী তাহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ডাকার্ণব-গ্রন্থে বর্ণিত চৌষট্টিটি তান্ত্রিক পীঠের একটি পীঠ হরিকেস, এবং এই হরিকেল টিক্কর, খাড়ি, রাঢ় এবং বঙ্গাল দেশ হইতে পৃথক। হরিকেল দেশে বৌদ্ধ দেবতা লোকনাথের একটি মন্দিরও বোধ হয় ছিল। টিক্কর রামচরিত কাব্যের ঢেক্করীয়—ঢেকুরী, কাটোয়ার কাছে, বর্ধমান জেলায়। শ্রীচন্দ্রের রামপাল-লিপিতে শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্র দেবকে আগে হরিকেল এবং পরে চন্দ্রদ্বীপেরও (বাখরগঞ্জ) রাজা বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অনুমান হয়, হরিকেল চন্দ্রদ্বীপ বা বাখরগঞ্জ অঞ্চলের সংলগ্ন ছিল। কান্তিদেবের চট্টগ্রাম লিপিতে হরিকেলকে একটি মণ্ডল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সব সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে মনে হয়, হরিকেল সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গ (চন্দ্রদ্বীপও বঙ্গে) এবং সমতটের সংলগ্ন কিন্তু স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, কিন্তু ত্রৈলোক্যচন্দ্রের চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের পর হইতেই হরিকেলকে মোটামুটি বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করা হয়। ডাকার্ণব এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি দুইটির সাক্ষ্য একত্র করিলে হরিকেল বা হরিকোলা যে শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা স্বীকার করিতে আপত্তি হইবার কারণ নাই। শ্রীহট্ট চৌষট্টি তান্ত্রিক পীঠের অন্যতম পীঠ। দ্বাদশ শতকে গুজরাতে বসিয়া হেমচন্দ্র যখন তাঁহার অভিধান লিখিতেছিলেন তখন তাঁহার পক্ষে বঙ্গ এবং হরিকেল সমার্থক বলা হয়তো খুব অন্যায় হয় নাই। তাহা ছাড়া, তাঁহার উক্তি একটু শিথিলভাবেই প্রযোজ্য; কারণ, চম্পা অঙ্গদেশের একটি অংশ মাত্র, অবশ্য কেন্দ্রীয় অংশ, অথচ তিনি বলিতেছেন, "চম্পাস্তু অঙ্গাঃ"। হরিকেলও সেই হিসাবে বঙ্গের অংশ মাত্র, অবশ্যই রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেবের রাজ্যের আদিকেন্দ্র; সে-ক্ষেত্রেও তিনি বলিতেছেন, "বঙ্গাস্তু হরিকেলিয়াঃ"। একটু শিথিলভাবে বলা, সন্দেহ কি?

এইমাত্র আমরা শ্রীচন্দ্রের রামপাল-লিপিতে ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেবের প্রসঙ্গে চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ দেখিয়াছি (দশম-একাদশ শতক)। ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দের একটি পাণ্ডুলিপিতেও চন্দ্রদ্বীপের তারা মূর্তি ও মন্দিরের ইঙ্গিত আছে। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদ-লিপিতেও বোধ হয় [চ]ন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ আছে (ত্রয়োদশ শতক); এই চন্দ্রদ্বীপের ঘাঘরকাট্টি পাটক নিশ্চয়ই ঘাঘর নদীর তীরবর্তী ঘাঘরকাটি নামক কোনও গ্রাম (বরিশাল জেলার ঝালকাটি প্রভৃতি কাটি-পদান্ত নাম লক্ষণীয়); এই ঘাঘর নদীর তীরেই ফুল্লশ্রী গ্রামে মনসার পাঁচালীর কবি বিজয়গুপ্তের (পঞ্চদশ শতক) বাসভূমি ছিল।

চন্দ্রদ্বীপ

"পশ্চিমে ঘাগর নদী পূবে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত-নগর॥

স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়॥"

মধ্যযুগে চন্দ্রদ্বীপ সুপ্রসিদ্ধ স্থান। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের বাক্‌লা পরগণার বাক্‌লা সরকার (বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলার) আর চন্দ্রদ্বীপ একই স্থান বলিয়া বহুদিনই স্বীকৃত হইয়াছে। এই চন্দ্রদ্বীপ বা বাখরগঞ্জ অঞ্চল যে অন্তত ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা তো আগেই দেখিয়াছি।

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে (চতুর্থ শতক) ডবাক-নেপাল-কর্তৃপুর-কামরূপের সঙ্গে, এবং বরাহমিহিরের (ষষ্ঠ শতক) বৃহৎ-সংহিতায় পুণ্ড্র-তাম্রলিপ্তক-বর্ধমান-বঙ্গের সঙ্গে সমতট নামে একটি জনপদের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যাইতেছে।

সমতট

সপ্তম শতকে য়ুয়ান চোয়াঙের বিবরণী পাঠে মনে হয়, সমতট ছিল কামরূপের দক্ষিণে। এই শতকেরই শেষাশেষি ইৎসিঙ্ সমতটে রাজভট নামে এক রাজার উল্লেখ করিতেছেন; রাজভট এবং আস্রফপুর পট্টোলীর (সপ্তম শতক) রাজরাজভট্ট একই ব্যক্তি বলিয়া বহুদিন পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত হইয়াছেন। রাজরাজভট্টের অন্যতম রাজধানী ছিল কর্মান্ত বা ত্রিপুরা জেলার বড়কাম্‌তা। য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণী পাঠে মনে হয় মধ্য-বাংলার অন্তত কিয়দংশ এই সমতটের অংশ ছিল। অথচ, বর্তমান ত্রিপুরাও যে সমতটেরই অংশ ছিল, সপ্তম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতক পর্যন্ত, তাহা অনস্বীকার্য; এ-সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ সুপ্রচুর। সপ্তম শতকের কথা বলিয়াছি। দশম শতকে প্রথম মহীপালের রাজত্বের তৃতীয় সম্বৎসরে নির্মিত এবং ত্রিপুরা জেলার বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত মূর্তিলিপি, আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতকের একটি চিত্রিত পাণ্ডুলিপিতে "চম্পিতলা লোকনাথ সমতটে অরিষষ্টান"-উক্তি (চম্পিতলা বর্তমান ত্রিপুরায়), ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দের দামোদরদেবের অপ্রকাশিত মেহার পট্টোলী ইত্যাদি সাক্ষ্যের ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, ত্রিপুরা জেলাই ছিল সমতটের প্রধান কেন্দ্র। এই কেন্দ্রস্থলটি যে একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত পট্টিকেরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে

পট্টিকেরা

অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার একটি পাণ্ডুলিপিতে (১০১৫ খ্রীষ্টাব্দ; চুণ্ডা দেবীর ছবির নিচে "পট্টিকেরে চুণ্ডাবর ভবনে চুণ্ডা"-পরিচয় দ্রষ্টব্য; এই চুণ্ডাবর ভবন ও চুণ্ডাদেবীর সঙ্গে বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার চুণ্টা গ্রামের একটু যোগ আছে বলিয়া মনে হইতেছে), ব্রহ্মদেশীয় রাজবৃত্ত হ্‌মনান্ গ্রন্থে, এবং ১২২০ খ্রীষ্টাব্দের রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকাল দেবের একটি লিপিতে। কিন্তু, অন্তত দ্বাদশ শতকে সমতটের পশ্চিম সীমা বোধ হয় মধ্য-বঙ্গ অতিক্রম করিয়া একেবারে বর্তমান চব্বিশ-

...বনগার খাড় পরগণা (প্রাচীন খাড়ি মণ্ডল) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিজয়সেনের বারাকপুর পাট্টোলীতে দেখিতেছি, খাড়ি মণ্ডলের ভূমির পরিমাপ করা হইতেছে "সমতটীয় নলেন"। সেন লিপিগুলিতে ভূমিপরিমাপের যে-অভ্যাসের পরিচয় আমরা পাই তাহাতে মনে হয়, যে-ভূখণ্ড যে-জনপদের অন্তর্ভুক্ত সেই জনপদে ব্যবহৃত নলেই ভূখণ্ডের পরিমাপ করা হইত। সেইজন্য মনে হয়, খাড়ি মণ্ডল তখন সমতটেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরূপ হওয়া কিছুতেই *অস্বাভাবিক নয়, অসম্ভব তো নয়ই। সমতটের অর্থই হইতেছে তটের সঙ্গে যাহা সমান, অর্থাৎ সমুদ্রশায়ী নিম্নদেশ।* গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীর হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে মেঘনা-মোহানা পর্যন্ত সমুদ্রশায়ী ভূখণ্ডকেই বোধ হয় বলা হইত সমতট, মুসলমান ঐতিহাসিকদের এবং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ভাটি, তারানাথের বাটি। যাহা হউক ত্রিপুরা ও মধ্য-বঙ্গ যে বঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত তাহা তো আমরা আগেই দেখিয়াছি।

নারায়ণপালদেবের ভাগলপুর শাসনে সংসমতটজন্মা শুভদাসপুত্র শ্রীমান সংখদাস নামে এক শিল্পীর উল্লেখ আছে ; সংসমতট কোন্ জায়গা তাহা নির্ণয় করা কঠিন, তবে নিশ্চয়ই সমতট-সংপৃক্ত কোনও স্থান।

একাদশ শতক হইতে প্রাচীন বঙ্গের একটি বিভাগের নূতন একটি নাম পাইতেছি, বঙ্গাল। বিজ্জল কলচুর্যের অবলুর লিপি, রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপি এবং আরও কয়েকটি দক্ষিণী লিপিতে প্রথম বঙ্গাল দেশের নামের উল্লেখ দেখিতেছি। অবলুর লিপি

বঙ্গাল

এবং আরও অন্তত দু'টি দক্ষিণী লিপিতে বঙ্গ ও বঙ্গাল দুটি জনপদই একই সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। এ-অনুমান স্বাভাবিক যে, বঙ্গ ও বঙ্গাল একাদশ শতকে দুই পৃথক জনপদ ছিল। পরেও ইহাদের পৃথকভাবেই গণ্য করা হইত। নয়চন্দ্র সূরীর হাম্মির মহাকাব্য (পঞ্চদশ শতক) এবং সাম্‌শ্-ই-সিরাজ' আফিফ্-র তারিখ-ই-ফিরুজসাহী গ্রন্থেও এই দুই জনপদকে পৃথক ভাবে গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু, এই একাদশ শতকেরই রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপি পাঠে মনে হয়, চোল সৈন্য দণ্ডভুক্তি (তাম্রলিপ্তি অঞ্চল, বর্তমান দাঁতন) ও তক্কণ লাঢ় (দক্ষিণ-রাঢ়) জয় করিবার পর বঙ্গাল দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পলায়নপর করেন; বঙ্গের কোনও উল্লেখ এই লিপিতে নাই। স্বতঃই অনুমান হয়, দক্ষিণ-রাঢ়ের পরই ছিল বঙ্গাল দেশ, এবং দুই দেশের মধ্যসীমা ছিল বোধ হয় গঙ্গা-ভাগীরথী। রাজা গোবিন্দচন্দ্র যে-বংশের রাজা সেই বংশ যে হরিকেল-ত্রিপুরা-চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি ছিলেন, এ তথ্য ঐতিহাসিকদের কাছে সুবিদিত। বিক্রমপুর অঞ্চলেও গোবিন্দচন্দ্রের অন্তত দুইটি লিপিপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে এবং এই অঞ্চলও গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যভুক্ত ছিল। দেখা যাইতেছে, একাদশ শতকে বঙ্গালদেশ বলিতে প্রায় সমস্ত পূর্ব-বঙ্গ এবং দক্ষিণ-বঙ্গের সমুদ্রতটশায়ী সমস্ত দেশখণ্ডকেই বুঝাইত। ইহার সম্পূর্ণ না হউক কতক অংশকে যে সমতট বলা হইত, তাহা তো আগেই দেখিয়াছি। চন্দ্রদ্বীপ-হরিকেলও তখন বঙ্গাল দেশেরই অংশ। দ্বাদশ শতকে না হউক, ত্রয়োদশ শতকে এই সব অংশই

আবার বঙ্গের বিক্রমপুর এবং নাব্যভাগের অন্তর্গত। মাণিকচন্দ্র রাজার গানের "ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি" পদে অনুমান হয়, ভাটি ও বঙ্গাল বা বাঙ্গাল দেশ এক সময়ে প্রায় সমার্থকই ছিল। কিন্তু বঙ্গাল বা বাঙ্গাল দেশের কেন্দ্রস্থান বোধ হয় ছিল পূর্ব-বঙ্গে। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদ-লিপিতে রামসিদ্ধি পাটকের দক্ষিণে বাঙ্গালবড়া নামে একখণ্ড ভূমির উল্লেখ আছে। রামসিদ্ধি পাটক যে বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলার গৌরনদী অঞ্চলের একটি গ্রাম তাহা এখন স্বীকৃত এবং আগেই তাহা উল্লেখও করিয়াছি। বাঙ্গালবড়াও বাখরগঞ্জ জেলার কোনও স্থান হওয়াই স্বাভাবিক। Gastaldiর (১৫৬১) নকশায় Bengalaর অবস্থিতি যেন এই অঞ্চলেই দেখান হইয়াছে; কিন্তু ষোড়শ শতক হইতে যত নকশা প্রায় প্রত্যেকটিতেই দেখিতেছি Bengalaর অবস্থান আরও পূর্বদিকে। এই Bengala-বন্দর যে কোন্ বন্দর তাহা বলা কঠিন; কেহ বলেন চট্টগ্রাম, কেহ বলেন প্রাচীন ঢাকা। ঢাকা সহরে বাঙ্গালা-বাজার এখনও প্রসিদ্ধ পল্লী ও বাজার; বাঙ্গালা-বাজার মধ্যযুগীয় Bengala-বন্দরের স্মৃতি বহন করা অসম্ভব নয়। সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে (সংকলন কাল ১২০৬; সংকলন-কর্তা শ্রীধর দাস) জনৈক অজ্ঞাতনামা বঙ্গাল—বাঙ্গাল—পূর্ববঙ্গীয় কবির রচিত একটি গঙ্গাস্তোত্র স্থান পাইয়াছে। এই কবি নিজের বাণীকে গঙ্গার সহিত উপমিত করিয়াছেন। উপমা-চাতুর্যে স্তোত্রটি এত সুন্দর যে, বঙ্গ-বাঙ্গাল প্রসঙ্গে ইহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করা কঠিন :

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিম-সুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গাল-বাণী চ॥—বঙ্গালস্য। (সদুক্তি, ৫।৩১।২)

পুণ্ড্র

পুণ্ড্র জনদের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, এবং তারপরে বোধায়ন ধর্মসূত্রে। প্রথমোক্ত গ্রন্থের মতে ইহারা আর্যভূমির প্রাচ্য-প্রত্যন্তদেশের দস্যু কোমদের অন্যতম; দ্বিতীয় গ্রন্থের মতে ইহারা সংকীর্ণযোনি, অপবিত্র; বঙ্গ এবং কলিঙ্গজনদের ইহারা প্রতিবেশী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেপ-আখ্যানের এই উল্লেখে দেখা যায়, পুণ্ড্ররা অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ ও মূতিব কোমদের সংলগ্ন এবং আত্মীয় কোম। এই ধরনের একটি গল্প মহাভারতের আদিপর্বে আছে, একাধিক পুরাণেও আছে; সেখানে কিন্তু পুণ্ড্ররা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং সুহ্মদের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি। মানবধর্মশাস্ত্রে পুণ্ড্রদের বলা হইয়াছে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, যদিও মহাভারতের সভাপর্বে বঙ্গ ও পুণ্ড্র উভয় কোমকেই শুদ্ধজাত ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কর্ণ, কৃষ্ণ এবং ভীমের যুদ্ধ এবং দিগ্বিজয় প্রসঙ্গেও মহাভারতে পুণ্ড্রকোমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণ সুহ্ম, বঙ্গ এবং পুণ্ড্রদের পরাজিত করিয়াছিলেন এবং বঙ্গ ও অঙ্গকে একটি শাসন-বিষয়ে পরিণত করিয়া নিজে তাহার অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণও একবার বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, ভীমের দিগ্বিজয়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি মুদ্গগিরির (মুঙ্গের) রাজাকে নিহত করিয়া প্রতাপশালী পুণ্ড্ররাজ ও কোশী নদীর তীরবর্তী অন্য একজন ভূপালকে পরাভূত করেন, এবং তাহার পর বঙ্গরাজকে আক্রমণ

করেন। যাহাই হউক, উপরোক্ত উল্লেখগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে, পুণ্ড্রদের জনপদ অঙ্গ, বঙ্গ এবং সুহ্ম কোমদের জনপদের সংলগ্ন, এবং হয়তো ইহারা সকলেই একই নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, এই জনপদের অবস্থান মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরের পূর্বদিকে এবং কোশীতীর-সংলগ্ন। জৈনদের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ কল্পসূত্রে গোদাসগণ নামীয় জৈন সন্ন্যাসীদের তিন তিনটি শাখার উল্লেখ আছে: তাম্রলিপ্তি শাখা, কোটীবর্ষ শাখা, পুণ্ড্রবর্ধন শাখা। এই তিনটি শাখার নামই বাংলার দুইটি জনপদ এবং একটি নগর হইতে উদ্ভূত। কোটীবর্ষ পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ নগর। খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক দ্বিতীয় শতকের মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপিতে এক পুদনগল বা পুণ্ড্রনগরের উল্লেখ আছে। এই পুদনগলই বোধ হয় ছিল তদানীন্তন পুণ্ড্রর রাজধানী, বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থান, যাহার পুরাতন ধ্বংসাবশেষ ঘেঁষিয়া এখনও করতোয়ার ক্ষীণধারা বহমান। এই করতোয়ারই তীর্থমহিমা মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। লঘুভারতের কথায় "বৃহৎপরিসরা পুণ্যা করতোয়া মহানদী"।

এই সব প্রাচীন সাক্ষ্য পরবর্তী সাক্ষ্য দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে। ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ড্র পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হইয়াছে, এবং গুপ্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান ভুক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ধনাইদহ, বৈগ্রাম, পাহাড়পুর এবং দামোদরপুর তাম্রপট্টোলী কয়টিতে এবং য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণে এই পুণ্ড্রবর্ধন নামই পাওয়া যাইতেছে। উপরোক্ত পট্টোলীগুলিতে উল্লিখিত বিভিন্ন স্থানের নাম হইতে এ-তথ্য আজ নিঃসংশয় যে, তদানীন্তন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি অন্তত বগুড়া-দিনাজপুর এবং রাজসাহী জেলা জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। মোটামুটি সমস্ত উত্তর-বঙ্গই বোধ হয় ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের অধীন, একেবারে রাজমহল-গঙ্গা-ভাগীরথী তীর হইতে আরম্ভ করিয়া করতোয়া পর্যন্ত। কারণ, য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ কজঙ্গল হইতে আসিয়াছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনে এবং করতোয়া পার হইয়া গিয়াছিলেন কামরূপ। কজঙ্গল এবং করতোয়া মধ্যবর্তী ভূভাগই তাহা হইলে পুণ্ড্রবর্ধন; উত্তরে "হিমবচ্ছিখর"; দক্ষিণে সীমা কালে কালে বিভিন্ন।

পুণ্ড্রবর্ধন

পরবর্তী কালে পৌণ্ড্রভুক্তি, পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির রাষ্ট্রসীমা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই গিয়াছে। ধর্মপালের (অষ্টম শতক) খালিমপুর লিপিতেই দেখিতেছি পুণ্ড্রবর্ধনান্তর্গত ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলের উল্লেখ। এই ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল যে দক্ষিণ-সমুদ্রতীরবর্তী ব্যাঘ্রাধ্যুষিত বনময় প্রদেশ হওয়া অসম্ভব নয়, সে-কথা আগেই বলিয়াছি। সেন আমলে দেখিতেছি পুণ্ড্রবর্ধনের দক্ষিণতম সীমা পশ্চিম দিকে খাড়িবিষয়—খাড়িমণ্ডল (বর্তমান খাড়ি পরগণা, ২৪ পরগণা), অন্যদিকে ঢাকা-বাখরগঞ্জের সমুদ্রতীর পর্যন্ত। বঙ্গের নাব্য এবং বিক্রমপুর ভাগও তখন পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত। সদ্যোক্ত খাড়ি নিশ্চয়ই ভাগীরথীর পূর্ব-তীরের (পূর্ব)-খাড়ি বা ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ডোম্মনপালের পট্টোলীর পূর্ব-খাটিকা। কারণ, লক্ষণসেনের গোবিন্দপুর পট্টোলীতে পশ্চিম-খাটিকার উল্লেখ পাইতেছি;

এই পশ্চিম-খাটিকা বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে। রাঢ় দেশের কোনও অঞ্চল বোধ হয় কখনও পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। পশ্চিম-খাটিকার অন্তর্গত বেতড্ডচতুরক বর্তমান হাওড়া জেলার বেতড়ে পরিণত হইয়াছে। বেতড় ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে।

পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্র বা হৃদয়স্থানের একটি নূতন নাম পাইতেছি দশম শতক হইতে; এই নাম বরেন্দ্র অথবা বরেন্দ্রী। ৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি দক্ষিণী লিপিতে "বারেন্দ্রদ্যুতি-কারিণ" এবং "গৌড়চূড়ামণি" জনৈক ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রসিদ্ধতম উল্লেখ সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত কাব্যের কবি-প্রশস্তিতে, এবং গয়াড়তুঙ্গদেবের তালচের পট্টোলীতে। কবি সন্ধ্যাকর বরেন্দ্রীকে পালরাজাদের জনকভূ অর্থাৎ পিতৃভূমি বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, এবং গঙ্গা-করতোয়ার মধ্যে ইহার অবস্থিতি নির্দেশ করিয়াছেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে বরেন্দ্রীর উল্লেখ আছে; কিন্তু সিলিমপুর, তর্পণদীঘি এবং মাধাইনগর পট্টোলী তিনটিতে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, বরেন্দ্রী পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেন-রাজাদের পট্টোলীগুলিতে বরেন্দ্রীর অন্তর্গত স্থানগুলির অবস্থিতি হইতে এ-অনুমান নিঃসংশয়ে করা যায় যে, বর্তমান বগুড়া-দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলা, এবং হয়তো পাবনাও (পদুবম্বা ?) প্রাচীন বরেন্দ্রীর বর্তমান প্রতিনিধি। বরেন্দ্রীই মধ্যযুগীয় মুসলমান ঐতিহাসিকদের বরিন্দ্, তবে বরিন্দ্ প্রাচীন বরেন্দ্রী অপেক্ষা সংকীর্ণতর বলিয়া মনে হয়। তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে বরিন্দকে গঙ্গার পূর্ব-তীরবর্তী এবং লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের একটি অংশ মাত্র বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থের মতে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের দুই বিভাগ গঙ্গার দুই তীরে; পশ্চিমে রাল্ (= রাঢ), পূর্বে বরিন্দ্ (= বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্র)। প্রাচীন বাংলার আর একটি বিভাগে লক্ষ্মণসেনের বংশধরেরা তখনও (অর্থাৎ, ১২৪২-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মিনহাজের লক্ষ্মণাবতী প্রবাস-কালে) রাজত্ব করিতেছিলেন; এই বিভাগটির নাম বঙ্গ্ (= বঙ্গ)। যাহা হউক, মধ্যযুগীয় সাহিত্য, ইতিহাস এবং কুলজী গ্রন্থে বরেন্দ্র-বরেন্দ্রীর উল্লেখ প্রচুর; লোকস্মৃতিতেও বরেন্দ্রী এবং বরেন্দ্রীর ঐতিহ্য বরাবর জাগরূক ছিল। ইহাদের ইঙ্গিতেও বরেন্দ্রী উত্তর-বঙ্গের কেন্দ্রস্থলে।

বরেন্দ্র
বরেন্দ্রী

রাঢ়া জনপদের প্রাচীনতম উল্লেখ পাইতেছি প্রাচীন জৈনগ্রন্থ আয়ারাঙ্গ বা আচারাঙ্গ সূত্রে। মহাবীর তাঁহার কয়েকজন শিষ্যসহ রাঢ়া জনপদে আসিয়াছিলেন ধর্মপ্রচারের জন্য (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক); এই জনপদ তখন পথবিহীন, আচারবিহীন, এবং লোকেরাও একটু নিষ্ঠুর ও রূঢ় প্রকৃতির। তাঁহারা এই সব অহিংস যতিদের পেছনে কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল। জৈন প্রজ্ঞাপনা গ্রন্থে রাঢ় ও বঙ্গজনদের একত্র গ্রথিত করিয়া উভয়কেই আর্য বলা হইয়াছে। কোড়ীবর্ষ (বা পরবর্তী কোটীবর্ষ) ছিল তাহাদের রাজধানী। কোটীবর্ষ দিনাজপুর জেলায়, এবং দামোদরপুর পট্টোলীর (পঞ্চম-ষষ্ঠ

রাঢ়া

শতক) মতে কোটীবর্ষ পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ; পাল আমলেও তাহাই। আচারাঙ্গ সূত্রে রাঢ়া জনপদের দুইটি বিভাগ : বজ্‌জ বা বজ্রভূমি, সুব্‌ভ বা সুহ্মভূমি। বজ্‌জভূমিতে জৈন সন্ন্যাসীদের অপরিকৃত নিকৃষ্ট খাদ্য খাইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছিল। সিংহলী পালিগ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশ-কথিত বিজয়সিংহের কাহিনী সুবিদিত। বঙ্গরাজ সীহবাহু (সিংহবাহু) লাড়দেশে সীহপুর নামে এক নগরের পত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া এই কাহিনীতে উল্লিখিত আছে। কেহ কেহ বলেন, এই লাড়দেশ কাথিয়াবাড় অঞ্চলের প্রাচীন লাটদেশ, এবং সীহপুর বর্তমান সীহোর। কাহারও মতে লাড়দেশ প্রাচীন লাঢ় বা রাঢ় জনপদ এবং সীহপুর বর্তমান হুগলী জেলার সিঙ্গুর। সীহবাহু লাড়দেশে নগর পত্তন করিবার সময় বঙ্গ জনপদেরই রাজা ছিলেন। বঙ্গের সঙ্গে লাড়ের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং নৈকট্য দেখিয়া মনে হয়, লাড়দেশ বঙ্গের সংলগ্ন রাঢ়দেশ হওয়া অসম্ভব নয়। রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী-গ্রন্থে রাঢ়া জনপদের সৌন্দর্যের উল্লেখ আছে; হলায়ুধের অভিধান-গ্রন্থেও অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাঢ় জনপদের দুইটি বিভাগের মধ্যে সুব্‌ভ—সুহ্মবিভাগ সমধিক প্রসিদ্ধ এবং সম্ভবত প্রাচীনতর। সুহ্ম জনদের উল্লেখ আছে মহাভারতে কর্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে।

সুহ্মভূমি

কর্ণদেব সুহ্ম, পুণ্ড্র ও বঙ্গজনদের যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গেও ভীম কর্তৃক মুদ্গগিরি, পুণ্ড্র, বঙ্গ, তাম্রলিপ্তি, এবং সুহ্ম জন ও রাজাদের পরাজয়ের কথা আছে। দশকুমার চরিত-গ্রন্থ কিন্তু সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তিকে পৃথক জনপদ বলিতেছে না, বরং তাম্রলিপ্তিকে সুহ্মের অন্তর্গত বলিয়া বলিতেছে। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে মহোদধির তালিবনশ্যামোপকণ্ঠে সুহ্মদের পরাজয়ের উল্লেখ আছে। এই শ্লোকদ্বয়ের অব্যবহিত পূর্বেই আর একটি শ্লোক আছে :

> স সেনা মহতীং কর্ষন্ পূর্বসাগর গামিনীম্।
> বভৌ হরজটাভ্রষ্টাং গঙ্গামিব ভাগীরথঃ॥ (৪।৩২)

এই শ্লোকটির ব্যঞ্জনা হইতে মনে হয়, রঘু গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূল বাহিয়া দক্ষিণ-সাগরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এবং ইহারই দক্ষিণ অংশের ভূভাগ সুহ্ম নামে পরিচিত ছিল। ধোয়ী কবির পবনদূতেও গঙ্গা-তীরবর্তী সুহ্মের উল্লেখ আছে এবং এই দেশে গঙ্গা-যমুনা সংগমে ত্রিবেণী অতিক্রম করিয়া লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বিজয়পুরের পথের ইঙ্গিত আছে। এই গঙ্গা-যমুনা সংগম ও ত্রিবেণী বর্তমান হুগলী জেলায়। এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে অনুমান করা চলে যে, গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী দক্ষিণতম ভূখণ্ড, অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলীর বহুলাংশ এবং হাবড়া জেলাই প্রাচীন সুহ্ম জনপদ; মোটামুটি ইহাই পরবর্তী কালের দক্ষিণ-রাঢ়। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ অবশ্য বলিতেছেন, সুহ্ম এবং রাঢ়া এক এবং সমার্থক। হয়তো কখনও সুহ্মজনপদের প্রভাবসীমা সমস্ত রাঢ়দেশেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, যেমন দশকুমারচরিত-মতে এক সময়

সেই প্রস্তাব তাম্রলিপ্তিতেও বিস্তৃত হইয়াছিল; কিন্তু সাধারণত সুহ্মভূমি রাঢ়াভূমির দক্ষিণতর অংশ বলিয়াই পরিচিত ছিল। বৌদ্ধ পালি গ্রন্থ সংযুক্ত-নিকায় এবং তেলপত্ত জাতকেও সুব্ভ বা সুহ্মজনদের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদের অবস্থিতির কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে সুহ্মজন এবং সমুদ্রশায়ী অন্যান্য ম্লেচ্ছদের সঙ্গে প্রসুহ্ম নামীয় আর একটি কোমের উল্লেখ আছে। প্রাচীন সাহিত্যে সুহ্ম জনপদের উল্লেখ বারবার পাওয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সুহ্মজন-সংপৃক্ত আর একটি কোমের নামও শোনা যায়, তাহার নাম ব্রহ্ম বা ব্রহ্মোত্তর। ব্রহ্মোত্তর খুব সম্ভব আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের বর্‌মহত্তর। কেহ কেহ মনে করেন ব্রহ্মোত্তর পাঠ যথার্থত সুহ্মোত্তর (সুহ্মের উত্তরে যে জনপদ) হওয়া উচিত। প্রসুহ্ম এবং সুহ্মোত্তর কোন্ জনপদ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই; তবে অনুমান হয়, দুইটি নামই একই জনপদের দ্যোতক, এবং এই জনপদটি সুহ্মজনপদের উত্তরে, আচারাঙ্গ সূত্রে যে ভূমিকে বলা হইয়াছে বজ্‌জ বা বজ্রভূমি, অর্থাৎ রাঢ়ের উত্তরাংশ। এই বজ্রভূমিই বোধহয় কাব্যমীমাংসা এবং পবনদূত-গ্রন্থের ব্রহ্ম (ভূমি) বা ব্রহ্মোত্তর (সমাসবদ্ধ ব্রহ্ম ও উত্তর) জনপদ। এই ব্রহ্ম যে রাঢ়েরই একটি অংশ তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় পবনদূতে; এই গ্রন্থে সুহ্ম ও ব্রহ্ম দু'টি জনপদই গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, ব্রহ্ম যে সুহ্মের উত্তরে এবং ত্রিবেণী সংগম এবং বিজয়পুর যে ব্রহ্মভূমিরই অন্তর্গত তাহাও বলা হইয়াছে। খুব সম্ভব মহাভারতের প্রসুহ্ম এই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মোত্তরেরই নামান্তর মাত্র। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ব্রহ্মোত্তর যদি সুহ্মোত্তরও হয় তাহা হইলে তাহারও অর্থ সুহ্মের উত্তরস্থ জনপদ অর্থাৎ যে-ভূমিকে কাব্যমীমাংসা ও পবনদূতে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম, আচারাঙ্গ সূত্রে বলা হইয়াছে বজ্র, পরবর্তী লিপিতে মোটামুটি ভাবে যে-দেশকে বলা হইয়াছে উত্তর-রাঢ়। যাহাই হউক, রাঢ় দেশে সুহ্ম জনপদের উত্তরে যে ব্রহ্ম নামে একটি জনপদ ছিল এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না।

প্রসুহ্ম সুহ্মোত্তর, ব্রহ্ম, ব্রহ্মোত্তর

বজ্‌জভূমি

দিগ্বিজয়-প্রকাশ গ্রন্থে (ষোড়শ শতক) রাঢ়দেশের দক্ষিণ সীমায় পাইতেছি দামোদর নদ—"দামোদরোত্তরভাগে···রাঢ়দেশঃ প্রকীর্তিতঃ"। হয়তো তখন তাম্রলিপ্ত জনপদের উত্তর সীমা ছিল দামোদর পর্যন্ত, কিন্তু পূর্ববর্তী সাক্ষ্য এবং লিপি প্রমাণ হইতে মনে হয়, রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা দামোদরের আরও দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। নবম-দশম শতক হইতেই রাঢ়ের দুইটি সুস্পষ্ট বিভাগ জানা যাইতেছে—উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়—প্রাচীনতর কালের মোটামুটি বজ্‌জ বা ব্রহ্মভূমি ও সুহ্মভূমি। রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে (একাদশ শতকের প্রথমপাদ) উত্তীর-লাঢ়ম (উত্তর-রাঢ়) এবং তক্কণ-লাঢম (দক্ষিণ-রাঢ়) নাম এক সঙ্গেই পাওয়া যাইতেছে।

উত্তর-রাঢ়

উত্তর-রাঢ়ের প্রথম উল্লেখ পাইতেছি আনুমানিক নবম শতকের গঙ্গরাজ দেবেন্দ্র বর্মণের একটি লিপিতে, এবং তারপর একাদশ শতকের রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে। রাজেন্দ্রচোলের সৈন্য ওড্ডবিষয় (উড়িষ্যা) এবং কোশলৈনাড়ু জয় করিয়া, পরে অধিকার করিলেন

> "Taṇḍabutti in whose gardens bees abounded...(land which he acquired) after having destroyed Dharmapāla (in) hot battle; Takkaṇalāḍam whose fame reached (all) directions, (and which he occupied) after having forcibly attacked Raṇasūra; Vaṅgāla-desa where the rain water never stopped, (and from which) Govindachandra fled, having descended (from his) male elephant; elephants of rare strength, women and treasure, (which he seized) after having pleased to frighten the strong Mahīpāla on the field of hot battle with the (noise of the) conches (got) from the deep sea, Uttiralāḍam (on the shore of) the expansive ocean (producing) pearls [অনুবাদান্তর: Uttiralāḍam, as rich in pearls as the ocean, কিংবা, Uttiralāḍam, close to the sea yielding pearls.] and the Gaṅgā whose waters bearing fragrant flowers dashed against the bathing places."

রাজা ভোজবর্মণের বেলাব লিপিতে উত্তর-রাঢ় এবং তদন্তর্গত সিদ্ধল গ্রামের উল্লেখ আছে। সিদ্ধল গ্রাম বর্তমান বীরভূমের অন্তর্গত সিধল গ্রাম। এই সিদ্ধল গ্রামই পণ্ডিত-মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের জন্মভূমি। তথাকথিত ভুবনেশ্বর লিপিতে ভবদেব ভট্ট তাঁহার জন্মভূমি সিদ্ধল গ্রামের কথা বলিয়াছেন, এবং রাঢ়ের এই অঞ্চল যে অজলা এবং জাঙ্গলময়, তাহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন। রাঢ়ের অজলা ও জাঙ্গলময় এই অঞ্চলে তিনি একটি দীঘি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বল্লালসেনের নৈহাটি পট্টোলীতেও উত্তর-রাঢ় এবং তদন্তর্গত বাল্লহিট্ঠা, জলসোথী, খাণ্ডয়িল্লা, অম্বয়িল্লা এবং মোলাদণ্ডী গ্রামের উল্লেখ আছে। বাল্লহিট্ঠা বর্তমান বর্ধমান জেলার প্রায় উত্তর সীমায় বালুটিয়া গ্রাম (কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত, নৈহাটির ছয় মাইল পশ্চিমে); জলসোথী মুর্শিদাবাদ জেলার জলসোথী গ্রাম (বালুটিয়ার উত্তরে); খাণ্ডয়িল্লা বর্তমান খারুলিয়া (জলসোথীর দক্ষিণে); অম্বয়িল্লা বর্তমান অম্বলগ্রাম, খারুলিয়ার পূর্ব-দক্ষিণে; মোলাদণ্ডী বর্তমান মুরুণ্ডি (খারুলিয়ার পশ্চিমে)। সব ক'টি গ্রামই বর্তমান বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ জেলার যোগসীমায়। নৈহাটি লিপি অনুসারে উত্তর-রাঢ় বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের আমলে দেখিতেছি উত্তর-রাঢ়মণ্ডল কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে; শক্তিপুর পট্টোলীতে এই খবর পাওয়া যাইতেছে। এই শাসনে উল্লিখিত উত্তর-রাঢ়মণ্ডলের অন্তর্গত যে-সব গ্রামের নাম পাওয়া যাইতেছে তাহাতে প্রমাণ হয় যে, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অনেকাংশ উত্তর-রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল। য়ুয়ান-চোয়াঙের কজঙ্গলও এই উত্তর-রাঢ়ে। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড অধ্যায়ে ভাগীরথীর পশ্চিমে রাঢ়ীখণ্ড

জাঙ্গল নামে এক জনপদ এবং তদন্তর্গত বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর, বীরভূমি প্রভৃতি স্থান এবং অজয় প্রভৃতি নদনদীর উল্লেখ আছে। এই রাঢ়ীখণ্ডজাঙ্গলও উত্তর-রাঢ়েরই অন্তর্গত বলিয়া মনে না করিবার কোনও কারণ নাই। অনুমান হয়, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কান্দি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম জেলা (সাঁওতালভূমি সহ) এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ, এই লইয়া উত্তর-রাঢ়। মোটামুটি অজয় নদী এই উত্তর-রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা এবং দক্ষিণ-রাঢ়ের উত্তর সীমা। উত্তর-রাঢ়ের উত্তর সীমা বোধ হয় কোনও সময় গঙ্গা পার হইয়া আরও উত্তরে বিস্তৃত ছিল। জৈন প্রজ্ঞাপনা গ্রন্থে কোড়ীবর্ষ বা কোটীবর্ষকে রাঢ়ের অন্তর্গত বলা হইয়াছে, তাহা আগেই উল্লেখ করিয়াছি; ইহারই যেন প্রতিধ্বনি শোনা যাইতেছে ভরতমল্লিকের চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থের "উত্তরগঙ্গ-রাঢ়াম" পদটিতে। কিন্তু, অকাট্য লিপি প্রমাণ এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থে গঙ্গা-ভাগীরথীই রাঢ়ের উত্তরতম সীমা, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তবকাত-ই-নাসিরী'র সাক্ষ্য উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দক্ষিণ-রাঢ়

রাজেন্দ্রচোলের সৈন্য ওড্ডবিষয় এবং কোশলৈনাডু (দক্ষিণ-কোশল) জয় করিয়া পরে তণ্ডবুত্তি (=দণ্ডভুক্তি=বর্তমান দাঁতন) অধিকার করিয়াছিলেন, এবং দণ্ডভুক্তির পরেই দক্ষিণ-রাঢ়। দেশগুলির ভৌগোলিক অবস্থিতি সুস্পষ্ট; দণ্ডভুক্তি এবং বঙ্গের মধ্যবর্তী জনপদ-রাষ্ট্রই দক্ষিণ-রাঢ় বা তক্কনলাঢ়ম্। দক্ষিণ-রাঢ়ের প্রাচীনতম উল্লেখ মিলিতেছে বাক্‌পতি মুঞ্জের একটি লিপিতে, এবং শ্রীধরাচার্যের ন্যায়কন্দলী গ্রন্থে (৯৯১-৯২)। ন্যায়কন্দলী গ্রন্থে আছে: আসীদ্দক্ষিণ-রাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাম। ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ॥ শ্রীধরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিপতি "গুণরত্নাভরণ কায়স্থকুলতিলক" পাণ্ডুদাস। এই পাণ্ডুদাসই পাণ্ডুভূমি-বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে (একাদশ-দ্বাদশ শতক) রাঢ়ের এবং একটি দক্ষিণী লিপিতে দক্ষিণ-রাঢ়ের উল্লেখ আছে; কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই এই জনপদটিকে গৌড় বা গৌড়দেশান্তর্গত বলা হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলান্তর্গত মান্ধাতা অঞ্চলের অমরেশ্বর মন্দিরের একটি লিপিতে, এবং মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও (১৫৯৩-৯৪) দক্ষিণ-রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীধর এবং কৃষ্ণমিশ্র দক্ষিণ-রাঢ়ের দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম করিতেছেন; ভূরিসৃষ্টি বা ভূরিশ্রেষ্ঠিক এবং নবগ্রাম; আর মুকুন্দরাম বলিতেছেন দামুন্যা গ্রামের কথা, যে-দামুন্যা বা দামিন্যা ছিল তাঁহার জন্মভূমি (শহর সেলিমাবাজ তাহাতে সজ্জনরাজ নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ। তাঁহার তালুকে বসি' দামিন্যায় চাষ চষি নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥) ভূরিসৃষ্টি বা ভূরিশ্রেষ্ঠিক (যেখানে ছিল অনেক শ্রেষ্ঠীর বাসস্থান—ভূরিশ্রেষ্ঠীজনাশ্রয়) বর্তমান হাওড়া জেলার ভুরস্থট (বা ভুরিশিট বা ভুরসিট) গ্রাম। নবগ্রাম বর্তমান হুগলী জেলায়, এবং দামুন্যা-দামিন্যা দামোদরের পশ্চিমে বর্তমান বর্ধমান জেলায়। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে

বর্তমান হাওড়া, এবং হুগলী ও বর্ধমানের অধিকাংশ দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তর্গত। দ্বাদশ শতকের উড়িষ্যার চোড়গঙ্গ রাজাদের আধিপত্য মিধুনপুর (নিঃসন্দেহে বর্তমান মেদিনীপুর) পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ গঙ্গাতীরে মন্দার-রাজকে পরাভূত করিয়া তাঁহার দুর্গনগর আরম্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। মিধুনপুর না হউক, মন্দার এবং আরম্য বোধ *হয় সেই সময় দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল। মন্দার নিঃসন্দেহে* বর্তমান মন্দারণ বা মদারণ, মধ্যযুগের সরকার মন্দারণ বা গড় মন্দারণ; এবং আরম্য বর্তমান আরামবাগ; দুইই বর্তমান হুগলী জেলায়।

রাঢ়দেশের দুইটি রাষ্ট্রবিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতকের মল্লসারুল লিপি, দশম শতকের ইর্দা লিপি, লক্ষ্মণসেনের নৈহাটি ও গোবিন্দপুর লিপিতে বর্ধমানভুক্তির সাক্ষাৎ মেলে। ইর্দালিপিতে দেখিতেছি, দণ্ডভুক্তিমণ্ডল অর্থাৎ দাঁতন পর্যন্ত বর্ধমানভুক্তির সীমা বিস্তৃত; কিন্তু পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে বোধ হয় দক্ষিণে বর্ধমানভুক্তির এত বিস্তার ছিল না, কারণ, বরাহমিহির গৌড়ক, বর্ধমান ও তাম্রলিপ্তক পৃথক পৃথক জনপদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাল ও সেন আমলে দণ্ডভুক্তি মণ্ডল ছাড়া বর্ধমানভুক্তির আরও তিনটি বিভাগ ছিল: উত্তর-রাঢ়, দক্ষিণ-রাঢ় মণ্ডল এবং পশ্চিম-খাটিকা। বর্ধমানভুক্তির অন্যতম রাষ্ট্রবিভাগ হিসাবে দক্ষিণ-রাঢ় মণ্ডলের উল্লেখ কোন লিপিতে নাই, কিন্তু এই মণ্ডলটিও যে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যাহাই হউক, এই তিনটি জনপদ-রাষ্ট্রের কথা আগেই বলা হইয়াছে। পাল ও সেন আমল ছাড়া দণ্ডভুক্তি সাধারণত তাম্রলিপ্ত জনপদেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অনুমিত; সেইজন্য দণ্ডভুক্তির কথা তাম্রলিপ্ত প্রসঙ্গেই বলা যাইবে। তবে, এইখানে বলিয়া রাখা চলে যে, ইর্দা লিপি ছাড়া রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপি এবং সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে যথাক্রমে তণ্ডবুত্তি—দণ্ডভুক্তি ও দণ্ডভুক্তি-মণ্ডলের উল্লেখ আছে। দণ্ডভুক্তি বর্তমান মেদিনীপুর (প্রাচীন মিধুনপুর) জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ; বর্তমান দাঁতন প্রাচীন দণ্ডভুক্তির স্মৃতিবহ। পশ্চিম-খাটিকা যে মোটামুটি বর্তমান হাওড়া জেলা, এবং গঙ্গার পশ্চিম তীরে সে-ইঙ্গিত তো আগেই করা হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর পট্টোলীতে রাঢ়ের আর একটি বিভাগের খবর পাওয়া যায়; ইহার নাম কঙ্কগ্রামভুক্তি, এবং উত্তর-রাঢ় এই ভুক্তির অন্তর্গত। কঙ্কগ্রাম কাহারও মতে রাজমহল নিকটবর্তী কাঁকজোল, কাহারও মতে মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার কাগ্রাম। যাহাই হউক, শাসনোল্লিখিত স্থানগুলির অবস্থিতি হইতে মনে হয়, বর্তমান মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলার অধিকাংশ এবং সাঁওতাল পরগণারও কিয়দংশ এই কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত ছিল।

বর্ধমানভুক্তি
কঙ্কগ্রামভুক্তি

মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায়।

পুরাণে তো বারম্বারই এই জনপদটির দেখা মেলে; বঙ্গ, কর্বট ও সুহ্মজনেরা ছিলেন তাহাদের প্রতিবেশী। জৈন কল্পসূত্র-গ্রন্থে গোদাসগণ নামীয় জৈন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখার নাম তাম্রলিপ্তি শাখা। জৈন প্রজ্ঞাপনা-গ্রন্থেও তামলিত্তি (তাম্রলিপ্তি) বঙ্গজনদের অধিকারে ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দশকুমারচরিত-গ্রন্থে দামলিপ্ত (তাম্রলিপ্ত) আবার সুহ্মের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। জাতকের গল্পে, বৌদ্ধগ্রন্থে বারবার তাম্রলিপ্তির উল্লেখ পাওয়া যায় সুবৃহৎ নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে। পেরিপ্লাস গ্রন্থে, টলেমির বিবরণে, ফাহিয়ান, য়ুয়ান্-চোয়াঙ ও ইৎসিঙের বিবরণে তাম্রলিপ্ত বন্দরের বর্ণনা সুবিদিত। টলেমির সময়ে তাম্রলিপ্ত জনপদের রাজধানীই ছিল তাম্রলিপ্ত (Tamalites) বন্দর; সপ্তম শতকে য়ুয়ান্-চোয়াঙ বলিতেছেন, তাম্রলিপ্ত বন্দর সমুদ্রের একটি উপবাহুর তীরে অবস্থিত ছিল (near an inlet of sea)। অষ্টম শতকের পর হইতেই তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমৃদ্ধির পতন ঘটে, এবং বোধ হয় তাহার আগে সপ্তম শতক হইতেই দণ্ডভুক্তি জনপদের নামেই তাম্রলিপ্ত জনপদের পরিচয়। ইহাও হইতে পারে, এই সময় তাম্রলিপ্ত কিছুদিনের জন্য সুহ্ম জনপদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। যাহাই হউক, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে বরাহমিহির তাম্রলিপ্তক জনপদকে গৌড়ক (মুর্শিদাবাদ-বীরভূম এবং সম্ভবত পশ্চিম-বর্ধমান ও মালদহ) এবং বর্ধমান হইতে পৃথক জনপদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সপ্তম শতকে দণ্ডভুক্তি গৌড়-কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের করতলগত। সম্প্রতি আবিষ্কৃত শশাঙ্কের মেদিনীপুর লিপি দুইটিতে দেখিতেছি দণ্ডভুক্তি বা দণ্ডভুক্তি-দেশ একজন শাসনকর্তার (সামন্ত-মহারাজ সোমদত্ত এবং মহাপ্রতীহার শুভকীর্তি) অধীনে, এবং উৎকলদেশ এই রাষ্ট্রবিভাগের অন্তর্গত। দশম শতকের ইর্দা লিপিতে দণ্ডভুক্তি মণ্ডল বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। একাদশ শতকের প্রথম পাদে রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে তণ্ডবুত্তি বা দণ্ডভুক্তি দক্ষিণ-রাঢ়, বঙ্গালদেশ, এবং উত্তর-রাঢ় হইতে পৃথক জনপদ-রাষ্ট্র; দ্বাদশ শতকের মধ্যপাদে আবার এই দণ্ডভুক্তি বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। দণ্ডভুক্তির রাজা পালরাজ রামপালের অন্যতম বিশ্বস্ত বন্ধু এবং সহায়ক ছিলেন।

তাম্রলিপ্তি

দণ্ডভুক্তি

গৌড়পুর নামক একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে পাণিনি-সূত্রে; কিন্তু এই গৌড়পুর বর্তমান বঙ্গদেশের কোনও স্থান কিনা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। কৌটিল্য বঙ্গদেশের অনেক জনপদেরই খবরাখবর রাখিতেন; তাঁহার অর্থশাস্ত্রে গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ এবং কামরূপে উৎপন্ন অনেক শিল্প ও কৃষিদ্রব্যাদির খবর পাওয়া যায়; অন্যত্র তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। পাণিনির টীকাকার পতঞ্জলিও গৌড়দেশের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তৃতীয়-চতুর্থ শতকে বাৎস্যায়ন গৌড়দেশের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন; গৌড়ের নাগরকদের বিলাস-ব্যসন, নারীদের মৃদুবাক্য ও মৃদু অঙ্গের সবিশেষ পরিচয় তাঁহার ছিল; বঙ্গ এবং পৌণ্ড্রের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় ছিল। তাহাও যথাস্থানে

গৌড়

প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। পুরাণে এক গৌড়দেশের উল্লেখ আছে (যেমন, মৎস্য-পুরাণে), কিন্তু সে-গৌড়দেশ কোশল জনপদে বলিয়া অনুমিত হয়। বরাহমিহির (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক) গৌড়ক, পৌণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট, বর্ধমান এবং তাম্রলিপ্তক নামে ছয়টি স্বতন্ত্র জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষায় গৌড়ীরীতির খবর পাওয়া যাইতেছে দণ্ডীর কাব্যাদর্শে, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায়; বস্তুত, প্রাচীন সাহিত্যে গৌড়ের উল্লেখ সুপ্রচুর। কিন্তু সর্বত্র গৌড়দেশের অবস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতার উল্লেখ হইতে খানিকটা আভাস অবশ্য পাওয়া যাইতেছে, এবং সে-আভাস যেন মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-পশ্চিম বর্ধমানের দিকে। মুরারির অনর্ঘরাঘবে (অষ্টম শতক) চম্পা গৌড়জনপদের রাজধানী বলিয়া কথিত হইয়াছে; এই চম্পা কি ভাগলপুর জেলার প্রাচীন চম্পা না মন্দারণ সরকারের অন্তর্গত বর্ধমান-সহরের উত্তর-পশ্চিমে, দামোদরের বামতীরের চম্পানগরী, বলা কঠিন। অষ্টম শতকের শেষার্ধে (ধর্মপালের প্রায় সমসাময়িক) গৌড়ের রাষ্ট্রাধিকার প্রাচীন অঙ্গদেশে বিস্তৃত ছিল, ইহা একেবারে অসম্ভব নয়। মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরে যে একটি পাল জয়স্কন্ধাবার ছিল তাহাতো সুবিদিত; তীরভুক্তি বা তিরহুতেও একটি ভুক্তি ছিল। কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে রাঢ়া বা রাঢ়াপুরী এবং ভূরিশ্রেষ্ঠিক গৌড়রাষ্ট্রের অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। একটি দক্ষিণী লিপিতেও রাঢ়দেশকে গৌড়দেশের অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে; কিন্তু যাদবরাজ প্রথম জৈতুগির মনগোলি লিপিতে আবার লাল (রাঢ়) এবং গৌল (গৌড়) পৃথক জনপদ বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর (ত্রয়োদশ শতক) কিন্তু বলিতেছেন, গৌড়দেশ একেবারে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। ভবিষ্য-পুরাণের মতে গৌড়দেশের উত্তর সীমায় পদ্মা, দক্ষিণ সীমায় বর্ধমান। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের কোনও কোনও জৈনগ্রন্থে জানা যায়, বর্তমান মালদহ জেলার প্রাচীন লক্ষ্মণাবতী গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকদের ইঙ্গিতও তাহাই; বস্তুত, লক্ষ্মণাবতী নগরকেই তাঁহারা বলিয়াছেন গৌড় এবং এই গৌড় রাঢ় দেশে। মনে রাখা দরকার লক্ষ্মণাবতী-গৌড় তখন গঙ্গার পশ্চিম বা দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল; গঙ্গা তখন ঐখানে আরও উত্তর ও পূর্ব বাহিনী হইয়া পরে দক্ষিণ বাহিনী হইত। ভবিষ্য-পুরাণ বা ত্রিকাণ্ডশেষ গ্রন্থে যে গৌড়কে (লক্ষ্মণাবতী নগরী?) যথাক্রমে পুণ্ড্র বা বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বলা হইয়াছে, তাহা এই কারণেই। শক্তিসংগমতন্ত্রে গৌড়দেশ বঙ্গ হইতে একেবারে ভুবনেশ (ভুবনেশ্বর) পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া বলা হইয়াছে; কথাসরিৎসাগরে বর্ধমানকে গৌর (=গৌড়) জনপদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বলা হইয়াছে। এক গৌড় ছিল কোশলে (বর্তমান যুক্তপ্রদেশের গোণ্ডা জেলা); আর এক গৌড়ের খবর পাওয়া যায় শ্রীহট্ট জেলায়—গৌড়ের রাজার সংগে পীর শাহজালালের যুদ্ধ-কাহিনী প্রসংগে। রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থে প্রথম পাওয়া যাইতেছে পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ, এবং পরে একাধিক গ্রন্থে দেখা যায় গৌড়, সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা এবং উৎকল লইয়া পঞ্চগৌড়। পাল সম্রাট ধর্মপাল-দেবপালের সময়ে

গৌড়েশ্বরের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব বিস্তারের ইতিহাস এই পঞ্চগৌড় নামটির মধ্যে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া মনে করিলে বোধ হয় কিছু অন্যায় হয় না। আর এক গৌড় উপনিবেশের খবর পাওয়া যাইতেছে দক্ষিণ-ব্রহ্মের প্রেগু শহরের নিকটবর্তী কল্যাণী লিপিমালায়; এই লিপিতে গোল বা গৌড়দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই সব উল্লেখ ও বিবরণের মধ্যে গৌড় জনপদের সঠিক অবস্থিতি সুস্পষ্ট জানা গেল না; শুধু এইটুকু বুঝা গেল, মুর্শিদাবাদ-বীরভূমই এই জনপদের আদি কেন্দ্র; পরে মালদহ এবং বোধ হয় বর্ধমানও এই জনপদের মধ্যে যুক্ত হয়। বর্তমানের এই কয়টি জেলা লইয়াই প্রাচীন গৌড়। এই গৌড়ের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য যখন যেমন বিস্তৃত হইয়াছে—কখনও কলিঙ্গ কখনও ভুবনেশ্বর—জনপদসীমাও তখন তেমনই বিস্তারিত হইয়াছে; ধর্মপাল-দেবপালের আমলে ভারতীয় ঐতিহাসিক ও জনসাধারণের পঞ্চমুখে শুনা যাইতেছে পঞ্চগৌড়ের কথা; বাঙ্গালা অর্থই যেন গৌড়।

গৌড়ের অবস্থিতি সম্বন্ধে বঙ্গীয় লিপি-প্রমাণ কি আছে দেখা যাইতে পারে; সমসাময়িক ও নিঃসংশয়ে বিশ্বাসযোগ্য ভিন্প্রদেশী লিপি এবং ইতিবিবরণও এই সম্পর্কে আলোচ্য। ঈশানবর্মণ মৌখরীর হড়াহা লিপিতে (৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) গৌড়জনদের বর্ণনা করা হইয়াছে "গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ান্" বলিয়া। এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় একাদশ শতকের শুর্গি লিপিতে; এই লিপিতে বলা হইয়াছে, 'the lord of Gauda lies in the watery fort of the sea'। এই উক্তি হইতে মনে হয়, গৌড়জনপদের দক্ষিণ সীমা ষষ্ঠ শতকে সমুদ্র হইতে খুব বেশি দূরে ছিল না। সপ্তম শতকে গৌড়-কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের নবাবিষ্কৃত মেদিনীপুর লিপি দুইটিতে দেখা যাইতেছে, গৌড়রাষ্ট্রের আধিপত্য সমুদ্রসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত; উৎকলসহ দণ্ডভুক্তি দেশ গৌড়-রাষ্ট্রসীমার অন্তর্গত বলিয়া এই লিপি দুইটিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

কর্ণসুবর্ণ

য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণ এবং বাণভট্টের হর্ষচরিতে শশাঙ্কের যে-ইতিহাস বর্ণিত আছে তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, শশাঙ্ক ছিলেন গৌড়ের রাজা; এবং কর্ণসুবর্ণ (= বর্তমান কানসোনা, মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি অঞ্চল) ছিল তাঁহার রাষ্ট্রকেন্দ্র বা রাজধানী, অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ অঞ্চলই ছিল গৌড়ের কেন্দ্রভূমি।

প্রতীহার-রাজ ভোজদেবের গ্বওআলিয়র লিপিতে দেখিতেছি, পালরাজ [ধর্মপাল]কে বলা হইয়াছে 'বঙ্গপতি' এবং তাঁহার প্রজাবর্গকে 'বঙ্গজান্'। দ্বিতীয় নাগভট্ট যখন চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন তখন ধর্মপাল বঙ্গপতি এবং তাঁহার প্রজাবর্গ "বঙ্গান," কিন্তু অন্যত্র সর্বত্রই সকল লিপিতেই পাল রাজারা 'গৌড়েশ্বর'। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষের (৮১৪-৮৭৭) কান্হেরী লিপিতে গৌড় জনপদ গৌড়বিষয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যাহাই হউক, ধর্মপালের রাজত্বকাল হইতেই গৌড়েশ্বর উপাধি পালরাজাদের নামভূষণরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে, যদিও তখন বঙ্গ জনপদ পৃথক স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান এবং পালেরা

বঙ্গেরও অধিপতি। রাজা অমোঘবর্ষেরই নীলগুণ্ড লিপিতে বঙ্গ জনপদ-রাষ্ট্রের এবং কর্করাজের বড়োদা পট্টোলীতে (৮১১-১২) একই সঙ্গে বঙ্গ ও গৌড় জনপদ-রাষ্ট্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর লিপিতেও গৌড়নৃপ এবং বঙ্গরাজ পৃথকভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন। সেন-রাজ বিজয়সেনের সময়ে গৌড়-রাষ্ট্র স্বতন্ত্র রাজার করায়ত্ত ছিল, কিন্তু বিজয়সেন তাঁহাকে পরাভূত করিয়াছিলেন (দেওপাড়া লিপি)। আবার বল্লাল সেনের আমলে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত উত্তর-রাঢ়মণ্ডল সেন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল (নৈহাটি লিপি)। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-লিপিতে দেখিতেছি, তিনি সহসা গৌড় রাজ্য আক্রমণ ও জয় করিয়াছিলেন, এবং বোধ হয়, এইজন্যই এই লিপিতেই তিনি গৌড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত হইতেছেন। এই সব প্রমাণ হইতে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা চলে যে, গৌড় বঙ্গ ও পুণ্ড্রবর্ধন হইতে স্বতন্ত্র জনপদ, এবং আমরা মোটামুটি পশ্চিম-বঙ্গ বলিতে (অর্থাৎ মালদহ-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্ধমানের কিয়দংশ) এখন যাহা বুঝি তাহাই ছিল প্রাচীন গৌড় জনপদ। দক্ষিণ-রাঢ়মণ্ডল বা তাম্রলিপ্ত-দণ্ডভুক্তি বোধ হয় গৌড় জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, যদিও গৌড়ের রাষ্ট্রসীমা কখনও কখনও উৎকল-দণ্ডভুক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং গৌড় বলিতে এক এক সময় হয়তো সমগ্র বাংলাদেশকেও বুঝাইত।

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদগুলি সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে মোটামুটি ভাবে—একটু শিথিল ভাবেই—কয়েকটি কথা বলা চলে। প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা দেশ পুণ্ড্র,

প্রাচীন জনপদ ও 'বাংলা' নামকরণ

গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, বজ্র (অথবা ব্রহ্ম), তাম্রলিপ্তি, সমতট, বঙ্গ, প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত। এই জনপদগুলি প্রত্যেকেই স্ব-স্বতন্ত্র ও পৃথক; মাঝে মাঝে বিরোধে-মিলনে একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগের সম্বন্ধও দেখা যায়, কিন্তু প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রপরায়ণ। সপ্তম শতকের প্রথম পাদে শশাঙ্ক গৌড়ের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হ'ন এবং বর্তমান পশ্চিম-বঙ্গ—মালদহ-মুর্শিদাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে উৎকল পর্যন্ত—সর্বপ্রথম এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করে; কিন্তু বর্তমান পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন জনপদগুলি এক নাম লইয়া এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইবার সূচনা বোধ হয় দেখা দেয় শশাঙ্কের আগেই, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি হইতে (হড়াহা লিপির 'গৌড়ান্')। শশাঙ্ক তাহাকে পূর্ণ পরিণতি দান করেন। এই সময় হইতেই গৌড় নামটির ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা যেন অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল; এবং পাল-রাজারা বঙ্গপতি হওয়া সত্ত্বেও গৌড়াধিপ, গৌড়েন্দ্র, গৌড়েশ্বর নামে পরিচিত হইতেই ভালবাসিতেন। লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। যাহাই হউক, শশাঙ্কের পর হইতে, অর্থাৎ মোটামুটি অষ্টম শতক হইতেই, বাংলাদেশের তিনটি জনপদই যেন সমগ্র বাংলা দেশের সমার্থক হইয়া উঠে—পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ। একথা সত্য, আগে যেমন পরেও তেমনই, দেশে বিভিন্ন জনপদ এবং তাহাদের নামস্মৃতি ছিলই, নূতন নূতন

স্থানের বিভাগীয় নামের উদ্ভবও হইতেছিল (যেমন, পূর্ব ও দক্ষিণ-বাংলা অঞ্চলে বঙ্গাল, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট ; উত্তর-বঙ্গ অঞ্চলে বরেন্দ্রী ; তাম্রলিপ্তি অঞ্চলে দণ্ডভুক্তি ; পশ্চিম-বাংলা অঞ্চলে রাঢ়ের উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগ) এবং এই সব বিভাগের আবার নূতন নূতন উপবিভাগও নূতন নূতন নাম লইয়া দেখা দিতেছিল ; কিন্তু আর সমস্তই যেন এই তিনটি জনপদের কাছে ম্লান বলিয়া মনে হয় ; আর সকলেই যেন ধীরে ধীরে ইহাদের মধ্যেই নিজেদের সত্তা বিলোপ করিয়া দিতেছিল। রাঢ়ের মতন প্রাচীন জনপদও যেন ক্রমশ গৌড় নামের মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতেছিল। শশাঙ্ক এবং পাল রাজারা সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গের অধিকারী হইয়াও নিজেদের রাঢ়াধিপতি বা রাঢ়েশ্বর না বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিলেন গৌড়াধিপ এবং গৌড়েশ্বর বলিয়া, এবং ভিন্-প্রদেশীরাও তাহা মানিয়া লইল। হর্ষচরিত ও রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থ এবং নবম শতকের ভিন্-প্রদেশী লিপি-গুলিই তাহার প্রমাণ। পুণ্ড্র-বরেন্দ্রী সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর স্মৃতি পুণ্ড্রবর্ধনের মধ্যে বাঁচিয়াছিল সেন আমলের প্রায় শেষ পর্যন্ত ; কিন্তু এই পুণ্ড্রও যেন তাহার স্বতন্ত্র নাম-সত্তা গৌড়ের মধ্যে বিসর্জন দিতে যাইতেছিল ; একজন পাল-রাজা যদি বা একবার অন্তত বঙ্গপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, পুণ্ড্রাধিপ বা পুণ্ড্র-বর্ধনেশ্বর বা বরেন্দ্রী-অধিপতি বলিয়া কোথাও তাঁহাদের উল্লেখ করা হয় নাই, যদিও বরেন্দ্রী ছিল তাঁহাদের জনকভূ বা পিতৃভূমি। ইহার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত লক্ষ্য করিবার মতন। পাল এবং সেন রাজাদের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত হওয়া। বঙ্গপতি যে-মুহূর্তে গৌড়ের অধিপতি সেই মুহূর্তেই তিনি গৌড়েশ্বর ; লক্ষ্মণসেন যে-মুহূর্তে গৌড় অধিকার করিলেন সেই মুহূর্তে তিনিও হইলেন গৌড়েশ্বর। শশাঙ্কের সময় হইতেই একটি মাত্র নাম লইয়া প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে-চেষ্টার সজ্ঞান সূচনা দেখা দিয়াছিল পাল ও সেন রাজাদের আমলে তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিল, যদিও বঙ্গ তখনও পর্যন্ত আপন স্বতন্ত্র-জনপদ প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিয়াছে। এক গৌড় নাম লক্ষ্য ও আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গ নাম তখনও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বিদ্যমান ; পুণ্ড্র-পুণ্ড্রবর্ধনের রাষ্ট্রসত্তা আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র পৃথক জনপদ-সত্তা তখন আর নাই। পরবর্তী কালেও গৌড় নামে বাংলা দেশের কিয়দংশের জনপদ-সত্তা বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে ; বাংলার বাহিরে বাঙালী মাত্রেই গৌড়বাসী বা গৌড়ীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, এমন প্রমাণও দুর্লভ নয়। ঔরংজীবের আমলে সুবা বাংলার যে অংশ নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসনাধীন ছিল তাহাকে বলা হইত গৌড়মণ্ডল। উনবিংশ শতকে যখন মধুসূদন দত্ত মহাশয় লিখিয়াছিলেন :

> "রচিব এ মধুচক্র গৌড়জন যাহে
> আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"

তখন গৌড়জন বলিতে তিনি সমগ্র বাংলা দেশের অধিবাসীকেই বুঝাইয়াছিলেন।

কিন্তু গৌড় নাম লইয়া বাংলার সমস্ত জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে-চেষ্টা শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা করিয়াছিলেন সে-চেষ্টা সার্থক হয় নাই; গৌড় নামের ললাটে সেই সৌভাগ্য অঙ্কিত বোধ হয় ছিল না! সেই সৌভাগ্যলাভ ঘটিল বঙ্গ নামের, যে-বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, এবং যে-বঙ্গ নাম ছিল পাল ও সেন রাজাদের কাছে কম গৌরব ও আদরের। কিন্তু, সমগ্র বাংলা দেশের বঙ্গ নাম লইয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়া হিন্দু আমলে ঘটে নাই; তাহা ঘটিল তথাকথিত পাঠান আমলে এবং পূর্ণ পরিণতি পাইল আকবরের আমলে, যখন সমস্ত বাংলা দেশ সুবা বাংলা নামে পরিচিত হইল। ইংরাজ আমলে বাংলা নাম পূর্ণতর পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, যদিও আজিকার বাংলা দেশ আকবরী সুবা বাংলা অপেক্ষা খর্বীকৃত।

চতুর্থ অধ্যায়

ধন-সম্বল

১

সমাজ-সংস্থানের বস্তু-ভিত্তি হইতেছে ধন। এই ধন যে শুধু ব্যক্তির পক্ষে, তাহার জীবন-ধারণ, অশন-বসন, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্মের জন্য অপরিহার্য তাহা নয়, গোষ্ঠী ও সমাজের পক্ষেও ইহা সমভাবে অপরিহার্য। সমাজ-নিরপেক্ষ পারত্রিক মঙ্গলের জন্য, অথবা

যুক্তি

উপশ্চর্যায় বিশুদ্ধ ধর্মজীবন যাপনের জন্য কোনও উদ্দেশ্যে সমাজের বাহিরে একান্ত ভাবে একক জীবন যাঁহারা যাপন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন মুক্ত পুরুষ হয়তো আছেন যাঁহারা কোনো ভাবেই ধন কামনা করেন না, অশন-বসনের ও কামনার উর্ধ্বে যাঁহাদের স্থান। তাঁহারা সমাজ-ইতিহাসের আলোচনার বিষয় নহেন। আমরা তাঁহাদের কথাই বলিতেছি যাঁহারা জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখে, জীবনের বিচিত্র টানা-পোড়েনে নিত্য আন্দোলিত, ঐহিক জীবনের ক্ষুৎপিপাসায়, শীতাতপে পীড়িত এবং সামাজিক নানা বিধি-বিধান প্রয়োজন-আয়োজন দ্বারা শাসিত। সমাজধর্মী এই যে ব্যক্তি তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে ধন অপরিহার্য বস্তু; এই ধন বলিতে শুধু মুদ্রা বুঝায় না, টাকা-আনা-পয়সা বুঝায় না, একথা আজকাল আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ব্যক্তির যেমন, সমাজেরও তেমনই; ধন ছাড়া কোনও দেশের কোনও বিশেষ কালের সমাজের ব্যবসা-বাণিজ্য কল্পনাই করিতে পারা যায় না; ধন ছাড়া সমাজের রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হইতে পারে না; কারণ যাঁহারা এই রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করিবেন তাঁহাদিগকে তাঁহাদের কায়িক অথবা মানসিক শ্রমের বিনিময়ে নিজেদের ভরণ-পোষণের, শিক্ষা-দীক্ষার, ধর্ম-কর্মের, আরাম-বিলাসের জন্য বেতন দিতে হইবে, তাহা শস্য দিয়া হউক, মুদ্রা দিয়া হউক, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া হউক, ভূমি দিয়া হউক, অথবা অন্য যে কোনও উপায়েই হউক। শুধু রাষ্ট্রের কথাই বা বলি কেন, ধর্ম, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, কিছুই এই ধন ছাড়া চলিতে পারে না, এবং সমাজ-সংস্থানের যে-কোনও ব্যাপারেই এ-কথা সত্য।

নানা বর্ণ, নানা জাতি এবং নানা শ্রেণীর অগণিত ও অলিখিত জনসমষ্টি লইয়া প্রাচীন বাংলার যে-সমাজ, তাহার পরিকল্পনা এবং সংস্থানে যে-ধন প্রয়োজন হইত, তাহা আসিত কোথা হইতে? একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, যাঁহারা রাজসরকারে চাকরি করিতেন, লেখমালায় যাঁহাদের বলা হইয়াছে রাজপাদোপজীবী, তাঁহারা ধন উৎপাদন

করিতেন না, উৎপাদিত ধনের অংশ মাত্র ভোগ করিতেন, শ্রম ও বুদ্ধির বিনিময়ে। শিক্ষা-বৃত্তি ছিল যাঁহাদের, ধর্মানুষ্ঠানের পুরোহিত ছিলেন যাঁহারা, সমাজের তথাকথিত হেয় কর্ম ইত্যাদি যাঁহারা করিতেন, তাঁহারাও যতটুকু পরিমাণে নিজ নিজ বিশেষ বৃত্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন ততটুকু পরিমাণে ধনোৎপাদনের দায় ও কর্তব্য হইতে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু, উৎপাদিত ধনের অংশ তাঁহারা ভোগ করিতেন, শ্রম ও বুদ্ধির বিনিময়ে, নিজ নিজ সুযোগ ও অধিকার অনুযায়ী। সোজাসুজি প্রত্যক্ষ ভাবে ধনোৎপাদন ইঁহারা কেহই করেন না বটে, তবে পরোক্ষ ভাবে ধনোৎপাদনে সাহায্য সকলকেই কিছু না কিছু করিতে হয়, কোনও না কোনও উপায়ে। সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই একথা জানেন।

তাহা হইলেই প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে, ধনোৎপাদনের উপায় কি কি? প্রাচীন বাংলায় দেখিতেছি, ধনোৎপাদনের তিন উপায়: কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য। ইহাদের মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্যই প্রধান; আজ পর্যন্তও বাংলা দেশে কৃষিই প্রধান ধন-সম্বল; তারপরেই শিল্প। এই কৃষি ও শিল্পজাত জিনিসপত্র লইয়া দেশে বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে উৎপাদিত ধনের বৃদ্ধি এবং দেশের বাহির হইতে নূতন ধনের আগমন হইত। এই তিন উপায়ে আহৃত যে-ধন তাহাই প্রাচীন বাংলার ধন-সম্বল। এবং এই ধন-সম্বলের উপরই সমাজ, রাজা, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি সবকিছুর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ।

২

কিন্তু এই ধন-সম্বলের কথা বলিবার আগে আমাদের ঐতিহাসিক উপাদান সম্বন্ধে দু'একটি কথা আলোচনা করিয়া লওয়া দরকার। আমাদের প্রধান উপাদান লেখমালা, এবং প্রাচীন বাংলার সর্বপ্রাচীন লেখমালার তারিখ আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে। বগুড়া জেলার মহাস্থানে প্রাপ্ত এই সুপ্রাচীন প্রস্তর-লেখখণ্ডটিতে প্রাচীন বাংলার ধন-সম্বলের একটি প্রধান উপকরণের সংবাদ পাওয়া যায়। এই উপকরণটি ধান, কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান। এই লেখখণ্ডটি ছাড়া, পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রচুর লিপির সংবাদ আমরা জানি, কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থের উপাদানও আমাদের অজ্ঞাত নয়, অথচ এই সর্বপ্রাচীন মহাস্থান-লেখখণ্ডটি এবং আরও দুই চারিটি তাম্রশাসন ছাড়া বাংলা দেশের প্রধান উৎপন্ন ধন যে ধান লিপিতে সে-উল্লেখ কোথাও নাই বলিলেই চলে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে অবশ্য বলা হইয়াছে, বরেন্দ্রীর লক্ষ্মীশ্রী দৃষ্টিগোচর হইত নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ধান্যক্ষেত্রের কমনীয় রূপে অর্থাৎ বরেন্দ্র-ভূমিতে (উত্তর-বাংলায়) নানাপ্রকারের খুব ভাল ধান জন্মাইত, এই ইঙ্গিত রামচরিতে পাওয়া

উপাদান

যাইতেছে। অথচ, ইহা তো সহজেই অনুমেয় যে, আজও যেমন অতীতেও তেমনি, ধান্যই ছিল শুধু বরেন্দ্রভূমির নয়, সমগ্র বাংলা দেশেরই প্রধান ধন-সম্বল। শুধু ধান সম্বন্ধেই নয়, অন্যান্য অনেক কৃষি ও শিল্পজাত বা খনিজ দ্রব্যের উল্লেখই আমাদের ঐতিহাসিক উপাদানে পাওয়া যায় না। কাজেই, আমাদের এই বিবরণীতে যে-সব উপকরণের উল্লেখ নাই, অথচ যাহা উৎপাদিত ধন হিসাবে বর্তমান ছিল বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায়, তাহা প্রাচীন বাংলায় ছিল না, একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কার্পাস বস্ত্র ও রেশম বস্ত্র যে বাংলার প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য ছিল, এবং সুদূর মিশর ও রোমদেশ পর্যন্ত তাহা রপ্তানি হইত, সর্বত্র তাহার আদরও ছিল, একথা আমরা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার বর্ণিত Periplus of the Erythrean Sea অথবা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কিংবা চর্যা-গীতি-গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু জানিতে পারি; অথচ, এ-যাবৎ বাংলাদেশ-সম্পর্কিত যত লেখমালার খবর আমরা জানি কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। উদাহরণ দিবার জন্য ধান্য ও বস্ত্র-শিল্পের উল্লেখ করিলাম মাত্র, তবে অনেক খনিজ, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের সম্বন্ধেই এ-কথা বলা যাইতে পারে। কাজেই অনুল্লেখের যুক্তি অন্তত এক্ষেত্রে অনস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করে না। কৃষি ও শিল্পের তদানীন্তন অবস্থায়, প্রাচীন বাংলার তদানীন্তন ভূমি-ব্যবস্থায়, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু এবং নদনদীর সংস্থানে যে-সব দ্রব্য উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক তাহা সমস্তই উৎপাদিত হইত, এই অনুমানই যুক্তিসংগত, তবু ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিতে বসিয়া কেবলমাত্র সেই সব উপকরণই বিবৃত করা যাইতে পারে যাহার উল্লেখ অবিসংবাদিত উপাদানের মধ্যে পাওয়া যায়, এবং যাহার উল্লেখ না থাকিলেও অস্তিত্বের অনুমান প্রমাণের অনুরূপ মূল্য বহন করে। একটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য পরিষ্কার হইবে। তক্ষণ অথবা স্থাপত্য শিল্পের কোন উল্লেখ আমরা আমাদের জ্ঞাত উপাদানের মধ্যে পাই না, যদিও তিব্বতী লামা তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধ-ধর্মের ইতিহাসে ধীমান ও বীটপাল নামে বরেন্দ্রভূমির দুই খ্যাতনামা শিল্পীর উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিজয়সেনের দেওপাড়া তাম্রশাসনে "বারেন্দ্রক শিল্পিগোষ্ঠী চূড়ামণি রাণক শূলপাণি"র উল্লেখ আছে। ঠিক তেমনই স্বর্ণকার অথবা রৌপ্যকারের উল্লেখও নাই। অথচ বাংলাদেশে প্রাপ্ত অগণিত দেবদেবীর পোড়ামাটি ও পাথরের মূর্তিগুলি দেখিলে, পাহাড়পুর ও অন্যান্য স্থানের প্রাচীন মন্দির, স্তূপ এবং বিহারের ধ্বংসাবশেষ অথবা সম-সাময়িক চিত্রে ও ভাস্কর্যে সেই যুগের ঘর-বাড়ি-মন্দিরাদির পরিকল্পনা দেখিলে, দেবদেবীর মূর্তিগুলির চিরযৌবনসুলভ শ্রীঅঙ্গে বিচিত্র গহনার সূক্ষ্ম ও বিচিত্রতর কারুকার্যগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে একথা অনুমান করিতে কোনও আপত্তি করিবার কারণ নাই যে, তদানীন্তন কালে তক্ষণ ও স্থাপত্য শিল্প অথবা স্বর্ণ ও রৌপ্যশিল্পজাত দ্রব্যাদির কোনও প্রকার অপ্রতুলতা ছিল। অন্যান্য অনেক কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধেই একথা বলা যাইতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধেও একই কথা। গঙ্গা ও তাম্রলিপ্তি যে মস্ত বড় দুইটি বন্দর

ছিল, এ-খবর বিশেষভাবে পেরিপ্লাস গ্রন্থ, টলেমির বিবরণ, জাতকগ্রন্থ ও ফাহিয়ান-য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণীর ভিতর পাওয়া যায় ; তাহা ছাড়া অন্য কোথাও ইহাদের বিশদ উল্লেখ কিছু নাই বলিলেই চলে। এই বন্দর হইতে, এবং কিছু পরবর্তীকালে অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রারম্ভ হইতেই সপ্তগ্রাম হইতে যে পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপগুলিতে, দক্ষিণ-ভারতের উপকূল বাহিয়া সিংহলে, এবং পশ্চিম উপকূল বাহিয়া সুরাষ্ট্র-ভৃগুকচ্ছ পর্যন্ত বাণিজ্যতরী যাতায়াত করিত তাহার কিছু কিছু আভাস হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু সমসাময়িক বিশদ প্রমাণ কিছু নাই বলিলেই চলে। অন্তর্বাণিজ্যও নিশ্চয়ই ছিল, বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদগুলির ভিতর এবং দেশের বাহিরে অন্যান্য রাজ্য ও রাজ্যখণ্ডগুলির সঙ্গে। এই অন্তর্বাণিজ্য চলিত হয়তো অধিকাংশই নদীপথে, কিন্তু স্থলপথেও কিছু কিছু না চলিত এমন নয়, অথচ এই সব বাণিজ্য-সম্ভার, বাণিজ্যপথ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য খবরের আভাসও উপাদানগুলির মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। হাট-বাজার, আপণ-বিপণি, ব্যাপারী ইত্যাদির নির্বিশেষ উল্লেখ লেখমালাগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায়, কিন্তু তাহা উল্লেখ মাত্রই ; বিশেষ আর কিছু খবর পাওয়া যায় না।

পাওয়া যে যায় না, উল্লেখ যে নাই তাহার কারণ তো খুবই পরিষ্কার। লেখমালাই হউক, অথবা অন্য যে কোনও প্রকার লিখিত বিবরণই হউক, ইহাদের কোনটিই দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের, কিংবা দেশের সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় দিবার জন্য রচিত হয় নাই। দু'একটি ছাড়া সব লেখমালাই প্রায় ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলী, আধুনিক ভাষায় পাট্টা বা দলিল। প্রস্তাবিত দান-বিক্রয়ের ভূমির পরিচয় দিতে গিয়া, কিংবা দান-বিক্রয়ের সর্ত ও স্বত্ব উল্লেখ করিতে গিয়া পরোক্ষভাবে কোনও কোনও উৎপন্ন দ্রব্যাদির নাম বাধ্য হইয়াই করিতে হইয়াছে, কারণ সেই সব উৎপন্ন দ্রব্যাদি সেই ভূমিখণ্ডের ধন-সম্পদ, এবং তাহার অবলম্বনেই ক্রেতা অথবা দানগ্রহীতার ক্রয় অথবা দানগ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সব লেখমালায় আবার সে উল্লেখও নাই। পূর্বোক্ত মহাস্থান শিলালিপিখণ্ডের কথা ছাড়িয়া দিলে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম শতক পর্যন্ত বহু তাম্রপট্টোলীর খবর আমরা জানি, কিন্তু উহাদের মধ্যে কোথাও দত্ত বা ক্রীত ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যাদির বা কোনও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে ; একমাত্র সপ্তম শতকে রচিত কর্ণসুবর্ণ (কর্ণস্বর্ণ—কানসোনা, মুর্শিদাবাদ জেলা) রাষ্ট্রের ঔদুম্বরিক বিষয়ের বপ্যঘোষবাট গ্রামের তাম্রপট্টোলীতে "সর্ষপ-যানক" বলিয়া সর্ষপক্ষেত্র-পার্শ্ববিলম্বিত যে-পথের (?) উল্লেখ আছে তাহা হইতে হয়তো অনুমান করা যায়, উক্ত গ্রামের অন্যতম উৎপন্ন দ্রব্য ছিল সর্ষপ বা সরিষা। অষ্টম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত পাল, সেন ও অন্যান্য রাজবংশের যে-সমস্ত পট্টোলীর খবর আমরা জানি তাহার প্রায় সব ক'টিতেই দত্ত অথবা ক্রীত ভূমির প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ আছে, এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে, বিশেষ ভাবে, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের

পট্টোলীগুলিতে ভূমিজাত দ্রব্যাদির আয়ের পরিমাণও উল্লেখ করা আছে। ভূমি-সম্পর্কিত দলিল বলিয়াই ভূমিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। প্রশ্ন দাঁড়ায়, পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকের লেখমালায় ভূমিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই কেন, এবং অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের লেখমালায় আছে কেন? সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন, কিন্তু একটা অনুমান করা চলে। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর পট্টোলীতে (৫০৭-৮ খ্রী) দেখিতেছি, মহাযানিক অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘকে যে-গ্রাম বা অগ্রহার দান করা হইতেছে তাহার সর্ত হইতেছে "সর্বতোভোগেন," অর্থাৎ দানগ্রহীতা সকল প্রকারে এই ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য ও তাহার আয় ভোগ করিতে পারিবেন, এই অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে। এই যুগের অন্যান্য লেখমালায় এই ধরনের "সর্বতোভোগেন" অধিকারের উল্লেখ বিশেষ ভাবে নাই, কিন্তু "অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী" যে-দান তাহা যে "সর্বতোভোগেন"ই দেওয়া হইত, এবং ক্রেতা ও দানগ্রহীতারা যে সেই ভাবেই গ্রহণ করিতেন, এ-অনুমান করা যায়। পরবর্তী কালে এই "সর্বতোভোগে"র স্বরূপ নির্দেশ করা প্রয়োজন হইয়াছিল, নানা বিশেষ ও অবিশেষ কারণে; ভোক্তার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন হয়তো উঠিয়াছিল, এবং হয়তো এই কারণেই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরবর্তী কালে কতকটা বিশদভাবে এই অধিকারের স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছিল; এবং তাহার ফলেই ভূমিজাত দ্রব্যাদির খবর আমরা কিছু কিছু পাই।

এ তো গেল লেখমালাগুলির কথা। অন্যান্য উপাদানগুলি সম্বন্ধেও দু'এক কথা বলা দরকার। পূর্বে বলিয়াছি, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রচিত Periplus of the Erythrean Sea নামক গ্রন্থে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন বাংলার প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের খবর পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বিদেশী বণিক যাঁহারা সমুদ্র-পথে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য, কতকটা 'গাইড্ বই'র মতন। বাংলা দেশ হইতে যে-সব জিনিস বিদেশে পশ্চিম-এসিয়ায়, মিসরে, রোমে, গ্রীসে যাইত তাহাদের মধ্যে অজ্ঞাতনামা লেখক রেশম বস্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সব দেশে এই জিনিসের চাহিদা ছিল, তাই ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে; অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যও নিশ্চয়ই ছিল, সেগুলির চাহিদা হয়তো তেমন ছিল না, রপ্তানিও হইত না, সেই জন্য তাহাদের উল্লেখ নাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ অপরোক্ষভাবে। কারণ, এই গ্রন্থ এবং গ্রন্থোক্ত বিশেষ অধ্যায়টি ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের সংবাদ দিবার জন্য বিশেষ ভাবে রচিত নয়। রাজশেখরের কাব্য-মীমাংসায় পূর্বদেশগুলির উৎপন্ন দ্রব্যাদির একটি ক্ষুদ্র তালিকা আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, এই তালিকা কিছুতেই সম্পূর্ণ হইতে পারে না; মনে হয় কোনও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে যে-সব গন্ধ ও আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইত, এ-তালিকায় শুধু সেই সব কয়েকটি দ্রব্যেরই নাম আছে। সেইজন্য আমাদের নানা উপাদানের মধ্যে প্রাচীন বাংলার ধন-সম্বলের যে-সংবাদ তাহা

প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পরোক্ষ ও অসম্পূর্ণ। এই সব বিচ্ছিন্ন, টুকরা টুকরা তথ্য আহরণ করিয়া এই ধনসম্বলের একটি সম্পূর্ণ স্বরূপ গড়িয়া তোলা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু, মোটামুটি একটা কাঠামো গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

৩

প্রথম কৃষি ও ভূমিজাত দ্রব্যাদির কথাই বলি। প্রাচীন বাংলায় কৃষি যে ধনোৎপাদনের এক প্রধান ও প্রথম উপায় ছিল তাহার প্রমাণ লেখমালায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লেখমালাগুলিতে 'ক্ষেত্রকরান্,' 'কর্ষকান্,' 'কৃষকান্,' ইত্যাদি কথার তো বারংবার উল্লেখ আছেই। জনসাধারণ যে-কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে ক্ষেত্রকর বা কৃষকেরাও ছিল বিশেষ একটি শ্রেণী, এবং কোনও স্থানে ভূমি দান-বিক্রয় করিতে হইলে রাজপাদপোজীবীদের, ব্রাহ্মণদের, এবং গ্রামের ও গোষ্ঠীর অন্যান্য মহত্তর ও ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিদিগের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রকর বা কৃষকদেরও দান-বিক্রয়ের ব্যাপার বিজ্ঞাপিত করিতে হইত। উদাহরণ স্বরূপ খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্মপালের লিপি (অষ্টম শতকের চতুর্থ পাদ, আনুমানিক) হইতে এই বিজ্ঞপ্তি-সূত্রটি উদ্ধার করিতেছি :—

কৃষি ও ভূমিজাত দ্রব্যাদি

> "এষু চতুর্ষ্বু গ্রামেষু সমুপগতান্ সর্বানেব রাজ-রাজনক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-সেনাপতি-বিষয়পতি-ভোগপতি-ষষ্ঠাধিকৃত-দণ্ডশক্তি-দণ্ডপাশিক-চৌরোদ্ধরণিক-দৌস্সাধসাধনিক-দূত-খোল-গমাগমিকা-ভি ত্ব র মা ণ-হস্ত্যশ্ব-গোমহিষাজাবিকাধ্যক্ষ-নাকাধ্যক্ষ-বলাধ্যক্ষ-তরিক-শৌল্কিক-গৌল্মিক-তদাযুক্তক-বিনিযুক্তকাদি-রাজপাদপোজীবিনোহন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্ চাটভটজাতীয়ান্ যথাকালাধ্যাসিনো জ্যেষ্ঠকায়স্থ-মহামহত্তর-মহত্তর-দাশগ্রামিকাদি-বিষয় ব্যবহারিণঃ সকরণান্ প্রতিবাসিনঃ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণ-মাননাপূর্বকং যথাহং মানয়তি বোধয়তি সমাজ্ঞাপয়তি চ।"

এই ধরনের উল্লেখ প্রায় প্রত্যেক তাম্র-পট্টোলীতেই আছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভাল প্রমাণ, লোকের ভূমির চাহিদা। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত যত ভূমি দান-বিক্রয়ের তাম্রপট্টোলী দেখিতেছি, সর্বত্রই দেখি ভূমি-যাচক বাস্তুক্ষেত্রাপেক্ষা খিলক্ষেত্রই চাহিতেছেন বেশি পরিমাণে; তাহার উদ্দেশ্য যে কৃষিকর্ম তাহা সহজেই অনুমেয়। যে-জমি কর্ষিত হয় নাই সেই জমির চাহিদাই বেশি; উদ্দেশ্য কর্ষণ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ধনাইদহ পট্টোলী (৪৩২-৩৩ খ্রী), দামোদরপুরে প্রাপ্ত প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পট্টোলী (৪৪৩-৪৪ খ্রী; ৪৮২-৮৩খ্রী; ৫৪৩-৪৪ খ্রী), ধর্মাদিত্যের প্রথম ও দ্বিতীয় পট্টোলী (সপ্তম শতক), গোপচন্দ্রের পট্টোলী (সপ্তম শতক), সমাচার দেবের ঘুগ্রাহাটি পট্টোলী (সপ্তম শতক) প্রভৃতিতে শুধু খিলক্ষেত্র প্রার্থনারই উল্লেখ আছে। অন্যত্র, যেখানে খিল ও বাস্তুক্ষেত্রউভয়ই প্রার্থনা করা হইতেছে, যেমন বৈগ্রাম পট্টোলীতে (৪৪৭-৪৮ খ্রী), সেখানেও খিলক্ষেত্রের পরিমাণ বাস্তুক্ষেত্রের প্রায় বার গুণ। পরবর্তী কালের পট্টোলীগুলিতে ভূমির পরিমাণ

সমগ্রভাবে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু সে-ভূমির কতটুকু খিল কতটুকু বাস্তু তাহা পরিষ্কার করিয়া কিছু বলা নাই। তবু দত্ত ও ক্রীত ভূমির যে-বিবরণ আমরা এই লিপিগুলিতে দেখি, তাহাতে মনে হয়, খিলভূমির কথাই বলা হইতেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তাহা ছাড়া, কৃষির প্রাধান্য সম্বন্ধে অন্য একটি অনুমানও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভূমির পরিমাণ সর্বত্রই ইঙ্গিত করা হইতেছে এমন মানদণ্ডে যাহা কৃষি-ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, আঢ়বাপ বা আঢকবাপ, উন্মান (উয়ান) এই সমস্ত মানই শস্য-সম্পর্কিত। এক কুল্য, এক দ্রোণ বা এক আঢক (বাংলা, আঢ়া; পূর্ব-বাংলার অনেক স্থানে দুন্ এবং আঢ়া শস্যমান এখনও প্রচলিত) বীজ বপনের জন্য যতটুকু জমির প্রয়োজন তাহার পরিমাণই এক কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ অথবা আঢ়বাপ ভূমি এবং এই মানানুযায়ীই পঞ্চম হইতে মোটামুটি অষ্টম শতক পর্যন্ত সমস্ত ভূমির পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের তাম্রপট্টোলী (একাদশ শতক) কিংবা শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা তাম্র পট্টোলীতে (দশম শতক) ভূমি-পরিমাপের মান হইতেছে হল, এবং হলই হইতেছে প্রধান কৃষিযন্ত্র। অবশ্য একথা সত্য যে, আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভূমি সর্বত্রই ঠিক এই কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, উন্মান, হল ইত্যাদি মানদণ্ডে মাপা হইত না; তাহার জন্য অন্য মানদণ্ডের নির্দেশও পাইতেছি। নল-মানদণ্ডের নির্দেশ আছে (অষ্টকনবকনলাভ্যাম, ৮×৯ নল) পঞ্চম শতকেই, দামোদরপুরের তৃতীয় পট্টোলীতে (৪৮২-৮৩ খ্রী); তথাপি এই যে শস্যমান অথবা কৃষি-যন্ত্রমানের সাহায্যে ভূমির পরিমাণের উল্লেখ, ইহার মধ্যে কৃষিপ্রধান সমাজের স্মৃতি যে জড়িত তাহা অনুমান করা অসংগত নয়।

ডাক ও খনার বচনগুলিও প্রাচীন বাংলার কৃষিপ্রধান সমাজের অন্যতম প্রমাণ। যে-ভাষায় এখন আমরা এই বচনগুলি পাই তাহা অর্বাচীন, সন্দেহ নাই। এগুলি প্রচলিত ছিল জনসাধারণের মুখে মুখে, বংশপরম্পরায়। ভাষার অদলবদল হইয়া বর্তমানে তাহা যে-রূপ লইয়াছে তাহা মধ্যযুগীয়। তবু, এই বচনগুলি যে খুব প্রাচীন স্মৃতি বহন করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন্ কোন্ ঋতুতে কি শস্য বুনিতে হইবে, কোন্ শস্যের জন্য কি প্রকার ভূমি, কি পরিমাণের বারিপাত প্রয়োজন, বারিপাত ও খরাতপ নির্দেশ, বিভিন্ন শস্যের নাম ও রূপ, আবহাওয়া-তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, কৃষি-প্রধান সমাজের বিচিত্র ছবি, ইত্যাদি নানা খবর এই বচনগুলিতে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক; ইহার ভূমি নিম্ন এবং বারিপাত কৃষির পক্ষে অনুকূল; এ-দেশের ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে; ইহার ভূমির উর্বরতা সম্বন্ধে চীন-পরিব্রাজক য়ুয়ান্ চোয়াঙের সাক্ষ্যও সেই সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণ ভাবে এ-দেশের শস্যসম্ভার সম্বন্ধেও এই চীন-পরিব্রাজকের দু'চার কথা বলিবার আছে। পূর্ব-ভারতের যে কয়টি দেশে তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অন্তত চারিটি বর্তমান বাংলা-ভাষাভাষী জনপদের সীমার ভিতর অবস্থিত—

পুন্-ন-ফ-টন্-ন (পুণ্ড্রবর্ধন), সন্-মো-ত-ট' (সমতট), তন্-মো-লিহ্-তি (তাম্রলিপ্তি) এবং ক-লো-ন-সু-ফ-ল-ন (কর্ণসুবর্ণ)। তাহা ছাড়া আর একটি দেশেও তিনি গিয়াছিলেন, তাহার নাম ক-চু-ওয়েন্-কি-লো : ইহার ভারতীয় রূপ হইতেছে কযঙ্গল, কজঙ্গল অথবা কজাঙ্গল। কানিংহাম সাহেব এই কজঙ্গলকে কাঁকজোল বা রাজমহলের সঙ্গে অভিন্ন মনে করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে এক কযঙ্গল রাজার উল্লেখ আছে ; কোন কোন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থেও কজঙ্গলের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড পুঁথিতে রাঢ়ীখণ্ডজাঙ্গল নামে এক দেশের উল্লেখ আছে। এই দেশ ভাগীরথীর পশ্চিমে, কীকট অর্থাৎ মগধ দেশের নিকটে ; এই দেশের ভিতরেই বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর ও বীরভূমি (বীরভূম), অজয় ও অন্যান্য নদী , ইহার তিনভাগ জঙ্গল, এক ভাগ গ্রাম ও জনপদ, ইহার অধিকাংশ ভূমি উষর, স্বল্পভূমি মাত্র উর্বর। এই যে জঙ্গল ও জাঙ্গল প্রদেশ ইহাই তো য়ুয়ান্-চোয়াঙের কজঙ্গল বা কজাঙ্গল বলিয়া মনে হয়—রাঢ় দেশের উত্তর-খণ্ডের জাঙ্গলময় উষর ভূভাগ যাহা রাজমহল ও সাঁওতালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই হিসাবে এই কযঙ্গল-কজঙ্গল-কজাঙ্গল বর্তমান বাংলা দেশেরই অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমার এই মন্তব্যের সমর্থন পাইতেছি ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর লিপিতে (একাদশ শতক)। ভবদেব উষর (অজলা) ও জাঙ্গলময় রাঢ় দেশের কোনও গ্রামোপকণ্ঠে একটি জলাশয় খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। এখানেও রাঢ় দেশের যে-অংশের বিবরণ পাইতেছি তাহা অজলা, অনুর্বর এবং জাঙ্গলময়। এখন দেখা যাক্ য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ এই পাঁচটি দেশের শস্যসম্ভার সম্বন্ধে সাধারণভাবে কি বলিতেছেন।

কজঙ্গল সম্বন্ধে তিনি বলেন, এ-দেশের শস্যসম্ভার ভাল। পুণ্ড্রবর্ধনের বর্ধিষ্ণু জনসমষ্টি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং এ-দেশের শস্যসম্ভার ফুল ফল যে সুপ্রচুর তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সমতট ছিল সমুদ্রতীরবর্তী দেশ , এ দেশের উৎপাদিত শস্য সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। তাম্রলিপ্ত ছিল সমুদ্রের এক খাড়ির উপরেই ; এখানকার কৃষিকর্ম ভাল ছিল, ফলফুল ছিল প্রচুর। স্থলপথ ও জলপথ এখানে কেন্দ্রীকৃত হইয়াছিল বলিয়া নানা দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি এখানে মজুত হইত এবং এখানকার অধিবাসীরা সেই হেতু প্রায় সকলেই বেশ সম্পন্ন ও বর্ধিষ্ণু ছিল। কর্ণসুবর্ণের লোকেরাও ছিল খুবই ধনী, এবং জনসংখ্যাও ছিল প্রচুর ; কৃষিকর্ম ছিল নিয়মিত ঋতু অনুযায়ী, ফলফুল-সম্ভার ছিল সুপ্রচুর। দেখা যাইতেছে, য়ুয়ান্-চোয়াঙের দৃষ্টিও দেশের কৃষিপ্রাধান্যের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং সর্বত্রই তিনি উৎপন্ন শস্য-সম্ভারের উল্লেখ করিয়াছেন, এক সমতট ছাড়া। সমুদ্রতীরবর্তী এই দেশে স্বভাবতই কৃষিকর্মের অবস্থা হয়তো ভাল ছিল না। তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধির হেতু যে শুধু কৃষিকর্মই নয়, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই এই দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রতিও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

এইবার কৃষিজাত কি কি শস্য ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যাদির খবর আমরা জানি একে একে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

প্রথমেই প্রধান শস্য ধান্যের সহিত আমাদের পরিচয়। এই পরিচয়, আগেই বলিয়াছি, আমরা পাই খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে উৎকীর্ণ, প্রাচীন করতোয়া-তীরবর্তী মহাস্থানের শিলালিপিখণ্ডটি হইতে। ইহা একটি রাজকীয় আদেশ; রাজা অজ্ঞাত, এবং যে-স্থান হইতে এই আদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহার নামও অজ্ঞাত। তবে, অক্ষর দেখিয়া শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় অনুমান করেন, এবং তাঁহার অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয় যে, আদেশটি দিয়াছিলেন কোনও মৌর্য সম্রাট। আদেশটি দেওয়া হইতেছে পুন্দনগলের (পুণ্ড্রনগরের) মহামাত্রকে, এবং তাঁহাকে শাসনোল্লিখিত আদেশটি পালন করিতে বলা হইয়াছে। পুণ্ড্রনগরে ও পার্শ্ববর্তী স্থানে সংবঙ্গীয়দের মধ্যে (অন্য মতে, ছবগীয়=ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের মধ্যে) কোনও দৈবদুর্বিপাকবশত নিদারুণ দুর্গতি দেখা দিয়াছিল। এই দৈবদুর্বিপাক যে কি তাহা উল্লেখ করা নাই। এই দুর্গতি হইতে ত্রাণের উদ্দেশ্যে দুইটি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। প্রথমটি কি, তাহা হয়তো শিলাখণ্ডটির প্রথম লাইনে লেখা ছিল, কিন্তু ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তাহা আর জানিবার উপায় নাই। তবে, অনুমান করা হইয়াছে যে, গণ্ডক মুদ্রায় কিছু অর্থ সংবঙ্গীয়দের (ছবগীয়দের ?) নেতা (?) গলদনের হাতে দেওয়া হইয়াছিল ঋণ হিসাবে। দ্বিতীয় উপায়ে রাজকীয় শস্যভাণ্ডার হইতে দুঃস্থ জনসাধারণকে ধান্য দেওয়া হইয়াছিল—খাইয়া বাঁচিবার জন্য, না বীজ হিসাবে, তাহা উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু এই ধান্য-বিতরণও ঋণ হিসাবে। কারণ, এই আশার উল্লেখ লিপিখণ্ডটিতে আছে যে, রাজকীয় এই আদেশের ফলে সংবঙ্গীয়েরা অথবা ছবগীয় ভিক্ষুরা বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারিবে, এবং জনসাধারণের মধ্যে আবার শস্য-সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিবে। তখন গণ্ডক মুদ্রাদ্বারা রাজকোষ এবং ধান্যদ্বারা রাজ-কোঠাগার ভরিয়া দিতে হইবে। এই শিলাখণ্ড হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জনসাধারণের প্রধান উপজীব্যই ছিল ধান্য; দুর্গতি-দুর্ভিক্ষের সময়ও এই ধান্য-ঋণ গ্রহণই ছিল জীবনধারণের উপায়। রাজাও সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন; এবং রাজ-কোঠাগারে দৈবদুর্বিপাক কাটাইবার জন্য ধান্যই সংগ্রহ করিয়া রাখা হইত। এই বিপদে রাজা ধান বিনামূল্যে বিতরণ করেন নাই, ঋণ-স্বরূপই দিয়াছিলেন; অর্থও ঋণ-স্বরূপই দিয়াছিলেন, ইহা লক্ষণীয়।

ধান্য

পরবর্তী কালের অসংখ্য লিপিতে এই ধান্য শস্যের উল্লেখ সর্বত্র নাই; কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ধান্যই ছিল একমাত্র উপজীব্য এই দেশের, এবং শস্য বলিতে ধান্যই বুঝাইত সর্বাগ্রে; তাহার নাম করিবার প্রয়োজন হইত না। এই ধান্য একান্তভাবে বারিনির্ভর; সেই জন্য অগণিত নদনদী-খালবিল থাকা সত্ত্বেও এ-দেশের ছড়ায়, গানে, পল্লীবচনে নানা লোকায়ত ব্রত ও পূজানুষ্ঠানে মেঘ ও আকাশের কাছে বারি-

প্রার্থনার বিরাম নাই; অতীতেও ছিল না, আজও নাই। লক্ষ্মণসেনের আহুলিয়া তর্পণদীঘি, গোবিন্দপুর ও শক্তিপুর এই চারিটি তাম্রশাসনে একটি মঙ্গলাচরণ শ্লোক আছে; এই শ্লোকটিতে ধান্যোপজীবী বাঙালীর আন্তরিক আকুতি ধ্বনিত হইয়াছে মনে করিলে অনৈতিহাসিক উক্তি কিছু করা হয় না।

> বিদ্যুদ্‌যত্র মণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
> বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালা বলাকাবলিঃ।
> ধ্যানাভ্যাসসমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঽঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
> ভূয়াদ্ বঃ স ভবার্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃ কপর্দাম্বুদঃ॥

ফণিপতির মণিদ্যুতি যাহাতে বিদ্যুৎস্বরূপ, বালেন্দু ইন্দ্রধনুস্বরূপ, স্বর্গতরঙ্গিণী বারিস্বরূপ, শ্বেতকপালমালা বলাকাস্বরূপ, যাহা ধ্যানাভ্যাসরূপ সমীরণের দ্বারা চালিত এবং যাহা ভবার্তিতাপভেদকারী, শম্ভুর এমন কপর্দরূপ অম্বুদ তোমাদের শ্রেয় শস্যের অঙ্কুরোদ্‌গমের কারণ হউক।

লক্ষ্মণসেনের আহুলিয়া-শাসনে ব্রাহ্মণদের অনেক গ্রামদানের উল্লেখ আছে; এই সব গ্রাম ছিল নানা শস্যক্ষেত্র এবং উপবন শোভায় অলংকৃত, এবং শস্যক্ষেত্রে শালি ধান্য জন্মাইত প্রচুর। কেশবসেনের ইদিলপুর-শাসনেও দেখা যাইতেছে, রাজা অনেক ব্রাহ্মণকে বহুগ্রাম দান করিয়াছিলেন; এই সব গ্রামে সুন্দর সমতল সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ছিল এবং সেই সব ক্ষেত্রে চমৎকার ধান উৎপন্ন হইত। ধান এবং ধান-চাষ ইত্যাদি সম্বন্ধে আরও খবর জানা যায়; দু'একটি উল্লেখ করিতেছি। রঘুবংশ কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বঙ্গাভিযানের উল্লেখ আছে; কালিদাস বলিতেছেন, ধানের চারাগাছ যেমন করিয়া একবার উৎপাটন করিয়া আবার রোপণ করা হয় রঘু তেমনই করিয়া বঙ্গজনদের একবার উৎখাত করিয়া আবার প্রতিরোপিত (উৎখাত-প্রতিরোপিতঃ) করিয়াছিলেন। কবিগুরুর বীক্ষণ-শক্তি ও স্থানীয় জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই ধরনের ধানের চাষ সহজ এবং নিরাপদ এবং বাংলাদেশের ও আসামাঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্য যে দুই ধরনের ধানের চাষ বাংলাদেশে প্রচলিত কালিদাস তাহাও জানিতেন কিনা, এই কৌতূহল প্রায় অনিবার্য। কাটা ধান মাড়াই করার পদ্ধতি এখন যেমন সুপ্রাচীন কালেও তেমনই ছিল বলিয়া মনে হয়। রামচরিত-কাব্যের কবি-প্রশস্তিতে ধানের 'খলা' বা মাড়াই-স্থানের ইঙ্গিত আছে, এবং গোলাকারে সাজানো কাটা ধানের উপর দিয়া গরু-বলদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাঁটিয়া কি করিয়া ধান মাড়াই করিত, তাহারও উল্লেখ আছে। কালিদাসের রঘুবংশ-কাব্যে ইক্ষুক্ষেত্রের ছায়ায় বসিয়া কৃষক রমণীগণ কর্তৃক শালিধান্য পাহারা দেবার কথা আছে, কিন্তু তাহা বাংলাদেশ সম্বন্ধে কিনা, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

ধান্য, বিশেষভাবে শালিধান্য এবং ইক্ষু সম্বন্ধে বাঙালী কবির কল্পনা নানাভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াছে। সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে উদ্ধৃত দুইটি বাঙালী কবির রচিত দুইটি শ্লোকে বর্ষায় ধানের ক্ষেত, হেমন্তে কাটা শালিধানের স্তূপ, আখের

ইক্ষু

ক্ষেত, আখ-মাড়াই কল ইত্যাদি লইয়া যে কবি-কল্পনা বিস্তারিত হইয়াছে তাহা অন্য প্রসঙ্গে (দেশ-পরিচয় অধ্যায়ে, জলবায়ু প্রসঙ্গে) উদ্ধার করিয়াছি। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সর্ষপ যে অন্যতম উৎপন্ন শস্য ছিল তাহার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি; বাপ্য-ঘোষবাট গ্রামের তাম্রপট্টোলীতে উল্লিখিত 'সর্ষপ-যানক' কথাটিতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সর্ষপ

য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ যে বাংলার সর্বত্রই প্রচুর ফলশস্য-সম্ভারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উক্তি মাত্রই নয়; ইহার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত রচিত তাম্রপট্টোলী গুলিতে। আমি আগেই বলিয়াছি, পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত রচিত লিপিগুলিতে ভূমিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। কিন্তু অষ্টম শতকে পাল-রাজত্বের আরম্ভের সূত্রপাত হইতেই এই উল্লেখ পাওয়া যায়। কি ভাবে তাহা পাওয়া যায় তাহা দেখা যাইতে পারে।

খালিমপুর-তাম্রশাসনে দেখিতেছি, ধর্মপাল চারিটি গ্রাম দান করিতেছেন হট্টিকা তলপাটক (বাটক ?) সমেত, উৎপাদিত শস্যাদির কোন উল্লেখ নাই। দেবপালের মুঙ্গের-শাসনে দেখিতেছি, মোষিকা নামক একটি গ্রাম দান করা হইতেছে "স্বসীমা-তৃণযূতিগোচর পর্যন্তঃ সতলঃ সোদ্দেশঃ সাম্র মধুকরঃ সজলস্থলঃ সমৎস্যঃ সতৃণঃ···"। যে-জমি দান করা হইতেছে তাহার উপর রাজা কোনও অধিকারই রাখিতেছেন না, শুধু ভূমির উপরকার স্বত্ব নয়, ভূমির নিম্নের স্বত্ব (সতলঃ), জলস্থলের স্বত্ব (সজলস্থলঃ সমৎস্যঃ), গাছগাছড়ার স্বত্ব সবই দান করিয়া দিতেছেন। তিনটি উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ এখানে আছে, আম্র, মহুয়া (মধুকঃ) ও মৎস্য। নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতেও অনুরূপ সংবাদই পাওয়া যায়, শুধু মৎস্যের উল্লেখ নাই। যাহাই হউক, মুঙ্গের ও ভাগলপুর-লিপির দু'টি গ্রামই হয়তো বর্তমান বিহার প্রদেশে, কাজেই এই সাক্ষ্য হয়তো বাংলা দেশের প্রতি প্রযোজ্য অনেকে না-ও মনে করিতে পারেন। কিন্তু, দেখিতেছি, দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে প্রাপ্ত প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসনে যে কুরটপল্লিকা গ্রাম দান করা হইতেছে, তাহার উৎপন্ন দ্রব্যাদির উল্লেখ ঠিক পূর্বোক্ত ভাগলপুর লিপিরই অনুরূপ; এখানেও মৎস্যের উল্লেখ নাই, কিন্তু আম ও মহুয়ার উল্লেখ আছে। প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল মোটামুটি একাদশ শতকের প্রথমার্ধ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অথচ, ইহার কিছু পূর্ববর্তী, অর্থাৎ দশম শতকের একটি শাসনে উৎপন্ন দ্রব্যাদির তালিকা অন্যরূপ। কম্বোজরাজ নয়পালদেবের ইর্দা তাম্রপট্টে বৃহৎছত্তিবন্না (যে-গ্রামে খুব বড় একটি ছাতিম গাছ ছিল ?) নামে একটি গ্রাম দানের উল্লেখ আছে। এই গ্রামটি বর্ধমানভুক্তির দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের অন্তর্গত। দণ্ডভুক্তি মেদিনীপুর জেলার দাঁতন অথবা দান্তন। এই গ্রামটি দান করা হইতেছে সমস্ত অধিকার সমেত; যাঁহাকে দান করা হইতেছে তিনিই ইহার সব কিছু ভোগ করিবেন; বাস্তুক্ষেত্র, জলাধার, গর্ত, মার্গ (পথ), পতিত বা

আম্র, মহুয়া মৎস্য

অনুর্বর জমি, জঞ্জাল বা আবর্জনা ফেলিবার জায়গা যাহাকে আমরা বলি আস্তাকুঁড় (= আবকরস্থান), লবণাকর, সহকার (আম) ও মধুক বৃক্ষের ফলফুল, অন্যান্য গাছ গাছড়া, হাট, ঘাট, পার বা খেয়া-ঘাট, (সহট্ট-ঘট্ট-সতর) ইত্যাদি সমস্তই তাহার ভোগ্য। ধান্য ও অন্যান্য শস্য ছাড়া, আম্র-মধুক ছাড়া, এখানে আর একটি উৎপন্ন দ্রব্যের খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহা লবণ। মেদিনীপুর জেলার দান্তন সমুদ্রতীরবর্তী। জোয়ার যখন আসে, তখন সমুদ্রতীরবর্তী অনেক স্থানই নোনাজলে ভাসিয়া ডুবিয়া যায়; বড় বড় গর্ত করিয়া লোকে এখনও সেই জল ধরিয়া রাখে, পরে রৌদ্রে অথবা জ্বাল দিয়া শুকাইয়া লবণ তৈরি করে। এই প্রথা প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ইর্দা লিপিটিতে। এই বড় বড় গর্তগুলিই শাসনোল্লিখিত লবণাকর। জল কিংবা তলের কিংবা পারঘাটের অধিকার ছাড়িয়া দিয়া রাজা যে ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ানুযায়ী বা অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী ভূমি দান করিতেছেন বলিয়া দেখিতেছি, তাহার অর্থ পরিষ্কার। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখি, জল, স্থল, পারঘাট ইত্যাদির অধিকার রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত; পারঘাটের আয় রাজার, ভূমির উপরকার অধিকার প্রজার হইলেও নীচেকার অধিকার রাষ্ট্র কখনও ছাড়িয়া দেয় না। সেইজন্যই যেখানে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, সেখানে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই অর্থশাস্ত্রেই দেখি, লবণে রাষ্ট্রের অথবা রাজার একচেটিয়া অধিকার। সেই একচেটিয়া অধিকারও ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে যেখানে রাজা ভূমিদান করিতেছেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে প্রাগ্‌জ্যোতিষভুক্তির কামরূপ-মণ্ডলের বাড়া বিষয়ে একটি গ্রামদানের উল্লেখ আছে; এই গ্রামটি দানের সর্ত 'জল-স্থল-খিলারণ্য-বাট-গোবাট-সংযুক্তং'। পথ-গোপথের অধিকারও ছাড়া হইতেছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য হইতেছে অরণ্যের উপর অধিকার ত্যাগ। অথচ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অরণ্য রাষ্ট্র-সম্পদ ও সম্পত্তি। এই অরণ্য-দানের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। কাঠ অর্থোৎপাদনের একটি প্রধান উপায়। মদনপালদেবের মনহলি তাম্রপট্টে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির কোটিবর্ষবিষয়ের হলাবর্তমণ্ডলে যে গ্রামদানের উল্লেখ আছে তাহাও দেখিতেছি সতলঃ... সাম্রমধুকঃ সজলস্থলঃ সগর্তোষরঃ সঝাট-বিটপঃ...। পুণ্ড্রবর্ধনেও তাহা হইলে বিস্তৃত মহুয়ার চাষ ছিল! এই মহুয়া গাছের আয় দুই প্রকারে —খাদ্য হিসাবে এবং মহুয়া-জাত আসব হইতে। মহুয়া-আসবের উল্লেখ কৌটিল্য তো বিশদভাবেই করিয়াছেন। ঝাট-বিটপও উল্লেখযোগ্য; বাঁশ অথবা অন্য গাছের ঝাড় ও অন্যান্য বড় গাছও এক রকমের অর্থাগমের উপায়। সাধারণ লোকেরা যে বাঁশের চাঁচের বেড়া দিয়াই ঘর-বাড়ি বাঁধিত (খুঁটিও ব্যবহার করিত নিশ্চয়ই), তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় শবরীপাদের একটি চর্যাগীতিতে—"চারিপাসে ছাইলারে দিয়া চঞ্চালী।" চঞ্চালী—চঞ্চারিকা যে আমাদের বাঁশের চাঁচারি এ-সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি? আর বাঁশের ব্যবসায় তো এখনও বাংলাদেশে সর্বত্র সুপরিচিত। খুব ভাল বাঁশের ঝাড় ছিল বরেন্দ্রীতে; রামচরিতে

লবণ

বাঁশ, কাঠ ও ইক্ষু

একথার প্রমাণ আছে। এই প্রসঙ্গেই সন্ধ্যাকর নন্দী একথাও বলিতেছেন যে, বরেন্দ্রীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম উপকরণ ছিল সেখানকার ইক্ষু বা আখের ক্ষেত। এই ভূমির প্রাচীনতর ও বৃহত্তর সংজ্ঞা হইতেছে পুণ্ড্র। ব্রাত্য পুণ্ড্রদের বাসস্থান পুণ্ড্রদেশ, পুণ্ড্রবর্ধন। এই পুণ্ড্র—পুঁড় কোম বোধ হয় আখের চাষে খুব দক্ষ ছিল, এবং হয়তো সেইজন্যই আখের অন্যতম নামই হইতেছে পুঁড়; এক জাতীয় দেশী আখকে বলে পুঁড়ি। আর একটি লক্ষণীয় নাম, গৌড়। গৌড় যে গুড় হইতে উৎপন্ন তাহার শব্দতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ সুবিদিত। এ তথ্যের মধ্যেও আখের চাষের ইঙ্গিত ধরিতে পারা কঠিন নয়। সুবিখ্যাত সুশ্রুত-গ্রন্থে পৌণ্ড্রক নামে এক প্রকার ইক্ষুর উল্লেখ আছে, এবং বহু সংস্কৃত নিঘণ্টু-রচয়িতা ও কোষকারদের মত এই যে, পুণ্ড্রদেশে যে-ইক্ষু জন্মাইত তাহাই পৌণ্ড্রক। আজকাল পৌড়িয়া, পুঁড়ি, পৌঁড়া প্রভৃতি নামে যে-ইক্ষু ভারতের সর্বত্র চাষ হইতে দেখা যায় তাহা এই পৌণ্ড্রক ইক্ষু নাম হইতেই উদ্ভূত। সুপ্রাচীন কালেই প্রাচ্যদেশের ইক্ষু ও ইক্ষুজাত দ্রব্য—চিনি ও গুড়—দেশে বিদেশে পরিচিত ছিল। গ্রীক লেখক ঈলিয়ন্ (Aelien) ইক্ষুদণ্ড পেষণ-জাত একপ্রকার প্রাচ্যদেশীয় মধুর (পাতলা ঝোলা গুড়?) কথা বলিতেছেন। ইক্ষুনল পেষণ করিয়া একপ্রকার মিষ্টরস আহরণ করিত গঙ্গাতীরবাসী লোকেরা, একথা বলিতেছেন অন্যতম গ্রীক লেখক লুক্যান (Lukan); এ সমস্তই খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীর কথা।

উৎপন্ন দ্রব্যাদির, অবশ্যই ধান্য ও অন্য শস্য ছাড়া, বিস্তৃততর উল্লেখ আমরা পাই পরবর্তী লিপিগুলিতে। একাদশ শতকের শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসনে পাই "সতলা।··· সাম্রপনসা। সগুবাক-নালিকেরা সলবণা সজলস্থলা···।" দ্বাদশ শতকের ভোজবর্মণের বেলব লিপিতে পাই "সাম্রপনসা সগুবাকনালিকেরা সলবণা সজলস্থলা সগর্তোষরা।" বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির খবর পাওয়া যায় না; এই রাজারই বারাকপুর শাসনেও তাহাই, কিন্তু শেষোক্তটিতে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির খাড়িমণ্ডলের যে-গ্রামে চার পাটক ভূমিদানের উল্লেখ আছে তাহার উৎপত্তি মূল্য (বার্ষিক আয়?) ছিল দুই শত কপর্দক পুরাণ। চার কড়িতে এক গণ্ডা, ষোল গণ্ডায় এক কপর্দক পুরাণ। বল্লালসেনের নৈহাটি-তাম্রপট্টে বর্ধমানভুক্তির উত্তর-রাঢ়মণ্ডলের স্বল্পদক্ষিণবীথির অন্তর্গত বাল্লহিঠ্ঠা গ্রামে কিছু ভূমিদানের উল্লেখ আছে; এই ভূমির পরিমাণ বৃষভশংকর অর্থাৎ বিজয়সেনীয় নলের মাপে ৪০ উন্মান ৩ কাক। ইহার উৎপত্তি মূল্য ৫০০ কপর্দকপুরাণ এবং এই আয়ের অন্তত কিয়দংশ পাওয়া যাইতেছে ভূমিসম্বদ্ধ 'ঝাট-বিটপ-গর্তোষর-জলস্থল-গুবাক-নারিকেল' হইতে। লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি-শাসনেও অন্যতম আয়ের পথ ঝাটবিটপ ও গুবাক-নারিকেল। দত্তভূমি পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বেলাহিষ্ঠী গ্রামে; ভূমির পরিমাণ ১২০ আঢাবাপ, ৫ উন্মান; উৎপত্তি মূল্য ১৫০ কপর্দকপুরাণ। এই নৃপতিরই মাধাইনগর-লিপিতে দত্তভূমি বরেন্দ্রীর অন্তর্গত কান্তাপুরের নিকট দাপনিয়াপাটক গ্রাম, গ্রামটির পরিমাণ ১০০ ভূখাড়ী, ৯১ খাড়িকা; উৎপত্তি মূল্য ১৬৮ (?)

পান, গুবাক নারিকেল

কপর্দকপুরাণ (কপর্দকাষ্টষষ্টিপুরাণাধিকশত — কপর্দকাষ্টষষ্ঠ্যাধিকপুরাণশত)। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-শাসনেও অন্যতম আয়ের পথ ঝাটবিটপ এবং গুবাক-নারিকেল। দত্তভূমি বর্ধমানভুক্তির পশ্চিম-খাটিকার বেতড্ড চতুরক (— বেতড়) অন্তর্গত বিড্ডারশাসন গ্রাম; পূর্বে গঙ্গা। ভূমির পরিমাণ ৬০ দ্রোণ, ১৭ উন্মান; উৎপত্তি মূল্য ৯০০ পুরাণ, দ্রোণ প্রতি ১৫ পুরাণ। আনুলিয়া-শাসনে দত্তভূমি পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির ব্যাঘ্রতটী অন্তর্গত মাথরণ্ডিয়া-পণ্ডক্ষেত্র; ভূমির পরিমাণ ১ পাটক, ৯ দ্রোণ, এক আঢ়াবাপ, ৩৭ উন্মান, এবং ১ কাকিনিকা; বার্ষিক উৎপত্তি মূল্য ১০০ কপর্দক পুরাণ, এবং আয়ের অন্যতম উপকরণ ঝাটবিটপ ও গুবাক-নারিকেল। সুন্দরবন-শাসনে দত্তভূমির পরিমাণ ৩ ভূদ্রোণ, ১ খাড়িকা (?), ২৩ উন্মান, এবং ২৷৷০ কাকিনি; উৎপত্তি মূল্য ৫০ পুরাণ; ভূমি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির খাড়িমণ্ডলের কান্থল্লপুর চতুরকের মণ্ডল গ্রামে। আয়ের অন্যতম উপকরণ এ-ক্ষেত্রেও ঝাটবিটপ ও গুবাক-নারিকেল। ত্রয়োদশ শতকে বিশ্বরূপসেন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎশাসনদ্বারা নানা তিথিপর্ব উপলক্ষে পুণ্ড্র-বর্ধনভুক্তির সমুদ্রতীরশায়ী নিম্ন প্রদেশে বিভিন্ন গ্রামে ১১টি ভূখণ্ড দান করিয়াছিলেন। দুইটি ভূখণ্ড দিয়াছিলেন বঙ্গের নাব্য খণ্ডে (নৌকা চলাচলযোগ্য) রামসিদ্ধি পাটকে; ভূমির পরিমাণ ৬৭$\frac{১}{৪}$ উন্মান, উৎপত্তিক ১০০ পুরাণ; এই আয়ের প্রায় এক পঞ্চমাংশ (১৯$\frac{১}{১৬}$) পানের বরজ হইতে। এই নাব্যখণ্ডেই বিনয়তিলক গ্রামে দত্ত ২৫ উদান (উন্মান) ভূমির উৎপত্তিক ছিল ৬০ পুরাণ; মধুক্ষীরকা আবৃত্তির নবসংগ্রহচতুরকে অজিকুলা পাটকে দত্তভূমির পরিমাণ ১৬৫ উন্মান, উৎপত্তিক ১৪০ পুরাণ; বিক্রমপুরের লাউহণ্ডাচতুরকের দেউলহস্তী গ্রামে দত্ত পাঁচটি ভূখণ্ডের পরিমাণ ৪২ উন্মান, উৎপত্তিক ১০০ পুরাণ; চন্দ্রদ্বীপের ঘাঘরকাট্টি পাটক ও পাতিলাদিবীক গ্রামে দত্তভূমির পরিমাণ ৩৬$\frac{১}{৪}$ উন্মান, উৎপত্তিক ১০০ পুরাণ। মোট দত্তভূমির পরিমাণ ছিল ৩৩৬$\frac{১}{২}$ উন্মান, উৎপত্তিক ছিল ৫০০ পুরাণ। এই ভূমি নালভূমি (অর্থাৎ কৃষিভূমি) ও বাস্তুভূমি দুইই ছিল, এবং আয়ের প্রধান উপকরণ ছিল পানের বরজ ও গুবাক-নারিকেল। রামসিদ্ধি পাটকে যে ৬৭$\frac{১}{৪}$ উন্মান ভূমি দেওয়া হইয়াছিল তাহার বার্ষিক উৎপত্তিক ছিল ১০০ পুরাণ, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি; তাহার প্রায় এক পঞ্চমাংশ (১৯$\frac{১}{১৬}$ — ১৯ পুরাণ, ১১ গণ্ডা) আয় হইত শুধু পানের বরজ হইতে। বাকি চারি অংশ পরিমাণ আয় যে অন্যান্য উৎপন্ন শস্যাদি হইতে এবং অন্যান্য উপায়ে হইত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সে-সবের উল্লেখ নাই। অন্যান্য লিপিতেও এইরূপই; ধান্য ও অন্যান্য শস্য, মৎস্য ইত্যাদি উপকরণ অনুল্লিখিতই থাকিত। বিশ্বরূপ তাঁহার মদনপাড়া-তাম্রপট্টোলী দ্বারা পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির 'বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে' পিঞ্জোকাষ্ঠি গ্রামে আরও দুইটি ভূখণ্ড দান করিয়াছিলেন; এই দুই খণ্ড ভূমির আয় ছিল ৬২৭ পুরাণ, এবং প্রধান উল্লিখিত উপকরণ এক্ষেত্রেও গুবাক-নারিকেল। বিশ্বরূপের ভ্রাতা কেশবসেন এই 'বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে'ই তলপাড়াপাটক নামে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন; এই গ্রামটির মূল্য (না, বার্ষিক উৎপত্তিক) রাজসরকারে নির্ধারিত ছিল ২০০ শত [দ্রম্ম ?]। এখানেও গুবাক-নারিকেল

হইতেছে অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ; এই গুবাক নারিকেল গাছ ইত্যাদি সহই যে গ্রামটি দান করা হইতেছে শুধু তাহাই নয়, দান-গ্রহীতা নীতিপাঠক ঈশ্বরদেবশর্মণকে বলা হইতেছে, তিনি যেন মন্দির ও পুষ্করিণী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করাইয়া (দেবকুল-পুষ্করিণ্যাদিকং কারয়িত্বা) এবং গুবাক-নারিকেল গাছ ইত্যাদি লাগাইয়া (গুবাক-নারিকেলাদিকং লগ্‌গাবয়িত্বা) এই গ্রাম যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ভোগ করিতে থাকেন। গুবাক ও নারিকেলই যে ধান্য ইত্যাদি শস্যের পরেই এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল, এই নির্দেশই তাহার প্রমাণ। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে জনৈক রাজা দামোদর পৃথ্বীধর নামক এক ব্রাহ্মণকে ৫ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, তিন দ্রোণ ডাম্বরডাম গ্রামে, দুই দ্রোণ কেটঙ্গপাল গ্রামে। ভূমির আয় বা উৎপন্ন দ্রব্যাদির কোনও খবরই চট্টগ্রামে প্রাপ্ত এই শাসনে উল্লেখ নাই, তবে ডাম্বরডাম গ্রামের দক্ষিণ-সীমায় 'লবণোৎসবাশ্রমদণ্ডাধা-বাটী'র উল্লেখ হইতে মনে হয়, এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল লবণ, এবং লবণ উত্তোলন, অথবা এই ধরনের লবণ-সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে উৎসবও হইত, যেমন নবান্ন উপলক্ষে আজও হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী দেশে ইহা কিছু অসম্ভবও নহে। দনুজমাধব দশরথদেব সেনরাজবংশ অবসানের পর ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে পূর্ব-বাংলার রাজা হইয়াছিলেন। তিনি একবার অনেক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে পৃথক পৃথক ভাবে অনেকগুলি ভূখণ্ড দান করিয়াছিলেন। এই ভূখণ্ডগুলির সমগ্র উৎপত্তিকের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০০ পুরাণ। বিক্রমপুর পরগণায় আদাবাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত এক তাম্রপট্টে ইহার বিস্তৃত খবর পাওয়া যায় ; দত্ত ভূখণ্ডগুলি আদাবাড়ীতে এবং আদাবাড়ীরই নিকটস্থ অন্যান্য গ্রামে, কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিশেষ উল্লেখ তাহাতে নাই।

অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সমস্ত লেখমালাগুলি এবং রামচরিত ও অন্যান্য গ্রন্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল, ধান্য এবং অন্যান্য শস্য ছাড়া প্রাচীন বাংলার প্রধান ভূমি ও কৃষিজাত দ্রব্য হইতেছে, আম্র অথবা সহকার, মধুক অর্থাৎ মহুয়া, পনস অর্থাৎ কাঁটাল, ইক্ষু, ডালিম্ব বা দাড়িম্ব, পর্কটি, খর্জুর, বীজ, গুবাক অর্থাৎ সুপারি, নারিকেল, পান, মৎস্য ও লবণ। আম তো বাংলাদেশের সর্বত্রই জন্মায়, কমবেশি এই মাত্র ; এই জন্যই প্রায় সব ক'টি লিপিতেই আমের উল্লেখ আছেই। মহুয়ার উল্লেখ যে ক'টি লিপিতে এবং অন্যান্য জায়গায় আছে প্রত্যেকটিরই স্থানের ইঙ্গিত উত্তর-বঙ্গে, শুধু ইর্দা তাম্রপট্টের ইঙ্গিত মেদিনীপুর জেলার দাঁতনের দিকে। মহুয়ার চাষ এই অঞ্চলে নিশ্চয়ই তখন ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ শাসনেও মহুয়া বা মধুকের উল্লেখ দেখা যায়। পনস অর্থাৎ কাঁটালের ইঙ্গিত পাইতেছি বিশেষ ভাবে পূর্ব-বাংলায়, ঢাকা অঞ্চলে। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ কিন্তু বলিতেছেন কাঁটাল প্রচুর জন্মাইত পুণ্ড্রবর্ধনে, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে, এবং সেখানে এই ফলের আদরও ছিল খুব। গুবাক ও নারিকেল তো এখনও প্রচুরতর পরিমাণে জন্মায় বাংলার গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথী-

আম, মহুয়া কাঁটাল ও অন্যান্য ফল

করতোয়া ও বিশেষভাবে সমুদ্রতীর-নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে; এবং আশ্চর্যের বিষয় লেখমালার ইঙ্গিতও তাই। ইক্ষুর কথা তো আগেই বলিয়াছি। বিচিত্র উল্লেখ হইতে মনে হয়, ইক্ষুচাষের প্রধানতম স্থান ছিল উত্তর-বঙ্গ, তবে গঙ্গা-ভাগীরথী বাহিত দেশগুলিতেও বোধ হয় কিছু কিছু জন্মাইত। এক ডালিম্ব ক্ষেত্রের উল্লেখ পাইতেছি লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর পট্টোলীতে; ইহার অবস্থিতি ছিল বর্তমান হাওড়া জেলায় বেতড় গ্রামের নিকটেই, গঙ্গাতীরের সন্নিকটে। পর্কটি বৃক্ষের উল্লেখ পাইতেছি একাধিক পট্টোলীতে; ইহাদের মধ্যে ধর্মাদিত্যের কোটালিপাড়া-শাসন অন্যতম। বীজফল ও খেজুরের উল্লেখ তো ধর্মপালের খালিমপুর-লিপিতেই আছে। কদলী বৃক্ষ বা কলের উল্লেখ কোনও পট্টোলীতে বড় একটা দেখা যাইতেছে না; কিন্তু পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকে এবং নানা প্রস্তরচিত্রে বারবার ফলসমন্বিত বা ফলবিযুক্ত কলাগাছের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেই অষ্ট্রিক্-আদি অস্ট্রেলিয় আমল হইতেই কলা বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। উত্তর-রাঢ়ে, বরেন্দ্রীতে গুবাক ও নারিকেলের উল্লেখ পাইতেছি, সন্দেহ নাই; শুধু যে লিপিগুলিতেই আছে তাহা নয়, রামচরিতেও আছে। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ আছে যে, বরেন্দ্রীর মাটি নারিকেল উৎপাদনের পক্ষে খুব প্রশস্ত। যাহাই হউক, বাংলাদেশের সর্বত্রই তো সুপারি নারিকেল জন্মায়, তবু অধিক উল্লেখ পাই বঙ্গে বিক্রমপুর-ভাগে, সুন্দরবনের খাড়িমণ্ডলে, বঙ্গের নাব্য অর্থাৎ নিম্ন জলাভূমি অঞ্চলে, ঢাকা জেলার পদ্মাতীরবর্তী ভূমি অঞ্চলে। খড়্গবংশীয় রাজা দেবখড়্গের (অষ্টম শতক) আস্রফপুর তাম্র-পট্টোলী (২নং) দ্বারা তলপাটক গ্রামে ¼ পাটক ভূমি দান করা হইতেছে, এবং এই ভূমিখণ্ডে যে দুইটি সুপারি বাগান (গুবাক বাস্তুদ্বয়েন সহ) আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, সুপারির আদর কতটুকু ছিল ধন-সম্বল হিসাবে। পানের বরজের উল্লেখ যে পাই, সে-ও বঙ্গের নাব্য প্রদেশে; অন্যান্য স্থানেও হইত সন্দেহ নাই। মৎস্যের সবিশেষ উল্লেখ বাংলার কোনও লিপি অথবা শাসনে নাই, কিন্তু যখনই ভূমি দান করা হইয়াছে, সজল অর্থাৎ জলাধার, খাল, বিল, প্রণালী, নালা, পুষ্করিণী ইত্যাদির অধিকার সমেতই দান করা হইয়াছে; অষ্টম শতক-পরবর্তী শাসনগুলিতে সর্বত্রই তাহার উল্লেখও আছে। এই যে 'সজল' ভূমি দান, ইহা 'সমৎস্য' দান, এই অনুমান কিছু অসংগত নয়। তাহা ছাড়া, এই নদনদীবহুল খালবিলাকীর্ণ বাংলাদেশে মৎস্য যে একটি প্রধান সামাজিক ধনসম্পদ্ প্রাচীন কালেও ছিল, তাহাও সহজেই অনুমেয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অরণ্য এবং বহু ক্ষেত্রেই ঝাটবিটপ, তরুষণ্ডাদিসহ ভূমি দান করা হইয়াছে; ইহার আয়ও কম ছিল না। ঝাট অথবা ঝাড় আমার তো বাঁশের ঝাঁড় বলিয়াই সন্দেহ হয়, এবং অরণ্য ও বিটপ যে কাঠের কাঁচা মাল তাহাও সুস্পষ্ট। বাঁশ ও কাঠ এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের অন্যতম ধন-সম্বল। লবণ ঠিক কৃষিজাত অথবা ভূমিজাত দ্রব্য না হইলেও এই সঙ্গেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ-কথা অনেকেই জানেন, বাংলার সমুদ্রতীরের নিম্নভূমিগুলিতে

কিংবা পদ্মার উজান বাহিয়া জোয়ারের জল সামুদ্রিক লবণ বহন করিয়া আনে। এই অঞ্চলের লোকেরা কি করিয়া লবণ প্রস্তুত করে, তাহা আগেই বলিয়াছি। সেই জন্যই দেখা যাইবে, উল্লিখিত শাসনগুলিতে যেখানে 'সলবণ' ভূমি দান করা হইতেছে, সেই ভূমি সর্বদাই সমুদ্রতীরবর্তী নিম্নভূমিতে অথবা পদ্মার তীরে তীরে, ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ-নারায়ণগঞ্জের পদ্মাতীরে, মেদিনীপুর জেলার দাঁতনে, চট্টগ্রামে। বিক্রমপুরে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা শাসনে যে লোনিয়াজোড়া-প্রস্তরের উল্লেখ আছে, তাহা যে লবণের গর্তের মাঠ, তাহা তো বোধ হয় সহজেই অনুমান করা চলে। ইহাও বিক্রমপুর অঞ্চলে।

প্রাকৃত বাঙালীর খাদ্য
ভাত, শাক, দুধ, মাছ, ঘি

এই সব ছাড়া আরও কিছু কিছু ভূমিজাত অথবা বৃহত্তর অর্থে কৃষি-সম্পর্কিত দ্রব্যাদির খবর ইতস্তত অনুসন্ধানে জানা যায়। যেমন, বিদ্যাপতি তাঁহার কীর্তিকৌমুদী-গ্রন্থে গৌড় দেশকে "আজ্যসার গৌড়" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। আজ্য অর্থে ঘৃত, আজ্য বা ঘৃত যে-গৌড় দেশের শ্রেষ্ঠ বস্তু, সেই গৌড় হইল আজ্যসার গৌড়; তাহাকে রাজা মোদকের মতন করতলগত করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতকের অপভ্রংশ ভাষায় রচিত প্রাকৃত-পৈঙ্গল-গ্রন্থের একটি পদে প্রাকৃত বাঙালীসুলভ যে আহার্য-বর্ণনা আছে, তাহাতে কলাপাতায় ওগরা ভাত ও নালিতা শাক এবং মৌরলা মাছের সঙ্গে সঙ্গে গব্য (মহিষের নয়) ঘৃত ও দুগ্ধের উল্লেখ আছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে দেখিতেছি, বরেন্দ্রভূমিতে

এলাচ, লবঙ্গ, লঙ্কা, তেজপাতা

এলাচের সুবিস্তৃত চাষ ছিল, এবং সেই সব ক্ষেতে খুব ভাল এলাচ উৎপন্ন হইত। প্রিয়ঙ্গুলতাও উৎপন্ন হইত প্রচুর। এলাচ ও প্রিয়ঙ্গু-সরিষা যেমন হইত লবঙ্গও জন্মাইত তেমনই প্রচুর। সরিষার বাণিজ্যিক চাহিদা কেমন ছিল জানা নাই; কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য মসলার সঙ্গে সঙ্গে এলাচ ও লবঙ্গ যে প্রচুর পরিমাণে পশ্চিম এসিয়া, মিসর এবং পূর্ব ও দক্ষিণ য়ুরোপে রপ্তানি হইত, পেরিপ্লাস-গ্রন্থ ও টলেমির ইণ্ডিকা-গ্রন্থেই সে-প্রমাণ আছে। রাজশেখর তাঁহার কাব্য-মীমাংসা গ্রন্থে পূর্বদেশে ১৬টি জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, অঙ্গ, কলিঙ্গ, কোসল, তোসল, উৎকল, মগধ, মুদ্গর (মুদ্গগিরি=মুঙ্গের), বিদেহ, নেপাল, পুণ্ড্র, প্রাগ্‌-জ্যোতিষ, তাম্রলিপ্তক, মলদ, মল্লবর্তক, সুহ্ম ও ব্রহ্মোত্তর। এই ষোলটি জনপদের উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষুদ্র একটি তালিকাও তিনি দিয়াছেন; যথা, লবলী, গ্রন্থিপর্ণক, অগুরু, দ্রাক্ষা, কস্তুরিকা। এই তালিকা রাজশেখর কি উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন, বলা শক্ত; কিন্তু এ কথা বুঝা শক্ত নয় যে, তিনি গন্ধদ্রব্য এবং আয়ুর্বেদীয় উপকরণের একটি ক্ষুদ্র তালিকা মাত্র দিয়াছেন। এই তালিকায় দ্রাক্ষা দ্রব্যটি সন্দেহজনক। যে কয়টি দেশের নাম তিনি করিয়াছেন তাহাদের কোথাও দ্রাক্ষা জন্মান প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। আমার মনে হয়, দ্রব্যটি হইবে লাক্ষা; এটি লিপিকর-প্রমাদ, অশুদ্ধ পাঠ। দ্রাক্ষা হয় না বটে, কিন্তু পূর্ব-ভারতের অনেক স্থানে লাক্ষা জন্মায়। এই ষোলটি জনপদের চারিটি বর্তমান বাংলা দেশে; যথা,—পুণ্ড্র,

তাম্রলিপ্তক, সুহ্ম ও ব্রহ্মোত্তর। লাক্ষা রাঢ়দেশে ও উত্তরবঙ্গে বা বরেন্দ্রভূমিতে এখনও জন্মায়। অগুরু বাংলা দেশে কোথাও জন্মায় কি না, জানি না; তবে কামরূপের নানা জায়গায় জন্মায়, তাহার প্রমাণ পাইতেছি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও তাহার টীকায়। তবে, ইব্ন খুর্দদ্বা নামে একজন আরব ভৌগোলিক (দশম শতক) রহ্মি দেশে (রহন্—আরাকান্) অগুরু কাষ্ঠ জন্মায়, এ কথা বলিতেছেন। কস্তুরী বা কস্তুরিকা নেপালে হিমালয়ের পাদদেশে হয়তো পাওয়া যাইত; পূর্বদেশের অন্য কোনও জনপদে কস্তুরীমৃগের বিচরণস্থান ছিল বলিয়া জানি না, তবে কস্তুরিকা নামে একপ্রকার ভৈষজ্য আছে; রাজশেখর তাহারও ইঙ্গিত করিয়া থাকিতে পারেন। লবলী বরেন্দ্রীতে প্রচুর জন্মাইত; তাহার উল্লেখ রামচরিতে আছে (৩, ১১)। এই শ্লোকেই উল্লিখিত আছে যে, বরেন্দ্রী দেশে বড় বড় লকুচ, শ্রীফল ও খাদ্যোপযোগী কন্দমূল জন্মাইত।

অগুরু, কস্তুরী

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের টীকাকার বাংলা দেশের একটি আকরজ দ্রব্যের খবর দিতেছেন। কৌটিল্য যে-অধ্যায়ে মণিরত্নের খবর বলিতেছেন, সেই অধ্যায়ে হীরামণির উল্লেখ আছে। টীকাকার এই হীরামণির খনি কোথায় কোথায় ছিল, তাহার একটি নাতিদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন: এই তালিকার দুইটি জনপদ নিঃসন্দেহে বাংলা দেশে; তাহাদের নাম, টীকাকারের ভাষায়—পৌণ্ড্রক এবং ত্রিপুর (=ত্রিপুরা)। জৈন আচারঙ্গ সূত্রের মতে রাঢ় দেশের দুইটি বিভাগ ছিল, বজ্রভূমি ও সুব্ভভূমি (=সুহ্মভূমি)। বজ্রভূমিতে খুব সম্ভব হীরার খনি ছিল, এবং তাহা হইতেই বজ্রভূমি নামের উৎপত্তি। আইন-ই-আক্‌বরী-গ্রন্থে কিন্তু মদারণ বা গড় মন্দারণে এক হীরার খনির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভূমি হয়তো পশ্চিম দিকে বিহার-সীমায় অবস্থিত কোখ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জাহাঙ্গীরের আমলে কোখ্রায় একাধিক হীরাখনির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি আকরজ দ্রব্যের উল্লেখও অর্থশাস্ত্রে দেখা যায়। গৌড়িক নামক একপ্রকার খনিজ-রৌপ্যের নাম কৌটিল্য করিয়াছেন, এবং তাহা যে গৌড়দেশোৎপন্ন, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। টীকাকার বলিতেছেন, এই রৌপ্যের রঙ্ অগুরু ফুলের মতন।

হীরা, মুক্তা, সোনা, রূপা, তামা, লোহা ইত্যাদি

আর একটি খনিজ দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় কতকটা অর্বাচীন একটি গ্রন্থে—ভবিষ্য পুরাণে। এই গ্রন্থ কতটা প্রাচীন এবং ইহার ব্রহ্মখণ্ড প্রক্ষিপ্ত, না মূল গ্রন্থের সমসাময়িক, বলা কঠিন। এ কথা সত্য যে, গ্রন্থটি খুব প্রাচীন নয়, এবং আদিপর্বের সমসাময়িক প্রমাণও হয়তো নয়। ইহার ব্রহ্মখণ্ডে রাঢ়দেশের জঙ্গল-বিভাগের বিবরণে আছে:

ত্রিভাগং জাঙ্গলং তত্র গ্রামশ্চৈবৈকভাগকঃ।
স্বল্পা ভূমিরুর্বরা চ বহুলা চোষরা মতাঃ॥
রারী[টী] খণ্ডজাঙ্গলে চ লৌহধাতোঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ
আকরো ভবিতা তত্র কলিকালে বিশেষতঃ॥

এখানে রাঢ়দেশের জাঙ্গলখণ্ডে লৌহখনির উল্লেখ আমরা পাইতেছি। বাঁকুড়া বীরভূমে সাঁওতাল ভূমে তো এখনও জায়গায় জায়গায় লোহা আহরণ এবং লোহার তৈজসপত্র, গৃহোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি তৈরি করা স্থানীয় দরিদ্রতর জনসাধারণের জীবন-ধারণের অন্যতম উপায়। এসব জায়গার লোহা গলানোর পদ্ধতিও প্রাগৈতিহাসিক। ভারতবর্ষের বৃহত্তম লৌহ কারখানা তো এখনও বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা সংলগ্ন। তাম্র বা তামা সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা। সুবর্ণরেখার তীর ধরিয়া জামসেদপুর এবং তারপর পশ্চিমে চক্রধরপুর ছাড়াইয়া সমানেই তাম্র সমাবেশ এবং তাম্রখনিনিচয়। আমার তো মনে হয়, তাম্রলিপ্তি নামটির মধ্যেও এই তাম্রসমৃদ্ধির স্মৃতি জড়িত। এই স্মৃতিও প্রাগৈতিহাসিক।

বাংলাদেশের হীরা সমৃদ্ধির প্রমাণ আরও কিছু আছে। রত্নপরীক্ষা, বৃহৎ সংহিতা, নবরত্নপরীক্ষা, রত্নসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে সর্বত্রই উল্লেখ আছে, পৌণ্ড্রদেশ একসময় হীরার জন্য বিখ্যাত ছিল; অগস্তি মত-গ্রন্থের মতে বঙ্গেও কিছু কিছু হীরা পাওয়া যাইত। তবে, মনে হয়, এই সমৃদ্ধি খ্রীষ্টপূর্ব শতকের; পেরিপ্লাস-গ্রন্থের সময় সে-সমৃদ্ধি আর ছিল না। পেরিপ্লাসে গাঙ্গেয় মুক্তার উল্লেখের কথা আগেই বলা হইয়াছে: তাহা ছাড়া, রত্নপরীক্ষা গ্রন্থে এবং মহাভারতের সভাপর্বে পূর্বদেশে সমুদ্রতীরের জনপদগুলিতে মুক্তা সমৃদ্ধির উল্লেখ আছে।

বাংলা দেশের রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি ও সংস্থাপনার মধ্যে হস্তীর একটি প্রধান স্থান ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে পাই, Prasioi=প্রাচ্য ও Gangaridae=গঙ্গা-রাষ্ট্রের সম্রাট Agrammes বা ঔগ্রসৈন্যের সামরিক শক্তি অনেকটা হস্তীর উপর নির্ভর করিত। পাল ও সেন-রাজাদের হস্তী, অশ্ব ও নৌবল লইয়াই ছিল সামরিক শক্তি। এই হস্তী আসিত কোথা হইতে? কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে, কলিঙ্গ, অঙ্গ, করূষ এবং পূর্বদেশীয় হস্তীই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই পূর্বদেশ বলিতে কৌটিল্য বাংলাদেশ, বিশেষভাবে উত্তর-বঙ্গ ও কামরূপের পার্বত্য অঞ্চলের কথা বলিতেছেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এখনও তো গারো পাহাড় অঞ্চল হাতীর জায়গা। আর এই বাংলাদেশেই তো পরবর্তী কালে হাতী ধরার এবং হস্তী-আয়ুর্বেদ নামে এক বিশেষ বিদ্যা ও শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল, সে-কথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বহুদিন আগেই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গৌড়দেশ যে হাতীর জন্য বিখ্যাত ছিল তাহা রাজতরঙ্গিণীর কবির নিকটও সুবিদিত ছিল। প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্র দেশ যে হাতীর জন্য বিখ্যাত ছিল, তাহা মেগাস্থিনিসের বিবরণে, এবং কামরূপের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে (গারো পাহাড়ে?) যূথবদ্ধ হাতী বিচরণ করিত তাহা য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণে জানা যায়। জীবজন্তু পশুপক্ষীও দেশের ধনসম্বলের মধ্যে গণ্য। হাতী ছাড়া অন্যান্য পশুর উল্লেখ কিছু কিছু বাংলার লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। লোক-নাথের ত্রিপুরা পট্টোলিতে একটি গহন বন কাটিয়া নূতন এক গ্রাম পত্তন করিবার কথা

পশুপক্ষী
হাতী, হরিণ, মহিষ,
বরাহ, ব্যাঘ্র
ইত্যাদি

আছে ; সেই বনে যে-সব জীবজন্তুর উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে হরিণ, মহিষ, বরাহ, ব্যাঘ্র ও সর্প অন্যতম। আদিম বাঙালীর সর্প ও ব্যাঘ্রভীতি সুবিদিত, এবং এই দুইটি প্রাণী ভয় দেখাইয়া কি করিয়া তাহাদের পূজা আদায় করিয়াছিল তাহাও এখন আর অবিদিত নয়। মধ্যযুগে মনসাপূজা এবং দক্ষিণরায় বা ব্যাঘ্রপূজার বিস্তৃত প্রচলন এই দুইটি প্রাণী হইতেই। বনবহুল বৃষ্টিবহুল গ্রীষ্মপ্রধান এই দেশে এই দুয়েরই অপ্রতিহত প্রভাব। বিশেষভাবে বনময় জলময় সমুদ্রতীরবর্তী দেশগুলি তো এই দুই প্রাণীর লীলাস্থল। পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকগুলিতে এবং কোনো কোনো প্রস্তরচিত্রে আরও অন্যান্য নানা জীবজন্তুর পরিচয় পাওয়া যায় ; তাহার মধ্যে গরু, বানর, হরিণ, শূকর, ঘোড়া ও উট্‌ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দুইটি প্রাণী বিদেশাগত, সন্দেহ নাই এবং যুদ্ধ ও বাণিজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারেই হয়তো ইহাদের আমদানি হইয়াছিল। পক্ষীর উল্লেখ ও পরিচয় কমই পাওয়া যায় ; তবে হাঁস, বন্য ও গৃহপালিত কুক্কুট, কপোত, নানাজাতীয় জলচর বিহঙ্গ, কাক ও কোকিলের উল্লেখ ও পরিচয় লিপিগুলিতে, মৃৎ ও প্রস্তরচিত্রে ও সমসাময়িক সাহিত্যে দুর্লভ নয়। বাঘ, হরিণ, বন্যমহিষ, নানাপ্রকার হাঁস, বানর ইত্যাদি যে বাংলার সাধারণ বন্যজন্তু তাহা মধ্যযুগের Ralph Fitch (1583-91), Fernandus (1598). Fonseca (1599) প্রভৃতি পর্যটকদের বিবরণী পড়িলেও জানিতে পারা যায়।

৪

বাংলার শিল্পজাত দ্রব্যাদির কথা বলিতে গিয়া প্রথমেই বলিতে হয় বস্ত্রশিল্পের কথা। বাংলা দেশের বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্বেই দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং ইহাই যে এ-দেশের প্রধান শিল্প ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, Periplus Erythri Mari নামক গ্রন্থে, আরব, চীন ও ইতালীয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের বৃত্তান্তের মধ্যে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সাক্ষ্যই প্রথম উদ্ধৃত করা যাক। কৌটিল্য বলিতেছেন, বঙ্গদেশের (বাঙ্গক) দুকূল খুব নরম ও সাদা ; পুণ্ড্রদেশের (পৌণ্ড্রক) দুকূল শ্যামবর্ণ এবং দেখিতে মণির মত পেলব ; সুবর্ণকুড্যদেশের (কামরূপ) দুকূলের রং নবোদিত সূর্যের মতন। টীকাকার যোজনা করিতেছেন, দুকূল বস্ত্র খুব সূক্ষ্ম, ক্ষৌম বস্ত্র, একটু মোটা। পত্রোর্ণ (জাত) বস্ত্র মগধ (মাগধিকা), সুবর্ণকুড্যক (সৌবর্ণ্যকুড্যকা) অর্থাৎ কামরূপ এবং পুণ্ড্রদেশে (পৌণ্ড্রিকা) উৎপন্ন হইত। পত্রোর্ণজাত বস্ত্র বোধ হয় এণ্ডি ও মুগাজাতীয় বস্ত্র (পত্র হইতে যাহার উর্ণা—পত্রোর্ণ?)। অমরকোষের মতে পত্রোর্ণ সাদা অথবা ধোয়া কৌষেয় বস্ত্র ; টীকাকার পরিষ্কার বলিতেছেন, কীট বিশেষের জিহ্বারস কোন কোন বৃক্ষপত্রকে এই ধরনের উর্ণায় রূপান্তরিত করে। লক্ষণীয় এই যে,

শিল্পজাত দ্রব্যাদি

বস্ত্রশিল্প

কৌটিল্যোক্ত দেশগুলিতে এখনও খুব ভাল এণ্ডি-মুগাজাতীয় বস্ত্র উৎপন্ন হয়, বিশেষভাবে কামরূপে। পুণ্ড্রদেশে যে শুধু দুকূল ও পত্রোর্ণ বস্ত্র উৎপন্ন হইত তাহাই নয়, মোটা ক্ষৌম বস্ত্রও উৎপন্ন হইত এই দেশে, কৌটিল্য সে-কথাও বলিতেছেন। শ্রেষ্ঠ কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন হইত মধুরা (মাদুরা), অপরান্ত, কলিঙ্গ, কাশি, বঙ্গ, বৎস এবং মহিষ জনপদে। বঙ্গে শ্বেতস্নিগ্ধ দুকূল যেমন উৎপন্ন হইত, তেমনই শ্রেষ্ঠ কার্পাসবস্ত্রেরও অন্যতম উৎপত্তিস্থল ছিল এই দেশ। বঙ্গে ও পুণ্ড্রে প্রাচীনকালে তাহা হইলে চারিপ্রকার বস্ত্রশিল্প ছিল,—দুকূল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাসিক। প্রাচীন বাংলার এই সম্পদের কথা গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বারবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহার রপ্তানির উল্লেখ পাওয়া যায় Periplus-গ্রন্থে। Schoff'র ইংরাজী অনুবাদটুকু সমস্তই উদ্ধৃত করিতেছি এই জন্য যে, এই উপলক্ষে আমাদের দেশের অন্যান্য রপ্তানি দ্রব্যেরও কিছু কিছু খবর পাওয়া যাইবে। হিমালয়ের সানুদেশে পার্বত্য অসভ্য কিরাত জাতিদের উল্লেখের পরেই বলা হইতেছে :

> "After these, the course turns towards the east again and sailing with the ocean to the right and the shore remaining beyond to the left, the Ganges comes into view, and near it the very last land towards the east, Chryse. There is a river near it called the Ganges... . On its bank is a market-town which has the same name as the river Ganges. Through this place are brought malabathrum and Gangetic spikenard and pearls and muslins of the finest sorts which are called Gangetic. It is said that there are gold-mines near these places. and there is a gold coin which is called *caltis*..."

এই সমুদ্রতীরবর্তী গঙ্গাবিধৌত দেশ যে বাংলা দেশ, তাহা সুস্পষ্ট। এই দেশকেই গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলিয়াছেন গঙ্গারাষ্ট্র বা Gangaridae. এই গঙ্গা-বন্দরের (তাম্রলিপ্তি হইতে পৃথক ?) রপ্তানি দ্রব্যগুলির প্রথমেই পাইতেছি malabathrum বা তেজপাতা।

কৃষিদ্রব্য : তেজপাতা, পিপ্পলি। মুক্তা ও স্বর্ণের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ

Ptolemy বলেন, Kirrhadae বা কিরাত দেশেই সব চেয়ে ভাল তেজপাতা উৎপন্ন হইত। উত্তর-বঙ্গের কোনও কোনও স্থানে, শ্রীহট্টে এবং আসামের কোন কোনও জায়গায়, সাধারণভাবে পূর্ব-হিমালয়ের পার্বত্য জনপদগুলিতে এখনও প্রচুর তেজপাতা উৎপন্ন হয়, এবং তাহার ব্যবসাও খুব বিস্তৃত। ইহার পরেই দেখিতেছি, গাঙ্গেয় পিপ্পলির উল্লেখ; ইহারও উৎপত্তিস্থল বোধ হয় ছিল বাংলার উত্তরে পার্বত্য সানুদেশ। রোম-দেশীয় বণিকেরা Nelcynda হইতে যে প্রচুর পিপ্পলি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে লইয়া যাইতেন, তাহার অধিকাংশই যে এই গঙ্গা-বন্দর হইতে যাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছু কিছু মালবার অঞ্চল হইতেও যাইত, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের পিপ্পলি (গ্রীক, পেপেরি—অধুনা pepper) গঙ্গা-বন্দরের পিপ্পলির মতন এত বড় বা ভাল হইত না। এই পিপ্পলির ব্যবসায়ে দেশে প্রচুর অর্থাগম হইত, সে-কথা ব্যবসা-বাণিজ্য আলোচনা প্রসঙ্গে জানা যাইবে। পিপ্পলির পরেই পাইতেছি, মুক্তার উল্লেখ। এই মুক্তা যে গাঙ্গেয় মুক্তা, সে

সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, এবং খুব ভাল মুক্তা না হইলেও ইহার কিছু কিছু পশ্চিম-এশিয়ায়, ইজিপ্টে, গ্রীসে, রোমে রপ্তানি হইত। কিন্তু সর্বাপেক্ষা মূল্যবান রপ্তানি দ্রব্য হইতেছে Gangetic muslin অর্থাৎ গাঙ্গের সূক্ষ্মতম বস্ত্র-সম্ভার। সর্বশেষ উল্লেখ পাইতেছি স্বর্ণখনির। Schoff সাহেব অনুমান করেন, এই স্বর্ণ আসিত গ্রীক Erannaboas (সংস্কৃত হিরণ্যবাহ্) বা বর্তমান সোন নদ বাহিয়া। কিন্তু Herodotus হইতে আরম্ভ করিয়া প্লিনি পর্যন্ত তিব্বতের যে ant-goldর কথা বলিতেছেন, Periplusএ যে তাহার উল্লেখ নাই সে-কথা কে বলিবে? কিন্তু এ দুয়ের কোনওটিই বাংলা দেশে নয়। বহু দিন পরে টেভারনিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তে কিন্তু পাইতেছি, আসাম ও উত্তর-ব্রহ্মের নদী বাহিয়া কিছু কিছু সোনা ত্রিপুরাদেশের ভিতর দিয়া বাংলায় আসিত। এই সোনার পরিমাণ ছিল যথেষ্ট, যদিও স্বরূপ খুব উৎকৃষ্ট ছিল না। ত্রিপুরার যে-সব বণিক ঢাকায় বাণিজ্য করিতে আসিতেন, তাঁহারা টুকরা টুকরা সোনার পরিবর্তে লইয়া যাইতেন প্রবাল, অয়স্কান্ত মণি, কূর্মাবরণের এবং সামুদ্রিক শঙ্খের বালা। রাঢ়ের দক্ষিণ-সমুদ্রে যে প্রচুর মুক্তা পাওয়া যাইত তাহার একটু ইঙ্গিত আছে রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে। তাহা ছাড়া, নিম্ন-বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদী, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার সোনারং, সোনার গাঁ বা সুবর্ণগ্রাম, সুবর্ণবীথি, সোনাপুর প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্থান-নামগুলিও আমার কাছে একেবারে নিরর্থক মনে হয় না। এই সব জনপদের নদীগুলিতে এক সময় dust gold পাওয়া যাইত, তাহারই স্মৃতি হয়তো নামগুলির মধ্যে থাকিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, কার্পাস বস্ত্র ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ অর্থশাস্ত্র বা Periplus ছাড়াও অন্যত্র অনেক জায়গায় আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইব্‌ন্ খুর্দদ্‌বা নামক আরব ভৌগোলিকের (দশম শতক) নাম করা যাইতে পারে। ইনি রহমি বা রহ্‌ম নামে একটি দেশের নাম করিতেছেন : এই রহমি বা রহ্‌ম দেশকে Elliot সাহেব মোটামুটি বঙ্গ দেশের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। আমার মনে হয়, Elliot সাহেবের এই অনুমান যথার্থ নয়; রহ্‌মি বা রহম্ প্রাচীন আরাকান (রহ্‌ম্=রহন্=রখ্‌ন্=আরাকান)। ইব্‌ন খুর্দদ্‌বা বলিতেছেন, "স্থলপথে জাহাজের সাহায্যে রহ্‌মি দেশের রাজা অন্যান্য দেশের রাজাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করেন। তাঁহার পাঁচ হাজার হাতী আছে, এবং তাঁহার দেশে কার্পাস বস্ত্র এবং অগুরু কাঠ উৎপন্ন হয়।" এই রহ্‌মি দেশ সম্বন্ধেই আরবদেশীয় সওদাগর সুলেমান্ (নবম দশক) বলিতেছেন, এ-দেশে এক প্রকার সূক্ষ্ম ও সুকোমল বস্ত্র উৎপন্ন হইত, অন্য কোনও দেশে এমন সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপন্ন হইত না; এ-বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ও কোমল ছিল যে একটা আংটির ভিতর দিয়া তাহাকে চালাইয়া দেওয়া যাইত। সুলেমান আরও বলেন যে, এ-বস্ত্র ছিল কার্পাসের তৈরি, এবং তেমন বস্ত্র তিনি নিজের চোখে দেখিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে চীন-পরিব্রাজক চাও-জু-কুয়া পিং-কলো

বা বাংলা দেশ সম্বন্ধে বলিতেছেন, এদেশে খুব ভাল দুমুখো তলোয়ার তৈরি হয়, এবং কার্পাস এবং অন্যান্য বস্ত্র উৎপন্ন হয়। ত্রয়োদশ শতকেরই শেষের দিকে (১২৯০) মার্কো পোলো, গুজরাট, কাম্বে, তেলিঙ্গানা, মালাবার ও বঙ্গদেশে কার্পাস উৎপাদন ও কার্পাস বস্ত্রশিল্পের কথা বলিয়াছেন। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, বাংলা দেশের লোকেরা প্রচুর কার্পাস উৎপাদন করে, এবং তাহাদের কার্পাসের ব্যবসা ছিল খুব সমৃদ্ধ। পঞ্চদশ শতকে আর একজন চীন-পরিব্রাজক মা-হুয়ান্ (১৪০৫) বাংলা দেশে আসিয়াছিলেন; সৈফুদ্দীন হম্‌জা সাহ্ তখন গৌড়ের রাজা। কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ ছাড়াও তাহার বিবরণটি অন্যান্য ধনসম্বলের পরিচয়ের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য। চেহ্‌টি-গান (চট্টগ্রাম) ও সোনা-উর্-কো ঙ্ (সোনারগাঁ=সুবর্ণগ্রাম) উল্লেখের পর তিনি গৌড় রাজধানীর কথা বলিতেছেন, 'এই রাজ্যের নগরগুলি প্রাচীর বেষ্টিত; অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ এবং মুসলমান। ভাষার নাম বাংলা, তবে পারস্য ভাষার ব্যবহারও আছে। মুদ্রার নাম টঙ্কা; অল্প মূল্যের জন্য কড়িও ব্যবহার করা হয়। সমস্ত বৎসর ধরিয়া চীন দেশের গ্রীষ্মকালের মতন গরম। নানা প্রকার ধান, যব, গম ও সর্ষপ এদেশের প্রধান শস্য। এই দেশে নারিকেল, ধান, তাল ও কাজঙ্গ হইতে মদ তৈরি করা হয়, এবং সেই মদ প্রকাশ্যভাবে বিক্রয় করা হয়। উৎপন্ন ফলের মধ্যে কলা, কাঁটাল, আম, ডালিম ও আক প্রধান। এদেশে ছয় প্রকারের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়; এই বস্ত্র সাধারণত প্রস্থে দুই এবং দৈর্ঘ্যে উনিশ হাত। এই দেশে রেশমের কীট পালিত হয় ও রেশম নির্মিত বস্ত্র বয়ন করা হয়।...'

তলোয়ার

কার্পাস সম্বন্ধে একটু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে চর্যাগীতি-গ্রন্থ হইতেও। এই গ্রন্থ সহজিয়া গুহ্যসাধনার আনন্দ-সংগীত; ইহার অনেক পদের অর্থ সুস্পষ্ট নয়। তথাপি নানা রাগরাগিণীর এই গানগুলি যে সাধনার আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, এ কথা সহজেই বুঝা যায়। এই গ্রন্থে শবরপাদের একটি পদে আছে:—"হেরি সে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা। সুকড় এসে রে কপাসু ফুটিলা॥ তইলা বাড়ীর পাসেঁর জোহ্না বাড়ী উএলা। ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ ফুলিআ॥" ইহার প্রথম দুই লাইনের তিব্বতী অনুবাদ হইতে প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন এইরূপ:—"মম উদ্যানবাটিকাং দৃষ্ট্বা খসম-সমতুল্যাম্। কার্পাসপুষ্পম্ প্রস্ফুটিতম্ অত্যর্থং আনন্দিতঃ ভবতি।" বাড়ীর বাগানে কার্পাসফুল ফুটিয়াছে, দেখিয়াই আনন্দ—যেন ঘরের চারপাশ উজ্জ্বল হইল, আকাশের অন্ধকার টুটিল। ইহা হইতেই বুঝা যায়, কার্পাসকে কতখানি মূল্য দেওয়া হইত তদানীন্তন বাংলা দেশে। শান্তিপাদের একটি পদে আছে:—"তুলা ধুঁনি ধুঁনি আঁসুরে আঁসু। আঁসু ধুনি ধুনি নিরবর সেসু॥...তুলা ধুঁনি ধুঁনি সুনে আহারিউ। পুন লইয়া অপনা চটারিউ॥" ভাবার্থ এই: তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ তৈরি করা হইতেছে, আঁশ ধুনিয়া ধুনিয়া আর কিছু বাকি নাই। তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া শূন্যে উড়াইতেছি; আবার তাহাই লইয়া ছড়াইয়া দিতেছি।

হয় তো ইহার গূঢ় অর্থ আছে; কিন্তু তুলা ধুনিবার যে ইহা একটি বাস্তব চিত্র, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কাহ্নপাদের একটি পদে তাঁত বিক্রয়ের কথাও আছে, এবং সাধারণত ডোমনীরাই বোধ হয় তাঁত (বাঁশের) তৈরি করিত [তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চাংগেড়া (বাঁশের চাঙাড়ি)]। আর একটি পদের রচয়িতার নাম পাইতেছি তন্ত্রীপাদ। তন্ত্রীপাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে তাঁত-শিক্ষক অথবা তাঁত-গুরু। ইহাই বোধ হয় এই পদ-রচয়িতার পূর্বতন বৃত্তি ছিল; পরে তিনি 'সিদ্ধ' হইয়াছিলেন। এই অনুমানের কারণ পদটির ভিতরেই আছে। ইহার মূল বাংলা পাওয়া যায় নাই; তবে তিব্বতী অনুবাদ হইতে প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় যে সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ হইতে বুঝা যাইবে, গীত ও সাধন-সংবদ্ধ সমস্ত রূপকটি গড়িয়া উঠিয়াছে বস্ত্র বয়নকে অবলম্বন করিয়া।

> কালপঞ্চকতন্তুং নির্মলং বস্ত্রং বয়নং করোতি।
> অহং তন্ত্রী আত্মনঃ সূত্রম্॥
> আত্মনঃ সূত্রস্য লক্ষণং ন জ্ঞাতম্॥
> সার্দ্ধত্রিহস্তং বয়নগতিঃ প্রসরতি ত্রিধা।
> গগনং পূরণং ভবতি অনেন বস্ত্রবয়নেন॥

নির্ধন ব্রাহ্মণের গৃহে নারীরা যে তুলা ধুনিয়া সূতা কাটিতেন তাহা কবি শুভাঙ্কের (আনুমানিক, একাদশ-দ্বাদশ শতক) একটি প্রশস্তি শ্লোকে জানা যায়।

> "কার্পাসাস্থিপ্রচয়নিচিতা নির্ধন শ্রোত্রিয়াণাং
> যেষাং বাত্যাপ্রবিতত কুটীপ্রাঙ্গণান্তা বভূবুঃ।" (সদুক্তিকর্ণামৃত)।

সমসাময়িক কালেরই আর একজন অজ্ঞাতনামা কবি বঙ্গ-বারাঙ্গনাদের সূক্ষ্ম বসনের (বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি) উল্লেখ করিয়াছেন (সদুক্তিকর্ণামৃত)। চতুর্দশ শতকে তীরভুক্তিবাসী জ্যোতিরীশ্বর তাঁহার বর্ণরত্নাকর গ্রন্থে বাংলাদেশের 'মেঘ-উদুম্বর', 'গঙ্গা-সাগর', 'লক্ষ্মীবিলাস', 'সিলহটী' (শ্রীহট্ট-জাত), 'গাঙ্গেরী' ইত্যাদি পট্ট ও নেতবস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরের এই আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে, কার্পাসের চাষ, গুটিপোকার চাষ, কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পই ছিল প্রাচীন বাংলার সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত শিল্প এবং ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপায়। পট্টবস্ত্র বা পাটের কাপড়ের শিল্পও ছিল, এবং নানা উপলক্ষে, বিশেষভাবে পূজা, ব্রত, বিবাহানুষ্ঠান ইত্যাদি ব্যাপারে পট্টবস্ত্রের ব্যবহারেরও খুব প্রচলন ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পট্টবস্ত্রের উল্লেখ সুপ্রচুর। পাটের চাষ এখনকার মত বিস্তৃত না হইলেও ছিল যে সন্দেহ নাই, এবং পাটের কচিপাতা বা নালিতা শাক এখনকার মত তখনও বাঙালীর প্রিয় খাদ্য ছিল। প্রাকৃত-পৈঙ্গল-গ্রন্থে সে-কথার প্রমাণ আছে; অন্যত্র তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

বস্ত্রশিল্পের পরেই উল্লেখ করিতে হয় চিনি, লবণ ও মৎস্যের কথা। একটু পরেই

এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ করা হইয়াছে। চিনি মারফৎ দেশে প্রচুর অর্থাগম হইত বলিয়া মনে হয়। পৌণ্ড্রক ইক্ষু হইতে যে প্রচুর চিনি উৎপন্ন হয় একথা সুশ্রুত বহুদিন আগেই বলিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতকে বাংলা দেশ হইতে প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে চিনির উল্লেখ করিয়াছেন মার্কো পোলো। ষোড়শ শতকের গোড়ায়ও ভারতের বিভিন্ন দেশে, সিংহলে, আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশে চিনি রপ্তানি লইয়া দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে, এ-সাক্ষ্য দিতেছেন পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা। লবণের ব্যবসা লইয়া ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাড়াকাড়ির কথা সুবিদিত; ইহা হইতেই অনুমান হয়, অষ্টাদশ শতকেও লবণের ব্যবসা খুব লাভজনকই ছিল। মৎস্যের একটা বিস্তৃত আন্তর্দেশিক ব্যবসা নিশ্চয়ই ছিল, কাঁচা এবং শুকনা মৎস্য দুয়েরই। বাংলা দেশ তো চিরকালই মৎস্যাহারী, এবং বাঙালী স্মৃতিকার ব্রাহ্মণ ভবদেব ভট্ট যেমন করিয়া বাঙালীর মৎস্যাহারের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, আজিকার মতন তখনও বাংলার বাহিরে বাঙালীর এই মৎস্যপ্রীতি সম্বন্ধে একটা ঘৃণার ভাব ছিল। ভবদেব ভট্ট নানাপ্রকার মৎস্যের উল্লেখ করিয়াছেন; শুকনা মাছের কথাও বলিয়াছেন। দুইই ছিল ভক্ষ্য এবং সেই হেতু ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম দ্রব্য। যে-ভাবে দান-বিক্রয়ের পট্টোলীগুলিতে মৎস্যের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতেই মনে হয়, এই দ্রব্যটির মূল্য ও চাহিদা যথেষ্টই ছিল; পাহাড়পুরের ২।১টি পোড়ামাটির ফলকে তাহার ইঙ্গিতও আছে।

চিনি, লবণ ও মৎস্য শিল্প

কারুশিল্পও কম ছিল না। তাহার লিপি-প্রমাণ বিশেষ নাই, কিন্তু অনুমান সহজেই করা চলে। তক্ষণ ও স্থাপত্যশিল্প, স্বর্ণ ও রৌপ্যশিল্পের কথা আগেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি। এখানে আর বিস্তৃত করিয়া উল্লেখ করিবার বিশেষ কিছু নাই। সোনা, রূপা, মণি, হীরা ও বিচিত্র দ্যুতিময় প্রস্তর সজ্জিত নানা অলংকার বিত্তশালী সমাজে ব্যবহৃত হইত, একথা তো সহজেই অনুমেয়। অন্যত্র উল্লিখিত বিচিত্র দেবদেবীর অলংকরণ ঐশ্বর্য দেখিলে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তবকত্-ই-নাসিরী গ্রন্থে উল্লেখ আছে, লক্ষ্মণসেন সোনা ও রূপার বাসনে আহার করিতেন। ইহা কিছু অত্যুক্তি নয়। রাজারাজড়া তো করিতেনই, বণিক সাধু-সওদাগরেরাও করিতেন; তাহার কিছু আভাস মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও আছে। রামচরিত-কাব্যে মণিময় ঘুঙুর, মুক্তা, হীরা ও নানা বিচিত্রবর্ণ প্রস্তর খচিত অলংকারের উল্লেখ আছে; বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপি, লক্ষ্মণসেনের নৈহাটিলিপি এবং অন্যান্য লিপিতে দেবদাসী, রাজান্তঃপুরের নারী ও পরিচারিকাদের নানা মূল্যবান অলংকার-সজ্জার উল্লেখ আছে। এই বিলাস ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী সেন আমলেই বেশী আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। লৌহশিল্পও ছিল; দুই একটি শাসনে কর্মকার তো রাজপাদোপজীবী বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন। চাও-জু-কুয়া যে

কারুশিল্প: তক্ষণ ও স্থাপত্যশিল্প; অলংকার শিল্প; লৌহশিল্প; মৃৎশিল্প; কাষ্ঠশিল্প; দন্তশিল্প: কাংস্যশিল্প

বলিয়াছেন, বাংলাদেশে দুমুখো খুব ধারালো তলোয়ার তৈরি হয়, তাহার মধ্যে লৌহ ইত্যাদি ধাতুশিল্পে এদেশের শিল্প-কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। লৌহশিল্পের প্রচলন যে খুবই ছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। কর্মকারের সুপ্রাচুর্য না থাকিলে তো কৃষিকর্ম এবং কৃষিসমাজ-চলিতেই পারে না। দা', কুড়াল, কোদালি, খন্তা, খুরপি, লাঙ্গল ইত্যাদি ছাড়া লোহার জল-পাত্র (ইদিলপুর লিপি), তীর, বর্শা, তরোয়াল ইত্যাদি যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর তৈরি হইত। অগ্নিপুরাণের মতে অঙ্গ ও বঙ্গদেশ তরোয়ালের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল; বঙ্গদেশীয় তরোয়াল নাকি ছিল খুব শক্ত ও ধারালো। কুম্ভকারের মৃৎশিল্পের প্রচলনও ছিল খুব। কুম্ভকারের উল্লেখ ২।১টি লিপিতে আছে (যথা, বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপি), এবং একাধিক লিপিতে কুম্ভকার-গর্তের উল্লেখও আছে (যথা, নিধনপুর লিপি)। এই উল্লেখ-প্রসঙ্গ হইতে মনে হয়, কুম্ভকার-বৃত্তির কেন্দ্র ছিল গ্রাম। পোড়ামাটির নানা প্রকারের থালা, বাটি, জলপাত্র, রন্ধনপাত্র, দোয়াত, প্রদীপ ইত্যাদি পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, বজ্রযোগিনীর সন্নিকটস্থ রামপালে, ত্রিপুরায় ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুর, মহাস্থান, সাভার ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকও বিস্তৃত মৃৎশিল্পের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দ-কেশবের শাসনে আমরা রাজবিগা নামে জনৈক দন্তকারের উল্লেখ পাইতেছি; মনে হইতেছে, হস্তিদন্ত-শিল্পের প্রচলনও ছিল। কেশবসেনের ইদিলপুর লিপিতে দ্বিপদন্ত-দণ্ড শিবিকার উল্লেখ পাইতেছি। সূত্রধরের উল্লেখও কয়েকটি লিপিতে পাইতেছি; আশ্চর্যের বিষয় এই, ইহাদের উল্লেখ তাম্রপট্টগুলির খোদাইকররূপে, লিখিত শাসন ইহারাই তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ করিতেন। এই অর্থে আমরা এখন আর এই শব্দটি ব্যবহার করি না, কিন্তু যে-যুগের কথা আমরা বলিতেছি, সে যুগে যে ব্যবহৃত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। না হইবার কারণও নাই; সূত্রধর যে শুধু কাঠ-মিস্ত্রী, তাহাই নয়; আমাদের প্রাচীন বাস্তু-শাস্ত্রে (যেমন, মানসারে) সূত্রধর বলিতে স্থপতি, তক্ষণকার, খোদাইকর, কাঠ-মিস্ত্রী সকলকেই বুঝাইত। কাঠের শিল্পের প্রচলনও কম ছিল না। কাঠের তৈরি ঘরবাড়ি কালের ভ্রূক্ষেপ উপেক্ষা করিয়া আজ আর বাঁচিয়া নাই, কিন্তু স্তম্ভ, খিলান, খুঁটি ইত্যাদির ২।৪টি টুকরা আজও যাহা পাওয়া যায় তাহাদের কারু ও শিল্পনৈপুণ্য বিস্ময়কর। ঢাকার চিত্রশালায় তেমন নিদর্শন কয়েকটি আছে। সংসারের আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি, মন্দির, পালকি, গরুর গাড়ি, রথ, বিশেষভাবে নদীগামী নানাপ্রকার নৌকা ও সমুদ্রগামী বৃহদাকৃতি নৌকা বা জাহাজ ইত্যাদি সমস্তই তো ছিল কাঠের। সেই দিক দিয়া দেখিলে কাষ্ঠশিল্পের সমৃদ্ধি সহজেই অনুমেয়, এবং সমাজের মধ্যে এই শিল্পীদের একটা স্থানও ছিল। সাধারণ ভাবে শিল্পী ও শিল্পীগোষ্ঠীর কথার আভাস তো বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপির খোদাইকর রাণক শূলপাণির "বারেন্দ্রক শিল্পিগোষ্ঠীচূড়ামণি" এই বিশেষণটির মধ্যেও আছে। তাহা ছাড়া, পঞ্চম হইতে অষ্টম শতকের তাম্রপট্টোলীগুলিতে ভূমি

দান-বিক্রয় ব্যাপারে বিষয়পতি বা অন্য রাজপ্রতিনিধি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যে-কয়জন প্রধানের মতামত গ্রহণ করিতেন, অর্থাৎ যে-কয়জনে মিলিয়া অধিকরণ গঠিত হইত, তাহাদের মধ্যে প্রথম-কুলিক সর্বদাই অন্যতম। কুলিক অর্থ শিল্পী (artisan); এই প্রথম-কুলিক খুব সম্ভবত ছিলেন শিল্পীগোষ্ঠী বা নিগমের প্রধান প্রতিনিধি। নগরের অথবা বিষয়ের শ্রেষ্ঠ গণ্য মান্য শিল্পী যিনি ছিলেন, তিনিই এই জাতীয় অধিকরণে আসন লইবার জন্য আহূত হইতেন। রাজপাদোপজীবীদের মধ্যেও কোথাও কোথাও কুলিক বা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নাম পাওয়া যাইতেছে। পূর্বোল্লিখিত ভাটেরা গ্রামের গোবিন্দকেশবদেবের লিপিতে গোবিন্দ নামে এক কাংস্য অর্থাৎ কাংস্যকার বা কাঁসারীর উল্লেখ পাইতেছি। কাঁসা বা bell-metalর শিল্পের আভাসও তাহা হইলে কিছু পাওয়া গেল। নানাপ্রকার মিশ্র ধাতুশিল্পের প্রমাণ ও পরিচয় আরও পাওয়া যায় অসংখ্য ব্রোঞ্জ ও অষ্টধাতুর রচিত মূর্তিগুলির মধ্যে।

নৌ-শিল্প

সকল শিল্পের মধ্যে নৌ-শিল্প বা নদীগামী নৌকা ও সমুদ্রগামী পোত-নির্মাণ শিল্পের একটা বিশেষ স্থান নিশ্চয়ই ছিল; তাহার প্রমাণ শুধু বর্তমান চট্টগ্রামে কিংবা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নয়, প্রাচীন বাংলার লিপিগুলিতে এবং সংস্কৃত সাহিত্যেও ইতস্তত ছড়াইয়া আছে। মৌখরী-রাজ ঈশানবর্মের হড়াহা লিপিতে (ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ) গৌড়দেশবাসীদের (গৌড়ান্) "সমুদ্রাশ্রয়ান্" বলা হইয়াছে; ইহার অর্থ সমুদ্রতীরবর্তী গৌড়দেশ হইতে পারে, অথবা সামুদ্রিক বাণিজ্যই যাহার আশ্রয়, সেই গৌড়দেশও বুঝাইতে পারে। কালিদাস রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বাঙালীকে "নৌসাধনোদ্যতান্" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। পাল ও সেন-বংশের লিপি-মালায় নৌবাট, নৌবিতান (fleet of boats) প্রভৃতি শব্দ তো প্রায়শ উল্লিখিত হইয়াছে। এই উভয় রাজবংশের, এবং সমসাময়িক বাংলাদেশের অন্যান্য রাজবংশেরও, সামরিক শক্তি নৌবলের উপর অনেকটা নির্ভর করিত; ইহার উল্লেখ তো অনেক শিলালিপিতেই আছে। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে নৌযুদ্ধের বর্ণনাও আছে। সাধারণ লোকদের যাতায়াত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নৌ-যানের প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট; এই নদীমাতৃক, খাড়িপ্রধান, বারিবহুল, এবং বহুলাংশে নিম্নভূমির দেশে ইহা তো স্বাভাবিক এবং সহজেই অনুমেয়। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর লিপিতে (৫০৭-৮ খৃ) নৌযোগ অর্থাৎ নৌকাঘাট বা বন্দর বা পোতাশ্রয়ের উল্লেখ আছে; এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যে ভূমি-সীমানা সম্পর্কে এই নৌযোগের উল্লেখ, সেই ভূমি ত্রিপুরা জেলার গুণাইঘর গ্রামের নিকটবর্তী জলপ্লাবিত দেশে। ফরিদপুর জেলায় প্রাপ্ত মহারাজ ধর্মাদিত্যের ১নং তাম্রপট্টোলীতে ভূমির সীমা সম্পর্কে "নবাত-ক্ষেণী" কথার উল্লেখ আছে। 'নাবাত' পাঠ খুব শুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না, প্রকাশিত প্রতিলিপিতে 'ভাবতা' পাঠই সমীচীন মনে হয়; কিন্তু 'ভাবতা-ক্ষেণী' কথার কোনও সংগত অর্থ এস্থলে করা যায় না। সেইজন্য পার্জিটার সাহেবের আনুমানিক পাঠ 'নাবাত-ক্ষেণী' আপাতত স্বীকার করা যাইতে পারে। তিনি ইহার অনুবাদ

করিয়াছেন, ship building harbour। এই ধর্মাদিত্যের ২নং শাসনে অন্য একটি ভূমির সীমা সম্পর্কে "নৌদণ্ডক" কথার উল্লেখ আছে; বোধ হয় "নৌদণ্ডক" কথার অর্থও নৌকার আশ্রয়, নৌকা যেখানে বাঁধা হইত সেই স্থান, অর্থাৎ বন্দর, ঘাট। এই সব উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, নদনদীগামী ছোট বড় নৌকা, সমুদ্রগামী পোত ইত্যাদি নির্মাণ-সংক্রান্ত একটা সমৃদ্ধ শিল্প ও ব্যবসায় প্রাচীন বাংলায় নিশ্চয়ই ছিল। রক্তমৃত্তিকাবাসী মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের কাহিনী সুপরিচিত। ভাটেরার গোবিন্দকেশবের লিপিতেও জনৈক 'নাবিক' জ্যোজ্যের উল্লেখ পাইতেছি।

৫

এই নৌ-শিল্পের কথা হইতেই ধনোৎপাদনের তৃতীয় উপায় ব্যবসা-বাণিজ্যের কথার মধ্যে আসিয়া পড়া যাইতে পারে। এপর্যন্ত ভূমিজাত ও শিল্পজাত যে সব দ্রব্যাদির কথা বলিয়াছি, তাহাই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের উপকরণ। ফলফুল, অর্থাৎ আম, কাঁটাল, মহুয়া ইত্যাদি লইয়া কোনও বিস্তৃত ব্যবসা হয় তো সম্ভব ছিল না, মৎস্য সম্বন্ধেও তাহাই; তবু গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের হাটে হাটে এই সব জিনিস লইয়া ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত বই কি। হট্ট, হট্টিকা, হট্টিয়গৃহ, হট্টবর, আপণ, মানপ (তৌলদার = দোকানদার = ছোট ব্যবসায়ী) ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ প্রায়শ লেখমালাগুলিতে দেখা যায়; অষ্টম শতক-পরবর্তী লিপিগুলিতে তো অনেক স্থলেই হাট-বাজার-ঘাট সমেত (সহট্ট সঘট্ট) জমি দান করা হইয়াছে। হট্টপতি, শৌল্কিক, তরিক ইত্যাদি রাজকর্মচারীর উল্লেখ হইতেও একটা সমৃদ্ধ অন্তর্বাণিজ্যের কতকটা আভাস পাওয়া যায়; হাটবাজার, বাণিজ্য-শুল্ক এবং পারঘাট-খেয়াঘাটের কর ইত্যাদি আদায়ের দায়িত্ব ছিল ইঁহাদের উপর। প্রসঙ্গ উল্লেখ হইতে মনে হয়, এই সব উপায় হইতে রাষ্ট্রের যথেষ্ট অর্থাগম হইত। ধর্মাদিত্যের পট্টোলী দুইটিতে "ব্যাপার-কারণ্ডয়" এবং "ব্যাপারণ্ডয়" ও গোপচন্দ্রের পট্টোলীতে "ব্যাপারায় বিনিযুক্তক" নামে একপ্রকার রাজপুরুষের উল্লেখ আছে; খুব সম্ভব ইঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন এবং ছোট বড় নগরগুলিই এই সব ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। নব্যাবকাশিকা এবং কোটীবর্ষ যে বণিক ও ব্যবসায়ীদের খুব সমৃদ্ধ মিলনকেন্দ্র ছিল, এ খবর তো কোটালিপাড়া ও দামোদরপুর পট্টোলীতেই পাওয়া যায়। পুণ্ড্রবর্ধনের কোনও এক অনুল্লিখিত স্থানে যে বিচিত্র বিপণিমালা শোভিত এক সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, সে-খবর পাওয়া যাইতেছে সোমদেবের কথাসরিৎসাগর-গ্রন্থে। কিন্তু, শহর ছাড়া গ্রামাঞ্চলের হাটবাজারেও কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য নিশ্চয়ই চলিত। ইর্দা লিপিতে দেখিতেছি হাটসহ একটি গ্রাম দান করা হইতেছে; দামোদর লিপি, ধর্মপালের খালিমপুর লিপি, গোবিন্দকেশবের ভাটেরা লিপি প্রভৃতিতেও হাটবাজার সমেত অনুরূপ

ব্যবসা-বাণিজ্য

ভূমি বা গ্রাম দান-বিক্রয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব গ্রাম ও গ্রামান্তরের হাটে স্থানীয় উৎপন্ন ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়াই ক্রয়-বিক্রয় চলিত। ভূমিজাত অন্যান্য কিছু কিছু দ্রব্য, যেমন পান, সুপারি, নারিকেল ইত্যাদির ব্যবসা নিশ্চয়ই বিস্তৃততর ছিল সন্দেহ নাই, এবং শুধু বাংলাদেশের ভিতরেই নয়, দেশের বাহিরেও প্রতিবেশী দেশগুলিতে সুপারি ও নারিকেল এই দুই দ্রব্যই কিছু কিছু রপ্তানি হইত, এরূপ অনুমান করা যায় পরবর্তী মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া। বংশীদাসের মনসামঙ্গলে ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে পাই, দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্রোপকূল বাহিয়া বাঙালী বণিকেরা গুজরাট পর্যন্ত যে বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া যাইতেন, তাহার মধ্যে গুয়া(ক) বা গুবাক, পান ও নারিকেলের উল্লেখ। গুয়ার বদলে লইয়া আসিতেন মাণিক্য, পানের বদলে মরকত এবং নারিকেলের বদলে শঙ্খ। গুয়া বা গুবাক যে সুপারি নাম লইল, তাহার ইতিহাসের মধ্যে বাংলাদেশের এই দ্রব্যটির বাণিজ্য ইতিহাসও লুকাইয়া আছে। বর্তমান গৌহাটি সহরের নামটি আসিয়াছে গুয়া হইতে; গুবাক ক্রয়-বিক্রয়ের হাট বা হাটি অর্থে গুবাহাটি = গুয়াহাটি = গৌহাটি।

পান, গুবাক ও নারিকেলের ব্যবসা

যাহা হউক, এই গুবাক প্রাচীন কালেই আরব-পারস্য প্রভৃতি দেশগুলিতে রপ্তানি হইত; ঐ দেশীয় বণিকেরা এই দ্রব্য জাহাজ বোঝাই করিতেন বাংলাদেশের কোনো সামুদ্রিক বন্দর হইতে নয়, পশ্চিম-ভারতের বন্দর শূর্পারক = সুপ্পারক = সোপারা হইতে, এবং তাঁহারা এই দ্রব্যকে সোপারার ফল বলিয়াই জানিতেন; এই অর্থে পরবর্তী কালে গুবাক হইল সুপারি এবং সেই নামেই ভারতের সর্বত্র ইহার পরিচয়; কিন্তু বাংলাদেশের, বিশেষত পূর্ববাংলার গ্রামে গ্রামে এখনও ইহার নাম গুবা বা গুয়া। গুবাকের ব্যবসা যে খুবই প্রশস্ত ছিল, এবং তাহা হইতে এই দেশের প্রচুর অর্থাগমও হইত, তাহার প্রমাণ তো ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল পর্যন্তও পাওয়া যায়। কোম্পানির আমলে সুপারি বাংলাদেশের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। এই সুপারি-নারিকেলের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের ইতিহাস যদি পরবর্তী মধ্যযুগ বাহিয়া কোম্পানির আমল পর্যন্ত অনুসরণ করা যায়, তবেই বুঝা যাইবে প্রাচীন বাংলার ভূমিদান সম্পর্কিত লিপিগুলিতে বিশেষ করিয়া গুবাক, নারিকেল এবং পানের বরজের [বর্ (অষ্ট্রিক) = পান; বরজ = পান যেখানে জন্মায়; পানের বরজ যাঁহাদের জীবিকা তাঁহারা বারুজীবী = বারুই) উল্লেখ কেন করা হইয়াছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহা হইতে আয়ের পরিমাণও কেন উল্লেখ করা হইয়াছে। লবণ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলে। বাংলাদেশের লবণ সামুদ্রিক লবণ। মধ্যযুগের যে দুইটি কাব্যের নাম কিছু আগে করিয়াছি, তাহাতেই প্রমাণ আছে, লবণও অন্যতম বাণিজ্যসম্ভার ছিল। বাঙালী বণিকেরা সামুদ্রিক লবণের বিনিময়ে পাথুরে লবণ লইয়া আসিতেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলেও দেখি, লবণের ব্যবসা লইয়া কাড়াকাড়ি; কোম্পানির সওদাগরেরা অনবরত চেষ্টা করিতেছেন

গুবাক বা সুপারির ব্যবসায় ইতিহাস

লবণের ব্যবসা

লবণের ব্যবসা একচেটিয়া করিতে। এই প্রয়াসের ইতিহাস পড়িলে স্বতই মনে হয়, ব্যবসাটা খুবই লাভবান ছিল। সে-কথাটি না বুঝিলে প্রাচীন লিপিগুলিতে কেন যে ভূমি-দানের সময় বারবারই 'সলবণ' কথাটি উল্লেখ করা হইতেছে, সে-রহস্যটি ধরা পড়ে না।

Periplus Erythri Mari-গ্রন্থে তেজপাতা ও পিপ্পলের ব্যবসার উল্লেখ আমরা দেখিয়াছি। এই দুটি দ্রব্যের ব্যবসাও খুব লাভজনক ব্যবসা ছিল, সন্দেহ নাই। সব দ্রব্যের বাণিজ্যমূল্য উপাদানের অভাবে জানিবার উপায় নাই; কিন্তু পিপ্পলির বাণিজ্যমূল্যের খানিকটা আভাস পাইতেছি প্লিনির ইণ্ডিকা নামক গ্রন্থ হইতে (খ্রীঃ প্রথম শতক)। তিনি বলিতেছেন, রোম সাম্রাজ্যে এক পাউণ্ড বা আধ সের পিপ্পলির দাম ছিল তখনকার দিনে ১৫ দিনার, অর্থাৎ পনরটি স্বর্ণমুদ্রা। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, এই সব বাণিজ্যসম্ভার হইতে দেশে কম অর্থাগম হইত না। কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। এই শিল্প সম্বন্ধে আগে যে-সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, নানা প্রকার বস্ত্রের ব্যবসা বাংলা দেশে খুব সুপ্রাচীন এবং শুধু প্রাচীন বাংলায়ই নয়, একেবারে অষ্টাদশ শতকের শেষ, উনবিংশ শতকের প্রথম পর্যন্ত সর্বদাই এই বস্ত্রশিল্পের ব্যবসা দেশের অর্থাগমের একটা মস্ত বড় উপায় ছিল। প্লিনি সেই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেই বলিতেছেন, ভারতবর্ষ হইতে যত রেশম ও কার্পাস ইত্যাদি বস্ত্র পশ্চিমের বণিকেরা বহন করিয়া লইয়া যাইত, তাহার বার্ষিক মূল্য ছিল (আনুমানিক) এক লক্ষ (স্বর্ণ?) মুদ্রা। এই অর্থের একটা বৃহৎ অংশ যে বাংলা দেশে আসিত, তাহাতে সন্দেহ কি?

পিপ্পলির দাম

বস্ত্র-ব্যবসা ও বস্ত্রের মূল্য

বংশীদাসের মনসামঙ্গল অথবা মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে বাঙালীর অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের যে-ছবি পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত সন্দেহ নাই; গ্রন্থ দুইটি আমাদের যুগের পক্ষে অর্বাচীনও; কিন্তু তাহা যে বাঙালীর প্রাচীন বাণিজ্যস্মৃতি বহন করে, এ-কথা সকলেই স্বীকার করেন। ইহার সাক্ষ্য আমাদের বক্ষ্যমাণ বিষয়ে প্রামাণিক কিছুতেই নয়, তবু এই দেশজাত পান, গুবাক, নারিকেল ইত্যাদির পরিবর্তে বণিকেরা যে-সব মূল্যবান দ্রব্য লইয়া আসিতেন, তাহার অংশ মাত্রও যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও এ-কথা অনুমান করা চলে যে, প্রাচীন বাংলায় অর্থাগমের অন্যতম নয়, প্রথম ও প্রধান উপায়ই ছিল বাণিজ্য। এ-কথা যে একেবারে শূন্যকথা নয়, তাহা বস্ত্রশিল্প ও পিপ্পল সম্বন্ধে প্লিনির উক্তি হইতেও কতকটা বুঝা যায়। ইক্ষু ও ইক্ষুজাত দ্রব্য, লবণ, নানা প্রকারের হীরা, মুক্তা ও সোনা, তেজপাতা ও অন্যান্য মসলা দ্রব্য ইত্যাদির কথা তো আগেই বলিয়াছি। হাজারিবাগ জেলার দুধপানি পাহাড়ে একটি লিপি উৎকীর্ণ আছে; অক্ষরের রূপ দেখিয়া মনে হয়, লিপিটি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের। এই লিপিতে আছে :—

অথ কস্মিংশ্চি[ৎ স]ময়ে বাণিজ্যে ভ্রাতরস্ত্রয়ঃ।
তাম্রলিপ্তি[ম]যোধ্যায়া যযুঃ পূর্ব্বপশ্চিমা॥
ভূয়ঃ প্রতিনিবৃত্তান্তে সবাবাসং বিয়াসবঃ।
প্রয়োজনেন কেনাপি চিরকস্থূরিহ স্থিতিং॥
সুবর্ণ মণি মাণিক্য মুক্তা প্রভৃতি বৈধ'নং।
বিত্তপম্পর্ধ'য়েবা সোদপর্বত্তমুপার্জিতং॥

অষ্টম শতকে বলা হইতেছে, 'কোনো এক সময়ে' অর্থাৎ এখানে যে উল্লেখটি আছে, তাহা একটি প্রাচীন দিনের ঘটনার স্মৃতি। কিন্তু, বাণিজ্য উপলক্ষে তিন ভাই অযোধ্যা হইতে তাম্রলিপ্তিতে আসিয়া কিছুকালের মধ্যে প্রচুর ধনরত্ন উপার্জন করিয়া নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, এ কথাটির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বৌদ্ধ জাতকের অনেক গল্পে বাণিজ্য উপলক্ষে তাম্রলিপ্তির উল্লেখও সুপরিচিত; পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে একাধিক জায়গায় উল্লেখ আছে, পাটলীপুত্র হইতে বাণিজ্য উপলক্ষে বণিকদের পুণ্ড্র অথবা পুণ্ড্রবর্ধনে আসিবার কথা। ই-ৎসিঙ্‌ও এই পথেরই উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, তাম্রলিপ্তি হইতে পশ্চিমবাহী পথ ধরিয়া যখন তিনি বুদ্ধগয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহার পথসঙ্গী হইয়াছিল শত শত বণিক। তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যের উল্লেখও বারবার নানা গ্রন্থে দেখা যাইতেছে। বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষায় গুজরাটের সঙ্গে গৌড়ের বাণিজ্য-সম্বন্ধের আভাস পাইতেছি। গঙ্গার মুখে গঙ্গাবন্দরের কথা, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণের বাণিজ্য-সমৃদ্ধির উল্লেখ তো য়ুয়ান্-চোয়াঙ্‌ও করিয়া গিয়াছেন। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ বলেন, নানাপ্রকার মূল্যবান দ্রব্য, মণিরত্ন ইত্যাদির প্রচুর সমাগম হইত তাম্রলিপ্তিতে; তাম্রলিপ্তির লোকেরা এই হেতুই খুব বিত্তবান ছিলেন। কথাসরিৎসাগরের মতেও তাম্রলিপ্তি বিত্তশালী বণিকদের কেন্দ্র ছিল; তাঁহারা লঙ্কা, সুবর্ণদ্বীপ ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমৃদ্ধ সামুদ্রিক বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। উত্তাল বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা মণিরত্ন ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি জলে অর্পণ করিয়া পূজা করিতেন। এই সুপ্রাচীন রীতির উল্লেখ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও দেখা যায়। এই সমস্ত সাক্ষ্যই সুপরিচিত। এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখিলে সহজেই মনে হয়, প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধি যাহা ছিল, তাহা বহুলাংশে নির্ভর করিত ব্যবসা-বাণিজ্যেরই উপর। তাহা ছাড়া পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত দেখিতেছি, ভূমি দান-বিক্রয়ের দলিলগুলিতে স্থানীয় অধিকরণে যাঁহাদের আহ্বান করা হইতেছে, সেই পাঁচ জনের মধ্যে দুই জন তো রাজকর্মচারীই—বিষয়পতি স্বয়ং এবং প্রথম-কায়স্থ বা জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ; বাকি তিন জনের মধ্যে দুই জন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিনিধি—নগরশ্রেষ্ঠী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠীগোষ্ঠীর যিনি প্রধান তিনি এবং প্রথম-সার্থবাহ অর্থাৎ বণিক্‌দের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি; অবশিষ্ট যিনি রহিলেন, তিনি প্রথম-কুলিক অর্থাৎ শিল্পিগোষ্ঠীর

বাণিজ্যে তাম্রলিপ্তির স্থান

প্রতিনিধি। তাহা হইলে দেখিতেছি, রাষ্ট্রেও কতকটা আধিপত্য এই বণিক্ ও ব্যবসায়ীরাই করিতেছেন। রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যাপারেও 'প্রধান ব্যাপারিণঃ' যাঁহারা তাঁহাদের সাহায্য লওয়া হইতেছে, মহত্তর অর্থাৎ সমাজের অন্যান্য গণ্যমান্য লোকেদের সঙ্গে সঙ্গে। এই সম্বন্ধে পরবর্তী এক অধ্যায়ে আরও বলিবার সুযোগ আসিবে; এইখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে এই সব শ্রেষ্ঠী ও বণিক্‌দের হাতে যে অর্থাগম হইত, তাহার ফলেই ইঁহারা রাষ্ট্রে আধিপত্য লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রে যে আছে, 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্ধং কৃষিকর্মণি', এ-কথা প্রাচীন বাংলায় যথার্থ সার্থকতা লাভ করিয়াছিল বলিলে ইতিহাসের অমর্যাদা হয় না। প্রাচীন বাংলার লক্ষ্মী ব্যবসাবাণিজ্য-নির্ভরই ছিলেন বেশি, এবং সেই লক্ষ্মী বাস করিতেন বণিক্, ব্যাপারী, শ্রেষ্ঠী ইত্যাদির ঘরে—ধর্মাদিত্যের ২নং এবং গোপচন্দ্রের তাম্রপট্টে যাঁহাদের যথাক্রমে বলা হইয়াছে ব্যাপার-কারণ্ডয়ঃ, ব্যাপারিণঃ, তাঁহাদের ঘরে। মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যে সওদাগরদের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাহিনীগুলিতেও সে-কথার প্রমাণ আছে; ধনপতি, হীরামাণিক, দুলালধন, ইত্যাদি নাম যে বণিকদের মধ্যেই পাই, তাহা একেবারে নিরর্থক নয়। বর্তমান হুগলী জেলার ভুরশুট গ্রামে প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠীদের খুব বড় একটা কেন্দ্র ছিল। ভুরশুটের প্রাচীন নাম ভূরিশ্রেষ্ঠিক = ভূরিসৃষ্টি = ভূরিশ্রেষ্ঠীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ভট্টভবদেবের শিলালিপিতে, শ্রীধর আচার্যের ন্যায়কন্দলী-গ্রন্থে। শেষোক্ত গ্রন্থে স্পষ্টই বলা হইয়াছে "ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রাম, ভূরিশ্রেষ্ঠী-জনাশ্রয়"। গ্রামটিতে বিত্তবান সমৃদ্ধ বণিকসম্প্রদায় ছিল, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠীরাও ছিলেন। অষ্টম শতকপূর্ব লিপিগুলিতে দেখা যায় রাষ্ট্রে ও সমাজে সার্থবাহদের সঙ্গে শ্রেষ্ঠীদেরও যথেষ্ট আধিপত্য ছিল।

রাষ্ট্রে ও সমাজে বণিক ব্যবসায়ীর স্থান

এই সমৃদ্ধ বাণিজ্য স্থলপথ ও জলপথ উভয় পথেই চলিত। বাণিজ্যপথের বিস্তৃততর আলোচনা দেশ-পরিচয় অধ্যায়ে ইতিপূর্বেই করিয়াছি; এখানে ইঙ্গিতমাত্রই যথেষ্ট। এই নদীমাতৃক দেশে নৌ-শিল্পের প্রচলন যেমন দেখিতে পাই, যত 'নাবাত-ক্ষেণী', 'নৌবাট', 'নৌদণ্ডক', 'নৌবিতান', ইত্যাদির উল্লেখ পাইতেছি, চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাকৃত-পৈঙ্গল পর্যন্ত প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত অসংখ্য গান ও পদে যত নদ-নদী-নৌকা সংক্রান্ত রূপক ও উপমার দেখা পাইতেছি তাহাতে অনুমান হয়, নৌ-বাণিজ্যই প্রবলতর ও প্রশস্ততর ছিল। গুজরাট হইতে গৌড়ে, কিংবা বারাণসী হইতে পুণ্ড্রবর্ধনে যে-বাণিজ্যের আভাস বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষায় কিংবা সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে পাওয়া যায়, জাতকের বহু গল্পে তাম্রলিপ্তিতে বণিক্‌দের যে আনাগোনার খবর পাওয়া যায়, তাহা হয় তো স্থলপথেই বেশি হইত, বৌদ্ধ-যুগের সুপরিচিত বাণিজ্যপথ ধরিয়া। বারাণসী হইতে মগধের ভিতর দিয়া অঙ্গের রাজধানী চম্পা হইয়া পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত সার্থবাহের গরুর গাড়ির লহর চলাচলের পথও

বাণিজ্যপথ

ছিল, একথা মনে করিতে সুদূরবিসর্পী কল্পনার আশ্রয় লইবার কোনও প্রয়োজন নাই। চম্পা হইতে গঙ্গা ও ভাগীরথী বাহিয়া গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত নৌকাপথও প্রশস্ত ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই নদীপথের বন্দর ও দেশগুলির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বংশীদাসের মনসামঙ্গলে, এবং অন্যান্য মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এবং বিস্তৃত ভাবে মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে, বিভিন্ন চৈতন্যচরিত কাব্যে এই পথের কিয়দংশের বন্দরগুলির উল্লেখ আছে। এই বিবরণের মধ্যে প্রাচীন স্মৃতি কিছু লুকাইয়া নাই, এ কথা কে বলিবে? স্থলপথের আর একটি আভাস য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণীতে পাওয়া যায়। কজঙ্গল বা উত্তররাঢ় হইতে তিনি গিয়াছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনে এবং সেখান হইতে একটি বৃহৎ নদী পার হইয়া কামরূপে। এই পরিব্রাজক নিজে নূতন করিয়া পথ কাটিয়া অগ্রসর হন নাই; যে-পথ বহু দিন আগে হইতেই বহুলোক-যাতায়াতে প্রশস্ত হইয়াছে, সেই পথেই তিনি গিয়াছিলেন, এ অনুমানই সংগত। এই পথেই কামরূপের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য-সম্বন্ধ চলিত। পূর্ব ও নিম্নবঙ্গের সঙ্গে কামরূপের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল সেই পথ ধরিয়া যে-পথে এই চীন পরিব্রাজক কামরূপ হইতে সমতট ও তাম্রলিপ্তিতে আসিয়াছিলেন। আর, উড়িষ্যার সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধের স্থলপথ ধরিয়াই যে পরবর্তী কালে চৈতন্যদেব নীলাচল গিয়াছিলেন, তাহা তো সহজেই অনুমেয়। এই সব পথ বহু প্রাচীন এবং বহুজনের চরণচিহ্নে অঙ্কিত।

গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তি

সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান বন্দর যে ছিল গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তি, তাহাও সুস্পষ্ট। তাম্রলিপ্তিই জাতকের দামলিপ্তি এবং Ptolemyর Tamalites, য়ুয়ান্-চোয়াঙের তন্-মো-লিহ্-তি। সিংহলের সঙ্গে তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যপথের আভাস ফাহিয়ান্ রাখিয়া গিয়াছেন (চতুর্থ শতক)। তাহারও তিন চারি শত বৎসর আগে ভারতের দক্ষিণ-সমুদ্রতীর বাহিয়া গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তির সঙ্গে সুদূর রোম-সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-সম্বন্ধের আভাস তো Periplus ও Ptolemyর গ্রন্থেই পাওয়া যায়। এ-সমস্ত সাক্ষ্যই অত্যন্ত সুপরিচিত। মিলিন্দ-পঞ্‌হ গ্রন্থে বঙ্গ বা পূর্ব-বঙ্গকেও একটি অন্যতম সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, অন্যান্য অনেক বাণিজ্যকেন্দ্রের সঙ্গে। বলা হইয়াছে, বঙ্গদেশে বাণিজ্যব্যপদেশে অনেক সমুদ্রগামী জাহাজ একত্র হইত। এই বন্দর কোন্ বন্দর তাহা অনুমান করিবার উপায় নাই। তবে বুড়ীগঙ্গা (Ptolemy'র Antibole ?) বা মেঘনার মুখের কোনও বন্দর হওয়া অসম্ভব নয়, অথবা চট্টগ্রামও হইতে পারে কিন্তু মধ্যযুগের Bengala বন্দর হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। বহু পরবর্তী কালেও সপ্তগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তত ভৃগুকচ্ছ-সুরাষ্ট্র-পাটন পর্যন্ত এই বাণিজ্য-সম্বন্ধের বিস্তৃততর বিবরণ পাওয়া যাইবে মনসা-মঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায়। ব্রহ্মদেশ ও যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ ও পূর্বদক্ষিণ বৃহত্তর ভারতের দ্বীপগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নাই,

তবে অনুমান খুব সহজেই করা যাইতে পারে। উত্তর-ব্রহ্মের সঙ্গে আসাম ও মণিপুরের ভিতর দিয়া স্থলপথে একটা নিকট সম্বন্ধ তো ছিলই, একথা অন্যত্র বলিয়াছি; বর্তমান ত্রিপুরা জেলার পট্টিকেরার রাজবংশের সঙ্গে যে পাগানের আনাউরহ্থা ও চ্যন্জিথ্থার রাজবংশের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল, তাহাও আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি। মধ্যযুগে এই পথ দিয়াই একাধিক বার মণিপুরে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধাভিযান আসিয়াছে। নিম্নব্রহ্মের সঙ্গে সমুদ্রোপকূল বাহিয়া জলপথও ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রহ্মদেশীয় প্রাচীন রাজবংশাবলীগুলির ইতিহাসের মধ্যে, কিছু কিছু লিপিমালায়; ব্রহ্মদেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও আমার অন্য দুটি গ্রন্থে সে-কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যবদ্বীপ-সুবর্ণদ্বীপের সঙ্গে পূর্বদক্ষিণ-সমুদ্রের দেশ ও দ্বীপগুলির সম্বন্ধের প্রমাণ আছে মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের লিপিতে (চতুর্থ-পঞ্চম শতক), মেঘবর্মন-সমুদ্রগুপ্ত (চতুর্থ শতক) প্রসঙ্গে, রাজা বালপুত্রদেবের নালন্দা লিপিতে (দশম শতক), ই-ৎসিঙের (৭ম শতক) ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত ধর্মকীর্তির জীবন-ইতিহাসের মধ্যে (একাদশ শতক)। এই সমস্ত সাক্ষ্যই এত সুপরিচিত যে, ইহাদের উল্লেখ পুনরুক্তি-দোষে দুষ্ট হইবে। তাহা ছাড়া, ইতিপূর্বেই দেশ-পরিচয় অধ্যায়ে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। সাধারণ ভাবে এই সব পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ ও দেশ-গুলিতে বাংলা দেশের ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতির প্রভাব এত সুস্পষ্ট এবং পণ্ডিত মহলে এত বেশি আলোচিত হইয়াছে যে, প্রাচীন বাংলা দেশের সঙ্গে ইহাদের নিকট সম্বন্ধের কথা এখন আর কল্পনার বিষয় নয়। সত্য, এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত একটিও প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য-সংক্রান্ত নয়, যদিও একথা অনুমান করিতে বাধা নাই যে, বাণিজ্য-সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়াই ক্রমে ক্রমে বাংলা দেশের ও ভারতের অন্যান্য দেশের ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতি ক্রমশ এই সব অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অন্য দেশে রাজ্যবিস্তার এই ভাবেই হইয়া থাকে, প্রাচীন কালেও হইয়াছিল, বর্তমান কালেও হইয়াছে ও হইতেছে। সর্বাগ্রে বণিক, বণিকের সঙ্গে বণিকের প্রয়োজনেই ধর্ম ও পুরোহিত, তারপরেই ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আসিয়া পড়ে সামরিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব। যাহা হউক, প্রত্যক্ষ বাণিজ্য-সম্বন্ধের প্রমাণ প্রাচীন বাংলায় পাইতেছি না, কিন্তু নানা মনসামঙ্গল কাব্যে সে-প্রমাণ ছড়াইয়া আছে; আরাকান ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধের আভাস এই সব গ্রন্থে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। অনুল্লিখিত-নাম যে দেশের বিবরণ সওদাগরদের শুনান হইতেছে, সেই দেশ যে ব্রহ্মদেশ, বিবরণটি একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলে এ-সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু প্রাচীনকালে এই পূর্বদক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ ও দেশগুলির সঙ্গে বাংলা দেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণও কি নাই? আমার মনে হয়, আছে। সেই প্রমাণটি উল্লেখ করিয়াই এই ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গ শেষ করিব। মালয় উপদ্বীপের ওয়েলেস্লি জেলার

বৌদ্ধবণিক বুদ্ধগুপ্ত

একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে একটি শ্লেট্ পাথরে উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পাথরটির

মাঝখানে উৎকীর্ণ একটি বৌদ্ধস্তূপের প্রতিকৃতি, স্তূপটির দুই পাশে লিপি উৎকীর্ণ। লিপিটির পাঠ এইরূপ :—

অজ্ঞানাচ্চীয়তে কর্ম জন্মনঃ কর্ম কারণ [ম]
জ্ঞানান্ন চীয়তে [কর্ম কর্মাভাবান্ন জায়তে]

ইহা একটি বৌদ্ধ সূত্র। এর পরেই দক্ষিণতম প্রান্তে লেখা আছে :—

মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত রক্তমৃত্তিকা বাস [ত ব্যস্ত]

এবং তারপরেই বাম প্রান্তে ও পার্শ্বে আছে :—

সর্বেণ প্রকারেণ সবস্মিন্ সর্বথা স (র) ব···সিদ্ধ যাত [র] া [ঃ] সন্তু

এই মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত পণ্ডিতমহলে সুপরিচিত; লিপিটি বহু আলোচিত। বুদ্ধগুপ্তের বাড়ি ছিল রক্তমৃত্তিকায়। সিদ্ধযাত্র ও সিদ্ধযাত্রা কথাটি লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়াছে। বেশির ভাগ তর্ক নিরর্থক। কথাটি এ-পর্যন্ত এই দেশ ও দ্বীপগুলির অন্তত সাতটি প্রাচীন লিপিতে পাওয়া গিয়াছে। সিদ্ধযাত্রিক, সিদ্ধযাত্রত্ব, যাত্রাসিদ্ধিকাম ইত্যাদি কথা পঞ্চতন্ত্রে ও জাতকমালায় বার বার পাওয়া যায়। জাতকমালার সুপারগ-জাতকে পূর্বভারতের বণিকদের সুবর্ণভূমি বা নিম্নব্রহ্মদেশে যাত্রার কথা আছে (সুবর্ণভূমি বণিজো যাত্রাসিদ্ধিকামাঃ) —তাহাদের যাত্রা সিদ্ধিলাভ করুক, এই কামনা তাহাদের মনে ছিল, সেই জন্য তাহাদের বলা হইয়াছে যাত্রাসিদ্ধিকামাঃ। বুদ্ধগুপ্তের এই লিপিটির শেষ ছত্রটির অর্থেরও অস্পষ্টতা কিছু নাই; সর্বপ্রকারে, সকল বিষয়ে, সর্বথা বা সর্ব উপায়ে সকলে সিদ্ধযাত্র হউক, এই প্রকার একটা কামনা বা আশীর্বাদ করা হইতেছে। এই কামনা বা আশীর্বাদ করা হইয়াছিল যাত্রার পূর্বে, ইহাই ত 'সন্তু' এই ক্রিয়াপদটির এবং সমস্ত আশীর্বাদটির ইঙ্গিত। কামনা বা আশীর্বাদ করা হইয়াছিল খুব সম্ভব কোন বৌদ্ধ পুরোহিত বা ধর্মগোষ্ঠীর পক্ষ হইতে; স্তূপের প্রতিকৃতিটি তাহার প্রমাণ, এবং এই আশীর্বাদের একটি লিপি বৌদ্ধসূত্র সহ, ধর্মনিদর্শন সহ খোদাই করিয়া, রক্ষাকবচের মত বুদ্ধগুপ্তের সঙ্গে দিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই প্রথা তো এখনও বাংলার বহু পরিবারে প্রচলিত। এই মহানাবিকের বাস্তব্য অর্থাৎ বাড়ি ছিল রক্তমৃত্তিকায়। এই রক্তমৃত্তিকা কোথায়, ইহাই হইতেছে প্রশ্ন। অধ্যাপক কার্ন বলিয়াছিলেন, এই রক্তমৃত্তিকা চৈনিক উপাদানের Ch'ih-t'u, সিয়াম দেশের সমুদ্রোপকূলের একটি স্থানের সঙ্গে অভিন্ন। অক্ষর দেখিয়া লিপিটির তারিখ পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক। লিপিটির ভাষা শুদ্ধ সংস্কৃত; ধর্মপ্রেরণা একান্তভাবেই ভারতীয়; মহানাবিকটির নাম ও ধাম একান্তভাবেই ভারতীয়; বুদ্ধগুপ্ত নামটি যেন বিশেষ করিয়াই ভারতীয়। এই অবস্থায় নাবিকটিকে সিয়ামদেশবাসী বলিয়া মনে করিতে একটু ঐতিহাসিক দ্বিধা বোধ হয় বই কি? বিশেষত রক্তমৃত্তিকার সন্ধান যদি ভারতবর্ষে কোথাও পাওয়া যায়, তাহা হইলে তো কথাই নাই। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ (সপ্তম শতক) কিন্তু কর্ণসুবর্ণের বিবরণ দিতে বসিয়া এক রক্তমৃত্তিকার সন্ধান দিতেছেন; বলিতেছেন, কর্ণসুবর্ণের রাজধানীর একেবারে

পাশেই ছিল লো-টো মো-চিহ্ (Lo-to-mo-chih) নামে বৃহৎ বৌদ্ধ-বিহার। চীন লো-টো-মো-চিহ্ পালি অথবা প্রাকৃত লত্তমচি—রক্তমত্তি—রক্তমৃত্তি বা রক্তমৃত্তিকা, বাংলা, রাঙামাটি। আমার তো মনে হয়, বুদ্ধগুপ্তের বাড়ি কর্ণসুবর্ণের এই রক্তমৃত্তিকা বা রাঙামাটি। তাহা ছাড়া, আর একটি রাঙামাটির খবর আমরা জানি চট্টগ্রামে। প্রাচীন ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক আবেষ্টনের কথা মনে রাখিলে মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত যে বাংলাদেশের তাম্রলিপ্তি বন্দর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রতীরের দেশে,এই অনুমানই তো বিজ্ঞানসম্মত সত্য বলিয়া মনে হয়। এবং যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এইখানে আমরা প্রাচীন বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য-বিস্তারের একটা পাথুরে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। লক্ষণীয় এই যে, লিপির তারিখ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক। পরে আমি একাধিক প্রমাণ ও অনুমানের সাহায্যে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, খ্রীষ্টপূর্ব কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক পর্যন্তই বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ; ইহার পর আদিপর্বে বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের সেই যুগ আর ফিরিয়া আসে নাই।

এই যে আমরা একটা প্রশস্ত, সমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের পরিচয় পাইলাম, এই বাণিজ্যে বাংলাদেশে প্রচুর অর্থাগম হইত এবং সে-অর্থের অধিকাংশ বণিকদের হাতেই কেন্দ্রীকৃত হইত, এই ইঙ্গিত আগেই করিয়াছি। কিন্তু এই অর্থ কি? ইহা কি মুদ্রায় বা বিনিময়-দ্রব্যাদিতে রূপান্তরিত? প্লিনি যে বলিয়াছেন, আধ সের পিপ্পলির দাম হইত ১৫ স্বর্ণ দিনার, এবং ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বার্ষিক রপ্তানির মূল্য ছিল প্রায় এক লক্ষ মুদ্রা, তাহা হইতে অনুমান হয়, বণিকেরা বাণিজ্য-পসরার বদলে মুদ্রাই লইয়া আসিতেন, এবং এই মুদ্রা স্বুবর্ণমুদ্রা dinarius বা দিনার ও রৌপ্যমুদ্রা drachm বা দ্রম্ম। পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রায় সমস্ত পট্টোলীগুলিতে ভূমির মূল্যের উল্লেখ (স্বর্ণ) দিনার অনুযায়ী, কিংবা পরবর্তী পাল ও সেনবংশের লিপিগুলিতে মূল্যের উল্লেখ পাই রৌপ্য দ্রম্মে (ধর্মপালের মহাবোধি লিপির "ত্রিতয়েন সহস্রেণ দ্রম্মানাং খানিতা"; বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের দুইটি লিপিতেও ভূমির মূল্য বোধ হয় দেওয়া হইয়াছে দ্রম্মে)। এই দুইটি মুদ্রার নাম হইতে মনে হয়, এক সময়ে এই দুই বিদেশী মুদ্রাই প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশে আসিত, এবং বিনিময়-মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত এবং গৃহীতও হইত; পরে ইহাদের নাম হইতেই স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা বাংলাদেশে দিনার ও দ্রম্ম নামে পরিচিত হইয়াছিল। 'দাম' এবং 'দর্মা' (বেতন) এই কথা দুইটি ত 'দ্রম্ম' হইতেই আমরা পাইয়াছি। এই দুই মুদ্রা প্রচলনের মধ্যেও প্রশস্ত বৈদেশিক বাণিজ্য-সম্বন্ধের স্মৃতি লুক্কায়িত আছে, সন্দেহ নাই।

সামুদ্রিক বাণিজ্যলব্ধ সমৃদ্ধি

কিন্তু বিনিময়-বাণিজ্যও (trade by barter) সঙ্গে সঙ্গে ছিল না, এ-কথাও বলা চলে না। Periplus-গ্রন্থে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তো মনে হয়, এই বাণিজ্য পণ্য-বিনিময়েও মাঝে মাঝে চলিত। বংশীদাস ও মুকুন্দরামের যে-সাক্ষ্য

আগে একাধিক বার উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতেও প্রমাণ হয় যে, মধ্যযুগেও এই বিনিময় বাণিজ্য বহির্বাণিজ্যের অন্যতম নিয়ম ছিল। টেভারনিয়ারের যে-সাক্ষ্য ত্রিপুরাদেশাগত সোনা সম্বন্ধে আগে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে তো দেখা যায়, অন্তর্বাণিজ্যেও এই ব্যবস্থা কতকটা প্রচলিত ছিল। এই দু'টি সাক্ষ্যই মধ্যযুগীয়; তবু মনে হয় প্রাচীন ধারা কিছুটা মধ্যযুগেও অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে বিনিময় বাণিজ্য যে সাধারণ নিয়ম ছিল না তাহা খ্রীষ্টীয় শতকের আগে হইতে সমৃদ্ধ মুদ্রাপ্রচলন হইতেই সুপ্রমাণিত হয়।

৬

কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের আলোচনা শেষ হইল। এগুলি সমস্তই সামাজিক ধনসম্পদের বনিয়াদ; এই তিন উপায়েই দেশের অর্থোৎপাদন হইত। মুদ্রায় এই অর্থের রূপান্তর কিরূপ ছিল, দেখা প্রয়োজন।

বিনিময়ের জন্য মুদ্রার ব্যবহার অর্থনৈতিক সভ্যতার দ্যোতক। খ্রীষ্টীয় শতকের আগে হইতেই বাংলা দেশে মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। মহাস্থানের শিলাখণ্ডের লিপিটিতে

মুদ্রায় সামাজিক ধনের রূপ

গণ্ডক নামে এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন দেখিতে পাইতেছি। এই মুদ্রা সোনা কি রূপার, বলার কোনও উপায় নাই। তবে বহু পূর্ববর্তী কালের 'গণ্ডা' গণনা রীতির সঙ্গে যে এই গণ্ডক মুদ্রার একটা শব্দতাত্ত্বিক সম্বন্ধ আছে এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই গণ্ডক মুদ্রার চেহারা যে কিরূপ ছিল তাহাও আমরা কিছু জানিনা। কেহ কেহ মনে করেন, মহাস্থান লিপিতে 'কাকনিক' নামে আর এক প্রকার মুদ্রারও উল্লেখ আছে। এই মুদ্রারও রূপ, মূল্য বা ওজন সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। গণ্ডকের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ যে কি ছিল বলা যায় না। পেরিপ্লাস-গ্রন্থে খবর পাওয়া যাইতেছে, গঙ্গা-বন্দরে ক্যালটিস্ (Caltis) নামে এক প্রকার স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল; ইহা তো খৃষ্টীয় প্রথম শতকের কথা। কেহ কেহ মনে করেন, Caltis সংস্কৃত 'কলিত' অর্থাৎ সংখ্যাঙ্কিত শব্দেরই রূপান্তর। পেরিপ্লাস-গ্রন্থের সম্পাদক মনে করেন Caltis এবং দক্ষিণ-ভারতের Kallais একই মুদ্রা। ভিন্‌সেন্ট স্মিথ তো বলেন, Kallais নামে বাংলাদেশেও এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন ছিল। কনকলাল বড়ুয়া মনে করেন, আসামের 'কলিত' বণিকেরা একপ্রকার স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করিত, তাহার নাম ছিল Kaltis। বোধ হয় ইহারও আগে এক ধরনের নানা চিহ্নাঙ্কিত (punch-marked) রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার বিস্তৃত প্রচলন ছিল বাংলা দেশে। চব্বিশ পরগণার জাক্রা এবং বেরাচাম্পা, রাজসাহীর ফেট্‌গ্রাম, মৈমনসিংহের ভৈরববাজার, মেদিনীপুরের তমলুক এবং ঢাকার উয়াড়ী প্রভৃতি স্থানে এই ধরনের রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রচুর আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রাপ্ত এই জাতীয় মুদ্রার নিকট আত্মীয়তা সহজেই ধরা পড়ে। সেই হেতু, সর্বভারতীয় সাধারণ অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে বাংলার একটা যোগাযোগ ছিল, এই অনুমান

হয়তো নিতান্ত মিথ্যা না-ও হইতে পারে। কুষাণ আমলের দুই চারিটি স্বর্ণমুদ্রাও বাংলা দেশে পাওয়া গিয়াছে। বাংলাদেশ কখনও কুষাণ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; কাজেই অনুমান হয়, বাণিজ্য ব্যপদেশে বা অন্য কোনও উপায়ে কিছু কিছু কুষাণ স্বর্ণমুদ্রা বাংলাদেশে আসিয়া থাকিবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে বিনিময় মুদ্রা হিসাবে এই মুদ্রার প্রচলন ছিল, এমন মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

উত্তর-বঙ্গ গুপ্ত-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এ তথ্য সুবিদিত। সেই আমলে গুপ্ত মুদ্রারীতি বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত ছিল। এই মুদ্রা ছিল প্রধানত সুবর্ণ ও রৌপ্যের; স্কন্দগুপ্তের আমলে গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রার ওজন ছিল ১৪২ মাষের কাছাকাছি, এবং রৌপ্যমুদ্রার ওজন একটি রৌপ্য কার্যাপণের প্রায় সমান অর্থাৎ ৩৬ মাষ। পূর্ববর্তী সম্রাটদের কালে স্বর্ণমুদ্রা ওজনে আরও কম ছিল। যাহাই হউক, গুপ্ত আমলে এই দুই মুদ্রাই যে বাংলাদেশে প্রচলিত হইয়াছিল তাহার লিপি-প্রমাণ প্রচুর; বিনিময় মুদ্রা হিসাবে এই মুদ্রাই ব্যবহৃত হইত। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলীগুলিতে ভূমির মূল্য দেওয়া হইয়াছে (স্বর্ণ) দিনারে (denarius aureus)। প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রাই যে ছিল দিনার, তাহা ইহাতেই সপ্রমাণ। রৌপ্য মুদ্রার নাম ছিল রূপক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৈগ্রাম পট্টোলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই লিপি হইতেই প্রমাণ হয় যে, আটটি রূপক মুদ্রা অর্ধ দিনারের সমান, অর্থাৎ ষোলটিতে এক দিনার। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে (ধনাইদহ, দামোদরপুর ও বৈগ্রাম পট্টোলীর কালে) এক স্বর্ণ দিনারের ওজন ছিল ১১৭·৮ হইতে ১২৭·৩ মাষ পরিমাণ, এবং এক রূপকের ওজন ছিল ২২·৮ হইতে ৩৬·২ মাষ পরিমাণ। ইহা হইতে সোনার সঙ্গে রূপার আপেক্ষিক সম্বন্ধের যে-ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয়, রূপার আপেক্ষিক মূল্য সোনা অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার কারণ বর্তমানে যে ঐতিহাসিক উপাদান আমাদের হাতে আছে তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হইতে পারে, দেশে রৌপ্যের অপ্রতুলতাই ইহার কারণ, অথবা কোনওনা কোনো কারণে দেশে রৌপ্যের আমদানি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, অথবা পট্টোলীগুলির মধ্যে আমরা যে স্বর্ণ দিনারের উল্লেখ দেখিতেছি তাহার যথার্থ মূল স্বর্ণমূল্য (intrinsic value) অনেক কম ছিল, অর্থাৎ সুবর্ণ মুদ্রার স্বর্ণগত অবনতি ঘটিয়াছিল (debasement)। দেখিতেছি, গুপ্ত আমলের অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশে যখন স্ব স্ব প্রধান ছোট ছোট রাজবংশের স্বতন্ত্র আধিপত্য চলিতেছে তখন রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন একবারে নাই, অথচ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন অব্যাহত, এবং এই স্বর্ণমুদ্রার যথার্থ মূল স্বর্ণমূল্য অনেক কম, অবনত (debased) স্বর্ণমুদ্রা, যদিও ওজনে তাহা কমে নাই। বাংলাদেশের বহুস্থানে কিছু কিছু গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহার কিছু সাধারণ সরকারী গ্রন্থশালার রক্ষিত, কিন্তু ব্যক্তিগত সংগ্রহে যাহা আছে তাহার সংখ্যাও কম নয়। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ কালীঘাটে প্রায় ২০০ (গুপ্ত ?) সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার অধিকাংশই গালাইয়া ফেলা হইয়াছিল। গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে

যশোহরের মহম্মদপুরে, হুগলিতে ও হুগলি জেলার মহানাদে। গুপ্ত রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে যশোহরের মহম্মদপুরে, বর্ধমান জেলার কাটোয়ায়। 'নকল' গুপ্তমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে উপরোক্ত মহম্মদপুরে, ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায়, ঢাকা জেলার সাভার গ্রামে এবং রংপুরে। বাংলাদেশের নানা জায়গায় শশাঙ্ক, জয়(নাগ ?) সমাচা(র দেব ?) এবং অন্যান্য রাজার নামাঙ্কিত এই ধরনের কিছু কিছু স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। রৌপ্যমুদ্রা একেবারেই নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই, গুপ্ত আমলেও, যখন স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা বহুল প্রচলিত, তখনও মুদ্রার নিম্নতম মান কিন্তু কড়ি। চতুর্থ শতকে ফাহিয়ান বলিতেছেন, লোকে ক্রয়বিক্রয়ে কড়িই ব্যবহার করিত, এবং নিম্নতম মান কড়ি একেবারে উনবিংশ শতক পর্যন্ত কোনোও দিনই ব্যবহারের বাইরে চলিয়া যায় নাই। চর্যাপদ (দশম-একাদশ শতক) গুলিতে দেখিতেছি, কবাডি (কড়ি) এবং বোডির (বুড়ি) ব্যবহার। মিন্হাজ উদ্দীন তুরস্কাভিযানের বিবরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন, অভিযাত্রী তুরুষ্কেরা বাংলাদেশে কোথাও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন দেখিতে পান নাই; সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে লোকে কড়িই ব্যবহার করিত। এমন কি রাজাও যখন কাহাকেও কিছু দান করিতেন, কড়ি দ্বারাই করিতেন; লক্ষ্মণসেনের নিম্নতম দান ছিল এক লক্ষ কড়ি। ত্রয়োদশ শতকেও কড়ির প্রচলনের সাক্ষ্য অন্যত্র পাইতেছি। পঞ্চদশ শতকে মা-হুয়ান একই সাক্ষ্য দিতেছেন; মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এবং বিদেশী পর্যটকদের সাক্ষ্য একই প্রকার। এমন কি ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকেরাও দেখিয়াছেন কলিকাতা শহরে কর আদায় হইত কড়ি দিয়া; বাজারে অনেক ক্রয় বিক্রয়ও কড়ির সাহায্যেই হইত।

যাহাই হউক, মাৎস্যন্যায়-পর্বের শেষে পাল রাজারা যখন দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং শান্তি ও সুশাসন ফিরিয়া আসিল তখন আবার দেশে রৌপ্যমুদ্রার (এবং সঙ্গে সঙ্গে তাম্রমুদ্রার) প্রচলন যেন ফিরিয়া আসিল। কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা আর ফিরিল না। স্বর্ণমুদ্রার ক্রমশ অবনতি ঘটিতে ঘটিতে শেষে যেন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। বস্তুত, পালরাজা ও সেনরাজাদের আমলের একটি স্বর্ণমুদ্রাও বাংলাদেশে কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই, কিংবা সমসাময়িক সাহিত্যে কোথাও তাহার কোনও উল্লেখও নাই। সপ্তম শতকের পর হইতেই স্বর্ণ দিনার বা যে কোনও প্রকার স্বর্ণ মুদ্রা একেবারে অনুপস্থিত। বাংলা ও বিহারের কোথাও কোথাও "শ্রী বি(গ্রহ)" নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; কোথাও কোথাও ঐ নামাঙ্কিত বা কোন নামাঙ্কন ছাড়া পালযুগীয় তাম্রমুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে (যেমন, পাহাড়পুরে)। "শ্রী বি(গ্রহ)" পালরাজ প্রথম বিগ্রহপাল; নিকৃষ্ট তাম্র মুদ্রাগুলি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের আমলেরও হইতে পারে, এমন কি সমসাময়িক বা পরবর্তী অন্য কোনো রাজারও হইতে পারে। ঐ নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা সাধারণত দ্রম্ম (drachm) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ধর্মপালের মহাবোধি লিপিতে দ্রম্ম নামক এক প্রকার মুদ্রার উল্লেখ আছে; এই উল্লেখই পাল আমলে দ্রম্ম মুদ্রার প্রচলনের প্রমাণ। উক্ত রাজার রাজত্বের

ষোল বৎসরে কেশব নামক এক ব্যক্তি তিন সহস্র দ্রম্ম মুদ্রা খরচ করিয়া (ত্রিভিরেব সহস্রৈশ দ্রম্মাণাং খানিতা) একটি পুকুর খনন করাইয়াছিলেন। সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন তো ছিলই না, এবং আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলি হইতে মনে হয়, রৌপ্যমুদ্রারও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছিল। যে অবনতি গুপ্ত-পরবর্তী যুগে দেখা গিয়াছিল, পালরাজারাও সেই অবনতি ঠেকাইতে পারেন নাই। এমন কি আবিষ্কৃত তাম্রমুদ্রাগুলিও মূল মূল্য বা আকৃতি বা শিল্পরূপের দিক হইতে অত্যন্ত নিকৃষ্ট। ভাস্করাচার্যের (১০৩৬ শক—১১১৪ খ্রী) লীলাবতী গ্রন্থে একটি আর্যা আছে; কুড়ি কড়া বা কড়িতে এক কাকিনী, চার কাকিনীতে এক পণ, ষোল পণে এক দ্রম্ম (রৌপ্য মুদ্রা), ষোল দ্রম্মে এক নিষ্ক। অমরকোষের মতে এক নিষ্ক এক দিনারের সমান, অর্থাৎ ষোল দ্রম্মে এক দিনার, অর্থাৎ ষোল দ্রম্ম—ষোল রূপক। দ্রম্ম যে রৌপ্যমুদ্রা তাহা হইলে এসম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু রৌপ্যমুদ্রা হইলে কি হইবে, পাল রৌপ্যমুদ্রা যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের; মূল মূল্য (intrinsic value) এবং বাহ্যরূপ উভয় দিক হইতেই নিকৃষ্ট।

সেন আমলে কিন্তু তাহাও নাই। সুবর্ণমুদ্রা তো দূরের কথা, রৌপ্যমুদ্রাও একেবারে অন্তর্হিত। বস্তুত, ধাতুমুদ্রা প্রচলনের একটা চেষ্টা পাল আমলে যদি বা ছিল, সেন আমলে তাহাও দেখিতেছি না। এই আমলে দেখিতেছি, উর্ধ্বতম মুদ্রামান পুরাণ বা কপর্দক পুরাণ। এই পুরাণ বা কপর্দক পুরাণের একটিও বাংলাদেশের কোথাও আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সেই জন্যই এই মুদ্রার রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুমান ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে, পুরাণ-মুদ্রার আকার ছিল কপর্দক বা কড়ির মতন, সেই মুদ্রাই কপর্দক পুরাণ। দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় এইরূপ মনে করেন এবং বলেন কপর্দক পুরাণ রৌপ্যমুদ্রা। এইরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, পুরাণ ৩২ রতি বা ৫৮ মাষ পরিমাণের সুবিদিত রৌপ্যমুদ্রা বলিয়া নানা গ্রন্থে কথিত। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, প্রায় প্রত্যেকটি লিপিতেই শত শত পুরাণ মুদ্রার উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে একটিও পুরাণমুদ্রা পাওয়া গেল না কেন? এবং অন্যদিকে, মিনহাজই বা কেন বলিতেছেন, তুরুষ্কেরা রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন দেখে নাই, হাট বাজারে কড়িরই প্রচলন ছিল? এমন কি রাজার দানমুদ্রাও ছিল কড়ি! এ-রহস্যের অর্থ কি এই যে, কপর্দক পুরাণ বা পুরাণ বলিয়া যথার্থত কোনও মুদ্রার অস্তিত্বই সেন আমলে ছিল না, আন্তর্দেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে মুদ্রার উর্ধ্বতম ও নিম্নতম উভয় মানই ছিল কড়ি? অথবা, কপর্দকপুরাণ ছিল একটা কাল্পনিক রৌপ্যমুদ্রা মান, এবং এক নির্দিষ্ট সংখ্যক কড়ির মূল্য ছিল সেই রৌপ্য মানের সমান? বহির্বাণিজ্য এবং পরদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্যই কি এইরূপ মান নির্ধারণের প্রয়োজন ছিল? বোধ হয় তাহাই। সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী মহাশয় নানা অনুমানসিদ্ধ প্রমাণের সাহায্যে এই ধরনের ইঙ্গিতই করিতেছেন, বলিতেছেন, "...Payments were made in cowries and a certain number of them came to be equated to

the silver coin, the purana, thus linking up all exchange transactions ultimately to silver, just as at present, the silver coin is linked up to gold at a certain ratio"।

গুপ্তযুগের পর অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতেই মুদ্রার, বিশেষভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার, এরূপ অবনতি ঘটিল কেন, এই প্রশ্ন অর্থনীতিবিদের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতে পারে। প্রথমাবস্থায় স্বর্ণমুদ্রার অবনতি ঘটিল, কিছুদিন গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রার নকলও চলিল এবং তারপর একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। রৌপ্যমুদ্রা সপ্তম শতকেই একবার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল, তবে পাল আমলে আবার তাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু সে-চেষ্টা সার্থক হয় নাই। সেন-আমলে আর তাহা দেখাই গেল না, এমন কি তাম্রমুদ্রাও নয়। গুপ্ত আমলে স্পষ্টত স্বর্ণ ই ছিল অর্থমান নির্দেশক, পাল আমলে রৌপ্য; সেন আমলেও স্বীকারত রৌপ্য, কিন্তু সে রৌপ্য দৃশ্যত অনুপস্থিত। নিম্নতম মান কড়ি সব সময়ই ছিল, এবং ছোটখাট কেনাবেচায় ব্যবহারও হইত, কিন্তু অর্থমান নির্ণীত হইত সোনা বা রূপায়। সেন আমলে কড়িই মনে হইতেছে সর্বেসর্বা। মুদ্রার এই ক্রমাবনতি কি দেশের সাধারণ আর্থিক দুর্গতির দিকে ইঙ্গিত করে? না, রাষ্ট্রের স্বর্ণের ও রৌপ্যের গচ্ছিত মূলধনের স্বল্পতার দিকে ইঙ্গিত করে? মুদ্রার প্রচলন কি কমিয়া গিয়াছিল? স্বর্ণমুদ্রার অবনতি এবং বিলুপ্তি হয়ত Gresham Law দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়; রৌপ্যমুদ্রার অবনতিও কি সেই কারণে? যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর, বিশেষ করিয়া বহির্বাণিজ্যের উপর, প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধি নির্ভর করিত, তাহার অবনতি ঘটিয়াছিল কি? সোনা ও রূপার অভাব ঘটিয়াছিল কি? রাজকোষে সমস্ত সোনা ও রূপা সঞ্চিত হইতেছিল কি?

সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আজও হয়তো সম্ভব নয়। তবে কিছু কিছু তথ্য ও তথ্যগত অনুমান উল্লেখ করা যাইতে পারে। গুপ্ত রাজাদের আমলের পর হইতেই, এমন কি শশাঙ্কের আমলেই, বাংলার রাষ্ট্রীয় অবস্থায় গুরুতর চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল। তারপর তো প্রায় সুদীর্ঘ এক শতাব্দীরও উপর দুরন্ত মাৎস্যন্যায়ের অপ্রতিহত রাজত্ব চলিয়াছে; অন্তর্বাণিজ্য বহির্বাণিজ্য দুইই খুব বিচলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, এবং সমাজের অর্থনৈতিক স্থিতিও খানিকটা শিথিল হইয়াছিল। এই অবস্থায় স্বর্ণমুদ্রার অবনতি ঘটা কিছু অস্বাভাবিক নয়, নকল মুদ্রা চলাও অস্বাভাবিক নয়। আর, রৌপ্যমুদ্রার অবনতিও একই কারণে হইয়া থাকিতে পারে। রূপা বাংলাদেশের কোথাও পাওয়া যায়না; ইহাও হইতে পারে যে, বিদেশ হইতে রূপার আমদানি কোনও কারণে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পাল সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুবিস্তৃত হইবার পরও স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ঘটিল না কেন, রৌপ্যমুদ্রাই বা স্বগৌরবে ও যথার্থ মূল্যে প্রতিষ্ঠিত হইল না কেন, এ-তথ্য ইতিহাসের অন্যতম বিস্ময়। পালরাজাদের

আদান-প্রদান ও যোগাযোগ ছিল উত্তর-ভারত জুড়িয়া এবং হয়তো দক্ষিণ-ভারতেও; সমসাময়িক কালে অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে সুবর্ণমুদ্রার প্রচলনও ছিল অন্নবিস্তর। আনুমানিক একাদশ শতকে জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কামরূপের রাজা জয়পালের নিকট হইতে (হেম্নাম্ শতানি নব) নয়শত সুবর্ণ (মুদ্রা) দান গ্রহণ করিয়াছিলেন, সিলিমপুর লিপিতে এ-তথ্য পাওয়া যাইতেছে। অথচ, বাংলাদেশে তখন সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন একেবারে নাই, পরেও নাই। পাল ও সেন বংশের মতন সমৃদ্ধ ও সচেতন রাজবংশ সুবর্ণমুদ্রার প্রচলনে প্রয়াসী হইলেন না কেন? বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে এ-প্রশ্নের উত্তর চেষ্টা করা যাইতে পারে।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রারম্ভেই আরবী মুসলমানেরা সিন্ধুদেশ অধিকার করে। ইহাদের পূর্বদেশাভিযান আগেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমদেশাভিযানও চলিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে ইহারা একদিকে স্পেন ও অন্যদিকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত নিজদের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব, এবং চীনদেশ পর্যন্ত বাণিজ্য প্রভুত্ব বিস্তার করে। ভূমধ্যসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত-মহাসাগরের দক্ষিণ-পূর্বশায়ী দ্বীপগুলি পর্যন্ত যে সামুদ্রিক বাণিজ্য ছিল এক সময় রোম ও মিসর দেশীয় বণিকদের করতলগত সেই সুবিস্তৃত বাণিজ্য-ভার চলিয়া যায় আরব ও পারস্যদেশীয় বণিকদের হাতে। অবশ্য একদিনে তা' হয় নাই। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি হইতেই এই বিবর্তনের সূত্রপাত এবং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে আসিয়া চরম পরিণতি। এই বিবর্তন ইতিহাসের বিস্তৃত উল্লেখের স্থান এখানে নয়, কিন্তু সংক্ষেপত এই কথা বলা যায়, এই সুবৃহৎ বাণিজ্যে উত্তর-ভারতীয়দের যে অংশ ছিল তাহা ক্রমশ খর্ব হইতে আরম্ভ করে। প্রথম পশ্চিম-ভারতের বন্দরগুলি চলিয়া যায় আরবদেশীয় বণিকদের হাতে, এবং পরে পূর্ব-ভারতের। দক্ষিণ-ভারতীয় পল্লব, চোল ও অন্য ২।১টি রাজ্য প্রায় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু পরে তাহাও চলিয়া যায়। মুঘল আমলে তো প্রায় সমস্ত ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যটাই আরব ও পারস্যদেশীয় বণিকদের হাতে ছিল; সেই বাণিজ্য লইয়াই তো পরে পর্তুগীজ-ওলন্দাজ-দিনেমার-ফরাসী-ইংরেজে কাড়াকাড়ি মারামারি।

যাহাই হউক, আমি আগেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, এই সামুদ্রিক বাণিজ্য হইতে প্রাচীন বাংলাদেশে প্রচুর অর্থাগম হইত। গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তি হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া মাল বিদেশে রপ্তানি হইত, এবং তাহার বদলে দেশে প্রচুর সুবর্ণ ও রৌপ্য আমদানি হইত—এই সুবর্ণ রোমক দিনার এবং রৌপ্য রোমক দ্রম্ম হওয়াই সম্ভব। খ্রীষ্টপূর্ব শতক হইতেই এই সমৃদ্ধির সূচনা দেখা দিয়াছিল এবং সমানে চলিয়াছিল প্রায় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত। কিন্তু তারপরেই এই সমৃদ্ধ বাণিজ্যস্রোতে যেন ভাঁটা পড়িয়া গেল। ভারতীয় দ্রব্যসম্ভারের কাছে পশ্চিমের সুবিস্তৃত হাট বন্ধ হইয়া গেল। যখন আবার সেই হাট খুলিল তখন বাণিজ্যকর্তৃত্ব চলিয়া গিয়াছে আরব বণিকদের হাতে এবং

সেই হাটেরও চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। পশ্চিমের বাজারে যে-সব জিনিসের চাহিদা ছিল তাহাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। অন্তত এই সুসমৃদ্ধ বাণিজ্যে বাংলাদেশের যে অংশ ছিল তাহা যে খর্ব হইয়া গিয়াছে, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। বাংলাদেশের প্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্তি; সেই তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যসমৃদ্ধির কথা সকলের মুখে মুখে, পুঁথির পাতায় পাতায়। সপ্তম শতকে য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ ও ই-ৎসিঙ্ তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বা কোনও হিসাবেই তাম্রলিপ্তির উল্লেখ অষ্টম শতকের পর হইতে আর পাইতেছি না। পলি পড়িয়া পড়িয়া সরস্বতী নদীর মুখ বন্ধ হইয়া গেল এবং নদীটিও খাত্ পরিবর্তন করিল। তাম্রলিপ্তির সৌভাগ্য সূর্য অস্তমিত হইল, এবং আশ্চর্য এই, অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে আর কোথাও সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিল না! চতুর্দশ শতকে দেখিতেছি ভাগীরথী-তীরবর্তী সপ্তগ্রাম তাম্রলিপ্তির স্থান অধিকার করিতেছে এবং পূর্ব-দক্ষিণতম বাংলায় নূতন এক বন্দর চট্টগ্রাম গড়িয়া উঠিতেছে। সত্যই এই সুদীর্ঘ পাঁচ ছয় শত বৎসর সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাংলা দেশের বিশেষ কোনও স্থান নাই। এবং সেই হেতু বাহির হইতে সোনারূপার আমদানিও কম। ভারতের অন্তর্বাণিজ্যে বাংলার অংশ নিঃসন্দেহে আছে; বাংলাদেশ বিদেশে ও ভারতবর্ষে তাহার বস্ত্রসম্ভার, চিনি, গুড়, লবণ, নারিকেল, পান, সুপারি ইত্যাদি রপ্তানি করিতেছে প্রচুর, কিন্তু তাহার নিজস্ব কোনও সামুদ্রিক বন্দর নাই; যেটুকু তাহার অংশ তাহা শুধু আন্তর্দেশিক ব্যবসাবাণিজ্যে। সেই সূত্রে সোনারূপায় দাম সে পাইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা আগেকার মতন আর লাভজনক নয়, সুপ্রচুরও নয়। স্বর্ণ দ্বারা অর্থমান নির্ণয় করিবার মতন ইচ্ছা বা অবস্থা পরবর্তী পাল বা সেন রাষ্ট্রের আর নাই, স্পষ্টতই বোঝা যাইতেছে। অথবা, যেহেতু বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্য তাঁহাদের আর নাই, সেই হেতু স্বর্ণমানের প্রয়োজনও নাই। অথচ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে দেখিতেছি, সাধারণ গৃহস্থও ভূমি কেনাবেচা করিতেছেন স্বর্ণমুদ্রার সাহায্যে। সেন আমলের শেষ পর্যন্ত অন্তত স্বীকারত রৌপ্যই হয়তো অর্থমান নির্ণক; কিন্তু তৎসত্ত্বেও পাল আমলে রৌপ্যমুদ্রার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, সেন আমলে মৃত। ভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্যই হয়তো রৌপ্যমান বজায় রাখা প্রয়োজন হইয়াছিল। মুদ্রার অবস্থা যাহাই হউক, এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, অষ্টম শতক ও তাহার পর হইতেই ভারতীয় সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্যে বাংলাদেশের আর কোনও বিশেষ স্থান ছিল না, এবং অন্তর্বাণিজ্যে অল্পবিস্তর আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও সেই হেতু বণিককুল ও ব্যবসায়ীদের সমাজে ও রাষ্ট্রে সে প্রভাব ও প্রতিপত্তি আর থাকে নাই। অষ্টম শতক হইতে দেখা যাইবে—পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমি তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি—বঙ্গীয় সমাজ ক্রমশ কৃষি-নির্ভর হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে, এবং কৃষকেরাই সমাজদৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দেখিতেছি, বণিক ও ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিপত্তিও হ্রাস হইয়াছে। রাষ্ট্রের

অধিষ্ঠানাধিকরণগুলিতে শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক ও ব্যাপারী প্রভৃতিদের যে-আধিপত্য পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে দেখা যায় অষ্টম শতকে ও তাহার পর আর তাহা নাই।

কিন্তু স্বর্ণমুদ্রার অনস্তিত্ব এবং রৌপ্যমুদ্রার অবনতি ও অনস্তিত্ব শুধু বহির্বাণিজ্যের অবনতি ও বিলুপ্তি দ্বারা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পাল ও সেন আমলে খুব যে নামিয়া গিয়াছিল মনে হয় না। এই দুই আমলের লিপিগুলি এবং সমসাময়িক সাহিত্য—রামচরিত, পবনদূত, গীতগোবিন্দের মতন কাব্য, সদুক্তিকর্ণামৃতের মত সংকলন গ্রন্থে উদ্ধৃত সমসাময়িক বাঙালী কবিদের রচনা—পাঠ করিলে, নানা বিচিত্র অলংকারশোভিত মূর্তিগুলি দেখিলে, অসংখ্য সুদৃশ্য সুউচ্চ মন্দির-রচনার কথা স্মরণ করিলে, যাগযজ্ঞে পূজানুষ্ঠানে রাজরাজড়া এবং অন্যান্য সমৃদ্ধ লোকদের দানধ্যানের কথা স্মরণ করিলে মনে হয় না লোকের, অন্তত সমাজের উচ্চতর আর্থিক শ্রেণীগুলির, ধনসমৃদ্ধির কিছু অভাব ছিল। মণিমুক্তাখচিত সোনারূপার অলংকারের যে-সব পরিচয় লিপিগুলিতে, সমসাময়িক সাহিত্যে এবং শিল্পে পড়া ও দেখা যায় তাহাতে তো মনে হয় সোনারূপাও দেশে যথেষ্ট ছিল। তৎসত্ত্বেও এই দুই রাজবংশ সুবর্ণমুদ্রা, এমন কি সেন রাজারা রৌপ্য-মুদ্রারও প্রচলন করিলেন না। আন্তর্ভারতীয় বাণিজ্য এবং অন্যান্য ব্যাপার কিসের সাহায্যে নিষ্পন্ন হইত? ভিন্‌দেশীরা তো নিশ্চয়ই কড়ি গ্রহণ করিতেন না! রাষ্ট্রকে বিনিময়ে সোনা বা রূপা নিশ্চয়ই দিতে হইত। সেন আমলে স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা কিছুই তো ছিল না; তবে কি বিনিময় ব্যাপারটা সোনা বা রূপার তালের সাহায্যে নিষ্পন্ন হইত? রাজ-কোষে যে অর্থ সঞ্চয় হইত তাহাও কি সোনা ও রূপার তাল? আন্তর্ভারতীয় বাণিজ্য, ভিন্‌দেশীর সঙ্গে আর্থিক লেনদেন প্রভৃতি কি রাষ্ট্রের মারফতে বা মধ্যবর্তিতায় নিষ্পন্ন হইত?

মুদ্রা-সংক্রান্ত এই সব অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তর ঐতিহাসিক গবেষণার বর্তমান অবস্থায় একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে।

তৃতীয় অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

১। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—গৌড়লেখমালা (পাল লিপিমালার জন্য দ্রষ্টব্য)।
২। আচারঙ্গ সূত্র—Sacred Books of the East Series, Jaina Sutras, ২৫২-৫৩পৃ।
৩। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প—ed. by Ganapati Sastri, ২২ পটল, ২৩২-৩৫পৃ। Sastri's edn. p. 11-13
৪। এনামুল হক্—আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য।
৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭, ১৩-১৮।
৬। রাজতরঙ্গিণী, ৪।৪৬৮।
৭। কালিদাস—রঘুবংশম, ৪।৩৫ ; ৪।৩৬-৩৭।
৮। কৌটিল্য—অর্থশাস্ত্র, ed. by Shamasastri, ২।১৩।
৯। কৃত্তিবাস—রামায়ণ, আদিকাণ্ড, নলিনীকান্ত ভট্টশালী সং, ৯৯পৃ।
১০। কৃষ্ণমিশ্র—প্রবোধচন্দ্রোদয়, ২য় অঙ্ক।
১১। গোবিন্দদাসের কড়চা, ক-বি সং।
১২। ঘনারাম—ধর্মমংগল।
১২ক। জয়ানন্দ—চৈতন্যমংগল।
১৩। ত্রিপুরা রাজমালা, বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত, ৪৯পৃ।
১৪। দশকুমার চরিতম্, মিত্রগুপ্ত চরিত, ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস।
১৫। দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহদ্বঙ্গ, ১ম খণ্ড।
১৬। দেবী ভাগবত—বঙ্গবাসী সং, ৩৯২ পৃ।
১৭। ধোয়ী—পবনদূত, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ সং, ২৫-৩৮।
১৮। পঞ্চপুষ্প মাসিক পত্রিকা, ১৩৩৯, ৩৬৯পৃ।
১৯। পাণিণি—পাণিণিসূত্র, Kielhorn's edn. II. p. 269, 282।
২০। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য—কামরূপ শাসনাবলী, ভূমিকা।
২০ক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪১,১৭-১৯ পৃ ; ১৩৪৮; ৪৬ পৃঃ ; ১৩১৭, ২৩২-২৩৪ পৃ।
২১। বসুমতী মাসিক পত্রিকা, মাঘ, ১৩৪০, ৬১০পৃ।
২২। বরাহমিহির—বৃহৎসংহিতা, ১৪।৮ ; ১৪।৬-৭।
২৩। বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড, ২,৪১পৃ।
২৪। বায়ুপুরাণ, ৯৯, ১১, ৮৫ হইতে।
২৫। বাৎস্যায়ন—কামসূত্র, ৬।৪৯ ; tr. by Burton, pp. 52-58. p. 236 ; Chowkhamba edn. pp. 115, 294.
২৬। বোধায়ন—ধর্মসূত্র, ed. by Srinivasacharya, ১,১, ২৫—৩১।
২৭। বৃহদ্ধর্মপুরাণ, Bib. Ind. edn., p. 409।
২৮। ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড।
২৯। ভরতমল্লিক—চন্দ্রপ্রভা, ৩৫পৃ।
৩০। ভাগবত পুরাণ, ২।৪।১৮।
৩১। মৎস্যপুরাণ ৪৮ ; ১২১।
৩২। মহাভাগবতপুরাণ, গুজরাতী সং, ৭০ অধ্যায়, ১৭৫পৃ।
৩৩। মহাভারত, বনপর্ব, তীর্থযাত্রা অধ্যায় ; ২।৩০ ; ৮৫।২-৪ ; সভাপর্ব, ৫২।১৭।
৩৪। মিতাক্ষরা, নির্ণয়সাগর প্রেস সং, ২৫৭পৃ।
৩৫। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ—চণ্ডীমংগল, ক-বি সং, ১. ২০পৃ।
৩৬। যশোধর—(কামসূত্রের) জয়মংগল নামীয় টীকা, Benares edn. ২৯৪-৯৫পৃ।
৩৭। রাজশেখর—কর্পূরমঞ্জরী, Konow and Lenman's edn. ২২৬-২৭পৃ।
কাব্যমীমাংসা।

৩৮। রাবারু, ২, ১০, ৩৬-৩৭।
৩৯। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বৌদ্ধগান ও দোঁহা, ভূমিকা এবং ৪৯ পদের টীকা ও অর্থ।
৪০। হেমচন্দ্র—অভিধান চিন্তামণি, ভূমিকাও।
৪১। শব্দকল্পদ্রুম, গৌড় ও বরেন্দ্রী শব্দ দ্রষ্টব্য।
৪২। সতীশচন্দ্র মিত্র—যশোহর ও খুলনার ইতিহাস, ৪, ১৩২পৃ।
৪৩। সদুক্তিকর্ণামৃত—শ্রীধরদাস ; ২।৮৪।৬ ; ২।১৩৬।৫ ; ৫।৩১।২।
৪৪। সন্ধ্যাকর নন্দী—রামচরিত, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি সং, Intro. and text. ২।৫,৬,৮।
৪৫। সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৮০-৮৭পৃ, ১০৪-১১৯পৃ, ৫৭৭-৭৮পৃ, ১০১পৃ, ৪৩৪পৃ।
৪৬। Ain-i-Akbari, tr. by Jarrett, II. p. 120, 141. "The original name of Bengal was *Bang*. Its former rulers raised mounds measuring ten yards in height and twenty in breadth throughout the province which were called *al*. From this suffix the name Bengal took its rise and currency"।
৪৭। Aitareya Aranyaka, Keith's edn. 101, 200।
৪৮। Annual Report of the Arch. Survey of Burma. 1921-22. pp. 61-62 ; 1922-23, pp 31-32।
৪৯। Annual Rep. of the Archaeological Survey of India, 1922-23, p. 109।
৫০। Bagchi, P. C.—Materials for a critical edition of the Bengali Caryapadas, in Journ. of the Dept. of Letters, C. U.।
৫১। Baharistan-i-Ghaybi. ed. & tr. by Borah. I, pp. 45-64।
৫২। Berry, J. W. E.—The waterways in East Bengal, in A. B. Patrika 15th June, 1938।
৫৩। Bhattasali, N. K.—Antiquity of the Lower Ganges, in Science and Culture, VII, 1941, p. 233-39।
৫৪। Bulletin l'Ecole Francaise Extreme Orient. IV. p. 131ff. p. 142-43।
৫৫। Carey—Good old days of the John Company. II. p. 157।
৫৬। Chakladar. H. C.—Social life in Ancient India: Studies in Vatsyayana's Kamasutra. pp. 64-67।
৫৭। Corpus Inscriptionum Indicarm. III (সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি লিপি, মহাকূট লিপি, মেহেরৌলি স্তম্ভলিপি)।
৫৮। Dacca University—History of Bengal. I pp. 2-29।
৫৯। Dasgupta, J. N.—Bengal in the Sixteenth century. C. U.।
Some facts about old Dacca, in Bengal Past and Present. Jan-March. 1936।
৬০। Datta, K.—Antiquity of Khadi, V. R. Soc. Memoir।
৬১। District Gazetteer. 24 Parganas. ed. by O' Malley. 1914।
৬২। Elliot and Dowson—History of Muhammadan India as told by its own historians, III. p. 295।
৬৩। Epigraphia Birminica, III. pt. I. p. 185।
৬৪। Epigraphia Carnatica. V. Intro. 14n. 19 ; Cn. 179 ; VI. Cm. 137 ; VII, Intro. 30th Sloka, 119 ; IX. Bn. 96।
৬৫। Epigraphia Indica. II, p. 345ff ; V, p. 20. 257. VI, p. 103 ; XIV, p. 117 ; XX. p. 61 ; XXI, p. 78ff p. 250ff. 218ff ; XXII, 150ff, 135 ; XXIII. p. 283 ; XXIV, p. 43ff ; XV, p. 134ff ; XVII, p. 189-95 ; XVIII, p. 74ff ; p. 155ff ; p. 74, p. 105 129ff, 141ff p. 345ff,

৬৬। Fahien—Travels, tr. and ed. by Legge।

৬৭। Hunter, W. W.—A statistical account of Bengal।

৬৮। Ibn Batuta—ed. and tr. by Gibb, p. 267-77।

৬৯। I-sing—A record of the Buddhist religion...ed. by Takakusu।

৭০। Indian Antiquary, 1891, p. 375, 413 ; 1877, p. 58 ; IX, p. 333ff ; XIII, 134 ; 1910, p. 193ff ; XIX, p. 7ff।

৭১। Indian Historical Quarterly, II. p. 6 ; IX. p. 724ff ; X, p. 58 ; XII, p. 77 ; XIII, p. 151ff ; 1932, p. 521ff ; 1937, p. 162 ; 1928, p. 239।

৭২। Inscriptions of the Madras Presidency, I, p. 353।

৭৩। Journal of the Andhra Research Soc. VI, p. 215।

৭৪। Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1895, p. 1-24 ; 1873, p. 236 ; 1907, p. 157 ; 1908, p. 279ff ; 1912. p. 341 ; N. S. XII, p. 293 ; 1874, p. 150 ; 1896, p. 1ff.।

৭৫। Journal of the Royal Asiatic Society, 1935, p. 99, p. 73ff, p. 85ff.

৭৫ক। L'Iconographie Bouddhique de l'Inde, I, p. 200, no 55 ; p. 192, no. 17 ; p. 199, pl. VIII. fig 4 ; p. 102. pl. IV, fig. 3।

৭৬। Mahavamsa, ed by Geiger, P. T. S. edn. intro.।

৭৭। Majumdar—Inscriptions of Bengal, III (সেন, চন্দ্র ও বর্ম্ম লিপিমালার জন্য দ্রষ্টব্য)।

৭৮। Majumdar. R. C.—Physical features of ancient Bengal, in D. R, Bhandarkar volume।

৭৯। Majumdar, S. C.—Rivers of the Bengal Delta, C U.।

৮০। Malalasekera—Dictionary of Pali proper names, II, p. 1252।

৮১। Martin—Eastern India, III, p. 15।

৮২। Mukherji. R. K.—Changing face of Bengal, C. U।

৮৩। Ocean of Story, trs., by Tawney, ed. by Panzer, VII, 204।

৮৪। Paul, P. L.—Early history of Bengal, I, p. iii-iv।

৮৫। Periplus of the Erythrean Sea, ed. and tr. by Schoff.।

৮৬। Ptolemy—Ancient India, ed. by S. N. Majumdar (McCrindle), p. 75।

৮৭। Roy, H. C.—Dynastic history of Northern India, I, C. U.।

৮৮। Ray, Niharranjan—Sanskrit Buddhism in Burma, C. U.।
Theravada Buddhism in Burma, C. U.।

৮৯। Sastri, K. A. Nilakanta—The Colas, I, p, 249।

৯০। Tabaqat-i-Nasiri, ed. & tr. by Raverty, pp. 584-86 ; p. 558. মিনহাজের মতে গঙ্গার পশ্চিমতীরে রাল্ (=রাঢ়) এবং লখ্‌নওর (=লক্ষ্মণাবতী), পূর্বতীরে বরিন্দ্ (=বরেন্দ্রী) এবং দিবকোট্ (=কোটীবর্ষ) নগর। বাংলার আর এক অংশে তখন লক্ষ্মণসেনের পুত্রেরা রাজা ; সে-অংশটি বঙ্গ (=পূর্ববঙ্গ)।

৯১। Watters—On Yuan Chwang. II. (পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ, কজঙ্গল দ্রষ্টব্য)।

৯২। এই অধ্যায়ে বাংলার যে-সব লিপি হইতে সংবাদ আহরণ করা হইয়াছে, তাহাদের তালিকা ও গ্রন্থপঞ্জীর জন্য গ্রন্থশেষে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

১। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—গৌড়লেখমালা, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি।

২। কৌটিল্য—অর্থশাস্ত্র, ed. by Shamasastry, pp. 54, 86, 90-91, etc.।

৩। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য—কামরূপ শাসনাবলী, ৭৮পৃ, ৯৯পৃ, ১২৬-২৭পৃ।

প্রাচীন বাংলার খুব কম লিপিতেই ধান্যের উল্লেখ আছে; এই শস্য সম্পদটি এতই আদৃত ও ও পরিচিত ছিল যে ইহাকে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই লিপি-লেখকেরা ধরিয়া লইয়াছেন, উল্লেখের কোনো প্রয়োজন মনে করেন নাই। প্রতিবাসী কামরূপ রাজ্যের লিপিগুলিতে কিন্তু ভূমির পরিমাণই যে শুধু দেওয়া হইয়াছে তাহাই নয়, সেই ভূমিতে কি পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হয় তাহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে; অনেকস্থলে উৎপন্ন ধানের পরিমাণ দ্বারাই ভূমির পরিমাণ নির্দেশ করা হইয়াছে। বলবর্মার তাম্রশাসনে আছে, "দক্ষিণকূলে দিজ্জুরাবিষয়াস্থঃপাতিনো ধান্যচতুঃসহস্রোৎপত্তিমতো হেড়সিবাভিধানা ভূমিঃ", রত্নপালের প্রথম শাসনে আছে, "উত্তরকূলে ত্রয়োদশগ্রামবিষয়াস্থঃপাতি বামদেবপাটকাপকৃষ্ট ভূমিসমেতবাবুকুটিঃক্ষেত্রে ধান্যৈকসহস্রোৎপত্তিকভূমৌ"; ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় তাম্রশাসনে বলা হইয়াছে, "উত্তরকূলে মন্দিবিষয়াস্থঃপাতি-পণ্ডবীভূমিতেহপকৃষ্ট ধান্য দ্বিসহস্রোৎপত্তিকভূমৌ," ইত্যাদি।

৪। প্রাকৃতপৈঙ্গল, Bib. Ind. edn. ৪০৮পৃ; ওগ্গরভত্তা গাইকঘিত্তা দুদ্ধ-সজুত্তা। মোইলিমচ্ছা নালিচগচ্ছা দিজ্জই কন্তা খা পুনবন্তা॥

৫। বংশীদাস—মনসামঙ্গল, ২৮০-২৯০ পৃ।

"আগে আনি গুয়াপান থুইলেক বিদ্যমান
মূলা বান্ধ কাঁড়ারী তুলাই।
একটি একটি পানে মরকত দশগুণে
গুয়াতে মাণিক্য যেন পাই॥

৬। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৪৮ ভাগ, ১৩৪৮, ৭৮-৭৯পৃ।

৭। মহাভারত, ২, ৩০, ২৭। মহাভারতে উল্লেখ আছে, বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরবর্তী ম্লেচ্ছরা যুধিষ্ঠিরকে প্রচুর সোনা ও মুক্তা উপঢৌকন দান করিয়াছিল। এই মহাকাব্যের যুদ্ধদৃশ্যের বর্ণনাপ্রসঙ্গে একাধিকবার বঙ্গদেশীয় হস্তীর উল্লেখ করা হইয়াছে।

৮। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কবিকঙ্কন—চণ্ডীমঙ্গল, ১৯১ পৃ।

"কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব
শুণ্ঠের বদলে টঙ্ক॥"

৯। রাজশেখর—কাব্যমীমাংসা। লবলী কি বস্তু, জানিনা। পত্রিপর্ণের উল্লেখ একাধিক নিঘণ্ট-গ্রন্থে আছে; ইহা একপ্রকার ভেষজদ্রব্য বলিয়াই মনে হয়। কস্তুরী নির্ণয়ে: নেপালের কস্তুরী ধূসর, কাশ্মীরের হরিদ্রাবর্ণ, এবং কামরূপের কৃষ্ণবর্ণ। ভাবপ্রকাশের মতে নেপালের কস্তুরী নীল, কাশ্মীরের ধূসর। এই গ্রন্থের মতে কামরূপের কস্তুরী সর্বশ্রেষ্ঠ, তারপর নেপাল এবং কাশ্মীরের।

১০। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বৌদ্ধগান ও দোঁহা, ব-সা-প সং। ১, ১০, ২৫, ২৭ নং পদ দ্রষ্টব্য।

১১। সোমেশ্বর—কীর্ত্তিকৌমুদী, ed. by Kathavate, Bombay, 1883. এই গ্রন্থ লবনপাল ও বীরধবল বাঘেলাদের মন্ত্রী বস্তুপালের জীবনী; সোমেশ্বর ইহার রচয়িতা। "আত্মাসারঃ করম্বোভূদ্‌গৌড়ো মোদকবল্লভঃ"—এই নৃপ হইতেছেন অনহিল্লপুরের রাজা জয়সিংহ (আনুমানিক ১০৭২ খ্রী)।

১২। Asiatic Society of Bengal—Memoirs, I. p. 85ff,

১৩। Bagchi, P. C.—Materials for a critical edition of the Bengali Caryapadas, in Journ. of the Dept. of Letters, C. U. xxx, pp. 1-156. ১, ১০, ২৫ ও ২৭ পদ দ্রষ্টব্য।

১৪। Bhandarkar, D. R.—Carmichael Lectures, Second Series, C. U. p. 39-40।

১৫। Epigraphia Indica, xxii. p. 150ff ; xv ; xvii. p. 345ff ; xviii, p. 60ff, 75ff ; xxi, p. 83ff, p. 78ff

১৬। Indian Antiquary, 1910. p. 193ff.

১৭। Indian Historical Quarterly, Vol. VI, 1930, p. 45ff.

১৮। I-tsing—A record of the Buddhist religion...ed by J. Takakusu.

অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে প্রাচীন বাংলার স্থান কি ছিল তাহার পরিচয় মিলিন্দ-পঞ্হ, মহানিদ্দেশ ও অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কিন্তু এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণ এত সুপরিচিত যে তাহার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

১৯। Majumdar, N. G.—Inscriptions of Bengal, III. V. R. Soc ; V. R. Society Memoir No. I.

২০। Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain. 1895, pp. 529-33 ; 1896, p. 495.

২১। Periplus of the Erythrean Sea, ed. by Schoff।

২২। Pliny—Natural history, XII, 18. There was "no year in which India did not drain the Roman empire of a hundred million sesterces." এই মুদ্রা পরিমাণ এখনকার ভারতীয় মুদ্রায় আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকার সমান।

২৩। Ray, Niharranjan—Brahmanical Gods in Burma ; Sanskrit Buddhism in Burma ; Theravada Buddhism in Burma. C. U.

২৪। Yule—Marcopolo, II, p. 115. পঞ্চদশ শতকের আর একজন চীন পর্যটক বাংলা দেশের বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে বলিতেছেন, "Five or six kinds of cotton fabrics were manufactured, one of which called Pi-chih was of very soft texture, 3ft wide and 56ft. long. Another ginger-yellow fabric (এণ্ডি, মুগা জাতীয় বস্ত্র ?) called Man-cheti was also produced, which was 4ft wide and 50ft long, etc."—Mahuan's account of the kingdom of Bengal, by G. Philip, in J. R. A. S., 1895, pp. 529-33.

২৫। Watters—On Yuan Chwang. II. পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, কজঙ্গল, কর্ণসুবর্ণ এবং তাম্রলিপ্তি প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২৬। বাংলা দেশের যে-সব প্রাচীন লিপিমালা হইতে এই অধ্যায়ে বিচিত্র তথ্য আহৃত হইয়াছে তাহার পাঠনির্দেশ গ্রন্থশেষে পরিশিষ্টে পাওয়া যাইবে।

সমাজ-বিন্যাস

পঞ্চম অধ্যায়

ভূমি-বিন্যাস

১

কৃষিপ্রধান সভ্যতায় ভূমি-ব্যবস্থা সমাজ-বিন্যাসের গোড়ার কথা। প্রাচীন বাংলায় কৃষিই ছিল অন্যতম প্রধান ধনসম্বল। কৃষি ভূমি-নির্ভর; কাজেই ভূমি-ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে গ্রামের সংস্থান, শ্রেণী-বিন্যাস, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির অথবা সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ, বিভিন্ন প্রকারের ভূমির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের দায় ও অধিকার, ইত্যাদি। সেইজন্য কৃষি-নির্ভর সমাজে জনসাধারণের ইতিহাস জানিতে হইলে ভূমি-ব্যবস্থার ইতিহাসের পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

যুক্তি

প্রাচীন বাংলার ভূমি-ব্যবস্থার এই পরিচয় অতি দুর্লভ ব্যাপার; প্রায় দুঃসাধ্য বলিলেও চলে। প্রথমত, ভূমি দান-বিক্রয় ব্যাপার উপলক্ষে যে কয়টি রাজকীয় শাসনের খবর আমাদের জানা আছে, তাহাই এ-বিষয়ে আমাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান। ইহা ছাড়া পরোক্ষ সংবাদ হয়তো কিছু কিছু পাওয়া যায় প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র জাতীয় সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে; কিছু উপকরণ বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও পালি জাতক গ্রন্থাদি হইতেও সংগৃহীত হইয়াছে। কোনো কোনোও পণ্ডিত এইসব উপকরণ অবলম্বন করিয়া প্রাচীন ভারতের ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু সার্থক গবেষণাও করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার সুবিস্তৃত এই দেশের বিস্তৃততর শাসন-লিপিবদ্ধ সংবাদ লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষের ভূমি-ব্যবস্থার পরিচয় লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই উভয় চেষ্টারই মূলে একটু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। স্মৃতিশাস্ত্র অথবা অর্থশাস্ত্র জাতীয় গ্রন্থাদিতে যে-সব সংবাদ পাওয়া যায় তাহা বাস্তবক্ষেত্রে কতটা প্রযোজিত হইয়াছিল, কতটা হয় নাই, সে-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। এ কথা হয়তো সহজেই অনুমান করা চলে, প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থাগুলিই এই সব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, অন্তত চেষ্টাটা সেই দিকেই হইয়াছিল, অথবা, বিধি-ব্যবস্থাপকদের আদর্শটাকেই তাঁহারা রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তখনই প্রশ্ন উঠিবে, এই সুবিস্তৃত দেশের সর্বত্রই কি একই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, অথবা খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে যাহা ছিল, খ্রীষ্টপরবর্তী দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতকেও কি তাহাই ছিল? অথবা, যাহা ছিল আদর্শ, সর্বত্র সকল সময়ে বা কোনো কালে কোনো স্থানেই তাহা কর্মের মধ্যে রূপ লাভ করিয়াছিল কি? এই যে একটির পর

একটি বিদেশি জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস করিয়াছে, রাজত্ব করিয়াছে, তাহারা যদি রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের, রাষ্ট্রাদর্শের অদল বদল করিয়া থাকিতে পারে, এবং তাহা যে করিয়াছে সে প্রমাণের অভাব নাই, তাহা হইলে ভূমি-ব্যবস্থার অদল বদল হয় নাই, সে-কথা কেমন করিয়া বলা যাইবে? স্মৃতিশাস্ত্রগুলি সব একই সময়ে রচিত হয় নাই, যদিও মোটামুটি তাহাদের কাল আমাদের একেবারে অজ্ঞাত নয়। তাহা সত্ত্বেও ইহা তো অনস্বীকার্য যে, স্মৃতিশাস্ত্রের সমাজ-ব্যবস্থা আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার দিকে যতটা ইঙ্গিত করে, বাস্তব সমাজ-ব্যবস্থার দিকে ততটা নয়। সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছিল কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আর, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে এ সন্দেহ যদি উত্থাপন না-ই করা যায়, তাহা হইলেও এই জিজ্ঞাসা নিশ্চয়ই করা চলে যে, ইহার সাক্ষ্যপ্রমাণ কি পরবর্তী কাল সম্বন্ধেও প্রযোজ্য? অথচ, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং সামাজিক দাবির প্রয়োজনে ভূমি-ব্যবস্থা যে পরিবর্তিত হয় তাহা তো একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। স্মৃতিশাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে যে-সব কথা বলা যায়, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে সে-কথা তো আরও বেশি প্রযোজ্য। তাহা ছাড়া এই জাতীয় গ্রন্থের সাক্ষ্যপ্রমাণ কোনোটিই আমরা প্রাচীন বাংলা দেশে নিঃসন্দেহে প্রয়োগ করিতে পারি না, কারণ কোন সাক্ষ্যপ্রমাণই নির্দিষ্টভাবে বাংলা দেশের দিকে ইঙ্গিত করে না। বাংলার বাহিরের শাসনলিপির প্রমাণও বাংলার ভূমি-ব্যবস্থার পরিচয়ে ব্যবহার করা চলে না, যদিও সে-চেষ্টা পণ্ডিতদের মধ্যে হইয়াছে। চোখের সম্মুখেই আমরা দেখিতেছি, মাদ্রাজে অথবা উড়িষ্যায়, আসামে অথবা গুজরাতে যে ভূমি-ব্যবস্থা আজ প্রচলিত, বাংলা দেশের সঙ্গে তাহার কোনো যোগ নাই। বস্তুত, বর্তমান কালে এক প্রদেশের ভূমি-ব্যবস্থা হইতে অন্য প্রদেশের ভূমি-ব্যবস্থা বিভিন্ন। প্রাচীন কালেও এই বিভিন্নতা ছিল না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় কি? ভূমির শ্রেণী বিভাগ নির্ভর করে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর; ভাগ, ভোগ, কর, ইত্যাদি নির্ভর করে ভূমিলব্ধ আয়ের উপর, সে-আয়ের তারতম্য ভূমির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তাহা ছাড়া, সব চেয়ে যাহা বড় কথা, ভূমির উপর অধিকার এবং সে অধিকারের স্বরূপ, তাহাও এই সুবিস্তৃত দেশে বিভিন্ন কালে একই প্রকার ছিল, এই অনুমানই বা কি করিয়া করা যায়? যে-জাতীয় গ্রন্থের উল্লেখ আগে করা হইয়াছে, এই সব গ্রন্থ প্রায় সমস্তই ব্রাহ্মণ্য আদর্শের দ্বারা শাসিত সমাজের সৃষ্টি; কিন্তু এই সমাজের বাহিরে অনার্য, আর্যপূর্ব সমাজ ও সেই সমাজের অগণিত লোক আমাদের দেশে বাস করিত; "শিষ্টদেশ"-বহির্ভূত এই বাংলা দেশে তাহাদের সংখ্যা ও প্রভাব কম ছিল না। আমাদের ধর্ম, ধ্যানধারণা, আচারব্যবহার, সমাজ-ব্যবস্থা ইত্যাদিতে এখনও সেই সব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; আমাদের ভূমি-ব্যবস্থায় সেই প্রভাব পড়ে নাই, এ কথা কে বলিবে? সেই প্রভাব ভারতবর্ষের সর্বত্র এক ছিল না। আর্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বর্তমান যুক্তপ্রদেশে এই প্রভাবকে ঠেকাইয়া রাখা হয়ত সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু বাংলা দেশ তাহা হইয়াছিল কি? পিতৃপ্রধান

আর্য সমাজসংস্থান এবং মাতৃপ্রধান আর্যপূর্ব অথবা অনার্য সমাজসংস্থানে ভূমি-ব্যবস্থার তারতম্য থাকিতে বাধ্য; এবং এই তারতম্য প্রাচীন ভারতের ভূমি-ব্যবস্থাকে বিভিন্ন দেশখণ্ডে বিভিন্ন ভাবে রূপ দান করে নাই, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় কি? এই সব কারণে কেবল মাত্র পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি অবলম্বনে ভূমি-ব্যবস্থার ইতিহাস রচনা করা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। বিশেষ ভাবে, প্রাচীন বাংলার ভূমি-ব্যবস্থার পরিচয়ে এই জাতীয় উপাদানের উপর কিছুতেই নির্ভর করা চলে না।

অন্যক্ষেত্রে যেমন এক্ষেত্রেও তেমনই, এই ভূমি-ব্যবস্থার পরিচয়ে আমি আমাদের প্রাচীন ভূমি দান-বিক্রয় সম্বন্ধীয় তাম্র-পট্টোলীগুলিকেই নির্ভরযোগ্য উপাদান বলিয়া মনে করি। প্রথমত, ইহাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্বন্ধে অবাস্তবতার আপত্তি তুলিবার উপায় নাই; বস্তুত, যাহা প্রচলিত ছিল, যে-রীতি ও পদ্ধতি যখন অনুসৃত হইত, তাহাই যথাযথ ভাবে এই পট্টোলীগুলিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইহাদের উৎস ও কালনির্দেশ সম্বন্ধে কোনো অনিশ্চয়তা নাই। অবশ্য এ কথা সত্য যে, ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে-সব সংবাদ জানা একান্তই প্রয়োজন তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় এই সব উপাদানে পাওয়া যায় না। কিন্তু যাহা যতটুকু পাওয়া যায়, যতটুকু বুঝা যায়, ততটুকুই মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য; যাহা পাওয়া যায় না তাহা লইয়া অভিযোগ করা চলে, কিন্তু কল্পনার সাহায্যে পূরণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য বুদ্ধিসাধ্য, যুক্তিসাধ্য অনুমানে বাধা নাই, যতক্ষণ সে-অনুমান সমাজ-বিবর্তনের সাধারণ ইতিহাস-সম্মত নিয়ম, সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার ইঙ্গিত অতিক্রম করিয়া না যায়। তাহা ছাড়া, এই সব প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যে এমন কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে, যাহা খুব সুবোধ্য নয়; এমন সব শব্দ ও পদের ব্যবহার আছে যাহা সমসাময়িককালে নিশ্চয়ই খুব সহজবোধ্য ছিল, কিন্তু আমাদের কাছে এখন আর তেমন নয়। এই সব ক্ষেত্রে স্মৃতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র জাতীয় উপাদানের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে, আমিও লইয়াছি; তাহার একমাত্র কারণ, এই সব গ্রন্থে পূর্বোক্ত শব্দ বা পদের বা দুর্বোধ্য ও কষ্টবোধ্য রীতি-পদ্ধতিগুলির সুবোধ্য ও বিস্তৃততর ব্যাখ্যা অনেক সময় পাওয়া যায়।

২

ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কিত যে-সব পট্টোলী প্রাচীন বাংলায় এ-পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলি সমস্ত ভূমি-দানবিক্রয় সম্বন্ধীয়, এবং লিপিগুলিতে ভূমি-দানবিক্রয় রীতির ক্রম কমবেশি বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার ফলে ভূমি-সম্পর্কিত দায় ও অধিকার, ভূমির প্রকারভেদ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক প্রকার সংবাদ এই লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। এই রীতি-ক্রমের একটু পরিচয় এইখানে লওয়া যাইতে পারে। রাজা কর্তৃক ব্রাহ্মণকে কিংবা দেবতার

ভূমিদান এবং ক্রয়-বিক্রয়ের রীতি ও ক্রম

উদ্দেশ্যে ভূমি-দানের লিপি বা দলিল প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত নয়; কিন্তু প্রাচীন বাংলার এই পর্বের লিপিগুলি ঠিক এই জাতীয় ব্রহ্মদেয় বা দেবোত্তর ভূমি-দানের পট্ট বা দলিল নয়। এই শাসনগুলি একটু বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করিলে প্রাচীন বাংলার ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এমন সব সংবাদ পাওয়া যায় যাহা সাধারণত প্রাচীন ভারতের ভূমি-দান সম্পর্কিত শাসনগুলিতে বেশি দেখা যায় না।

প্রথমেই দেখিতেছি, ভূমি ক্রয়েচ্ছু যিনি তিনি স্থানীয় রাজসরকারের কাছে আবেদন বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। ক্রয়েচ্ছু একজনও হইতে পারেন, একজনের বেশিও হইতে পারেন, এবং একাধিক ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি একই সঙ্গে ক্রয়ের ইচ্ছা বিজ্ঞাপিত করিতে পারেন। যেমন, বৈগ্রাম তাম্রপট্টোলীতে দেখা যায় একই সঙ্গে দুই ভাই, ভোয়িল ও ভাস্কর, একত্র রাজসরকারে ভূমি-ক্রয়ের আবেদন জানাইতেছেন। পাহাড়পুর পট্টোলীতে দেখি, ব্রাহ্মণ নাথশর্মা ও তাঁহার স্ত্রী রামী একই সঙ্গে আবেদন উপস্থিত করিতেছেন। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা সাধারণ গৃহস্থও হইতে পারেন, অথবা রাজসরকারের কর্মচারী বা তৎসম্পর্কিত ব্যক্তি বা অধিকরণের সভ্যও হইতে পারেন। ধনাইদহ তাম্রপট্টোলীতে দেখা যাইতেছে ভূমি-ক্রেতা হইতেছেন একজন আয়ুক্তক বা রাজকর্মচারী; ৪নং দামোদরপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত নগরশ্রেষ্ঠী রিভুপাল স্থানীয় অধিষ্ঠানাধিকরণের একজন সভ্য; বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর পট্টোলীতে আবেদন-কর্তা হইতেছেন মহারাজ রুদ্রদত্ত যিনি মহারাজ বৈন্যগুপ্তের পদদাস, তবে রুদ্রদত্ত মূল্য দিয়া ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন না বিনামূল্যেই তাহা লাভ করিয়াছিলেন, স্পষ্ট করিয়া শাসনে বলা হয় নাই; ধর্মাদিত্যের ১নং পট্টোলীতে ভূমি-ক্রেতার নাম বটভোগ যিনি ছিলেন সাধনিক, এবং এই উপাধি হইতে মনে হয় তিনি রাজকর্মচারী ছিলেন; গোপচন্দ্রের পট্টোলীতে ভূমি-ক্রেতা হইতেছেন বৎসপাল যিনি ছিলেন বারকমণ্ডলের বিষয়-ব্যাপারের কর্তা, রাষ্ট্রের বিনিযুক্তক (বারক বিষয়-ব্যাপারায় বিনিযুক্তক বৎসপাল স্বামিনা), অর্থাৎ রাষ্ট্র-যন্ত্র সম্পর্কিত ব্যক্তি; ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত লোকনাথের পট্টোলীতেও ব্রাহ্মণ মহাসামন্ত প্রদোষশর্মণ এই জাতীয় জনৈক রাষ্ট্র-যন্ত্রসম্পর্কিত ব্যক্তি, কিন্তু তিনি মূল্য দিয়া ভূমি লাভ করিয়াছিলেন কিনা তাহা শাসনে সুস্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই। রাজসরকার বলিতে সাধারণত যে অধিষ্ঠান বা বিষয়ে প্রস্তাবিত ভূমির অবস্থিতি সেই অধিষ্ঠানের আয়ুক্তক ও অধিষ্ঠানাধিকরণ, অথবা বিষয়ের বিষয়পতি ও বিষয়াধিকরণ এবং স্থানীয় প্রধান প্রধান লোকদের বুঝায়। দুই একটি পট্টোলীতে মাঝে মাঝে ইহার অল্পবিস্তর ব্যতিক্রম যে নাই তাহা বলা চলে না, তবে তাহা খুব উল্লেখযোগ্য নয় এই কারণে যে, সর্বত্রই ভূমির প্রকৃত অধিকারীর পক্ষে স্থানীয় প্রতিনিধিদের বিজ্ঞাপিত করাটাই ছিল সাধারণ নিয়ম। রাজ-সরকারের উল্লেখ-প্রসঙ্গে তদানীন্তন রাজার এবং ভুক্তিপতি বা উপরিকের নামও উল্লেখ করার রীতি প্রচলিত ছিল; কোন কোন ক্ষেত্রে শাসনের এই অংশে লিপির তারিখও দেওয়া হইয়াছে।

এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তির পরই দেখিতেছি, ভূমি-ক্রয়ের বিশেষ উদ্দেশ্যটি কি, তাহা আবেদন-কর্তা সাধারণত প্রথম পুরুষেই বিজ্ঞাপিত করিতেছেন, এবং তিনি যে ক্ষেত্র, খিল, অথবা বাস্তভূমির স্থানীয় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মূল্য দিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাও বলিতেছেন। দেখা যাইতেছে, সর্বত্রই ভূমি-ক্রয়ের প্রেরণা ক্রীত-ভূমি দেবকার্য বা ধর্মাচরণোদ্দেশে দানের ইচ্ছা।

তৃতীয় পর্বে পুস্তপাল বা দলিল-রক্ষকের বিবৃতি। ভূমি-ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তির আবেদন রাজসরকারে পৌঁছিলেই রাজসরকার তাহা পুস্তপাল বা পুস্তপালদের দপ্তরে পাঠাইতেছেন; পুস্তপাল বা পুস্তপালেরা প্রস্তাবিত ভূমি আর কাহারও ভোগ্য কিনা, আর কাহারও অধিকারে আছে কিনা, অন্য কেহ সেই ভূমি ক্রয়ের ইচ্ছা জানাইয়াছে কিনা, ভূমির মূল্য যথাযথ নির্ধারিত হইয়াছে কিনা, রাজসরকারের কোন স্বার্থ তাহাতে আছে কিনা ইত্যাদি জ্ঞাতব্য তথ্য নির্ণয় করিতেছেন তাঁহার বা তাঁহাদের দপ্তরে রক্ষিত কাগজপত্র, শাসন ইত্যাদির সাহায্যে, এবং কোনও প্রকার আপত্তি না থাকিলে প্রস্তাবিত ভূমি বিক্রয়ের সম্মতি জানাইতেছেন। যে কয়েকটি শাসনের খবর আমরা জানি তাহার প্রত্যেকটিতে পুস্তপাল-দপ্তরের সম্মতিই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, এই কারণে অনুমান করা স্বাভাবিক যে, ব্যাপারটা নেহাৎই কার্যক্রমগত। কিন্তু, বোধ হয়, এই অনুমান সর্বত্র সংগত নয়। ৫নং দামোদরপুর পট্টোলীতে বিষয়পতির সঙ্গে পুস্তপালের একটু বিরোধের ([বি]ষয়পতিনা কশ্চিদ্বিরোধঃ) ইঙ্গিত যেন আছে! কি লইয়া বিরোধ বাধিয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই; তবে অনুমান হয় যে, বিষয়পতির পক্ষ হইতে কোন আপত্তি উঠিয়াছিল। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত মহারাজাধিরাজের নিকটে গিয়া বিষয়পতির আপত্তি টেঁকে নাই।

চতুর্থপর্বে রাষ্ট্রের অনুমতি। যথানির্ধারিত মূল্য গ্রহণের পর রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে স্থানীয় রাজসরকার ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ভূমি বিক্রয়ের অনুমতি দিতেছেন; এবং প্রস্তাবিত ভূমি যে-গ্রামে অবস্থিত সেই গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণ-কুটুম্বদের ও রাজপুরুষদের সম্মুখে বিক্রীত ভূমির সীমা নির্দেশ করিয়া, অন্য ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্থানীয় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভূমির মাপজোখ করিয়া বিক্রীত ভূমি ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে হস্তান্তরিত করিয়া দিতেছেন। কি সর্তে তাহা দিতেছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে। দেখা যাইতেছে প্রায় সর্বত্রই এই সর্ত অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী।

পঞ্চম পর্বে ক্রেতার বা বিক্রেতার পক্ষ হইতে ক্রীত অথবা বিক্রীত ভূমি দানের বিবৃতি। এই পর্বে ক্রেতা অথবা বিক্রেতা কাহাকে বা কাহাদের কি উদ্দেশ্যে, কোন্ সর্তে ক্রীত ভূমি দান করিতেছেন তাহা বলা হইতেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রেতার পক্ষ হইতে বিক্রেতাও তাহা করিতেছেন।

ষষ্ঠ অথবা সর্বশেষ পর্বে এই জাতীয় দত্ত ভূমি রক্ষণাপহরণের পাপপুণ্যের বিবৃতি দেওয়া হইতেছে এবং শাস্ত্রোক্ত শ্লোকে তাহা সমাপ্ত হইতেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই

পর্বে শাসনের তারিখ উল্লিখিত আছে। স্থানীয় রাজসরকারের সীলমোহর দ্বারা এই সব পট্টোলী নিয়মানুযায়ী পট্টীকৃত বা আধুনিক ভাষায় রেজেস্ট্রি করা হইত।

সমস্ত তাম্রশাসনেই যে সব ক'টি পর্বের উল্লেখ একই ভাবে আছে, তাহা নয়। কোনো কোনো তাম্রপট্টে সব ক'টি পর্বের বিস্তৃত উল্লেখ নাই, কোনো কোনো পর্বের আভাসমাত্র আছে; আবার কোথাও কোথাও একেবারে বাদও দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমির মাপজোখ ও সীমানির্দেশ রাজসরকার হইতে না করিয়া গ্রাম প্রধানদের তাহা করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যেমন পাহাড়পুর পট্টোলীতে। এইরূপ অল্পস্বল্প ব্যতিক্রম কোথাও কোথাও থাকা সত্ত্বেও মোটামুটি পট্টোলীগুলি একই ধরনের।

কিন্তু এই পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যায়ে একেবারে অন্য ধরনের ভূমি-দানের পট্টোলীও যে নাই তাহা বলা চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর পট্টোলী (৬ষ্ঠ শতক), জয়নাগের বপ্পঘোষবাট পট্টোলী (৭ম শতক), লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলী (৭ম শতক), এবং দেবখড়্গের আস্রফপুরের দুটি পট্টোলীর (৮ম শতক) উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের প্রত্যেকটিই ভূমি-দানের শাসন, দত্তভূমি ক্রয়ের কোনও উল্লেখই ইহাদের মধ্যে নাই; কাজেই, পূর্বোক্ত শাসনগুলির ক্রমের সঙ্গে এই পট্টোলীগুলির তুলনা করা চলে না। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর তাম্রপট্টোলীতে মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত স্বয়ং কিছু ভূমি দান করিতেছেন মহাযানী সম্প্রদায়ের অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘকে; লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলীতে রাজকর্মচারী ব্রাহ্মণ মহাসামন্ত প্রদোষশর্মণ এক অনন্ত-নারায়ণের মন্দির নির্মাণ ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এবং তাহার দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য মহারাজ লোকনাথের কাছে কিছু ভূমি প্রার্থনা করিতেছেন, এবং রাজা সেই ভূমিদান করিতেছেন। জয়নাগের বপ্পঘোষবাট পট্টোলী ও দেবখড়্গের আস্রফপুর পট্টোলী দুটিতে ভূমিদানের অনুরোধ বা প্রার্থনা কেহ জানাইতেছেন, এমন উল্লেখও নাই; রাজা নিজেই যথাক্রমে ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামী ও কোনো বৌদ্ধসংঘকে ভূমিদান করিতেছেন, এইটুকুই শুধু আমরা জানিতে পারিতেছি। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের নিধনপুর লিপিতে আর একটি প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যাইতেছে। ভাস্করবর্মার জনৈক ঊর্ধ্বতন পুরুষ রাজা ভূতিবর্মণ একবার কয়েকজন ব্রাহ্মণকে প্রচুর ভূমিদান করিয়া দানকর্ম রাজসরকারে পট্টীকৃত করিয়া তাম্রপট্টগুলি ব্রাহ্মণদের হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন। পরে কোনো সময়ে অগ্নিদাহে সেই তাম্রপট্টগুলি নষ্ট হইয়া যায়। তাহার ফলে ভূমির ভোগাধিকার লইয়া পাছে কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, বোধ হয় এই আশঙ্কাতেই সেই ব্রাহ্মণদের বংশধরেরা ভাস্করবর্মণের নিকট হইতে পুরাতন দানক্রিয়া নূতন করিয়া পট্টীকৃত করিয়া লন। ভাস্করবর্মণানুমোদিত তাম্রপট্টই বর্তমানে নিধনপুর পট্টোলী বলিয়া খ্যাত; কিন্তু মূলত এই ব্রহ্মদেয় ভূমি রাজা ভূতিবর্মার দান।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আগে যে দান-বিক্রয় সম্পর্কিত পট্টোলীগুলির উল্লেখ

করিয়াছি সে-গুলি সস্তোক্ত পট্টোলীগুলি হইতে বিভিন্ন। পূর্বোক্ত পট্টোলীগুলি প্রথমত ভূমি-ক্রয়বিক্রয়ের শাসন এবং দ্বিতীয়ত ভূমি-দানের শাসনও বটে। সস্তোক্ত পট্টোলীগুলি শুধুই ভূমি-দানের শাসন। ভূমি-ক্রয়ের শাসন কাহাকে বলে বার্হস্পত্য ধর্মশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে ; বৃহস্পতি বলেন, ন্যায্য মূল্য দিয়া কোনো ব্যক্তি যখন কোনো বাস্তু, ক্ষেত্র অথবা অন্য কোনো প্রকার ভূমি ক্রয় করেন এবং মূল্যের উল্লেখসমেত ক্রয়কার্যের একটি শাসন লিপিবদ্ধ করিয়া লন, তখন সেই শাসনকে বলা হয় ভূমি-ক্রয়ের শাসন। পূর্বোক্ত লিপিগুলি যে বৃহস্পতি-কথিত ভূমি-ক্রয়ের শাসন এ-সম্বন্ধে তাহা হইলে কোনো সন্দেহ নাই। জর্মান পণ্ডিত য়লি (Jolly) মনে করেন, বৃহস্পতি খ্রীষ্টোত্তর ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম শতকের লোক ; যদি তাহা হয় তাহা হইলে বৃহস্পতি পূর্বোক্ত পট্টোলীগুলির প্রায় সমসাময়িক। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বাস্তু ও বাস্তু-বিক্রয় অধ্যায়ে সর্বপ্রকার ভূমি, ঘরবাড়ি, উদ্যান, পুষ্করিণী, হ্রদ, ক্ষেত্র, ইত্যাদি বিক্রয়ের ক্রম ও রীতির উল্লেখ আছে : এই অধ্যায় হইতে আমরা জানিতে পাই, এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় কুটুম্ব, প্রতিবাসী এবং সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্মুখে হওয়া উচিত, এবং যিনি সর্বোচ্চ মূল্য দিয়া ভূমি ডাকিয়া লইয়া ক্রয় করিতে রাজী হইবেন তাঁহার কাছেই প্রস্তাবিত ভূমি বিক্রয় করিতে হইবে। ভূমির মূল্যের উপর ক্রেতাকে রাজসরকারে একটা করও দিতে হইবে, একথাও কৌটিল্য বলিতেছেন। মূল্যের উপর কোনও প্রকার করের উল্লেখ আমাদের লিপিগুলিতে নাই ; ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। ক্রীত ভূমিখণ্ডগুলি প্রায় সমস্তই ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে দানের জন্য, এবং সেই হেতুই তাহা কররহিত। তবে, ভূমি-বিক্রয়ের ব্যাপারটা যে কুটুম্ব, প্রতিবাসী এবং সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের সম্মুখেই নিষ্পন্ন হইত তাহার উল্লেখ প্রায় প্রত্যেক লিপিতেই পাওয়া যায়। কতকটা পূর্বোক্ত শাসনানুরূপ ভূমি-বিক্রয়ের অন্তত একটি পাথুরে প্রমাণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। এই লিপিটি নাসিকের একটি বৌদ্ধ-গুহার প্রাচীরে উৎকীর্ণ, এবং ইহার তারিখ খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধ। ইহাতে উল্লেখ আছে যে, ক্ষত্রপ নহপানের জামাতা, দীনীকপুত্র উষবদাত জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ৪,০০০ কার্ষাপণ মুদ্রায় কিছু ক্ষেত্রভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন, এবং তাহা গুহাবাসী ভিক্ষুসংঘকে দান করিয়াছিলেন। উষবদাত ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন জনৈক গৃহস্থের নিকট হইতে, রাজার বা রাষ্ট্রের নিকট হইতে নয়, কাজেই সে-ক্ষেত্রে যে সুবিস্তৃত ক্রমের উল্লেখ প্রাচীন বাংলার পূর্বোক্ত লিপিগুলিতে আছে তাহার কোনো প্রয়োজনই হয় নাই। আমাদের লিপিগুলিতে কিন্তু সাধারণ ভাবে একটি দৃষ্টান্তও পাইতেছি না যেখানে কোনও গৃহস্থ কোন ভূমি বিক্রয় করিতেছেন ; সর্ব্বত্রই যে-ভূমি বিক্রীত হইতেছে তাহা রাজা বা রাষ্ট্রকর্তৃকই হইতেছে। এ-প্রশ্ন স্বভাবতই মনকে অধিকার করে, প্রাচীন বাংলার সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কোনও গৃহস্থই কি ভূমি বিক্রয় করেন নাই ? সে-অধিকার কি তাঁহার ছিল না ? যদি করিয়া থাকেন, যদি সে-অধিকার থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা কি উপায়ে বিধিবদ্ধ হইত ? সে-বিক্রয়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধ কিরূপ ছিল ? কৌটিল্যের ইঙ্গিতানুযায়ী ভূমির

মূল্যের উপর রাজাকে বা রাষ্ট্রকে কিছু প্রণামী দিতে হইত কি, না রাষ্ট্র রাজস্ব লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত? এই সব অত্যন্ত সংগত ও স্বাভাবিক প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইবার সূত্রও লিপিগুলিতে আবিষ্কার করা যায় না।

এ-পর্যন্ত খ্রীষ্টোত্তর অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলির কথাই বলিলাম। এইবার অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লিপিগুলি একটু বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। প্রথমেই বলা যায়, যতগুলি শাসনের সংবাদ আমরা জানি, তাহার সব ক'টিই ভূমি-দানের শাসন, ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের শাসন একটিও নয়। এই পর্বের শাসনগুলিকে সেই জন্য পূর্বোক্ত গুণাইঘর, বপ্পঘোষবাট, লোকনাথ বা আশ্রফপুর লিপিগুলির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে, যদিও পাল ও সেন আমলের লিপিগুলি অনেকটা দীর্ঘায়ত। অন্য কারণেও এই পর্বের কোনো কোনো শাসনের সঙ্গে গুণাইঘর লিপি অথবা লোকনাথের লিপিটির কতকটা তুলনা করা চলে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধর্মপালের খালিমপুর লিপিটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্মা একটি নারায়ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; সেই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও পূজার দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি যুবরাজ ত্রিভুবনপালকে দিয়া রাজার কাছে চারিটি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং প্রার্থনানুযায়ী রাজা তাহা দান করিয়াছিলেন। এই ধরনের দৃষ্টান্ত আরো দু'একটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ শাসনে এইরূপ প্রার্থনা বা অনুরোধের কোনও উল্লেখ নাই; রাজা যেন স্বেচ্ছায় ভূমি দান করিতেছেন, এই রকম ধারণা জন্মায়। অথবা, এমনও হইতে পারে, অনুরোধ বা প্রার্থনা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আর বাহুল্য অনুমানে উল্লিখিত হয় নাই। এই ধরনের লিপিগুলির সঙ্গে বপ্পঘোষবাট ও আশ্রফপুর লিপি দুইটির তুলনা করা যাইতে পারে। পাল আমলে দেখা যায়, কোথাও কোথাও ভূমি দান করা হইতেছে কোনো ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে, যদিও ব্যক্তিগতভাবে ব্রাহ্মণকে ভূমি-দানের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই; কিন্তু, সেন আমলে প্রায় সব দানই ব্যক্তিগত দান, এবং সেন-রাজাদের যে কয়টি ভূমি-দানের সংবাদ আমরা শাসনে পাই তাহার সব কয়টিরই দান-গ্রহীতা হইতেছেন ব্রাহ্মণ এবং দানের উপলক্ষ হইতেছে কোনো ধর্মানুষ্ঠানের আচরণ। এই ধরনের দান কতকটা ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা জাতীয়, এবং এ-সব ক্ষেত্রে ভূমি-দান গ্রহণের কোনো অনুরোধ জ্ঞাপনের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আমার তো মনে হয়, যে-সব ক্ষেত্রে কোনো ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমি প্রয়োজন হইয়াছে, সেই খানেই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা রাজাকে ভূমি-দানের অনুরোধ জানাইয়াছেন, এবং রাজাও সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন; গুণাইঘর, লোকনাথ ও খালিমপুর লিপির সাক্ষ্য এই অনুমানের দিকেই ইঙ্গিত করে। আর, যেখানে রাজা অথবা রাষ্ট্র নিজেই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা, অথবা যেখানে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কোনও আয়তনের প্রয়োজন রাজা নিজেই অনুভব করিয়াছেন, অথবা রাষ্ট্র-কর্মচারীর বা জনপদ-প্রধানদের মুখ হইতে শুনিয়াছেন, সেখানে রাজা নিজেই স্বেচ্ছায় ভূমি-দান করিয়াছেন, কোনো অনুরোধের অপেক্ষা বা অবসর সেখানে নাই। শেষোক্ত ক্ষেত্রে

আমার এই অনুমানের সাক্ষ্য অষ্টম শতকের আশ্রফপুর লিপি দুইটিতে আছে। ইহার সাক্ষ্য এই যে, রাজা দেবখড়্গ নিজেই আচার্য সংঘমিত্রের বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর ভূমিদান করিয়াছিলেন, কোনও অনুরোধের উল্লেখ সেখানে নাই। শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবদেবের লিপির সাক্ষ্যও একই প্রকারের।

এই পর্বের লিপিগুলিতে দেখিলাম, ভূমিদান করিতেছেন সর্বত্রই রাজা স্বয়ং, কিন্তু সপ্তম অষ্টম শতকের আগেকার লিপিগুলিতে দেখিয়াছি, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহের জন্য ভূমিদান গৃহস্থ ব্যক্তিরাই করিতেছেন, এবং দানের পূর্বে সেই ভূমি মূল্য দিয়া রাজার নিকট হইতে কিনিয়া লইতেছেন। দু'চার ক্ষেত্রে রাজাও ভূমিদান করিতেছেন, কিন্তু তাহাও ক্রেতার পক্ষ হইতেই; তিনি শুধু দানকার্যের পুণ্যের ষষ্ঠভাগ (ধর্মষড়ভাগং) লাভ করিতেছেন। এ প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, আগেকার পর্বে অর্থাৎ সপ্তম শতকের পূর্বে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের যত ভূমি দান তাহা অধিকাংশ গৃহস্থ ব্যক্তিরাই করিতেছেন কেন, আর উত্তরপর্বে ভূমিদান শুধু রাজাই করিতেছেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কি এই যে, ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব আগে ব্যক্তিগতভাবে পুরজনপদবাসী গৃহস্থরাই করিতেন, এবং পরে ক্রমশ সেই দায়িত্ব রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে রাজাই গ্রহণ করিয়াছিলেন? ব্যক্তিগত ভাবে ব্রাহ্মণদের যে-সব ভূমি দান করা হইত, সে-সব দান সম্বন্ধে এ-ধরনের কোন প্রশ্নের বা উত্তরের অবকাশ নাই। এইরূপ ব্যক্তিগত দানের পরিচয় ঘাঘ্রাহাটি এবং বপ্পঘোষবাট পট্টোলী দুইটিতে পাওয়া যায়। পাল ও সেন আমলের লিপিতে এই পরিচয় প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

গুপ্ত আমল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলীতেই দেখা যায় পুস্তপাল (record-keeper) নামক জনৈক রাজপুরুষের উল্লেখ; কেন্দ্রীয় ভুক্তি-সরকারে যেমন, আহার এবং মণ্ডল-অধিষ্ঠানেও তেমনই পুস্তপাল নামীয় একজন রাজপুরুষ নিযুক্ত থাকাই যেন ছিল রীতি। পট্টোলী গুলি একটু অভিনিবেশে পাঠ করিলেই মনে হয়, ভূমি সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্রের দপ্তরের মালিকই ছিলেন তিনি, এবং তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ছিল তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত ভূমির সীমা, স্বত্ব, অধিকার, বিভাগ, অর্থাৎ জরিপ সম্বন্ধীয় সমস্ত সংবাদ ও হিসাব সংগ্রহ করা এবং তাহা প্রস্তুত রাখা। খুবই সম্ভব, এই সব সংবাদ লিপিবদ্ধ থাকিত তালপাতায় কিংবা ঐ জাতীয় কোনও বস্তুর উপর; আজ আর সে-সব দপ্তর উদ্ধারের কোন উপায় নাই! জমি যখন দান-বিক্রয় করা হইত এবং রাজ-সরকারে পট্টীকৃত বা রেজেষ্ট্রি করা হইত, কেবল তখনই প্রয়োজন হইত তাম্রশাসনের; তাহারই দুই চারিটি ইতস্তত আমাদের হাতে আসিতেছে। পাল আমলে না হউক, অন্তত সেন রাজাদের আমলে কোনো না কোনো প্রকার পুঙ্খানুপুঙ্খ জমি-জরিপের বন্দোবস্ত ছিল এবং সমস্ত জমির সীমা, স্বত্ব, অধিকার, শস্যোৎপত্তির গড়পড়তা পরিমাণ, কর বা খাজনা ইত্যাদির পরিপূর্ণ সংবাদ পুস্তপালের দপ্তরে মজুত থাকিত, এ-অনুমান প্রায় ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। শুধু যে দত্ত ভূমি সম্বন্ধেই এই জরিপ করা হইত তাহা

মনে হয় না; রাজ্যের সমস্ত বাস্তু, ক্ষেত্র ও খিল এবং অন্যান্য ভূমি ও এই ধরনের জরিপের অন্তর্গত ছিল, এই অনুমানও সহজেই করা চলে। সেন আমলের পট্টোলী গুলিতে জমি সংক্রান্ত সংবাদ এমন সুসংবদ্ধ সুনির্দিষ্ট ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, এই ধরনের জরিপের সম্ভাব্য অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা কঠিন।

ভূমিদান কি কি সর্তে করা হইত, কি কি দায় ও অধিকার বহন করিত তাহা এইবার আলোচনা করা যাইতে পারে। এ-বিষয়ে পূর্ব পর্বের লিপিগুলির সংবাদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যথামূল্যে প্রস্তাবিত ভূমি ক্রয়ের জন্য গৃহস্থ আবেদন যখন জানাইতেছেন, তখন তিনি ভূমি ক্রয় করিতে চাহিতেছেন, সোজাসুজি এ-কথা বলিতেছেন না; বলিতেছেন, 'আপনি আমার নিকট হইতে যথারীতি যথানির্দিষ্ট হারে মূল্য গ্রহণ করিয়া এই ভূমি আমাকে দান করুন।' এই যে ক্রয়ের প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে দানের প্রার্থনাও করা হইতেছে, ইহার অর্থ কি? যে-ভূমির জন্য মূল্য দেওয়া হইতেছে, তাহাই আবার দানের জন্যও প্রার্থনা করা হইতেছে কেন, এ-কথার উত্তর পাইতে হইলে ভূমি কি সর্তে দান-বিক্রয় হইতেছে, তাহা জানা প্রয়োজন। ধনাইদহ লিপিতে আবেদক ভূমি প্রার্থনা করিতেছেন, "নীবীধর্মক্ষয়েণ"; দামোদরপুরের ১নং লিপিতে আছে, "শাশ্বতাচন্দ্রার্কতারকভোজ্যে তয়া নীবীধর্মেণ দাতুমিতি"; ২নং লিপিতে "অপ্রদাক্ষয় নী [বী]-মর্যাদয়া দাতুমিতি"; ৩নং লিপিতে "হিরণ্যমুপসংগৃহ্য সমুদয়-বাহ্যাপ্রদখিলক্ষেত্রানাং প্রসাদং কর্তুমিতি···"; ৫নং লিপিতে "অপ্রদাধর্মেণ···শাশ্বতকালভোগ্যা"; পাহাড়পুর-পট্টোলীতে আছে, "শাশ্বতকালোপভোগ্যাক্ষয়নীবী সমুদয়বাহ্যাপ্রতিকর···"; বৈগ্রাম-পট্টোলীতে "সমুদয়-বাহ্যাদি···অকিঞ্চিৎ প্রতিকরাণাম্ শাশ্বতাচন্দ্রাকতারকভোজ্যানাম্ অক্ষয়নীব্যা···"; বপ্পঘোষবাট গ্রামের পট্টোলীতে আছে, "অক্ষয়ানী[বী]-ধর্মণাপ্রদত্তঃ"। অন্যান্য লিপিগুলিতে শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের কথাই আছে, কোনও সর্তের উল্লেখ নাই। যাহা হউক, যে-সব লিপিতে সর্তের উল্লেখ পাইতেছি, দেখিতেছি সেই সর্ত একাধিক প্রকারের: (১) নীবী ধর্মের সর্ত, (২) অপ্রদা ধর্মের সর্ত, (৩) অক্ষয়নীবী (ধর্মের) সর্ত এবং (৪) অপ্রদাক্ষয়নীবীর সর্ত। বৈগ্রাম ও পাহাড়পুর-পট্টোলী দুটিতে অক্ষয়নীবী ধর্মের সর্তের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি সর্তের উল্লেখ আছে, সেটি হইতেছে,"সমুদয়-বাহ্যাপ্রতিকর" বা "সমুদয়বাহ্যাদি···অকিঞ্চিত্ প্রতিকর", অর্থাৎ ভূমি প্রার্থনা করা হইতেছে এবং ভূমি দান করা হইতেছে অক্ষনীবীধর্মানুযায়ী এবং সকল প্রকার রাজস্ব-বিবর্জিত ভাবে। ইহার অর্থ এই যে, ভূমি-গ্রহীতা সুচিরকাল, চন্দ্রসূর্যতারার স্থিতিকাল পর্যন্ত ভূমি ভোগ করিতে পারিবেন, কোনও রাজস্ব না দিয়া। রাজা বা রাষ্ট্র যে সুচিরকালের জন্য রাজস্ব হইতে ক্রেতা ও ক্রেতার বংশধরদের মুক্তি দিতেছেন, এইখানেই হইতেছে দান কথার অন্তর্নিহিত অর্থ। ভূমির প্রচলিত মূল্য গ্রহণ

ভূমি দানের সর্ত

করিয়া রাজা যে-ভূমি বিক্রয় করেন, সেই ভূমিই যখন অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী "সমুদয় বাহ্যাপ্রতিকর" করিয়া দেন, তখন তাহা দানও করেন, এবং তাহা করেন বলিয়াই ভূমি বিক্রয় করিয়াও তিনি "ধর্মষড্‌ভাগের" অর্থাৎ দানপুণ্যের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হন। রাজা ভূমির আয়ের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী, সেই এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকার যখন তিনি পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি দানপুণ্যের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হইবেন, ইহাই তো যুক্তিযুক্ত। এই অর্থে ছাড়া পাহাড়পুর-পট্টোলীর "যৎ পরম-ভট্টারক-পাদানাম্ অর্থপচয়ো ধর্মষড্‌ভাগোপ্যায়নঞ্চ ভবতি" এ-কথার কোনও সংগত যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বৈগ্রাম-পট্টোলীতে এই কথাই আরও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। ৩নং দামোদরপুর-পট্টোলীতেও পরমভট্টারক মহারাজের পুণ্যলাভের যে ইঙ্গিত আছে, তাহাও তিনি "সমুদয়বাহ্যাপ্রদ" অর্থাৎ সর্বপ্রকারের দেয়-বিবর্জিত করিয়া ভূমি বিক্রয় করিতেছেন বলিয়াই।

এইবার নীবীধর্ম, অক্ষয়-নীবীধর্ম বা নীবীধর্মক্ষয় এবং অপ্রদাধর্ম কথা কয়টির অর্থ কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। বাংলা দেশের বাহিরে গুপ্তযুগের যে লিপির খবর আমরা জানি, তাহার মধ্যে অন্তত দুইটিতে অক্ষয়নীবী ধর্মের উল্লেখ আছে। কোষকারদের মতে নীবী কথার অর্থ মূলধন বা মূলদ্রব্য। কোনো ভূমি যখন নীবীধর্মানুযায়ী দান বা বিক্রয় করা হইতেছে, তখন ইহাই বুঝান হইতেছে যে, দত্ত বা বিক্রীত ভূমিই মূলধন বা মূলদ্রব্য; সেই ভূমির আয় বা উৎপাদিত ধন ভোগ বা ব্যবহার করা চলিবে, কিন্তু মূলধনটি কোনও উপায়েই নষ্ট করা চলিবে না। তাহা হইলে নীবীধর্ম কথাটি দ্বারা যাহা সূচিত হইতেছে, অক্ষয়-নীবীধর্ম দ্বারা তাহাই আরও সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে, এই অনুমান অতি সহজেই করা চলে। যে-ভূমি সম্পর্কে এই সর্তের উল্লেখ আছে, সেই ভূমিই কেবল "শাশ্বতাচন্দ্রার্কতারকা" ভোগ করিতে পারা যায়, ইহাও খুবই স্বাভাবিক। লিপিগুলিতেও তাহাই দেখিতেছি। বস্তুত যে-সব ক্ষেত্রে নীবী বা অক্ষয়-নীবী ধর্মের উল্লেখ আছে, সেই সব ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বতাচন্দ্রার্ক-তারকা ভোগের সর্তও আছে; যে-ক্ষেত্রে নাই, যেমন বপ্পঘোষবাট গ্রামের লিপিটিতে, সে-ক্ষেত্রেও তাহা সহজেই অনুমেয়। ধনাইদহ-লিপিতে আছে, নীবীধর্মক্ষয়েণ; এক্ষেত্রেও ভূমি বিক্রয় করা হইতেছে মূলধন অক্ষত রাখিবার রীতি অনুযায়ী, অর্থাৎ ভোক্তা স্বেচ্ছায় ঐ ভূমি দান-বিক্রয় করিয়া হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন না, ইহাই সূচিত হইতেছে। দামোদরপুরের ৩নং লিপিতে সর্তটি হইতেছে "অপ্রদাধর্মেণ"। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই সর্তের সঙ্গে "শাশ্বতচান্দ্রর্কতারকা" ভোগের সর্ত নাই। যাহা হউক, অনুমান হয়, এই সর্তানুযায়ী যে-ভূমি বিক্রয় করা হইতেছে, সেই ভূমিও দান অথবা বিক্রয়ের অধিকার ভোক্তার ছিল না। স্বেচ্ছামত ফিরাইয়া লইবার অধিকার দাতার অথবা রাজার ছিল কি না, তাহা বুঝা যাইতেছে না। যাহা হউক, মোটামুটিভাবে নীবীধর্ম, অক্ষয়-নীবীধর্ম ও অপ্রদাধর্ম বলিতে একই সর্ত বুঝা যাইতেছে; অন্তত আমাদের লিপিগুলিতে তাহা অনুমান

করিতে বাধা নাই, যদিও মনে হয়, অপ্রদাধর্মের সঙ্গে নীবী বা অক্ষয়নীবী ধর্মের সূক্ষ্ম পার্থক্য হয়তো কিছু ছিল।

একটি জিনিস একটু লক্ষ্য করা যাইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে, যে-ভূমি কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে দান করা হইতেছে, সেই সম্পর্কেই শুধু অপ্রদাধর্ম বা অক্ষয় নীবীধর্মের উল্লেখ পাইতেছি। ইহার কারণ তো খুবই সহজবোধ্য। তাহা ছাড়া, সেই সব ক্ষেত্রেই কেবল রাজা রাজস্বের অধিকার ছাড়িয়া দিতেছেন, ইহাও কিছু অস্বাভাবিক নয়। ব্যতিক্রম দু'একটি আছে; কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রেও দানের পাত্র কোনো ব্রাহ্মণ এবং তিনি দান গ্রহণ করিতেছেন কোনো ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে। কোনো গৃহস্থ যেখানে ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ভূমি ক্রয় অথবা দান গ্রহণ করিতেছেন, সে ক্ষেত্রে না আছে কোন চিরস্থায়ী সর্তের উল্লেখ, না আছে নিষ্কর করিয়া দিবার উল্লেখ।

এ-পর্যন্ত শুধু সপ্তমশতকপূর্ববর্তী লিপিগুলির কথাই বলিলাম। এই বিষয়ে পরবর্তী লিপিগুলির সাক্ষ্য জানা প্রয়োজন। অষ্টম হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত যত রাজকীয় ভূমি-দানলিপির খবর আমরা জানি, তাহার প্রত্যেকটিতেই ভূমি-দানের সর্ত মোটামুটি একই প্রকার। সর্তাংশটি যে-কোনো লিপি হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে। খালিমপুর লিপিতে আছে, "সদশপচারাঃ অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যাঃ পরিহৃতসর্বপীড়াঃ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং"; শ্রীচন্দ্রের রামপাল-লিপিতে আছে, "সদশপরাধা সচৌরোদ্ধরণা পরিহৃতসর্বপীড়া অচাটভটপ্রবেশ অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যা। সমস্তরাজভোগকরহিরণ্যপ্রত্যায়সহিতা··· আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন।" বিজয়সেনের বারাকপুর-লিপিতে আছে, "সহৃদশাপরাধা পরিহৃতসর্বপীড়া অচট্টভট্টপ্রবেশা অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যা সমস্তরাজভোগকরহিরণ্য-প্রত্যায়সহিতা।···আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ।" দেখা যাইতেছে, ধর্মপালের খালিমপুর-লিপিতে যাহা আছে, তাহাই পরবর্তী লিপিগুলিতে বিস্তৃততরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সদশপচারাঃ বা সহৃদশাপরাধাঃ—আমাদের দণ্ডশাস্ত্রে দশ প্রকারের অপচার বা অপরাধের উল্লেখ আছে। তিনটি কায়িক অপরাধ, যথা—চুরি, হত্যা, এবং পরস্ত্রীগমন; চারিটি বাচনিক অপরাধ, যথা—কটুভাষণ, অসত্যভাষণ, অপমানজক ভাষণ এবং বস্তুহীন ভাষণ; তিনটি মানসিক অপরাধ, যথা—পরধনে লোভ, অধর্ম চিন্তা, এবং অসত্যানুরাগ। এই দশটি অপরাধ রাজকীয় বিচারে দণ্ডনীয় ছিল; এবং সেই অপরাধ প্রমাণিত হইলে অপরাধী ব্যক্তিকে জরিমানা দিতে হইত। রাষ্ট্রের অন্যান্য আয়ের মধ্যে ইহাও অন্যতম। কিন্তু রাজা যখন ভূমি দান করিতেছেন, তখন সেই ভূমির অধিবাসীদের জরিমানা হইতে যে আয়, তাহা ভোগ করিবার অধিকারও দান-গ্রহীতাকে অর্পণ করিতেছেন।

সচৌরোদ্ধরণা—চোর-ডাকাতের হাত হইতে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার দায়িত্ব হইতেছে

রাজার; কিন্তু তাহার জন্য জনসাধারণকে একটা কর দিতে হইত। কিন্তু রাজা যখন ভূমি দান করিতেছেন, তখন দানগ্রহীতাকে সেই কর ভোগের অধিকার দিতেছেন।

পরিহৃতসর্বপীড়া—সর্বপ্রকার পীড়া বা অত্যাচার হইতে রাজা দত্ত ভূমির অধিবাসীদের মুক্তি দিতেছেন। কোনো কোনো পণ্ডিত পারিশ্রমিক না দিয়া আবশ্যিক শ্রম গ্রহণ করা অর্থে এই শব্দটি অনুবাদ করিয়ছেন। আমার কাছে এই অর্থ খুব যুক্তিযুক্ত মনে হইতেছে না, যদিও বহু প্রকারের রাজকীয় পীড়া বা অত্যাচারের মধ্যে ইহাও হয় তো একপ্রকার পীড়া বা অত্যাচার ছিল, এ-অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু পরিহৃতসর্বপীড়াঃ বলিতে যথার্থত কি বুঝাইত, তাহা সুস্পষ্ট ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রতিবাসী কামরূপ রাজ্যের একাধিক লিপিতে আছে। বলবর্মার নওগাঁ-লিপিতে অনুরূপ প্রসঙ্গেই উল্লিখিত আছে, "রাজ্ঞীরাজপুত্ররাণকরাজবল্লভমহল্লকপ্রৌঢ়িকাহাস্তিবন্ধিকনৌকাবন্ধিকচৌরোদ্ধরণিকদাণ্ডিক-দাণ্ডপাশিক-ঔপরিকরিক-ঔৎখেটিকচ্ছত্রবাসাদ্যুপদ্রবকারিণামপ্রবেশ্য।" রত্নপালের প্রথম তাম্রশাসনে আছে, "হস্তিবন্ধনৌকাবন্ধচৌরোদ্ধরণদণ্ডপাশোপরিকরনানানিমিত্তোৎখেটন-হস্ত্যশ্বোষ্ট্রগোমহিষাজাবিকপ্রচারপ্রভৃতিনাং বিনিবারিতসর্বপীড়া…"। কামরূপের অন্যান্য দু'একটি লিপিতেও অনুরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে সর্বপীড়া বলিতে কি কি পীড়া বা অত্যাচার বুঝায়, তাহার ব্যাখ্যা কতকটা সবিস্তারেই পাওয়া যাইতেছে। রাজ্ঞী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজপরিবারের লোকেরা, ও রাজপুরুষেরা যখন সফরে বাহির হইতেন, তখন সঙ্গের নৌকা, হাতী, ঘোড়া, উট, গরু, মহিষের রক্ষক যাহারা তাহারা গ্রামবাসীদের ক্ষেত, ঘর-বাড়ি, মাঠ, পথ, ঘাটের উপর নৌকা এবং পশু ইত্যাদি বাঁধিয়া ও চরাইয়া উৎপাত অত্যাচার করিত। অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধারকারী যাহারা, তাহারা; দাণ্ডিক ও দাণ্ডপাশিক অর্থাৎ যাহারা চোর ও অন্যান্য অপরাধীদের ধরিয়া বাঁধিয়া আনিত, যাহারা দণ্ড দিত, তাহারাও সময়ে অসময়ে গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার করিত। যাহারা প্রজাদের নিকট হইতে কর এবং অন্যান্য নানা ছোটখাট শুল্ক আদায় করিত, তাহারাও প্রজাদের উৎপীড়ন করিতে ত্রুটি করিত না। ইহারা কার্যোপলক্ষে গ্রামে অস্থায়ী ছত্রাবাস (camp) স্থাপন করিয়া বাস করিত বলিয়া অনুমান হয়, এবং শুধু গ্রামবাসীরাই নয়, রাজা নিজেও বোধ হয়, ইহাদের উপদ্রবকারী বলিয়া মনে করিতেন; বস্তুত রাজকীয় লিপিতেই ইহাদের উপদ্রবকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমাদের বাংলা দেশের লিপিগুলিতে এই সব উপদ্রবের বিস্তারিত উল্লেখ নাই, পরিহৃতসর্বপীড়াঃ বলিয়াই শেষ করা হইয়াছে; তবে, একটি উৎপাতের উল্লেখ দৃষ্টান্তস্বরূপ করা হইয়াছে। যে ভূমি দান করা হইতেছে, বলা হইতেছে, সেই ভূমি অচাটভাট অথবা অচট্টভট্টপ্রবেশ, চট্টভট্টরা সেই ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। চাট অথবা চট্ট বলিতে খুব সম্ভব, এক ধরনের অস্থায়ী সৈনিকদের বুঝাইত বলিয়া অনুমান হয়। চাম্বা প্রদেশের কোনো কোনো লিপিতে পরগণা বা চারকর্তা অর্থে চাট কথাটির ব্যবহার পাওয়া যায়। ভট্ট বা ভাট কথাটি ভাঁড় অর্থে কেহ কেহ

ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু রাজার ভৃত্য বা সৈনিক অর্থে কথাটি গ্রহণ করাই নিরাপদ। যাহা হউক, চট্টভট্ট দুইই রাজভৃত্য অর্থে গ্রহণ করা চলিতে পারে।

অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্য—দত্ত ভূমি হইতে আয়স্বরূপ কোনো কিছু গ্রহণ করিবার অধিকারও রাজা ছাড়িয়া দিতেছেন, এই সর্তটির উল্লেখ লিপিতে আছে। এই সব অধিকারের ফলভোগী হইতেছেন দানগ্রহীতা; সেই জন্যই ইহার পর বলা হইতেছে—'সমস্তরাজভাগ-ভোগকরহিরণ্যপ্রত্যায়সহিতা', অর্থাৎ সেই ভূমি হইতে ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য ইত্যাদি যে সব আয় আইনত রাজার অথবা রাষ্ট্রেরই ভোগ্য, সেই সব সমেত ভূমি দান করা হইতেছে, এবং বলা হইতেছে, দানগ্রহীতা "আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং" অর্থাৎ শাশ্বত কাল পর্যন্ত সেই ভূমি ভোগ করিতে পারিবেন।

সর্বশেষ সর্ত হইতেছে ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন—ভূমি দান করা হইতেছে ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায় বা যুক্তি অনুযায়ী। এই কথাটির নানা জনে নানা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈজয়ন্তী গ্রন্থ মতে যে-ভূমি কর্ষণের অযোগ্য, সেই ভূমি ভূমিচ্ছিদ্র; এই অর্থে কৌটিল্যও কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে আছে, "ভূমিচ্ছিদ্রাঞ্চ অকিঞ্চিৎকরগ্রাহ্যাম্" অর্থাৎ কর্ষণের অযোগ্য ভূমির কোন কর বা রাজস্ব নাই। কর বা রাজস্ব নাই, এই যে রীতি অর্থাৎ রাজস্ব-মুক্তির রীতি অনুযায়ী যে ভূমি-দান, তাহাই ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ানুযায়ী দান, এবং লিপিগুলিতে এই সর্তেই ভূমি-দান করা হইয়াছে, সমস্ত কর হইতে ভোক্তাকে মুক্তি দিয়া।

লিপিগুলির স্বরূপ বিস্তৃত করিয়া উপরে ব্যাখ্যা করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-দান ও ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে আমরা অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানিলাম। এইবার ভূমি-সম্পর্কিত অন্যান্য সংবাদ লওয়া যাইতে পারে। ভূমি-সম্পর্কিত কি কি সংবাদ স্বভাবতই আমাদের জানিবার ঔৎসুক্য হয়, তাহার তালিকা করিয়া লইলে তথ্য নির্ধারণ সহজ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞাত [illegible] তথ্যের হিসাব লওয়া যাইতে পারে।

১। ভূমির প্রকারভেদ

২। ভূমির মাপ ও মূল্য

৩। ভূমির চাহিদা

৪। ভূমির সীমা-নির্দেশ

৫। ভূমির উপস্বত্ব, কর, উপরিকর ইত্যাদি

৬। ভূমিস্বত্বাধিকারী কে? রাজার ও প্রজার অধিকার। খাস প্রজা, নিম্ন প্রজা ইত্যাদি।

৪

অষ্টমশতকপূর্ববর্তী লিপিগুলিতে আমরা প্রধানত তিন প্রকার ভূমির উল্লেখ পাইতেছি; বাস্তু, ক্ষেত্র ও খিলক্ষেত্র। যে-ভূমিতে লোকে ঘরবাড়ি তৈরি করিয়া বাস

করিত অথবা বাসযোগ্য যে ভূমি, তাহা বাস্তুভূমি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন বৈগ্রাম-পট্টোলীতে, বাস্তুভূমিকে স্থলবাস্তুভূমিও বলা হইয়াছে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের কোন কোন লিপিতে "ব্যাভূ" বলিয়া বাস্তুভূমি নির্দেশ করা হইয়াছে, যথা, দামোদর দেবের অপ্রকাশিত চট্টগ্রাম-লিপিতে, বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য-পরিষৎ লিপিতে। ব্যাভূ "চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন বাস্তভূমি", অর্থাৎ সীমানির্দিষ্ট বসবাস করিবার ভূমি।

ভূমির প্রকারভেদ

যে-ভূমি কর্ষণযোগ্য ও কর্ষণাধীন, সে-ভূমি ক্ষেত্রভূমি। যেখানে দান-বিক্রয় হইতেছে, এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, সেখানে ভূমি পূর্বেই অন্য লোকের দ্বারা কর্ষিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা রাজার পক্ষ হইতেই হউক বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা বা ব্যক্তির পক্ষ হইতেই হউক। ক্ষেত্রভূমি দান-বিক্রয় যেখানে হইতেছে, সেখানে ভূমি হস্তান্তরিতও হইতেছে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের কোন কোন লিপিতে কর্ষণযোগ্য ক্ষেত্রভূমি বুঝাইতে "নালভূ" বা "নাভূ" কথাটির ব্যবহার করা হইয়াছে, যেমন, পূর্বোক্ত দামোদর দেবের অপ্রকাশিত চট্টগ্রাম-লিপিতে। নালজমি কথা তো এই অর্থে এখনো প্রচলিত।

ভূমি কর্ষণযোগ্য ও কর্ষণাধীন যেমন হইতে পারে, তেমনই কর্ষণযোগ্য কিন্তু অকর্ষিতও হইতে পারে। এ-কথা বলিতে বুঝিতেছি, কোন নির্দিষ্ট ভূমি চাষের উপযুক্ত, কিন্তু যে কারণেই হোক, যখন সে ভূমি দান-বিক্রয় হইতেছে, তখন কেহ সে-ভূমি চাষ করিতেছে না। এমন যে ক্ষেত্র বা ভূমি, তাহা খিলক্ষেত্র। চাষ করিয়া করিয়া যে-ভূমির উর্বরতা নষ্ট হইয়া যায়, সে-ভূমি অনেক সময় দু'চার বৎসর ফেলিয়া রাখা হয়, তাহাতে ভূমির উর্বরতা বাড়ে, এবং পরে তাহা আবার চাষ করা হয়। খিলক্ষেত্র বলিতে খুব সম্ভব, এই ধরনের ভূমির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আর, যে-ভূমি শুধু খিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কর্ষণের অযোগ্য ভূমি। অষ্টমশতকোত্তর কোনো কোনো লিপিতে নালভূমির সঙ্গে খিল-ভূমির উল্লেখ হইতেও (সখিলনালা, সবাস্তুনালখিলা) এই অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হয়। এখনো পূর্ববাংলা ও শ্রীহট্টে কোন কোন স্থানে খিল জমি বলিতে অনুর্বর, কর্ষণের অযোগ্য জলাভূমিকেই বুঝায়। ইহার একটু পরোক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণও আছে বৈন্য-গুপ্তের গুণাইঘর-লিপিতে। এই ক্ষেত্রে বিশেষ এক খণ্ড খিলভূমি উল্লিখিত হইতেছে 'হজ্জিক খিলভূমি' বলিয়া (water-logged waste land)। হজ্জিক = হাজা, শুখা বা শুকনার বিপরীত, অর্থ জলাভূমি। তবে, এমনও হইতে পারে, খিল ও খিলক্ষেত্র বলিতে একই প্রকারের ভূমি নির্দেশ করা হইতেছে। দুই ভিন্ন অর্থে কথা দুইটি ব্যবহৃত হইতেছে কি না, লিপিগুলির সাক্ষ্য হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কোন কোন লিপিতে, যেমন ১নং দামোদরপুর-লিপিতে, খিল ভূমিকেই আবার বিশেষিত করা হইতেছে 'অপ্রহত' অর্থাৎ অকৃষ্ট বলিয়া। অমরকোষের মতে খিল ও অপ্রহত একার্থক (২, ১০, ৫) এবং হলায়ুধ খিল অর্থে বুঝিয়াছেন পতিত জমি। যাদবপ্রকাশ তাঁহার বৈজয়ন্তী গ্রন্থে

(একাদশ শতক) এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "খিলমপ্রহতং স্থানমূষবত্যূষরেরিণৌ" (১২৪ পৃ)। তিনিও তাহা হইলে খিল ও অপ্রহত সমার্থক বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন এবং খিলভূমি বলিতে কর্ষণযোগ্য অথচ অকৃষ্ট ভূমির প্রতিই যেন ইঙ্গিত করিতেছেন। নারদ-স্মৃতির মতে যে ভূমি এক বছর চাষ করা হয় নাই, তাহা অর্ধখিল, যাহা তিন বছর চাষ করা হয় নাই, তাহা খিল (১১, ২৬)। ক্ষেত্র ও খিলভূমির পূর্বোক্ত পার্থক্য পরবর্তী কালেও দেখা যায়। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ভূমির প্রকারভেদ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে: (১) যে-ভূমি কর্ষণাধীন, তাহা 'পোলজ' ভূমি; ইহাই প্রাচীন বাংলার ক্ষেত্রভূমি। (২) যে-ভূমি কর্ষণযোগ্য, কিন্তু এক বা দুই বৎসরের জন্য কর্ষণ করা হইতেছে না উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, সেই ভূমি 'পরৌতি' ভূমি; (৩) এই ভাবে যে-ভূমি তিন বা চার বৎসর ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা 'চচর' ভূমি; (৪) এবং যাহা পাঁচ বা ততোধিক বৎসর ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা 'বঞ্জর' ভূমি। আকবরের কালের ২, ৩ ও ৪নং ভূমিই খুব সম্ভব প্রাচীন বাংলার খিলভূমি।

এই প্রধান তিন চার প্রকার ভূমি ছাড়া অন্যান্য প্রকারের ভূমির উল্লেখও লিপিগুলিতে দেখা যায়। একে একে সেগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তল, বাটক, উদ্দেশ, আলি—বৈগ্রাম-পট্টোলীতে 'তলবাটক' কথা এক সঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যিনি ভূমি ক্রয় করিতেছেন, তিনি বাস্তুভূমিই ক্রয় করিতেছেন; উদ্দেশ্য—ঘরবাড়ি তৈরি করা, এবং ঘরবাড়ি করিয়া বাস করিতে হইলেই পায়ে চলিবার পথ এবং জল চলাচলের পথও তৈরী করা প্রয়োজন। খালিমপুর-লিপির "তলপাটক" নিঃসন্দেহে "তলবাটক", এবং বৈগ্রাম-লিপিতে কথাটি যে-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এখানেও ঠিক তাহাই। এখনও বাংলাদেশের অনেক জায়গায় পথ অর্থে বাট কথাটির ব্যবহার প্রচলন আছে; বাংলার বাহিরেও আছে। এই পথের অর্থাৎ বাটকের সঙ্গে তল কথার উল্লেখ যেখানেই আছে, সেখানে তলের অর্থ নালা বা প্রণুল্লী, এক কথায় নর্দামা বা জল নিঃসরণের পথ। নালা এবং প্রণুল্লী, এই দুইটি শব্দের উল্লেখও অষ্টমশতকোত্তর লিপিতেও আছে। সাধারণত পথের ধারে ধারেই থাকিত জল নিঃসরণের পথ; তাহা ছাড়া কথা দুইটি বিপরীতার্থব্যঞ্জক। সেই জন্যই তল এবং বাটক প্রায় সর্বত্রই একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। অষ্টমশতকোত্তর লিপিগুলিতে অনেক স্থলে তলের সঙ্গে উদ্দেশ কথাটিরও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় (সতলঃ সোদ্দেশঃ)। সে-ক্ষেত্রেও তল অর্থে পয়ঃপ্রণালী বুঝাইতে কোন আপত্তি নাই; কারণ, উদ্দেশ বা উৎ+দেশ অর্থে উচ্চ ভূমি, অর্থাৎ বাঁধ, ঢিপি, জমির আলি (আইল, ধর্মপালের খালিমপুর-লিপি দ্রষ্টব্য), বান্ধাইল (বরেন্দ্রভূমিতে এখনও প্রচলিত) ইত্যাদি বুঝায়, এবং বাঁধ বা জমির আলির পাশে পাশেই তো এখনও দেখা যায় ক্ষেতের জল নিঃসরণের বা জলসেচনের প্রণালী। কেহ কেহ তল বলিতে সাধারণভাবে গ্রামের নিম্ন জলাভূমি বুঝিয়াছেন; আমার কাছে এই অর্থ সমীচীন মনে হয় না। কারণ বাটক বা উদ্দেশ উভয়ের সঙ্গেই পয়ঃপ্রণালী অর্থে তল কথাটির ব্যবহার সার্থকতর, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

জোলা, জোলক, জোটিকা, খাট, খাটা, খাটিকা, খাড়ি, খাড়িকা, বানিকা, স্রোতিকা, গঙ্গিনিকা, হজ্জিক, খাল, বিল ইত্যাদি—এই প্রত্যেকটি শব্দই প্রাচীন বাংলার লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। দত্ত অথবা বিক্রীত ভূমির সীমা নির্দেশ উপলক্ষেই এই সব কথা ব্যবহারের প্রয়োজন হইয়াছে। জোলা কথাটি তো এখনো উত্তর ও পূর্ববাংলায় বহুল ব্যবহৃত; যে অনতিপ্রসার খালের পথ দিয়া বিল, পুষ্করিণী, গ্রাম ইত্যাদির জল চলাচল করে, তাহারই নাম জোলা। জোলক, জোটিকা প্রভৃতি শব্দ জোলা শব্দেরই সমার্থক। খাট, খাটা, খাটিকা, খাড়ি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে খাল অর্থে; যে জনপদ খাল-বহুল, তাহাই খাড়িমণ্ডল, আর চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশ যে খালবহুল, তাহা তো সকলেই জানেন। আর, খাদা বা খাটার পারে পারে যে জনপদ, তাহাই খাদা (?) পার বা খাটাপার বিষয় (ধনাইদহ-লিপি)। বানিকা, স্রোতিকা, গঙ্গিনিকাও খাড়ি-খাটিকা কথার সমার্থক বলিয়াই মনে হয়। মরা নদীর খাত অর্থে গঙ্গিনিকা শব্দ উত্তরবঙ্গে এখনও ব্যবহৃত হয় বলিয়া অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছিলেন; কিন্তু গঙ্গিনিকার অপভ্রংশ গাঙ্গিনা উত্তর ও পূর্ববাংলায় এখনও যে-কোনও মরা পুরাতন খালকেই বুঝায়। হজ্জিকা যে নিম্ন জলাভূমি, তাহার ইঙ্গিত তো আগেই করিয়াছি। ঠিক এই অর্থে জলা বা জল্লা কথা মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় আজও প্রচলিত। খাল খাটা, খাটিকা, খাড়িকা ইত্যাদি কথারই সমার্থক। বিল কথার উল্লেখ দামোদরদেবের অপ্রকাশিত একটি লিপিতে আছে।

হট্ট, হট্টিকা, ঘট্ট, তর—হট্ট, হট্টিকা সহজবোধ্য এবং আমাদের হাট, বাজার অর্থেই সর্বত্র ইহার ব্যবহার। ঘট্ট—ঘাট, এবং তর—পারঘাট বা খেয়াপারাপারের ঘাট।

গর্ত, উষর (সগর্তোষর)—গর্ত ত সহজবোধ্য। বদ্ধ ডোবা, অনতিগভীর অনতিপ্রসার কর্ষণ-অযোগ্য ভূমি অর্থেই এই শব্দটির ব্যবহার লিপিতে আছে। উষর অর্থে অনুর্বর কর্ষণ-অযোগ্য উচ্চভূমি। প্রতি গ্রামেই এই ধরনের গর্ত ও উষর ভূমি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আজও দেখিতে পাওয়া যায়। গর্ত এবং উষর ভূমি সহ যেমন ভূখণ্ড দান-বিক্রয় করা হইয়াছে, তেমনই জলস্থল সহও হইয়াছে। একই লিপিতে একই ভূখণ্ড "সগর্তোষর" এবং "সজলস্থল" দানের উল্লেখ লিপিগুলিতে অপ্রতুল নয়। কাজেই জল অর্থে এ-ক্ষেত্রে গর্ত বুঝাইতে পারে না; খুব সম্ভবত জলাশয়, পুষ্করিণী, কুণ্ড, বাপী ইত্যাদি বুঝায়, এবং ইহাদের উল্লেখ কোথাও কোথাও আছে।

গোমার্গ, গোবাট, গোপথ, গোচর ইত্যাদি—গোচর সোজাসুজি গোচারণভূমি, যে ভূমিতে গরু মহিষ চরিয়া বেড়ায়। গোচরভূমি সুপ্রাচীন কাল হইতেই গ্রামবাসীদের সাধারণ সম্পত্তি, এবং সাধারণত গ্রামের বহিঃসীমায়ই তাহার অবস্থিতি। এ সম্বন্ধে কৌটিল্য এবং ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতাদের সাক্ষ্য উল্লেখযোগ্য। কৌটিল্যের মতে গ্রামের চারিদিকে ১০০ ধনু (৪০০ হাত) অন্তর অন্তর বেড়া দেওয়া গোচরভূমি থাকা প্রয়োজন। মনু এবং

যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানও অনুরূপ। ইহা কিছু আশ্চর্য নয় যে, লিপিগুলির ইঙ্গিতও তাহাই। যে-পথে গ্রামের ভিতর হইতে গরু মহিষ প্রভৃতি গোচর-ভূমিতে যাতায়াত করে, সেই পথই গোমার্গ, গোবাট অথবা গোপথ। গোবাট (পূর্ববাংলায় কোথাও কোথাও এখনও গোপাট), গোপথ প্রভৃতি শব্দ এই অর্থে এখনও বাংলা দেশের অনেক জায়গায় প্রচলিত।

যে-গোচরের কথা এইমাত্র বলিলাম, অনেকগুলি লিপিতে, বিশেষত অষ্টমশতকোত্তর লিপিগুলিতে, তাহার সঙ্গেই উল্লেখ আছে তৃণযূতি অথবা তৃণপূতি কথাটির। সীমা নির্দেশ উপলক্ষেই কথাটির ব্যবহার; যে-ভূমি দান করা হইতেছে, তাহার সীমা অনেক ক্ষেত্রেই "স্বসীমা (বচ্ছিন্না) তৃণযূতি (অথবা তৃণপূতি) গোচর পর্যন্তঃ"। এ-কথা সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, গোচরের মত তৃণযূতির বা তৃণপূতির অবস্থানও গ্রামসীমায় বা দত্ত ভূমির সীমায়। তৃণযূতি এবং তৃণপূতি ও তাহাদের অর্থ লইয়া পণ্ডিত মহলে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনতর লিপিতে, যেমন সমুদ্রসেনের নিরমান্দ তাম্রপট্টে কথাটি হইতেছে তৃণ···যূতি। কিন্তু সেখানে তৃণ ও যূতির মধ্যে আরও দুইটি শব্দ আছে, কাজেই তৃণযূতি একটি কথা নয়। চাম্বা প্রদেশের লিপিতে একই প্রসঙ্গে গোযূতির উল্লেখ আছে; এবং গরু যেখানে বাঁধা হয় সেই স্থানকেই বুঝাইতেছে। পাল আমলের লিপি-গুলিতে কিন্তু তৃণ এবং যূতি কথা দুইটি এক সঙ্গে এক কথা বলিয়াই পাইতেছি। সেন আমলের লিপিগুলির তৃণ-পূতি কথাটি কি তৃণ-যূতি কথাটির অশুদ্ধ রূপ? সমসাময়িক নাগর লিপিতে "য" ও "প" বর্ণে পার্থক্য খুব বেশি নয়। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে গোচরের সঙ্গেই তৃণ-যূতির উল্লেখ খুব অসার্থক নয়। গ্রামসীমায় যে তৃণাস্তীর্ণ ভূমিতে গরু মহিষ বাঁধিয়া রাখা এবং ঘাস খাওয়ান হইত, তাহাই তৃণযূতি এবং তাহারই পাশে গরু মহিষ চরিয়া বেড়াইবার গোচারণ ভূমি। আর যদি তৃণপূতি কথাটিও শুদ্ধ অবিকৃতরূপে আমরা পাইয়া থাকি, তাহা হইলে, কথাটিকে গোচরের বিশেষণরূপে ধরিয়া লওয়া যায় কি? কোষকারদের মতে পূতি এক ধরনের ঘাস, কাজেই তৃণ ও পূতি প্রায় সমার্থক। তৃণ-পূতিপূর্ণ যে গোচরভূমি, তাহাই তৃণপূতিগোচর এবং তাহা যে গ্রামসীমায় বা ক্ষেত্র ও খিলভূমির সীমায় অবস্থিত থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

বন, অরণ্য ইত্যাদি—বন, অরণ্য সকল ক্ষেত্রেই গ্রামের বাহিরে। একাধিক লিপিতে বনভূমি, অরণ্যভূমি দানের উল্লেখ আছে। অরণ্যভূমি পরিষ্কার করিয়া কি করিয়া গ্রামের পত্তন করা হইত, তাহার পরিচয় অন্তত একটি লিপিতে আছে। লোকনাথের ত্রিপুরা-পট্টোলীতে দেখিতেছি, সুব্বুঙ্গ বিষয়ে রাজা লোকনাথ সর্প-মহিষ-ব্যাঘ্র-বরাহাধ্যুষিত আটবী ভূখণ্ডে চতুর্বেদবিদ্যাবিশারদ দুই শত এগার জন ব্রাহ্মণ বসাইবার জন্য প্রচুর ভূমি দান করিয়া-ছিলেন; দানের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন ব্রাহ্মণ প্রদোষশর্মা। কৌটিল্যের বিধানে বন, অরণ্য ইত্যাদি ছিল রাষ্ট্রসম্পত্তি; ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে অরণ্যভূমি ব্রাহ্মণকে দান করা যাইতে পারে, কৌটিল্য এই বিধানও দিয়াছেন। অরণ্যভূমি পরিষ্কার করিয়া কি করিয়া নূতন

জনপদের পত্তন করিতে হয়, কৌটিল্য তাহারও ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন। লোকনাথের লিপিটি কৌটিল্যের বিধানের অন্যতম ঐতিহাসিক প্রমাণ।

মার্গ, বাট দুইই জনপদের লোক ও যানবাহন চলাচলের পথ। ইর্দা তাম্রপট্টের আবষ্করস্থান তো আস্তাকুঁড় এবং সেই হেতু উষর ভূমির সঙ্গেই তাহার উল্লেখ।

৫

পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার লিপিগুলিতে ভূমির মাপের ক্রম খুব সহজেই ধরিতে পারা যায়। সর্বোচ্চ ভূমিমান হইতেছে কুল্য অথবা কুল্যবাপ, তার পর দ্রোণ বা দ্রোণবাপ এবং সর্বনিম্ন মাপ আঢ়বাপ। কুল্য, দ্রোণ এবং আঢ় (পরবর্তী লিপিগুলির আঢক, বর্তমান পূর্ববাংলার আঢ়া) সমস্তই শস্যমান; এই শস্যমান দ্বারাই ভূমিমান নিরূপিত হইয়াছিল, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

ভূমির মাপ ও মূল্য

কুল্য বা কুল্যবাপ—যে-ভূমিতে বপন করা হয়, তাহা বাপক্ষেত্র; "উপ্যতেঽস্মিন্ ইতি বাপঃক্ষেত্রম্"। যে-পরিমাণ বাপক্ষেত্রে এক কুল্য বীজ শস্য বপন করা যায়, সেই পরিমাণ ভূমি এক কুল্যবাপ ভূমি। দ্রোণবাপ এবং আঢ়বাপও যথাক্রমে এক দ্রোণ ও এক আঢ় বা আঢক শস্য বপনযোগ্য ভূমি। কাহারও কাহারও মতে কুল্য পূর্ববাংলার কুলা; এক কুল্য শস্য অর্থাৎ একটি কুলায় যত ধান বা শস্য ধরে তাহার বীজ যতটা পরিমাণ ভূমিতে বপন করা হয় তাহাই কুল্যবাপ। মৈমনসিং-শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে এখনও কুলুবায় কথা প্রচলিত, তাহাও কুল্যবাপ কথারই ভগ্ন রূপ।

দ্রোণবাপ ও আঢ়বাপ—দ্রোণ (=কলস) বর্তমানে বাংলার বহু জেলায় পল্লীগ্রামে দোনে বা ডোনে রূপান্তরিত হইয়াছে। আঢ় এখনও আঢ়া নামে প্রচলিত। প্রাচীন আর্যা ও কোষকারদের মতে এক কুল্যবাপ ভূমি আট দ্রোণবাপের সমান, এক দ্রোণবাপ চার আঢ়বাপের সমান, এক আঢ়বাপ চার প্রস্থের সমান। এক কুল্যবাপ যে আট দ্রোণের সমান, তাহা লিপিপ্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত হয়। পাহাড়পুর লিপিতে ১২ দ্রোণবাপ যে ১½ কুল্যবাপের সমান, তাহা পরিষ্কার ধরা যায়। বৈগ্রাম-লিপির ইঙ্গিতও তাহাই।

এই ইঙ্গিত প্রাচীন সাহিত্য-ঐতিহ্যদ্বারাও সমর্থিত হয়। কুল্যই হোক্ আর দ্রোণই হোক্, এ-সমস্তই ধান্যের আধার, যেহেতু ধান্যই বাংলার প্রধানতম শস্য। মনুসংহিতায় দ্রোণ বলিতেই ধান্যদ্রোণের উল্লেখ, এবং এই ধান্যদ্রোণেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন বাঙালী কুল্লুকভট্ট। এই কুল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন এবং শব্দকল্পদ্রুম কোষ-সংকলয়িতার মতে

৮ মুষ্টি = ১ কুঞ্চি
৮ কুঞ্চি = ১ পুষ্কল
৪ পুষ্কলে = ১ আঢ়ক (আঢ়া)
৪ আঢ়কে = ১ দ্রোণ

এবং মেদিনীকোষের মতে ৭ দ্রোণ=১ কুল্য। শব্দকল্পদ্রুমে বলা হইয়াছে, এক আঢ়কে সাধারণত ১৬ হইতে ২০ সের ধান ধরে, অর্থাৎ এক দ্রোণে ৬৪ হইতে ৮০ সের, এক কুল্যে ৫১২ হইতে ৬৪০ সের অর্থাৎ ১২ মণ ৩২ সের হইতে ১৮ মণ। এই পরিমাণ ধানের বীজ যে পরিমাণ ভূমিতে বপন করা হইত সেই পরিমাণ ভূমি হয়ত এক কুল্যবাপ। কিন্তু এ-সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই।

কুল্যবাপই হোক, আর দ্রোণবাপ বা আঢ়বাপ যাহাই হোক, মাপা হইত নলের সাহায্যে; এই নলই হইতেছে প্রাচীন উত্তর ও পূর্ববাংলার প্রচলিত মানদণ্ড। বৈগ্রাম, পাহাড়পুর এবং ফরিদপুরের তিনটি পট্টোলীতেই বলা হইতেছে, ৮, ৯ নলে (অষ্টকনবকনলাভ্যাম্) এক মান। কিন্তু এই মান কি প্রস্থ×দৈর্ঘ্যের মান, ৮ এবং ৯ দুই প্রকার নলের মান, কুল্যবাপের মান, দ্রোণবাপ না আঢ়বাপের মান, তাহা সঠিক বলিবার উপায় নাই। এই নলেরও দৈর্ঘ্য নির্ভর করিত ব্যক্তিবিশেষের হস্তের দৈর্ঘ্যের উপর; বৈগ্রাম-লিপি অনুসারে দরব্বীকর্ম নামক জনৈক ব্যক্তির হাতের মাপে, ফরিদপুর-লিপিত্রয় অনুসারে শিবচন্দ্র নামক কোন ব্যক্তির হাতের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী। অবশ্য ইঁহাদের হাতের মাপ গড়পড়তা সাধারণ হাতের দৈর্ঘ্যের মাপ কিংবা তার চেয়ে একটু বেশি বলিয়া মনে করিলে কিছু অন্যায় করা হইবে না। এই ধরনের ব্যক্তিবিশেষের হাতের মাপের মান অষ্টাদশ শতকের মধ্যপাদেও বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। রাজসাহীর নাটোর অঞ্চলে রামজীবনী হাতের মান তো সেদিনকার স্মৃতি।

ষষ্ঠ শতক ও অষ্টম শতকের দুইটি লিপিতে ভূমি-মাপের একটি নূতন মানের সংবাদ জানা যাইতেছে। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘরপট্টোলী এবং দেবখড়্গের ১নং আস্রফপুর-পট্টোলীতে পাটক নামে একটি মানের উল্লেখ আছে, এবং তাহার পরের ক্রমেই যে-মানের নাম উল্লেখ আছে তাহা দ্রোণবাপ। দ্রোণের সঙ্গে পাটকের সম্বন্ধের ইঙ্গিত এই দুইটি পট্টোলীর দত্ত ভূমির পরিমাণ বিশ্লেষণ করিলে হয়ত পাওয়া যাইতে পারে। আস্রফপুর-পট্টোলীটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ৫০ দ্রোণে এক পাটক হয়। কিন্তু আস্রফপুর-পট্টোলীর পাঠের নির্ধারণ সন্দেহাতীত নয়। তাহা ছাড়া, সন্দেহ করিবার আরও কারণ গুণাইঘর লিপির সাক্ষ্য। এই পট্টোলী দ্বারা মহারাজ রুদ্রদত্ত পাঁচটি পৃথক ভূখণ্ডে সর্বসুদ্ধ ১১ পাটক ভূমি দান করিয়াছিলেন; এই পাঁচটি ভূখণ্ডের পরিমাপ তালিকাগত করিলে এইরূপ দাঁড়ায়:

১ম ভূখণ্ড	—	৭ পাটক	৯ দ্রোণবাপ
২য় "	—	×	২৮ "
৩য় "	—	×	২৩ "
৪র্থ "	—	×	৩০ "
৫ম "	—	১½ "	× "
		৮½	৯০

আগেই বলিয়াছি, দত্ত ভূমির মোট পরিমাণ ১১ পাটক। তাহা হইলে ৯০ দ্রোণে হইতেছে ২১/৪ পাটক, অর্থাৎ ৪০ দ্রোণে এক পাটক, এ কথা সহজেই বলা চলে। আগে দেখিয়াছি, ৮ দ্রোণে এক কুল্যবাপ, তাহা হইলে ৫ কুল্যবাপ = ১ পাটক।

পাটক এখানে নিঃসন্দেহে ভূমি মাপের মান; কিন্তু আস্রফপুর-লিপি দুটিতেই প্রমাণ পাওয়া যাইবে, পাটক কথাটি গ্রাম বা গ্রামাংশ অর্থেও ব্যবহৃত হইত। তলপাটক, মর্কটাসী পাটক, বৎসনাগ পাটক, দর পাটক এবং এই জাতীয় পাটকান্ত যত নাম, সমস্তই গ্রাম বা গ্রামাংশের নাম। বস্তুত বাংলা পাড়া কথাটি পাটক হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়, অথবা দেশজ পাড়া হইতে পাটক। তলপাটক = তলপাড়া, ভট্টপাটক = ভাটপাড়া, মধ্যপাটক = মধ্যপাড়া, ইত্যাদি পাটকান্ত নাম তো এখনও বাংলাদেশের সর্বত্র সুপরিচিত। এ জাতীয় নাম প্রাচীন বাংলার লিপিগুলি হইতেও জানা যায়। বাংলার বাহিরেও এই জাতীয় নামের অভাব নাই, যেমন—মূলবর্মপাটক গ্রাম, বিশালপাটক গ্রাম ইত্যাদি। গ্রাম বা গ্রামাংশ (= পাড়া) অর্থে পাট, পাটক কথা উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে পদ্র বা পদ্রকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—বড়পদ্রকাভিধান গ্রাম, শমীপদ্রক গ্রাম, শিরীষপদ্র গ্রাম ইত্যাদি। পাট = পদ্র = গ্রাম; ক্ষুদ্র গ্রামার্থে ক প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয় পাটক = পদ্রক = পাড়া বা গ্রামাংশ বা ছোট গ্রাম।

পাল-সম্রাট্‌দের আমলে ভূমি পরিমাপের মান কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দানের বস্তু হইতেছে একটি বা একাধিক সম্পূর্ণ গ্রাম; বোধ হয় ইহা অন্যতম কারণ। একাদশ শতকে শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রপট্টে দেখিতেছি, সর্বোচ্চ ভূমি-মান হইতেছে পাটক। অষ্টম শতকে এই মান ফরিদপুরে প্রচলিত ছিল; একাদশ শতকে বিক্রমপুরেও দেখিলাম। মোটামুটি এই শতকেই শ্রীহট্টে দেখি, উচ্চতম মান হইতেছে হল। কেহ কেহ মনে করেন কুলুবায়েরই অপর নাম হল বা হাল। যাহাই হউক, গোবিন্দকেশবের ভাটেরা তাম্রপট্টে ২৮টি গ্রামে ২৯৬টি বাস্তুভিটা এবং ৩৭৫ হল জমি ছিল; নিম্নতম মান ছিল ক্রান্তি। শ্রীহট্টে ভূমি পরিমাপের বর্তমান ক্রম এইরূপ:

৩ ক্রান্তি	=	১ কড়া
৪ কড়া	=	„ গণ্ডা
২০ গণ্ডা	=	„ পণ
৪ পণ	=	„ রেখা
৪ রেখা	=	„ যষ্ঠী
৭ যষ্ঠী	=	„ পোয়া
৪ পোয়া	=	„ কেদার বা কেয়ার
১২ কেয়ার	=	১ হল (= ১০১/২ বিঘা = ৩১/২ একর)

শ্রীচন্দ্রের রামপাল শাসনে উচ্চতম ভূমিমান দেখিয়াছি পাটক, কিন্তু এই রাজারই ধুল্লা

শাসনে উচ্চতম মান দেখিতেছি হল, এবং দত্ত ভূমিগুলি তো বিক্রমপুরে বলিয়াই অনুমান হয়। একাদশ শতকে বিক্রমপুরে কি পাটক ও হল, এই দুই মানই প্রচলিত ছিল? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পাটকের সঙ্গে হলের সম্বন্ধ কি? যাহাই হউক, ধুল্লা শাসন হইতে এই খবরটুকু পাওয়া যাইতেছে যে, হলের নিম্নতর ক্রম হইতেছে দ্রোণ; কিন্তু দ্রোণের সঙ্গে হলের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যাইতেছে না। দ্বাদশ শতকে ভোজবর্মার বেলব লিপিতে উচ্চতম ভূমিমান পাটক এবং নিম্নতর মান দ্রোণ; এ দুয়ের সম্বন্ধ যে কি, তাহা আগেই দেখিয়াছি। সেন রাজাদের লিপিগুলিতেও উচ্চতম মান পাটক অথবা ভূপাটক। এই লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ভূমিমানের যে ক্রম পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ: (১) পাটক বা ভূপাটক, (২) দ্রোণ বা ভূদ্রোণ, (৩) আঢক বা আঢ়াবাপ, (৪) উন্মান বা উদান বা উয়ান, (৫) কাক বা কাকিনী বা কাকিণিকা। পাটকের সঙ্গে দ্রোণের এবং দ্রোণের সঙ্গে আঢক বা আঢ়বাপের সম্বন্ধ ইতিপূর্বেই আমরা জানিয়াছি, কিন্তু আঢকের সঙ্গে উন্মানের বা উন্মানের সঙ্গে কাকের সম্বন্ধের কোনও ইঙ্গিত লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে না। লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন পট্টোলীতে উপরোক্ত ক্রমের একটু ব্যতিক্রম পাওয়া যায়; দ্রোণের নিম্নতর ক্রম দেওয়া হইয়াছে খাড়িকা (?), এবং তাহার পর যথারীতি উন্মান ও কাকিনী। খাড়ীকা মান যে ছিল, তাহার প্রমাণ এই রাজারই মাধাইনগর পট্টোলীতেও আছে; সেখানে উচ্চতর মান ভূখাড়ী এবং তাহার পরেই খাড়ীকা। কিন্তু খাড়ীকার সঙ্গে দ্রোণের অথবা ভূখাড়ীর সঙ্গে খাড়ীকার সম্বন্ধ নির্ণয়ের কোন ইঙ্গিত লিপিগুলিতে নাই। তবে লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন লিপিতে একটু ইঙ্গিত যাহা আছে তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১২ অঙ্গুলি = ১ হাত
৩২ হাত = ১ উন্মান (উয়ান)।

এই সম্বন্ধ নির্ণয় এবং এ-পর্য্যন্ত যে-সমস্ত ভূমিমানের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার যথাযথ মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে প্রাচীন আর্য্যাশ্লোক এবং প্রচলিত ভূমি-পরিমাপ রীতির একটু পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

এ ইঙ্গিত আমি আগেই করিয়াছি যে, শস্যভাণ্ডমানের সাহায্যেই প্রাচীন কালে ভূমি-মান নির্ধারিত হইয়াছিল। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, আঢ়বাপ ইত্যাদি নামই তাহার প্রমাণ। পাটক বোধ হয় গোড়াতেই ছিল ভূমিমান। হলও তাহাই। খাড়ী (শুদ্ধ, খারী) কিন্তু শস্যভাণ্ডমান বলিয়াই মনে হয়, খাড়ী উচ্চতর মান, খাড়ীকা (ক-প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন ক্ষুদ্রার্থে) বোধ হয় নিম্নতর মান। খারী যে শস্যমান, তাহার প্রমাণ অমরকোষে আছে:—

দ্রোণাঢকাদিবাপাদৌ দ্রৌণিকাঢকিকাদয়ঃ।
খারীবাপস্তু খারীকঃ।

কাক বা কাকিণী গোড়ায় বোধ হয় ছিল মুদ্রামান। শ্রীধরের ত্রিশতিকায় একটি আর্য্যা আছে:

ষোড়শপণঃ পুরাণঃ পণো ভবেৎ কাকিণীচতুষ্কেণ।
পঞ্চাহতৈশ্চতুর্ভিবর্বরাটকৈঃ কাকিণী হেকা॥

উন্মান অর্থই বোধ হয় তুলামান। কিন্তু গোড়ায় এই সব মান মুদ্রামান, ভাণ্ডমান, তুলা-মান বা ভূমিমান যাহাই থাকুক, উত্তর কালে ইহারা ভূমিমান নির্দেশে ব্যবহৃত হইত। উন্মান এবং কাকিণী ছাড়া আর সমস্ত মানই হয় ভূমিমান, না হয় শস্যভাণ্ডমান; সেন আমলের লিপিগুলিতেই প্রথম দেখিতেছি, এই ভূমিমান ও শস্যমানের সঙ্গে তুলামান ও মুদ্রামান সম্পর্কিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে একটা অনুমান বোধ হয় সহজেই করা যায়। প্রাচীনতর কালে ভূমি যখন সুলভ ছিল, চাহিদা যখন খুব বেশি ছিল না, তখন ভূমির মাপের এত চুলচেরা বিচারও ছিল না। পাটকের অর্থাৎ গ্রামাংশের মোটামুটি আয়তন একটা সকলেরই জানা ছিল, দুই চার বিঘা এদিক ওদিক হইলে বিশেষ কিছু আসিয়া যাইত না। পরবর্তী কালে ভূমির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পাটকের মাপজোখও নিশ্চয়ই সুনির্দিষ্ট হইয়াছিল। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, আঢ়বাপ, হল ইত্যাদি সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। সুলভ ভূমির যুগে কতখানি ভূমিতে মোটামুটি কত বীজ ধান লাগে, কত লাঙ্গল লাগে, এই দিয়াই মোটামুটি জমির পরিমাণ নির্ণীত হইত। ক্রমে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাপ-জোখ্ নির্দিষ্টতর হইতে থাকে, এবং ক্রমশ আরও নিম্নতর মান নির্দেশের প্রয়োজন হয়। এই নিম্নতর মান যে তুলামান বা মুদ্রামান দ্বারা নির্ণীত হইয়াছিল, তাহাও জমির ক্রমবর্ধমান চাহিদার দিকে ইঙ্গিত করে।

পাটকের সঙ্গে কুল্যবাপের ও দ্রোণের, কুল্যবাপের সঙ্গে দ্রোণের, দ্রোণের সঙ্গে আঢক বা আঢ়বাপের সম্বন্ধ আমরা আগেই জানিয়াছি। এইবার আঢক বা আঢ়বাপের সঙ্গে উন্মানের এবং উন্মানের সঙ্গে কাকিণীর সম্বন্ধ কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। কোনও আর্যাশ্লোকের মধ্যে এই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাঁকুড়ার প্রচলিত রীতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় খবর দিতেছেন। মল্লভূমের রাজা চৈতন্য-সিংহদেবের তিনখানি দানপত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল; একটি পত্রে তিনি জানকীরাম হাজরাকে দুই দ্রোণ দুই আড়ি তিরিশ উয়ান এক কান ভূমি দেবোত্তর দান করিয়াছিলেন। সমসাময়িক অন্যান্য দানপত্র হইতে জানা যায়,

৪ কাক বা কাকিণী (পূর্ববাংলায়, চট্টগ্রামে কানি, রাঢ়ে কান) = ১ উয়ান

৫০ উয়ান	= ১ আড়ি
৪ আড়ি	= ১ দ্রোণ

বাংলা ১২৩০ সালে লিখিত "সেবক শ্রীসনাতন মণ্ডল দাসস্য" একটি শুভঙ্করীর বইএ যে আর্যা পাওয়া যায়, তাহাও উপরোক্ত সংবাদ সমর্থন করে।

"খেতে মাঠে রশি না পাই
সোল ছেষে কাহন বলাই॥

চারি কানে উয়ান হয়
পঞ্চাশ উয়ানে আড়ি ॥
চারি আড়িতে ডোন হয়
আঠাস হাত দণ্ডি ॥"

আড়ি, আড়ি নিঃসন্দেহে আঢ়বাপ, আঢক বা আঢ়কবাপ ; ডোন দ্রোণ বা দ্রোণবাপ। তাহা হইলে এইবার আমরা আঢ়বাপের সঙ্গে উন্মানের এবং উন্মানের সঙ্গে কাকিণীর সম্বন্ধ জানিলাম।

আর একটি ভূমি-মাপের উল্লেখ শুভংকর করিয়াছেন, এবং মাপটি কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশেও প্রচলিত ছিল ; এই মাপটির নাম কুড়ব। কেহ কেহ মনে করেন, এই কুড়ব ও কুল্যবাপ সমানার্থক। আমার মনে হয়, এই অনুমান সন্দেহজনক, কারণ, লীলাবতীর আর্যায় আছে

৪ কুড়ব	= ১ প্রস্থ
৪ প্রস্থ	= ১ আঢ়া (আঢক, আঢ়বাপ)
৪ আঢ়া	= [illegible]

অর্থাৎ ৬৪ কুড়বে ১ দ্রোণ, এবং যেহেতু ৮ দ্রোণে এক কুল্যবাপ, সেইহেতু এক কুল্যবাপ ৫১২ কুড়ব বা কুড়বার সমান ; অন্তত লীলাবতীর মতে তাহাই হওয়া উচিত। কুড়ব এবং বর্তমান কালে প্রচলিত বিঘা সমপরিমাণ ভূমি নির্দেশ করে কিনা বলা কঠিন। যাহাই হউক, এই কুড়বার উল্লেখ বাংলার প্রাচীন লিপিগুলিতে দেখা যায়না।

এক কুল্যবাপ ভূমির পরিমাণ কতটুকু ছিল তাহা জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক। সে-দিকে চেষ্টাও কিছু কিছু হইয়াছে, কতকটা অনুমানের এবং অনুমানোপম সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া। কুল্যবাপের পরিমাণ যে বর্তমান কালের বিঘা হইতে অনেক বেশি ছিল, একথা নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বহুদিন আগেই বলিয়াছিলেন। কাছাড়ের ইতিবৃত্ত-লেখক উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ মহাশয় বলেন যে, ঐ জেলায় এক কুল্যবাপ ১৪ বিঘার সমান। দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় অনেক অনুমানসিদ্ধ প্রমাণের সাহায্যে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এক কুল্যবাপ ভূমি পরিমাণ "অন্তত পক্ষে ৪০—৪২ একর অর্থাৎ প্রায় ১২৫ বিঘার কম ছিল না।" এসম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই ; তবে লীলাবতীর আর্যার সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় এবং কুড়বা যদি বিঘার সমার্থক হয় তাহা হইলে এক কুল্য-বাপে ৫১২ বিঘা হওয়া উচিত। কিন্তু কুড়বা ও বিঘা সমার্থক কিনা এবিষয়ে সন্দেহ আছে।

অষ্টমশতকপূর্ব লিপিগুলিতে দেখিয়াছি, ভূমি পরিমাপের মানদণ্ড ছিল নল ; পরবর্তী যুগের মানদণ্ডও ইহাই। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া-শাসনে প্রদত্ত ভূমি যে-নল মানদণ্ডে মাপা হইয়াছিল, তাহার নাম বৃষভশঙ্কর নল। বৃষভশঙ্কর ছিল রাজা বিজয়সেনের বিরুদ বা অন্যতম উপাধি। মনে হয়, বিজয়সেনের হাতের মাপে যে নলের দৈর্ঘ্য নিরূপিত হইয়াছিল,

তাহারই নাম হইয়াছিল বৃষভশংকর নল। আহুলিয়া-শাসন হইতে প্রমাণ হয়, অন্তত লক্ষ্মণসেনের কাল পর্যন্ত এই বৃষভশংকর নলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অথচ, বিজয়সেন নিজে কিন্তু ভূমি দান করিয়াছিলেন "সমতটনলেন" অর্থাৎ সমতটমণ্ডলে প্রচলিত মানদণ্ডের পরিমাপে। সমতটীয় নল পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির খাড়ি-বিষয়েও প্রচলিত ছিল (বারাকপুর শাসন)। এই সমতট নলই পরে বৃষভশংকর নল নামে পরিচিত হইয়াছিল কি না, বলা কঠিন। বর্ধমান-ভুক্তির উত্তর-রাঢ় অঞ্চলে এবং পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির ব্যাঘ্রতটী অঞ্চলে এই বৃষভশংকর নল প্রচলিত ছিল। লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি-শাসনের সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানের নল-মানদণ্ড বিভিন্ন প্রকারের ছিল; বরেন্দ্রীমণ্ডলে প্রদত্ত ভূমি মাপা হইয়াছিল "তত্রত্যদেশব্যবহারনলেন" অর্থাৎ সেই সেই দেশে প্রচলিত নলের সাহায্যে। সেন-আমলের লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলে অর্থাৎ পশ্চিম-নিম্নবঙ্গে বৃষভশংকর নল প্রচলিত ছিল, কিন্তু বরেন্দ্রীমণ্ডলে অর্থাৎ উত্তর-বঙ্গে প্রচলিত ছিল অন্য প্রকারের নল-মানদণ্ড। গোবিন্দপুর-তাম্রশাসনের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে বর্ধমান-ভুক্তির পশ্চিম-খাটিকা অঞ্চল বেতড্ড চতুরকে (বেতড়, হাওড়া) প্রচলিত নলের মাপ ছিল ৫৬ হাত। লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল লিপিতে দেখি ২২ হাতের আর এক নলের উল্লেখ। ঢাকা জেলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এই নলের প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। বাংলার বাহিরেও নলমানদণ্ডের প্রচলন যে ছিল তাহার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় তৈলের নীলগুণ্ড লিপিতে ভূমি পরিমাপের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে "রাজমানেন দণ্ডেন"; উড়িষ্যার নৃসিংহদেবের একটি পট্টোলীতে দেখিতেছি, রাজকর্মচারীদের হাতের মাপেও নলমান নির্ধারিত হইত। এই লিপিতে ভূমি পরিমাপের নির্দেশ দেওয়া হইতেছে "চন্দ্রদাসকরণস্য নলপ্রমাণেন" এবং "শ্রীকরণশিবদাসনামকনলপ্রমাণেন"। কিন্তু এই নলমানদণ্ড কিসের মান—পাটকের না কুল্যবাপের, দ্রোণের না আঢকের, উন্মান না কাকিণীর? এই প্রশ্নের উত্তরের কোন ইঙ্গিত লিপিগুলিতে নাই।

ভূমির মূল্য কিরূপ ছিল, তাহা এইবার আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে যাহা কিছু সংবাদ, তাহা অষ্টমশতকপূর্ব লিপিগুলিতেই শুধু পাওয়া যায়। পরবর্তী লিপিগুলিতে ভূমির মূল্য কোথাও দেওয়া হয় নাই; কারণ, এই যুগের পট্টোলীগুলি দানের পট্টোলী, ক্রয়-বিক্রয়ের নয়। সেন-আমলের লিপিগুলিতে ভূমির উৎপত্তির যথাযথ পরিমাণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে মূল্য নিরূপণের সাহায্য যাহা পাওয়া যায় তাহা পরোক্ষ। দামোদরপুরের ১, ২, ৪ এবং ৫নং পট্টোলী শতাধিক বৎসর জুড়িয়া বিস্তৃত। এই চারিটি পট্টোলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, শতাধিক বৎসর ধরিয়া পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির কোটিবর্ষবিষয়ে এক কুল্যবাপ ভূমির মূল্য ছিল তিন দীনার। ফরিদপুরের পট্টোলীগুলি তিনটি রাজার রাজত্বকাল অর্থাৎ মোটামুটি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বিস্তৃত। পূর্ববাংলার এই অঞ্চলে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ভূমির মূল্য ছিল প্রতি কুল্যবাপে চারি দীনার।

বৈগ্রাম-পট্টোলীরদত্ত ভূমির অবস্থিতি ছিল পঞ্চনগরীবিষয়ে এবং সেখানে প্রতি কুল্যবাপের মূল্য ছিল দুই দীনার। বৈগ্রাম উত্তর-বঙ্গে দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার সীমান্তে; দামোদরপুরও দিনাজপুর জেলায়; কিন্তু প্রথমটি কোটিবর্ষ বিষয়ে, দ্বিতীয়টি পঞ্চনগরী বিষয়ে, এবং দুই স্থানে প্রতি কুল্যবাপের মূল্যের পার্থক্য এক দীনার। ৩নং দামোদরপুর পট্টোলীর চণ্ডগ্রাম কোন্ বিষয়ে অবস্থিত ছিল, তাহার উল্লেখ নাই; কিন্তু প্রতি কুল্যবাপের মূল্য দুই দীনার দেখিয়া অনুমান হয় চণ্ডগ্রাম ছিল পঞ্চনগরী বিষয়ে। এই অনুমানের অন্যতম কারণ, চণ্ডগ্রাম বৈগ্রাম বা বায়ীগ্রামের একেবারে পাশাপাশি গ্রাম। পাহাড়পুর পট্টোলীর দত্তভূমিও কোন্ বিষয়ে অবস্থিত তাহার উল্লেখ নাই; কিন্তু এক্ষেত্রেও ভূমির মূল্য দুই দীনার; এবং পাহাড়পুর বৈগ্রাম হইতে মাত্র উনিশ কুড়ি মাইল। অনুমান করা চলে, পাহাড়পুরও পঞ্চনগরী-বিষয়েই অবস্থিত ছিল। যাহা হউক, একথা সহজেই বুঝা যাইতেছে, এক এক বিষয়ে ভূমির মূল্য ছিল এক এক প্রকার—যেমন, পঞ্চনগরীবিষয়ে দুই দীনার, কোটিবর্ষবিষয়ে তিন দীনার, ফরিদপুর অঞ্চলে চারি দীনার। ইহার অন্য একটি প্রমাণ দেখিতেছি, প্রায় প্রত্যেকটি পট্টোলীতেই "ইহ বিষয়ে···দীনারিক্যবিগ্রয়োমুবৃত্তঃ" বা এই জাতীয় কোনো পদের উল্লেখের মধ্যে। ভূমির মূল্য বৃদ্ধির হার কিরূপ ছিল তাহা বলিবার কোনো উপায় নাই, তবে ভূমির চাহিদা যে-ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাতে মূল্যও যে ক্রমশ বাড়িতেছিল, এরূপ অনুমান করিলে খুব অন্যায় হয় না। কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধি সম্ভবত খুব তাড়াতাড়ি হয় নাই। আমরা তো আগেই দেখিয়াছি, কোটীবর্ষবিষয়ে শতাধিক বর্ষ ধরিয়া জমির দাম একই ছিল; সে-প্রমাণও ধর্মাদিত্য এবং গোপচন্দ্রের পট্টোলী তিনটিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে দামের পার্থক্যও আগেই দেখিয়াছি। এই পার্থক্য খানিকটা যে ভূমির উর্বরতা, চাহিদা এবং স্থানীয় জীবিকামান-সমৃদ্ধির উপর নির্ভর করিত, এ-অনুমান সহজেই করা চলে। পঞ্চনগরীবিষয়ের তুলনায় কোটিবর্ষবিষয়ের সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই বেশি ছিল, এবং কোটিবর্ষের তুলনায় প্রাক্‌সমুদ্রশায়ী দেশগুলি সমৃদ্ধতর ছিল। ধর্মাদিত্য এবং গোপচন্দ্রের পট্টোলী তিনটিতে ভূমির দাম প্রতি কুল্যবাপে চারি দীনার। ১নং পট্টোলীতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, প্রাক্‌সমুদ্রশায়ী দেশগুলিতে ইহাই ছিল প্রচলিত মূল্য; ২নং এবং ৩নং পট্টোলীতেও পূর্বদেশে ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের ("প্রাক্-ক্রিয়মাণক" এবং "প্রাক্-প্রবৃত্তি") এই নিয়মের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। "প্রাক্" বলিতে এই তিন ক্ষেত্রেই সাগরশায়ী দেশগুলিকে বুঝাইতেছে, নিঃসংশয়ে এই অনুমান করা চলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে, সর্বত্র খিল, ক্ষেত্র এবং বাস্তুভূমির একই মূল্য। বাস্তুভূমি অপেক্ষা ক্ষেত্রভূমি, এবং ক্ষেত্রভূমির অপেক্ষা খিলভূমির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হওয়াই তো স্বাভাবিক, অথচ একটি লিপিতেও তেমন ইঙ্গিত নাই, বরং সর্বত্র সকল প্রকার ভূমির দাম একই, এই কথারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।*

---

* নারদ ও বৃহস্পতির মতে—১ দীনার = ১২ ধানক, ১ ধানক = ৪ আণ্ডিকা, ১ আণ্ডিকা = ১ কার্ষাপণ (তাম্রমুদ্রা)। অমরকোষের মতে—১ দীনার = ১ নিষ্ক। বৃহস্পতির মতে—১ নিষ্ক = ৪ সুবর্ণ।

অর্থনীতির মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন মুদ্রার মূলগত মূল্য নির্ভর করে ক্রয়শক্তির তারতম্যের উপর। আজিকার দিনে এক টাকায় বা একটি মোহরে কোনো বস্তু যে-পরিমাণ ক্রয় করা যায়, ১০০ বৎসর আগে তাহার অনেক বেশি পাওয়া যাইত, এবং ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড দেখাইয়াছেন, আকবরের আমলে ১৯১২ খ্রীষ্টশতকের চেয়ে অন্তত ছয়গুণ বেশি পাওয়া যাইত। সেই হেতু অনুমান করা চলে, প্রাচীন বাংলায় একটি রৌপ্যমুদ্রার ক্রয়শক্তি আকবরের আমল অপেক্ষাও অন্তত কয়েকগুণ বেশি ছিল। প্রাচীন বাংলায় ১৬টি রৌপ্যকে ছিল ১ দীনার, অর্থাৎ তখনকার ১ দীনার বর্তমান ভারতবর্ষের অন্তত ৯৬ টাকার কম কিছুতেই ছিল না, এ-কথা জোর করিয়াই বলা যায়। বর্তমানের মুদ্রায় পঞ্চনগরী বিষয়ের এক কুল্যবাপ ভূমির মূল্য সেই হেতু অন্ততঃ ১৯২ টাকা, কোটিবর্ষ বিষয়ে অন্ততঃ ২৮৮ টাকা, এবং ফরিদপুর অঞ্চলে অন্তত ৩৮৪ টাকার কম কিছুতেই ছিল না। তখনকার দিনে এই মুদ্রা-পরিমাণ কম নয়।

পরবর্তী যুগে অর্থাৎ পাল ও সেন-আমলে ভূমির মূল্য কিরূপ ছিল, তাহা বলিবার উপায় বিশেষ নাই, তবে বিশ্বরূপসেনের একটি লিপিতে এবং কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপিতে এই মূল্যের খানিকটা ইঙ্গিত আছে বলিয়া যেন মনে হয়। রাজা কেশবসেন ইদিলপুর-শাসনদ্বারা জনৈক ব্রাহ্মণকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বঙ্গের বিক্রমপুর ভাগে তালপড়া-পাটক নামে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই গ্রামের ভূমির পরিমাণ কত ছিল, তাহার উল্লেখ নাই, তবে চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন এই গ্রামটির বার্ষিক আয় (না, মোট মূল্য?) যে ২০০ শত মুদ্রা ছিল, তাহার উল্লেখ আছে। এই মুদ্রা খুব সম্ভব কপর্দকপুরাণ। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদ্ লিপিতে ৩৩৬½ উন্মান ভূমি দানের উল্লেখ আছে; ছয়টি গ্রামে এগারটি ভূখণ্ডে এই পরিমাণ ভূমির মোট বার্ষিক আয় (না, মোট মূল্য?) ছিল পাঁচ শত পুরাণ। সমসাময়িক অন্যান্য লিপির সাক্ষ্য দেখিয়া মনে হয়, সর্বত্রই আমরা যাহা পাইতেছি, তাহা দত্ত ভূমির বার্ষিক আয়, ভূমির মোট মূল্য নয়, এবং এই আয়ের পরিমাণ দেওয়া হইতেছে পুরাণ অথবা কপর্দকপুরাণ মুদ্রায়। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-তাম্রশাসনে এবং আরও দুই একটি শাসনে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, প্রতি দ্রোণের বার্ষিক আয় মোটামুটি ১৫ পুরাণ হিসাবে ৬০ দ্রোণ ১৭ উন্মান ভূমির বিড্ডারশাসন গ্রামের মোট বার্ষিক আয় ৯০০ পুরাণ (ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নো তদ্দেশীয়সংব্যবহারষট্‌পঞ্চাশৎহস্তপরিমিতনলেন সপ্তদশোন্মানাধিকষষ্টি-ভূ-দ্রোণাত্মক প্রতি দ্রোণে পঞ্চদশ-পুরাণোৎপত্তি-নিয়মে বৎসরেণ নবশতোৎপত্তিকঃ বিড্ডারশাসনঃ...)। এই বার্ষিক আয় হইতে ভূমির মোট মূল্য কি হইতে পারে, তাহা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

৬

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা বাড়ে, বিশেষভাবে কৃষিপ্রধান দেশে, ইহা তো প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু না থাকিলেও এই অনুমান কিছু কঠিন নয় যে, প্রাচীন বাংলায়ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা বাড়িতেছিল। যে-সময় হইতে লিপি-প্রমাণ আমরা পাইতেছি, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে ইহার কিছু কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। পাহাড়পুর-লিপিতে দেখিতেছি, জনৈক ব্রাহ্মণ নাথশর্মা ও তাঁহায় স্ত্রী রামী ১ কুল্যবাপ ও ৪ দ্রোণবাপ ভূমি কিনিয়া দান করিতেছেন বট-গোহালীর একটি জৈন বিহারে, সেই বিহারের পূজার্চনাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য। এই অনুমান খুবই স্বাভাবিক যে, সেই বিহারের নিকটবর্তী ভূমিই এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা উপযোগী হইত, আর নিকটবর্তী ভূমি যদি একান্তই পাওয়া সম্ভব না হইত, তাহা হইলে সমগ্র পরিমাণ ভূমি একই জায়গায় একই ভূখণ্ডে পাইলে ভাল হইত। নাথশর্মা কিন্তু তাহা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই; তাঁহাকে ১ কুল্যবাপ ৪ দ্রোণ ভূমি সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল পাশাপাশি চারিটি গ্রাম হইতে; পৃষ্টিমপোষক, গোষাটপুঞ্জক এবং নিত্বগোহালী গ্রামত্রয় হইতে যথাক্রমে ৪, ৪ এবং ২½ দ্রোণ এবং বটগোহালী গ্রাম হইতে ১½ দ্রোণ বাস্তুভূমি। এই অনুমান অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়া পড়ে যে, ভূমির চাহিদা এত বেশি হইয়াছিল যে, একটি গ্রামে একসঙ্গে ১ কুল্যবাপ ৪ দ্রোণ ভূমি সংগ্রহ করার সুযোগ এই দম্পতি পান নাই। বৈগ্রাম-পট্টোলীতে দেখিতেছি, দুই ভাই ভোয়িল এবং ভাস্কর একই ধর্মপ্রতিষ্ঠানে কিছু ভূমি দান করিলেন; তাহাও দুই জনে সংগ্রহ করিলেন দুই গ্রামে, এক গ্রামে ভোয়িল কিনিলেন তিন কুল্যবাপ খিলভূমি, আর এক গ্রামে ভাস্কর কিনিলেন ১ দ্রোণবাপ বাস্তুভূমি। (অবান্তর হইলেও একটা প্রশ্ন এখানে মনকে অধিকার করে। একই পিতার দুই পুত্র পৃথকভাবে পৃথক পৃথক্ গ্রামে ভূমি ক্রয় করিলেন কেন—বিশেষত দানের পাত্র এবং উদ্দেশ্য যেখানে এক? একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শে কোথাও ফাটল ধরিয়াছিল কি?) গুণাইঘর-লিপিতেও দেখি, ১১ পাটক ক্রয়যোগ্য খিলভূমি যদিও একই গ্রামে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহা একসঙ্গে এক ভূখণ্ডে পাওয়া যাইতেছে না, যাইতেছে পাঁচটি পৃথক ভূখণ্ডে। ৫নং দামোদরপুর পট্টোলীদ্বারা যে ৫ কুল্যবাপ ভূমি বিক্রীত হইতেছে, তাহাও চারিটি বিভিন্ন গ্রামে। আশ্রফপুর-পট্টোলীদ্বারা সংঘমিত্রের বিহারে যে-ভূমি দেওয়া হইতেছে, সেখানে দেখিতেছি, প্রথম দফায় ৯ পাটক ১০ দ্রোণ ভূমি ৭টি পাড়া বা গ্রামে, দ্বিতীয় দফার ৬ পাটক ১০ দ্রোণ ভূমি ৮টি পাড়া বা গ্রামে। এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে সহজেই জনসাধারণের মধ্যে ভূমির চাহিদার পরিমাণ অনুমান করিতে পারা যায়। প্রতিষ্ঠিত গ্রাম ও জনপদগুলিতে প্রায় সমগ্র পরিমাণ ভূমিতেই জনপদবাসীদের বসতি এবং চাষবাস ইত্যাদি ছিল, কাজেই কোনো গ্রামেই এক সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ ভূমি

ভূমির চাহিদা

সহজলভ্য ছিল না, এই অনুমান অসংগত নয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যানুযায়ী বন, অরণ্য ইত্যাদি কাটিয়া নূতন গ্রাম ও বসতির পত্তন করাও যে প্রয়োজন হইতেছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ত্রিপুরা জেলার লোকনাথের পট্টোলীতে।

পরবর্তী কালেও এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রমাণ দুর্লভ নয়। ধুল্লা-পট্টোলী দ্বারা রাজা শ্রীচন্দ্র ১৯ হল ৬ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন শান্তিবারিক ব্যাসগঙ্গশর্মাকে, কিন্তু এই ভূমিও সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল পাঁচটি গ্রাম হইতে। চট্টগ্রাম-পট্টোলীদ্বারা রাজা দামোদরদেব মাত্র পাঁচ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাহাও দুই গ্রামে। ভাটেরা-লিপিদ্বারা ভট্টপাটকের শিবমন্দিরের সেবার জন্য যে ২৯৬টি বাড়ি এবং ৩৭৫ হল ভূমি দেওয়া হইতেছে, তাহা ২৮টি বিভিন্ন গ্রামে বিস্তৃত। সাহিত্য-পরিষদ্-পট্টোলীদ্বারা রাজা বিশ্বরূপসেন জনৈক আবল্লিক পণ্ডিত হলায়ুধ শর্মাকে ৩৩৬½ উন্মানভূমি দান করিয়াছিলেন ছয়টি বিভিন্ন গ্রামে ১১টি পৃথক্ পৃথক্ ভূখণ্ডে। বিশ্বরূপসেনের এই পট্টোলীটির সাক্ষ্য অন্য দিক্ হইতেও খুব উল্লেখযোগ্য। দানসংগ্রহ দ্বারা কোনো কোনো ধর্মপ্রতিষ্ঠান প্রচুর ভূমির অধিকারী হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত দু'একটি আমাদের লিপিগুলিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ নিজের জন্য, হয় ক্রয় করিয়া না হয় দান গ্রহণ করিয়া অথবা উভয় উপায়েই, নিজের প্রয়োজনাধিক ভূমি সংগ্রহ করিয়া ভূমির বড় মালিক হইয়া বসিতেছেন, এমন অন্তত একটি দৃষ্টান্ত বিশ্বরূপসেনের এই লিপি হইতে পাওয়া যায়। আরও আশ্চর্য হইতে হয় এই ভাবিয়া যে, এই ভূম্যধিকারীটি হইতেছেন একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, সাধারণত আমরা যাঁহাদের সর্বপ্রকারে নির্লোভ এবং বিত্তহীন বলিয়া মনে করি! এই আবল্লিক পণ্ডিতটি কি ভাবে ভূমি-সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার একটু পরিচয় লওয়া যাইতে পারে, এবং এই পরিচয়ের মধ্যে ভূমি-সংগ্রহের ইচ্ছা সমাজের মধ্যে কি ভাবে রূপ লইতেছিল, তাহার একটু আভাসও পাওয়া যাইতে পারে।

১। রামসিদ্ধি পাটকে দুইটি ভূখণ্ড, ৬৭¾ উদান পরিমাণ, আয় ১০০ (পুরাণ)। উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি উপলক্ষে রাজার দান।

২। বিজয়তিলক গ্রামে ২৫ উদান, আয় ৬০ (পুরাণ)। কি উপায়ে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা বলা হয় নাই।

৩। অজ্ঞিকুল পাটকে ১৬৫ উদান, আয় ১৪০ (পুরাণ)। হলায়ুধ নিজে এই ভূখণ্ড কিনিয়াছিলেন।

৪। দেউলহস্তী গ্রামে ২৫ উদান, আয় ৫০ (পুরাণ)। কি উপায়ে সংগৃহীত বলা হয় নাই।

২, ৩ ও ৪ নং ভূমি হলায়ুধ চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে রানীমাতার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৫। দেউলহস্তী গ্রামে আরও দুইটি ভূখণ্ড, পরিমাণ ১০ উদান, আয় ২৫ (পুরাণ)।

হলায়ুধ আগে উহা কিনিয়াছিলেন, পরে কুমার সূর্যসেনের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন—কুমারের জন্মদিন উপলক্ষে।

৬। দেউলহস্তী গ্রামেই আরও দুইটি ভূখণ্ড, পরিমাণ ৭ উদান, আয় ২৫ (পুরাণ)। হলায়ুধ আগে উহা কিনিয়াছিলেন, পরে সান্ধিবিগ্রহিক নাঞ্চীসিংহের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৭। ঘাঘরাকাট্টি পাটকে ১২৪ উদান ভূমি, আয় ৫০ (পুরাণ)। হলায়ুধ রাজপণ্ডিত মহেশ্বরের নিকট হইতে উহা কিনিয়াছিলেন।

৮। পাতিলাদিবীক গ্রামে ২৪ উদান, আয় ৫০ (পুরাণ)। উত্থানদ্বাদশী তিথি উপলক্ষে কুমার পুরুষোত্তমসেনের দান।

সর্বসুদ্ধ এই ৩৩৬৪ উন্মান ভূমির বার্ষিক আয় ছিল ৫০০ শত (পুরাণ); তখনকার দিনে এই অর্থের পরিমাণ কম নয়। ব্রাহ্মণপণ্ডিত হলায়ুধ শর্মা বিভিন্ন গ্রামে বিস্তৃত সমগ্র পরিমাণ এই ভূমি রাজার নিকট হইতে ব্রহ্মত্র দানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ভূম্যধিকারী হইয়া বসিয়াছিলেন; রাষ্ট্রকে তাঁহার কোনও করই দিতে হইত না, অথচ তাঁহার প্রজাদের নিকট হইতে সমস্ত করই তিনি পাইতেন। পাল ও সেনবংশীয় রাজারা ও অন্যান্য ছোটখাট রাজবংশের রাজারা অনেক সময়ই অনেক ব্রাহ্মণকে যে গ্রামকে-গ্রাম দান করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত তো ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। প্রয়োজনাধিক ভূমির অধিকারী হওয়ার ইচ্ছা, ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া ভূমির স্বত্বাধিকার কেন্দ্রীকৃত হওয়ার ঝোঁক সমাজের মধ্যে কি ভাবে বাড়িতেছিল, এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যে তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

ভূমির ক্রমবর্ধমান চাহিদার ইঙ্গিত কতকটা ভূমির সূক্ষ্ম সীমা-নির্দেশের মধ্যেও পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভূমির সীমা ও পরিমাণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, এবং রাষ্ট্রও এ-সম্বন্ধে কম সচেতন ছিল না। ভূমি দান-বিক্রয়কালে অন্য কাহারও ভূমিস্বার্থ যাহাতে আহত না হয়, এ-সম্বন্ধে প্রজার ও রাষ্ট্রের দৃষ্টি খুবই সজাগ ছিল। তাহা ছাড়া, প্রত্যেকটি লিপিতেই ভূমি-সীমা এত সূক্ষ্মভাবে ও সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে যে, পড়িলেই মনে হয়, সূচ্যগ্র ভূমিও কেহ সহজে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইতেন না। কালের অগ্রগতির সঙ্গে এই চেতনাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অষ্টমশতক-পূর্ব লিপিগুলিতে এই সীমা-বিবৃতি খুব বিস্তৃত নয়; কিন্তু পরবর্তী লিপিগুলিতে ক্রমশ এই বিবৃতি দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইবার দিকে ঝোঁক অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

তাহা ছাড়া ভূমির পরিমাপের বর্ধমান সূক্ষ্মতাও ক্রমবর্ধমান চাহিদার দিকে ইঙ্গিত করে। অষ্টমশতকপূর্ব লিপিগুলিতে ভূমি-পরিমাপের নিম্নতম ক্রম হইতেছে আঢ়বাপ বা আঢ়কবাপ, কিন্তু সেন-আমলের লিপিগুলিতে দেখা যায়, নিম্নতম ক্রম আঢ়বাপ হইতে উন্মান, উন্মান হইতে কাকিণী পর্যন্ত নামিয়াছে। ভূমির চাহিদা যতই বাড়িতেছিল, লোকেরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশ সম্বন্ধেও ক্রমশ সজাগ হইয়া উঠিতেছিল, এই অনুমানই স্বাভাবিক।

৭

আগেই বলিয়াছি, ভূমি দান-বিক্রয়কালে সীমা-নির্দেশ খুব সূক্ষ্মভাবে ও সবিস্তারেই করা হইত। প্রস্তাবিত ভূমি দান-বিক্রয়ে যাহাতে গ্রামবাসীদের বসতি অথবা কৃষিকর্মের কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, তাহা প্রজারা তো দেখিতেনই, স্থানীয় অধিকরণও এ-সম্বন্ধে সচেতন থাকিত। পাহাড়পুর-পট্টোলীতে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, প্রস্তাবিত পরিমাণ ভূমি এমন ভাবে নির্বাচিত ও চিহ্নিত করিতে হইবে, যাহাতে গ্রামবাসীদের কাজকর্মে কোনও প্রকার অসুবিধা না হয় ("স্বকর্মাবিরোধেন")। ভূমির সীমা নির্দেশ কি করিয়া করা হইত, তাহার একটু ইঙ্গিত বৈগ্রাম-পট্টোলীতে পাওয়া যায়। তুষের ছাই ইত্যাদি চিরকালস্থায়ী বস্তুদ্বারা চারিদিকের সীমা চিহ্নিত করাই ছিল প্রচলিত রীতি ("চিরকালস্থায়ি-তুষারাঙ্গাদি-চিহ্নৈর্চতুর্দিশো নিয়মা")। খুব সম্ভব, চারিদিকে লাইন ধরিয়া মাটি খুঁড়িয়া, তুষের ছাই ইত্যাদি দিয়া গর্ত ভরাট করা হইত; তাহার ফলে এই সীমারেখার উপর কোনও ঘাস, গাছ ইত্যাদি জন্মাইত না, এবং এই অপ্রসূ অনুর্বর রেখাই সীমা-নির্দেশের কাজ করিত। মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত লিপিতে পদ্মবীচির মালা চিহ্নিত (কমলাক্ষমালাঙ্কিত) খুঁটি বা কীলকদ্বারা সীমা-নির্দেশ করার আর এক প্রকার রীতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সীমা চিহ্নিত করিবার এই রীতি তো ছিলই। তাহা ছাড়া গাছ, খাল, নালা, জোলা, নদী, পুষ্করিণী, মন্দির ইত্যাদি দ্বারাও সীমা নির্দিষ্ট হইত। যেখানে সমগ্র গ্রাম দান-বিক্রয়ের বস্তু, সেখানে গ্রামসীমা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। যেখানে খণ্ড খণ্ড ভূমি দান-বিক্রয় হইতেছে, সেখানেও প্রস্তাবিত ভূমির সীমা অন্য ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ("অপবিঞ্ছা", ৩নং দামোদরপুর-লিপি) কমবেশি সবিস্তারে নির্দেশ করা হইয়াছে। অষ্টমশতকপূর্ব উত্তর-বঙ্গের লিপিগুলিতে এই ধরনের সীমা-নির্দেশ অনুপস্থিত, কিন্তু সমসাময়িক কালের নিম্ন ও পূর্ববঙ্গের লিপিগুলিতে ভূমি-সীমা নির্দেশ সুবিস্তারিত। এই সীমা-নির্দেশের দুই চারিটি দৃষ্টান্তের পরিচয় লওয়া যাইতে পারে।

ভূমির সীমা নির্দেশ

বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর-পট্টোলীতে পাঁচটি বিভিন্ন ভূমিখণ্ডের সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রথম ভূমিখণ্ডটি ৭ পাটক ৯ দ্রোণ; ইহার পূর্ব দিকে গুণিকাগ্রহার (বর্তমান গুণাইঘর) গ্রামের সীমা এবং বিষ্ণুবর্ধকির ক্ষেত্র; দক্ষিণে মৃদুবিলালের ক্ষেত্র এবং রাজবিহারক্ষেত্র; পশ্চিমে সূরীনশীর পূর্নেকের ক্ষেত্র; উত্তরে দোষীভোগ পুষ্করিণী এবং বম্পিয়ক ও আদিত্যবন্ধুর ক্ষেত্রসীমা। দ্বিতীয় খণ্ডটি ২৮ দ্রোণবাপ; ইহার পূর্ব দিকে গুণিকাগ্রহার গ্রামসীমা, দক্ষিণে পক্ববিললের ক্ষেত্র; পশ্চিমে রাজবিহারক্ষেত্র; উত্তরে বৈন্য···র ক্ষেত্র। তৃতীয় খণ্ডটি ২৩ দ্রোণ; ইহার পূর্বদিকে···র ক্ষেত্র, দক্ষিণে···র ক্ষেত্রসীমা, পশ্চিমে জোলারির ক্ষেত্রসীমা, উত্তরে নগিজোদকের ক্ষেত্র। চতুর্থ খণ্ডটি ৩০ দ্রোণ; ইহার পূর্বদিকে বুদ্ধ·কের ক্ষেত্রসীমা, দক্ষিণে কলকের ক্ষেত্রসীমা, পশ্চিমে সূর্যের ক্ষেত্রসীমা, উত্তরে মহীপালের ক্ষেত্রসীমা।

পঞ্চম খণ্ডটি ১১ পাটক; ইহার পূর্বদিকে খন্দবিদুগ্‌গরিকের ক্ষেত্র, দক্ষিণে মণিভদ্রের ক্ষেত্র, পশ্চিমে যজ্ঞরাতের ক্ষেত্রসীমা, উত্তরে নাদড়দক গ্রামের সীমা। যে মহাযানিক অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘবিহারে এই ভূমি দান করা হইয়াছিল, সেই বিহারসংলগ্ন কিছু নিম্নভূমি ছিল, তাহার সীমাও সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে: পূর্বে চূড়ামণি ও নগরশ্রী নৌযোগের (নৌকা বাঁধিবার জায়গা) মাঝখানের জোলা, দক্ষিণে গণেশ্বর বিললের পুষ্করিণীর সঙ্গে যুক্ত নৌখাট (নৌকা রাখিবার খাল), পশ্চিমে প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরের মাঠ, উত্তরে প্রডামার-নৌযোগখাট। বিহারের কিছু হজ্জিক খিল (হাজা, অনুর্বর) ভূমিও ছিল; তাহার সীমা পূর্বে প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরের মাঠ, দক্ষিণে বৌদ্ধ আচার্য জিতসেনের বিহারক্ষেত্র-সীমা, পশ্চিমে হচাত খাল, উত্তরে দন্তপুষ্করিণী। ধর্মাদিত্যের ১নং ও ২নং পট্টোলীতে, এবং বপ্যঘোষবাট-পট্টোলীতে দত্ত ও বিক্রীত ভূমিসীমা এইভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে: ২নং পট্টোলীর ভূমিসীমায় পূর্বে সোগ নামক ব্যক্তির তাম্রপট্টীকৃত ক্ষেত্রের সীমা, দক্ষিণে প্রাচীন পট্টকি (পর্কটী=পাকুড়) বৃক্ষচিহ্নিত সীমা, পশ্চিমে গোযান চলাচলের রাস্তা এবং উত্তরে গর্গ স্বামীর তাম্রপট্টীকৃত ক্ষেত্রের সীমা। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রপট্টে দত্ত ক্রৌঞ্চশ্বভ্র গ্রামটির সীমা এবং তৎসংলগ্ন আরও তিনটি গ্রামের নাম সুস্পষ্ট ও সবিস্তারে দেওয়া হইয়াছে; ইহার সীমা—পশ্চিমে গঙ্গিনিকা বা গাঙ্গিনা, উত্তরে কাদম্বরী (সরস্বতী) দেবমন্দির ও খেজুরগাছ, পূর্বোত্তরে রাজপুত্র দেবটকৃত আলি, [এই আলি] বীজপুরকে গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পূর্বদিকে বিটককৃত আলি খাটক-যানিকাতে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পর জম্বুযানিকা আক্রমণ করিয়া জম্বুযানক পর্যন্ত গিয়াছে, তথা হইতে নিঃসৃত হইয়া পুণ্যারাম বিল্বার্ধস্রোতিকা পর্যন্ত গিয়াছে। সেখান হইতে নিঃসৃত হইয়া নলচর্মটের উত্তর সীমা পর্যন্ত গিয়াছে। নলচর্মটের দক্ষিণে নামুণ্ডি-কায়িকা···হইতে খণ্ডমুণ্ডমুখ পর্যন্ত, তথা হইতে বেদস-বিল্বিকা, তাহার পরে রোহিতবাটী-পিণ্ডারবিটি-জোটীকা-সীমা, উক্তারযোটের দক্ষিণ এবং গ্রামবিল্বের দক্ষিণ পর্যন্ত দেবিকা সীমাবিটি ধর্মজোটিকা। এই প্রকার মাঢ়া-শাল্মলী নামক গ্রাম। তাহার উত্তরেও গঙ্গিনিকার সীমা; তাহার পূর্বে অর্ধস্রোতিকার সহিত [মিলিত হইয়া] আম্রযানকোলার্ধযানিকা পর্যন্ত গিয়াছে। তাহার দক্ষিণে কালিকা-শ্বভ্র, তথা হইতেও নিঃসৃত হইয়া শ্রীফলভিষুক পর্যন্ত গিয়াছে। তাহার পশ্চিমে [গিয়া] বিল্বঙ্গর্ধস্রোতিকার গঙ্গিনিকায় গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পালিতকের সীমা দক্ষিণে কাণা-দ্বীপিকা, পূর্বে কোষ্ঠিয়া-স্রোত, উত্তরে গঙ্গিনিকা, পশ্চিমে জেনন্দায়িকা; এই গ্রামের শেষ সীমায় পরকর্মকৃদ্বীপ স্থালীক্কটবিষয়ের অধীন আম্রষণ্ডিকামণ্ডলের অন্তর্গত গো-পিপ্পলী গ্রামের সীমা, পূর্বে উড়্রগ্রামমণ্ডলের * সীমায় অবস্থিত গোপথ। পরবর্তী সেন-আমলের লিপিগুলিতে গ্রাম অথবা খণ্ডভূমির সীমা কমবেশি সবিস্তারেই দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সর্বত্রই এই সীমা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট, কোথাও ভুল হইবার

* উড়্রগ্রামমণ্ডলে কি ওড্রদেশবাসিরা অধিকসংখ্যায় বাস করিতেন? তাঁহাদের কলোনি?

সুযোগ নাই। ভূমির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমি লইয়া বাদ-বিসংবাদও হইত, এ অনুমান স্বভাবতই করা যায়; হয়তো এই কারণেও ভূমি-সীমা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন হইয়াছিল।

ভূমির এই সূক্ষ্ম, সুস্পষ্ট ও সবিস্তার সীমানির্দেশ, সুনির্দিষ্ট মূল্য, ভূমি-পরিমাপের মানের ক্রমবর্ধমান সূক্ষ্মতা, বার্ষিক আয়ের পরিমাণ, হলমানদণ্ডের উল্লেখ ইত্যাদি একটু গভীর ভাবে বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিলে স্বভাবতই মনে হয়, ভূমি পরিমাপের, পরিমাণ নির্দেশের, জমি-জরিপ এবং জমির বার্ষিক আয়, জমির মূল্য ইত্যাদি নির্ধারণের কোনো না কোনো প্রকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের ছিল, এবং পুস্তপালের দপ্তরে এই সব বিষয়সংক্রান্ত কাগজ-পত্র যথারীতি রক্ষিত হইত। এই কারণে ভূমি ক্রয়-বিক্রয় প্রস্তাবমাত্রই প্রথমে পুস্তপালের দপ্তরে পাঠাইতে হইত, এবং তিনি কাগজপত্র দেখিয়া দান অথবা ক্রয়বিক্রয়ে সম্মতি দিতেন। পঞ্চম শতকের লিপিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে এই ব্যবস্থা যে আরও সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়মিত হইয়াছিল কর ইত্যাদি ধার্য করিবার উদ্দেশ্যে, মূল্য, আয়, ভূমি-পরিমাণ ইত্যাদি নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে জরিপ ও ভূ-কর নিয়ামক বিভাগের কাজকর্ম যে আরও সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ কোথায়?

৮

সপ্তমশতকপূর্ব লিপিগুলির কোনো কোনোটিতে আমরা ভূমি-দানের অন্যান্য সর্তের মধ্যে একটি সর্ত দেখিয়াছি, "সমুদয়বাহ্যাপ্রতিকর" অথবা "সমুদয়বাহ্যাদি···অকিঞ্চিৎপ্রতিকর", অর্থাৎ রাজা ভূমি দান করিতেছেন কেবল তখনই, যখন তিনি তাহা সকল প্রকারের করবিবর্জিত করিয়া দিতেছেন; তাহা না হইলে মূল্য লইয়া যে-ভূমি বিক্রয় করিতেছেন, তাহাই দান করিতেছেন বলিয়া উল্লেখের আর কোনো অর্থ হয় না। যাহা হউক, রাজা যখন ভূমি করবিবর্জিত করিতেছেন, তখন রাজা দান ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রেই ভূমির ভোক্তাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন, ইহা তো প্রায় স্বতঃসিদ্ধ, এবং এই কর যে নানা প্রকারের ছিল, তাহার ইঙ্গিতও "সমুদয়বাহ্য" এই কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। কর্ষণযোগ্য ও কৃষ্ট ভূমির কর ছিল, বাস্তু-ভূমিরও ছিল, কিন্তু খিল অর্থাৎ কর্ষণের অযোগ্য ভূমির বোধ হয় কোনো কর ছিল না, এই ধরনের ইঙ্গিত আমি আগেই করিয়াছি। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে তাহার প্রমাণও আছে। কর কত প্রকারের ছিল, কি কি ছিল, তাহা এই যুগের লিপিগুলি হইতে জানিবার উপায় নাই, তবে উৎপন্ন শস্যের একষষ্ঠ ভাগ যে রাষ্ট্রের প্রধান প্রাপ্য ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। পাহাড়পুর ও বৈগ্রাম-লিপিতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, কোনও ব্যক্তিবিশেষ যদি রাজার নিকট হইতে ভূমি ক্রয় করিয়া ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে সেই ভূমি দান

ভূমির উপস্বত্ব, কর, উপরিকর ইত্যাদি

করেন, তাহা হইলে রাজা শুধু যে ভূমির মূল্যটুকুই লাভ করেন তাহা নয়, ক্রেতা ভূমিদানের ফলস্বরূপ যে পুণ্য লাভ করেন, দত্ত ভূমি সর্বপ্রকার করবিবর্জিত করিয়া দেওয়াতে রাজা সেই পুণ্যের এক-ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হন। অর্থাৎ, সেই ভূমির উপস্বত্বের এক ষষ্ঠভাগ যে রাজার তাহা এই উল্লেখের মধ্যে সুস্পষ্ট। ধর্মাদিত্যের ১নং পট্টোলীতে এই কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। অন্যান্য কর যাহা ছিল তাহার দু'একটি অনুমান করা যাইতে পারে। যে-ভূমি বিক্রয় করা হইতেছে এবং পরে ক্রেতা দান করিতেছেন, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই লবণাকর, খেয়া পারাপার ঘাট, হাটবাজার, অরণ্য ইত্যাদি-সম্বলিত। এ-গুলির উল্লেখ নিরর্থক নয়। কৌটিল্য ও অন্যান্য অর্থশাস্ত্রকারদের মতে লবণ, অরণ্য ইত্যাদিতে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার ছিল, এবং তাহা হইতে রাজার তথা রাষ্ট্রের নিয়মিত আয় ছিল; এই সব যাহারা ভোগ করিতেন, রাজসরকারে তাঁহাদের কর দিতে হইত। হাটবাজার, খেয়াঘাট হইতেও একপ্রকারে রাজস্ব আদায় হইত, জনসাধারণকেই এই করভার বহন করিতে হইত। রাজা যেখানে ভূমি দান করিতেছেন, এই সব আয়ের স্বার্থ ত্যাগ করিয়াই দান করিতেছেন; অর্থাৎ, প্রতিপক্ষে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, উৎপাদিত শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ ছাড়া অন্যপ্রকারের করও ছিল, এবং পূর্বোক্ত করগুলি তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

রাজা যখন ভূমি দান করিলেন, তখন তিনি সর্বপ্রকার করবিবর্জিত করিয়াই দান করিলেন; তাহার অর্থ এই যে, যিনি বা যে-প্রতিষ্ঠান এই দান গ্রহণ করিলেন, তিনি বা সেই প্রতিষ্ঠান সেই ভূমির সকল প্রকারের উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। নিম্নপ্রজা যদি কেহ সেই ভূমি ভোগ করেন, তাহা হইলে তিনি দানগ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রকার কর, উৎপাদিত শস্যের ভাগ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রদান করিবেন, রাজা বা রাষ্ট্রকে নয়। ইহা ছাড়া রাজার ভূমিদানের কোনো অন্য অর্থ হইতে পারে না। এই কথাটা পরবর্তী কালের লিপিগুলিতে খুব স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

ভূমির উপস্বত্ব সম্বন্ধে উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটি কথারই সবিস্তার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে পরবর্তী কালের লিপিগুলিতে। প্রথমেই দেখিতেছি, রাজা যখন ভূমি দান করিতেছেন, তখন সমস্ত 'রাজভাগভোগকরহিরণ্যপ্রত্যায়'স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দান করিতেছেন, অর্থাৎ দানগ্রহীতাকে এ-সব কিছুই রাষ্ট্রকে বা রাজাকে দিতে হইবে না, সুস্পষ্ট বলিয়া দিতেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলিয়া দিতেছেন যে, সেই ভূমির ক্ষেত্রকর ইত্যাদি অন্যান্য প্রকারের ভোক্তা যাহারা আছে বা হইবে, তাহারা যেন রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বিধিমত যথোচিত করপিণ্ডকাদি এবং অন্যান্য সকল প্রকার প্রত্যায় দানগ্রহীতাকে অর্পণ করেন ("প্রতিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরৈশ্চাজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ৈর্ভূত্বা সমুচিতকরপিণ্ডকাদিসর্বপ্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য ইতি"—খালিমপুর-লিপি)। রাজভোগ্য বা রাষ্ট্রকে দেয় কয়েকটি উপস্বত্বের উল্লেখ এই লিপিগুলিতে পাওয়া যায়:—ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য। এই কথা কয়টির অর্থ জানা প্রয়োজন।

ভাগ—ভাগ বলিতে রাজার বা রাষ্ট্রের প্রাপ্য উৎপাদিত শস্যের ভাগ বুঝায়। ধর্মপালের খালিমপুর-লিপিতে 'ষষ্ঠাধিকৃত' নামে একজন রাজপুরুষের উল্লেখ আছে; খুব সম্ভব, ইনিই রাজার প্রাপ্য এক-ষষ্ঠভাগ সংগ্রহ করিতেন। শুধু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা অন্যান্য স্মৃতি-গ্রন্থেই যে রাজার এই ষষ্ঠ ভাগ প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, তাহাই নয়; আগেকার লিপি-প্রমাণের মধ্যেও দেখিয়াছি, উৎপাদিত শস্যের একষষ্ঠ ভাগই ছিল রাজার প্রাপ্য।

ভোগ—খুব সম্ভব, ফল ফুল কাঠ ইত্যাদি যে সব দ্রব্য মাঝে মাঝে রাজাকে তাঁহার ব্যক্তিগত ভোগের জন্য দেওয়া হইত, তাহারই নাম ছিল ভোগ। বাংলা দেশের লিপিগুলিতে সর্বত্রই উল্লেখ আছে, ভূমি দানকালে তৎসংলগ্ন মহুয়া, আম, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি গাছ ও অন্যান্য ঝাটবিটপ ইত্যাদি সমস্তই সঙ্গে সঙ্গে দান করা হইত। তাহা হইতে এ অনুমান অসংগত নয় যে, এই সব ফল ফুল কাঠ বাঁশ হইতে একটা নিয়মিত আয়ের অংশ রাজার ভোগ্য ছিল।

কর—মুদ্রায় দেয় রাজস্ব অর্থে কর। অর্থশাস্ত্রে তিন প্রকার করের উল্লেখ আছে। (১) রাজার প্রাপ্য শস্যভাগ ছাড়া নির্ধারিত কালে নিয়মিত ভাবে দেয় মুদ্রাকর; (২) আপৎকালে অথবা অত্যায়িক কালে দেয় মুদ্রাকর; (৩) বণিক্ ও ব্যবসায়ীদের লাভের উপর দেয় কর। প্রাচীন বাংলায়ও বোধ হয়, এই তিন প্রকার করই প্রচলিত ছিল।

হিরণ্য—হিরণ্য অর্থে স্বর্ণ। এই হিরণ্য সর্বদাই উল্লিখিত হইয়াছে ভাগ-ভোগ-করের সঙ্গে। কিন্তু ইহার সবিশেষ অর্থ বুঝিতে পারা কঠিন। কোনো কোনো পণ্ডিত অর্থ করিয়াছেন, রাজা সব শস্যের ভাগ গ্রহণ করিতেন না, তাহার বদলে গ্রহণ করিতেন মুদ্রা, সেই মুদ্রাই হিরণ্য।

পূর্ববর্তী কালে কি হইত বলা কঠিন, কিন্তু সেনরাজাদের আমলে ভূমি-রাজস্ব যে মুদ্রায় দিতে হইত, এ-অনুমান বোধ হয় করা যায়, যদিও সে-মুদ্রা যে কি বস্তু তাহা আমরা আজও জানিনা। এই আমলের প্রত্যেকটি লিপিতেই ভূমির বার্ষিক আয় প্রচলিত মুদ্রায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই রাজস্বের ক্রম ও পরিমাণ জানিবার কোনও উপায় নাই। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-পট্টোলীতে দেখা যাইতেছে, দত্ত ভূমির প্রতি দ্রোণের আয় ছিল ১৫ পুরাণ; কিন্তু বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষৎ-লিপিতে দেখা যায়, একই জায়গায় সমপরিমাণ ভূমির আয় সমান ছিল না; কর্ষণ-যোগ্য ভূমির উৎপাদিত শস্যসম্পদের কমবেশির উপর আয়ের পরিমাণ নির্ভর করিত, এবং ইহা সহজেই অনুমেয় যে, ভূমির রাজস্বও সেই অনুযায়ীই নির্ধারিত হইত।

যাহাই হউক, ভাগ, ভোগ, কর ও হিরণ্য ছাড়া জনসাধারণকে অন্যান্য করও দিতে হইত। এই জাতীয় সব করের উল্লেখ লিপিগুলিতে নাই; কিন্তু কয়েকটি সম্বন্ধে পরোক্ষ

অনুমান সহজেই করা যায়। পাল ও সেন আমলের প্রায় প্রত্যেকটি লিপিতেই "সচৌরোদ্ধরণ" কথাটির উল্লেখ আছে, অর্থাৎ দানগ্রহীতাকে যে সব সুবিধা ও ক্ষমতা দান করা হইত, তাহার মধ্যে চৌরোদ্ধরণ একটি। কথাটির অর্থ করা হইয়াছে এই মর্মে যে, অন্যান্য ক্ষমতার সহিত শান্তিরক্ষার ক্ষমতাও দানগ্রহীতাকে অর্পণ করা হইত। কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন, দানগ্রহীতাকে শান্তিরক্ষার জন্য অর্থাৎ চোর-ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোনও প্রকার কর রাজাকে দিতে হইত না। শেষোক্ত অর্থটিই যেন সমীচীন মনে হয়।

আগেই দেখিয়াছি, "সঘট্ট-সতর" অর্থাৎ ঘাট, খেয়াপারাপার ঘাট ইত্যাদিসহ ভূমি দান করা হইত। এই খেয়া পারাপার ঘাটের একটা রাজস্ব ছিল, এবং পরোক্ষভাবে জনসাধারণকে তাহা বহনও করিতে হইত। যে-সব রাজকর্মচারী এই কর সংগ্রহ করিতেন এবং এই সব ঘাটের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাঁহাদের নাম ছিল তারক অথবা তরপতি। হাট হইতেও এক প্রকারের রাজস্ব আদায় হইত; তাহা সংগ্রহ এবং হাটবাজারের তত্ত্বাবধান যিনি করিতেন, তাঁহার নাম ছিল হট্টপতি (ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ-লিপি)। খালিমপুর এবং অন্যান্য আরও দুই একটি লিপিতে হাটের রাজস্বও যে দানগ্রহীতার প্রাপ্য, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ধর্মপালের খালিমপুর-লিপিতে অন্যান্য করের সঙ্গে পিণ্ডক কথার উল্লেখ আছে। সম্ভবত এই পিণ্ডক এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের পিণ্ডকর একই বস্তু। টীকাকার ভট্টস্বামী বলিতেছেন, সমগ্র গ্রামের উপর যে কর চাপান হইত, তাহাই পিণ্ডকর। বাট, গোবাট, গোচর ইত্যাদির উপরেও বোধ হয় নির্ধারিত হারে কর ছিল; ভূমিদান যখন করা হইতেছে, তখন দানগ্রহীতা এ-সমস্তই ভোগের অধিকার পাইতেছেন, অর্থাৎ নিম্ন প্রজাদের দেয় কর রাজার বদলে তিনিই ভোগ করিবার অধিকার পাইতেছেন। দশ প্রকার অপরাধের জন্যও প্রজাকে জরিমানা দিতে হইত, তাহাও একপ্রকারের রাজস্ব; আগেই সে-কথা উল্লেখ করিয়াছি। উপরিকর নামে আর একটি করের উল্লেখ লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। এই করটি যিনি সংগ্রহ করিতেন, তাঁহার বৃত্তি-নাম ছিল ঔপরিকারক; প্রতিবাসী কামরূপ রাজ্যের নওগাঁ-লিপি হইতে এ-কথা জানা যায়, এবং তিনি যে রাষ্ট্রের অন্যতম কর্মচারী ছিলেন, তাহাও ঐ লিপিটিতে সুস্পষ্ট। উপরিকর বোধ হয় additional tax, অর্থাৎ নিয়মিত কর ছাড়া সময়ে অসময়ে রাষ্ট্র যে সব কর নির্ধারণ করিতেন, অথবা ভূমিরাজস্ব ছাড়া অন্যান্য যে সব অতিরিক্ত কর রাষ্ট্রকে দিতে হইত, তাহাই বোধ হয় উপরিকর। অথবা, নিম্নপ্রজাদের নিকট হইতে রাষ্ট্র যে সব কর সংগ্রহ করিতেন, তাহাও হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন, অস্থায়ী প্রজাকে যে রাজস্ব দিতে হইত তাহাই উপরিকর। যে-ভাবেই হউক, এই উপরিকর রাষ্ট্রের প্রাপ্য ছিল, মধ্যস্বত্বাধিকারীর নয়, তাহা নওগাঁ-লিপিটির সাক্ষ্য হইতেই সপ্রমাণ।

৯

ভূমি-সংপৃক্ত ব্যাপারে প্রজার দায় যাহা কিছু, তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া গেল। এই ব্যাপারে প্রজার অধিকার কি ছিল, তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু সে-আলোচনা করিতে হইলে ভূমি-স্বত্বাধিকারী কে, তাহার আলোচনা অনিবার্য। রাজা বা রাষ্ট্রের সঙ্গে মধ্য-স্বত্বাধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ কি, সে-বিচারও প্রসঙ্গত আসিয়া পড়িবে।

ভূমি-স্বত্বাধিকারী কে? রাজা ও প্রজার অধিকার। খাস ও নিম্ন প্রজা

ভূমির যথার্থ মূল অধিকারী রাজা, না জনসাধারণ, ইহা লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। অতীত কালেও হইয়াছে, এই একান্ত আধুনিক কালেও হইতেছে। ভারতবর্ষেও হইয়াছে, ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেও হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন অর্থশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে এই তর্কের দুই পক্ষেরই বিস্তৃত মতামত পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু এ-তর্ক আমাদের আলোচনায় নিরর্থক। ইহার সন্দেহহীন সুমীমাংসাও কিছু নাই। কাজেই এই বিতর্কের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার আমাদের কোন প্রয়োজনও নাই। আমাদের প্রশ্ন—ভূমির মূল অধিকারী কে, এ সম্বন্ধে নয়; ভূমি-স্বত্বাধিকারী কে, সেই প্রশ্নই আমাদের বিচার্য। কারণ, ভূমির মূল অধিকারী কে, এ-প্রশ্ন লইয়া যত তর্কই থাকুক তাহা জিজ্ঞাসু মনের অনুসন্ধান মাত্র, ঐতিহাসিক যুগে ইতিহাসের বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ না-ও থাকিতে পারে। ভূমি-স্বত্বের অধিকারী হইতেছেন কে, এ-প্রশ্নের উত্তর পাইলেই ঐতিহাসিকের প্রয়োজন মিটিয়া যায়। যুক্তির দিক্ হইতে ভূমির মূল অধিকারী কে ছিলেন, তাহা জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক, কিন্তু মূল অধিকারী যিনি বা যাঁহারাই হউন, ইতিহাসের বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি বা তাঁহারাই যে ভূমি-স্বত্বাধিকারী হইবেন, এমন না-ও হইতে পারে।

ভারতবর্ষে সমাজ-বিবর্তনের স্বাভাবিক ঐতিহাসিক নিয়মে অনুমান করা চলে, অতি প্রাচীন কালে লোকসংখ্যা যখন খুব বেশি ছিল না, এবং ভূমি ছিল প্রচুর, তখন ভূমির অধিকারী কে, এ-প্রশ্ন উঠিবার কোনও অবকাশই ছিল না। লোকের যখন ভূমির প্রয়োজন হইত, তখন সে জঙ্গল কাটিয়া, মাটি ভরাট করিয়া নিজের প্রয়োজনমত ভূমি তৈয়ারি করিয়া লইত। পরের ভূমি লোভ করিবার প্রয়োজন হইত না, ভূমি লইয়া বিবাদেরও কোন অবকাশ হইত না; হইলেও গ্রামবাসীরাই পরামর্শ করিয়া তাহা মিটাইয়া ফেলিত। তারপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কৃষিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা যতই বাড়িতে লাগিল, ভূমি লইয়া বিবাদ-বিসংবাদও ততই বাড়িবার দিকে চলিল। এদিকে রাজা ও রাষ্ট্রযন্ত্রেরও একটা বিবর্তন ঘটিতে লাগিল; রাজা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সমাজ-যন্ত্রের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল। সমাজের রক্ষক ও পালক হইলেন রাজা; সে-রাজা নররূপী দেবতাই হউন বা প্রকৃতিপুঞ্জ দ্বারা নির্বাচিতই হউন, তাহাতে কিছু

আসিয়া যায় না। শান্তিরক্ষার মূল দায়িত্ব তাঁহার, সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের মূল মীমাংসক তিনি, সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র তিনি, সকল ক্ষমতা, দায়িত্ব ও অধিকারের মূল উৎস তিনি। সমাজ-বিবর্তনের যে-স্তরে এই নীতি স্বীকৃত হইল, সেই স্তরে এ-কথাও সমাজের অন্তরে স্বীকৃত হইয়া গেল, ভূমির উপর অধিকারের উৎসও রাজা এবং তিনিই ভূমি-সম্পর্কিত বাদ-বিসংবাদের শেষ মীমাংসক। কিন্তু রাজা বা রাষ্ট্র তাই বলিয়া ভূমির মূল অধিকারী রূপে নিজেদের দাবি করিলেন না; কারণ, আদি প্রাচীন কালেও যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনই, এ-প্রশ্ন উঠিবার কোনও অবকাশই ছিল না। রাজা বা রাষ্ট্র ভূমির এবং ভূমি-সংলগ্ন প্রজার ধারক, রক্ষক ও পালক হিসাবে ধারণ, রক্ষণ ও পালনের পরিবর্তে শুধু ভূমি-স্বত্বের অধিকারিত্বের দাবি করিলেন। কিন্তু এই বিবর্তনের প্রথমাবস্থায় স্বভাবতই এই দাবিও সর্বজনগ্রাহ্য ছিল না, কিংবা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারও এ-সম্বন্ধে ছিল না। ভূমি তখনও খুব দুর্লভ নয়; তাহা ছাড়া গ্রামে গ্রামবাসীদের অনেকটা স্বারাজ্য তো ছিলই। যে-পরিমাণ ভূমি ব্যক্তিগত ভাবে লোকেরা ভোগ করিত, তাহার পরিবর্তে গ্রামের সমাজযন্ত্রকে কিছু উপস্বত্ব দিতেই হইত—সেই সমাজযন্ত্র পরিচালনার জন্য; আর যে সমস্ত ভূমি সমস্ত গ্রামবাসীদেরই প্রয়োজন হইত, যেমন পথ, ঘাট, গোবাট, গোচর ইত্যাদি, তাহা সমগ্র গ্রামেরই যৌথ সম্পত্তি বলিয়া সহজেই লোকেরা মনে করিতে পারিত। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও মূল অধিকারিত্বের কোন প্রশ্ন উঠিবার অবকাশ নাই। বাস্তব ক্ষেত্রে যাহা প্রয়োজিত হইত, তাহাই কালক্রমে প্রয়োগ-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ হইয়া জনসাধারণদ্বারা স্বীকৃত হইত। মূল অধিকারিত্বের দাবি যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা পরবর্তী কালে রাষ্ট্রযন্ত্রের এবং সমাজযন্ত্রের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। আমাদের দেশে মোটামুটি ভাবে মৌর্যসম্রাট্‌দের আমল হইতেই এই বিবর্তন দেখা দিয়াছিল। মৌর্য আমলেই ভারতবর্ষে একটা কেন্দ্রীকৃত কর্মচারিতন্ত্র শাসনব্যবস্থা গড়িয়া উঠে ক্ষমতাসম্পন্ন চক্রবর্তী সম্রাট্‌দের চেষ্টায় ও প্রেরণায়, এবং সমাজ-যন্ত্রের সঙ্গে এই রাষ্ট্রযন্ত্রের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়। ভারতবর্ষের সর্বত্রই একই সঙ্গে ইহা হইয়াছিল, তাহা অবশ্য বলা চলে না; তবে, এই বিবর্তন মৌর্য-আমলের পরে উত্তর-ভারতে সর্বত্রই স্তরে স্তরে ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশ সর্বত্র স্বীকৃত হয়। সমাজযন্ত্রের মধ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই চেতনা জনসাধারণকে অধিকার করিতে আরম্ভ করে যে, রাজা এবং রাষ্ট্রই সমাজ-ব্যবস্থার ধারক ও নিয়ামক। এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ভূমি-ব্যবস্থা অন্যতম প্রধান উপকরণ। বিবর্তনের যে-স্তরে স্বীকৃত হইল যে, রাজা এবং রাষ্ট্রই ভূমির উপর অধিকারের উৎস এবং তিনিই ভূমি-সম্পর্কিত বাদ-বিসংবাদের শেষ মীমাংসক, তাহার পর হইতেই ক্রমশ ধীরে ধীরে এই চেতনা গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিল যে, রাজা ও রাষ্ট্র শুধু ভূমি-ব্যবস্থার নিয়ামক নহেন, দেশের ভূসম্পত্তির মালিকও। ইহার অন্যতম কারণ বোধ হয়, সেচন-ব্যবস্থায় রাজার বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আমাদের দেশ নদী-মাতৃক হইলেও কৃষিকর্ম বহুল পরিমাণে বারিনির্ভর। এই যে লিপিগুলিতে

প্রচুর খাটা, খাড়িকা, খাল ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ ভূমির উর্বরতা বিধানের জন্ম রাষ্ট্রকর্তৃক খনিত, এ-অনুমান বোধ হয় করা চলে। তাহা ছাড়া এই প্রাবনের দেশে বাঁধ, আলি ইত্যাদির বিস্তৃত উল্লেখও রাষ্ট্র-সহায়তার দিকেই ইঙ্গিত করে বলিয়া মনে হয়। রাজারা যে এই সেচন-ব্যবস্থার দায়িত্ব পালন করিতেন, তাহার দু'একটি প্রমাণও আছে; যেমন, বাণগড় লিপিতে রাজ্যপাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তিনি অনেক বড় বড় দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন; "রামচরিতে" রামপাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তিনি নানাপ্রকার জনহিতকর পূর্তকার্য করিয়াছিলেন, খুব বড় বড় পুষ্করিণী খনন করাইয়া দুই ধারে তালগাছ লাগাইয়া পাড় পাহাড়ের মতন উঁচু করিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন, দেখিলে মনে হইত, বুঝিবা সমুদ্র।

"স বিশালশৈলমালাতালবন্ধসমৃদ্ধিং সাক্ষাৎ।
অপি পূর্তং পুষ্করিণীভূতং রচায়ভূব ভূপালঃ॥ (৩।৪২)

পালরাজাদের লিপিমালায় রাজা বা রাষ্ট্র কর্তৃক খনিত বহু দীঘির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধরনের সুদীর্ঘ বিশালকায় হ্রদোপম পুকুরের চিহ্ন বাঁকুড়া, বীরভূম অঞ্চলে, ত্রিপুরা জেলায়, উত্তর-বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক জেলায় এখনও প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়; এই সব পুকুরের জল যে চাষ-আবাদের কাজেই ব্যবহৃত হইত, এবং রাজকীয় অথবা রাষ্ট্রের সাহায্যেই যে এগুলি খনিত হইত, সে-স্মৃতি উত্তর-রাঢ়ে এবং বরেন্দ্রভূমিতে এখনও বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। ধোয়ী কবির "পবনদূত" কাব্যে দেখিতেছি, সেনরাজ বল্লালসেনদেব সুহ্মদেশের কেন্দ্রস্থল গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সংগমে কোথাও একটি সুবৃহৎ বাঁধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন; বাঁধটি তাঁহারই নামের সঙ্গে জড়িত ছিল, এই ইঙ্গিত দিতেও কবি বিস্মৃত হন নাই। যাহাই হউক, মৌর্যযুগের ও পরবর্তী কালের অর্থশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র-রচয়িতারাও রাজা ও রাষ্ট্রই যে ভূসম্পত্তির মালিক তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু এক সময় সমাজই যে ভূমি-ব্যবস্থার নিয়ামক ছিল, সে-স্মৃতিও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল না; থাকিয়া থাকিয়া সে-স্মৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের পাতায়, টীকাকারের ব্যাখ্যায়, প্রচলিত ব্যবহারের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। সাধারণ-ভাবে এই কথা কয়টি মনের পটভূমিতে রাখিয়া, আমাদের প্রাচীন বাংলার লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া, তাহাদের সাক্ষ্য প্রমাণ কি, দেখা যাইতে পারে।

গুপ্ত আমলের যে কয়টি লিপি বাংলা দেশে পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই দেখিতেছি, ভূমি-বিক্রেতা হইতেছেন রাজা বা রাষ্ট্র, এবং বিক্রীত ভূমি ধর্মাচরণোদ্দেশে দত্ত হইতেছে বলিয়া রাজা দানপুণ্যের এক-ষষ্ঠভাগের অধিকারীও হইতেছেন। বস্তুত প্রত্যেকটি লিপিতেই ভূমি-বিক্রয়ের আবেদন জানান হইতেছে রাজা বা রাষ্ট্রযন্ত্রকে; দু'এক ক্ষেত্রে রাজা কর্তৃক বিক্রীত ভূমি দানও করিতেছেন রাজা স্বয়ং ক্রেতার পক্ষ হইতে। তাহা ছাড়া রাজা অনুরুদ্ধ হইয়া অথবা আত্মপ্রেরণায় নিজেও ভূমি দান করিতেন। এই লিপিগুলি

ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিলে স্বতই মনে হয়, রাজা বা রাষ্ট্র শুধু ভূমি-স্বত্বেরই অধিকারী নহেন, ভূমির মূল অধিকারীও। এই স্বত্বাধিকারতত্ত্ব বাংলা দেশে বোধ হয়, গুপ্ত-আমলের পূর্বেই নির্ধারিত ও স্বীকৃত হইয়া গিয়াছিল, এবং আমরা যে-যুগের লিপিগুলির কথা বলিতেছি, সে-যুগে এ-সম্বন্ধে আর কোনো প্রশ্ন ছিল না। তবে, তিনি অধিকারী ছিলেন বলিয়াই ভূমি দান-বিক্রয়ে যথেচ্ছাচরণ করিতে পারিতেন না; দেখিতে হইত, প্রস্তাবিত ভূমি দত্ত বা বিক্রীত হইলে গ্রামবাসীদের কৃষি ও অন্যান্য কর্মের কোনও অসুবিধা হইবে কি না, অন্য কাহারও ভূমিস্বত্ব আহত হইবে কি না। শুধু রাজাই অথবা রাষ্ট্রই যে দেখিতেন, তাহা নয়, গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, কখনো কখনো সাধারণ ব্যক্তিরাও তাহা দেখিতেন। লিপিগুলিতে যে বার বার ভূমিদান-বিক্রয় স্থানীয় মহত্তর, কুটুম্ব, প্রতিবাসী এবং প্রাকৃত জনকে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে, তাহা প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই। বহু ক্ষেত্রে ইঁহারাই ভূমি অন্য ভূমি হইতে পৃথক্ করিয়া সীমা নির্দেশ করিয়া দিতেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ লিপিগুলিতে পাইতেছি, সে-সমস্ত ভূমিই রাজার অথবা রাষ্ট্রের নিজস্ব ভূসম্পত্তি অর্থাৎ খাসমহল, এবং সে খাসমহল দান-বিক্রয়ের অধিকার রাজা বা রাষ্ট্রেরই হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? এ প্রশ্নের সুযোগ হয়তো আছে, কিন্তু যখন দেখা যায়, সর্বত্রই সকল লিপিতেই রাজা হইতেছেন বিক্রেতা বা দাতা, তখন এই অনুমানই মনকে অধিকার করে যে, রাজ্যের সকল ভূমিরই স্বত্বাধিকারী এবং মূল মালিক, দুই-ই ছিলেন রাজা বা রাষ্ট্র। তাহা ছাড়া, লিপিগুলিতে এমন একটি দৃষ্টান্তও পাইতেছি না, যেখানে রাজা বা রাষ্ট্র মূল অধিকারিত্ব ছাড়িয়া দিতেছেন; যাহা পাইতেছি, তাহা তাঁহার স্বত্বাধিকার। ভূমি যখন শুধু বিক্রয় করিতেছেন, তখন স্বত্বাধিকারের দাবি বজায় রাখিতেছেন কর গ্রহণের ভিতর দিয়া; আর যখন শুধু বিক্রয় নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভূমি নিষ্কর করিয়া দান করিয়া দিতেছেন, তখন সেখানে স্বত্বাধিকারিত্বের দাবিও ছাড়িয়া দিতেছেন, কিন্তু সেখানেও তাহার মূল অধিকারিত্ব চলিয়া যাইতেছে না। আমার এই মন্তব্যগুলির সুস্পষ্ট সবিশেষ প্রমাণ অষ্টমশতকপূর্ব বাংলার অন্তত: দুই তিনটি লিপিতে পাওয়া যাইবে। ফরিদপুর জেলায় প্রাপ্ত গোপচন্দ্রের পট্টোলীতে খবর পাওয়া যায় যে, বৎসপাল স্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ এক কুল্যবাপ ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন। লিপিটির অনেক স্থান অবলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় পাঠ নিঃসন্দেহ নয়; কিন্তু যাহা আছে, তাহাতে নিঃসংশয়ে বুঝা যায়, যে এক কুল্যবাপ ভূমি বৎসপাল স্বামী কিনিয়াছিলেন তাহা মহাকোট্টিক...নামীয় কোন ব্যক্তির বা একাধিক ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল, কিন্তু এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রয়ের এবং দানের আবেদনও জানাইতে হইয়াছিল স্থানীয় রাষ্ট্র-প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের নায়কদের। রাজা বা রাষ্ট্র যে ভূমির মূল অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইতেন, এ-সম্বন্ধে তাহা হইলে আর কোন সন্দেহ রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও জানিলাম যে ভূসম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারও ছিল; কিন্তু সে-অধিকার রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা শাসিত ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি

ছিল বলিয়াই কোনো ব্যক্তি যে-কোনো সর্তে যে-কোনো ক্রেতার কাছে ভূমি বিক্রয় করিতে পারিতেন না, কিংবা দানও করিতে পারিতেন না। এই বিক্রয় অথবা দানকর্মের প্রয়োজন হইলে প্রস্তাবিত ক্রেতা বা দানগ্রহীতা রাষ্ট্রের কাছে অর্থাৎ রাষ্ট্রের স্থানীয় অধিকরণ ও প্রধান প্রধান লোকদের কাছে আবেদন করিতেন, এবং তাঁহারাই বিক্রয় ও দানের ব্যবস্থা করিতেন। বস্তুত, কোনো গ্রামে কোনো ক্রেতা বা দানগ্রহীতা ব্যক্তির নবাগমন গ্রামবাসীদের অগোচরে হইতে পারে না, এ-ব্যাপারে রাষ্ট্র অপেক্ষা গ্রামের সমষ্টিগত স্বার্থই অধিকতর বিবেচ্য। এই কারণেই সর্বত্র এই দান-বিক্রয়ের ব্যাপার গ্রামবাসীদের গোচরে ও সাক্ষাতে হওয়াই প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। দেবখড়্গের আশ্রফপুর-পট্টোলীতেও আমার পূর্বোক্ত মন্তব্যগুলির প্রমাণ পাওয়া যাইবে। রাজা দেবখড়্গ বৌদ্ধ আচার্য সংঘমিত্রের বিহারে প্রথম দফায় ৯ পাটক ১০ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, এবং দ্বিতীয় দফায় দান করিয়াছিলেন ৬ পাটক ১০ দ্রোণ। এই ভূমির অধিকাংশই ছিল ব্যক্তিগত অধিকারে, এবং দানের পূর্বাহ্ণ পর্যন্ত বিভিন্ন লোকেরা নিজদের সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন।

১। ২ পাটক ... ভোগ করিতেছিলেন রাজমহিষী শ্রীপ্রভাবতী।

২। ½ (?) „ ... „ „ শুভংস্থকা নামে এক মহিলা।

৩। ১½ „ ... মিত্রবলি নামক জনৈক ব্যক্তির ভূমি, কিন্তু ভোগ করিতেছিলেন সামন্ত বর্ণটিয়োক নামক এক ব্যক্তি।

৪। ১½ „ ... ভোগ করিতেছিলেন শ্রীনেত্রভট।

৫। ১ „ ... ভোগ করিতেছিলেন শর্বান্তর নামক এক ব্যক্তি, কিন্তু চাষ করিতেছিলেন মহত্তর, শিখর প্রভৃতি কর্ষকেরা (শ্রীশর্বান্তরেণ ভুজ্যমানক মহত্তরশিখরাদিভিঃ কৃষ্যমান-[কঃ])।

৬। ১ „ ... ভোগ করিতেছিলেন বন্দ্য জ্ঞানমতি।

৭। ১ „ ... দ্রোণমথিকা নামক জনৈক ব্যক্তির ভূমি।

৮। ½ „ ... ভোগ করিতেছিলেন শক্রক নামক ব্যক্তি। (ইহার এক পাটক ভূমির সবটুকু রাজা গ্রহণ করেন নাই; যে অর্ধপাটকে দুইটি সুপারিবাগান ছিল, সেইটুকু শুধু লইয়া দান করিয়াছিলেন)।

৯। ২০ দ্রোণবাপ অর্থাৎ ½ পাটক—আগে ছিল উপাসক নামক জনৈক ব্যক্তির, এখন ভোগ করিতেছিলেন স্বস্তিয়োক নামীয় জনৈক গৃহস্থ (অর্ধপাটক উপাসকেন ভুক্তকাধুনা স্বস্তিয়োকেন ভুজ্যমানক)।

১০।	২৭ দ্রোণবাপ	···	ভোগ করিতেছিলেন স্থলক্ক এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা।
১১।	১৩ „	···	চাষ করিতেছিলেন রাজদাস এবং দুগ্‌গট নামক দুই ব্যক্তি।
১২।	১ পাটক	···	[এক সময়ে] বৃহৎপরমেশ্বর নামক জনৈক ব্যক্তি দান করিয়াছিলেন; কিন্তু কাহাকে এবং কি উদ্দেশ্যে দান করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই।
১৩।	১ „	···	[এক সময়ে] শ্রীউদীর্ণখড়্গ দান করিয়াছিলেন এবং এখন ভোগ করিতেছিলেন শক্রক নামক জনৈক ব্যক্তি। এই শক্রক এবং পূর্বোক্ত ৮ নম্বরের শক্রক যে একই ব্যক্তি, এই অনুমান সহজেই করা যাইতে পারে।

এই সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যাইতেছে। একটি একটি করিয়া তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমত, রাজা যে-কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাঁহার ইচ্ছামত এবং প্রয়োজনমত কাড়িয়া লইতে পারিতেন। ২নং পট্টোলীটিতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, ৬ পাটক ১০ দ্রোণ ভূমি ব্যক্তিগত অধিকার হইতে কাড়িয়া লইয়া (যথাভুঞ্জনাদপনীয়) সংঘমিত্রের বিহারে দেওয়া হইতেছে। ইহার পরিবর্তে অধিকারী ব্যক্তিদের যথোচিত মূল্য বা ক্ষতিপূরণ কিছু দেওয়া হইয়াছিল কি না, তাহার উল্লেখ লিপিতে নাই; হইলে তাহার উল্লেখ থাকাটাই বোধ হয় স্বাভাবিক ছিল। রাজা বা রাষ্ট্র যদি ভূমির মূল অধিকারী না হইতেন তাহা হইলে এই জাতীয় অধিকারের প্রয়োগ তিনি কিছুতেই করিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়ত, মহিলারাও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতেন (১ ও ২)। তৃতীয়ত, মধ্যস্বত্বাধিকারীর নীচে নিম্নাধিকারী প্রজার একটি স্তর ছিল (৩ ও ৫)। ইহাদের অধিকারের স্বরূপ কি ছিল, বলা কঠিন। ৩ নম্বরের মিত্রবলি ভূমিস্বত্বাধিকারী ছিলেন বুঝা যাইতেছে, কিন্তু ভূমির উপস্বত্ব বোধ হয় ভোগ করিতেছিলেন বর্ণটিয়োক নিম্নপ্রজারূপে। এ-সম্পর্কে তাঁহার কি কি দায় ও মিত্রবলিকে কি কি দেয় ছিল, তাহা অনুমান হয়তো করা যাইতে পারে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলিবার কোনো উপায় নাই। ৫ নম্বরের শর্বান্তর ভূমিস্বত্বাধিকারী ছিলেন, ইহা তো পরিষ্কার, কিন্তু মহত্তর, শিখর প্রভৃতি কৃষক, যাহারা শর্বান্তরের এক পাটক ভূমি চাষ করিতেন, তাঁহাদের দায় ও অধিকার কি ছিল? ইহারা কি বর্তমান কালের ভাগচাষীদের মতন ছিলেন, না কোন প্রকার করের বিনিময়ে চাষবাস করিতেন? তবে, এইটুকু বুঝা যাইতেছে—মহত্তর, শিখর প্রভৃতি কৃষকদের সেই এক পাটক ভূমির উপর কোনো অধিকার ছিল না। চতুর্থত, ব্যক্তিগত অধিকারের ভূমি হস্তান্তরিত হইত, দানেই হউক আর বিক্রয়েই হউক (৯, ১২ ও ১৩)। এই হস্তান্তরের জন্য রাষ্ট্রের অনুমোদন প্রয়োজন হইত কি না, বলিবার উপায় এক্ষেত্রে নাই; তবে পূর্বোক্ত গোপচন্দ্রের পট্টোলীর সাক্ষ্য যদি এ-ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়, তাহা

হইলে রাষ্ট্রানুমোদন ছাড়া এই ধরনের হস্তান্তর সম্ভব ছিল না। পঞ্চমত, একাধিক (দুই বা ততোধিক) ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে একই ভূখণ্ডের অধিকারী হইতে পারিতেন (১০ ও ১১)।

অষ্টমশতকপরবর্তী পাল ও সেন-আমলের লিপিগুলি এইবার বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। আগেই বলিয়াছি, পাল-আমলের প্রায় সবগুলি লিপিই সমগ্র গ্রামদানের পট্টোলী, সেন-আমলেরও কয়েকটি পট্টোলী তাহাই। এই গ্রামগুলি সমস্তই রাষ্ট্রের 'খাসমহল' ছিল, এ-অনুমান খুব স্বাভাবিক নয়; বরং ভূমির মূল অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্র, রাজ্যের যে কোনো ভূমি, তাহা গ্রাম বা যে কোনো ভূমিখণ্ড বা জনপদখণ্ডই হোক, দান-বিক্রয় করিতে পারিতেন, এই মন্তব্যই যুক্তিসংগত, এবং দান যখন করিতেছেন, তখন সেই গ্রামবাসী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তি যাহা আছে তাহা সমেতই দান করিতেছেন; ইহার পর রাজা বা রাষ্ট্রকে যাহা কিছু দেয়, ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির অধিকারীরা তাহা দানগ্রহীতাকে দিবেন, রাষ্ট্রকে আর নয়। কিন্তু এই যে রাজা ইচ্ছা ও প্রয়োজনমত ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তিও দান করিয়া দিতেছেন, ইহাও রাষ্ট্রের মূল অধিকারিত্বের দিকেই ইঙ্গিত করে। ভূমির অধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, সেন-আমলের লিপিগুলিও তাহাই সমর্থন করে। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষৎ-লিপিতে এক সঙ্গে এই জাতীয় অনেক তথ্য পাওয়া যায়; সেই হেতু এই লিপিটিই একটু বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। রাজা বিশ্বরূপসেন জনৈক আবল্লিক পণ্ডিত হলায়ুধ শর্মাকে ১১টি ভূখণ্ডে সর্বসুদ্ধ ৩৩৬½ উন্মান ভূমি দান করিয়াছিলেন, এই ভূখণ্ড কয়টি হলায়ুধ শর্মা কর্তৃক নানা উপায়ে সংগৃহীত হইয়াছিল।

১। দুইটি ভূখণ্ডে ৬৭¾ উন্মান ভূমি উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষে [রাজা?] হলায়ুধকে দান করিয়াছিলেন।

২। ১৬৫ উন্মান ভূমি পূর্বে কোনও সময়ে হলায়ুধ কিনিয়াছিলেন। কাহার নিকট হইতে কিনিয়াছিলেন বলা হয় নাই, তবে ব্যক্তিগত ভূম্যধিকারীর নিকট হইতেই কিনিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। পরে এই ১৬৫ উন্মান, এবং অন্য দুইটি ভূখণ্ডে ৫০ উন্মান হলায়ুধ শর্মা চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে রাজমাতার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩। দুইটি ভূখণ্ডে ৩৫ উন্মান পূর্বে কোনও সময়ে হলায়ুধ কিনিয়াছিলেন; পরে কুমার সূর্যসেন এই ভূমিখণ্ড দুইটি জন্মদিন উপলক্ষে হলায়ুধকে দান করিয়াছিলেন।

৪। দুইটি ভূখণ্ডে ৭ উন্মান পূর্বে কোনও সময়ে হলায়ুধ কিনিয়াছিলেন; পরে সান্ধিবিগ্রহিক নাঞীসিংহ সেই ভূখণ্ড দুইটি হলায়ুধকে দান করিয়াছিলেন।

৫। ১২¾ উন্মান হলায়ুধ শর্মা রাজপণ্ডিত মহেশ্বরের নিকট হইতে কিনিয়াছিলেন।

৬। ২৪ উন্মান কুমার পুরুষোত্তমসেন উত্থানদ্বাদশী তিথি উপলক্ষে হলায়ুধকে দান করিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ হইতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাইতেছে। প্রথমত, ক্রীত ভূমি পরে কাহারও নিকট হইতে দানস্বরূপ গ্রহণ করা যাইত (২, ৩, ৪)। কি উপায়ে তাহা করা হইত লিপিতে বলা হয় নাই, তবে অনুমান হয়, হলায়ুধ কোনো সময়ে মূল্য দিয়া ভূমি কিনিয়াছিলেন, পরে দাতা ক্রীত ভূমির মূল্য হলায়ুধকে অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং হলায়ুধ ক্রীত ভূমি দানস্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, এই সব ভূমি ব্যক্তিগত অধিকারেই ছিল, এবং ব্যক্তিগত অধিকারের বলেই বিক্রীতও হইয়াছিল (২, ৩, ৪,৫)। তৃতীয়ত, ভূমির ব্যক্তিগত অধিকারীরা ভূমি দানও করিতে পারিতেন এবং করিতেনও (২, ৩, ৪, ৫, ৬)। কিন্তু এই দান রাজা যে-অর্থে ভূমি দান করেন, সেই অর্থে নয়; নিষ্কর করিয়া দিবার ক্ষমতা এই ব্যক্তিগত অধিকারীদের নাই, ইঁহারা শুধু ভূমির মধ্যস্বত্বাধিকার অর্থাৎ তাঁহাদের ব্যক্তিগত অধিকার দান করেন, রাজার স্বত্বাধিকার অর্থাৎ কর গ্রহণের অধিকার দান করিবার ক্ষমতা ইঁহাদের নাই। সেই জন্যই হলায়ুধ যখন সমগ্র ৩৩৬½ উন্মান ভূমিই নিষ্কর ভাবে, কোন দায় ঘাড়ে না লইয়া ভোগ করিতে চাহিলেন, তখন রাজার শরণাপন্ন হইলেন এবং রাজাও তাঁহাকে নিষ্কর করিয়া দিয়া সমস্ত ভূমি দান করিলেন, অর্থাৎ, হলায়ুধ শুধু তখনই রাজার ভূমি-স্বত্বাধিকার লাভ করিলেন। এখানেও রাজা যে তাঁহার মূল অধিকার ছাড়িয়া দিলেন, এ-কথা বলা যায় না। লক্ষণসেনের শক্তিপুর শাসনে দেখিতেছি, সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে স্নান করিয়া রাজা ব্রাহ্মণ কুবেরকে ৮৯ দ্রোণ ভূমি দাম করিয়াছিলেন; এই সমুদয় জমির আয় ছিল ৫০০ কপর্দক পুরাণ। এই দান করা হইয়াছিল ক্ষেত্রপাটকের বিনিময়ে; কারণ শেষোক্ত গ্রামটি পিতা বল্লালসেন কর্তৃক জনৈক ব্রাহ্মণ হরিদাসকে দান করা হইয়াছিল। কিন্তু ভুল ধরা পড়িলে রাজা তাহা কোষস্থ অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন, এবং তৎপরিবর্তে কুবেরকে উক্ত গ্রাম দান করিয়াছিলেন। লক্ষণীয় এই যে, ভুল ধরা পড়িলে রাজা দত্তভূমি রাজকোষে বাজেয়াপ্ত করিতেন। এ-ক্ষেত্রেও ভূমির মূল অধিকার যে রাজার তাহাই যেন ইঙ্গিত।

পাল আমলের শাসনগুলিতে দেখা যাইতেছে, প্রস্তাবিত ভূমিদানের সময় রাজা স্থানীয় প্রধান প্রধান লোকদের, কুটুম্ব, প্রতিবাসী, এক কথায় প্রকৃতিপুঞ্জকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "মতমস্তু ভবতাম্" [আমি এই ভূমি দান করিতেছি], আপনাদের সকলের অনুমোদন হউক। কেহ কেহ মনে করেন, গ্রামগোষ্ঠী ভূমির মালিক ছিলেন বলিয়া রাজাকে এই ধরনের অনুমতি লইতে হইত। এ-অনুমান কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। গ্রামগোষ্ঠী ভূমির মালিক হইলে রাজা সেই ভূমি ক্রয় না করিয়া দান কি ভাবে করিতে পারেন? তবে, এ যুক্তি হয় তো কতকটা সার্থক যে, এই "মতমস্তু ভবতাম্" প্রাচীন গোষ্ঠী-অধিকারের সুদূর স্মৃতি বহন করিতেছে; কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ সার্থক বলিয়া মনে হয় না, যখন দেখা যায়, পরবর্তী কালের শাসনগুলিতে একই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "বিদিতমস্তু ভবতাম্", 'আপনারা বিজ্ঞাপিত হউন,' অর্থাৎ ভূমি-দানের ব্যাপারটি গ্রামবাসীদের বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে মাত্র। এই

বিজ্ঞাপন করা কেন প্রয়োজন হইত, তাহা তো আগেই পরিষ্কার [illegible]। আসল কথা, "মতমস্তু ভবতাম্" এবং "বিদিতমস্তু ভবতাম্" এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল বলিয়া মনে করিবার কোনো কারণ নাই। সেন আমলে বিজ্ঞাপিত করিবার প্রয়োজনে যে-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে "বিদিতমস্তু", পাল আমলে সেই প্রসঙ্গেই সৌজন্য প্রকাশ করিয়া বলা হইত "মতমস্তু"।

ভূমি-সংক্রান্ত কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য

ভূমির চাহিদা সমাজে ক্রমশ কি করিয়া বাড়িয়াছে তাহার কিছু কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ আগেই উল্লেখ করিয়াছি; এই চাহিদা বৃদ্ধির ইঙ্গিত বাস্তু, ক্ষেত্র, খিল সর্বপ্রকার ভূমি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। খুব প্রাচীন কালে কি হইয়াছিল, বলা কঠিন; কিন্তু অনুমান করা কঠিন নয় যে, লোকবসতি এবং কৃষিকর্ম সাধারণত নদ-নদীপ্রবাহ অনুসরণ করিয়াই বিস্তৃত ছিল। কৃষিকর্মের উপরই জনসাধারণের জীবিকা নির্ভর করিত, এবং সেই কৃষির প্রধান নির্ভরই নদনদী। যাহারা এদেশে লাঙ্গল প্রবর্তন করিয়াছিল, ধান্যকে লোকালয়ের কৃষিবস্তু করিয়াছিল, কলা, বেগুন, পান, হরিদ্রা, লাউ, সুপারি, নারিকেল, তেঁতুল প্রভৃতির সঙ্গে দেশের পরিচয় ঘটাইয়াছিল, সেই আদি-অস্ট্রেলিয় বা অস্ট্রিক্-ভাষাভাষী লোকেদের সময়ই এই অবস্থা কল্পনা করা কঠিন নয়। নদনদী-অনুসারী বসতি ও কৃষিক্ষেত্রের পরই বোধ হয় ছিল হয় বনভূমি বা উষর পার্বত্যভূমি, অথবা নিম্ন হজ্জিক জলাভূমি এবং সেই হেতু খিল বা 'পতিত্'। লোকবসতি এবং কৃষি-বিস্তার কখন কি গতিতে অগ্রসর হইয়াছে, বলিবার মত প্রমাণ নাই; দেশের সর্বত্র সকল সময়ে একই ভাবে হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। শাসন ও বাণিজ্য-কেন্দ্র যে-সব জায়গায় গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইখানে লোকবসতি এবং কৃষিক্ষেত্রের বিস্তারও অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বেশি হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা কঠিন নয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বাহির হইতে আর্যভাষাভাষী লোকদের এই দেশে বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদাও ক্রমশ বাড়িয়া গিয়াছে, ইহাও খুব স্বাভাবিক।

এই লোকবসতি ও কৃষিবিস্তারের প্রথম নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় পঞ্চম শতক হইতে; ভূমি-সম্পর্কিত কোনও সাক্ষ্য ইহার আগে আর উপস্থিত নাই। লক্ষণীয় এই যে, পঞ্চম হইতে সপ্তম অষ্টম শতক পর্যন্ত যতগুলি ভূমিদান-বিক্রয়ের পট্টোলী আছে, তাহার অধিকাংশ দত্ত এবং বিক্রীত ভূমি 'অপ্রদ' অর্থাৎ যাহা তখনও পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই, বিলি বন্দোবস্ত হয় নাই; 'অপ্রহত', অর্থাৎ যাহা তখনও পর্যন্ত কর্ষিত হয় নাই এবং 'খিল', অর্থাৎ যাহা তখনও পর্যন্ত 'পতিত্' পড়িয়া আছে। ১নং দামোদরপুর পট্টোলীর ভূমি "অপ্রদাপ্রহতখিল ক্ষেত্র"; ৩নং দামোদরপুর পট্টোলীর ভূমি "অপ্রদখিলক্ষেত্র"; বৈগ্রাম পট্টোলীর ভূমিও পতিত্ পড়িয়াছিল, রাজার কোন আয় তাহা হইতে হইত না; গুণাইঘর

ট্রোলীর ভূমি একেবারে "শূন্যপ্রতিকরহজ্জিকখিলভূমি", রাজার কোন আয়বিহীন হাজা পতিত, জমি; সমাচারদেবের ঘুগ্রাহাটি পট্টোলীর ভূমিও গর্তপরিপূর্ণ বন্যপশুর আবাসস্থল এবং সেই হেতু রাষ্ট্রের দিক হইতে নিষ্ফল হইয়া পড়িয়া ছিল। ৫নং দামোদরপুর পট্টোলীর ভূমি তো একেবারে অরণ্যময় প্রদেশে; আর ত্রিপুরা লোকনাথ পট্টোলীর ভূমিও হরিণ-মহিষ-ব্যাঘ্র-বরাহ-সর্প অধ্যুষিত এক অরণ্যের মধ্যে। নূতন নূতন বাস্তু ও ক্ষেত্রভূমি যেমন সৃষ্ট ও পত্তন হইতেছে, তেমনই পুরাতন ব্যবহৃত ভূমির উপরও নূতন চাপ পড়িতেছে, এরকম দৃষ্টান্তও দু' একটি এই যুগের লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। আশ্রফপুর পট্টোলীতে দেখিতেছি, ভোগ করিতেছে এমন লোকের নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া (যথা-ভুজ্যনাদপনীয়) অন্যত্র দান করা হইতেছে। ভূমির চাহিদাবৃদ্ধির ইহাও অন্যতম প্রমাণ।

পাল ও সেন আমলের লিপিগুলি সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। গ্রামগুলির যে আভাস লিপিগুলিতে পাওয়া যায়, ধানশস্যের যে-ইঙ্গিত ইহাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন এবং "রামচরিতে" সুস্পষ্ট, সুপারি-নারিকেল হইতেই ভূমির আয়ের পরিমাণের যে-আভাস পাওয়া যায়, তাহাতে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, এই আমলে লোক বসতি ও কৃষির বিস্তার বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। লোক সংখ্যার বৃদ্ধি, রাজা, রাজপরিবার এবং সমৃদ্ধ লোকদের ভূমিদান করিয়া পুণ্যলাভের ইচ্ছা, ব্রাহ্মণপুরোহিতদের ভূমি সংগ্রহের লোভ প্রভৃতির প্রেরণায়ই দেশে ক্রমশ বসতি ও কৃষির বিস্তার হইয়াছে, লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যের ইহাই ইঙ্গিত।

"শাসন" ও "অগ্রহার" অর্থাৎ দত্তভূমি যাঁহারা ভোগ করিতেন তাঁহারা ভূমিদানের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-সম্পর্কিত অন্যান্য কতগুলি অধিকারও রাজা বা রাষ্ট্রের নিকট হইতে লাভ করিতেন; এই সব অধিকারের কিছু কিছু বিবরণ আগেই উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণ প্রজাদের কি কি দায় ও অধিকার ছিল, তাহার কিছু কিছু আভাসও তাহা হইতেই পাওয়া যায়। ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য এই চারি প্রকার কর তো তাহাদের দিতেই হইত। উপরিকর নামেও একপ্রকার রাজস্ব দিতে হইত। দশ রকম অপরাধের কোনো অপরাধে অপরাধী হইলে জরিমানা দিতে হইত। হাটবাজার, খেয়াঘাট ইত্যাদির জন্যও কর ছিল। চোরডাকাত হইতে রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাষ্ট্র লইত বলিয়া সেজন্যও একটা কর নির্দিষ্ট ছিল। এইগুলি নিয়মিত কর। তাহা ছাড়া, সময় সময় কোনও বিশেষ উপলক্ষেও রাজাকে বা রাষ্ট্রকে অন্যপ্রকারে কর দিতে হইত—লিপিতে এগুলিকে বলা হইয়াছে 'পীড়া'। পীড়া যে এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই! ছোট বড় নানাস্তরের নানা রাজপুরুষেরা বিচিত্র কার্যোপলক্ষ্যে গ্রামে অস্থায়ী ছত্রবাস স্থাপন করিয়া বাস করিতেন; মনে হয়, তখন গ্রামবাসীদেরই তাহাদের আহার্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করিতে হইত। সমসাময়িক কামরূপের লিপিতে তো এগুলিকে উপদ্রবই বলা হইয়াছে। চাটভাটেরাও গ্রামে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার উৎপাত উপদ্রব করিত। রাজপ্রাসাদের জন্য রাজকন্যার বিবাহ প্রভৃতি

উপলক্ষে রাজাকে প্রজার কিছু দেয় তো চিরাচরিত বিধি; বাংলা দেশেও যে তাহার ব্যতিক্রম ছিল মনে হয় না। রাজা বা রাষ্ট্র যে ইচ্ছা করিলে বা প্রয়োজন হইলে প্রজার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিতেন এ-সম্বন্ধে তো লিপি-প্রমাণ আগেই উল্লেখ করিয়াছি। ভূমিতে অধিকারবিহীন চাষী প্রজাও যে ছিল, সে-প্রমাণও বিদ্যমান। রাষ্ট্রে ও সমাজে ভূমির ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকৃত হইত, ব্যক্তিগত অধিকারের ভূমি হস্তান্তরিত হইত, ভূমির ব্যক্তিগত যৌথ-অধিকার (এজ্‌মালি স্বত্ব) স্বীকৃত হইত, নারীরা ভূসম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিতেন, মধ্যস্বত্বাধিকারিত্বও অস্বীকৃত ছিল না, এই সব তথ্যও সাক্ষ্য প্রমাণসহ আগেই উদ্ধার করা হইয়াছে। যে-ভূমি দান করা হইয়াছে সেই ভূমির উপর ও নীচের সমস্ত স্বত্ব-উপস্বত্বই রাজা ও রাষ্ট্র দান করিয়া দিতেছেন—একেবারে হাট ঘাট আকর জলস্থল মাছ গাছ ইত্যাদি সহ—; কিন্তু সাধারণ প্রজারা ভূমির নিচের অধিকার ভোগ করিত কি না, সংলগ্ন জলের অধিকার লাভ করিত কি না এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কৌটিল্যের মতে ভূগর্ভস্থ খনি, লবণ ইত্যাদি রাষ্ট্রের সম্পত্তি; ভূমি বিক্রয়কালে রাজা কি ভূগর্ভের অধিকারও বিক্রয় করিতেন? অবশ্য লিপিগুলি, বিশেষভাবে, অষ্টম-শতকপূর্ব লিপিগুলি পাঠ করিলে মনে হইতে পারে, দান ও বিক্রয় উভয় ক্ষেত্রেই সর্বপ্রকার ভোগাধিকারই প্রজার উপর অর্পিত হইত।

পঞ্চম অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

১। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়—গৌড়লেখমালা।

২। উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ—কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, ৮৮-৯০ পৃ; ১৫২ পৃ।

৩। কৌটিল্য—অর্থশাস্ত্র, Mysore edn. VI. p. 168 ff. Shamasastry's trans. 2nd edn. pp. 204, 206-7.।

৪। পাণিনি—৫, ১, ৪ ।

৫। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৯, ১৩৪০।

৬। ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকা, ১৩৪৯, ভাদ্র, ২৬৩-৬৫ পৃ।

৭। মনুসংহিতা, ৮, ২৩৭।

৮। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ২,১৬৭ ; ৭,১২৩।

৯। Ain-i-Akbari, trans. by Jarrett।

১০। Fleet—Corpus Inscriptionum Indicarum, III.।

১১। Majumdar, N. G.—Inscriptions of Bengal, III.।

১২। Majumdar, R. C. *editor*—History of Bengal, I. Dacca Univ.।

১৩। Moreland—India at the death of Akbar, p. 56।

১৪। Sacred Books of the East, XXXIII. p. 305।

১৫। Sen, B. C.—Some aspects of the history of Bengal।

১৬। Vogel, J. Ph.—Antiquities of Chamba. pp. 167—68।

১৭। এই অধ্যায়ে যে-সব লিপিপ্রমাণ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার পাঠনির্দেশের জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

বর্ণাশ্রম প্রথার জন্মের ইতিহাস আলোচনা না করিয়াও বলা যাইতে পারে, বর্ণ-বিন্যাস ভারতীয় সমাজ-বিন্যাসের ভিত্তি। খাওয়া-দাওয়া এবং বিবাহ-ব্যাপারের বিধিনিষেধের উপর ভিত্তি করিয়া আর্যপূর্ব ভারতবর্ষে যে সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন ছিল তাহাকে পিতৃপ্রধান আর্যসমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ঢালিয়া সাজাইয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছিল। এই নূতন করিয়া গড়ার পশ্চাতে একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক যুক্তি কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সে-সব আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। যে-যুগে বাংলা দেশের ইতিহাসের সূচনা সে-যুগে বর্ণাশ্রম আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতীয় সমাজের উচ্চতর এবং অধিকতর প্রভাবশালী শ্রেণীগুলিতে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে, এবং ধীরে ধীরে তাহা পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইতেছে। বর্ণাশ্রমের এই সামাজিক আদর্শের বিস্তারের কথাই এক হিসাবে ভারতবর্ষে আর্যসংস্কার ওসংস্কৃতির বিস্তারের ইতিহাস; কারণ, ঐ আদর্শের ভিতরই ঐতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের সংস্কার ও সংস্কৃতির সকল অর্থ নিহিত। বর্ণাশ্রমই আর্য-সমাজের ভিত্তি,. শুধু ব্রাহ্মণ্য সমাজেরই নয়, জৈন এবং বৌদ্ধ সমাজেরও। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আর্যপূর্ব ও অনার্য সংস্কার এবং সংস্কৃতি এই বর্ণাশ্রমের কাঠামো এবং আদর্শের মধ্যেই সমন্বিত ও সমীকৃত হইয়াছে। বস্তুত, বর্ণাশ্রমগত সমাজ-বিন্যাস এক হিসাবে যেমন ভারত-ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তেমনই অন্য দিকে এমন সর্বব্যাপী এমন সর্বগ্রাসী এবং গভীর অর্থবহ সমাজ-ব্যবস্থাও পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। প্রাচীন বাংলার সমাজ-বিন্যাসের কথা বলিতে গিয়া সেইজন্য বর্ণ-বিন্যাসের কথা বলিতেই হয়।

যুক্তি

বর্ণাশ্রম প্রথা ও অভ্যাস যুক্তিপদ্ধতিবদ্ধ করিয়াছিলেন প্রাচীন ধর্মসূত্র ও স্মৃতিগ্রন্থের লেখকেরা। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোর মধ্যে তাঁহারা সমস্ত ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চাতুর্বর্ণ্যপ্রথা অলীক উপন্যাস, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কারণ, ভারতবর্ষে এই চাতুর্বর্ণ্যের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ, জন ও কোম বিদ্যমান ছিল; প্রত্যেক বর্ণ, জন ও কোমের ভিতর আবার ছিল অসংখ্য স্তর-উপস্তর। ধর্মসূত্র ও স্মৃতিকারেরা নানা অভিনব অবাস্তব উপায়ে এই সব বিচিত্র বর্ণ, জন ও কোমের স্তর-উপস্তর

ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিতে এবং সব কিছুকেই আদি চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোর যুক্তিপদ্ধতিতে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন পর্যন্ত এই চেষ্টার কখনও বিরাম হয় নাই। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে স্মৃতিকারদের রচনার মধ্যে সমসাময়িক বাস্তব সামাজিক অবস্থার কিছুটা প্রতিফলন হয়তো আছে, সেই অবস্থার ব্যাখ্যার একটা চেষ্টা আছে; কিন্তু যে-যুক্তিপদ্ধতির আশ্রয়ে তাহা করা হইয়াছে, অর্থাৎ চাতুর্বর্ণ্যের বহির্ভূত অসংখ্য বর্ণ, জন ও কোমের নরনারীর সঙ্গে চাতুর্বর্ণ্যধৃত নরনারীর যৌনমিলনের ফলে সমাজের যে বিচিত্র বর্ণ ও উপবর্ণের, বিচিত্রতর সংকর বর্ণের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা একান্তই অনৈতিহাসিক এবং সেই হেতু অলীক। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হয়, আর্য-ব্রাহ্মণ্য ভারতীয় সমাজ আজও এই যুক্তিপদ্ধতিতে বিশ্বাসী, এবং সুদূর প্রাচীন কাল হইতে আদি চাতুর্বর্ণ্যের যে কাঠামো ও যুক্তিপদ্ধতি অনুযায়ী বর্ণব্যাখ্যা হইয়া আসিয়াছে সেই ব্যাখ্যা প্রয়োগ করিয়া হিন্দুসমাজ আজও বিচিত্র বর্ণ, উপবর্ণ ও সংকর বর্ণের সামাজিক স্থান নির্ণয় করিয়া থাকেন। বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই, আজও হইতেছে না।

এই সব বিচিত্র বর্ণ, উপবর্ণ, সংকর বর্ণ সকল কালে ও ভারতবর্ষের সকল স্থানে এক প্রকারের ছিল না, এখনও নয়; সকল স্মৃতিশাস্ত্রে সেই জন্য এক প্রকারের বিবরণও পাওয়া যায় না। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থগুলির একটিও বাংলাদেশে রচিত নয়; কাজেই বাংলার বর্ণ-বিন্যাসগত সামাজিক অবস্থার পরিচয়ও তাহাতে পাওয়া যায় না, আশা করাও অযৌক্তিক এবং অনৈতিহাসিক। বস্তুত, একাদশ শতকের আগে বাংলাদেশে বাংলাদেশের সামাজিক প্রতিফলন লইয়া একটিও স্মৃতিগ্রন্থ বা এমন কোনও গ্রন্থ রচিত হয় নাই যাহার ভিতর সমসাময়িক কালের বর্ণ-বিন্যাসের ছবি কিছুমাত্র ধরা যাইতে পারে। বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ স্বীকার করিলে বলিতেই হয়, এই সময় হইতেই বাঙালী স্মৃতি ও পুরাণকারেরা সজ্ঞানে ও সচেতন ভাবে বাংলার সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রাচীনতর ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির আদর্শ ও যুক্তিপদ্ধতি অনুযায়ী ভারতীয় বর্ণবিন্যাসের কাঠামোর মধ্যে বাঁধিবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। কিন্তু এই সজ্ঞান সচেতন চেষ্টার আগেই, বহুদিন হইতেই, আর্যপ্রবাহ বাংলাদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে; এবং আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণাশ্রমের যুক্তি এবং আদর্শও স্বীকৃতি লাভ করে। সেইজন্য প্রাচীন বাংলার বর্ণবিন্যাসের কথা বলিতে হইলে বাংলার আর্যীকরণের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা আরম্ভ করিতে হয়।

২

আর্যীকরণের তথা বাংলার বর্ণ-বিন্যাসের প্রথম পর্বের ইতিহাস নানা প্রকারের সাহিত্যগত উপাদানের ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। সে-উপাদান রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মনু-বোধায়ন প্রভৃতি স্মৃতি ও সূত্রকারদের গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বৌদ্ধ ও জৈন প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও এ-সম্বন্ধে কিছু

উপাদান-বিচার

কিছু তথ্য নিহত আছে। উত্তর-বঙ্গে এবং বাংলাদেশের অন্যত্র গুপ্তাধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আর্যীকরণ তথা বাংলার বর্ণ-বিন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত বর্ণবিন্যাস-ইতিহাসের প্রচুর উপাদান বাংলার অসংখ্য লিপিমালায় বিদ্যমান। বস্তুত, সন-তারিখযুক্ত এই লিপিগুলির মত বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরযোগ্য যথার্থ বাস্তব উপাদান আর কিছু হইতেই পারে না; এইগুলির উপর নির্ভর করিয়াই বাংলার বর্ণ-বিন্যাসের ইতিহাস রচনা করা যাইতে পারে, এবং তাহা করাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। বর্তমান নিবন্ধে আমি তাহাই করিতে চেষ্টা করিব। সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক দু-একটি কাব্যগ্রন্থের, যেমন, রামচরিতের সাহায্যও লওয়া যাইতে পারে। ইহাদের ঐতিহাসিকতা অবশ্যস্বীকার্য।

তবে, সেন-বর্মণ আমলে বাংলাদেশে কিছু কিছু স্মৃতি ও ব্যবহারগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সেগুলি কখন কোন্ রাজার আমলে ও পোষকতায় কে রচনা করিয়াছিলেন তাহা সুনির্ধারিত ও সুবিদিত। সমস্ত স্মৃতি ও ব্যবহারগ্রন্থ কালের হাত এড়াইয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই; অনেক গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া অথবা হারাইয়া গিয়াছে। কিছু কিছু যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ভবদেব ভট্টের ও জীমূতবাহনের কয়েকটি গ্রন্থই প্রধান। এই সব স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে কোনও বাধা নাই; এবং লিপিমালায় যে-সব তথ্য পাওয়া যায়, সে-সব তথ্য এই স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিলে অনৈতিহাসিক বা অযৌক্তিক কিছু করা হইবে না।

স্মৃতি ও ব্যবহারগ্রন্থ ছাড়া অন্তত দুইটি অর্বাচীন পুরাণ-গ্রন্থ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গোপালভট্ট-আনন্দভট্টকৃত বল্লাল-চরিত, এবং বাংলার কুলজী গ্রন্থমালায় হিন্দুযুগের শেষ অধ্যায়ের বর্ণ-বিন্যাসের ছবি কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের একটিকেও প্রামাণিক সমসাময়িক সাক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সেইজন্য ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ইহারা কতখানি নির্ভরযোগ্য সে-বিচার আগেই একটু সংক্ষিপ্ত ভাবে করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিচারালোচনা হইয়াছে। প্রথমোক্ত পুরাণটিতে পদ্মা ও বাংলাদেশের যমুনা নদীর উল্লেখ, গঙ্গার তীর্থ-মহিমার সবিশেষ উল্লেখ, ব্রাহ্মণের মাছ-মাংস খাওয়ার বিধান (যাহা ভারতবর্ষের আর কোথাও বিশেষ নাই), ব্রাহ্মণেতর সমস্ত শূদ্রবর্ণের ছত্রিশটি উপ ও সংকর বর্ণে বিভাগ (বাংলার তথাকথিত 'ছত্রিশ জাত্' যাহা ভারতবর্ষে আর কোথাও দেখা যায় না) ইত্যাদি দেখিয়া মনে হয় এই পুরাণটির লেখক বাঙালী না হইলেও বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁহার সবিশেষ পরিচয় ছিল। ক্ষত্রিয় এবং-বৈশ্য বর্ণের পৃথক্ অনুল্লেখ, 'সৎ' ও 'অসৎ' পর্যায়ে শূদ্রদের দুই ভাগ, ব্রাহ্মণদের পরেই অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) এবং করণ (কায়স্থ)দের স্থান নির্ণয়, শংখকার (শাঁখারী), মোদক (ময়রা),

বৃহদ্ধর্মপুরাণ
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ

তন্তুবায়, দাস (চাষী), কর্মকার, সুবর্ণবণিক ইত্যাদি উপ ও সংকর বর্ণের উল্লেখ প্রভৃতিও এই অনুমানের সমর্থক। বাংলাদেশের বাহিরে অন্যত্র কোথাও এই ধরনের বর্ণ-ব্যবস্থা এবং এই সব সংকর বর্ণ দেখা যায় না। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। বস্তুত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের বর্ণ-ব্যবস্থার চিত্র প্রায় এক এবং অভিন্ন, এবং তাহা যে বাংলাদেশ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য ইহাও অস্বীকার করা যায় না। এই দুই গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন; তবে এই কাল দ্বাদশ শতকের আগে নয় এবং চতুর্দশ শতকের পরে নয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয়। যদি তাহা হয় তাহা হইলে বলা যায়, এই দুই পুরাণে বাংলার আদিপর্বের শেষ অধ্যায়ের বর্ণ-বিন্যাসের ছবির একটা মোটামুটি কাঠামো পাওয়া যাইতেছে।

বল্লালচরিত

বল্লাল-চরিত নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রচলিত। একখানির গ্রন্থকার আনন্দভট্ট; নবদ্বীপের রাজা বুদ্ধিমন্ত খাঁর আদেশে তাঁহার গ্রন্থখানি রচিত হয়। রচনাকাল ১৫১০ খ্রীষ্টশতক। আনন্দভট্টের পিতা দাক্ষিণাত্যাগত ব্রাহ্মণ, নাম অনন্তভট্ট। আর একখানি গ্রন্থ পূর্বখণ্ড, উত্তরখণ্ড ও পরিশিষ্ট এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ডের রচয়িতার নাম গোপালভট্ট; গোপালভট্ট বল্লালসেনের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন, এবং বল্লালের আদেশানুসারে ১৩০০ শকে গ্রন্থখানি রচিত হয়, এইরূপ দাবি করা হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড রাজার ক্রোধোৎপাদনের ভয়ে গোপালভট্ট নিজে লিখিয়া যাইতে পারেন নাই; দুই শত বৎসর পর ১৫০০ শকে আনন্দভট্ট তাহা রচনা করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে নানা কুলজীবিবরণ, বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তিকথা ইত্যাদি তো আছেই, তাহা ছাড়া প্রথম গ্রন্থে বল্লাল কর্তৃক বণিকদের উপর অত্যাচার, সুবর্ণবণিকদের সমাজে 'পতিত' করা এবং কৈবর্ত প্রভৃতি বর্ণের লোকদের উন্নীত করা প্রভৃতি যে-সব কাহিনী বর্ণিত আছে তাহাও পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে বল্লালের যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহা বল্লালের যথার্থ কাল নয়; কাজেই গোপালভট্ট বল্লালের সমসাময়িক ছিলেন একথা সত্য নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থটিকে বলিয়াছিলেন 'জাল'; আর শাস্ত্রী মহাশয়-সম্পাদিত প্রথম গ্রন্থটিকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন 'জাল'!

বল্লাল চরিতের কাহিনীটি সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য।

সেনরাজ্যে বল্লভানন্দ নামে একজন মস্ত বড় ধনী বণিক ছিলেন। উদন্তপুরীর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য বল্লালসেন বল্লভানন্দের নিকট হইতে একবার এক কোটি নিষ্ক ধার করেন। বারবার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর বল্লাল আর একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য প্রস্তুত হন, এবং বল্লভানন্দের নিকট হইতে আরও দেড় কোটি সুবর্ণ (মুদ্রা) ধার চাহিয়া পাঠান। বল্লভানন্দ সুবর্ণ পাঠাইতে রাজি হন, কিন্তু তৎপরিবর্তে হরিকেলির রাজস্ব দাবি করেন। বল্লাল ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক বণিকের ধনরত্ন কাড়িয়া লন এবং নানাভাবে তাহাদের উপর অত্যাচার করেন। ইহার পর আবার সৎশূদ্রদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতে তাঁহাদের আপত্তি আছে বলিয়া বণিকেরা রাজপ্রাসাদে এক আহারের আমন্ত্রণ অস্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গেই বল্লাল শুনিতে পান যে, বণিকদের নেতা বল্লভানন্দ পালরাষ্ট্রের

সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। তাহার উপর আবার মগধের রাজা ছিলেন বল্লভানন্দের জামাতা। বল্লাল অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণবণিকদের শূদ্রের স্তরে নামাইয়া দিলেন; তাঁহাদের পূজানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিলে, তাঁহাদের কাছ হইতে দান গ্রহণ করিলে কিংবা তাঁহাদের শিক্ষাদান করিলে ব্রাহ্মণেরাও 'পতিত' হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে এই বিধানও দিয়া দিলেন। বণিকেরা তখন প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্য দিয়া সমস্ত দাসভৃত্যদের হাত করিয়া ফেলিল। উচ্চবর্ণের লোকেরা বিপদে পড়িয়া গেলেন। বল্লাল তখন বাধ্য হইয়া কৈবর্তদিগকে জলচল-সমাজে উন্নীত করিয়া দিলেন; তাঁহাদের নেতা মহেশকে মহামাণ্ডলিক পদে উন্নীত করিলেন। মালাকার, কুম্ভকার এবং কর্মকার, ইহারাও সৎশূদ্র পর্যায়ে উন্নীত হইল। সুবর্ণবণিকদের পৈতা পরা নিষিদ্ধ হইয়া গেল; অনেক বণিক দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বল্লাল উচ্চতর বর্ণের মধ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখিয়া অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে শুদ্ধিযজ্ঞের বিধান দিলেন। ব্যবসায়ী নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্ব একেবারে ঘুচিয়া গেল; তাঁহারা ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে 'পতিত' হইলেন।

কাহিনীটির ঐতিহাসিক যাথার্থ্য স্বীকার করা কঠিন; কিন্তু ইহাকে একেবারে অলীক কল্পনাগত উপন্যাস বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া আরও কঠিন। গ্রন্থ দুটিকেও 'জাল' বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান নাই। সেনবংশ 'ব্রহ্মক্ষত্র' বংশ; বল্লালসেন কলিঙ্গরাজ চোড়গঙ্গের বন্ধু ছিলেন (সমসাময়িক তাঁহারা ছিলেনই); বল্লালের সময়ে কীকট-মগধ পালবংশের করায়ত্ত ছিল এবং তাঁহার আমলেই পালবংশের অবসানও হইয়াছিল; বল্লাল মিথিলায় সমরাভিযানও প্রেরণ করিয়াছিলেন—বল্লালচরিতের এই সব তথ্য অন্যান্য স্বতন্ত্র সুবিদিত নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। এই সব হেতু দেখাইয়া কোনও কোনও ঐতিহাসিক যথার্থ ই বলিয়াছেন, বল্লাল-চরিত 'জাল' গ্রন্থ নয়, এবং ইহার কাহিনী একেবারে ঔপন্যাসিকও নয়। তাঁহাদের মতে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে প্রচলিত লোক-কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া বল্লাল-চরিত এবং এই জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কেহ কেহ ইহাও মনে করেন যে, "The *Valllacharita* contains the distorted echo of an internal disruption caused by the partisans of the Pala dynasty which proved an important factor in the collapse of the Sena rule in Bengal." এই মত সর্বথা নির্ভরযোগ্য। তবে, এই কাহিনীটিকে সাধারণত যতটা বিকৃত প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে করা হয় আমি ততটা বিকৃত বলিয়া মনে করি না। আমরা জানি, কৈবর্তরা পালরাষ্ট্রের প্রতি খুব প্রসন্ন ছিলেন না; একবার তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া এক পালরাজকে হত্যা করিয়া বরেন্দ্রী বহুদিন তাঁহাদের করায়ত্তে রাখিয়াছিলেন। কাজেই সেই কৈবর্তদের প্রসন্ন করা এবং তাঁহাদের হাতে রাখিতে চেষ্টা করা বল্লালের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, বিশেষত মগধের পালদের সঙ্গে শত্রুতা যখন তাঁহাদের ছিলই। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে সেন-রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শের, এবং স্মৃতি ও পুরাণ গ্রন্থাদিতে সমসাময়িক সমাজ-বিন্যাসের যে পরিচয় আমরা পাই তাহাতে স্পষ্টই মনে হয়, সমাজে স্বর্ণকার-সুবর্ণবণিকদের স্থান খুব শ্লাঘ্য ছিল না। বৃহদ্ধর্মপুরাণে তাঁতী, গন্ধবণিক, কর্মকার,

তৌলিক, (সুপারি ব্যবসায়ী), কুমার, শাঁখারী, কাঁসারী, বারুজীবী (বারুই), মোদক, মালাকার সকলকে উত্তম-সংকর পর্যায়ে গণ্য করা হইয়াছে, অথচ স্বর্ণকার-সুবর্ণবণিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ধীবর-রজকের সঙ্গে জল-অচল মধ্যম-সংকর পর্যায়ে। ইহার তো কোনও যুক্তিসংগত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! বল্লাল-চরিতে এ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে একটা যুক্তি আছে; রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে এইরূপ হওয়া খুব বিচিত্র নয়। ইহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় কি? সেন-বর্মণ আমলে এইরূপ পর্যায়-নির্ণয় যে হইয়াছে স্মৃতিগ্রন্থগুলিই তাহার সাক্ষ্য। লোকস্মৃতি এক্ষেত্রে একেবারে মিথ্যাচরণ করিয়াছে, এমন মনে হইতেছে না। বল্লালচরিত-কাহিনী অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হইলেও ইহার মূলে যে সমাজেতিহাসের একটি ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতেছি না।

বল্লাল-চরিতের ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছুটা স্বীকার করা গেলেও কুলজীগ্রন্থের ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করা অত্যন্ত কঠিন।। বাংলাদেশে কুলজী গ্রন্থমালা সুপরিচিত, সুআলোচিত। ব্রাহ্মণ-কুলজীগ্রন্থমালায় ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশাবলী বা মিশ্রগ্রন্থ, মুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা, বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম, ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপ, মেলপর্যায় গণনা, বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা, কুলার্ণব, হরিমিশ্রের কারিকা, এড়ু মিশ্রের কারিকা, মহেশের নির্দোষ কুলপঞ্জিকা এবং সর্বানন্দ মিশ্রের কুলতত্ত্বার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী পঞ্চদশ শতকের রচনা বলিয়া অনুমিত; মুলো পঞ্চানন এবং বাচস্পতিমিশ্রের গ্রন্থের কাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতক হইতে পারে। বাকি কুলজীগ্রন্থ সমস্তই অর্বাচীন। বস্তুত, কোন কুলজী গ্রন্থেরই রচনাকাল পঞ্চদশ শতকের আগে নয়; অধিকাংশ কুলজীগ্রন্থ এখনও পাণ্ডুলিপি আকারেই পড়িয়া আছে, এবং নানা উদ্দেশ্যে নানা জনে ইহাদের পাঠ অদলবদলও করিয়াছেন, এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। বৈদ্য-কুলজীগ্রন্থের মধ্যে রামকান্তের কবিকণ্ঠহার এবং ভরতমল্লিকের চন্দ্রপ্রভা সমধিক খ্যাত; ইহাদের রচনাকাল যথাক্রমে ১৬৫৩ ও ১৬৭৩ খ্রীষ্টশতক। কায়স্থ এবং অন্যান্য বর্ণেরও কুলজী-ইতিহাস পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি কিছুতেই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের আগেকার রচনা বলিয়া মনে করা যায় না। / উনবিংশ শতকের শেষপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া একান্ত আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অনেক পণ্ডিত এই সব পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত কুলজী-গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং এখনও অনেক কৌলীন্যমর্যাদাগর্বিত ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ বংশ এই সব কুলজী-গ্রন্থের সাক্ষ্যের উপরই নিজেদের বংশমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। বস্তুত, বাংলার কৌলীন্যপ্রথা একমাত্র এই কুলশাস্ত্র বা কুলজী-গ্রন্থমালার সাক্ষ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত।/

কুলজী-গ্রন্থমালা

একান্ত সাম্প্রতিক কালে উচ্চ-শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা যে-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাকে আঘাত করা অত্যন্ত কঠিন। নানা কারণেই ঐতিহাসিকেরা এই সব কুলজী-গ্রন্থ-

মালার সাক্ষ্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতিতে আলোচনার বিষয়ীভূত করেন নাই, যদিও অনেকে তাঁহাদের সন্দেহ ব্যক্ত করিতে দ্বিধা করেন নাই। ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য প্রথম বিচার করেন স্বর্গত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়। খুব সাম্প্রতিক কালে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই সব কুলজী-গ্রন্থের বিস্তৃত ঐতিহাসিক বিচার করিয়াছেন; তাঁহার সুদীর্ঘ বিচারালোচনার যুক্তিবত্তা অনস্বীকার্য। কাজেই এখানে একই আলোচনা পুনরুত্থাপন করিয়া লাভ নাই। আমি শুধু মোটামুটি নির্ধারণগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

প্রথমত, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে যখন কুলশাস্ত্রগুলি প্রথম রচিত হইতে আরম্ভ করে তখন মুসলমানপূর্ব যুগের বাংলার সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালীর জ্ঞান ও ধারণা খুব অস্পষ্ট ছিল। কোনো কোনো পারিবারিক ইতিহাসের অস্তিত্ব হয়তো ছিল, কিন্তু আজ সেগুলির সত্যাসত্য নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব। এই সব বংশাবলী এবং প্রচলিত অস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, অর্ধসত্য অর্ধকল্পনার নানা কাহিনীতে সমৃদ্ধ করিয়া এই কুলশাস্ত্রগুলি রচনা করা হইয়াছিল। পরবর্তী কালে এই সব গ্রন্থোক্ত কাহিনী ও বিবরণ বংশমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে পড়িয়া নানা উদ্দেশ্যে নানাভাবে পাঠ-বিকৃতি লাভ করে এবং নূতন নূতন ব্যাখ্যা ও কাহিনীদ্বারা সমৃদ্ধতর হয়। কাজেই, ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসাবে ইহাদের উপর নির্ভর করা কঠিন। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে, প্রায় দুই শত আড়াই শত বৎসরের মুসলমানাধিপত্যের পর বর্ণ-হিন্দুসমাজ নিজের ঘর নূতন করিয়া গুছাইতে আরম্ভ করে; রঘুনন্দন তখনই নূতন স্মৃতিগ্রন্থাদি রচনা করিয়া নূতন সমাজনির্দেশ দান করেন; চারিদিকে নূতন আত্মসচেতনতার আভাস সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কুলশাস্ত্রগুলির রচনাও তখনই আরম্ভ হয়, এবং প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রাচীনতর কালের স্মৃতিশাসনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া তাহার একটা সুসংগত ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টাও পণ্ডিতদের মধ্যে উদগ্র হইয়া দেখা দেয়। সেন-বর্মণ আমলই স্মৃতিরচনা ও স্মৃতিশাসনের প্রথম সুবর্ণযুগ, কাজেই কুলশাস্ত্রকারেরা সেই যুগের সঙ্গে নিজেদের ব্যবস্থা-ইতিহাস যুক্ত করিবেন তাহাও কিছু আশ্চর্য নয়!

দ্বিতীয়ত, কুলশাস্ত্রকাহিনীর কেন্দ্রে বসিয়া আছেন রাজা আদিশূর। আদিশূর কর্তৃক কোলাঞ্চ-কনৌজ (অন্যমতে, কাশী) হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের সঙ্গেই ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ ও অন্যান্য কয়েকটি বর্ণ-উপবর্ণের কুলজী-কাহিনী এবং কৌলীন্যপ্রথার ইতিহাস জড়িত। কৌলীন্যপ্রথার বিবর্তনের সঙ্গে বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের নামও জড়িত হইয়া আছে, এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলজীর সঙ্গে আদিশূরের পৌত্র ক্ষিতিশূরের এবং ক্ষিতিশূরের পুত্র ধরাশূরের; বৈদিক-ব্রাহ্মণ কুলকাহিনীর সঙ্গে বর্মণরাজ শ্যামলবর্মণ এবং হরিবর্মণের নামও জড়িত। একাদশ শতকে দক্ষিণরাঢ়ে এক শূরবংশ রাজত্ব করিতেন, এবং রণশূর নামে অন্তত একজন রাজার নাম আমরা জানি। আদিশূর, ক্ষিতিশূর এবং ধরাশূরের নাম

আজও ইতিহাসে অজ্ঞাত। সেন ও বর্মণ রাজবংশদ্বয় তো খুবই পরিচিত। কিন্তু, আদিশূরই বাংলায় প্রথম ব্রাহ্মণ আনিলেন, তাঁহার আগে ব্রাহ্মণ ছিল না, বেদের চর্চা ছিল না, কুলজী-গ্রন্থগুলির এই তথ্য একান্তই অনৈতিহাসিক, অথচ ইহারই উপর সমস্ত কুলজী-কাহিনীর নির্ভর। অন্তত পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলাদেশে ব্রাহ্মণের কিছু অভাব ছিল না, বেদ-বেদাঙ্গচর্চাও যথেষ্টই ছিল; অষ্টম শতকের আগেই বাংলার সর্বত্র অসংখ্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বসবাস হইয়াছিল। আর, অষ্টম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অসংখ্য ব্রাহ্মণ যেমন বাংলায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, তেমনই বাংলার ব্রাহ্মণ-কায়স্থেরা বাংলার বাহিরে গিয়াও বিচিত্র সম্মাননা লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গজ ব্রাহ্মণদের কোনও কাহিনী কুলশাস্ত্রগুলিতে নাই, অথচ (পূর্ব)-বঙ্গেও অনেক ব্রাহ্মণ গিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধে লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং সম্ভবত বৈদিক ও গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণদের অস্তিত্বের খবর অন্যতর স্বতন্ত্র সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতেও পাওয়া যায়। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র একান্তই ভৌগোলিক সংজ্ঞা; বৈদিক ব্রাহ্মণদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আদিশূর-পূর্ব লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান; আর গ্রহবিপ্রেরা তো বাহির হইতে আগত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়। ইহাদের সম্পর্কে কুলজীর ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক এবং অনৈতিহাসিক। বৈদ্য ও কায়স্থদের ভৌগোলিক বিভাগ সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের নাম অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, অথচ এই দুই রাজার আমলে যে-সব স্মৃতি ও ব্যবহারগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, ইহাদের নিজেদের যে-সব লিপি আছে তাহার একটিতেও এই প্রথা সম্বন্ধে একটি ইঙ্গিতমাত্রও নাই, উল্লেখ তো দূরের কথা; তাহা ছাড়া, এই যুগের ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অসংখ্য অপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের যে-সব উল্লেখ সমসাময়িক গ্রন্থাদি ও লিপিমালায় পাওয়া যায় তাঁহাদের একজনকেও ভুলিয়াও কুলীন কেহ বলেন নাই। বল্লাল ও লক্ষ্মণের নাম কৌলীন্যপ্রথা উদ্ভবের সঙ্গে জড়িত থাকিলে তাঁহারা নিজেরা কেহ তাহার উল্লেখ করিলেন না, সমসাময়িক গ্রন্থ ও লিপিমালায় তাহার উল্লেখ পাওয়া গেল না, ইহা খুবই আশ্চর্য বলিতে হইবে! আদিশূর-কাহিনী এবং কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের গাঞী বিভাগও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। গাঞীর উদ্ভব গ্রাম হইতে; যে গ্রামে যে-ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপন করিতেন তিনি সেই গ্রামের নামানুযায়ী গাঞী পরিচয় গ্রহণ করিতেন। বন্দ্য, ভট্ট, চট্ট প্রভৃতি গ্রামের নামের সঙ্গে উপাধ্যায় বা আচার্য জড়িত হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পদবীর সৃষ্টি। বস্তুতঃ বন্দ্য, ভট্ট, চট্ট ব্রাহ্মণদের এই সব গ্রামনামায় পরিচয় অষ্টম শতক-পূর্ব লিপিগুলিতেই দেখা যাইতেছে। কাজেই এই সব গাঞীপর্যায়-পরিচয় স্বাভাবিক ভৌগোলিক কারণেই উদ্ভূত হইয়াছিল এবং তাহার সূচনা ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই দেখা গিয়াছিল —আদিশূর-কাহিনী বা কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে উহাকে যুক্ত করিবার কোনও সংগত কারণ নাই। বৈদ্য এবং কোনও কোনও ব্রাহ্মণ কুলজীতে আদিশূর এবং বল্লালসেনকে বলা হইয়াছে বৈদ্য।

এ-তথ্য একান্তই অনৈতিহাসিক। সেনেরা নিঃসন্দেহে ব্রহ্মক্ষত্রিয়; ইহারা এবং সম্ভবত শূরেরাও অবাঙালী। কাজেই বাঙালী বৈদ্য-সংকরবর্ণের সঙ্গে ইহাদের যুক্ত করিবার কারণ নাই।

কুলজী-গ্রন্থগুলিতে নানা প্রকার গালগল্প ও বিচিত্র অসংগতি তো আছেই; সাম্প্রতিক পণ্ডিতেরা তাহা সমস্তই অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি শুধু কয়েকটি ঐতিহাসিক যুক্তি সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। এই সব কারণে কুলশাস্ত্রের সাক্ষ্য ঐতিহাসিক আলোচনায় নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। তবে, ইহাদের ভিতর দিয়া লোকস্মৃতির একটি ঐতিহাসিক ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করা যায়, এবং সে-ইঙ্গিত অস্বীকার করা কঠিন। পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে যে বর্ণ-উপবর্ণগত সমাজ-ব্যবস্থা, যে-স্মৃতিশাসন বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল তাহার একটা প্রাচীনতর ইতিহাস ছিল, এবং লোকস্মৃতি সেই ইতিহাসকে যুক্ত করিয়াছিল শূর, সেন ও বর্মণ রাজবংশগুলির সঙ্গে—পাল, চন্দ্র বা অন্য কোনো রাজবংশের সঙ্গে নয়, ইহা লক্ষণীয়। আমরা নিঃসংশয়ে জানি, সেন ও বর্মণ বংশদ্বয় অবাঙালী; শূরবংশও সম্ভবত অবাঙালী; ইহাও আমরা জানি, সেন এবং বর্মণ রাষ্ট্র ও রাজবংশ দুটির ছত্রছায়ায়ই এবং তাঁহাদের আমলেই বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য-স্মৃতি ও ব্যবহার-শাসন, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুশাসন সমস্ত পরিবেশ ও বাতাবরণ, সমস্ত খুঁটিনাটি সংস্কার লইয়া সর্বব্যাপী প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কুলজী-গ্রন্থগুলির ইঙ্গিতও তাহাই। এই হিসাবে লোকস্মৃতি মিথ্যাচরণ করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। দ্বিতীয়ত, কোনও কোনও বংশের প্রাচীনতর ইতিহাস পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়, এবং কুলজী-গ্রন্থাদিতে তাহা ব্যবহৃতও হইয়াছে। এই রকম কয়েকটি বংশের সাক্ষ্য স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রমাণদ্বারা সমর্থনও করা যায়। কুলজী-গ্রন্থে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ও গ্রহবিপ্র, ব্রাহ্মণদের এই চারি পর্যায়ের বিভাগও স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রমাণদ্বারা সমর্থিত। কুলশাস্ত্র-গ্রন্থমালায় ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন শাখার বিচিত্র গাঞী বিভাগের অন্তত কয়েকটি গাঞীর নাম লিপিমালায় এবং সমসাময়িক স্মৃতি-সাহিত্য পাওয়া যায়। এই সব কারণে মনে হয়, কুলজী-গ্রন্থমালার পশ্চাতে একটা অস্পষ্ট লোকস্মৃতি বিদ্যমান ছিল, এবং এই লোকস্মৃতি একেবারে পুরোপুরি মিথ্যাচারী নয়। তবে, কুলশাস্ত্রগুলির ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটুকু মাত্রই গ্রাহ্য, তাহাদের বিচিত্র খুঁটিনাটি তথ্য ও বিবরণগুলি নয়।

এই সব ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থাদি ছাড়া আর একটি উপাদানের উল্লেখ করিতে হয়; এই উপাদান সহজিয়াতন্ত্রের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি গ্রন্থ, চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতি। এই গ্রন্থ বিভিন্ন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য কর্তৃক গুহ্য তান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধীয় সন্ধাভাষায় রচিত কয়েকটি (৫০টি) পদের সমষ্টি। পদগুলি প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন; ইহাদের তিব্বতী ভাষারূপও কিছুদিন হইল পাওয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, ইহাদের রচনার কাল দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বলিয়া বহুদিন পণ্ডিতসমাজে

চর্যাগীতি

স্বীকৃত হইয়াছে। এই পদগুলির যত গুহ্য অর্থই থাকুক, কিছু কিছু সমাজ-সংবাদও ইহাদের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে, এবং বিশেষভাবে ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি তথাকথিত অন্ত্যজ পর্যায়ের বর্ণ-সংবাদ। সমসাময়িক সাক্ষ্য হিসাবে ইহাদের মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

৩

আর্যীকরণের সূচনা : বর্ণবিন্যাসের প্রথম পর্ব

বাঙালীর ইতিহাসের যে অস্পষ্ট উষাকালের কথা আমরা জানি তাহা হইতে বুঝা যায়, আর্যীকরণের সূচনার আগে এই দেশ অস্ট্রিক ও দ্রবিড়ভাষাভাষী—অস্ট্রিক্ ভাষাভাষীই অধিকসংখ্যক,—খুব স্বল্পসংখ্যক অন্যান্য ভাষাভাষী কৃষি ও শিকারজীবী, গৃহ ও অরণ্যচারী অসংখ্য কোমে বিভক্ত লোকেদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। সাম্প্রতিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় এই তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে যে, এইসব অসংখ্য বিচিত্র কোমদের ভিতর বিবাহ ও আহার-বিহারগত ধর্ম ও আচারগত নানাপ্রকার বিধিনিষেধ বিদ্যমান ছিল; এবং এই সব বিধিনিষেধকে কেন্দ্র করিয়া বিচিত্র কোমগুলির পরস্পরের ভিতর যৌন ও আহারবিহার সম্বন্ধগত বিভেদ-প্রাচীরেরও অন্ত ছিল না। পরবর্তী আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বিন্যাসের মূল অনেকাংশে এই সব যৌন ও আহার-বিহার সম্বন্ধগত বিধিনিষেধকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা প্রায় অনস্বীকার্য; তবে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতি গুণ ও কর্মকে ভিত্তি করিয়া তাহাদের চিন্তা ও আদর্শানুযায়ী এইসব বিধিনিষেধকে ক্রমে ক্রমে কালানুযায়ী প্রয়োজনে যুক্তি ও পদ্ধতিতে প্রথাশাসনগত করিয়া গড়িয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমাজ ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার নির্ধারণানুযায়ী বিচার করিলে ভারতীয় বর্ণ-বিন্যাস আর্যপূর্ব ও আর্য্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির সম্মিলিত প্রকাশ। অবশ্যই এই মিলন একদিনে হয় নাই; বহু শতাব্দীর নানা বিরোধ, নানা সংগ্রাম বিচিত্র মিলন ও আদানপ্রদানের মধ্য দিয়া এই সমন্বয় সম্ভব হইয়াছে। এই সমন্বয়-কাহিনীই এক হিসাবে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির এবং কতকাংশে ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতিরও ইতিহাস। যাহাই হউক, বাংলা দেশে এই বিরোধ-মিলন-সমন্বয়ের সূচনা কি ভাবে হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু আভাস প্রাচীন আর্য-ব্রাহ্মণ্য ও আর্য-বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই সব গ্রন্থের সাক্ষ্য একপক্ষীয়, এবং তাহাতে পক্ষপাত দোষ নাই এমনও বলা চলে না; আর্যপূর্ব জাতি ও কোমদের পক্ষ হইতে সাক্ষ্য দিবার মতন কোনও অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত নাই। তাহা ছাড়া, বাংলা দেশ উত্তর-ভারতের পূর্বপ্রত্যন্ত দেশ; আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির স্পর্শ ও প্রভাব এদেশকে আক্রমণ করিয়াছে সকলের পরে; তখন তাহা উত্তর-ভারতের আর প্রায় সর্বত্রই বিজয়ী, সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিমান। অন্যদিকে, তখন সমগ্র বাংলা দেশে আর্যপূর্ব সংস্কার ও সংস্কৃতিসম্পন্ন বিচিত্র কোমদের বাস; তাহারাও কম শক্তিমান নয়। তাহাদের নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতিবোধ গভীর ও ব্যাপক। কাজেই এই দেশে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির বিজয়াভিযান বিনা বিরোধ ও বিনা

সংঘর্ষে সম্পন্ন হয় নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই বিরোধ-সংঘর্ষ চলিয়াছিল, ইহা যেমন স্বভাবতই অনুমান করা চলে, তেমনিই ঐতিহাসিক সাক্ষ্য দ্বারাও তাহা সমর্থিত। লিপিপ্রমাণ হইতে মনে হয়, গুপ্ত আমলে আর্য-ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বিন্যাস, ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি এদেশে সম্যক্ স্বীকৃতই হয় নাই। তাহার পরেও ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বিন্যাসের নিম্নস্তরে ও তাহার বাহিরে সংস্কার ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ বহুদিন চলিয়াছিল; সেন-বর্মণ আমলে (একাদশ-দ্বাদশ শতকে) বর্ণ-সমাজের উচ্চস্তরে আর্যপূর্ব লোক-সংস্কৃতির পরাভব প্রায় সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাঙালী সমাজের অন্তঃপুরে এবং একান্ত নিম্নস্তরে এই সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রভাব আজও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই—ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বিন্যাসের আদর্শ সেখানে শিথিল; দৈনন্দিন জীবনে, ধর্মে, লোকাচারে, ব্যবহারিক আদর্শে, ভাবনা-কল্পনায় আজও সেখানে আর্যপূর্ব সমাজের বিচিত্র স্মৃতি ও অভ্যাস সুস্পষ্ট। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে শিল্পে, ধর্মে, বর্তমান বাঙালীর ধ্যানে মননে আচারে ব্যবহারে এখনও সেই স্মৃতি বহমান, একথা কখনও ভুলিলে চলিবে না।

ঐতরেয় অরণ্যক গ্রন্থের "বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা" এই পদে কেহ কেহ বঙ্গ, মগধ, চের এবং পাণ্ড্য কোমের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে করেন; এই সব কোমকে বলা হইয়াছে বয়াংসি বা 'পক্ষী-বিশেষাঃ,' এবং ইহারা যে আর্য-সংস্কৃতির বহির্ভূত তাহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই পদটির পাঠ ও ব্যাখ্যা এইভাবে হইতে পারে কিনা এ-সম্বন্ধে মতভেদের অবসর বিদ্যমান। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদের লোকদিগের যে 'দস্যু' বলা হইয়াছে এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। এই দুইটি ছাড়া আর কোনো প্রাচীনতম গ্রন্থেই প্রাচীন বাংলার কোনও কোমের উল্লেখ নাই। বুঝা যাইতেছে, সেই প্রাচীনকালে আর্যভাষীরা তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সঙ্গে পরিচিত হন নাই; পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদি রচনার সময় তাঁহারা পুণ্ড্র, বঙ্গ, ইত্যাদি কোমের নাম শুনিতেছেন মাত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি গল্প এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঋষি বিশ্বামিত্র একটি ব্রাহ্মণ বালককে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন—দেবতার প্রীত্যর্থে যজ্ঞে বালকটিকে আহুতি দিবার আয়োজন হইয়াছিল, সেইখান হইতে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। যাহা হউক, পিতার এই পোষ্যপুত্রগ্রহণ বিশ্বামিত্রের পঞ্চাশটি পুত্রের সমর্থন লাভ করেন নাই। ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র পুত্রদের অভিসম্পাত দেন যে তাঁহাদের সন্তানেরা যে উত্তরাধিকার লাভ করিবে তাহা একেবারে পৃথিবীর প্রান্ততম সীমায় (বিকল্পে, তাঁহাদের বংশধরেরা একেবারে সর্বনিম্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইবেন)। ইহারাই 'দস্যু' আখ্যাত অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, এবং মুতিব কোমের জন্মদাতা। এই গল্পের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মহাভারতের এবং কতিপয় পুরাণের একটি গল্পেও শুনিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের অন্যত্র, ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বাংলার সমুদ্রতীরবাসী কোমগুলিকে বলা হইয়াছে 'ম্লেচ্ছ'; ভাগবত পুরাণে কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, যবন, খস এবং সুহ্ম কোমের লোকদের বলা

হইয়াছে 'পাপ'। বোধায়নের ধর্মসূত্রে আরট্ট (পঞ্জাব), পুণ্ড্র, (উত্তর-বঙ্গ) সৌবীর (দক্ষিণ পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ), বঙ্গ (পূর্ব-বাংলা), কলিঙ্গ প্রভৃতি কোমের লোকদের অবস্থিতি নির্দেশ করা হইয়াছে আর্যবহির্ভূত দেশের প্রত্যন্ততম সীমায়; ইহাদের বলা হইয়াছে "সংকীর্ণ যোনয়ঃ", এবং এই সব দেশ একেবারে আর্য-সংস্কৃতির বাহিরে; এই সব জনপদে কেহ স্বল্পকালের প্রবাসে গেলেও ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বোধায়নের কালে বাংলাদেশের সঙ্গে পরিচয় যদি বা হইয়াছে, যাতায়াতও হয়তো কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তখনও আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দৃষ্টিতে এই সব অঞ্চলের লোকেরা ঘৃণিত এবং অবজ্ঞাত। এই ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রাচীন আর্য, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতেও কিছু কিছু দেখা যায়। আচারঙ্গ=আয়ারঙ্গ সূত্রের একটি গল্পে পথহীন রাঢ়দেশে মহাবীর এবং তাঁহার শিষ্যদের লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের যে-বর্ণনা আছে, বজ্রভূমিতে যে অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণের ইঙ্গিত আছে তাহাতে এই ঘৃণা ও অবজ্ঞা সুস্পষ্ট। বৌদ্ধ আর্যমঞ্জুশ্রীকল্প-গ্রন্থে গৌড়, পুণ্ড্র, সমতট ও হরিকেলের লোকদের ভাষাকে বলা হইয়াছে 'অসুর' ভাষা। এই সব বিচিত্র উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ইহারা এমন একটি সুদীর্ঘকালের স্মৃতি-ঐতিহ্য বহন করে যে-কালে আর্যভাষাভাষী এবং আর্য-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক উত্তর ও মধ্যভারতের লোকেরা পূর্বতম ভারতের বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, সুহ্ম প্রভৃতি কোমদের সঙ্গে পরিচিত ছিল না, যে-কালে এইসব কোমদের ভাষা ছিল ভিন্নতর, আচার-ব্যবহার অন্যতর। এই অন্যতর জাতি, অন্যতর আচার-ব্যবহার, অন্যতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং অন্যতর ভাষাভাষী লোকদের সেইজন্যই বিজেতা, উন্নত ও পরাক্রান্ততর জাতিসুলভ দর্পিত উন্নাসিকতায় বলা হইয়াছে, 'দস্যু', 'ম্লেচ্ছ', 'পাপ', 'অসুর' ইত্যাদি।

কিন্তু এই দর্পিত উন্নাসিকতা বহুকাল স্থায়ী হয় নাই। নানা বিরোধ-সংঘর্ষের ভিতর দিয়া এইসব দস্যু, ম্লেচ্ছ, অসুর, পাপ কোমের লোকদের সঙ্গে আর্যভাষাভাষী লোকদের মেলামেশা হইতেছিল। এই সব বিরোধ-সংঘর্ষের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানা পৌরাণিক গল্পে—রামায়ণে রঘুর দিগ্বিজয়, মহাভারতে কর্ণ, কৃষ্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয়, আচারঙ্গসূত্রে মহাবীরের রাঢ়দেশে জৈনধর্ম প্রচার ইত্যাদি প্রসঙ্গে। ইহাদের মধ্য দিয়াই আর্য ও আর্যপূর্ব সংস্কৃতির মিলনপথ প্রশস্ত হইতেছিল এবং আর্যপূর্ব সংস্কৃতির 'ম্লেচ্ছ' ও 'দস্যু'রা আর্যসমাজে স্বীকৃতি লাভ করিতেছিল। এই স্বীকৃতিলাভ ও আর্যসমাজে অন্তর্ভুক্তির দুইটি দৃষ্টান্ত আহরণ করা যাইতে পারে। রামায়ণে দেখা যাইতেছে, মৎস্য-কাশী-কোশল কোমের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-অঙ্গ-মগধ কোমের রাজবংশগুলি অযোধ্যা রাজবংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। ইহাপেক্ষাও আর একটি অর্থবহ গল্প আছে বায়ু ও মৎস্যপুরাণে, মহাভারতে। এই গল্পে অসুররাজ বলির স্ত্রীর গর্ভে বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমসের পাঁচটি পুত্র উৎপাদনের কথা বর্ণিত আছে; এই পাঁচপুত্রের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম; ইহাদের নাম হইতেই পাঁচ পাঁচটি কৌম জনপদের নামের উদ্ভব।

প্রাথমিক পরাভব ও যোগাযোগের পর বাংলাদেশের এইসব দস্যু ও ম্লেচ্ছ কোমগুলি ধীরে ধীরে আর্যসমাজ ব্যবস্থায় কথঞ্চিৎ স্বীকৃতি ও স্থান লাভ করিতে আরম্ভ করিল। এই স্বীকৃতি ও স্থানলাভ যে একদিনে ঘটে নাই, তাহা তো সহজেই অনুমেয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একদিকে বিরোধ ও সংঘর্ষ অন্যদিকে স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তি চলিয়াছিল—কখনও ধীর শান্ত, কখনও দ্রুত কঠোর প্রবাহে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পরাভব ঘটিয়াছিল আগে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরাভব ঘটিয়াছিল ক্রমে ক্রমে, অনেক পরে, এ সম্বন্ধেও সন্দেহের অবসর কম। মানব-ধর্মশাস্ত্রে আর্যাবর্তের সীমা দেওয়া হইতেছে পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্বসমুদ্রতীর পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রাচীন বাংলাদেশের অন্তত কিয়দংশও আর্যাবর্তের অন্তর্গত, এই যেন ইঙ্গিত। মনু পুণ্ড্র কোমের লোকদের বলিতেছেন 'ব্রাত্য' বা পতিত্ ক্ষত্রিয়, এবং তাহাদের পংক্তিভুক্ত করিতেছেন দ্রাবিড়, শক, চীন প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিদের সঙ্গে। মহাভারতের সভাপর্বে কিন্তু বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের যথার্থ ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে; জৈন প্রজ্ঞাপনা-গ্রন্থেও বঙ্গ এবং লাঢ় কোম দুটিকে আর্য কোম বলা হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মহাভারতেই দেখিতেছি, প্রাচীন বাংলার কোনও কোনও স্থান তীর্থ বলিয়া স্বীকৃত ও পরিগণিত হইতেছে, যেমন পুণ্ড্রভূমিতে করতোয়া তীর, সুহ্মদেশের ভাগীরথী সাগর-সঙ্গম। অর্জুন অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের তীর্থস্থানসমূহ পরিভ্রমণকালে ব্রাহ্মণদিগকে নানাপ্রকারে উপহৃত করিয়াছিলেন : বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে (৩য়-৪র্থ শতক) গৌড়-বঙ্গের ব্রাহ্মণদের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ বাংলা এবং বাঙালীর আর্যীকরণ ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে, ইহাই এইসব পুরাণকথার ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিতের সমর্থন পাওয়া যায় মহাভারত ও পুরাণগুলিতে। বায়ু ও মৎস্যপুরাণে, মহাভারতে বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্রদের তো ক্ষত্রিয়ই বলা হইয়াছে, এমন কি শবর, পুলিন্দ এবং কিরাতদেরও। কোনও কোনও বংশ যে ব্রাহ্মণ পর্যায়েও স্বীকৃত ও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, ঋষি দীর্ঘতমসের গল্পটি তাহার কতকটা প্রমাণ বহন করে। কিন্তু অধিকাংশ বিজিত লোকই স্বীকৃত ও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল শূদ্রবর্ণ পর্যায়ে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। মনু বলিতেছেন, পৌণ্ড্রক ও কিরাতেরা ক্ষত্রিয় ছিল, কিন্তু বহুদিন তাহারা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংস্পর্শে না আসায় তাহারা ব্রাহ্মণ্য পূজাচার প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছিল, এবং সেই হেতু তাহাদের শূদ্র পর্যায়ে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অন্যান্য কোমদের ক্ষেত্রেও বোধ হয় এইরূপ হইয়া থাকিবে। মনু কৈবর্তদের বলিয়াছেন সংকর বর্ণ, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ তাহাদের বলিতেছে "অব্রহ্মণ্য," অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-সমাজ বহির্ভূত। কিন্তু, একদিকে স্বীকৃতি-অন্তর্ভুক্তি এবং আর একদিকে উন্নীত-অবনীতকরণ যাহাই চলিতে থাকুক না কেন, এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর্য বর্ণ-বিন্যাসও বাংলা দেশে ক্রমশ তাহার মূল প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীরাই যে আর্য-সংস্কৃতি ও সমাজ-ব্যবস্থা বাংলাদেশে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহাই নয়, জৈন ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরাও এ-সম্বন্ধে সমান কৃতিত্বের দাবি করিতে পারেন।

তাঁহারা বেদবিরোধী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আর্য সমাজ-ব্যবস্থা বিরোধী ছিলেন না, এবং বর্ণ-ব্যবস্থাও একেবারে অস্বীকার করেন নাই।

মৌর্য ও শুঙ্গাধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া আর্য-সংস্কৃতি ও সমাজ-ব্যবস্থা ক্রমশ বাংলাদেশে অধিকতর প্রসার লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই, বিশেষত ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রের আধিপত্যকালে। কিন্তু, মহাস্থান লিপির গলদন পুরাদস্তর বাংলা নাম বলিয়াই মনে হইতেছে; প্রাকৃত গলদনকে সংস্কৃত গলর্দন করিলেও তাহার দেশজ রূপ অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায়। লিপিটির ভাষা প্রাকৃত; মৌর্য আমলের সব লিপির ভাষাই তো তাহাই; কিন্তু রাষ্ট্রে যে আর্য সামাজিক আদর্শ গৃহীত ও স্বীকৃত হইতেছিল তাহা সুস্পষ্ট। বোধ হয় এই সময় হইতেই ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার, রাষ্ট্রকর্ম প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া অধিকতর সংখ্যায় উত্তর-ভারতীয় আর্যভাষীরা বাংলাদেশে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিতে থাকে। কিন্তু আর্য, বৌদ্ধ, জৈন এবং সর্বোপরি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা গুপ্তকালের আগে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, এবং আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-ব্যবস্থাও বাংলাদেশে বোধ হয় তাহার আগে দানা বাঁধিয়া গড়িয়া উঠে নাই।

৪

বাংলাদেশের অধিকাংশ জনপদ গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সমাজ উত্তর-ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইতে আরম্ভ করে। এই যুগের লিপিমালাই তাহার নিঃসংশয় সাক্ষ্য বহন করিতেছে। লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলে অনেকগুলি তথ্য জানা যায়।

গুপ্ত পর্বের বর্ণ-বিন্যাস

প্রথমেই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে অগণিত ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠানের। ১ নং দামোদরপুর লিপিতে (খ্রীষ্টশতক ৪৪৩-৪৪) জনৈক কর্পটিকনামীয় ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র যজ্ঞকার্য সম্পাদনের জন্য ভূমিক্রয় প্রার্থনা করিতেছেন; ২ নং পট্টোলী দ্বারা (৪৪৮-৪৯) পঞ্চ মহাযজ্ঞের জন্য আর এক ব্রাহ্মণকে ভূমি দেওয়া হইতেছে; ধনাইদহ পট্টোলীর (৪৩২-৩৩) বলে কটকনিবাসী এক ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ কিছু ভূমি লাভ করিতেছেন; ৩ নং দামোদরপুর লিপিতে (৪৮২-৮৩) পাইতেছি নাভক নামে এক ব্যক্তি কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বসাইবার জন্য কিছু ভূমি ক্রয় করিতেছেন; ৪ নং দামোদরপুর লিপিতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, নগরশ্রেষ্ঠী রিভুপাল হিমালয়ের পাদদেশে ডোঙ্গাগ্রামে কোকামুখস্বামী, শ্বেতবরাহস্বামী এবং নামলিঙ্গের পূজা ও সেবার জন্য ভূমিক্রয় করিতেছেন; বৈগ্রাম পট্টোলীর (৪৪৭-৪৮) সংবাদ, ভোয়িল এবং ভাস্কর নামে দুই ভাই গোবিন্দস্বামীর নিত্য পূজার জন্য ভূমি ক্রয় করিতেছেন; ৫ নং দামোদর পট্টোলীতে (৫৪৩-৪৪) দেখিতেছি শ্বেতবরাহস্বামীর মন্দির সংস্কারের জন্য ভূমি ক্রয় করিতেছেন অযোধ্যাবাসী কুলপুত্রক অমৃতদেব। এই সব ক'টি লিপি

পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ভূমি সম্বন্ধীয়। এই অনুমান নিঃসংশয় যে, পঞ্চম শতকে উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, এই ধর্মের দেবদেবীরা পূজিত হইতেছেন, ব্রাহ্মণদের বসবাস বিস্তৃত হইতেছে, অব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করিতেছেন, আনিয়া বসবাস করাইতেছেন, এবং অযোধ্যাবাসী ভিন্-প্রদেশি আসিয়াও এই দেশে মন্দির সংস্কার করাইবার জন্য ভূমি ক্রয় করিতেছেন। যে-সব ব্রাহ্মণেরা আসিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে বেদবিদ্ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণও আছেন। উত্তর-বঙ্গের সংবাদ বোধ হয় আরও পাওয়া যায় কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার নিধনপুর লিপিতে। লিপিটি সপ্তম শতকের; পট্টোলী কর্ণসুবর্ণ জয়স্কান্ধাবার হইতে নির্গত; দত্তভূমি চন্দ্রপুরি বিষয়ের ময়ূরশাল্মলাগ্রহার ক্ষেত্র, এবং এই ভূমিদানকার্য ভাস্করের চারি পুরুষ পূর্বে বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্মাদ্বারা (আনুমানিক ষষ্ঠ শতকের প্রথম পাদ) প্রথম সম্পাদিত হইয়াছিল। চন্দ্রপুরি বিষয় বা ময়ূরশাল্মল অগ্রহার কোথায় তাহা আজও নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয় নাই, তবে উত্তর-বঙ্গের পূর্বতম সীমায় (রংপুর জেলায়) কিংবা একেবারে শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড (লিপির আবিষ্কার স্থান) অঞ্চল, এ-দুয়ের এক জায়গায় হওয়াই সম্ভব, যদিও রংপুর অঞ্চল হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। যাহাই হউক, এই লিপিতে দেখা যাইতেছে ময়ূরশাল্মল অগ্রহারে ভূতিবর্মা ভিন্ন ভিন্ন বেদের ৫৬টি বিভিন্ন গোত্রীয় অন্তত ২০৫ জন 'বৈদিক' বা 'সাম্প্রদায়িক' ব্রাহ্মণের বসতি করাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সকলেই বাজসনেয়ী, ছান্দোগ্য, বাহ্বৃচ্য, চারক্য এবং তৈত্তিরীয়, এই পাঁচটি বেদ-পরিচয়ের অন্তর্গত, তবে যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী-পরিচয়ের সংখ্যাই অধিক। চারক্য এবং তৈত্তিরীয়েরাও যজুর্বেদীয়; বাহ্বৃচ্য ঋগ্বেদীয়; ছান্দোগ্য সামবেদীয়। ইহাদের অধিকাংশের পদবী স্বামী। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই উত্তরপূর্ব-বাংলায় (ভিন্ন মতে, শ্রীহট্ট অঞ্চলে) পুরাদস্তুর ব্রাহ্মণ-সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বোক্ত অন্যান্য লিপির সাক্ষ্যও তাহাই। ভূমি দান-বিক্রয় যে সব গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে নিষ্পন্ন হইতেছে তাহাদের মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণের দর্শন মিলিতেছে; ইহাদের নামপদবী শর্মণ এবং স্বামী দুইই পাওয়া যাইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের খবর পাওয়া যাইতেছে বিজয়সেনের মল্লসারুল লিপি (ষষ্ঠ শতক) এবং জয়নাগের বপ্যঘোষবাট লিপিতে (সপ্তম শতক)। শেষোক্ত লিপিটিদ্বারা মহাপ্রতীহার সূর্যসেন বপ্যঘোষবাটনামক একটি গ্রাম ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামী নামে এক ব্রাহ্মণকে দান করিতেছেন; এই লিপিতেই খবর পাওয়া যাইতেছে কুক্কুট গ্রামের ব্রাহ্মণদের; ভট্ট উন্মীলন স্বামী এবং ভরণি স্বামী নামে আরও দুইটি ব্রাহ্মণের দেখা এখানেই মিলিতেছে; এক্ষেত্রেও নাম-পদবী স্বামী। মল্লাসারুল লিপিতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, দৈনিক পঞ্চ-মহাযজ্ঞ নিষ্পন্নের জন্য মহারাজ বিজয়সেন বৎসস্বামী নামক জনৈক ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণকে কিছু ভূমি দান করিতেছেন। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে রাঢ়া-রাষ্ট্রেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বর্ণব্যবস্থা ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই স্বীকৃত ও প্রসারিত হইয়াছে। এই তথ্যের প্রমাণ আরও পাওয়া যায় সম্প্রতি

আবিষ্কৃত শশাঙ্কের মেদিনীপুর লিপি দুইটিতে। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে দণ্ডভুক্তিদেশেও যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বর্ণব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছিল তাহা সিদ্ধান্ত করা যায় ইহাদের সাক্ষ্যে।

মধ্য ও পূর্ববঙ্গেও এই যুগে অনুরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গোপচন্দ্রের একটি পট্টোলীদত্ত ভূমির দানগ্রহীতা হইতেছেন লৌহিত্য-তীরবাসী জনৈক কাণ্বগোত্রীয় ব্রাহ্মণ, ভট্টগোমীদত্ত স্বামী। যে-মণ্ডলে (বারকমণ্ডলে; ফরিদপুর জেলায়) দত্ত ভূমির অবস্থিতি তাহার শাসনকর্তাও ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ, তাঁহার নাম বৎসপাল স্বামী। এই বংশের আর এক রাজা ধর্মাদিত্যের একটি পট্টোলীদত্ত ভূমির দানগ্রহীতা হইতেছেন ব্রাহ্মণ চন্দ্রস্বামী, আর একটির জনৈক বসুদেব স্বামী। শেষোক্ত পট্টোলীতে গর্গস্বামী নামে আর এক ব্রাহ্মণের ভূমিরও খবর পাওয়া যাইতেছে। তখনও বারকমণ্ডলের শাসনকর্তা একজন ব্রাহ্মণ, নাম গোপালস্বামী। ধর্মাদিত্যের প্রথম পট্টোলীটিতে গ্রামবাসিদের মধ্যেও দুইজন ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয়—একজনের নাম বৃহচ্চট্ট, আর একজনের কুলস্বামী। মহারাজ সমাচারদেবের ঘুগ্রাহাটি লিপির দত্তভূমির দানগ্রহীতাও একজন ব্রাহ্মণ, নাম সুপ্রতীক স্বামী এবং দান-গ্রহণের উদ্দেশ্য বলিচরুসত্র প্রবর্তন। ষষ্ঠ শতকের ফরিদপুর ছাড়িয়া সপ্তম শতকের ত্রিপুরার লোকনাথ লিপির সাক্ষ্যও একই প্রকার; এখানেও দেখিতেছি জনৈক ব্রাহ্মণ মহাসামন্ত প্রদোষশর্মণ অনন্তনারায়ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ২১১ জন চাতুর্বিদ্য ব্রাহ্মণের বসতি করাইবার জন্য পশুসংকুল বনপ্রদেশে ভূমিদান গ্রহণ করিতেছেন। গ্রামকুটম্বি অর্থাৎ গৃহস্থদের মধ্যে শর্মা ও স্বামী পদবীযুক্ত অনেক নাম পাইতেছি, যথা মঘশর্মা, হরিশর্মা, রুষ্টশর্মা, অহিশর্মা, গুপ্তশর্মা, ক্রমশর্মা, শুক্রশর্মা, কৈবর্তশর্মা, হিমশর্মা, লক্ষ্মণশর্মা, নাথশর্মা, অলাতস্বামী, ব্রহ্মস্বামী, মহাসেনভট্টস্বামী, বামনস্বামী, ধনস্বামী, জীবস্বামী, ইত্যাদি।

শুধু যে ব্রাহ্মণেরাই ভূমিদান লাভ করিতেছেন তাহাই নয়; জৈন ও বৌদ্ধ আচার্যরা এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানগুলিও অনুরূপ ভূমিদান লাভ করিয়াছেন। পঞ্চম শতকে উত্তর-বঙ্গে পাহাড়পুর অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি লিপিতে দেখিতেছি (৪৭৮-৭৯ খ্রী) জনৈক ব্রাহ্মণ নাথশর্মা এবং তাঁহার স্ত্রী রামী এক জৈন আচার্য গুহনন্দির বিহারে দানের জন্য কিছু ভূমি ক্রয় করিতেছেন। ষষ্ঠ শতকে (গুনাইঘর লিপি, ৫০৭-৮ খ্রী) ত্রিপুরা জেলায় জনৈক মহাযানাচার্য শান্তিদেব প্রতিষ্ঠিত আর্য অবলোকিতেশ্বরের আশ্রম-বিহারের মহাযানিক অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘের জন্য মহারাজ রুদ্রদত্ত কিছু ভূমি দান করিতেছেন। এই লিপিটিতেও একজন ব্রাহ্মণ কুমারামাত্য বেরজ্জ স্বামীর সংবাদ পাইতেছি। সপ্তম-অষ্টম শতকে ঢাকা জেলার আস্রফপুর অঞ্চলে দেখিতেছি জনৈক বৌদ্ধ আচার্য বন্দ্য সংঘমিত্র তাঁহার বিহার ইত্যাদির জন্য স্বয়ং রাজার নিকট হইতে প্রচুর ভূমিদান লাভ করিতেছেন।

উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ হইতে দেখা যাইতেছে শর্মা ও স্বামী পদবী ছাড়া ব্রাহ্মণদের

বোধ হয় অন্য পদবী-পরিচয়ও ছিল। যেমন, বৃহচ্চট্ট নামে চট্ট ; ভট্ট গোমিদত্ত স্বামী, ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামী, ভট্ট উন্মীলন স্বামী, ভট্ট বামন স্বামী, মহাসেন ভট্ট স্বামী এবং শ্রীনেত্র ভট (ভট্ট) প্রভৃতি নামে ভট্ট ; এবং বন্দ্য জ্ঞানমতি ও বন্দ্য সংঘমিত্র নামে বন্দ্য। বৃহচ্চট্টের চট্ট নামের অংশমাত্র বলিয়া মনে হইতেছে না। ব্রহ্মবীর, উন্মীলন, বামন এবং মহাসেন যে ব্রাহ্মণ তাহা তাঁহাদের স্বামী পদবীতেই পরিষ্কার ; কিন্তু তাহার পরেও যখন তাঁহাদের নামের পূর্বে অথবা মধ্যে অথবা পরে ভট্ট ব্যবহৃত হইতেছে তখন ভট্ট তাঁহাদের "গাঞি" পরিচয় হইলেও হইতে পারে। অথবা পণ্ডিত বা আচার্য অর্থেও 'ভট্ট' কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে। পরবর্তী কালের ভাট' অর্থ এই ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। শ্রীনেত্র ভট স্পষ্টই শ্রীনেত্র ভট্ট, এবং এক্ষেত্রে ভট্ট ব্যবহৃত হইয়াছে নামের পরে। বন্দ্য পূজনীয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে, অন্তত আচার্য বন্দ্য সংঘমিত্রের ক্ষেত্রে ; কিন্তু বন্দ্য জ্ঞানমতির ক্ষেত্রেও কি তাহাই ? এক্ষেত্রে বন্দ্য "গাঞি" পরিচয় হওয়া অসম্ভব নয়। চট্ট এবং বন্দ্য যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের অসংখ্য "গাঞি"-পরিচয়ের মধ্যে দু'টি, এ-তথ্য পরবর্তী স্মৃতি ও কুলজী-গ্রন্থে জানা যায়। 'ভট্ট' সম্বন্ধে কিছু জোর করিয়া বলা যায় না। যাহাই হউক, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই এই "গাঞি" পরিচয়ের রীতি প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা অসম্ভব এবং অনৈতিহাসিক না-ও হইতে পারে।

ব্রাহ্মণদের পদবী ও গাঞি (?) পরিচয়

ব্রাহ্মণদের শর্মা পদবী-পরিচয় বাংলাদেশে আজও সুপ্রচলিত। কিন্তু স্বামী পদবী-পরিচয় মধ্যযুগের সূচনা হইতেই অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। নিধনপুর লিপির সাক্ষ্য ও শ্রীহট্ট অঞ্চলের লোকস্মৃতি হইতে মনে হয়, ঐ লিপির দুই শতাধিক স্বামী পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণেরা বৈদিক (পরবর্তী কালের, সাম্প্রদায়িক) ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অনুমান হয়, ইঁহারা সকলেই বাংলাদেশের বাহির হইতে—পশ্চিম বা দক্ষিণ হইতে—আসিয়াছিলেন। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে তো এখনও ব্রাহ্মণদের স্বামী পদবী সুপ্রচলিত ; প্রাচীন কালেও তাহাই ছিল। উত্তর-ভারতেও যে তাহা ছিল তাহার প্রমাণ গুপ্তযুগের লিপিমালায়ই পাওয়া যায়। পরবর্তী কালের কুলজী-গ্রন্থে বৈদিক ব্রাহ্মণদের দুই শাখার পরিচয় পাওয়া যায় : পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য। এই সব স্বামী পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণেরা পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ হওয়া অসম্ভব নয়। ধনাইদহ পট্টোলীর দানগ্রহীতা বরাহস্বামী ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ, এবং তিনি আসিয়াছিলেন উড়িষ্যান্তর্গত কটক অঞ্চল হইতে। গোপচন্দ্রের একটি পট্টোলীর দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণটির নাম গোমিদত্ত স্বামী ; তিনি কাণ্বগোত্রীয় এবং লৌহিত্য-তীরবাসী। লৌহিত্য-তীরবর্তী কামরূপের ব্রাহ্মণেরা তো আজও নিজেদের পাশ্চাত্য বৈদিক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। অবশ্য, স্বামী পদবীর উপর নির্ভর করিয়া এ-সম্বন্ধে নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত কিছু করা চলে না। বাহির হইতে ব্রাহ্মণেরা যে বাংলাদেশে আসিতেছেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অযোধ্যাবাসী কুলপুত্রক অমৃতদেব স্বয়ং।

এই সব ব্রাহ্মণদের ছাড়া পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে রাজকর্মচারী,

গ্রামবাসী গৃহস্থ, প্রধান প্রধান লোক, নগরবাসী শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ এবং অন্যান্য লোকের নাম-পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে। কয়েকটি নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে: যথা, চিরাতদত্ত বেত্রবর্মা, ধৃতিপাল, বন্ধুমিত্র, ধৃতিমিত্র, শাম্বপাল, রিশিদত্ত (লক্ষণীয় এই যে, নামটির বানান ঋষিদত্ত হওয়া উচিত ছিল; সংস্কৃত রীতিপদ্ধতি তখনও অভ্যস্ত হয় নাই বলিয়া মনে করা চলে), জয়নন্দি, বিভুদত্ত, গুহনন্দি, দিবাকরনন্দি, ধৃতিবিষ্ণু, বিরোচন, রামদাস, হরিদাস, শশিনন্দী, দেবকীর্তি, ক্ষেমদত্ত, গোষ্ঠক, বর্গপাল, পিঙ্গল, সুংকুক, বিষ্ণুভদ্র, খাসক, রামক, গোপাল, শ্রীভদ্র, সোমপাল, রাম, পত্রদাস, স্থায়ণপাল, কপিল, জয়দত্ত, শণ্ডক, রিভুপাল, কুলবৃদ্ধি, ভোয়িল, ভাস্কর, নবনন্দী, জয়নন্দী ভটনন্দী, শিবনন্দী, দুর্গাদত্ত, হিমদত্ত, অর্কদাস, রুদ্রদত্ত, ভীম, ভামহ, বৎসভোজিক, নরদত্ত, বরদত্ত, বম্পিয়ক, আদিত্যবন্ধু, জোলারি, নগিজোদক, বুদ্ধক, কলক, সূর্য, মহীপাল, খন্দবিদুর্গ্‌গরিক, মণিভদ্র, যজ্ঞরাত, নাদভদক, গণেশ্বর, জিতসেন, রিভুপাল, স্থাণুদত্ত, মতিদত্ত, বিপ্রপাল, স্কন্দপাল, জীবদত্ত, পবিক্রক, দামুক, বৎসকুণ্ড, শুচিপালিত, বিহিতঘোষ, শূরদত্ত, প্রিয়দত্ত, জনার্দন, কুণ্ড, করণিক, নয়নাগ, কেশব, ইটিত, কুলচন্দ্র, গরুড়, আলুক, অনাচার, ভাশৈত্য, শুভদেব, ঘোষচন্দ্র, অনমিত্র, গুণচন্দ্র, কলসখ, দুর্লভ, সত্যচন্দ্র, প্রভুচন্দ্র, রুদ্রদাস, অর্জুনবপ্প (সোজাসুজি অর্জুনের বাপের সংস্কৃত রূপ; এই ধরণের ডাক-নাম আজও বাংলার পাড়াগাঁয়ে প্রচলিত), কুণ্ডলিপ্ত, নাগদেব, নয়সেন, সোমঘোষ, জন্মভূতি, সূর্যসেন, লক্ষ্মীনাথ, শ্রীমিত্রাবলি, বর্ণটিয়োক, শর্বান্তর, শিখর, পুরদাস, শক্রক, উপাসক, স্বস্তিয়োক, সুলব্ধ, রাজদাস, দুর্গ্‌গট ইত্যাদি। এই নামগুলি বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি তথ্য লক্ষ্যগোচর হয়। প্রথমত, অধিকাংশ নামের রূপ সংস্কৃত। কতকগুলি নামের দেশজ রূপ হইতে সংস্কৃতীকরণ হইয়াছে, যেমন বম্পিয়ক, খন্দবিদুর্গ্‌গরিক, অর্জুনবপ্প, বর্ণটিয়োক, দুর্গ্‌গট ইত্যাদি; আর কতকগুলির নামরূপ দেশজই থাকিয়া গিয়াছে, যেমন, জোলারি, নগিজোদক, কলক, নাদভদক, দামুক, আলুক, কলসখ, ইটিত, সংকুক, খাসক ইত্যাদি। 'অক্' বা 'ওক্' প্রত্যয় জুড়িয়া দিয়া দেশজ বা ভাষা শব্দের নামকে সংস্কৃত ক-কারান্ত পদরূপে দেখাইবার যে-রীতি আমরা পরবর্তী কালে বাংলা দেশে প্রচলিত দেখিতে পাই (যেমন সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে গৌড়-বঙ্গের কবিদের নাম-পরিচয়ে, এবং অন্যত্র) তাহাও এই যুগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, যথা, খাসক, রামক, বম্পিয়ক, বর্ণটিয়োক, নগিজোদক, নাদভদক, স্বস্তিয়োক ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত নামে জনসাধারণ সাধারণত কোনও পদবী ব্যবহার করিত না, শুধু পূর্বনামেই পরিচিত হইত (তেমন নামের সংখ্যাই অধিক), যেমন, পিঙ্গল, গোপাল, শ্রীভদ্র, রাম, কপিল, বিরোচন, দেবকীর্তি, গোষ্ঠক, শণ্ডক, ভোয়িল, ভাস্কর, ভামহ, বুদ্ধক, সূর্য, পবিক্রক, করণিক, কেশব, গরুড়, অনাচার, ভাশৈত্য, দুর্লভ, শর্বান্তর, শিখর, শক্রক, উপাসক, সুলব্ধ, গরুড় ইত্যাদি। তৃতীয়ত, এই নামগুলির মধ্যে কতকগুলি অন্ত্যনামের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে যেগুলি এখনও বাংলাদেশে নাম-পদবী হিসাবে

ব্যবহৃত হয়, যেমন, দত্ত, পাল, মিত্র, নন্দি-নন্দী, বর্মণ, দাস, ভদ্র, সেন, দেব, ঘোষ, কুণ্ড, পালিত, নাগ, চন্দ্র, এমন কি দাম (দাঁ), ভূতি, বিষ্ণু, যশ, শিব, রুদ্র ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে এগুলি অন্ত্যনাম এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নামেরই অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই অনুমানও হয়তো করা চলে। চতুর্থত, এই সব অন্ত্যনাম আজকাল যেমন বর্ণজ্ঞাপক, পঞ্চম-অষ্টম শতকে তেমন ছিল না, তবে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের লোকেরাই এই অন্ত্যনামগুলি ব্যবহার করিতেন; ব্রাহ্মণেরা শুধু শর্মা বা স্বামী পদবী এবং ভট্ট, চট্ট, বন্দ্য প্রভৃতি "গাঞি"-পরিচয় গ্রহণ করিতেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত বোধ হয় করা যায়। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য তথাকথিত 'ভদ্র' জাতের মধ্যে (বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত উত্তম-সংকর ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণোক্ত সৎশূদ্র জাতের মধ্যে) চন্দ্র, গুপ্ত, নাগ, দাস, আদিত্য, নন্দী, মিত্র, শীল, ধর, কর, দত্ত, রক্ষিত, ভদ্র, দেব, পালিত প্রভৃতি নামাংশ বা পদবীর ব্যবহার এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়া হিন্দু আমলের শেষেও যে চলিতেছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের গৌড়-বঙ্গীয় কবিদের নামের মধ্যে। একথা সত্য, বাংলার বাহিরে, বিশেষভাবে গুজরাত্-কাথিয়াবাড় অঞ্চলে প্রাচীন কালে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যেও দত্ত, নাগ, মিত্র, ঘোষ, এবং বর্মা ইত্যাদি অন্ত্যনামের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু বাংলার এই লিপিগুলিতে এই সব অন্ত্যনাম যে-সব ক্ষেত্রে ব্যবহার হইতেছে, তাঁহাদের একজনকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হইতেছে না; ব্রাহ্মণেরা যেন সর্বত্রই শর্মা বা স্বামী এই অন্ত্যনামে পরিচিত হইতেছেন, অথবা ভট্ট, চট্ট, বন্দ্য প্রভৃতি উপ বা অন্ত্যনামে।

লিপিগুলিতে অনেক ব্যক্তি-নামের উল্লেখ যেমন আছে, তেমনই আছে অনেক স্থান-নামের উল্লেখ। এই নামগুলি বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায়, কতকগুলি নামের রূপ পুরাপুরি সংস্কৃত, যেমন, পুণ্ড্রবর্ধন, কোটীবর্ষ, পঞ্চনগরী, নব্যাবকাশিকা, সুবর্ণবীথি, ঔদম্বরিক (বিষয়), চণ্ডগ্রাম, কর্মান্তবাসক, শিলাকুণ্ড, পলাশবৃন্দক, স্বচ্ছন্দপাটক ইত্যাদি। কতকগুলি নামের দেশজরূপ হইতে সংস্কৃতীকরণ হইয়াছে, যেমন, বায়িগ্রাম, পৃষ্ঠিম-পোট্টক, গোষাটপুঞ্জক, খাড়া(টা)পার, ত্রিবৃতা, ত্রিঘট্টিক, রোল্লবায়িকা ইত্যাদি। আবার, কতকগুলির নাম এখনও দেশজ রূপেই থাকিয়া গিয়াছে, যেমন, কুট্‌কুট্, নাগিরট্ট, ডোঙ্গা (গ্রাম), কণমোটিকা ইত্যাদি। মনে হয়, ব্যক্তি-নামের ক্ষেত্রে যেমন স্থান-নামের ক্ষেত্রেও তেমনই, আর্যীকরণ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

উপরোক্ত অন্ত্যনামগুলি যাঁহাদের ব্যক্তিনামের সঙ্গে ব্যবহৃত হইতেছে তাঁহারা কোন বর্ণ বা উপবর্ণের স্থির করিবার কোনও উপায় নাই, একথা আগেই বলিয়াছি। এই যুগের

কায়স্থ-করণ

লিপিগুলিতে কায়স্থ নামে পরিচিত এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর সংবাদ পাওয়া যায়, যেমন, প্রথম-কায়স্থ শাম্বপাল, স্কন্দপাল, বিপ্রপাল, করণ-কায়স্থ নরদত্ত, কায়স্থ প্রভুচন্দ্র, রুদ্রদাস, দেবদত্ত, কৃষ্ণদাস, জ্যেষ্ঠকায়স্থ নলসেন, ইত্যাদি।

ইঁহারা যে রাজকর্মচারী এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। কায়স্থ বলিতে মূলত কোনও বর্ণ বা উপবর্ণ বুঝাইত না। কোষকার বৈজয়ন্তী (একাদশ শতক) কায়স্থ অর্থে বলিতেছেন লেখক, এবং কায়স্থ ও করণ সমার্থক, ইহাও বলিতেছেন। ক্ষীরস্বামী কৃত অমরকোষের টীকায়ও করণ বলিতে কায়স্থদের মতই একশ্রেণীর রাজকর্মচারীকে বুঝান হইয়াছে। গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের দুইটি পট্টোলীর লেখক জল্হণ একটিতে নিজের পরিচয় দিতেছেন কায়স্থ বলিয়া, আর একটিতে তিনি "করণিকোদ্গতো"। চান্দেল্লরাজ ভোজবর্মার অজয়গড় লিপিতেও করণ ও কায়স্থ সমার্থক বলিয়া ধরা হইয়াছে। কায়স্থরা যে রাজকর্মচারী তাহা প্রাচীন বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিদ্বারাও সমর্থিত। বিষ্ণুস্মৃতিমতে তাঁহারা রাজকীয় দলিল-পত্রাদির লেখক ছিলেন; যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির টীকাকার বলেন কায়স্থরা ছিলেন লেখক ও হিসাবরক্ষক। এখনও তো বিহার অঞ্চলে হিসাব রাখার লিখনপদ্ধতির যে বিশিষ্ট ধরণ তাহাকে বলা হয় "কাইথী" লিপি। করণ শব্দও লেখক ও হিসাবরক্ষক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; সমস্ত পরবর্তী সাক্ষ্যের ইঙ্গিতই এইরূপ *। দু'এক ক্ষেত্রে মাত্র করণ ও কায়স্থ দুইটি শব্দ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন ৮৭০ খ্রীস্টাব্দের গুরমহা তাম্র পট্টোলীতে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে কিন্তু করণ ও কায়স্থ সমার্থক বলা হইয়াছে। উত্তর-বিহারে করণ সম্প্রদায় এখনও কায়স্থদেরই একটি শাখা বলিয়া পরিগণিত; উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থরা আজও অনেকে নিজেদের করণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মেদিনীপুর, ওড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশের করণরা চিত্রগুপ্তকেই তাঁহাদের আদিপুরুষ বলিয়া মনে করেন; বাঙালী কায়স্থরাও তো তাহাই করেন। প্রাচীন কালে যাহাই হউক, পরবর্তী কালে অর্থাৎ খ্রীস্টীয় নবম-দশম শতক নাগাদ বাংলাদেশে করণ ও কায়স্থ সমার্থক বলিয়াই বিবেচিত হইত; ভারতের অন্যত্রও হইত। বাংলাদেশে করণেরা ক্রমে কায়স্থ নামের মধ্যেই বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন। যাহাই হউক, আমরা যে-যুগের আলোচনা করিতেছি অর্থাৎ মোটামুটি গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে বাংলার লিপিগুলিতে কায়স্থ শব্দের ব্যবহার যেমন পাইতেছি, তেমনই পাইতেছি করণ শব্দেরও। এ-তথ্য মোটামুটি নিঃসংশয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যে, এই যুগের লিপিগুলিতে কায়স্থ কোনও বর্ণ বা উপবর্ণজ্ঞাপক শব্দ নয়—বৃত্তিবাচক শব্দ, অর্থাৎ কায়স্থরা এই যুগে এখনও বর্ণ বা উপবর্ণ হিসাবে গড়িয়া উঠেন নাই। এই যুগের অন্তত দুইটি লিপিতে করণদের উল্লেখ পাইতেছি। গুনাইঘর পট্টোলীর লেখক সন্ধিবিগ্রহাধিক নরদত্ত ছিলেন করণ-কায়স্থ, এবং ত্রিপুরার লোকনাথ পট্টোলীর মহারাজ লোকনাথও নিজের পরিচয় দিতেছেন করণ বলিয়া। করণ-কায়স্থ বলিয়া নরদত্তের

---

*করণ কথার মূল অর্থ, খোদাই যন্ত্র, কাটিবার যন্ত্র; এই অর্থে 'করুণি' কথাটি আজও ব্যবহৃত হয়। ইতিহাসের গোড়ার দিকে লেখার কাজটা করণ জাতীয় কোন খোদাই যন্ত্রদ্বারাই বোধ হয় নিষ্পন্ন হইত। সেই অর্থে পরবর্তীকালে লেখক মাত্রেই সম্ভবত 'করণ' নামে পরিচিত হইতেন। কোন সময় হইতে করণ ও কায়স্থ সমার্থক বলিয়া ধরা হইতে আরম্ভ করে বলা কঠিন।

আত্মপরিচয় লক্ষ্যণীয়; করণ এবং কায়স্থ একেবারে সমার্থক একথা স্পষ্ট না হইলেও উভয়ের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ বিদ্যমান তাহা এই ধরনের উল্লেখের মধ্যে যেন সুস্পষ্ট। লোকনাথের করণ-পরিচয়ও অন্যদিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মাতামহ কেশবকে বলা হইয়াছে 'পারশব', পিতামহ 'দ্বিজবর', প্রপিতামহ 'দ্বিজসত্তমা', এবং বৃদ্ধপ্রপিতামহ নাকি ছিলেন মুনি ভরদ্বাজের বংশধর। 'পারশব কেশব' কথার অর্থ তো এই যে, কেশবের ব্রাহ্মণ পিতা একজন শূদ্রাণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অথচ, কেশব ছিলেন রাজার সৈন্যাধ্যক্ষ, এবং সমসাময়িক রাষ্ট্রে ও সমাজে তিনি যথেষ্ট মান্যও ছিলেন! ব্রাহ্মণ বর ও শূদ্র কন্যার বিবাহ বোধ হয় তখনও সমাজে নিন্দনীয় ছিল না; পরবর্তী কালেও নিন্দনীয় না হউক অপ্রচলিত যে ছিল না তাহা তো স্মৃতিকার ভবদেব ভট্ট এবং জীমূতবাহনের রচনা হইতেই জানা যায়। লোকনাথের নিজের করণ-পরিচয়ের কারণ বলা বড় কঠিন। বুঝা যাইতেছে, লোকনাথের পিতা একজন পারশব-দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; এই জন্যই কি লোকনাথ বর্ণসমাজে নীচে নামিয়া গিয়াছিলেন, অথবা, তাঁহার পিতাও ছিলেন করণ? এক্ষেত্রে করণ বর্ণ না বৃত্তিবাচক শব্দ তাহাও কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতেছে না। যাহা হউক, এইটুকু বুঝা গেল, করণ বা কায়স্থ এখনও নিঃসন্দেহে বর্ণ বা উপবর্ণ হিসাবে বিবেচিত হইতেছে না; এই দুই শব্দেরই ব্যবহার মোটামুটি বৃত্তিবাচক, তবে বৃত্তি ক্রমশ বর্ণে বিধিবদ্ধ হইবার দিকে ঝুঁকিতেছে।

উপরে আলোচিত ও বিশ্লেষিত নামগুলির মধ্যে আর কোন্ কোন্ বর্ণ বা উপবর্ণ আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা বলিবার উপায় নাই: অন্তত বিশেষ ভাবে কোনও বর্ণ বা উপবর্ণ উল্লিখিত হইতেছে না। অন্ত্যনাম হিসাবে বর্মা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাওয়া যাইতেছে, যেমন বেত্রবর্মা, সিংহবর্মা, চন্দ্রবর্মা ইত্যাদি। এই যুগে বর্মণান্ত্য নাম উত্তর-ভারতের অন্যত্র ক্ষত্রিয়ত্ব জ্ঞাপক; কিন্তু বেত্রবর্মা, চন্দ্রবর্মা ক্ষত্রিয় কিনা বলা কঠিন, অন্তত তেমন দাবি কেহ করিতেছেন না। রাজা-রাজন্যরা তো সাধারণত ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করিয়াই থাকেন, কিন্তু সমসাময়িক বাংলার রাজা-রাজন্যদের পক্ষ হইতেও তেমন দাবি কেহই জানান নাই। পরবর্তী পাল রাজাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিও নিঃসংশয় নয়; কেবল বিদেশাগত কোনও কোনও রাজবংশ এই দাবি করিয়াছেন। বস্তুত, বাংলার স্মৃতি-পুরাণে-ঐতিহ্যে ক্ষত্রিয়-বর্ণের সবিশেষ দাবি কাহারও যেন নাই! নগরশ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, ব্যাপারী-ব্যবসায়ীর উল্লেখ এ-যুগে প্রচুর; কিন্তু তাহাদের পক্ষ হইতেও বৈশ্যত্বের দাবি কেহ করিতেছেন না—সমসাময়িক কালে তো নয়ই, পরবর্তী কালেও নয়। বাংলার স্মৃতি-পুরাণ-ঐতিহ্যে বিশিষ্ট পৃথক বর্ণ হিসাবে বৈশ্যবর্ণের স্বীকৃতি নাই। বল্লাল-চরিত-গ্রন্থে বণিক-সুবর্ণ-বণিকদের বৈশ্যত্বের দাবি করা হইয়াছে; কিন্তু এ-সাক্ষ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। অন্যত্র কোথাও কাহারও সে দাবি নাই; স্মৃতিগ্রন্থাদিতে নাই, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পর্যন্ত নাই। বস্তুত, বাংলাদেশে কোনও কালেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুনির্দিষ্ট বর্ণহিসাবে

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য

গঠিত ও স্বীকৃত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয় না; অন্তত তাহার সপক্ষে বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক কোনও প্রমাণ নাই। ইহার কারণ কি বলা কঠিন। বহুদিন আগে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিয়াছিলেন, বাংলার আর্যীকরণ ঋগ্বেদীয় আর্য সমাজব্যবস্থানুযায়ী হয় নাই, সেই জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র লইয়া যে চাতুর্বর্ণ্য-সমাজ, বাংলাদেশে তাহার প্রচলন নাই। বাংলার বর্ণসমাজ অ্যাল্পীয় আর্য সমাজব্যবস্থানুযায়ী গঠিত, এবং অ্যাল্পীয় আর্যভাষীরা ঋগ্বেদীয় আর্যভাষী হইতে পৃথক। চন্দ মহাশয়ের এই মত যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহার মধ্যে বাংলার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের প্রায়ানুপস্থিতির কারণ নিহিত থাকা অসম্ভব নয়। বাংলার বর্ণবিন্যাস ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রবর্ণ ও অন্ত্যজ-ম্লেচ্ছদের লইয়া গঠিত; করণ-কায়স্থ, অম্বষ্ঠ-বৈদ্য এবং অন্যান্য সংকর বর্ণ সমস্ত শূদ্র-পর্যায়ে; সর্বনিম্নে অন্ত্যজ বর্ণের লোকেরা। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের এই বর্ণবিন্যাস পঞ্চম-অষ্টম শতকে খুব সুস্পষ্টভাবে দেখা না দিলেও তাহার মোটামুটি কাঠামো এই যুগেই গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই অনুমান করা চলে। কারণ, এই যুগের লিপিগুলিতে তিনটি দ্বিজবর্ণের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণদেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ধরা পড়িতেছে; আর যাঁহারা, তাঁহারা এবং অন্যান্যেরা বিচিত্র জীবন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া শূদ্রান্তর্গত বিভিন্ন উপবর্ণ গড়িয়া তুলিতেছেন মাত্র। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের কোন ইঙ্গিত-আভাস কিছুই নাই।

৫

পাল যুগ
বর্ণ-বিন্যাসের তৃতীয় পর্ব

বর্ণ হিসাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের ইঙ্গিত-আভাস পরবর্তী পাল আমলেও দেখা যাইতেছে না। একমাত্র "রামচরিত" গ্রন্থের টীকাকার পাল-বংশকে ক্ষত্রিয়-বংশ বলিয়া দাবি করিয়াছেন। কিন্তু এই ক্ষত্রিয় কি বর্ণ অর্থে ক্ষত্রিয়? রাজা-রাজন্য মাত্রই তো ক্ষত্রিয়; সমসাময়িক কালে সব রাজবংশই তো ক্ষত্রিয় বলিয়া নিজেদের দাবি করিয়াছে, এবং একে অন্যের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। রাজা-রাজন্যের বিবাহ-ব্যাপারে কোনও বর্ণগত বাধা-নিষেধ কোনো কালেই ছিল না। তারানাথ তো বলিতেছেন, গোপাল ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে জনৈক বৃক্ষদেবতার পুত্র, এ-গল্প নিঃসন্দেহে টটেম-স্মৃতিবহ! আবুল ফজল বলেন পাল রাজারা কায়স্থ; মঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থ তাঁহাদের সোজাসুজি বলিয়াছে দাসজীবী। পালেরা বৌদ্ধ ছিলেন, এবং মনে রাখা দরকার, তারানাথ এবং মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার দুইজনই বৌদ্ধ। পালেরা যে বর্ণ-হিসাবে দ্বিজশ্রেণীর কেহ ছিলেন না, তারানাথ, আবুল ফজল এবং শেষোক্ত গ্রন্থের লেখক সকলের ইঙ্গিতই যেন সেই দিকে। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বর্ণের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছি না। তবে রাজা, রাণক, রাজন্যক প্রভৃতিরা ক্ষত্রিয় বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন, এমন অনুমান হয়তো অসম্ভব নয়; কিন্তু বর্ণ হিসাবে তাঁহারা যথার্থই ক্ষত্রিয় ছিলেন কিনা সন্দেহ। ক্ষত্রিয়-পরিবারে বিবাহ অনেক রাজাই করিয়াছেন, কিন্তু শুধু তাহাই ক্ষত্রিয়ত্ব জ্ঞাপক হইতে পারে না।

করণ-কায়স্থদের অস্তিত্বের প্রমাণ অনেক পাওয়া যাইতেছে। রামচরিতের কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা ছিলেন "করণানামাগ্রণী", অর্থাৎ করণ কুলের শ্রেষ্ঠ; তিনি ছিলেন পালরাষ্ট্রের সন্ধিবিগ্রহিক। শব্দপ্রদীপ নামে একখানি চিকিৎসা-গ্রন্থের লেখক আত্মপরিচয় দিতেছেন "করণান্বয়" অর্থাৎ করণ-বংশজাত বলিয়া; তিনি নিজে রাজবৈদ্য ছিলেন, তাঁহার পিতা ও প্রপিতামহ যথাক্রমে পালরাজ রামপাল ও বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের রাজবৈদ্য ছিলেন।

করণ-কায়স্থ

ন্যায়কন্দলী-গ্রন্থের লেখক শ্রীধরের (৯৯১ খ্রী) পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাণ্ডুদাস; তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে 'কায়স্থ কুলতিলক' বলিয়া। পাণ্ডুদাসের বাড়ী বাংলাদেশে বলিয়াই তো মনে হইতেছে, যদিও এ-সম্বন্ধে নিঃসংশয় প্রমাণ নাই। তিব্বতী গ্রন্থ পাগ্-সাম-জোন্-জাং (Pag-Sam-Jon-Zang) পাল-সম্রাট ধর্মপালের এক কায়স্থ রাজকর্মচারীর উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহার নাম দঙ্গদাস। জড্ঢ নামে গৌড়দেশবাসী এক করণিক খাজুরাহোর একটি লিপির (৯৫৪) লেখক। যুক্তপ্রদেশের পিলিভিট্ জেলায় প্রাপ্ত দেবল প্রশস্তির (৯৯২) লেখক তক্ষাদিত্যও ছিলেন একজন গৌড়দেশবাসী করণিক। চাহমানরাজ রায়পালের নাডোল লিপির লেখক ছিলেন (১১৪১) ঠকুর পেথড নামে জনৈক গৌড়ান্বয় কায়স্থ। বীসলদেবের দিল্লী-শিবালিক স্তম্ভলিপির (১১৬৩) লেখক শ্রীপতিও ছিলেন একজন গৌড়ান্বয় কায়স্থ। সমসাময়িক উত্তর ও পশ্চিম ভারতে করণ-কায়স্থেরা পৃথক স্বতন্ত্র বর্ণ বা বংশ বলিয়া গণ্য হইত, এ-সম্বন্ধে অনেক লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। রাষ্ট্রকূট অমোঘবর্ষের একটি লিপিতে (নবম শতক) বলভ-কায়স্থ বংশের উল্লেখ, ১১৮৩ বা ১১৯৩ খৃষ্টাব্দের একটি লিপিতে কায়স্থ বংশের উল্লেখ প্রভৃতি হইতে মনে হয় নবম-দশম-একাদশ শতকে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের সর্বত্রই কায়স্থরা বর্ণহিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাস্তু হইতে উদ্ভূত এই অর্থে বাস্তব্য কায়স্থের উল্লেখও একাধিক লিপিতে পাওয়া যাইতেছে; একাদশ শতকের আগে এই বাস্তব্য কায়স্থেরা কালঞ্জর নামক স্থানে বাস করিতেন, এই তথ্যও এই লিপিগুলি হইতে জানা যাইতেছে। বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত এই আমলের একটি লিপিতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে, বাস্তব্য কায়স্থেরা করণবৃত্তি অনুসরণ করিত; এবং তাহাদের বর্ণ বা উপবর্ণকে যেমন বলা হইয়াছে কায়স্থ তেমনই বলা হইয়াছে করণ, অর্থাৎ করণ এবং কায়স্থ যে বর্ণহিসাবে সমার্থক ও অভিন্ন তাহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। নবম-দশম শতক নাগাদ বাংলাদেশেও করণ-কায়স্থেরা বর্ণহিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন, এই সম্বন্ধে অন্তত একটি লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। শাকম্ভরীর চাহমানাধিপ দুর্লভরাজের কিনসরিয়া লিপির (৯৯৯) লেখক ছিলেন গৌড়দেশবাসী মহাদেব; মহাদেবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে "গৌড়কায়স্থবংশ" বলিয়া।

কায়স্থদের বর্ণগত উদ্ভব সম্বন্ধে লিপিমালায় এবং অর্বাচীন স্মৃতিগ্রন্থাদিতে নানা প্রকার কাহিনী প্রচলিত দেখা যায়। বেদব্যাস স্মৃতিমতে কায়স্থরা শূদ্রপর্যায়ভুক্ত।

উদয়সুন্দরীকথা-গ্রন্থের লেখক কবি সোঢ্ঢল (একাদশ শতক) কায়স্থবংশীয় ছিলেন; তাঁহার যে বংশ-পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখা যায় কায়স্থরা ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিয়া দাবি করিতেন। ১০৪৯ খ্রীস্টাব্দের কলচুরীরাজ কর্ণের জনৈক কায়স্থ মন্ত্রীর একটি লিপিতে কায়স্থদের বলা হইয়াছে 'দ্বিজ' (৩৪ শ্লোক); অন্য স্থানে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে তাঁহারা ছিলেন শূদ্র। ব্রাহ্মণেরাও যে করণবৃত্তি গ্রহণ করিতেন তাহার একাধিক লিপি-প্রমাণ বিদ্যমান। ভাস্করবর্মার নিধনপুর লিপি-কথিত জনৈক ব্রাহ্মণ জনার্দন স্বামী ছিলেন ন্যায়-করণিক। এই লিপিতে জনৈক কায়স্থ দুন্দুনাথেরও উল্লেখ আছে। উদয়পুরের ধোড়লিপিতে (১১৭১) এক করণিক ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। করণিক শব্দ এইসব ক্ষেত্রে যে বৃত্তিবাচক সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; তবে, সাম্প্রতিক কালে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, বাংলার কায়স্থরা নাগর ব্রাহ্মণদের বংশধর, এবং এইসব নাগর ব্রাহ্মণ পঞ্জাবের নগরকোট, গুজরাট-কাথিয়াবাড়ের আনন্দপুর (অন্য নাম নগর) প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন। এই মত সকলে স্বীকার করেন না; এ-সম্বন্ধে একাধিক বিরুদ্ধ-যুক্তি যে আছে সত্যই তাহা অস্বীকার করা যায় না। বিদেশ হইতে নানাশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বাংলাদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছেন, তাহার প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান; কিন্তু পৃথক পৃথক বর্ণস্তর গড়িয়া তুলিবার মতন এত অধিক সংখ্যায় তাঁহারা কখনো আসিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ নাই।

বৈদ্য-অম্বষ্ঠ

পাল আমলের সুদীর্ঘ চারিশত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের অন্যত্র বৈদ্যবংশও পৃথক উপবর্ণ হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থাদিতে বর্ণহিসাবে বৈদ্যের উল্লেখ নাই; অর্বাচীন স্মৃতি-গ্রন্থে চিকিৎসাবৃত্তিধারী লোকদের বলা হইয়াছে বৈদ্যক। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ সমার্থক বলিয়া ধরা হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য দুই পৃথক উপবর্ণ বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার সহবাসে উৎপন্ন অম্বষ্ঠ সংকর বর্ণের উল্লেখ একাধিক স্মৃতি ও ধর্মসূত্র গ্রন্থে পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত অম্বষ্ঠ-বৈদ্যের অভিন্নতা পরবর্তী কালে বাংলাদেশে স্বীকৃত হইয়াছিল; চন্দ্রপ্রভা-গ্রন্থ এবং ভট্টিটীকার বৈদ্য লেখক ভরতমল্লিক (সপ্তদশ শতক) অম্বষ্ঠ এবং বৈদ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বাংলার বাহিরে সর্বত্র এই অভিন্নতা স্বীকৃত নয়; বর্তমান বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের কোনও কোনও কায়স্থ সম্প্রদায় নিজেদের অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন; এবং অন্তত একটি অর্বাচীন সংহিতায় (সূত-সংহিতা) অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যদের অভিন্ন বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, দক্ষিণতম ভারতে অষ্টম শতকেই—কোন কোন লিপি সাক্ষ্য অনুযায়ী আরো কিছু আগেই—বৈদ্য উপবর্ণের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। জনৈক পাণ্ড্যরাজার তিনটি লিপিতে কয়েকজন বৈদ্য সামন্তের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, এবং ইহারা প্রত্যেকেই সমসাময়িক রাষ্ট্র ও সমাজে সম্ভ্রান্ত ও পরাক্রান্ত বলিয়া গণিত হইতেন, তাহা বুঝা যাইতেছে। ইহাদের একজনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে

বৈদ্য এবং "বৈদ্যকশিখামণি" বলিয়া; তিনি একজন প্রখ্যাত সেনানায়ক এবং রাজার অন্যতম উত্তরমন্ত্রী ছিলেন। আর একজনের জন্মের ফলে বঙ্গলগুের বৈদ্যকুল উজ্জ্বল হইয়াছিল; তিনি ছিলেন গীতবাদ্যে সুনিপুণ। আরও এক জনের পরিচয় বৈদ্যক হিসাবে; তিনি ছিলেন একাধারে কবি, বক্তা এবং শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত। এই লিপিগুলির 'বৈদ্যকুল', 'বৈদ্য' 'বৈদ্যক' শব্দগুলি ভিষক্‌বৃত্তিবাচক বলিয়া মনে হইতেছে না, এবং বৈদ্যকুল বলিতে যেন কোনো উপবর্ণ ই বুঝাইতেছে। বাংলার সমসাময়িক কোনো লিপি বা গ্রন্থে এই অর্থে বা অন্য কোনো অর্থে বৈদ্যক, বা বৈদ্যকবংশ বা বৈদ্যককুলের কোনো উল্লেখ নাই। বস্তুত, তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় পরবর্তী পাল ও সেন-বর্মণ যুগে, একাদশ শতকের পাল লিপিতে, দ্বাদশ শতকে শ্রীহট্টজেলায় রাজা ঈশানদেবের ভাটেরা লিপিতে। ঈশানদেবের অন্যতম পট্টনিক বা মন্ত্রী বনমালী কর ছিলেন "বৈদ্যবংশ প্রদীপ"। পাল-চন্দ্রযুগে কিন্তু দেখিতেছি শব্দপ্রদীপ-গ্রন্থের লেখক, তাঁহার পিতা এবং প্রপিতামহ, যাঁহারা সকলেই ছিলেন রাজবৈদ্য বা চিকিৎসক, তাঁহাদের আত্মপরিচয় 'করণ' বলিয়া। সেইজন্য মনে হয়, একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে, অন্তত বাংলাদেশে, বৃত্তিবাচক বৈদ্য-বৈদ্যক শব্দ বর্ণ বা উপবর্ণ-বাচক বৈদ্য শব্দে বিবর্তিত হয় নাই, অর্থাৎ বৈদ্যবৃত্তিধারীরা বৈদ্য-উপবর্ণে গঠিত ও সীমিত হইয়া উঠেন নাই।

কিন্তু পূর্বোক্ত পাণ্ড্যরাজার একটি লিপিতে যে বঙ্গলগুের বৈদ্যকুলের কথা বলা হইয়াছে, এই বঙ্গলগু কোথায়? এই বঙ্গলগুের সঙ্গে কি বঙ্গ-বঙ্গালজনের বা বঙ্গাল-দেশের কোনও সম্বন্ধ আছে? আমার যেন মনে হয়, আছে। এই বৈদ্যকুল বঙ্গ বা বঙ্গালদেশ (দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ) হইতে দক্ষিণ প্রবাসে যায় নাই তো? বাংলাদেশে বৈদ্যকুল এখনও বিদ্যমান; দক্ষিণতম ভারতে কিন্তু নাই, মধ্যযুগেও ছিল বলিয়া কোনো প্রমাণ নাই। তাহা ছাড়া পূর্বোক্ত তিনটি লিপিই একটি রাজার রাজত্বের, এবং যে-তিনটি বৈদ্য-প্রধানের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা যেন একই পরিবারভুক্ত। এইসব কারণে মনে হয়, বৈদ্যকুলের এই পরিবারটি বঙ্গ বা বঙ্গালদেশ হইতে দক্ষিণ-ভারতে গিয়া হয়তো বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্গলগু হয়ত পাণ্ড্যদেশে বঙ্গ-বঙ্গাল দেশবাসীর একটি উপনিবেশ, অথবা একেবারে মূল বঙ্গ-বঙ্গালভূমি। যদি এই অনুমান সত্য হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, অষ্টম শতকেই বাংলাদেশে বৈদ্য উপবর্ণ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

পাল আমলে কৈবর্তদের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। বরেন্দ্রী-কৈবর্তনায়ক দিব্য বা দিব্বোক পালরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান সামন্ত কর্মচারী ছিলেন বলিয়া মনে হয়; অনন্তসামন্তচক্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পালরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপরায়ণ হইয়া রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করেন, এবং বরেন্দ্রী কাড়িয়া লইয়া সেখানে কৈবর্তাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বরেন্দ্রী কিছুদিনের জন্য দিব্য, রুদোক ও ভীম এই তিন কৈবর্তরাজার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, সমসাময়িক উত্তরবঙ্গ-সমাজে কৈবর্তদের সামাজিক

কৈবর্ত

অভাব ও আধিপত্য, জনবল ও পরাক্রম যথেষ্টই ছিল। বিষ্ণুপুরাণে কৈবর্তদের বলা হইয়াছে অব্রহ্মণ্য, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সংস্কৃতি বহির্ভূত। মনুস্মৃতিতে নিষাদ-পিতা এবং আয়োগব মাতা হইতে জাত সন্তানকে বলা হইয়াছে মার্গব বা দাস; ইহাদেরই অন্য নাম কৈবর্ত। মনু বলিতেছেন, ইহাদের উপজীবিকা নৌকার মাঝিগিরি। এই দুইটি প্রাচীন সাক্ষ্য হইতেই বুঝা যাইতেছে, কৈবর্তরা কোনও আর্যপূর্ব কোম বা গোষ্ঠী ছিল, এবং তাহারা ক্রমে আর্য-সমাজের নিম্নস্তরে স্থানলাভ করিতেছিল। বৌদ্ধ জাতকের গল্পেও মৎস্যজীবিদের বলা হইয়াছে কেবত্ত—কেবর্ত। আজ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের কৈবর্তরা নৌকাজীবী বা মৎস্যজীবী। দ্বাদশ শতকে বাঙালী স্মৃতিকার ভবদেব ভট্ট সমাজে কেবর্তদের স্থান নির্দেশ করিতেছেন অন্ত্যজ পর্যায়ে, রজক, চর্মকার, নট, বরুড়, মেদ এবং ভিল্লদের সঙ্গে; এবং স্মরণ রাখা প্রয়োজন ভবদেব রাঢ়দেশের লোক। অমরকোষেও দেখিতেছি, দাস ও ধীবরদের বলা হইতেছে কৈবর্ত। মনুস্মৃতি এবং বৌদ্ধজাতকের সাক্ষ্য একত্র যোগ করিলেই অমরকোষের সাক্ষ্যের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। দ্বাদশ শতকের গোড়ায় ভবদেব ভট্টের সাক্ষ্যও প্রামাণিক। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ঐ সময়েও কৈবর্তদের সঙ্গে মাহিষ্যদের যোগাযোগের কোনও সাক্ষ্য উপস্থিত নাই; এবং মাহিষ্য বলিয়া কৈবর্তদের পরিচয়ের কোনও দাবিও নাই, স্বীকৃতিও নাই। পরবর্তী পর্বে সেই দাবি এবং স্বীকৃতির স্বরূপ ও পরিচয় পাওয়া যাইবে, কিন্তু এই পর্বে নয়। কৈবর্তদের জীবিকাবৃত্তি যাহাই হউক, পালরাষ্ট্রের উদার সামাজিক আদর্শ কৈবর্তদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভ ও সঞ্চয়ের পথে কোনও বাধার সৃষ্টি করে নাই; করিলে দিব্য এত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতে পারিতেন না। সন্ধ্যাকর নন্দী পালরাষ্ট্রের প্রসাদভোজী, রামপালের কীর্তিকথার কবি; তিনি দিব্যকে দস্যু বলিয়াছেন, উপধিব্রতী বলিয়াছেন, কুৎসিত কৈবর্ত নৃপ বলিয়াছেন, তাঁহার বিদ্রোহকে অলীক ধর্মবিপ্লব বলিয়াছেন, এই ডমর উপপ্লবকে 'ভবস্য আপদম' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—শত্রু এবং শত্রুবিদ্রোহকে পক্ষপাতী লোক তাহা বলিয়াই থাকে—কিন্তু কোথাও তাঁহার বা তাঁহার শ্রেণীর বৃত্তি বা সামাজিক স্থান সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত তিনি করেন নাই। মনে হয়, সমাজে তাঁহাদের বৃত্তি বা স্থান কোনটাই নিন্দনীয় ছিল না। কৈবর্তরা যে মাহিষ্য, এ-ইঙ্গিতও সন্ধ্যাকর কোথাও দিতেছেন না। একাদশ-দ্বাদশ শতকেও কৈবর্তরা বাংলাদেশে কেবট্ট বলিয়া পরিচিত হইতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অন্তত কেহ কেহ সংস্কৃতচর্চা করিতেন, কাব্যও রচনা করিতেন, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির ভক্ত অনুরাগী ছিলেন। সদুক্তিকর্ণামৃত নামক কাব্যসংকলন গ্রন্থে (১২০৬) কেবট্ট পপীপ অর্থাৎ কেওট বা কৈবর্ত কবি পপীপ রচিত গঙ্গাস্তবের একটি পদ আছে। পদটি বিনয়-মধুর, সুন্দর!

পালরাজাদের অধিকাংশ লিপিতে সমসাময়িক বর্ণসমাজের নিম্নতম স্তরের কিছু পরোক্ষ সংবাদ পাওয়া যায়। লিপিগুলির যে অংশে ভূমিদানের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইতেছে সেখানে

রাজপাদোপজীবী বা রাজকর্মচারীদের সুদীর্ঘ তালিকার পরেই উল্লেখ করা হইতেছে ব্রাহ্মণদের, তাহার পরে প্রতিবাসী ও ক্ষেত্রকর বা কৃষকদের এবং কুটুম্ব অর্থাৎ স্থানীয় প্রধান প্রধান গৃহস্থ লোকদের (লক্ষণীয় যে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের কোনও উল্লেখ নাই); ইহাদের পরই অন্যান্য যে-সব স্তরের লোক তাহাদের সকলকে একত্র করিয়া গাঁথিয়া উল্লেখ করা হইতেছে মেদ, অন্ধ্র ও চণ্ডালদের। চণ্ডালরাই যে সমাজের নিম্নতম স্তর তাহা লিপির এই অংশটুকু উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে: প্রতিবাসিনশ্চ ব্রাহ্মণোত্তরান্ মহত্তরকুটুম্বিপুরোগমেদান্ধ্রকচণ্ডালপর্য্যন্তান্। ভবদেব ভট্টের স্মৃতিশাসনে চণ্ডাল অন্ত্যজ পর্যায়ের, চণ্ডাল ও অন্ত্যজ এই দুইই সমার্থক। মেদরাও ভবদেবের মতে অন্ত্যজ পর্য্যায়ের। মেদ ও চণ্ডালদের সঙ্গে অন্ধ্রদের উল্লেখ হইতে মনে হয়, ইহাদেরও স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল বাঙালী সমাজের নিম্নতম স্তরে। কিন্তু কেন এইরূপ হইয়াছিল, বুঝা কঠিন। বেতনভুক সৈন্য হিসাবে মালব, খস, কুলিক, হূণ, কর্ণাট, লাট প্রভৃতি বিদেশী ও ভিন্‌প্রদেশী অনেক লোক পালরাষ্ট্রের সৈন্যদলে ভর্তি হইয়াছিল; এই তালিকায় অন্ধ্রদের দেখা পাওয়া যায় না। ইহারা বোধ হয় জীবিকার্জনের জন্য নিজের দেশ ছাড়িয়া বাংলাদেশে আসিয়া এদেশের বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিলেন, এবং সামাজিক দৃষ্টিতে হেয় বা নীচ এমন কোনও কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

বর্ণসমাজের নিম্নস্তর

ইহাদের ছাড়া চর্যাগীতি বা চর্যাচর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থে আরও কয়েকটি তথাকথিত নীচ জাতের খবর পাওয়া যাইতেছে, যথা ডোম বা ডোম্ব, চণ্ডাল, শবর ও কাপালি। ডোমপত্নী অর্থাৎ ডোমনী বা ডোম্বি ও কাপালি বা কাপালিক সম্বন্ধে কাহ্নুপাদের একটি পদের কিয়দংশ উদ্ধার করা যাইতে পারে।

> নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহেরি কুড়িআ (কুঁড়ে ঘর)।
> ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ (নেড়ে ব্রাহ্মণ)॥
> আলো (ওলো) ডোম্বি তোএ সম করিব ম সঙ্গ।
> নিঘিন (নিঘৃণ—ঘৃণা নাই যার) কাহ্ন কাপালি জোই (যোগী) লাংগ (উলঙ্গ)॥...
> তান্তি (তাঁত) বিকণঅ ডোম্বি অবরনা চাংগেড়া (বাঁশের চাঙাড়ি)।
> তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া॥

ডোমেরা যে সাধারণত নগরের বাহিরে কুঁড়ে বাঁধিয়া বাস করিত, বাঁশের তাঁত ও চাঙাড়ি তৈরি করিয়া বিক্রয় করিত এবং ব্রাহ্মণস্পর্শ যে তাহাদের নিষিদ্ধ ছিল, এই পদে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ডোম পুরুষ ও নারী নৃত্যগীতে সুপটু ছিল। কপালী বা কাপালি (ক)রাও নিম্নস্তরের লোক বলিয়া গণ্য হইত; এই পদে তাহারও ইঙ্গিত বিদ্যমান। ভবদেব ভট্ট চণ্ডাল ও পুক্কশদের সঙ্গে কাপালিকদেরও অন্ত্যজ পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কাপালিকরা ছিল লজ্জাঘৃণাবিরহিত, গলায় পরিত হাড়ের মালা, দেহগাত্র

থাকিত প্রায় উলঙ্গ। শবরেরা বাস করিত পাহাড়ে জঙ্গলে, ময়ূরের পাখ্ ছিল তাহাদের পরিধেয়, গলায় গুঞ্জা বীচির মালা, কর্ণে বজ্রকুণ্ডল।

> উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী।
> মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥…
> একেলী শবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী!
> তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুখে সেজ্ঞি ছাইলী।
> সবোর ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেহ্মরাতি পোহাইলী॥

শবর-শবরীদের গানের একটা বিশিষ্ট ধরন ছিল; সেই ধরন শবরী-রাগ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কয়েকটি চর্যাগীতি যে এই শবরী রাগে গীত হইত সে-প্রমাণ এই গ্রন্থেই পাওয়া যাইতেছে। এই চর্যাগীতিটির মধ্যেই আমরা বজ্রযান বৌদ্ধদেবতা পর্ণশবরীর রূপাভ'স পাইতেছি, এ-তথ্যের ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট। একাধিক চর্যাগীতির ইঙ্গিতে মনে হয় ডোম্ব ও চণ্ডাল অভিন্ন (১৮ ও ৪৭ সংখ্যক পদ); কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ডোম ও চণ্ডাল উভয়ই অন্ত্যজ অস্পৃশ্য পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু পৃথক পৃথক ভাবে উল্লিখিত। চর্যাপদের সাক্ষ্য হইতে এই ধারণা করা চ'লে যে, সমাজের উচ্চতর শ্রেণী ও বর্ণের দৃষ্টিতে ইহাদের যৌনাদর্শ ও অভ্যাস শিথিল ছিল। পরবর্তী পর্বে দেখা যাইবে, এই শৈথিল্য উচ্চশ্রেণীর ধর্মকর্মকেও স্পর্শ করিয়াছিল। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপের পোড়ামাটির ফলকগুলিতে বাঙালী সমাজের নিম্নস্তরের এইসব গোষ্ঠী ও কোমদের দৈহিক গঠনাকৃতি, দৈনন্দিন আহার বিহার, বসন-ব্যসনের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। বৃক্ষপত্রের পরিধান, গলায় গুঞ্জাবীচির মালা, এবং পাতা ও ফুলের নানা অলঙ্কার দেখিলে শবর মেয়েদের চিনিয়া লইতে দেরী হয় না।

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বের ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য বর্ণ উপবর্ণ সম্বন্ধে যে-সব সংবাদ পাওয়া যায় তাহা একত্রে গাঁথিয়া মোটামুটি একটা চিত্র দাঁড় করাইবার চেষ্টা করা গেল। দেখা যাইতেছে এ-যুগের রাষ্ট্রদৃষ্টি বর্ণসমাজের নিম্নতম স্তর চণ্ডাল পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য বর্ণসমাজের মাপকাঠি ব্রাহ্মণ স্বয়ং এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও ধর্ম। সমাজে ইহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির বিস্তার ও গভীরতার দিকে তাকাইলেই বর্ণসমাজের ছবি স্পষ্টতর ধরিতে পারা যায়। এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার তারতম্য এবং বিশিষ্টতা অনেকাংশে কোন বিশেষ ধর্ম ও ধর্মগত সংস্কার ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রসারতার দ্যোতক।

ব্রাহ্মণ

পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রসার আগেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সমাজে ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ প্রসারিত হইতেছিল। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ ও মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার শশাঙ্ককে বলিয়াছেন বৌদ্ধবিদ্বেষী। সত্যই শশাঙ্ক তাহা ছিলেন কিনা সে-বিচার এখানে অবান্তর। এই দুই সাক্ষ্যের একটু ক্ষীণ প্রতিধ্বনি নদীয়া

বঙ্গসমাজের কুলজীগ্রন্থেও আছে, এবং সেই সঙ্গে আছে শশাঙ্ক কর্তৃক সরযূনদীর তীর হইতে বারোজন ব্রাহ্মণ আনয়নের গল্প। শশাঙ্ক এক উৎকট ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন; ব্যাধিমুক্তির উদ্দেশ্যে গৃহযজ্ঞ করিবার জন্যই এই ব্রাহ্মণদের আগমন। রাজানুরোধে এই ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে বসবাস আরম্ভ করেন এবং গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত হন; পরে তাঁহাদের বংশধরেরা রাঢ়ে-বঙ্গেও বিস্তৃত হইয়া পড়েন এবং নিজ নিজ গাঞী নামে পরিচিত হন। বাংলার বাহির হইতে ব্রাহ্মণাগমনের যে ঐতিহ্য কুলজীগ্রন্থে বিধৃত তাহার সূচনা দেখিতেছি শশাঙ্কের সঙ্গে জড়িত। কুলজীগ্রন্থের অন্য অনেক গল্পের মত এই গল্পও হয়তো বিশ্বাস্য নয়, কিন্তু এই ঐতিহ্য-ইঙ্গিত সর্বথা মিথ্যা না-ও হইতে পারে। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার বলিতেছেন, শশাঙ্ক ছিলেন ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণ্যপ্রীতি কিছু অস্বাভাবিক নয়, এবং বহুযুগস্মৃত শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ কাহিনীর মূলে এতটুকু সত্যও নাই, এ-কথাই বা কি করিয়া বলা যায়! সমসাময়িক কাল যে প্রাগ্রসরমান ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিরই কাল তাহা তো নানাদিক হইতে সুস্পষ্ট। আগেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। য়ুয়ান্ চোয়াঙ, ইৎসিঙ্, সেংচি প্রভৃতি চীন ধর্মপরিব্রাজকেরা যে সব বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে অনুমান করা চলে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির অবস্থাও বেশ সমৃদ্ধই ছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির অবস্থা তাহার চেয়েও অনেক বেশী সমৃদ্ধতর ছিল। বাংলার সর্বত্র ব্রাহ্মণ দেবপূজকদের সংখ্যা সৌগতদের সংখ্যাপেক্ষা অনেক বেশি ছিল, এ-তথ্য য়ুয়ান্-চোয়াঙই রাখিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারের তথা বর্ণব্যবস্থার প্রসার বাড়িয়াই চলিয়াছিল, এ-সম্বন্ধে দেবদেবীর মূর্তি-প্রমাণই যথেষ্ট। জৈন ধর্ম ও সংস্কার তো ধীরে ধীরে বিলীন হইয়াই যাইতেছিল। আর, বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কারও ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শকে যে ধীরে ধীরে স্বীকার করিয়া লইতেছিল, পালচন্দ্র-কম্বোজ রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শের দিকে তাকাইলেই তাহা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। য়ুয়ান্-চোয়াঙ কামরূপ প্রসঙ্গে বলিতেছেন, কামরূপের অধিবাসীরা দেবপূজক ছিল, বৌদ্ধধর্মে তাঁহারা বিশ্বাস করিত না; দেবমন্দির ছিল শত শত, এবং বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের লোকসংখ্যা ছিল অগণিত। মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি বৌদ্ধ ছিল তাহারা ধর্মানুষ্ঠান করিত গোপনে। এই তো সপ্তমশতকের কামরূপের অবস্থা; বাংলা দেশেও তাহার স্পর্শ লাগে নাই, কে বলিবে? মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার স্পষ্টই বলিতেছেন, মাৎস্যন্যায়ের পর গোপালের অভ্যুদয় কালে সমুদ্রতীর পর্যন্ত স্থান তীর্থিক(ব্রাহ্মণ?)দের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল; বৌদ্ধমঠগুলি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল; লোকে ইহাদেরই ইটকাঠ কুড়াইয়া লইয়া ঘরবাড়ী তৈয়ার করিতেছিল। ছোটবড় ভূস্বামীরাও তখন অনেকে ব্রাহ্মণ। গোপাল নিজেও ব্রাহ্মণানুরক্ত, এবং বৌদ্ধ গ্রন্থকার সেজন্য গোপালের উপর একটু কটাক্ষপাতও করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রসার ও প্রভাব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই আর করা চলে না।

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ যুগের সমসাময়িক অবস্থাটা দেখা যাইতে পারে। এ-তথ্য সুবিদিত

যে পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন—পরম সুগত। বৌদ্ধধর্মের তাঁহারা পরম পৃষ্ঠপোষক; ওদন্তপুরী, সোমপুর এবং বিক্রমশীল মহাবিহারের তাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা; নালন্দা মহাবিহারের তাঁহারা ধারক ও পোষক; বজ্রাসনের বিপুল করুণা পরিচালিত দলবল পালরাষ্ট্রের রক্ষক। বাংলাদেশে যত বৌদ্ধ মূর্তি ও মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রায় সমস্তই এই যুগের; যত অসংখ্য বিহারের উল্লেখ পাইতেছি নানা জায়গায়—জগদ্দল-বিক্রমপুরী-ফুল্লহরি-পট্টিকের-দেবীকোট-ত্রৈকূটক-পণ্ডিত-সন্নগর—এই সমস্ত বিহারও এই যুগের; দেশ-বিদেশ-প্রখ্যাত যে-সব বৌদ্ধ পণ্ডিতাচার্যদের উল্লেখ পাইতেছি তাঁহারাও এই যুগের। চন্দ্রবংশও বৌদ্ধ; জিন (বুদ্ধ), ধর্ম ও সংঘের স্বস্তি উচ্চারণ করিয়া চন্দ্রবংশীয় লিপিগুলির সূচনা; ইঁহাদের রাজ্য হরিকেল তো বৌদ্ধতান্ত্রিক পীঠগুলির অন্যতম পীঠ। ভিন্ন-প্রদেশাগত কম্বোজ রাজবংশও বৌদ্ধ, পরমসুগত।

পালরাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ

অথচ, ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সমাজাদর্শ একান্তই ব্রাহ্মণ্য সংস্কারানুসারী, ব্রাহ্মণ্যাদর্শানুযায়ী। এই যুগের লিপিগুলি তো প্রায় সবই ভূমিদান সম্পর্কিত; এবং প্রায় সর্বত্রই ভূমিদান লাভ করিতেছেন ব্রাহ্মণেরা, এবং সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণদের সম্মাননা না করিয়া কোন দানকার্যই সম্পন্ন হইতেছে না। তাঁহাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি রাষ্ট্রের ও সমাজের সর্বত্র। হরিচরিত নামক গ্রন্থের লেখক চতুর্ভুজ বলিতেছেন, তাঁহার পূর্ব-পুরুষেরা বরেন্দ্রভূমির করঞ্জগ্রাম ধর্মপালের নিকট হইতে দানস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। এই গ্রামের ব্রাহ্মণেরা বেদবিদ্যাবিদ্ এবং স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। এই ধর্মপাল প্রসিদ্ধ পাল-নরপতি হওয়াই সম্ভব, যদিও কেহ কেহ মনে করেন ইনি রাজেন্দ্রচোল-পরাজিত ধর্মপাল। বৌদ্ধ নরপতি শূরপাল (প্রথম বিগ্রহপাল) মন্ত্রী কেদারমিশ্রের যজ্ঞস্থলে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অনেকবার শ্রদ্ধা-সলিলাপ্লুতহৃদয়ে নতশিরে পবিত্র শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাদল প্রস্তরলিপিতে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীবংশের প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে; এই বংশের তিনপুরুষ বংশপরম্পরায় পালরাষ্ট্রের মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন। দর্ভপাণিপুত্র মন্ত্রী কেদারমিশ্র সম্বন্ধে এই লিপিতে আরও বলা হইয়াছে, "তাঁহার [হোমকুণ্ডোত্থিত] অবক্রভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নিশিখাকে চুম্বন করিয়া দিকচক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত।" তাহা ছাড়া তিনি চতুর্বিদ্যা-পয়োনিধি পান করিয়াছিলেন (অর্থাৎ চারি বেদবিদ ছিলেন)। কেদারমিশ্রের পুত্র মন্ত্রী গুরবমিশ্রের "বাগ্‌বৈভবের কথা, আগমে ব্যুৎপত্তির কথা, নীতিতে পরম নিষ্ঠার কথা…জ্যোতিষে অধিকারের কথা এবং বেদার্থচিন্তাপরায়ণ অসীম তেজসম্পন্ন তদীয় বংশের কথা ধর্মাবতার ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।" পরমসুগত প্রথম মহীপাল বিষুবসংক্রান্তির শুভতিথিতে গঙ্গাস্নান করিয়া এক ভট্ট ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালও আমগাছি লিপিদ্বারা এক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। মদনপালের মনহলি লিপিতে বলা হইয়াছে, শ্রীবটেশ্বর স্বামীশর্মা বেদব্যাসপ্রোক্ত মহাভারত পাঠ করায় মদনপালের পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকা ভগবান বুদ্ধভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া

অনুশাসন দ্বারা ব্রাহ্মণ বটেশ্বরকে নিকর গ্রাম দান করিয়াছেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে দেখিতেছি, বরেন্দ্রীর অন্তর্গত ভাবগ্রামে ভরত নামক ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; "তাঁহার যুধিষ্ঠির নামক বিপ্র(কুল)তিলক পণ্ডিতাগ্রগণ্য পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞানপবিত্রবুদ্ধি এবং শ্রোত্রিয়দের সমুজ্জ্বল যশোনিধি ছিলেন।" যুধিষ্ঠিরের পুত্র ছিলেন বিদ্যাধীশ-পূজ্য শ্রীধর। তীর্থভ্রমণে, বেদাধ্যয়নে, দানাধ্যাপনায়, যজ্ঞানুষ্ঠানে, ব্রতাচরণে, সর্বশ্রোত্রীয়শ্রেষ্ঠ শ্রীধর প্রাতঃ, নক্ত, অযাচিত এবং উপবসন (নামক বিবিধ কৃচ্ছ্র সাধন) করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন; এবং কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডবিৎ পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য সর্বাকার-তপোনিধি এবং শ্রৌতস্মার্তশাস্ত্রের গূঢ়ার্থবিৎ বাগীশ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পবিত্র ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব কুমারপাল-মন্ত্রী বৈদ্যদেব বৈশাখে বিষুবসংক্রান্তি একাদশী তিথিতে ধর্মাধিকার পদাভিষিক্ত শ্রীগোনন্দন পণ্ডিতের অনুরোধে এই ব্রাহ্মণ শ্রীধরকে শাসনদ্বারা ভূমিদান করিয়াছিলেন। কিন্তু আর দৃষ্টান্ত উল্লেখের প্রয়োজন নাই; লিপিগুলিতে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী এবং মন্দির ইত্যাদির যে সব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারও আর বিবরণ দিতেছি না। বস্তুত, পালযুগের লিপিমালা পাঠ করিলেই এ-তথ্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এইসব লিপির রচনা আগাগোড়া ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প, ভাবকল্পনা, এবং উপমালংকার দ্বারা আচ্ছন্ন—ইহাদের ভাবাকাশ একান্তই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কারের আকাশ। তাহা ছাড়া বৌদ্ধ পালরাষ্ট্র যে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও বর্ণব্যবস্থা পুরাপুরি স্বীকার করিত তাহার অন্তত দুটি উল্লেখ পাল-লিপিতেই আছে। দেবপালদেবের মুঙ্গের লিপিতে ধর্মপাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ধর্মপাল "শাস্ত্রার্থের অনুবর্তী শাসনকৌশলে (শাস্ত্রশাসন হইতে) বিচলিত (ব্রাহ্মণাদি) বর্ণসমূহকে স্ব স্ব শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মে প্রতিস্থাপিত করিয়াছিলেন"। এই শাস্ত্র যে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র এই সম্বন্ধে তো কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। স্ব স্ব ধর্মে প্রতিস্থাপিত করিবার অর্থও নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাসে প্রত্যেক বর্ণের যথানির্দিষ্ট স্থানে ও সীমায় বিন্যস্ত করা। মাৎস্যন্যায়ের পরে নূতন করিয়া শাস্ত্রশাসনানুযায়ী বিভিন্ন বর্ণগুলিকে সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজন বোধ হয় সমাজে দেখা দিয়াছিল। আমগাছি লিপিতেও দেখিতেছি তৃতীয় বিগ্রহপালকে "চাতুর্বর্ণ্য-সমাশ্রয়" বা বর্ণাশ্রমের আশ্রয়স্থল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

৬

পালরাষ্ট্র সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, চন্দ্র ও কম্বোজরাষ্ট্র সম্বন্ধেও তাহা সমভাবে প্রযোজ্য। দেখিতেছি, বৌদ্ধ রাজা শ্রীচন্দ্র যথারীতি পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া কোটিহোমকর্তা শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ত্রিঋষিপ্রবর শান্তিবারিক ব্রাহ্মণ পীতবাস গুপ্ত শর্মাকে ভূমিদান করিতেছেন; আর একবার দেখিলাম, এই রাজাই হোমচতুষ্টয়ক্রিয়াকালে অদ্ভুতশান্তি নামক যজ্ঞানুষ্ঠানের পুরোহিত কাণ্বশাখীয় বার্দ্ধকৌশিকগোত্রীয় ত্রিঋষিপ্রবর শান্তিবারিক ব্রাহ্মণ ব্যাসগঙ্গশর্মাকে

ভূমিদান করিলেন—উভয় ক্ষেত্রেই দানকার্যটি সম্পন্ন হইল বুদ্ধভট্টারকের নামে এবং ধর্মচক্রদ্বারা শাসনখানা পট্টীকৃত করিয়া! কম্বোজরাজ পরমসুগত নয়পালদেব একটি গ্রাম দান করিলেন ভট্টদিবাকর শর্মার প্রপৌত্র, উপাধ্যায় প্রভাকর শর্মার পৌত্র এবং উপাধ্যায় অনুকূল মিশ্রের পুত্র, ভট্টপুত্র পণ্ডিত অশ্বত্থশর্মাকে; এবং এই দানকার্যের যাঁহারা সাক্ষী রহিলেন তাঁহাদের মধ্যে পুরোহিত, ঋত্বিক এবং ধর্মজ্ঞ অন্যতম। এই দুই রাষ্ট্রেই ঋত্বিক, ধর্মজ্ঞ, পুরোহিত, শান্তিবারিক ইত্যাদি ব্রাহ্মণেরা রাজপুরুষ, এই তথ্যও লক্ষণীয়।

চন্দ্র ও কম্বোজ রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ

বস্তুত, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। পূর্ব পূর্ব যুগে যাহাই হউক, এই যুগে সমাজ-ব্যবস্থা ব্যাপারে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণে কিছু পার্থক্য ছিল না। সামাজিক ব্যাপারে বৌদ্ধেরাও মনুর শাসন মানিয়া চলিতেন, ঠিক আজও বৌদ্ধধর্মানুসারী ব্রহ্ম ও শ্যামদেশ সামাজিক শাসনানুশাসনের ক্ষেত্রে যেমন কতকটা ব্রাহ্মণ্য শাসনব্যবস্থা মানিয়া চলে। তারানাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস এবং অন্যান্য তিব্বতী বৌদ্ধগ্রন্থের সাক্ষ্য হইতেও অনুমান হয়, বর্ণাশ্রমী হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোন সামাজিক পার্থক্যই ছিল না। যাঁহারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন, বিহারে সংঘারামে বাস করিতেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম-শাসন প্রযোজ্য ছিল না, থাকিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু যাঁহারা উপাসক মাত্র ছিলেন, গৃহী বৌদ্ধ ছিলেন তাঁহারা সাংসারিক ক্রিয়াকর্মে প্রচলিত বর্ণ-শাসন মানিয়াই চলিতেন। বৌদ্ধপণ্ডিতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতে ধর্ম ও সামাজিক মতামত লইয়া দ্বন্দ্ব-কোলাহলের প্রমাণ কিছু কিছু আছে, কিন্তু বৌদ্ধরা পৃথক সমাজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এমন কোনও প্রমাণ নাই। বরং সমসাময়িক কাল সম্বন্ধে তারানাথ এবং অন্যান্য বৌদ্ধ আচার্যরা যাহা বলিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, পালযুগের মহাযানী বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ তন্ত্রধর্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িতেছিল, এবং ধর্মাদর্শ ও ধর্মানুষ্ঠান, পূজাপ্রকরণ প্রভৃতি ব্যাপারে নূতন নূতন মত ও পথের উদ্ভব ঘটিতেছিল। তন্ত্রধর্মের স্পর্শে ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও অনুরূপ বিবর্তন ঘটিতেছিল, এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভেদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘুচিয়া যাইতেছিল।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শ

ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাস পাল-চন্দ্র-কম্বোজ যুগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং বর্ণাশ্রম রক্ষণ ও পালনের দায়িত্ব এই যুগের বৌদ্ধরাষ্ট্রও স্বীকার করিত; এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ সত্যই নাই। কিন্তু বর্ণবিন্যাস এবং প্রত্যেক বর্ণের সীমা পরবর্তী কালে যতটা দৃঢ়, অনমনীয় এবং নানা বিধিনিষেধের সূত্রে শক্ত ও সুনির্দিষ্ট রূপে বাঁধা পড়িয়াছিল, এই যুগে তাহা হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ, বাংলাদেশ তখনও পর্যন্ত তাহার নিজস্ব স্মৃতিশাসন গড়িয়া তোলে নাই; বস্তুত, স্মৃতিশাস্ত্র রচনার সূত্রপাতই তখনও হয় নাই। দ্বিতীয়ত, এই যুগের সব ক'টি রাষ্ট্র এবং রাজবংশই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধ সংস্কারাশ্রয়ী; ইহারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক এবং ব্রাহ্মণ্য-

সমাজের গতি ও প্রকৃতি

সমাজ-ব্যবস্থার ধারক ও পালক হইলেও—হিন্দুশাস্ত্রীয় আদর্শে রাজার অন্যতম কর্তব্যই প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার ধারণ ও পালন—উত্তর বা দক্ষিণ-ভারতের ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাসন ইঁহাদের নিকট একান্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। তৃতীয়ত, পালরাজবংশ উচ্চবর্ণোদ্ভব নয়; বর্ণ-হিসাবে ইঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি রামচরিত ছাড়া আর কোথাও নাই, এবং তাহা রামপালের পিতা সম্বন্ধে। গোপাল বা ধর্মপাল বা দেবপাল সম্বন্ধে এ-দাবি কেহ করে নাই; দশ-বারো পুরুষ রাজত্ব করার পর একজন রাজা ও তাঁহার বংশ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইবেন ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। যাহাই হউক, পালবংশ উচ্চবর্ণোদ্ভব ছিলেন না বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা বর্ণশাসনের স্মৃতিসুলভ সুদৃঢ় আচার-বিচার বা স্তরউপস্তরভেদ সম্বন্ধে খুব নিষ্ঠাপরায়ণও ছিলেন না। চতুর্থত, বাঙালী সমাজের অধিকাংশ লোকই তখনও বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত; অল্প সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত ছিল, যদিও তাহার সীমা ক্রমশই প্রসারিত হইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান সীমার মধ্যে যাহারা আসিয়া অন্তর্ভুক্ত হইতেছিল তাহারা সকলেই আর্যপূর্ব কোম-সমাজের ও সেই সমাজগত সংস্কার ও সংস্কৃতির লোক। ব্রাহ্মণ্য সমাজ-ব্যবস্থা, সংস্কার ও সংস্কৃতি তাহারা মানিয়া লইতেছিল অর্থনৈতিক আধিপত্যের চাপে পড়িয়া। ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাসের সূত্রের মধ্যে তাহাদের গাঁথিয়া লওয়া খুব সহজ হয় নাই; অন্তত পাল ও চন্দ্ররাষ্ট্র সচেতন ও সক্রিয়ভাবে সেদিকে চেষ্টা কিছু করিয়াছিল বলিয়া তো মনে হয় না, প্রমাণও কিছু নাই। রাষ্ট্রীয় চাপ সেদিকে কিছু ছিল না; রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টিও এ-বিষয়ে উদার ছিল। আমার এই শেষোক্ত অনুমানের সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট প্রমাণ কিছু নাই; তবে সমসাময়িক রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় সমাজ-ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি যাহা হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক তাহাই অনুমানের রূপে ও আকারে ব্যক্ত করিলাম। হিন্দুধর্ম ও সমাজের স্বাঙ্গীকরণক্রিয়া আজও যে যুক্তি-পদ্ধতি অনুসারে চলিতেছে বিভিন্ন আর্যপূর্ব গোষ্ঠী ও কোম গুলিতে, সেই যুক্তি-পদ্ধতিই এই অনুমানের সাক্ষ্যও সমর্থক। তাহা ছাড়া, এই অনুমানের পশ্চাতে রহিয়াছে, পরবর্তী যুগের, বিশেষভাবে সেন-বর্মণ আমলের বাংলার বর্ণ ও সমাজ-বিন্যাসের ইতিহাস এবং বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য।

৭

পাল-চন্দ্ররাষ্ট্রে ও তাঁহাদের কালে ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাসের আদর্শ ছিল উদারও নমনীয়; কম্বোজ-সেন-বর্মণ আমলে সেন-বর্মণ রাষ্ট্রের সক্রিয় সচেতন চেষ্টার ফলে সেই আদর্শ হইল সুদৃঢ়, অনমনীয় ও সুনির্দিষ্ট। যে বর্ণবিন্যস্ত সমাজব্যবস্থা আজও বাংলাদেশে প্রচলিত ও স্বীকৃত তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইল এই যুগে দেড় শতাব্দীর মধ্যে। বাংলার সমাজ-ব্যবস্থার এই বিবর্তন প্রায় হাজার বৎসরের বাংলাদেশকে ভাঙিয়া নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইয়াছে। কি

সেন-বর্মণ যুগ
বর্ণ-বিন্যাসের চতুর্থ পর্ব

করিয়া এই আমূল সংস্কার, এত বড় পরিবর্তন সাধিত হইল তাহা একে একে দেখা যাইতে পারে।

কম্বোজ-রাজবংশকে অবলম্বন করিয়াই এই বিবর্তনের সূচনা অনুসরণ করা যাইতে পারে। এই পার্বত্য কৌমটি বোধ হয় বাংলা দেশে আসার পর আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি আশ্রয় করেন। প্রথম রাজা রাজ্যপাল ছিলেন 'পরমসুগত' অর্থাৎ বৌদ্ধ; কিন্তু তাঁহার পুত্র নারায়ণপাল হইলেন বাসুদেবের ভক্ত। নারায়ণপালের ছোট ভাই সম্রাট নয়পাল একবার নবমী দিবসে পুণ্যস্নান করিয়া শঙ্কর ভট্টারকের (শিবের) নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে বর্ধমানভুক্তিতে কিছু ভূমি দান করেন। বৌদ্ধ রাজার বংশধরদের ব্রাহ্মণ্যধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় লইতে দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় সমাজচক্র কোন্ দিকে ঘুরিতেছে। পালবংশের শেষের দিকেও একই চিহ্ন সুস্পষ্ট। শেষ অধ্যায়ে পালরাষ্ট্রও এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক সমাজশাসনের স্পর্শে আসিয়াছিল। পালবংশ ও পালরাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করিয়া সেনবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল; চন্দ্রবংশকে বিলুপ্ত করিয়া হইল বর্মনবংশের প্রতিষ্ঠা। যে দু'টি বংশ ও রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইল তাহারা উভয়েই বাঙালী ও বৌদ্ধ, এবং যে দু'টি বংশ ও রাষ্ট্র নূতন প্রতিষ্ঠিত হইল তাহারা উভয়েই ভিন্ প্রদেশাগত, উভয়েই অত্যন্ত নৈষ্ঠিক ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির ধারক ও পোষক। বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের দিক হইতে এই দু'টি তথ্যই অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক অর্থবহ।

সেন-রাজবংশ কর্ণাটাগত; তাঁহারা আগে ছিলেন ব্রাহ্মণ, পরে ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া হইলেন ক্ষত্রিয়, এবং পরিচিত হইলেন ব্রহ্মক্ষত্র রূপে। বর্মণ-বংশ কলিঙ্গাগত বলিয়া অনুমিত, অন্তত ভিন্প্রদেশী এবং দক্ষিণাগত, সন্দেহ নাই, এবং বর্ণহিসাবে ক্ষত্রিয়। দক্ষিণদেশ সাতবাহন এবং তৎপরবর্তী সালঙ্কায়ন, বৃহৎফলায়ন, আনন্দ, পল্লব, কদম্ব প্রভৃতি রাজবংশের সময় হইতেই নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের কেন্দ্র, যাগযজ্ঞহোম প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্রাহ্মণ্য পূজানুষ্ঠানে গভীর বিশ্বাসী, এবং প্রচলিত বর্ণাশ্রমের উৎসাহী প্রতিপালক। দক্ষিণদেশের এই নিষ্ঠাপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার লইয়া সেন ও বর্মণ রাজবংশ বাংলাদেশে আসিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। পাল বংশের শেষের দিকে এবং কম্বোজ রাজবংশে ব্রাহ্মণ্য বিবর্তনের সূত্রপাত কিছু কিছু দেখা দিয়াছিল। এখন, দেখিতে দেখিতে বাংলা দেশ যাগযজ্ঞহোম ক্রিয়ার ধূমে ছাইয়া গেল, নদ-নদীর ঘাটগুলি বিচিত্র পুণ্যস্নানার্থীর মন্ত্র-গুঞ্জরণে মুখরিত হইয়া উঠিল, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা, বিভিন্ন পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ব্রতানুষ্ঠান দ্রুত প্রসারিত হইল। সহজ স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় এই দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয় নাই; পশ্চাতে ছিল রাষ্ট্রের ও রাজবংশের সক্রিয় উৎসাহ, অমোঘ ও সচেতন নির্দেশ। এই যুগের লিপিমালা, অসংখ্য পুরাণ, স্মৃতি, ব্যবহার ও জ্যোতিষগ্রন্থ ইত্যাদিই তাহার প্রমাণ।

লিপিপ্রমাণগুলিই আগে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্মণ-বংশ পরম বিষ্ণুভক্ত। এই রাজবংশের যে বংশাবলী ভোজবর্মার বেলাব লিপিতে পাওয়া যাইতেছে তাহার গোড়াতেই

ঋষি অত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক নামের ছড়াছড়ি, ইহাদেরই বংশে নাকি বর্মণ পরিবারের অভ্যুদয়। রাজা জাতবর্মা অনেক দেশ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিব্যকেও পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। এই দিব্য যে বরেন্দ্রীর কৈবর্তনায়ক দিব্য ইহা বহুদিন স্বীকৃত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক স্মৃতিশাসনের সূচনা

দিব্যর সৈন্য আক্রমণকালে জাতবর্মাকে নিশ্চয়ই উত্তরবঙ্গে অভিযান করিতে হইয়াছিল। এই অভিযানের একটু ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বোধ হয় নালন্দায় একটি লিপিতে পাওয়া যায়। সোমপুরের বৌদ্ধ মহাবিহার জাতববর্মার সৈন্যরা পুড়াইয়া দিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। "সোমপুরের একটি বৌদ্ধ ভিক্ষুর গৃহ যখন বঙ্গাল-সৈন্যরা পুড়াইয়া দিয়েছিল, ভিক্ষুটি তখন বুদ্ধের চরণ-কমল আশ্রয় করিয়া পড়িয়াছিলেন; সেইখানে সেই অবস্থাতেই তিনি মৃত হইলেন।" বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের প্রতি বর্মণ-রাষ্ট্রের মনোভাব কিরূপ ছিল এই ঘটনা হইতে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শুধু মাত্র এই ঘটনাটি হইতেই এতটা অনুমান নিশ্চয়ই করা চলিত না; কিন্তু যুগের মনোভাবটাই ছিল এইরূপ। পরবর্তী সাক্ষ্য হইতে ক্রমশ তাহা আরও সুস্পষ্ট হইবে। এই বর্মণ রাষ্ট্রেরই অন্যতম মন্ত্রী স্মার্ত ভট্ট ভবদেব অগস্ত্যের মত বৌদ্ধ সমুদ্রকে গ্রাস করিয়াছিলেন, এবং পাষণ্ডবৈতণ্ডিকদের (বৌদ্ধদের নিশ্চয়ই, বোধ হয় নাথপন্থীদেরও) যুক্তিতর্ক খণ্ডনে অতিশয় দক্ষ ছিলেন বলিয়া গর্ব অনুভব করিয়াছেন। সেই রাষ্ট্রের সৈন্যরা যুদ্ধব্যপদেশে বৌদ্ধবিহারও ধ্বংস করিবে ইহা কিছু বিচিত্র নয়। জাতবর্মার পরবর্তী রাজা সামলবর্মা কুলজীগ্রন্থের রাজা শ্যামলবর্মণ; স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই শ্যামলবর্মা'র নামের সঙ্গেই এবং অনুমতে তাঁহারই পূর্ববর্তী রাজা হরিবর্মার সঙ্গে কান্যকুব্জাগত বৈদিক ব্রাহ্মণদের শকুনসত্র যজ্ঞের কিংবদন্তী জড়িত। সামলবর্মার পুত্র ভোজবর্মা সাবর্ণ গোত্রীয়, ভৃগু-চ্যবন-আপ্নুবান-ঔর্ব-জামদগ্নি প্রবর, বাজসনেয় চরণ এবং যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখ, শান্ত্যাগারাধ্যক্ষ ব্রাহ্মণ রামদেবশর্মাকে পৌণ্ড্র-ভুক্তিতে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। রামদেব শর্মার পূর্বপুরুষ মধ্যদেশ হইতে আসিয়া উত্তর-রাঢ়ার সিদ্ধলগ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সিদ্ধলগ্রামে সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের বসতির কথা বর্মণ-রাজ হরিবর্মা-দেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের লিপিতেও দেখা যাইতেছে। এই লিপিতে সমসাময়িক কালের ভাবাদর্শ, সমাজ ও শিক্ষাদর্শ ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেক খবর পাওয়া যায়। ভবদেবের মাতা সাঙ্গোক ছিলেন জনৈক বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের কন্যা। এই সময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের "গাঞী"-পরিচয় বিভাগ সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, এ-সম্বন্ধে আর তাহা হইলে কোনও সন্দেহই রহিল না। ভবদেব সমসাময়িক কালের বাঙালী চিন্তানায়কদের অন্যতম; তিনি ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্, সিদ্ধান্ত-তন্ত্র-গণিত-ফলসংহিতায় সুপণ্ডিত, হোরাশাস্ত্রের একটি গ্রন্থের লেখক, কুমারিলভট্টের মীমাংসাগ্রন্থের টীকাকার, স্মৃতিগ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, আগমশাস্ত্র, অস্ত্রবেদেও তিনি সুপণ্ডিত। রাঢ়দেশে তিনি একটি নারায়ণ মন্দির স্থাপন করিয়া

তাহাতে নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কুমারিলভট্টের তন্ত্রবার্তিক নামক মীমাংসাগ্রন্থের ভবদেবকৃত তৌতাতিতমত-তিলক নামক টীকাগ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ আজও বর্তমান। তাঁহার কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি বা দশকর্মপদ্ধতি ও প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ নামক দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থ আজও প্রচলিত। পরবর্তী বাঙালী স্মৃতি ও মীমাংসা লেখকেরা ভবদেবের উক্তি ও বিচার বারবার আলোচনা করিয়াছেন। বস্তুত, বাঙালীর দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ, বিভিন্ন বর্ণের বিচিত্র স্তর উপস্তর বিভাগের সীমা উপসীমা, প্রত্যেকের পারস্পরিক আহার বিহার, বিবাহ-ব্যাপারে নানা বিধি নিষেধ, এক কথায় সর্বপ্রকার সমাজকর্মের রীতিপদ্ধতি বিধিনিয়ম সুনির্দিষ্ট সূত্রে গ্রথিত হইয়া সমাজশাসনের একান্ত ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক, পুরোহিত-তান্ত্রিক নির্দেশ এই সর্বপ্রথম দেখা দিল। ভবদেবভট্ট পালযুগের শেষ আমলের লোক; এই সময় হইতেই এই একান্ত ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক সমাজশাসনের সূচনা এবং ভবদেবভট্টই তাহার আদিগুরু। বর্মণরাষ্ট্রকে অবলম্বন করিয়াই এই ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিল। ভূমি প্রস্তুত হইয়াই ছিল; রাষ্ট্রের সহায়তা এবং সক্রিয় সমর্থন পাইয়া সেই ভূমিতে এই শাসন প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে বিলম্ব হইল না। এই শাসনের প্রথম কেন্দ্রস্থল হইল একদিকে রাঢ়দেশ, এবং কিছু পরবর্তী কালে, আর একদিকে বিক্রমপুর।

বর্মণরাষ্ট্রে যাহার সূচনা সেনরাষ্ট্রে তাহার প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মণ্য সমাজ এই সময় হইতেই আত্মসংরক্ষণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়কর্ম হইয়া উঠিল। এই সংরক্ষণী মনোবৃত্তির একটা কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। আগে দেখিয়াছি, ভবদেব ভট্ট বৌদ্ধদের প্রতি মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না; এই 'পাষণ্ডবৈতণ্ডিকদের' বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ-তন্ত্রের সংরক্ষণী মনোবৃত্তি ভবদেব ভট্টের রচনাতেই সুস্পষ্ট। সেন আমলে এই মনোবৃত্তি তীব্রতর হইয়া দেখা দিল। পাল আমলে বৌদ্ধ দেবদেবীরা কিছু কিছু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যাইতেছিলেন, এবং শেষোক্ত দেবদেবীরাও বৌদ্ধ ও শৈবতন্ত্রে স্থান পাইতেছিলেন। বৌদ্ধসাধনমালায় ব্রাহ্মণ্য মহাকাল ও গণপতির স্থান, বৌদ্ধতন্ত্রে ব্রাহ্মণ্য লিঙ্গ এবং শৈব দেবদেবীদের স্থানলাভ পাল যুগেই ঘটিয়াছিল। তাহা ছাড়া, বৌদ্ধ তান্ত্রিক বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান, সহজযান ইত্যাদির আচারানুষ্ঠান, সাধনপদ্ধতি, সাধনাদর্শ প্রভৃতি ক্রমশ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পূজানুষ্ঠান প্রভৃতিকেও স্পর্শ করিতেছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিভূদের কাছে তাহা ভাল লাগিবার কথা নয়, বিশেষত ভিন্নপ্রদেশাগত বর্মণ ও সেনরাষ্ট্রের প্রভুদের কাছে। বাংলাদেশের তন্ত্রধর্মের সমাজ-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞানও খুব সুস্পষ্ট থাকিবার কথা নয়। যে-ভাবেই হউক, সেন আমলের ব্রাহ্মণ্য সমাজ এইখানেই হয়তো ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনা, এবং সমসাময়িককালের ব্রাহ্মণ্যসমাজের সম্ভাব্য সামাজিক নেতৃত্ব-হীনতার কারণ খুঁজিয়া পাইয়া থাকিবেন।

যাহাই হউক, ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র রচনাকে আশ্রয় করিয়াই ব্রাহ্মণ্যসমাজের এই

সংরক্ষণী মনোবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করিল। আদি ধর্মশাস্ত্র লেখক জিতেন্দ্রিয় ও বালকের কোনও রচনা আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই; কিন্তু শুভাশুভকাল, প্রায়শ্চিত্ত, ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে এই দুইজনেরই মতামত আলোচনা করিয়াছেন জীমূতবাহন, শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি পরবর্তী বাঙালী স্মার্ত ও ধর্মশাস্ত্র লেখকেরা। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পারিভদ্রীয় গাঞী মহামহোপাধ্যায় জীমূতবাহনও এই যুগেরই লোক, এবং তিনি সুবিখ্যাত ব্যবহারমাতৃকা, দায়ভাগ এবং কালবিবেক গ্রন্থের রচয়িতা। কুলজীগ্রন্থের মতে পারিহাল শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের অন্যতম গাঞী। জীমূতবাহনের পরেই নাম করিতে হয় বল্লালসেনের গুরু, হারলতা এবং পিতৃ-দয়িতা গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা অনিরুদ্ধভট্টের। তিনি শুধু মহামহোপাধ্যায় রাজগুরু ছিলেন না, সেনরাষ্ট্রের ধর্মাধ্যক্ষও ছিলেন। অনিরুদ্ধের বসতি ছিল বরেন্দ্রীর অন্তর্গত চম্পাহিটি গ্রামে, এবং তিনি চম্পাহিটি মহামহোপাধ্যায় আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। কুলজীগ্রন্থের মতে চম্পটি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বারেন্দ্র গাঞীদের অন্যতম গাঞী। অনিরুদ্ধশিষ্য রাজা বল্লালসেন স্বয়ং একাধিক স্মৃতিগ্রন্থের লেখক। তদ্রচিত আচারসাগর ও প্রতিষ্ঠাসাগর আজও অনাবিষ্কৃত; কিন্তু দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর বিদ্যমান। দানসাগর তিনি রচনা করিয়াছিলেন গুরু অনিরুদ্ধের আদেশে· অসম্পূর্ণ অদ্ভুতসাগর পিতার আদেশে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন পুত্র লক্ষ্মণসেন। ছান্দোগ্য মন্ত্রভাষ্য রচয়িতা গুণবিষ্ণুও এই যুগের লোক। কিন্তু এই সব স্মৃতি-ব্যবহার-ধর্মশাস্ত্র রচয়িতাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছেন ধর্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের পুত্র, লক্ষ্মণসেনের মহাধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ। হলায়ুধের এক ভাই ঈশান আহ্নিকপদ্ধতি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ এবং অপর ভ্রাতা পশুপতি দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন, একখানি শ্রাদ্ধপদ্ধতি এবং অন্য একখানি পাকযজ্ঞ সম্বন্ধে। হলায়ুধ স্বয়ং সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব এবং পণ্ডিতসর্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু আর নামোল্লেখের প্রয়োজন নাই। এক কথায় বলা যাইতে পারে, যে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও ব্যবহার শাসন পরবর্তীকালে শূলপাণি-রঘুনন্দন কর্তৃক আলোচিত ও বিধিবদ্ধ হইয়া আজও বাংলাদেশে প্রচলিত তাহার সূচনা এই যুগে—বর্মণ ও সেনরাষ্ট্রের ছত্রছায়ায়। এই যুগে রচিত স্মৃতি ও ব্যবহারগ্রন্থগুলিতে ব্রাহ্মণসমাজের সংরক্ষণী মনোবৃত্তি সুস্পষ্ট। দন্তধাবন, আচমন, স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ, আহ্নিক, যাগযজ্ঞ, হোম, পূজানুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্মের শুভাশুভ-কালবিচার, অশৌচ, আচার, প্রায়শ্চিত্ত, বিচিত্র অপরাধ ও তাহার শাস্তি, কৃচ্ছ্র, তপস্যা, গর্ভাধান-পুংসবন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, উত্তরাধিকার, স্ত্রীধন, সম্পত্তি-বিভাগ, আহার-বিহারের বিচিত্র বিধিনিষেধ, বিচিত্র দানের বিবৃতি, দান-কর্মের বিচিত্রতর বিধিনিষেধ, তিথিনক্ষত্রের ইঙ্গিত বিচার, দৈবিক, বায়বিক ও পার্থিব বিচিত্র উৎপাত, লক্ষণাদির শুভাশুভ নির্ণয়, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রপাঠের নিয়ম ও কাল—এক কথায় দ্বিজবর্ণের জীবনশাসনের কোনও নির্দেশই এইসব গ্রন্থ হইতে বাদ পড়ে নাই।

স্মৃতি ও ব্যবহার শাসনের বিস্তার

সমাজের বিচিত্র স্তর ও উপস্তরের, বিচিত্রতর বর্ণ ও উপবর্ণের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়, বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধের অসংখ্য বিধিনিষেধও এইসব স্মৃতিকর্তাদের আলোচনার বিষয়। শুধু তাহাই নয়, ইহাদের নির্দেশ অমোঘ ও সুনির্দিষ্ট। এই যুগের স্মৃতি-শাসনই পরবর্তী বাংলার ব্রাহ্মণতন্ত্রের ভিত্তি।

ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক সেনরাষ্ট্র

রাষ্ট্রে এই একান্ত ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক স্মৃতিশাসনের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। তাহা না হইবারও কারণ নাই, কারণ ভবদেবের বংশ, হলায়ুধের বংশ, অনিরুদ্ধ ইহারা তো সকলেই রাষ্ট্রেরই সৃষ্টি এবং সে-রাষ্ট্রের নায়ক হরিবর্মা, সামল (শ্যামল) বর্মা, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন। শেষোক্ত দুইজন তো নিজেরাই ভাবাদর্শে সমাজাদর্শে অনিরুদ্ধ-হলায়ুধের সমগোত্রীয়, নিজেরাই স্মৃতিশাসনের রচয়িতা। তাহা ছাড়া শান্ত্যাগারিক, শান্ত্যাগারিধিকৃত, শান্তিবারিক, পুরোহিত, মহাপুরোহিত, ব্রাহ্মণ-রাজপণ্ডিত ইহারা রাজপুরুষ হিসাবে স্বীকৃত হইতেছেন এই যুগেই—কম্বোজ-বর্মণ-সেন রাষ্ট্রে। পাল আমলে কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রে সাক্ষাৎভাবে ইহাদের কোনও স্থান নাই। রাষ্ট্রে ইহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িতেছে, ইহারা রাষ্ট্রের অজস্র কৃপালাভ করিতেছেন নানা উপলক্ষ্যে অপরিমিত ভূমিদান ইহারাই লাভ করিতেছেন। কাজেই রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক স্মৃতি-শাসনের প্রতিফলন দেখা যাইবে, ইহা তো বিচিত্র নয়।

বিজয়সেন ও বল্লালসেন উভয়েই ছিলেন পরম মাহেশ্বর অর্থাৎ শৈব; লক্ষ্মণসেন কিন্তু পরম বৈষ্ণব এবং পরম নারসিংহ (অর্থাৎ বৈষ্ণব); লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও কেশব উভয়েই সৌর অর্থাৎ সূর্যভক্ত। সেন-বংশের আদিপুরুষ সামন্তসেন শেষ বয়সে গঙ্গাতীরস্থ আশ্রমে বানপ্রস্থে কাটাইয়াছিলেন। এই সব আশ্রম-তপোবন ঋষি-সন্ন্যাসী দ্বারা অধ্যুষিত এবং যজ্ঞাগ্নিসেবিতঘৃতধূমের সুগন্ধে পরিপূরিত থাকিত; সেখানে মৃগশিশুরা তপোবন-*নারীদের* স্তন্যদুগ্ধ পান করিত এবং শুকপাখীরা সমস্ত বেদ আবৃত্তি করিত! কবিকল্পনা সন্দেহ নাই, কিন্তু বস্তুসম্পর্ক বিচ্যুত, ভাবাকাশ বিহারী কবিকল্পনাও রাষ্ট্রের সমাজাদর্শকেই ব্যক্ত করিতেছে এবং প্রাচীন তপোবনাদর্শের দিকে সমাজের মনকে প্রলুব্ধ করিবার, সেই স্মৃতি জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, সে-বিষয়েও সন্দেহ নাই। সামন্তসেনের পৌত্র বিজয়সেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উপর এত কৃপা বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং সেই কৃপায় তাঁহারা এত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পত্নীদিগকে নাগরিক রমণীরা মুক্তা, মরকত, মণি, রৌপ্য, রত্ন এবং কাঞ্চনের সঙ্গে কার্পাস বীজ, শাকপত্র, অলাবুপুষ্প, দাড়িম্ববীচি এবং কুষ্মাণ্ডলতাপুষ্পের পার্থক্য শিক্ষা দিত। যজ্ঞকার্যে বিজয়সেনের কখনও কোনও ক্লান্তি ছিল না। একবার তাঁহার মহিষী মহাদেবী বিলাসদেবী চন্দ্রগ্রহণের সময়ে কনক-তুলাপুরুষ অনুষ্ঠানের হোমকার্যের দক্ষিণাস্বরূপ রত্নাকর দেবশর্মার প্রপৌত্র, রহস্কর দেবশর্মার পৌত্র, ভাস্কর দেবশর্মার পুত্র, মধ্যদেশাগত, বৎসগোত্রীয়, ভার্গব-চ্যবন-আপ্নুবান-ঔর্ব-জামদগ্ন্য প্রবর, ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখার ষড়ঙ্গাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ উদয়কর দেবশর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়া-

ছিলেন। বল্লালসেনের নৈহাটিলিপি আরম্ভ হইয়াছে অর্ধনারীশ্বরকে বন্দনা করিয়া; তাঁহার মাতা বিলাসদেবী একবার সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাতীরে হেমাশ্বমহাদান অনুষ্ঠানের দক্ষিণাস্বরূপ ভরদ্বাজ গোত্রীয়, ভরদ্বাজ-আঙ্গিরস-বার্হস্পত্য প্রবর, সামবেদীয় কৌঠুম-শাখাচরণানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণ শ্রীওবাসুদেবশর্মাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। বল্লালসেন এই লিপি দ্বারা এই দান অনুমোদিত ও পট্টিকৃত করেন। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া লিপির ভূমিদান-গ্রহীতা হইতেছেন কৌশিক গোত্রীয়, বিশ্বামিত্র-বন্ধুল-কৌশিক প্রবর, যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখা-ধ্যায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রঘুদেব শর্মা। লক্ষ্মণসেন যে অসংখ্য ব্রাহ্মণকে ধান্যশস্যপ্রচুর উপবনসমৃদ্ধ বহু গ্রামদান করিয়াছিলেন তাহাও এই লিপিতে উল্লিখিত আছে। এই রাজার গোবিন্দপুর পট্টোলীর ভূমিদান গ্রহীতাও একজন ব্রাহ্মণ, উপাধ্যায় ব্যাসদেব শর্মা—বৎস-গোত্রীয় এবং সামবেদীয় কৌঠুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী। এই ভূমিদান কার্য প্রথম করা হইয়াছিল লক্ষ্মণসেনের অভিষেক উপলক্ষে। সামবেদীয় কৌঠুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী, ভরদ্বাজ গোত্রীয় আর এক ব্রাহ্মণ ঈশ্বরদেবশর্মণও কিছু ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন রাজা কর্তৃক হেমাশ্বরথমহাদান যজ্ঞানুষ্ঠানে আচার্যক্রিয়ার দক্ষিণাস্বরূপ। এই ভূমির সীমানির্দেশ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, পূর্বদিকে বৌদ্ধ বিহারদেবতার এক আঢ়বাপ নিষ্কর ভূমির পূর্বসীমা আলি (বৌদ্ধবিহারীদেবতা নিকরদেয়ম মালভূম্যাঢ়াবাপ-পূর্বালিঃ)। সেন বংশের লিপিমালার মধ্যে এই একটি মাত্র স্থানে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ পাওয়া গেল; বরেন্দ্রীতে তাহা হইলে দ্বাদশ শতকের শেষপাদেও বৌদ্ধধর্মের প্রকাশ্য অস্তিত্ব ছিল। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর লিপি সর্বত্র সুস্পষ্ট ও সুপাঠ্য নয়; মনে হয়, রাজা তাঁহার মূল অভিষেকের সময় ঐন্দ্রীমহাশান্তি যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে কৌশিকগোত্রীয়, অথর্ববেদীয় পৈপ্পলাদশাখাধ্যায়ী শান্ত্যাগারিক ব্রাহ্মণ গোবিন্দ দেবশর্মাকে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন তাহাই এই শাসন দ্বারা অনুমোদিত ও পট্টীকৃত করা হইয়াছে। আর একবার এই রাজাই সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে জনৈক কুবের নামীয় ব্রাহ্মণকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। এই রাজার সুন্দরবন লিপিতেও কয়েকজন শান্ত্যাগারিক ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের খবর পাওয়া যায়, যথা, প্রভাস, রামদেব, বিষ্ণুপাণি গড়োলী, কেশব গড়োলি এবং কৃষ্ণধর দেবশর্মা; ইঁহারা প্রত্যেকেই শান্ত্যাগারিক। শেষোক্তটি গার্গগোত্রীয় এবং ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়নশাখাধ্যায়ী। লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন ধান্য শস্যক্ষেত্র ও অট্টালিকাপূর্ণ বহু প্রসিদ্ধ গ্রাম ব্রাহ্মণদের দান করিয়াছিলেন। তদনুষ্ঠিত যজ্ঞাগ্নির ধূম চারিদিকে এমন বিকীর্ণ হইতে যেন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যাইত! তিনি একবার তাঁহার জন্মদিনে দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া একটি গ্রাম বাৎস্যগোত্রীয় নীতিপাঠক ব্রাহ্মণ ঈশ্বরদেবশর্মাকে দান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের আর এক পুত্র বিশ্বরূপসেন শিবপুরাণোক্ত ভূমিদানের ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় বাৎস্যগোত্রীয় নীতিপাঠক ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপ দেবশর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। এই রাজারই অন্য আর একটি লিপিতে দেখিতেছি হলায়ুধ নামে বাৎস্যগোত্রীয়, যজুর্বেদীয়, কাণ্বশাখাধ্যায়ী জনৈক ব্রাহ্মণ আবল্লিক

পণ্ডিত রাজপরিবারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদের নিকট হইতে প্রচুর ভূমিদান লাভ করিতেছেন—উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি, চন্দ্রগ্রহণ, উত্থানদ্বাদশীতিথি, জন্মতিথি ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলের দেববংশের লিপিগুলিতেও অনুরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী এবং বিষ্ণুভক্ত। এই বংশের অন্যতম রাজা দামোদর একবার জনৈক যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ পৃথ্বীধরশর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই বংশেরই আর একজন রাজা, অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীদশরথদেবের (—কুলজীগ্রন্থের দনুজমাধব—মুসলমান ঐতিহাসিকদের সোনারগাঁর রাজা, দনুজ রায়) আদাবাড়ী লিপি দ্বারা যে সমস্ত ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হইয়াছে তাঁহাদের গাঞী পরিচয় আছে; যথা, সন্ধ্যাকর, শ্রীমাকি (সিঙী গাঞী), শ্রীনক, শ্রীসুগন্ধ (পালি গাঞী), শ্রীসোম (সিউ গাঞী), শ্রীনাভ (পালি গাঞী) শ্রীপণ্ডিত (মাসচটক গাঞী) শ্রীযাত্রী (বৃন গাঞী), শ্রীরাম (ভিতী গাঞী), শ্রীলেধু (সেহন্দায়ী গাঞী), শ্রীনক (পুতি গাঞী), শ্রীভট্ট (সেউ-গাঞী), শ্রীবালি (মহান্তিয়াড়া গাঞী), শ্রীবাসুদেব (করঞ্জ গাঞী) শ্রীমিকো (মাসচড়ক গাঞী), ইত্যাদি। গাঞীপ্রথার প্রচলন ভবদেব ভট্টের কালেই আমরা দেখিয়াছি; বোধ হয় তাহারও বহু পূর্বে গুপ্ত আমলেই এই প্রথা প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে (গুপ্ত আমলের লিপিগুলিতে বন্দ্য, চট্ট, প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য পদবী-পরিচয় গাঞী-পরিচয় হওয়াই সম্ভব, একথা আগেই বলিয়াছি)। ত্রয়োদশ শতকে এই প্রথা একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আদাবাড়ী লিপির গাঞী তালিকায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র উভয় গাঞী পরিচয়ই মিলিতেছে।

এই সুবিস্তৃত লিপি-সংবাদ হইতে কয়েকটি তথ্য সুস্পষ্ট দেখা দিতেছে। প্রথমত, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ও রাজবংশের সুদীর্ঘ দান-তালিকায় বৌদ্ধধর্ম ও সংঘে একটি দানের উল্লেখও নাই। অথচ বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব তখনও ছিল, লক্ষ্মণসেনের তর্পনদীঘি লিপিতেই তাহার প্রমাণ আমরা দেখিয়াছি। তাহা ছাড়া, রণবঙ্কমল্ল হরিকাল দেবের (১২২০) পট্টিকেরা লিপিও তাহার অন্যতম সাক্ষ্য; এই লিপিতে হরিকাল কর্তৃক পট্টিকেরা নগরের এক বৌদ্ধবিহারে একখণ্ড ভূমিদানের উল্লেখ আছে। এই লিপিতেই দুর্গোত্তারা নামক বৌদ্ধ দেবীমূর্তির এবং সহজধর্মেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আরও প্রমাণ আছে। পঞ্চরক্ষা নামক মহাযানগ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকা অংশে "পরমেশ্বর-পরমসৌগত-পরমমহারাজাধিরাজ শ্রীমন্ গৌড়েশ্বর-মধুসেন-দেবপাদানাং বিজয়রাজ্যে" উল্লেখ হইতে জানা যায় ১২১১ শকে (—১২৮৯) মধুসেন নামক একজন বৌদ্ধ রাজা গৌড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। বর্মণরাষ্ট্রেও বৌদ্ধ মহাযান মতের অস্তিত্ব ছিল। লঘুকালচক্র নামক মহাযান গ্রন্থের বিমলপ্রভা নামীয় টীকার একটি পুঁথি লেখা হইয়াছিল হরিবর্মা দেবের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে, এবং ৪৬ রাজ্যাঙ্কে অর্থাৎ সাত বৎসর পর, "পূর্বোত্তর দিশাভাগে

বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের প্রতি ব্রাহ্মণ-তন্ত্রের ব্যবহার

বেংগনত্থাস্তথা কূলে" গৌরী নামে একটি (বৌদ্ধ ?) মহিলা স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়াছিলেন গ্রন্থটি নিয়মিত বাচনের জন্য। এই বেংগ নদী, মনে হয়, যশোর কি ফরিদপুর জেলার কোনও নদী। এই অঞ্চলেই পঞ্চদশ শতকেও বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায় ১৪৯২ সংবতের (=১৪৩৬) মহাযান মতের বিখ্যাত গ্রন্থ বোধিচর্যাবতারের একটি অনুলিপি হইতে। এই অনুলিপিটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন সোহিখতরী গ্রামনিবাসী কুটুম্বিক উচ্চমহত্তম শ্রীমাধবমিত্রের পুত্র মহত্তম শ্রীরামদেবের স্বার্থ-পরার্থের জন্য "সদ্বৌদ্ধ করণকায়স্থ ঠক্কুর" শ্রীঅমিতাভ। কোন এক সময়ে পুঁথিখানা গুণকীর্তি "ভিক্ষুপাদানাং" অধিকারে ছিল। পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রের আমলে বৌদ্ধ রাজবংশের যে-ঔদার্য ছিল সেন-বর্মণ রাষ্ট্রের সে-ঔদার্যের এতটুকু চিহ্ন কোথাও দেখা যাইতেছে না। কান্তিদেবের পিতা বৌদ্ধ ধনদত্ত একজন পরম শিবভক্ত রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং নিজের সুভাষিত-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণে ব্যুৎপত্তির কথা বলিতে গিয়া গর্বানুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কান্তিদেব নিজে বৌদ্ধ হইয়াও তাঁহার রাজকীয় শীলমোহরে বৌদ্ধ পিতা ও শৈব মাতা উভয়ের ধর্মের সমন্বিত রূপ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই ধরণের বহু দৃষ্টান্ত আগেও উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শের সেই উদারতার যুগ আর ছিল না। সেন-বর্মণদের আমলে এই ঔদার্যের এতটুকু দৃষ্টান্ত কোথাও নাই। দ্বিতীয়ত, সেন-বর্মণ-দেবরাষ্ট্র ও রাজবংশ বাংলার অতীত সামাজিক বিবর্তনের ধারা, বিশেষভাবে, গৌরবময় পাল-চন্দ্র যুগের ধারা, গতি-প্রকৃতি ও আদর্শ একেবারে অস্বীকার করিয়া বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ বাংলাদেশে পুনঃপ্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-কালিদাস-ভবভূতি যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য আদর্শের কথা বলিয়াছেন সেই ব্রাহ্মণ্য আদর্শ সমাজ-জীবনে সঞ্চার করিবার প্রয়াস লিপিগুলিতে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে সুস্পষ্ট। এই যুগের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রতিনিধি হলায়ুধ সন্দেহ নাই। তাঁহার ব্রাহ্মণসর্বস্বের গোড়াতেই আত্মপ্রশস্তিমূলক কয়েকটি শ্লোক আছে, তাহার একটি এই :

> পাত্রং দারুময়ং কচিদ্ বিজয়তে কচিৎ ভাজনং
> কুত্রাপ্যস্তি দুকূলমিন্দুধবলং কুত্রাপি কৃষ্ণাজিনম্।
> ধূপঃ কাপি বষট্কৃতাহুতিকৃতো ধূমঃ পরঃ কাপ্যভূদ্
> অগ্নে কর্মফলং চ তস্য যুগপজ্জাগর্তি যন্মন্দিরে॥

[হলায়ুধের নিজের গৃহে] কোথায়ও কাঠের [যজ্ঞ] পাত্র [ছড়াইয়া আছে]; কোথাও বা স্বর্ণপাত্র [ইত্যাদি]। কোথাও ইন্দুধবল দুকূলবস্ত্র; কোথাও কৃষ্ণমৃগচর্ম। কোথাও ধূপের [গন্ধময় ধূম]; কোথাও বষট্কার ধ্বনিময় আহুতির ধূম। [এইভাবে তাঁহার গৃহে] অগ্নির এবং [তাঁহার নিজের] কর্মফল যুগপৎ জাগ্রত।

ইহাই ব্রাহ্মণ্য সেন-রাষ্ট্রের ভাবপরিমণ্ডল। হলায়ুধ-গৃহের ভাবকল্পনাই সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভাবকল্পনা।

কনক-তুলাপুরুষ মহাদান, ঐন্দ্রীমহাশান্তি, হেমাশ্বমহাদান, হেমাশ্বরথদান প্রভৃতি যাগযজ্ঞ; সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, উত্থানদ্বাদশীতিথি, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি প্রভৃতি উপলক্ষে স্নান, তর্পণ, পূজানুষ্ঠান; শিবপুরাণোক্ত ভূমিদানের ফলাকাঙ্ক্ষা; বিভিন্ন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ; গোত্র, প্রবর, গাঞী প্রভৃতির বিশদ্ বিস্তৃত পরিচয়োল্লেখ; দূর্বাতৃণ লইয়া দানকার্য সমাপন; নীতিপাঠক শান্ত্যাগারিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের উপর রাষ্ট্রের কৃপাবর্ষণ ইত্যাদির সামাজিক ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট—সে-ইঙ্গিত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রচলন এবং পাল-চন্দ্র যুগের সমন্বয় ও সমীকরণাদর্শের বিলোপ। বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ধর্মাদর্শের সহজ স্বাভাবিক বিবর্তিত সমন্বয় নয়, ঔদার্যময় বিন্যাস নয়, এক বর্ণ, এক ধর্ম ও সমাজাদর্শের একাধিপত্যই সেন-বর্মণ যুগের একতম কামনা ও আদর্শ। সে-বর্ণ, ব্রাহ্মণ বর্ণ। সে-ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। এবং সে-সমাজাদর্শ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের আদর্শ। এই কালের স্মৃতি-ব্যবহার-মীমাংসা গ্রন্থে আগেই দেখিয়াছি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের জয়জয়কার; লিপিমালায়ও তাহাই দেখিলাম। সেই আদর্শই হইল সমাজ ব্যবস্থার মাপকাঠি। রাষ্ট্রের শীর্ষে যাঁহারা আসীন সেই রাজারা, এবং রাষ্ট্রের যাঁহারা প্রধানতম সমর্থক সেই ব্রাহ্মণেরা দুইয়ে মিলিয়া এই আদর্শ ও মাপকাঠি গড়িয়া তুলিলেন; পরস্পরের সহযোগীতায়, পোষকতায় ও সমর্থনে, মূর্তিতে-মন্দিরে রাজকীয় লিপি মালায়, স্মৃতি-ব্যবহার ও ধর্মশাস্ত্রে, সর্বথা, সর্ব উপায়ে এই আদর্শ ও মাপকাঠি সবলে সোৎসাহে প্রচার করিলেন। পশ্চাতে যেখানে রাষ্ট্রের সমর্থন সেখানে এই প্রচারকার্য ও ঈপ্সিত সমাজ-ব্যবস্থার দ্রুত প্রচলন সার্থক হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়।

ভিন্-প্রদেশী বর্মণ ও সেনাধিপত্য সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই (তখন পাল-পর্বের শেষ অধ্যায়) বাংলার ইতিহাস-চক্র সম্পূর্ণ আবর্তিত হইয়া গেল। বৈদিক, আর্য ও পৌরাণিক

পরিণতি

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি বাংলাদেশে গুপ্ত আমল হইতেই সবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, সে-প্রমাণ আমরা আগেই পাইয়াছি। তিনশত সাড়ে তিনশত বৎসর ধরিয়া এই প্রবাহ চলিয়াছে। বৌদ্ধ খড়্গ পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রের কালেও তাহা ব্যাহত হয় নাই; বরং আমরা দেখিয়াছি সামাজিক আদর্শ ও অনুশাসনের ক্ষেত্রে এইসব রাষ্ট্র ও রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য আদর্শ ও অনুশাসনকেই মানিয়া চলিত, কারণ সেই আদর্শ ও অনুশাসনই ছিল বৃহত্তর জনসাধারণের, অন্তত উচ্চতর স্তর সমূহের লোকদের আদর্শ ও অনুশাসন। কিন্তু, বৌদ্ধ বলিয়াই হউক বা অন্য সামাজিক বা অর্থনৈতিক কারণেই হউক, পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ ও অনুশাসনের একটা ঔদার্য ছিল—তাহার দৃষ্টান্ত সত্য সত্যই অফুরন্ত—ব্রাহ্মণ্য সামাজিক আদর্শকেই একটা বৃহত্তর সমন্বিত ও সমীকৃত আদর্শের রূপ দিবার সজাগ চেষ্টা ছিল; অন্যতর সামাজিক যুক্তিপদ্ধতি ও আদর্শকে অস্বীকার করার কোনও চেষ্টা ছিল না, কোনও সংরক্ষণী মনোবৃত্তি সক্রিয় ছিল না। সেন-বর্মণ আমলে কিন্তু তাহাই হইল; সমাজ ব্যবস্থায় কোনও ঔদার্য, অন্যতর আদর্শ ও

ব্যবস্থার কোনও স্বীকৃতিই আর রহিল না; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি এবং তদনুযায়ী সমাজ ও বর্ণব্যবস্থা একান্ত হইয়া উঠিল; তাহারই সর্বময় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল— রাষ্ট্রের ইচ্ছায় ও নির্দেশে।

ফল যাহা ফলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ফলিল। বর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে তাহার পরিপূর্ণ রূপ দেখিতেছি সমসাময়িক স্মৃতি-গ্রন্থাদিতে, বৃহদ্ধর্মপুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, সমসাময়িক লিপিমালায় এবং কিছু কিছু পরবর্তী কুলজী গ্রন্থমালায়।

ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক বর্ণব্যবস্থার চূড়ায় থাকিবেন স্বয়ং ব্রাহ্মণেরা ইহা তো খুবই স্বাভাবিক। নানা গোত্র, প্রবর ও বিভিন্ন বৈদিক শাখানুযায়ী ব্রাহ্মণেরা যে পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই উত্তর-ভারত হইতে বাংলাদেশে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা তো আমরা আগেই দেখিয়াছি। "মধ্যদেশ-বিনির্গত" ব্রাহ্মণদের সংখ্যা অষ্টম শতক হইতে ক্রমশ বাড়িয়াই যাইতে আরম্ভ করিল; ক্রোড়ঞ্চি-ক্রোড়ঞ্জ (=কোলাঞ্চ), তর্কারি (যুক্তপ্রদেশের শ্রাবস্তী অন্তর্গত), মৎস্যাবাস, কুন্তীর, চন্দবার (এটোয়া জেলার বর্তমান চান্দোয়ার), হস্তিপদ, মুক্তাবাস্ত, এমন কি সুদূর লাট (গুজরাত) দেশ হইতে ব্রাহ্মণ পরিবারদের বাংলাদেশে আসিয়া বসবাসের দৃষ্টান্ত এ-যুগের লিপিগুলিতে সমানেই পাওয়া যাইতেছে। ইহারা এদেশে আসিয়া পূর্বাগত ব্রাহ্মণদের এবং তাঁহাদের অগণিত বংশধরদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমানই স্বাভাবিক।

ব্রাহ্মণ

কুলজীগ্রন্থের আদিশূর-কাহিনীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বর্ণকাহিনী রচনার প্রয়োজন নাই; লিপিমালা ও সমসাময়িক স্মৃতি-গ্রন্থাদির সাক্ষ্যই যথেষ্ট। পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই দেখিতেছি চট্ট, বন্দ্য ইত্যাদি গ্রামের নামে পরিচয় দিবার একটি রীতি ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা যাইতেছে; নিঃসংশয়ে বলিবার উপায় নাই, কিন্তু মনে হয় গাঞী পরিচয় রীতির তখন হইতেই প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তখনও বিধিবদ্ধ, প্রথাবদ্ধ হয় নাই। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে কিন্তু এই রীতি একেবারে সুনির্দিষ্ট সীমায় প্রথাবদ্ধ নিয়মবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ভবদেব ভট্টের মাতা বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ-কন্যা; টীকাসর্বস্ব গ্রন্থের রচয়িতা আর্তিহরপুত্র সর্বানন্দ (১১৫৯-৬০) বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ; ভবদেব স্বয়ং এবং শাহ্যাগরাধিকৃত ব্রাহ্মণ রামদেবশর্মা উভয়েই সাবর্ণগোত্রীয় এবং সিদ্ধল-গ্রামীয়; বল্লালগুরু অনিরুদ্ধভট্ট চম্পাহিটী বা চম্পহট্টীয় মহামহোপাধ্যায়; মদনপালের মনহলি লিপির দানগ্রহিতা বটেশ্বরও চম্পহট্টীয়; জীমূতবাহন আত্মপরিচয় দিয়াছেন পারিভদ্রীয় বলিয়া। দশরথদেবের আদাবাড়ী লিপিতে দিণ্ডী, পালি বা পালী, সেউ, মাসচটক বা মাসচড়ক, মূল, সেহন্দায়ী, পুতি, মহান্তিয়াড়া এবং করঞ্জ প্রভৃতি গাঞী পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। হলায়ুধের মাতৃপরিচয় গোচ্ছাষণ্ডী-গ্রামীয়রূপে; লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি শ্রীনিবাসের মহিন্তাপনীবংশ-পরিচয়ও গাঞী পরিচয়। বরেন্দ্রীর তটক, মৎস্যাবাস; রাঢ়ার ভূরিশ্রেষ্ঠী, পূর্বগ্রাম, তালবাটী, কাঞ্জিবিল্লী এবং বাংলাদেশের অন্যান্য

গাঞী বিভাগ

অনেক গ্রামের (যথা ভট্টশালী, শকটী, রত্নামালী, তৈলপাটী, হিজ্জলবন, চতুর্থ খণ্ড, বাপভলা) ব্রাহ্মণদের উল্লেখ সমসাময়িক লিপি ও গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাইতেছে। সংকলয়িতা শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃত (১২০৬)-গ্রন্থেও দেখিতেছি বাঙালী ব্রাহ্মণদের নামের সঙ্গে—বর্তমান ক্ষেত্রে নামের পূর্বে—গ্রামের নাম অর্থাৎ গাঞী পরিচয় ব্যবহারের রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, যথা, ভট্টশালীয় পীতাম্বর, তৈলপাটীয় গাঙ্গোক, কেশরকোলীয় নাথোক, বন্দিঘটীয় সর্বানন্দ, ইত্যাদি। এইসব গাঞী পরিচয় অল্পবিস্তর পরিবর্তিতরূপে কুলজী-গ্রন্থমালার রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পঞ্চগোত্রে বিভক্ত ১৫৬টী গাঞী-পরিচয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। কালক্রমে এই গাঞী-পরিচয়প্রথা বিস্তৃত হইয়াছে, বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং সুনির্দিষ্ট সীমায় সীমিত হইয়াছে; এই সীমিত, বিধিবদ্ধ প্রথারই অস্পষ্ট পরিচয় আমরা পাইতেছি কুলজী-গ্রন্থমালায়।

কিন্তু গাঞী বিভাগ অপেক্ষাও সামাজিক দিক হইতে গভীর অর্থবহ বিভাগ ব্রাহ্মণদের ভৌগোলিক বিভাগ। এক্ষেত্রেও কুলজীগ্রন্থের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া লাভ নাই, কারণ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ও অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের উদ্ভব সম্বন্ধে এইসব গ্রন্থে যে-বিবরণ পাওয়া যাইতেছে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব প্রামাণ্যগ্রন্থ, এবং তাহার রচনাকালও সুনির্দিষ্ট। এই গ্রন্থে হলায়ুধ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা যথার্থ বেদবিদ্ ছিলেন না; ব্রাহ্মণদের বেদচর্চার সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল, তাঁহার মতে, উৎকল ও পাশ্চাত্যদেশ সমূহে। যাহাই হউক, হলায়ুধের সাক্ষ্য হইতে দেখিতেছি, দ্বাদশ শতকেই জনপদ বিভাগানুযায়ী ব্রাহ্মণদের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে; এবং লিপিসাক্ষ্য হইতে জানা যায়, এই সব ব্রাহ্মণেরা রাঢ় ও বরেন্দ্রীর বাহিরে পূর্ববঙ্গেও বসতি স্থাপন করিতেছেন। বরেন্দ্রীর ভটকগ্রামীয় একজন ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, অন্তত এই একটি দৃষ্টান্ত আমরা জানি। কুলজী-গ্রন্থমালায় দেখা যায় কায়স্থ, বৈদ্য, বারুই প্রভৃতি অব্রাহ্মণ উপবর্ণদের ভিতরও রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং বঙ্গজ প্রভৃতি ভৌগোলিক বিভাগ প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এ-সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু নাই।

ভৌগোলিক বিভাগ

রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র বিভাগ ছাড়া ব্রাহ্মণদের আর একটি শ্রেণী—বৈদিক—বোধ হয় এই যুগেই উদ্ভূত হইয়াছিল। কুলজী গ্রন্থমালায় এ-সম্বন্ধে দুইটি কাহিনী আছে; একটি কাহিনীর মতে, বাংলাদেশে যথার্থ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ না থাকায় এবং যজ্ঞাগ্নি যথানিয়মে রক্ষিত না হওয়ায় রাজা শ্যামলবর্মা (বোধ হয় বর্মণরাজ সামলবর্মা) কান্যকুব্জ (কোনও কোনও গ্রন্থমতে, বারাণসী) হইতে ১০০১ শকাব্দে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। অপর কাহিনীমতে সরস্বতী নদীতীরস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণেরা যবনাক্রমণের ভয়ে ভীত হইয়া বাংলাদেশে পলাইয়া আসেন, এবং বর্মণরাজ হরিবর্মার পোষকতায় ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায় বসবাস আরম্ভ করেন। উত্তর-ভারত

বৈদিক ব্রাহ্মণ

হইতে আগত এই সব বৈদিক ব্রাহ্মণেরাই পাশ্চাত্য বৈদিক নামে খ্যাত। বৈদিক ব্রাহ্মণদের আর এক শাখা আসেন উৎকল ও দ্রবিড় হইতে; ইঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামে খ্যাত। এই কুলজী-কাহিনীর মূল বোধ হয় হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব-গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। এই গ্রন্থ-রচনার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া হলায়ুধ বলিতেছেন, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ করিতেন না এবং সেই হেতু বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের রীতিপদ্ধতিও জানিত না; যথার্থ বেদজ্ঞান তাঁহার সময়ে উৎকল ও পাশ্চাত্যদেশেই প্রচলিত ছিল। বাংলার ব্রাহ্মণেরা নিজেদের বেদজ্ঞ বলিয়া দাবি করিলেও যথার্থত বেদচর্চার প্রচলন বোধ হয় সত্যই তাঁহাদের মধ্যে ছিল না। হলায়ুধের আগে বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ ভট্টও তাঁহার পিতৃদয়িতা গ্রন্থে বাংলাদেশে বেদচর্চার অবহেলা দেখিয়া দুঃখ করিয়াছেন। যাহা হউক, পাশ্চাত্য বলিতে হলায়ুধ এক্ষেত্রে উত্তর-ভারতকেই বুঝাইতেছেন, সন্দেহ নাই। বাংলা দেশে উৎকল ও পাশ্চাত্যদেশাগত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বসবাস তখন করিতেছিলেন কিনা এ-সম্বন্ধে হলায়ুধ কোনও কথা বলেন নাই; তবু, সামলবর্মা ও হরিবর্মার সঙ্গে কুলজী-কাহিনীর সম্বন্ধ, তাঁহাদের মোটামুটি তারিখ, অনিরুদ্ধ ভট্ট এবং হলায়ুধ কথিত রাঢ়ে-বরেন্দ্রীতে বেদচর্চার অভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎকল ও পশ্চিম দেশসমূহে বেদজ্ঞানের প্রসার, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য এই দুই শাখায় বৈদিক ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিভাগ, এই সব বিচিত্র হেতু-সমাবেশ দেখিয়া মনে হয় সেন-বর্মণ আমলেই বাংলায় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের উদ্ভব দেখা দিয়াছিল।

এই সব শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছাড়া আরও দুই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের সংবাদ এই যুগেই পাওয়া যাইতেছে। গয়াজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিপিতে (১০৫৯ শক—১১৩৭) দেখিতেছি, শাকদ্বীপাগত মগব্রাহ্মণ-পরিবার সম্ভূত জনৈক ব্রাহ্মণ গঙ্গাধর জয়পাণি নামে গৌড়রাষ্ট্রের একজন কর্মচারীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই লিপি এবং বৃহদ্ধর্ম-পুরাণগ্রন্থের সাক্ষ্য হইতে দেবল বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের পরিচয় জানা যায়। শেষোক্ত গ্রন্থে স্পষ্টই বলা হইতেছে, দেবল ব্রাহ্মণেরা শাকদ্বীপ হইতে আসিয়াছিলেন, এবং সেই হেতু তাঁহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বল্লালসেনের দানসাগর গ্রন্থে সারস্বত নামে আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের খবর পাওয়া যাইতেছে। কুলজী-গ্রন্থের মতে ইঁহারা আসিয়াছিলেন সরস্বতী নদীর তীর হইতে, অঙ্গরাজ শূদ্রকের আহ্বানে। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের উদ্ভব সম্বন্ধে কুলজী-গ্রন্থে কিন্তু অন্য কাহিনী দেখা যাইতেছে; এই মতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষেরা গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত ছিলেন, এবং ইঁহারা বাংলাদেশে প্রথম আসিয়াছিলেন গৌড়রাজ শশাঙ্কের আমলে, শশাঙ্কেরই আহ্বানে—তাঁহার রোগমুক্তি উদ্দেশে গ্রহযজ্ঞ করিবার জন্য। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখিতেছি দেবল অর্থাৎ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ পিতা এবং বৈশ্য মাতার সন্তানরা গ্রহবিপ্র বা গণক নামে পরিচিত হইতেছেন। যাহাই হউক, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-গ্রন্থে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে গণক বা গ্রহবিপ্ররা

(এবং সম্ভবত, দেবল-শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরাও) ব্রাহ্মণ-সমাজে সম্মানিত ছিলেন না; গণক-গ্রহবিপ্ররা তো 'পতিত' বলিয়াই গণ্য হইতেন, এবং সেই পাতিত্যের কারণ বৈদিক ধর্মে তাঁহাদের অবজ্ঞা, জ্যোতিষ ও নক্ষত্রবিদ্যায় অতিরিক্ত আসক্তি এবং জ্যোতির্গণনা করিয়া দক্ষিণাগ্রহণ। এই গণক বা গ্রহবিপ্রদেরই একটি শাখা অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন; ইঁহারাও 'পতিত' বলিয়া গণ্য হইতেন, কারণ তাঁহারাই সর্বপ্রথম শূদ্রদের নিকট হইতে এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণেই ভট্ট ব্রাহ্মণ নামে আর এক নিম্ন বা 'পতিত' শ্রেণীর ব্রাহ্মণের খবর পাওয়া যাইতেছে; সূত পিতা এবং বৈশ্য মাতার সন্তানরাই ভট্ট-ব্রাহ্মণ, এবং অন্যলোকের যশোগান করাই ইঁহাদের উপজীবিকা, এ-সংবাদও এই গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। ইঁহারা নিঃসন্দেহে বর্তমান কালের ভাট ব্রাহ্মণ। এখানেও 'পতিত' ব্রাহ্মণদের তালিকা শেষ হইতেছে না। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখিতেছি শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা উত্তম সঙ্কর পর্যায়ের ২০টি উপবর্ণ ছাড়া (ইঁহারা সকলেই শূদ্র) আর কাহাদেরও পূজানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিতে পারিতেন না; মধ্যম ও অধম সঙ্কর বা অন্ত্যজ পর্যায়ের কাহারও পৌরোহিত্য করিলে তিনি 'পতিত' হইয়া যজমানের বর্ণ বা উপবর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। মধ্যযুগের ও বর্তমান কালের 'বর্ণ-ব্রাহ্মণ'দের উৎপত্তি এইভাবেই হইয়াছে। স্মার্ত ভবদেব ভট্ট বলিতেছেন, এই সব ব্রাহ্মণদের স্পৃষ্ট খাদ্য যথার্থ বা সংব্রাহ্মণদের খাওয়া নিষেধ, খাইলে সে-অপরাধ হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কৃচ্ছ্রসাধনের বিধানও তিনি দিয়াছেন। এই বিধিনিষেধ ক্রমশ কঠোরতর হইয়া মধ্যযুগেই দেখা গেল, পতিত বর্ণব্রাহ্মণ ও শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান দূরে থাক্ তাঁহাদের স্পৃষ্ট জলও সংব্রাহ্মণেরা পান করিতেন না। তাহা ছাড়া কতকগুলি বৃত্তিও ছিল ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ; ভবদেব ভট্ট তাহার এক সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। ব্রাহ্মণদের তো প্রধান বৃত্তিই ছিল ধর্মকর্মানুষ্ঠান এবং অন্যের ধর্মানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা। অধিকাংশ ব্রাহ্মণই তাহা করিতেন, সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক রাজা ও রাষ্ট্র, ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের কৃপালাভ করিয়া দান ও দক্ষিণা-স্বরূপ প্রচুর অর্থ ও ভূমির অধিকারী হইতেন, এমন প্রমাণেরও অভাব নাই। আবার অনেক ব্রাহ্মণ ছোটবড় রাজকর্মও করিতেন; ব্রাহ্মণ রাজবংশের খবরও পাওয়া যায়। পাল-আমলে দর্ভপাণি-কেদারমিশ্রের বংশ, বৈদ্যদেবের বংশ, বর্মণরাষ্ট্রে ভবদেব ভট্টের বংশ, সেনরাষ্ট্রে হলায়ুধের বংশ একদিকে যেমন উচ্চতম রাজপদ অধিকার করিতেন, তেমনই আর একদিকে শাস্ত্রজ্ঞানে, বৈদিক যাগযজ্ঞ আচারানুষ্ঠানে, পাণ্ডিত্যে ও বিদ্যাবত্তায় সমাজেও তাঁহাদের স্থান ছিল খুব সম্মানিত। ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধে নায়কত্ব করিতেন, যোদ্ধৃ-ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেন এমন প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ভবদেবের পূর্বোক্ত তালিকায় দেখিতেছি, অনেক নিষিদ্ধবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের পক্ষে শূদ্রবর্ণের অধ্যাপনা তাঁহাদের পূজানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য, চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা, চিত্র ও অন্যান্য

বিভিন্ন শিল্পবিদ্যার চর্চা প্রভৃতি বৃত্তিও নিষিদ্ধ ছিল; করিলে 'পতিত' হইতে হইত। কিন্তু কৃষিবৃত্তি নিষিদ্ধ ছিল না; যুদ্ধবৃত্তিতে আপত্তি ছিল না; মন্ত্রী, সন্ধি-বিগ্রহিক, ধর্মাধ্যক্ষ বা সেনাধ্যক্ষ হইলে কেহ পতিত হইত না! অথচ বর্ণবিশেষের অধ্যাপনা বা পৌরোহিত্য নিষিদ্ধ ছিল।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলাদেশে আর যত বর্ণ আছে, সমস্তই সঙ্কর; চতুর্বর্ণের যথেচ্ছ পারস্পরিক যৌনমিলনে উৎপন্ন মিশ্রবর্ণ, এবং তাঁহারা সকলই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণদ্বয়ের উল্লেখই এই গ্রন্থে নাই। ব্রাহ্মণেরা এই সমস্ত শূদ্র সঙ্কর উপবর্ণগুলিকে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি উপবর্ণের স্থান ও বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণেতর বর্ণবিভাগ

এই বর্ণ ও বৃত্তিসমূহের বিবরণ দিতে গিয়া বৃহদ্ধর্মপুরাণ বেন রাজা সম্বন্ধে যে-গল্পের অবতারণা করিয়াছেন, কিংবা উত্তম, মধ্যম ও অধম সঙ্কর এই তিন পর্যায়-বিভাগের যে-ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার উল্লেখ বা আলোচনা অবান্তর। কারণ, স্মৃতিগ্রন্থের বর্ণ-উপবর্ণ ব্যাখ্যার সঙ্গে বাস্তব ইতিহাসের যোগ আবিষ্কার করা কঠিন। যাহা হউক, এই গ্রন্থ তিন পর্যায়ে ৩৬টি উপবর্ণ বা জাতের কথা বলিতেছে, যদিও তালিকাভুক্ত করিতেছে ৪১টি জাত। বাংলাদেশের জাত-সংখ্যা বলিতে আজও আমরা বলি ছত্রিশ জাত। ৩৬টিই বোধ হয় ছিল আদি সংখ্যা, পরে আরও ৫টি উপবর্ণ এই তালিকায় ঢুকিয়া পড়িয়া থাকিবে। উত্তম-সংকর পর্যায়ে ২০টি উপবর্ণ:

১। করণ—ইহারা লেখক ও পুস্তকর্মদক্ষ, এবং সৎশূদ্র বলিয়া পরিগণিত।

২। অম্বষ্ঠ—ইহাদের বৃত্তি চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদচর্চা, সেই জন্য ইহারা বৈদ্য বলিয়া পরিচিত। ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয় বলিয়া ইহাদের বৃত্তি বৈশ্যের, কিন্তু ধর্মকর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারে ইহারা শূদ্র বলিয়াই গণিত।

উত্তম-সংকর

৩। উগ্র—ইহাদের বৃত্তি ক্ষত্রিয়ের, যুদ্ধবিদ্যাই ইহাদের ধর্ম।

৪। মাগধ—হিংসামূলক যুদ্ধব্যবসায়ে অনিচ্ছুক হওয়ায় ইহাদের বৃত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছিল সূত বা চারণের এবং সংবাদবাহীর।

৫। তন্ত্রবায় (তাঁতী)।

৬। গান্ধিক বণিক (গন্ধদ্রব্য বিক্রয় যে-বণিকের বৃত্তি; বর্তমানের গন্ধবণিক)।

৭। নাপিত।

৮। গোপ—(লেখক)।

৯। কর্মকার (কামার)।

১০। তৈলিক বা তৌলিক—(গুবাক-ব্যবসায়ী)।

১১। কুম্ভকার (কুমোর)।

১২। কংসকার (কাঁসারী)।

১৩। শাংখিক বা শংখকার (শাঁখারী)।

১৪। দাস—কৃষিকার্য ইহাদের বৃত্তি, অর্থাৎ চাষী।

১৫। বারজীবি (বারুই)—(পানের বরজ উৎপাদন করা ইহাদের বৃত্তি)।

১৬। মোদক (ময়রা)।

১৭। মালাকার।

১৮। সূত—(বৃত্তি উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু অনুমান হয় ইহারা চারণ-গায়ক—'পতিত' ব্রাহ্মণ)।

১৯। রাজপুত্র—(বৃত্তি অনুল্লিখিত ; রাজপুত ?)

২০। তাম্বলী (তামলী)—পানবিক্রেতা।

মধ্যম সংকরপর্যায়ে ১২টি উপবর্ণ :

২ । তক্ষণ—খোদাইকর।

২২। রজক।

২৩। স্বর্ণকার—(সোনার অলঙ্কার ইত্যাদি প্রস্তুতকারক)।

২৪। সুবর্ণবণিক—সোনা-ব্যবসায়ী।

মধ্যম সংকর

২৫। আভীর (আহীর)—(গোয়ালা, গোরক্ষক)।

২৬। তৈলকার (তেলী)।

২৭। ধীবর—(মৎস্যব্যবসায়ী)।

২৮। শৌণ্ডিক—(শুঁড়ি)।

২৯। নট—যাহারা নাচে, খেলা ও বাজি দেখায়।

৩০। শাবাক, শাবক, শারক, শাবার (?)।

৩১। শেখর (?)।

৩২। জালিক (জেলে, জালিয়া)।

অধম সংকর বা অন্ত্যজ পর্যায়ে ৯টি উপবর্ণ ; ইহারা সকলেই বর্ণাশ্রম-বহিষ্কৃত। অর্থাৎ ইহারা অস্পৃশ্য, এবং ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার মধ্যে ইহাদের কাহারও কোনও স্থান নাই।

অধম সংকর বা অন্ত্যজ

৩৩। মলেগ্রহী (বঙ্গবাসী সং : মলেগৃহি)।

৩৪। কুড়ব (?)।

৩৫। চণ্ডাল (চাঁড়াল)।

৩৬। বরুড় (বাউড়ী ?)।

৩৭। তক্ষ (তক্ষণকার ?)।

৩৮। চর্মকার (চামার)।

৩৯। ঘট্টজীবি (পাঠান্তরে ঘণ্টজীবি—খেয়াঘাটের রক্ষক, খেয়াপারাপার মাঝি ? বর্তমান, পাটনী ?)।

৪০। ভোলাবাহী—ডুলি-বেহারা, বর্তমান ডুলিয়া, ডুলে' (?)।

৪১। মল্ল (বর্তমান মালো ?)।

এই ৪১টি জাত ছাড়া ম্লেচ্ছ পর্যায়ে আরও কয়েকটি দেশি ও ভিন্‌প্রদেশি আদিবাসী কোমের নাম পাওয়া যায়; স্থানীয় বর্ণ-ব্যবস্থার মধ্যে ইহাদেরও কোনও স্থান ছিল না, যথা, পুক্‌কশ, পুলিন্দ, খস, খর, কম্বোজ, যবন, সুহ্ম, শবর ইত্যাদি।

ম্লেচ্ছ

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও অনুরূপ বর্ণ-বিন্যাসের খবর পাওয়া যাইতেছে। 'সৎ' ও 'অসৎ' (উচ্চ ও নিম্ন) এই দুই পর্যায়ে শূদ্রবর্ণের বিভাগের আভাস বৃহদ্ধর্মপুরাণেই পাওয়া গিয়াছে; করণদের বলা হইয়াছে 'সৎশূদ্র'। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সমস্ত সংকর বা মিশ্র উপবর্ণগুলিকে সৎ ও অসৎ শূদ্র এই দুই পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। সৎশূদ্র পর্যায়ে যাহাদের গণ্য করা হইয়াছে তাঁহাদের নিম্নলিখিতভাবে তালিকাগত করা যাইতে পারে। এই ক্ষেত্রেও সর্বত্র পৃথক সূচীনির্দেশ দেওয়া হইতেছেনা। এই অধ্যায়ে আহৃত অধিকাংশ সংবাদ এই গ্রন্থের প্রথম অর্থাৎ ব্রহ্মখণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে পাওয়া যাইবে; ১৬-২১ এবং ৯০—১৩৭ শ্লোক বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। ২।৪টি তথ্য অন্যত্র বিক্ষিপ্তও যে নাই তাহা নয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মিশ্রবর্ণেরও সম্পূর্ণ তালিকা এক্ষেত্রে উদ্ধার করা হয় নাই, করিয়া লাভও নাই; কারণ, এই পুরাণই বলিতেছে, 'মিশ্রবর্ণ অসংখ্য, কে তাহার সমস্ত নাম উল্লেখ ও গণনা করিতে পারে' (১।১০।১২২)? সৎশূদ্রদের তালিকাও যে সম্পূর্ণ নয় তাহার আভাসও এই গ্রন্থেই আছে (১।১০।১৮)।

লক্ষ্যণীয় যে, এই পুরাণ বৈদ্য ও অম্বষ্ঠদের পৃথক উপবর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে, এবং উভয় উপবর্ণের যে উৎপত্তি-কাহিনী দিতেছে, তাহাও পৃথক।

১। করণ।

২। অম্বষ্ঠ (দ্বিজ পিতা এবং বৈশ্যমাতার সন্তান)।

সৎশূদ্র

৩। বৈদ্য (জনৈক ব্রাহ্মণীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে জাত সন্তান; বৃত্তি, চিকিৎসা)।

৪। গোপ।

৫। নাপিত।

৬। ভিল্ল—(ইহারা আদিবাসি কোম; কি করিয়া সৎশূদ্র পর্যায়ে পরিগণিত হইলেন, বলা কঠিন)।

৭। মোদক।

৮। কূবর—?

৯। তাম্বূলী (তাম্লী)।

১০। স্বর্ণকার ও অন্যান্ত বণিক } ইহারা পরে ব্রাহ্মণের অভিশাপে 'পতিত' হইয়া 'অসৎ শূদ্র' পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছিলেন; স্বর্ণকারদের অপরাধ, সোনাচুরি।

১১। মালাকার।

১২। কর্মকার।

১৩। শংখকার।

১৪। কুবিন্দক (তন্তুবায়)।

১৫। কুম্ভকার।

১৬। কংসকার।

১৭। সূত্রধার।

১৮। চিত্রকার (পটুয়া)।

১৯। স্বর্ণকার।

সূত্রধার ও চিত্রকার কর্তব্যপালনে অবহেলা করায় ব্রাহ্মণের অভিশাপে 'পতিত' হইয়া অসংশূদ্রপর্যায়ে গণ্য হইয়াছিলেন। স্বর্ণকারও 'পতিত' হইয়াছিলেন, এ কথা আগেই বলা হইয়াছে।

পতিত বা অসংশূদ্র পর্যায়ে যাঁহাদের গণনা করা হইত তাঁহাদের তালিকাগত করিলে এইরূপ দাঁড়ায়:

স্বর্ণকার। [সুবর্ণ] বণিক। সূত্রধার (বৃহদ্ধর্মপুরাণের তক্ষণ)। চিত্রকার। ২০। অট্টালিকাকার। ২১। কোটক (ঘরবাড়ি তৈয়ার করা যাঁহাদের বৃত্তি)।

অসংশূদ্র — ২২। তীবর। ২৩। তৈলকার। ২৪। লেট। ২৫। মল্ল। ২৬। চর্মকার। ২৭। শুঁড়ি। ২৮। পৌণ্ড্রক (পোদ?)

২৯। মাংসচ্ছেদ (কসাই)। ৩০। রাজপুত্র (পরবর্তী কালের 'রাউত'?) ৩১। কৈবর্ত (কলিযুগের ধীবর)। ৩২। রজক। ৩৩। কোয়ালী। ৩৪। গঙ্গাপুত্র (লেট-তীবরের বর্ণ-সংকর সান্তন)। ৩৫। যুঙ্গি (যুগী?) ৩৬। আগরী (বৃহদ্ধর্মপুরাণের উগ্র? বর্তমানের আগুরী)।

অসংশূদ্রেরও নিম্ন পর্যায়ে অর্থাৎ অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য পর্যায়ে যাঁহাদের গণনা করা যায় তাঁহাদের তালিকাগত করিলে এইরূপ দাঁড়ায়:—

ব্যাধ, ভড় (?), কাপালী, কোল (আদিবাসি কোম), কোঞ্চ (কোচ, আদিবাসী কোম), হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগ্দী?), শরাক (প্রাচীন শ্রাবকদের অবশেষ?), ব্যালগ্রাহী (বৃহদ্ধর্মপুরাণের মল্লেগ্রাহী?) চণ্ডাল ইত্যাদি।

এই দুইটি বর্ণবিভাগের তালিকা তুলনা করিলে দেখা যায় প্রথমোল্লিখিত গ্রন্থের সংকর পর্যায় এবং দ্বিতীয় গ্রন্থের সৎশূদ্র পর্যায় প্রায় এক এবং অভিন্ন; শুধু মগধ, গন্ধবণিক,

তৌলিক বা তৈলিক, দাস, বারজীবি, এবং সূত দ্বিতীয় গ্রন্থের তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে; পরিবর্তে পাইতেছি ভিল্ল ও কুবর এই দুইটি উপবর্ণের উল্লেখ, এবং বৈশ্যদের উল্লেখ। তাহা ছাড়া, প্রথম গ্রন্থের উত্তম সংকর বর্ণের রাজপুত্র দ্বিতীয় গ্রন্থের অসৎশূদ্র পর্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম গ্রন্থের মধ্যম সংকর পর্যায় এবং দ্বিতীয় গ্রন্থের অসৎশূদ্র পর্যায় এক এবং অভিন্ন; শুধু বৃহদ্ধর্মপুরাণের আভীর, নট, শাবাক (শ্রাবক?), শেখর ও জালিক দ্বিতীয় গ্রন্থের তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে; পরিবর্তে পাইতেছি অট্টালিকাকার, কোটক, লেট, মল্ল, চর্মকার পৌণ্ড্রক, মাংসচ্ছেদ, কৈবর্ত গঙ্গাপুত্র, যুঙ্গি, আগরী এবং কোয়ালী। ইহাদের মধ্যে মল্ল ও চর্মকার বৃহদ্ধর্মপুরাণের অধম সংকর বা অন্ত্যজ পর্যায়ের। বৃহদ্ধর্মপুরাণে ধীবর ও জালিক, মৎস্যব্যবসায়ী এই দুইটি উপবর্ণের খবর পাইতেছি; ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পাইতেছি শুধু কৈবর্তদের। কৈবর্তদের উদ্ভব সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে: কৈবর্ত ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান, কিন্তু কলিযুগে তীবরদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ইহারা ধীবর নামে পরিচিত হন এবং ধীবর বৃত্তি গ্রহণ করেন। ভবদেব ভট্টের মতে কৈবর্তরা অন্ত্যজ পর্যায়ের। ভবদেবের অন্ত্যজ পর্যায়ের তালিকা উপরোক্ত দুই পুরাণের তালিকার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে: রজক, চর্মকার নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ এবং ভিল্ল। ভবদেবের মতে চণ্ডাল ও অন্ত্যজ সমার্থক। চণ্ডাল, পুক্কস, কাপালিক, নট, নর্তক, তক্ষণ (বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত মধ্যম সংকর পর্যায়ের তক্ষ?), চর্মকার, সুবর্ণকার, শৌণ্ডিক, রজক এবং কৈবর্ত প্রভৃতি নিম্নতম উপবর্ণের এবং পতিত ব্রাহ্মণদের স্পৃষ্ট খাদ্য ব্রাহ্মণদের অভক্ষ্য বলিয়া ভবদেব ভট্ট বিধান দিয়াছেন, এবং খাইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহাও বলিয়াছেন।

দেখা যাইতেছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে উল্লিখিত তিনটি সাক্ষ্যে অল্পবিস্তর বিভিন্নতা থাকিলেও বর্ণ-উপবর্ণের স্তর উপস্তর বিভাগ সম্বন্ধে ইহাদের তিনজনেরই সাক্ষ্য মোটামুটি একই প্রকার। এই চিত্রই সেন-বর্মনদের আমলের বাংলাদেশের বর্ণ-বিন্যাসের মোটামুটি চিত্র।

করণ-কায়স্থ

প্রথমেই দেখিতেছি করণ ও অম্বষ্ঠদের স্থান। করণরা কিন্তু কায়স্থ বলিয়া অভিহিত হইতেছেন না; এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বৈদ্যদের স্পষ্টতই অম্বষ্ঠ হইতে পৃথক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। করণদের সম্বন্ধে পাল পর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে, এবং করণ ও কায়স্থরা যে বর্ণহিসাবে এক এবং অভিন্ন তাহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই অভিন্নতা পাল-পর্বেই স্বীকৃত হইয়া গিয়াছিল; বৃহদ্ধর্মপুরাণে বা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কেন যে সে-ইঙ্গিত নাই তাহা বলা কঠিন। হইতে পারে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে তখনও তাহা সম্পূর্ণ স্বীকৃত হইয়া উঠে নাই।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে বর্ণ হিসাবে বৈদ্যদেরও উল্লেখ নাই, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে; কিন্তু সেখানেও বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ দুই পৃথক উপবর্ণ, এবং উভয়ের উদ্ভব-ব্যাখ্যাও বিভিন্ন। এই

গ্রন্থের মতে দ্বিজ পিতা ও বৈশ্য মাতার সঙ্গমে অম্বষ্ঠদের উদ্ভব; কিন্তু বৈদ্যদের উদ্ভব সূর্যতনয় অশ্বিনীকুমার এবং জনৈকা ব্রাহ্মণীর আকস্মিক সঙ্গমে। বৈদ্য ও অম্বষ্ঠরা যে এক এবং অভিন্ন এই দাবি সপ্তদশ শতকে ভরতমল্লিকের আগে কেহ করিতেছেন না; ইনিই সর্বপ্রথম নিজে বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন। তবে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের উল্লেখ হইতে বুঝা যায়, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে বৈদ্যরা উপবর্ণ হিসাবে বিদ্যমান, এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও সদ্যোক্ত পুরাণটির সাক্ষ্য একত্র করিলে ইহাও বুঝা যায় যে, অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য উভয়েই সাধারণত একই বৃত্তিঅনুসারী ছিলেন। বোধ হয়, এক এবং অভিন্ন এই চিকিৎসাবৃত্তিই পরবর্তীকালে এই দুই উপবর্ণকে এক এবং অভিন্ন উপবর্ণে বিবর্তিত করিয়াছিল, যেমন করিয়াছিল করণ এবং কায়স্থদের।

অম্বষ্ঠ-বৈদ্য

পালপর্বে কৈবর্ত-মাহিষ্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি, তখন পর্যন্ত কৈবর্তদের সঙ্গে মাহিষ্যদের যোগাযোগের কোনও সাক্ষ্য উপস্থিত নাই এবং মাহিষ্য বলিয়া কৈবর্তদের পরিচয়ের কোনও দাবিও নাই, স্বীকৃতিও নাই। সেন-বর্মন-দেব পর্বেও তেমন দাবি কেহ উপস্থিত করিতেছেন না—এই যুগের কোনও পুরাণ বা স্মৃতিগ্রন্থেও তেমন উল্লেখ নাই। বস্তুত, মাহিষ্য নামে কোনও উপবর্ণের নামই নাই। কৈবর্তদের উদ্ভবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সংকলয়িতা বলিতেছেন, ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য-মাতার সঙ্গমে কৈবর্তদের উদ্ভব। লক্ষ্যণীয় এই যে, গৌতম ও যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাদের প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে মাহিষ্যদের উদ্ভব সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যাই দিতেছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের লেখক কৈবর্ত সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা কোথায় পাইলেন, বলা কঠিন; কোনও প্রাচীনতর গ্রন্থে কৈবর্ত সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা নাই, সমসাময়িক বৃহদ্ধর্মপুরাণ বা কোনো স্মৃতিগ্রন্থেও নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও ব্যাখ্যা যদি বা পাইতেছি মাহিষ্য-ব্যাখ্যা অনুযায়ী, কিন্তু কলিযুগে ইহাদের বৃত্তি নির্দেশ দেখিতেছি ধীবরের মাহিষ্যের নয়। সুতরাং মনে হয়, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্যাখ্যার মধ্যেই কোনও গোলমাল রহিয়া গিয়াছে। দ্বাদশ শতকে ভবদেব ভট্ট কৈবর্তদের স্থান নির্দেশ করিতেছেন অন্ত্যজ পর্যায়ে। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ধীবর ও মৎস্যব্যবসায়ী অন্য একটি জাতের অর্থাৎ জালিকদের স্থান নির্দেশ করিতেছেন মধ্যম সংকর পর্যায়ে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ তীবর ও কৈবর্তদের স্থান নির্দেশ করিতেছেন অসৎশূদ্র পর্যায়ে; এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই ইঙ্গিত এই যে, ইহারা মৎস্যজীবি, কৃষিজীবি নন। তবে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-সংকলয়িতা ইহাদের যে উদ্ভব ব্যাখ্যা দিতেছেন, এই জাতীয় ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়াই পরবর্তীকালে কৈবর্ত ও মাহিষ্যদের এক এবং অভিন্ন বলিয়া দাবি সমাজে প্রচলিত ও স্বীকৃত হয়। যাহাই হউক বর্তমানকালে পূর্ববঙ্গের হালিক দাস এবং পরাশর দাস এবং হুগলী-বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের চাষী কৈবর্তরা নিজেদের মাহিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন; আবার পূর্ববঙ্গে (ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ, ঢাকা অঞ্চলে) মৎস্যজীবি ধীবর ও জালিকরাও কৈবর্ত বলিয়া পরিচিত। বুঝা যাইতেছে, কালক্রমে কৈবর্তদের

কৈবর্ত-মাহিষ্য

মধ্যে দুইটি বিভাগ রচিত হয়, একটি প্রাচীন কালের ন্যায় মৎস্যজীবিই থাকিয়া যায় (যেমন পূর্ববঙ্গে আজও), আর একটি কৃষি (হালিক) বৃত্তি গ্রহণ করিয়া মাহিষ্যদের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। বল্লালচরিতে যে বলা হইয়াছে, রাজা বল্লালসেন কৈবর্ত (এবং মালাকার, কুম্ভকার ও কর্মকার) দিগকে সমাজে উন্নীত করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে কৈবর্তদের এক শ্রেণীর বৃত্তি পরিবর্তনের (চাষী-হালিক হওয়ার) এবং মাহিষ্যদের সঙ্গে অভিন্নতা দাবির যোগ থাকা অসম্ভব নয়।

৯

উপরোক্ত উভয় পুরাণের মতেই করণ-কায়স্থ এবং বৈদ্য-অম্বষ্ঠদের পরেই গোপ, নাপিত, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার, শংখকার, কংসকার, তন্তুবায়-কুবিন্দক, মোদক এবং তাম্বূলীদের স্থান। গন্ধবণিক, তৈলিক, তৌলিক (সুপারী-ব্যবসায়ী), দাস (চাষী), এবং বারজীবি, (বারুই), সমাজনীতির দিক হইতে ইঁহাদেরও সদ্যোক্ত জাতগুলির সমপর্যায়ে গণ্য করা যাইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে কৃষিজীবি দাস ও বারজীবি, এবং শিল্পজীবি কুম্ভকার, কর্মকার, শংখকার, কংসকার ও তন্তুবায় ছাড়া আর কাহাকেও ধনোৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যায় না। গোপ, নাপিত, মালাকার, ইঁহারা সমাজ-সেবক মাত্র। মোদক, তাম্বূলী (তাম্লী), তৈলিক, তৌলিক এবং গন্ধবণিকেরা ব্যবসায়ী শ্রেণী, এবং সেই হেতু অর্থোৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে; তবে ইঁহাদের মধ্যে মোদক বা ময়রার ব্যবসায় বিস্তৃত বা যথাযথভাবে ধনোৎপাদক ছিল, এমন বলা যায় না। গুবাক, পান এবং গন্ধদ্রব্যের ব্যবসায় যে সুবিস্তৃত ছিল তাহা অন্যত্র নানা প্রসঙ্গে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। করণ ও অম্বষ্ঠদের বৃত্তিও ধনোৎপাদক বৃত্তি নয়। করণরা সোজাসুজি কেরাণী, পুস্তপাল, হিসাবরক্ষক, দপ্তর-কর্মচারী; অম্বষ্ঠ-বৈদ্যরা চিকিৎসক। উভয়ই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সাক্ষ্য হইতে স্পষ্টই মনে হয়, স্বর্ণকার ও অন্যান্য বণিকেরা আগে উত্তম সংকর বা সৎশূদ্র পর্যায়েই গণ্য হইতেন, কিন্তু বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ রচনাকালে তাঁহারা কিছুটা নীচে নামিয়া গিয়াছেন।

বর্ণ ও শ্রেণী

আশ্চর্য এই যে, সমাজের ধনোৎপাদক শিল্পী, ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের লোকেরা সৎশূদ্র বা উত্তম সংকর বলিয়া গণিত হন নাই। ইঁহাদের মধ্যে স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, তৈলকার, সূত্রধার, শৌণ্ডিক বা শুঁড়ি, তক্ষণ, ধীবর-জালিক-কৈবর্ত, অট্টালিকাকার, কোটক প্রভৃতি জাতের নাম করিতেই হয়; ইঁহারা সকলেই মধ্যম সংকর বা অসৎশূদ্র পর্যায়ের। যুঙ্গি-যুগীরা এবং চর্মকারেরাও অর্থোৎপাদক শিল্পী শ্রেণীর অন্যতম; ইঁহারাও অসৎশূদ্র বা মধ্যম সংকর। নট সেবক মাত্র, ভবদেব ভট্টের মতে নট নর্তক। চর্মকার, শুঁড়ি, রজক, ইঁহারা সকলেই নিম্নজাতের লোক। ইঁহারা প্রয়োজনীয় সামাজিক স্তর সন্দেহ নাই, কিন্তু শৌণ্ডিক ও চর্মকার ছাড়া অন্য দুইটিকে ঠিক অর্থোৎপাদক স্তরের লোক বলা চলে কিনা

সন্দেহ। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে চর্মকারেরা একেবারে অন্ত্যজ পর্যায়ে পরিগণিত—তাঁহাদের বৃত্তির অন্য সন্দেহ নাই। অসংশূদ্র পর্যায়ভুক্ত মল্ল (=মালো, মাঝি?) এবং রজক প্রয়োজনীয় সমাজ-শ্রমিক। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে মল্ল অন্ত্যজ পর্যায়ভুক্ত।

সমাজ-শ্রমিকেরা কিন্তু প্রায় অধিকাংশই অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ পর্যায়ে—বর্ণাশ্রমের বাহিরে তাঁহাদের স্থান। চণ্ডাল, বরুড় (বাউড়ী), ঘট্টজীবি (পাটনী?), ডোলাবাহী (ঢুলিয়া, ঢুলে'), মল্ল (মালো?), হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগদী?)—ইঁহারা সকলেই তো সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় শ্রমিক-সেবক; অথচ ইঁহাদের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল সমাজের একেবারে নিম্নতম স্তরে। অন্ত্যজ পর্যায়ের আর একটি বর্ণের খবর দিতেছেন বন্দ্যঘটীয় আর্ত্তিহর পুত্র সর্বানন্দ (১১৬০)। ইঁহারা বেদে বা বাদিয়া; বাদিয়ারা সাপখেলা দেখাইয়া বেড়াইত (ভিক্ষার্থং সর্পধারিণি বাদিয়া ইতি খ্যাতে)। চর্যাগীতিগুলি হইতে ডোম, চণ্ডাল, শবর প্রভৃতি নিম্ন অন্ত্যজ বর্ণ ও কোম্যবদ্ধ নরনারীর বৃত্তির একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়; বাঁশের তাঁত ও চাঙারি বোনা, কাঠ কাটা, নৌকার মাঝিগিরি করা, নৌকা ও সাঁকো তৈরী করা, মদ তৈরী করা, জুয়া খেলা, তুলা ধুনা, হাতী পোষা, পশু শীকার, নৃত্যগীত, বাদ্যবিদ্যা, ভোজবাজী, সাপ নাচানো ইত্যাদি ছিল ইঁহাদের বৃত্তি। এই সব বস্তু আশ্রয় করিয়াই বৌদ্ধ সহজ-সাধকদের গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিপিতে সং ও অসং শূদ্র উভয় পর্যায়েরই কয়েকজন ব্যক্তির সাক্ষাৎ মিলিতেছে। কয়েকটি অজ্ঞাতনামা গোপ, জনৈক কাংসকার গোবিন্দ, নাপিত গোবিন্দ, এবং দন্তকার রাজবিগা—ইঁহারা সংশূদ্র পর্যায়ের সন্দেহ নাই, কিন্তু রজক সিরুপা অসংশূদ্র পর্যায়ের; নাবিক তোজে কোন পর্যায়ের বলা যাইতেছে না।

মনে রাখা দরকার, বর্ণ ও শ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধের যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেল তাহা একান্তই আদিপর্বের শেষ অধ্যায়ের। পূর্ববর্তী বিভিন্ন পর্যায়ে এ-পরিচয় খুব সুস্পষ্ট নয়। তবু প্রাচীনতর স্মৃতি ও অর্থশাস্ত্রগুলিতে বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর সম্বন্ধের একটা চিত্র মোটামুটি ধরিতে পারা যায়, এবং অনুমান করা সহজ যে, অন্তত গুপ্ত আমল হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা দেশেও অনুরূপ সম্বন্ধ প্রবর্তিত হইয়াছিল। সেখানে দেখিতেছি, অনেকগুলি অর্থোৎপাদক শ্রেণী—তাহাদের মধ্যে স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, তৈলকার, গন্ধবণিক ইত্যাদিরাও আছেন—বর্ণ হিসাবে সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া নাই, বরং কতকটা অবজ্ঞাতই। আর, সমাজ-শ্রমিক যাঁহারা তাঁহারা তো বরাবরই নিম্নবর্ণস্তরে, কেহ কেহ একেবারে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য পর্যায়ে। তবে, সমাজ যতদিন পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যপ্রধান ছিল, যতদিন অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যই ছিল সামাজিক ধনোৎপাদনের প্রধান উপায় ততদিন পর্যন্ত বর্ণস্তর-হিসাবে না হউক, অন্ততঃ রাষ্ট্রে এবং সেই হেতু সামাজিক মর্যাদায় বণিক-ব্যবসায়ীদের বেশ প্রতিষ্ঠাও ছিল। কিন্তু সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে বাঙালী সমাজ প্রধানত কৃষি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্পনির্ভর হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে, এবং তখন হইতেই অর্থোৎপাদক ও শ্রমিক

শ্রেণীগুলি ক্রমশ সামাজিক মর্যাদাও হারাইতে আরম্ভ করে। হাতের কাজই ছিল যাঁহাদের জীবিকার উপায় তাঁহারা স্পষ্টতই সমাজের নিম্নতর ও নিম্নতম বর্ণস্তরে; অথচ বুদ্ধিজীবি ও মসীজীবি যাঁহারা তাঁহারাই উপরের বর্ণস্তর অধিকার করিয়া আছেন। এমন কি, কৃষিজীবি দাস-সম্প্রদায়ও অনেক ক্ষেত্রে বণিক-ব্যবসায়ী এবং অতি প্রয়োজনীয় সমাজ-শ্রমিক সম্প্রদায়-গুলির উপরের বর্ণস্তরে অধিষ্ঠিত। মধ্য ও উত্তর-ভারতে বর্ণস্তরের দৃঢ় ও অনমনীয় সংবদ্ধতা এবং সমাজের অর্থোৎপাদক ও শ্রমিক শ্রেণীস্তরগুলি সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞা খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতেই দেখা দিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর পারস্পরিক সম্বন্ধের বিরোধও ক্রমশ তীব্রতর হইতেছিল। বাংলা দেশে, মনে হয়, মোটামুটিভাবে পাল আমল পর্যন্ত এই বিরোধ খুব তীব্র হইয়া দেখা দেয় নাই; পাল আমলের শেষের দিকে, বিশেষ ভাবে সেন-বর্মন-আমলে উত্তর ও মধ্যভারতের বর্ণ ও শ্রেণীগত সামাজিক আদর্শ, এই দুইয়ের সুস্পষ্ট বিরোধ রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল।

১০

উল্লিখিত তালিকাগুলিতে এবং সমসাময়িক লিপি ও স্মৃতিগ্রন্থে কতকগুলি আদিবাসি আরণ্য ও পার্বত্য কোমের এবং বিদেশি বা ভিন্-প্রদেশি কোমের নাম পাওয়া যাইতেছে: যথা, ভিল্ল, মেদ, আভীর, কোল, পৌণ্ড্রক (পোদ?), পুলিন্দ, পুক্কশ, খস, খর, কম্বোজ, যবন, সুহ্ম, শবর, অন্ধ্র ইত্যাদি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ভিল্লদের সংশূদ্র পর্যায়ে কি করিয়া গণ্য করা হইয়াছিল বলা কঠিন; ভবদেব ইঁহাদের মেদদের সঙ্গে বিন্যস্ত করিয়াছেন অন্ত্যজ পর্যায়ে। পৌণ্ড্রকরা অসংশূদ্র পর্যায়ে পরিগণিত হইয়াছিলেন; বাকী সমস্ত কোমই হয় অন্ত্যজ, না হয় ম্লেচ্ছ পর্যায়ে। কোলেরা পুরাণোক্ত কোল্ল সন্দেহ নাই। পুরাণোক্ত কোল্ল-ভীল্লের দর্শন তাহা হইলে এখানেও পাওয়া যাইতেছে। পুলিন্দরাও প্রাচীন কোম এবং ইঁহাদের উল্লেখ বল্লালসেনের নৈহাটি লিপিতেও পাওয়া যাইতেছে। খসদের উল্লেখ পালদের লিপিতেই পাওয়া যাইতেছে গৌড়-মালব-কুলিক-হূণ-কর্ণাট-লাট প্রভৃতি বেতনভুক্ সৈন্যদের সঙ্গে। খর, পুক্কশ, ইঁহারাও পুরাণোক্ত আদিবাসি কোম। আভীররা বিদেশাগত প্রাচীন কোম এবং ভারতেতিহাসে সুবিদিত। বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে উঁহারা মধ্যমসংকর পর্যায়ভুক্ত। আর কোনও বিদেশি কোমের পক্ষে কিন্তু এতটা সৌভাগ্যলাভ ঘটে নাই। কম্বোজরা উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের সুপরিচিত কোম হইতে পারে অথবা আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের বা তিব্বত অঞ্চলের পার্বত্য কোমও হইতে পারে; শেষোক্ত কোম হওয়াই অধিকতর সম্ভব। এক কম্বোজ রাজবংশ বাংলাদেশে কিছুকাল রাজত্বও করিয়াছিলেন। যবনরা বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে মুসলমান। অন্ধ্রদের কথা তো পালপর্বে নিম্নতম স্তরের জাতগুলির আলোচনা প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে। সুহ্মরা বাংলার প্রাচীনতম আদিবাসি কোমগুলির অন্যতম। শবররাও তাহাই। ইঁহাদের কথাও পালপর্বে

বর্ণ ও কোম

বলা হইয়াছে, এবং বল্লালসেনের নৈহাটি লিপিতে পুলিন্দদের সঙ্গে ইহাদেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শবর-নারীদের মতন পুলিন্দ নারীরাও গুঞ্জাবীচির মালা পরিতে খুব ভাল-বাসিতেন; নৈহাটি লিপিতে এ-কথার ইঙ্গিত আছে। যাহা হউক, উপরোক্ত বিশেষণ হইতে বুঝা যাইতেছে, হিন্দু বর্ণ-সমাজে ধীরে ধীরে যে স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়া চলিতেছিল তাহার ফলে কোন কোনও আদি বাঙালী কোম এবং বিদেশী কোম বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, যেমন পৌণ্ড্রক এবং আভীররা এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সাক্ষ্য সত্য হইলে ভিল্লরাও; কোনও কোনও আদিবাসি কোম বর্ণাশ্রমের বাহিরে অন্ত্যজ পর্যায়ে স্থান পাইয়াছিল, যেমন, মেদ, ভিল্ল, কোল প্রভৃতি; আবার কেহ কেহ একেবারে ম্লেচ্ছ পর্যায়ে পুক্কশ, খস, খর, কম্বোজ, যবনদের সঙ্গে, যেমন সুহ্ম, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি। অনুমান করা কঠিন নয়, ব্যাধ, হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগদী?), চণ্ডাল, মল্ল, ডোলাবাহী (ছুলিয়া, ছুলে), ঘট্টজীবি (পাটনী?), বরুড় (বাউরী) প্রভৃতিরাও আদিবাসি কোম। হিন্দু সমাজের সামাজিক স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়ার যুক্তিপদ্ধতিতে ইহারাও ক্রমশ সমাজের নিম্নতম স্তরে স্থান পাইয়াছিল। পাল আমলের লিপিগুলিতে "মেদান্ধ্রচণ্ডালপর্যন্তান্" পদাংশ হইতে মনে হয়, এই স্বাঙ্গীকরণ পালযুগেই সুপরিণতি লাভ করিয়া গিয়াছিল। সেন আমলে সামাজিক নিম্নতম স্তর তো রাষ্ট্রের দৃষ্টির অন্তর্ভুক্তই ছিল না, অন্তত রাজকীয় দলিলপত্রে ইহাদের কোনও উল্লেখ নাই।

১১

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্যান্য বর্ণ-উপবর্ণের সম্বন্ধ ও যোগাযোগ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্যের সংবাদ লওয়া যাইতে পারে। প্রথমেই আহার-বিহার লইয়া বিধিনিষেধের কথা বলা যাক। ভবদেব ভট্টের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ এ-সম্বন্ধে প্রামাণিক ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সমস্ত বিধিনিষেধের উল্লেখের প্রয়োজন নাই; দুই চারিটি নমুনাস্বরূপ উল্লেখই যথেষ্ট।

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্যান্য বর্ণের সম্বন্ধ

রজক, কর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ, ভিল্ল, চণ্ডাল, পুক্কশ, কাপালিক, নর্তক, তক্ষণ, সুবর্ণকার, শৌণ্ডিক এবং পতিত ও নিষিদ্ধ বৃত্তিজীবি ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্পৃষ্ট বা পক্ক খাদ্য ব্রাহ্মণদের পক্ষে ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল; এই নিষেধ অমান্য করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। শূদ্রপক্ক অন্ন ভক্ষণও নিষিদ্ধ ছিল; নিষেধ অমান্য করিলে পূর্ণ কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল; প্রাচীন স্মৃতিকারদের এই বিধান ভবদেবও মানিয়া লইয়াছেন, তবে টীকা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়পক্ক অন্ন গ্রহণ করিলে কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্তের অর্ধেক পালন করিলেই চলিবে; আর, বৈশ্যপক্ক অন্ন গ্রহণ করিলে তিন-চতুর্থাংশ। ক্ষত্রিয় যদি শূদ্রপক্ক অন্ন গ্রহণ করে তাহাকে পূর্ণ কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, কিন্তু বৈশ্যপক্ক অন্ন গ্রহণ করিলে অর্ধেক প্রায়শ্চিত্ত করিলেই চলিবে। বৈশ্য শূদ্রপক্ক অন্ন গ্রহণ করিলেও অর্ধেক

প্রায়শ্চিত্তেই চলিতে পারে। শূদ্রহস্তে তৈলপক্ক ভর্জিত (শস্ত) দ্রব্য, পায়স, কিংবা আপৎকালে শূদ্রপক্ক দ্রব্য ইত্যাদি ভোজন করিতে ব্রাহ্মণের কোনও বাধা নাই; শেষোক্ত অবস্থায় মনস্তাপপ্রকাশরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই দোষ কাটিয়া যায়। ভবদেবের সময়ে দ্বিজবর্ণের মধ্যে বাংলাদেশে এই সব বিধিনিষেধ কিছু স্বীকৃত ছিল, কিছু নূতন গড়িয়া উঠিতেছিল বলিয়া মনে হইতেছে। শূদ্রের পাত্রে রক্ষিত অথবা শূদ্রদত্ত জলপানও ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, অবশ্য স্বল্প প্রায়চিত্তেই সে দোষ কাটিয়া যাইত; তবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র কেহই চণ্ডাল ও অন্ত্যজস্পৃষ্ট বা তাঁহাদের পাত্রে রক্ষিত জল পান করিতে পারিতেন না, করিলে পুরাপুরি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। নট ও নর্তকদের সম্বন্ধে ভবদেবের বিধিনিষেধ দেখিয়া মনে হয়, উচ্চতর বর্ণসমাজে ইঁহারা সম্মানিত ছিলেন না। বৃহদ্ধর্মপুরাণে নটেরা অধম সংকর পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু সমসাময়িক অন্য প্রমাণ হইতে মনে হয়, যাঁহারা নট-নর্তকের বৃত্তি অনুসরণ করিতেন সমাজে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা কম ছিল না। নট গাঙ্গো বা গাঙ্গোক রচিত কয়েকটি শ্লোক সুপ্রসিদ্ধ সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। "পদ্মাবতীচরণচারণ-চক্রবর্তী" জয়দেবের পত্নী প্রাক্‌বিবাহ জীবনে দেবদাসী-নটী ছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। জয়দেব নিজেও সঙ্গীতপারঙ্গম ছিলেন; সেক শুভোদয়া-গ্রন্থে এই সম্বন্ধে একটি গল্পও আছে।

অন্ত্যজ জাতেরা বোধ হয় এখানকার মত তখনও অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ডোম্ব-ডোম্বীরা যে ব্রাহ্মণদের অস্পৃশ্য ছিলেন তাহার একটু পরোক্ষ প্রমাণ চর্যাগীতে পাওয়া যায় (১০ নং গীত)। ভবদেবের প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-গ্রন্থের সংসর্গ প্রকরণাধ্যায়ে অস্পৃশ্য-স্পর্শদোষ সম্বন্ধে নাতিবিস্তর আলোচনা দেখিয়াও মনে হয়, স্পর্শবিচার সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিধিনিষেধ সমাজে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল।

বিবাহ-ব্যাপারেও অনুরূপ বিধিনিষেধ যে গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার পরিচয়ও সুস্পষ্ট। পালপর্বে এই প্রসঙ্গে রাজা লোকনাথের পিতৃ ও মাতৃবংশের পরিচয়ে দেখা গিয়াছে, উচ্চবর্ণ পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণ নারীর বিবাহ, ব্রাহ্মণ বর ও শূদ্রকন্যায় বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। সবর্ণে বিবাহই সাধারণ নিয়ম ছিল, এই অনুমান সহজেই করা চলে; কিন্তু সেন-বর্মন-দেব আমলেও চতুর্বর্ণের মধ্যে, উচ্চবর্ণ বর ও নিম্নবর্ণ কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই, এমন কি শূদ্রকন্যার ব্যাপারেও নহে; ভবদেব ও জীমূতবাহন উভয়ের সাক্ষ্য হইতেই তাহা জানা যায়। ব্রাহ্মণের বিদগ্ধা শূদ্রা স্ত্রীর কথা ভবদেব উল্লেখ করিয়াছেন; জীমূতবাহন ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের উত্তরাধিকারাগত রীতিনিয়মের কথা বলিয়াছেন; যজ্ঞ ও ধর্মানুষ্ঠান ব্যাপারে সমবর্ণ স্ত্রী বিদ্যমান না থাকিলে অব্যবহিত নিম্নবর্তী বর্ণের স্ত্রী হইলেও চলিতে পারে, এইরূপ বিধানও দিয়াছেন। এইসব উল্লেখ হইতে মনে হয়, শূদ্রবর্ণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ পুরুষের যে কোনও নিম্নবর্ণে বিবাহ সমাজে আজিকার মতন একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া যায় নাই। অবশ্য কোনও পুরুষই উচ্চবর্ণে বিবাহ করিতে পারিতেন না। তবে, দ্বিজবর্ণের

পক্ষে শূদ্রবর্ণে বিবাহ সমাজে নিন্দনীয় হইয়া আসিতেছিল, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, এই প্রথা যে নিন্দনীয় এ-সম্বন্ধে মনু ও বিষ্ণুস্মৃতির মত উল্লেখ করিয়া জীমূতবাহন বলিতেছেন, শঙ্খস্মৃতি দ্বিজবর্ণের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা স্ত্রীর কথাই বলিয়াছেন, শূদ্রা স্ত্রীর কথা উল্লেখই করেন নাই। যজ্ঞ ও ধর্মানুষ্ঠানের স্ত্রীর অধিকার সম্বন্ধে জীমূতবাহনের যে-মত একটু আগে উদ্ধার করা হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে জীমূতবাহন মনুর মত সমর্থন করিয়া বলিতেছেন, সবর্ণ স্ত্রীই এই অধিকারের অধিকারী, তবে সবর্ণ স্ত্রী বিদ্যমান না থাকিলে ক্ষত্রিয়া স্ত্রী যজ্ঞভাগী হইতে পারেন, কিন্তু বৈশ্য বা শূদ্র নারী ব্রাহ্মণের বিবাহিতা হইলেও তিনি তাহা হইতে পারেন না, অর্থাৎ যথার্থ স্ত্রীত্বের অধিকারী তিনি হইতে পারেন না। এই টিপ্পনী হইতে স্বভাবতই এই অনুমান করা চলে যে, ব্রাহ্মণ বৈশ্যানী এমন কি শূদ্রানীও বিবাহ করিতে পারিতেন, করিতেনও, কিন্তু তাঁহারা সর্বদা স্ত্রীর অধিকার লাভ করিতেন না। এই অনুমানের প্রমাণ জীমূতবাহনই অন্যত্র দিতেছেন; বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ শূদ্রাণীর গর্ভে সন্তানের জন্মদান করিলে তাহাতে নৈতিক কোনও অপরাধ হয় না; স্বল্প সংসর্গদোষ তাহাকে স্পর্শ করে মাত্র, এবং নামমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সে অপরাধ কাটিয়া যায়। শূদ্রাণীর সঙ্গে বিবাহ যে সমাজে ক্রমে নিন্দনীয় হইয়া আসিতেছিল তাহা জীমূতবাহনের সাক্ষ্য হইতে বুঝা যাইতেছে; বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রীদের মর্যাদা সম্বন্ধেও যে পার্থক্য করা হইতেছিল তাহাও পরিষ্কার, বিশেষত শূদ্রা বিবাহিতা পত্নী সম্বন্ধে। বর্ণাশ্রম-বহিষ্কৃত যে-সব জাত্ ছিল তাঁহাদের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধের কোনও প্রশ্ন বিবেচনার মধ্যেই আসে নাই, অর্থাৎ তাহা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল, এমন কি শূদ্রদের পক্ষেও।

দ্বিজবর্ণ (এবং বোধ হয় উচ্চ জাতের শূদ্রবর্ণের মধ্যেও) সপিণ্ড, সগোত্র এবং সমান-প্রবরের বিবাহই সাধারণত প্রচলিত ছিল; ভবদেবভট্টের সম্বন্ধ-বিবেক গ্রন্থে তাহার উপর বেশ জোরই দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, এবং প্রাজাপাত্য বিবাহে কন্যা বরের মায়ের দিক হইতে পঞ্চম পুরুষের মধ্যে কিম্বা পিতার দিক হইতে সপ্তম পুরুষের মধ্যে হইলে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। বর এবং কন্যা সগোত্র কিম্বা সপ্রবরের হইলেও বিবাহ হইতে পারিত না। আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহে কন্যা বরের মায়ের দিক হইতে তিন পুরুষ, কিম্বা পিতার দিক হইতে পঞ্চম পুরুষের বাহিরে হইলে বিবাহ হইতে পারিত, কিন্তু তাঁহারা সমাজে শূদ্র পর্যায়ে পতিত্ বলিয়া গণ্য হইতেন।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, এইসব বর্ণগত বিধিনিষেধ সাধারণত ব্রাহ্মণের সম্বন্ধেই সবিশেষ প্রযোজ্য ছিল, এবং তাহাও ব্রাহ্মণের সঙ্গে নিম্নতর, এবং বিশেষভাবে নিম্নতম বর্ণের আহার-বিহার-বিবাহ ব্যাপারে যোগাযোগ সম্বন্ধে। কালক্রমে এই সব বিধিনিষেধই সামাজিক আভিজাত্যের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়ায় এবং বৃহত্তর সমাজে বিস্তৃত হইয়া অন্যান্য বর্ণ ও জাতের মধ্যেও স্বীকৃতি লাভ করে। শেষ পর্বে আসিয়া যে-অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে তাহা তো সাম্প্রতিক কালে বাঙালী হিন্দুসমাজে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যাহা হউক,

সমসাময়িক স্মৃতিগ্রন্থে সেন-বর্মন-দেব আমলের বর্ণগত বিধিনিষেধের যে-চিত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায়, এই সময়েই ব্রাহ্মণেরা বৃহত্তর সমাজের অন্যান্য বর্ণ ও জাত্ হইতে প্রায় পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন। এক প্রান্তে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, অন্য প্রান্তে স্বাঙ্গীকৃত ও স্বাঙ্গীক্রিয়মান স্পর্শচ্যুত অধিকারলেশহীন অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়, আর মধ্যস্থলে বৃহৎ শূদ্র সম্প্রদায়। প্রত্যেকের মধ্যে দৃঢ় ও দুরতিক্রম্য প্রাচীর। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ও নানা ভৌগোলিক এবং অন্যান্য বিভেদ-প্রাচীরে বিভক্ত, আহার-বিহার-বিবাহ-ব্যাপারে নানা বিধিনিষেধের সূত্রে দৃঢ় করিয়া বাঁধা, যোগাযোগের বাধাও বিচিত্র। বৃহৎ শূদ্র সম্প্রদায়ও নানা জাতে নানা স্তরে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক স্তর দৃঢ় ও দুর্লঙ্ঘ্য সীমায় সীমিত। অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ পর্যায় তো একান্তই রাষ্ট্র ও সমাজের দৃষ্টির বাহিরে।)

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের উল্লেখ ভবদেব ভট্ট, জীমূতবাহন ও অন্যান্য স্মৃতিকারেরা বারবার করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা একান্তই ঐতিহ্য-সংস্কারগত উল্লেখ বলিয়া মনে হয়—উত্তর-ভারতীয় প্রাচীনতর স্মৃতিকথিত বর্ণ-বিন্যাসের প্রথাগত অনুকরণ। পূর্বতন কালে অথবা বাংলার আদি স্মৃতিগ্রন্থগুলির সমসাময়িক কালে এইদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের উপস্থিতির কোন নিসংশয় সাক্ষ্য আজও আমরা জানি না।

প্রাচীন বাংলায় বর্ণ-বিন্যাসের পরিণতির কথা বলিতে গিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের History of Bengal, Vol. I-গ্রন্থে একটি উক্তি করা হইয়াছে; উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।

> "An important factor in the evolution of this final stage is the growing fiction that almost all non-Brahmanas were Sudras. The origin of this fiction is perhaps to be traced to the extended significance given to the term Sudra in the Puranas, where it denotes not only the members of the fourth caste, but also those members of the three higher castes who accepted any of the heretical religions or were influenced by Tantric rites. The predominance of Buddhism and Tantric Saktism in Bengal as compared with other parts of India, since the eighth century A. D. perhaps explains why all the notable castes in Bengal were degraded in the Brihad-dharma Purana and other texts as Sudras and the story of Vena and Pritha might be mere echo of a large scale re-conversion of the Buddhists and Tantric elements of the population into the orthodox Brahmanical fold." (p. 578).

১২

বিভিন্ন পর্বে বর্ণ-বিন্যাসের সঙ্গে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের সম্বন্ধের কথা না বলিয়া বর্ণ-বিন্যাস প্রসঙ্গ শেষ করা উচিত হইবে না।

বাংলাদেশে গুপ্তাধিপত্যের আগে এই সম্বন্ধের কোনও কথাই বলিবার উপায় নাই;

তথ্যই অনুপস্থিত। গুপ্তাধিকারের কালে ভুক্তির রাষ্ট্রযন্ত্রে অথবা বিষয়াধিকরণে কিম্বা স্থানীয় অন্য রাষ্ট্রাধিকরণের কর্তৃপক্ষদের মধ্যে যাঁহাদের নামের তালিকা পাইতেছি তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রায় নাই বলিলেই চলে। ভুক্তিপতি বা উপরিকদের মধ্যে যাঁহাদের দেখা মিলিতেছে তাঁহারা কেহ চিরাতদত্ত, কেহ ব্রহ্মদত্ত, কেহ জয়দত্ত, কেহ রুদ্রদত্ত, কেহ কুলবৃদ্ধি ইত্যাদি ; ইঁহাদের একজনকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হয় না।) বিষয়পতিরা বা তৎস্থানীয়রা কেহ বেত্রবর্মণ, কেহ স্বয়ম্ভূদেব, কেহ শণ্ডক ; ইহাদের মধ্যে বেত্রবর্মণ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করিতে পারেন ; স্বয়ম্ভূদেব সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন, ব্রাহ্মণ হইলে হইতেও বা পারেন ; শণ্ডক যে অব্রাহ্মণ এ-অনুমান সহজেই করা চলে। তারপরেই নিঃসন্দেহে যাঁহারা রাজকর্মচারী তাঁহারা হইতেছেন পুস্তপাল এবং জ্যেষ্ঠ বা প্রথম কায়স্থ। ইঁহাদের কাহারও নাম শাম্বপাল, কাহারও কাহারও নাম দিবাকরনন্দী, পত্রদাস, দুর্গাদত্ত, অর্কদাস, করণ-কায়স্থ নরদত্ত, স্কন্দপাল ইত্যাদি। এই সব নামও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের, সন্দেহ করিবার কারণ নাই। অন্তত একজন করণ-কায়স্থ নরদত্ত যে সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, সে-পরিচয় পাইতেছি। কুমারামাত্যদের মধ্যে একটি নাম পাইতেছি বেরজ্জস্বামী—যিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া কতকটা নিঃসংশয়ে বলা চলে। পুস্তপাল ও জ্যেষ্ঠ বা প্রথম কায়স্থদের সঙ্গে যাঁহারা স্থানীয় অধিকরণের রাষ্ট্রকার্য পরিচালনায় সহায়তা করিতেন তাঁহারা হইতেছেন নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ এবং প্রথম কুলিক ; ইঁহাদের নামের তালিকায় পাওয়া যায় ধৃতিপাল, বন্ধুমিত্র, ধৃতিমিত্র, রিভুপাল, স্থাণুদত্ত, মতিদত্ত, ইত্যাদি ব্যক্তিকে ; ইঁহাদের একজনকেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না। বস্তুত, এই সব নামাংশ বা পদবী পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েতর অন্য ভদ্রবর্ণের।

ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে (পূর্ব) বঙ্গেও এই একই অবস্থা দেখিতেছি। শুধু, সুবর্ণবীথি অন্তর্গত বারকমণ্ডলের বিষয়াধিনিযুক্তক ব্যক্তিদের মধ্যে দুইবার দুই জনের নাম পাইতেছি, গোপালস্বামী ও বৎসপালস্বামী। এই দুইজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, সন্দেহ নাই। জ্যেষ্ঠকায়স্থ, পুস্তপাল ইত্যাদির নামের মধ্যে পাইতেছি বিনয়সেন, নয়ভূতি, বিজয়সেন, পুরদাস ইত্যাদিকে ; ইঁহারা অব্রাহ্মণ, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

অর্থাৎ, সপ্তম শতক পর্যন্তও রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের কোনও প্রাধান্য দেখা যাইতেছে না ; বরং পরবর্তী কালে যাঁহারা করণ-কায়স্থ, অম্বষ্ঠ-বৈদ্য ইত্যাদি সংকর শূদ্রবর্ণ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন তাঁহাদের প্রাধান্যই দেখিতেছি বেশি, বিশেষভাবে করণ-কায়স্থদের। শ্রেণী হিসাবে শিল্পী ও বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রধান্যও যথেষ্ট দেখা যাইতেছে ; বর্ণ হিসাবে ইঁহারা বৈশ্যবর্ণ বলিয়া গণিত হইতেন কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। বৈশ্য বলিয়া কোথাও ইঁহাদের দাবি সমসাময়িক কাল বা পরবর্তী কালেও কোথাও দেখিতেছি না, এইটুকুই মাত্র বলা যায়। অনুমান হয়, পরবর্তীকালে যে-সব শিল্পী ও বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণী শূদ্র উত্তম ও মধ্যম সংকর বর্ণ পর্যায়ভুক্ত বলিয়া পাইতেছি তাঁহারাই এই যুগে শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক

ইত্যাদির বৃত্তি অনুসরণ করিতেন। বুঝা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থা বিস্তৃতি লাভ করিলেও রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণেরা এখনও প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই; তাঁহারা সম্ভবত এখনও নিজেদের বর্ণানুযায়ী বৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। অন্যান্য বর্ণের লোকদের সম্পর্কে মোটামুটি বলা যায় যে, তাঁহারাও নিজেদের নির্দিষ্ট বৃত্তিসীমা অতিক্রম করেন নাই। রাষ্ট্রে করণ-কায়স্থদের প্রতিপত্তি বৃত্তিগত স্বাভাবিক কারণেই; শিল্পী ও বণিক-ব্যবসায়ীদের প্রতিপত্তির কারণ অর্থনৈতিক। শেষোক্ত কারণের ব্যাখ্যা অন্যান্য প্রসঙ্গে একাধিক বার করিয়াছি।

কিন্তু, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও বর্ণ-ব্যবস্থার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, রাষ্ট্রের সক্রিয় পোষকতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ক্রমশ তাঁহারা প্রতিপত্তিশীল হইয়া উঠিতে আরম্ভ করেন; ভূমিদান অর্থদান ইত্যাদি কৃপালাভের ফলে অনেক ব্রাহ্মণ ক্রমশ ব্যক্তিগতভাবে ধনসম্পদের অধিকারীও হইতে থাকেন। এই সামাজিক প্রতিপত্তি রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হইতে বিলম্ব হয় নাই। করণ-কায়স্থেরাও রাজসরকারে চাকুরী করিয়া করিয়া রাষ্ট্রের কৃপালাভে বঞ্চিত হন নাই; গ্রামে, বিষয়াধিকরণে, ভুক্তির রাষ্ট্রকেন্দ্রে সর্বত্র যাঁহারা মহত্তর, কুটুম্ব ইত্যাদি বলিয়া গণ্য হইতেছেন, রাজকার্যে সহায়তার জন্য যাঁহারা আহূত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে করণ-কায়স্থ এবং অন্যান্য 'ভদ্র' বর্ণের লোকই সংখ্যায় বেশি বলিয়া মনে হইতেছে। প্রচুর ভূমির অধিকারী রূপে, শিল্প-ব্যবসায়ে অর্জিত ধনবলে, সমাজের সংস্কার, সংস্কৃতি ও বর্ণ-ব্যবস্থার নায়করূপে যে সব বর্ণ সমাজে প্রতিপত্তিশীল হইয়া উঠিতেছেন তাঁহারা রাষ্ট্রে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হইবেন, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। রাষ্ট্রেরও স্বার্থ হইল সেই সব প্রতিপত্তিশালী বর্ণ বা বর্ণসমূহকে সমর্থকরূপে নিজের সঙ্গে যুক্ত রাখা।

(সাধারণত অধিকাংশ লোকই নিজেদের বর্ণবৃত্তি অনুশীলন করিতেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই সত্য, কিন্তু ব্যক্তিগত রুচি, প্রভাব-প্রতিপত্তি-কামনা, অর্থনৈতিক-প্রেরণা ইত্যাদির ফলে প্রত্যেক বর্ণেরই কিছু কিছু লোক বৃত্তি পরিবর্তন করিত, তাহাও সত্য। স্মৃতিগ্রন্থাদিতে যে নির্দেশই থাকুক বাস্তবজীবনে দৃঢ়বদ্ধ রীতিনিয়ম অনুসৃত যে হইত না তাহার প্রমাণ অসংখ্য লিপি ও সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। পাল-চন্দ্র এবং সেন-বর্মন আমলে যথেষ্ট ব্রাহ্মণ রাজা, সামন্ত, মন্ত্রী, ধর্মাধ্যক্ষ, সৈন্য-সেনাপতি, রাজকর্মচারী, কৃষিজীবী ইত্যাদির বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন; অম্বষ্ঠ-বৈদ্যেরা মন্ত্রী হইতেছেন; দাসজীবীরা রাজকর্মচারী, সভাকবি ইত্যাদি হইতেছেন, করণ-কায়স্থেরা সৈনিকবৃত্তি চিকিৎসাবৃত্তি ইত্যাদি অনুসরণ করিতেছেন; কৈবর্তরা রাজকর্মচারী ও রাজ্যশাসক হইতেছেন; এ-ধরনের দৃষ্টান্ত অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত অনবরতই পাওয়া যাইতেছে।)

পাল-রাষ্ট্রযন্ত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় রাষ্ট্র ও সমাজপদ্ধতির পূর্বোক্ত রীতিক্রম সুস্পষ্ট ও সক্রিয়। প্রথমেই দেখিতেছি, রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের প্রভাব ও আধিপত্য বাড়িয়াছে।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীদর্ভপাণি, পৌত্র কেদারমিশ্র ও প্রপৌত্র গুরবমিশ্র রাজা ধর্মপালের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর চারিজন পালসম্রাটের অধীনে পালরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন বেদবিদ্ পরমশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ রাজনীতিকুশল। আর একটি ব্রাহ্মণ-বংশের—শাস্ত্রবিদ্‌শ্রেষ্ঠ যোগদেব, পুত্র তত্ত্ববোধভূ বোধিদেব এবং তৎপুত্র বৈদ্যদেব—এই তিনজন যথাক্রমে তৃতীয় বিগ্রহপাল, রামপাল এবং কুমারপালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই পরিবারও পাণ্ডিত্যে, শাস্ত্রজ্ঞানে, এক কথায় ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিতে যেমন কুশলী ছিলেন তেমনই ছিলেন রাজনীতি ও রণনীতিতে। নারায়ণপালের ভাগলপুর লিপির দূতক ভট্ট গুরব ব্রাহ্মণ ছিলেন, সন্দেহ নাই। প্রথম মহীপালের বাণগড়লিপির দূতক ছিলেন ভট্ট শ্রীবামন মন্ত্রী; ইনিও অন্যতম প্রধান রাজপুরুষ সন্দেহ নাই। এই রাজার রাজগুরু ছিলেন শ্রীবামরাশি; ইনি বোধ হয় একজন শৈব সন্ন্যাসী ছিলেন। বৌদ্ধরাজার লিপি "ওঁ নমো বুদ্ধায়" বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু প্রথম দুই শ্লোকেই বলা হইতেছে, "সরসীসদৃশ-বারাণসী-ধামে, চরণাবনত-নৃপতি-মস্তকাবস্থিত কেশপাশ-সংস্পর্শে শৈবালাকীর্ণরূপে প্রতিভাত শ্রীবামরাশি নামক গুরুদেবের পাদপদ্মের আরাধনা করিয়া, গৌড়াধিপ মহীপাল [যাঁহাদিগের দ্বারা] ঈশান-চিত্রঘণ্টাদি শতকীর্তিরত্ন নির্মাণ করাইয়াছিলেন…"। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন "চিত্রঘণ্টেশী" নবদুর্গার একতম রূপ; কাজেই, ঈশান চিত্রঘণ্টাদি অর্থে নবদুর্গার বিভিন্ন রূপ সূচিত হইয়া থাকা অসম্ভব নয়। শ্রীবামরাশি নামটিও হঠাৎ যেন শৈব বা শাক্ত লক্ষণের সূচক।

একটি ক্ষত্রিয়বর্ণ প্রধান রাজপুরুষের নাম বোধ হয় পাওয়া যাইতেছে ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে; ইনি মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মা। এই সামন্ত নরপতিটি যেন অবাঙালী বলিয়াই মনে হইতেছে। কিছু কিছু বণিকের নাম পাইতেছি, যেমন বণিক লোকদত্ত, বণিক বুদ্ধমিত্র; নামাংশ বা পদবী দেখিয়া মনে হয় ইঁহারা পরবর্তীকালের 'ভদ্র' সংকরবর্ণীয়, বৃত্তি অবশ্যই বৈশ্যের; কিন্তু রাষ্ট্রে বর্ণ হিসাবে বা শ্রেণী হিসাবে ইঁহাদের কোনও প্রাধান্য নাই। করণ-কায়স্থদের প্রভাব ব্রাহ্মণদের প্রভাবের সঙ্গে তুলনীয় না হইলেও খুব কম ছিল না। রামচরিত-রচয়িতা সন্ধ্যাকরনন্দীর পিতা প্রজাপতিনন্দী ছিলেন করণদের মধ্যে অগ্রণী এবং রামপালের কালে পালরাষ্ট্রের সান্ধিবিগ্রহিক। আর এক করণ-শ্রেষ্ঠ শব্দপ্রদীপ গ্রন্থের রচয়িতা; তিনি স্বয়ং তাঁহার পিতা ও পিতামহ সকলেই ছিলেন রাজবৈদ্য; দুইজন পাল-রাজসভার, একজন চন্দ্র-রাজসভার। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে ধর্মাধিকার-পদাভিষিক্ত জনৈক শ্রীগোনন্দন এবং মদনপালের মনহলি-লিপিতে সান্ধিবিগ্রহিক দূতক জনৈক ভীমদেবের সংবাদ পাইতেছি—ইঁহারাও করণ-কায়স্থকুলসম্ভূত বলিয়া মনে হইতেছে। কৈবর্ত দিব্য বিদ্রোহী হইবার আগে পালরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান রাজপুরুষ বা সামন্ত ছিলেন, সে কথা তো আগেই একাধিকবার বলা হইয়াছে। সামন্ত নরপতিদের মধ্যেও করণ-কায়স্থদের দর্শন মিলিতেছে। ত্রিপুরা পট্টোলীর মহারাজা লোকনাথ নিজেই ছিলেন করণ।

কিন্তু করণদের প্রভাব পালরাষ্ট্রে যতই থাকুক, ঠিক আগেকার পর্বের মতন আর নাই। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকের রাষ্ট্রে সর্বত্রই যেন ছিল করণ-কায়স্থদের প্রভাব, অন্তত নামাংশ বা পদবী হইতে তাহাই মনে হয়। পালচন্দ্র-পর্বে ঠিক ততটা প্রভাব নাই; পরিবর্তে ব্রাহ্মণ প্রভাব বর্ধমান।

কম্বোজ-সেন-বর্মন পর্বের রাষ্ট্রে এই ব্রাহ্মণ প্রভাব ক্রমশ বাড়িয়াই গিয়াছে। ভবদেবভট্ট ও হলায়ুধের বংশের কথা পূর্বেই একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি; এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একাধিক পুরুষ ব্যাপিয়া সেন-বর্মন রাষ্ট্রে এই দুই পরিবারের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাহা ছাড়া, অনিরুদ্ধভট্টের মত ব্রাহ্মণ-রাজগুরুদের প্রভাবও রাষ্ট্রে কিছু কম ছিল না। অধিকন্তু, পুরোহিত, মহাপুরোহিত, শান্ত্যাগারিক, শান্ত্যাগারাধিকৃত, শান্তিবারিক, তন্ত্রাধিকৃত, রাজপণ্ডিত প্রভৃতিরও প্রভাব এই পর্বের রাষ্ট্রগুলিতে সুপ্রচুর, এবং ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রভাবের পরিচয় বিশেষভাবে কিছু পাওয়া যাইতেছে না; বরং বল্লালচরিত, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের বর্ণতালিকা হইতে মনে হয়, শিল্পী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীভুক্ত অনেক বর্ণ রাষ্ট্রের অকৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া সমাজে নামিয়া গিয়াছিল। বণিক-ব্যবসায়ীদের প্রতি সেনরাষ্ট্র বোধ হয় খুব প্রসন্ন ছিল না। একমাত্র বিজয়সেনের দেবপাড়া লিপিতে পাইতেছি বারেন্দ্রক-শিল্পীগোষ্ঠী-চূড়ামণি রাণক শূলপাণিকে। বৈদ্যদের প্রভাব-পরিচয়ের অন্তত একটি দৃষ্টান্ত আমাদের জানা আছে; বৈদ্যবংশ-প্রদীপ বনমালী কর রাজা ঈশানদেবের পট্টনিক বা মন্ত্রী ছিলেন; কিন্তু সংবাদটি বঙ্গের পূর্বতম অঞ্চল শ্রীহট্ট হইতে পাওয়া যাইতেছে যেখানে আজও বৈদ্য-কায়স্থে বর্ণ-পার্থক্য খুব সুস্পষ্ট নয়। একই অঞ্চলে দেখিতেছি দাস-কৃষিজীবীরা রাজকর্মচারী এবং সভাকবিও হইতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের পরেই রাষ্ট্রে যাঁহাদের প্রভাব সক্রিয় ছিল তাঁহারা করণ-কায়স্থ; ইঁহাদের প্রভাব হিন্দু আমলে কখনও একেবারে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; করণ-কায়স্থদের বর্ণগত বৃত্তিই বোধ হয় তাহার কারণ। সেন-রাজসভার কবিদের মধ্যে অন্তত একজন করণ-কায়স্থ উপবর্ণের লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়; তিনি উমাপতিধর। মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি-গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, উমাপতি লক্ষ্মণসেনের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের সংকলয়িতা কবি শ্রীধরদাসও বোধ হয় করণ-কায়স্থ ছিলেন; শ্রীধর নিজে ছিলেন মহামাণ্ডলিক, তাঁহার পিতা বটুদাস ছিলেন মহাসামন্তচূড়ামণি। বিজয়সেনের বারাকপুর লিপির দূত শালাড্ডনাগ, বল্লালসেনের সান্ধিবিগ্রহিক হরিঘোষ, লক্ষ্মণসেনের মহাসান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণদত্ত, এই রাজারই অন্যতম প্রধান রাজকর্মচারী শঙ্করধর, বিশ্বরূপসেনের সান্ধিবিগ্রহিক নাঞী সিংহ এবং কোপিবিষ্ণু, ইত্যাদি সকলকেই করণ-কায়স্থ বলিয়াই মনে হইতেছে। লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি ধোয়ী কিন্তু ছিলেন জাতে তন্তুবায়; তন্তুবায়-কুবিন্দকেরা উত্তম-সংকর বা সৎশূদ্র পর্যায়ের লোক, একথা স্মরণীয়।

রাষ্ট্রে বিভিন্ন বর্ণের প্রভাবের মোটামুটি যে-পরিচয় পাওয়া গেল তাহা হইতে অনুমান

হয়, ব্রাহ্মণ ও করণ-কায়স্থদের প্রভাব-প্রতিপত্তিই সকলের চেয়ে বেশি ছিল। করণ-কায়স্থদের প্রভাবের কারণ সহজেই অনুমেয় ; ভূমির মাপ-প্রমাপ, হিসাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, পুস্তপালের কাজকর্ম, দপ্তর ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ, লেখকের কাজ প্রভৃতি ছিল ইহাদের বৃত্তি। স্বভাবতই, তাঁহারা রাষ্ট্রে এই বৃত্তিপালনের যতটা সুযোগ পাইতেন অন্যত্র তাহা সম্ভব হইত না। কাজেই এক্ষেত্রে বর্ণ ও শ্রেণী প্রায় সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে তাহা বলা চলে না ; ইহারা বৃত্তিসীমা অতিক্রম করিয়াই মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষ, ধর্মাধ্যক্ষ, সান্ধি-বিগ্রহিক ইত্যাদি পদ অধিকার করিতেন। রাজগুরু, রাজপণ্ডিত, পুরোহিত, শান্ত্যাগারিক ইত্যাদিরা অবশ্যই নিজেদের বৃত্তিসীমা রক্ষা করিয়া চলিতেন, বলা যাইতে পারে। কোন্ সামাজিক রীতিক্রমানুযায়ী ব্রাহ্মণেরা রাষ্ট্রে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন তাহা তো আগেই বলিয়াছি। বৈশ্যবৃত্তিধারী বর্ণ-উপবর্ণ সম্বন্ধে বলা যায়, যতদিন শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা উন্নত ছিল, ধনোৎপাদনের প্রধান উপায় ছিল শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য, ততদিন রাষ্ট্রেও তাঁহাদের প্রভাব অনস্বীকার্য ছিল, কিন্তু একাধিক প্রসঙ্গে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, অষ্টম শতকের পরে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেও বৈশ্যবৃত্তিধারী লোকদের প্রভাব কমিয়া যাইতে থাকে। পাল-রাষ্ট্রেই তাহার চিহ্ন সুস্পষ্ট। বল্লাল-চরিতের ইঙ্গিত সত্য হইলে সেনরাষ্ট্র তাঁহাদের প্রতি সক্রিয়ভাবে অপ্রসন্নই ছিল। তাহা ছাড়া, বৃহদ্ধর্ম-ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণও সে-ইঙ্গিত সমর্থন করে। রাষ্ট্রে ইহাদের প্রভাব থাকিলে সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে ইহারা এতটা অবজ্ঞাত অবহেলিত হইতে পারিতেন না।

যাহা হউক, এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, ব্রাহ্মণ ও করণ-কায়স্থদের প্রভাবই রাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা বেশি কার্যকরী ছিল। অম্বষ্ঠ-বৈদ্যদের প্রভাবও হয়তো সময়ে সময়ে কিছু কিছু ছিল, কিন্তু সর্বত্র সমভাবে ছিল এবং খুব সক্রিয় ছিল, এমন মনে হয় না। বৈশ্যবৃত্তিধারী বর্ণের লোকেরা রাষ্ট্রে অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রভাবশালীই ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহাদের প্রভাব কমিয়া যায় এবং তাঁহাদের কোনও কোনও সম্প্রদায় সৎশূদ্র পর্যায় হইতেও পতিত্ হইয়া পড়েন। কৈবর্তদের একটি সম্প্রদায় কিছুদিন রাষ্ট্রে খুব প্রভাবশালীই ছিলেন, এবং পরেও সে-প্রভাব খুব সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। আর কোনও বর্ণের কোনও প্রভাব রাষ্ট্রে ছিল বলিয়া মনে হয় না।

১৩

যে বিচিত্র বর্ণভেদ-বিন্যাসের কথা এতক্ষণ বলিলাম, পঞ্চম শতকের পর হইতেই এই ভেদ-বিন্যাস ক্রমশ বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করে এবং সেন-বর্মন পর্বে তাহা দৃঢ় ও অনমনীয় হইয়া সমাজকে স্তরে উপস্তরে বিভক্ত করিয়া সমগ্র সমাজ-বিন্যাস গড়িয়া তোলে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেশে এমন মানুষ, এমন সাধক ছিলেন যাঁহারা মানুষে মানুষে এই ভেদ-সংঘাত অস্বীকার করিয়া তাহার উর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছিলেন। জাত্‌ভেদ, বর্ণভেদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর তাঁহাদের উদার ও সমদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে

ভাব-দৃষ্টি

নাই। সমস্ত জাত্ ও বর্ণ ভেদ করিয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া মানুষের মানব-মহিমা, তাহার চিরমুক্ত প্রাণ ও আত্মার জয় ঘোষণাই ছিল তাঁহাদের অধ্যাত্মচিন্তা ও জীবন-সাধনার আদর্শ। এই আদর্শ সবচেয়ে বেশি প্রচার করিয়াছেন ভাগবতধর্মী এবং সহজযানী সাধকেরা। সমাজে তাঁহাদের আদর্শ কতটা অনুসৃত হইয়াছিল বলা কঠিন—খুব যে হইয়াছিল, এমন প্রমাণ নাই—কিন্তু, সে-আদর্শ যে অধ্যাত্মচিন্তায় এবং কিছু কিছু লোকের জীবন-সাধনার কাজে লাগিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলেনা। অন্তত বিশেষ বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীতে জাত্ভেদ বর্ণভেদের কোনো বালাইই ছিলনা, একথা মানিতেই হয়। ভাগবত্ তো খুব জোরের সঙ্গেই বলিয়াছেন, ভগবানের কাছে সকলেরই সমান অধিকার, এমন কি কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুহ্ম, যবন, খসদেরও। উপনিষদ্ধর্মে, বৌদ্ধধর্মে, প্রাচীন ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মেও অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে জাত্-বর্ণকে অস্বীকারই করা হইয়াছে। প্রাচীন বাংলায় এ-কথাটা খুব ভাল করিয়া জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা, এবং ভবিষ্যপুরাণের ব্রাহ্মপর্ব যদি বাংলাদেশে রচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ ভাবের ভাবুকেরাও। বজ্রসূচিকোপনিষৎ নামে একটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বোধ হয় বাংলাদেশেই, এবং মনে হয় এই উপনিষদটি বজ্রযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রচনা। গ্রন্থটি ৯৭৩-৯৮১ খ্রীষ্ট তারিখে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। এই গ্রন্থেও প্রচণ্ড যুক্তিতর্কে জাত্ভেদের যুক্তি খণ্ডন করা হইয়াছে।

সরহপাদের দোহাকোষের প্রথমেই বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ [সহজধর্মের] রহস্য জানেনা। সংস্কৃত টীকাকার বলিতেছেন, দ্বিজবর্ণের সংস্কার পালনেই যদি জাতি হয় তবে সংস্কার পালন তো সকলেরই হইতে পারে, তাহাতে জাতি সিদ্ধ হয়না—তস্মাৎ ন সিধ্যতি জাতিঃ। দোহাকোষের টীকার অন্যত্র আছে, শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষ কিছু জাতি নাই, সমস্ত লোক একই জাতিতে নিবদ্ধ, ইহাই সহজ ভাব—তয়া ন শূদ্রং ব্রাহ্মণাদি জাতিবিশেষং ভবতি সিদ্ধং। সর্বে লোকা একজাতি নিবদ্ধাশ্চ সহজমেবতি ভাবঃ॥ ভবিষ্যপুরাণের ব্রাহ্মপর্বে জাতিভেদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ যুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং সর্বশেষে বলা হইয়াছে, চার বর্ণই যখন এক পিতার সন্তান তখন সকলেরই একই জাতি; সব মানুষের পিতা যখন এক তখন এক পিতার সন্তানদের মধ্যে জাতিভেদ থাকিতেই পারেনা। বজ্রসূচিকোপনিষদেও খুব জোরের সঙ্গে বর্ণ-ব্রাহ্মণত্বের দাবী অস্বীকার করা হইয়াছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের বেশির ভাগ সম্বন্ধই তো শবর-শবরী, ডোম-ডোম্নী, চণ্ডাল-চণ্ডালিনীদের সঙ্গে।

কিন্তু, এই উদার সমদৃষ্টি ও অধ্যাত্ম-ভাবনা সামাজিকভাবে সমাজে গৃহীত হয় নাই, অধ্যাত্ম ও ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেই যেন সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যক্তিজীবনে এই উদার আদর্শের ধ্যান ও স্পর্শ অনেক মানুষকে জীবনসাধনায় অগ্রসর করিয়াছে, প্রাচীন বাংলায় এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। পাল যুগে বৌদ্ধ সহজধর্মের উদার আদর্শ কিছুটা সামাজিক জীবনেও সক্রিয় ছিল, কিন্তু সাধারণভাবে আমাদের দৈনন্দিন সামাজিক আচার, বিচার ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং সমাজ-বিন্যাসে এই উদার মানবাদর্শের স্বীকৃতি বিশেষ ছিল বলিয়া মনে হয়না।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

১। অনিরুদ্ধ ভট্ট—পিতৃদয়িতা, ৮ পৃ।

২। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—গৌড়লেখমালা।

৩। আচারঙ্গ সূত্র, ১।৮।৩ ; Sacred Books of the East, XXII, p. 84,264.

৪। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প, গণপতি শাস্ত্রী সং, ২২ পটল। কাশীপ্রসাদ জয়সবালের সং-ও দ্রষ্টব্য।

৫। উদয়সুন্দরী কথা, Gaekwad Oriental Series, 11 p.

৬। ঐতরেয় আরণ্যক, ২।১।১ ; A. B. Keith'র সং-ও দ্রষ্টব্য।

৭। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭।১৩-১৮।

৮। জীমূতবাহন—কালবিবেক, Bib. Ind. edn. Intro. viii p.

৯। পদ্মনাথ ভাট্টচার্য—কামরূপ শাসনাবলী।

১০। বল্লালসেন—অদ্ভুতসাগর, কলিকাতা সং।

১১। বল্লালসেন—দানসাগর, কলিকাতা সং।

১২। বাৎস্যায়ন—কামসূত্র, ৬।৩৮,৪১।

১৩। বায়ুপুরাণ, ৯৯।১১।৮৫।

১৪। বিষ্ণুপুরাণ, ৪।৮।১১ ; ৪।২৪।৮।

১৫। বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিক পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫০।

১৬। বোধায়ন—ধর্ম্মসূত্র, ১।১।২৫-৩১।

১৭। বৃহদ্ধর্মপুরাণ, Bib. Ind. edn। বঙ্গবাসী সং। উত্তর খণ্ড, ১৩ শ ও ১৪ শ অধ্যায়।

১৮। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সং। ব্রহ্মখণ্ড, ১০ম অধ্যায়।

১৯। ভবদেব ভট্ট—প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ।

২০। ভরতমল্লিক—চন্দ্রপ্রভা, কলিকাতা সং।

২১। ভাগবতপুরাণ, ২৪।৪।১৮।

২২। ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকা, ১৩৩৬-৩৭, ২য় খণ্ড ; ১৩৩৭-৩৮, ১ম খণ্ড ; ১৩৪৬, কার্তিক—ফাল্গুন ; ১৩৪৪, ১ম খণ্ড।

২৩। মণীন্দ্রমোহন বসু—চর্যাপদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৪। মৎস্যপুরাণ, ৪৮।৭৭ ; ৪৮।২৫।

২৫। মহাভারত, সভাপর্ব ২।৩০ ; ৫২।১৭ ; বনপর্ব, ৮৫।২-৪ ; ১।২১৬।

২৬। মনুস্মৃতি, ১০।৪৪ ; ১০।৩৪।

২৭। যতীন্দ্রমোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১০৭ পৃ।

২৮। রামায়ণ, ২।১০।৩৬-৩৭।

২৯। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বৌদ্ধগান ও দোহা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৩০। হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন লেখমালা—২য় খণ্ড, ২০৮ পৃ।

৩১। হলায়ুধ—টীকাসর্বস্ব, Trivandrum Sans. Ser.

৩২। " —ব্রাহ্মণসর্বস্ব, বারাণসী সং ; কলিকাতা সং।

৩৩। শ্রীধরদাস—ন্যায়কন্দলী। Journ. Andhra. Res. Soc. IV, 158-62 p.

৩৪। " —সদুক্তিকর্ণামৃত, Ed. by Ramavatara and Haradatta Sarma. Intro.

৩৫। সন্ধ্যাকরনন্দী—রামচরিত, V. R. S. edn.

৩৬। সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড।

৩৭। " —প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা।

৩৮। ক্ষিতিমোহন সেন—জাতিভেদ। বিশ্বভারতী।

৩৯। Asiatic Society of Bengal—Proceedings. 1880, 141 pp.

৪০। Bagchi, P. C.—Materials for a critical edition of the Bengali Caryāpadas.

৪১। Asiatic Soc. Bengal—Catalogue of Mss. from Nepal, Ed. by H. P. Sastri

৪২। Chanda, R. P.—Indo-Aryan races. Chap. V.

৪৩। Census Report of India, 1931. Vol I. Part one. Section on Caste, and tables ; Also, Bengal Volume, pt. I

৪৪। Dacca University—History of Bengal, Vol. I. Chap. XV with appendices.

৪৫। Dacca University Library—Mss. no. 4092.

৪৬। Epigraphia Indica—Vol. I, 81 p ; 332 p ; II, 330 p ; IV, 140 p ; VIII, 153 p ; 317—81 p ; XI, 41 p ; XII, 61 p ; XIII, 292 p ; XV, 150 p ; 281 p ; 293 p ; 301 p ; XVII, 356 p ; 291—309 p ; XVIII, 251 p ; XIX, 277 p ; XXII, 150 p ; XXIV, 101 p.

৪৭। Fick, R.—Social Organisation of N.-E. India in Buddha's time. C. U.

৪৮। India Office—Catalogue of Sans. Mss. in the Library. 1887.

৪৯। " —Catalogue, I. Part One. no. 450.

৫০। Indian Antiquary, 1922, 47 p ; 1893, 57 p ; LXI, 48 p ; XIX, 218 p.

৫১। Indian Culture, I, 505 p.

৫২। Indian Historical Qly, IX, 282 p ; VI, 60 p.

৫৩। Inscriptions of Bengal, III. Ed. by N. G. Majumdar. V. R. Society.

৫৪। Journal of the Royal Asiatic Soc. of Great Britan & Ireland. 1927. 472 p.

৫৫। Kane—History of the Dharmasāstras.

৫৬। Majumdar, R. C.—An indigenous history of Bengal, *in* Proceedings of the Indian Historical Records Commission. XVI.

৫৭। Paul, P. C.—Early History of Bengal, II. Chap. IX.

৫৮। Pag-Sam-Jon-Zang. Ed. by S. C. Das.

৫৯। Rhys Davids—Buddhist India.

৬০। Tāranath—Geschichte der Budddhismus in indien...Trans. by Schiefner.

৬১। Vallāla-charitam. Ed. by H. P. Sastri. A. S. B. 1904 ; Ed. by Harischandra Kaviratna, 1889.

৬২। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের যে-সব লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার তালিকা ও পাঠ নির্দেশের জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রেণী-বিন্যাস

১

প্রাচীন বাংলার সমাজ যেমন বিভিন্ন বর্ণে তেমনই বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল[১]। সামাজিক ধনের উৎপাদন ও বণ্টনানুযায়ী সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণীর উদ্ভব ও স্তরভেদ দেখা দেয়। যে-সমাজের উৎপাদিত ধনের উপর সকলের সমান অধিকার, ব্যক্তিগত ধনাধিকার যে-সমাজে স্বীকৃত নয়, সেই সমাজে শ্রেণী-বিন্যাসের প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু, প্রাচীন বাংলার সমাজে ব্যক্তিগত ধনাধিকার যেমন আজিকার মতই স্বীকৃত হইত—সমগ্র ভারতবর্ষেও হইত, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও হইত—তেমনই অস্বীকৃত হইত উৎপাদিত ধনের উপর সকলের সমান অধিকার। বস্তুত, বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম চিন্তায় অন্নের উপর সকলের সমানাধিকার অর্থাৎ সকলেরই খাইয়া বাঁচিবার অধিকার স্বীকৃত হইলেও[২], বাস্তব দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে সামাজিক ধনের উপর সকলের সমানাধিকার কখনও স্বীকৃত হয় নাই। বিংশ শতকের আগে মঠ-মন্দির-বিহার-সংঘারাম ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এই স্বীকৃতি ছিলনা। কৌম সমাজের ধনসাম্য-ব্যবস্থার কথা বাদ দিলে, ঐতিহাসিক পর্বে ব্যক্তিগত ধনাধিকারবাদ স্বীকৃতির উপরই ছিল প্রাচীন সমাজের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ধন উৎপাদন যাঁহারা করিতেন তাঁহারাই যে উৎপাদিত ধন ভোগ করিতে পারিতেন তাহা নয়; সামাজিক ধন কাহারা বেশী ভোগ করিতেন, কাহারা কম করিতেন, কাহারা কায়ক্লেশে জীবনধারণ করিতেন, কিংবা উৎপাদিত ধন একেবারেই ভোগ করিবার সুযোগ পাইতেন না, তাহা নির্ভর করিত উৎপাদিত

যুক্তি

১ এই অধ্যায়ে পাঠনির্দেশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যে-সব সাক্ষ্য-প্রমাণ ও তথ্য বর্তমান অধ্যায়ে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই অন্যান্য অধ্যায়ে, বিশেষভাবে বর্ণবিন্যাস, ভূমিবিন্যাস, ধনসম্বল, ধর্মকর্ম এবং রাষ্ট্রবৃত্ত অধ্যায়গুলিতে একাধিকবার উদ্ধৃত হইয়াছে; পাঠনির্দেশও সেই সঙ্গে পাওয়া যাইবে।

২ অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ। ভাগবত, ৭, ১১, ১০
সর্বভূতে যথাযোগ্যভাবে অন্নাদির সম্যক বিভাগও ধর্ম। এই ভাগবতেই অন্যত্র (৭, ১৪, ৮) পাইতেছি:

যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোহভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥

ক্ষুধার ও প্রয়োজনের অনুরূপ অন্ন পাওয়া দেহী মাত্রেরই অধিকার তাহার বেশি যে অধিকার করে সে দণ্ডার্হ।

ধনের বণ্টন ব্যবস্থার উপর। এই বণ্টন কাহারা করিতেন? প্রাচীন বাংলায় ধনোৎপাদনের ছিল তিন উপায়—কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যই এই তিন উপায়ের মধ্যে ধনাগমের প্রধান দুই উপায় ছিল বলিয়া মনে হয়। কৃষি ভূমিনির্ভর, ভূমির ব্যক্তিগত অধিকার এবং ব্যক্তিগত অধিকারের উপর রাষ্ট্রের অধিকার প্রাচীন বাংলায় স্বীকৃত ছিল, এ-তথ্য পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে জানা গিয়াছে। কাজেই কৃষিদ্রব্য ক্ষেত্রকর বা কর্ষকরা উৎপাদন করিলেও বণ্টন-ব্যবস্থাটা ছিল ভূম্যধিকারী এবং রাষ্ট্রের হাতে। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল বণিকদের হাতে, শিল্প ছিল শিল্পীদের হাতে; এই দুই উপায়ে উৎপাদিত অর্থের বণ্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ইহাদের হাতে না থাকিলেও—খানিকটা তো রাষ্ট্রের হাতে ছিলই—অধিকাংশ ইহাদেরই করায়ত্ত ছিল। ধনোৎপাদনের তিন উপায় অবলম্বন করিয়া স্বভাবতই বাংলায় তিনটি শ্রেণী গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়; এবং উৎপাদিত ও বণ্টিত ধনের তারতম্যানুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণীতে নানা স্তর থাকিবে তাহাও আশ্চর্য নয়।

কিন্তু সমাজে এমন বহু লোক বাস করেন যাঁহারা ধন উৎপাদন করেন না, বণ্টনের অধিকারও যাঁহাদের নাই। ধন উৎপাদন ও বণ্টন ছাড়াও সমাজের অনেক কর্তব্য আছে যাহা সমাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণকর। এই সব কর্তব্যের তালিকা সুদীর্ঘ; ইহাদের একপ্রান্তে যেমন মিলিবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মকর্ম, শিল্পকলা, ভাষা-সাহিত্য, এক কথায় সমাজের মানস-জীবনের নায়কদের, শিক্ষা ও ধর্মজীবিদের, তেমনই অন্যপ্রান্তে পাওয়া যাইবে সমাজের অঙ্গ-নির্গত আবর্জনা-পরিষ্কারক রজক-চণ্ডাল-বাউড়ী-পোদ-বাগ্‌দী ইত্যাদিদের। এইখানেই আসিয়া পড়ে সমাজের বর্ণ-বিন্যাসের কথা, এবং শ্রেণী-বিন্যাসের সঙ্গে তাহা জড়াইয়া যায়। বস্তুত, ভারতীয় সমাজে বর্ণ ও শ্রেণী অঙ্গাঙ্গী জড়িত, একটিকে আর একটি হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার উপায় নাই; বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে দেখা গিয়াছে, বৃত্তি বা জীবিকা বর্ণনির্ভর, এবং বর্ণ জন্মনির্ভর। বিশেষ বর্ণের কেহ নির্ধারিত বৃত্তির সীমা অতিক্রম করিতেন না এমন নয়, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম; অধিকাংশ লোক নিজ নিজ বৃত্তিসীমা রক্ষা করিয়াই চলিতেন। ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্যজ চণ্ডাল পর্যন্ত অগণিত স্তরের অগণিত বৃত্তি, এবং বৃত্তি অনুযায়ী যেমন বর্ণের সামাজিক মর্যাদা, তেমনই বর্ণানুযায়ী বৃত্তির নির্দেশ। বৃত্তি বা জীবিকা যেখানে বর্ণ অনুযায়ী সেখানে বর্ণ ও শ্রেণী একে অন্যের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়, এবং শ্রেণীর মর্যাদাও সেই সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি অনুযায়ী হইবে তাহাও বিচিত্র নয়। উৎপাদিত ধন উৎপাদক ও বণ্টকেরা তো ভোগ করিতেনই, বিশেষভাবে করিতেন উৎপাদন ও বণ্টন যাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করিতেন তাঁহারা, যাঁহারা তাঁহাদের সহায়ক ও সমর্থক ছিলেন তাঁহারা, এবং সমাজের অন্যান্য বিচিত্র কর্তব্যে যাঁহারা নিয়োজিত ছিলেন তাঁহারাও। সমানাধিকারবাদের স্বীকৃতি যখন ছিল না, তখন সকলে সমভাবে সামাজিক ধন ভোগ করিতে পাইতেন না, তাহাও স্বাভাবিক।

তাহার উপর এই বণ্টন আবার নিয়মিত হইত বর্ণ ও বৃত্তির মর্যাদানুযায়ী; কাজেই, ধনোৎপাদনের প্রধান তিন উপায়ানুযায়ী তিনটি শ্রেণী ছাড়া আরও অনেক অর্থনৈতিক শ্রেণী থাকিবে ইহা অস্বাভাবিক নয়।

সব শ্রেণী-উপশ্রেণী একসঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছিল এমন মনে করিবার কারণ নাই; সমাজের গঠন-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, সমাজকর্মের জটিলতা ও কর্মবিভাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-উপশ্রেণীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, ইহাই যুক্তিসঙ্গত অনুমান। তবে, এই অনুমান অনেকটা নিঃসংশয়ে করা চলে যে, খ্রীষ্টপূর্ব শতকগুলিতেই ধনাগমের পূর্বোক্ত তিন প্রধান উপায় অবলম্বন করিয়া তিনটি প্রধান শ্রেণী প্রাচীন বাংলায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নাই, কিন্তু ষষ্ঠ-পঞ্চম-চতুর্থ খ্রীষ্টপূর্ব শতকগুলিতে প্রতিবেশী অঙ্গ-মগধের সাক্ষ্য যদি আংশিকতও পুণ্ড্র-রাঢ়-সুহ্ম-বঙ্গ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয়, এবং এই সব জনপদের কৃষি-শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যদি সমসাময়িক সাক্ষ্য প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে এই অনুমান অস্বীকার করা যায় না। তবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতেই এ-বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়; তাহার আগে সবটাই অনুমান। পঞ্চম শতক-পরবর্তী বাংলার লিপিমালা পূর্বোক্ত অনুমান সমর্থন করে, এবং সদ্যকথিত তিনটি ও অন্যান্য শ্রেণীগুলি যে তাহার আগেই তাহাদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি লইয়া কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও সুস্পষ্ট সীমারেখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, ইহার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু সে-কথা বলিবার আগে শ্রেণী-বিন্যাস সংক্রান্ত উপকরণগুলি সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন।

২

উপাদান-বিবৃতি
ভূমিদান-বিক্রয়ের পট্টোলি

শ্রেণী-বিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের প্রধান উপকরণ ভূমিদান-বিক্রয়ের পট্টোলী, এবং সমর্থক ও আনুষঙ্গিক উপকরণ—পাল ও সেন আমলে—সমসাময়িক সাহিত্য, বিশেষভাবে বৌদ্ধ চর্যাগীতি, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ও বাংলার স্মৃতিগ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে পট্টোলীগুলির স্বরূপ বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন।

মহাস্থান শিলাখণ্ডলিপি বা চন্দ্রবর্মার শুশুনিয়া-লিপি আমাদের বিশেষ কোনও কাজে লাগিতেছে না। যদি অনুমান করা যায় যে, মৌর্যকালে বাংলাদেশ অথবা তাহার কতকাংশ মৌর্য সম্রাটদের করতলগত ছিল, এবং মৌর্যশাসন-পদ্ধতি এ দেশেও প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হয় যে, মৌর্যরাষ্ট্রে আমরা যে-সব রাজপুরুষদের পরিচয় অশোকের লিপিমালা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা-গ্রন্থ হইতে পাই, সেই সব রাজপুরুষেরা এদেশেও বিদ্যমান ছিলেন, এবং মৌর্য প্রাদেশিক-শাসনের যন্ত্র

পুন্দনগলের (পুণ্ড্রনগরের) মহামাত্রের নির্দেশে বাংলা দেশেও পরিচালিত হইত। কিন্তু তাহা হইলেও এই অনুমান বা প্রমাণ হইতে আমরা একমাত্র রাজপুরুষশ্রেণী বা সরকারী চাকুরীয়া ছাড়া আর কোনও শ্রেণীর খবর পাইলাম না। পরবর্তী যুগেও কতকটা তাহাই; উত্তর-ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সমসাময়িক লিপিগুলি অধিকাংশই তো রাজরাজড়ার বংশপরিচয় ও যুদ্ধ-জয়বিজয়ের এবং অন্যান্য কীর্তিকলাপের বিবরণ। এই সব লিপিতেও রাজপুরুষশ্রেণী ছাড়া আর কাহারও খবর বড় একটা নাই। সমসাময়িক সংস্কৃত-সাহিত্যে, যেমন শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে, ভাসের দু'একটি নাটকে, কালিদাসের শকুন্তলায় পরোক্ষ ভাবে সমাজের অন্যান্য বৃত্তি ও শ্রেণীর খবরাখবর কিছু কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও অত্যন্ত অস্পষ্ট। শুঙ্গ আমলের ভরহুত স্তূপের বেষ্টনীতে কিংবা কিছু পরবর্তী কালের সাঁচীর শিলালিপিগুলিতে ও মথুরায় প্রাপ্ত কোনও কোনও লিপিতে, কোনও কোনও প্রাচীন মুদ্রায়ও এই ধরনের পরোক্ষ কিছু কিছু খবর আছে; শিল্পী-বণিক্‌-ব্যবসায়ী-শ্রেণীর আভাস তাহাতে আছে। বস্তুত, একমাত্র জাতক-গ্রন্থ ছাড়া আর কোন উপাদানের ভিতরই প্রাচীন ভারতের শ্রেণী-বিন্যাসের সুস্পষ্ট চেহারা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পঞ্চম শতক পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। তবে, অনুমান করিয়া একটা অস্পষ্ট চেহারা আঁকিয়া লওয়া যায়। কিন্তু সে-চেষ্টা করিয়া লাভ নাই।

পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ-সংক্রান্ত পট্টোলীগুলি সমস্তই ভূমিদান-বিক্রয়ের দলিল। এই পট্টোলীগুলির মধ্যে আমরা শ্রেণী-সংবাদ যে খুব বেশী পাইতেছি, তাহা নয়; তবে দুইটি শ্রেণী বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে, এ কথা সহজেই বলা চলে, একটি রাজপুরুষ শ্রেণী, আর একটি বণিক্‌-ব্যবসায়ী শ্রেণী। তাহা ছাড়া, মহত্তরাঃ, ব্রাহ্মণাঃ, কুটুম্বিনঃ, ব্যবহারিণঃ প্রভৃতি, এবং সাধারণ ভাবে 'অক্ষুদ্র প্রকৃতি' অর্থাৎ গণ্যমান্য জনসাধারণের সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। ব্রাহ্মণদের বৃত্তি কি ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। মহত্তর (মহতর = মাহাতো = মাতব্বর লোক অর্থাৎ সম্পন্ন গৃহস্থ), কুটুম্ব (অর্থাৎ গ্রামবাসী সাধারণ গৃহস্থ) এবং 'অক্ষুদ্রপ্রকৃতি' জনসাধারণ কিংবা যে সমস্ত 'সদ্‌ব্যবহারী' কোনও বিশেষ প্রয়োজনে নিজেদের মতামত দিবার জন্য স্থানীয় অধিকরণের (তথা রাষ্ট্রের) সাহায্য-নিমিত্ত আহূত হইতেন, তাঁহাদের বৃত্তি কি ছিল, তাঁহারা কোন্‌ শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত ছিলেন, এ-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোনো আভাস এই লিপিগুলিতে পাওয়া না গেলেও অনুমান করা খুব কঠিন নয়। ভূমি দান-বিক্রয় উপলক্ষে যাঁহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হইতেছে, যাঁহাদের এই দান-বিক্রয় বিজ্ঞাপিত করা প্রয়োজন হইতেছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেণী হিসাবে কোনো শ্রেণীর উল্লেখ নাই; তবে যাঁহারা এই ব্যাপারে প্রধান তাঁহাদের মধ্যে রাজপুরুষশ্রেণী এবং বণিক্‌-ব্যবসায়ীশ্রেণীর লোকদেরই নিঃসংশয় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; অন্য যাঁহাদের উল্লেখ আছে, তাঁহারা কোনো সুনির্দিষ্ট শ্রেণীপর্যায়ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হন্‌ নাই, কিন্তু উল্লেখের রীতি দেখিয়া মনে হয়, শ্রেণীর ইঙ্গিত বর্তমান। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা

দরকার যে, রাজপুরুষদের উল্লেখ তাঁহাদিগের অধিকৃত পদমর্যাদার জন্যই ; সুস্পষ্ট সীমরেখায় আবদ্ধ একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকেও উল্লেখ করা হইতেছে না, তেমন উল্লেখের প্রয়োজনও হয় নাই।

অষ্টম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লিপিগুলির স্বরূপ একটু ভিন্ন প্রকারের। এইগুলি সবই ভূমিদানের দলিল। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকের দলিল গুলিতে ভূমি কি ভাবে বিক্রীত হইতেছে, এবং পরে কি ভাবে দান করা হইতেছে, তাহার ক্রমের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। অষ্টম শতক-পরবর্তী দলিলগুলিতে ভূমি ক্রয়ের যে ক্রম তাহা আমাদের দৃষ্টির বাহিরে ; আমরা শুধু দেখি, রাজা ভূমি দান করিতেছেন, এবং সেই ভূমি-দান বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। এই বিজ্ঞাপন যাঁহাদের নিকট করা হইতেছে, তাঁহাদের উপলক্ষ্য করিয়া সমসাময়িক প্রায় সমস্ত শ্রেণীর লোকদের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। যাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপিত করার কোনও প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না, তাঁহাদেরও জানান হইতেছে ; যেমন, যে-গ্রামে ভূমিদান করা হইতেছে, সেই গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের সমস্ত শ্রেণীর লোকদের নিশ্চয়ই জানান প্রয়োজন, সেই গ্রাম যে বীথী বা মণ্ডল বা বিষয় বা ভুক্তিতে অবস্থিত তাহার রাজপুরুষদের জানান প্রয়োজন, কিন্তু রাজনক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, সেনাপতি ইত্যাদি সকল রাজপুরুষদের জানাইবার কোনও প্রয়োজন বাস্তবক্ষেত্রে আছে বলিয়া তো মনে হয়না। কিংবা মালব, খস, হুণ, কর্ণাট, লাট ইত্যাদি ভিন্নদেশাগত বেতনভোগী সৈন্যদের বিজ্ঞাপিত করিবার কারণও কিছু বুঝা যায় না। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে এই ধরনের সর্বশ্রেণীর, সকল বৃত্তিধারী লোকের উল্লেখ নাই ; সেখানে যে-বিষয়ে অথবা মণ্ডলে ভূমি দান-বিক্রয় করা হইতেছে, সেই বিষয়ের অথবা মণ্ডলের রাজপুরুষ, বণিক্ ও ব্যবসায়ী, মহত্তর, ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ইত্যাদির বাহিরে আর কাহারও উল্লেখ করা হইতেছে না।

৩

এইবার একে একে লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক্ প্রাচীন বাংলার শ্রেণীবিভাগের চেহারাটা ধরিতে পারা যায় কি না। বলা বাহুল্য, পঞ্চম শতকের পূর্বে এ-বিষয়ে স্থির করিয়া কিছু বলিবার উপাদান আমাদের নাই।

উপাদান বিশ্লেষণ

প্রথম কুমারগুপ্তের ধনাইদহ (৪৩২-৩৩ খ্রী) লিপিতে দেখিতেছি, ভূমি-বিক্রয়ের ব্যাপারটি বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে গ্রামের কুটুম্ব অর্থাৎ অন্যান্য গৃহস্থদের, ব্রাহ্মণদের এবং মহত্তর অর্থাৎ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের ; বিজ্ঞাপন দিতেছেন একজন রাজপুরুষ। এই সম্রাটের ১নং দামোদরপুর-লিপিতে (৪৪৩-৪৪ খ্রী) রাজপুরুষ হইতেছেন কোটিবর্ষ বিষয়ের বিষয়পতি কুমারামাত্য বেত্রবর্মা এবং ভূমি-বিক্রয় ব্যাপারে তাঁহার সহায়ক ও পরামর্শদাতা হইতেছেন নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক এবং প্রথম বা জ্যেষ্ঠ কায়স্থ। ইঁহারা সকলেই অবশ্য রাজপুরুষ নহেন ; প্রথম কায়স্থ খুব

সম্ভব একজন রাজপুরুষ; বাকী তিনজনের দুই জন বণিক্ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এবং একজন শিল্পীশ্রেণীর প্রতিনিধি। কয়েকজন পুস্তপালের উল্লেখ আছে, ইহারাও রাজপুরুষ। বৈগ্রাম পট্টোলী (৪৪৭-৪৮ খ্রী) মতে কুমারামাত্য কুলবৃদ্ধি ছিলেন পঞ্চনগরী বিষয়ের বিষয়পতি; কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহার সহায়ক নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক অথবা প্রথম কায়স্থের সাক্ষাৎ পাইতেছি না; পরিবর্তে ভূমি-বিক্রয়ের ব্যাপারটি যেখানে জানান হইতেছে, সেখানে বিষয়াধিকরণকেও জানাইবার ইঙ্গিত আছে। অন্যান্য সমসাময়িক লিপি হইতে আমরা জানি যে, পূর্বোল্লিখিত নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক এবং প্রথম বা জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, ইহারাই বিষয়াধিকরণ গঠন করিতেন। ইহাদের ছাড়া বিক্রীত ভূমিসংপৃক্ত দুই গ্রামের কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও সংব্যবহারী-দিগকেও বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। এই সংব্যবহারীরা বিষয়, মণ্ডল বা গ্রামের রাজপ্রতিনিধির সহায়ক, কিন্তু রাজপুরুষ ঠিক নহেন। কোনো বিশেষ কারণে বা উপলক্ষে প্রয়োজন হইলে ইহারা আহূত হন্ এবং স্থানীয় রাজপ্রতিনিধিকে সাহায্য করেন। ২নং দামোদরপুর-লিপির সাক্ষ্য (৪৪৭-৪৮ খ্রী) প্রথম কুমারগুপ্তের ১নং দামোদরপুর-লিপিরই অনুরূপ। পাহাড়পুর পট্টোলীতেও (৪৭৮-৭৯ খ্রী) আযুক্তক ও পুস্তপালের উল্লেখ পাইতেছি, অধিষ্ঠানাধিকরণের উল্লেখও আছে এবং ভূমি মাপিয়া সীমা ঠিক করিয়া দিতে বলা হইয়াছে গ্রামের ব্রাহ্মণ, মহত্তর ও কুটুম্বদিগকে। ৩নং ও ৪নং দামোদরপুর-লিপির (৪৮২-৮৩ খ্রী; দ্বিতীয়টির তারিখ অজ্ঞাত) সাক্ষ্যও এইরূপই। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর-লিপিতে (৫০৭-৮ খ্রী) পঞ্চাধিকরণোপরিক, পুরপালোপরিক, সন্ধিবিগ্রহাধিকরণ, কায়স্থ ইত্যাদি রাজপুরুষদের উল্লেখ দেখিতেছি; অন্য কোনো শ্রেণীর লোকদের উল্লেখ নাই। দত্ত ভূমি কোনও ব্যক্তিবিশেষ ক্রয় করিয়া পরে দান করিতেছেন কি না, সে-খবর উল্লিখিত অন্যান্য লিপিগুলিতে যেমন আছে, এই লিপিটিতে তেমন নাই; শুধু আছে, জনৈক মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত শাসন-নির্দিষ্ট ভূমি দান করিতেছেন। পরবর্তী শতকে ত্রিপুরায় প্রাপ্ত লোকনাথের পট্টোলিও ঠিক্ গুণাইঘর-লিপিরই অনুরূপ। ঠিক্ এই ক্রমটি দেখা যায় পাল ও সেন-যুগের লিপিগুলিতে। গুপ্তযুগের লিপিগুলি একটু অন্যরূপ; সেখানে কোনও ব্যক্তিবিশেষ রাজসরকারের নিকট হইতে ভূমি কিনিয়া দান করিতেছেন এবং সেক্ষেত্রে রাজসরকারের অর্থলাভ এবং পুণ্যলাভ দুইই হইতেছে (বৈগ্রাম-লিপি ও পাহাড়পুরলিপি দ্রষ্টব্য; "...অর্থোপচয়ো ধর্ম্মষড়্ভাগাপ্যায়নঞ্চ ভবতি"—পাহাড়পুর-লিপি)। পাল ও সেন যুগে দানটা কিন্তু করিতেছেন রাজা স্বয়ং, কোনও ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধে (ধর্মপালের খালিমপুর-লিপি এবং দামোদরদেবের চট্টগ্রাম-পট্টোলী দ্রষ্টব্য)। যাহাই হউক, গুণাইঘর-লিপি এবং সপ্তম শতকের লোকনাথের লিপি, ইহাদের উভয়েরই ধারাটা যেন পরবর্তী পাল ও সেন আমলের; গুপ্ত আমলের অন্যান্য লিপি-নির্দিষ্ট ধারা যেন নয়! গোপচন্দ্রের মল্লসারুল-লিপি সম্বন্ধেও মোটামুটি একই কথা বলা যাইতে পারে। যাহাই হউক, গুপ্ত আমলের

পট্টোলী-সংবাদ

লিপিগুলিতে আবার ফিরিয়া যাওয়া যাক্। দামোদরপুরের ৫নং লিপি বক্ষ্যমাণ বিষয়ের সাক্ষ্য ব্যাপারে এই স্থানে প্রাপ্ত অন্যান্য লিপির অনুরূপ। ফরিদপুরের ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব প্রভৃতির তাম্রপট্টোলীর সাক্ষ্য একটু অন্য প্রকার। ধর্মাদিত্যের ১নং শাসনে ভূমি-ক্রয়েচ্ছা জ্ঞাপন করা হইতেছে বিষয়-মহত্তরদিগকে; অর্থাৎ বিষয়ের প্রধান প্রধান লোকদের এবং অন্যান্য সাধারণ লোকদের গ্রামীয় ভূমির দান-বিক্রয়ের খবর দেওয়া হইল। ধর্মাদিত্যের ২নং লিপিতে নূতন খবর কিছু নাই। গোপচন্দ্রের লিপিতে বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধানব্যাপারিণঃ অর্থাৎ স্থানীয় প্রধান ব্যাপারীদের উল্লেখ আছে। সমাচারদেবের ঘুঘ্‌রাহাটি পট্টোলিতে নূতন খবর কিছু নাই। জয়নাগের বপ্যঘোষবাট পট্টোলীতেও তাহাই। লোকনাথের ত্রিপুরা-লিপিতে রাজপুরুষদের ছাড়া বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের মধ্যে 'সপ্রধান-ব্যবহারিজনপদান্' অর্থাৎ স্থানীয় প্রধান ব্যবহারী ও জানপদদের নাম করা হইতেছে। অষ্টম শতকের খড়্গবংশীয় দেবখড়্গের আস্রফপুর-পট্টোলীতে বিষয়পতিদের সঙ্গে সঙ্গে কুটুম্ব-গৃহস্থদিগকেও বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে।

এই বিশ্লেষণ হইতে আমরা যাহা পাইলাম, তাহা হইতে এক শ্রেণীর লোক আমরা পাইতেছি যাঁহারা রাজপুরুষ, রাজপ্রতিনিধি। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোথাও তাঁহাদের রাজপুরুষ বা রাজপ্রতিনিধি বলা হইতেছে না, এবং সেই ভাবে বিশেষ কোনও একটি শ্রেণীভুক্তও করা হইতেছে না। আর এক ধরনের লোকের উল্লেখ পাইতেছি, যাঁহারা বিশেষ প্রয়োজনে আহূত হইলে রাষ্ট্রব্যাপারে রাজপুরুষদের সহায়তা করিয়া থাকেন; ইহাদিগকে কোথাও ব্যবহারিণঃ, কোথাও সংব্যবহারিণঃ, বিষয়ব্যবহারিণঃ, প্রধান-ব্যবহারিণঃ ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ইঁহাদের বৃত্তি কি ছিল, আমরা জানি না; তবে ইহাই অনুমেয় যে, নানা বৃত্তির প্রধান প্রধান লোকদেরই আহ্বান করা হইত; বিষয় বা অধিষ্ঠান-অধিকরণের সভ্য, নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক, ইঁহারাও সেই হিসাবে সংব্যবহারী, এবং কোনো কোনো পট্টোলীতে তাহারাও এই আখ্যায়ই উল্লিখিত হইয়াছেন। মহত্তর অর্থাৎ প্রধান প্রধান সম্পন্ন গৃহস্থ, কুটুম্ব অর্থাৎ সাধারণ গৃহস্থ, (তাঁহারা বিষয়েরই হোন্ বা গ্রামেরই হোন্ বা জনপদেরই হোন্), অক্ষুদ্রপ্রকৃতি বা শুধু প্রকৃতি অর্থাৎ প্রধান প্রধান অধিবাসী অথবা সাধারণ অধিবাসী প্রভৃতি যাহাদের উল্লেখ পাইতেছি, তাঁহাদের কাহার কি বৃত্তি ছিল, অনুমানের উপায় থাকিলেও সুনির্দিষ্টভাবে বলিবার উপায় নাই, কিংবা ইঁহারা কে কোন্ শ্রেণীর লোক, তাহাও জানা যায় না। তবে, রাজপুত্র ও রাজপ্রতিনিধি ছাড়া এমন কতকগুলি ব্যক্তির খবর পাওয়া গেল যাঁহাদের বৃত্তি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই, যেমন, নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ ও প্রথম কুলিক। ইঁহাদের কথা আগেই বলিয়াছি। যে-ভাবে ইঁহাদের উল্লেখ পাইতেছি, তাহাতে ইঁহারা যে এক একটী বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর প্রতিভূ তাহা বুঝা যাইতেছে, এবং তাহা সমর্থিত হইতেছে গোপচন্দ্রের একটি পট্টোলিতে 'প্রধান-ব্যাপারিণঃ' বা প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদের উল্লেখ দ্বারা। রাজপুরুষ ও এই বণিক্-ব্যবসায়ি-

শিল্পীশ্রেণী ছাড়া আর একটি শ্রেণীর পরোক্ষ উল্লেখও আছে, সেটি ব্রাহ্মণদের। ইহাদের বৃত্তি কি ছিল, তাহাও সহজেই অনুমেয়; পূজা, ধর্মকর্ম ইত্যাদির জন্যই তো ইহারা ভূমিদান গ্রহণ করিতেছেন। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাও ইহাদের অন্যতম বৃত্তি ছিল। অবশ্য, ইহাদের মধ্যে অনেকে রাজপুরুষের বৃত্তি কিংবা অন্যান্য বৃত্তিও গ্রহণ করিতেন, লিপিগুলিতে তাহার প্রমাণও আছে, কিন্তু তাহা ব্যতিক্রম মাত্র; সাধারণ ভাবে এই সব বৃত্তি তাঁহাদের ছিল না এবং সর্বদাই লিপিগুলিতে তাঁহারা পৃথক্ ভাবে বর্ণবদ্ধ শ্রেণী হিসাবেই উল্লিখিত হইয়াছেন।

এইবার অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লিপিগুলি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই দুই পর্বের অর্থাৎ পঞ্চম হইতে অষ্টম, এবং অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের লিপিগুলির স্বরূপের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহা আগেই ইঙ্গিত করিয়াছি। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ধর্মপালের খালিমপুর-শাসনে দেখিতেছি, নরপতি ধর্মপাল দুইটি গ্রাম দান করিতেছেন। দানের প্রার্থনা জানাইতেছেন, মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্মা; দানের হেতু হইতেছে নারায়ণ বর্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নারায়ণবিগ্রহের পূজা এবং বিগ্রহের পূজারী লাট (গুজরাট) দেশীয় ব্রাহ্মণদের এবং মন্দির-ভৃত্যদের ব্যবহার। যাহাই হউক, এই দান এইভাবে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে—

"এষু চতুর্ষু গ্রামেষু সমুপগতান্ সর্বানেব রাজ-রাজনক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-সেনাপতি-বিষয়পতি-ভোগপতি-ষষ্ঠাধিকৃত-দণ্ডশক্তি-দণ্ডপাশিক-চৌরোদ্ধরণিক-দৌসাধসাধনিক-দূতখোল-সমাগমিকাভিত্বরমাণ-হস্ত্যশ্ব-গোমহিষাজবিকা-ধ্যক্ষ-নাকাধ্যক্ষ-বলাধ্যক্ষ-তরিক-শৌল্কিক-গৌল্মিক-তদাযুক্তক-বিনিয়ুক্তকাদি রাজপাদোপজীবিনোঽন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্ চাটভাটজাতীয়ান্ যথাকালাধ্যাসিনো জ্যেষ্ঠকায়স্থ-মহামহত্তর দাশগ্রামিকাদি-বিষয়ব্যবহারিণঃ সকরণান্ প্রতিবাসিনঃ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণমাননাপূর্বকং যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাজ্ঞাপয়তি চ।

এই সূত্রটি খালিমপুর-লিপিতে প্রথম পাইলাম। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভূমিদানের যত পট্টোলী আছে, তাহার প্রায় সবটিতেই এই ধরনের একটি সূত্র উল্লিখিত আছে; প্রভেদের মধ্যে দেখা যায়, কোথাও রাজপুরুষদের তালিকাটি সংক্ষিপ্ত, কোথাও বিস্তৃততর। এই বিস্তৃততর তালিকার আর উল্লেখ করিয়া লাভ নাই; তবে একটু আধটু নূতন সংযোজনা কোথাও কোথাও আছে, সেগুলি আমাদের কাজে লাগিবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই, যেখানে এই ধরনের নূতন সংযোজনা পাওয়া যাইবে, তাহাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, দেবপালের মুঙ্গের-লিপিতে রাজপাদোপজীবীদের (এ ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে, স্বপাদপদ্মোপজীবিনঃ) তালিকায় চাটভাটজাতীয় সেবকদের সঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে—"গৌড়-মালব-খস-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চাটভাট-সেবকাদীন্-অন্যাংশ্চাকীর্তিতান্"; এবং প্রতিবাসী ও ব্রাহ্মণোত্তরদের সঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে,—"মহত্তর-কুটুম্বি-পুরোগমেদান্ধ্রকচণ্ডালপর্যন্তান্"। নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতেও ঠিক

এই ধরনের উল্লেখ আছে। বস্তুত পালরাজাদের সমস্ত লিপিই এইরূপ। শুধু গৌড়-মালব-খস-হূণ প্রভৃতিদের সঙ্গে কোথাও কোথাও চোড়দেরও (মদনপালের মনহলিলিপি দ্রষ্টব্য) উল্লেখ আছে। চাটভাটদের জায়গায় চট্টভট্ট অথবা চাটভটদের উল্লেখ পাওয়া যায়; বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে "ক্ষেত্রকরান্"এর পরিবর্তে পাওয়া যায় "কর্ষকান্।" কিন্তু দশম শতকের কম্বোজরাজ নয়পালদেবের ইর্দা-পট্টোলিতে বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের নামের তালিকা একটু অন্যরূপ। এখানে উল্লেখ পাইতেছি, স্থানীয় "সকরণান্ ব্যবহারিণঃ"দের (কেরাণীকুল সহ অন্যান্য রাষ্ট্রসহায়কদের), কৃষক ও কুটুম্বদিগের এবং ব্রাহ্মণদের। অন্যত্র যেমন, এখানেও তাহাই; ব্রাহ্মণদের যে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে ঠিক তাহা নয়, তাঁহাদের সম্মান জ্ঞাপনের পর (মাননাপূর্ব্বকং) অন্যদের বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে। আর, রাজমহিষী, যুবরাজ, মন্ত্রী, পুরোহিত, ঋত্বিক্, প্রাদেষ্টৃবর্গ, সকল শাসনাধ্যক্ষ, করণ (বা কেরাণী), সেনাপতি, সৈনিক-সংঘমুখ্য, দূতবর্গ, গূঢ়পুরুষবর্গ, মন্ত্রপালবর্গ এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীদের বলা হইতেছে এই দান মান্য করিবার জন্য।

সেনরাজাদের এবং সমসাময়িক অন্যান্য রাজবংশের লিপিগুলি সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছু নাই; বক্ষ্যমাণ বিষয়ে তাহাদের সাক্ষ্য পাল-লিপিগুলিরই অনুরূপ। তবে পাল ও সমসাময়িক অন্য রাজাদের লিপিতে যেখানে পাইতেছি প্রতিবাসীদের কথা, পরবর্তী লিপি-গুলিতে ঠিক সেইখানেই আছে জনপদবাসী (জনপদান্ কিংবা জানপদান্)দের কথা। কিন্তু, একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। পাল ও সমসাময়িক অনেকগুলি লিপিতে দেখা যায়, বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষেত্রকর ইত্যাদির পরেই নিম্নস্তরের যে অগণিত লোক তাঁহাদিগকে সব একসঙ্গে গাঁথিয়া দিয়া বলা হইতেছে, "মেদান্ধ্র চণ্ডালপর্যন্তান্" অথবা "আচণ্ডালান্" অর্থাৎ নিম্নতম স্তরের চণ্ডাল পর্যন্ত; অর্থাৎ বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজ পর্যায়ে যতগুলি উপবর্ণের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি তাহারা সকলেই ঐ "মেদান্ধ্রচণ্ডাল" পদের মধ্যেই উক্ত হইয়াছে। পরবর্তী লিপিগুলিতে, অর্থাৎ কম্বোজ-বর্মণ-সেন আমলের লিপিগুলিতে কিন্তু এই পদটি কোথাও নাই; চণ্ডাল পর্যন্ত নিম্নতম শ্রেণী ও বর্ণের অন্যান্য লোকেরা অনুল্লিখিত। পাল যুগের পরে সেন আমলে রাষ্ট্রের ও সমাজের উচ্চস্তরের অর্থাৎ এক কথায় উৎপাদন ও বণ্টন কর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যেন বদলাইয়া গিয়াছিল। এই অনুমান যেন অস্বীকার করা যায়না।

সমসাময়িক সাহিত্যে

• সমসাময়িক সাহিত্যেও এই শ্রেণী-বিন্যাসের চেহারা কিছুটা ধরিতে পারা যায়; পূর্ববর্তী বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে বর্ণ ও শ্রেণী এবং বর্ণ ও কোম প্রসঙ্গে তাহার আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি। বৌদ্ধ চর্যাগীতিতে কয়েকটি আদিবাসি কোম ও উপবর্ণ এবং তাঁহাদের বৃত্তির ইঙ্গিত আছে; সেন আমলের দুই একটি লিপিতেও আছে। সমসাময়িক বঙ্গীয় স্মৃতি ও পুরাণে ইহারা অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ পর্যায়ভুক্ত, এবং শুধু বর্ণ হিসাবেই নয়, অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবেও ইহারা সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর

লোক ; ইহাদের অনুসৃত বৃত্তিতেই তাহা পরিষ্কার। মেদ, অন্ধ্র, ও চণ্ডালদের মত কোল, পুলিন্দ, পুক্কস, শবর, বরুড়, (বাউড়ী ?), চর্মকার, ঘট্টজীবী, ডোলাবাহী (ছুলিয়া, দুলে'), ব্যাধ, হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগাতীত (বাগ্‌দী ?), ইত্যাদি সকলেই সমাজের শ্রমিক-সেবক, আজিকার দিনের ভাষায় দিনমজুর, এবং আজিকার মতই ভূমিহীন প্রজা। ইহাদের অব্যবহিত উপরের স্তরেই আর একটি শ্রেণীর আভাস ধরিতে পারা যায় ; ইহারা বিভিন্ন উপবর্ণে বিভক্ত, প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বৃত্তি ও উপজীবিকা। কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, ইহারা প্রায় সকলেই বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের মধ্যম সংকর এবং ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের অসৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে শিল্পজীবীও আছেন, কৃষিজীবীও আছেন, এমন কি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও নাই, এমন নয় ; শিল্পজীবী, যেমন, তক্ষণ, সূত্রধার, চিত্রকার, অট্টালিকাকার, কোটক ইত্যাদি ; কৃষিজীবি, যেমন, রজক, আভীর (বিদেশী কোম), নট, পৌণ্ড্রক (পোদ ?), কৌয়ালী, মাংসচ্ছেদ ইত্যাদি ; ব্যবসায়ী, যেমন, তৈলকার, শৌণ্ডিক (শুঁড়ি), ধীবর-জালিক ইত্যাদি। নিজ নিজ বৃত্তিই ইহাদের জীবিকা সন্দেহ নাই, কিন্তু জীবিকার জন্য ইহারা কমবেশী আংশিকত কৃষিনির্ভরও ছিলেন, এরূপ অনুমান অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইহাদের বৃত্তিগুলির প্রত্যেকটিই সামাজিক কর্তব্য ; সেই কর্তব্যের বিনিময়ে ইহারা ভূমির উপর অথবা ভূমিলব্ধ দ্রব্যাদির উপর আংশিক অধিকার ভোগ করিতেন, এই অনুমানও স্বাভাবিক। ইহারাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের অস্থায়ী প্রজা, ভাগচাষী ইত্যাদি। অস্থায়ী প্রজা ও ভাগচাষের প্রজা যে ছিল, তাহা তো ভূমি-বিন্যাস অধ্যায়েই আমরা দেখিয়াছি। উন্নত সমাজাধিকার বা উৎপাদন ও বণ্টন-কর্তৃত্ব যে ইহাদের নাই তাহা বর্ণ-বিন্যাসের স্তর হইতেও কতকটা অনুমান করা যায়। ইহাদেরই অব্যবহিত উপরের স্তরে ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী, ভূমিস্বত্ববান্ কৃষক বা ক্ষেত্রকর, শিল্পী, ব্যবসায়ী, করণ-কায়স্থ-বৈদ্যক-গোপ-যুদ্ধ-চারণ প্রভৃতি বৃত্তিধারী বিভিন্ন লোক লইয়া একটি বৃহৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পরিচয়ও বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের বর্ণতালিকার মধ্যে ধরিতে পারা কঠিন নয়। তাহা ছাড়া, শিক্ষাদীক্ষা-ধর্মকর্মবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ যতি সম্প্রদায় তো ছিলেনই।

৪

এই বিশ্লেষণের ফলে কি পাওয়া গেল, তাহা এইবার দেখা যাইতে পারে। রাজপুরুষদের লইয়াই আরম্ভ করা যাক্। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে দেখিয়াছি বিভিন্ন রাজপুরুষদের উল্লেখ আছে। মহারাজাধিরাজের অধীনে রাজা, রাজক, রাজনক-রাজন্যক, সামন্ত-মহাসামন্ত, মাণ্ডলিক-মহামাণ্ডলিক, এই সব লইয়া যে অনন্ত সামন্তচক্র ইহারাও রাজপাদোপজীবি। রাজা-রাজনক-রাজপুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তরিক-শৌল্কিক-গৌল্মিক প্রভৃতি নিম্নস্তরের রাজকর্মচারী পর্যন্ত সকলের উল্লেখই শুধু নয়, তাঁহাদের সকলকে একত্রে একমালায় গাঁথিয়া বলা হইয়াছে

বিবর্তন ও পরিণতি

"রাজপাদোপজীবিনঃ",) এবং সুদীর্ঘ তালিকায়ও যখন সমস্ত রাজপুরুষের নাম শেষ হয় নাই, তখন তাহার পরই বলা হইয়াছে "অধ্যক্ষপ্রচারোক্তানিহকীর্তিতান", অর্থাৎ আর যাঁহাদের কথা এখানে কীর্তিত বা উল্লিখিত হয় নাই কিন্তু তাঁহাদের নাম (অর্থশাস্ত্র জাতীয় গ্রন্থের) অধ্যক্ষ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আছে। (এই যে সমস্ত রাজপুরুষকে একসঙ্গে গাঁথিয়া একটি সীমিত শ্রেণীতে উল্লেখ করা, তাহা পাল আমলেই যেন প্রথম আরম্ভ হইল; অথচ আগেও রাজপুরুষ, রাজপাদোপজীবীরা ছিলেন না, তাহা তো নয়। বোধ হয়, এইরূপভাবে উল্লেখের কারণ আছে।) মোটামুটি সপ্তম শতকের সূচনা হইতে গৌড় স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তা লাভ করে; বঙ্গ এই সত্তার পরিচয় পাইয়াছিল ষষ্ঠ শতকের তৃতীয় পাদ হইতে। যাহা হউক, (সপ্তম শতকেই সর্বপ্রথম বাংলাদেশ নিজস্ব রাষ্ট্র লাভ করিল, নিজস্ব শাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিল) গৌড় ও কর্ণসুবর্ণাধীপ শশাঙ্ককে আশ্রয় করিয়াই তাহার সূচনা দেখা গেল; কিন্তু তাহা স্বল্পকালের জন্য মাত্র। কারণ, তাহার পরই অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া সমস্ত দেশ জুড়িয়া রাষ্ট্রীয় আবর্ত, মাৎস্যন্যায়ের উৎপীড়ন। এই মাৎস্যন্যায় পর্বের পর পালরাষ্ট্র ও পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশ আবার আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইল, নিজের রাষ্ট্র ও রাজ্য লাভ করিল, রাষ্ট্রীয় স্বাজাত্য ফিরিয়া পাইল, এবং পাইল পূর্ণতর বৃহত্তর রূপে। (মর্যাদায় ও আয়তনে, শক্তিতে ও ঐক্যবোধে বাংলাদেশ নিজের এই পূর্ণতর বৃহত্তর রূপ আগে কখনও দেখে নাই। বোধ হয়, এই কারণেই রাষ্ট্র ও রাজপাদপোজীবীদের শুধু সবিস্তার উল্লেখই নয়, শাসনযন্ত্রের যাঁহারা পরিচালক ও সেবক, তাঁহারা নূতন এক মর্যাদার অধিকারী হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে একত্র গাঁথিয়া স্বসীমায় সুনির্দ্দিষ্ট একটি শ্রেণীর নামকরণ করাটাও সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। যাহাই হউক, সোজাসুজি রাজপাদপোজীবী অর্থাৎ সরকারী চাকুরীয়াদের একটা সুস্পষ্ট শ্রেণীর খবর এই আমরা প্রথম পাইলাম।

রাজপাদোপজীবী শ্রেণী

রাজপাদপোজীবী সকলেই আবার একই অর্থনৈতিক স্তরভুক্ত ছিলেন না, ইহা তো সহজেই অনুমেয়। ইহাদের মধ্যে সকলের উপরে ছিলেন রাণক, রাজনক, মহাসামন্ত, সামন্ত, মাণ্ডলিক, মহামাণ্ডলিক ইত্যাদি সামন্ত প্রভুরা; স্ব স্ব নির্দিষ্ট জনপদে ইহাদের প্রভুত্ব মহারাজাধিরাজাপেক্ষা কিছু কম ছিল না। সর্বপ্রধান ভূস্বামী মহাসামন্ত-মহামাণ্ডলিকেরা; তাঁহাদের নীচেই সামন্ত-মাণ্ডলিকেরা—সামন্তসৌধের দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তরে মহামহত্তরেরা—বৃহৎ-ভূস্বামীর দল; চতুর্থ স্তরে মহত্তর ইত্যাদি অর্থাৎ ক্ষুদ্র ভূস্বামীর দল এবং তাহার পর ধাপে ধাপে নামিয়া কুটুম্ব অর্থাৎ সাধারণ গৃহস্থ বা ভূমিবান্‌প্রজা, ভাগীপ্রজা, ভূমিবিহীন প্রজা ইত্যাদি। মহাসামন্ত, মহামাণ্ডলিক, সামন্ত, মাণ্ডলিক—ইহারা সকলেই সাক্ষাৎভাবে রাজপাদপোজীবী; কিন্তু মহামহত্তর, মহত্তর, কুটুম্ব প্রভৃতিরা রাজপাদপোজীবী নহেন, রাজসেবক মাত্র; রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আহূত হইলে রাজপুরুষদের সহায়তা ইহারা

ভূম্যধিকারীর শ্রেণীস্তর

করিতেন, এমন প্রমাণ পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল লিপিতেই পাওয়া যায়।

পূর্বোক্ত রাজপাদপোজীবী শ্রেণীর বাহিরে আর একটি শ্রেণীর খবর আমরা পাইতেছি; অষ্টম শতকপূর্ব লিপিগুলিতে এই শ্রেণীর লোকদের খবর পাওয়া যায়। ইহারা রাজসরকারে চাকুরি করিতেন কিনা ঠিক বলা যায় না, তবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আহূত হইলে রাজপুরুষদের সহায়তা করিতেন, তাহা বুঝা যায়; ইহাদের উল্লেখ আগেই করা হইয়াছে। পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতেও ইহাদের উল্লেখ আছে, কিন্তু এখানে ইহারা উল্লিখিত হইতেছেন রাষ্ট্রসেবকরূপে। ইহারা হইতেছেন জ্যেষ্ঠকায়স্থ, মহামহত্তর, মহত্তর, দাশগ্রামিক, করণ, বিষয়-ব্যবহারি ইত্যাদি। কোনো কোনো লিপিতে মহত্তর, মহামহত্তর ইত্যাদি স্থানীয় ব্যক্তিদের এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু চাটভাট ইত্যাদি অন্যান্য নিম্নস্তরের রাজকর্মচারীরা সর্বদাই সেবকাদি অর্থাৎ (রাজ)-সেবকরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। অষ্টম শতকপূর্ব লিপিগুলির জ্যেষ্ঠকায়স্থ বা প্রথম কায়স্থ তো রাজপুরুষ বলিয়াই মনে হয়; যে পাঁচ জন মিলিয়া স্থানীয় অধিকরণ গঠন করেন, তিনি তাঁহাদের একজন। পরবর্তীকালে রাজপুরুষ না হইলেও তিনিও যে একজন রাজসেবক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই (রাজ)-সেবকদের মধ্যে গৌড়-মালব-খস-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চোড় ইত্যাদি জাতীয় ব্যক্তিদের উল্লেখ পাইতেছি। ইহারা কাহারা? এটুকু বুঝিতেছি, ইহারাও কোনো উপায়ে রাষ্ট্রের সেবা করিতেন। যে-ভাবে ইহাদের উল্লেখ পাইতেছি, আমার তো মনে হয়, এই সব ভিন্‌প্রদেশী লোকেরা বেতনভুক্ সৈন্যরূপে রাষ্ট্রের সেবা করিতেন। পুরোহিতরূপে লাট বা গুজরাটদেশীয় ব্রাহ্মণদের উল্লেখ তো খালিমপুর-লিপিতেই আছে। কিন্তু ঐ দেশীয় সৈন্যরাও এদেশে রাজসৈনিকরূপে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন সময়ে অন্য প্রদেশ হইতে যে-সব যুদ্ধাভিযান বাংলা দেশে আসিয়াছে, যেমন কর্ণাটদের, তাহাদের কিছু কিছু সৈন্য এদেশে থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য, অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও যে তাঁহারা আসেন নাই, তাহাও বলা যায় না।

রাজসেবক শ্রেণী

তবে, যে ভাবেই হউক, এদেশে তাঁহারা যে-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা রাজসেবকের বৃত্তি। অবশ্য, সমাজের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল বলিয়া মনে হয় না।

যাহাই হউক, রাজপাদোপজীবী শ্রেণীরই আনুষঙ্গিক বা ছায়ারূপে পাইলাম রাজসেবকশ্রেণী। এই দুই শ্রেণীর সমস্ত লোকেরাই এক স্তরের ছিলেন না, পদমর্যাদা এবং বেতনমর্যাদাও এক ছিল না, তাহা তো সহজেই অনুমান করা যায়। উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন স্তরের বিত্ত ও মর্যাদার লোক এই উভয় শ্রেণীর মধ্যেই ছিল; কিন্তু যে স্তরেই হউক, ইহাদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রাষ্ট্রের সঙ্গেই যে একান্তভাবে জড়িত ছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে কল্পনার আশ্রয় লইবার প্রয়োজন নাই।

রাজপাদোপজীবী শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরগুলি ধরিতে পারা কঠিন নয়। মহাসামন্ত,

মহামাণ্ডলিক, সামন্ত, মাণ্ডলিক প্রভৃতির কথা আগেই বলিয়াছি। ইঁহাদের নীচের স্তরেই পাইতেছি উপরিক বা ভুক্তিপতি, বিষয়পতি, মণ্ডলপতি, অমাত্য, সান্ধিবিগ্রহিক, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী, ধর্মাধ্যক্ষ, দণ্ডনায়ক, মহাদণ্ডনায়ক, দৌঃসাধসাধনিক, দূত, দূতক, পুরোহিত, শান্ত্যাগারিক, রাজপণ্ডিত, কুমারামাত্য, মহাপ্রতীহার, মহাসেনাপতি, রাজামাত্য, রাজস্থানীয়, ইত্যাদি। সুবৃহৎ আমলাতন্ত্রের ইঁহারাই উপরতম স্তর, এবং ইঁহাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ অর্থাৎ শ্রেণীস্বার্থ একদিকে যেমন রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত, তেমনই অন্যদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ ভূস্বামীদের সঙ্গে। এই উপরতম স্তরের নীচেই একটি মধ্যবিত্ত, মধ্যক্ষমতাধিকারী রাজকর্মচারীর স্তর; এই স্তরে বোধ হয় অগ্রহারিক, ঔদ্রঙ্গিক, আবস্থিক, চৌরোদ্ধরণিক, বলাধ্যক্ষ, নাবাধ্যক্ষ, দাণ্ডিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডশক্তি, দশাপরাধিক, গ্রামপতি, জ্যেষ্ঠকায়স্থ, খণ্ডরক্ষ, খোল, কোট্টপাল, ক্ষেত্রপ, প্রমাতৃ, প্রান্তপাল, ষষ্ঠাধিকৃত ইত্যাদি। ইঁহাদের নিম্নবর্তী স্তরে শৌল্কিক, গৌল্মিক, গ্রামপতি, হট্টপতি, লেখক, শিরোরক্ষিক, শান্তকিক, বাগাগারিক, পিলুপতি, ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই সব রাজপুরুষদের ক্ষমতা ও মর্যাদার তারতম্য হইত, ইহা সহজেই অনুমেয়। সর্বনিম্ন স্তরও একটি নিশ্চয়ই ছিল; এই স্তরে স্থান হইয়াছিল ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রসেবকদলের, এবং এই দলে হূণ-মালব-খস-লাট-কর্ণাট-চোড় ইত্যাদি বেতনভুক্ সৈন্যরা ছিলেন, ক্ষুদ্র করণ বা কেরাণীরা ছিলেন, চাটভাটেরা ছিলেন এবং আরও অনেকে।

আমলাতন্ত্রের শ্রেণীস্তর

মহামহত্তর, মহত্তর, কুটুম্ব, প্রতিবাসী, জনপদবাসী ইত্যাদিরা কোন্ শ্রেণীর লোক ছিলেন, ইঁহাদের বৃত্তি কি ছিল? ইঁহাদের অধিকাংশই যে বিভিন্ন স্তরের ভূম্যধিকারী ছিলেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবসর কম। শাসনাবলীতে উল্লিখিত রাজপাদোপজীবি, ক্ষেত্রকর, ব্রাহ্মণ এবং নিম্নস্তরের চণ্ডাল পর্যন্ত লোকদের বাদ দিলে যাঁহারা বাকী থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ভূমিসম্পদে, এবং অল্পসংখ্যক ব্যক্তিগত গুণে ও চরিত্রে সমাজে মান্য ও সম্পন্ন হইয়াছিলেন; তাঁহারাই মহামহত্তর ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন, এরূপ মনে করিলে অন্যায় হয় না। কুটুম্ব, প্রতিবাসী, জনপদবাসী—ইঁহারা সাধারণভাবে স্বল্প ভূমিসম্পন্ন গৃহস্থ; কৃষি, গৃহ-শিল্প ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা ইঁহাদের বৃত্তি ও জীবিকা। কৃষি ইঁহাদের বৃত্তি বলিলাম বটে, কিন্তু ইঁহারা নিজেরা নিজেদের হাতে চাষের কাজ করিতেন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না, যদিও ভূমির মালিক তাঁহারা ছিলেন। চাষের কাজ নিজে যাঁহারা করিতেন, তাঁহারা ক্ষেত্রকর, কর্ষক, কৃষক বলিয়াই পৃথকভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন। অষ্টম শতকের দেবখড়্গের আস্রফপুর লিপির একটি স্থানে দেখিতেছি, ভূমি ভোগ করিতেছেন একজন, কিন্তু চাষ করিতেছে অন্য লোকেরা—"শ্রীশর্বান্তরেণ ভুজ্যমানকঃ মহত্তরশিখরাদিভিঃ কৃষ্যমাণকঃ" (এখানে মহত্তর একজন ব্যক্তির নাম)। এই ব্যবস্থা শুধু এখন নয়, প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগেও প্রচলিত ছিল। বস্তুত, যিনি ভূমির মালিক, তাঁহার পক্ষে নিজের হাতেই সমস্ত মি রাখা এবং

নিজেরাই চাষ করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। জমি নানা সর্তে বিলিবন্দোবস্ত করিতেই হইত, তাহার ইঙ্গিত পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে ইতিপূর্বেই করিয়াছি। সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত বিশ্বরূপসেনের এক লিপিতে দেখিতেছি, হলায়ুধ শর্মা নামক জনৈক আবল্লিক মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ একা নিজের ভোগের জন্য নিজের গ্রামের আশে পাশে তিন চারিটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ৩৩৬½ উন্মান ভূমি রাজার নিকট হইতে দানস্বরূপ পাইয়াছিলেন; এই ভূমির বার্ষিক আয় ছিল ৫০০ কপর্দক পুরাণ। এই ৩৩৬½ উন্মানের মধ্যে অধিকাংশ ছিল নালভূমি অর্থাৎ চাষের ক্ষেত্র। ইহা তো সহজেই অনুমেয় যে, এই সমগ্র ভূমি হলায়ুধ শর্মার সমগ্র পরিবার পরিজনবর্গ লইয়াও নিজেদের চাষ করা সম্ভব ছিল না, এবং হলায়ুধ শর্মা ক্ষেত্রকর বলিয়া উল্লিখিতও হইতে পারেন না। তাঁহাকে জমি নিম্নপ্রজাদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত করিয়া দিতেই হইত। এই নিম্নপ্রজাদের মধ্যে যাঁহারা নিজেরা চাষবাস করেন, তাঁহারাই ক্ষেত্রকর। এইখানে এই ধরণের একটা অনুমান যদি করা যায় যে, সমাজের মধ্যে ভূমি-সম্পদে ও শিল্পবাণিজ্যাদি সম্পদে সমৃদ্ধ নানা স্তরের একটা শ্রেণীও ছিল এবং এই শ্রেণীরই প্রতিনিধি হইতেছেন মহত্তর, মহামহত্তর, কুটুম্ব ইত্যাদি ব্যক্তিরা, তাহা হইলে ঐতিহাসিক তথ্যের বিরোধী বোধ হয় কিছু বলা হয় না। বরং যে প্রমাণ আমাদের আছে, তাহার মধ্যে তাহার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন, এ-কথা স্বীকার করিতে হয়।

ধর্ম ও জ্ঞানজীবী শ্রেণী

ব্রাহ্মণেরা বর্ণ হিসাবে যেমন শ্রেণী হিসাবেও তেমনই পৃথক শ্রেণী; এবং এই শ্রেণীর উল্লেখ তো পরিষ্কার। দান-ধ্যান-ক্রিয়াকর্ম যাহা কিছু করা হইতেছে, ইঁহাদের সম্মাননা করার পর। ভূমিদান ইঁহারাই লাভ করিতেছেন, ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজ-পাদোপজীবী শ্রেণীতে উল্লিখিত হইয়াছেন; মন্ত্রী, এমন কি, সেনাপতি সামন্ত, মহাসামন্ত, আবস্থিক, ধর্মাধ্যক্ষ ইত্যাদিও হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণ নিয়মে ইঁহারা পুরোহিত, ঋত্বিক, ধর্মজ্ঞ, নীতিপাঠক, শান্ত্যাগারিক, শান্তিবারিক, রাজপণ্ডিত, ধর্মজ্ঞ, স্মৃতি ও ব্যবহারশাস্ত্রাদির লেখক, প্রশস্তিকার, কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদির রচয়িতা। ইঁহাদের উল্লেখ পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতে, সমসাময়িক সাহিত্যে বারংবার পাওয়া যায়। এই ব্রাহ্মণ-শাসিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম ছাড়া পাল আমলের শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাধান্যও কম ছিল না। ব্রাহ্মণেরা যেমন শ্রেণী-হিসাবে সমাজের ধর্ম, শিক্ষা, নীতি ও ব্যবহারের ধারক ও নিয়ামক ছিলেন, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসংঘগুলিও ঠিক তেমনই সমাজের কতকাংশের ধর্ম, শিক্ষা ও নীতির ধারক ও নিয়ামক ছিল, এবং তাঁহাদের পোষণের জন্যও রাজা ও অন্যান্য সমর্থ ব্যক্তিরা ভূমি ইত্যাদি দান করিতেন, ভূমিদান, অর্থদান ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহারা প্রচুর ভূমি ও অর্থ সম্পদের অধিকারী হইতেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এই বৌদ্ধ-জৈন স্থবির ও সংঘ-সভ্যদের এবং ব্রাহ্মণদের লইয়া প্রাচীন বাংলার বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান ধর্মজীবী শ্রেণী।

ক্ষেত্রকর শ্রেণীর কথা তো প্রসঙ্গক্রমে আগেই বলা হইয়াছে। অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিতেই ক্ষেত্রকরদের বা কৃষক-কর্ষকদের উল্লেখ আছে।) অথচ আশ্চর্য এই, অষ্টম শতকের আগে প্রায় কোনও লিপিতেই ইহাদের উল্লেখ নাই, যদিও উভয় যুগের লিপিগুলি, একাধিক বার বলিয়াছি, ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ও দানেরই পট্টোলী। এ তর্ক করা চলিবে না যে, ক্ষেত্রকর বা কৃষক পূর্ববর্তী যুগে ছিল না, পরবর্তী যুগে হঠাৎ দেখা দিল। খিল অথবা ক্ষেত্রভূমি দান-ক্রয়-বিক্রয় যখন হইতেছে, চাষের জন্যই হইতেছে। এ-সম্বন্ধে তর্কের সুযোগ কোথায়? আর, ভূমি দান-বিক্রয় যদি মহত্তর, কুটুম্ব, শিল্পী, ব্যবসায়ী, রাজপুরুষ, সাধারণ ও অসাধারণ (প্রকৃতয়ঃ এবং অক্ষুদ্র-প্রকৃতয়ঃ) লোক, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি সকলকে বিজ্ঞাপিত করা যায়, তাহা হইলে ভূমিব্যাপারে যাঁহার স্বার্থ সকলের বেশি, সেই কর্ষকের উল্লেখ নাই কেন? আর, অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী লিপিগুলিতে তাহাদের উল্লেখ আছে কেন? তর্ক তুলিতে পারা যায়, পূর্ববর্তী যুগের লিপিগুলিতে কৃষকদের অনুল্লেখের কথা যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য নয়; কারণ তাঁহারা হয় তো ঐ গ্রামবাসী কুটুম্ব, গৃহস্থ, প্রকৃতয়ঃ অর্থাৎ সাধারণ লোক, ইহাদের মধ্যেই তাহাদের উল্লেখ আছে। ইহার উত্তর হইতেছে, তাহা হইলে এই সব কুটুম্ব, প্রতিবাসী, জনপদবাসী জনসাধারণের কথা তো অষ্টম শতক-পরবর্তী লিপিগুলিতেও আছে, তৎসত্ত্বেও পৃথক্‌ভাবে ক্ষেত্রকরদের, কৃষকদের উল্লেখ আছে কেন? আমার কিন্তু মনে হয়, পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে কৃষকদের অনুল্লেখ এবং পরবর্তী লিপিগুলিতে প্রায় আবশ্যিক উল্লেখ একেবারে আকস্মিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহার একটা কারণ আছে এবং এই কারণের মধ্যে প্রাচীন বাংলার সমাজ-বিন্যাসের ইতিহাসের একটু ইঙ্গিত আছে। একটু বিস্তারিতভাবে সেটি বলা প্রয়োজন।

৮) কৃষক বা ক্ষেত্রকর শ্রেণী

ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পূর্বতন একটি অধ্যায়ে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই হউক্ বা অন্য কোনো কারণেই হউক্—অন্যতম একটি কারণ পরে বলিতেছি—সমাজে ভূমির চাহিদা ক্রমশ বাড়িতেছিল, সমাজের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া ভূমি কেন্দ্রীকৃত হইবার দিকে একটা ঝোঁক একটু একটু করিয়া দেখা দিতেছিল। সামাজিক ধনোৎপাদনের ভারকেন্দ্রটি ক্রমশ যেন ভূমির উপরই আসিয়া পড়িয়াছিল; পাল ও বিশেষ করিয়া সেন আমলের লিপিগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িলে এই কথাই মনের মধ্যে জুড়িয়া বসিতে চায়। কোন্ ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য কি, কোন্ ভূমির দাম কত, বার্ষিক আয় কত ইত্যাদি সংবাদ খুঁটিনাটি সহ সবিস্তারে যে ভাবে দেওয়া হইতেছে, তাহাতে সমাজের কৃষি-নির্ভরতার ছবিটাই যেন দৃষ্টি ও বুদ্ধি অধিকার করিয়া বসে। তাহা ছাড়া জনসংখ্যা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন ভূমির আবাদ, জঙ্গল কাটিয়া গ্রাম বসাইবার ও চাষের জন্য জমি বাহির করিবার চেষ্টাও চোখে পড়ে। বস্তুত, তেমন প্রমাণও দু'একটি আছে;

দৃষ্টান্তস্বরূপ সপ্তম শতকের লোকনাথের ত্রিপুরা-পট্টোলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ক্রমবর্ধমান কৃষিনির্ভরতার প্রতিচ্ছবি সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, এবং পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতে তাহাই হইয়াছে। সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে বর্ণিত ও উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে পৃথক ও সুনির্দিষ্টভাবে কৃষক বা ক্ষেত্রকর বলিয়া যে কাহারও উল্লেখ নাই তাহার কারণ এই নয় যে, তখন কৃষক ছিল না, কৃষিকর্ম হইত না; তাহার যথার্থ ঐতিহাসিক কারণ, সমাজ তখন একান্তভাবে কৃষিনির্ভর হইয়া উঠে নাই, এবং কৃষক বা ক্ষেত্রকর সমাজের মধ্যে থাকিলেও তাঁহারা তখনও একটা বিশেষ অথবা উল্লেখযোগ্য শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া উঠেন নাই। আমার এই যে অনুমান তাহার সবিশেষ সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ঐতিহাসিক গবেষণার বর্তমান অবস্থায় দেওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু আমি যে-যুক্তির মধ্যে এই অনুমান প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলাম তাহা সমাজতাত্ত্বিক যুক্তি নিয়মের বহির্ভূত, পণ্ডিতেরা আশা করি তাহা বলিবেন না।

যাহাই হউক, এই পর্যন্ত শ্রেণী-বিন্যাসের যে-তথ্য আমরা পাইলাম তাহাতে দেখিতেছি, রাজপাদোপজীবীরা একটি সুসংবদ্ধ, সুস্পষ্ট সীমারেখায় নির্দিষ্ট একটি শ্রেণী, এবং তাঁহাদেরই আনুসঙ্গিক ছায়ারূপে আছেন (রাজ)-সেবক শ্রেণী। ইহারা রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালক ও সহায়ক। ইঁহাদের মধ্যে আবার বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তর বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্মজীবীরা আর একটি শ্রেণী; ইহারা সাধারণভাবে জ্ঞান-ধর্ম-সংস্কৃতির ধারক ও নিয়ামক। ইঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের সংখ্যাই অধিক; বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের সংঘগুরু এবং যতিরাও আছেন, সিদ্ধাচার্যরা আছেন, এবং স্বল্পসংখ্যক করণ-কায়স্থ, বৈদ্য, এবং উত্তম সংকর বা সংশূদ্র পর্যায়ের কিছু কিছু লোকও আছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি ধোয়ী তন্তুবায় ছিলেন, এবং সমসাময়িক অন্য আর একজন কবি, জনৈক পপীপ, জাতে ছিলেন কেবট্ট বা কৈবর্ত। ব্রহ্মদেয় অথবা ধর্মদেয় ভূমি, দক্ষিণালব্ধ ধন ও পুরস্কার হইল এই শ্রেণীর প্রধান আর্থিক নির্ভর। ভূম্যধিকারীর একটি শ্রেণীও অল্পবিস্তর সুস্পষ্ট, এবং এই শ্রেণীও বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। সর্বোপরি স্তরে সামন্ত শ্রেণী এবং পরে স্তরে স্তরে মহামহত্তর, মহত্তর ইত্যাদি ভূমিসমৃদ্ধ অভিজাত শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে কুটুম্ব ও প্রধান প্রধান গৃহস্থ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীর স্তর। ইহারা, বিশেষভাবে নিম্নতর স্তরের ভূস্বামীরাই শাসনোক্ত অক্ষুদ্র প্রকৃতয়ঃ। চতুর্থ একটি শ্রেণী হইতেছে ক্ষেত্রকর বা কৃষকদের লইয়া; দেশের ধনোৎপাদনের অন্যতম উপায় ইঁহাদের হাতে; কিন্তু বণ্টন ব্যাপারে ইঁহাদের কোনও হাত নাই; ইঁহারা অধিকাংশই স্বল্পমাত্র ভূমির অধিকারী অথবা ভাগচাষী ও ভূমিবিহীন চাষী। পাল ও সেন লিপিতে পঞ্চম একটি শ্রেণীর উল্লেখ আছে; এই শ্রেণীর লোকেরা সমাজের শ্রমিক-সেবক, অধিকাংশই ভূমি-বঞ্চিত, রাষ্ট্রীয়-সামাজিক অধিকার বঞ্চিত। এই শ্রেণী তথাকথিত অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছবর্ণের ও আদিবাসী কোমের নানা বৃত্তিধারী লোকদের লইয়া

গঠিত।) লিপিগুলিতে বিশদভাবে ইহাদের কথা বলা হয় নাই, এবং যেটুকু বলা হইয়াছে তাহাও পালপর্বের লিপিমালাতেই; অষ্টম শতকের আগে ইহাদের উল্লেখ নাই, পালপর্বের পরেও ইহাদের উল্লেখ নাই। পালপর্বেও ইহাদের সকলকে লইয়া নিম্নতম বৃত্তি ও স্তরের নাম পর্যন্ত করিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, "মেদান্ধ্রচণ্ডালপর্যন্তান্"—একেবারে চণ্ডাল পর্যন্ত। কিন্তু পাল ও সেন আমলের সমসাময়িক সাহিত্যে—কাব্যে, পুরাণে, স্মৃতিগ্রন্থে—ইহাদের বর্ণ ও বৃত্তিমর্যাদা সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়। আগেই বর্ণ-বিন্যাস ও বর্তমান অধ্যায়ে সে-সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছি। লিপিপ্রমাণদ্বারাও সমসাময়িক সাহিত্যের সাক্ষ্য সমর্থিত হয়। রজক ও নাপিতরাও সমাজ-শ্রমিক, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা আবার কর্ষক বা ক্ষেত্রকরও বটে। জনৈক রজক সিরুপা ও নাপিত গোবিন্দের উল্লেখ পাইতেছি শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের লিপিতে। মেদ, অন্ধ্র, চণ্ডাল ছাড়া আরও দু'একটি অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ পর্যায়ের অর্থাৎ নিম্নতম অর্থনৈতিক স্তরের লোকদের খবর সমসাময়িক লিপিতে পাওয়া যায়, যেমন পুলিন্দ, শবর ইত্যাদি। চর্যাপদে যে ডোম্, ডোম্বী বা ডোমনী, শবর-শবরী, কাপালিক ইত্যাদির কথা বার বার পাওয়া যায় তাঁহারাও এই শ্রেণীর। একটি পদে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, ডোম্বীর কুঁড়িয়া (কুঁড়ে ঘর) নগরের বাহিরে; এখনও তো তাঁহারা গ্রাম ও নগরের বাহিরেই থাকে। বাঁশের চাংগাড়ী ও বাঁশের তাঁত তৈরী করা তখন যেমন ছিল ইহাদের কাজ, এখনও তাহাই। শিল্পীশ্রেণীর মধ্যে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের খবরও চর্যাগীতিতে পাওয়া যায়; সিদ্ধাচার্য তন্ত্রীপাদ সিদ্ধিপূর্বজীবনে এই সম্প্রদায়ের লোক এবং তাঁতগুরু ছিলেন বলিয়াই তো মনে হয়।

কিন্তু অষ্টমশতক হইতে আরম্ভ করিয়া এই যে বিভিন্ন শ্রেণীর সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা পাইলাম, ইহার মধ্যে শিল্পী, বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীর উল্লেখ কোথায়? এই সময়ের ভূমি দান-বিক্রয়ের একটি পট্টোলীতেও ভুল করিয়াও বণিক্ ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর কোনও ব্যক্তির উল্লেখ নাই; ইহা আশ্চর্য নয় কি? অষ্টম শতক-পূর্ববর্তী লিপিগুলিও ভূমি দান-বিক্রয়ের দলিল, সেখানে তো দেখিতেছি, স্থানীয় অধিকরণ উপলক্ষেই যে শুধু নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ ও প্রথম কুলিকের নাম করা হইতেছে, তাহাই নয়, কোন কোনও লিপিতে প্রধানব্যাপারিনঃ বা প্রধান ব্যবসায়ীদেরও উল্লেখ করা হইতেছে, অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিদের সঙ্গে বণিক্ ও ব্যবসায়ীদেরও বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে। রাষ্ট্র-ব্যাপারেও তাঁহাদের বেশ কতকটা আধিপত্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু অষ্টম শতকের পর এমন কি হইল, যাহার ফলে পরবর্তী লিপিগুলিতে এই শ্রেণীটির কোনো উল্লেখই রহিল না? ভূমিদানের ব্যাপারে শিল্পী, বণিক্ ও ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপিত করিবার কোনও প্রয়োজন হয় নাই, এই তর্ক উঠিতে পারে। এ যুক্তি হয় তো কতকটা সত্য, কিন্তু প্রয়োজন কি একেবারেই নাই? যে-গ্রামে ভূমিদান করা হইতেছে, সে-গ্রামের সকল শ্রেণী ও সকল স্তরের লোক, এমন কি চণ্ডাল পর্যন্ত সকলের উল্লেখ করা

শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণী

হইতেছে, অথচ শ্রেণী হিসাবে শিল্পী, বণিক্ ও ব্যবসায়ীদের কোনও উল্লেখই হইতেছে না। এতগুলি গ্রাম ও তৎসংপৃক্ত ভূমিদানের উল্লেখ আমরা পাইতেছি, অথচ তাহার মধ্যে একটি গ্রামেও শিল্পী, বণিক্ ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক কি ছিলেন না? আর, যেখানে রাজসেবকদের উল্লেখ করা হইতেছে, সেখানেও তো নগরশ্রেষ্ঠী বা সার্থবাহ বা কুলিক ইত্যাদির কাহারও উল্লেখ পাইতেছি না। অথচ, সপ্তম শতক পর্যন্ত তাঁহারাই তো স্থানীয় অধিকরণের প্রধান সহায়ক, তাঁহারা এবং ব্যাপারীরাই স্থানীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সংব্যবহারী। অথচ ইঁহাদেরও কোনো উল্লেখ নাই। এখানেও আমার মনে হয়, এই অনুল্লেখ আকস্মিক নয়। অষ্টম শতকের পরে শিল্পী, বণিক্ ও ব্যবসায়ী ছিলেন না, এইরূপ অনুমান মূর্খতা মাত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, খালিমপুর লিপির "প্রত্যাপণে মানপৈঃ"—দোকানে দোকানে মানপদের দ্বারা ধর্মপালের যশ কীর্তনের কথা, তারনাথ কথিত শিল্পী ধীমান ও বীটপালের কথা, শিল্পী মহীধর, শিল্পী শশিদেব, শিল্পী কর্ণভদ্র, শিল্পী তথাগতসর, সূত্রধার বিষ্ণুভদ্র এবং আরও অগণিত শিল্পী যাঁহারা পাল লিপিমালা ও অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা; বণিক বুদ্ধমিত্র ও বণিক লোকদত্তের কথা। মহারাজাধিরাজ মহীপালের রাজত্বের যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে বিলকিন্দক (ত্রিপুরা জেলার বিলকান্দি) গ্রামবাসী শেষোক্ত দুই বণিক একটি নারায়ণ ও একটি গণেশমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শুধু পাল আমলেই তো নয়; সেন আমলেও শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীদের অপ্রাচুর্য ছিল না। শিল্পীদের তো গোষ্ঠীই ছিল, এবং বিজয়সেনের আমলে জনৈক রাণক শিল্পীগোষ্ঠীর অধিনায়ক ছিলেন। পূর্বোক্ত ভাটেরা গ্রামের গোবিন্দকেশবের লিপিতে এক কাংস্যকার (কাঁসারী) এবং দন্তকারের (হাতীর দাঁতের কাজ যাঁহারা করেন) খবর পাওয়া যাইতেছে। বল্লালচরিতে বণিক ও বিশেষভাবে স্বর্ণবণিকদের উল্লেখ তো সুস্পষ্ট। আর, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ দুইটিতে তো শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর অগণিত উপবর্ণের তালিকা পাওয়া যাইতেছে। শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখ করা যায়, তন্তুবায়-কুবিন্দক, কর্মকার, কুম্ভকার, কংসকার, শংখকার, তক্ষণ-সূত্রধার, স্বর্ণকার, চিত্রকার, অট্টালিকাকার, কোটক ইত্যাদি; বণিক-ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেখা পাইতেছি, তৈলিক, তৌলিক, মোদক, তাম্বূলী, গান্ধিকবণিক, সুবর্ণবণিক, তৈলকার, ধীবর, ইত্যাদির।

শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী সমাজে তাহা হইলে নিশ্চয়ই ছিলেন; কিন্তু অষ্টম শতকের পূর্বে শ্রেণী হিসাবে তাঁহাদের যে প্রাধান্য রাষ্ট্রে ও সমাজে ছিল, সেই প্রাধান্য ও আধিপত্য সপ্তম শতকের পর হইতেই কমিয়া গিয়াছিল। বণিক ও ব্যবসায়ী বৃত্তিধারী যে-সব বর্ণের তালিকা উপরোক্ত দুই পুরাণ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে, লক্ষ্যণীয় এই যে, ইঁহারা সকলেই ক্ষুদ্র বণিক ও ব্যবসায়ী, স্থানীয় দেশান্তর্গত ব্যবসা-বাণিজ্যেই যেন ইঁহাদের স্থান। প্রাচীনতর কালের, অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের এবং হয়তো তাহারও আগেকার কালের

শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহরা কোথায় গেলেন? ইহাদের উল্লেখ সমসাময়িক সাহিত্যে বা লিপিতে নাই কেন? আমি এই অধ্যায়েই পূর্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ঠিক এই সময় হইতেই অর্থাৎ মোটামুটি অষ্টম শতক হইতেই প্রাচীন বাংলার সমাজ কৃষিনির্ভর হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে, এবং ক্ষেত্রকর-কর্ষকরাও বিশেষ একটী শ্রেণীরূপে গড়িয়া উঠেন, এবং সেইভাবেই সমাজে স্বীকৃত হন। অষ্টম শতকের আগে তাঁহাদের সুনির্দিষ্ট শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া উঠিবার কোনও প্রমাণ নাই। শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর পক্ষে হইল ঠিক ইহার বিপরীত। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত দেখি—বোধহয় খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতক হইতেই—বিশেষভাবে শ্রেণী হিসাবে তাঁহাদের উল্লেখ না থাকিলেও রাষ্ট্রে ও সমাজে ইহারাই ছিলেন প্রধান, তাঁহাদেরই আধিপত্য ছিল অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের অপেক্ষা বেশী। ইহার একমাত্র কারণ, তদানীন্তন বাঙালী সমাজ প্রধানত শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য-নির্ভর। এই তিন উপায়ই ধনোৎপাদনের প্রধান তিন পথ, এবং সামাজিক ধন বণ্টনও অনেকাংশে নির্ভর করিত ইহাদের উপর। কৃষিও তখন ধনোৎপাদনের অন্যতম উপায় বটে, কিন্তু প্রধান উপায় শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য। অষ্টম শতক হইতে সমাজ অধিকতর কৃষিনির্ভর, এবং উত্তরোত্তর এই নির্ভরতা বাড়িয়াই গিয়াছে; শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ধনোৎপাদনের প্রধান ও প্রথম উপায় আর থাকে নাই, এবং সেই জন্যই রাষ্ট্রে ও সমাজে ইহাদের প্রাধান্যও আর থাকে নাই। ব্যক্তি হিসাবে কাহারও কাহারও মর্যাদা স্বীকৃত হইলেও শ্রেণী হিসাবে সপ্তম শতকপূর্ব মর্যাদা আর তাঁহারা ফিরিয়া পান নাই। লক্ষ্যণীয় যে, অনেক শিল্পী ও বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মধ্যম সংকর বা অসৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত; যাঁহারা উত্তম সংকর বা সৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত তাঁহাদেরও মর্যাদা করণ-কায়স্থ, বৈদ্য-অম্বষ্ঠ, গোপ, নাপিত প্রভৃতির নীচে। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের সাক্ষ্যে দেখিতেছি, শিল্পী, স্বর্ণকার, সূত্রধার ও চিত্রকার এবং কোনো কোনো বণিক সম্প্রদায়কে মধ্যম সংকার পর্যায়ে স্থান দেওয়া হইয়াছে। বল্লাল-চরিতের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, বণিক ও বিশেষ ভাবে সুবর্ণবণিকদের তিনি সমাজে পতিত করিয়া দিয়াছিলেন। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, রাষ্ট্রে ও সমাজে ইহাদের প্রাধান্য থাকিলে, ধনোৎপাদন ও বণ্টন ব্যাপারে ইহাদের আধিপত্য থাকিলে এইরূপ স্থান নির্দেশ বা অবনতিকরণ কিছুতেই সম্ভব হইত না।

সদ্যোক্ত মন্তব্য ঐতিহাসিক অনুমান সন্দেহ নাই, তবু আমার যুক্তিটি যদি ঐতিহাসিক মর্যাদার বিরোধী না হয়, এবং ধনসম্বল অধ্যায়ে সামাজিক ধনের বিবর্তনের ইঙ্গিত, মুদ্রার ইঙ্গিত আমি যে-ভাবে নির্দেশ করিয়াছি, ভূমিবিন্যাস অধ্যায়ে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই অনুমানও ঐতিহাসিক সত্যের দাবি রাখে, সবিনয়ে আমি এই নিবেদন করি। তবে, এই অনুমানের স্বপক্ষে সমসাময়িক যুগের (দ্বাদশ শতক) একটি কবির একটি শ্লোক আমি উদ্ধার করিতে পারি। শ্লোকটি ঐতিহাসিক দলিলের মূল্য ও মর্যাদা দাবি করে না সত্য, কিন্তু আমার ধারণা এই শ্লোকটিতে উপরোক্ত সামাজিক বিবর্তনের

অর্থাৎ বণিক-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অবনতি এবং কৃষক-ক্ষেত্রকর সম্প্রদায়ের উন্নতির ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। গোবর্দ্ধন আচার্য ছিলেন লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি; তাঁহারই রচনা এই পদটি। প্রাচীনকালে শ্রেষ্ঠীরা শক্রধ্বজোত্থান পূজা (ইন্দ্রের ধ্বজার পূজা) উৎসব করিতেন; দ্বাদশ শতকেও উৎসবটি হইত, কিন্তু তখন শ্রেষ্ঠীরা আর ছিলেন না।

তে শ্রেষ্ঠীনঃ ক সম্প্রতি শক্রধ্বজ যৈঃ কৃতস্তবোচ্ছ্রায়ঃ।
ঈষাং বা মেঢ়িং বাধুনাতনাস্ত্বাং বিধিৎসন্তি ॥*

হে শক্রধ্বজ! যে শ্রেষ্ঠীরা (একদিন) তোমাকে উন্নত করিয়া গিয়াছিলেন, সম্প্রতি সেই শ্রেষ্ঠীরা কোথায়! ইদানীংকালে লোকেরা তোমাকে (লাঙ্গলের) ঈষ অথবা মেঢ়ি (গরু বাঁধিবার গোঁজ) করিতে চাহিতেছে।

এই একটি শ্লোকে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতিতে এবং একান্ত কৃষিনির্ভরতায় বাঙালী সমাজের আক্ষেপ গোবর্দ্ধন আচার্যের কণ্ঠে যেন বাণীমূর্তি লাভ করিয়াছে। একটু প্রচ্ছন্ন শ্লেষও কি নাই!

প্রমাণ ও যুক্তিসিদ্ধ অনুমানের সাহায্যে আমরা যাহা পাইলাম তাহার সার মর্ম এখন এইভাবে আমরা প্রকাশ করিতে পারি। সুপ্রাচীন বাংলার শ্রেণী-বিন্যাস সম্বন্ধে পঞ্চম শতকের আগে উপাদানের অভাবে কিছু বলা কঠিন। তবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, জাতকের গল্প, মিলিন্দপঞ্‌হ্, পেরিপ্লাস্-গ্রন্থ, টলেমির বিবরণ, কথা-সরিৎসাগরের গল্প, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র, মহাভারতের গল্প, গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণ ইত্যাদি সমসাময়িক সাহিত্যে প্রাচীন বাংলার শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয়, শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ীদের একাধিক সুসমৃদ্ধ সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক শ্রেণী দেশে বিদ্যমান ছিল, এবং রাষ্ট্রে ও সমাজে তাঁহাদের প্রভাব এবং আধিপত্যও ছিল যথেষ্ট। ধনোৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় এই শ্রেণীগুলির প্রভুত্বও সহজেই অনুমেয়। বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্রে যে নাগর-সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা যে সদাগরী ধনতন্ত্রেরই সৃষ্টি এ-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের কোনো কারণ দেখি না। ধর্ম-অধ্যয়ন-অধ্যাপনাজীবী একটি শ্রেণীর আভাসও পাওয়া যায়, এবং এই শ্রেণী জৈন এবং বৌদ্ধ যতি ও ব্রাহ্মণদের লইয়া গঠিত। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের ব্রাহ্মণদিগকে অর্জুন অনেক ধনরত্ন উপহার দিয়াছিলেন, এ-তথ্য মহাভারতেই উল্লিখিত আছে (১।২১৬)। বাৎস্যায়নও গৌড়-বঙ্গের ব্রাহ্মণদের কথা বলিতেছেন (৬।৩৮, ৪১); সদাগরী ধনতন্ত্রপুষ্ট নাগর-সভ্যতা তাঁহাদেরও স্পর্শ করিয়াছিল। বাংলায় স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তখন ছিল না; কৌম সমাজযন্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রযন্ত্র তো একটা ছিলই; মহাস্থান শিলাখণ্ড লিপিই তাহার প্রমাণ। সেই রাষ্ট্রযন্ত্রকে

সার সংক্ষেপ

আদি পর্ব

কেন্দ্র করিয়া যত ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণই হউক, রাজপাদোপজীবিদের একটি শ্রেণীও গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই অনুমান অসঙ্গত নয়। ইহাদেরই অভিজাত প্রতিনিধি হইতেছেন গলদন—বাংলায় মৌর্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধি অর্থাৎ মহামাত্র। সর্বনিম্ন শ্রেণীস্তরের একটু আভাসও পাওয়া যাইতেছে বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে; এই স্তরে ছিল ক্রীতদাসেরা। বাৎস্যায়ন এই ক্রীতদাসদের কথা বলিয়াছেন (৬।৩৮)। পৃথিবীর সর্বত্রই সদাগরী ধনতন্ত্রের সঙ্গে ক্রীতদাস প্রথা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। হিন্দু আমলের শেষ পর্যন্ত এই প্রথা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, জীমূতবাহন তাঁহার দায়ভাগ গ্রন্থে সেই সাক্ষ্য দিতেছেন। বাংলায় দাস ক্রয়বিক্রয়ের প্রথা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকেও প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ পট্টিকৃত দলিলপত্র আজও বাংলার সর্বত্র পাওয়া যায়। ক্রমপ্রসারমান আর্য-ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতির প্রান্তসীমায় যে-সমস্ত আদিবাসী কোম স্থান পাইতেছিল তাহারাও অর্থনৈতিক শ্রেণী সমূহের নিম্নস্তরেই নিবদ্ধ হইতেছিল, এ-অনুমানও খুব অসঙ্গত নয়।

পঞ্চম শতকের গোড়া হইতে প্রায় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত শ্রেণীবিন্যাসগত সামাজিক চেহারাটা সুস্পষ্ট ধরিতে পারা অনেক সহজ। এই পর্বে বাঙালী সমাজ প্রধানত শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যনির্ভর; অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীর উল্লেখ না থাকিলেও সমাজে ও রাষ্ট্রে তাঁহাদের প্রাধান্য পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। কৃষক, ক্ষেত্রকর, কৃষিকর্ম, সবই সমাজে রহিয়াছে, কৃষিকর্মের বলে সমাজে ধনোৎপাদনও হইতেছে, কিন্তু যেহেতু সমাজ প্রথমত ও প্রধানত শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর, এবং কৃষিকর্ম ও ভূমি সম্পদ সামাজিক ধনের স্বল্প অংশ মাত্র, সেই হেতু কৃষকরা সুসমৃদ্ধ সুসম্বদ্ধ শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পান নাই, এবং সেইভাবে রাষ্ট্রে ও সমাজে স্বীকৃতিলাভও করিতে পারেন নাই। কিন্তু ষষ্ঠ শতকেই সামন্ত প্রথা স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে, ভূমির চাহিদা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, বাঙালীর নিজস্ব রাষ্ট্রে ভূমির মর্যাদা বাড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে; বুঝা যাইতেছে, সমাজ ভূমিসম্পদকেই যেন প্রধান সম্পদ বলিয়া মানিয়া লইবার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সপ্তম শতকের শেষার্ধ ও অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ প্রায় জুড়িয়া রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আবর্ত এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্রুত অগ্রগতির স্রোতে এই বিবর্তন যেন সম্পূর্ণ হইল; শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য যেন ধনোৎপাদনের প্রথম ও প্রধান উপায় আর রহিল না। ইহার কারণ একাধিক; ভূমি-বিন্যাস, বর্ণবিন্যাস, ধনসম্বল, রাজবৃত্ত প্রভৃতি অধ্যায়ে নানা প্রসঙ্গে আমি এই সব কারণের উল্লেখ করিয়াছি; এখানে পুনরুল্লেখ করিয়া লাভ নাই। যাহা হউক, এই পর্বে অভিজাত ও অনভিজাত রাজপুরুষ, সংব্যবহারী ও রাজসেবকদের দেখা পাইতেছি; কিন্তু স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দেশে তখনও গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া রাজকর্মচারী বা রাজসেবকদের সুনির্দিষ্ট শ্রেণী তখনও গড়িয়া উঠে নাই; তাহার সূচনামাত্র দেখা

পঞ্চম—সপ্তম শতক পর্ব

যাইতেছে। জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও নিয়ামক বুদ্ধি-বিদ্যা-জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণীর পরিচয় এই যুগে সুস্পষ্ট। তাঁহাদের মর্যাদা ও সম্মাননা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, এবং তাঁহারা যে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিপাল্য সেই দাবিও স্বীকৃত হইয়াছে। নিম্নতর শ্রেণীস্তরের লোকেরা তো নিশ্চয়ই ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সমাজের প্রধান শ্রেণীগুলির বাহিরে। অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবে তাঁহারা গড়িয়া উঠেন নাই, সেই হিসাবে তাঁহাদের কোনো মূল্য স্বীকৃতও হয় নাই; উল্লেখও সেই হেতু নাই।

অষ্টম—ত্রয়োদশ শতক পর্ব

অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত, অর্থাৎ আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত বাঙালী সমাজ প্রধানত ও প্রথমত কৃষিনির্ভর। সামন্তপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত, ভূমিই সমাজের প্রধান সম্পদ, এবং সেই ভূমির অধিকারের বিচিত্র ক্রমসংকুচীয়মান স্তর লইয়াই এই যুগের সমাজ। ইহার একপ্রান্তে জনপদজোড়া ভূমির অধিকার লইয়া দোর্দণ্ড প্রতাপে দণ্ডায়মান মুষ্টিমেয় মহামাণ্ডলিক-মহাসামন্তরা; অন্যদিকে লেশমাত্র ভূমিবিহীন অসংখ্য প্রজার দল; মধ্যস্থলে ভূমিসমৃদ্ধির ও অধিকারের নানা স্তর। এই বিচিত্র স্তরই প্রধানত শ্রেণী নির্দেশের দ্যোতক। ইহাই এই যুগের প্রথম ও প্রধান সামাজিক বৈশিষ্ট্য। যেহেতু সমাজ প্রধানত ভূমিনির্ভর সেই হেতু এই পর্বে কৃষক-ক্ষেত্রকর শ্রেণীও সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট সীমারেখা লইয়া চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একই কারণে গ্রাম্য সমাজে ভূমিসম্পদসমৃদ্ধ একটি ভূম্যাধিকারী, এবং আর একটি কৃষিসম্পদ-সমৃদ্ধ গ্রাম্য কুটুম্ব, গৃহস্থ, ভদ্র শ্রেণীও গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের ঠিক শ্রেণী বলা হয়তো উচিত নয়, বরং একই শ্রেণীর বিভিন্ন স্তর বলিলেই যথার্থ বলা হয়। শিল্পী, বণিক এবং ব্যবসায়ীরাও সমাজে আছেন; শিল্পকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্যও চলিতেছে। কিন্তু ভূমিনির্ভর, কৃষিনির্ভর সমাজে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ধনোৎপাদনের অন্যতম উপায় মাত্র, প্রধান উপায় আর নহে; সেইজন্য শ্রেণী হিসাবে এই শ্রেণীদের অস্তিত্বের খবর নাই, রাষ্ট্রে এবং সমাজে তাঁহাদের প্রাধান্যও আর নাই। স্বতন্ত্র স্বাধীন স্বসীমাবদ্ধ রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার ফলে রাজপাদোপজীবী বলিয়া একটি বিশেষ সুস্পষ্ট শ্রেণী এই পর্বে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যেও আবার বিভিন্ন স্তর; একপ্রান্তে উপরিক, রাজস্থানীয়, মহাসেনাপতি, মহাধর্মাধ্যক্ষ, মহামন্ত্রী ইত্যাদি, অন্যপ্রান্তে তরিক, শৌল্কিক, গৌল্মিক, চাটভাট, ক্ষুদ্র করণ, বেতনভুক্ সৈন্য, প্রহরী ইত্যাদি। যাহাই হউক, রাজপাদোপজীবী শ্রেণীরই আনুষঙ্গিক ছায়ারূপে রাষ্ট্রসেবক শ্রেণীর আভাসও সুস্পষ্ট। ইহাদের মধ্যে ভূমিসম্পদনির্ভর শ্রেণীস্তর সমূহের লোকদের দর্শনও মিলিতেছে। বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণীও সুস্পষ্ট; এই শ্রেণীতেও বিভিন্ন স্তর। একপ্রান্তে তিন্তিড়িপত্র ও শাকান্নভুক্ বিনয়নম্র ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা পণ্ডিত; অন্যপ্রান্তে প্রভূত অর্থসমৃদ্ধ রাজপণ্ডিত বা পুরোহিত, পৌরোহিত্য ও অধ্যাপনার ছদ্মবেশে সমৃদ্ধ ভূম্যধিকারী। ভূমিহীন সমাজ-শ্রমিকশ্রেণীও সুস্পষ্ট; ইহারা অধিকাংশ অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ বর্ণবদ্ধ, স্বল্পসংখ্যক মধ্যম সংকর বা অসৎশূদ্র পর্যায়ের নিম্নস্তরে। পালপর্বে চণ্ডাল পর্যন্ত

সমাজের নিম্নতম শ্রমিক শ্রেণীস্তর সমাজদৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত; কিন্তু সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অত্যুচ্চারণের ফলে, সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দৃষ্টির আচ্ছন্নতার ফলে তাঁহাদিগকে সমাজদৃষ্টির বাহিরে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধ মহাযান-বজ্রযান-মন্ত্রযান-সহজযানে ডোম-ডোম্বী, শবর-শবরীদেরও স্বীকৃতি ছিল; চর্যাগীতিই তাহার প্রমাণ। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতিতে তাহা ছিল না, কাজেই সেন আমলে সমাজ-শ্রমিক শ্রেণীর এই অবজ্ঞা কিছু অস্বাভাবিক নয়!

৬

বর্ণ ও শ্রেণীর পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে এবং বর্তমান অধ্যায়ে কতকটা সবিস্তারেই বলা হইয়াছে। রাষ্ট্র ও শ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধের ইঙ্গিতও এই অধ্যায়ের ইতস্তত ইতিপূর্বেই প্রসঙ্গক্রমে দেওয়া হইয়াছে। এইখানে সেই সব ইঙ্গিত সংক্ষেপে একটু ফুটাইয়া তোলা যাইতে পারে। পঞ্চম শতকের আগে এ-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে দেখা যাইতেছে একটি শ্রেণী বরাবর রাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভ করিতেছে; রাষ্ট্রযন্ত্রে এই শ্রেণীর প্রভাব অক্ষুণ্ণ—ইঁহারা শিল্পী, শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, ব্যাপারী ইত্যাদি। দেখিয়াছি, ইঁহারাই ছিলেন সেই যুগের প্রধান ধনোৎপাদক শ্রেণী; কাজেই রাষ্ট্রের পক্ষে ইঁহাদের আনুকূল্য খুবই স্বাভাবিক। আর একটি শ্রেণীও রাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; ইঁহারা জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণীর জৈন-বৌদ্ধ যতি সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণ। কিন্তু এই শ্রেণী এখনও সম্পূর্ণ গড়িয়া উঠিয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে পরস্পর স্বার্থের সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় নাই; তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে মাত্র।

শ্রেণী ও রাষ্ট্র

ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে ভূমি-নির্ভর সামন্তপ্রথার স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দুইটি শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইল—একটি বহুস্তরবদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রেণী, এবং আর একটি জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। সামন্তচক্র ছিল রাষ্ট্রের শক্তি ও নির্ভর; এবং এই সামন্তচক্রকে আশ্রয় করিয়াই ভূম্যধিকারী শ্রেণীর অস্তিত্ব। কাজেই এই শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। জ্ঞান-ধর্মজীবী ব্রাহ্মণদের জীবিকানির্ভর ছিল ধর্মদেয়, ব্রহ্মদেয় ভূমি ও দক্ষিণা-পুরস্কারলব্ধ অর্থ। এই ভূমি ও অর্থপ্রাপ্তি নির্ভর করিত একদিকে রাষ্ট্র ও অন্যদিকে অভিজাত ভূম্যধিকারী শ্রেণীর কৃপার উপর। কাজেই ব্রাহ্মণেরা এই দুয়েরই পোষাক ও সমর্থক হইবেন, ইহাই তো স্বাভাবিক। তবে এই পর্বের রাষ্ট্রযন্ত্রে ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব বা আধিপত্য বড় একটা এখনও দেখা যাইতেছে না। ব্রাহ্মণেরা সংখ্যায় তখনও স্বল্প, দেশে নবাগত অথবা নববর্দ্ধিত, ব্রহ্মদেয় ধর্মদেয় ভূমি লইয়া পূজা যাগযজ্ঞ, অধ্যয়ন অধ্যাপনাতেই প্রধানত তাঁহারা নিযুক্ত; কাজেই প্রভুত্ব বিস্তারের সময় তখনও আসে নাই।

পরে সংখ্যা ও ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রে ও সমাজে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়, এবং মোটামুটি সপ্তম-অষ্টম শতক হইতেই পৌর ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও তাঁহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়—সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের ক্ষমতা এবং অধিকারও হ্রাস পাইতে থাকে।

অষ্টম শতক হইতে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভূম্যধিকারী শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থবন্ধন আরও ঘনিষ্ঠ হয়; আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অটুট ও অক্ষুন্ন ছিল। এই ব্যাপারে পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রের সঙ্গে কম্বোজ-বর্মণ-সেন রাষ্ট্রের কোনো পার্থক্য ছিল না! একান্তভাবে সামন্ততন্ত্রনির্ভর রাষ্ট্রে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক এবং সমাজ-বিবর্তনের ইহাই নিয়ম। পাল ও চন্দ্র বংশ বৌদ্ধরাজবংশ হওয়া সত্ত্বেও, আগেই দেখিয়াছি, এই দুই রাষ্ট্রেই ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল; কেন, কি কারণে ছিল তাহা বর্ণ-বিন্যাস, ধর্মকর্ম ও রাজবৃত্ত অধ্যায়ে সবিস্তারেই আলোচনা করিয়াছি। সেন-বর্মণ রাষ্ট্রে এই প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বাড়িয়াই গিয়াছিল এবং ভূম্যধিকারীতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে স্বার্থগ্রন্থিবন্ধন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। বস্তুত, সেন ও বর্মণ রাজবংশ যে সমাজাদর্শ ও আবেষ্টনের মধ্যে তাঁহাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, যে-আদর্শ ও আবেষ্টনের মধ্যে ভূম্যধিকারতন্ত্র অটুট ও অক্ষুন্ন থাকা সহজ ও সম্ভব সেই আদর্শ ও পরিবেশ রচনা এবং প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ছিল জ্ঞান-বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণদের উপর। পরমসুগত বৌদ্ধ ও চন্দ্ররাজবংশের ক্ষেত্রেও ইহার অন্যথা হয় নাই, কারণ অর্থ ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সমাজপদ্ধতির এই নিয়মই তখন কার্যকরী ছিল! দেশের ভূমিবান্ বিত্তবান্ সম্ভ্রান্ত অধিকাংশ লোকই ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতি আশ্রয়ী, এবং বৌদ্ধ গৃহীরাও তাহাই। কাজেই পাল-চন্দ্র যুগে ভূমি ও কৃষিতান্ত্রিক সমাজপদ্ধতির কিছু ব্যতিক্রম হয় নাই। তবে, বৌদ্ধ রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টি ছিল উদার এবং সর্বত্র প্রসারী এবং সেই হেতু পরবর্তী সেন-বর্মণ আমলের মত পাল-চন্দ্র আমলে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রভাব ও আধিপত্য এমন দুর্জয় ও সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিতে পারে নাই। পাল-চন্দ্র ও সেন-বর্মণ আমলে ভূমি ও কৃষিতন্ত্রেরই প্রাধান্য অর্থাৎ ভূম্যধিকারী শ্রেণীই রাষ্ট্রের প্রধান সহায় ও পোষক, এবং রাষ্ট্রও ইহাদের সহায় ও পোষক। সেন-বর্মণ রাষ্ট্র উপরন্তু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেরও পোষক ও সহায়ক; পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রের উদার সর্বত্র প্রসারী দৃষ্টিও ইহাদের ছিল না। ইহার ফলেই বোধ হয় সেন-বর্মণ রাষ্ট্র সমাজের সকল শ্রেণীর সমর্থন ও পোষকতা লাভ করিতে পারে নাই। সমসাময়িক স্মৃতি, পুরাণ ও পরবর্তীকালের বল্লাল-চরিতের সাক্ষ্য যদি এক্ষেত্রে প্রামাণিক হয় তাহা হইলে অনুমান করা কঠিন নয় যে, শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর একটা বৃহৎ অংশের সমর্থন ও পোষকতা সেন-বর্মণ রাষ্ট্র লাভ করিতে পারেন নাই। ভূমিনির্ভর কৃষিপ্রধান সমাজে ও রাষ্ট্রে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণী অবজ্ঞাত হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ কাহিনী সম্বন্ধে কোনো বাস্তব, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে নিশ্চয় করিয়া হয়তো দেওয়া কঠিন (রাজবৃত্ত এবং ধর্মকর্ম অধ্যায়ে শশাঙ্ক-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য); কিন্তু বল্লাল-চরিতে বণিক-সুবর্ণ-

বণিকদের সঙ্গে বল্লালসেনের রাষ্ট্রের যে সংঘর্ষের কাহিনী বর্ণিত আছে তাহার পশ্চাতে একদিকে ব্রাহ্মণ ও ভূম্যধিকারী শ্রেণী এবং অন্যদিকে বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণী এই দুইয়ের সংঘর্ষের ইঙ্গিত লুকাইয়া নাই, জোর করিয়া এমন কথা বলা যায় না। সংঘর্ষের কারণ যে ছিল তাহা তো সমসাময়িক স্মৃতি ও পুরাণেই জানা যাইতেছে। তাহা ছাড়া, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ পর্যায়ভুক্ত যে সুবৃহৎ নিম্নতম সমাজ-শ্রমিক তাহারাও বোধ হয় সেন-বর্মণ রাষ্ট্রের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। ইহাদের অনেকেই বজ্রযান-কালচক্রযান-সহজযান-মন্ত্রযান তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, শৈব তান্ত্রিক ধর্ম, নাথ ধর্ম ইত্যাদির নানা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন; সেন-বর্মণ রাষ্ট্রের ধর্ম ও সমাজগত আদর্শ এই সব অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ধর্ম ও আচার সুনজরে দেখিত না—এই তথ্য আমরা জানি। ভূম্যধিকারী শ্রেণীপ্রধান, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রপ্রধান, কৃষিপ্রধান সমাজে এই সব ভূমিবিহীন কৃষক ও অসংখ্য ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ সমাজ-শ্রমিকের কোনো অধিকারই যে ছিল না, ইহা অনুমান করিতে কল্পনার আশ্রয় লইবার দরকার হয় না। সমসাময়িক স্মৃতি-পুরাণই তাহার প্রমাণ। কাজেই, সেন-বর্মণ রাষ্ট্র ও সেই রাষ্ট্রের ধারক ও পোষক সমসাময়িক উচ্চতর শ্রেণীগুলির উপর ইহাদের প্রসন্ন থাকিবার কোনো কারণ নাই।*

* এই অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী নিষ্প্রয়োজন। যে-সব তথ্য ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সমস্তই সুপরিচিত এবং অন্যান্য অধ্যায়ে আলোচিত। বাংলার যে-সব লিপি-প্রমাণ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার তালিকা ও পাঠনির্দেশ পরিশিষ্টে পাওয়া যাইবে।

অষ্টম অধ্যায়

গ্রাম ও নগর-বিন্যাস

১

প্রাচীন বাংলার সমাজ-বিন্যাসের বাস্তব উপাদান-বিবৃতি প্রসঙ্গে আমাদের বাস্তব সভ্যতার প্রাক্-আর্য ভিত্তির কথা বলিয়াছি। কৃষিজীবী অষ্ট্রিক্ ভাষাভাষী কৌমগুলির সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থা ছিল একান্তই গ্রামীন; গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই ইহাদের জীবনযাত্রা রূপায়িত হইত; অন্তত অষ্ট্রিক্ ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাড়া, সমাজতত্ত্ব আলোচনায় দেখা যায়, একান্ত কৃষিনির্ভর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরশিল্পনির্ভর

যুক্তি

সমাজে গ্রামগুলি সাধারণত খুব বড় হয়না, এবং সহরের সংখ্যাও বেশি থাকে না। কৃষিক্ষেত্র ও কৃষিকর্ম চালনার জন্য ঘরবাড়ী তৈরী ও দেহাবরণ রচনার জন্য যে-সব শিল্প একান্ত প্রয়োজন তাহার জন্য প্রচুর আসবাব বা উপাদানের প্রয়োজন হয় না, বহুসংখ্যক লোকেরও প্রয়োজন হয়না। উপরন্তু কৃষিযোগ্য ভূমি কোথাও এত সুপ্রচুর থাকেনা যে নগরের মত সীমাবদ্ধ স্বল্পস্থানে বহুসংখ্যক লোককে পালন করিতে পারে। সেইজন্যই গ্রাম যত বৃহৎই হউক না কেন আয়তনে বা লোকসংখ্যায় কিছুতেই নগরের সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে পারিতনা, আজও পারেনা। অধিকন্তু, নগরকে কেন্দ্র করিয়া নগরের প্রয়োজন মিটাইবার মত কোথাও সুবিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র থাকেনা, থাকিতে পারেনা; নগরের বাহিরে দেশের জনপদ জুড়িয়া সেই কৃষিক্ষেত্র বিস্তৃত থাকে, এবং সেই বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে কৃষিকর্ম যাঁহাদের চালাইতে হয় তাঁহাদিগকে কৃষিক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া নিকটেই বাস করিতে হয়। তাঁহাদের বসতিস্থানগুলিই গ্রাম। কৃষিনির্ভর সভ্যতা সেই জন্য গ্রামকেন্দ্রিক হইতে বাধ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্পগুলিও গ্রামকেন্দ্রিক, কারণ সেগুলি কৃষিকর্মেরই আনুষঙ্গিক, এবং কৃষিজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কৃষিকর্ম পরিচালনার জন্য প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন জল; জল যেখানে সহজলভ্য কৃষিকর্মও সেখানে সমৃদ্ধ। প্রাচীন বাংলায় তাহাই দেখিতেছি। গ্রামগুলির পত্তনও সেইজন্যই সর্বত্র নদী, নালা, খাটিকা, খাল, বিল ইত্যাদির তীরে তীরে। খাদ্য ও পানীয় যেখানে সহজলভ্য সেইখানেই তো মানুষের বসতি; কাজেই সেই বসতি জলপ্রবাহকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া

উঠিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। গ্রাম্য কৃষিসভ্যতার বিকাশও সেইজন্য নদী, খাল, বিল, খাটিকার তীরে তীরে। প্রাচীন বাংলায়ও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

নগরসভ্যতা সম্বন্ধেও একথা সত্য; কিন্তু তাহা অন্য প্রয়োজনে। পানীয় জলের প্রয়োজন একটা নগরেও থাকে, কিন্তু সে-পানীয় নদনদীর জলপ্রবাহ ছাড়া অন্য উপায়েও মিটান যায়; যেমন কূপের সাহায্যে খুব সুপ্রাচীন কালেও হইয়াছে। তবু, যেখানে স্বল্পমাত্র স্থান আশ্রয় করিয়া বহুলোক বাস করে সেখানে জলপ্রবাহের একটা প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু, ইহা ছাড়াও, নগরসভ্যতা নদী ও প্রশস্ত যাতায়াত পথকে আশ্রয় করিবার অন্য একাধিক কারণ প্রাচীন কালে ছিল। নগর একপ্রকারের নয়, কিংবা একই প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে নাই। রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দেশের নানা জায়গায় কতকগুলি কেন্দ্র রচনার প্রয়োজন হইত; রাজকর্মচারীরা সেইখানে বাস করিতেন, রাজকর্মের জন্য সেখানে লোকদের যাওয়া আসা প্রয়োজন হইত, এবং এই সব বসতি ও যাতায়াত-পথ আশ্রয় করিয়া শাসনাধিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে হাট-বাজার ইত্যাদিও গড়িয়া উঠিত। প্রধানত যাতায়াতের সুবিধার জন্যই এইসব শাসনাধিষ্ঠানের কেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল হয় নদীর তীরে, অথবা সুপ্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে, অথবা দুয়েরই আশ্রয়ে। রাজা-মহারাজদের রাজধানী ও জয়স্কন্ধাবারগুলি সম্বন্ধেও একই যুক্তি প্রযোজ্য; এবং এগুলিও গড়িয়া উঠিয়াছিল নদী বা রাজপথ বা উভয়েরই আশ্রয়ে। সৈন্যচালনা এবং সামরিক প্রয়োজনেও রাজধানী ও জয়স্কন্ধাবারগুলি নদী এবং প্রশস্ত রাজপথ আশ্রয় করিত। আর এক শ্রেণীর নগর গড়িয়া উঠিত একান্তই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বৃহত্তর শিল্পের প্রয়োজনে, যে-সব শিল্প প্রধানত বৃহত্তর ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত অন্তত সেই সব শিল্পের প্রয়োজনে, যেমন নৌ-শিল্প, সমৃদ্ধ বস্ত্রশিল্প ইত্যাদি। এই সব ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র প্রশস্ত স্থলপথ বা জলপথ বা উভয়ই আশ্রয় না করিয়া গড়িতেই পারে না; এবং শুধু তাহাই নয়, সাধারণত দুইপথের সঙ্গম স্থলেই এই সব ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্রের অবস্থিতি দেখা যায়। দুই পথ উভয়ই স্থলপথ বা উভয়ই জলপথ হইতে পারে; একটি স্থলপথ অপরটি জলপথ হইতে পারে; আবার সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র হইলে একটি স্থল বা জলপথ, অপরটি সমুদ্রপথ হইতে পারে। তবে, সব নগরই যে এক একটি পৃথক পৃথক কারণে গড়িয়া উঠে তাহা নয়; বরং প্রাচীন বাংলায় দেখা যায় একাধিক কারণে এক একটি নগরের পত্তন হইয়াছিল। শাসনাধিষ্ঠান বা রাজধানী বা বিজয়স্কন্ধাবার একই সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যকেন্দ্র হওয়াও বিচিত্র নয়। প্রাচীন বাংলায়ও তাহা হইয়াছিল। সদ্যকথিত প্রয়োজন ছাড়া অন্য প্রয়োজনেও কোনো কোনো নগর গড়িয়া উঠে; যেমন, এক একটি স্থানের এক একটি বিশেষ তীর্থমহিমা থাকে, এবং শুধু বিশেষ তিথি-পর্ব উপলক্ষে নয়, সম্বৎসর ধরিয়াই তীর্থপুণ্য কামনায় বহুলোক সেখানে যাতায়াত করে। এই সব তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করিয়া বহু লোকের বসতি প্রতিষ্ঠিত হয়, শিল্প ও ব্যবসাকর্ম বিস্তৃতি লাভ করে এবং ধীরে ধীরে নগর গড়িয়া উঠে, এবং

পরে হয়তো প্রয়োজন হইলে শাসনাধিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব তীর্থকেন্দ্রে বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্রও সময় সময় গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়, বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। বৃহৎ বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সাধারণত পত্তন হইত গ্রাম ও নগর হইতে একটু দূরে, বিহার ও সংঘগুলি আশ্রয় করিয়া। এগুলি ঠিক নগর নয়, কিন্তু নগরোপম। প্রাচীন বাংলার এই রকম নগরোপম বৌদ্ধ-মহাবিহারের কিছু কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষাকেন্দ্রই হউক আর তীর্থকেন্দ্রই হউক, এগুলিরও আশ্রয় ছিল নদনদী প্রভৃতি জলপ্রবাহ এবং প্রশস্ত যাতায়াত পথ। সমাজতত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায়, যে-প্রয়োজনেই নগর গড়িয়া উঠুক না কেন, প্রধানত তাহাদের অর্থনৈতিক নির্ভর বৃহৎশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য; এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি-অবনতির উপরই নগর-সভ্যতার উন্নতি-অবনতি অনেকাংশে নির্ভর করে, যেমন কৃষির উন্নতি-অবনতির উপর নির্ভর করে গ্রামের উন্নতি-অবনতি।

প্রধানত কৃষিনির্ভর গ্রাম্য-সভ্যতা এবং প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্যনির্ভর নগর-সভ্যতা এ দুয়ের আকৃতি শুধু নয়, প্রকৃতিও বিভিন্ন। গ্রামে যাঁহাদের বাস করিতে হইত, তাঁহারা সাধারণত কৃষিনির্ভর ভূম্যধিকারী, মহত্তর, কুটুম্ব, কৃষক বা ক্ষেত্রকর, সমাজ-শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক, এবং কিছু কিছু কৃষি ও গৃহস্থ কর্মসম্পৃক্ত শিল্পী। ইঁহাদের জীবনের কামনা-বাসনা, ভাবনা-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি সমস্তই কৃষিকর্ম এবং গ্রাম্য গার্হস্থ্য ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিত। নগরে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা ক্ষুদ্র বৃহৎ সামন্ত, ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজকর্মচারী, শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, শিল্পী, বণিক ইত্যাদি, এবং ইঁহাদেরই অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে আশ্রয় করিয়া, উপলক্ষ করিয়া স্থায়ী অস্থায়ী অন্যান্য বহুতর লোক; শুধু ইঁহারাই নন্, ইঁহাদের দৈনন্দিন গার্হস্থ্য প্রয়োজন এবং অন্যান্য আরও বহুতর প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বহুতর সমাজ-শ্রমিক। গ্রামে যে-সব কৃষি ও শিল্পদ্রব্য ইত্যাদি উৎপন্ন হইত তাহাদের ক্রয়-বিক্রয়কেন্দ্র গ্রাম হইতে দূরে, নগরে-বন্দরে; কাজেই উৎপাদিত ধনের বণ্টনকেন্দ্র গ্রামে নয়। শাসনকেন্দ্রও নগরে, বাণিজ্যকেন্দ্রও তাহাই। কাজেই সমাজিক ধনের বৃহত্তর গতি-কেন্দ্রই হইতেছে নগর; বণ্টন-ব্যবস্থাও প্রায় সবটাই নগরে। এই ব্যবস্থায় জাগতিক সুখ-সুবিধা যাহা কিছু তাহাও বেশি ভোগ করিত নগরগুলিই; বিশেষত শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য যতদিন ধনাগমের প্রথম ও প্রধান উপায় ততদিন তো নগরগুলিই দেশের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল। অবশ্য, সমাজ যে পরিমাণে কৃষিনির্ভর সেই পরিমাণে গ্রাম-গুলিও প্রাধান্য লাভ করে; প্রাচীন বাংলায়ও তাহা হইয়াছিল; যে-সব প্রমাণ বিদ্যমান তাহা হইতে এই অনুমান করা চলে। তাহা ছাড়া, ইহাই সমাজ-বিবর্তনের গতি-প্রকৃতির ধারা।

এইসব কারণেই প্রাচীন বাংলার সমাজ-বিন্যাসের পূর্ণতর পরিচয় পাইতে হইলে গ্রাম ও নগর-বিন্যাস সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সমস্ত তথ্যই জানা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতন এ-বিষয়েও যথেষ্ট তথ্য-সাক্ষ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত

নাই। যাহা আছে তাহার মধ্যে লিপিগুলিই প্রধান এবং প্রামাণিক; কিছু কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ সমসাময়িক সাহিত্যগ্রন্থাদি হইতেও পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, ধনসম্বল অধ্যায়ে ও সমাজ-বিন্যাস খণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ে যে-সব তথ্যের আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে যুক্তিসিদ্ধ কিছু কিছু অনুমানও করা চলে। গ্রাম ও নগর সম্বন্ধে অনেক কথাই প্রসঙ্গক্রমে এই সব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে; এই অধ্যায়ে সে-সবের পুনরাবৃত্তি না করিয়া মোটামুটি ভাবে গ্রাম ও নগরের সংস্থান, কিছু কিছু গ্রাম-নগরের বিবরণ, গ্রাম ও নগরের সম্বন্ধ, গ্রাম্য ও নাগর সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে।[১]

২

বাংলার লিপিগুলিতে রাজসরকার হইতে বিক্রীত বা দত্ত ভূমিগুলির বিবরণ ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলির বিবরণ যে-ভাবে পাইতেছি তাহা হইতে বাংলার গ্রামের সংস্থান ও সংগঠন সম্বন্ধে কতকগুলি সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারা যায়। মহাস্থান লিপি (খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতক, আনুমানিক) এবং চন্দ্রবর্মার শুশুনিয়া লিপির (খ্রীষ্টোত্তর চতুর্থ শতক) কথা ছাড়িয়া দিয়া পঞ্চম শতক হইতেই আলোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই শতকের সাত আটখানা লিপির প্রত্যেকটিতেই দেখিতেছি বাস্তুভূমির চেয়ে খিলভূমির চাহিদা অনেক বেশি, এবং খিলভূমি যে চাষের জন্যই দান-বিক্রয় হইতেছে এ-সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই; পরবর্তী লিপিগুলির সাক্ষ্যও তাহাই। বস্তুত, আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত সমস্ত সাক্ষ্যেই দেখিতেছি কৃষিযোগ্য এবং কৃষিভূমির উপরই গ্রাম্য সমাজের নির্ভর, এবং তাহার চাহিদাই উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। এমন কি, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকের মহাস্থান লিপিতে যে-ধান্যকে দেখিতেছি লোকের প্রাণধারণের প্রধান উপায় সেই ধান্যও তো স্থানীয় অর্থাৎ এই দেশেরই কৃষিক্ষেত্রলব্ধ সম্পদ বলিয়া মনে না করিবার কোনো কারণ নাই। লিপিগুলির বিশ্লেষণে স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, এই সব খণ্ড খণ্ড কৃষিক্ষেত্র সমস্তই একে অন্যের সঙ্গে সংলগ্ন, এক খিলক্ষেত্রের সীমা আর এক ক্ষেত্রের সীমার একেবারে গাত্রলগ্ন; বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রভূমি প্রায় নাই বলিলেই চলে। অনেক দৃষ্টান্ত এমনও আহরণ করা যায়, যেখানে একই ব্যক্তি যে-পরিমাণ ক্ষেত্রভূমি চাহিতেছেন তাহা এক গ্রামে পাওয়া যাইতেছে না, বিভিন্ন গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিতে হইতেছে। আবার, নূতন গ্রামের পত্তন যেখানে হইতেছে সেখানে সমস্ত বাস্তু ও ক্ষেত্রভূমি একত্র নেওয়া হইতেছে, বিচ্ছিন্নভাবে নয়।

গ্রাম ও গ্রামের সংস্থান

কয়েকটি দৃষ্টান্ত আহরণ করা যাইতে পারে। পঞ্চম শতকের পাহাড়পুর পট্টোলীতে দেখিতেছি, এক ব্রাহ্মণদম্পতি ১ কুল্যবাপ ২১/২ দ্রোণবাপ ক্ষেত্রভূমি ক্রয় করিতেছেন তিনটি বিভিন্ন গ্রাম হইতে। এই শতকেরই বৈগ্রাম লিপিতে দেখা যাইতেছে, ভোয়িল নামে

---

১ [illegible] এবং ইতিপূর্বে উল্লিখিত অন্যান্য সাক্ষ্যের পাঠনির্দেশ দেওয়া হইতেছে না।

জনৈক গৃহস্থ বায়িগ্রামের ত্রিবৃতা নামক পাড়ায় (?) ৩ কুল্যবাপ খিলক্ষেত্র কিনিয়াছিলেন এবং এক দ্রোণবাপ বাস্তুভূমি কিনিয়াছিলেন শ্রীগোহালী পাড়ায় (?) ; ভোয়িলের সহোদর ভ্রাতা ভাস্করও একই সঙ্গে কিছু বাস্তুভূমি কিনিয়াছিলেন শেষোক্ত গ্রামে। স্পষ্টতই বোঝা যাইতেছে শ্রীগোহালীতে খিলভূমি সহজলভ্য আর ছিল না। ত্রিবৃতা পাড়ায় যে ভূমিখণ্ড কিনিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, ঐ ভূমি হইতে রাজার কোনও আয় এ-যাবৎ হইতেছিল না, অর্থাৎ ভূমিখণ্ডটি পতিত্ পড়িয়াছিল। ষষ্ঠ শতকের গুণাইঘর পট্টোলীতে একসঙ্গে অনেকগুলি খবর পাওয়া যাইতেছে। মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে শ্রীমহারাজ বৈন্যগুপ্ত উত্তর মণ্ডলের অন্তর্গত কন্তেড়দক গ্রামে মহাযানিক অবৈবর্তিক ভিক্ষু সংঘকে পাঁচটি পৃথক পৃথক ভূখণ্ডে ১১ পাটক কর্ষণযোগ্য অথচ অকৃষ্ট ভূমিদান করিয়াছিলেন। প্রথম ভূখণ্ডের সীমায় পূর্বদিকে গুণিকাগ্রহার গ্রাম এবং বিষ্ণুবর্ধকির (?) ক্ষেত্র, দক্ষিণে মৃদুবিলাল (?) নামক জনৈক গৃহস্থের ক্ষেত্র এবং রাজবিহারের ক্ষেত্র, পশ্চিমে সুরীনশীর-পূর্ণকের ক্ষেত্র ; উত্তরে দোষীভোগ পুষ্করিণী...এবং বপ্পিয়ক ও আদিত্যবন্ধুর ক্ষেত্রসীমা। দ্বিতীয় ভূখণ্ডের সীমায় পূর্বদিকে গুণিকাগ্রহার গ্রাম, দক্ষিণে পক্কবিললের ক্ষেত্র, পশ্চিমে রাজবিহার, উত্তরে বৈদ্যনাম গৃহস্থের ক্ষেত্র। তৃতীয় ভূখণ্ডের সীমায় পূর্বদিকে জনৈক গৃহস্থের ক্ষেত্রভূমি, দক্ষিণে আর একজন গৃহস্থের ক্ষেত্রসীমা ; পশ্চিমে জোলারির ক্ষেত্রসীমা ; উত্তরে নগিজোদকের ক্ষেত্রসীমা। চতুর্থ ভূমিখণ্ডের সীমায়, পূর্বে বুদ্ধকের ক্ষেত্রসীমা, দক্ষিণে কলকের ক্ষেত্রসীমা ; পশ্চিমে সূর্যের ক্ষেত্রসীমা, উত্তরে মহীপালের ক্ষেত্রসীমা। পঞ্চম ভূমিখণ্ডের পূর্বসীমায় খন্দবিদুগ্গুরিকের ক্ষেত্র, দক্ষিণে মণিভদ্রের ক্ষেত্র, পশ্চিমে যজ্ঞরাতের ক্ষেত্র, উত্তরে নাদভদক গ্রাম। সপ্তম শতকে জয়নাগের বপ্যঘোষবাটপট্টোলী দ্বারা বপ্যঘোষবাট গ্রামখানা ব্রাহ্মণ ভট্ট বীরস্বামীকে দান করা হইয়াছিল। এই গ্রামের পশ্চিম সীমায় কুক্কুট গ্রামের ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত ক্ষেত্রভূমির সীমা ; উত্তরে নদীর খাত্ ; পূর্বে একই নদীর খাত্ এবং এই খাত্ হইতে আরম্ভ করিয়া আমলপস্তিক গ্রামের পশ্চিম সীমা স্পর্শ করিয়া যে সর্ষপযানক একেবারে চলিয়া গিয়াছে ভট্ট উন্মীলনস্বামীর ক্ষেত্রভূমি পর্যন্ত ; সেইখান হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে সোজা ভরাণিস্বামীর ক্ষেত্র পর্যন্ত এবং সেখান হইতে সোজা লম্ববান হইয়া ভট্ট উন্মীলনস্বামীর ক্ষেত্রসীমায় অবস্থিত বখটস্মালিকার পুষ্করিণী ভেদ করিয়া কুক্কুট গ্রামের ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত ভূমিসীমা পর্যন্ত বিলম্বিত। এই শতকেরই ত্রিপুরার লোকনাথ পট্টোলীতে দেখিতেছি জনৈক ব্রাহ্মণ মহাসামন্ত প্রদোষশর্মা দুই শতাধিক ব্রাহ্মণের বসবাসের জন্য সুব্বুঙ্গ বিষয়ের অরণ্যময় প্রদেশে বাস্তু ও ক্ষেত্রভূমি রাজার নিকট হইতে দানস্বরূপ গ্রহণ করিতেছেন। এক্ষেত্রে স্পষ্টতই বনভূমি পরিষ্কার করিয়া নূতন গ্রামের পত্তন হইতেছে এ-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত লিপি প্রমাণ অপর্যাপ্ত, এবং সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া—শ্রীহট্ট হইতে মেদিনীপুর, এবং বরেন্দ্র হইতে খাড়ীমণ্ডল—এই সব লিপির ব্যাপ্তি। যে সব ক্ষেত্রভূমি, বাস্তুভূমি এবং গ্রামের বর্ণনা এই

লিপিগুলিতে পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যাইতেছে, ক্ষেত্রভূমি ক্ষেত্রভূমির সঙ্গে, এবং বাস্তুভূমি বাস্তুভূমির সঙ্গে একেবারে সংলগ্ন, এবং কোথাও কোথাও গ্রামও গ্রামের সংলগ্ন।

কিন্তু দৃষ্টান্ত উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত হইতে দুইটি তথ্য পরিষ্কার। প্রথমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তু ও কৃষিক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে, সর্বপ্রকার ভূমির চাহিদা বাড়িয়াছে, বন-অরণ্যভূমি পরিষ্কার করিয়া নূতন গ্রামের পত্তন হইয়াছে, পতিত্ অথচ কর্ষণযোগ্য ভূমি কর্ষণাধীন করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, বাস্তু ও ক্ষেত্রভূমি লইয়া প্রত্যেকটি গ্রাম পৃথক অথচ ঘনসন্নিবিষ্ট, দৃঢ়সংবদ্ধ, অর্থাৎ গ্রামান্তর্গত গৃহস্থবাড়ীগুলি এবং কৃষিক্ষেত্রখণ্ডগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নয়। তাহা না হইবার কারণও আছে। যে ভূমি-নির্ভর সমাজের জীবিকা প্রধানত শুধু পশুপালন এবং পশুচারণ, সেখানে চারণভূমি যেমন দেখা যায় দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত তেমনই বাস্তুও থাকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন। কিন্তু একান্ত ভাবে কৃষিনির্ভর গ্রামে তাহা হইতে পারে না, বরং প্রবণতা দেখা যায় ঠিক তাহার বিপরীত দিকে। তাহা ছাড়া, কৃষিজীবী সমাজে নূতন গ্রামের যখন পত্তন হয়, তখন প্রথমেই বৃহৎ বসতি ও ক্ষেত্রভূমির বিস্তার দেখা যায় না। কয়েকটি গৃহস্থ বাড়ী ও তাহাদের প্রয়োজন মত ক্ষেত্রভূমি লইয়া গ্রামের পত্তন হয়; তাহার পর গ্রামের লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই কয়েকটি বাড়ী ও ক্ষেত্রভূমিকে কেন্দ্র করিয়া দুয়েরই ক্রমবিস্তার ঘটিতে থাকে। লিপিসংবদ্ধ সংবাদ একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে প্রাচীন বাংলার গ্রামগুলির এই গঠন প্রকৃতি ধরিতে পারা কঠিন নয়। তাহা ছাড়া, গ্রামগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট ও দৃঢ়সংবদ্ধ হইবার অন্য কারণও আছে। ভয়ভীতি, নানাপ্রকারের বিপদ-উৎপাত প্রভৃতি হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেও গ্রামবাসীরা ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া বাস করিত, এবং সাধারণত এক এক বৃত্তি আশ্রয় করিয়া সমশ্রেণীর লোকদের লইয়া এক একটি পাড়া গড়িয়া উঠিত। এই ধরণের পাড়া ও গ্রামের গঠন প্রাচীন কৌমসমাজেরই দান।

প্রাচীন লিপিমালায় অসংখ্য গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে; সব গ্রামের আয়তন ও লোক-সংখ্যা সমান ছিল না, ইহাতো সহজেই অনুমেয়; প্রকৃতিও একপ্রকার ছিল না, এরূপ অনুমানেও বাধা নাই। ছোট ছোট গ্রাম বা গ্রামাংশের নাম ছিল পাটক (বা পাড়া)। বৈগ্রাম পট্টোলীতে তো স্পষ্টই দেখিতেছি, বায়িগ্রামের অন্তত দুইটি ভাগ ছিল, ত্রিবৃতা ও শ্রীগোহালী, যদিও ইহাদের পাটক বলা হইতেছে না। কিন্তু ষষ্ঠ শতকের ৫নং দামোদরপুর পট্টোলীতে পরিষ্কার স্বচ্ছন্দ পাটক এবং পুরাণ-বৃন্দিকহরি অন্তর্গত আর একটি পাটকের উল্লেখ দেখিতেছি। মল্লসারুল লিপিতে বাটক নামে একটি জনপদ বিভাগের নাম পাওয়া যাইতেছে, যেমন, নির্বৃত-বাটক, কপিস্থ-বাটক, শাল্মলী-বাটক, মধু-বাটক ইত্যাদি। এই বাটক ও পাটক সমার্থক, এবং একই শব্দ বলিয়া মনে হইতেছে। এই লিপিরই খণ্ডজোটিকা বোধ হয় কোনো জোটিকা বা খাড়ীকা তীরবর্তী গ্রাম। যাহা হউক, এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত এই পাটক বিভাগ বিদ্যমান। সে-সব গ্রামের অবস্থিতি প্রশস্ত

জল ও স্থলপথের উপর, বাস্তুক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্র যেখানে সুলভ ও সুপ্রচুর, যে-সব গ্রামে শিল্প-বাণিজ্যের সুযোগ ও প্রচলন বেশি, কিংবা যে-সব গ্রামে শাসনকার্য পরিচালনার কোনো কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত থাকিত, শিক্ষা, সংস্কৃতি বা ধর্মকর্মের কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত সেই সব গ্রাম সম্ভোক্ত এক বা একাধিক কারণে আয়তনে, লোকসংখ্যায় এবং মর্যাদায় অন্যান্য গ্রামাপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বলাভ করিত, সন্দেহ নাই। এই রকম দুই চারিটি বৃহৎ এবং মর্যাদা সম্পন্ন গ্রামের খবর লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যে পাওয়া যায়; পরে তাহাদের কথা বলিতেছি। আকৃতি ও প্রকৃতির এই পার্থক্য সত্ত্বেও প্রত্যেক গ্রামই কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে এক প্রকার; যেমন, প্রত্যেক গ্রামই কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিভক্ত। বাস্তুভূমি ও ক্ষেত্রভূমি দুই প্রধান অঙ্গ; ইহা ছাড়া প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই উষরভূমি, মালভূমি, গর্তভূমি, তলভূমি, গোচরভূমি, বাটক-বাট, গোপথ-গোবাট-গোমার্গভূমি ইত্যাদির উল্লেখ পাইতেছি—একেবারে পঞ্চম হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত। তাহা ছাড়া খাল, বিল, খাটিকা, খাটা, পুষ্করিণী, নদী, নদীর খাত, গঙ্গিনিকা ইত্যাদির উল্লেখ তো আছেই। গোচর বা গোচারণভূমি সর্বদাই গ্রামের ক্ষেত্রভূমির প্রান্তসীমায় অথবা একেবারে এক পাশে, এবং সেইখান হইতে গ্রামের সীমা ঘেঁষিয়া গ্রামের ভিতর পর্যন্ত গোবাট-গোমার্গ-গোপথ। কোনো কোনো গ্রামে হট্ট, হট্টীয়গৃহ, আপণ ইত্যাদির উল্লেখ পাইতেছি; নানা দেবতার মন্দির, দেবকুল, জৈন ও বৌদ্ধ বিহার ইত্যাদির উল্লেখও আছে। সব গ্রামে হাট, বাজার, মন্দির, বিহার ইত্যাদি থাকিত না; লিপিতেও তেমন উল্লেখ নাই, যে-সব গ্রামে ছিল সে-সব ক্ষেত্রেই উল্লেখ পাইতেছি মাত্র। কোনো কোনো গ্রামে বনজঙ্গল, ঝাড়, বড় বড় গাছ ইত্যাদিও ছিল (সবন, সঝাটবিটপ ইত্যাদি); লিপিতে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। এই সব বনজঙ্গল হইতে লোকে জ্বালানি কাঠ, ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য বাঁশ, খুঁটি ইত্যাদি সংগ্রহ করিত। বিক্রীত ও দত্তভূমির শ্রেণী বিভাগের যে পুংখানুপুংখ বিবরণ লিপিগুলিতে পাওয়া যায় তাহাতে এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, পঞ্চম শতকের আগেই বাংলার গ্রাম্য কৃষিনির্ভর সমাজ সুশৃঙ্খল সুবিন্যস্ত ভাবে সমস্ত অধিগম্য ও প্রয়োজনীয় ভূমিকে সামাজিক স্বার্থসাধনের বিষয়ীভূত করিয়াছিল।

গ্রামগুলির আপেক্ষিক আয়তন সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত সেন-আমলের লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। বল্লালসেনের নৈহাটি লিপিতে দেখি, বাল্লহিট্ঠা গ্রামের আয়তন ৭ ভূপাটক ৭ দ্রোণ ১ আঢক ৩৪ উন্মান এবং ৩ কাক (বাস্তু, ক্ষেত্র, পতিত্ ভূমি এবং খাল সহ), এবং বার্ষিক উৎপত্তিক ৫০০ কপর্দকপুরাণ। এই গ্রাম বর্ধমানভুক্তির উত্তররাঢ় মণ্ডলের স্বল্পদক্ষিণবীথীর অন্তর্গত। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর লিপিতে দেখিতেছি, একই বর্ধমানভুক্তির পশ্চিম খাটিকার অন্তর্ভুক্ত বেতড্ডচতুরকের অন্তর্গত বিড্ডারশাসনগ্রামের আয়তন (অরণ্য, জল, স্থল, গর্তভূমি, উষরভূমি, ইত্যাদি সহ) ৬০ ভূদ্রোণ ১৭ উন্মান; দ্রোণ প্রতি ১৫ পুরাণ হিসাবে বার্ষিক উৎপত্তিক ৯০০ পুরাণ। এই রাজারই তর্পণদীঘি লিপিতে দেখিতেছি,

বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেলহিষ্টী গ্রামের আয়তন মাত্র ১২০ আঢ়াবাপ (আঢক) ৫ উন্মান; বার্ষিক উৎপত্তিক মাত্র ১৫০ কপর্দক পুরাণ। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম তিন বিভিন্ন আয়তনের। পাল ও সেন আমলের, এমন কি আগেকার পর্বের লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যাইবে, অধিকাংশ গ্রামই কোনও নদনদী, খাল, বিল্ল, খাটীকা, খাড়ীকা প্রভৃতির তীরে অবস্থিত; অধিকাংশ গ্রামে ঘাট (সঘট্ট), পুষ্করিণী ইত্যাদিও দেখা যায়। কোটালিপাড়ার একটি পট্টোলীতে গ্রামের প্রান্তে বলদের গাড়ীর রাস্তাও একটি ভূমির সীমারূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রাম্যসমাজ যে কৃষিপ্রধান-সমাজ তাহা তো বারবারই বলিয়াছি। কিন্তু ইহার অর্থ এ নয় যে গ্রামে শিল্পীদের বাস ছিল না। বাঁশ ও বেতের শিল্প, কাষ্ঠশিল্প, মৃৎশিল্প, কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্প, লৌহশিল্প ইত্যাদির কেন্দ্র তো গ্রামেই ছিল, এরূপ অনুমান সহজেই করা যায়। কৃষিকর্মের প্রয়োজনীয় বাঁশ ও বেতের নানাপ্রকার পাত্র ও ভাণ্ড, ঘরবাড়ী ও নৌকা, মাটির হাঁড়িভাণ্ড প্রভৃতি, দা'-কুড়াল-কোদাল, লাঙ্গলের ফলা, খন্তা ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য কৃষিযন্ত্রাদি ইত্যাদির প্রয়োজন তো গ্রামেই ছিল বেশি। কার্পাস ফল ও বীচি, তাঁত, তুলা, তুলাধুনা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় যে গ্রামের লোকদেরই বেশি তাহার ইঙ্গিত পাইতেছি বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে, চর্যাগীতিগুলিতে এবং সদুক্তিকর্ণামৃতগ্রন্থের দু'একটি শ্লোকে। শেষোক্ত গ্রন্থের একটি শ্লোকে কবি শুভাংক বলিতেছেন, নির্ধন শ্রোত্রিয়গণের ঝটিকাবিহত কুটীর প্রাঙ্গণ কার্পাস বীজ দ্বারা আকীর্ণ থাকিত। সুতাকাটা দরিদ্র ব্রাহ্মণ-গৃহস্থবাড়ীর মেয়েদেরও দৈনন্দিন কর্ম ছিল; কাপড় বুনিতেন তন্তুবায়-কুবিন্দকেরা, যুঙ্গি বা যুগীরা। কিন্তু এই সব শিল্প ছাড়া কোনো কোনো গ্রামে দুই একটি সমৃদ্ধতর শিল্পও প্রচলিত ছিল। শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের লিপিতে দেখিতেছি, এক কাংসকার (বা কাঁসারী) গোবিন্দ, এক নাবিক জ্যোজো এবং এক দন্তকার (হাতীর দাঁতের শিল্পী) রাজবিগা নিজ নিজ গ্রামে বসিয়াই তাঁহাদের স্বীয় বৃত্তি অভ্যাস করিতেন। কাংসকার গোবিন্দ বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন বলিয়া মনে হয়; তাঁহার পাঁচখানা বাড়ী ছিল (অথবা, বাড়ীতে পাঁচখানা ঘর ছিল)। নাবিক জ্যোজ্জেরও ছিল দুইখানা বাড়ী (ঘর ?); অথচ অন্যান্য সকলেরই প্রায় দেখিতেছি এক একখানা বাড়ী (ঘর ?)। দুই চারিজন ছোটখাট ব্যবসায়ীও যে গ্রামে বাস করিতেন না তাহা নয়; পাল-সম্রাট মহারাজাধিরাজ মহীপালের রাজত্বের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে যে দুই বণিক যথাক্রমে একটি নারায়ণ ও একটি গণেশ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই দুইজনই ছিলেন ত্রিপুরা জেলার বিলকীন্দক-বিলিকন্দক গ্রামবাসী। ষষ্ঠ শতকের কোটালিপাড়ার দুইটি পট্টোলীতে উল্লিখিত ভূমিসীমা প্রসঙ্গে যে "নৌদণ্ডক", "ঘাট" এবং "নাবাতাক্ষেণী"র উল্লেখ পাইতেছি তাহাতে মনে হয়, কোনো কোনো গ্রাম সমৃদ্ধ নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্রও ছিল।

গ্রামে কাহারা প্রধানত বাস করিতেন তাহাও অনুমান করা কঠিন নয়;

লিপিগুলিতে তাহার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়—একেবারে পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত। তাহা ছাড়া, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গ্রামবাসী ছিলেন সাধারণত ব্রাহ্মণেরা, ভূমিবান্ মহামহত্তর, মহত্তর, কুটুম্বরা; ক্ষেত্রকরেরা, বারজীবিরা, ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকেরা; তন্তুবায়-কুবিন্দক, কর্মকার, কুম্ভকার, কাংসকার, মালাকার, চিত্রকার, তৈলকার, সূত্রধার প্রভৃতি শিল্পীরা; তৌলিক, মোদক, তাম্বুলী, শৌণ্ডিক, ধীবর-জালিক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা; গোপ, নাপিত, রজক, আভীর, নট-নর্তক প্রভৃতি সমাজ-সেবকেরা; বরুড় (বাউড়ী), চর্মকার, ঘট্টজীবি (পাট্‌নী), ডোলবাহী (ডুলে, ডুলিয়া), ব্যাধ, হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগ্‌দী ?), বেদিয়া (বেদে), মাংসচ্ছেদ, চর্মকার, চণ্ডাল, কোল, ভীল্ল, শবর, পুলিন্দ, মেদ, পৌণ্ড্রক (পোদ ?) প্রভৃতি অন্ত্যজ ও আদিবাসি পর্যায়ের লোকেরা। শেষোক্ত পর্যায়ের লোকেরা সাধারণত বাস করিতেন গ্রামের এক প্রান্তে, আজও যেমন করিয়া থাকেন। ভাটেরা গ্রামের পূর্বোক্ত লিপিটিতে গ্রামবাসীদের মধ্যে পাইতেছি কয়েকজন গোপ, অন্তত একজন রজক এবং একজন নাপিতকে। কোনো কোনো গ্রামে সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠীরাও বাস করিতেন বলিয়া মনে হইতেছে, যেমন দক্ষিণরাঢ় দেশের ভূরিসৃষ্টি বা বর্তমান ভুরসুট্ গ্রামে। এই গ্রামটি ব্রাহ্মণদের একটি বড় কেন্দ্রস্থল তো ছিলই, তাহা ছাড়া বহু সংখ্যক শ্রেষ্ঠীজনের আশ্রয়ও ছিল। শ্রীধরাচার্যের ন্যায়কন্দলী গ্রন্থে (৯৯১-৯২) আছে,

আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাম।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ॥

৩

লিপিগুলিতে অসংখ্য গ্রামের উল্লেখ পাইতেছি, একথা আগেই বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আয়তনে ও মর্যাদায় গুরুত্বসম্পন্ন কয়েকটি গ্রামের লিপি-প্রদত্ত বিবরণ উল্লেখ করিলে প্রাচীন বাংলার গ্রামগুলির সংস্থান ও বিন্যাস সম্বন্ধে ধারণা একটু পরিষ্কার হইতে পারে।

কয়েকটি প্রধান প্রধান গ্রামের বিবরণ

পশ্চিম-বাংলার গ্রাম লইয়াই আরম্ভ করা যাক্। ঔদুম্বরিক বিষয়ের বপ্যঘোষবাট গ্রামের কথা আগেই বলিয়াছি। মল্লসারুল লিপিতে কয়েকটি বাটক-পাটক এবং অগ্রহার গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। নয়পালের ইর্দা লিপিতে বৃহৎ-ছত্তিবন্না নামে এক গ্রামের উল্লেখ আছে; এই গ্রাম ছিল বর্দ্ধমান ভুক্তির দণ্ডভুক্তিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। বৃহৎ-ছত্তিবন্না নাম দেখিয়া মনে হয়, ক্ষুদ্রছত্তিবন্না গ্রামও একটি ছিল। ছত্তিবন্না বাঁকুড়া জেলার চণ্ডীদাসস্মৃতি-বিজড়িত ছাতনা কিংবা সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী ছাতনা গ্রাম হওয়া অসম্ভব নয়। ভোজবর্মার বেলাব লিপিতে উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত সিদ্ধল গ্রামের উল্লেখ আছে; ভা ভবদেবের প্রশস্তিতে এই গ্রামকে আর্যাবর্তের ভূষণ, সমস্ত গ্রামের অগ্রগণ্য এবং রাঢ়লক্ষ্মী

অলঙ্কার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাচীন সিদ্ধল গ্রাম এবং বর্তমান বীরভূম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত সিদ্ধল গ্রাম এক এবং অভিন্ন, এ-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পূর্বোক্ত লিপিতেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, সাবর্ণগোত্রীয় বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদের আবাসস্থল বলিয়া এই গ্রামের একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। উত্তররাঢ়মণ্ডলের স্বল্পদক্ষিণবীথীর অন্তর্গত বাল্লহিট্ঠা নামে আর একটি গ্রামের ভৌগোলিক বিন্যাসের একটু বিস্তৃততর খবর পাওয়া যাইতেছে বল্লালসেনের নৈহাটি লিপিতে। বাল্লহিট্ঠা বর্তমান নৈহাটির ৬ মাইল পশ্চিমে বালুটিয়া গ্রাম। এই বাল্লহিট্ঠা গ্রামের চতুঃসীমা এই ভাবে দেওয়া হইয়াছেঃ (১) খাণ্ডয়িল্লা (বর্তমান খাড়ুলিয়া) গ্রামের উত্তর দিক দিয়া যে সিঙ্গটিয়া নদী প্রবহমানা তাহার উত্তরে; নাড়িচা গ্রামের উত্তর দিক দিয়া একই সিঙ্গটিয়া প্রবহমানা, তাহারও উত্তর-পশ্চিমে; (২) অম্বয়িল্লা (বর্তমান অম্বল গ্রাম) গ্রামের পশ্চিম বাহিয়া এই একই নদী প্রবহমানা, তাহার পশ্চিমে; (৩) কুড়ুম্বমার দক্ষিণ সীমালির দক্ষিণে; কুড়ুম্বমার পশ্চিমে পশ্চিমাভিমুখী সীমালিরও দক্ষিণে; আউহাগড্ডিয়ার দক্ষিণ গোপথেরও দক্ষিণে: এই আউহাগড্ডিয়ার উত্তর দিকে আর একটি গোপথ, এই গোপথ হইতে একটি সীমালি সোজা পশ্চিম অভিমুখী হইয়া স্বরকোণা-গড্ডিয়াকীয়ের উত্তর সীমালিতে গিয়া মিশিয়াছে, তাহারও দক্ষিণে; (৪) নাড্ডিনা গ্রামের পূর্ব সীমালির পূর্বে; জলসোথী গ্রামের (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার ঐ নামীয় গ্রাম) পূর্ব গোপথেরও কতকটা পূর্বে; মোলাডণ্ডী (বর্তমান মুড়ুন্দি) গ্রামের পূর্বদিকে সিঙ্গটীয়া নদী পর্যন্ত যে গোপথ তাহারও কথঞ্চিৎ পূর্বদিকে। খাণ্ডয়িল্লা (খাড়ুলিয়া), অম্বয়িল্লা (অম্বলগ্রাম), জেলাসোথী (বর্তমানেও ঐ নাম), মোলাডণ্ডী (মুড়ুন্দি) এবং বাল্লহিট্ঠা (বালুটিয়া) গ্রাম তাহাদের প্রাচীন নামস্মৃতি লইয়া এখনও বিদ্যমান; ইহাদের বর্তমান সংস্থান হইতে প্রাচীন বাংলার গ্রাম-সংস্থানের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর পট্টোলীতে বিড্ডারশাসন নামে আর একটি গ্রামের পরিচয় পাইতেছি; এই গ্রাম বর্দ্ধমানভুক্তির পশ্চিম-খাটিকাভুক্ত বেতড্ডচতুরকের (হাওড়া জেলার বর্তমান বেতড়) অন্তর্গত। বিড্ডারশাসন গ্রামের পূর্বাপর সীমা স্পর্শ করিয়া জাহ্নবী নদী (বর্তমান হুগলী নদী) প্রবহমানা; দক্ষিণে লেংঘদেব মণ্ডপী (শিবলিঙ্গ মন্দির?); পশ্চিমে একটি ডালিম্বক্ষেত্র সীমা; উত্তরে ধর্মনগর সীমা। এই রাজারই শক্তিপুর শাসনে আরও কতকগুলি গ্রামের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। উত্তররাঢ়ের কঙ্কগ্রামভুক্তির (বর্তমান কাঁকজোল অঞ্চল) মধুগিরিমণ্ডলের (বর্তমান মহুয়াগড়ি, কাঁকজোলের ২১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) কুম্ভীনগর-প্রতিবদ্ধ (বর্তমান কুম্ভীর, মহুয়াগড়ি হইতে ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে, বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানায়), দক্ষিণ-বীথীর অন্তর্গত কুমারপুর চতুরক। মোর বা বর্তমান ময়ূরাক্ষী নদীর ৩½ মাইল উত্তরে মৌরেশ্বর থানার অন্তর্গত কুমারপুর গ্রাম এখনও বিদ্যমান। যাহাই হউক, এই চতুরকের অন্তর্গত পাঁচটি পাটকের উল্লেখ শক্তিপুর শাসনে আছে, যথা,

পশ্চিম-বঙ্গ

বারহকোণা, বাল্লিহিটা, নিমা, রাঘবহট্ট এবং ডামরবড়াবন্ধ বিজহারপুর পাটক। বারহকোণা সিউড়ি থানার বারকুণ্ডা (মোর নদীর ২ মাইল উত্তরে), বা মৌরেশ্বর থানার বারণ (মোর নদীর উত্তরে) অথবা মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার পাঁচথুপীর সন্নিকটে বারকোনার সঙ্গে এক এবং অভিন্ন বলিয়া বিভিন্ন পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। নিমা এবং বাল্লিহিটা যথাক্রমে বর্তমান নিমা এবং বলুটি (মৌরেশ্বর থানা) গ্রামের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন বলিয়া প্রস্তাবিত হইয়াছে। বাড়কুণ্ডা, বারণ, নিমা এবং বলুটি প্রত্যেকটি গ্রামই বর্তমানে মোর নদীর উত্তরে; অথচ শক্তিপুর শাসনে ইহারা এই নদীর দক্ষিণে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হইতে পারে ময়ূরাক্ষী-মোর প্রবাহপথ পরিবর্তন করিয়া পুরাতন গ্রাম ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু পুরাতন নামগুলি বিলুপ্ত করিতে পারে নাই; পরে ঐ নামগুলি আশ্রয় করিয়া নূতন গ্রামের পত্তন হইয়াছে। যাহাই হউক, শক্তিপুর শাসনে দেখিতেছি, বারহকোণা, বাল্লিহিটা, নিমা এবং রাঘবহট্ট এই চারিটি গ্রাম একত্র সংলগ্ন, এবং এক সঙ্গে একই চতুঃসীমার মধ্যে উল্লিখিত ও বর্ণিত হইয়াছে। এই চারটি গ্রামের (চতুরকের?) পূর্বদিকে অপরাজোলী (পশ্চিম খাল?) সমেত মালিকুণ্ডা (গ্রামের) ভূমি; দক্ষিণে ব্রহ্মস্থল অন্তর্গত ভাগড়ীখণ্ডের ভূমি; পশ্চিমে অচ্ছমা গোপথ; উত্তরে মোর নদী সীমা। বিজহারপুর পাটকের পশ্চিমে লাঙ্গলজোলী (লাঙ্গল-খাল?), উত্তরে পরজাণ গোপথ; দক্ষিণে বিপ্রবন্ধজোলী; পূর্বে চাকুলিয়া-জোলী। আর একটি গ্রামের উল্লেখ করিয়াই পশ্চিম-বাংলার গ্রাম-বর্ণনা শেষ করা যাইতে পারে। ভূরিসৃষ্টি গ্রামের কথা আগেই বলিয়াছি। কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকেও রাঢ়দেশান্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠিকা নামে সুপ্রসিদ্ধ গ্রামের উল্লেখ আছে (একাদশ শতক)। হুগলী জেলার দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে এই গ্রাম আজও ভূরসুট নামে পরিচিত; সমস্ত মধ্যযুগ ধরিয়া এই গ্রাম ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি বড় কেন্দ্র ছিল। অষ্টাদশ শতকের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায় ভুরসুটের জমিদার নরেন্দ্র রায়ের পুত্র ছিলেন। অন্নদামঙ্গলে আছে:

ভূরিশিতে ভূপতি নরেন্দ্র রায় সুত।
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত ॥

ভারতচন্দ্রের সত্যপীরের কথায়ও এই গ্রামের উল্লেখ আছে। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা এই গ্রামকে ভোসট বলিয়া জানিতেন।

পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ

পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের কয়েকটি গ্রামের একটু পরিচয় এইবার লওয়া যাইতে পারে। ষষ্ঠ শতকের বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর লিপিতে উত্তরমণ্ডলভুক্ত কন্তেড়দক গ্রামের একটু বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। এই গ্রামের ভৌগোলিক সংস্থান আগেই কতকটা উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রামটি মহাযানিক অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘের একটি বড় কেন্দ্র ছিল এবং অন্তত দুইটি বৌদ্ধ-বিহারও ছিল এই গ্রামে। তাহা ছাড়া প্রদ্যুম্নেশ্বরের একটি মন্দিরও ছিল। গ্রামটির অবস্থিতি যে. নিম্নশায়ী জলাভূমিতে এই সম্বন্ধে

লিপিগত সংবাদ কোনো সংশয়ই রাখে না। বিহারটির চতুঃসীমায় নৌযোগ, নৌখাট, নৌযোগখাট, বিলাল (বিল), খাল, এবং হজ্জিকখিলভূমিই তাহার প্রমাণ। নৌযোগ, নৌখাট ইত্যাদির উল্লেখ হইতে মনে হয়, ছোট বড় নৌকা ইত্যাদির বৃহৎ আশ্রয়ও ছিল এই গ্রামে। গঞ্জ বা বন্দর ছিল বলিয়াই হয়তো এই সব নৌযোগ, নৌখাট ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্তমান ত্রিপুরার ভাটি অঞ্চলে তাহা কিছু অসম্ভবও নয়। এই শতকেই ফরিদপুরের কোটালিপাড়া অঞ্চলে কয়েকটি গ্রামের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে গোপচন্দ্র-ধর্মাদিত্য-সমাচারদেবের পট্টোলিগুলিতে। বারকমণ্ডলের একটি গ্রামে বহু ভূমি পতিত্ পড়িয়াছিল ; নিম্নভূমিও ছিল প্রচুর, এবং সেখানে বন্য জন্তুরা চরিয়া বেড়াউত ; সেই ভূমি হইতে রাজকোষে কোনও অর্থাগম হইত না। কাজেই রাজা যখন সেই ভূমি ধর্মকার্যের জন্য বিক্রয় করিলেন তখন তাঁহার অর্থলাভ ও পুণ্যসঞ্চয় দুইই হইল। বিক্রিত ভূমির পূর্বদিকে ছিল একটা পিশাচাধ্যুষিত পর্কটি বা পাঁকুড় গাছ ; দক্ষিণে বিদ্যাধর জ্যোটিকা (বিদ্যাধর খাল) ; পশ্চিমে চন্দ্রবর্মণকোটের একটি কোণ ; উত্তরে গোপেন্দ্রচরক গ্রাম। বারকমণ্ডলের আর একটি গ্রামে বিক্রিত ভূমির চতুঃসীমায় পাইতেছি, পূর্বে হিমসেনের ভূমি ; দক্ষিণে তিনটি ঘাট, এবং অপর একজনের শাসনদত্তভূমি ; পশ্চিমে পূর্বোক্ত তিনটি ঘাটে যাইবার পথ এবং শিলাকুণ্ড ; উত্তরে নাবাতক্ষেণী এবং হিমসেনের ভূমি। নাবাতক্ষেণীর উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয় এই গ্রামেও একটি গঞ্জ বা বন্দর ছিল। এই মণ্ডলেরই আর একটি গ্রামের বিক্রীত ভূমিসীমায় পাইতেছি একটি গোযান চলাচলের পথ, পাঁকুড় গাছ এবং একটি নৌদণ্ডক। তদানীন্তন কোটালিপাড়া অঞ্চলের গ্রামগুলি যে নৌগামী ব্যবসাবাণিজ্যের সমৃদ্ধ কেন্দ্র ছিল, নৌদণ্ডক, নাবাতক্ষেণী, নৌযোগ, নৌখাট প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার তাহার আংশিক প্রমাণ। অষ্টম শতকে ঢাকা অঞ্চলের (ঢাকা সহর হইতে ৩০ মাইল, শীতললক্ষ্যার অদূরে আশ্রফপুর গ্রাম) কয়েকটি গ্রামের পরিচয় পাইতেছি দেবখড়্গের আশ্রফপুর লিপি দুইটিতে। এই অঞ্চলের একটি বা একাধিক গ্রামের বিভিন্ন পাটকে (পাড়ায়) চারিটি বৌদ্ধবিহার ও বিহারিক (ছোট বিহার) ছিল, এবং ইহাদের আচার্য ছিলেন বন্দ্য সংঘমিত্র। সংঘমিত্রের শিষ্যবর্গের মধ্যে শালিবর্দক ছিলেন অন্যতম। বিভিন্ন পাটকের বিভিন্ন কৃষক ও গৃহস্থদের অধিকার হইতে ভূমি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া [ইহাদের মধ্যে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে রাণী শ্রীপ্রভাবতী, শুভংস্থকা নামে একটি মহিলা, বন্দ্য জ্ঞানমতি নামে একজন বৌদ্ধ আচার্য (?) এবং শ্রীউদীর্ণখড়্গ নামে রাজপরিবারের (?) একজন মাননীয় ব্যক্তিও আছেন] পূর্বোক্ত চারিটি বিহার-বিহারিকের অধিকারে দান করা হইয়াছিল, আচার্য সংঘমিত্রের তত্ত্বাবধানে। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মপ্রতিষ্ঠান, গঞ্জ, বন্দর, নৌকাযাতায়াত পথ ইত্যাদি লইয়া ফরিদপুর-ঢাকা-ত্রিপুরার পূর্বোক্ত গ্রামাঞ্চলগুলিতে সমৃদ্ধজনপূর্ণ বসতি ছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়।

ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলের মহন্তাপ্রকাশ-বিষয়ের অন্তর্গত

ক্রৌঞ্চশ্বভ্রগ্রামের সীমা-পরিচয় প্রসঙ্গে এই গ্রাম ও অন্য আরও তিনটি গ্রামের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ক্রৌঞ্চশ্বভ্রগ্রামের 'পশ্চিমে গঙ্গিনিকা, উত্তরে কাদম্বরী অর্থাৎ সরস্বতীর দেউল (দেবকুলিকা) ও খেজুর গাছ। পূর্বোত্তরে রাজপুত্র দেবটকৃত আলি, এই আলি বীজপূরকে (টাবা লেবুর বাগান ?) গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পূর্বদিকে বিকটকৃত আলি, তাহা খাটক-যানিকাতে (খালে) গিয়া প্রবেশ করিয়াছে; তাহার পর জম্বু-যানিকা (যে-খালের দুই ধারে বাতাপী লেবুর গাছ ?) আক্রমণ করিয়া তাহার পাশ দিয়া জম্বুযানক পর্যন্ত গিয়াছে। তথা হইতে নিঃসৃত হইয়া পুণ্যারাম-বিল্বার্দ্ধস্রোতিকা পর্যন্ত গিয়াছে। তথা হইতে নিঃসৃত হইয়া, নলচর্মটের উত্তর সীমা পর্যন্ত গিয়াছে। নলচর্মটের দক্ষিণে নামুণ্ডি-কায়িকা…হইতে খণ্ডমুণ্ডমুখ পর্যন্ত, সেখান হইতে বেদসবিল্বিকা, তাহার পর রোহিতবাটী-পিণ্ডারবিটি-জোটিকা (খাল) সীমা, উক্তারযোটের দক্ষিণ এবং গ্রামবিল্বের দক্ষিণ পর্যন্ত দেবিকা সীমাবিটি ধর্মায়োজোটিকা (খাল)। এই প্রকার মাঢ়াশাল্মলী নামক গ্রাম (তুলনীয়, নিধনপুর লিপির ময়ূরশাল্মলী)। তাহার উত্তরেও গঙ্গিনিকার সীমা; তাহার পূর্বে অর্দ্ধস্রোতিকার সহিত মিলিত হইয়া আম্রযানকোলার্দ্ধ-যানিকা (আম্রকাননবর্তী খাল ?) পর্যন্ত গিয়াছে। তাহার দক্ষিণে কালিকাশ্বভ্র; তথা হইতেও নিঃসৃত হইয়া শ্রীফলাভিষুক পর্যন্ত গিয়াছে; তাহার পশ্চিমে গিয়া বিল্বঙ্গর্দ্ধস্রোতিকার গঙ্গিনিকায় (বর্তমান, গাঙ্গিনা) গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পালিতকের সীমা দক্ষিণে কাণাদ্বীপিকা, পূর্বে কোণ্ঠিয়া স্রোত, উত্তরে গঙ্গিনিকা, পশ্চিমে জেনন্দায়িকা। এই গ্রামের শেষ সীমায় পরকর্মকৃদ্বীপ স্থালীকট-বিষয়ের অধীন আম্রষণ্ডিকা-মণ্ডলের অন্তর্গত গো-পিপ্পলী গ্রামের সীমা—পূর্বে উড্রগ্রামমণ্ডলের পশ্চিমসীমা, দক্ষিণে জোলক, পশ্চিমে বেসানিকা নামক খাটিকা, উত্তরে উড্রগ্রামমণ্ডলের (উড্রগ্রাম কি সেই গ্রাম যে-গ্রামে ওড্র বা ওড়িষ্যাবাসীদের বসতি ছিল বেশি ?) সীমায় অবস্থিত গোপথ।' উপরোক্ত ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল যে দক্ষিণ-বঙ্গের ব্যাঘ্রাধ্যুষিত নিম্নশায়ী বনময় জনপদ এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। সমুদ্রতীরবর্তী নিম্নভূমি বলিয়াই এইসব গ্রামাঞ্চলে এত গঙ্গিনিকা, যানিকা, স্রোত, স্রোতিকা, জোটিকা, খাটিকা, দ্বীপ, দ্বীপিকা প্রভৃতির এত প্রাদুর্ভাব। বিশ্বরূপসেনের একটি লিপিতে বঙ্গের নাব্যভাগে রামসিদ্ধিপাটক নামে একটি গ্রামের উল্লেখ আছে; এই গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে বরাহকুণ্ড, পূর্বে দেওহারের দেবভোগ-সীমা; দক্ষিণে বঙ্গালবড়া নামক গ্রামের ভূমি; পশ্চিমে একটি নদী; উত্তরে একই নদী। এই নাব্যভাগেই বিনয়তিলক নামে আর একটি গ্রাম ছিল; এই গ্রামের পূর্বে সমুদ্র; দক্ষিণে প্রণুল্লীভূমি; পশ্চিমে একটি বাঁধ (জাঙ্গলসীমা); উত্তরে স্বীয় শাসনসীমা। নাব্য জনপদ-ভাগটাই ছিল নৌচলাচল-নির্ভর, আর এই গ্রাম একেবারে ছিল সমুদ্রশায়ী। কেশবসেনের ইদিলপুর লিপিতে বিক্রমপুর ভাগের অন্তর্গত তালপড়া পাটক নামে আর একটি গ্রামের খবর পাওয়া যাইতেছে। এই গ্রামের পূর্বে শত্রকাদ্বি গ্রাম; দক্ষিণে শঙ্করপাশা (পাশা-অন্ত্য গ্রাম-নাম তো বরিশাল-ফরিদপুর অঞ্চলে সুপ্রচুর) এবং গোবিন্দকেলি নামে দুইটি

গ্রাম, পশ্চিমে শংকর গ্রাম, উত্তরে বাগুলীবিত্ত...গ্রাম। বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া লিপিতে পিঞ্জোকাস্টি এবং কন্দর্পশংকর নামে দুইটি গ্রামের উল্লেখ আছে। পিঞ্জোকাস্টি বর্তমান ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগণার পিঞ্জারি গ্রাম। যাহা হউক, পিঞ্জোকাস্টি গ্রামের পূর্বদিকে অঠপাগ গ্রামের বাঁধ (জাঙ্গলভূ) ; দক্ষিণে বারয়ীপড়া (বারুইপাড়া ?) ; পশ্চিমে উঞ্চোকাস্টি গ্রাম ; উত্তরে বীরকাট্টী গ্রামের বাঁধ (কাস্টি, কাট্টি—বর্তমান কাটি ; তুলনীয়, বরিশাল-ফরিদপুর অঞ্চলের ঝালকাটি, কলসকাটি, লক্ষ্মণকাটি ইত্যাদি। এই রাজারই সাহিত্য-পরিষদ লিপিতে বিক্রমপুর ভাগের লাউহণ্ডা চতুরকের অন্তর্গত দেউলহস্তি গ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখিতেছি, এই গ্রামের পূর্ব ও পশ্চিমে রাজহতা নদী। শ্রীমৎ ডোম্মনপালের সুন্দরবন লিপিতে পূর্বখাটিকার অন্তর্গত ধামহিথা নামে একটি গ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় একটু পাইতেছি ; এই গ্রামের বাহিরে বোধ হয় একটি বৌদ্ধবিহার ছিল (রত্নত্রয়বহিঃ)। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া লিপির মাথরণ্ডিয়া নামে আর একটি গ্রামের অবস্থিতি ছিল ব্যাঘ্রতটীতে ; এই গ্রামে একটি বটবৃক্ষ এবং একটি জলপিল্লের (জলময় নিম্নভূমি ?) উল্লেখ আছে। ইহারই সংলগ্ন ছিল আর দুইটি গ্রাম ; শান্তিগোপী এবং মালামঞ্চবাটী। বাংলার পূর্ব-দক্ষিণতম প্রান্তের চাটিগ্রাম আনুমানিক দশম শতক হইতেই একটি সমৃদ্ধ ও মর্যাদাসম্পন্ন গ্রাম ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। তিব্বতী বৌদ্ধপুরাণ মতে, চাটিগ্রাম বৌদ্ধ তান্ত্রিক গুরু তিল-যোগীর জন্মভূমি ছিল (দশম শতক)। এই গ্রামে পণ্ডিত-বিহার নামে সুবৃহৎ একটি বৌদ্ধবিহার ছিল এবং এই বিহারে বসিয়া বৌদ্ধ-আচার্যেরা সমবেত বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করিতেন। এই চাটিগ্রামই পরে মধ্যযুগে পূর্ব-বাংলার বৃহত্তম সামুদ্রিক বাণিজ্যের বন্দর-নগরে পরিণত হইয়াছিল চট্টগ্রাম নাম লইয়া। রাজা গোবিন্দকেশবদেবের ভাটেরা লিপিতে একসঙ্গে ২৮টি গ্রামের উল্লেখ আছে ; ভট্টপাটক গ্রামের শিবমন্দিরের পরিচালনার জন্য এই ২৮টি গ্রামে ২৯৬টি বাড়ী (ঘর ?) এবং ৩৭৫ হল জমি দান করা হইয়াছিল। ভট্টপাটক বর্তমান ভাটেরা গ্রাম, কুলাউড়া-শ্রীহট্ট রেলপথের ধারেই। বাকী ২৮টি গ্রামের নাম প্রায় অবিকৃত ভাবে এখনও ভাটেরার আশেপাশে বিদ্যমান। এই গ্রামগুলিহইতে প্রায় ৯০০ শত বৎসরের পূর্বেকার গ্রাম-বিন্যাসের চেহারা এখনও কতকটা অনুমান করা চলে।

দামোদরপুরে প্রাপ্ত গুপ্ত আমলের একটি লিপিতে (৩ নং) পলাশবৃন্দক নামে একটি স্থানের উল্লেখ আছে ; এই স্থান হইতেই ভূমি বিক্রয়ের রাজকীয় আদেশ নিঃসৃত হইয়াছিল। পলাশবৃন্দক যে একটি গ্রাম এই ইঙ্গিত লিপিতেই পাওয়া যায়। দিনাজপুর সহরের ষোল মাইলের মধ্যে পলাশবাড়ী নামে দুইটি গ্রাম এখনও বিদ্যমান ; পলাশডাঙ্গা নামে আর একটি গ্রামও আছে দিনাজপুর সহরের ১১ মাইল দক্ষিণপূর্বে। এই তিনটি গ্রামই দামোদরপুরের খুব সন্নিকটে। গুপ্ত আমলের পলাশবৃন্দক বোধ হয় খুব বড় গ্রাম ছিল, এবং ইহা যে একাধিক 'পলাশ'-পূর্বনাম গ্রামের সমষ্টি ছিল তাহা

উত্তরবঙ্গ

'বৃন্দক' শব্দের ব্যবহার হইতেও অনুমেয়। রেনেলের নক্সায়ও (১৭৬৪-৭৬) দেখিতেছি পলাশবাড়ী বেশ বড় ও মর্যাদাসম্পন্ন স্থান। এই লিপিতেই চণ্ডগ্রাম নামে আর একটি গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। গুপ্ত আমলের লিপিগুলিতে অনেক গ্রামের উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে স্বচ্ছন্দপাটক, সাতুবনাশ্রমক, হিমবচ্ছিখরাবস্থিত ডোঙ্গাগ্রাম, বায়িগ্রাম (বর্তমান বৈগ্রাম, বগুড়া জেলা), পুরাণবৃন্দিকহরি, পৃষ্ঠিমপোট্টক, গোষাটপুঞ্জক, নিত্বগোহালী, পলাশাট্ট, বট-গোহালী প্রভৃতি গ্রাম উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামগুলি প্রায় সবই দিনাজপুর-রাজসাহী-বগুড়া জেলার অন্তর্গত। বায়িগ্রাম যে একাধিক গ্রামখণ্ডের সমষ্টি ছিল তাহা তো আগেই বলিয়াছি। শ্রীগোহালী এবং ত্রিবৃতা এই গ্রামের অন্তর্গত ছিল। দামোদরপুরের ১৪ মাইল উত্তরে বৃন্দকুড়ি নামে একটি গ্রাম এখনও বিদ্যমান; এই গ্রাম হয়তো পুরাণবৃন্দিকহরির স্মৃতি বহন করিতেছে। নিত্বগোহালী গ্রাম মূল নাগিরট্টমণ্ডলের (অর্থাৎ, মণ্ডল-শাসনাধিষ্ঠানের) সংলগ্ন ছিল, পাহাড়পুর লিপিতেই এইরূপ ইঙ্গিত আছে। পৃষ্ঠিমপোট্টক, গোষাটপুঞ্জক এবং পলাশট্ট গ্রাম ছিল নাগিরট্টমণ্ডলান্তর্গত দক্ষিণাংশকবীথীর অন্তর্গত। বটগোহালী পাহাড়পুরের সংলগ্ন গোয়ালভিটা গ্রাম হওয়া অসম্ভব নয়। মুঙ্গের জেলার নন্দপুর গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিপিতে অম্বিল গ্রামাগ্রহার নামে একটি অগ্রহার গ্রামের উল্লেখ পাইতেছি। এই গ্রামে বিষয়পতি ছত্রমহের অধিষ্ঠান-অধিকরণের অবস্থিতি হইতে গ্রামটির আয়তন ও মর্যাদা অনুমান করা কঠিন নয়। শাসনাধিষ্ঠানরূপে কোনও কোনও গ্রাম যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়া আয়তনে ও গুরুত্বে বাড়িয়া উঠিত এসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। অম্বিলগ্রামাগ্রহারের মত পলাশবৃন্দকও ছিল এই রকম একটি গ্রাম; এই গ্রাম হইতে রাজকীয় শাসনের নির্গতি দেখিয়া এই অনুমান করা চলে যে, পলাশবৃন্দকেও শাসনাধিষ্ঠানের একটি কেন্দ্র ছিল।

প্রথম মহীপালের বাণগড়লিপিতে কোটীবর্ষ-বিষয়ের গোকলিকা-মণ্ডলের অন্তর্গত কুরটপল্লিকা গ্রামের উল্লেখ পাইতেছি। এই গ্রামের একটি অংশের নাম ছিল চুটপল্লিকা (অর্থাৎ ছোটপল্লী বা ছোটপাড়া)। দ্রাবিড়ী চুট শব্দের অর্থই তো ছোট। তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি লিপিতে কোটীবর্ষ-বিষয়ান্তর্গত ব্রাহ্মণীগ্রামমণ্ডল নামে একটি মণ্ডলের উল্লেখ আছে; ব্রাহ্মণীগ্রামই সম্ভবত মণ্ডলের শাসনাধিষ্ঠান ছিল, এবং সেইহেতু ঐ গ্রামকে আশ্রয় করিয়াই মণ্ডলটির নামকরণ হইয়াছিল। বিষমপুর নামক স্থানের দণ্ডভ্রহেশ্বরের মন্দির এই মণ্ডলের অন্তর্গত ছিল। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর লিপিতে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির বরেন্দ্রীর অন্তর্গত কান্তাপুর-আবৃত্তিতে দাপনিয়া পাটক নামে এক গ্রামের উল্লেখ আছে; এই গ্রামের নিকটেই রাবণসরসী নামে একটি দীঘির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই লিপি-প্রদত্ত ভূমির পূর্বে চড়সপালা-পাটকের পশ্চিমসীমা; দক্ষিণে গয়নগরের উত্তরাংশ; পশ্চিমে গুণ্ডীস্থিরা-পাটকের পূর্বাংশ; উত্তরে গুণ্ডী-দাপনিয়ার দক্ষিণাংশ। এই রাজারই তর্পণদীঘি শাসনে বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বেলহিষ্টী

গ্রামের পূর্বসীমায় বৌদ্ধবিহারসীমাজ্ঞাপক একটি বাঁধ; দক্ষিণ সীমায় নিচড়হার পুষ্করিণী; পশ্চিমে নন্দিহরিপাকুণ্ডী গ্রাম ও মোল্লাণ-খাড়ী নামে খাল। কামরূপরাজ জয়পালের সময়ের (একাদশ শতক) সিলিমপুর লিপিতে বালগ্রাম নামে আর একটি গ্রাম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, পুণ্ড্রদেশান্তর্গত এই গ্রাম বরেন্দ্রীর অলঙ্কার স্বরূপ ছিল (বরেন্দ্রীমণ্ডনং গ্রামো) এবং এই গ্রাম ও তর্কারির মধ্যে সকটীনদীর ব্যবধান ছিল (সকটীব্যবধানবান্)। তর্কারি ব্রাহ্মণ ও করণদের খুব বড় কেন্দ্র ছিল; তর্কারি-তর্কারিকা-তর্কার-টক্কার-টকারীর উল্লেখ সমসাময়িক অনেক লিপিতেই পাওয়া যায়। সন্দেহ নাই যে, এই গ্রাম সমসাময়িক কালে বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে একাধিক কারণে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই গ্রামের অবস্থিতি-নির্দেশ লইয়া পণ্ডিত মহলে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে, কিন্তু ইহা যে প্রাচীন বরেন্দ্রীর অন্তর্গত এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া লিপি এবং কেশবসেনের ইদিলপুর লিপি দুইই নির্গত হইয়াছিল "ফল্গুগ্রাম পরিসর সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ।" লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর লিপিও নির্গত হইয়াছিল ধার্যগ্রাম জয়স্কন্ধাবার হইতে। ফল্গুগ্রাম ও ধার্যগ্রামে জয়স্কন্ধাবার স্থাপনার ইঙ্গিত হইতে এই অনুমান স্বাভাবিক যে, সমসাময়িক কালের সেনরাষ্ট্রে এই গ্রাম দুইটির বিশেষ একটা মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল, নহিলে মহারাজের জয়স্কন্ধাবার গ্রামে স্থাপিত হইতে পারিতনা; অন্তত জয়স্কন্ধাবার স্থাপনার পর তো গুরুত্ব ও মর্যাদা নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোনো কোনো গ্রামে যে শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইত তাহার কতকটা যুক্তিসিদ্ধ অনুমান তো ব্রাহ্মণীগ্রামমণ্ডল হইতেই পাওয়া যায়। সেন আমলের শেষের পর্বে কোনও কোনও গ্রাম জয়স্কন্ধাবারের মর্যাদাও লাভ করিয়াছে, দেখিতেছি।

৪

বাংলাদেশের কৃষিপ্রধান প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেমন বহুলাংশে সুপ্রাচীন অষ্ট্রিক-ভাষাভাষী আদিবাসিদের দানের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে, নাগরিক সভ্যতা তেমনই পরিমাণে ঋণী দ্রাবিড়-ভাষাভাষী লোকদের নিকট। এ-সম্বন্ধে নরতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ কিছু কিছু তথ্যের ঐতিহাসিক ইঙ্গিত দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রাচীন বাংলার অনেক ব্যক্তি ও স্থান-নাম সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ শব্দতাত্ত্বিক গবেষণা হইয়াছে, তাহাও এই ইঙ্গিতের সমর্থক।

বাংলাদেশ প্রধানত গ্রামপ্রধান, কিন্তু নগরও এদেশে একেবারে কম ছিল না এবং নাগরিক সভ্যতাও একেবারে নিম্নস্তরের ছিল না। এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য, উত্তর-ভারতের পাটলীপুত্র-শ্রাবস্তি-অযোধ্যা-সাকেত-ইন্দ্রপ্রস্থ-শাকলপুর-পুরুষপুর-ভৃগুকচ্ছ-কপিলবাস্তু প্রভৃতি নগরের সঙ্গে প্রাচীন বাংলার নগরগুলির তুলনা হয়তো চলে না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পুণ্ড্র-মহাস্থান, কোটীবর্ষ-দেবকোট, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি অন্তত কয়েকটি নগর-নগরী সর্বভারতীয় খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করিয়াছিল,

নগর ও নগরের সংস্থান

এ তথ্যও অস্বীকার করা যায় না। সমসাময়িক লিপিমালায় এবং সাহিত্যে বাংলার অনেকগুলি নগর-নগরীর উল্লেখ ও বিবরণ জানা যায়; তাহা ছাড়া প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের খননকার্য, আবিষ্কার ইত্যাদি যেটুকু হইয়াছে—বাংলাদেশে খুব অল্পই হইয়াছে—তাহার ফলেও কোনো কোনো নগরের সংস্থান ও বিন্যাস সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু ধারণা করা চলে। গ্রাম ও নগরের পার্থক্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে পৃথিবীর সর্বত্র যেমন, বাংলা দেশেও তাহাই। প্রথম ও প্রধান পার্থক্য, গ্রামগুলি প্রধানত ভূমি ও কৃষি নির্ভর, কিন্তু নগর নানা প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে, এবং কৃষি কতক পরিমাণে তাহার অর্থনৈতিক নির্ভর হইলেও শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ অর্থসম্পদই নগর-সমৃদ্ধির প্রধান নির্ভর। যে-ক্ষেত্রে তাহা নয়, সেখানে গ্রাম ও নগরে পার্থক্যও কম।

প্রাচীন বাংলায়ও নগরগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল নানা প্রয়োজনে; কোথাও একটিমাত্র প্রয়োজনের তাড়নায়, কোথাও একাধিক প্রয়োজনে। পুণ্ড্র-পুণ্ড্রবর্ধনের মত নগর একটি মাত্র প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে নাই; বিভিন্ন সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে করতোয়া তীরবর্তী এই নগর প্রখ্যাত একটি তীর্থ ছিল। দ্বিতীয়ত, শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরিয়া এই নগর বৃহৎ এক রাজ্য ও জনপদ-বিভাগের রাজধানী ও প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল। তৃতীয়ত, এই নগর সর্বভারতীয় এবং আন্তর্দেশিক বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল; একাধিক স্থলপথ এবং প্রশস্ত করতোয়ার জলপথ এই কেন্দ্রে মিলিত হইত। তাম্রলিপ্তির মতন নগরও একটি মাত্র প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে নাই। প্রথমত, তাম্রলিপ্তি ভারতের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর; একদিকে সমুদ্রপথ এবং অন্যদিকে ভাগীরথীর জলপথের এবং অন্যদিকে আন্তর্ভারতীয় ও আন্তর্দেশিক স্থলপথের কেন্দ্র এই নগর। এই কারণেই তাম্রলিপ্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাণিজ্যের এত বড় কেন্দ্র রূপে ভারতে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্থান লাভ করিতে পারিয়াছিল। লক্ষণীয় এই যে, এই নগরে রাষ্ট্রীয় শাসনকেন্দ্র ছিল, দণ্ডীর দশকুমার-চরিতের একটি গল্প ছাড়া আর কোথাও তেমন ইঙ্গিতও কিছু নাই। তাম্রলিপ্তির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ, এই নগর বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধানকেন্দ্র। কোটীবর্ষ প্রধানত এবং প্রথমত আন্তর্দেশিক রাজ্যবিভাগের বড় একটা শাসনকেন্দ্র ছিল বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া। দ্বিতীয়ত, সামরিক প্রয়োজনের দিক হইতেও খুব সম্ভবত কোটীবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থিতির একটা গুরুত্ব ছিল। অভিধান-চিন্তামণির গ্রন্থকার হেমচন্দ্র এবং ত্রিকাণ্ডশেষের গ্রন্থকার পুরুষোত্তমদেব দুইজনেই কোটীবর্ষ নগরের যে-সব ভিন্ন ভিন্ন নাম সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে শুধু শাসনকেন্দ্র হিসাবেই যে ইহার মর্যাদা, তাহা মনে হয় না। ইহারা দুইজনই দেবীকোট (মধ্যযুগের মুসলমান ঐতিহাসিকদের দীব্‌কোট, দেবীকোট, দীওকোট ইত্যাদি), উমাবন, বাণপুর, এবং শোণিতপুর কোটীবর্ষের বিভিন্ন নাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পুনর্ভবা বা পূর্ণভবা নদীর তীরবর্তী এই নগরের সামরিক গুরুত্ব এবং তীর্থমহিমা থাকা কিছু অসম্ভব নয়।

বিক্রমপুর শুধু শাসনকেন্দ্র হিসাবেই গুরুত্ব অর্জন করে নাই, ইহার সামরিক গুরুত্বও অনস্বীকার্য ; তাহা না হইলে একাধিক সেন রাজার আমলে এখানে জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিত না। লক্ষ্মণসেনের পরাজয় এবং তুর্কীদের দ্বারা নবদ্বীপ অধিকারের পর সে-গুরুত্ব আরও বাড়িয়াই গিয়াছিল। তাহা ছাড়া, প্রাচীনকালে নদনদীবহুল নৌ-যাতায়াত পথের হৃদয়দেশে অবস্থিত থাকায় ইহার বাণিজ্যিক গুরুত্বও ছিল বলিয়া মনে হয়। অধিকন্তু, আনুমানিক নবম-দশক শতক হইতে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও একটা বড় কেন্দ্র ছিল বিক্রমপুরে। শুধু মাত্র রাষ্ট্রীয় বা সামরিক প্রয়োজনে, কিংবা শুধু ধর্মকেন্দ্র হিসাবে কোনও নগর প্রাচীন বাংলায় গড়িয়া উঠে নাই, তাহাও নয়। পঞ্চনগরী বিষয়ের শাসনাধিষ্ঠান, পুষ্করণ, ক্রীপুর, পাল ও সেন রাজাদের প্রতিষ্ঠিত রামপাল, রামাবতী ও লক্ষ্মণাবতী, শশাঙ্ক ও জয়নাগের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি নগর প্রধানত রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রয়োজনে গড়িয়া উঠিয়াছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়। সোমপুর (বর্তমান পাহাড়পুর), ত্রিবেণী প্রভৃতি নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবেই। কিন্তু সমসাময়িক সাক্ষ্যে দেখা যায়, যে-প্রয়োজনেই নগরগুলি গড়িয়া উঠুক না কেন, কমবেশি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেরণা সর্বত্রই ছিল বলিয়া মনে হয়। বস্তুত, প্রাচীন বাংলার নগরগুলির ভৌগোলিক অবস্থিতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেকটি নগরই প্রশস্ত ও প্রচলিত স্থল ও জলপথের উপর বা সংযোগকেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। ইহা একেবারে অকারণ বা আকস্মিক বলিয়া মনে হয় না। ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতকের একটি লিপিতে চন্দ্রবর্মণ-কোট বলিয়া একটি দুর্গের উল্লেখ আছে ; সামরিক প্রয়োজনে এই দুর্গ-নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই লিপিতে এবং এই স্থানে প্রাপ্ত সমসাময়িক অন্যান্য লিপিতে স্থানটি যে নৌ-বাণিজ্য-প্রধান ছিল তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই কোট হইতেই বর্তমান কোটালিপাড়া নামের উদ্ভব, এরূপ অনুমান একেবারে অযৌক্তিক নয়।

নগরের বাসিন্দা কাহারা ছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যে-সব নগর প্রধানত রাষ্ট্রীয় এবং সামরিক প্রয়োজনে গড়িয়া উঠিয়াছিল, শাসনাধিষ্ঠান ছিল যে-সব নগরে, সেখানে রাষ্ট্রীয় ও সামরিক কর্মচারীরা তো বাস করিতেনই—ইঁহারা সকলেই চাকুরিজীবী, ধনোৎপাদক কেহই নহেন। রাজা, মহারাজ, সামন্তরাও নগরবাসীই ছিলেন। তীর্থমহিমার জন্য বা শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে যে-সব নগর গড়িয়া উঠিত সেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও শিক্ষার গুরু, আচার্য, পুরোহিত প্রভৃতি বৃত্তিধারী লোকেরা, তাঁহাদের শিষ্য, ছাত্র প্রভৃতিরাও বাস করিতেন। অন্যান্য নগরবাসীদের ধর্মাচরণ ও অনুষ্ঠানের জন্যও প্রত্যেক নগরেই ব্রাহ্মণ আচার্য, পুরোহিতের একটা সংখ্যা থাকিতই। ইঁহারা তো অনেকে রাজপাদপোজীবীর বৃত্তিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীর্থাচরণোদ্দেশে এই সব নগরে লোক যাতায়াতও ছিল ; যাঁহারা আসিতেন অর্থ ব্যয় করিতেই আসিতেন। কাজেই এই সব তীর্থনগরে নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্রও সহজেই গড়িয়া উঠিত। কিন্তু শুধু তীর্থ-প্রয়োজনেই নয়,

অধিকাংশ নগরে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা প্রেরণাও ছিল, একথা আগে বলিয়াছি। এই ব্যবসা-বাণিজ্য আশ্রয় করিয়া বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক—ইহারা নগরেই বাস করিতেন, অষ্টম শতকপূর্ব লিপিগুলিতে এমন প্রমাণ প্রচুর পাওয়া যাইতেছে। রাজকর্মচারী রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সঙ্গে ইহারাই নগরের প্রধান বাসিন্দা। ইহাদের নিগমকেন্দ্রগুলিও নগরে। তাহা ছাড়া, শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কয়েকটি রাজপদের উল্লেখও লিপিগুলিতে দেখা যায়; এই পদগুলি এবং নগর-শাসন সংক্রান্ত কয়েকটি রাজকীয় পদ (যেমন, পুরপাল, পুরপালোপরিক) রাজধানী, ভুক্তি অথবা বিষয়ের রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সংপৃক্ত। ইহারা সকলেই যে নগরবাসী এসম্বন্ধে কোনও সংশয়ই থাকিতে পারেনা। দেওপাড়া লিপির "বরেন্দ্রকশিল্পীগোষ্ঠীচূড়ামনি" রাণক শূলপানিও নাগরিক। বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে যে-সব শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের তালিকা আছে তাহাদের মধ্যে কর্মকার, কংসকার, শাঙ্খিক-শংখকার, মালাকার, তক্ষণ-সূত্রধার, শৌণ্ডিক, তন্ত্রবায়-কুবিন্দক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অনেকেই নগরে বাস করিতেন, সন্দেহ নাই। স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, অট্টালিকাকার, কোটক, অন্যান্য ছোট বড় শিল্পী ও বণিকেরা তা একান্তই নগরবাসী ছিলেন। ইহাদের ছাড়া, অথচ ইহাদের সেবার জন্য রজক, নাপিত, গোপ প্রভৃতি কিছু সমাজ-সেবকও নগরে বাস করিতেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজ পর্যায়ের কিছু কিছু সমাজ-শ্রমিকেদেরও নগরে বাস করিতে হইত, যেমন ডোম, চণ্ডাল, ডোলাবাহী, চর্মকার, মাংসচ্ছেদ ইত্যাদি। কিন্তু ইহারা সাধারণত বাস করিতেন নগরের বাহিরে; চর্যাগীতে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে 'ডোম্বীর কুঁড়িয়া' নগরের বাহিরে। এইসব সমাজ-সেবক ও সমাজ-শ্রমিকেরা নগরবাসী বটে, কিন্তু যথার্থত নাগরিক ইহারা নহেন; নাগরিক বলা যায় প্রধানতঃ শ্রেষ্ঠী, শিল্পী, বণিকদের, নগরবাসী রাজ ও অভিজাত সম্প্রদায়দের, রাষ্ট্রপ্রধানদের এবং সমৃদ্ধ বিত্তবান্ ব্রাহ্মণদের।

এই নাগরিকেরাই সামাজিক ধনের প্রধান বণ্টনকর্তা, এবং যেহেতু নগরগুলিই ছিল সামাজিক ধনবণ্টনের প্রধান কেন্দ্র, সেই হেতু নগরগুলিতেই সামাজিক ধন কেন্দ্রীকৃত হইবার দিকে ঝোঁক স্বাভাবিক। সপ্তম-অষ্টম শতক বাংলার সামাজিক ধন যতদিন প্রধানত শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর ছিল ততদিন তো নগরগুলি সামাজিকধনলব্ধ ঐশ্বর্য-বিলাসাড়ম্বরের কেন্দ্র ছিলই, এবং তাহা স্বাভাবিকও; কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সামাজিক ধনের উৎপাদন যখন প্রধানত গ্রাম্য কৃষি ও গৃহশিল্প হইতে তখনও নগরগুলিই সামাজিক ধনের কেন্দ্র, এবং সেই হেতু ঐশ্বর্যবিলাসাড়ম্বরেরও। বস্তুত, রামচরিত, পবনদূত প্রভৃতি কাব্য, সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত বিচ্ছিন্ন শ্লোকাবলী, এবং সমসাময়িক লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় গ্রাম ও নগরের প্রধান পার্থক্যই এই ধনৈশ্বর্যের তারতম্যদ্বারা চিহ্নিত। তৃতীয়-চতুর্থ শতকে বাৎস্যায়ন হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ-দ্বাদশ শতকের কাব্য ও প্রশস্তিগুলিতে সর্বত্রই নগরে নগরে দেখিতেছি শ্রেণীবদ্ধ প্রাসাদাবলী,

নরনারীর প্রসাধন ও অলঙ্কার প্রাচুর্য, বারাঙ্গনাদের কটাক্ষবিস্তার, নানাপ্রকার বিলাসের উপকরণ এবং অত্যুগ্র ঐশ্বর্যের লীলা, আর, সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে দেখিতেছি গ্রামবাসিদের সারল্যময় সহজ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার, এবং কখনো কখনো দারিদ্রের নিষ্করুণ চিত্র। অথচ, এই সব চিত্র যে-যুগের সেই যুগে গ্রামের কৃষি এবং গৃহশিল্পলব্ধ ধনই একমাত্র না হউক, প্রধান সামাজিক ধন।

৫

প্রাচীন লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যে অনেক নগরের উল্লেখ ও বিবরণ পাইতেছি। সকল নগর গুরুত্বে, মর্যাদায়, আয়তনে বা অর্থসম্পদে সমান ছিলনা, একথা বলাই বাহুল্য। তবু, ক্ষুদ্র বৃহৎ কয়েকটি নগরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানিতে পারিলে প্রাচীন বাংলার নগর-বিন্যাস সম্বন্ধে ধারণা একটু স্পষ্ট হইতে পারে।

কয়েকটি প্রধান প্রধান নগরের বিবরণ

বর্তমান পশ্চিম-বঙ্গের প্রাচীনতম নগর তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যসমৃদ্ধির কথা সুপরিচিত। বহুপ্রসঙ্গে বারবার তাহা আলোচিত হইয়াছে। মহাভারত, পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া টোডরমল্ল পর্যন্ত নানাগ্রন্থে নানা নামে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়—তাম্রলিপ্ত, তামলিপ্ত, তামলিপ্তি, তাম্রলিপ্তক, তমালিনী, বিষ্ণুগৃহ, স্তম্বপুর, তামলিকা, বেলাকূল, তামোলিত্তি, দামলিপ্ত, টামালিটেস (Tamalites), টালুক্‌টেই (Taluctae), এবং তম্বুলক। সপ্তম-অষ্টম শতক পর্যন্ত এই সামুদ্রিক বন্দরের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল, একথা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। টলেমি এই সামুদ্রিক বন্দর-নগরটির অবস্থিতি নির্দেশ করিতেছেন গঙ্গার উপরেই; কথাসরিৎসাগরের একটি গল্পে দেখিতেছি, তাম্রলিপ্তিকা পূর্বাম্বুধির অদূরস্থ নগরী; দশকুমার চরিতের মতে দামলিপ্ত সমৃদ্ধ ব্যবসা বানিজ্যের কেন্দ্র ও সামুদ্রিক বন্দর, গঙ্গার তীরে, সমুদ্রের অদূরে; য়ুয়ান্ চোয়াঙও বলিতেছেন তাম্রলিপ্তি সমুদ্রের একটি খাড়ীর উপর অবস্থিত, যেখানে স্থলপথ ও জলপথ একত্র মিশিয়াছে। সমুদ্রমুখস্থিত এই বন্দর হইতেই ফাহিয়ান্ সিংহল এবং ইৎসিঙ্ শ্রীভোজ বা শ্রীবিজয়রাজ্যে (সুমাত্রা-যবদ্বীপ) যাইবার জন্য জাহাজে উঠিয়াছিলেন। রূপনারায়ণ-তীরবর্তী বর্তমান তমলুক সহর এই সুসমৃদ্ধ বাণিজ্যনগরীর স্মৃতিমাত্র বহন করিতেছে। অন্যত্র আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, পুরাতন সরস্বতী বা গঙ্গার অন্য কোনো শাখানদীর উপর প্রাচীন তাম্রলিপ্তির অবস্থিতি ছিল; সেই নদীর খাত শুকাইয়া যাওয়ার ফলে তাম্রলিপ্তির বাণিজ্য-সমৃদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়, এবং নগর হিসাবেও তাহার প্রাধান্য আর থাকে নাই। কিন্তু তাম্রলিপ্তি শুধু দুই জলপথের সঙ্গমেই অবস্থিত ছিলনা; স্থলপথে রাজগৃহ-শ্রাবস্তি-গয়া-বারাণসীর সঙ্গেও এই নগরীর যোগ ছিল; জাতকের গল্পগুলিতে তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। সিংহলী মহাবংশ গ্রন্থের

পশ্চিম বঙ্গ

তাম্রলিপ্ত

একটি গল্পে দেখিতেছি, সম্রাট অশোক সিংহলী কয়েকজন দূতকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা জানাইবার জন্য নিজে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত আসিয়া সেই বন্দরে তাহাদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিয়াছিলেন। গয়া হইতে স্থলপথে বিন্ধ্যপর্বত (ছোটনাগপুরের পাহাড়?) অতিক্রম করিয়া তাম্রলিপ্তি আসিতে তাঁহার ঠিক সাতদিন লাগিয়াছিল। বৃহৎ ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র ছাড়া তাম্রলিপ্তি সমসাময়িক শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও একটি বড় কেন্দ্র ছিল। পঞ্চম শতকে ফাহিয়ান এই নগরে দুই বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধসূত্রের পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন ও পুনর্লিখন করিয়াছিলেন, কিছু কিছু বৌদ্ধ দেবদেবীর ছবিও আঁকিয়াছিলেন। সপ্তম শতকের শেষার্দ্ধে ইৎসিঙ্ এই কেন্দ্রে বসিয়াই শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন এবং সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। বর্তমান তমলুক সহরের অদূরে কয়েকটি ধ্বংসস্তূপ ছাড়া এই নগরের আর কিছুই এখন বর্তমান নাই। মাঝে মাঝে ভূমি চাষ করিতে গিয়া কিংবা গর্ত খুঁড়িতে গিয়া অথবা আকস্মিকভাবে কিছু কিছু প্রাচীনমুদ্রা, পোড়ামাটির মূর্তি ও ফলক ইতস্তত পাওয়া গিয়াছে; কোনো কোনো মুদ্রা ও মূর্তির তারিখ প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের। সমৃদ্ধ ঐশ্বর্যশালী ব্যবসা-বাণিজ্যপ্রধান তাম্রলিপ্তিতে যাতায়াতের পথঘাট দস্যু তস্কর-বিরহিত ছিল না, এমন অনুমান স্বভাবতই করা চলে। বণিক, সার্থবাহ, তীর্থযাত্রী, পর্যটক প্রভৃতিরা দল বাঁধিয়াই যাতায়াত করিতেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইৎসিঙ্ নালন্দার নিকট হইতে তাম্রলিপ্তি যাইবার সময় একবার পথে দস্যুদল দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন, এবং অত্যন্ত আয়াসে কোনো প্রকারে তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে পুষ্করণ নামে একটি নগরের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে মহারাজ চন্দ্রবর্মার শুশুনিয়া লিপিতে। এই নগর বাঁকুড়া জেলায় দামোদরের দক্ষিণ-তীরবর্তী বর্তমান পোখরণা গ্রামের স্মৃতির মধ্যে আজও বাঁচিয়া আছে। শুঙ্গ আমলের একটি যক্ষিণী মূর্তির পোড়ামাটির ফলক এবং আরও কয়েকটি প্রত্নবস্তু পোখরণা গ্রামে পাওয়া গিয়াছে।

বর্দ্ধমানও অতি প্রাচীন নগর। জৈন কল্পসূত্র, সোমদেবের কথাসরিৎসাগর, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে এই নগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কথাসরিৎসাগরে বর্দ্ধমান বসুধার অলঙ্কার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। জৈন কল্পসূত্রের মতে মহাবীর একবার অস্থিকগ্রামে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন; টীকাকার বলিতেছেন পূর্বে এই স্থানের নাম ছিল বর্দ্ধমান। তিনি এই নাম-পরিবর্তনের একটা কারণও উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মল্লসারুল লিপিতে, দশম শতকের ইর্দা লিপিতে এবং দ্বাদশ শতকের নৈহাটি ও গোবিন্দপুর লিপিতে দেখিতেছি এই নগর ভুক্তি-বিভাগের শাসনাধিষ্ঠান ছিল। অনুমান হয়, এই নগর দামোদরের তীরেই অবস্থিত ছিল, যদিও বর্তমান বর্দ্ধমান সহর ও দামোদরের ব্যবধান অনেক। বর্দ্ধমান প্রাচীনকালের অতি জনপ্রিয় নাম; বাংলার বাহিরেও স্থান-নাম

পুষ্করণ, বর্দ্ধমান

হিসাবে ইহার প্রচলন দেখা যায়। হর্ষবর্দ্ধনের বাঁশখেরা লিপিতে এক বর্দ্ধমানকোটির উল্লেখ আছে; আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থে কামরূপদেশে এক বর্দ্ধমানপুরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; কান্তিদেবের চট্টগ্রাম লিপিতে (নবম শতক) হরিকেল-মণ্ডলান্তর্গত আর এক বর্দ্ধমানপুরের দেখা মিলিতেছে—এই বর্দ্ধমানপুরেই কান্তিদেবের রাজধানী ছিল। হরিকেল যে ব্রহ্মপুত্র-পূর্ব পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত তাহা তো অন্যত্র বলিয়াছি।

সিংহপুর

সিংহলী পুরাণে বিজয়সিংহ-কাহিনী প্রসঙ্গে লাল (রাঢ়) দেশান্তর্গত সিংহপুর নামে একটি নগরের উল্লেখ আছে; কেহ কেহ মনে করেন সিংহপুর বর্তমান হুগলী-জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার সিঙ্গুর। এ-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা কঠিন।

প্রিয়ঙ্গু

দশম ও একাদশ শতকে দণ্ডভুক্তির কম্বোজরাজদের রাজধানী ছিল প্রিয়ঙ্গু নামক নগরে। এই নগরের অবস্থিতি বা অন্য কোনো প্রকার গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, তবে মেদিনীপুর বা হুগলী জেলার কোথাও ইহার অবস্থিতি হওয়া বিচিত্র নয়।

কর্ণসুবর্ণ

কর্ণসুবর্ণ প্রাচীন পশ্চিম-বাংলার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নগর। সপ্তম শতকে এই নগর গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানী, এবং শশাঙ্কের মৃত্যুর পর স্বল্প কিছুদিনের জন্য কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার জয়স্কন্ধাবার ছিল। এই শতকেরই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে মহারাজ জয়নাগের রাজধানীও ছিল এই নগরে। য়ুয়ানচোয়াঙ্ বলিতেছেন, এই নগরের পরিধি ছিল ২০ লি। বাংলায় ভ্রমণকালে য়ুয়ান-চোয়াঙ্' কর্ণসুবর্ণে আসিয়াছিলেন। সপ্তম শতকের কর্ণসুবর্ণ শুধু রাজধানী হিসাবেই খ্যাতি লাভ করে নাই; সমসাময়িক শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও প্রধান একটি কেন্দ্র ছিল এই নগর। নগরের বাহিরে অনতিদূরে রক্তমৃত্তিকা নামে একটি বৃহৎ বৌদ্ধ বিহার ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি এবং কানসোনা গ্রাম যথাক্রমে আজও রক্তমৃত্তিকা বিহার এবং কর্ণসুবর্ণের স্মৃতি বহন করিতেছে। দুইই বহরমপুরের নিকটবর্তী গঙ্গাপ্রবাহের তীরে অবস্থিত ছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়। জয়নাগের কালে ঔদুম্বরিক বিষয় নামে কর্ণসুবর্ণের একটি বিষয়-বিভাগ ছিল, এবং এই বিষয়ের শাসনাধিষ্ঠান বোধ হয় ছিল ঔদুম্বর নামক নগর। ঔদুম্বরিক বিষয় যে আইন-ই-আকবরীর ঔদম্বর পরগণা তাহা তো আগেই বলিয়াছি; বীরভূমের অধিকাংশ এবং মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ জুড়িয়া ছিল এই বিষয়ের বিস্তৃতি। রক্তমৃত্তিকা-রাঙ্গামাটির রক্তিম ধূসর ধ্বংসস্তূপে কিছু কিছু খনন কার্য হইয়াছে; এই স্তূপ সমতল ভূমি হইতে প্রায় ৪০।৫০ ফুট উঁচু, কিন্তু ইহার অনেকাংশ ভাগীরথী প্রবাহে ভাঙ্গিয়া ধুইয়া গিয়াছে। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে প্রায় দুই মাইল জুড়িয়া ছিল রাজধানীর বিস্তৃতি; নদীপ্রবাহের ধ্বংসাবশেষের অনেক ভাঙ্গিয়া ধুইয়া যাওয়া সত্ত্বেও ইহা বুঝিতে কিছু কষ্ট হয় না। রাক্ষসীডাঙ্গার ধ্বংসস্তূপ খননে

আনুমানিক সপ্তম শতকীয় একটি বৌদ্ধ বিহারের ভিত্তিচিহ্নের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। রাজা কর্ণের স্তূপ নামে খ্যাত যে-ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান, তাহাই বোধ হয় ছিল প্রাচীন রাজপ্রাসাদ।

অষ্টম শতকের শেষার্দ্ধে অনর্ঘরাঘবের গ্রন্থকার মুরারী চম্পাকে গৌড়ের রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই চম্পা গঙ্গাতীরবর্তী এবং বর্তমান ভাগলপুরের নিকটবর্তী চম্পানগরী-চম্পাপুরী হওয়াই স্বাভাবিক; তবে, আইন-ই-আক্‌বরী-গ্রন্থের মন্দারণ-সরকারের (হুগলী-মেদিনীপুর) অন্তর্গত চম্পানগরী হওয়াও একবারে অসম্ভব নয়।

ধোয়ী কবির পবনদূতের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, সেন-রাজাদের (অন্তত লক্ষ্মণসেনের) প্রধান রাজধানী ছিল বিজয়পুর (স্কন্ধাবারং বিজয়পুরিমত্যুন্নতাম্ রাজধানীম্)। ধোয়ীর বিবরণীর আক্ষরিক অনুসরণ করিলে বিজয়পুর যে তপন-তনয়া যমুনা ও ভাগীরথী সঙ্গমের অদূরে অবস্থিত ছিল (ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত নির্যাতি দেবী) তাহা অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। কেহ কেহ বিজয়পুরকে নবদ্বীপ-নদীয়া বা রাজসাহী জেলার বিজয়নগরের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। ধোয়ীর পবনদূত কখনও গঙ্গা অতিক্রম করিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ নাই; কাজেই বিজয়পুর উত্তর-বঙ্গে অবস্থিত হওয়া অসম্ভব। নবদ্বীপ-নদীয়া ত্রিবেণীর অনেক উত্তরে; পবনদূতের বর্ণনা অনুসারে বিজয়পুর ত্রিবেণী হইতে এতদূরে হইতে পারে না। বিজয়পুরের যে বর্ণনা ধোয়ী দিতেছেন তাহাতে উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তি আছে, সন্দেহ নাই; তবু, রাজধানীর নাগরিক ঐশ্বর্যাড়ম্বরের খানিকটা পরিচয় তাহাতে পাওয়া যায়।

বিজয়পুর

পশ্চিম-দক্ষিণবঙ্গের আর একটি সুপ্রসিদ্ধ নগর দণ্ডভুক্তি-নগর। এই নগর দণ্ডভুক্তির এবং পরে দণ্ডভুক্তি-মণ্ডলের শাসনাধিষ্ঠানরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানা ও দাঁতন সহর প্রাচীন দণ্ডভুক্তির স্মৃতি বহন করিতেছে।

দণ্ডভুক্তি

যমুনা-সরস্বতী-ভাগীরথীর তিন 'মুক্তবেণী'র সঙ্গমে অবস্থিত ত্রিবেণী প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রধান তীর্থনগরী। অন্তত সেন-রাজাদের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া তুর্কী আমল পর্যন্ত তীর্থ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হিসাবে ত্রিবেণীর খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল; আজ সরস্বতী-প্রবাহ শুষ্ক, যমুনা প্রবাহের চিহ্ন ও অনুসন্ধানের বস্তু, কিন্তু ত্রিবেণীর তীর্থস্মৃতি আজও বিদ্যমান, যদিও আজ তাহা গণ্ডগ্রাম মাত্র। ত্রিবেণীর অবস্থান ছিল সেই দেশে যে দেশকে ধোয়ী বলিয়াছেন, "গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালাবতংসো যাস্যত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ।"

ত্রিবেণী

ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে বা শেষার্দ্ধে ত্রিবেণীর দুই মাইল দূরে, ভাগীরথী সঙ্গমের

সন্নিকটে সরস্বতীর তীরে সপ্তগ্রামে এক সুবৃহৎ বন্দর-নগর গড়িয়া উঠে, এবং সেন-রাজাদের রাজধানী বিজয়পুরের মর্যাদা অবলুপ্ত করিয়া দেয়। ষোড়শ শতক পর্যন্ত সপ্তগ্রাম শুধু বৃহত্তম বাণিজ্যকেন্দ্র নয়, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার রাজধানী, মুসলমান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রকেন্দ্র। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে সমসাময়িক সপ্তগ্রামের সুন্দর ও বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

সপ্তগ্রাম

সেন-রাজাদের অন্যতম রাজধানী বোধ হয় ছিল নবদ্বীপ, বা মিন্‌হাজ-উদ্-দীন কথিত নুদীয়া নগর। নদীয়া-নবদ্বীপ যে সেন-রাজাদের অন্যতম রাজধানী ছিল তাহা কুলজী গ্রন্থমালাদ্বারাও সমর্থিত। সম্বন্ধনির্ণয় ও বল্লাল-চরিত গ্রন্থের মতে বল্লালসেন বৃদ্ধবয়সে নবদ্বীপ-রাজধানীতেই বাস করিতেন।

গোরক্ষবিজয়, মীনচেতন ও পদ্মপুরাণ গ্রন্থে এক বিজয়নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়; এই বিজয়নগর দামোদর নদের উত্তর তীরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রাঢ়দেশের সঙ্গেই সেন-রাজবংশের প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয়; অসম্ভব নয় যে, এই বিজয়নগর বিজয়সেনের নামের সঙ্গে জড়িত।

পুণ্ড্র-পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর উত্তর বাংলার সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রাচীন নগর। দিব্যাবদান, রাজতরঙ্গিণী, বৃহৎকথামঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থে এই নগরের উল্লেখ আছে। অন্যান্য অনেক সাহিত্যগ্রন্থে এবং লিপিমালায়ও পুণ্ড্র-পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রধান নগর পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্র-বর্দ্ধনপুরের অল্পবিস্তর উল্লেখ হইতে, এবং বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থান-ধ্বংসাবশেষের প্রত্নতাত্ত্বিক বর্ণনা হইতে সুপ্রাচীন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী অধ্যুষিত এই নগরটি সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত সংবাদ আহরণ করা যায়। এই সব সংবাদের সাহায্যে অন্যান্য নগরগুলি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হইতে পারে, এই অনুমানে পুণ্ড্রনগর-বর্ণনা একটু বিস্তৃতভাবেই করা যাইতে পারে।

উত্তর-বঙ্গ

বৌদ্ধপুরাণ মতে বুদ্ধদেব স্বয়ং কিছুদিন পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে কাটাইয়াছিলেন এবং নিজের ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। মৌর্যরাজত্বকালে পুদনগল (পুণ্ড্রনগর) জনৈক মহামাত্রের শাসনাধিষ্ঠান ছিল। গুপ্ত আমলে এই নগর পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির ভুক্তিকেন্দ্র ছিল, এবং সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতকে হিন্দু আমলের শেষ পর্যন্ত পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রনগর কখনও তাহার এই মর্যাদার আসন হইতে বিচ্যুত হয় নাই। শুধু শাসনাধিষ্ঠানরূপেই নয়, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে এবং আন্তর্ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক স্থলপথ-বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্ররূপেও এই নগরের বিশেষ খ্যাতি ও মর্যাদা বহু শতাব্দী ধরিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সপ্তম শতকে য়ুয়ান্-চোয়াঙ যখন বাংলাদেশ পর্যটনে আসিয়াছিলেন তখন এই নগরের পরিধি ৩০ লি'রও (অর্থাৎ ৬ মাইল) অধিক ছিল; পুষ্করিণী, পুষ্প ও ফলোদ্যান, বিহারকানন প্রভৃতিতে এই নগর সুশোভিত

পুণ্ড্রনগর-মহাস্থান

পরবর্তী পাল ও সেন আমলে প্রধান ভুক্তির শাসনকেন্দ্র হিসাবে ইহার মর্যাদা

ও আয়তন বাড়িয়াই গিয়াছিল, এমন অনুমান অযৌক্তিক নয়। সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিতে বলা হইয়াছে, পুণ্ড্রবর্দ্ধনপুর বরেন্দ্রীর মুকুটমণি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান (বসুধাশিরো বরেন্দ্রী-মণ্ডল চূড়ামণেঃ কুলস্থানম্)। আনুমানিক দ্বাদশ শতকের করতোয়া-মাহাত্ম্য গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্দ্ধনপুরকে পৃথিবীর আদিভবন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (আদ্যম ভুবোভবনম্)। এই গ্রন্থেই পবিত্র করতোয়া-তীরবর্তী মহাস্থানকে পুণ্য পৌণ্ড্রক্ষেত্র বা পৌণ্ড্রনগর বলিয়া উল্লেখও করা হইয়াছে। বগুড়া হইতে ৭ মাইল দূরবর্তী করতোয়া-তীরে মহাস্থান; এখনও প্রতিবৎসর স্নানপুণ্যদিবসে সহস্র সহস্র লোক করতোয়ায় স্নান করিতে আসে। পৌণ্ড্রক্ষেত্রে করতোয়ার এই তীর্থমহিমার কথা করতোয়া-মাহাত্ম্যে সবিস্তারে উল্লিখিত হইয়াছে। মহাস্থানের সুবিস্তৃত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মৌর্যব্রাহ্মী লিপিখণ্ডের আবিষ্কার এবং লিপিখণ্ডে পুন্দনগলের উল্লেখ এবং করতোয়া-মাহাত্ম্যের উক্তি পুণ্ড্রনগর ও মহাস্থান যে এক এবং অভিন্ন তাহা নিঃসংশয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

করতোয়ার বাম তীরে ৩০ বর্গ মাইল জুড়িয়া মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষ বিস্তৃত। নগর-প্রাকার, প্রাসাদ, অট্টালিকা, মূর্তি, মন্দির, পরিখা, নগরোপকণ্ঠের বিহার, মন্দির, ঘরবাড়ী প্রভৃতির আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাচীন নগরটির যে-চিত্র ফুটিয়া উঠে তাহা কোনো অংশেই প্রাচীন বৈশালী-শ্রাবস্তি-কৌশাম্বীর নগরসমৃদ্ধির তুলনায় খর্ব বলিয়া মনে হয় না। অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক, মাটি-পাথর-ধাতব মূর্তি, প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, মুদ্রা, লিপি ইত্যাদি প্রচুর এই সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের ভিতর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নগরটির দুই অংশ। একটি অংশ পরিখাচিহ্নিত ও প্রাকারবেষ্টিত; এই অংশই যথার্থত নগর। অন্য অংশ প্রাকারের বাহিরে; এই অংশ নগরোপকণ্ঠ। নগরটি চারিধারের সমতল ভূমি হইতে প্রায় ১৫ ফুট উঁচু, চারদিকে সুপ্রশস্ত সুউচ্চ প্রাকার; চারিকোণে চারিটি উচ্চতর প্রাকারমঞ্চ; প্রাকারের বাহিরেই উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে পরিখা; পূর্বদিকে করতোয়া প্রবহমানা। নগরটি দৈর্ঘ্যে উত্তর-দক্ষিণে আনুমানিক ৫,০০০ ফুট, প্রস্থে ৪,২০০ ফুট; সমস্ত নগরটি ক্ষুদ্র বৃহৎ মাটী-ইট্-পাথরের স্তূপ এবং ভগ্ন মৃৎপাত্রের টুক্‌রায় আকীর্ণ। নগর হইতে নগরোপকণ্ঠ এবং বাহিরে যাতায়াতের জন্য উত্তর ও দক্ষিণদিকে দুইটি করিয়া সুপ্রশস্ত নগরদ্বার। পশ্চিমদিকে উত্তর কোণের কাছে প্রধান নগরদ্বার; এখনও এই দ্বার তাম্র দরওয়াজা নামে খ্যাত। পূর্বদিকে ঠিক ইহার বিপরীত কোনে শিলাদেবীর ঘাটে যাইবার জন্য আরও একটি দ্বার; এই শিলাদেবীর ঘাটই করতোয়ায় স্নানের প্রধান তীর্থকেন্দ্র। একটি প্রশস্ত লম্বমান সোজা পথ একদ্বারে হইতে আর একদ্বারে বিলম্বিত; এখনও সেই পথ দুরাপস্থত করতোয়ায় গিয়া নামিয়াছে। নগরাভ্যন্তরের বৈরাগীর ভিটা ও নগরোপকণ্ঠের গোবিন্দ

ঢিবির যতটুকু খনন কার্য হইয়াছে তাহার ফলে দুই জায়গায়ই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্বদিকে শিলাদেবীর ঘাটের কাছে নগর-প্রাকারের কিয়দংশের খননে দেখা গিয়াছে, করতোয়ার জলস্রোতের গতি পরিবর্তনের জন্য ঐ স্থানে প্রাকার দৃঢ়তর করিয়া দুইস্তরে গাঁথা হইয়াছিল। খনন-বিশারদ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন এই সব ধ্বংসাবশেষ ও নগরপ্রাকার, পরিখা প্রভৃতি সমস্তই পাল আমলের।

নগরাভ্যন্তরে ছিল রাজকীয় প্রসাদ, রাষ্ট্রের অধিকরণ-গৃহ এবং অন্যান্য রাজকীয় প্রাসাদ ইত্যাদি, সার্থবাহ-বণিক-নাগরিকদের বাসগৃহ, হাট, মন্দির, সভাগৃহ, সৈন্যসামন্তদের আবাসস্থান ইত্যাদি। রামচরিতে দেখিতেছি, পুণ্ড্রনগরের সারি সারি আপন-বিপণি গৃহের বর্ণনা। নগরের সমাজসেবক ও শ্রমিকেরা, কুটুম্ব গৃহস্থেরা বাস করিতেন নগরোপকণ্ঠে; সেখানেও ঘরবাড়ী, মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। শুধু পুণ্ড্রনগরেই নয় কোটিবর্ষ, রামপাল সর্বত্রই নগর-বিন্যাস একই প্রকারের।

পুণ্ড্রনগর-পৌণ্ড্রক্ষেত্রের পরেই বলিতে হয় কোটীবর্ষ নগরের কথা। হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি, পুরুষোত্তমের ত্রিকাণ্ডশেষ প্রভৃতি গ্রন্থের মতে দেবীকোট, বাণপুর, উমাবন, শোণিতপুর প্রভৃতি কোটিবর্ষেরই বিভিন্ন নাম। অভিধানকারদের মতে কোটিবর্ষের খ্যাতি ও মর্যাদা কৌশাম্বী, প্রয়াগ, মথুরা, উজ্জয়িনী, কান্যকুব্জ, পাটলীপুত্র প্রভৃতি নগরের চেয়ে কম নয়। বায়ুপুরাণে "কোটীবর্ষম নগরম"-এর উল্লেখ আছে। জৈন কল্পসূত্রে বলা হইয়াছে, মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহুর এক শিষ্য গোদাস প্রাচ্য-ভারতের জৈনদিগকে চারিটি শাখায় শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে তিনটি শাখার নাম তাম্রলিপ্তি, পুণ্ড্রবর্দ্ধন এবং কোটিবর্ষের সঙ্গে যুক্ত। পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তত পাল আমলের শেষ পর্যন্ত কোটিবর্ষ নগরেই পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির সর্বপ্রধান বিষয় কোটিবর্ষ-বিষয়ের শাসনাধিষ্ঠান অবস্থিত ছিল। মুসলমান অধিকারের পর পুরাতন কোটিবর্ষ নগরেই দেবীকোট-দীব্‌কোট-দীওকোট নামে নূতন নগরের পত্তন হয়। একাদশ শতকের শেষে বা দ্বাদশ শতকের প্রথমে সন্ধ্যাকর-নন্দী কোটিবর্ষ নগরের প্রশস্তি উচ্চারণ করিয়া এই নগরের অসংখ্য পূজারী-পূজক-মুখরিত মন্দির ও প্রস্ফুটিত পদ্মহসিত দীঘির দীর্ঘ বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। ষোড়শ শতক পর্যন্ত মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনায় দীব্‌কোট-দীওকোটের বর্ণনা পাঠ করা যায়।

কোটীবর্ষ-বাণগড়

হেমচন্দ্রের কোটিবর্ষ-বাণপুর পুনর্ভবাতীরস্থ এবং বলিরাজপুত্র বাণাসুরের ও উষা-অনিরুদ্ধের পুরাণ-স্মৃতি বিজড়িত, বর্তমান দিনাজপুর জেলার বাণগড়, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। সমস্ত বাণগড় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি জুড়িয়া এক বৃহৎ সমৃদ্ধ নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিস্তৃত। কম্বোজ-রাজবংশের একটি এবং পালবংশের একটি লিপি, অসংখ্য মূর্তি, মন্দির ও প্রাসাদের ভগ্ন প্রস্তর ও ইষ্টকখণ্ড, ভিত্তিস্তর, স্তম্ভখণ্ড, ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দির-নিদর্শন প্রভৃতি এই সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের ভিতর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কম্বোজ-রাজবংশের লিপিখোদিত যে ক্ষুদ্র মন্দির-নিদর্শনটি পাওয়া গিয়াছে তেমন মন্দিরকে যে সমসাময়িক সাহিত্যে "ভূ-ভূষণ" বলা হইয়াছে তাহা কিছু মিথ্যা অত্যুক্তি নয়।

ধ্বংসাবশেষ হইতে অনুমান হয়, এই নগর দৈর্ঘ্যে প্রায় ১,৮০০ এবং প্রস্থে ১,৫০০ ফুট বিস্তৃত ছিল; নগরটি চারিদিকে প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত এবং প্রাকারের পরেই পূর্বে, উত্তরে ও দক্ষিণে পরিখা, এবং পশ্চিমে পুনর্ভবা নদী। পূর্বদিকে প্রধান নগরদ্বার এবং নগর হইতে নগরোপকণ্ঠে যাইবার জন্য পরিখার উপরে সেতুর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। নগরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে এখনও একটি সুউচ্চ স্তূপ বর্তমান, এবং জনসাধারণের স্মৃতিতে এখনও এই স্তূপ রাজবাড়ী নামে জাগ্রত; বোধহয় এইখানেই ছিল রাজপ্রাসাদ। নগরাভ্যন্তরে এবং প্রাচীরের বাহিরে নগরোপকণ্ঠে এখনও অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ স্তূপ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

পঞ্চম শতকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্যতম বিষয় ছিল পঞ্চনগরী, এবং পঞ্চনগরীতেই বিষয়ের শাসনাধিকরণ অধিষ্ঠিত ছিল। পঞ্চনগরী দিনাজপুর জেলায় সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন্ স্থান তাহা নির্ণীত হয় নাই। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরও খুব পুরাতন তীর্থনগর বলিয়া মনে হয়; খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে এই স্থানের অন্তত একাংশের নাম ছিল বটগোহালী (বর্তমান গোয়ালভিটা), এবং সেখানে জৈন শ্রমণাচার্য গুহনন্দীর একটি বিহার ছিল। ধর্মপালের আমলে এই স্থান সোমপুর নামে খ্যাতি লাভ করে, এবং এইখানেই সোমপুর মহাবিহার (বর্তমান পাহাড়পুর) গড়িয়া উঠে। পাহাড়পুরের সন্নিকটবর্তী ওমপুর আজও পুরাতন সোমপুর নামের স্মৃতি বহন করিতেছে। সোমপুর মহাবিহার সমসাময়িক বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থনগর ছিল এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। একাদশ শতকে (বর্মন-রাষ্ট্রের?) বঙ্গাল সৈন্যেরা এই মহাবিহার আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দিয়াছিল।

পঞ্চনগরী

সোমপুর

পালরাজাদের রাজধানী কোথায় ছিল তাহা নিঃসংশয়ে জানিবার উপায় নাই; তবে তাঁহারা রাজ্যের সর্বত্র—বোধহয় সামরিক গুরুত্ব এবং শাসনকার্যের সুবিধানুযায়ী—অনেকগুলি বিজয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছিলেন। এগুলি যে অন্তত নগরোপম এসম্বন্ধে সন্দেহ কি? রাজারা যখন সদলবলে এই সব স্থানে আসিয়া বাস করিতেন, এবং শাসনকার্যও সেখানে নিষ্পন্ন হইত, তখন সেগুলো অস্থায়ী ছত্রাবাস মাত্র ছিল, একথা কিছুতেই কল্পনা করা যায় না। রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় ঘরবাড়ী, সৈন্যসামন্তাবাস, হাটবাজার, মন্দির, পথঘাট, উদ্যান প্রভৃতি সমস্তই এই সব দুর্গজাতীয় স্কন্ধাবারে থাকিত, এমন অনুমান করিতে কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না। ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতে একেবারে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এই ধরনের জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে; চন্দ্র-বর্মণ-সেন আমলের অনেক লিপিই তো 'বিক্রমপুর সমাবাসিত-

জয়স্কন্ধাবার

বিজয়স্কন্ধাবার' হইতে নির্গত। যাহা হউক, পাল লিপিগুলিতে মুদ্গগিরি, বটপর্বতিকা, বিলাসপুর, হরধাম, রামাবতীনগর, হংসাকোঞ্চি, এবং পাটলীপুত্র জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ আছে। এইসব জয়স্কন্ধাবারের মধ্যে রামাবতী স্পষ্টতই নগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; পাটলীপুত্র তো বহুদিনের প্রাচীন নগর; সুতরাং অন্য জয়স্কন্ধাবারগুলিও নগর না হইলেও নগরোপম ছিল, সন্দেহ নাই। মুদ্গগিরি বর্তমান মুঙ্গের নগর; গঙ্গার তীরেই ছিল তাহার অবস্থিতি। বিলাসপুর এবং হরধাম দুইই অবস্থিত ছিল গঙ্গার উপরে; কারণ গঙ্গায় তীর্থস্নান করিয়াই প্রথম মহীপাল এবং তৃতীয় বিগ্রহপাল যথাক্রমে বাণগড় ও আমগাছি লিপি-কথিত ভূমি দান করিয়াছিলেন, বিলাসপুর এবং হরধাম জয়স্কন্ধাবার হইতে। বটপর্বতিকার অবস্থিতি নির্ণয় কঠিন; পর্বতিকার উল্লেখ হইতে অনুমান হয় রাজমহল পর্বতের সংলগ্ন গঙ্গার তীরেই কোথাও এই জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাটলীপুত্রও গঙ্গার তীরে। হংসাকোঞ্চী মহরাজ বৈদ্যদেবের কামরূপস্থ জয়স্কন্ধাবার বলিয়া মনে হয়। রামাবতী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র রামপাল; মদনপালের মনহলি লিপি এবং সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিতে এই নগরের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। রামাবতী এবং আইন-ই-আকবরী কথিত রামাউতি যে এক এবং অভিন্ন নগর এ-সম্বন্ধে সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নাই। পরবর্তী সেন আমলের গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী নগরের অদূরে গঙ্গা-মহানন্দার সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে ছিল রামাবতীর অবস্থিতি। আজ রামাবতীর পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্মণাবতীর প্রাচীন কীর্তি-হর্ম্যাদির অদূরে মাটির ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে। অথচ সন্ধ্যাকরের বর্ণনা হইতে মনে হয়, সমসাময়িককালে রামাবতী সমৃদ্ধ নগর ছিল।

রামাবতী

পাল আমলের জয়স্কন্ধাবারগুলির সামরিক গুরুত্ব লক্ষণীয়, এবং অনুমান হয়, এই সামরিক গুরুত্ব বিবেচনা করিয়াই জয়স্কন্ধাবারগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পাটলীপুত্র, মুদ্গগিরি, বিলাসপুর, হরধাম, রামাবতী—এবং বোধহয় বটপর্বতিকাও—প্রত্যেকটিই গঙ্গার তীরে তীরে। এই গঙ্গা বাহিয়া রাজমহলের তেলিগড়ি ও সিক্রিগলির সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়াই বাংলায় প্রবেশের পথ, পাল-রাজ্যের হৃদয়স্থলে প্রবেশের পথ; এবং পাটলীপুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রামাবতী পর্যন্ত সমস্ত পথটিই সুরক্ষিত থাকা প্রয়োজন ছিল। পালরাষ্ট্র তাহাই করিয়াছিল। এই অনুমান আরও সমর্থিত হয় পরবর্তীকালে লক্ষ্মণাবতী-গৌড়, পাণ্ডুয়া, টাণ্ডা ও রাজমহলে পর পর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকেন্দ্রের অবস্থিতি হইতে। যাহা হউক, সে কথা পরে বলিতেছি।

সেন আমলের প্রায় শেষাশেষি লক্ষ্মণসেন রামাবতীর অদূরে লক্ষ্মণাবতী (মুসলমান ঐতিহাসিকদের গৌড়-লখ্‌নৌতি) নামে এক সুবিস্তৃত নগর প্রতিষ্ঠা করেন। রাজমহল হইতে ২৫ মাইল ভাটিতে গঙ্গা-মহানন্দার সঙ্গমস্থলের এই নগর গঙ্গার তীর ধরিয়া প্রায় ১৪।১৫ মাইল জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। সেন-আমলের লক্ষ্মণাবতীকে আশ্রয় করিয়া তুর্কী

সুলতানদের গৌড়-লখনৌতি নগর গড়িয়া উঠে। গঙ্গা আজ খাত্ পরিবর্তন করিয়া বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে, মহানন্দাও তাহাই। কিন্তু গৌড়-লখ্নৌতির ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান, এবং তাহা হইতে প্রাচীনতর লক্ষ্মণাবতীর বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির খানিকটা অনুমান করা চলে। গৌড়-লখ্নৌতি হইতে রাজধানী কিছুদিন পর পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তরিত হয়; তবু লখ্নৌতির খ্যাতি ও মর্যাদা হুমায়ুন-আকবরের আমল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। মুঘলেরা ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন জন্নতাবাদ। গঙ্গা ও মহানন্দার খাত্ পরিবর্তনের ফলে লখ্নৌতি অস্বাস্থ্যকর জলাভূমিতে পরিণত এবং ষোড়শ শতকের শেষাশেষি নাগাদ পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তী কালে বাংলার রাজধানী টাণ্ডায় এবং সর্বশেষে রাজমহলে স্থানান্তরিত হয়।

লক্ষ্মণাবতী

বর্তমান রাজসাহী সহরের ৭ মাইল পশ্চিমে, গোদাগারী থানার অন্তর্গত দেওপাড়া বা দেবপাড়া নামে একটি গ্রাম আছে; দেওপাড়ার উত্তরে অদূরে চব্বিশনগর এবং দক্ষিণে কিঞ্চিৎ দূরে বিজয়নগর নামে আর দুইটি গ্রাম। দেওপাড়া গ্রাম জুড়িয়া প্রাচীন অট্টালিকা, প্রাসাদ, মন্দির, মূর্তি ও দীর্ঘিকার বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ ইতস্তত আকীর্ণ। বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিলিপিটি পাওয়া গিয়াছে দেওপাড়া গ্রাম হইতে; এই লিপিটিতে প্রদ্যুম্নেশ্বরের একটি সুবৃহৎ মন্দির এবং তৎসংলগ্ন একটি বৃহৎ দীঘির উল্লেখ আছে। আজ মন্দিরটির কয়েকটি ভগ্ন স্থাপত্যখণ্ড ছাড়া আর কিছুই নাই; তবে দীঘিটি পদুমসর (প্রদ্যুম্নেশ্বর বা প্রদ্যুম্নসর = প্রদ্যুম্ন সরোবর) নামে আজও বাঁচিয়া আছে। মনে হয়, প্রাচীন দেওপাড়া গ্রাম বিজয়সেন-প্রতিষ্ঠিত বিজয়-নগরের একটি অংশ ছিল; বিজয়নগর, চব্বিশনগর নাম দুইটি এবং দেওপাড়া প্রশস্তির ইঙ্গিত একান্ত অর্থহীন বলিয়া মনে হয় না। দেওপাড়ার উত্তরে দক্ষিণে প্রায় ৭।৮ মাইল জুড়িয়া প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু চিহ্ন ইতস্তত এখনও বিদ্যমান। এই স্থান পদ্মাতীর হইতে খুব দূরেও নয়।

বিজয়নগর

পূর্ব ও দক্ষিণ-বাংলার সর্বপ্রাচীন নগর সিংহলী পুরাণ-কথিত বঙ্গনগর ও টলেমি-কথিত গঙ্গা-বন্দর (Gange)। গঙ্গা-বন্দর গঙ্গার পঞ্চমুখের একটি মুখে অবস্থিত ছিল; সম্ভবত দ্বিতীয় মুখের তীরে, কিন্তু নিঃসংশয়ে তাহা বলা যায় না। পেরিপ্লাস-গ্রন্থের বিবরণ অনুসারে গঙ্গাবন্দর সমসাময়িককালের সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্র, এবং গ্রীক ঐতিহাসিকের মতে গঙ্গাহৃদি-গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী ও প্রধান নগর। সিংহলী পুরাণ-কথিত বঙ্গনগরের অবস্থিতি সম্বন্ধে কিছুই বলিবার উপায় নাই।

পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গ

গঙ্গাবন্দর-নগর

বঙ্গনগর

ফরিদপুর-কোটালীপাড়ার পট্টোলীগুলিতে নব্যাবকাশিকা, বারকমণ্ডল-বিষয় এবং সুবর্ণবীথী নামে যথাক্রমে একটি ভুক্তি (?)-বিভাগ, একটি বিষয়-বিভাগ এবং একটি

বীথী-বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি শাসনাধিষ্ঠান ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু কাহার কোথায় অবস্থিতি ছিল নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না, তবে বর্তমান ফরিদপুর ও ঢাকা জেলায়, মোটামুটি এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। একটি লিপিতে চূড়ামণি-নৌযোগ নামে একটি নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

নব্যাবকাশিকা
বারকমণ্ডল-বিষয়
সুবর্ণবীথী

দেবখড়্গের আস্রফপুর লিপি দুইটিতে জয়কর্মান্তবাসক নামে একটি নগরের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে; এই নগরটিই বোধ হয় খড়্গরাজাদের রাজধানী অথবা অন্তত জয়স্কন্ধাবার ছিল। কেহ কেহ মনে করেন, কর্মান্তবাসক বা প্রাচীন কর্মান্ত এবং বর্তমান ত্রিপুরা জেলার বড়কামতা গ্রাম এক এবং অভিন্ন। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ সমসাময়িক সমতটের রাজধানীটির নামোল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তাহার একটি বর্ণনা দিয়াছেন।

জয়কর্মান্তবাসক
সমতট-নগর

বর্তমান ত্রিপুরা অঞ্চলে পট্টিকেরা রাজ্যের উল্লেখ একাদশ শতক হইতেই পাওয়া যায়। এই রাজ্যের রাজধানীর ইঙ্গিত ব্রহ্মদেশীয় রাজবৃত্ত-কাহিনীতেও জানা যায়। তবে পট্টিকেরা-নগরের সবিশেষ এবং সুস্পষ্ট সাক্ষাৎ পাইতেছি ত্রয়োদশ শতকে রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেবের একটি লিপিতে। ত্রিপুরা জেলার মধ্যযুগীয় পাটিকেরা বা পাইটকেরা এবং বর্তমান পাটিকারা বা পাইটকারা পরগণা প্রাচীন পট্টিকেরা রাজ্যের নাম ও স্মৃতি বহন করিতেছে। প্রাচীন পট্টিকেরা-নগর এবং বর্তমান পাইটকারা পরগণাস্থিত ময়নামতী পাহাড়ের ময়নামতী গ্রাম খুব সম্ভবত এক এবং অভিন্ন। এই গ্রাম এবং আশপাশের গ্রাম হইতে অনেক প্রত্নবস্তু—লিপি, মূর্তি ও মূর্তির অংশ, ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড, পোড়ামাটির ফলক ইট্-পাথরের টুকরা ইত্যাদি—বহুদিন হইতেই সময় সময় পাওয়া যাইতেছিল। খুব সম্প্রতি আকস্মিক খননের ফলে ময়নামতীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ধ্বংসস্তূপের ভিতর হইতে এক সুপ্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক লিপিখণ্ড, পোড়ামাটির ফলক, মূর্তি, মৃৎপাত্র ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। গোমতীর তীর এবং ময়নামতী পাহাড়ের ক্রোড়স্থিত এই সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষই প্রাচীন পট্টিকেরার ধ্বংসাবশেষ, এমন মনে করিবার সঙ্গত কারণ বিদ্যমান। হরিকালদেবের লিপি হইতে জানা যায়, পট্টিকেরা-নগরে দুর্গোত্তারা নামে এক বৌদ্ধ দেবীর একটি মন্দির ছিল।

পট্টিকেরা

দামোদরদেবের মেহারলিপিতে (১১৫৬ শক) মেহারকুল বা মুকুল নামে একটি নগরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার মেহার গ্রাম এই নগরের স্মৃতি আজও বহন করিতেছে।

মেহারকুল

পূর্ব-বাংলার বৃহত্তম প্রাচীন নগর শ্রীবিক্রমপুর। বিক্রমপুর চন্দ্র, বর্মন, সেন ও দেববংশীয় রাজাদের অন্যতম প্রধান জয়স্কন্ধাবার। পাল-রাজাদের মত সেন-রাজাদেরও

কয়েকটি রাজধানী বা জয়স্কন্ধাবার ছিল, তন্মধ্যে বিক্রমপুরই সর্বপ্রধান ছিল বলিয়া মনে হয়। এই "শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ" বিজয়সেনের একটি, বল্লালসেনের একটি, এবং লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের প্রথম ছয় বৎসরের মধ্যে অন্তত পাঁচটি শাসনলিপি নির্গত হইয়াছিল। এই বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারেই বিজয়সেন-মহিষী বিরাট তুলাপুরুষ মহাদানযজ্ঞ সম্পাদন করাইয়াছিলেন। সুতরাং জয়স্কন্ধাবার অস্থায়ী ছত্রাবাস মাত্র, একথা কিছুতেই সত্য হইতে পারেনা। লক্ষ্মণসেনের দুইটি লিপি এবং বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের লিপিগুলি কিন্তু বিক্রমপুর হইতে নির্গত নয়। বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার কি পরিত্যক্ত হইয়াছিল; না এই পরিবর্তন আকস্মিক? যে ধার্যগ্রাম ও ফল্গুগ্রাম হইতে এই লিপিগুলি উৎসারিত, সে-গ্রাম দু'টিই বা কোথায়?

বিক্রমপুর নামে একটি সুবিস্তৃত পরগণা এখনও ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ জুড়িয়া বিস্তৃত। বিক্রমপুর নামে একটি গ্রাম প্রাচীন দলিল-পত্রে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঢাকা-ফরিদপুরে আজ আর কোনও গ্রামই বিক্রমপুর নামে পরিচিত নয়।

মুন্সীগঞ্জ মহকুমার মুন্সীগঞ্জ সহরের অদূরে সুপ্রসিদ্ধ বজ্রযোগিনী (অতীশ-দীপঙ্করের জন্মভূমি) এবং পাইকপাড়া গ্রামের অদূরে রামপাল নামক স্থানে সুপ্রাচীন একটি নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রায় পনেরো বর্গমাইল জুড়িয়া বিস্তৃত। প্রায় ১৭।১৮টি গ্রাম এই সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়াইয়া আছে; সমস্ত স্থানটি জুড়িয়া ভগ্ন মৃৎপাত্রের অংশ, পুরাতন ইট-পাথরের টুকরা, মূর্তির ভগ্ন অংশ প্রভৃতি নানা পুরাবস্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। সমগ্র স্থানটির ভৌগোলিক সংস্থান উল্লেখযোগ্য। রামপালের উত্তরে ছিল ইচ্ছামতী নদী; এই নদীর নিম্নপ্রবাহ আজ ধলেশ্বরী প্রবাহের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ইচ্ছামতীর প্রাচীন খাতের সমান্তরালে পূর্ব-পশ্চিমে লম্ববান একটি সুউচ্চ প্রকারের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। পূর্বদিকে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র প্রবাহের খাত; ব্রহ্মপুত্র যে একসময় এই নগরের পূর্ব সীমা স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইত এই খাত তাহারই অন্যতম প্রমাণ। পশ্চিমে ও দক্ষিণে দুইটি বিস্তৃত পরিখা; এই দুইটি পরিখা বর্তমানে যথাক্রমে মিরকাদিম খাল ও মকুহাটি খাল নামে পরিচিত। সমগ্র স্থানটি ছিল বোধ হয় নিম্নভূমি; বোধ হয় সেই জন্যই অসংখ্য ছোট বড় দীঘি কাটিয়া নগরভূমিকে সমতল উচ্চভূমিতে পরিণত করা হইয়াছিল। সদ্যোক্ত চতুঃসীমাবেষ্টিত বিস্তৃত নগরের মধ্যে উচ্চতর ভূমিতে রাজপ্রাসাদের বিরাট ধ্বংসস্তূপ এখনও সুস্পষ্ট; জনস্মৃতিতে এই স্তূপ আজও বল্লালবাড়ী নামে খ্যাত। এই নামের মধ্যে বল্লালসেনের স্মৃতি বিজড়িত, সন্দেহ নাই। কিন্তু রামপাল নাম তো পালরাজ রামপালের, এবং খুব সম্ভব রামপালই এই নগর পত্তন না করিলেও ইহার খ্যাতিকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের চারিদিকের প্রাকার ও পরিখা ভগ্নাবস্থায় আজও দৃষ্টিগোচর হয়। ইচ্ছামতীর প্রাচীন খাত্ হইতে একটি সুপ্রশস্ত রাজপথ

নগরটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একেবারে সোজা দক্ষিণ-সীমা পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে; উত্তরতম প্রান্তে এবং দক্ষিণতম প্রান্তে দুইটি সুবৃহৎ নগরদ্বার আজও যথাক্রমে কপালদুয়ার ও কচ্‌কিদুয়ার নামে খ্যাত। এই প্রধান রাজপথ হইতে পূর্ব ও পশ্চিমে অনেকগুলি পথ বাহির হইয়া একেবারে সোজা পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে; এই পথগুলির চিহ্ন এখনও বর্তমান।

এই রামপালই চন্দ্র-বর্মণ সেন-দেববংশের লিপিগুলির শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার বলিয়া মনে হইতেছে। সমগ্র বিক্রমপুর পরগণায় এমন সুপ্রশস্ত এবং ভৌগোলিক দিক হইতে এমন সুবিন্যস্ত ও সুরক্ষিত প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। রামপালের (একাদশ শতকের শেষার্দ্ধ) নাম ও স্মৃতির সঙ্গে জড়িত বলিয়া এই অনুমান আরও গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রবংশীয় রাজাদের আমলেই প্রথম বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারের কথা জানা যাইতেছে (একাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধ); ইহারাই হয়তো এই নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু রামপালই প্রকৃতপক্ষে ইহার খ্যাতি ও মর্যাদার যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা। হয়তো তিনিই ইহাকে বিস্তৃত ও সংস্কৃত করিয়া নিজের নামের সঙ্গে জড়িতও করিয়া থাকিবেন।

অরিরাজ দনুজমাধব দশরথদেবের আদাবাড়ীর লিপির কাল পর্যন্তও বিক্রমপুর নগর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দনুজমাধব দশরথ, হরিমিশ্রের কারিকা-কথিত দনুজমাধব এবং জিয়াউদ্দীন বারণি কথিত সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁ-র রাজা দনুজ রায় যদি একই ব্যক্তি

সুবর্ণগ্রাম

হইয়া থাকেন—এবং তাহা হইবার সঙ্গত কারণও বিদ্যমান—তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার আগে কোনো সময় দনুজমাধব দশরথ বিক্রমপুর হইতে তাঁহার রাজধানী সুবর্ণগ্রামে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এই সময়ের আগে সুবর্ণগ্রামের কোনো উল্লেখ প্রাচীনতর সাক্ষ্যে কোথাও নাই। হইতে পারে, সুবর্ণগ্রাম পূর্বে বিক্রমপুর-ভাগের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার ও বিক্রমপুর-ভাগ এক নহে। বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার বিক্রমপুর-ভাগের শাসন কেন্দ্র; দনুজরায়-দনুজমাধব শাসনকেন্দ্র বিক্রমপুর হইতে উঠাইয়া সুবর্ণগ্রামে লইয়া গিয়া থাকিবেন। সুবর্ণগ্রাম আজও ঢাকা জেলায় মুন্সীগঞ্জের বিপরীত দিকে ধলেশ্বরী-তীরের একটি সমৃদ্ধ গ্রাম; এবং কিছু কিছু পুরাবস্তু এখানেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুঘলপূর্ব মুসলমান রাজাদের আমলে সুবর্ণগ্রামই ছিল পূর্ব-বাংলার রাজধানী। লক্ষ্যা-সঙ্গমের অদূরবর্তী সুবর্ণগ্রামের অবস্থিতি যে সামরিক দিক হইতে গুরুত্বময়, তাহা স্বীকার করিতেই হয়।

৬

প্রাচীন বাংলার গ্রাম ও নগর সম্বন্ধে এইবার দুই একটি সাধারণ মন্তব্য করা যাইতে পারে।

আয়তনে বা আকৃতি-প্রকৃতিতে এক গ্রামের সঙ্গে আর এক গ্রামের যত পার্থক্যই

থাকুক, ঐতিহাসিক কালে অর্থাৎ চতুর্থ-পঞ্চম শতক হইতে একেবারে আদি-পর্বের শেষ পর্যন্ত সমগ্রভাবে বাংলার গ্রামের চেহারা ও প্রকৃতি একই থাকিয়া গিয়াছে। বস্তুত, মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সে-চেহারা ও প্রকৃতির বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নাই বলিলেই চলে। ইহার কারণ একাধিক। প্রথম ও প্রধান কারণ, এই সুদীর্ঘ শতাব্দী পর শতাব্দীর মধ্যে গ্রাম্য উৎপাদন-ব্যবস্থার—কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের উৎপাদনোপায়ের—কোনো পরিবর্তনই হয় নাই। একদিকে গরু ও লাঙ্গল, আখমাড়াই যন্ত্র, অন্যদিকে চরকা ও তাঁতই প্রধান উৎপাদন-যন্ত্র। দ্বিতীয় কারণ, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ভূমি-ব্যবস্থারও কোনো মূলগত পরিবর্তন হয় নাই, এবং ভূমি-নির্ভর কৃষক-সমাজের মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগ তাহাও মোটামুটি একই থাকিয়া গিয়াছে। কোনো গ্রাম হয়ত কখনো ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হওয়ার ফলে, বা শাসনকার্যের অধিষ্ঠান নির্বাচিত হইবার ফলে, বা দুয়েরই ফলে, পৃথক একটা গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে এবং গ্রাম্য সমাজের আকৃতি-প্রকৃতিতে স্থানীয় একটা পরিবর্তনও ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কোনো কোনো গ্রাম শেষোক্ত কারণে গুরুত্ব ও মর্যাদায় স্ফীত ও সমৃদ্ধ হইয়া নগর-মর্যাদায় উন্নীতও হইয়াছে, কিন্তু তাহাও ব্যতিক্রম। ছোট ছোট গ্রামগুলি একাই একক; বড় গ্রামগুলি দেখিতেছি বিভিন্ন পাড়ায় বিভক্ত। আয়তনানুযায়ী প্রত্যেক গ্রামে গ্রামীয় মহত্তর, কুটুম্ব, গৃহস্থ, ভূমিবান ও ভূমিহীন কৃষক, কয়েকঘর শিল্পী, সমাজ-সেবক রজক, নাপিত ইত্যাদি এবং সমাজ-শ্রমিক চণ্ডাল, হাড়ি, ডোম ইত্যাদির বিভিন্ন আয়তন ও মর্যাদার বাস্তুগৃহাদি। এইসব বাস্তু পরস্পর দূরবিচ্ছিন্ন নয়; তবে চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ বর্ণের লোকেরা যে-অংশে বাস করে তাহা প্রধান গ্রামাংশ হইতে একটু বিচ্ছিন্ন। বাস্তুগৃহাদির সংলগ্ন গুবাক, নারিকেল, আম্র, মহুয়া, পনস প্রভৃতি ফলবৃক্ষ; পানের বরজ, পুষ্করিণী, তল, বাটক; কিছু কিছু পতিত বাস্তুভিটা, উচ্চনীচভূমি ইত্যাদি। বাস্তু হইতে অদূরে গ্রামের কৃষিক্ষেত্র; সেই সুবিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে প্রত্যেকের ক্ষেত্রভূমিসীমা আলিদ্বারা সুনির্দিষ্ট; গ্রামের সমগ্র কৃষিভূমি সেই জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। ক্ষেত্রভূমির পাশ দিয়া মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র বৃহৎ খাল নালা ইত্যাদি; এই খাল নালাগুলি শুধু চাষের জল সরবরাহ করে না, গ্রামের পয়ঃপ্রণালীর কাজও করে। ক্ষেত্রভূমির মধ্যে অথবা শেষ সীমায় গোবাট ও তৃণাচ্ছাদিত গোচরভূমি। গ্রামের পাশ দিয়া নদী বা গঙ্গিনিকা বা খাল বা অন্য কোনো জলপ্রবাহ এবং গ্রাম্য লোকজন চলাচলের পথ। কোনো কোনো গ্রামের বাহিরে গ্রাম্য হাট, হট্টিয়গৃহ ইত্যাদি। যে-সব গ্রাম সমুদ্র বা সমুদ্র জোয়ারবাহী নদীর তীরে সেখানে সমুদ্র বা নদীর তীরে তীরে গ্রামের লোকদের লবণের গর্ত। যে-সব গ্রাম বর্ষায় জল-প্লাবিত হয় অথবা নদী ও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসদ্বারা আক্রান্ত হয়, সে-সব গ্রামের নিম্নতর ভূমিতে ক্ষুদ্র বৃহৎ বাঁধ বা জাঙ্গাল। নদী বা বৃহৎ খাল পারাপারের জন্য গ্রাম্য খেয়াঘাট। প্রত্যেক গ্রামেই ক্ষুদ্র বৃহৎ ২।১টি

গ্রাম ও নগর সম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ মন্তব্য

মন্দির; কোনো কোনো গ্রামে ক্ষুদ্র বৃহৎ বৌদ্ধবিহার; পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের গৃহে চতুষ্পাঠী। কেন্দ্র গ্রাম ব্যবসা-বাণিজ্যের যাতায়াত পথের কেন্দ্রে বা সীমায় অবস্থিত সেখানে গঞ্জ, বৃহৎ হাট; জলবাণিজ্যের কেন্দ্র হইলে নদীর ঘাটে বা সমুদ্রের খাড়ীতে অসংখ্য নৌকার সমাবেশ, যেমন ফরিদপুর-কোটালীপাড়া অঞ্চলের গ্রামগুলিতে। এই সব গ্রাম অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ সন্দেহ নাই। এই তো মোটামুটি প্রাচীন বাংলার গ্রামের চিত্র, এবং এ-চিত্র সমসাময়িক বাংলার লিপিগুলিতে সুস্পষ্ট। মোটামুটি এই চিত্র অষ্টাদশ শতকের শেষ, এমন কি উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার গ্রামগুলিতে দেখা যাইতেছে। সমসাময়িক সাহিত্যে, যেমন রামচরিতে এবং সদুক্তিকর্ণামৃতের দুই একটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে প্রাচীন বাংলার গ্রামগুলির মনোরম কাব্যময় ছবি আঁকা হইয়াছে। রামচরিতে বরেন্দ্রীর গ্রাম বর্ণণাপ্রসঙ্গে বলা হইতেছে (৩।৫-২৮)

> বরেন্দ্রীতে জগদ্দল মহাবিহার, এই দেশেই বোধিসত্ত্ব লোকেশ ও তারার মন্দির। ইহার স্কন্দনগর এবং বহুমন্দির শোভিত শোণিতপুর (বাণগড়-কোটিবর্ষ) নগরে অসংখ্য ব্রাহ্মণের বাস। এই ভূমির দুই প্রান্তে গঙ্গা ও করতোয়া, আর পুনর্ভবার তীরে প্রসিদ্ধ তীর্থঘাট। বরেন্দ্রীতে প্রচুর বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় (বিল ?) : সেই জলাশয় হইতে বলভী ও কীর্ণতোয়া কালিনদীর উদ্ভব। স্থানে স্থানে কোকিল কূজিত, কন্দ-লকুচ-শ্রীফল-লবলী-করুণা-প্রিয়ালা শোভিত উদ্যান; মাঠে মাঠে নানা প্রকারের ধানের ক্ষেত, এলার ক্ষেত, প্রিয়ঙ্গুলতা এবং ইক্ষু ও বাঁশের ঝাড়, অগণিত মহুয়া, সুপারী ও নারিকেল গাছ। জলাশয়ে জলাশয়ে নীল ও লাল পদ্ম, গৃহপ্রাঙ্গণে কনক (চম্পক) ও কেতক ফুলের গাছ; আকাশে বিস্তৃত ও দ্রুতসঞ্চরমান প্রচুর বারিবর্ষী মেঘ।

লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া-লিপিতে শালিধান্যভারাবনত শস্যক্ষেত্র এবং রমণীয় উদ্যান শোভিত গ্রামের উল্লেখ আছে, অন্যান্য ২।১টি লিপিতেও ধান্যভারাবনত শস্যসমৃদ্ধ গ্রাম্য শোভার ইঙ্গিত আছে, এমন কি ২।১টি গ্রামে হর্ম্যাবলীর কথাও আছে।

বর্ষায় ও হেমন্তে বাংলার গ্রাম-বর্ণনা, গ্রাম্য কৃষকের চিত্র প্রভৃতি সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থ হইতে অন্যত্র উদ্ধার করিয়াছি (দেশ-পরিচয় প্রসঙ্গে জলবায়ু-বর্ণনা দ্রষ্টব্য)। শালিধান্য ও ইক্ষুশস্য সমৃদ্ধ এবং ইক্ষুযন্ত্রধ্বনিমুখরিত বাংলার টুক্‌রা টুক্‌রা চিত্র লিপিমালায় এবং সমসাময়িক সাহিত্যে অন্যত্রও পাওয়া যায়।

গ্রামগুলি মোটামুটি অপরিবর্তিত, কিন্তু প্রাচীন বাংলার নগরগুলি সম্বন্ধে কিন্তু তাহা বলা চলে না বলিয়াই মনে হইতেছে। খ্রীষ্টপূর্ব শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত যতগুলি নগরের খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহার অধিকাংশই যেন প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর। তাম্রলিপ্তি তো বটেই, এমন কি পুণ্ড্রনগর, বর্দ্ধমান, গঙ্গাবন্দর-নগর, নব্যাবকাশিকা-নগর, বারকমণ্ডল-বিষয়ের নগর প্রভৃতি সমস্ত নগরই সুপ্রশস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য পথের উপর অবস্থিত। তাম্রলিপ্তি, গঙ্গাবন্দর, ও পুণ্ড্রনগর সম্বন্ধে যে-সমস্ত বিবরণ প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থ, চীনপরিব্রাজকদের বিবরণ, পাশ্চাত্য বণিক ও ভৌগোলিকদের বিবরণ ইত্যাদির মধ্যে পাইতেছি, তাহাতে এসম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকে না। নব্যাবকাশিকা-

বারকমণ্ডল-পুণ্ড্রনগর-বর্দ্ধমানে শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা যেন বাণিজ্য-সমৃদ্ধির উপরই নির্ভর করিত; পুণ্ড্রনগরের ক্ষেত্রে তীর্থমহিমাও অবশ্যই কার্যকরী ছিল। এই উভয় কারণের জন্যই হয়তো মৌর্য ও গুপ্ত-রাজারা এইখানেই শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গঙ্গা-বন্দর ও তাম্রলিপ্তির গুরুত্ব নিরঙ্কুশ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর। কোটিবর্ষ, পঞ্চনগরী, পুষ্করণ, প্রভৃতি নগর প্রধানত রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রয়োজনে হয়তো গড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কোটিবর্ষের অবস্থান এবং প্রাচীন সাহিত্যের উল্লেখ-ইঙ্গিতে মনে হয়, এই নগরের কিছু কিছু বাণিজ্য এবং তীর্থমহিমাও ছিল। বস্তুত, অন্তত ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার সব কয়টি নগরেরই অবস্থিতি ও বিবরণ যতটুকু জানা যায়, তাহাতে মনে হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য বিবেচনার উপরই ইহাদের মর্যাদা ও অস্তিত্ব প্রধানত নির্ভর করিত। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে বাংলার নাগর-সভ্যতার যে সমসাময়িক চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতেও সদাগরী ধনতন্ত্রের লক্ষণ সুস্পষ্ট। কিন্তু সপ্তম শতক ও তাহার পর হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষত সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বাংলার নগরগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি ধীরে ধীরে বদলাইতে আরম্ভ করে। সপ্তম শতকে য়ুয়ান-চোয়াঙ্ বাংলার যে-কয়টি নগরের বিবরণ দিতেছেন, তাহাদের মধ্যে এক তাম্রলিপ্তি ছাড়া আর একটিরও বাণিজ্য-প্রাধান্যের ইঙ্গিত নাই, বরং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন-প্রেরণার ইঙ্গিত আছে। কর্ণসুবর্ণ, ঔদুম্বর নগর, কযঙ্গল-নগর, সমতট-নগর, এমন কি পুণ্ড্রনগর সম্বন্ধেও য়ুয়ান্-চোয়াঙের বর্ণনার ইঙ্গিত লক্ষ্যণীয়। অষ্টম-নবম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু আমলের শেষ পর্যন্ত যে-কয়টি নগরের বর্ণনা উপরে করা হইয়াছে, তাহাদের ভৌগোলিক অবস্থিতি, নগর-বিন্যাস, এবং সমসাময়িক উল্লেখের ইঙ্গিত একটু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, অধিকাংশ নগরের পশ্চাতে রাষ্ট্রীয়, বিশেষভাবে সামরিক প্রয়োজন-বিবেচনা সক্রিয়। মুদ্গগিরি, বিলাসপুর, হরধাম, রামাবতী, লক্ষ্মণাবতী, বিজয়পুর, সপ্তগ্রাম, বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম, পট্টিকেরা প্রভৃতি সমস্ত নগর সম্বন্ধেই এই উক্তি প্রযোজ্য। দুই একটি নগর, যেমন, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, সোমপুর এবং অন্যান্য বৌদ্ধ বিহার-নগর প্রভৃতির পশ্চাতে হয়তো ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রয়োজন-প্রেরণাই প্রধান বিবেচনার বিষয় ছিল। অন্যত্র সর্বত্রই এই প্রয়োজন-বিবেচনা গৌণ।

রামাবতী ও বিজয়পুরের যে বর্ণনা যথাক্রমে রামচরিত ও পবনদূতে পাইতেছি, মহাস্থান-বাণগড়-রামপাল-পট্টিকেরা প্রভৃতি নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নগর-বিন্যাসের যে-চিত্র উদ্ঘাটিত হইতেছে তাহা সমস্তই অষ্টম শতক পরবর্তী। বলা বাহুল্য, যে ভাবে নগরগুলি অবস্থিত ও বিন্যস্ত তাহাতে সামরিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন, রাজকীয় প্রয়োজন এবং ধন ও বংশাভিমান-সমৃদ্ধ অভিজাত শ্রেণীসমূহের প্রয়োজনকেই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে বেশি। রামাবতী-লক্ষ্মণাবতী দুইই গঙ্গা-মহানন্দার সঙ্গমে রাজমহল গিরিবর্ত্মের প্রবেশ মুখের প্রহরী; পুণ্ড্রনগর করতোয়ার উপর; কোটিবর্ষ পূর্ণভবার তীরে; রামপাল ইচ্ছামতী-

ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমে; পট্টিকেরা গোমতী নদী ও ময়নামতী পাহাড়ের ক্রোড়ে; বিজয়পুর ভাগরথী-যমুনা-সরস্বতী এই ত্রিবেণী সঙ্গমের অদূরে। মহাস্থান-বাণগড়-রামপালের ধ্বংসাবশেষ বিশ্লেষণে দেখা যাইতেছে, প্রত্যেকটি নগরই প্রাকার-বেষ্টিত, এবং প্রাকারের পরেই পরিখা। নগর হইতে নগরোপকণ্ঠে বা নদীর ঘাটে যাইবার জন্য প্রাকারের প্রত্যেক দিকেই এক বা একাধিক নগরদ্বার, এবং পরিখার উপর দিয়া সেতু। পরিখার অপর পারে নগরোপকণ্ঠে সমাজ-সেবক, সমাজ-শ্রমিক এবং নগর-নির্ভর কুটুম্ব-গৃহস্থদের বাস; কোথাও কোথাও মন্দির, সংঘ, বিহার প্রভৃতিও আছে। নগরাভ্যন্তরে উচ্চতর ভূমির উপর প্রাচীর-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন রাজকীয় এবং শাসনকার্যসংক্রান্ত অট্টালিকাদি। সোজা সরল রেখায় পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে লম্ববান্ রাজপথদ্বারা সমস্ত নগরভূমি পৃথক পৃথক চতুর্ভুজে বিভক্ত; রাজপথের দুইধারে সমান্তরালে প্রাসাদোপম আবাস-সৌধশ্রেণী, আপণি-বিপণি প্রভৃতি। তাহা ছাড়া, হাট, বাজার, মন্দির, প্রমোদোদ্যান, দীঘি, পুষ্করিণী, বিহার প্রভৃতি তো ছিলই; য়ুয়ান-চোয়াঙের বর্ণনায়ও তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। রামাবতী ও বিজয়পুরের কাব্যময় বর্ণনাতেও পাইতেছি, সুপ্রশস্ত রাজপথের দুইধারে সমান্তরালবর্তী সুউচ্চ সুরম্য প্রাসাদোপম অট্টালিকাশ্রেণী, প্রত্যেক অট্টালিকার চূড়ায় সুবর্ণকলস; মন্দির, বিহার, প্রমোদোদ্যান; বৃহৎ দীঘির চারিধার তালবৃক্ষ ও সুসজ্জিত প্রস্তরখণ্ডদ্বারা শোভিত ও অলঙ্কৃত।

সকল নগরই যে এইরূপ সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যবান্ ছিল, এমন বলা যায় না। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরও ছিল যাহাদের সামরিক বা রাষ্ট্রীয় বা অন্য কোনো গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল না, প্রধানত স্থানীয় শাসনাধিষ্ঠানের কেন্দ্ররূপই যাহাদের পত্তন হইয়াছিল। বিষয়াধিষ্ঠান, মণ্ডলাধিষ্ঠান, বীথী অধিষ্ঠান প্রভৃতি জাতীয় নগর সর্বত্র উপরোক্ত নগরগুলির মত সমৃদ্ধ নিশ্চয়ই ছিলনা। ছোট ছোট তীর্থ বা শিক্ষাকেন্দ্রগুলিও তাহা ছিল না। এগুলি বরং অনেকটা বৃহৎ সমৃদ্ধ গ্রামের মতনই ছিল বলিয়া অনুমান হয়। ছোট ছোট বাণিজ্যকেন্দ্র গুলিও তাহাই ছিল। বিষয়, মণ্ডল বা বীথীর অধিষ্ঠানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজস্বসংগ্রহের, স্থানীয় বিচার-ব্যবস্থার, ভূমি-ব্যবস্থার, শান্তিরক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র। কিছু কিছু স্থানীয় বাণিজ্যকার্যও এই সব কেন্দ্রে নির্বাহিত হইত। এইসব উপলক্ষে কিছু কিছু রাজকর্মচারী, শিল্পী, বণিক প্রভৃতির এ-জাতীয় অধিষ্ঠান গুলিতে বাসও করিতেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও গ্রামের সঙ্গে এই জাতীয় নগরের বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিলনা। অধিকাংশ লিপির সাক্ষ্যেই দেখা যায়, এই জাতীয় ছোট ছোট নগরের সঙ্গে গ্রামগুলি একেবারে সংলগ্ন; নগরের পথ গ্রামে গিয়া মিশিয়াছে, অথবা গ্রামেরই পথ নগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। নিকটস্থ গ্রামের উৎপাদিত কৃষি ও শিল্পবস্তু লইয়াই এই সব ছোট ছোট নগরের স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য। অবশ্য, কোটীবর্ষ-বিষয়ের অধিষ্ঠান কোটীবর্ষ-নগর সম্বন্ধে একথা বলা চলেনা, কারণ এই নগরের গুরুত্ব ও মর্যাদা শুধু বিষয়াধিষ্ঠান বলিয়া নয়; তীর্থ ও

ধর্মকেন্দ্র এবং আন্তর্দেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে ইহার অন্যতর গুরুত্ব এবং মর্যাদা ছিল।

৭

আগেই বলিয়াছি, নগরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ ধনের প্রধান সঞ্চয়-কেন্দ্র ছিল; তাহা ছাড়া গৃহশিল্প ও কৃষিলব্ধ ধনের প্রধান বণ্টন-কেন্দ্রও ছিল নগরগুলি। তাহার ফলে সামাজিক ধনের অধিকাংশই কেন্দ্রীকৃত হইত নগরে, এবং অল্পসংখ্যক নগরবাসীই সেই ধনের অপেক্ষাকৃত অধিকাংশ ভোগের সুযোগ ও অধিকার লাভ করিত। ইহাই নগরগুলির ঐশ্বর্য, বিলাস ও আড়ম্বরের মূলে। বস্তুত, পাল ও সেন আমলের লিপি ও সমসাময়িক সাহিত্যপাঠে মনে হয়, নগর ও গ্রামের প্রথম এবং প্রধান পার্থক্যই যেন নির্ণীত হইত ঐশ্বর্য বিলাসাড়ম্বরের তারতম্যদ্বারা। রামচরিতে রামাবতীর এবং পবনদূতে বিজয়পুরের বর্ণণায় দেখিতেছি, রাজপথের দুইধারে চলিয়াছে প্রাসাদের শ্রেণী, নগরে সঞ্চিত প্রচুর মণিরত্ন সম্ভার। রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধন নগরের নাগরিকদের ধনৈশ্বর্যের বর্ণণা আছে বাররামা নর্তকী কমলার গল্প প্রসঙ্গে; কিন্তু তাহারও আগে তৃতীয়-চতুর্থ শতকে বাংলাদেশের নগরগুলি যখন সদাগরী বাণিজ্যলব্ধ ধনে সমৃদ্ধ তখন বাৎস্যায়ন এদেশের নগর ও নাগর সভ্যতার কিছু আভাস রাখিয়া গিয়াছেন। বাৎস্যায়নের কামসূত্র সমসাময়িক ভারতীয় নাগর-সভ্যতার ইতিহাস এবং নাগর যুবক-যুবতীদের অনুশীলন-গ্রন্থ। তিনি এই নাগর-সভ্যতারই জয়গান করিয়াছেন, এবং নাগরাদর্শকেই বিদগ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ বলিয়া পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তদানীন্তন শিক্ষা, রুচি ও সংস্কারানুযায়ী। বাংলাদেশের সমসাময়িক নাগর-সভ্যতা সম্বন্ধেও তাঁহার কিছু বক্তব্য আছে। গৌড়ের নগরপুষ্ট অবসরসমৃদ্ধ নরনারীদের কামলীলা ও ঐশ্বর্যবিলাসের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট চিত্র তিনি রাখিয়া গিয়াছেন; গৌড় নাগরকেরা যে লম্বা লম্বা নখ রাখিতেন এবং সেই নখে রং লাগাইতেন যুবতীদের মনোহরণ করিবার জন্য, তাহাও বাৎস্যায়ন লিখিয়া যাইতে ভুলেন নাই। গৌড় ও বঙ্গের রাজপ্রাসাদান্তঃপুরের নারীরা প্রাসাদের ব্রাহ্মণ, রাজকর্মচারী, ভৃত্য ও দাসদের সঙ্গে কিরূপ লজ্জাকর কামষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেন তাহার সাক্ষ্যও বাৎস্যায়ন দিতেছেন। নাগর অভিজাত শ্রেণীর অবসর এবং স্বল্পায়াসলব্ধ ধনপ্রাচুর্য তাহাদিগকে ঐশ্বর্য-বিলাস এবং কামলীলার চরিতার্থতার একটা বৃহৎ সুযোগ দিত; বাৎস্যায়নে তাহার আভাস সুস্পষ্ট। অভিজাতগৃহে নর্তকী-বিলাসের ইঙ্গিতও বাৎস্যায়ন দিয়াছেন। কিন্তু শুধুই বাৎস্যায়ন নহেন; কহ্লন তাঁহার রাজতরঙ্গিনীতে অষ্টম শতকের পুণ্ড্রবর্ধন-নগরের নর্তকী কমলার কথা বলিতেছেন। কমলা নগরের কোনো মন্দিরের দেবদাসী বা নর্তকী ছিলেন, নৃত্যেগীতে সুদক্ষা এবং অন্যান্য কলাবিদ্যায় নিপুণা। বস্তুত,

গ্রামীণ ও নাগর সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রকৃতি

বাৎস্যায়ন এই সব নর্তকী ও সভানারীদের যে-সব কলানিপুণতা থাকা প্রয়োজন বলিয়া বর্ণণা করিয়াছেন, কমলার তাহাই ছিল। অভিজাত নাগর যুবকদের মনোরঞ্জন করিয়া কমলা প্রচুর ধনৈশ্বর্যের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। সমসাময়িক নাগর অভিজাত সমাজে এই প্রথা কিছু নিন্দনীয়ও ছিলনা। তাহা হইলে সন্ধ্যাকর-নন্দী রামচরিতে এবং ধোয়ী-কবি পবনদূতে যে-ভাষায় নাগর-বাররামাদের স্তুতিবাদ করিয়াছেন তাহা কিছুতেই হয়তো সম্ভব হইত না; বরং ইহাদের বর্ণণা হইতে মনে হয়, নাগর অভিজাত সমাজে নর্তকী, সভানারী, বাররামা, দেবদাসীরা অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তি, বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের লিপিগুলিতেও ইহাদের উচ্ছ্বসিত স্তুতিবাদের সাক্ষাৎ মেলে। বিজয়সেন (দেওপাড়ালিপি) ও ভট্ট ভবদেব তাঁহাদের নির্মিত মন্দিরে শত শত দেবদাসী নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাহাদের সৌন্দর্য ও কামাকর্ষণ বর্ণনায় প্রশস্তিকারেরা অজস্র স্তুতিবাদ বর্ষণ করিয়াছেন। রামাবতীর নারীদের সম্বন্ধে রামচরিতের কবিও তাহাই করিয়াছেন।

নাগরিক ঐশ্বর্যবিলাসাড়ম্বরের চিত্র এইখানেই শেষ নয়। নানাপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র, মণিরত্নখচিত ধাতব অলঙ্কার, স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈজসপত্র, প্রাসাদোপম সৌধাবলী, মন্দির ইত্যাদির বর্ণনায় দশম-একাদশ শতক-পরবর্তী লিপিগুলি এবং সমসাময়িক নাগর-সাহিত্য প্রায় ভারাক্রান্ত। সপ্তম শতকে ইৎসিঙ্ প্রয়োজন ও ক্ষমতার অতিরিক্ত বৃহৎ সামাজিক ভোজের অপব্যবস্থার কথাও বলিয়াছেন; বাংলাদেশের গ্রামে নগরে সর্বত্র এই বৃহৎ সামাজিক অপব্যয় আজও অব্যাহত চলিতেছে। বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে একটি অর্থবহ শ্লোক আছে। গ্রাম্য ব্রাহ্মণ মেয়েরা মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, মরকত প্রভৃতি দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন না; কার্পাস-বীজ, শাকপত্র, অলাবুপুষ্প, দাড়িম্ব-বীচি, কুষ্মাণ্ডপুষ্পই তাঁহাদের অধিকতর পরিচিত। কিন্তু বিজয়সেনের কল্যাণে অনেক ব্রাহ্মণ-পরিবার নগরবাসী হইয়াছিলেন এবং বিত্তবানও হইয়াছিলেন। তখন নাগরীরা (নাগরীভিঃ) ব্রাহ্মণীদের মুক্তা, রৌপ্য, স্বর্ণ, মরকত প্রভৃতি চিনিতে শিখাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কবিজনোচিত অত্যুক্তি আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু গ্রাম্য নারী এবং নগরের নাগরীদের প্রকৃতির পার্থক্যের যে-ইঙ্গিত আছে তাহাও লক্ষ্যণীয়।

সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে গ্রাম্য ও নাগর সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রকৃতি-পার্থক্য খুব সুন্দর ফুটিয়াছে। আপেক্ষিক তুলনার জন্য এই শ্লোকগুলি পর পর উদ্ধার করা যাইতে পারে।

পল্লীগ্রামের লোকেরা নগরবাসিনীদের চালচলন পছন্দ করিতেন না। কবি গোবর্ধনাচার্য বলিতেছেন :

> ঋজুনা নিধেহিচরণৌ পরিহর সখি নিখিলনাগরাচারম্।
> ইহ ডাকিনীতি পল্লীপতিঃ কটাক্ষেঽপি দণ্ডয়তি॥

ওগো সখি, ঋজুভাবে পদক্ষেপ করিয়া চল, নাগরাচার সব পরিত্যাগ কর। কটাক্ষপাত করিলেও গ্রামপতি এখানে ডাকিনী বলিয়া ভৎস'না করে।

এই প্রকৃতি-পার্থক্য এখনও কি সত্য নয়? ইহারই সঙ্গে বঙ্গীয় (অর্থাৎ পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গীয়) নগরবাসিনী গৃহস্থ বারাঙ্গনাদের বেশভূষার বর্ণনা উদ্ধার করা যাইতে পারে। জনৈক অজ্ঞাতনামা কবি বলিতেছেন :

বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়োঃ কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রীর্
মালাগর্ভঃ সুরভিমসৃণৈর্গন্ধ তৈলৈঃ শিখণ্ডঃ।
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং
বেশঃ কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গবারাঙ্গনাম॥

দেহ সূক্ষ্ম বস্ত্র, ভুজবন্ধে সোনার অঙ্গদ, গন্ধতৈলের সুরভিযুক্ত মসৃণ কেশ শিখণ্ড বা চূড়ার মত করিয়া বাঁধা এবং তাহা মালাগর্ভ (অর্থাৎ ফুলের মালা বেশচূড়ায় জড়ান); কর্ণলতিকায় নবশশিকলার মত নির্মল তালপাতার অলঙ্কার—বঙ্গবারাঙ্গনাদের এই বেশ কাহার না মন হরণ করে!

অথচ, ইহারই পাশে পাশে জনৈক কবি চন্দ্রচন্দ্রের পল্লী-বিলাসিনীদের বর্ণনা লক্ষ্যণীয় :

ভালে কজ্জল বিন্দুরিন্দু কিরণস্পর্ধী মৃণালাঙ্কুরো
দোর্বল্লীষু শলাটুফেনিলফলোত্তংসশ্চ কর্ণাতিথিঃ।
ধম্মিল্লস্তিলপল্লবাভিষবণস্নিগ্ধঃ স্বভাবাদয়ং
পান্থান্ মন্থরয়ত্যনাগর বধূবর্গস্য বেশগ্রহঃ॥

কপালে কজ্জলবিন্দু, হস্তে ইন্দুকিরণস্পর্ধী শ্বেত পদ্মডাঁটার বলয়, কর্ণে কোমল রীঠাফুলের কর্ণাভরণ, কেশ স্নানস্নিগ্ধ এবং কবরীতে তিলপল্লব নিবদ্ধ—পল্লীবধূদের এই বেশ স্বতঃই পান্থদের গমন মন্থর করিয়া আনে।

কবি শুভাংক বলিতেছেন, নগরে রাজসৌধাবলীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যুবতীদের ক্রীড়াযুদ্ধে ছিন্ন হারের মুক্তাসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে থাকে; সেখানে 'বিলাসগৃহে পিঞ্জরস্থিত শুক'; রাজপ্রাসাদে মূলব্যান প্রস্তরখচিত ফুল, কণ্ঠহার, কর্ণাঙ্গুরী, স্বর্ণখচিত বলয় এবং নূপুর পরিধান করিয়া ভৃত্যাঙ্গনারা' ঘুরিয়া বেড়ায়; এবং নগর প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া নগরাঙ্গনারা নিম্নে রাজপথে চলমান সুদর্শন যুবকের উপর কামকটাক্ষ নিক্ষেপ করেন (সদুক্তিকর্ণামৃত)। অথচ, অন্যদিকে গ্রাম্যজীবনের একাংশে নিষ্করুণ দারিদ্র্য। কবি বার ও অন্য একজন অজ্ঞাতনামা কবি এই দারিদ্র্যের ছবিও আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। অন্যত্র এই শ্লোক দুইটি উদ্ধার করা হইয়াছে (রাষ্ট্রবিন্যাস-অধ্যায়ের উপসংহার দ্রষ্টব্য)। জীবনের সেই দিক্‌টায় 'নিরানন্দে দেহ শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণবস্ত্র; ক্ষুধায় শিশুদের চক্ষু ও পেট কুক্ষিগত, আকুল হইয়া তাহারা খাদ্য প্রার্থনা করিতেছে। দীনা দুঃস্থা গৃহিণী চক্ষুর জলে আনন ধৌত করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এক মান তণ্ডুলে যেন তাহাদের একশত দিন চলে।' আর একটি পরিবারেও একই চিত্র। 'শিশুরা ক্ষুধায় পীড়িত, তাহাদের দেহ শবের মত শীর্ণ, আত্মীয়-

[illegible] বস্থাবস্থ, পুরাতন [illegible] [illegible] এককোঁটা মাত্র জল ধরে। গৃহিণীর পরিধানে শতছিন্ন বস্ত্র' (সদুক্তিকর্ণামৃত)।

গ্রাম্য সমৃদ্ধির ছবিও আছে। তেমন দুইটি শ্লোক দেশ-পরিচয় অধ্যায়ে জলবায়ু বর্ণনা-প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছি। একটি ছবি এইরূপ : 'বর্ষায় প্রচুর জল পাইয়া ধান চমৎকার গজাইয়া উঠিয়াছে, গরুগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে ; ইক্ষুর সমৃদ্ধিও দেখা যাইতেছে। অন্য কোনো ভাবনা আর নাই। ঘরে গৃহিণী সারাদিনের শেষে প্রসাধনরতা। বাহিরে আকাশ হইতে জল ঝরিতেছে প্রচুর। গ্রাম্য যুবক সুখে নিদ্রা যাইতেছে।' অন্য আর একটি ছবি : 'হেমন্তে কাটা শালি ধান্যে চাষীর গৃহাঙ্গন স্তূপীকৃত ; নবজাত শ্যামল যবাঙ্কুর ক্ষেত্রসীমা ছাড়াইয়া যেন বিস্তৃত ; গরু, ষাঁড় ও ছাগলগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নূতন খড় খাইয়া তৃপ্তি ও আনন্দ পাইতেছে ; গ্রামগুলি ইক্ষুপেষণযন্ত্রের শব্দে মুখর আর নূতন গুড়ের গন্ধে আমোদিত' (সদুক্তিকর্ণামৃত)। বস্তুত, প্রাচীন বাংলার কৃষিজীবী গ্রাম্য বাঙালী গৃহস্থের পরম এবং চরম কামনাই হইতেছে, 'বিষয়পতি অর্থাৎ স্থানীয় শাসনকর্তা যেন লোভহীন হ'ন, ধেনুদ্বারা গৃহ যেন পবিত্র হয়, ক্ষেত্রে যেন চাষ হয়, এবং গৃহিণী যেন অতিথিসংকারে কখনও ক্লান্ত না হ'ন'। কবি শুভাংক পল্লীবাসী ভদ্র গৃহস্থের এই কামনাটি ব্যক্ত করিয়াছেন (সদুক্তিকর্ণামৃত)।

> বিষয়পতিরলুব্ধো ধেনুভির্ধাম পূতং
> কতিচিদভিমতায়াং সীম্নি সীরা বহন্তি।
> শিথিলয়তি চ ভার্যা নাতিথেয়ী সপর্যাম্
> ইতি সুকৃতমনেন ব্যঞ্জিতং নঃ ফলেন ॥

লক্ষ্মণসেনের সুহৃদ ও সভা-কবি শরণ গ্রাম্যজীবনের আর একটি ছবি রাখিয়া গিয়াছেন ; এই ছবিটি উদ্ধার করিয়াই এই অধ্যায় শেষ করা যাইতে পারে ; ছবিটি সুন্দর, বস্তুনির্ভর এবং চমৎকার কাব্যচিত্রময়।

> এতাস্তা দিবসান্তভাস্করদৃশো ধাবন্তি পৌরাঙ্গনাঃ
> স্কন্ধপ্রস্খলদংশুকাঞ্চলধৃতিব্যাসঙ্গবদ্ধাদরাঃ।
> প্রাতর্যাতকৃষীবলাগমভিয়া প্রোৎপ্লুত্যবর্ত্মচ্ছিদো
> হট্টক্রয্যপদার্থমূল্যকলন ব্যগ্রাঙ্গুলিগ্রন্থয়ঃ॥ (সদুক্তিকর্ণামৃত)

এই তো দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে পৌরাঙ্গনারা ; তাহাদের চক্ষু দিবসান্তসূর্যের মত (অরুণবর্ণ) ; দ্রুত গমনহেতু তাঁহাদের স্কন্ধের অঞ্চল বারংবার খসিয়া পড়িতেছে, আর বার বার তাহা তুলিয়া দিবার জন্য তাহারা ব্যগ্র। ঘরের চাষী (স্বামী-পুত্র-ভ্রাতারা) প্রাতঃকালে বাহির হইয়া গিয়াছে (মাঠের কাজে) ; তাহাদের (ঘরে) ফিরিয়া আসিবার সময় হইয়াছে ভাবিয়া মেয়েরা লাফাইয়া লাফাইয়া পথ ছেদন করিতেছে (অর্থাৎ সংক্ষেপ করিয়া আনিতেছে), (অথচ সেই অবস্থাতেই) তাহারা হাটে ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য আঙুলে গুণিতে ব্যস্ত।

অষ্টম অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

১। কথাসরিৎসাগর—Ed. by Tawney and Penzer. II, 171 p., 188-89 p., 223-24 p., 287 p. ; III. 4 p., 218 p., 229-30 p., 232 p.
২। কামসূত্র—৬।৪৯ ; ৬।৩৮ ; ৬।৪১ ইত্যাদি
৩। গোরক্ষবিজয়—৩৯ পৃ, ১০১ পৃ, ১২০ পৃ
৪। গৌড়লেখমালা—বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সং।
৫। গৌড়রাজমালা— " " " রমাপ্রসাদ চন্দ, প্রণীত। ১৫ পৃ
৬। গোপীচাঁদের গান—দীনেশচন্দ্র সেন সং। ২য় খণ্ড, ৪২৮ পৃ।
৭। ত্রিকাণ্ডশেষ, ১৬ পৃ।
৮। দশকুমার চরিত, ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস।
৯। পবনদূতম—Ed. by Chintaharan Chakravarti. Intro., ২৮ পৃ, ৩৬ পৃ ইত্যাদি
১০। পদ্মপুরাণ—৪৩৭ পৃ।
১১। বল্লালচরিত—২৭।২।১
১২। বায়ুপুরাণ—২৩।১৯৬
১৩। বৃহৎসংহিতা—১৪।৭ ; ১৬।৩
১৪। মহাবংশ—Ed. by Geiger. XI, 23-24 p., 38-39 p. ; XIX, 5-6 p.
১৫। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প—T. S. S. edn. LXX. ii, 89 p.
১৬। মীনচেতন—৮ পৃ।
১৭। রামচরিত—V. R. Society edn. ৩।২৯-৩২ ; ৩।৩৭ ইত্যাদি
১৮। রাজতরঙ্গিনী—৪।৪২১-২২ ইত্যাদি
১৯। সদুক্তিকর্ণামৃত—Ed. by Ramavatara and Haradatta Sarma.
২০। সম্বন্ধনির্ণয়—লালমোহন বিদ্যানিধি সম্পাদিত। ৩য় সং। ৭০৮ পৃ
২১। সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড।
২২। Abid Ali Khan—Memoirs of Gaur and Pandua
২৩। Ain-i-Akbari—Jarrett's edn. II. 131 pp.
২৪। Ann. Rep. Arch. Sur. Burma—1921-22, 61-62 pp.
২৫। Ann. Rep. Arch. Sur. India—1928-29, 191-93 pp.
২৬। Bhattasali, N. K.—Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum. Intro.
২৭। Chakladar, H. C.—Social Life in ancient India...146 pp.
২৮। Dacca University—History of Bengal. I. 33 pp., 251-52 pp., 257-58 pp. etc.
২৯। Elliot and Dowson, *trans.*,—History of India...116 p.
৩০। Epigraphia Indica—I. 336 p. ; III. 348 p., 353 p. ; IV. 210 p. ; IX. 107. ; XIII. 285 p. ; XXIII. 103 p.
৩১। Hmann Yazawin or the Glass Palace Chronicle—Trans. by Maung Tin and Luce.
৩২। Harvey, G. E.—History of Burma. Chap. I.
৩৩। Hunter—Statistical account of Bengal. VII. 28 p., 51-53 pp.
৩৪। Inscriptions of Bengal—Ed. by N. G. Majumdar. Vol. III.

৩৫। Indian Antiquary—XVII. 121 p. ; 1919. 208-11 pp.
৩৬। J. A. S. B.—N. S., V. 215-16 pp.
৩৭। J. R. A. S.—1914. 101 p., 105 p. ; 1896. 112 p.
৩৮। Legge, *ed.*—Fa-hien...100 p.
৩৯। Modern Review, 1922, Nov. 612-14 pp. ; 1937, 198-201 pp.
৪০। Rennell—Memoir of a map of Hindoostan. 55 p.
৪১। Sacred Books of the East. XXII. 264 p.
৪২। Saraswati, S. K.—Forgotten cities of Bengal. Cal. Geog. Rev. 1936. 17-18 p.
৪৩। Tabaqat-i-Nasiri—562 p. ; 585-86 pp., 591 p.
৪৪। Takakusu—I-tsing...xxxiii, 40 p., 211 p. etc.
৪৫। Varendra Research Society—Monograph No 2.
৪৬। Watters—Yuan Chwang. II. পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কযঙ্গল প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।
৪৭ এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের যে-সব লিপিমালা হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাদের পাঠনির্দেশ পরিশিষ্টে পাওয়া যাইবে।

নবম অধ্যায়

রাষ্ট্র-বিন্যাস

১

প্রাচীন বাংলার সমাজ-বিন্যাসের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখিতে হইলে রাষ্ট্র-বিন্যাসের চেহারাটাও একবার দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল মাত্র নয়, অর্থশাস্ত্র-দণ্ডশাস্ত্র অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ব্যাকরণের উদাহরণ মাত্র নয়; সমসাময়িক সমাজেরই রূপ কমবেশি রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হয়, সেই সমাজের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে, অর্থশাস্ত্র-দণ্ডশাস্ত্র রচিত হয়। কোনও শাস্ত্রের রীতিপদ্ধতি অচল ও সনাতন নয়; যখন সমাজের রূপ যেমন, সামাজিক আদর্শ যেমন, সেই অনুযায়ী রাষ্ট্র গঠিত হয়, শাস্ত্র রচিত হয়; সেই রূপ ও আদর্শ যখন বদলায়, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় শাস্ত্রও বদলায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা শুক্রচার্যের শুক্রনীতিসার সর্বদেশে সর্বকালে প্রযোজ্য নয়; সমসাময়িক কাল ও তদোক্ত দেশের রাষ্ট্রবিন্যাস-ব্যাখ্যায়ই তাহারা সহায়ক। কিন্তু সহায়ক মাত্রই, তাহার বেশি নয়।

যুক্তি ও উপাদান

প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্রবিন্যাস-ব্যাখ্যার এই ধরনের কোনো শাস্ত্র-সহায় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। যাহা আছে তাহা রাষ্ট্রযন্ত্রের বাস্তব ক্রিয়াক্রমের এবং বিভিন্ন শাখা-উপশাখার, বিভাগ-উপবিভাগের পরিচয়জ্ঞাপক কতকগুলি রাজকীয় দলিল—ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্ট বা পাটা। ইহা স্বাভাবিক ও সহজবোধ্য যে, এই ধরনের পট্টে রাষ্ট্র-বিন্যাস সংক্রান্ত সকল সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়; ভূমি দান-বিক্রয়ের জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের যে-অংশের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে সেইটুকুই শুধু আমরা পাইতেছি, এবং পরোক্ষ ভাবে আরও কিছু কিছু সংবাদের ইঙ্গিত পাইতেছি। এই সব সংবাদ ও সংবাদের ইঙ্গিত কিছু কিছু প্রাচীনতর অর্থশাস্ত্র-দণ্ডশাস্ত্রের ব্যাখ্যার সাহায্যে স্ফুটতর হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু এমন সংবাদও আছে যাহা এই সব শাস্ত্রে নাই, যাহা বিশেষ স্থান ও বিশেষ কালেরই সংবাদ। একাদশ-দ্বাদশ শতকের সমসাময়িক সাহিত্যগ্রন্থ হইতেও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দুই একটা টুক্‌রা-টাক্‌রা খবর জানা যায়।

পূর্বাপর-সংলগ্ন তথ্য-সম্বলিত উপাদান পঞ্চম শতকের আগে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার বহু আগে হইতেই উত্তর-ভারতে, বিশেষভাবে মগধ রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া, সুবিস্তৃত রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও মতবাদ, জটিল অথচ সুসংবদ্ধ, বিভাগ-উপবিভাগবহুল, কর্মচারীবহুল রাষ্ট্রযন্ত্র

গড়িয়া উঠিয়াছিল; মৌর্যাধিকার কালে ভারতবর্ষে তাহার সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট একটা রূপ আমরা দেখিয়াছি। মৌর্য রাষ্ট্রযন্ত্রই শক-কুষাণ আমলের রাষ্ট্রীয় মতবাদ ও আদর্শ এবং রাষ্ট্র-বিন্যাসের প্রভাবে গুপ্ত-রাষ্ট্রযন্ত্রে ও রাষ্ট্রীয় বিন্যাসে বিবর্তিত হয়। মহাস্থান শিলাখণ্ড লিপির সাক্ষ্যে অনুমিত হয়, বাংলাদেশের অন্তত কিয়দংশ মৌর্যরাষ্ট্রের করকবলিত হইয়াছিল; তখন মৌর্য রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রাদেশিক রূপও এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। মৌর্য রাষ্ট্র-বিন্যাস উত্তর-ভারতীয় আর্য সমাজ-বিন্যাসেরই আংশিক রূপ; কাজেই এই অনুমান করা চলে যে, আর্য সংস্কার, সংস্কৃতি ও সমাজ-বিন্যাস বাংলাদেশে বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর্য রাষ্ট্র-বিন্যাসের আদর্শ এবং অভ্যাসও ক্রমশ ধীরে ধীরে প্রবর্তিত হইতেছিল। কিন্তু গুপ্তাধিকারের আগে আর্য সমাজ-বিন্যাস যেমন বাংলায় যথেষ্ট কার্যকরী হইতে পারে নাই, মনে হয়, উত্তর-ভারতীয় রাষ্ট্রাদর্শ এবং বিন্যাসও তেমনই পূর্ণাঙ্গ প্রবর্তন লাভ করে নাই। গুপ্তাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ঘটিল—ধর্মে, সংস্কারে, সংস্কৃতিতে, সমাজ-বিন্যাসে যেমন, রাষ্ট্র-বিন্যাসের ক্ষেত্রেও তেমনই বাংলাদেশ এই সর্বপ্রথম উত্তর-ভারতীয় জীবন-নাট্যমঞ্চে প্রবেশ করিল। কাজেই, ঐতিহাসিক কালে বাংলার রাষ্ট্র-বিন্যাসের যে-চেহারা আমরা দেখি তাহা গুপ্ত-আমলের উত্তর-ভারতীয় রাষ্ট্র-বিন্যাসেরই প্রাদেশিক ও স্থানীয় বিবর্তনের রূপ।

২

কিন্তু আরম্ভর আগেও আরম্ভ আছে। পঞ্চম শতকেরও আগে, এমন কি মৌর্য কালেরও আগে প্রাচীন বাংলার জানপদেরা সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিত, তাহাদের সমাজ ছিল, রাজা ছিল, রাষ্ট্রও ছিল। তাহারও আগে যখন রাজা ছিল না, কৌমসমাজ ছিল, ইতিহাসের সেই উষাকালে সেই সমাজেরও একটা শাসনপদ্ধতি ছিল—আজও তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া লোপ পাইয়া যায় নাই। বাংলার বিভিন্ন জেলায় সমাজের নিম্নতম স্তরে, অথবা পার্বত্য আরণ্য কোমদের মধ্যে, যেমন সাঁওতাল, গারো, রাজবংশী ইত্যাদির মধ্যে, তাঁহাদের পঞ্চায়েতী প্রথায়, তাঁহাদের দলপতি নির্বাচনে, সামাজিক দণ্ডবিধানে, নানা আচারানুষ্ঠানে, ভূমি ও শীকার স্থানের বিলি বন্দোবস্তে, উত্তরাধিকার-শাসনে এখনও সেই কৌম শাসনযন্ত্র ও পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার বাহিরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও এই ধরনের বিচিত্র কৌম শাসন-যন্ত্র ও পদ্ধতি আজও দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও উন্নত অর্থ-নৈতিক সমাজ-পদ্ধতির ক্রমবর্দ্ধমান চাপে আজ তাহা দ্রুত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু, স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সুপ্রাচীন কাল হইতেই আর্য সমাজযন্ত্র ও পদ্ধতি ইহাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছে এবং কালে কালে ইহাদের অনেক রীতি-নিয়ম, বিন্যাস-ব্যবস্থা আত্মসাৎ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে। বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্র-বিন্যাসের কথা বলিতে গেলে এই সব

কৌম শাসনযন্ত্র

অস্পষ্ট স্বল্পজ্ঞাত কৌম শাসনযন্ত্র ও রাষ্ট্র-বিন্যাসের কথা একবার স্মরণ করিতেই হয়। কারণ, ঐতিহাসিক কালের বহুকীর্তিত এবং বহুজ্ঞাত রাষ্ট্রযন্ত্র, রাষ্ট্র-বিন্যাস, তথা সমাজ-বিন্যাসের বাহিরে অগণিত লোক কৌম সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে বাস করিত; আজও করে না এমন নয়। ইহাদের কথা ভুলিয়া গেলে ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করা হয় না।

বাংলা দেশের শারীর-নৃতত্ত্বের আলোচনা কিছু কিছু হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু সুপ্রাচীন কৌম সমাজ-বিন্যাসের গবেষণা বিশেষ কিছু হয় নাই বলিলেই চলে। গারো, কোচ, বাহে, রাজবংশী, সাঁওতালদের সমাজশাসন সম্বন্ধে মোটামুটি তথ্য হয়তো আমাদের জানা আছে, কিন্তু হিন্দু সমাজের নিম্নতম স্তরে নানা শাসনগত সংস্কার এখনও সক্রিয়; সে গুলির ঐতিহ্য-আলোচনা যথেষ্ট হয় নাই। এই সব কারণে বাংলার সুপ্রাচীন কৌম সমাজ ও শাসন-বিন্যাস সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা কঠিন। মোটামুটি ভাবে এইটুকুই শুধু বলা চলে, আমাদের গ্রাম্য পঞ্চায়েতী শাসনযন্ত্র এই প্রাচীন কৌম সমাজের দান; পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাচিত দলপতিই স্থানীয় কৌম শাসনযন্ত্রের নায়কত্ব করিতেন। মাতৃপ্রধান বা পিতৃপ্রধান কৌম ব্যবস্থানুযায়ী উত্তরাধিকার শাসন নিয়ন্ত্রিত হইত, এবং সামাজিক দণ্ডের ও নির্দেশের কর্তা ছিলেন পঞ্চায়েতমণ্ডলী। কৌম সমাজ ও রাষ্ট্র-বিন্যাসের বিবর্তন সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি, এখানে আর তাহা পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, আলেকজান্দারের ভারত-আক্রমণ ও অব্যবহিত পরবর্তী মৌর্যাধিকার কালের আগেই বাংলাদেশে কৌমতন্ত্র নিঃসন্দেহে রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল; এবং অনুমান হয়, কিছু পরেই মৌর্য রাষ্ট্র-বিন্যাসের প্রাদেশিক রূপ এদেশে প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল।

বাংলার এই রাজতন্ত্রের আদি পরিচয় মহাভারতের দুই একটি কাহিনীতে এবং সিংহলী দীপবংশ-মহাবংশ পুরাণে বিজয়সিংহের গল্পে প্রথম পাওয়া যাইতেছে। মহাভারতে পৌণ্ড্রক-বাসুদেব নামে পুণ্ড্রদের এক রাজার কথা; ভীম কর্তৃক এক পৌণ্ড্রাধিপের পরাজয়ের কথা; বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম প্রভৃতি কৌম রাজাদের কথা; দুর্যোধনসহায় এক বঙ্গরাজের কথা; রামায়ণে প্রাচীন বাংলার কয়েকটি রাজবংশের কথা প্রভৃতি সমস্তই বাংলার আদি রাজতন্ত্রের পরিচয় বহন করে। দীপবংশ-মহাবংশের বঙ্গ ও রাঢ়াধিপ সীহবাহুর কথা প্রভৃতি হইতে মনে হয় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক হইতেই বোধ হয় বাংলার বিভিন্ন কৌমতন্ত্র রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হইতেছিল; কিন্তু এই বিবর্তন যখনই হউক, তাহার পরও বহুদিন পর্যন্ত ঐতিহ্যে ও লোকস্মৃতিতে কৌমতন্ত্রের স্মৃতিই যে শুধু জাগরূক ছিল তাহা নয়, ইতস্তত তাহার কিছু কিছু অভ্যাস এবং ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। সমগ্র দেশ বোধ হয় এক সঙ্গে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই।

৩

রাজতন্ত্রের নিঃসংশয় প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক ইতিহাস-কথিত গঙ্গারাষ্ট্রের বিবরণের মধ্যে। গঙ্গাহৃদি-গঙ্গারাষ্ট্রের সামরিক শক্তির এবং সেনা-বিন্যাসের যে সংবাদ গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্বভাবতই অনুমান করা চলে যে, দৃঢ়সম্বদ্ধ সুবিন্যস্ত রাষ্ট্রশৃঙ্খলা ছাড়া সামরিক শক্তির এইরূপ বিন্যাস কিছুতেই সম্ভব হইত না। কিন্তু গঙ্গারাষ্ট্রের বাহিরে সমসাময়িক বাংলার আর যে-সব রাজা ও রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল তাহাদের সঙ্গে গঙ্গারাষ্ট্রের কি সম্বন্ধ ছিল তাহা জানিবার কোনো উপায় নাই। তবে, মহাভারত ও সিংহলী পুরাণের কাহিনী হইতে মনে হয়, এই রাজ্যগুলিতেও রাষ্ট্রীয় সচেতনতার অভাব ছিল না। প্রয়োজন হইলে এই সব রাষ্ট্র সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইত, পররাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের আদান প্রদান করিত এবং সময় সময় প্রয়োজন মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও রাষ্ট্র বৃহত্তর রাজ্য ও রাষ্ট্রের সঙ্গে একত্র গ্রথিতও হইত। পৌণ্ড্রক-বাসুদেব কাহিনীই তাহার প্রমাণ।

অব্যবহিত পরবর্তী কালে (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকে) বাংলার অন্তত একাংশের রাষ্ট্র-বিন্যাসের একটু আভাস পাওয়া যায় মহাস্থানের শিলাখণ্ড লিপিটিতে। মৌর্য-আমলে উত্তর-বঙ্গ মৌর্য-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল; উত্তর-বঙ্গে মৌর্য-শাসনের কেন্দ্র ছিল পুডনগল বা পুণ্ড্রনগর, বর্তমান বগুড়া জেলার পাঁচ মাইল দূরে, মহাস্থানে। লিপিটিতে মহামাত্রের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, জনৈক রাজপ্রতিনিধির নেতৃত্বে বাংলায় তখন মৌর্য-শাসনযন্ত্র পরিচালিত হইত এবং জটিল ও সুসম্বদ্ধ মৌর্য-রাষ্ট্রের প্রাদেশিক শাসনযন্ত্রের সুবিদিত রূপ তদানীন্তন বাংলা দেশেও প্রবর্তিত হইয়াছিল। দেবপ্রিয়, প্রিয়দর্শী রাজা অশোকের সুশাসন ও জন-কল্যাণাগ্রহের কথা সুবিদিত। দুর্ভিক্ষে বা এই জাতীয় কোনো প্রাকৃতিক অত্যায়িক কালে প্রজাদের বিপন্মুক্তির জন্য রাষ্ট্রের কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ রাজকীয় শস্যভাণ্ডারের অর্দ্ধেক শস্য পৃথক করিয়া রাখিবেন, রাজা শস্যবীজ ও খাদ্য দিয়া প্রজাদের অনুগ্রহ করিবেন; বিনিময়ে রাষ্ট্র প্রজাদের দিয়া দুর্গনির্মাণ বা সেতুনির্মাণ ইত্যাদি কাজ করাইয়া লইবেন, অথবা শ্রম-বিনিময় না লইয়া এমনই দান করিবেন, কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে এইরূপ বিধান দিয়াছেন। ঠিক্ এই জাতীয় না হইলেও মহাস্থান লিপিটিতে অনুরূপ রাষ্ট্র-নির্দেশেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এবং তাহা হইতে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার কিছুটা ইঙ্গিত ধরা যায়। পুণ্ড্রনগরে একবার কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। এই উপলক্ষে প্রধান রাষ্ট্রকেন্দ্র হইতে পুণ্ড্রনগরে অধিষ্ঠিত মহামাত্রকে দুইটি আদেশ দেওয়া হইয়াছিল—এই আকস্মিক বিপদ হইতে আশু মুক্তির জন্য। প্রথম আদেশটির স্বরূপ বলা কঠিন; লিপির প্রথম লাইনটি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে এই

প্রাথমিক রাজতন্ত্র

অংশে কি ছিল জানা যায় না। দ্বিতীয়টিতে বিপদপীড়িত প্রজাদের (একমতে সংঘস্থবিরদের ; অন্যমতে ছবগ্‌গীয় ভিক্ষুদের ; ইহারা যাহারাই হউন, ইহাদের নেতার নাম ছিল গলদন) ধান্য এবং সম্ভবত সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রায় অর্থ সাহায্যও করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সাহায্য ঠিক দান নয়, ধার মাত্র ; কারণ, রাষ্ট্র বা রাজা আশা ও ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, এই সাময়িক সাহায্যের ফলে প্রজারা বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারিবে, এবং তাহার পর সুদিন ফিরিয়া আসিলে, দেশ শস্যসমৃদ্ধ হইলে প্রজারা আবার রাজকোষে অর্থ এবং রাজকোষ্ঠাগারে ধান্য প্রত্যর্পণ করিবে। এই ব্যবস্থা একটি সুনিয়ন্ত্রিত সুসংবদ্ধ শাসন-ব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

ইহার পর বহুদিন পর্যন্ত বাংলার রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্র-বিন্যাসের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে গৌড়-বঙ্গের রাজান্তঃপুর ও নাগর সমাজের যে-পরিচয় বাৎস্যায়নের কামসূত্রে পাওয়া যায়, তাহারও আগে খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে পেরিপ্লাস্-গ্রন্থ ও টলেমির বিবরণে, মিলিন্দপঞ্‌হ-গ্রন্থে যে সুসমৃদ্ধ সুবিস্তৃত ব্যবসা-বাণিজ্যের খবর জানা যায়, নাগার্জুনীকোণ্ডর শিলালিপিতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারসূত্রে সিংহল ও পূর্ব-দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বঙ্গের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আভাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্পষ্টতই মনে হয়, রাষ্ট্র ও সমাজগত শাসন-শৃঙ্খলা বর্তমান না থাকিলে এই ধরনের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, বিশেষ ভাবে সুসমৃদ্ধ সুদূর প্রসারী অন্তঃ ও বহির্বাণিজ্য কিছুতেই সম্ভব হইত না। সুবর্ণমুদ্রার প্রচলনও এই অনুমানের অন্যতম ইঙ্গিত। চতুর্থ-শতকে রাঢ় দেশে অর্থাৎ পশ্চিম-বঙ্গে একটি রাজা ও রাষ্ট্রের খবর পাওয়া যাইতেছে—এই রাষ্ট্র পুষ্করণাধিপ মহারাজ সিংহবর্মণ ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রবর্মণের ; কিন্তু ইহাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের বিন্যাস ও পরিচালনা সম্বন্ধে কোনো তথ্যই জানা যাইতেছে না ; ইহারা স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজা ছিলেন কিনা তাহাও জোর করিয়া বলা যাইতেছে না। তবে রাজতন্ত্র যে তাহার সমস্ত মর্যাদা ও সমারোহ লইয়া এই যুগে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের আর অবকাশ নাই।

৪

গুপ্তআমলে প্রাচীন বাংলার অধিকাংশ গুপ্ত-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং গুপ্ত-রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রাদেশিক রূপ এ-দেশে পুরাপুরি প্রবর্তিত হইয়াছিল ; স্থানীয় পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী এই প্রাদেশিক রূপের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এ-দেশে দেখা দিয়াছিল, এ-সম্বন্ধেও সন্দেহ করা চলে না।

মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক পরমদৈবত গুপ্ত সম্রাট্‌দের রাজকীয় মর্যাদা ও রাজতন্ত্রের প্রধান পুরুষ হিসাবে তাঁহাদের ঔপধিক আড়ম্বর ও সমারোহ সহজেই অনুমেয়। তাঁহারা যে নররূপী দেবতা এবং দেবতা-নির্দিষ্ট অধিকারেই রাজা তাহাও “পরমদৈবত” পদটির ইঙ্গিতেই অনুমেয়। এ-তথ্যও সুবিদিত যে, গুপ্ত সম্রাটেরা বিজিত রাজ্যসমূহ সমস্তই তাঁহাদের

সাক্ষাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রভুক্ত করিতেন না, সমগ্র সাম্রাজ্য তাঁহারা বা তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা নিজেরা শাসন করিতেন না। অনেক অংশ থাকিত সামন্ত নরপতিদের শাসনাধীনে, এবং এই সব সামন্ত নরপতিরা নিজ নিজ রাজ্যে প্রায় স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজা রূপেই রাজত্ব করিতেন; তাঁহাদের নিজেদের পৃথক রাষ্ট্রযন্ত্রও ছিল, এবং সেই রাষ্ট্রযন্ত্রের রূপও ছিল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রেরই ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে এই সব সামন্ত রাজা ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ সাধারণত মহারাজাধিরাজের সর্বাধিপত্য স্বীকৃতিতেই আবদ্ধ ছিল; তবে যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় তাঁহারা সৈন্যবল সংগ্রহ করিতেন, নিজেরা মহারাজাধিরাজের যুদ্ধে যোগদান করিতেন, এই অনুমান সহজেই করা যাইতে পারে; পরবর্তী কালে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণও আছে। বাংলা দেশে এই সামন্ত নরপতিদের দায় ও অধিকার কিরূপ ছিল তাহার কিছু কিছু পরিচয় এই পর্বের লিপিমালা হইতে জানা যায়।

গুপ্তপর্ব আনুমানিক ৩০০—৫০০ খ্রীষ্টীয় শতক রাজা

গুপ্ত-আমলে বাংলা দেশে আমরা অন্তত দুইজন সামন্ত নরপতির সংবাদ পাইতেছি, এবং এই দুইজনই মহারাজ বৈন্যগুপ্তের (৫০৭-৮) সামন্ত; ইঁহাদের একজন বৈন্যগুপ্তের পাদদাস মহারাজ রুদ্রদত্ত, এবং আর একজন ছিলেন বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর পট্ট-কথিত মহারাজ মহাসামন্ত বিজয়সেন। মল্লসারুল-লিপিতে বিজয়সেন শুধু 'মহারাজ' বলিয়াই আখ্যাত হইয়াছেন। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, এই সব সামন্ত-মহাসামন্তরা কখনো কখনো মহারাজ বলিয়াই আখ্যাত ও ভূষিত হইতেন। গুণাইঘর পট্টে মহারাজ মহাসামন্ত বিজয়-সেনকে বলা হইয়াছে দূতক, মহাপ্রতীহার, মহাপিলুপতি পঞ্চাধিকরণোপরিক, পুরপালোপরিক এবং পাট্যুপরিক। কোনো বিশেষ রাষ্ট্রীয় অথবা রাজকীয় কর্মের জন্য যে রাষ্ট্রপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইতেন তাঁহাকে বলা হইত দূতক। প্রতীহারের সহজ অর্থ দ্বাররক্ষক; মহাপ্রতীহার শান্তিরক্ষা বা যুদ্ধবিগ্রহ ব্যাপারে নিযুক্ত শান্তিরক্ষক বা উচ্চ সামরিক কর্মচারী অথবা তিনি রাজপ্রাসাদের রক্ষকও হইতে পারেন। মহাপিলুপতি রাজকীয় হস্তীসৈন্যের অধ্যক্ষ বা রাজকীয় হস্তীবাহিনীর প্রধান শিক্ষাদানকর্তা। পাঁচটি অধিকরণ (শাসন-কর্মকেন্দ্র; এক্ষেত্রে বোধ হয় বিষয়াধিকরণের কথাই বলা হইয়াছে) মিলিয়া পঞ্চাধিকরণ; এই পঞ্চাধিকরণের যিনি প্রধান কর্মকর্তা তিনিই পঞ্চাধিকরণোপরিক। পুর বা নগরের অধ্যক্ষদের বলা হইত পুরপাল; এই পুরপালদের যিনি ছিলেন কর্তা তিনি পুরপালোপরিক। পাট্যুপরিক বলিতে কি বুঝাইতেছে, বলা কঠিন। যাহা হউক, মহাসামন্ত মহারাজ বিজয়সেন যে সমসাময়িক রাষ্ট্রের এক প্রধান ও করিৎকর্মা ব্যক্তি ছিলেন, সন্দেহ নাই; নহিলে এতগুলি বৃহৎ কর্মের কর্তৃত্ব ভার, এতগুলি উপাধি তাঁহার আয়ত্তে আসিবার কথা নয়। অথচ তাঁহার প্রভু বৈন্যগুপ্ত শুধু 'মহারাজ' আখ্যাতেই রাজকীয় দলিলে আখ্যাত হইয়াছেন। পট্ট-সাক্ষ্যে মনে হয়, সামন্ত নরপতিরা তাঁহাদের শাসিত জনপদে নিজেরা ভূমিদান করিতে পারিতেন না; মহারাজের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রে ভূমিদানের অনুরোধ

সামন্ত-মহাসামন্ত

জানাইতেন, এবং সেই অনুযায়ী মহারাজের নামে সেই ভূমি দত্ত বা বিক্রীত এবং পট্টীকৃত হইত। কিন্তু মল্লসারুল-লিপিতে দেখিতেছি, বিজয়সেন নিজেই ভূমিদান করিতেছেন। হয়তো তখন তিনি স্বাধীন নরপতি; অথবা, গোপচন্দ্রের সামন্ত হইলেও তাঁহার সর্বময় আধিপত্য বিজয়সেন সর্বথা স্বীকার করিতেন না।

সামন্ত নরপতি শাসিত জনপদ ছাড়া বাকী দেশখণ্ড ছিল খাস রাষ্ট্রের অধিকারে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের বৃহত্তম রাজ্য-বিভাগের নাম ছিল ভুক্তি; প্রত্যেক ভুক্তি বিভক্ত হইত কয়েকটি বিষয়ে, প্রত্যেক বিষয় কয়েকটি মণ্ডলে, প্রত্যেক মণ্ডল কয়েটি বীথীতে, এবং প্রত্যেক বীথী কয়েকটি গ্রামে, এবং গ্রামই ছিল সর্বনিম্ন দেশবিভাগ। প্রত্যেক বিভাগ-উপবিভাগ ছিল সুনির্দিষ্ট সীমায় সীমায়িত, এবং অধস্তন গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধতম ভুক্তি পর্যন্ত একটি সূত্রে গ্রথিত।

গুপ্ত আমলে বাংলাদেশে অন্তত দুইটি ভুক্তি-বিভাগের খবর পাওয়া যায়; বৃহত্তর ভুক্তি-বিভাগ পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি, বর্দ্ধমানভুক্তি ক্ষুদ্রতর। প্রথমটির খবর প্রত্যক্ষভাবে পাইতেছি দামোদরপুর-পট্টোলী পাঁচটি হইতে, পরোক্ষভাবে পাহাড়পুর-পট্টোলী হইতে; বর্দ্ধমান-ভুক্তির খবর পাইতেছি মহারাজ গোপচন্দ্রের মল্লসারুল-লিপি হইতে। অনুমান হয়, শেষোক্ত ভুক্তি-বিভাগটি গোপচন্দ্রের আগে বৈন্যগুপ্তের সময়েও বিদ্যমান ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তি অন্তত তিনটি বিষয়ে বিভক্ত ছিল। কোটিবর্ষ নামে একটি বিষয়ের খবর পাইতেছি ১, ২, ৪, ও ৫নং দামোদরপুর-পট্টোলীতে; ধনাইদহ-পট্টোলীতে খাটাপারা বা খাদাপারা (নন্দপুর লিপির খটাপূরাণ দ্রষ্টব্য) নামে একটি বিষয়ের উল্লেখ দেখা যাইতেছে; এবং বৈগ্রাম-পট্টোলীতে পঞ্চনগরী নামে তৃতীয় আর একটি বিষয়ের। শেষোক্ত দুইটি বিষয় পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত, একথা লিপিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নাই সত্য, কিন্তু লিপি-প্রসঙ্গ এবং স্থানের ইঙ্গিতে এ-তথ্য সুস্পষ্ট। মণ্ডল-বিভাগের একটিমাত্র উল্লেখ এই আমলের লিপিতে পাইতেছি, যদিও বাংলার বাহিরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্যত্র এই বিভাগের বিদ্যমানতার সাক্ষ্য সুপ্রচুর। পাহাড়পুর-পট্টোলীতে দক্ষিণাংশক-বীথী ও নাগিরট্ট-মণ্ডলের উল্লেখ পর পর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মণ্ডল কোন্ বিষয়ের অন্তর্গত, কোনো বিষয়েরই অন্তর্গত কিনা, না সরাসরি পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই—লিপিতে কোনো ইঙ্গিতই পাওয়া যাইতেছেনা। অথবা, দক্ষিণাংশক বীথী এই মণ্ডলেরই একটি বিভাগ কিনা তাহা ও নিঃসংশয়ে বলা যাইতেছে না। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, মণ্ডল নামে একটী রাষ্ট্র-বিভাগ ছিল, এবং বাংলার বাহিরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্যত্র যে রীতি প্রচলিত ছিল তাহা হইতে এই অনুমান করা যায় যে, মণ্ডল বিষয়ের ক্ষুদ্রতর বিভাগ। দক্ষিণাংশক বীথী ছাড়া আরও দুই একটি বীথী-বিভাগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মুঙ্গের জেলার রঙ্গপুর গ্রামে প্রাপ্ত নন্দপুর পট্টোলীতে (৪৮৯ খ্রীঃ) নন্দ-বীথী নামে এক বীথীর উল্লেখ আছে; এই বীথী অখিল গ্রামাগ্রহারের অন্তর্ভুক্ত, এবং লিপি-সাক্ষ্যের ইঙ্গিতে

মনে হয়, এই অগ্রহারেই ছিল বিষয়পতি ছত্রমহের অধিকরণ বা বিষয়কর্মকেন্দ্র। এই অনুমান বোধ হয় সঙ্গত যে, খিল গ্রামাগ্রহার যে-বিষয়ের রাষ্ট্রকেন্দ্র, সেই বিষয়েরই অন্তর্গত ছিল নন্দ-বীথী। বক্কট্টক নামে আর একটি বীথী-বিভাগের উল্লেখ পাইতেছি গোপচন্দ্রের মল্লসারুল-লিপিটিতে এবং এই বীথী বর্দ্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত। সর্বনিম্ন রাষ্ট্রবিভাগ গ্রাম। কোনো কোনো ধর্মদেয় বা ব্রহ্মদেয় গ্রাম অগ্রহার নামে অভিহিত হইত, যেমন নন্দপুর লিপির খিল গ্রামাগ্রহার, গুণাইঘর লিপির গুণেকাগ্রহারগ্রাম। অনুমান হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বা রাষ্ট্রকর্মকেন্দ্র হিসাবে কোনো কোনো অগ্রহার গ্রাম বাড়িয়া উঠিয়া বড় হইত এবং অন্যান্য গ্রামাপেক্ষা অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিত। ছোট ছোট একাধিক গ্রাম বা পাড়া (পরবর্তী লিপি সমূহের পাটক, পড্রক ইত্যাদি) লইয়া একটি বৃহৎ গ্রামও গড়িয়া উঠিত, যেমন বৈগ্রাম পট্টোলীর বায়িগ্রাম। বায়িগ্রামের অন্তত দুইটি অংশের নাম লিপিতে পাইতেছি, একটি ত্রিবৃতা, আর একটি শ্রীগোহালি (পাহাড়পুর-পট্টোলীর বট-গোহালী—বর্তমান গোয়ালভিটা, এবং নিত্বগোহালী দ্রষ্টব্য)।

মহারাজাধিরাজ স্বয়ং ভুক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতেন; ভুক্তিপতিরা সকলেই মহারাজাধিরাজ সম্পর্কে "তৎপাদপরিগৃহীত"। কখনো কখনো রাজকুমার বা রাজপরিবারের লোকেরাও ভুক্তিপতি নিযুক্ত হইতেন; ৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির উপরিক মহারাজ ছিলেন জনৈক রাজপুত্র দেবভট্টারক। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে ভুক্তিপতিদের বলা হইত উপরিক, কিন্তু বুধগুপ্তের রাজত্বকালে দেখিতেছি তাহাদের বলা হইতেছে, উপরিক মহারাজ বা মহারাজ। মল্লসারুল-লিপিতেও দেখিতেছি, বর্দ্ধমান-ভুক্তির শাসনকর্তাকে বলা হইতেছে উপরিক। ভুক্তির শাসনযন্ত্রের স্বরূপ কি ছিল, বলা কঠিন; লিপিগুলিতে তাহার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে না। বসারে প্রাপ্ত একটি শীলমোহরে দেখা যাইতেছে, উপরিকের অধিষ্ঠানে বা শাসনকেন্দ্রে একটি অধিকরণ বা কর্মকেন্দ্র থাকিত; কিন্তু এই কর্মকেন্দ্র কাহাদের লইয়া গঠিত হইত তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে না। বুধগুপ্তের পাহাড়পুর-লিপি পাঠে মনে হয়, উপরিক-মহারাজের সঙ্গে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের স্থানীয় অধিকরণের সাক্ষাৎভাবে কোনো সম্বন্ধ ছিল না, অন্তত ভূমি দান-বিক্রয়ের ব্যাপারে। এই ক্ষেত্রে ভূমি-বিক্রয়ের প্রস্তাবটি আসিয়াছিল প্রথমে আয়ুক্তক নামে বর্ণিত কর্মচারী এবং স্থানীয় অধিকরণের সম্মুখে; তাঁহারা প্রস্তাবটি পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন পুস্তপালদের নিকট। আয়ুক্তক নাম হইতে মনে হয়, এই স্থানীয় অধিকরণ বিষয়াধিকরণ, অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্দ্ধন-বিষয়ের অধিকরণ, এবং আয়ুক্তক হইতেছেন বিষয়পতি। যেমন ভুক্তিপতির, তেমনই বিষয়পতিরও অধিকরণের অধিষ্ঠান ছিল পুণ্ড্রবর্দ্ধনে। সেইজন্যই এই ভূমি-বিক্রয়ের ব্যাপারে স্থানীয় অধিকরণের সঙ্গে উপরিক-মহারাজের কোনো প্রত্যক্ষ

ভুক্তিপতি ও তাঁহার শাসনযন্ত্র

সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে না। মল্লসারুল-লিপিতে বর্দ্ধমান-ভুক্তির উপরিকের অধিকরণ-সংপৃক্ত কয়েকজন রাজকর্মচারীর খবর পাইতেছি ; ইহাদের পদোপাধি ভোগপতিক, পত্তলক, চৌরোদ্ধরণিক, আবসথিক, হিরণ্যসমুদায়িক, ঔদ্রঙ্গিক, ঔর্ণস্থানিক, কার্তাকৃতিক, দেবদ্রোণী-সম্বন্ধ, কুমারামাত্য, আগ্রহারিক, তদায়ুক্তক, বাহনায়ক এবং বিষয়পতি। উপরিক হইতেছেন ভুক্তির সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী ; বিষয়পতি বিষয়-বিভাগের সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী ; তদায়ুক্তক বোধ হয় উপরিক-নিযুক্ত কর্মচারী এবং আয়ুক্তক বা বিষয়পতির সমার্থক। কার্তাকৃতিক শিল্পকর্মের অধ্যক্ষ, অথবা রাজকীয় পূর্তবিভাগের কর্মকর্তা হইলেও হইতে পারেন, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ভোগপতিক এবং পত্তলিকের কর্ম সম্বন্ধে কিছু ধারণা আপাতত করা যাইতেছে না। ভোগ একপ্রকারের সুপরিচিত কর ; ভোগপতিকরা বোধ হয় সেই করের সংগ্রহকর্তা। চৌরোদ্ধরণিক উচ্চপদস্থ শান্তিরক্ষক কর্মচারী। আবসথিক হইতেছেন রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় ঘরবাড়ী, বিশ্রামস্থান ইত্যাদির অধ্যক্ষ। হিরণ্যসমুদায়িক মুদ্রায় দেয় কর সংগ্রহকর্মের অধ্যক্ষ। ঔদ্রঙ্গিক স্থায়ী প্রজাদের নিকট হইতে উদ্রঙ্গ নামক করের সংগ্রহ-কর্তা। ঔর্ণস্থানিক বোধ হয় রেশম জাতীয় বস্ত্রশিল্পকর্মের নিয়ামক-কর্তা। দেবদ্রোণীসম্বন্ধ হইতেছেন মন্দির, তীর্থ-ঘাট ইত্যাদির রক্ষক ও পর্যবেক্ষক। কুমারামাত্য এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী ; ইহারা বোধ হয় বংশানুক্রমে প্রত্যক্ষভাবে রাজা বা রাজকুমার কর্তৃক নিযুক্ত এবং তাঁহাদের অধীনস্থ কর্মচারী। অগ্রহার হইতেছে ধর্মদেয়, ব্রহ্মদেয় ভূমি ; এই ভূমির রক্ষক-পর্যবেক্ষকের নাম বোধ হয় ছিল আগ্রহারিক। বাহনায়ক যানবাহন-যাতায়াত প্রভৃতির নিয়ামক-কর্তা।

বিষয়পতি সাধারণত নিযুক্ত হইতেন উপরিক কর্তৃক ; কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বোধ হয় মহারাজাধিরাজ স্বয়ংই ছিলেন নিয়োগকর্তা, যেমন, বৈগ্রাম-পট্টোলী-কথিত পঞ্চনগরী বিষয়ের বিষয়পতি ছিলেন "ভট্টারকপাদানুধ্যাত"। বিষয়ের শাসনকর্তাকে কোনো কোনো লিপিতে বলা হইয়াছে আয়ুক্তক, যেমন পাহাড়পুর-লিপিতে ; কোনো লিপিতে কুমারামাত্য, যেমন বৈগ্রাম-পট্টোলীতে। কিন্তু পরবর্তী গুপ্ত-রাজাদের আমলে সর্বত্রই তাঁহার পদোপাধি বিষয়পতি।

বিষয়পতি বিষয়াধিকরণের সর্বোচ্চ কর্মচারী, এবং বিষয়পতির অধিষ্ঠানস্থানেই বিষয়াধিকরণের শাসনকেন্দ্র। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকের নবম অঙ্কে এক অধিকরণের বর্ণনা আছে। অধিকরণের কর্মনির্বাহের জন্য একটি মণ্ডপ বা সভাগৃহ ছিল। সেই মণ্ডপে অধিকরণ বসিত। মৃচ্ছকটিকের বিচারাধিকরণের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, অধিকরণিক, অধিকরণ-ভোজক, শ্রেষ্ঠী এবং কায়স্থদের লইয়া অধিকরণ গঠিত হইত, এবং এই সব অধিকরণের উপর ভূমি দান-বিক্রয় কর্ম শুধু নহে, বিষয় শাসন-সংক্রান্ত সর্বপ্রকার রাষ্ট্রকর্মের দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল, এবং তাহার মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বিচার, দণ্ড-পুরস্কার, দানকর্মও বাদ পড়িত

বিষয়পতি ও বিষয়াধিকরণ

না। অধিকরণ-গঠনের যে-ইঙ্গিত মৃচ্ছকটিক নাটকে পাওয়া যায়, প্রায় অনুরূপ ইঙ্গিত গুপ্ত-আমলের লিপিগুলিতেও পাওয়া যাইতেছে; তবে লিপিগুলি সমস্তই ভূমি দান-বিক্রয় সংপৃক্ত বলিয়া তাহা ছাড়া অন্য কোনও শাসন-সংপৃক্ত সংবাদ ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। কোনো কোনো বিষয়ের বোধহয় কোনো অধিকরণ থাকিত না, বিষয়পতি তাহার কর্মচারীদের লইয়া শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন। বৈগ্রাম-পট্টোলীতে দেখিতেছি পঞ্চনগরী বিষয়ের কোনো বিষয়াধিকরণের উল্লেখ নাই; কুমারামাত্য কুলবৃদ্ধি (বিষয়পতি) সংব্যবহার ও পুস্তপালদের সাহায্যে শাসনকার্য চালাইতেন। প্রধান দায়িত্ব যে সর্বত্র বিষয়পতির উপরই ছিল সন্দেহ নাই। তবে, ১, ২, ৪ ও ৫ নং দামোদর পট্টোলী-কথিত (৪৪২-৪৪—৫৪৩-৪৪ খ্রী) কোটিবর্ষ বিষয়ের অধিকরণের যে-খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখিতেছি, বিষয়পতির সহায়করূপে অধিকরণ গঠন করিতেছেন নগরশ্রেষ্ঠি, প্রথম কুলিক, প্রথম কায়স্থ এবং প্রথম সার্থবাহ। প্রথমকায়স্থ খুব সম্ভব বিষয়পতির কর্মসচিব এবং সেই হেতু রাজকর্মচারী। কিন্তু বাকী তিনজন অর্থাৎ নগরশ্রেষ্ঠি, প্রথম কুলিক এবং প্রথম সার্থবাহ যথাক্রমে বণিক, শিল্পী এবং ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধি, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। প্রাচীন তীরভুক্তি (তিরহুত) অন্তর্গত বর্তমান বসার বা প্রাচীন বৈশালীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক মাটির শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে "শ্রেষ্ঠি-সার্থবাহ-কুলিকনিগম" বা "শ্রেষ্ঠিনিগম" এইরূপ পদ উৎকীর্ণ আছে। এলাহাবাদ জেলায় ভিটার ধ্বংসাবশেষ হইতেও "কুলিক-নিগম" পদ উৎকীর্ণ কয়েকটি শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। অনুমান হয়, কোটিবর্ষ বিষয়েও শ্রেষ্ঠী, কুলিক, এবং সার্থবাহদের নিজস্ব নিগম ছিল, এবং বিষয়াধিকরণের নগরশ্রেষ্ঠি, প্রথম কুলিক এবং প্রথম-সার্থবাহ তাঁহাদের নিজস্ব নিগমের সভাপতি এবং সেই হিসাবে বিষয়াধিকরণে ইহাদের প্রতিনিধি ছিলেন। ইহারা কি স্ব স্ব নিগম কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন, না রাষ্ট্র বা রাজাদ্বারা নিযুক্ত হইতেন? এ-প্রশ্নের নিঃসংশয় উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে, প্রায় সমসাময়িক নারদ ও বৃহস্পতি ধর্মসূত্রের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, এই সব নিগম-সভাপতিরা স্ব স্ব নিগম কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। দ্বিতীয়ত, অধিকরণের এই সব সভ্যদের সঙ্গে বিষয়পতির সম্বন্ধ কি ছিল? কেহ কেহ মনে করেন, শাসন-ব্যাপারে ইহাদের সাক্ষাৎ দায়িত্ব কিছু ছিল না, অধিকরণের অধিবেশনে ইহারা উপস্থিত থাকিতেন মাত্র (রাষ্ট্রকর্ম ইহাদের 'পুরোগে' অর্থাৎ উপস্থিতিতে নির্বাহ হইত)। আবার কেহ কেহ বলেন, সর্বময় দায়িত্ব ছিল বিষয়পতির, আর ইহারা ছিলেন উপদেষ্টা মাত্র। নগরশ্রেষ্ঠি, প্রথম কুলিক, প্রথম সার্থবাহ এবং প্রথম কায়স্থকে লইয়া একটি উপদেষ্টা-মণ্ডলী ছিল, তাঁহারা বিষয়পতিকে উপদেশ-পরামর্শ ইত্যাদি দিতেন। কিন্তু লিপিগুলির প্রসঙ্গ-সাক্ষ্য এবং মৃচ্ছকটিকের বিবরণ একত্র করিলে মনে হয়, ইহারা শুধু সহায়ক বা উপদেষ্টা মাত্র ছিলেন না, বিষয়পতির সঙ্গে ইহারাও সমভাবে শাসনকার্যের দায়িত্ব নির্বাহ করিতেন, এবং অধিকরণের ইহারা অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন।

বিষয়াধিকরণের সভ্যদের প্রয়োজনমত সাহায্য করিবার জন্য একটি পুস্তপালের দপ্তরও থাকিত; বিশেষত, ভূমি দান-বিক্রয় ব্যাপারে ইহাদের সাহায্য সর্বদাই প্রয়োজন হইত, কারণ ভূমির মাপজোখ, সীমা-নির্দেশ, ভূমির স্বত্বাধিকার, ইত্যাদি সব কিছুর দলিলপত্র ইহাদের দপ্তরেই রক্ষিত হইত। ভূমি দান-বিক্রয়ের ক্রমের যে-বিবরণ এই যুগের লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে তাহার বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি; এখানে সংক্ষেপে সারমর্ম উদ্ধার করা যাইতে পারে। ভূমি ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট ভূমি-ক্রয়ের ইচ্ছা ও সঙ্গে সঙ্গে ক্রয়ের উদ্দেশ্য (প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ধর্মোদ্দেশে দান) এবং স্থানীয় প্রচলিত মূল্যানুযায়ী মূল্যদানের স্বীকৃতি স্থানীয় অধিকরণে আবেদনরূপে উপস্থিত করিতেন; অধিকরণ তখন প্রস্তাবিত আবেদনটি পরীক্ষা করিবার জন্য পুস্তপালের দপ্তরে পাঠাইয়া দিতেন। পুস্তপালের দপ্তর কখনো তিনজন (যেমন, ১, ২, ৪, ও ৫ নং দামোদরপুর-পট্টোলীতে), কখনও দুইজন পুস্তপাল (যেমন, বৈগ্রাম-লিপিতে) লইয়া গঠিত হইত। যাহাই হউক, পুস্তপালের দপ্তর বিক্রয় অনুমোদন করিলে এবং মূল্য রাজসরকারে জমা হইলে ভূমি-ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ভূমির অধিকার দেওয়া হইত, অর্থাৎ বিক্রয়কার্য নিষ্পন্ন হইত। এই বিক্রয়কার্য-সম্পাদনা পট্টীকৃত হইত তাম্রশাসনে, এবং বিক্রীত ভূমির উপর অধিকারের দলিল-প্রমাণস্বরূপ তাম্রশাসনখানি ক্রেতার হস্তে অর্পিত হইত। ভূমির মাপজোখ্ কাহারা করিতেন, এ-সম্বন্ধে লিপিতে সুনির্দিষ্ট কোনো উল্লেখ নাই, তবে পুস্তপালেরাই তাহা করিতেন এমন অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে যে-সব ভূমির অবস্থিতি অধিকরণ-শাসনসীমার বাহিরে, দূর গ্রামে, সে-ক্ষেত্রে বিষয়াধিকরণ তাঁহাদের নিকট উপস্থাপিত প্রস্তাব ও তাঁহাদের নির্দেশ স্থানীয় শাসন-প্রতিনিধিদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন, এবং স্থানীয় অধিকরণের কর্মচারীরা ভূমি নির্বাচন ও মাপজোখ ইত্যাদি সম্পাদন করিয়া মূল্য গ্রহণ করিয়া বিক্রয়কার্য পট্টীকৃত করিয়া দিতেন। গ্রামের শাসনযন্ত্র আলোচনা কালে এই কার্যক্রম আরও পরিষ্কার হইবে।

পুস্তপাল-দপ্তর

বীথী-বিভাগেরও যে একটি নিজস্ব অধিকরণ থাকিত তাহার প্রমাণ মল্লসারুল-লিপির সাক্ষ্যেই জানা যাইতেছে, তবে এই অধিকরণ কি ভাবে গঠিত হইত, বলা যাইতেছে না। মহত্তর, খাড়্গী ও অন্তত একজন বাহনায়ক বক্তৃক বীথী-অধিকরণের শাসন-কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, এবং ভূমি দান-বিক্রয়ের ব্যাপারে এই অধিকরণের ক্ষমতা বিষয়াধিকরণেরই অনুরূপ, এ-তথ্যও লিপি-সাক্ষ্যেই প্রমাণ। এই লিপিতে কুলবারকৃত নামে একাধিক বীথী-অধিকরণ-কর্মচারীর উল্লেখ পাইতেছি; বিক্রীত ভূমির বীথীকোষস্থ অর্থ অধিকরণের নির্দেশানুযায়ী বিলি-বন্দোবস্ত করিবার ভার এই কুলবারকৃতদের উপর দেওয়া হইয়াছিল। স্থানীয় অধিকরণ-সংপৃক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তত দুইজন মহত্তর, তিনজন

বীথীর শাসনযন্ত্র

খাড়্গী এবং একজন বাহনায়কের সাক্ষাৎ পাইতেছি; তবে শাসনকার্যে ইহাদের দায়িত্ব কতখানি ছিল বলা কঠিন। বাহনায়কের কথা আগে বলিয়াছি। খাড়্গী এবং পরবর্তী কালের রামগঞ্জ লিপির খড়্গগ্রাহ সমার্থক হওয়া অসম্ভব নয়; খাড়্গী—খড়্গধারী প্রহরী, অর্থাৎ শান্তিরক্ষা-বিভাগের রাজকর্মচারী হওয়া বিচিত্র নয়।

গ্রামের শাসনযন্ত্রের সর্বোচ্চ দায়িত্ব কাহার উপর ছিল, অর্থাৎ গ্রামে প্রধান রাজপুরুষ কে ছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতেছে না, তবে গ্রামিক নামে জনৈক রাজপুরুষের (?) সাক্ষাৎ কোনো কোনো লিপিতে পাওয়া যাইতেছে, (যেমন, ৩নং দামোদরপুর-লিপিতে); বোধ হয় তাঁহারাই ছিলেন গ্রাম্য শাসনযন্ত্রের কর্তা। অধিকাংশ গ্রামে গ্রামের প্রধান প্রধান লোকেরাই—ব্রাহ্মণ, মহত্তর, কুটুম্ব ইত্যাদিরা—বোধ হয় শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন। অন্তত ভূমি দান-বিক্রয় ব্যাপারে ইহারা যে স্থানীয় শাসনকার্যের উপদেষ্টা ও সহায়ক ছিলেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই (দামোদরপুর-লিপি, পাহাড়পুর-লিপি দ্রষ্টব্য)।

গ্রামের শাসনযন্ত্র

মনে হয় রাষ্ট্রের নির্দেশ কার্যে পরিণত করার ভার ইহাদের উপরই দেওয়া হইত। কিন্তু কোনো কোনো গ্রামে একটু বিস্তৃততর শাসনযন্ত্রও বিদ্যমান ছিল; সে-সব ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, মহত্তর, কুটুম্ব, 'অক্ষুদ্র প্রকৃতয়ঃ' প্রভৃতিরা তো সহায়ক ও উপদেষ্টা হিসাবে থাকিতেনই; তাহা ছাড়া, গ্রামিক এবং অষ্টকুলাধিকরণ নামে একটি অধিকরণও যে থাকিত, তাহারও প্রমাণ আছে (৩ নং দামোদরপুর-পট্টোলী এবং ধনাইদহ-পট্টোলী দ্রষ্টব্য)। অষ্টকুলাধিকরণের গঠন লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মত্ দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চকুলের উল্লেখ অনেক লিপিতেই দেখা যায়, এবং স্থানীয় রাষ্ট্রকার্যে, বিশেষত ভূমি ও অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে পঞ্চকুলের দায়িত্ব যে অনেকখানি ছিল তাহা আমরা একাধিক স্বতন্ত্র সাক্ষ্যে জানিতে পাই। পঞ্চকুল যে কৌমতান্ত্রিক পঞ্চায়েৎ প্রথার সমগোত্রীয়, সন্দেহ নাই। অষ্টকুল বোধ হয় পঞ্চকুলের মতই কোনও জনসংঘ—আট জন প্রধান ব্যক্তি লইয়া গঠিত সমিতি। অবশ্য কুল শব্দের বিশেষ আভিধানিক অর্থ আছে। ছয়টি বলদ ও দুইটি লাঙ্গলে যে পরিমাণ ভূমি চাষ করা যায় তাহাই এক কুল; এই রকম আটটি কুলের শাসন-কর্তৃত্ব যাঁহার বা যাঁহাদের উপর দেওয়া হয়, তিনি বা তাঁহারাই অষ্ট-কুলাধিকরণ। কিন্তু এই অভিধানিক অর্থ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া মনে হইতেছে না। এই ধরনের বিস্তৃততর গ্রাম্য শাসন-যন্ত্রের কাজের সাহায্যের জন্য পুস্তপালের দপ্তরও একটি থাকিত। ৩ নং দামোদরপুর-পট্টোলীতে পলাশবৃন্দকের শাসনযন্ত্রে মহত্তর, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ, "অক্ষুদ্র প্রকৃতয়ঃ", গ্রামিক, অষ্টকুলাধিকরণ প্রভৃতির সঙ্গে পত্রদাস নামে একজন পুস্তপালের সাক্ষাৎও পাইতেছি।

বিষয় ও বীথী-অধিকরণের মত ভূমি দান-বিক্রয়ের ব্যাপারে গ্রাম্য-অধিকরণেরও একই অধিকার ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। ৩ নং দামোদরপুর-পট্টোলীতে দেখিতেছি, গ্রামিক নাভক পলাশবৃন্দকের শাসন-কর্তৃপক্ষের নিকট চণ্ডগ্রামে কিছু ভূমিক্রয়ের প্রার্থনা

জানাইয়া ছিলেন। চণ্ডগ্রাম পলাশবৃন্দকের সীমার বাহিরে অবস্থিত থাকায় কর্তৃপক্ষ চণ্ডগ্রামের ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ও মহত্তরদের উপর এই বিক্রয়-ব্যাপার সম্পাদনার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ধনাইদহ-লিপিতেও দেখিতেছি, গ্রাম্য অষ্টকুলাধিকরণ এবং তৎসংপৃক্ত শাসন-যন্ত্রের নিকটই ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি ভূমিক্রয়ের প্রার্থনা জানাইতেছেন। পাহাড়পুর-লিপিতে দেখা যাইতেছে, নগরশ্রেষ্ঠির উপস্থিতিতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের ভুক্তি-অধিকরণের সমক্ষে এক ভূমি-ক্রয়ের প্রার্থনা উপস্থিত করা হইয়াছিল; কিন্তু প্রস্তাবিত ভূমি অধিকরণাধিষ্ঠানের সীমার বাহিরে অবস্থিত থাকায় ভুক্তি-অধিকরণ স্থানীয় ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ও মহত্তরদিগকে এ-কার্যে সহায়তা করিতে আহ্বান ও নির্দেশ করিয়াছিলেন। বৈগ্রাম-লিপির সাক্ষ্যও অনুরূপ; পঞ্চনগরীর বিষয়াধিকরণের সমক্ষে উপস্থাপিত একটি প্রার্থনা প্রস্তাবিত ভূমির স্থানীয় সংব্যবহারীপ্রমুখের—ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ইত্যাদির—নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উর্দ্ধতন অধিকরণের নির্দেশানুযায়ী এইসব স্থানীয় কর্তৃপক্ষই ভূমি নির্বাচন করিয়া, মাপজোখ্ করিয়া, মূল্য লইয়া বিক্রয়-কার্য সম্পাদন করিতেন এবং তাহা পট্টীকৃতও করিতেন।

ভুক্তি-অধিকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম্য স্থানীয় অধিকরণ পর্যন্ত সর্বত্রই দেখিতেছি, রাষ্ট্রযন্ত্রে জনসাধারণের ইচ্ছা, মতামত, দায় ও অধিকার কার্যকরী করিবার একটা সুযোগ ছিল। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যবহুল জনপদের অধিকরণ গুলিতে শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা স্থান পাইতেন; কৃষিবহুল, ভূমিনির্ভর জনপদের স্থানীয় বীথী ও গ্রাম্য অধিকরণ গুলিতে গ্রামিক, অষ্টকুলাধিকরণ, কুটুম্ব, মহত্তর, ব্রাহ্মণ, ইত্যাদিরা শাসন-কার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন—অন্তত সহায়ক ও উপদেষ্টা রূপে। ইহাদের দায় ও অধিকারের তারতম্য সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা হয়তো কঠিন, মতভেদও আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু মোটামুটি ভাবে এই যুগের রাষ্ট্রযন্ত্র জনসাধারণকে একেবারে অবজ্ঞা করিয়া চলিতে পারে নাই, এ-তথ্য স্বীকার করিতে হয়। তবে, জনসাধারণ বলিতে ভূমি ও অর্থবান সমৃদ্ধ শ্রেণী এবং ব্রাহ্মণদেরই বুঝাইতেছে, সন্দেহ নাই; ক্ষুদ্র-প্রকৃতিপুঞ্জের কোনো দায় বা অধিকার রাষ্ট্র স্বীকার করিত, এমন প্রমাণ নাই।

৫

ষষ্ঠ শতকে বঙ্গ স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব রাষ্ট্রযন্ত্রও গড়িয়া তোলে। তখন উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে গুপ্ত-বংশের আধিপত্য বিলীয়মান; ছোটখাট বংশধরেরা কোনো প্রকারে তাঁহাদের স্থানীয় আধিপত্য বজায় রাখিয়াছেন মাত্র। স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে) নূতন রাষ্ট্রযন্ত্রেরও পত্তন হইল; কিন্তু সে-রাষ্ট্রবিন্যাস গুপ্ত-আমলের প্রাদেশিক রাষ্ট্ররূপের আদর্শই স্বীকার করিয়া লইল। বস্তুত, বঙ্গের স্বাধীন রাজাদের রাষ্ট্রযন্ত্র গুপ্ত-রাষ্ট্রযন্ত্রের অনুকরণ বলিলেই চলে। রাষ্ট্রবিভাগ,

গুপ্তোত্তর যুগ
আনুমানিক ৫০০-৭৫০ খ্রীষ্টীয় শতক

শাসন-পদ্ধতি, রাজপাদোপজীবীদের উপাধি, দায় ও অধিকার, শাসনক্রম, ইত্যাদি সমস্তই একপ্রকার। কাজেই এ-পর্বে নূতন কথা বলিবার বিশেষ কিছু নাই।

রাষ্ট্রযন্ত্রের চূড়ায় বসিয়া আছেন মহারাজাধিরাজ স্বয়ং, তবে এই মহারাজাধিরাজ স্বাধীন স্বতন্ত্র হইলেও স্থানীয় নরপতি মাত্র। ফরিদপুরে কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত পট্টোলী-গুলিতে যে কয়জন নরপতির উল্লেখ পাইতেছি তাঁহারা সকলেই ঐ উপাধিটি ব্যবহার করিতেছেন। যে-ক্ষেত্রে মহারাজাধিরাজের উল্লেখ নাই, সে-ক্ষেত্রে তিনি শুধু ভট্টারক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বপ্পঘোষবাট-লিপিতে জয়নাগ, এবং শশাঙ্কের একাধিক লিপিতে গৌড়-কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কও মহারাজাধিরাজ উপাধিতেই আখ্যাত হইয়াছেন। খড়্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা খড়্গোদ্যম নৃপাধিরাজ এবং ত্রিপুরার লোকনাথ-পট্টোলীর সামন্ত শিবনাথের পিতা, লোকনাথের বংশের প্রতিষ্ঠাতা, অধিমহারাজ আখ্যায় পরিচিত হইয়াছেন। ইহারা সকলেই স্বাধীন নরপতি সন্দেহ নাই, এবং সেই হিসাবেই মহারাজাধিরাজ, নৃপাধিরাজ, অধিমহারাজ প্রভৃতি উপাধি ব্যবহৃত হইয়াছে। বঙ্গ মহারাজাধিরাজদের অধীনে, শশাঙ্কের অধীনে এবং জয়নাগের অধীনে সামন্ত নরপতির অস্তিত্ব ইহার অন্যতম প্রধান।

গুপ্ত-আমলেই দেখিয়াছি, এই রাজতন্ত্র ছিল সামন্ততন্ত্র-নির্ভর। এই আমলেও দেখিতেছি তাহার ব্যতিক্রম নাই, বরং সামন্ততন্ত্রের প্রসারই দেখা যাইতেছে। সমাজের ভূমিনির্ভরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। গোপচন্দ্রের মল্লসারুল-লিপি-কথিত দূতকমহারাজ মহাসামন্ত বিজয়সেনের কথা আগেই বলিয়াছি; অনুমান হয়, ইনি আগে মহারাজাধিরাজ বৈন্যগুপ্তের মহাসামন্ত ছিলেন, তারপর বর্দ্ধমান-ভুক্তি গোপচন্দ্রের করায়ত্ত হইলে তিনি গোপচন্দ্রের মহাসামন্ত হন। বপ্পঘোষবাট লিপিতে দেখিতেছি,

সামন্ততন্ত্র

সামন্ত নারায়ণভদ্র ঔডুম্বরিক বিষয়ে মহারাজাধিরাজ জয়নাগের সামন্ত ছিলেন। লোকনাথ-পট্টোলী-কথিত ব্রাহ্মণ প্রদোষশর্মা মহারাজ লোকনাথের মহাসামন্ত ছিলেন। আশ্রফপুর-লিপিতে জনৈক সামন্ত বনটিয়োকের সাক্ষাৎ পাইতেছি। শশাঙ্ক তো তাঁহার রাষ্ট্রীয় জীবন আরম্ভই করিয়াছিলেন মহাসামন্তরূপে; তারপর যখন তিনি স্বাধীন পরাক্রান্ত নরপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহার নিজেরও মহাসামন্ত ছিল। বিজিত রাজ্যের রাজারাই বিজেতা মহারাজাধিরাজগণ কর্তৃক মহাসামন্ত রূপে স্বীকৃত হইতেন, এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। শৈলোদ্ভববংশীয় কঙ্গোদাধিপতি দ্বিতীয় মাধবরাজ এবং দণ্ডভুক্তির শাসনকর্তা সোমদত্ত এই দুইজনই যথাক্রমে শশাঙ্কের মহারাজ-মহাসামন্ত এবং সামন্ত-মহারাজ ছিলেন। সামন্তরা সকলে যে একই পর্যায় ও মর্যাদাভুক্ত ছিলেন না, তাহা তাঁহাদের উপাধি হইতেই সুপ্রমাণিত। কেহ ছিলেন মহাসামন্ত-মহারাজ, কেহ মহাসামন্ত, কেহ বা শুধু সামন্ত। ভূম্যাধিপত্যের বিস্তৃতি, রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা ও অধিকার, রাজসভায় ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি প্রভৃতির উপর এই স্তরবিভাগ নির্ভর করিত, সন্দেহ নাই।

বঙ্গরাষ্ট্রের বৃহত্তম রাষ্ট্রবিভাগের নাম এই পর্বে কি ছিল নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বর্দ্ধমান-ভুক্তি (মল্লসারুল-লিপি) ও নব্যাবকাশিকা (ফরিদপুর-লিপি), এই দুইটি যে বৃহত্তম বিভাগ সমূহের দুইটি বিভাগ এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই ; বর্দ্ধমান-ভুক্তির উল্লেখ হইতে মনে হয় নব্যাবকাশিকাও ভুক্তি-পর্যায়েরই রাষ্ট্রবিভাগ। ফরিদপুর-লিপিকথিত সর্বোচ্চ শাসনকর্তা উপরিক নাগদেব, উপরিক জীবদত্ত প্রভৃতির উপাধি হইতে প্রায় নিঃসংশয়ে অনুমান করা চলে যে, নব্যাবকাশিকা ভুক্তি বলিয়া উল্লিখিত না হইলেও ইহার বিভাগীয় রাষ্ট্রমর্যাদা ভুক্তি-পর্যায়ের। ভুক্তির শাসনকর্তারা এ-ক্ষেত্রেও উপরিক উপাধিতেই আখ্যাত হইতেছেন, যদিও স্থাণুদত্তকে উপরিক বলা হয় নাই, শুধু মহারাজ বলা হইয়াছে। নাগদেব শুধু উপরিক নহেন, মহাপ্রতীহারও বটে ; জীবদত্ত উপরিক এবং অন্তরঙ্গ। অন্তরঙ্গ রাজার নিজস্ব চিকিৎসক—রাজবৈদ্য। চক্রদত্তের এক টীকাকার শিবদাস সেনের পিতা অনন্তসেন বারবক শাহের অন্তরঙ্গ ছিলেন ; শ্রীচৈতন্যের পারষদবর্গের অন্যতম শ্রীখণ্ডবাসী মুকুন্দ সরকার ছিলেন হোসেন শাহের অন্তরঙ্গ। মনে হয়, উপরিক জীবদত্ত মহারাজাধিরাজ সমাচারদেবের রাজবৈদ্যও ছিলেন। ইহারা নিযুক্ত হইতেন স্বয়ং মহারাজাধিরাজ কর্তৃক (তদনুমোদনলব্ধাস্পদস্য, তৎপ্রসাদলব্ধাস্পদে. চরণকমলযুগলারাধনোপাত্ত ইত্যাদি পদ দ্রষ্টব্য)। শশাঙ্কের সময় দণ্ডভুক্তি বা দণ্ডভুক্তিদেশও বোধ হয় ছিল একটি ভুক্তি-বিভাগ, এবং তাহার শাসনকর্তার পদোপাধি ছিল উপরিক। সোমদত্ত ছিলেন উপরিক এবং সামন্ত-মহারাজ ; শুভকীর্তি ছিলেন উপরিক এবং মহাপ্রতীহার।

ভুক্তি

গুপ্তরাষ্ট্রে যেমন, বঙ্গরাষ্ট্রে, এবং শশাঙ্কের গৌড়রাষ্ট্রেও তেমনই ভুক্তি-অধিষ্ঠানের একটি অধিকরণ নিশ্চয়ই ছিল। ফরিদপুরের পট্টোলীগুলিতে এই অধিকরণের উল্লেখ পাইতেছি না ; কারণ, উল্লেখের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু, শশাঙ্কের মেদিনীপুর লিপি দুইটিতে যে তাবীর-অধিকরণের উল্লেখ আছে, এবং যে-অধিকরণ হইতে শাসন দুইটি নির্গত হইয়াছিল সেই অধিকরণটি তো ভুক্তির অধিকরণ বলিয়াই মনে হইতেছে।

ভুক্তির নিম্নবর্তী রাষ্ট্রবিভাগ বিষয়ের খবর এই পর্বেও পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গের নব্যাবকাশিকা (-ভুক্তির ?) প্রধান একটি বিষয় ছিল বারকমণ্ডল বিষয়। বারকমণ্ডলের মণ্ডল এখানে কোনও রাষ্ট্রবিভাগ বলিয়া মনে হইতেছে না ; বিষয়টিরই নাম বারকমণ্ডল। বিষয়ের বিষয়পতি কখনও মহারাজাধিরাজ স্বয়ং নিযুক্ত করিতেন, যেমন বপ্পঘোষবাট লিপিতে ঔদুম্বরিক বিষয়ের বিষয়পতিকে বলা হইয়াছে "তৎপাদানুধ্যাত সামন্ত নারায়ণভদ্র বিষয়সম্ভোগকালে", কিন্তু সাধারণত উপরিকেরাই বিষয়পতি নিযুক্ত করিতেন, যেমন, বারকমণ্ডল বিষয়ে। বিষয়পতি জজাবকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন (উপরিক)-মহারাজ স্থাণুদত্ত ; গোপালস্বামী এবং বৎসপালকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন উপরিক জীবদত্ত। ত্রিপুরার লোকনাথ পট্টোলীতেও এক সুব্বুঙ্গ বিষয়ের উল্লেখ পাইতেছি

বিষয়

বিষয়পতিদের অধিকরণের খবর ফরিদপুর-পট্টোলী গুলিতে তো আছেই, লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলীতেও "বিষয়পতীন্ সাধিকরণান্"দের উল্লেখ দেখা যায়। শেষোক্ত লিপিটিতে দেখিতেছি, বিষয়পতি ও তাঁহার অধিকরণ স্থানীয় শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন "সপ্রধান্-ব্যবহারি-জনপদান্"দের সাহায্যে। ফরিদপুর-কোটালিপাড়ার লিপিগুলিতে যে-অধিকরণের উল্লেখ দেখিতেছি, তাহার গঠন ঠিক গুপ্ত-আমলের পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির বিষয়াধিকরণের মতন নয়। ধর্মাদিত্যের দ্বিতীয় পট্টোলীতে বিষয়পতি এবং বিষয়াধিরণ ছাড়া আরও ষোলো-সতেরো জন বিষয়-মহত্তর, ব্যাপারী-ব্যবসায়ী এবং অনুল্লিখিত-সংখ্যক প্রকৃতিপুঞ্জের খবর পাওয়া যাইতেছে। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, কোটিবর্ষের বিষয়াধিকরণে নগরশ্রেষ্ঠি-প্রথমকুলিক-প্রথমসার্থবাহের যে স্থান, এখানে তাঁহাদের সেই স্থান নাই; বিষয়-মহত্তরেরাও বারকমণ্ডল বিষয়াধিকরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নহেন বলিয়াই মনে হইতেছে। এতগুলি বিষয়-মহত্তর, ব্যাপারী-ব্যবহারী এবং প্রকৃতিপুঞ্জ লইয়া বিষয়াধিকরণ গঠিত হইত বলিয়া মনে হয় না; ইঁহারা সম্ভবত জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে অধিকরণের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া শাসনকার্যের আলোচনা ও কর্তব্য নির্ধারণে সহায়তা করিতেন। ইহা ছাড়া বারকমণ্ডল বিষয়ের আরও একটু বৈশিষ্ট্য দেখিতেছি। ঘুগ্রাহাটি-লিপি এবং অন্য আরও দুইটি কোটালিপাড়া-লিপিতে বিষয়পতির অধিকরণের প্রধান হিসাবে একজন জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ বা জ্যেষ্ঠাধিকরণিকের সাক্ষাৎ পাইতেছি। এই তিনটি লিপিতে অধিকরণ-ব্যাপারে বিষয়পতির উল্লেখ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া এ অনুমান করা চলেনা যে, বিষয়পতির সঙ্গে বিষয়াধিকরণের কোনো সম্বন্ধ ছিলনা, বা জ্যেষ্ঠাধিকরণিকই অধিকরণের সভাপতি ছিলেন। বরং, এ-অনুমানই সঙ্গত যে, বিষয়পতিই ছিলেন সর্বময় কর্তা, অধিকরণের সভাপতি; জ্যেষ্ঠকায়স্থ বা জ্যেষ্ঠাধিকরণিক ছিলেন অধিকরণের অন্যান্য সভ্যদের মুখ্যতম প্রতিনিধি। এই অন্যান্য সভ্যরা কাহারা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; অনুমান করিয়াও লাভ নাই। এই অধিকরণেরই সহযোগী উপদেষ্টা হিসাবে থাকিতেন বিষয়-মহত্তরেরা (ধর্মাদিত্যের একটি পট্টোলীকথিত "বিষয়িণঃ" দ্রষ্টব্য), মহত্তরেরা, প্রধান ব্যাপারী বা প্রধান ব্যবহারীরা। মহত্তর ও বিষয়-মহত্তর এই দুয়ের পৃথক উল্লেখ হইতে স্বতই মনে হওয়া উচিত যে, ইঁহারা দুই স্তর বা পর্যায়ের লোক, এবং বিষয়-মহত্তরেরা উচ্চতর পর্যায়ের। মহত্তরেরা তো স্থানীয় সম্ভ্রান্ত বিত্তবান্ ও ভূমিবান্ লোক বলিয়াই মনে হয়; ব্যাপারী ও ব্যবহারীরা নিঃসন্দেহে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোক।

ভূমি ক্রয়-দান-বিক্রয় ব্যাপারে বঙ্গরাষ্ট্রের বিষয়াধিকরণগত সংবাদ গুপ্তরাষ্ট্রযন্ত্রেরই অনুরূপ; খুঁটিনাটি ব্যাপারে যাহা কিছু পার্থক্য তাহা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। মল্লসারুল-লিপিতে বীথী-অধিকরণ সম্পর্কে কুলবারকৃত আখ্যাত এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর উল্লেখ আগেই করা হইয়াছে; বঙ্গরাষ্ট্রের কোনো কোনো লিপিতেও কুলবার নামে রাজপুরুষের সাক্ষাৎ পাইতেছি। সমাচারদেবের ঘুগ্রাহাটি লিপিতে দেখিতেছি, বারকমণ্ডল-বিষয়ের

অধিকরণ বিক্রিত ভূমি মাপিয়া পৃথক করিয়া দিবার জন্য করণিক নয়নাগ, কেশব এবং আরও কয়েকজনকে কুলবার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কোটালিপাড়ার একটি লিপিতেও কুলবারের উল্লেখ আছে এবং সেখানেও ইঁহাদের দায়িত্বের ইঙ্গিত ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের শেষ পর্বে। ইঁহারা বোধহয় স্থায়ী অধিকরণ-কর্মচারী ছিলেন না, সর্বত্রই সকল সময় ইঁহাদের প্রয়োজনও হইত না; প্রয়োজনানুযায়ী অধিকরণ কর্তৃক ইঁহারা নিযুক্ত হইতেন; ভূমি-আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে বোধ হয় তাঁহারা দক্ষ ছিলেন। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, গুপ্তরাষ্ট্রের অধিকরণগুলিতে যেমন, বঙ্গরাষ্ট্রের অধিকরণেও জনসাধারণের মতামত্ ইত্যাদি জ্ঞাপন ও কার্যকরী করিবার সুযোগ ও উপায় ছিল; বিষয়-মহত্তর, মহত্তর, ব্যাপারী-ব্যবহারী ও প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মিলনই তাহার প্রমাণ।

বঙ্গরাষ্ট্রের কোনও বীথী ও বীথী-অধিকরণ বা গ্রামাধিকরণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না; তবে পূর্ববর্তী পর্বের, এবং মল্লসারুল-লিপিকথিত বর্দ্ধমান-ভুক্তির বক্কট্টক-বীথীর অধিকরণের উল্লেখ ও বিবরণ হইতে মনে হয়, পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রবিভাগ ও রাষ্ট্রযন্ত্রে ইহাদের স্থান ছিল—সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই মাত্র। বক্কট্টক-বীথী ও তাহার অধিকরণের কথা আগেই বলা হইয়াছে; এবং তাহা যে মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রেরই অধিকারভুক্ত ছিল সে-ইঙ্গিতও করা হইয়াছে। মল্লসারুল-লিপির সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে অন্যদিক দিয়াও উল্লেখ যোগ্য। গুপ্ত-আমলের প্রাদেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র বঙ্গরাষ্ট্রের কর্মধারা বা আমলাতন্ত্র একই জাতীয় না হওয়াই স্বাভাবিক। স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র বিস্তৃততর হইবে, এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রের রূপ লইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। বঙ্গরাষ্ট্রের আমলে তাহাই হইয়াছিল, এবং মল্লসারুল-লিপিতে সেই বর্দ্ধিত বিস্তৃত আমলাতন্ত্রের প্রতিফলন দেখা যাইতেছে। এই লিপির কর্মচারী-তালিকা আগেই বিবৃত করা হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। এই আমলাতন্ত্র এখন হইতে ক্রমশ বিস্তারলাভ করিয়া সেন-আমলে অস্বাভাবিক স্ফীতি লাভ করিবে—ক্রমে আমরা তাহা দেখিব। ইতিমধ্যেই (সপ্তম শতক) লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলীতে সান্ধিবিগ্রহিক ঔপধিক এক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকর্মচারীর উল্লেখ দেখা যাইতেছে। সান্ধিবিগ্রহিক পররাষ্ট্রব্যাপারে যুদ্ধ ও সন্ধি-শান্তিসম্পর্কিত উচ্চতম রাজকর্মচারী, বর্তমান ইংরাজি পরিভাষায় minister of peace and war। প্রাদেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রে সান্ধিবিগ্রহিক থাকার কোনো প্রয়োজন হয় নাই; কিন্তু স্বাধীন স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সে-প্রয়োজন হইয়াছিল।

৬

অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পালবংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে নবযুগের সূচনা দেখা গেল। কিঞ্চিন্যূন চারিশত বৎসর ধরিয়া এই রাজবংশ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল; এই বংশের প্রভাবশালী রাজারা বাংলাদেশের বাহিরে কামরূপে এবং উত্তর-ভারতের সুবিস্তৃত

দেশাংশ জুড়িয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন, উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যাপারে বাংলাদেশকে ইহারা আন্তর্ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ জগতে একটা বিশিষ্ট স্থানে উন্নীত ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

পাল-পর্ব

এই সব সুবৃহৎ সুবিস্তৃত প্রচেষ্টার পশ্চাতে যে-রাষ্ট্রের সচেতন কর্ম-কল্পনা সক্রিয় ছিল সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বতোমুখী বিস্তার ও জটিলতা সহজেই অনুমেয়। তাহা ছাড়া, যে-রাষ্ট্রযন্ত্র গুপ্ত-আমলে প্রবর্তিত হইয়া হইয়া স্বাধীন বঙ্গরাজাদের, শশাঙ্ক ও অন্যান্য রাজাদের আমলে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া অভ্যস্ত ও আচরিত হইয়াছে, তাহা পালবংশের সুদীর্ঘ কালের সুবিস্তৃত রাজ্য ও সুবিপুল দায়িত্বের ক্রমবর্ধমান প্রসারে আরও প্রসারিত, আরও গভীরমূল, আরও দৃঢ়সংবদ্ধ হইবে, স্পষ্টতর রূপ গ্রহণ করিবে তাহাও কিছু বিচিত্র নয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের নূতন কোনো বৈশিষ্ট্য পালরাষ্ট্র বা চন্দ্র-কম্বোজরাষ্ট্রে সূচিত হইয়াছিল, এমন নয়, বরং বলা যায় উত্তর-ভারতের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার সূত্রে সমসাময়িক উত্তর-ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্র-বিন্যাসগত অনেক অভ্যাস, অনেক বৈশিষ্ট্য এই যুগের রাষ্ট্র আত্মসাৎ করিয়াছিল। সপ্তম শতকের দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের দেওবরণার্ক লিপি, হর্ষবর্ধনের বাঁশখেরা লিপি প্রভৃতিতে সমসাময়িক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-বিন্যাসের যে-চিত্র পাওয়া যায়, পালরাষ্ট্রের প্রথম পর্বেও রাষ্ট্র-বিন্যাসের চিত্র মোটামুটি একই।

পূর্ব পূর্ব যুগের মত এ-যুগে এবং পরবর্তী যুগেও রাষ্ট্র-বিন্যাসের গোড়ার কথা রাজতন্ত্র, এবং সে-রাজতন্ত্র আরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, আরও মহিমা ও মর্যাদাসমন্বিত, আরও কীর্তি ও ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ। অব্যবহিত পূর্বযুগের স্বাধীন রাজারা ছিলেন মহারাজাধিরাজ অথবা অধিমহারাজ অথবা নৃপাধিরাজ; লোকনাথের পট্টোলীতে রাজাকে পরমেশ্বরও বলা হইয়াছে। এ-সমস্ত উপাধি বাংলাদেশে গুপ্ত-রাজারাই প্রচলন করিয়াছিলেন। পাল ও চন্দ্রবংশের রাজারা শুধু মহারাজাধিরাজ মাত্র নন, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর এবং পরমভট্টারকও। গুপ্ত-সম্রাটেরাও তো ছিলেন পরমদৈবত-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ।

রাজতন্ত্র

সাম্রাজ্য, রাজকীয় মর্য্যাদা ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে রাজাদের ঔপধিক আড়ম্বর বাড়িবে, তাহা কিছু আশ্চর্যও নয়! বংশানুক্রমিক রাজবংশের সর্বময় প্রভুত্ব, রাজকীয় মহিমা, ঐশ্বর্য-বিলাস, পারিবারিক মর্যাদা ইত্যাদি পাল আমলের লিপিগুলিতে যে অজস্র অত্যুক্তিময় পল্লবিত স্তুতিবাদ লাভ করিয়াছে তাহাতে মনে হয়, ভারতের অন্যত্র যেমন, বাংলাদেশেও তেমনই এই যুগে রাজাকে দেবতা ও পরমেশ্বরের নররূপী অবতার এবং পরমগুরু বলিয়া প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল।

রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ নামে আখ্যাত হইতেন, এবং প্রাপ্তবয়স্ক হইলেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতেন। তাঁহার দায় ও অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এক যুবরাজ ত্রিভুবনপাল ধর্মপালের খালিমপুর লিপির দূতকের কার্য করিয়াছিলেন; আর এক যুবরাজ রাজ্যপাল দেবপালের মুঙ্গের-লিপির দূতক ছিলেন। বিগ্রহপাল তাঁহার পুত্র যুবরাজ

নারায়ণপালের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থে গিয়াছিলেন। রাজার পুত্র কুমার নামে অভিহিত হইতেন, এবং তাঁহাদের কেহ কেহ উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইতেন, যুদ্ধবিগ্রহেও যোগদান করিতেন। রামপাল তাঁহার পুত্র রাজ্যপালের সঙ্গে রাজকীয় ও সামরিক ব্যাপারে আলোচনা পরামর্শ করিতেন; পরিণত বয়সে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনিও বানপ্রস্থে গিয়া গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করেন। রাজারা রাষ্ট্রকার্যে ভ্রাতাদের সহায়তা এবং পরামর্শও গ্রহণ করিতেন। ধর্মপাল ভ্রাতা বাক্‌পাল এবং দেবপাল কর্তৃক সামরিক ব্যাপারে বহুল উপকৃত হইয়াছিলেন। ভ্রাতা ও রাজপরিবারের ঘনিষ্ট আত্মীয়দের মধ্যে সিংহাসন ও উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ হইত না, এমন নয়; একবার এই ধরনের এক বিবাদ রাষ্ট্রবিপ্লবের অন্যতম কারণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে কৈবর্ত-বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বোধ হয় ভ্রাতৃবিরোধ এবং মহীপাল কর্তৃক ভ্রাতা রামপাল ও শূরপালের কারাবরোধ। তৃতীয় গোপালের মৃত্যুর মূলে খুল্লতাত মদনপালের দায়িত্ব একেবারে ছিল না, এ-কথা জোর করিয়া বলা যায় না। পাল-লিপিমালার রাজপাদপোপজীবীদের তালিকায়ও রাজপুত্রের উল্লেখ আছে। চন্দ্রবংশীয় লিপির এই তালিকায় রাজার এবং কম্বোজ বংশের ইর্দা পট্টোলীতে মহিষীর উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজকীয় মহিমা ও মর্যাদার সীমার ভিতরে মহিষীরও একটা স্থান ছিল, সন্দেহ নাই।

পাল-আমলে সামন্ততন্ত্র আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ও দৃঢ়সংবদ্ধ হয়। সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সামন্তদের সংখ্যাও ছিল অনেক। অনুমান করা কঠিন নয়, ইহাদের অনেকেই বিজিত রাজ্য ও রাষ্ট্রের প্রভু ছিলেন; বিজিত হইবার পর মহাসামন্ত-সামন্তরূপে স্বীকৃত হইতেন। মহারাজাধিরাজ সম্রাটের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধের স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন; তবে, খালিমপুর-লিপি পাঠে মনে হয়, পাল-সম্রাটেরা সময় সময় মহতী রাজকীয় সভা আহ্বান করিতেন বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে, এবং তখন এই সব মহারাজা-মহাসামন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ সামন্ত ও মাণ্ডলিক পর্যন্ত সকলেই সেই সভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজধিরাজ সম্রাটকে বিনীত প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া নিজেদের অধীনতার স্বীকৃতি জানাইতেন। পাল ও চন্দ্র-লিপিমালায় রাজপুরুষদের যে ক্ষুদ্র বৃহৎ তালিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে রাজন্‌, রাজনক, রাজন্যক, রাণক, সামন্ত, মহাসামন্ত প্রভৃতি ঔপধিক রাজপাদোপজীবীদের সাক্ষাৎ মেলে। ইহারা সকলেই যে নানা স্তরের সামন্ত নরপতি, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে জনৈক মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণবর্মার খবর পাওয়া যাইতেছে; তিনি কোন্‌ জনপদের মহাসামন্তাধিপতি তাহা জানা যাইতেছে না। এই লিপিতেই উত্তরাপথের যে-সব নরপতিদের পাটলিপুত্রের রাজদরবারে আসিয়া রাজরাজেশ্বরের সেবার্থ সমবেত হইবার ইঙ্গিত আছে, ভোজ-মৎস্য-মদ্র-কুরু-যদু-যবন-অবন্তি-গন্ধার-কীর-পঞ্চাল প্রভৃতি মিত্র রাজন্যবর্গের যে উল্লেখ আছে তাঁহারাও এক হিসাবে সামন্তরাজা, সন্দেহ

সামন্ততন্ত্র

নাই। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে যাঁহারা পালরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন তাঁহারাও 'অনন্ত সামন্তচক্র।' আবার রামপাল যাঁহাদের সহায়তায় পিতৃরাজ্য বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতে 'সামন্ত'-আখ্যায়ই পরিচয় দিয়াছেন, অথচ তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব জনপদে প্রায় স্বাধীন নরপতি। অপর-মন্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশূর তো নিজেও ছিলেন সামন্ত এবং "আটবিক-সামন্ত-চক্র-চূড়ামণি"। রামপালের মাতুল রাষ্ট্রকূট মহনের দুই পুত্র, মহামাণ্ডলিক কাহ্নুরদেব এবং সুবর্ণদেবও রামপালের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। তাহার পর, পালরাষ্ট্রের দুর্দিনে যাঁহারা বিদ্রোহপরায়ণ হইয়া সেই রাষ্ট্রকে ধ্বংসের পথে আগাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারাও সামন্ত। এক বর্ম্মণরাজ রামপালের শরণাগত হইয়াছিলেন এবং ইহা অসম্ভব নয় যে, বর্মণ বংশ সামন্ত-বংশ রূপেই বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং পরে স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কামরূপের বিদ্রোহী নরপতি তিঙ্গ্যদেবও পালরাষ্ট্রের সামন্তই ছিলেন।

পাল-চন্দ্র পর্বের রাষ্ট্রেই আমরা সর্বপ্রথম একজন প্রধান রাজপুরুষের সাক্ষাৎ পাইতেছি যাঁহার পদোপাধি মন্ত্রী বা সচিব এবং যিনি রাজা ও সম্রাট্‌দের সকল কর্মের প্রধান সহায়ক, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বপ্রধান কর্মচারী। ভট্ট গুরবমিশ্রের বাদল-প্রশস্তিতে দেখা যাইতেছে, একটি সম্রান্ত, শাস্ত্রবিদ্‌, সমসাময়িক পণ্ডিতকুলাগ্রগণ্য ব্রাহ্মণ-পরিবার চারিপুরুষ ধরিয়া পাল-সম্রাটদের মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন। মন্ত্রী গর্গ ধর্মপালকে অখিল রাজ্যের স্বামিত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে; তাঁহার পুত্র দর্ভপাণির নীতি কৌশলে দেবপাল হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ করতলগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! শুধু তাহাই নয়, 'দেবপাল···উপদেশ গ্রহণের জন্য দর্ভপাণির অবসর অপেক্ষায় তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন' এবং 'তিনি আগে সেই মন্ত্রীবরকে আসন প্রদান করিয়া স্বয়ং সচকিতভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন।' দর্ভপাণির পুত্র সোমেশ্বর পরমেশ্বর-বল্লভ বা মহারাজাধিরাজের প্রিয়পাত্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। সোমেশ্বরপুত্র কেদারমিশ্রের 'বুদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া' দেবপাল উৎকল, হূণ, দ্রাবিড় ও গুর্জরনাথকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞস্থলে শূরপাল নামক নরপাল স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অনেকবার শ্রদ্ধাসলিলাপ্লুত হৃদয়ে নতশিরে পবিত্র শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেদারমিশ্রের পুত্র শ্রীগুরবমিশ্রকে 'শ্রীনারায়ণপাল যখন माननীয় মনে করিতেন, তখন আর তাঁহার অন্য প্রশংসা বাক্য কি হইতে পারে?' এই সব বর্ণনার মধ্যে অতিশয়োক্তি যথেষ্ট, সন্দেহ নাই; মন্ত্রীরা সকলেই যে খুব প্রতাপবান ছিলেন, রাজা ও রাষ্ট্রের উপর তাঁহাদের অধিপত্য যে খুব প্রবল ছিল, এ-সম্বন্ধেও সন্দেহ করা চলে না। আর একটি ব্রাহ্মণ-পরিবারও বংশানুক্রমে কয়েক পুরুষ ধরিয়া পাল-রাজাদের মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন। শাস্ত্রবিদশ্রেষ্ঠ যোগদেব বংশানুক্রমে (বংশানুক্রমেণাভূৎ সচিবঃ) তৃতীয় বিগ্রহপালের সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন; যোগদেবের পর "তত্ত্ববোধভূ"

মন্ত্রী

বোধিদেব রামপালের সচিব ছিলেন ; বোধিদেবের পুত্র কুমারপালের 'চিন্তানুরূপ সচিব' হইয়াছিলেন। এই দুইটি বংশানুক্রমিক দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয়, বংশানুক্রমিক মন্ত্রীত্বপদ পালরাষ্ট্রে প্রচলিত হইয়াছিল ; এবং সম্ভবত এ-ক্ষেত্রেও তাঁহারা গুপ্তবংশীয় প্রথাই অনুসরণ করিয়াছিলেন। শুধু মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য অনেক পদনিয়োগের ক্ষেত্রে পাল, বর্মণ ও সেনবংশীয় রাজারা এই বংশানুক্রমিক নিয়োগপ্রথা মানিয়া চলিতেন। গুপ্তরাষ্ট্রের আমলেই এই প্রথা বহুল প্রচলিত হইয়াছিল। আল্ মাসুদি তো পরিষ্কার বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে অনেক রাজকীয় পদই ছিল বংশানুক্রমিক। অন্যান্য দুই একটি লিপিতেও পালরাষ্ট্রের মন্ত্রীপদের উল্লেখ আছে, যেমন, প্রথম মহীপালের বাণগড় লিপির দূতক ছিলেন ভট্টবামন মন্ত্রী ; তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি লিপির দূতকও ছিলেন একজন মন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী (বাণগড় লিপির মহামন্ত্রী দ্রষ্টব্য) বা সচিব ছাড়াও রাজার এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের কার্যে সহায়তা করিবার জন্য আরও কয়েকজন মন্ত্রী থাকিতেন ; ইঁহাদের কাহারো কাহারো পদোপাধি পাল ও চন্দ্রবংশের লিপিগুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে, যেমন, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, রাজামাত্য, মহাকুমারামাত্য, দূত বা দূতক, মহাসেনাপতি, মহাপ্রতীহার, মহাদণ্ডনায়ক, মহাদৌঃসাধসাধনিক, মহাকর্তাকৃতিক, মহাক্ষপটলিক, মহাসর্বাধিকৃত, রাজস্থানীয় এবং অমাত্য। অমাত্য সাধারণভাবে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ; রাজপুত্রের পরই রাজামাত্যের উল্লেখ হইতে মনে হয়, মন্ত্রী বা সচিবের পরই ইঁহাদের স্থান। কুমারামাত্য সাধারণত বিষয়পতির সমার্থক, বিষয়ের সর্বময় কর্তা ; মহাকুমারামাত্য হয়তো বিষয়পতি বা কুমারামাত্যদের সর্বাধ্যক্ষ। দূত কোন স্থায়ী রাজপদ না-ও হইতে পারে ; অন্তত তিনটি লিপিতে দেখিতেছি, মন্ত্রীরা এবং সান্ধিবিগ্রহিকেরাও দূত নিযুক্ত হইতেছেন (বাণগড়, আমগাছি ও মনহলি লিপি)। মহাসান্ধিবিগ্রহিক পররাষ্ট্রসংপৃক্ত যুদ্ধ ও শান্তি ব্যবস্থা-বিষয়ক উচ্চতম রাজকর্মচারী। মহাসেনাপতি যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কিত উচ্চতম রাজপুরুষ। মহাপ্রতীহার পদোপাধি রাজপুরুষ ও সামন্ত উভয়েরই দেখা যায়, এবং সামরিক ও অসামরিক উভয় বিভাগেই এই পদোপাধি প্রচলিত ছিল। প্রতীহার অর্থ দ্বাররক্ষক ; রাষ্ট্রের কর্মচারী মহাপ্রতীহার বোধ হয় রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমারক্ষক উর্দ্ধতম রাজকর্মচারী। অথবা, ইঁহাকে রাজপ্রাসাদের রক্ষকাবেক্ষক অর্থাৎ শান্তিরক্ষা-বিভাগের কর্মচারীও বলা যায়! ইঁহাকে অবশ্য যথার্থত মন্ত্রী বলা চলে না। মহাদণ্ডনায়ক প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ বা বিচারক, বিচার বিভাগের সর্বময় কর্তা। মহাদৌঃসাধসাধনিক ও মহাকর্তাকৃতিকের দায় ও কর্তব্য কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। মহাক্ষপটলিক আয়ব্যয়হিসাব-বিভাগের কর্তা। মহাসর্বাধিকৃত কি কাজ করিতেন এবং কোন্ বিভাগের কর্তা ছিলেন বলা কঠিন ; তবে, মধ্যযুগের এবং সাম্প্রতিক কালের সর্বাধিকারী পদবীটি এই রাজপদের স্মৃতি বহন করে। রাজস্থানীয় স্বয়ং রাজাধিরাজ-নিযুক্ত উচ্চ রাজকর্মচারী, রাজপ্রতিনিধি। ইঁহারা সকলেই রাষ্ট্রযন্ত্রে এক একটি প্রধান বিভাগের সর্বময় কর্তা, রাজা এবং রাষ্ট্রের এক এক বিভাগীয় মন্ত্রী বা

সাধারণভাবে কোনো কোনো বিশেষ বিশেষ কাজের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। রাজধানীতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্রে বসিয়া সেখান হইতে ইহারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্ম-বিভাগের এবং জনপদ-বিভাগের কার্য পরিচালনা করিতেন।

ইহাদের ছাড়া কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের আরও কয়েকজন পরিচালক থাকিতেন; তাঁহাদের উপাধি ছিল অধ্যক্ষ, এবং কাজ ছিল রাজকীয় অসামরিক বিভাগের হস্তী, অশ্ব, গর্দভ, খচ্চর, গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ করা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির অধ্যক্ষের উল্লেখ আছে। এই সব অধ্যক্ষদের দায় ও কর্তব্যের বিবৃতি কৌটিল্য-কথিত বিবৃতিরই অনুরূপ ছিল, সন্দেহ নাই। অধ্যক্ষদের মধ্যে নৌকাধ্যক্ষ বা নাবাধ্যক্ষ এবং বলাধ্যক্ষ নামীয় দুইজন রাজকর্মচারীও ছিলেন; নৌকাধ্যক্ষ রাজকীয় নৌবাহিনীর এবং বলাধ্যক্ষ রাজকীয় পদাতিক সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ।

ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত ব্যাপারেও রাষ্ট্রযন্ত্রের বাহু ক্রমশ বিস্তৃত হইতেছিল। পাল ও চন্দ্র-রাষ্ট্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বর্ণ-ব্যবস্থা ও লোকাচরিত বর্ণ-বিন্যাস বৌদ্ধ পাল নরপতিরাও যে অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অন্যত্র বলিয়াছি। ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান ব্যাপার সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য পাল এবং চন্দ্র রাষ্ট্রযন্ত্রে কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইতেন; এবং সম্ভবত ইহারা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। নরপতিদের ব্যক্তিগত ও বংশগত ধর্ম যাহাই হউক না কেন, পাল ও চন্দ্র-রাজারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত ধর্মমত দ্বারা রাষ্ট্রকে প্রভাবান্বিত হইতে দেন নাই। তাহা হইলে বংশানুক্রমিক ভাবে দুই দুইটি গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবার বহুকাল ধরিয়া পালরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর কাজ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা যে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মেরই পোষকতা করিতেন এ-সম্বন্ধে সুপ্রচুর লিপিপ্রমাণ এবং তিব্বতী গ্রন্থের সাক্ষ্য বিদ্যমান। এই যুগে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে সামাজিক পার্থক্য বিশেষ কিছু ছিলও না। দেবপাল বীরদেবকে নালন্দা মহাবিহারে প্রধান আচার্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এই সাক্ষ্য হইতে এবং বিভিন্ন মহাবিহার সংক্রান্ত বিচিত্র ও বিস্তৃত তিব্বতী সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, ধর্ম ও শিক্ষা ব্যাপারেও পাল রাষ্ট্রযন্ত্র সক্রিয় ছিল। চন্দ্র-রাজাদের লিপিতে শান্তিবারিক উপাধিক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহারা বোধ হয় তখনও রাজকর্মচারী হইয়া উঠেন নাই। কম্বোজরাজ জয়পালের ইর্দা পট্টোলীতেই সর্বপ্রথম ঋত্বিক, ধর্মজ্ঞ ও পুরোহিতের সাক্ষাৎ পাইতেছি রাজকর্মচারীরূপে।

পাল ও চন্দ্র লিপিমালায় রাজপুরুষদের সুদীর্ঘ তালিকা দেওয়া আছে। এই রাজপুরুষেরা কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের নানা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সন্দেহ নাই। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কতকটা নিঃসংশয় ভাবে এমন যাঁহাদের কথা বলা চলে তাঁহাদের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অন্য আরও অনেকে ছিলেন যাঁহাদের সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না; ইহারা অনেকেই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন,

সন্দেহ নাই ; কিন্তু, কেহ কেহ স্থানীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্মচারী ছিলেন, তাহাও সমান নিঃসন্দেহ। ইহাদের সকলের কথা বলিবার আগে পাল ও চন্দ্র-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় জনপদ-বিভাগের কথা বলিয়া লইতে হয়।

বিভিন্ন রাষ্ট্র-বিভাগ

পূর্বতন রাষ্ট্রযন্ত্রে যেমন, এই পর্বেও রাষ্ট্রের প্রধান বিভাগের নাম ভুক্তি। বাংলাদেশে পালরাষ্ট্রের তিনটি ভুক্তি-বিভাগের খবর লিপিমালা হইতে জানা যায় ; বৃহত্তম ভুক্তি পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তি এবং তাহার পরই বর্দ্ধমান-ভুক্তি ও দণ্ড-ভুক্তি ; বর্তমান বিহারে দুইটি, তীর-ভুক্তি (তিরহুত) এবং শ্রীনগর-ভুক্তি ; বর্তমান আসামে একটি, প্রাগ্জ্যোতিষ-ভুক্তি। ভুক্তির শাসনকর্তার নাম উপরিক। এই উপরিক কখনো কখনো রাজস্থানীয়-উপরিক ; অর্থাৎ শুধু ভুক্তির শাসনকর্তা নহেন, তিনি রাজপ্রতিনিধিও বটে। পূর্ব পর্বে কোটালিপাড়ার একটি লিপিতে দেখিয়াছি, অন্তরঙ্গ বা রাজবৈদ্য কখনও কখনও ভুক্তির উপরিক নিযুক্ত হইতেন। ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ লিপিতে ভুক্তির শাসনকর্তাকে বলা হইয়াছে ভুক্তিপতি।

ভুক্তির নিম্নতর বিভাগ মণ্ডল না বিষয় তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায় ; সাক্ষ্যও পরস্পর বিরোধী। খলিমপুর লিপির মহান্তপ্রকাশ-বিষয় ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলভুক্ত ; এই লিপিরই আম্রষণ্ডিকা-মণ্ডল (উড়্রগ্রাম-মণ্ডলের সীমাবর্তী) পালীতক-বিষয়ের অন্তর্গত ; মুঙ্গের-লিপির ক্রিমিল-বিষয় শ্রীনগর-ভুক্তির অন্তর্গত ; বাণগড়-লিপির গোকালকা-মণ্ডল কোটিবর্ষ-বিষয়ের অন্তর্গত ; বাণগড়, মনহলি ও আমগাছি লিপির কোটিবর্ষ-বিষয় পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত (দ্বিতীয় লিপিটিতে মণ্ডলের উল্লেখই নাই) ; কমৌলিলিপির কামরূপ-মণ্ডল প্রাগ্জ্যোতিষ-ভুক্তির অন্তর্গত, মন্দরাগ্রাম বড়া-বিষয়ের অন্তর্গত ; মনহলি-লিপির হলাবর্ত-মণ্ডল কোটিবর্ষ-বিষয়ের অন্তর্গত ; ভাগলপুর-লিপির কক্ষ-বিষয় তীর-ভুক্তির অন্তর্গত, এবং সেই বিষয়েরই অন্তর্গত মুকুতিগ্রাম, ইত্যাদি। এই সাক্ষ্যে দেখা যাইতেছে, ভুক্তির নিম্নতর বিভাগ কোথাও মণ্ডল, কোথাও বিষয়। চন্দ্র-রাষ্ট্রে কিন্তু বিষয়ই বৃহত্তর বিভাগ এবং মণ্ডল বিষয়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে হইতেছে। শ্রীচন্দ্রের রামপাল-লিপির নাব্য-মণ্ডল সোজাসুজি পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত, কিন্তু ঐ রাজারই ধুল্লা লিপির বল্লীমুণ্ডা-মণ্ডল খেদিরবল্লী-বিষয়ের এবং যোলামণ্ডল ইক্কডাসী-বিষয়ের অন্তর্গত, এবং উভয় বিষয়ই পৌণ্ড্র-ভুক্তির অন্তর্গত। ইদিলপুর লিপিতেও দেখিতেছি, কুমারতালক-মণ্ডল সতটপদ্মাবতী-বিষয়ের অন্তর্গত। জয়পালের ইর্দালিপির দণ্ডভুক্তি-মণ্ডল বর্দ্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত। দণ্ডভুক্তি বোধ হয় ভুক্তি-বিভাগই ছিল, কিন্তু কম্বোজবংশের অধিকারের পর মণ্ডল-বিভাগে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শশাঙ্কের মেদিনীপুরের একটি লিপিতে দণ্ডভুক্তি-দেশ নামে জনপদের উল্লেখ স্মর্তব্য। মনে হয়, ব্যতিক্রম যাহাই থাকুক, বিষয়ই ছিল ভুক্তির অব্যবহিত নিম্নবর্তী রাষ্ট্র-বিভাগ, এবং মণ্ডল বিষয়ের নিম্নবর্তী বিভাগ। বিষয়ের শাসনকর্তার পদোপাধি ছিল বিষয়পতি। গুপ্ত-আমলের কোনো কোনো লিপিতে বিষয়ের শাসনকর্তাকে আয়ুক্তক বলা

হইয়াছে ; অন্য দুই একটি লিপিতে কিন্তু আয়ুক্তক বলিতে ভুক্তি বা বিষয়ের উচ্চ কর্মচারী বলিয়া মনে হয়। পাল-আমলের লিপিগুলিতে তদায়ুক্তক এবং বিনিয়ুক্তক পদোপাধিবিশিষ্ট দুইটি রাজকর্মচারীর খবর পাওয়া যায়। ইহারা বোধ হয় ভুক্তি ও বিষয় শাসন-সংপৃক্ত উচ্চ রাজকর্মচারী। মণ্ডলের শাসনকর্তার নাম খুব সম্ভব ছিল মণ্ডলাধিপতি (বা মাণ্ডলিক) ; নালন্দা-লিপিতে আছে, ব্যাঘ্রতটী-মণ্ডলাধিপতি বলবর্মণ দেবপালের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। শ্রীচন্দ্রের রামপাল-লিপিতে মণ্ডল-শাসনকর্তার পদোপাধি মণ্ডলপতি।

বাংলার কোনো পাল-লিপিতে কিংবা চন্দ্রদের কোনও লিপিতে বীথী-বিভাগের কোনো উল্লেখ নাই, কিন্তু বিহারে প্রাপ্ত অন্তত দুইটি লিপিতে আছে। ধর্মপালের নালন্দা লিপির জম্বুনদী-বীথী ছিল গয়া-বিষয়ের অন্তর্গত। বীথীর শাসনকর্তার পদোপাধি কিছু জানা যাইতেছে না। কম্বোজ-বর্মণ-সেন আমলে বাংলাদেশে বীথী-রাষ্ট্রবিভাগের সাক্ষাৎ মেলে ; পাল-পূর্বযুগেও বীথী-বিভাগের প্রমাণ বিদ্যমান ; এই জন্য মনে হয়, পাল এবং চন্দ্র-রাষ্ট্রেও বীথী রাষ্ট্রবিভাগ প্রচলিত ছিল, লিপিগুলিতে উল্লেখ পাইতেছি না মাত্র।

এই সব ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল বা বীথীর অধিকরণ ছিল কিনা, থাকিলে তাহাদের গঠনই বা কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার কোনো উপায়ই লিপিগুলিতে বা অন্যত্র কোথাও নাই। ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, বীথী প্রভৃতি রাষ্ট্রযন্ত্রের শাসনকার্য কি ভাবে পরিচালিত হইত, পূর্ব যুগের মত জনসাধারণের কোনো দায় ও অধিকার এ-ব্যাপারে ছিল কিনা, তাহাও জানা যাইতেছে না। তবে, খালিমপুর লিপিতে একটু ইঙ্গিত যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই লিপিতে জ্যেষ্ঠকায়স্থ, মহা-মহত্তর, মহত্তর এবং দাশগ্রামিক—ইহাদের বলা হইয়াছে "বিষয়ব্যবহারী"। অনুমান হয়, ইহারা সকলেই বিষয়ের শাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জ্যেষ্ঠকায়স্থ, মহা-মহত্তর ও মহত্তরেরা তো পূর্ব পর্বেও বিষয়াধিকরণের সঙ্গে থাকিতেন। দাশগ্রামিক দশটি গ্রামের কর্তা ; পদাধিকারীর উল্লেখ হইতে মনে হয়, বিষয়ের অধীনে দশ দশটি গ্রামের এক একটি উপবিভাগ থাকিত, এবং দাশগ্রামিক ছিলেন এক একটি উপবিভাগের শাসনকর্ম-পর্যবেক্ষক।

রাষ্ট্রের নিম্নতম বিভাগ এই পর্বে গ্রাম, এবং গ্রামের স্থানীয় শাসনকার্যের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম গ্রামপতি ; তিনিও অন্যতম রাজপুরুষ। ভূমি-দানের বিজ্ঞপ্তি-তালিকায় গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে সাক্ষাৎ পাইতেছি করণ, প্রতিবাসী, ক্ষেত্রকর, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মেদ, অন্ধ্র ও চণ্ডাল পর্যন্ত সমস্ত লোকদের। কম্বোজরাজ জয়পালের ইর্দা-পট্টোলীতে ইহাদের সঙ্গে স্থানীয় ব্যবহারী(ব্যবসায়ী-ব্যাপারী)দের উল্লেখও পাইতেছি।

ইর্দা-পট্টোলীতে প্রাদেষ্টৃ নামে এক শ্রেণীর রাজপুরুষের উল্লেখ আছে। এই রাজপুরুষটির উল্লেখ বাংলাদেশের আর কোনো লিপিতেই দেখা যায় না, অথচ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে ইনি কর-সংগ্রহ, শান্তিরক্ষা ইত্যাদি সংপৃক্ত শাসনব্যাপারের নিয়ামক উচ্চ রাজকর্মচারী। ইর্দা-পট্টোলীতে মহিষী, যুবরাজ, মন্ত্রী, পুরোহিত ইত্যাদির সঙ্গে

প্রাদেষ্টৃ্র উল্লেখ হইতে মনে হয়, কম্বোজ-রাষ্ট্রেও এই পদাধিকারী উচ্চ রাজকর্মচারী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ইর্দা-পট্টোলীর রাষ্ট্রযন্ত্র-সংবাদ অন্যদিক হইতেও উল্লেখযোগ্য। এই লিপির রাজপুরুষদের তালিকায় দেখিতেছি, করণসহ অধ্যক্ষবর্গের উল্লেখ, সৈনিকসংঘমুখ্যসহ সেনাপতির উল্লেখ, গূঢ়পুরুষ এবং মন্ত্রপালসহ দূতের উল্লেখ। এই সব উল্লেখ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, কম্বোজ-রাষ্ট্রযন্ত্রের বহু বিভাগ বিদ্যমান ছিল, এবং প্রত্যেক বিভাগের একজন করিয়া অধ্যক্ষ থাকিতেন। প্রত্যেক অধ্যক্ষের অধীনে বহু করণ (= কেরাণী কর্মচারী) থাকিতেন। যুদ্ধবিগ্রহ-বিভাগ ছিল সেনাপতির অধীনে, এবং তাঁহার অধীনে ছিলেন সৈনিক-সংঘের প্রধান কর্মচারীরা। পররাষ্ট্র-বিভাগের কর্তা ছিলেন দূত ; এই বিভাগের বোধ হয় দুই উপবিভাগ ; একটি উপবিভাগে মন্ত্রপালেরা, আর একটিতে গূঢ়পুরুষেরা। মন্ত্রপালেরা সাধারণভাবে পররাষ্ট্র-ব্যাপারে দূতকে মন্ত্রণা দান করিতেন ; গূঢ়পুরুষেরা গোপনীয় সংবাদ সরবরাহ করিতেন। এই সব বিভাগীয় বর্ণনা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের রাষ্ট্রযন্ত্র বিভাগ-বর্ণনার সঙ্গে প্রায় স্পষ্ট মিলিয়া যাইতেছে। পাল-লিপিতে নৌকাধ্যক্ষ, গো, মহিষ, উষ্ট্র, অজ, অশ্ব, হস্তী, গর্দ্দভ ইত্যাদি অসামরিক অধ্যক্ষদের উল্লেখের কথা আগেই বলিয়াছি। চন্দ্র-বংশীয় লিপিতেও কৌটিলের অর্শশাস্ত্রোক্ত 'অধ্যক্ষ-প্রচার'-অধ্যায়ের উল্লেখ দেখিতেছি। বাংলার সমসাময়িক রাষ্ট্র-বিন্যাসে কৌটিল্য-রাষ্ট্রনীতির প্রভাব অনস্বীকার্য। ইহা হইতে এই অনুমানও করা চলে, পাল ও চন্দ্র-রাষ্ট্রযন্ত্র কম্বোজ-রাষ্ট্রযন্ত্রের মতনই বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত ছিল। এই দুই রাজবংশের লিপিমালায় যে-সব রাজপুরুষদের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতেও এই অনুমান সমর্থিত হয়। সুনির্দিষ্ট ভাবে বলিবার উপায় নাই, তবে মোটামুটি ভাবে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি কতকটা সুস্পষ্ট।

(ক) বিচার-বিভাগ—এই বিভাগের উর্দ্ধতন কর্মচারী মহাদণ্ডনায়ক। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে জনৈক কোবিদ (পণ্ডিত) গোবিন্দকে বলা হইয়াছে ধর্মাধিকার (ধর্মাধিকারার্পিত)। দেবপালের নালন্দা লিপিটিই উল্লিখিত হইয়াছে ধর্মাধিকার বলিয়া ; কি অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, বলা কঠিন। তবে, কমৌলি-লিপিকথিত গোবিন্দ যে বিচার-বিভাগেরই উচ্চ রাজকর্মচারী, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। মহাদণ্ডনায়কের পরেই দণ্ডনায়ক। দাশাপরাধিকও এই বিভাগের কর্মচারী বলিয়া মনে হইতেছে ; স্মৃতিশাস্ত্র-কথিত দশ প্রকার অপরাধের বিচার ইনি করিতেন, এবং অপরাধ প্রমাণিত হইলে অর্থদণ্ড আদায় করিতেন।

(খ) রাজস্ববিভাগ—আয়বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ কে ছিলেন বলা কঠিন ; কোনো পদোপাধিতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। রাষ্ট্রের অর্থাগমের নানা উপায় ছিল। প্রথম এবং প্রধান উপায় কর। কর ছিল নানা প্রকারের ; প্রধানত পাঁচ প্রকার করের উল্লেখ লিপিগুলিতে পাওয়া যায়—ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য এবং উপরিকর। অন্যত্র এই সব করের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়াছি। উপরিক, বিষয়পতি, মণ্ডলপতি, দ্রাশগ্রামিক এবং

গ্রামপতির রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে এই সব কর আদায় করা হইত। ভোগ-কর আদায়-বিভাগের যিনি সর্বময় কর্তা ছিলেন তাঁহার পদোপাধি ছিল ভোগপতি। পূর্ব পর্বের মল্লসারুল লিপিতে মহাভোগিক নামে এক রাজপুরুষের উল্লেখ আমরা দেখিয়াছি; তিনি ভোগ-কর আদায় বিভাগের উচ্চতম কর্তা, সন্দেহ নাই। ষষ্ঠাধিকৃত নামে একটি রাজপুরুষের উল্লেখ পাল লিপিতে দেখা যায়। রাজা ছিলেন ষষ্ঠাধিকারী, অর্থাৎ প্রজার শস্যের বা শস্যলব্ধ আয়ের একষষ্ঠ অংশের প্রাপক। এই একষষ্ঠ অংশ আদায়-বিভাগের যিনি কর্তা তিনিই ষষ্ঠাধিকৃত। খেয়া পারাপার ঘাট হইতে রাষ্ট্রের একটা আয় হইত; এই আয়-সংগ্রহের যিনি কর্তা তিনি তরিক। দেবপালের লিপিতে তরিক ও তরপতি দুয়েরই উল্লেখ আছে। তরপতি বা তরপতিক বোধ হয় পারাপার ঘাটের পর্যবেক্ষক। ব্যবসা-বাণিজ্য সংপৃক্ত শুল্ক আদায়-বিভাগের কর্তার পদোপাধি শৌল্কিক। দশ প্রকার অপরাধের বিচার ও অর্থদণ্ড আদায়-বিভাগের কর্তা হইতেছেন দাশাপরাধিক। চোর-ডাকাতের হাত হইতে প্রজাদের রক্ষার দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের; সেই জন্য রাষ্ট্র প্রজাদের নিকট হইতে একটা কর আদায় করিতেন। যে-বিভাগের উপর এই কর আদায়ের ভার তাহার কর্তার পদোপাধি চৌরোদ্ধরণিক। কৌটিল্যের মতে বনজঙ্গল ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি; সুতরাং আয়ের এই অন্যতম উপায় যে-বিভাগ হইতে সংগৃহীত হইত সেই বিভাগীয় কর্তার নাম গৌল্মিক। অথবা, গৌল্মিক সৈন্যঘাঁটি বা শান্তি-রক্ষকদের ঘাঁটিতে দেয় শুল্ক-কর আদায়-বিভাগের কর্তাও হইতে পারেন। পিণ্ডক নামেও একপ্রকার করের উল্লেখ অন্তত একটি পাল-লিপিতে দেখা যায় (খালিমপুর লিপি)।

(গ) আয়ব্যয়-হিসাব-বিভাগ—এই বিভাগের সর্বময় কর্তা বোধ হয় ছিলেন মহাক্ষপটলিক।

জ্যেষ্ঠকায়স্থও বোধ হয় একজন উচ্চ রাজকর্মচারী। এই পর্বে পুস্তপালের উল্লেখ দেখিতেছি না। রাজকীয় দলিলপত্র বোধ হয় জ্যেষ্ঠকায়স্থের তত্ত্বাবধানেই থাকিত। ভূমি সংপৃক্ত দলিলপত্র থাকিত কৃষি-বিভাগের দপ্তরে।

(ঘ) ভূমি ও কৃষি-বিভাগ—এই বিভাগের কয়েকজন কর্মচারীর নাম লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রপ ছিলেন কৃষ্ট ও কৃষিযোগ্য ভূমির সর্বোচ্চ হিসাবরক্ষক ও পর্যবেক্ষক। প্রমাতৃ ভূমির মাপজোখ, ভূমি-জরীপ ইত্যাদির বিভাগীয় কর্তা। কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন, প্রমাতৃ বিচার-বিভাগীয় কর্মচারী; তিনি বিচারকার্যে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিতেন। পাল ও সেন লিপিগুলিতে, বিশেষভাবে সেন লিপিগুলিতে, ভূমির মাপ ও সীমা নির্ধারণে, আয়োৎপত্তি নির্ধারণে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবের উল্লেখ আছে, তাহাতে এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, ভূমি মাপজোখ-জরিপ সংক্রান্ত একটি সুবিস্তৃত ও সুপরিচালিত বিভাগ বর্তমান ছিল। গুপ্ত-আমলের পুস্তপাল-বিভাগ হইতেও এই অনুমান কতকটা করা চলে।

(ঙ) পররাষ্ট্র-বিভাগ—এই বিভাগের আভাসোল্লেখ কম্বোজরাজ নয়পালের ইর্দা-

লিপিতে পাওয়া যায়, এবং তাহার ব্যাখ্যা আগেই করা হইয়াছে। এই বিভাগের ঊর্দ্ধতম কর্মচারী ছিলেন দূত; তাঁহার অধীনে মন্ত্রপাল ও গূঢ়পুরুষবর্গ। সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষ বোধ হয় ছিলেন মহাসান্ধিবিগ্রহিক।

(চ) শান্তিরক্ষা-বিভাগ—এই বিভাগের অনেক রাজপুরুষের উল্লেখ লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে। মহাপ্রতীহার সম্ভবত রাজপ্রাসাদের এবং রাজধানীর রক্ষকাবেক্ষক। দাণ্ডিক, দাণ্ডপাশিক (দণ্ড এবং পাশ-রজ্জু), দণ্ডশক্তি, সকলেই এই বিভাগের কর্মচারী। খোল খুব সম্ভব এই বিভাগের গুপ্তচর (খোল শব্দের অভিধানিক অর্থ খোঁড়া; অর্দ্ধমাগধী অভিধান মতে গুপ্তচর)। কাহারো কাহারো মতে চৌরোদ্ধরণিকও এই বিভাগেরই উচ্চ কর্মচারী। অঙ্গরক্ষ(দেহরক্ষক)কেও এই বিভাগের কর্মচারী বলা যাইতে পারে। চট্টভট্ট বা চাটভাটরাও এই বিভাগেরই নিম্নস্তরের কর্মচারী, সন্দেহ নাই।

(ছ) সৈন্য-বিভাগ—এই বিভাগের ঊর্দ্ধতম রাজপুরুষের পদোপাধি মহাসেনাপতি, এবং তাঁহার নীচেই সেনাপতি। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক এই চতুরঙ্গ বল ছাড়া পাল রাষ্ট্রের বৃহৎ নৌবলও ছিল, এবং এই পাঁচটি বলের প্রত্যেকটির একজন ভারপ্রাপ্ত ব্যাপৃতক বা অধ্যক্ষ থাকিতেন। পদাতিক সেনার কর্তা বলাধ্যক্ষ; নৌবলের কর্তা নৌকাধ্যক্ষ বা নাবাধ্যক্ষ। উষ্ট্রবলও ছিল, এবং তাহারও একজন ব্যাপৃতক ছিলেন। সৈন্যবাহিনীতে বোধ হয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরাও যোগদান করিতেন। গৌড়-সৈন্তেরা তো ছিলেনই; তাহা ছাড়া লিপিগুলিতে মালব-খস-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চোড় প্রভৃতি যে-সব ভিন্‌দেশি কোমের লোকদের উল্লেখ আছে তাঁহারা যে রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর বেতনভুক্ সেনা, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। কোট্টপাল দুর্গাধিকারী-দুর্গরক্ষক; প্রান্তপাল রাজ্যসীমা রক্ষক; মহাব্যূহপতি যুদ্ধকালে ব্যূহ-রচনার কর্তা। ইহাদের সাক্ষাৎ মিলিতেছে এবং ইহারা সকলেই যে সৈন্য-বিভাগের উচ্চ রাজকর্মচারী এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

এ-পর্যন্ত যে-সব রাজপুরুষদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা ছাড়া পাল, চন্দ্র ও কম্বোজবংশীয় লিপিগুলিতে আরও কয়েকজন রাজপুরুষের পদোপাধির পরিচয় পাওয়া যায়; যেমন, অভিত্বরমান, গমাগমিক, দূতপ্রৈষনিক, খণ্ডরক্ষ, স(শ)রভঙ্গ, ইত্যাদি। অভিত্বরমান ব্যুৎপত্তিগত অর্থে যে দ্রুত যাতায়াত করে; গমাগমিক অর্থও যাতায়াতকারী। ইহারা উভয়েই যে এক শ্রেণীর সংবাদবাহী বা রাজকীয় দলিলপত্রবাহী দূত, এই অনুমান মিথ্যা না-ও হইতে পারে। শান্তিরক্ষা, পররাষ্ট্র অথবা সৈন্য-বিভাগের সঙ্গে হয়তো ইহারা যুক্ত ছিলেন, অথবা সাধারণ রাষ্ট্রকর্মেও হয়তো ইহাদের প্রয়োজন হইত। তবে, খুব সম্ভব ইহারা উচ্চশ্রেণীর রাজকর্মচারী ছিলেন না। দূত-প্রৈষণিক দুইটি পৃথক শব্দ হইতে পারে, আবার এক শব্দও হইতে পারে। প্রৈষণিক অর্থ যিনি প্রেরণ করেন; দূত-প্রৈষণিক অর্থ যিনি দূত প্রেরণ করেন, অথবা দূতের সংবাদবাহী। ইনি যিনিই হউন, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র বা পররাষ্ট্র-বিভাগের সঙ্গেই ইহার যোগ। খণ্ডরক্ষ অর্দ্ধমাগধী অভিধান-মতে শান্তিরক্ষা-

বিভাগের অধ্যক্ষ অথবা শুল্ক-পরীক্ষক; কাহারো কাহারো মতে ইনি সৈন্য-বিভাগের কর্মচারী; আবার, কেহ কেহ মনে করেন, ইনি পূর্ত-বিভাগের কর্মচারী, সংস্কার কার্যাদির পরীক্ষক (খণ্ড-স্ফুট্ট-সংস্কার)। পরবর্তী পর্বের ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ লিপিতে খণ্ডপাল নামে এক রাজপুরুষের উল্লেখ আছে; খণ্ডপাল ও খণ্ডরক্ষক সমার্থক বলিয়াই তো মনে হইতেছে। স(শ)রভঙ্গ বলিতে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, তীরধনুধারী সৈন্যবর্গের অধ্যক্ষ; আবার কেহ কেহ বলেন শরভঙ্গ রাজার মৃগয়ার সঙ্গী, যিনি রাজার তীরধনু ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ইহারা কেহই উচ্চ রাজকর্মচারী নহেন, এমন অনুমান কতকটা করা যায়।

পাল ও সমসাময়িক অন্যান্য রাষ্ট্রযন্ত্রের যে সংক্ষিপ্ত কাঠামোর মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হইল তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, এই যুগে রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র পূর্ব পূর্ব পর্বাপেক্ষা অনেক বেশি বিস্তার ও স্ফীতি লাভ করিয়াছে। স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সচেতন মর্যাদা ও প্রয়োজনবোধে এই বিস্তার ও স্ফীতি ব্যাখ্যা করা যায়; তাহা ছাড়া, পালরাষ্ট্রের প্রথম পর্বে যে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রয়োজনেও কোনো কোনো বিভাগে আমলাতন্ত্রের বিস্তৃতির প্রয়োজন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমলাতন্ত্রের বিস্তৃতি, রাষ্ট্রযন্ত্রের স্ফীতি ও সূক্ষ্মতর বিভাগ সৃষ্টির অর্থই হইতেছে, রাষ্ট্রের বাহু সমাজের সর্বদেহে বিস্তৃত করা। পাল-পর্বে তাহারই সূচনা দেখা দিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালনায় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দায় ও অধিকার খর্বীকৃত হইয়াছে। গ্রাম্য স্থানীয় শাসনকার্য ছাড়া আর যে কোথাও এই সব প্রতিনিধিদের কোনো প্রভাব ছিল, মনে হইতেছেনা। বিষয়-শাসনের ব্যাপারে জ্যেষ্ঠকায়স্থ, মহা-মহত্তর, মহত্তর, এবং দাশগ্রামিক প্রভৃতি বিষয়-ব্যবহারীর উল্লেখ পাইতেছি, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠকায়স্থ ও দাশগ্রামিক উভয়েই রাজপুরুষ। পূর্বে পর্বে যে-ভাবে স্থানীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে স্থানীয় জন-প্রতিনিধিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়, এ-পর্বে তাহা নাই বলিলেই চলে। বস্তুত, সমাজ-বিন্যাসের বৃহৎ একটা অংশের দায়িত্ব ও অধিকার এই পর্বে রাষ্ট্রের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে। আমলাতন্ত্রের বাহু-বিস্তৃতিই তাহার কারণ; জনসাধারণও সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। গ্রামবাসী মহত্তর, ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব, ক্ষেত্রকর, মেদ, অন্ধ্র, চণ্ডাল পর্যন্ত ভূমিদানের বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তিতেই ইহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের পরিসমাপ্তি; আর কোনো অধিকারের উল্লেখ নাই।

আমলাতন্ত্রের বিস্তৃতি

৭

সেন-পর্বে সেন-বর্মণ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রযন্ত্র সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। এই সব রাষ্ট্রযন্ত্রে মোটামুটি পাল-পর্বের রাষ্ট্রযন্ত্রের-আদর্শই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল; রাষ্ট্র-বিন্যাসের আকৃতি-প্রকৃতিও মোটামুটি একই প্রকার। তবে, এই পর্বে আমলাতন্ত্র

আরও বিস্তৃত হইয়াছে, আরও স্ফীত হইয়াছে; রাজা ও রাজপরিবারের মর্যাদা, মহিমা ও আড়ম্বর আরও বাড়িয়াছে; রাষ্ট্রযন্ত্রের একাংশে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিততন্ত্র জাঁকাইয়া বসিয়াছে; রাষ্ট্রযন্ত্রবিভাগ বৃহত্তর গ্রামগুলিকেও বিভক্ত করিয়া একেবারে পাটক বা পাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রের সুদীর্ঘ বাহু জনপদের ও জনসাধারণের শেষসীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে; ছোটবড় রাজপদের সংখ্যা বাড়িয়াছে, নূতন নূতন পদের সৃষ্টি হইয়াছে, বড় পদগুলির মহিমা ও মর্যাদা বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ, সেন বা বর্মণ বা অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাজ্য-পরিধি পাল ও চন্দ্রবংশের রাজ্য-পরিধি অপেক্ষা সংকীর্ণতর। ঈশ্বরঘোষের রাজবংশ, দেববংশ, ইহারা তো একান্তই স্থানীয় ক্ষুদ্র জনপদ-স্বামী, অথচ ইহাদেরও লিপিগুলিতে আমলাতন্ত্রের যে আকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়, রাজতন্ত্রের যে প্রকৃতি ধরা পড়ে তাহা অস্বাভাবিক রূপে বিস্তৃত ও স্ফীত।

সেন-পর্ব

সেন রাজারা পাল-রাজাদের রাজোপাধিগুলি তো ব্যবহার করিতেনই, উপরন্তু নামের সঙ্গে তাঁহাদের নিজ নিজ বিরুদও ব্যবহার করিতেন। বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের বিরুদ যথাক্রমে ছিল অরিবৃষভ-শঙ্কর, অরিরাজ নিঃশঙ্ক-শঙ্কর, অরিরাজ মদন-শঙ্কর, অরিরাজ বৃষভাঙ্ক-শঙ্কর, এবং অরিরাজ অসহ্য-শঙ্কর। তাহার উপর, একেবারে শেষ অধ্যায়ের রাজারা আবার এই সব বিরুদের সঙ্গে সঙ্গে অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি প্রভৃতি উপাধিও ব্যবহার করিতেন, এমন কি দেববংশীয় রাজা দশরথদেবও। সেন ও বর্মণ বংশের, ঈশ্বরঘোষ ও ডোম্মনপালের লিপিগুলিতে রাজ্ঞী ও মহিষীর উল্লেখও পাইতেছি—ভূমিদানক্রিয়া তাঁহাদেরও বিজ্ঞাপিত হইতেছে। পালবংশের একটি লিপিতেও কিন্তু রাজপুরুষ হিসাবে রাজ্ঞী বা মহিষীর উল্লেখ নাই; চন্দ্র ও কম্বোজ বংশের লিপিতেই ইহাদের প্রথম উল্লেখ দেখা গিয়াছে। ইহারা কি হিসাবে রাজপুরুষ ছিলেন, কি ইহাদের দায় ও অধিকার ছিল, কিছুই বুঝা যাইতেছে না।

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার যুবরাজ হইতেন, এবং সেই হিসাবে রাষ্ট্রকর্মে, সামরিক ব্যাপারে রাজার সহায়কও ছিলেন। মাধাইনগর লিপিতে দেখিতেছি যুবরাজ লক্ষ্মণসেন কোনো কোনো বিজয়ী সমরাভিযানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষৎ-লিপিতে সূর্যসেন এবং পুরুষোত্তমসেন নামে দুই (রাজ)কুমারের উল্লেখ আছে; এই লিপিতেই আর একজন অনুল্লিখিতনামা কুমারের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে। ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ লিপিতে অন্তত তিনজন রাজপুরুষের উল্লেখ পাইতেছি যাঁহারা রাজপ্রাসাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে। শিরোরক্ষিক বোধ হয় রাজার দেহরক্ষক; অন্তঃপ্রতীহার প্রাসাদের অন্দর-মহলের রক্ষকাবেক্ষক বা প্রতীহার এবং আভ্যন্তরিক রাজপ্রাসাদের ব্যবস্থাপক বলিয়াই মনে হইতেছে। ইহাদের ছাড়া অন্তরঙ্গ ঔপধিক রাজবৈদ্যের সাক্ষাৎও পাইতেছি। মহাপাদমূলিক নামে আর একজন রাজপুরুষের উল্লেখ এই লিপিতে আছে। ইনি কি রাজার ব্যক্তিগত অনুচর?

এই পর্বেও সামন্তরা অত্যন্ত প্রবল এবং সংখ্যায়ও প্রচুর। এক রাণক শূলপাণি বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি খোদিত করিয়াছিলেন; শূলপাণি ছিলেন "বারেন্দ্রকশিল্পী-গোষ্ঠীচূড়ামণি"। ত্রিপুরার রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেবের বংশ, চট্টগ্রাম ও ঢাকার দেববংশ, ঈশ্বরঘোষ, ডোম্মনপাল, মুঙ্গেরের গুপ্ত-উপান্ত-নামা এক রাজবংশ—ইহারা সকলেই তো সামন্ত-মহাসামন্ত, মহামাণ্ডলিক বংশ ছিলেন, পরে কেহ কেহ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া মহারাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। ঢেক্করীর ঈশ্বরঘোষ যে মহামাণ্ডলিক ছিলেন তাহা রামগঞ্জ-লিপিতেই সপ্রমাণ। ঢেক্করীর এক মণ্ডলাধিপতি রামপালের সামন্তরূপে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধারে সহায়তা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরঘোষ, খুব সম্ভব, সেন-রাষ্ট্রেরই অন্যতম সামন্ত ছিলেন। রামগঞ্জ-লিপি পাঠে স্পষ্টতই মনে হয়, এই সব সামন্তরা প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ জনপদে স্বাধীন রাজার মতই আচরণ করিতেন; দেখিতেছি, পাল ও চন্দ্রবংশীয় স্বাধীন মহারাজাধিরাজদের রাজকীয় লিপিতে যেমন ভূমিদানক্রিয়া রাজা, রাজনক, রাজন্তক, রাণক ইত্যাদি রাজপুরুষকে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে, মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের লিপিতেও ঠিক তেমনই করা হইয়াছে, অথচ তিনি স্বাধীন রাজা ছিলেন না। বর্মণ ও সেন-লিপিতেও যথারীতি রাজা, রাজন্যক, রাণক প্রভৃতির উল্লেখ বিদ্যমান। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ-লিপির তালিকায় এমন কি মহাসামন্তেরও উল্লেখ আছে। প্রসিদ্ধ কাব্যসংকলন-গ্রন্থ সদুক্তিকর্ণামৃতের সংকলয়িতা কবি শ্রীধরদাস ছিলেন মহামাণ্ডলিক, এবং শ্রীধরের পিতা, লক্ষ্মণসেনের "অনুপমপ্রেমকপাত্রং সখা", শ্রীবটুদাস ছিলেন "প্রতিরাজভয়ৃত মহাসামন্ত-চূড়ামণি"।

মন্ত্রীবর্গের মধ্যে প্রধান মহামন্ত্রীর সাক্ষাৎ এই পর্বেও পাইতেছি। ভট্ট ভবদেবের পিতামহ আদিদেব এক (চন্দ্রবংশীয়?) বঙ্গ-রাজের মহামন্ত্রী ছিলেন। আদিদেব শুধুই মহামন্ত্রী ছিলেন না, তিনি রাজার বিশ্রাম-সচিব, মহাপাত্র এবং সন্ধিবিগ্রহীও ছিলেন। ভট্টভবদেব স্বয়ং বর্মণরাজ হরিবর্মদেবের মন্ত্রশক্তিসচিব ছিলেন, এবং ভবদেবের পরামর্শেই হরিবর্মদেব নাগ ও অন্যান্য রাজাদের পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন। মহামন্ত্রী নামে কোনো পদের উল্লেখ সেন-লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছেনা, কিন্তু কোনো কোনো লিপিতে, যেমন কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপিতে, মহামহত্তক বা মহামত্তক নামীয় একজন রাজপুরুষের উল্লেখ পাইতেছি। সেন-বংশের ভূমিদান লিপিগুলি সাধারণত মহাসান্ধিবিগ্রহিক দ্বারা অনুমোদিত হইত, এবং সান্ধিবিগ্রহিকেরা সাধারণত লিপিগুলির দূতের কাজ কাজ করিতেন। কিন্তু ইদিলপুর-লিপিটির দৌত্য করিয়াছিলেন শ্রী···গৌড়মহামহত্তক স্বয়ং, এবং লিপিটির এবং লিপিবদ্ধ বিবরণীর শুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া অনুমোদন করিয়াছিলেন তিনজন করণ বা কেরাণী; ইহাদের একজন মহামহত্তকের, একজন মহাসান্ধিবিগ্রহিকের, এবং তৃতীয় জন স্বয়ং মহারাজের। মহামহত্তক মনে হইতেছে সেন-রাষ্ট্রের ও রাজার অন্যতম প্রধান মন্ত্রী। অন্যান্য মন্ত্রীও ছিলেন। পূর্বোক্ত ইদিলপুর লিপিতেই দেখিতেছি শক্তসচিব

যাঁরা রাজপাদপদ্ম লালিত হইত (সচিবশতমৌলিলালিতঃ পদাম্বুজ)। ইহাদের মধ্যে মহা-সান্ধিবিগ্রহিকই ছিলেন প্রধান, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। অন্তত মহারাজাধিরাজের ভূমিদান-ক্রিয়ার তিনিই যে প্রধান অনুমোদনকর্তা তাহা তো একাধিক লিপিতে সুস্পষ্ট। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া লিপির দূত ছিলেন সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণদত্ত, এবং মহারাজের দানক্রিয়া অনুমোদন করিয়াছিলেন মহাসান্ধিবিগ্রহিক। মহাসান্ধিবিগ্রহিকেরাই অধিকাংশ সেন-ভূমিদানলিপির দূত। বস্তুত, এই পর্বে মহাসান্ধিবিগ্রহিক এবং তাঁহার সহকারী সান্ধিবিগ্রহিকেরাই সেন কেন্দ্রীয়-রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান কর্মচারী এবং রাজার প্রধান সহায়ক বলিয়া মনে হইতেছে। আদিদেব এবং ভট্ট ভবদেব দুইজনই ছিলেন যথাক্রমে বঙ্গ এবং বর্মণ-রাষ্ট্রের সান্ধিবিগ্রহিক; অধিকন্তু আদিদেব ছিলেন মহামন্ত্রী। লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল-লিপিকথিত শঙ্করধর শুধু গৌড়রাষ্ট্রের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন না, শতমন্ত্রীর প্রধান প্রভুও ছিলেন। নানা রাষ্ট্রকর্মে নিযুক্ত অন্যান্য প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে বৃহদুপরিক, মহাভৌগিক বা মহাভোগপতি, মহাধর্মাধ্যক্ষ, মহাসেনাপতি, মহাগণস্থ, মহামুদ্রাধিকৃত, মহাসর্বাধিকৃত, মহাবলাধিকরণিক, মহাবলাকোষ্ঠিক, মহাকরণাধ্যক্ষ, মহাপুরোহিত, মহাতন্ত্রাধিকৃত ইত্যাদি রাজপুরুষের সাক্ষাৎ পাইতেছি। ইহারা যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের এক এক বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ বা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, সন্দেহ নাই। মহাকার্তাকৃতিকের উল্লেখ এই পর্বে পাইতেছি না। ডোম্মনপালের সুন্দরবন-লিপিতে সপ্ত-অমাত্যের উল্লেখ পাইতেছি; ইহার অর্থ পরিষ্কার নয়। পাল-পর্বে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের যে-সব অধ্যক্ষের সাক্ষাৎ মিলিয়াছে, এই পর্বেও তাঁহারা বিদ্যমান। চন্দ্রবংশীয় শাসনে যেমন, সেন-বর্মণ লিপিগুলিতেও তেমনই কৌটিল্যের 'অধ্যক্ষ-প্রচার'-অধ্যায়কথিত কর্মচারীবর্গের উল্লেখ আছে।

কম্বোজ-বর্মণ-সেন রাষ্ট্রযন্ত্রে পুরোহিততন্ত্রের প্রতিপত্তি লক্ষ্যণীয়। পুরোহিত, মহাপুরোহিত, মহাতন্ত্রাধিকৃত, রাজপণ্ডিত, ইহারা সকলেই রাজপুরুষ। এই যুগের লিপিগুলিতে শান্তিবারিক, শান্ত্যাগারিক, শান্ত্যাগারাধিকৃত প্রভৃতি পুরোহিতের ছড়াছড়ি; ইহারা রাজপুরুষ ছিলেন কিনা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে, রামগঞ্জ-লিপির ঠক্কুর রাজপুরুষ এবং ঠক্কুর হইতেই যে বর্তমান পদোপাধি ঠাকুর উদ্ভূত, এ-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। ঠক্কুর বাংলার বাহিরে কোনো কোনো লিপিতে লেখক বা করণ অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে; এক্ষেত্রেও তাহা হইয়া থাকিতে পারে।

পালপর্বের মত এ-পর্বেও রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান জনপদ বিভাগগুলির দেখা মিলিতেছে; ভুক্তিপতির (উপরিকের) শাসনাধীনে ভুক্তি, মণ্ডলপতির শাসনাধীনে মণ্ডল, বিষয়পতির শাসনাধীনে বিষয়। কিন্তু বিষয় বা মণ্ডলের নীচের গ্রাম-সংক্রান্ত স্থানীয় বিভাগ-উপবিভাগের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ একাধিক নূতন বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পর্বের লিপিগুলিতে পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তি, বর্দ্ধমান-ভুক্তি এবং কঙ্কগ্রাম-ভুক্তির খবর পাওয়া যাইতেছে। সেন-রাজাদের আমলে পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির সীমা খুব বাড়িয়া

গিয়াছিল; উত্তর ও দক্ষিণ-বঙ্গের প্রায় সমগ্র জনপদ এবং পূর্ববঙ্গের বৃহৎ একটি অংশ এই ভুক্তি-বিভাগের অন্তর্গত ছিল। পাল-পর্বের বর্দ্ধমান-ভুক্তি লক্ষ্মণসেনের সময় খর্বীকৃত হইয়া দুইটি ভুক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, উত্তরে কঙ্কগ্রাম-ভুক্তি, দক্ষিণে বর্দ্ধমান-ভুক্তি। দণ্ড-ভুক্তির কোনো উল্লেখ এই পর্বে নাই। ভুক্তিপতি বা উপরিকদের একজন উর্দ্ধতন কর্মচারী ছিলেন; তাঁহার পদোপাধি বৃহদুপরিক, এবং তিনি সম্ভবত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মহারাজাধিরাজের অন্তরঙ্গ বা রাজবৈদ্য অনেক সময়ই বৃহদুপরিককর্তৃক নিযুক্ত হইতেন; সেই জন্যই বোধ হয় কতকগুলি লিপিতে অন্তরঙ্গ-বৃহদুপরিক একসঙ্গে একই রাজপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

ভুক্তির অব্যবহিত নিম্নতর বিভাগ মণ্ডল না বিষয় এ-সম্বন্ধে এই পর্বেও নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। ভোজবর্মণের বেলাব-লিপির উপ্যালিকা গ্রাম কৌশম্বী অষ্টগচ্ছখণ্ডল সংবদ্ধ অধঃপত্তন-মণ্ডলের অন্তর্গত, এবং এই মণ্ডল পৌণ্ড্র-ভুক্তির অন্তর্গত। বিজয়সেনের বারাকপুর লিপির ঘাসসম্ভোগভট্টবড়া গ্রাম খাড়ি-বিষয়ের অন্তর্গত, এবং খাড়ি-বিষয় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত। নৈহাটি-লিপির বাল্লাহিট্ঠা গ্রাম স্বল্পদক্ষিণ-বীথীর অন্তর্গত, এই বীথী বর্দ্ধমান-ভুক্তির উত্তররাঢ়-মণ্ডলান্তঃপাতী। আনুলিয়া-লিপির দত্তভূমির (মাথরণ্ডিয়া গ্রামে) মণ্ডলটি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত। গোবিন্দপুর-শাসনের বিড্ডারশাসনগ্রাম বেতড্ড-চতুরকে অবস্থিত, এই চতুরক বর্দ্ধমানভুক্তির পশ্চিম-খাটিকার অন্তর্গত। তর্পণদীঘি-শাসনের বেলহিষ্টী গ্রাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির বরেন্দ্রী (মণ্ডলের) অন্তর্গত। মাধাইনগর-লিপির দাপনিয়া-পাটকও বরেন্দ্রী-(মণ্ডলের) অন্তর্গত এবং বরেন্দ্রী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত। সুন্দরবন-লিপির মণ্ডলগ্রাম কান্তল্লপুর-চতুরকে অবস্থিত, এই চতুরক খাড়িমণ্ডলের অন্তর্গত, এবং খাড়ি-মণ্ডল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত। শক্তিপুর-শাসনের কঙ্কগ্রাম-ভুক্তির মধুগিরি-মণ্ডল কয়েকটি বীথীতে বিভক্ত, তন্মধ্যে দক্ষিণ-বীথী একটি। ইদিলপুর-লিপির তলপড়া-পাটকের এবং মদনপাড়া-লিপির পিঞ্জোকাষ্ঠি গ্রামের অবস্থিতি বঙ্গে বিক্রমপুর-ভাগে, এবং বঙ্গ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষৎ-লিপির রামসিদ্ধি-পাটক এবং বিজয়তিলক-গ্রাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত বঙ্গের নাব্যভাগে অবস্থিত; অজিকুল-পাটক মধুক্ষীরক-আবৃত্তির নবসংগ্রহ-চতুরকে অবস্থিত; দেউলহস্তী (গ্রাম) বঙ্গের অন্তর্গত লাউহণ্ডা-চতুরকে অবস্থিত, এবং ঘাঘরকাট্টি-পাটক চন্দ্রদ্বীপের উরা-চতুরকে অবস্থিত। ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ-লিপির দিগ্ঘাসোদিকা গ্রাম গাল্লিটিপ্যক-বিষয়ের অন্তর্গত, এবং এই বিষয় পিয়োল্ল-মণ্ডলের অন্তঃপাতী।

উপরোক্ত বিস্তৃত সাক্ষ্যের মধ্যে ভুক্তির সঙ্গে বিষয় বা মণ্ডলের এবং বিষয় ও মণ্ডলের পারস্পর সম্বন্ধের সঠিক ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে না। কোথাও দেখিতেছি ভুক্তির অব্য-বহিত নিম্নবর্তী বিভাগ মণ্ডল, কোথাও দেখিতেছি বিষয়, আবার কোথাও কোথাও দেখিতেছি একেবারে বীথী। বর্দ্ধমান-ভুক্তিতে ভুক্তির পরেই মণ্ডল, মণ্ডলের পর বীথী; অন্তত নৈহাটি

ও শক্তিপুর লিপিতে তো তাহাই দেখিতেছি, যদিও গোবিন্দপুর শাসনে ভুক্তির পরেই পাইতেছি পশ্চিম-খাটিকা। পশ্চিম-খাটিকা কি মণ্ডল, না বিষয়, না বীথী, বুঝিবার উপায় নাই; তাহার পরেই চতুরক। কঙ্কগ্রাম-ভুক্তিতে ভুক্তির পরই বীথী। বঙ্গ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত; কিন্তু বঙ্গ বিষয় না মণ্ডল কিছুই বুঝা যাইতেছে না; মনে হয়, ইহাদের উভয়াপেক্ষা বৃহত্তর বিভাগ, কিন্তু এ-বিভাগ রাষ্ট্রীয় বিভাগ নয়, ভৌগোলিক-বিভাগ মাত্র। বঙ্গের দুই ভাগ: বিক্রমপুর-ভাগ ও নাব্য-(ভাগ ?)। এই নাব্য-(ভাগের) উল্লেখ বোধ হয় শ্রীচন্দ্রের রামপাল-লিপিতেও আছে, নাব্য (নান্ন পাঠ অশুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়)মণ্ডল রূপে। যাহা হউক, বিক্রমপুর-ভাগের 'ভাগ'ও কোন রাষ্ট্রীয় বিভাগ বলিয়া মনে হইতেছে না, ভৌগোলিক বিভাগ মাত্র। বিক্রমপুর-ভাগ = বিক্রমপুর অঞ্চল, নাব্য (ভাগ ?) = নাব্য অঞ্চল। অন্যত্র, বিষয় যেন মণ্ডলের অন্তর্গত বলিয়াই মনে হইতেছে, যেমন, পরণায়ি-বিষয় সমতট-মণ্ডলভুক্ত, গাল্লিটিপ্যক-বিষয় পিয়োল্ল-মণ্ডলের অন্তঃপাতী। লক্ষণীয় এই যে, বিষয়-বিভাগ সেনরাষ্ট্রে বিশেষ দেখা যাইতেছে না; বিজয়সেনের বারাকপুর লিপিতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত খাড়ী-বিষয়ের উল্লেখ পাইতেছি, কিন্তু লক্ষ্মণসেনের আমলে খাড়ী-মণ্ডলে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে!

অন্তত একটি ক্ষেত্রে মণ্ডলের পরবর্তী বিভাগ দেখিতেছি খণ্ডল; অন্যত্র মণ্ডলের পরেই বীথী, যেমন, বর্দ্ধমান-ভুক্তিতে; আর এক ক্ষেত্রে মণ্ডলের পরেই পাইতেছি চতুরক, যেমন, খাড়ি-মণ্ডলের কান্তল্লপুর-চতুরক। অন্যত্র, চতুরক হইতেছে আবৃত্তির নিম্নতর বিভাগ, যেমন, নবসংগ্রহ-চতুরক মধুক্ষীরক-আবৃত্তির অন্তর্গত। কিন্তু, আবৃত্তি কাহার বিভাগ, সঠিক জানা যাইতেছে না। তবে মণ্ডলের উপবিভাগ হওয়া অসম্ভব নয়। চতুরক কখনো কখনো সোজাসুজি বৃহত্তর বিভাগের অন্তর্গত, যেমন, বেতড্ড-চতুরক বর্দ্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত। চতুরকের নিম্নবর্তী উপবিভাগ গ্রাম এবং কখনো কখনো সোজাসুজি পাটক (হেমচন্দ্রের আভিধানিক অর্থে, পাটক গ্রামের একার্দ্ধ), যেমন, বিড্ডারশাসন-গ্রাম বেতড্ড-চতুরকে অবস্থিত; অন্যত্র অগ্নিকুল-পাটকের অবস্থিতি নবসংগ্রহ-চতুরকে। পাটক বর্তমান কালের পাড়া; চতুরক বর্তমানের চৌকি, চক; বোধ হয় চতুরক গোড়ায় ছিল চারিটি গ্রামের সমষ্টি।

এই সব রাষ্ট্রীয়-বিভাগের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো তথ্যই লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে না; স্থানীয় কোনো অধিকরণের উল্লেখও নাই। পাল-পর্বে গ্রামের শাসন-ব্যবস্থার নিয়ামক গ্রামপতির (গ্রামিকের) সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছিল; এ-পর্বে তাঁহারও দেখা পাওয়া যাইতেছে না। পাল-পর্বে ভূমিদান ক্রিয়া যাঁহাদের কাছে বিজ্ঞাপিত হইত তাঁহাদের মধ্যে মহামহত্তর, মহত্তর, কুটুম্ব প্রভৃতিরা ছিলেন; এ-পর্বে তাঁহাদের উল্লেখ নাই। এই তালিকায় পাইতেছি শুধু ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণোত্তম, এবং ক্ষেত্রকরদের; মেদ, অন্ধ্র, চণ্ডাল পর্যন্ত যত লোক তাঁহাদের উল্লেখও নাই। অর্থাৎ, এক কথায়, স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে রাষ্ট্রের

যোগাযোগ একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। অথচ, অন্যদিকে রাষ্ট্রের বাহু পাটক পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া জনপদগুলিকে খণ্ডল, চতুরক, আবৃত্তি, গ্রাম, পাটক প্রভৃতিতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

পাল-পর্বের রাষ্ট্রযন্ত্র বিভাগের সব কয়টি বিভাগ এই পর্বেও বিদ্যমান। বিচার-বিভাগে একটি নূতন পদোপাধির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে; এই উপাধিটি মহাধর্মাধ্যক্ষ। দণ্ডনায়ক এই পর্বেও বিদ্যমান, কিন্তু মহাদণ্ডনায়কের উল্লেখ নাই। বোধ হয়, তাঁহারই স্থান লইয়াছেন মহাধর্মাধ্যক্ষ। ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ-লিপিতে অঙ্গিকরনিক নামে এক রাজপুরুষের দেখা পাইতেছি। বিচারকার্য্য ব্যাপারে যিনি শপথ বা অঙ্গীকার করাইতেন তিনিই বোধ হয় অঙ্গিকরণিক, এবং সেই হিসাবে ইনি হয়তো এই বিভাগের অন্যতম কর্মচারী। এই লিপিতেই দণ্ডপাল নামে যে রাজপুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তিনিও বিচার-কর্মচারী সন্দেহ নাই। রাজস্ব-বিভাগে নূতন যে রাজপুরুষের উল্লেখ পাইতেছি তাঁহার পদোপাধি মহাভোগিক; মল্লসারুল লিপিতে ইহার সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছিল; ইনি ভোগ-কর আদায় বিভাগের সর্বময় কর্তা। ষষ্ঠাধিকৃত ঔপধিক রাজপুরুষের উল্লেখ এই পর্বে নাই। তরিক-তরপতির উল্লেখও এই পর্বে নাই। তবে, হট্টপতি ঔপধিক এক রাজপুরুষের উল্লেখ রামগঞ্জ লিপিতে আছে; ইনি হাট-বাজারের কর্তা সন্দেহ নাই, এবং সেই হিসাবে রাজস্ব-বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকা অসম্ভব নয়।

ঠিক রাজস্ব-বিভাগ সংপৃক্ত নয়, তবে হট্টপতির মতনই আর একজন রাজপুরুষের দেখা পাইতেছি রামগঞ্জ-লিপিতে—তিনি পানীয়াগারিক। বোধ হয় রাজকীয় বিশ্রামগৃহ, ভোজনশালা, পানীয়াগার, প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করা ছিল ইহার কাজ। এই লিপিরই বাসাগারিক এবং ঔখিতাসনিক পানীয়াগারিক শ্রেণীরই আর দুই জন রাজপুরুষ। প্রথমোক্ত ব্যক্তিটি বোধ হয় রাষ্ট্রের অতিথিশালা বা রাজকীয় বাসগৃহের তত্ত্বাবধায়ক; দ্বিতীয়টি সম্ভবত রাজসভা ও দরবারের আসনসজ্জা-ব্যবস্থাপক। ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে পীঠিকাবিত্ত নামে আর একজন রাজকর্মচারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে; ইনিও বোধ হয় রাজকীয় সভা-সমিতি-দরবারের আসনসজ্জার ব্যবস্থা করিতেন।

আয়ব্যয়হিসাব-বিভাগে মহাক্ষপটলিক এই পর্বেও বিদ্যমান। জ্যেষ্ঠকায়স্থের উল্লেখ এই পর্বে নাই; কিন্তু রামগঞ্জ লিপিতে মহাকায়স্থের উল্লেখ আছে। ইনি এই বিভাগের অন্যতম উর্দ্ধতন কর্মচারী বলিয়াই তো মনে হয়। এই লিপি-উল্লিখিত মহাকরণাধ্যক্ষ এবং লেখক, এবং বহু সেনলিপি-কথিত করণ একান্তভাবে আয়ব্যয় হিসাব-বিভাগের কর্মচারী হয়তো নহেন। লেখক ও করণ সকল বিভাগেই প্রয়োজন হইত; উচ্চতর রাজপুরুষদের সকলেরই নিজস্ব করণ থাকিতেন। রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল করণের সর্বময় কর্তা যিনি তাঁহারই পদোপাধি মহাকরণাধ্যক্ষ।

পূর্ব-পর্বের ভূমি ও কৃষি-বিভাগের ক্ষেত্রপ বা প্রমাতৃ কাহারো সাক্ষাৎ এ-পর্বে

পাইতেছি না। কর্মকর ঔপধিক এক রাজপুরুষের উল্লেখ রামগঞ্জ-লিপিতে পাইতেছি; ইনি কি শ্রমিক-বিভাগের নিয়ামক কর্তা ছিলেন?

অন্তঃরাষ্ট্র বিভাগের প্রধান ছিলেন মহামন্ত্রী বা মহামহত্তক। তাঁহাদের সহায়ক সচিব ও মন্ত্রী তো অনেকেই ছিলেন। পররাষ্ট্র-বিভাগের প্রধান ছিলেন মহাসান্ধিবিগ্রহিক; তাঁহার সহায়ক সান্ধিবিগ্রহিক। দূতও এই বিভাগের অস্থায়ী উচ্চ রাজপুরুষ; সান্ধিবিগ্রহিকেরাই সাধারণত দূতের কাজ করিতেন। মন্ত্রপাল বা গূঢ়পুরুষবর্গের উল্লেখ এই পর্বে দেখিতেছি না।

শান্তিরক্ষা-বিভাগ এই পর্বেও খুব সক্রিয়। পূর্ব পর্বের মহাপ্রতীহার, চৌরোদ্ধরণিক, দণ্ডপাশিক, চাটভাট প্রভৃতি এই পর্বেও আছেন। অধিকন্তু, রামগঞ্জ লিপিতে পাইতেছি দাণ্ডপাশিক ঔপধিক এক রাজপুরুষের উল্লেখ; ইনিও এই বিভাগের কর্মচারী, সন্দেহ নাই। এই লিপিরই শিরোরক্ষক এবং খড়্গগ্রাহ উভয়ই বোধ হয় একশ্রেণীর দেহরক্ষক, এবং সেই হিসাবে উভয়েই শান্তিরক্ষা-বিভাগের কর্মচারী। আরোহক অশ্বারোহী-প্রহরী ও দেহরক্ষক; ইনিও এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত।

সৈন্ত-বিভাগে মহাসেনাপতি এই পর্বেও সর্বময় কর্তা। কোট্টপালও আছেন; রামগঞ্জ-লিপিতে তাঁহাকে বলা হইয়াছে কোট্টপতি। মহাব্যূহপতি, নৌবলাধ্যক্ষ, বলাধ্যক্ষ, হস্তী-অশ্ব-গো-মহিষ-অজাবিকাধ্যক্ষরাও আছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যনীয় এই যে, এই পর্বে এই বিভাগে অনেক নূতন নূতন পদোপাধির সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে: যেমন, মহাপীলুপতি, মহাগণস্থ, মহাবলাধিকরণিক, মহাবলাকোষ্ঠিক এবং বৃদ্ধধানুষ্ক। মহাপীলুপতি হস্তীসৈন্ত-চালনাশিক্ষক, হস্তীসৈন্তের অধ্যক্ষ। মহাগণস্থও সামরিক কর্মচারী: ২৭ রথ, ২৭ হস্তী, ৮১ ঘোড়া এবং ১৩৫টী পদাতিক সৈন্ত লইয়া এক এক গণ। এই সৈন্ত-গণের যিনি সর্বময় কর্তা তিনি মহাগণস্থ। গ্রাম বা নগরসংঘ অর্থে গণ শব্দের ব্যবহার আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু মহাগণস্থ শব্দে গণ উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়াই মনে হইতেছে। মহাবলাধিকরণিক খুব সম্ভব সৈন্তসংক্রান্ত অধিকরণের প্রধান কর্তা। মহাবলাকোষ্ঠিক এবং বৃদ্ধধানুষ্কের দায় ও কর্তব্য ঠিক বুঝা যাইতেছেনা, তবে ইহারাও যে সামরিক কর্মচারী, সন্দেহ নাই। প্রান্তপালের উল্লেখ এই পর্বে নাই; দূতপ্রৈষণিক এবং খোল বিদ্যমান।

পাল ও সেন-রাজাদের নৌবলের কথা নানাপ্রসঙ্গে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে "নৌসাধনোদ্যতান্" সামরিক বাঙ্গালীর বর্ণনা আছে। নদীমাতৃক সমুদ্রাশ্রয়ী বাঙ্গালীর রাষ্ট্র নৌবলনির্ভর হইবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। নৌবাট, নৌবিতান, নৌদণ্ডক ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ বাংলার লিপিগুলিতে বারবার দেখা যায়। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে কুমারপালের রাজত্বকালে দক্ষিণ-বঙ্গে এক নৌযুদ্ধের সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত কাব্যময় বর্ণনা আছে:

যত্তাম্বুত্তরঙ্গ-সংগরজয়ে নৌবাট হীহীরব-
ত্রস্তৈর্দিক্ করিভিশ্চ যন্নচলিতং চেন্নাস্তি তদ্‌গম্যভূঃ।
কিঞ্চোৎপাতুক-ফেনিপাত-পতন-প্রোতৎসর্পিতৈঃ শীকরৈ-
রাকাশে স্থিরতা কৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী।

বিজয়সেনও একবার গঙ্গার উপরে এক বিজয়ী নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চর্যাগীতির একটি পদে সেকালের নৌকায় নদীপারাপারের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে (১৪নং—ডোম্বীপাদ)। পাল ও সেনরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর অশ্ব আসিত কম্বোজ দেশ হইতে, দেবপালের মুঙ্গের লিপিতে এই সংবাদ জানা যায়। কিছু অশ্ব বোধ হয় আসিত ভুটান-তিব্বত অঞ্চল হইতেও; মিন্‌হাজ-উদ্‌-দীন বখ্‌ত-ইয়ারের তিব্বত অভিযানের যে বিবরণ দিতেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে করমবত্তনের হাটের যে-বর্ণনা পাইতেছি তাহাতে এই অনুমান একেবারে মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। আর্তিহর-পুত্র সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব গ্রন্থে (১১৬০) ঘোড়ার বিভিন্ন রকম দৌড়ের বর্ণনা ও বাংলাদেশে ব্যবহৃত নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বীরব দৌড় (বিষ্টব্ধা সমা চ গতিঃ), পুলিন দৌড় (ঋজুদূরগমনং), ছেড্‌ দৌড় (মণ্ডলিকালয়েন গমনং) এবং মার্জা দৌড় (বেগেন বিক্ষিপ্তোপরিচরণং)। সর্বানন্দ যুদ্ধসংক্রান্ত আর একটি খবর দিতেছেন—শারদীয়া পূজায় মহানবমীর দিনে রাজা ও প্রজারা শান্তিজল গ্রহণ করিতেন। হস্তীসৈন্যের কথা তো প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্রের বর্ণনা দিতে গিয়া গ্রীক ঐতিহাসিক হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক ভারতীয় ও বাঙ্গালী কবি ও লেখকরাই বলিয়া গিয়াছেন।

এই পর্যন্ত সেন-পর্বের রাষ্ট্র-বিন্যাসপ্রসঙ্গে যে-সব রাজপুরুষদের উল্লেখ করিয়াছি তাঁহারা ছাড়া সমসাময়িক লিপিতে আরও কয়েকটি রাজপদোপাধির সাক্ষাৎ মিলিতেছে। দৌঃসাধনিক-দৌঃসাধ্যসাধনিক-মহাদুঃসাধিক ইঁহাদের একজন। ইঁহার দায় ও কর্তব্যের স্বরূপ ঠিক বুঝা যাইতেছেনা, তবে কাজটা খুব কঠিন দুঃসাধ্য রকমের ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে। মহামুদ্রাধিকৃত আর একজন। রাজকীয় মুদ্রা বা শীলমোহর ইঁহার কাছে থাকিত; যে-সব দলিলপত্রে রাজকীয় শীলমোহর প্রয়োজন হইত তাহা ইনিই অনুমোদন করিয়া মুদ্রায় মুদ্রিত করিয়া দিতেন। কেহ কেহ মনে করেন, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মুদ্রাধ্যক্ষ এবং মহামুদ্রাধিকৃত একই ব্যক্তি। মহাসর্বাধিকৃতের কর্তব্যের স্বরূপ বুঝা যাইতেছে না। বাকাটক রাজবংশের লিপিতে সর্বাধ্যক্ষ নামে এক রাজপুরুষের উল্লেখ দেখা যাইতেছে; সর্বাধিকৃত-মহাসর্বাধিকৃত-সর্বাধ্যক্ষ মূলত সকলেরই কর্তব্য বোধ হয় একই ধরনের। একসরক, মহকটুক, শাস্তকিক, তদানিযুক্তক এবং খণ্ডপাল পদোপধিক কয়েকজন রাজপুরুষের উল্লেখ রামগঞ্জ লিপিতে দেখা যাইতেছে। প্রথম তিনজনের দায় ও কর্তব্য সম্বন্ধে কোনো ধারণাই আপাতত করা যাইতেছে না। তদানিযুক্তক উপাধিক রাজপুরুষটির সঙ্গে পাল-পর্বের তদায়ুক্তক-বিনিযুক্তক রাজপুরুষদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, এমন অনুমান করা যাইতে পারে। খণ্ডপাল ও পাল-পর্বের খণ্ডরক্ষ একই ব্যক্তি, সন্দেহ নাই।

মোটামুটি ইহাই সেন-পর্বের রাষ্ট্র-বিন্যাসের পরিচয়। এই রাষ্ট্র-বিন্যাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে দু'একটি ইঙ্গিত আগেই করিয়াছি। বর্তমান প্রসঙ্গে, এবং যে সাক্ষ্যপ্রমাণ বিদ্যমান তাহার উপর নির্ভর করিয়া আর কিছু বলার প্রয়োজন নাই, উপায়ও নাই।

৮

বিভিন্ন পর্বে বর্ণের সঙ্গে রাষ্ট্রের এবং শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধের বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে। এখানে আর পুনরুক্তি করিবনা। তবে, রাষ্ট্রবিন্যাস সম্বন্ধেই সাধারণ ভাবে দুই চারিটি উক্তি হয়তো অবান্তর হইবেনা।

দৃশ্যত, মহারাজ-মহারাজাধিরাজের ক্ষমতা ও অধিকারের কোনো সীমা ছিল না; তাঁহাদের রাজদণ্ডের প্রতাপ ছিল অব্যাহত, অপ্রতিহত। তিনি শুধু দণ্ডমুণ্ডের সর্বময় প্রভু নহেন, শুধু শাসন, সমর ও বিচার-ব্যাপারের কর্তা নহেন, সর্বপ্রকার দায় ও অধিকারের উৎসই তিনি। রাষ্ট্র-বিন্যাসগত ব্যাপারে অর্থশাস্ত্র-দণ্ডশাস্ত্রোক্ত মতবাদের দিক্ হইতে এ সম্বন্ধে কোনো আপত্তিই কেহ তোলে নাই—অন্তত বাংলার প্রাচীন রাজবৃত্তের ইতিহাসে তেমন কোনো প্রমাণ নাই। কিন্তু কার্যত রাজার ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা সংস্কারের উপর কিছু কিছু বাধা-বন্ধন ছিলই, একেবারে পুরাপুরি স্বেচ্ছাচারী হইবার উপায় তাঁহার ছিলনা। প্রথম বাধা-বন্ধন, মহামন্ত্রী এবং অপরাপর প্রধান প্রধান মন্ত্রীবর্গ। ইঁহাদের উপদেশ সর্বত্র সকল সময় না হউক, অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানিতেই হইত। বাদল-প্রশস্তি কিংবা কমৌলি লিপির বর্ণনায় কবিজনোচিত যত অতিশয়োক্তিই থাকুক না কেন, উহার পশ্চাতে খানিকটা ঐতিহাসিক সত্য লুক্কায়িত নাই, এমন বলা চলেনা। সেন-আমল সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রযোজ্য। আদিদেব, ভবদেব, হলায়ুধ, ইত্যাদি ব্যক্তির ইচ্ছা ও মতামত অগ্রাহ্য করা কোনো রাজার পক্ষেই সম্ভব ছিল না। অন্যান্য মন্ত্রী, সভাপণ্ডিত যাঁহারা থাকিতেন তাঁহারাও রাজা এবং রাজপরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির অন্যায় আচরণের কতকটা বাধা স্বরূপ ছিলেন, সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি গোবর্দ্ধন আচার্য সম্বন্ধে সেখ শুভোদয়া-গ্রন্থে একটি গল্প আছে। লক্ষ্মণসেনের এক শ্যালক—কুমারদত্ত—কামপরায়ণ হইয়া একবার এক বণিকবধূর উপর বলপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। বণিকবধূ মন্ত্রীদের নিকট এই অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা রাজমহিষীর এবং রাজশ্যালকের ক্রোধভাজন হইতে সাহসী হন্ নাই, তবে বণিকবধূকে তাঁহারা লক্ষ্মণসেন-সমীপে উপস্থিত করিয়া রাজার নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে বলেন। রাজসভায় মন্ত্রী ও সভাসদবর্গের সম্মুখে বণিকবধূ মাধবীর বিবৃতি শেষ হইলে রাজমহিষী বল্লভা নিজের ভ্রাতাকে রক্ষা করিবার জন্য ভ্রাতার দোষ অপরের (কবি উমাপতিধরের) স্কন্ধে আরোপ করেন। লক্ষ্মণসেনকে মহিষী ও শ্যালক উভয় সম্বন্ধেই দুর্বলতাপরবশ হইয়া বিচারমর্যাদা রক্ষায় অনিচ্ছুক দেখিয়া ক্ষুব্ধ বণিকবধূ শ্লেষমিশ্রিত ভাষায় নিজের মনের ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। মহিষী বল্লভা

ক্রুদ্ধ হইয়া রাজসভার মধ্যেই মাধবীকে চুল ধরিয়া টানিয়া পদাঘাত করেন। তাহাতেও মহারাজকে অবিচলিত দেখিয়া সভায় উপস্থিত কবি গোবর্দ্ধনাচার্যের ব্রাহ্মণ্য দর্প ও ন্যায়বোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে; তিনি ক্রুদ্ধ প্রদীপ্ত কণ্ঠে মহারাজাধিরাজকে ভৎর্সনা করিয়া মহিষীকে আঘাত করিতে যান, কিন্তু নিরস্ত হইয়া মহিষীকে ভৎর্সনা এবং রাজাকে অভিশাপ দিয়া রাজসভা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হন। তখন লক্ষ্মণসেন সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ-কবির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁহাকে নিরস্ত করেন। নীরব মন্ত্রীদের লক্ষ্য করিয়া বণিকবধূ মাধবী তখন বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। লজ্জায় ও ঘৃণায় উৎপীড়িত লক্ষ্মণসেন তখন খড়্গ লইয়া কুমারদত্তকে হত্যা করিতে যাইতেছেন, এমন সময় মাধবী মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার শ্যালক আমার হাত ধরিয়াছিল বলিয়া আমি মরিয়া যাই নাই, আমার জাত ও যায় নাই। আমারই স্বকর্ম্মফলে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। আপনার আচরণে উহার অপরাধের প্রতিকার হইয়াছে, আপনি উহাকে ক্ষমা করুন।' মাধবীর কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে সাধুবাদ করিল। মহারাজ কুমারদত্তকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন।

গল্পটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হইতে পারে, কিন্তু হইতেও কোন বাধা নাই; কারণ সমসাময়িক কালের প্রতিচ্ছবি এই গল্পে সুস্পষ্ট। তাহা ছাড়া বর্তমান প্রসঙ্গে, অর্থাৎ রাজার যথেচ্ছ বা দুর্বল আচরণের উপর সভাকবি ও পণ্ডিতদের বাধা-বন্ধনের দৃষ্টান্ত হিসাবেও ইহার মূল্য আছে। দ্বিতীয় মহীপাল মন্ত্রীদের শুভ পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া সামন্ত-চক্রের বিরোধিতা করিতে গিয়া নিজের প্রাণ ও বরেন্দ্রী উভয়ই হারাইয়াছিলেন।

আর এক বাধা-বন্ধনের কারণ ছিলেন সামন্ত-মহাসামন্তরা। বর্তমান নিবন্ধে এবং অন্যত্র বার বার ইহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, অন্তত গুপ্ত-আমল হইতে আরম্ভ করিয়া আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত বাংলার, তথা সমগ্র ভারতবর্ষের, রাষ্ট্র ও সমাজ-বিন্যাস একান্তই সামন্ততান্ত্রিক, এবং সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রই একদিকে সমাজের শক্তি, এবং অন্যদিকে দুর্বলতা। বস্তুত, প্রাচীন ভারতের যে কোনো বৃহৎ রাজ্য বা সাম্রাজ্য (১) কতকগুলি ক্ষুদ্রতর মিত্ররাজ্য, (২) ক্রমসংকুচীয়মান জনপদাধিকার এবং ক্ষমতার তারতম্য লইয়া স্তরে উপস্তরে বিভক্ত বহুতর সামন্ত-মহাসামন্ত, এবং (৩) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের নিজস্ব জনপদভূমি—এই তিন প্রধান অঙ্গের সম্মিলিত রূপ। বাংলা দেশের গুপ্ত, পাল, বা সেনবংশের রাজ্য-সাম্রাজ্যেও, এমন কি ক্ষুদ্রতর চন্দ্র-বর্ম্মণ-কম্বোজ-দেবরাজ্যেও এই রূপের কিছু ব্যতিক্রম নাই। এই সব মিত্র ও সামন্ত-মহারাজদের একবারে অবজ্ঞা করিয়া চলা কোন মহারাজের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। রামপাল যখন কৈবর্ত ক্ষৌণীনায়ক ভীমের কবল হইতে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধারের আয়োজন করিতেছিলেন তখন সাহায্য ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে সামন্তদের দুয়ারে দুয়ারে প্রায় করযোড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল, অর্থ ও রাজ্য লোভ দেখাইতে হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক কালে বাংলাদেশে—তথা ভারতবর্ষে—কোনো রাজাই দেখিতেছি না যিনি

রাষ্ট্রব্যবস্থা নূতন করিয়া গড়িতে, বা নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোনো রাজা বা রাজবংশ ব্যক্তিগত রুচি, প্রবৃত্তি ও সংস্কার দ্বারা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-বিন্যাসকে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, কিন্তু অর্থনীতি-দণ্ডনীতি বা রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থা তাহাতে বদলাইয়া যায় নাই; মোটামুটি তাহা অপরিবর্তিতই থাকিয়া গিয়াছিল। রাজা রাষ্ট্রদেহ, সমাজদেহ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুরই ধারক, পোষক ও বর্দ্ধক ছিলেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের স্রষ্টা ছিলেন না। বরং তাঁহাকে চিরাচরিত সংস্কার, শাস্ত্রনির্দেশ, ধর্মনির্দেশ মানিয়া চলিতেই হইত—সাধারণত ইহার অন্যথা হইবার উপায় ছিলনা। বৌদ্ধ পালরাজারাও বারবার এ সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়াছেন; তাঁহারা যে শাস্ত্রনির্দেশ, বর্ণ ও সমাজব্যবস্থা, ধর্মনির্দেশ ইত্যাদি মানিয়া চলিয়াছেন বলিয়া একাধিকবার লিপিগুলিতে বলা হইয়াছে, তাহার ইঙ্গিত নিরর্থক নয়।

শাসনব্যবস্থা যে মোটামুটি খুব বিস্তৃত, সুবিন্যস্ত ও সুপরিচালিত ছিল এ সম্বন্ধে দু'একটি ইঙ্গিত প্রাচীন সাক্ষ্যে পাওয়া যায়। দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশ প্রসঙ্গে একটি কাহিনী তিব্বতী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে; কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য। নয়পালের রাজত্বকালে, আনুমানিক ১০৩০-৪০ খ্রীষ্ট শতকে কোনো সময়ে নগ্-টচো বাংলাদেশে আসিতেছিলেন, দীপঙ্করকে সঙ্গে করিয়া তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য। বিক্রমশীলা বিহারের অনতিদূরে গঙ্গাতীরে আসিয়া যখন তাঁহারা পৌঁছিলেন তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে, যাত্রী বোঝাই খেয়া-নৌকা ঘাট ছাড়িয়া নদী পাড়ি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুই বিদেশি পথিক মাঝিকে ডাক দিয়া তাঁহাদের ঐ নৌকায়ই নদী পার করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু বোঝাই নৌকায় মাঝি আর লোক লইতে অস্বীকার করিয়া বলিল, এখন আর সম্ভব নয়, পরে আবার সে ফিরিয়া আসিবে। নৌকা চলিয়া গেল; এদিকে রাত্রি হইয়া আসিতেছে, অন্যতম পথিক বিনয়ধর মনে করিলেন, মাঝি নৌকা লইয়া আর ফিরিবেনা। কিন্তু, বেশ খানিকক্ষণ পরে মাঝি নৌকা লইয়া ফিরিল; বিনয়ধর মাঝিকে বলিলেন, 'আমি ত ভাবিয়াছিলাম, এত রাত্রে তুমি আর ফিরিয়া আসিবেনা'। মাঝি উত্তর করিল, 'আমাদের দেশে ধর্ম আছে, আমি যখন আপনাকে ফিরিয়া আসিব বলিয়া গিয়াছি, তখন অন্যথা কি করিয়া হইবে!' মাঝি বিনয়ধরকে পরামর্শ দিল, এতরাত্রে নদী পার হইয়া কাজ নাই, অদূরবর্তী বিহারের দ্বারমঞ্চের নীচে রাত্রিবাস করাই যুক্তিযুক্ত, সেখানে চোরের উপদ্রব নাই।

খেয়া পারাবার বিভাগের কর্তার নাম পাল-লিপিমালায় পাইতেছি 'তরিক'; তাঁহার বিভাগের সুশাসনের একটু ইঙ্গিত এই গল্পে ধরিতে পারা যায়।

কিন্তু উপরোক্ত গল্প হইতে মনে করিবার প্রয়োজন নাই যে, সমস্ত রাজপুরুষরাই কর্তব্য ও নীতিপরায়ণ ছিলেন। বিষয়পতিরা যে মাঝে মাঝে লোভী হইয়া অত্যাচারী হইতেন, প্রজাসাধারণকে উৎপীড়ন করিতেন তাহার একটু পরোক্ষ ইঙ্গিত পাইতেছি সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত একটি শ্লোকে। পল্লীবাসী কৃষিজীবী গৃহস্থের সুখ ও শান্তিলাভের

চারিটি উপায়ের মধ্যে একটি উপায় বিষয়পতির (সাধারণ ভাবে, স্থানীয় শাসনকর্তার) লোভহীনতা। নিম্নের শ্লোকটির রচয়িতা হইতেছেন কবি শুভাংক।

বিষয়পতিরলব্ধো ধেনুভির্গ্রাম পূতং
কতিচিদভিমতানাং সীম্নি সীমা বহন্তি।
শিথিলয়তি চ ভার্যা নাতিথেয়ী সপর্যাম্
ইতি সুকৃতমনেন বাঞ্ছিতং নঃ কলেন॥

অন্যান্য রাজপুরুষেরাও জনপদবাসীদের উপর নানাভাবে উৎপীড়ন করিতেন। এই সব নানা জাতীয় পীড়ার উল্লেখ প্রতিবাসী কামরূপের সমসাময়িক লিপিতে কিছু কিছু পাওয়া যায়; বাংলার ভূমি দান-বিক্রয় সম্পর্কিত লিপিগুলিতেও "পরিহৃত-সর্বপীড়া" পদটির উল্লেখ আছে। অর্থাৎ, ভূমি যখন দান করা হইতেছে তখন দানকর্তা দানগ্রহীতাকে উল্লিখিত 'সর্বপীড়া' হইতে মুক্তি দিতেছেন। ইঙ্গিতটা এই যে, সাধারণত সকল প্রজাদেরই এই সব পীড়া বা উৎপীড়ন অল্পবিস্তর ভোগ করিতে হইত। চাটভাট প্রভৃতি "উপদ্রবকারীদের" সংখ্যাও কম ছিল না। অন্যত্র (ভূমি-বিন্যাস অধ্যায় দ্রষ্টব্য) সবিস্তারে ইহাদের উল্লেখ করিয়াছি। রাষ্ট্রকে দেয় কর-উপকরও কম ছিল না; সম্পন্ন ও বিত্তবান্ গৃহস্থদের পক্ষে এই সব কর-উপকর দেওয়া ক্লেশকর ছিল না, এরূপ অনুমান করা যায়; কিন্তু সমাজের অর্থনৈতিক নিম্ন শ্রেণীর পক্ষে করভার একটু বেশিই ছিল বই কি? বিভিন্ন প্রকারের করের তালিকা হইতে তো তাহাই মনে হয়। তাহা ছাড়া, রাজপুরুষেরা নানা প্রকারের পুরস্কার-উপহার গ্রহণ করিতেন—অর্থে, ফলে, শস্যে এবং অন্যান্য দ্রব্যে।

পাল ও সেন-আমলের ভূমি ও কৃষিনির্ভর রাষ্ট্র ও সমাজে ভূমিবান্ মহত্তর, কুটুম্ব, সাধারণ গৃহস্থদের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু, বৃহৎ ভূমিহীন গৃহস্থ এবং সমাজ-শ্রমিক গোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থা যে খুব স্বচ্ছল ছিল, এমন মনে হয় না। যে দুঃখ-দারিদ্র্যের চেহারা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নিম্নতম স্তরে বাংলার পল্লীগ্রামে, সহরের দুঃস্থ পল্লীতে আজও দৃষ্টিগোচর হয় তাহা তখনও ছিল। চর্যাগীতিতে (দশম-দ্বাদশ শতক) ঢেণ্ঢণ্‌পাদের একটি গীতিতে আছে:

টালিত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী
হাড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জা অ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষমাঅ॥ (হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাঠ)

ইহার গূঢ় গুহ্য ব্যাখ্যা যাহাই হউক, বস্তুগত, ইহগত ব্যাখ্যা এইরূপ:

টিলাতে আমার ঘর, প্রতিবেশী নাই। হাঁড়িতে ভাত নাই; নিত্যই ক্ষুধিত। (অথচ আমার) ব্যাং-এর সংসার বাড়িয়াই চলিয়াছে (ব্যাঙের যেমন অসংখ্য ব্যাঙাচি বা সন্তান আমারও সন্তান তেমনই বাড়িয়া যাইতেছে); দোহা দুধ আবার বাঁটে ঢুকিয়া যাইতেছে (অর্থাৎ, যে-খাদ্য প্রায় প্রস্তুত তাহাও নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেছে)।

কিন্তু, দারিদ্র্যের আরও নিকরুণ বর্ণনা পাওয়া যায় সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত নিম্নোক্ত তিনটি শ্লোকে। তিনটিই বাঙালী কবির রচনা; বাংলাদেশের দারিদ্র্যের ধূসর চিত্র। প্রথম শ্লোকটি অজ্ঞাত নামা এক কবির।

ক্ষুৎক্ষামাঃ শিশবঃ শবা ইব তনুর্মন্দাদরো বান্ধবো
লিপ্তা জর্জর কর্করী জললবৈর্নো মাং তথা বাধতে।
গেহিন্যাঃ স্ফুটিতাংশুকং ঘটয়িতুং কৃত্বা সকাকুস্মিতং
কুপ্যন্তী প্রতিবেশিনী প্রতিমুহুঃ সূচীং যথা যাচিতা॥

শিশুরা ক্ষুধায় পীড়িত, দেহ শবের মত শীর্ণ, বান্ধবেরা প্রীতিহীন, পুরাতন জীর্ণ জলপাত্রে স্বল্পমাত্র জল ধরে—এ সকলও আমায় তেমন কষ্ট দেয় নাই, যেমন দিয়াছিল যখন দেখিয়াছিলাম আমার গৃহিণী করুণ হাসি হাসিয়া ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করিবার জন্য কুপিত প্রতিবেশিনীর নিকট হইতে সূচ চাহিতেছেন।

দারিদ্র্যের এই বাস্তব কাব্যময় চিত্র সাহিত্যে সত্যই দুর্লভ। অথচ, ইহার ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমসাময়িক আর একটি অনুরূপ বাস্তব অথচ কাব্যময় চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন কবি বীর। এই চিত্র আরও নির্মম, আরও নিকরুণ।

বৈরাগ্যৈকসমুন্নতা তনুতনুঃ শীর্ণাম্বরং বিভ্রতী
ক্ষুৎক্ষামেক্ষণ কুক্ষিভিস্চ শিশুভির্ভোক্তুং সমভ্যর্থিতা।
দীনা দুঃস্থকুটুম্বিনী পরিগলদ্বাষ্পাম্বুধৌতাননা-
প্যেকং তণ্ডুলমানকং দিনশতং নেতুং সমাকাঙ্ক্ষতি॥

বৈরাগ্যে (আনন্দহীনতায়?) তাহার সমুন্নত দেহ শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণবস্ত্র; ক্ষুধায় শিশুদের চক্ষু কুঞ্চিত হইয়া এবং উদর ধসিয়া গিয়াছে; তাহারা আকুল হইয়া খাদ্য চাহিতেছে। দীনা দুঃস্থা গৃহিনী চোখের জলে মুখ ভাসাইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এক মান তণ্ডুলে যেন তাহাদের একশত দিন চলিতে পারে।

আরও একটি কাব্যময় অথচ বস্তুগর্ভ বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন কবি বীর। এই শ্লোকটিও সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থ হইতেই উদ্ধার করিতেছি।

চলৎকাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণসঞ্চয়ম্।
গণ্ডুপদার্থিমণ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম॥

কাঠের খুঁটি নড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে, চালের খড় উড়িয়া যাইতেছে; কেঁচোর সন্ধানে নিরত ব্যাঙের দ্বারা আমার জীর্ণ গৃহ আকীর্ণ।

সমাজের এই দারিদ্র্য, এই দুঃখদৈন্য সম্বন্ধে রাষ্ট্র যথেষ্ট সচেতন ছিল বলিয়া মনে হয় না। অথবা শ্রেণীবিন্যস্ত, ব্যক্তিগত অধিকারনির্ভর, সামন্ততন্ত্র ও আমলাতন্ত্র ভারগ্রস্ত, একান্ত ভূমি ও কৃষিনির্ভর সমাজের ইহাই হয়তো সামাজিক প্রকৃতি!

সেনরাজ বিজয়সেনের প্রশস্তি গাহিয়া কবি উমাপতি-ধর বলিতেছেন "...ভিক্ষা-ভুজোঽস্তাক্ষমাং লক্ষ্মীং স ব্যতনোদ্দরিদ্র-ভরণে সুজ্ঞো হি সেনান্বয়", অর্থাৎ "[বিজয়সেনের কৃপায়] ভিক্ষাই ছিল যাহার উপজীব্য সে হইয়াছে লক্ষ্মীর অধিকারী। কি করিয়া দরিদ্রের ভরণপোষণ করিতে হয় সেনবংশ তাহা ভালই জানে"! ব্যক্তিগত ভাবে রাজারা দান-ধ্যান

করিতেন, পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া কৃপাবর্ষণও করিতেন, সন্দেহ নাই ; উমাপতি-ধরও সে কৃপালাভ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্র জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করা সম্বন্ধে বা দুঃস্থপীড়িতদের সম্বন্ধে কোনো দায়িত্ব স্বীকার করিত বলিয়া মনে হয় না। অন্তত চর্যাগীতি ও সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের শ্লোকগুলিতে যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে এই স্বীকৃতির ইঙ্গিত নাই।

দশম অধ্যায়
রাজবৃত্ত

১

রাজবৃত্ত বর্ণন ইতিহাসের এক অপরিহার্য অধ্যায়। 'রাগদ্বেষ বহির্ভূত হইয়া ভূতার্থ কথন' বহুদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে (এবং বিদেশেও) রাজা ও রাজকীয় বর্ণনাতেই পর্যবসিত ছিল; এখনও নাই এমন বলা যায় না। এক সময় এই বর্ণনাই সমস্ত ইতিহাস জুড়িয়া বিরাজ করিত। তাহার প্রয়োজন ছিল না, এমন নয়। কিন্তু ইতিহাসের যে-যুক্তি আমার এই বাঙালীর ইতিহাসের মূলে সেই যুক্তিতে রাজবৃত্ত বর্ণনা, অর্থাৎ রাজা, রাজবংশ, যুদ্ধবিগ্রহ, রাষ্ট্রের উত্থান ও পতনের সন-তারিখ প্রভৃতির নিছক বিবরণ একেবারে অপরিহার্য না হইলেও গৌণ। ভূত-বিবরণ, অতীতের যথাযথ কথনই ইতিহাসের বড় কথা নয়, ভূতার্থ অর্থাৎ অতীত ঘটনার অর্থের বর্ণনাই যথার্থ ইতিহাস—এই অর্থ বর্ণনই ঘটনার প্রাণহীন কঙ্কালকে জীবনের গৌরব ও সৌন্দর্য দান করে। রাজতরঙ্গিনীর কবি কহ্লন তাহা জানিতেন; তিনি শুধু ভূত-বর্ণনা করেন নাই, ভূতার্থ কথনই ছিল তাঁহার লক্ষ্য ও আদর্শ; কিন্তু হর্ষচরিত-রচয়িতা বাণভট্ট এই লক্ষ্য ও আদর্শের সন্ধান জানিতেন না।

যুক্তি

বহু বৎসরের বহু পণ্ডিত ও গবেষকের শ্রমসাধনার ফলে প্রাচীন বাংলার রাজবৃত্ত বর্ণনার কাজ আজ সহজ হইয়া আসিয়াছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে প্রাচীন বাংলার সামগ্রিক রাজবৃত্ত বর্ণনার যে-চেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সদ্যপ্রকাশিত ইংরাজি ভাষায় রচিত বাংলার ইতিহাসে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাহার পূর্ণতর, সমৃদ্ধতর, যথার্থতর রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। বহু পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকের সমবেত সাধনার ফলে এই সার সংকলন সম্ভব হইয়াছে। তাহা ছাড়া, রাজবৃত্তের মোটামুটি পরিচয় বহু আলোচনার পর আজ আর বাঙালী পাঠকের কাছে অপরিচিত নয়, অনধিগম্য তো নয়ই। কাজেই একই বিষয়ে বিস্তৃত পুনরালোচনা করিয়া লাভ নাই; নূতন তথ্য পরিবেশন করিবার সুযোগও কম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্যের নূতন ব্যাখ্যা বা মতামতের অনৈক্য নির্দেশ করা চলে, কিন্তু তাহাও এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়, বিশেষত নিছক রাজবৃত্ত বর্ণনা যখন এই ইতিহাসের যুক্তির বাহিরে। সেই হেতু খুব সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে রাজবৃত্ত কাহিনীর সার সংকলন করিবার চেষ্টা করা হইবে মাত্র।

কিন্তু, এই অধ্যায় রচনার আর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে যাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রাচীন বাংলার রাজবৃত্ত বর্ণন এ-পর্যন্ত যাহা কিছু হইয়াছে তাহা সমস্তই রাজা এবং রাজবংশের ব্যক্তিক দিক্ হইতেই হইয়াছে, বৃহত্তর সমাজের দিক হইতে নয়—বস্তুত, রাজা এবং রাজবংশকে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যুক্ত করিয়া পারস্পর প্রভাব ও যোগাযোগের আলোচনা আমাদের ইতিহাসে এখনও কতকটা অবজ্ঞাত। রাষ্ট্র, রাজা বা রাজবংশের অভ্যুদয় বা প্রসার বা বিলয় সমস্তই ঘটে অন্তর্নিহিত সামাজিক কারণে; এই কারণগুলি, অর্থাৎ এক কথায় সামাজিক আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা রাজবৃত্তকে ঘূর্ণমান করে, তাহাকে গতি দেয়, অর্থদান করে। প্রাচীন বাংলায় এই আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক সর্বত্র সকল সময় সুস্পষ্ট নয়; যথেষ্ট তথ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। সেই সব ক্ষেত্রে রাজবৃত্ত কাহিনী বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন ব্যক্তিক কীর্তিকলাপের বিবরণ ছাড়া এখনও আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়, একথা অনস্বীকার্য; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এরূপ হইবার যৌক্তিকতা আজ আর নাই, তাহাও স্বীকার করিতেই হয়। অথচ, প্রাচীন ভারত ও বাংলার ইতিহাস বলিতে আমরা এ-পর্যন্ত যাহা বুঝিয়া আসিয়াছি তাহা এই ধরনের বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন ব্যক্তিক বিবৃতি ছাড়া আর বিশেষ কিছু নয়। খুব সম্প্রতি ইহার কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে মাত্র, যেমন হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের Political History of Ancient India-র চতুর্থ সংস্করণে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ইতিহাসে। যাহাই হউক, এই অধ্যায়ে রাজবৃত্ত কথা বলিতে গিয়া আমি এই বৃহত্তর সামাজিক আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক ব্যাখ্যা করিতে কিছু কিছু চেষ্টা করিয়াছি। আমার ব্যাখ্যা সর্বত্র সকলের সম্মতি লাভ করিবে সে-আশা করা অন্যায় হইবে—তথ্যই তো সর্বত্র উপস্থিত নাই। তবু, মনে হয় এই চেষ্টা হওয়া উচিত; রাজবৃত্ত কথা এই উপায়েই অর্থ ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হইতে পারে, এবং রাজা, রাষ্ট্র ও রাজবংশের ইতিহাস বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন বিবৃতি হইতে মুক্তি পাইতে পারে। বস্তুত, মানুষের ইতিহাস তো কার্যকারণ সম্বন্ধের মালায় গাঁথা; তাহার প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন। ইতিহাসের এই কার্যকারণ সম্বন্ধ-বিবৃতিই যথার্থ 'ভূতার্থ কথন'। এই অধ্যায়ে রাজা এবং রাজবংশের নিছক বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—তাহা বহুদিন ধরিয়া বহু আলোচিত এবং সুবিদিত। আমার একমাত্র চেষ্টা, রাজা, রাষ্ট্র এবং রাজবংশের বিবরণগুলিকে কার্যকারণ সম্বন্ধের অবিচ্ছিন্ন একটি প্রবাহে গাঁথিয়া তোলা—সমাজতত্ত্ব এবং ইতিহাস-সম্মত ব্যাখ্যার সাহায্যে। সেই হেতু রাজবৃত্তের সকল পর্বেই আমার চেষ্টা রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও সামাজিক ইঙ্গিতটি ব্যক্ত করা; কিন্তু স্বল্পক্ষেত্রেই তাহা সম্ভব হইয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে তাহা সম্ভব হয় নাই। সেজন্য আরও নূতন ও ব্যাপক তথ্য সংগ্রহের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই। তবু যে সামাজিক পটভূমিকায় এবং সামাজিক ইঙ্গিতের পরিবেশের মধ্যে আমি এই রাজবৃত্ত-কাহিনী উপস্থিত করিতেছি সবিনয়ে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখা প্রয়োজন, বহু কর্মীর বহু বৎসরের সাধনায় একটু একটু করিয়া

তথ্যের টুকরা সংগৃহীত হইয়া রাজবৃত্তের মোটামুটি কাঠামো-কাহিনী গড়িয়া না উঠিলে এই অসম্পূর্ণ সামাজিক ব্যাখ্যাও সম্ভব হইত না।*

২

পুরাণ-কথা
আঃ খ্রীষ্টপূর্ব
১০০০—৩৫০

প্রাচীন বাংলার প্রাচীনতম অধ্যায় অস্পষ্ট, পুরাণ-কথায় সমাচ্ছন্ন। ইতিহাসের সেই প্রদোষ উষায় কয়েকটি প্রাচীন কোমের নাম মাত্র পাওয়া যাইতেছে; ইহাদের কাহারও কাহারও কিছু কিছু কীর্তিকলাপের বিবরণও শোনা যাইতেছে কখনো কখনো। কিন্তু, যে-সব গ্রন্থে এই সব উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে তাহার একটিও এই সব জনদের পক্ষ হইতে রচিত নয়, প্রত্যেকটিরই উৎস অন্যতর জন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। সিন্ধু এবং উত্তর-গাঙ্গেয় প্রদেশের যে-সব জন ও সংস্কৃতি এই সব গ্রন্থের এবং গ্রন্থোক্ত কাহিনীর জনক তাঁহারা পূর্ব-ভারতের আর্যপূর্ব ও অনার্য কোমগুলিকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে পারেন নাই; ইহাদের ভাষা তাঁহাদের বোধগম্য ছিল না; ইহাদের আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার, বসন-ব্যসন তাঁহাদের রুচিকর ছিল না; ইহাদের প্রতি একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞা তাঁহাদের সকল উক্তি ও বিবরণীতে।

ঋগ্বেদে প্রাচীন বাংলার একটি কোমেরও উল্লেখ নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পূর্ব-ভারতের অনেকগুলি 'দস্যু' কোমের নাম পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে পুণ্ড্র কোম একটি। এই সব 'দস্যু' কোমদ্বারাই সমস্ত পূর্ব-ভারত তখন অধ্যুষিত। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ ও বগধ (মগধ?) জনদের ভাষা পাখীর ভাষার সঙ্গে তুলিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন; ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, পাখীর ভাষা যেমন দুর্বোধ্য বঙ্গ ও মগধ জনদের ভাষাও তেমনই দুর্বোধ্য ছিল আরণ্যক গ্রন্থের ঋষিদের কাছে। এই দুই কোমের লোকদের তাঁহারা মনে করিতেন অনাচারী বা আচারবিরহিত। প্রাচীন জৈনগ্রন্থ আচারঙ্গসূত্রে মহাবীর ও তাঁহার যতি সঙ্গীদের সম্বন্ধে যে গল্প আছে আগে তাহা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। তাহাতেও দেখা যাইতেছে, পথহীন রাঢ় দেশ তখনও পর্যন্ত (আনুমানিক, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) এক রূঢ় বর্বর কোমদ্বারা অধ্যুষিত এবং বজ্জ ভূমির (উত্তর-রাঢ়ের?) ভোজ্য প্রাচীন বিহারবাসী এই সব যতিদের কাছে অরুচিকর। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সমুদ্রতীরবাসী বাংলার লোকদের বলা হইয়াছে 'ম্লেচ্ছ'; ভাগবত পুরাণে সুহ্মদের বলা হইয়াছ 'পাপ' কোম (হূন, কিরাত, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, যবন, খস,

* অন্যান্য অধ্যায়ের মত এই অধ্যায়েও এই সব বিচিত্র তথ্যের মূল আমি নির্দেশ করি নাই; সে-জন্য যে-সব গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য তাহা নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। বিস্তৃত নির্দেশ অন্যান্য অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে; এই অধ্যায়ে এমন তথ্য ব্যবহৃত হয় নাই যাহা অন্যান্য অধ্যায়ে অনালোচিত থাকিয়া গিয়াছে।

ইহারাও 'পাপ' কোম)। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে আরট্ট (বর্তমান পঞ্জাব), সৌবীর (বর্তমান সিন্ধু এবং পঞ্জাবের দক্ষিণাংশ), কলিঙ্গ (বর্তমান ওড়িষ্যা ও অন্ধ্র), বঙ্গ এবং পুণ্ড্র জন এবং জনপদগুলিকে একেবারে আর্য সংস্কার ও সংস্কৃতি-বহির্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সব জনপদে যাঁহারা প্রবাস যাপন করিতে যাইতেন ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থে গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল জনপদের লোকদের ভাষাকে বলা হইয়াছে 'অসুর' ভাষা। ঐতিহাসিক কালে (খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতকের আগে) প্রাচীন কামরূপ রাজ্যে অসুরান্ত ঔপধিক রাজাদের নাম পাওয়া যাইতেছে। এই সব বিচিত্র উল্লেখ হইতে স্পষ্টতই বুঝা যায়, ইঁহারা এমন একটি কালের স্মৃতি ঐতিহ্য বহন করিতেছেন যে-কালে আর্য ভাষাভাষী এবং আর্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক উত্তর ও মধ্য-ভারতের লোকেরা পূর্ব-ভারতের বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, সুহ্ম, প্রভৃতি কোমদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, যে-কালে এই সব কোমদের ভাষা ছিল ভিন্নতর, আচার-ব্যবহার অন্যতর। জনতত্ত্বের দিক হইতেও যে এই সব লোকেরা অন্যতর জনের লোক ছিলেন, তাহার ইঙ্গিত তো আমরা আগেই পাইয়াছি; পুরাণ-কাহিনীর মধ্যেও তাহার কিছু ইঙ্গিত আছে, পরে তাহা উল্লেখ করিতেছি। এই অন্যতর জন, অন্যতর আচার-ব্যবহার, অন্যতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং অন্যতর ভাষার লোকদের সেই জন্যই বিজেতা-জাতিসুলভ দর্পিত উন্নাসিকতায় বলা হইয়াছে দস্যু, ম্লেচ্ছ, পাপ অসুর, ইত্যাদি।

কিন্তু এই দর্পিত উন্নাসিকতা বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। ইতিমধ্যে আর্য-ভাষাভাষী আর্য-সংস্কৃতির বাহকেরা ক্রমশ পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করিয়াছেন—ব্যক্তিগত বা কৌমগত খেয়ালবশে নয়, প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়মের তাড়নায়, উর্বর শস্যক্ষেত্রের সন্ধানে, ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার জন্য নদীতীরশায়ী বাস্তু ও ক্ষেত্রভূমির সন্ধানে, এবং আদিমতর কোমবৃন্দের উপর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টায়। এই বিস্তৃতির মূলে ছিল আর্যভাষাভাষী ও আর্যসংস্কৃতিসম্পন্ন লোকদের উন্নততর কৃষিব্যবস্থা, উন্নততর যন্ত্রাদি এবং অস্ত্রশস্ত্র, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। রামায়ণ-মহাভারতে এই অনুমানের কিছু কিছু যুক্তিও আছে। তাহা ছাড়া, মননশক্তি ও অভিজ্ঞতাতেও বোধ হয় ইঁহারা উন্নততর স্তরের লোক ছিলেন। গোড়ার দিকে এইসব বিভিন্ন জন, ভাষা ও সংস্কৃতির পরস্পর পরিচয় বিরোধের মধ্য দিয়াই হইয়াছিল। যাহাই হউক, আপাতত বাংলা দেশে আর্যভাষীদের ক্রমবিস্তারের পরস্পর পরিচয় ও যোগাযোগের এবং বিরোধ ও সমন্বয়ের আরম্ভিক দুই চারিটি সাক্ষ্যসূত্রের সন্ধান লওয়া যাইতে পারে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ এবং মূতিব কোমের লোকেরা ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিশপ্ত পঞ্চাশটি পুত্রের বংশধর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; তাঁহারা যে আর্যভূমির প্রত্যন্ত দেশে বাস করিতেন তাহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ঠিক এই ধরনের

একটি গল্প আছে মহাভারতে এবং বায়ু, মৎস্য ইত্যাদি পুরাণে। এই গল্পে অসুর বলির স্ত্রীর গর্ভে বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমসের পাঁচটি পুত্র উৎপাদনের কথা বর্ণিত আছে; এই পাঁচ পুত্রের নাম, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম; ইহাদের নাম হইতেই পাঁচ পাঁচটি জনপদের নামের উদ্ভব। রামায়ণে দেখিতেছি, বঙ্গদেশের লোকেরা অযোধ্যাধিপের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, এবং বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী এবং কোশল কোমবর্গ অযোধ্যা-রাজবংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। ইক্ষ্বাকু বংশীয় রঘু কর্তৃক সুহ্ম এবং বঙ্গ-বিজয়ের প্রতিধ্বনি কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যেও আছে। মহাভারতে কর্ণ, কৃষ্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গেও প্রাচীন বাংলার অনেকগুলি কোমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণ সুহ্ম, পুণ্ড্র ও বঙ্গদের পরাজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামে পুণ্ড্রদের এক রাজা বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাতদের এক রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করিয়া মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-বাসুদেবকে পৌণ্ড্রক-বাসুদেব ও জরাসন্ধের সমবেত সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কৃষ্ণ-বাসুদেব শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়াছিলেন। ভীমও এক পৌণ্ড্রাধিপকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং তাহার পর একে একে বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট ও সুহ্মের রাজাদের ও সমুদ্রতীরবাসী ম্লেচ্ছদের পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। এই সব কোমদের মধ্যে পুণ্ড্র ও বঙ্গ কোমই সবচেয়ে পরাক্রান্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। মহাভারতে পৌণ্ড্রক-বাসুদেবের কীর্তিকলাপ নগণ্য নয়; জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁহার মৈত্রীবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডব-ভ্রাতাদের পক্ষে শঙ্কা ও চিন্তার কারণ হইয়াছিল। এক বঙ্গরাজ কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে কৌরবপক্ষে দুর্যোধনের সহায়ক হইয়াছিলেন; ভীষ্মপর্বে দুর্যোধন-ঘটোৎকচ যুদ্ধে এই বঙ্গরাজ যথেষ্ট বীরত্ব ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

সদ্যোক্ত পুরাণকথাগুলির ঐতিহাসিক ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে পুণ্ড্র, শবর ইত্যাদি কোমদের এবং পুরাণ-মহাভারতে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-পুণ্ড্র-সুহ্ম কোমগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে-আখ্যান বর্ণিত আছে তাহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এই সব আখ্যান এক সুদূর অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়াছে। সে-কালে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির বাহকরা পূর্ব-প্রত্যন্ত এই সব দেশগুলিতে কেবল প্রথম পদক্ষেপ করিতেছেন মাত্র। কোনো বিজয় অভিযান নয়; ইহাদের মধ্যে যাঁহারা দুরন্ত, দুর্গম পথকামী তাঁহারাই শুধু আসিতেছেন দুঃসাহসী প্রথম পথিকৃতের মত, যেমন বিশ্বামিত্রের অভিশপ্ত পঞ্চাশটি সন্তান। তাহার পরই আসিতেছেন প্রচারকের দল—একটি দু'টি করিয়া, যেমন বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমস। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ বড় বিচিত্র; প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলনের যত কিছু বাধা—জাতি, সমাজ, আচার, ধর্ম, সকল কিছুর বাধা সবলে অতিক্রম করে। এই সব দুঃসাহসী পথিকৃৎ ও প্রচারক যখন দস্যু, ম্লেচ্ছ, পাপ, অসুর,

আর্য যোগাযোগ

কোমদের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, তখন পরস্পরের সংযোগ ঘটিতে দেরী হইল না, প্রাকৃতিক নিয়মেই সকল বাধা ক্রমশ ঘুচিয়া যাইতে লাগিল, এবং বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমসও প্রকৃতির নিয়ম এড়াইতে পারিলেন না। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মও সক্রিয় হইল বিরোধের মধ্য দিয়াই। কর্ণ, ভীম ও কৃষ্ণের যুদ্ধকাহিনী, পৌণ্ড্রক-বাসুদেব কর্তৃক জরাসন্ধের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন, বঙ্গরাজ ও দুর্যোধনের মৈত্রীবন্ধন, আচারঙ্গসূত্রের গল্পে রাঢ়বাসীদের দ্বারা মহাবীর ও তাঁহার যতি সঙ্গীদের পশ্চাতে কুকুর লেলাইয়া দেওয়া, ঢিল ছোঁড়া, ইত্যাদি গল্পের ভিতর সেই বিরোধের স্মৃতি সুস্পষ্ট। এই সব কোমের লোকেরা সহজে বিনা যুদ্ধে বিনা প্রতিরোধে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির বাহকদের কাছে পরাভব স্বীকার করিতে রাজী হ'ন নাই। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও সমাজ-প্রকৃতির নিয়মই জয়ী হইল ; উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থা, উন্নততর অস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যা, এবং উন্নততর ভাষা ও সংস্কৃতি জয়ী হইল।

আর্যীকরণের সূত্রপাত

প্রাথমিক পরাভব ও যোগাযোগের পর এই সব পূর্বদেশিয় কোমগুলি ক্রমশ আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি, এবং আর্য সমাজ-ব্যবস্থার একপ্রান্তে স্থান লাভ করিতে আরম্ভ করিল। এই স্বীকৃতি ও স্থানলাভ একদিনে ঘটে নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একদিকে এই সংঘাত ও বিরোধ এবং অন্যদিকে এই স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তি চলিয়াছিল, কখনও ধীর শান্ত, কখনো দ্রুত কঠোর প্রবাহে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পরাভব ঘটিয়াছিল আগে ; সংস্কৃতির পরাভব ঘটিয়াছে অনেক পর। বস্তুত, এই সব কোমের ধর্ম ও আচারগত, ধ্যান ও বিশ্বাসগত পরাভব আজও সম্পূর্ণ হয় নাই ; সামগ্রিক আর্যীকরণের ক্রিয়া আজও চলিতেছে, ধীরে আপাতদৃষ্টির অগোচরে। যাহাই হউক, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকেও দেখিতেছি, রাঢ়দেশে আর্য জৈনধর্ম প্রচারকেরা বাধা ও বিরোধের সম্মুখীন হইতেছেন। স্থানে স্থানে এই বিরোধ তখনও চলিতেছে, সন্দেহ নাই। তবে, সঙ্গে সঙ্গে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি লাভও ঘটিতেছে। রামায়ণ-কাব্যে দেখিয়াছি, প্রাচীন বঙ্গের রাজন্যরা অযোধ্যার রাজবংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। মানবধর্মশাস্ত্রে আর্যাবর্তের সীমা দেওয়া হইতেছে পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্বসমুদ্র পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রাচীন বাংলাদেশের অন্তত কিয়দংশও আর্যাবর্তের অন্তর্গত, এই যেন ইঙ্গিত। কিন্তু মনুই আবার পুণ্ড্রকোমের লোকদের বলিতেছেন ব্রাত্য বা পতিত ক্ষত্রিয়, এবং তাঁহাদের পংক্তিভুক্ত করিতেছেন দ্রাবিড়, শক, চীনদের সঙ্গে। মহাভারতের সভাপর্বে কিন্তু বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের যথার্থ ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে ; জৈন প্রজ্ঞাপনা-গ্রন্থেও বঙ্গ এবং রাঢ় কোম দু'টিকে আর্য কোম বলা হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মহাভারতেই দেখিতেছি, প্রাচীন বাংলার কোনো কোনো স্থান তীর্থ বলিয়াও স্বীকৃত ও পরিগণিত হইতেছে, যেমন পুণ্ড্রভূমিতে করতোয়াতীর, সুহ্মদেশে ভাগীরথীর সাগরসঙ্গম। অর্থাৎ, বাংলা এবং বাঙালীর আর্যীকরণ ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে, ইহাই এই সব পুরাণকথার ইঙ্গিত।

প্রাচীন সিংহলী পালিগ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশ-কথিত সিংহবাহু ও তৎপুত্র বিজয়সিংহের লঙ্কাবিজয় কাহিনী সুবিদিত। আগেই বলিয়াছি, এই কাহিনীর লাল দেশ প্রাচীন বাংলার রাঢ় হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। বঙ্গ ও রাঢ়াধিপ সিংহবাহুর পুত্র বিজয় পিতার ক্রোধের হেতু হইয়া রাজ্য হইতে নির্বাসিত হন; তিনি প্রথম সমুদ্রপথে ভারতের পশ্চিম সমুদ্রতীরের সোপারা (সুপ্পারক — শূর্পারক) বন্দরে গিয়া বসতি আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহার সঙ্গীদের অত্যাচারে সোপারার লোকেরা উত্যক্ত হইয়া উঠে। বিজয় সেই দেশও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া অবশেষে তম্বপন্নি দেশের (— তাম্রপর্ণী — বর্তমান লঙ্কা বা সিংহল) লঙ্কা নামক স্থানে চলিয়া যান এবং সেখানে এক রাজ্য ও রাজবংশ স্থাপন করেন। সিংহলী ঐতিহ্যের মতে এই ঘটনার তারিখ এবং বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের তারিখ (অর্থাৎ ৫৪৪ খ্রীষ্টপূর্ব) একই। মোটামুটি ষষ্ঠ-পঞ্চম খ্রীষ্টপূর্ব শতকে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যে তাম্রলিপ্তি-তাম্রপর্ণী বা সিংহল-ভরুকচ্ছ-সুপ্পারকের সামুদ্রিক বাণিজ্যের উল্লেখ একেবারে অপ্রতুল নয়। সমুদ্দ-বণিজ-জাতক, শঙ্খ-জাতক, মহাজনক-জাতক ইত্যাদি গল্পে তাম্রলিপ্তি-সিংহলের বাণিজ্যের কথা বারবার উল্লিখিত আছে। এ-সব গল্পে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকের বাণিজ্যিক চিত্র প্রতিফলিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বিজয়সিংহ এই ধরনের কোনো প্রাচীন বাণিজ্য-নায়ক হইয়া থাকিবেন। পিতৃরোষে নির্বাসিত হইয়া সুপ্পারকে-সিংহলে নিজ ভাগ্যান্বেষণ করিতে গিয়া হয়তো রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন।

সামাজিক ইঙ্গিত

সদ্যোক্ত জাতকের গল্প ও পালি মহানিদ্দেশ-গ্রন্থের ইঙ্গিত, মহাভারতে বঙ্গ ও পুণ্ড্রাজগণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট হস্তী, মুক্তা এবং মূল্যবান বস্ত্রাভরণ উপঢৌকন আনয়ন, সমুদ্রতীর বাসী ম্লেচ্ছগণ কর্তৃক সুবর্ণ উপহার দান, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন বাংলাদেশজাত বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারের বর্ণনা, মিলিন্দ-পঞ্হ-গ্রন্থে বাংলার সমৃদ্ধ স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিবরণ, পেরিপ্লাস-গ্রন্থে, ষ্ট্রাবো ও প্লিনির বিবরণীতে বাংলার বিচিত্র মূল্যবান্ বাণিজ্যিক দ্রব্যসম্ভারের বিবরণ প্রভৃতি পড়িলে মনে হয়, খুব সুপ্রাচীন কাল হইতেই বাংলাদেশ কতকগুলি কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যে এবং খনিজদ্রব্যে খুবই সমৃদ্ধ ছিল; বাংলার হস্তীও উত্তর-ভারতীয় রাজন্যবর্গের লোভনীয় ছিল। এই সব সমৃদ্ধির লোভেই হয়তো উত্তর-ভারতের ক্ষমতাবান্ রাজা ও রাজবংশ পূর্ব-ভারতের এই জনপদগুলির দিকে আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর-গাঙ্গেয়ভূমির আর্যভাষা, আর্যসমাজ ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বাংলায় বিস্তৃতি লাভ করে।

অঙ্গ (উত্তর-বিহার)-পুণ্ড্র-সুহ্ম-বঙ্গ-কলিঙ্গ কোমের লোকেরা, অন্ধ্র-পুণ্ড্র-শবর-পুলিন্দ-মূতিব জনেরা যে সুপ্রাচীন বাংলায় মোটামুটি একই নরগোষ্ঠীর লোক ছিলেন, এ-তথ্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঋষি এবং মহাভারতকারের অজ্ঞাত ছিল না। আগে এক অধ্যায়ে দেখিয়াছি, ইহারা বোধ হয় ছিলেন অষ্ট্রিক-ভাষী আদি-অষ্ট্রলয়েড্ নরগোষ্ঠীর লোক, মঙ্গোলীমূল-

কল্পের ভাষায় 'অসুর'। উপরোক্ত বিচিত্র উল্লেখ হইতেই দেখা যায়, সেই সুপ্রাচীন কালেই ইহারা কোমবদ্ধ হইয়াছেন এবং এক একটি জনপদকে আশ্রয় করিয়া এক একটি বৃহত্তর কৌমসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। এক কৌমসমাজের সঙ্গে অন্য কৌমসমাজের পরস্পর বিরোধ ঘটিতেছে, কখনো কখনো আবার পরস্পরের মৈত্রীবন্ধনও দেখা যাইতেছে, মহাভারতে তাহার আভাস পাওয়া যায়; ভারতযুদ্ধ গল্পের তিলমাত্র ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করিলে ইহাও মানিয়া লইতে হয় যে, মাঝে মাঝে এই সব কোম ঐক্যবদ্ধ হইয়া প্রতিবেশী জনপদরাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে মিলিত হইত এবং উভয়ের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করিত।

কৌমতন্ত্র

কৌমবদ্ধ সমাজ যখন ছিল, সেই সমাজের একটা শাসন-শৃঙ্খলাও নিশ্চয়ই ছিল। তাহা না হইলে প্রাচীনতম বাংলার যে সমৃদ্ধ বাণিজ্য বিবরণের কথা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-পুরাণ গ্রন্থাদিতে পাঠ করা যায়, এবং যাহার কয়েকটি সূত্র ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সেই সমৃদ্ধ বাণিজ্য সম্ভব হইত না। কিন্তু এই শাসনশৃঙ্খলার স্বরূপ কি ছিল বলা কঠিন। গোড়ার দিকে এই শাসন-ব্যবস্থা বোধ হয় কৌমতান্ত্রিক, কিন্তু মহাভারতে ও সিংহলী বিবরণীতে যে-যুগের কথা পাইতেছি সেই যুগে কৌমতন্ত্র রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু, প্রায় সর্বত্রই প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যে-ভাবে বহুবচনে কোমগুলির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে (যথা, পুণ্ড্রাঃ, বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ, সুহ্মাঃ ইত্যাদি) তাহাতে মনে হয়, রাজতন্ত্র সুপ্রচলিত হইবার পরও বহুদিন পর্যন্ত ঐতিহ্য ও লোকস্মৃতিতে কৌমতন্ত্রের স্মৃতি জাগরূক শুধু নয়, তাহার কিছু কিছু অভ্যাস এবং ব্যবস্থাও বোধ হয় প্রচলিত ছিল, বিশেষত শাসনকেন্দ্র হইতে দূরে গ্রাম্য লোকালয়গুলিতে। প্রাচীন বাংলায় রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত হইতে হইতে মৌর্য-আমলের খুব আগে হইয়াছিল বলিয়া যেন মনে হয় না।

৩

প্রাচীন গ্রীক্ ও লাতিন লেখকদের কৃপায় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের তৃতীয় পাদে বাংলার রাজবৃত্ত-কথা অনেকটা স্পষ্ট। এই গ্রীক ও লাতিন লেখকেরা আলেকজান্দারের ভারত-

আনুমানিক ৩৫০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ৩০০ খ্রীঃ অঃ

অভিযান সম্পর্কে এক সুবিস্তৃত সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন; সে-সাহিত্য বর্তমান ঐতিহাসিকদের নিকট সুবিদিত, সুআলোচিত। কাজেই তাহার বিস্তৃত উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এই প্রসঙ্গেই প্রথম শোনা যাইতেছে যে, বিপাশা নদীর পূর্বতীরে দুইটি পরাক্রান্ত রাষ্ট্র বিস্তৃত ছিল, একটি Prasioi বা প্রাচ্য এবং আর একটি Gangaridai (ভুল পাঠান্তরে Gandaridai) বা গঙ্গারাষ্ট্র (১)। প্রাচ্য রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল Palibothra বা পাটলিপুত্র, এবং গঙ্গারাষ্ট্রের Ganga বা গঙ্গা (-নগর)। পেরিপ্লাস-গ্রন্থ ও টলেমির বিবরণ হইতে জানা যায়, গঙ্গা-নগর সামুদ্রিক বাণিজ্যের বৃহৎ বন্দর ছিল; টলেমি আরও বলিতেছেন, এই গঙ্গা-বন্দরের

অবস্থিতি ছিল গাঙ্গেয় Kamberikhon-নদীর মোহানায়। এই Kamberikhon এবং কুমার নদী যে অভিন্ন তাহা আগেই এক অধ্যায়ে নদনদী-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।-Gangaridaiরা যে গাঙ্গেয় প্রদেশের লোক এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, কারণ গ্রীক ও লাতিন লেখকরা এ-সম্বন্ধে এক মত্। দিয়োদোরস-কার্টিয়াস্-প্লুতার্ক-সলিনাস্-প্লিনি-টলেমি-স্ট্রাবো প্রভৃতি লেখকদের প্রাসঙ্গিক মতামতের তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা করিয়া হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, গ্রীক্-লাতিন লেখক কথিত Gangaridai বা গঙ্গারাষ্ট্র গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত ও বিস্তৃত ছিল, এবং প্রাচ্যরাষ্ট্র গঙ্গা-ভাগীরথী হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমদিকে সমস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিস্তৃত ছিল। তাম্রলিপ্তি যে প্রাচ্য রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল, ইহাও তাঁহারই অনুমান। রায়চৌধুরী মহাশয়ের এই অনুমান যুক্তিসম্মত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক, এই দুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত বিদেশি লেখকরা কি বলিতেছেন তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কার্টিয়াসের বিবরণী পড়িলে মনে হয়, প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্র দুই স্বতন্ত্র রাজ্য, কিন্তু খ্রীষ্টের জন্মের চতুর্থ শতকের তৃতীয় পাদে একই রাজার অধীন এবং একই রাষ্ট্রে সংবদ্ধ। দিয়োদরসও বলিতেছেন, প্রাচ্য ও গঙ্গা একই রাষ্ট্র, একই রাজার অধীন। প্লুতার্ক এক জায়গায় বলিতেছেন, "the kings of the Gandaridai and the Prasioi"; অথচ আর এক জায়গার ইঙ্গিত যেন একটি রাজা এবং একটি রাষ্ট্রের দিকে। যাহাই হউক, এই সব উক্তি হইতে যে-অনুমান সহজেই বুদ্ধিতে স্বীকৃতি লাভ করে তাহা এই যে, প্রাচ্য ও গঙ্গা দুইটি স্বতন্ত্র জনপদ-রাষ্ট্র হিসাবেই বিদ্যমান ছিল; দুই স্বতন্ত্র নামই তাহার প্রমাণ; কিন্তু চতুর্থ শতকের তৃতীয় পাদে কিংবা তাহার আগে কোনো সময় দুই জনপদ-রাষ্ট্র এক রাজার অধীনস্থ হয়, এবং একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়, যদিও তাহার পরে খুব সম্ভব দুই জনপদের সৈন্যসামন্ত প্রভৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল। একদিকে কার্টিয়স-দিয়োদোরস এবং অন্যদিকে প্লুতার্কের সাক্ষ্য তুলনা করিয়া দেখিলে এ-অনুমান একেবার অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

গঙ্গারাষ্ট্র

এই যুক্তরাষ্ট্রের রাজা ছিলেন Agrammes বা Xandramnes—ঔগ্রসৈন্য—উগ্রসেনের পুত্র। পুরাণে যাঁহাকে বলা হইয়াছে মহাপদ্মনন্দ তাঁহাকেই বোধ হয় মহাবোধিবংশ-গ্রন্থে উগ্রসেন বলা হইয়াছে। Agrammes নীচকুলোদ্ভব নাপিতের পুত্র ছিলেন, এ-সাক্ষ্য পূর্বোক্ত লেখকেরাই দিতেছেন; হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্ব নামক জৈন গ্রন্থেও মহাপদ্মকে বলা হইয়াছে নাপিত-কুমার। পুরাণে কিন্তু মহাপদ্মনন্দকে শূদ্রোগর্ভোদ্ভব বলা হইয়াছে। মহাপদ্মকে আরও বলা হইয়াছে, "সর্বক্ষত্রান্তক নৃপঃ" এবং "একরাট্"। যিনি কাশী, মিথিলা, বীতিহোত্র, ইক্ষ্বাকু, কুরু পঞ্চাল, হৈহয় ও কলিঙ্গদের পরাভূত করিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে গঙ্গারাষ্ট্র স্বীয় প্রাচ্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা কিছু অসম্ভব নয়। যাহাই হউক, আজ এ-তথ্য সুবিদিত যে,

নন্দবংশাধিকার

ঔগ্রসৈন্যের সমবেত প্রাচ্য-গঙ্গারাষ্ট্রের সুবৃহৎ সৈন্য এবং তাঁহার প্রভূত ধনরত্ন পরিপূর্ণ রাজকোষের সংবাদ আলেকজান্দারের শিবিরে পৌঁছিয়াছিল, এবং তিনি যে বিপাশা পার হইয়া পূর্বদিকে আর অগ্রসর না হইয়া বাবিলনে ফিরিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহার মূলে অন্যান্য কারণের সঙ্গে এই সংবাদগত কারণটিও অগ্রাহ্য করিবার মতন নয়।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংশ করিয়া সুবিস্তৃত নন্দ-সাম্রাজ্য, নন্দ-সৈন্যসামন্ত এবং প্রভূত ধনরত্নপূর্ণ নন্দ-রাজকোষের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। মহাপদ্ম ও তাঁহার পুত্রদের গঙ্গারাষ্ট্রও মৌর্য-সাম্রাজ্যের করতলগত হইয়াছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। প্রাচীন জৈন এবং বৌদ্ধগ্রন্থ, মহাস্থানে প্রাপ্ত শিলাখণ্ডলিপি এবং য়ুয়ান্-চোয়াঙের সাক্ষ্য প্রামাণিক বলিয়া মানিলে স্বীকার করিতে হয়, পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা উত্তর-বঙ্গ নিঃসন্দেহে মৌর্য-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। য়ুয়ান্-চোয়াঙ তো পুণ্ড্রবর্দ্ধন ছাড়া প্রাচীন বাংলার অন্যান্য জনপদেও (যথা কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি, সমতট) মৌর্য-সম্রাট অশোক-নির্মিত বৌদ্ধস্তূপ ও বিহার দেখিয়াছিলেন বা তাহাদের বিবরণ শুনিয়াছিলেন বলিয়া বলিতেছেন। যদি তাহাই হয় তবে প্রাচীন বাংলায় মৌর্য রাষ্ট্রব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মহাস্থানের ব্রাহ্মী লিপিতে দেখিতেছি, রাজধানী পুন্দনগলে (পুণ্ড্রনগরে) একজন মহামাত্র নিযুক্ত ছিলেন, এবং স্থানীয় রাজকোষ ও রাষ্ট্রশস্যভাণ্ডার গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রায় এবং ধান্যশস্যে পরিপূর্ণ ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদের বীজ এবং খাদ্য-দানের নির্দেশ কৌটিল্য দিতেছেন; তাহার পরিবর্তে প্রজাদের দুর্গ অথবা সেতু নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত করা হইত, অথবা রাজা ইচ্ছা করিলে কোন শ্রম গ্রহণ না করিয়াও দান করিতে পারিতেন (দুর্ভিক্ষে রাজা বীজ-ভক্তোপগ্রহম্ কৃত্বানুগ্রহম্ কুর্যাৎ। দুর্গসেতুকর্ম বা ভক্তানুগ্রহেণ ভক্তসংবিভাগং বা॥ অর্থশাস্ত্র, ৪।৩।৭৮)। মহাস্থান লিপিতেও দেখিতেছি, কোনো এক অত্যায়িক কালে রাজা পুন্দনগলের মহামাত্রকে নির্দেশ দিতেছেন, প্রজাদের ধান্য এবং গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রা দিয়া সাহায্য করিবার জন্য, কিন্তু সুদিন ফিরিয়া আসিলে ধান্য ও মুদ্রা উভয়ই রাজভাণ্ডারে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দিতেছেন। বিনা শ্রমবিনিময়ে দান বা দুর্গ অথবা সেতু নির্মাণে শ্রম কোনো কিছুরই উল্লেখ এক্ষেত্রে করা হইতেছে না। লিপিকথিত অত্যায়িক যে কি জাতীয় তাহাও বলা হয় নাই।

মৌর্যাধিকার

শুঙ্গ রাজাদের আমলেও বোধ হয় বাংলাদেশ পাটলিপুত্র-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু এ-সম্বন্ধে কোনও নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ নাই। তবে শুঙ্গ শিল্পশৈলী এবং সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রচলিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে।

বাংলা দেশে কিছু কিছু নানা চিহ্নাঙ্কিত (punch-marked) মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; এই সব মুদ্রা মৌর্য ও শুঙ্গ আমলের হইলেও হইতে পারে; নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে পেরিপ্লাস-গ্রন্থে নিম্ন-গাঙ্গেয় ভূমিতে "ক্যালটিস্" নামক এক প্রকার সুবর্ণমুদ্রা প্রচলনের খবর পাওয়া যাইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের বাংলা দেশ সম্বন্ধে পেরিপ্লাস-গ্রন্থ ও টলেমির বিবরণে আরও কিছু খবর পাওয়া যাইতেছে। যে-গঙ্গারাষ্ট্রের কথা গ্রীক ও লাতিন লেখকদের রচনায় পাওয়া গিয়াছে, সেই গঙ্গারাষ্ট্র একই রূপে ও শাসন-প্রকৃতিতে এই যুগেও ছিল কিনা বলা যায় না; তবে, গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী গঙ্গাবন্দর নগর তখনও বিদ্যমান। এই গঙ্গাবন্দরে অতি সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন হইত, এবং ইহার সন্নিকটেই কোথাও সোনার খনি ছিল। গঙ্গা-বন্দরের অবস্থিতি যে কুমার-নদীর মোহনায় অর্থাৎ প্রাচীন কুমারতালক-মণ্ডলে, এই ইঙ্গিত আগেই করা হইয়াছে। ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতকের একটি লিপিতে সুবর্ণবীথির উল্লেখ ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় সুবর্ণগ্রাম, মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সোনারঙ্গ, সোনাকান্দি, বর্তমান বাংলার পশ্চিম প্রান্তে সুবর্ণরেখা নদী, ইত্যাদি সমস্তই সুবর্ণ-স্মৃতিবহ। টলেমি নিম্নমধ্য-বঙ্গে যে সোনার খনির কথা বলিতেছেন তাহা কাল্পনিক না-ও হইতে পারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে গঙ্গাবন্দর

কুষাণ-আমলের কিছু কিছু সুবর্ণ ও অন্য ধাতব মুদ্রা বাংলা দেশে পাওয়া গিয়াছে। মহাস্থানের ধ্বংসস্তূপেও কনিষ্কের (?) মূর্তি-চিহ্নিত একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাংলা দেশের কুষাণাধিপত্যের কোনও অকাট্য প্রমাণ নাই; এই সব মুদ্রা হয়তো বাণিজ্যসূত্রে এখানে আসিয়া থাকিবে। তবে, টলেমি গঙ্গার পূর্বদিকে (India Extra-Gangem) কোনো স্থানে Murandooi নামে এক কৌম-জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। এই মুরণ্ডরা পঞ্জাব অঞ্চলের সুপরিচিত মুরুণ্ডদের সঙ্গে সংপৃক্ত হইলেও হইতে পারেন। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-স্তম্ভলিপিতে কুষাণ রাজবংশ এবং শক-মুরুণ্ডদের উল্লেখ আছে। "শক-মুরুণ্ড" বলিতে কেহ বুঝেন 'শক-প্রধান', কেহ বা মনে করেন শক এবং মুরণ্ড দুইটি পৃথক কোম। টলেমির উল্লেখ হইতে মনে হয়, মুরণ্ড বা মুরুণ্ড এক স্বতন্ত্র কোম। ইহারা যদি কখনো বাংলা দেশের অধিবাসী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শক এবং কুষাণ জনগোষ্ঠী সংপৃক্ত মুরুণ্ডরা হয়তো প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে কখনো বাংলা দেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকিবেন, এবং কুষাণ মুদ্রার প্রচলন তাঁহারাই করিয়া থাকিবেন। তবে, এ-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলিবার কিছু উপায় নাই।

কুষাণ মুদ্রা

মুরণ্ড

বস্তুত, গ্রীক-লাতিন লেখকবর্গ-কথিত গঙ্গারাষ্ট্র এবং মৌর্য-আমলের পর হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টোত্তর চতুর্থ শতকের প্রারম্ভে গুপ্তরাজবংশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার রাজবৃত্ত-কাহিনী সম্বন্ধে স্বল্প তথ্যই আমরা জানি। দুই চারিটি বিচ্ছিন্ন সংবাদ ছাড়া রাজা, রাজবংশ

উগ্রসেনের সমবেত প্রাচ্য-গঙ্গারাষ্ট্রের সুবৃহৎ সৈন্য এবং তাঁহার প্রভূত ধনরত্ন পরিপূর্ণ রাজকোষের সংবাদ আলেকজান্দারের শিবিরে পৌঁছিয়াছিল, এবং তিনি যে বিপাশা পার হইয়া পূর্বদিকে আর অগ্রসর না হইয়া বাবিলনে ফিরিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহার মূলে অন্যান্য কারণের সঙ্গে এই সংবাদগত কারণটিও অগ্রাহ্য করিবার মতন নয়।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংশ করিয়া সুবিস্তৃত নন্দ-সাম্রাজ্য, নন্দ-সৈন্যসামন্ত এবং প্রভূত ধনরত্নপূর্ণ নন্দ-রাজকোষের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। মহাপদ্ম ও তাঁহার পুত্রদের গঙ্গারাষ্ট্রও মৌর্য-সাম্রাজ্যের করতলগত হইয়াছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। প্রাচীন জৈন এবং বৌদ্ধগ্রন্থ, মহাস্থানে প্রাপ্ত শিলাখণ্ডলিপি এবং য়ুয়ান্-চোয়াঙের সাক্ষ্য প্রামাণিক বলিয়া মানিলে স্বীকার করিতে হয়, পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা উত্তর-বঙ্গ নিঃসন্দেহে মৌর্য-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

মৌর্যাধিকার

য়ুয়ান্-চোয়াঙ তো পুণ্ড্রবর্দ্ধন ছাড়া প্রাচীন বাংলার অন্যান্য জনপদেও (যথা কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি, সমতট) মৌর্য-সম্রাট অশোক-নির্মিত বৌদ্ধস্তূপ ও বিহার দেখিয়াছিলেন বা তাহাদের বিবরণ শুনিয়াছিলেন বলিয়া বলিতেছেন। যদি তাহাই হয় তবে প্রাচীন বাংলায় মৌর্য রাষ্ট্রব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মহাস্থানের ব্রাহ্মী লিপিতে দেখিতেছি, রাজধানী পুন্দনগলে পুণ্ড্রনগরে) একজন মহামাত্র নিযুক্ত ছিলেন, এবং স্থানীয় রাজকোষ ও রাষ্ট্রশস্যভাণ্ডার গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রায় এবং ধান্যশস্যে পরিপূর্ণ ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদের বীজ এবং খাদ্য-দানের নির্দেশ কৌটিল্য দিতেছেন; তাহার পরিবর্তে প্রজাদের দুর্গ অথবা সেতু নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত করা হইত, অথবা রাজা ইচ্ছা করিলে কোন শ্রম গ্রহণ না করিয়াও দান করিতে পারিতেন (দুর্ভিক্ষে রাজা বীজ-ভক্তোপগ্রহম্ কৃত্বানুগ্রহম্ কুর্যাৎ। দুর্গসেতুকর্ম বা ভক্তানুগ্রহেণ ভক্তসংবিভাগং বা॥ অর্থশাস্ত্র, ৪।৩।৭৮)। মহাস্থান লিপিতেও দেখিতেছি, কোনো এক অত্যায়িক কালে রাজা পুন্দনগলের মহামাত্রকে নির্দেশ দিতেছেন, প্রজাদের ধান্য এবং গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রা দিয়া সাহায্য করিবার জন্য, কিন্তু সুদিন ফিরিয়া আসিলে ধান্য ও মুদ্রা উভয়ই রাজভাণ্ডারে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দিতেছেন। বিনা শ্রমবিনিময়ে দান বা দুর্গ অথবা সেতু নির্মাণে শ্রম কোনো কিছুরই উল্লেখ এক্ষেত্রে করা হইতেছে না। লিপিকথিত অত্যায়িক যে কি জাতীয় তাহাও বলা হয় নাই।

শুঙ্গ রাজাদের আমলেও বোধ হয় বাংলাদেশ পাটলিপুত্র-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু এ-সম্বন্ধে কোনও নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ নাই। তবে শুঙ্গ শিল্পশৈলী এবং সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রচলিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে।

বাংলা দেশে কিছু কিছু নানা চিহ্নাঙ্কিত (punch-marked) মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; এই সব মুদ্রা মৌর্য ও শুঙ্গ আমলের হইলেও হইতে পারে; নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে পেরিপ্লাস-গ্রন্থে নিম্ন-গাঙ্গেয় ভূমিতে "ক্যাল্‌টিস্‌" নামক এক প্রকার সুবর্ণমুদ্রা প্রচলনের খবর পাওয়া যাইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের বাংলা দেশ সম্বন্ধে পেরিপ্লাস-গ্রন্থ ও টলেমির বিবরণে আরও কিছু খবর পাওয়া যাইতেছে। যে-গঙ্গারাষ্ট্রের কথা গ্রীক ও লাতিন লেখকদের রচনায় পাওয়া গিয়াছে, সেই গঙ্গারাষ্ট্র একই রূপে ও শাসন-প্রকৃতিতে এই যুগেও ছিল কিনা বলা যায় না; তবে, গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী গঙ্গাবন্দর নগর তখনও বিদ্যমান। এই গঙ্গাবন্দরে অতি সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন হইত, এবং ইহার সন্নিকটেই কোথাও সোনার খনি ছিল। গঙ্গা-বন্দরের অবস্থিতি যে কুমার-নদীর মোহনায় অর্থাৎ প্রাচীন কুমারতালক-মণ্ডলে, এই ইঙ্গিত আগেই করা হইয়াছে। ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতকের একটি লিপিতে সুবর্ণবীথির উল্লেখ, ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় সুবর্ণগ্রাম, মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সোনারঙ্গ, সোনাকান্দি, বর্তমান বাংলার পশ্চিম প্রান্তে সুবর্ণরেখা নদী, ইত্যাদি সমস্তই সুবর্ণ-স্মৃতিবহ। টলেমি নিম্নমধ্য-বঙ্গে যে সোনার খনির কথা বলিতেছেন তাহা কাল্পনিক না-ও হইতে পারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে গঙ্গাবন্দর

কুষাণ-আমলের কিছু কিছু সুবর্ণ ও অন্য ধাতব মুদ্রা বাংলা দেশে পাওয়া গিয়াছে। মহাস্থানের ধ্বংসস্তূপেও কনিষ্কের (?) মূর্তি-চিহ্নিত একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাংলা দেশের কুষাণাধিপত্যের কোনও অকাট্য প্রমাণ নাই; এই সব মুদ্রা হয়তো বাণিজ্যসূত্রে এখানে আসিয়া থাকিবে। তবে, টলেমি গঙ্গার পূর্বদিকে (India Extra-Gangem) কোনো স্থানে Murandooi নামে এক কৌম-জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। এই মুরণ্ডরা পঞ্জাব অঞ্চলের সুপরিচিত মুরুণ্ডদের সঙ্গে সংপৃক্ত হইলেও হইতে পারেন। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-স্তম্ভলিপিতে কুষাণ রাজবংশ এবং শক-মুরুণ্ডদের উল্লেখ আছে। "শক-মুরুণ্ড" বলিতে কেহ বুঝেন 'শক-প্রধান', কেহ বা মনে করেন শক এবং মুরণ্ড দুইটি পৃথক কোম। টলেমির উল্লেখ হইতে মনে হয়, মুরণ্ড বা মুরুণ্ড এক স্বতন্ত্র কোম। ইহারা যদি কখনো বাংলা দেশের অধিবাসী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শক এবং কুষাণ জনগোষ্ঠী সংপৃক্ত মুরুণ্ডরা হয়তো প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে কখনো বাংলা দেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকিবেন, এবং কুষাণ মুদ্রার প্রচলন তাঁহারাই করিয়া থাকিবেন। তবে, এ-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলিবার কিছু উপায় নাই।

কুষাণ মুদ্রা

মুরণ্ড

বস্তুত, গ্রীক-লাতিন লেখকবর্গ-কথিত গঙ্গারাষ্ট্র এবং মৌর্য-আমলের পর হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টোত্তর চতুর্থ শতকের প্রারম্ভে গুপ্তরাজবংশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার রাজবৃত্ত-কাহিনী সম্বন্ধে স্বল্প তথ্যই আমরা জানি। দুই চারিটি বিচ্ছিন্ন সংবাদ ছাড়া রাজা, রাজবংশ

বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। অথচ, পেরিপ্লাস ও টলেমির বিবরণ, মিলিন্দপঞ্‌হ, জাতকের গল্প, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতেছি, এই সময়ে বাংলাদেশে সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত ব্যবসা-বাণিজ্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত; বাণিজ্যসূত্রে ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশ এবং ভারতের বাহিরে বিদেশের সঙ্গে—একদিকে মিশর ও রোম সাম্রাজ্য, অন্যদিকে পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ এবং চীন—তাহার যোগাযোগ। বৌদ্ধধর্ম প্রচারসূত্রে সিংহল ও পূর্ব-দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগেরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রাষ্ট্র ও সমাজগত শাসন শৃংখলা বর্তমান না থাকিলে এই ধরনের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, বিশেষভাবে সুসমৃদ্ধ, সুদূরপ্রসারী অন্তঃ ও বহির্বাণিজ্য কিছুতেই সম্ভব হইত না। সুবর্ণমুদ্রার প্রচলনও এই অনুমানের অন্যতম ইঙ্গিত। এই যুগের বিভিন্ন বাণিজ্যিক দ্রব্য-সম্ভারের কথা পেরিপ্লাস ও টলেমির বিবরণে সবিশেষ উল্লেখ আছে; ধনসম্বল ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে তাহা আলোচনাও করিয়াছি। সোনা, মনি-মুক্তা, বিচিত্র সূক্ষ্ম রেশম ও কার্পাস বস্ত্র, নানাপ্রকার মস্‌লা ও গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে দেশ-বিদেশে রপ্তানী হইত, এবং তাহার ফলে দেশে প্রচুর অর্থাগম হইত। তাহা ছাড়া, যুদ্ধের ও যানবাহনের একটি মস্ত বড় উপকরণ—হস্তী—প্রাচীন বাংলা ও কামরূপ হইতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যাইত, তাহার প্রমাণ তো বারবার পাওয়া যায়। দিয়দোরস ও প্লুতার্ক ঔগ্রসৈন্যের সৈন্যবাহিনীর যে বিবরণ দিতেছেন তাহার তুলনামূলক আলোচনা হইতে মনে হয়, প্রাচ্যবাহিনীতে যেমন গঙ্গারাষ্ট্রবাহিনীতেও তেমনই যথেষ্ট সংখ্যক হস্তী ছিল। মহাভারত ও অর্থশাস্ত্রের সাক্ষ্য পুনরুল্লেখ করিয়া লাভ নাই। যাহাই হউক, এই আমলে বাংলা দেশ নানা ধনরত্নে ও উৎপন্ন দ্রব্যাদিতে খুবই সমৃদ্ধ ছিল, সন্দেহ নাই; এবং এই সমৃদ্ধির আকর্ষণেই মহাপদ্মনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্তদের আমল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজবংশ একের পর এক বাংলা দেশে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলকামও হইয়াছেন। আর, বাণিজ্য-বিস্তারের চেষ্টা তো মিশর দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া চীন পর্যন্ত সকলেই করিয়াছে। মহাবোধিবংশ-গ্রন্থে মহাপদ্মের কনিষ্ঠতম পুত্রের নাম পাইতেছি ধন (নন্দ); এই ধননন্দ সম্বন্ধে সিংহলী মহাবংশ-গ্রন্থে বলা হইয়াছে, এই রাজা প্রভূত ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন নানা ন্যায় ও অন্যায় উপায়ে—ধনের পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে আশী কোটি, বোধ হয় সুবর্ণমুদ্রাই হইবে; এই ধন তিনি গঙ্গার নীচে এক সুড়ঙ্গের ভিতর লুকাইয়া রাখিতেন। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ও এ-বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন; কথাসরিৎসাগরের এক গল্পেও আছে যে, নন্দরাজের ধনের পরিমাণ ছিল নিরানব্বই কোটি সুবর্ণখণ্ড (মুদ্রা ?)। নন্দদের এই বিপুল অর্থ ও সম্পদের কতকটা অংশ যে গঙ্গারাষ্ট্র হইতে সংগৃহীত এ-সম্বন্ধে তো কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। মৌর্যরাও নিশ্চয়ই এই বিপুল ধনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন; বিশেষত কৌটিল্য অর্থনৈতিক

সামাজিক ইঙ্গিত

আর্থিক ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি

শাসন-ব্যবস্থার যে-ইঙ্গিত দিতেছেন তাহাতে তো রাজকোষে প্রচুর অর্থাগম হওয়ার কথা। এ-বিষয়ে কিছু পরোক্ষ প্রমাণও মহাস্থান শিলাখণ্ডলিপি, সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন ইত্যাদি সাক্ষ্যে পাওয়া যাইতেছে।

মধ্য ও উত্তর-ভারত হইতে যে-সব রাজবংশ, যে-সব বণিক ও ব্যবসায়ী যুদ্ধ, রাষ্ট্রকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বাংলাদেশে আসিয়াছেন, তাঁহারাই সঙ্গে সঙ্গে মধ্য ও উত্তর-ভারতের আর্য-ভাষা, আর্য-ধর্ম এবং আর্য-সংস্কৃতিও বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারাই পথ ও ক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন এবং সেই পথ বাহিয়া সেই সব ক্ষেত্রে আসিয়া আর্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন আর্য ধর্ম ও শিক্ষার প্রচারকেরা। প্রথমে জৈন-ধর্ম ও সংস্কৃতি, পরে বৌদ্ধ-ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং আরও পরে, বিশেষ ভাবে গুপ্ত আমলে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্রমশ বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছে। যে-আমলের কথা বলিতেছি, সেই আমলে বিশেষ ভাবে আসিয়াছে জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব, এবং দুই ধর্মকে আশ্রয় করিয়া আর্য ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি।

আর্যীকরণ ও পরাভবের হেতু

বাধা ও বিরোধ গড়িয়া তোলা সত্ত্বেও সমসাময়িক বাংলার প্রাচীন কোমগুলি এই প্রভাব ঠেকাইতে পারে নাই। রাষ্ট্রক্ষেত্রে পরাভব স্বীকারের প্রধান সামাজিক কারণ, এই সব প্রাচীন কোমগুলি তাহাদের কৌম-সামাজিক মন পরিত্যাগ করিয়া কৌম-সীমা অতিক্রম করিয়া রাজতন্ত্রের বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিধির মধ্যে স্থায়ীভাবে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে নাই; নিজ নিজ কৌম স্বার্থবুদ্ধিই বোধ হয় এই পরাভবের কারণ। রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাহিরের বিজেতা রাষ্ট্রগুলির উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উন্নততর শস্ত্র ও যুদ্ধপ্রণালী নিঃসন্দেহে যেমন পরাভবের অন্যতম কারণ, তেমনই উহাদের উন্নততর সামাজিক ব্যবস্থাও ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরাভবের হেতু, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ স্বল্প। আর, অর্থ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পরাভব ঘটিলে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অল্প বিস্তর পরাভব ঘটা যে অনিবার্য তাহা তো আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে বারবারই দেখা গিয়াছে, এমন কি সুপ্রাচীন সংস্কৃতি-সম্পন্ন চীন ও ভারতবর্ষের মতন দেশেও।

৪

বাংলায় গুপ্তাধিপত্য আঃ ৩০০—৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ

খ্রীষ্টোত্তর তৃতীয় শতকের শেষ বা চতুর্থ শতকের সূচনা হইতেই প্রাচীন বাংলা দেশ যে নিঃসংশয়ে কৌম সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। কৌমতন্ত্র আর নাই, রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; রাষ্ট্রীয় চেতনার সঞ্চার হইয়াছে; বাহির হইতে আক্রমণের প্রতিরোধ সংঘবদ্ধ হইয়াছে; জনপদগুলির কৌম-নাম জনপদ-নামে বিবর্তিত

হইতে আরম্ভ করিয়াছে ; পুষ্করণ, সমতট প্রভৃতি নূতন রাজ্যের নাম শুনা যাইতেছে, যদিও বঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্যও বিদ্যমান।

দিল্লীর কুত্‌ব্‌-মিনারের কাছে মেহেরৌলি-লৌহস্তম্ভের লিপিতে চন্দ্র নামক এক রাজা বঙ্গজনপদ সমূহে (বঙ্গেষু) তাঁহার শত্রু-নিধনের গৌরব দাবী করিতেছেন ; "বঙ্গেষু" অর্থে বঙ্গ ও তৎসংলগ্ন জনপদগুলি বুঝাইতে পারে, আবার বঙ্গের অন্তর্গত বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর জনপদখণ্ডও বুঝাইতে পারে। যে-অর্থেই হউক, মেহেরৌলি-লিপিতে একথাও বলা হইয়াছে যে, বঙ্গীয়েরা একত্র সংঘবদ্ধ হইয়া রাজা চন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করিয়াছিল।

বঙ্গজনসমূহ

এই চন্দ্র কে, তাহা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিচিত্র মত্‌ আছে। কাহারও মতে ইনি গুপ্তসম্রাট্ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, কাহারও মতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ; কেহ কেহ আবার মনে করেন ইনি সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ লিপির চন্দ্রবর্মা, যে-চন্দ্রবর্মা ছিলেন সিংহবর্মার পুত্র এবং পুষ্করণের অধিপতি (শুশুনিয়া লিপি)। অথবা, এমনও হইতে পারে, তিনি একেবারে স্বতন্ত্র নরপতি ছিলেন। ইনি যিনিই হউন, এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, বঙ্গজনেরা চন্দ্রের আক্রমণ পর্যন্ত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ; এবং চন্দ্রের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ রচনা করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁহারা পরাভূত হইয়াছিলেন।

বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের একটি লিপিতে সিংহবর্মাপুত্র পুষ্করণাধিপ চন্দ্রবর্মা নামক এক রাজার খবর পাওয়া যাইতেছে। শুশুনিয়া পাহাড়ের প্রায় ২৫ মাইল উত্তর-পূর্ব

পুষ্করণ

দিকে বর্তমান পোখর্ণা গ্রাম প্রাচীন পুষ্করণের স্মৃতি আজও বহন করিতেছে বলিয়া মনে হয়। এই পুষ্করণাধিপই বোধ হয় সমসাময়িক রাঢ়ের অধিপতি। কেহ কেহ মনে করেন, ইনিই এলাহাবাদ-লিপিকথিত এবং গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত চন্দ্রবর্মা।

সমুদ্রগুপ্ত পুষ্করণাধিপ চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন কিনা এ-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তিনি যে সমতট ছাড়া প্রাচীন বাংলার আর প্রায় সকল জনপদই গুপ্ত-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের পূর্বতম প্রত্যন্ত রাজ্য ছিল নেপাল, কর্তৃপুর, কামরূপ, ডবাক এবং সমতট। সমতট নিঃসন্দেহে দক্ষিণ ও পূর্ব-বঙ্গের

সমতট ; ডবাক

কিয়দংশ, ত্রিপুরা অঞ্চল যাহার কেন্দ্র। কিন্তু, প্রত্যন্ত রাজ্য হইলেও সমতটের রাজা সমুদ্রগুপ্তের আদেশ পালন করিতেন এবং তাঁহাকে যথোচিত সম্মান ও করোপহার দান করিতেন। সমুদ্রগুপ্তই বাংলায় প্রথম গুপ্তাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন নাই। সে-অধিকার বোধ হয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তেরও আগে কোনও রাজা প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। চীন পরিব্রাজক ই-ৎসিঙ্‌ বলিতেছেন, মহারাজ শ্রীগুপ্ত নামে একজন নরপতি চীন দেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য গঙ্গার তীর ধরিয়া নালন্দা হইতে চল্লিশ যোজন পূর্বে মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো নামে একটি ধর্মস্থান নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য চব্বিশটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। মহারাজ শ্রীগুপ্ত এবং

সমুদ্রগুপ্তের প্রপিতামহ মহারাজ গুপ্ত (আনুমানিক তৃতীয় শতকের তৃতীয় বা চতুর্থ পাদ) বোধ হয় একই ব্যক্তি ; এবং ই-ৎসিঙ্-কথিত মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো এবং বরেন্দ্রভূমির মৃগস্থাপন স্তূপ (মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো = মৃগস্থাপন) একই ধর্মস্থান। এ-তথ্য যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, বরেন্দ্রভূমি তৃতীয় শতকের তৃতীয়-চতুর্থ পাদেই গুপ্তাধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল। কিছু পরবর্তীকালে বাংলাদেশে পুণ্ড্রবর্দ্ধন যে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেখানকার উপরিক বা উপরিক মহারাজ যে সম্রাট নিজে নিয়োগ করিতেন—কখনো কখনো রাজকুমারদের একজনই নিযুক্ত হইতেন—তাহার ইঙ্গিত একেবারে অকারণ না-ও হইতে পারে। মেহেরৌলি-লিপির চন্দ্র যদি প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি বঙ্গজনদের জয় করিয়াছিলেন, এ-তথ্য স্বীকার করা চলে। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত পুষ্করণাধিপ চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করিয়া রাঢ়দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, এ-তথ্যের সম্ভাবনাও অস্বীকার করা যায় না। এলাহাবাদ-লিপির সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সমতট ছাড়া বাংলা দেশের আর সকল অংশই সমুদ্রগুপ্তের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রানুগত্য স্বীকার করিয়াছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের আমল হইতে একেবারে প্রায় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার গুপ্ত-রাজত্বের প্রধানতম কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্দ্ধন। ৫০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোনো সময়ে সমতটেও গুপ্তাধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল, এ-সম্বন্ধে লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান; এই সময়ে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত নামে একজন গুপ্তান্ত্য নামীয় রাজা ত্রিপুরা জেলায় কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। সম্ভবত বৈন্যগুপ্ত গুপ্তরাষ্ট্রেরই সামন্তরাজরূপে পূর্ববাংলায় রাজত্ব করিতেছিলেন, পরে গুপ্তরাষ্ট্রের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দ্বাদশাদিত্য এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি লইয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র নরপতিরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, নিঃসংশয় ঐতিহাসিক তথ্য এই যে, ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এবং সম্ভবত একেবারে শেষ পর্যন্ত বাংলা দেশ গুপ্তাধিকারভুক্ত ছিল, এবং এই রাজ্যখণ্ডের প্রধান কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তি। এই রাষ্ট্রবিভাগ এত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য হইত যে, সম্রাট স্বয়ং ইহার শাসনকর্তা—উপরিক বা উপরিক-মহারাজ—নিযুক্ত করিতেন, কখনো কখনো স্বয়ং বিষয়পতিও নিযুক্ত করিতেন। সময়ে সময়ে উপরিক-মহারাজ হইতেন একেবারে রাজকুমারদেরই একজন।

গুপ্তাধিকারের কেন্দ্র

গুপ্তাধিকারে বাংলাদেশে সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন প্রায় সর্বব্যাপী বলিলেই চলে। সুবর্ণমুদ্রা ছিল দিনার এবং রৌপ্য মুদ্রা রূপক। সাধারণ গৃহস্থরাও ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ে সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করিতেছেন, প্রত্যেকটি লিপির সাক্ষ্য তাহাই। প্রাচীন বাংলার সর্বোত্তম বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিও এই যুগেই। রক্তমৃত্তিকা (মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি)-বাসী বণিক বুধগুপ্ত এই সময়েরই লোক; তিনি মালয় অঞ্চলে গিয়াছিলেন

ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যপদেশে। সোমদেবের কথাসরিৎসাগর, বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষা, হাজারিবাগ জেলার দুধপানি পাহাড়ের লিপি, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র প্রভৃতির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সাক্ষ্য এই যুগেরই আন্তর্দেশি ও বহির্দেশি বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত করে। নিকষোত্তীর্ণ, সুমুদ্রিত এবং যথানির্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণমুদ্রার বহুল প্রচলনও দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির দ্যোতক। মনে হয়, নিয়মিত এবং সুসংবদ্ধ প্রণালীগত রাষ্ট্র শাসন-ব্যবস্থার ফলে দেশের অর্থগত ও সমাজগত-ব্যবস্থার, তথা বাণিজ্য-ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল, এবং তাহারই ফলে দেশের এই সমৃদ্ধি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, কিন্তু পরোক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান। এই যুগের প্রায় প্রত্যেকটি লিপিতেই দেখিতেছি, স্থানীয় রাষ্ট্রাধিকরণ (বিষয়াধিকরণ) যে পাঁচটি লোক লইয়া গঠিত তাহার মধ্যে দুইজন বোধ হয় রাজপুরুষ, বাকী তিনজনই শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধি—নগরশ্রেষ্ঠি, প্রথম সার্থবাহ এবং প্রথম কুলিক। ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ছিল বলিয়াই রাষ্ট্রে এই সব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্বীকৃতও হইয়াছিল; অথবা এমনও হইতে পারে, এই সমৃদ্ধির পশ্চাতে রাষ্ট্রের সজ্ঞান একটা চেষ্টা ছিল এবং সে-চেষ্টারই কতকটা রূপ আমরা দেখিতেছি এই রাষ্ট্রাধিকরণগুলিতে। বঙ্গের বাহিরে অন্য রাষ্ট্র-বিভাগের সাক্ষ্য যদি পুণ্ড্রবর্দ্ধনের পক্ষেও প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ ও কুলিক প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই নিজ নিজ নিগম বা সংঘ ছিল, নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা ও বিস্তারের জন্য; এবং প্রত্যেক নিগম বা সংঘের যিনি প্রধান সভাপতি ছিলেন তিনিই স্থানীয় রাষ্ট্রাধিকরণের সভ্য হইতেন, ইহা অসঙ্গত অনুমান নয়। রাষ্ট্রে বণিক, শ্রেষ্ঠী ও ব্যবসায়ী সমাজের এই আধিপত্য, দেশিয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি, স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন, বাৎস্যায়ন-বর্ণিত নাগর-জীবনের বিলাস-লীলা, এই সমস্তই সওদাগরী ধনতন্ত্রের দিকে নিঃসংশয় ইঙ্গিত দান করে। এই যুগের বাংলার সামাজিক ধন শ্রেষ্ঠী-বণিক-ব্যবসায়ী সমাজের আয়ত্তে, এবং সেই ধনেই রাষ্ট্র পুষ্ট; সামাজিক ধন উৎপাদন ও বণ্টনের সাধারণ নিয়মে রাষ্ট্র যেমন ইহাদের পোষক ও সমর্থক, ইহারাও তেমনই রাষ্ট্রের প্রধান ধারক ও সমর্থক। শুধু ভূমি ক্রয়-বিক্রয়-দানের ব্যাপারে নয়, স্থানীয় সকল ব্যাপারে এই সমাজই অন্যতম কর্তা, এমন কি লিপিপ্রমাণ দেখিলে মনে হয়, রাজপুরুষকেও বোধ হয় ইহাদের নির্দেশ মান্য করিয়া চলিতে হইত। এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণ ও তথ্য রাষ্ট্রবিন্যাস অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচিত হইয়াছে; এখানে রাজবৃত্তের আবর্তন-বিবর্তন প্রসঙ্গে সেই ইঙ্গিত গুলির উল্লেখ রাখিয়া যাইতেছি মাত্র। লক্ষ্যণীয় এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষি-সমাজের কোনো স্থান রাষ্ট্রে প্রায় নাই বলিলেই চলে। কৃষি ও সাধারণ গৃহস্থ-সমাজ তো নিশ্চয়ই ছিল; ভূমির মাপ-জোখ, পট্টোলী-রেজেষ্ট্রির সাক্ষী ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁহারা স্থানীয় অধিকরণের সাহায্যও করিতেছেন, কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রে তাঁহাদের প্রাধান্য তো

সামাজিক ইঙ্গিত

শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি

সওদাগরী ধনতন্ত্র

নাই-ই, স্থানও নাই। এই যুগের দুইটি মাত্র লিপিতে (ধনাইদহ লিপি, ৪৩২-৩৩ এবং ৩নং দামোদরপুর লিপি, ৪৮২-৮৩) ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে রাজপ্রতিনিধির (আয়ুক্তক) সঙ্গে রাজকার্য নির্বাহ যাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে বিত্তবান ব্যবসায়ী-সমাজের প্রতিনিধিদের কাহাকেও দেখিতেছিনা, পরিবর্তে দেখিতেছি স্থানীয় মহত্তর (প্রধান প্রধান লোক), গ্রামিক (গ্রাম-প্রধান), কুটুম্বিক (সাধারণ গৃহস্থ) এবং অষ্টকুলাধিকরণদের। ধনাইদহ পট্টোলী-উল্লিখিত ভূমি খাদা(খাটা ?)পার-বিষয়ের অন্তর্গত; দামোদরপুর পট্টোলীর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল পলাশবৃন্দকের অধিকরণ হইতে। মনে হয়, এই দুইটি স্থানীয় অধিকরণ-শাসিত জনপদখণ্ডে শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রসিদ্ধি ছিলনা, এবং শ্রেষ্ঠী-বণিক-ব্যবসায়ী-শিল্পীকুলের কোনও নিগম বা সংঘ ছিলনা; বস্তুত, এই সব অধিকরণ গ্রামাধিকরণ। তবে, স্থানীয় সমাজ একান্তভাবে কৃষিসমাজ না-ও হইতে পারে, কারণ মহত্তর, গ্রামিক, কুটুম্বিরা সকলেই যে কিছু সম্পূর্ণ কৃষিনির্ভর ছিলেন, এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। মধ্যবিত্ত সমাজ তো একটা ছিলই; সেই সমাজের লোকেরা ভূমিলব্ধ আয়নির্ভর যেমন ছিলেন, তেমনই কিছুটা পরিমাণে শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়নির্ভরও বোধ হয় ছিলেন।

যে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যনির্ভর সমাজের কথা এই মাত্র বলিয়াছি স্বভাবতই তাহার কেন্দ্র ছিল নগরগুলিতে। এই নাগর-সমাজের জীবন-প্রণালীর কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে। বাৎস্যায়ন আনুমানিক তৃতীয়-চতুর্থ শতকের লোক, কাজেই আলোচ্য যুগের সমসাময়িক। গ্রাম ও নগর-বিন্যাস অধ্যায়ে প্রাচীন বাংলার নাগরজীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে; এখানে এ-কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, সওদাগরী ধনতন্ত্রে পুষ্ট নগর-সমাজে যে অবসর ও বিলাসলীলা, যে কামচাতুর্যলীলা রাজান্তঃপুরে এবং ধনী সমাজের গৃহান্তঃপুরে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়, ভারতবর্ষেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তবে, বাংলাদেশ চিরকালই উত্তর-ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রত্যন্তদেশে অবস্থিত বলিয়া, এবং এখানে আর্যপূর্ব গ্রাম্য সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব বহুদিন সক্রিয় ছিল বলিয়া এদেশে নগর ও নাগর-সমাজ কোনোদিনই খুব একান্ত ও সমাদৃত হইয়া উঠিতে পারে নাই। তবু সামাজিক আবর্তন-বিবর্তনের নিয়ম এবং উত্তর-ভারতের স্পর্শ এড়াইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। নাগরকদের বিলাস-অবসরময় দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন যাহা বলিয়াছেন তাহা কতকাংশে বাংলাদেশের প্রতিও প্রযোজ্য। একাধিক জায়গায় তিনি প্রাচীন বাংলার (গৌড়ের) পুরুষদের সৌন্দর্যবোধ ও চর্চার উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহারা যে লম্বা লম্বা নখ রাখিয়া আঙুলের সৌন্দর্যচর্চা করিতেন তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। বঙ্গ ও গৌড়ের রাজান্তঃপুরে নানাপ্রকার কামচাতুর্যলীলা অভিনীত হইত, একথাও তিনি বলিতেছেন।

অবসরপুষ্ট নাগর সমাজ

আগেকার রাষ্ট্রপর্বে দেখিয়াছি বাংলায় জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রসার, এবং এই দুই ধর্মকে আশ্রয় করিয়া আর্যভাষা ও সংস্কৃতির বিস্তার। এই যুগেও এই দুই ধর্মের বিস্তার

অব্যাহত, এবং রাষ্ট্র ও রাজবংশের সমর্থন ও পোষকতা ইহাদের পশ্চাতে বিদ্যমান। অশ্বমেধ-যাজী ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও গুপ্ত-সম্রাটেরা এই দুই ধর্মের, বিশেষত বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। নালন্দা-মহাবিহারের গোড়াপত্তন তো তাঁহাদের পোষকতায়ই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; অন্তত য়ুয়ান-চোয়াঙের সাক্ষ্য তাহাই। সারনাথ-বিহারের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি-সাধনার পিছনেও তাঁহাদের পোষকতা সক্রিয় ছিল, এ-সম্বন্ধেও সন্দেহ করিবার কিছু নাই। বাংলাদেশেও অনুরূপ সাক্ষ্য বিদ্যমান। ই-ৎসিঙের মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো যদি ফুসে' (Foucher)-কথিত বরেন্দ্রদেশান্তর্গত মৃগস্থাপন স্তূপ হইয়া থাকে তাহা হইলে মহারাজা শ্রীগুপ্ত বৌদ্ধধর্মের একজন পোষক ছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। পাহাড়পুর পট্টোলীর (৪৭৮-৭৯) সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, জৈনধর্ম ও সংঘও গুপ্তরাজাদের সমর্থন লাভ করিয়াছিল। মহারাজ বৈন্যগুপ্ত ছিলেন মহাদেবের ভক্ত অর্থাৎ শৈব; তিনি তাঁহার সামন্ত মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে ত্রিপুরা জেলার গুণাইঘর (গুণিকাগ্রহার) গ্রামে কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন, মহাযানাচার্য শান্তিদেব প্রতিষ্ঠিত মহাযানিক অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘের আশ্রম-বিহারের সেবার জন্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মর্তব্য যে, গুপ্তরাজবংশ ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী, এবং ইহাদের রাজত্বকালেই ভারতবর্ষে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম—এখন আমরা যাহাকে বলি হিন্দুধর্ম, তাহার অভ্যুত্থান ও প্রসারলাভ ঘটে। মৎস্য, বায়ু, বিষ্ণু প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুরাণগুলি এই যুগেই রচিত হয়, এবং পৌরাণিক দেবদেবীরা এই সময় পূজা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ করেন। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজকীয় ঔদার্য ও পোষকতা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা এই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সবিশেষ পোষক ও ধারক হইবেন, এবং এই ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারে সচেষ্ট হইবেন, ইহাই তো স্বাভাবিক। বাংলাদেশের সমসাময়িক লিপিগুলির সাক্ষ্যও তাহাই। অধিকাংশ লিপিতেই ব্রাহ্মণদের সাক্ষাৎ তো পাইই, ভূমিদান তো তাঁহারাই লাভ করিতেছেন, ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণের উল্লেখও একটি লিপিতে আছে (ধনাইদহ লিপি); কিন্তু তাহার চেয়েও লক্ষণীয়, বিবিধ ব্রাহ্মণ্য যাগযজ্ঞ এবং পৌরাণিক দেবদেবী পূজার প্রচলন, ব্রাহ্মণদের জন্য নূতন নূতন বসতি স্থাপন, ইত্যাদি। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, চক্রস্বামী (বিষ্ণু), কোকামুখস্বামী, শ্বেতবরাহস্বামী, নামলিঙ্গ, গোবিন্দস্বামী, অনন্তনারায়ণ মহাদেব, প্রদ্যুম্নেশ্বর প্রভৃতি দেবতার পূজা, বলি-চরু-সত্র প্রবর্তন, গব্য-ধূপ-পুষ্প-মধুপর্ক-দীপ ইত্যাদি পূজোপকরণ প্রভৃতির সাক্ষাৎ বাংলাদেশে এই প্রথম পাওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি সমাজের অন্তত একটা অংশের—এবং এই অংশই সমাজের প্রতিষ্ঠাবান্ অংশ—সবিশেষ শ্রদ্ধা ও পোষকতা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। এই যুগে ইহারা যে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের আদর্শ বলবত্তর হইতেছে তাহার সবিশেষ প্রমাণ পাই যখন দেখি সাধারণ গৃহস্থ ব্যক্তিরাও নূতন নূতন ব্রাহ্মণ বসতি করাইবার জন্য ভূমি ক্রয় করিতেছেন এবং তাহা ব্রাহ্মণদের দান

পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি

করিতেছেন। ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করিবার যে-রীতি পরবর্তীকালে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত হইয়াছে তাহার সূত্রপাতও দেখি এই সময় হইতে। অব্যবহিত পরবর্তী যুগে যে এই অভ্যাস আরও বাড়িয়াই গিয়াছে, তাহার প্রমাণ ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতকের প্রত্যেকটি লিপিতেই পাওয়া যাইবে। লোকনাথের ত্রিপুরা-পট্টোলীতে দেখিতেছি, রাজা লোকনাথের মহাসামন্ত ব্রাহ্মণ প্রদোষশর্মা সুব্বুঙ্গ বিষয়ের অরণ্যময় জমিতে অনন্ত-নারায়ণের এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং তাহারই সন্নিকটে চতুর্বেদবিদ্যাবিশারদ (চাতুর্বিদ্য) দ্বিশতাধিক ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই যে সবিশেষ পোষকতা ইহার রাষ্ট্রীয় ইঙ্গিত লক্ষ্যণীয়; এই পোষকতার ফলেই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ রাষ্ট্রের অন্যতম ধারক ও পোষক শ্রেণীরূপে গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে, এবং তাঁহারাই ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক আদর্শ নির্দেশের নিয়ামক হইয়া উঠেন। উত্তর-ভারতে এই শ্রেণী ও শ্রেণীগত সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন আগেই দেখা দিয়াছিল। গুপ্তাধিপত্যক আশ্রয় করিয়া বাংলাদেশে সেই বিবর্তন এই যুগেই, অর্থাৎ চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে সর্বপ্রথম দেখা দিল; এবং ইহাদের অবলম্বন করিয়াই আর্য ভাষা, আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত সবেগে বাংলাদেশে প্রবাহিত হইল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকথা, বিচিত্র লৌকিক গল্প-কাহিনী ইত্যাদি সমস্তই সেই স্রোতের মুখে এদেশে আসিয়া পড়িয়া এদেশের প্রাচীনতর ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, লোককাহিনী সমস্ত কিছুকে সবেগে সমাজের একপ্রান্তে অথবা নিম্নস্তরে ঠেলিয়া নামাইয়া দিল। উচ্চতর শ্রেণীগুলির ভাষা হইল আর্যভাষা; ধর্ম হইল বৌদ্ধ, জৈন বা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম; সাংস্কৃতিক আদর্শ গড়িয়া উঠিল আর্যাদর্শানুযায়ী। প্রত্যন্তস্থিত বাংলাদেশ এই যুগে উত্তর-ভারতের বৃহত্তর রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে যুক্ত হইয়া গেল; এবং তাহা সম্ভব হইল বাংলাদেশ গুপ্ত-রাজবংশের প্রায় সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের অংশ হওয়ার ফলে, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আদান-প্রদানের ফলে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসারের ফলে।

৫

যুগান্তর ও বঙ্গ-গৌড়ের স্বাতন্ত্র্য
আঃ ৫০০—৬৫০

খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম শতকে দুর্দ্ধর্ষ হূণেরা ভারতবর্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং গুপ্ত-সাম্রাজ্যের বুকের উপর বসিয়া তাহার ভিত্তি একেবারে ঝাঁকিয়া নাড়িয়া দুর্বল করিয়া দিল। প্রায় এই সময়ই বা তাহার কিছু আগে এই হূণদেরই আর এক শাখা য়ুরোপের বুকের উপর পড়িয়া পূর্ব ও মধ্য-য়ুরোপের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় গুপ্ত-সাম্রাজ্যের দুর্বলতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল; পূর্বতম প্রত্যন্তে সামন্ত নরপতি মহারাজ বৈন্যগুপ্ত স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া মহারাজাধিরাজ হইয়া উঠিলেন। মধ্য-ভারতে মান্দাসোর অঞ্চলের

বংশগোত্র পরিচয়-বিহীন যশোধর্মন নামে জনৈক দিগ্বিজয়ী বীর প্রবল প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়া শিথিলমূল গুপ্তসাম্রাজ্যসৌধটিকে প্রায় ধরাশায়ী করিয়া দিলেন। যশোধর্মন লৌহিত্যতীর পর্যন্ত তাঁহার অপরাভূত সৈন্যবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইয়া ছিলেন, এবং সম্ভবত বাংলাদেশ আর একবার বৈতসীবৃত্তি আশ্রয় করিয়া এই অপরাজেয় যোদ্ধার কাছে মস্তক অবনত করিয়াছিল। তিনি দুর্দ্ধর্ষ হূনদেরও পরাজিত করিয়া তাঁহাদের নেতা মিহিরকুলকে তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন কাশ্মীরে। কিন্তু যশোধর্মনের দিগ্বিজয় ক্ষণস্থায়ী, এবং তিনি কোনো রাজবংশ বা স্থায়ী রাজ্য বা রাজত্ব গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। সুযোগ পাইয়া উত্তর-ভারতের বড় বড় সামন্তেরা স্বাতন্ত্র্য ঘোষনা করিয়া নূতন নূতন রাজ্য ও রাজবংশ গড়িয়া তুলিলেন; কনৌজ-কোশলে মৌখরী রাজবংশ এবং স্থানীশ্বরে পুষ্যভূতি বংশ মস্তক উত্তোলন করিল। গুপ্ত-রাজবংশের দুর্বল বংশধর ও প্রতিনিধিরা মগধ-মালবকে কেন্দ্র করিয়া কোনো প্রকারে একদা-প্রদীপ্ত সূর্যের স্মৃতি একটি ক্ষুদ্র দীপ শিখায় জিয়াইয়া রাখিলেন। বাংলা দেশও এই সুযোগ গ্রহণে অবহেলা করিল না। সর্বাগ্রে স্বাতন্ত্র্য ঘোষনা করিল পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গ এবং পশ্চিম-বঙ্গের বর্দ্ধমান অঞ্চল। ৫০৭-৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা অঞ্চল অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গ বৈন্যগুপ্তের অধীন ছিল; বর্দ্ধমান অঞ্চল তখন বৈন্যগুপ্তের সামন্ত বিজয়সেনের শাসনাধীনে। অনুমান হয়, বর্দ্ধমান অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিপুরা পর্যন্ত বৈন্যগুপ্তের রাজ্য বিস্তৃত ছিল; এই অঞ্চলই ষষ্ঠ শতকের প্রথম অথবা দ্বিতীয় পাদে, ৫০৭-৮'র কিছু পরে, স্বাতন্ত্র্য ঘোষনা করিয়া বসিল। এই শতকেরই শেষপাদে কোনো সময়ে স্বাতন্ত্র্য ঘোষনা করিল গৌড়। গৌড় ও বঙ্গের স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাসই ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ হইতে সপ্তম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস; এবং এই ইতিহাস একদিকে ধর্মাদিত্য-গোপচন্দ্র-সমাচারদেবের রাজবংশ এবং অন্যদিকে শশাঙ্ককে আশ্রয় করিয়া কেন্দ্রীকৃত।

ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত পাঁচটি এবং বর্দ্ধমান অঞ্চলে আবিষ্কৃত একটি, এই ছয়টি পট্টোলীতে তিনটি মহারাজাধিরাজের খবর পাওয়া যাইতেছে: গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং নরেন্দ্রাদিত্য সমাচারদেব। ইহাদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের কি সম্পর্ক তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই, তবে তিনজনে মিলিয়া অন্যূন ৭৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এই রাজত্বের কাল মোটামুটি ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ হইতে তৃতীয় পাদ পর্যন্ত। লিপি-প্রমাণ হইতে মনে হয়, গোপচন্দ্রই ইহাদের প্রথমতম এবং প্রধানতম, এবং ইহাদের রাজ্য বর্দ্ধমান অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—কেন্দ্রস্থল ছিল বোধ হয় ফরিদপুর অথবা ত্রিপুরা অঞ্চলে। রাজ্যের ছিল দুইটি বিভাগ, একটি বর্দ্ধমানভুক্তি, অপরটি নব্যাবকাশিকা (নূতন অবকাশ বা নবসৃষ্ট ভূমি—ফরিদপুরের কোটালিপাড়া অঞ্চল?)। বর্দ্ধমান অঞ্চলের যে-বিজয়সেন একদা ছিলেন মহারাজ বৈন্যগুপ্তের সামন্ত তিনি এখন

বঙ্গ
গোপচন্দ্রের বংশ

সামন্ত হইলেন গোপচন্দ্রের। আবিষ্কৃত সুবর্ণমুদ্রা হইতে মনে হয়, সমাচারদেবের পরও আরও কয়েকজন রাজা এই সব অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে একজনের নাম পৃথুজবীর (মতান্তরে, পৃথুবীর অথবা পৃথুবীরজ) ও আর একজনের নাম সুধন্যা (বা শ্রীসুধন্যাদিত্য)। বাতাপী বা বাদামীর চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মা ৫৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দের আগে কোনো সময় একবার বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহার এই আক্রমণের ফলে, অথবা গৌড়ে শশাঙ্কের অভ্যুদয় ও রাজ্য-বিস্তারের ফলে, অথবা দুয়েরই সম্মিলিত ফলে বঙ্গের স্বাতন্ত্র্য কিছুদিনের জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিবে।

সপ্তম শতকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে সমতটে একটি বৌদ্ধ রাজবংশের খবর পাওয়া যাইতেছে আস্রফপুরের দুইটি লিপিতে এবং চীন পরিব্রাজক ই-ৎসিঙ্ ও সেং-চি'র বিবরণীতে। আস্রফপুরের লিপি দুইটিতে নৃপাধিরাজ খড়্গোদ্যম, (পুত্র) জাতখড়্গ, (পুত্র) দেবখড়্গ এবং (পুত্র) রাজরাজ (ভট্ট) নামে চারজন রাজার খবর পাওয়া যাইতেছে। এই বংশ ইতিহাসে খড়্গ বংশ নামে খ্যাত। ত্রিপুরা জেলার দেউলবাড়ীতে প্রাপ্ত সর্বাণী দেবীর (দুর্গা) একটি মূর্তির পাদপীঠে দেবখড়্গের স্ত্রী এবং রাজরাজভট্টের মাতা প্রভাবতীর নাম উৎকীর্ণ আছে। সেং-চি রাজভট নামে সমতটের এক বৌদ্ধ রাজার নাম করিয়াছেন, এবং ই-ৎসিঙ্ ও দেববর্মা নামে পূর্বদেশের এক রাজার খবর দিতেছেন। দেববর্মা ও দেবখড়্গ এক ব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন, না-ও হইতে পারেন; কিন্তু সেং-চি কথিত রাজভট যে আস্রফপুর পট্টোলীর রাজরাজভট্ট, এ-তথ্য নিঃসংশয় বলিলেই চলে। যাহা হউক, এই বংশের অন্তত একটি জয়স্কন্ধাবার ছিল কর্মান্ত-বাসক (বোধ হয়, ত্রিপুরা জেলার বর্তমান বড়কাম্‌তা)। আস্রফপুর ঢাকার ত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে। অনুমান হয়, অন্তত বর্তমান ঢাকা ও ত্রিপুরা অঞ্চল এই বংশের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। যাহাই হউক, খড়্গ এই উপান্ত নাম দেশজ বলিয়া মনে হয় না। খড়্গ বংশের রাজারা কোনো পার্বত্য কোমের প্রতিনিধি হইলেও হইতে পারেন। খড়্গ বংশ বোধ হয় স্বাধীন রাজবংশ ছিল না। রাজরাজভট্টের আস্রফপুর-লিপিতে একখণ্ড ভূমির উল্লেখ আছে, এই ভূমি খণ্ড ইতিপূর্বেই জনৈক "বৃহৎ-পরমেশ্বর" কর্তৃক দান করা হইয়াছিল। এই "বৃহৎ-পরমেশ্বর" কে ছিলেন, বলা কঠিন, তবে, খড়্গরা যে সদ্যোক্ত বৃহৎ-পরমেশ্বরের সামন্তবংশ ছিলেন, এমন অনুমান অযৌক্তিক নয়। সামন্তরাও যে অনেক সময় 'নৃপাধিরাজ', 'অধিমহারাজ' বলিয়া উল্লিখিত হইতেন, এমন প্রমাণ দুর্লভ নয়। খড়্গবংশীয় রাজারা প্রথমে বোধ হয় বঙ্গে রাজত্ব করিতেন, পরে সমতটে রাজত্ব বিস্তার করিয়া থাকিবেন।

বঙ্গ ও সমতট
বৌদ্ধ খড়্গ বংশ

ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত সপ্তম শতকীয় একটি পট্টোলীতে আর একটি সামন্ত রাজবংশের খবর পাওয়া যাইতেছে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা একজন অধিমহারাজ ছিলেন; তাঁহার পুত্র ছিলেন মহাসামন্ত শিবনাথ, শিবনাথের পুত্র শ্রীনাথ, শ্রীনাথেরপুত্র ভবনাথ, তারপর লোকনাথ। অনেকে মনে করেন এই

সমতট

সামন্ত-রাজবংশ খড়্গবংশীয় নৃপাধিরাজদের অধিরাজত্ব স্বীকার করিতেন। এ-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই।

লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলীতে লোকনাথেরই সমসাময়িক জনৈক নৃপ জীবধারণের উল্লেখ আছে। এই জীবধারণ যে-বংশের রাজা ছিলেন সেই বংশকে রাতবংশ বলা যাইতে পারে, এবং ত্রিপুরা জেলার কৈলান গ্রামে অধুনাবিষ্কৃত একটি পট্টোলী হইতে এই বংশের দুইটি রাজার খবর পাওয়া যাইতেছে। অক্ষর-সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, এই সামন্ত রাজবংশ সপ্তম শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে সমতটের অধীশ্বর ছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বোধ হয় ছিলেন সমতটেশ্বর প্রতাপোপনতসামন্তচক্র-শ্রীজীবধারণ রাত ; তাঁহার পুত্র ছিলেন সমতটেশ্বর প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দ (অর্থাৎ যিনি একাধারে মহাপ্রতীহার, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাঅশ্বশালাধিকৃত, মহা-ভাণ্ডাগারিক এবং মহাসাধনিক) শ্রীশ্রীধারণরাত ; শ্রীধারণের পুত্র ছিলেন যুবরাজ বলধারণ রাত। বলা বাহুল্য, এই রাতবংশও সামন্তবংশ, স্বাধীন রাজবংশ নহেন। তবে খড়্গ বংশ বা লোকনাথের বংশ বা রাতবংশ, ইঁহারা নামেই শুধু ছিলেন সামন্তবংশ ; কার্যত ইঁহারা স্বাধীন নরপতিদের মতই ব্যবহার করিতেন। রাতবংশের রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী, এবং শ্রীধারণ নিজে ছিলেন পরম বৈষ্ণব ; কিন্তু কৈলান-পট্টোলীদ্বারা যে-ভূমি বিক্রীত এবং পট্টিকৃত হইয়াছিল সে-ভূমি রাজার মহাসান্ধিবিগ্রহিক জয়নাথ দান করিয়াছিলেন একটি বৌদ্ধবিহারে, আর্যসংঘের অশন, বসন এবং গ্রন্থাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য এবং কতিপয় ব্রাহ্মণকে—তাঁহাদের পঞ্চমহাযজ্ঞের ব্যয় নির্বাহের জন্য। শ্রীধারণ ছিলেন পরমকারুণিক, এবং একাধারে কবি, মধুর রচয়িতা (অতি মধুরচিত্রগীতেরুৎপাদয়িতা), শব্দবিদ্যাপারজ্ঞ এবং নানা বিদ্যা ও কলায় পারদর্শী। তাঁহার পুত্র বলধারণও শব্দবিদ্যা, শস্ত্রবিদ্যা এবং হস্তী ও অশ্ববিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন।

সমতটেশ্বর রাত বংশ

খড়্গ বংশ, লোকনাথের বংশ এবং রাত বংশের রাজারা প্রায় সমসাময়িক, এবং এই প্রত্যেকটি রাজবংশই সমতটে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কে কাহার পরে সমতটের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন ; ইঁহাদের বৃহৎ-পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজরাই বা কাহারা ছিলেন, তাহাও বলা যায় না। তবে, মনে হয়, খড়্গ বংশ প্রথমে বঙ্গেই রাজত্ব করিতেন, পরে রাজা দেবখড়্গ সমতটে রাজ্যবিস্তার করেন। বোধ হয়, খড়্গদের সামন্ত হিসাবে, অথবা তাঁহাদের অবসানের পর আর কাহারও সামন্ত হিসাবে লোকনাথ সমতটের অধীশ্বর হন, এবং লোকনাথকে পরাজিত করিয়া রাতবংশীয় জীবধারণ নিজ বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তম শতকের প্রথমার্দ্ধে সমতটে একটি ব্রাহ্মণরাজবংশ রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং নালন্দার বৌদ্ধ মহাস্থবির য়ুয়ান্-চোয়াঙের গুরু শীলভদ্র সেই রাজ-বংশের সন্তান ছিলেন বলিয়া য়ুয়ান্-চোয়াঙ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। এই ব্রাহ্মণ রাজবংশ রাত বংশ হওয়া কিছু অসম্ভব নয়।

অসম্ভব নয় যে, সপ্তম শতকে গৌড়ে এবং উত্তর ও পশ্চিম-দক্ষিণবঙ্গে শশাঙ্ক যে গৌড়তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন খড়্গ ও রাতবংশীয় রাজারা গোড়ায় তাহারই সামন্ত ছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়তন্ত্র বিনষ্ট হইলে এই সব সামন্ত বংশ একে একে কার্যত স্বাধীন হইয়া উঠেন।

এই সংক্ষিপ্ত তথ্যবিবৃতি হইতেই বুঝা যাইবে, সপ্তম শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত কি অষ্টম শতকের গোড়া পর্যন্ত বঙ্গ ও সমতটের স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল ; কিন্তু ঘন ঘন রাজবংশ পরিবর্তন ও প্রবল সামন্তাধিপত্য দেখিয়া মনে হয়, এই স্বাতন্ত্র্যের মূল শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। তাহা ছাড়া, সমসাময়িক অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে জানা যায়, বঙ্গ ও সমতট এই সময় একাধিকবার বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে, এবং রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলার সূচনা দেখা দিতেছে। এই বিশৃঙ্খলার ইতিহাস পরবর্তী পর্বে আলোচনা করা যাইবে।

সপ্তম শতকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে যখন বঙ্গ ও সমতটে খড়্গ ও রাতবংশীয় সামন্তদের প্রভুত্ব চলিতেছে তখন গৌড়ের অবস্থাটা কি, তাহা দেখা যাইতে পারে।

৫নং দামোদর লিপির সাক্ষ্যানুযায়ী পুণ্ড্রবর্ধন ৫৪৪ খ্রীষ্ট-শতকেও জনৈক গুপ্ত-রাজের অধীন। মহাসেনগুপ্ত নামক জনৈক গুপ্ত-নরপতি (আনুমানিক ষষ্ঠ শতকের চতুর্থপাদ) লোহিত্যতীরে কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। পুণ্ড্রবর্ধন ও গৌড় ষষ্ঠ শতকের চতুর্থ পাদের আগে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, সপ্তম শতকের সূচনায় দেখা যাইতেছে, জনৈক শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন স্বতন্ত্র নরপতিরূপে দেখা দিতেছেন, এবং গৌড়রাষ্ট্র উত্তর-ভারতের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র বিশিষ্ট অধ্যায় রচনা করিতেছে।

গৌড়তন্ত্র

গৌড়ের এই স্বাতন্ত্র্য লাভ ঐতিহাসিকেরা সাধারণত যতটা আকস্মিক বলিয়া মনে করেন, ততটা আকস্মিক নয়। ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার অব্যবহিত আগে কোনো সময়ে কনৌজ-কোশলের মৌখরীরাজ ঈশানবর্মার সঙ্গে একবার গৌড়জনদের এক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। হড়াহা লিপিতে ঈশানবর্মা দাবি করিয়াছেন, তিনি গৌড়জনদের সমগ্র জনপদের ভবিষ্যৎ বিনষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সমুদ্রাশ্রয়ী করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ঈশানবর্মার দাবি একটু অভিনিবেশে বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়েই গৌড় জনপদ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই জনপদ একান্তই সমুদ্রনির্ভর। একাদশ শতকের গুরগি শিলালিপিতেও দেখা যাইতেছে, গৌড়জনদের একটি সমুদ্র-জলদুর্গ ছিল (জলনিধিজলদুর্গং গৌড়োরাজ্যোহধিশেতে)। যাহা হউক, এই গৌড় জনপদ বোধ হয় ষষ্ঠ শতক হইতেই স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী, অথবা নামে মাত্র গুপ্তবংশধরদের আয়ত্তে, এবং ঈশানবর্মার গৌড়বিজয় বোধ হয় বংশপরম্পরা-বিলম্বিত গুপ্ত-মৌখরী সংঘর্ষের একটি ক্ষুদ্র কাহিনী মাত্র। গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্তের ভগিনীকে

বিবাহ করিয়াছিলেন পুষ্প বা পুষ্যভূতিরাজ প্রভাকরবর্দ্ধন; তাঁহাদের দুই পুত্র ও এক কন্যা; রাজ্যবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধন ও রাজ্যশ্রী। রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন মৌখরী-রাজ গ্রহবর্মা। গৌড়-স্বাতন্ত্র্যের নায়ক শশাঙ্ক ইহাদের সকলের, এবং মহাসেনগুপ্তের পরবর্তী গুপ্তরাজ দেবগুপ্তের সমসাময়িক; কাজেই তাঁহার ইতিহাস এবং গৌড়-স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস ইহাদের সকলের সঙ্গে জড়িত। সে-ইতিহাস সমসাময়িক লিপিমালা, বাণভট্টের হর্ষচরিত, য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণী এবং আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত, ব্যাখ্যাত ও কীর্তিত হইয়াছে। তাহার ফলে পুষ্যভূতিরাজ হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্ক-কাহিনীও অল্পবিস্তর সুপরিচিত।

শশাঙ্কের প্রথম পরিচয় মহাসামন্তরূপে। কাহার মহাসামন্ত তিনি ছিলেন, নিঃসংশয়ে বলা কঠিন, তবে, মনে হয়, মহাসেনগুপ্ত বা তৎপরবর্তী মালবাধিপতি দেবগুপ্ত তাঁহার অধিরাজ ছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধন কর্তৃক দেবগুপ্তের পরাজয়ের পর শশাঙ্কই যে দেবগুপ্তের দায়িত্ব ও কর্তব্যভার—মৌখরী-পুষ্যভূতি মৈত্রীবন্ধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন তাহা হইতে মনে হয়, শশাঙ্ক মগধ-মালবাধিপতি গুপ্তরাজাদেরই মহাসামন্ত ছিলেন। যাহা হউক, এ-তথ্য নিঃসংশয় যে, ৬০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোনো সময়ে শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং কর্ণসুবর্ণে (মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটির নিকটে কানসোনা) নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন।

শশাঙ্ক

মৌখরীদের সঙ্গে গুপ্তদের একটা সংগ্রাম কয়েক পুরুষ ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছিল, এবং তাহা গৌড় ও মগধের অধিকার লইয়া বলিয়াই মনে হয়। দুই পুরুষ সংগ্রাম চলিবার পর বোধ হয় মহাসেনগুপ্তের পিতা নিজের শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশে নিজ কন্যা মহাসেনগুপ্তাকে পুষ্যভূতিরাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের মহিষীরূপে অর্পণ করেন। এই মৈত্রীবন্ধনের ভয়ে কিছুদিন মৌখরী বিক্রম শান্ত ছিল। কিন্তু অবন্তীবর্মার পুত্র গ্রহবর্মা যখন মৌখরী-বংশের রাজা, তখন মালবের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা দেবগুপ্ত। পক্ষ-প্রতিপক্ষের রূপ তখন বদলাইয়া গিয়াছে। মগধ ইতিমধ্যেই গুপ্তহস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল; মালবরাজ মহাসেনগুপ্তের দুই পুত্র, কুমার ও মাধব, প্রভাকরবর্দ্ধনের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং মালবের অধিপতি হইয়াছিলেন দেবগুপ্ত। দেবগুপ্তের মৈত্রীবন্ধন গৌড়াধিপ শশাঙ্কের সঙ্গে, যে-শশাঙ্ক মঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থের মতে ইতিমধ্যেই বারাণসী পর্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। অন্য দিকে গ্রহবর্মাও ইতিপূর্বেই প্রভাকরবর্দ্ধনের কন্যা এবং রাজ্যবর্দ্ধন-হর্ষবর্দ্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; সেই সূত্রে তাঁহার মৈত্রীবন্ধন পুষ্যভূতি বংশের সঙ্গে। বৃদ্ধ প্রভাকরবর্দ্ধনের অসুস্থতা এবং মৃত্যুর সুযোগে মালবরাজ দেবগুপ্ত মৌখরীরাজ গ্রহবর্মাকে আক্রমণ ও হত্যা করিয়া রাণী রাজ্যশ্রীকে কনৌজে কারারুদ্ধ করেন। হর্ষচরিত পাঠে মনে হয়, প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু এবং শেষোক্ত দু'টি ঘটনা

একই দিনে সংঘটিত হইয়াছিল। দেবগুপ্ত তাহার পর যখন স্থানীশ্বরের দিকে অগ্রসরমান শশাঙ্কও তখন দেবগুপ্তের সহায়তার জন্ম কনৌজের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন; কিন্তু দেবগুপ্তের সৈন্তের সঙ্গে মিলিত হইবার আগেই সন্তসিংহাসনারূঢ় রাজ্যবর্দ্ধন সসৈন্তে দেবগুপ্তের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ, পরাভূত ও নিহত করেন। তাহার পর হয়তো তিনি ভগিনী রাজ্যশ্রীকে কারামুক্ত করিবার জন্ম কনৌজের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু উদ্দেশ্ত সিদ্ধির আগেই তাঁহাকে শশাঙ্কের সম্মুখীন হইতে হয়, এবং তিনি তাঁহার হস্তে নিহত হন। বাণভট্ট ও য়ুয়ান-চোয়াঙ্ বলিতেছেন, শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন; অন্ত দিকে হর্ষবর্দ্ধনের লিপির সাক্ষ্য এই যে, রাজ্যবর্দ্ধন সত্যানুরোধে (হয়তো কোনো প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্ম) তাঁহার শত্রুর শিবিরে গিয়াছিলেন এবং সেইখানেই তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকারের মতে রাজ্যবর্দ্ধন নগ্নজাতির কোনো রাজ-আততায়ী কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। বাণভট্ট ও য়ুয়ান-চোয়াঙ্ দুইজনেই শশাঙ্কের প্রতি কিছুটা বিদ্বিষ্ট ছিলেন, তাহা ছাড়া দুই জনই রাজ্যবর্দ্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনের কৃপাপাত্র ছিলেন। কাজেই তাঁহাদের সাক্ষ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। যাহাই হউক, এই বিতর্ক কতকটা অবান্তর, কারণ শশাঙ্কের ব্যক্তি-চরিত্রগত এই তথ্যের সঙ্গে জনসাধারণের ইতিহাসের যোগ প্রায় অনুপস্থিত। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর শশাঙ্ক আর স্থানীশ্বরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, কারণ মৌখরী রাজবংশের পরাভবের আর কিছু বাকী ছিল না। হর্ষবর্দ্ধন রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াই তৎক্ষণাৎ সসৈন্তে গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পথে কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মৈত্রীবন্ধন, সংবাদবাহক ভণ্ডীর মুখ হইতে রাজ্যবর্দ্ধন-হত্যার বিস্তৃততর বিবরণ ও বিন্ধ্যপর্বতে রাজ্যশ্রীর পলায়ন-বৃত্তান্ত প্রাপ্তি, সসৈন্তে ভণ্ডীকে গৌড়রাজের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া নিজে রাজ্যশ্রীর উদ্ধারে গমন ও অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিবার আগেই রাজ্যশ্রীর উদ্ধার, এবং তাহার পর গঙ্গাতীরে ভণ্ডীচালিত সৈন্তের সঙ্গে পুনর্মিলন, ইত্যাদি বাণভট্টের কৃপায় আজ অতি সুবিদিত ঐতিহাসিক তথ্য। কিন্তু তাহার পর শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষবর্দ্ধনের সম্মুখ যুদ্ধ কিছু হইয়াছিল কিনা এ-সম্বন্ধে বাণভট্ট নীরব। মঞ্জুশ্রী-মূলকল্পের গ্রন্থকারের মতে এই সময় প্রাচ্যদেশের রাজা ছিলেন সোম (= চন্দ্র = শশাঙ্ক); তাঁহার রাজধানী ছিল পুণ্ড্র। হর্ষবর্দ্ধন এই সোমরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে নিজ রাজ্যসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের বিবরণ কতটুকু সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন; তবে, তাঁহার এই জয় যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, এবং কামরূপ রাজ ভাস্করবর্মা ও হর্ষবর্দ্ধনের সম্মিলিত শত্রুতা সত্ত্বেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শশাঙ্ক যে সমগ্র গৌড় দেশ, মগধ-বুদ্ধগয়া অঞ্চল এবং উৎকল ও কঙ্গোদ দেশের অধিপতি ছিলেন, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। কঙ্গোদের শৈলোদ্ভব-বংশীয় অধিপতি মহারাজ-মহাসামন্ত দ্বিতীয় শ্রীমাধবরাজের (৬১৯ খ্রীষ্টশতক) একটি লিপিতে মাধবরাজ শশাঙ্ককে তাঁহার অধিরাজ বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছেন। সামন্ত-মহারাজ সোমদত্ত এবং মহাপ্রতীহার শুভকীর্তির অধুনাবিষ্কৃত মেদিনীপুর (প্রাচীন নাম, মিধুনপুর) লিপি দুইটিতেও শশাঙ্ক অধিরাজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই লিপি দুইটির সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়, দণ্ডভুক্তিদেশ শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং উৎকলদেশ দণ্ডভুক্তি-বিভাগের অন্তর্গত ছিল। ৬৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে শশাঙ্কের মৃত্যু হইয়া থাকিবে, কারণ ঐ সময় য়ুয়ান-চোয়াঙ্ মগধ-ভ্রমণে আসিয়া শুনিলেন, কিছুদিন আগেই শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম কাটিয়া ফেলিয়াছেন, এবং স্থানীয় বুদ্ধমূর্তিটি নিকটেই একটি মন্দিরে সরাইয়া রাখিয়াছেন। এই পাপের ফলেই নাকি শশাঙ্ক কুষ্ঠ-জাতীয় কোনো ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে মারা গিয়াছিলেন। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থেও এই গল্পের পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু গল্পটি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, বলা কঠিন।

শশাঙ্ক কীর্তিমান নরপতি ছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহাকে জাতীয় নায়ক অথবা বীর বলা যাইতে পারে কিনা সে-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও তিনি যে অজ্ঞাতকুলশীল মহাসামন্ত-রূপে জীবন আরম্ভ করিয়া তদানীন্তন উত্তর-ভারতের সর্বোত্তম রাষ্ট্রগুলির সমবেত শক্তির (কনৌজ-স্থানীশ্বর-কামরূপ মৈত্রী) বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া, শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র স্বাধীন নরপতিরূপে সুবিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, এ-তথ্যই ঐতিহাসিকের প্রশংসিত বিস্ময় উদ্রেকের পক্ষে যথেষ্ট। পুরুষপরম্পরাবিলম্বিত কনৌজ-গৌড়মগধ সংগ্রাম তাঁহারই শৌর্য ও বীর্যে নূতন রূপে রূপান্তরলাভ করিয়াছিল; সকলোত্তরপথনাথ হর্ষবর্দ্ধনকে যদি কেহ সার্থক প্রতিরোধ প্রদান করিয়া থাকেন তবে শশাঙ্ক এবং চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীই তাহা করিয়াছিলেন। উত্তর-ভারতের আধিপত্য লইয়া পালরাজ ধর্মপাল-দেবপাল প্রভৃতির আমলে গৌড়-কনৌজের যে সুদীর্ঘ সংগ্রাম পরবর্তী কালের বাংলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত করিয়াছে, তাহার প্রথম সূচনা শশাঙ্কের আমলেই দেখা দিল, এবং তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে উত্তর-ভারতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করাইলেন। বাণভট্ট-য়ুয়ানচোয়াঙ্-মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার যদি তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া থাকেন তবে তাহার মূলে ঈর্ষ্যা ও হিংসা কিছু ছিল না, এমন বলা যায়না।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় ও মগধের অধিকার লইয়া প্রায় কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার মানব নামে শশাঙ্কের এক পুত্রের নাম করিয়াছেন; এই পুত্র নাকি ৮ মাস ৫ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। অন্য কোনো সাক্ষ্যে এই তথ্যের উল্লেখ নাই, কাজেই ইহা সত্য হইতে পারে, না-ও হইতে পারে। তবে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসে গৌড়তন্ত্র বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের এই সাক্ষ্য অবিশ্বাস্য নয় বলিয়াই মনে হয়। ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে য়ুয়ান-চোয়াঙ্ যখন বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন তখন এই দেশ পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত: কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি ও সমতট। এই পাঁচটি জনপদের কোনোটিরই রাজা বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে য়ুয়ান-চোয়াঙ্ কিছু বলেন নাই। পাঁচটি জনপদের মধ্যে এক সমতট ছাড়া আর বাকী চারটিই নিঃসন্দেহে

শশাঙ্কের রাজ্যান্তর্গত ছিল। মনে হয়, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রত্যেকটি জনপদই স্বাধীন ও স্বতন্ত্রপরায়ণ হইয়া উঠে; এবং ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে কজঙ্গলে ভাস্করবর্মা-হর্ষবর্দ্ধন সাক্ষাৎকারের আগেই ভাস্করবর্মা কোনো সময় পুণ্ড্রবর্দ্ধন-কর্ণসুবর্ণ জয় করিয়া কর্ণসুবর্ণের জয়স্কন্ধাবার হইতে এক ভূমিদান পট্টোলী নির্গত করাইয়াছিলেন। চীনা রাজতরঙ্গের সাক্ষ্যানুযায়ী ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্করবর্মা পূর্ব-ভারতের নরপতি ছিলেন। ৬৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কঙ্গোদ এবং কজঙ্গলও হর্ষবর্দ্ধন কর্তৃক বিজিত ও অধিকৃত হইয়াছিল, য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণ হইতে এইরূপ মনে হয়। তাম্রলিপ্তি-দণ্ডভুক্তি সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন, তবে ৬৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মগধের রাজা ছিলেন পূর্ণবর্মা, কিন্তু ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে কি তাহার অব্যবহিত আগে মগধও হর্ষবর্দ্ধন কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, কারণ চীনদূত মা-তোয়ান্-লিন্ বলিতেছেন, শিলাদিত্য (হর্ষবর্দ্ধন) ঐ বৎসর "মগধাধিপ" এই আখ্যা গ্রহণ করেন।

কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা বোধ হয় বেশি দিন গৌড়-কর্ণসুবর্ণ নিজ করায়ত্ত রাখিতে পারেন নাই। শশাঙ্কের গৌড়তন্ত্র বিনষ্টির স্বল্পকাল পরেই গৌড়ে জয় নামক কোন নাগরাজ রাজত্ব করিয়াছিলেন, মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে এইরূপ একটি ইঙ্গিত আছে। আনুমানিক সপ্তম শতকের প্রথমার্দ্ধে মহারাজাধিরাজ জয়নাগ নামক এক রাজা কর্ণসুবর্ণের জয়স্কন্ধাবার হইতে কিছু ভূমিদানের আদেশ মঞ্জুর করিয়াছিলেন। জয় নামক এক রাজার নামাঙ্কিত কয়েকটি মুদ্রাও বীরভূম-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রার জয়, মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের জয়, এবং বপ্পঘোষবাট পট্টোলীর জয়নাগ এক এবং অভিন্ন বলিয়া বহুদিন স্বীকৃত হইয়াছে। মঞ্জুশ্রীমূল-কল্পের বিবরণ হইতে মনে হয়, ভাস্করবর্মার কর্ণসুবর্ণাধিকারের পর শশাঙ্কপুত্র মানব পিতৃরাজ্য পুনরধিকারের একটা চেষ্টা করিয়া থাকিবেন, এবং সে-চেষ্টা হয়তো ক্ষণস্থায়ী সার্থকতাও লাভ করিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার পরই কর্ণসুবর্ণ জয়নাগের করায়ত্ত হয়, এবং তিনি মহারাজাধিরাজ আখ্যায় স্বতন্ত্র নরপতিরূপে পরিচিত হন। অথবা, এমনও হইতে পারে ভাস্করবর্মা কর্তৃক কর্ণসুবর্ণ জয়ের আগেই জয়নাগ কোনো সময় ঐ রাজ্য কিছুদিনের জন্ত ভোগ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই শশাঙ্কের গৌড়-রাজ্য একেবারে তছ্‌নছ্‌ হইয়া গেল। শশাঙ্ক গৌড়কে কেন্দ্র করিয়া যে বৃহত্তর গৌড়তন্ত্র গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা অন্তত কিছুকালের জন্ত ধূলিসাৎ হইয়া গেল; যতদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন ততদিন এই রাষ্ট্রাদর্শ কার্যকরী ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু একদিকে ভাস্করবর্মা, অন্তদিকে হর্ষবর্দ্ধন, এ-দু'য়ের টানা-পোড়েনের মধ্যে পড়িয়া শশাঙ্কের অব্যবহিত পরই গৌড়তন্ত্র প্রায় বিনষ্ট হইয়া গেল। অষ্টম শতকের দ্বিতীয় পাদে জনৈক গৌড়াধিপ আবার, বোধ হয় শশাঙ্কের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, মগধ হইতে গুপ্তবংশের অবশেষ অবলুপ্ত করেন এবং মগধেরও আধিপত্য লাভ করেন। কিন্তু সে-চেষ্টা সত্ত্বেও গৌড়তন্ত্র আর পুনরুদ্ধার করা গেল না। শশাঙ্কের ধনুকে গুণ টানিবার মতন বীর অব্যবহিত পরে আর দেখা গেল না। তাহার পর সুদীর্ঘ একশত বৎসর গৌড়ের, শুধু গৌড়েরই

বা কেন, বঙ্গেরও, অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশের ইতিহাসে গভীর ও সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা, মাৎস্যন্যায়ের অপ্রতিহত প্রভাব।

এই যুগের স্বাধীন গৌড়-রাষ্ট্রের আদর্শ ছিল গৌড়তন্ত্র গড়িয়া তোলা; শশাঙ্কের কর্মকীর্তি এবং মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের সাক্ষ্য এ-বিষয়ে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি হইবার কারণ নাই। শশাঙ্কই ছিলেন এই আদর্শের নায়ক। কি-ভাবে তিনি এই আদর্শকে কার্যকরী করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা তো আগেই আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু বঙ্গে-সমতটে এবং গৌড়তন্ত্রে রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ কি ছিল তাহা এখন একটু দেখিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রের গঠনবিন্যাস এবং পরিচালন-পদ্ধতি গুপ্ত আমলেরই অনুসরণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়; রাষ্ট্রবিভাগ এবং রাজকর্মচারিদের যে-ইঙ্গিত সমসাময়িক লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে তাহা দ্বারা এই অনুমান সমর্থিত হয়। এই যুগে নূতন একটি রাষ্ট্রবিভাগ, বীথীর নাম শুনা যাইতেছে, অন্তত বঙ্গে-সমতটে; ভুক্তি এবং বিষয়-বিভাগের মত বীথী-বিভাগেরও একটি অধিকরণ থাকিত। ভুক্তির যিনি উপরিক বা শাসনকর্তা থাকিতেন তাঁহার মর্যাদা এই যুগে ক্রমশ যেন বাড়িয়া যাইবার দিকে। তাঁহাকে কখনো কখনো মহারাজা বলা হইয়াছে, যেমন গুপ্ত-আমলেও বলা হইত; কিন্তু কখনো কখনো নূতন উপাধি তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে; যেমন সমাচারদেবের কুর্পালা পট্টোলীতে ভুক্তির শাসনকর্তাকে বলা হইয়াছে, "পৌরোপকারিক-ব্যাপারপর-মহাপ্রতীহার"; শশাঙ্কের অন্যতম মেদিনীপুর লিপিতেও দণ্ডভুক্তির শাসনকর্তাকে বলা হইয়াছে মহাপ্রতীহার; সমাচারদেবের ঘুগ্রাহাটি-লিপিতে উপরিক জীবদত্তকে অধিকন্তু বলা হইয়াছে অন্তরঙ্গ। মনে হয়, ভুক্তি-উপরিকের ক্ষমতা এই যুগে বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, মল্লসারুল-পট্টোলীতে (গোপচন্দ্রের আমল) অনেক নূতন নূতন রাজপুরুষের নামের দীর্ঘ তালিকা সর্বপ্রথম পাওয়া যাইতেছে; এই সব নাম ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্তব্য সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিন্যাস অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে, কিন্তু এখানে একথা নির্দেশ করা প্রয়োজন যে, এই নূতন নূতন রাজপুরুষ এবং রাজকর্মবিভাগ সৃষ্টি একেবারে বৃথা হয় নাই; ইহার সামাজিক ইঙ্গিত লক্ষ্যণীয়। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র অনেক বেশী আত্মসচেতন হইয়াছে, নূতন নূতন সামাজিক দায় ও কর্তব্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করিতেছে। ইহার পর হইতে এই সচেতনতা ও স্বীকৃতি ক্রমশ বাড়িয়াই যাইবে এবং তাহার পূর্ণতর রূপ দেখা যাইবে পাল-আমলে, এবং পূর্ণতম রূপ সেন ও বর্মণবংশীয় রাজাদের আমলে।

সামাজিক ইঙ্গিত

যাহা হউক, বিস্তৃত কর্মচারীতন্ত্র (এখন আমরা যাহাকে বলি আমলাতন্ত্র) রচনার সূত্রপাত এই যুগেই প্রথম দেখা যাইতেছে। ছোটখাট সামাজিক দায় ও কর্তব্য সম্বন্ধেও রাষ্ট্র সচেতন হইতেছে; সমাজের অভ্যন্তরেও রাষ্ট্র হস্ত সম্প্রাসরণের চেষ্টা করিতেছে; আগে যাহা ছিল পল্লী বা স্থানীর স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্গত তাহা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের কুক্ষিগত হইতেছে, এই ইঙ্গিত কিছুতেই অবহেলা করিবার মতন নয়।

আমলাতন্ত্র

বিষয়াধিকরণ যাহারা গঠন করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠী-সার্থবাহ-কুলিকদের দেখিতেছি না; পরিবর্তে পাইতেছি মহত্তর এবং ব্যাপারী বা ব্যবহারী প্রভৃতিদের। মহত্তরেরা স্থানীয় প্রধান, ব্যাপারী-ব্যবহারীরা তো স্পষ্টতই শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধি। দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীদের আধিপত্য এখনও বিদ্যমান; তবে সে-আধিপত্য এখন অন্যান্য স্থানীয় প্রধানদের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করিতে হইতেছে, অথবা এমনও হইতে পারে, যে-অঞ্চলের বিষয়াধিকরণে এই গঠন-বিন্যাস পাওয়া যাইতেছে সেই অঞ্চলে এই সমাজের নির্বাধ নিরবচ্ছিন্ন প্রাধান্য ছিল না। মল্লসারুল লিপিতে বীথী-অধিকরণ গঠন-বিন্যাসেরও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে; এই অধিকরণটি গঠিত হইয়াছিল একজন বাহনায়ক এবং মহত্তর, অগ্রহারী ও খাড়্গীদের লইয়া। বাহনায়ক পথঘাট-যানবাহনের কর্তা এবং রাজপুরুষ বলিয়াই মনে হয়; অগ্রহারীরা বোধ হয় যে-সব ব্রাহ্মণ ব্রহ্মোত্তর ভূমি ভোগ করিতেন তাঁহাদের, এক কথায় ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধি অথবা অগ্রহার-ভূমি বা গ্রামের শাসনকর্তা; মহত্তরেরা স্থানীয় প্রধান প্রধান গৃহস্থ; খাড়্গী কাহারা বুঝা কঠিন, তবে পরবর্তী কালের খড়্গগ্রাহী এবং খাড়্গী বোধ হয় একই শ্রেণীর রাজপুরুষ। শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধি এই বীথী-অধিকরণে দেখিতেছি না, অথচ বীথীটি বর্তমান বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত ছিল। এই গ্রামে কি এই সম্প্রদায়ের প্রধান্য ছিল না? গ্রামের বা গ্রাম সমূহের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই কি ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিতেন? বাহনায়ককে দেখিয়া মনে হয়, এই বীথীর পথঘাট নদী-নালা দিয়া নৌকা, শকট, পশু ইত্যাদির যাতায়াত খুব বেশিই ছিল; ইহার কিছু তো নিশ্চয়ই ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ কি?

এই যুগে রাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করিবার মতন। বাংলাদেশে এই আমলেই পুরাপুরি সামন্ততন্ত্র রচনারও সূত্রপাত দেখা যায়। শশাঙ্কের জীবনই তো আরম্ভ হইয়াছিল মহাসামন্তরূপে; বোধ হয় তিনি গুপ্তদেরই মহাসামন্ত ছিলেন। তাহা ছাড়া, মেদিনীপুরে প্রাপ্ত শশাঙ্কের একটি লিপিতে দণ্ডভুক্তির শাসনকর্তা সামন্ত-মহারাজ সোমদত্তের উল্লেখ পাইতেছি; সোমদত্ত বোধ হয় আগে দণ্ডভুক্তির রাজা ছিলেন; দণ্ডভুক্তি শশাঙ্ক কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর তিনি হয়তো সামন্ত শাসন-কর্তা রূপে উহার উপরিক নিযুক্ত হন। কঙ্গোদের শৈলোদ্ভব বংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় শ্রীমাধব-রাজও শশাঙ্কের একজন মহাসামন্ত ছিলেন। তিনিও বোধ হয় শশাঙ্ক কর্তৃক কঙ্গোদ-বিজয়ের পর মহাসামন্ত নিযুক্ত হইয়া থাকিবেন। গুনাইঘর-লিপির দূতক মহাপ্রতীহার মহাপীলুপতি পঞ্চাধিকরণোপরিক মহারাজ বিজয়সেনও গোপচন্দ্রের একজন শ্রীমহাসামন্ত ছিলেন। বিজয়সেন গোপচন্দ্রের আগে মহারাজ বৈন্যগুপ্তেরও অন্যতম মহাসামন্ত ছিলেন। মহারাজাধিরাজ সমাচারদেবের কুর্পালা-লিপিতে এবং জয়নাগের বপ্পঘোষবাট-লিপিতেও সামন্তের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে; শেষোক্ত লিপিটিতে দেখিতেছি, সামন্ত নারায়ণভদ্র

সামন্ততন্ত্র

ঔদুম্বরিক বিষয়ের (—আইন-ই-আক্‌বরী গ্রন্থের ঔদম্বর পরগণা—বীরভূম-মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ) বিষয়পতি ছিলেন। খড়্গ-বংশীয় রাজারাও বোধ হয় সামন্ত নরপতিই ছিলেন; এবং লোকনাথের বংশও তো সামন্ত বংশ। রাতবংশীয় রাজারাও সামন্ত-মহাসামন্তই ছিলেন, সন্দেহ কি? এই সামন্তদের সঙ্গে মহারাজাধিরাজদের সম্বন্ধের রূপ ও প্রকৃতি কি ছিল, পরস্পরের দায় ও অধিকার কি ছিল, বলা কঠিন; এ-সম্বন্ধে কোনো তথ্য অনুপস্থিত। তবে অনুমান হয়, কোনো কোনো সামন্ত—তাঁহারা একবারে মহাসামন্ত অথবা সামন্ত-মহারাজ, যেমন, কঙ্গোদাধিপ মাধবরাজ বা শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক, অথবা দূতক বিজয়সেন, অথবা খড়্গ ও রাতবংশীয় রাজারা—প্রকৃত পক্ষে প্রায় স্বতন্ত্র স্বাধীন নরপতিরূপেই রাজত্ব করিতেন, শুধু মৌখিকত বা দলিলপত্রে নিজদের সেই ভাবে প্রচার করিতেন না। তবে, মহারাজাধিরাজের ক্ষমতা ও রাষ্ট্র দুর্বল হইলে অথবা অন্য কোনো উপায়ে সুযোগ পাইলেই তাঁহারা স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া বসিতেন। কোনো কোনো সামন্ত-মহাসামন্ত মহারাজাধিরাজের উচ্চ রাজকর্মচারী (যথা ভুক্তিপতি বা বিষয়পতি) রূপেও কাজ করিতেন। সামন্ত রাজাদেরও আবার সামন্ত থাকিতেন; লোকনাথ পট্টোলীতে দেখিতেছি, লোকনাথের এক মহাসামন্ত ছিলেন ব্রাহ্মণ প্রদোষশর্মা। পরবর্তীকালের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় (যেমন, রামচরিতের) তাহা হইলে সামন্তদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল যুদ্ধবিগ্রহের সময় সৈন্যবাহিনী দিয়া এবং নিজে যুদ্ধে যোগ দিয়া মহারাজাধিরাজকে সাহায্য করা। এই সামন্ত-মহাসামন্তরা বস্তুত মহারাজাধিরাজেরই একটি ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র। সামন্তপ্রথা এখন হইতে ক্রমশ বিস্তার লাভ করিয়াই চলিবে, এবং পাল-আমলে তাহার পূর্ণতর রূপ দেখা যাইবে। এ-পর্বের বঙ্গ ও সমতট রাষ্ট্র এবং গৌড়তন্ত্র এই আমলাতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র লইয়াই গঠিত।

রাষ্ট্র ও সামাজিক ধন

সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন এই যুগেও দেখা যাইতেছে—বঙ্গ, সমতট এবং গৌড় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই। কিন্তু সুবর্ণমুদ্রার সেই নিকষোত্তীর্ণ সুমুদ্রিত রূপ আর নাই; নকল মুদ্রার প্রচলনও আরম্ভ হইয়া হইয়াছে। রৌপ্য মুদ্রা তো একেবারেই নাই। ইহার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত অন্যত্র ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি (ধনসম্বল অধ্যায়ে মুদ্রাপ্রসঙ্গ); এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের বিবর্তন মুদ্রার এই অবনতির অন্যতম কারণ হইতেও পারে। রাষ্ট্রও যেন সামাজিক ধনোৎপাদনের দিকে এই যুগে খুব বেশি দৃষ্টি রাখে নাই; কর্মচারীতন্ত্রের বিস্তৃতি এবং বিচিত্র পদনাম ও বিভাগ বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, উৎপাদিত ধনের বণ্টন-ব্যবস্থার দিকেই রাষ্ট্রের ঝোঁকটা যেন বেশি! কৃষিসমাজ এবং ব্যাপারী-ব্যবহারী সমাজের কিছু কিছু খবর পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু রাষ্ট্রে বিশেষভাবে কাহারও প্রাধান্য দেখা যাইতেছে না, অন্তত তেমন কোনো সাক্ষ্য উপস্থিত নাই। বাণিজ্য-ব্যবসায় ব্যাপারে যেন একটু মন্দা পড়িয়াছে; মহত্তর-প্রামিক-কুটুম্বদের প্রতিপত্তি বাড়িতেছে। এই যুগেই ভূমির চাহিদা বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং সমাজ ক্রমশ ভূমিনির্ভর হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। পাল ও সেন আমলে দেখা যাইবে,

বাণিজ্য-ব্যবসায়ে বিশেষত বহির্বাণিজ্যে একেবারেই মন্দা পড়িয়া গিয়াছে, এবং সমাজ উত্তরোত্তর ভূমি ও কৃষিনির্ভর হইয়া পড়িয়াছে। বাৎস্যায়নের আমলে নাগর-সমাজকেই যেমন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ বলিয়া তুলিয়া ধরা হইয়াছিল—সওদাগরী ধনতন্ত্রের প্রকৃতিই নগরকেন্দ্রিক—এই আমলে সেই আদর্শে যেন একটু ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে; ভূমি ও কৃষিনির্ভরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ক্রমশ গ্রামকেন্দ্রিক হইবার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে—কৃষিনির্ভর সমাজের প্রকৃতিই তো গ্রাম-কেন্দ্রিক। কিন্তু এই প্রকৃতি এখনও সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয় নাই; কোটালিপাড়ার পট্টোলীগুলিতে তাহার ক্ষীণ আভাস মাত্র পাওয়া যাইতেছে। একশত বছর পরে তাহা একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিবে।

এই যুগের বঙ্গ ও সমতটের রাজারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী; রাত-বংশ ও আচার্য শীলভদ্রের পিতৃবংশও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী, লোকনাথের সামন্ত-বংশও তাহাই। শশাঙ্ক ছিলেন শৈব; তৎপ্রচলিত মুদ্রা এবং য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণই তাহার প্রমাণ। নিধনপুর-শাসনের সাক্ষ্যে ভাস্করবর্মাকেও শৈব বলা যাইতে পারে। সমাচারদেবের রাজত্বকালে বলি-চরু-সত্র প্রবর্তনের জন্য জনৈক ব্রাহ্মণ রাজকীয় ভূমিদান গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুত ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র, সমাচারদেব, জয়নাগ বা লোকনাথের আমলের যে-কয়টি ভূমিদানলিপি এ-পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিই ব্রাহ্মণদের ভূমিদান সম্পর্কিত পট্টোলী এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের পোষকতার প্রমাণ। চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের রাজকীয় লিপিগুলিতে দেখিয়াছি, বিভিন্ন নামে ও রূপে বিষ্ণু ক্রমশ পূজা ও সমাদর লাভ করিতেছেন; মহারাজ বৈন্যগুপ্ত মহাদেব-ভক্ত ছিলেন, এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধনে পঞ্চমশতকে বুধগুপ্তের আমলেই নামলিঙ্গ পূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই যুগে অর্থাৎ ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে গৌড়ে-কামরূপেও শৈবধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছে, এবং উভয় স্থানেই রাজা শৈব। কিন্তু বিষ্ণু এবং কৃষ্ণধর্মই অধিক প্রচলিত বলিয়া মনে হয়। পাহাড়পুরের মন্দির-প্রাচীরে সপ্তম-অষ্টম শতকের যে সব মৃৎ ও প্রস্তরচিত্র দেখা যায় তাহাতে মনে হয়, কৃষ্ণলীলার যমলার্জুন, কেশীবধ, কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে কংসরাজের মল্লদের যুদ্ধ, গোবর্দ্ধনধারণ, গোপ-বালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম, কৃষ্ণকে লইয়া বাসুদেবের গোকুলে গমন, গোপীলীলা প্রভৃতি কাহিনী ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে সুপ্রচলিত হইয়াছিল। রাজবংশের মধ্যে একমাত্র খড়্গ রাজারাই ছিলেন বৌদ্ধ; আর কোথাও বৌদ্ধধর্ম রাজকীয় পোষকতা লাভ করিতে পারে নাই।

ধর্ম ও সংস্কৃতি

ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় গুণাইঘর লিপির (৫০৭-৮) সাক্ষ্যে দেখিয়াছিলাম, বৌদ্ধধর্ম ত্রিপুরা অঞ্চলে রাষ্ট্র ও রাজবংশের পোষকতা লাভ করিতেছে। প্রায় দেড় শত বৎসর এই ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি বাংলার কোনো রাষ্ট্রের কোনো অনুগ্রহ বা সমর্থন দেখা যায় না; তাহার পর সপ্তম শতকের শেষপাদে দেখিতেছি, বৌদ্ধধর্ম আবার রাষ্ট্র ও রাজবংশের পোষকতা ও সমর্থন লাভ করিতেছে। খড়্গ বংশই বৌদ্ধরাজবংশ, রাজারা সকলেই পরম সুগত,

কাজেই এই পোষকতা খুবই স্বাভাবিক। লক্ষণীয় এই যে, এই পোষকতা ঢাকা-ত্রিপুরা অঞ্চলেই যেন সীমাবদ্ধ; কালপ্রান্তিক দুইটি সাক্ষ্যই বঙ্গ ও সমতটে। আশ্চর্য হইতে হয় এই ভাবিয়া যে, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে গৌড়ে বা বাংলার অন্য কোনো স্থানে বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম ও সংস্কৃতি কোথাও রাষ্ট্রের কোনোপ্রকার স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করিতেছে, এমন একটি দৃষ্টান্তও এ-পর্যন্ত জানা যায় নাই; অথচ, অন্যদিকে এই যুগের সব কয়টি রাজবংশই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী, এবং এই ধর্ম ও সংস্কৃতি সমানেই রাজকীয় সমর্থন ও পোষকতা লাভ করিতেছে; ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা প্রসারিত হইতেছে—খড়্গবংশীয় বৌদ্ধরাজবংশেও এবং বৌদ্ধ-রাজমহিষী প্রভাবতী দেবীর পোষকতায়ও তাহা হইয়াছে,—পৌরাণিক গল্পকথা প্রচারিত হইতেছে। এই যুগের রাষ্ট্র ও রাজবংশ বৌদ্ধ (বা জৈন) ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে খুব শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহপরায়ণ ছিলেন এমন মনে হয় না; অথচ দেশে বৌদ্ধ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের কিছু অপ্রতুলতা ছিল, এমন নয়। জনসাধারণের বেশ একটা অংশ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী ছিল; য়ুয়ান-চোয়াঙ, ইৎসিঙ এবং সেং-চি'র বিবরণ এবং আশ্রফপুর লিপির সাক্ষ্যেই তাহা সুস্পষ্ট। ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাইবে।

বৌদ্ধধর্ম ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্বন্ধে রাষ্ট্রে এই নেতিবাচক ঔদাসীন্য কি কখনো কখনো ইতিবাচক বিদ্বেষ ও শত্রুতায় রূপান্তরিত হইয়াছিল? কোথাও কি তাহার কোনো ইঙ্গিত আছে? য়ুয়ান-চোয়াঙ কিন্তু ইঙ্গিত শুধু নয়, সুস্পষ্ট অভিযোগই করিয়াছেন শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ ও শত্রুতা সম্বন্ধে। শশাঙ্ক নাকি একবার কুশীনগরে এক বিহারের ভিক্ষুদের বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন, পাটলিপুত্রে বুদ্ধপদাঙ্কিত একখণ্ড প্রস্তর গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম কাটিয়া ফেলিয়া উহার মূল পর্যন্ত ধ্বংস করিয়া পুড়াইয়া দিয়াছিলেন, একটি বুদ্ধমূর্তি সরাইয়া সেখানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সাধারণভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যু সম্বন্ধেও য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ একটি অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সেই-প্রসঙ্গেও শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ এবং তাহার ফলে শশাঙ্কের শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত আছে। বোধিদ্রুম ধ্বংস ও এই মৃত্যু-কাহিনীর প্রতিধ্বনি মঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থেও আছে। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ বৌদ্ধ শ্রমণ, আংশিকত হর্ষবর্দ্ধনের প্রসাদপ্রার্থী এবং সেই হেতু শশাঙ্কের প্রতি বিদ্বিষ্ট। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পও বৌদ্ধলেখকের রচনা এবং বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত গ্রন্থ। কাজেই এ-বিষয়ে ইহাদের সাক্ষ্য প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা একটু কঠিন, বিশেষত য়ুয়ান-চোয়াঙের সাক্ষ্য; কারণ, শশাঙ্ক-হর্ষবর্দ্ধন বা শশাঙ্ক-বৌদ্ধধর্ম ব্যাপারে এই বিদেশী শ্রমণ সর্বত্র অপক্ষপাত দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নাই। তবু, একটু আগেই ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের রাজবংশের ও রাষ্ট্রের বৌদ্ধধর্মের প্রতি ঔদাসীন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগের যে সংক্ষিপ্ত যুক্তি আমি উপস্থিত করিয়াছি তাহার পটভূমিকায় শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ কাহিনী একেবারে নিছক

শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ?

অনৈতিহাসিক কল্পনা, এমন মনে হয় না। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ যে-সব ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে অত্যুক্তি প্রচুর, সন্দেহ নাই; কিন্তু মোটামুটিভাবে এ-কথা উড়াইয়া দেওয়া যায় না যে, শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভূত ক্ষতিও করিয়াছিলেন। কিছুটা সত্য কোথাও না থাকিলে য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ বারবার একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি করিয়া গিয়াছেন, একথা মনে করা একটু কঠিন। এমন কি, তিনি যখন বলিয়াছেন, কর্ণসুবর্ণরাজ কর্তৃক বৌদ্ধধর্মের ক্ষতির খানিকটা পূরণ এবং ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই হর্ষবর্দ্ধনের সিংহাসনারোহণ প্রয়োজন, বোধিসত্ব হর্ষকে তাহাই বুঝাইয়াছিলেন, তখন মনে হয়, খুব জোর দিয়াই য়ুয়ান-চোয়াঙ্ শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষের কথা বলিতেছেন। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের লেখকও একজায়গায় শশাঙ্ককে দুষ্কর্মকারী এবং চরিত্রহীন বলিয়াছেন; বৌদ্ধলেখক বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষীর সম্বন্ধে খুব সংযত ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন নাই, একথা অনস্বীকার্য; কিন্তু, কোথাও সত্যের বীজ একটু সুপ্ত না থাকিলে শতাব্দীর লোকস্মৃতিই বা এই ইঙ্গিত ধরিয়া রাখিবে কেন?

শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষের কারণ অনুমান সহজেই করা যায়। প্রথমত, এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছিল বাংলা ও আসামের সর্বত্র; তাহার নানা সাক্ষ্য-প্রমাণ আগেই উল্লেখ করিয়াছি। কোনো কোনো রাজবংশ এই নবধর্ম ও সংস্কৃতির গোঁড়া পোষক ও ধারক হইবেন, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত, যে-সব উচ্চকোটি শ্রেণীসমূহের মধ্যে এই ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিতেছিল সেই সব শ্রেণীই তো রাষ্ট্রের প্রধান ধারক ও সমর্থক; কাজেই, তাঁহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও সহায়ক হইবে রাষ্ট্র, ইহা আর বিচিত্র কি? এই যুগের সকল রাজবংশই তো ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী। দ্বিতীয়ত, শশাঙ্কর অন্যতম প্রধান শত্রু হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধধর্মের অতি বড় পোষক; শত্রুর আশ্রিত ও লালিত ধর্ম নিজের ধর্ম না হইলে তাহার প্রতি বিদ্বেষ স্বাভাবিক। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ শশাঙ্কের অপকীর্তি যে-সব স্থানের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির অবস্থিতি বাংলার বাহিরে। অন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ বিদ্যমান থাকাও অসম্ভব নয়, যথা বাণিজ্যে বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি। তৃতীয়ত, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ও বর্ধিষ্ণু অবস্থা হয়তো ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী রাজার খুব রুচিকর ছিল না। য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণী পাঠে মনে হয়, বাংলার পাঁচটি বিভাগেই বৌদ্ধধর্ম ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব, প্রসার ও প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল—শশাঙ্কের সময়ে এবং পরেও। সেই যুগে, এবং পারিপার্শ্বিক ধর্ম ও সংস্কৃতির অবস্থা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থার পরিবেশের মধ্যে শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষী হওয়া খুব বিচিত্র বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এই সময় বৌদ্ধ-চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রতি একটা বিরূপ মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিতেছিল, এরূপ ইঙ্গিত দুর্লভ নয়। তবে, কি উপায়ে এবং কতটুকু অনিষ্ট তিনি করিতে পারিয়াছিলেন এ-সম্বন্ধে য়ুয়ান-চোয়াঙ্ পক্ষপাতশূন্য মত্ দিতে পারিয়াছেন, স্বীকার করা কঠিন। খুব কিছু অনিষ্ট যে করিতে পারেন নাই তাহা তো য়ুয়ান-চোয়াঙ্ ও ই-ৎসিঙের বিবরণীতেই সুস্পষ্ট। তাহা হইলে শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত

পরে য়ুয়ান-চোয়াঙ্ এবং ৫০ বৎসর পরে ই-ৎসিঙ্ বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের এতটা সমৃদ্ধি দেখিতে পাইতেন না।

এই প্রসঙ্গের আলোচনার প্রয়োজন হইল শশাঙ্ক-চরিত্রের কলঙ্ক-মুক্তির চেষ্টায় নয়; ইহার সামাজিক ইঙ্গিত উদ্‌ঘাটনের জন্য। বাঙালীর জনসাধারণের ইতিহাসের দিক হইতে শশাঙ্ক-চরিত্র রাহুমুক্ত হইল কি না হইল, সে-প্রশ্ন অবান্তর; সে-প্রশ্ন একান্তই ব্যক্তিক। কিন্তু, এই প্রসঙ্গ তাহা নয়। শশাঙ্ক যদি বৌদ্ধ-বিদ্বিষ্ট হইয়া থাকেন তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, তাঁহার বা তাঁহার রাষ্ট্রের সামাজিক সমগ্রতা সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল না, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে রাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্ব ছিল, এবং সমাজের একটা অংশ, যত ক্ষুদ্র বা বৃহৎই হউক, রাষ্ট্রের পোষকতা লাভ করিতে পারে নাই। যদি শশাঙ্ক বৌদ্ধ-বিদ্বিষ্ট না হইয়া থাকেন তাহা হইলেও এই স্বীকৃতি মিথ্যা হইয়া যাইবে না, কারণ, এই প্রসঙ্গের সূচনায় আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, সুদীর্ঘ দেড়শত বৎসর ধরিয়া কোনো রাষ্ট্র বা রাজবংশই সমসাময়িক বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কোনো পোষকতা করেন নাই; অন্য দিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি তাঁহাদের অবারিত কৃপা লাভ করিয়াছে, এবং তাঁহাদের সকলেরই আশ্রয় ঐ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি।

ইহার সামাজিক অর্থ

৬

৬৪৬ বা ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর চীনা-পুরাণের মতে ন-ফু-টি ও-লো-ন-স্যুয়েন (অর্জুন বা অরুণাশ্ব) নামে তি-ন-ফু-তি বা তীরভুক্তির (তিরহুত) শাসনকর্তা পুষ্যভূতি-সিংহাসন দখল করেন। অর্জুন বা অরুণাশ্ব মগধে হর্ষবর্দ্ধনের নিকট প্রেরিত এক চীনা রাজদূত ওয়াঙ্-হিউয়েন-ৎসের সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গোদের হত্যা করেন; রাজদূত নেপালে পলাইয়া গিয়া সে-দেশ ও তিব্বত হইতে একদল সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া অরুণাশ্বের রাজধানী (বোধ হয় মগধ) ও অন্যান্য বহু প্রাচীরবেষ্টিত নগর ধ্বংস করেন, এবং অরুণাশ্বকে বন্দী করিয়া চীনদেশে লইয়া যান। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সাহায্যও তিনি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া চীনা-ইতিহাসে বর্ণিত আছে। এই ঘটনা বোধ হয় ঘটিয়াছিল ৬৪৮-র গোড়ায় বা শেষে; কিন্তু চীনা রাজবৃত্ত-বর্ণিত এই কাহিনী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। তবে, এ-তথ্য নিঃসংশয় যে, হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর পূর্ব-ভারতের রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার সুযোগে চীন-তিব্বত-কামরূপের লোলুপ দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তিব্বতরাজ স্রং-ৎসন-গ্যাম্পো (৬০০-৬৫০) ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আবর্তে যোগদান করিয়াছিলেন। এই বহুখ্যাত তিব্বতী বৌদ্ধ নরপতি আসাম ও নেপাল, এবং ভারতবর্ষের বহুস্থান জয় করিয়াছিলেন বলিয়া

মাৎস্যন্যায়ের শতবৎসর আনু ৬৫০—৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ

দাবি করা হইয়াছে। মনে হয়, এই দাবি একেবারে নিরর্থক নয়। গ্যাম্পোর আমল হইতে আরম্ভ করিয়া নেপাল তো প্রায় দুইশত বৎসর তিব্বতের অধীন ছিল। কামরূপে ভাস্করবর্মার রাজবংশ এক ম্লেচ্ছরাজ কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল, এ-তথ্যও সুবিদিত। এই ম্লেচ্ছরাজ গ্যাম্পো হওয়া বিচিত্র নয়, অথবা, গ্যাম্পোর মতই ভোট-ব্রহ্মীয় কোনো নরপতিও হইতে পারেন। কামরূপের শালস্তম্ভ ও তদ্‌বংশীয় রাজারা যে ভোট-ব্রহ্ম নরগোষ্ঠীরই প্রতিনিধি, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ কি? গ্যাম্পো ৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তনুত্যাগ করেন, এবং তাঁহার পৌত্র কি-লি-প-পু (৬৫০-৬৭৯) তিব্বতের অধিপতি হন; তিনিও দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন, এবং মধ্য-ভারত পর্যন্ত তাঁহার রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তৃত ছিল। ৭০২ খৃষ্টাব্দে নেপাল ও মধ্যভারত তিব্বতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, কিন্তু এই বিদ্রোহ বোধ হয় রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে নাই। কারণ, ৭১৩ হইতে ৭৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে তিব্বতী ও আরবীদের বিরুদ্ধে সহায়তা প্রার্থনা করিয়া মধ্য-ভারত হইতে এক দৌত্য চীন রাজসভায় প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া চীনা-রাজবৃত্তে বর্ণিত আছে। চীনা ইতিহাসের মধ্য-ভারত সাধারণত বর্তমান বিহার অঞ্চলকেই বুঝায়, অন্তত এই যুগে। যাহা হউক, এই সব রাষ্ট্রীয় উপপ্লবের ঢেউ বাংলা দেশে আসিয়াও লাগিয়াছিল সন্দেহ নাই। তিব্বত-রাষ্ট্রের ভীতিশঙ্কাময়

তিব্বত ও বাংলা

প্রভাব বহুদিন ভারতবর্ষে, বিশেষত কাশ্মীর, কামরূপ, নেপাল এবং বাংলা দেশে সক্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয়, এবং সম্ভবত শুধু সপ্তম শতকেই নয়, সমস্ত অষ্টম শতক এবং নবম শতকের কিয়দংশ জুড়িয়া বাংলাদেশকে বার বার তিব্বতী অভিযানে বিব্রত ও পর্যুদস্ত হইতে হইয়াছিল, এমন কি পাল-সম্রাট ধর্মপাল সিংহাসন আরোহণ করিবার পরও। নারায়ণপালের রাজত্বকালেও একাধিক তিব্বতী সামরিক অভিযান বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। তিব্বতরাজ খ্রী-স্রং-ল্দে-ব্‌ৎসন্ (Khri-srong-lde-tsan, 755-97) ভারতবর্ষ জয়ের দাবি করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র মু-তিগ্-ব্‌ৎসন্-পো (Mu-tig-Btsen-po)ও ভারতবর্ষে বিজয়বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন:

> "In the south the Indian kings there established the Raja Dharma-dpal and Drahu-dpun, both waiting in their lands under order to shut up their armies, yielded the Indian kingdom in subjection to Tibet: the wealth of the Indian country, gems and all kinds of excellent provisions, they punctually paid. The two great kings of India, upper & lower, out of kindness to themselves (or in obedience to him), pay honour to commands".

ধর্মপালের উল্লেখ তো সুস্পষ্ট, কিন্তু Drahu-dpun কে, বলা কঠিন। আর একজন তিব্বত-রাজ, রল্-প-চন্ (Ral-pa-can, আ ৮১৭—৮৩৬) বাংলা দেশ জয় করিয়া একেবারে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া লদাকী-রাজবৃত্তে দাবি

করা হইয়াছে। তিব্বতী ও লদাকী-রাজতরঙ্গিনীর এই সব দাবিদাওয়া কতখানি সত্য, অত্যুক্তি কতখানি আছে বা নাই, বলা কঠিন। তবে, সপ্তম শতকের মাঝামাঝি হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে নবম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত একদিকে কামরূপ-বাংলা-বিহারকে এবং অন্যদিকে নেপাল ও কাশ্মীরকে বারবার তিব্বতী রাষ্ট্রীয় ও সামরিক পরাক্রমের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বঙ্গ-তিব্বত ইতিহাসের এই বিরোধ-মিলনপর্ব আজও খুব সুবিদিত নয়; তথ্য স্বল্প, অস্পষ্ট এবং অসমর্থিত। তবে, এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, মাৎস্যন্যায়ের পর্বে একশত বৎসর ধরিয়া যে রাষ্ট্রীয় দুর্যোগে বাংলার আকাশ সমাচ্ছন্ন তাহার খানিকটা মেঘ ও ঝড়ে বহিয়া আসিয়াছে তিব্বতের হিমতুষারময় পার্বত্যদেশ হইতে।

হর্ষের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মগধ রাষ্ট্রীয় দুর্যোগে বিপর্যস্ত হইয়াছিল। বোধ হয়, এই বিপর্যয়ের পর্বেই মগধে এক নবগুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের প্রথম রাজা আদিত্যসেন (গুপ্ত); ইনি মাধবগুপ্তের পুত্র এবং পূর্বকথিত মহাসেনগুপ্তের প্রপৌত্র। কাজেই মগধের উপর বংশগত অধিকারের দাবি আদিত্যসেনের ছিলই। আদিত্যসেন এবং তাঁহার তিনজন বংশধর প্রত্যেকেই স্বাধীন মহারাজাধিরাজরূপে পর পর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন, প্রায় অষ্টম শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত। বাংলা দেশের কোনো অংশ এই রাজবংশের করায়ত্ত ছিল কিনা বলা কঠিন; ছিল না বলিয়াই মনে হয়। তবে নিজেদের লিপিতে চতুঃসমুদ্র পর্যন্ত রাজ্যজয় এবং উত্তরাপথনাথ হইবার দাবি যে-ভাবে জানানো হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ইহাদের রাষ্ট্রীয় প্রভাব একেবারে তুচ্ছ করিবার মতন ছিল না।

নবগুপ্তবংশ

এই নবগুপ্তবংশের কোনো রাষ্ট্রীয় আধিপত্য থাকুক বা না থাকুক, অষ্টম শতকের প্রথম পাদের শেষে অথবা দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভেই শৈলবংশীয় কোন রাজা পৌণ্ড্রদেশ অর্থাৎ উত্তর-বঙ্গ জয় করিয়াছিলেন এবং পৌণ্ড্রাধিপকে হত্যা করিয়াছিলেন। শৈলবংশ হিমালয় উপত্যকাবাসী; কিন্তু ইহাদের রাষ্ট্রীয় পরাক্রম বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া গুর্জর, কাশী এবং বিন্ধ্য অঞ্চল গ্রাস করিয়াছিল। কিন্তু ইহাদের পৌণ্ড্রাধিকার বা ইহাদের বংশ ও রাজত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

শৈলাধিপত্য

বাংলা দেশে এই সব বৈদেশিক আক্রমণ ও তৎসংপৃক্ত রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল কনৌজরাজ যশোবর্মার মগধ এবং গৌড়াক্রমণ ও বিজয়ের ফলে। এই দুর্ধর্ষ বিজয়মদমত্ত রাজা ৭২৫ হইতে ৭৩৫এর মধ্যে কোনো সময় মগধাক্রমণ করিয়া মগধরাজকে প্রথমত বিন্ধ্য পর্বতে পলাইয়া যাইতে বাধ্য করেন, পরে সম্মুখ যুদ্ধে তাঁহাকে নিহত এবং তাঁহার সৈন্য-সামন্তদিগকে পরাজিত করেন। বোধ হয় মগধ জয়ের পর তিনি গৌড়রাজকেও পরাজিত ও নিহত করেন। বাক্‌পতিরাজ তাঁহার সভাকবি ছিলেন, এবং তিনি এই মগধ ও গৌড় বিজয়কাহিনী লইয়া গৌড়বহ নামে একটি (অসমাপ্ত?) প্রাকৃত কাব্য

যশোবর্মা কর্তৃক মগধ-গৌড়-বঙ্গ জয়

রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যে গৌড়রাজ-বধের কাহিনী যে-ভাবে প্রসঙ্গক্রমে মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, এবং সমস্ত কাহিনীটির বর্ণনা যে-ভাবে করা হইয়াছে তাহাতে এই অনুমান স্বাভাবিক যে, এই সময় গৌড়ের রাজাই মগধেরও রাজা ছিলেন এবং দুইজনই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু তিনি কে ছিলেন বলা কঠিন। মগধ ও গৌড় বিজয়ের পর যশোবর্মা সমুদ্রতীরের দিকে অগ্রসর হন এবং বঙ্গদেশও জয় করেন। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, প্রায় সমস্ত বাংলাদেশই তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল। কিন্তু যশোবর্মা অধিকদিন তাঁহার এই বৈদ্যুতিক দিগ্বিজয় ভোগ করিতে পারেন নাই।

সম্ভবত ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরই যশোবর্মা কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য কর্তৃক অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হ'ন। ললিতাদিত্য কর্তৃক উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে বহু রাজ্যবিজয়ের কথা কহ্লন্ রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব বিবরণের ঐতিহাসিকত্ব কতটুকু বলা কঠিন; তবে কহ্লনের বিবৃতি পাঠ করিলে মনে হয়, গৌড় কিছুদিনের জন্য হইলেও কাশ্মীরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। গৌড়রাজকে কাশ্মীররাজের আদেশে একদল হস্তীসেনা লইয়া কাশ্মীরে যাইতে হইয়াছিল। কাশ্মীররাজ সম্বন্ধে গৌড়রাজের বোধ হয় কিছু ভীতি ও অবিশ্বাসের কারণ ছিল; সেই হেতু ললিতাদিত্য বিষ্ণুমূর্তি সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, গৌড়রাজের কিছু অনিষ্ট তিনি করিবেন না। কিন্তু গৌড়রাজ কাশ্মীরে পৌঁছিবার পর ললিতাদিত্য এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই; গৌড়রাজকে তিনি হত্যা করেন। একদল গৌড়বাসী এই হত্যার প্রতিশোধ মানসে তীর্থযাত্রী সাজিয়া কাশ্মীরে গমন করেন, এবং ললিতাদিত্যের শপথসাক্ষী বিষ্ণুমূর্তি ও মন্দির ধ্বংস করেন। ইতিমধ্যে কাশ্মীররাজের সৈন্তেরা আসিয়া সমস্ত গৌড়বাসিদের খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে। এই কাহিনীর উল্লেখের কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এই উপলক্ষে কাশ্মীর-সন্তান কহ্লন্ গৌড়বাসীদের প্রভুভক্তি, সাহস ও শৌর্য সম্বন্ধে যে স্তুতিবাদ কাব্যস্থ করিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য, এবং সেই জন্যই এই কাহিনীর উল্লেখ। কহ্লন্ বলিতেছেন: গৌড়বাসীরা এই ব্যাপারে যাহা করিয়াছিল তাহা বরং সৃষ্টিকর্তারও অসাধ্য বলিলে কিছু অত্যুক্তি হয় না (৩৩২ শ্লোক)। [কহ্লনের সময়েও] রামস্বামীর মন্দিরটি যেমন একদিকে দেবতাশূন্য হইয়া পড়িয়া আছে, তেমনই সেই গৌড়বীরদের অপূর্ব যশোগানে সমগ্র পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া আছে। (৩৩৫ শ্লোক)।

কাশ্মীর ও বাংলা

ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় সম্বন্ধে কহ্লন্ আর একটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। জয়াপীড় দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া নিজের সৈন্যদল কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একা ঘুরিতে ঘুরিতে পুণ্ড্রবর্ধন নগরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ছদ্মবেশে এক বারাঙ্গনার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জয়ন্ত নামে এক ব্যক্তি তখন পুণ্ড্রবর্ধনের সামন্ত-রাজা; গৌড়ের রাজাদের তিনি অন্যতম সামন্ত। জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীর সঙ্গে জয়াপীড়ের প্রণয় সঞ্জাত হয়, এবং তিনি

তাঁহাকে বিবাহ করিয়া পঞ্চগৌড়াধিপতিদের পরাজিত করেন, এবং জয়ন্তকে তাঁহাদের অধিরাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কহ্লনের এই সব কাহিনীর ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া কঠিন; তবে মনে হয়, এই সময় গৌড়দেশ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বহুধা বিভক্ত ছিল, এবং সর্বব্যাপী কোনো রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের অস্তিত্ব ছিলনা, স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাই নিজ নিজ স্থানে রাষ্ট্রপ্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই অবস্থায় বৈপ্রান্তিক পরাক্রান্ত শক্তিদের দ্বারা বারবার পর্যুদস্ত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়!

আনুমানিক অষ্টম শতকের দ্বিতীয় পাদে গৌড়ে আর একটি বৈপ্রান্তিক অভিযানের খবর পাওয়া যায়। নেপালের লিচ্ছবিরাজ দ্বিতীয় জয়দেবের একটি লিপিতে দেখিতেছি (৭৫৯ অথবা ৭৪৮), জয়দেবের শ্বশুর (কামরূপের?) ভগদত্তবংশীয় হর্ষ গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ এবং কোশলের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

ভগদত্ত-বংশীয় হর্ষ

এই সব বিচিত্র বৈপ্রান্তিক বিজয়ী সমরাভিযান বাহিরের বা বাংলাদেশের কোনো লিপি বা অন্য কোনো স্বতন্ত্র সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা অসমর্থিত; সুতরাং ইহাদের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া কঠিন। তবে, সদ্যোক্ত সমস্ত সাক্ষ্যগুলি একত্র করিলে এই তথ্যই মনকে অধিকার করে যে, এই একশত বৎসর গৌড়রাষ্ট্রে সর্বময় প্রভু কেহ ছিলেন না, রাষ্ট্রের কোনো সামগ্রিক ঐক্য ছিলনা; এবং এই সমৃদ্ধ অথচ বহুধা বিভক্ত দেশ-পরিবার ভিন্‌-প্রদেশি রাজা ও রাষ্ট্রের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল।

গৌড়তন্ত্রের যখন এই অবস্থা বঙ্গরাষ্ট্রের অবস্থাও যে তখন ইহার চেয়ে উন্নত ও দৃঢ় ছিল তাহা বলা যায় না। তবে, আগেকার পর্বে দেখিয়াছি, বঙ্গ ও সমতট রাষ্ট্র সপ্তম শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত খড়্গ ও রাত বংশের নায়কত্বে একটা মোটামুটি সামগ্রিক ঐক্য বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। ভৌগোলিক দূরত্ব এবং কতকটা অনধিগম্যতাও বোধ হয় তাহার অন্যতম কারণ। সুপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ও রাষ্ট্রও তাহার অন্যতম কারণ হইতে পারে। বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক তিব্বতী লামা তারনাথের মতে খড়্গবংশের পতনের পর বঙ্গরাষ্ট্র চন্দ্রবংশীয় রাজাদের করায়ত্ত হয় এবং তাঁহারা বঙ্গে, এবং কখনো কখনো গৌড়ে, প্রায় অষ্টম শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। গোবিন্দচন্দ্র এবং ললিতচন্দ্র এই বংশের শেষ দুই রাজা; বোধ হয় ললিতচন্দ্রের আমলে বঙ্গ যশোবর্মার বিজয়ী সমরাভিযানের সম্মুখীন হইয়াছিল। এই রাজা যিনিই হউন, গৌড়বহের কবি বাক্‌পতিরাজ তৎকালীন বঙ্গবীরদের পরোক্ষে খুবই সুখ্যাতি করিয়াছেন। পরাজয়ের পর বঙ্গবীরেরা যখন যশোবর্মার সম্মুখে শির অবনত করিয়াছিল তখন তাহাদের মুখমণ্ডল (লজ্জা ও অপমানে) রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, কারণ তাহারা এইরূপ পরাজয়ে (লজ্জা ও অপমান স্বীকারে) অভ্যস্ত ছিল না (৪২০ শ্লোক)।

চন্দ্রবংশ

বঙ্গবীরদের অপমান

তারনাথের বিবৃতিমতে ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া অভূতপূর্ব নৈরাজ্যের সূত্রপাত হয়। গৌড়ে-বঙ্গে-সমতটে তখন আর কোনো রাজার আধিপত্য নাই, সর্বময় রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব তো নাইই। রাষ্ট্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন; ক্ষত্রিয়, বণিক, ব্রাহ্মণ, নাগরিক স্ব স্ব গৃহে সকলেই রাজা। আজ একজন রাজা হইতেছেন, রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব দাবি করিতেছেন, কাল তাঁহার ছিন্ন মস্তক ধূলায় লুটাইতেছে। ইহার চেয়ে নৈরাজ্যের বাস্তব চিত্র আর কি হইতে পারে! প্রায় সমসাময়িক লিপি (যেমন, খালিমপুর লিপি) এবং কাব্যে (যেমন, রামচরিত) এই ধরনের নৈরাজ্যকে বলা হইয়াছে মাৎস্যন্যায়। রাজা নাই, অথচ সকলেই রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের দাবিদার। বাহুবলই একমাত্র বল, সমস্ত দেশময় উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খল শক্তির উন্মত্ততা—এই যখন হয় দেশের অবস্থা, প্রাচীন অর্থশাস্ত্রে তাহাকেই বলে মাৎস্যন্যায়, অর্থাৎ বৃহৎ মৎস্য কর্তৃক ক্ষুদ্র মৎস্য-গ্রাসের যে ন্যায় বা যুক্তি সেই ন্যায়ের অপ্রতিহত রাজত্ব! বৎসরের পর বৎসর বাংলাদেশ এই মাৎস্যন্যায় দ্বারা পীড়িত হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত এই উৎপীড়ন যখন আর সহ্য হইল না তখন সমগ্র বাংলাদেশের রাষ্ট্র-নায়েকরা একত্র হইয়া নিজেদেরই মধ্য হইতে একজনকে অধিরাজ বলিয়া নির্বাচন করিলেন এবং তাঁহার সর্বময় আধিপত্য মানিয়া লইলেন—এই রাষ্ট্রনায়ক অধিরাজটির নাম গোপালদেব। কিন্তু এই বিপ্লবগর্ভ ইতিহাস পরবর্তী পর্বের।

নৈরাজ্য: মাৎস্যন্যায়

এই মাৎস্যন্যায়ের অপ্রতিহত রাজত্ব গোপালদেবের নির্বাচনের পূর্ববর্তী কয়েক বৎসরেই শুধু আবদ্ধ নয়; এ-রাজত্ব চলিয়াছিল একশত বৎসর ধরিয়া—সপ্তম শতকের মাঝামাঝি হইতে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই পর্ব জুড়িয়াই তো বৃহৎ মৎস্য কর্তৃক বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্ররূপ মৎস্য-ভক্ষণের যুক্তি বিস্তৃত। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার শশাঙ্কের পর হইতেই গৌড়তন্ত্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ দিতেছেন; শশাঙ্কের পর যাঁহারা রাজা হইতেছেন তাহারা কেহই পুরা এক বৎসর রাজত্ব করিতে পারিতেছেন না! শিশু নামক এক রাজার রাজত্বকালে নারীর প্রতাপ ও প্রভাব দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং হতভাগ্য রাজা একপক্ষকাল মাত্র রাজত্ব করিবার পরই নাকি নিহত হন। বারবার বৈদেশিক রাষ্ট্র ও রাজাকর্তৃক পরাজিত পর্যুদস্ত হওয়ার কথা তো আগেই বলিয়াছি। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে এই পর্বেই আবার পূর্বপ্রত্যন্ত দেশে এক নিদারুণ দুর্ভিক্ষের খবরও পাওয়া যাইতেছে। এ-সমস্ত বিবরণ একত্র করিলে মনে হয়, এই সুদীর্ঘ একশত বৎসর বাংলাদেশে—অন্তত গৌড়ে—কোথাও কোনো সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বজায় ছিল না। খালিমপুর লিপিতে আছে, মাৎস্যন্যায় দূর করিবার জন্যই প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালকে রাজা নির্বাচন করিয়াছিল, কিন্তু এই প্রকৃতিপুঞ্জ মাৎস্যন্যায়ের ফলে কতদূর উৎপীড়িত হইয়াছিল তাহা এই সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও উল্লেখের ভিতর হইতে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় না; কিন্তু অবস্থা যে খুবই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এই মাৎস্যন্যায়ের সামাজিক ইঙ্গিত ধরিবার মতন সাক্ষ্য-প্রমাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চাতের ইতিহাসের ধারা হইতে মোটামুটি অনুমান হয়তো একেবারে অসম্ভব নয়। প্রথমত, রাষ্ট্রের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা খুব ভাল থাকিবার কথা নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের পশ্চাতে রাষ্ট্রের যে সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা-বিন্যাস থাকা প্রয়োজন এই যুগে তাহার কোনো সাক্ষ্যই পাওয়া যাইতেছে না; শান্তি ও শৃঙ্খলা যেখানে অব্যাহত নাই সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি কল্পনা করা কঠিন। ইহার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, সুবর্ণমুদ্রা এমন কি রৌপ্য মুদ্রারও অপ্রচলন হইতে; বস্তুত এই যুগের কোনো প্রকার মূল্যবান ধাতব মুদ্রা বাংলাদেশের কোথাও এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। শশাঙ্ক-জয়নাগের কালে রৌপ্যমুদ্রা ছিল না, কিন্তু যত অপকৃষ্ট বা নকলই হউক না কেন, সুবর্ণমুদ্রা তো ছিল। বাংলাদেশের মুদ্রাজগৎ হইতে সুবর্ণমুদ্রা এই যে অন্তর্হিত হইল মুসলমান আমলের আগে আর তাহা ফিরিয়া আসে নাই। আর একটি পরোক্ষ প্রমাণ পাইতেছি, তাম্রলিপ্তির ইতিহাসের মধ্যে। সপ্তম শতকের শেষ পাদেও ই-ৎসিঙ্ তাম্রলিপ্তি বন্দরের উল্লেখ করিতেছেন; অষ্টম শতকের সাক্ষ্যেও, যেমন, দুধপানি পাহাড়ের লিপিতে, ২।১ বার তাম্রলিপ্তির উল্লেখ পাইতেছি, কিন্তু এই সব উল্লেখ হয় প্রাচীনতর স্মৃতিবহ অথবা শুধু উল্লেখই মাত্র; তাম্রলিপ্তির সেই সম্পদ-সমৃদ্ধির কথা আর কেহ বলিতেছেন না। অষ্টম শতকের শেষার্ধ হইতে উল্লেখও আর পাওয়া যাইতেছে না, এবং চতুর্দশ শতকের আগে সমগ্র বাংলাদেশের আর কোথাও বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের আর কোনো বন্দরই গড়িয়া উঠিল না! বস্তুত, সপ্তম শতকের চতুর্থপাদ হইতে অষ্টম শতকের মাঝামাঝির মধ্যে একমাত্র সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্তির সৌভাগ্য চিরতরে ডুবিয়া গেল! সরস্বতীর প্রাচীনতর খাত্ বন্ধ হওয়া ইহার একটি কারণ হইতে পারে, কিন্তু সুদীর্ঘকাল জুড়িয়া দেশব্যাপী এই অরাজকতাও অন্যতম কারণ নয়, তাহা কে বলিবে? দেশের অর্থসম্পদ ছিল না এ-কথা সত্য নয়, কিন্তু এই অর্থসম্পদ ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ নয় বলিয়াই যেন মনে হয়—ভূমিলব্ধ, কৃষিলব্ধ সম্পদ। তিব্বতরাজ খ্রি-স্রোঙ্-দে-ৎসন্ এবং মু-তিগ-ব্‌ৎসন্‌-পো'র সঙ্গে ধর্মপালের সম্বন্ধের কথা আগেই বলিয়াছি; সেই সময়ও বাংলা দেশ যথেষ্ট সম্পদশালী, শস্য ও মণিমাণিক্যে সমৃদ্ধ, এবং এই সব শস্য ও মণিমুক্তা সম্পদ নিয়মিত তিব্বতে প্রেরিত হইত বাৎসরিক উপঢৌকন রূপে। ইহার কিছু অবশ্য অন্তর্দেশি ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ হইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর দেশের সামাজিক ধন ক্রমশ যে উত্তরোত্তর কৃষিলব্ধ ধনে বিবর্তিত হইতেছে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। কারণ, পরবর্তী পালযুগে বাংলার সমাজ প্রধানত কৃষি এবং গৃহশিল্পনির্ভর হইয়া পড়িয়াছে, অধিকাংশই কৃষিনির্ভর, কারণ, রাষ্ট্রে কৃষক বা ক্ষেত্রকর সমাজের স্থান যদি বা উল্লিখিত হইতেছে, শিল্পী বা বণিক সমাজ পৃথকভাবে উল্লিখিত

সামাজিক ইঙ্গিত

ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি

হইতেছে না। দেখা যাইবে, ভূমির চাহিদাও পরবর্তীকালে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাইতেছে।

রাষ্ট্রবিন্যাস ব্যাপারে নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই; সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রায় অনুপস্থিত। তবে, এই যুগের রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইতেছে সামন্ততন্ত্র। সর্বময় অধিরাজ কেহ সাধারণত নাই, থাকিলে তো মাৎস্যন্যায়ই হইতে পারিতনা। সামন্তরাই এ-যুগের নায়ক, এবং সকলেই স্ব স্ব প্রধান। বঙ্গে-সমতটে খড়্গ-বংশীয় রাজারা রাজতন্ত্র হয়তো বজায় রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এই রাজতন্ত্রেও সামন্তরা প্রবল ও পরাক্রান্ত। লোকনাথের বংশ সামন্তবংশ, সামন্ত লোকনাথেরও আবার সামন্ত ছিল। মাৎস্যন্যায়ের শেষ পর্বে এই সব সামন্ত নায়কেরাই তো একত্র হইয়া গোপলদেবকে রাজা নির্বাচিত করিয়াছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ বলিতে খালিমপুর-লিপি ও রামচরিত এই সব সামন্ত-নায়কদেরই বুঝাইতেছে; ইহারাই ছিলেন প্রকৃতির নায়ক।

সামন্ততন্ত্র

ধর্ম ও সংস্কৃতির কথা আগেকার রাজবৃত্ত-পর্বেই বলিয়াছি। বঙ্গের খড়্গ-বংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, এ-কথা আগেই বলা হইয়াছে; তাঁহারা বৌদ্ধধর্মের খুব উৎসাহী পোষকও ছিলেন। আর যাঁহাদের, যে-সব রাজা, রাজবংশ বা সামন্তদের খবর পাওয়া যাইতেছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী। এই একশত বৎসরের মধ্যে ভিন্‌দেশি বা বৈপ্রান্তিক যে-সব অভিযাত্রীরা বিরোধের মধ্য দিয়া বাংলা দেশের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিব্বতী স্রং-ৎসন্-গ্যাম্পো এবং তাঁহার পৌত্র কি-লি-প-পু ছাড়া আর প্রায় সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ই-ৎসিঙ ও সেংচি'র বিবরণী পড়িলে মনে হয়, বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও খুব কম ছিল না। কিন্তু যে-ধর্মের যেরূপ প্রভাবই থাকুক না কেন, এই দুর্যোগে দুর্দিনে সকল ধর্ম ও সংস্কৃতিকেই দেশব্যাপী অনিশ্চয়তা ও অরাজকতার কিছু কিছু ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল নিশ্চয়ই। তাহার কিছু কিছু প্রমাণ-পরিচয় বোধ হয় বাংলার দুই চারিটি ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া যায়। পাহাড়পুরে পাল-সম্রাট ধর্মপালের আমলে বৌদ্ধ সোমপুর-মহাবিহার প্রতিষ্ঠার আগে সেই স্থানে যে একটি জৈন-বিহার ছিল, এ-তথ্য পাহাড়পুরের পট্টোলীতেই (৪৭৮-৭৯) প্রমাণ; এই বিহারের ধ্বংসাবশেষের উপরই সোমপুর-মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও দেখা যায়, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের ধ্বংসস্তূপের উপর পরবর্তী পাল-আমলের বিহার-মন্দির ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। নিশ্চিত ভাবে বলিবার উপায় নাই, কিন্তু মনে হয়, এই সব ধ্বংসকার্য এই নৈরাজ্য ও বৈদেশিক আক্রমণের যুগেই সম্ভব হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, বৌদ্ধধর্মের যে সমৃদ্ধ অবস্থাই য়ুয়ান-চোয়াঙ, ই-ৎসিঙ ও সেংচি বর্ণনা করিয়া থাকুন না, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল, সন্দেহ নাই। প্রায় সমসাময়িক লোকনাথ-পট্টোলী এবং কৈলান পট্টোলীর সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শত শত বৌদ্ধ সংঘ, বিহার প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কার ক্রমশ জয়ী ও সর্বব্যাপী হইতেছিল। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার গোপালের

ধর্ম ও সংস্কৃতি

নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বেকার বাংলার কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন: 'এই সময় সমুদ্র পর্যন্ত বাংলাদেশ তীর্থিকদের (ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী) দ্বারা পরিপূর্ণ, বৌদ্ধ মঠগুলি ভাঙিয়া পড়িতেছে, এবং তাহারই ইটকাঠ কুড়াইয়া লোকে বাড়ী তৈয়ারী করিতেছে। দেশে অনেক ব্রাহ্মণ সামন্ত ভূম্যধিকারী ছিল, এবং গোপালও ব্রাহ্মণানুরক্ত ছিলেন।'

ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক্ হইতে একশত বৎসর ধরিয়া বাংলায় এক বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধিত হইতেছিল বলিয়া মনে হয়। যে সংস্কৃত ভাষা বাঙালী পণ্ডিতদের হাতে কোনো প্রকারে ভাব প্রকাশের উপায় মাত্র ছিল (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের সংস্কৃত লিপিগুলিই তাহার প্রমাণ), সেই সংস্কৃত ভাষা সপ্তম শতকের মাঝামাঝি, বিশেষভাবে পাল-আমলের সূত্রপাত হইতেই, অপূর্ব ছন্দলালিত্যময় কাব্যময় ভাব প্রকাশের বাহন হইয়া উঠিয়াছে (দ্রষ্টব্য, লোকনাথের লিপি, পাল-আমলের লিপিগুলি)। বৌদ্ধধর্ম আরও বিস্তৃত হইয়াছে শুধু তাহাই নয়, বাংলার বহুস্থানে সুবৃহৎ মহাবিহার ইত্যাদিও স্থাপিত হইতেছে অষ্টম শতকের শেষপাদ হইতেই, এবং বৌদ্ধ শিক্ষাদীক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। যে-ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবদেবীর সংখ্যা ও প্রসার ছিল সীমায়িত তাহাদের সংখ্যা যেমন বাড়িয়াছে, বিষ্ণু, শৈব, শাক্ত এবং নানা মিশ্র দেবদেবীতে দেশ যেমন ছাইয়া গিয়াছে, তেমনই তাঁহাদের প্রভাবও গিয়াছে বাড়িয়া। পাল-আমলের সূচনা হইতেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই সমৃদ্ধি দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সংস্কৃত ভাষার সমৃদ্ধিও দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের কারণ সুবোধ্য—পালবংশই তো প্রধানত বৌদ্ধবংশ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মও পূর্বযুগের অনুপাতে এই যুগে বহুতর বিস্তৃতি, প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, এমন কি বৌদ্ধধর্মেরও সাংস্কৃতিক আদর্শ অনেকটা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি অনুযায়ী। এই বিবর্তন সমস্তটাই সংঘটিত হইয়াছে মাৎস্যন্যায়ের একশত বৎসরের মধ্যে, এবং পাল-আমলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ার পর তাহার সম্পূর্ণ রূপটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই একশত বৎসরের বৈদেশিক আক্রমণের দুর্যোগ-দুর্বিপাককে আশ্রয় করিয়াই উত্তর-ভারতের ক্রমবর্ধমান ক্রমপ্রসারমান ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত ভাষা বাংলা দেশে আসিয়া বিস্তৃততর সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। আর, বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম যে পাল-আমল হইতে উত্তরোত্তর তান্ত্রিক হইয়াছে তাহার মূলে স্রং-ৎসন্-গ্যাম্পো এবং তাহার পৌত্রের এবং তাঁহারও পরবর্তী একাধিক তিব্বতী অভিযানের কোনো প্রভাব নাই, খড়্গ বংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের কোনো প্রভাব নাই, এ-কথাই বা কে বলিবে? খড়্গ বংশীয় রাজারা বহির্দেশাগত বলিয়াই তো মনে হয়। একশত বৎসরের রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের কোন্ ফাঁকে কে বা কাহারা কোন্ সংস্কৃতির ধারায় কোন্ নূতন স্রোত বহাইয়া দিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস তাহার হিসাব, এমন কি ইঙ্গিতও রাখে নাই। অথচ, বৃহৎ সামাজিক আবর্তন-বিবর্তন তো এই রকম দুর্যোগের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। বাংলাদেশেও তাহাই হইয়াছিল; নহিলে পাল-আমলের সূচনা হইতেই বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির, সংস্কৃত ভাষার এমন সুসমৃদ্ধ রূপ আমরা দেখিতে পাইতাম না।

৭

মাৎস্যন্যায় হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম বাংলার প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজা নির্বাচন করিয়াছিল সেই গোপালদেব ছিলেন দয়িতবিষ্ণুর পুত্র এবং বপ্যটের পৌত্র। সমসাময়িক যুগসুলভ পৌরাণিক বংশ-মর্যাদায় নিজেদের কৌলীন্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাল-অধিপতিদের কাহারও দেখা যায় না; বস্তুত, পাল-রাজাদের দলিলপত্রে অথবা রাজসভায় রচিত কোনো গ্রন্থেই সে-চেষ্টা নাই। খালিমপুর-লিপিতে তিনটি মাত্র শ্লোকে ধর্মপালের বংশ পরিচয়; প্রথম শ্লোকটিতে দয়িতবিষ্ণুর উল্লেখ, দ্বিতীয় শ্লোকে বপ্যটের; তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে মাৎস্যন্যায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়াছিল, অর্থাৎ রাজা নির্বাচন করিয়াছিল। তাঁহারই পুত্র ধর্মপাল।

পালান্বয়

এই প্রকৃতিপুঞ্জ কাহারা? প্রকৃতির অভিধানগত অর্থ প্রজা। কিন্তু বাংলার তৎকালীন সমস্ত প্রজাবর্গ অর্থাৎ জনসাধারণ সম্মিলিত হইয়া গোপালকে রাজা নির্বাচন করিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। কেহ কেহ মনে করেন, প্রকৃতি অর্থ রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কর্মচারী, এবং গোপালকে রাজা নির্বাচন তাঁহারাই করিয়াছিলেন। এই মতও সমর্থনযোগ্য নয়; কারণ, সেই নৈরাজ্যের যুগে বাংলাদেশে পরস্পর বিবদমান অনেকগুলি রাষ্ট্রের আধিপত্য। কোন্ রাষ্ট্রের প্রধান কর্মচারীরা একত্র হইয়া এই নির্বাচন করিয়াছিলেন? একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের ব্যাপার হইলে হয়তো এইরূপ নির্বাচন সম্ভব হইতে পারিত, যেমন একবার কাশ্মীরে হইয়াছিল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে জলৌকের ক্ষেত্রে। সমস্ত প্রজাবর্গের সম্মিলিত নির্বাচনও সেই নৈরাজ্যের যুগে সম্ভব ছিল না; তাহা হইলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামন্ত-নায়কদের সঙ্গে প্রজাবর্গের একটা প্রবল বিরোধের ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যাইত। বরং মনে হয়, এই সামন্ত-নায়কেরাই বহু বৎসর নৈরাজ্য ও মাৎস্যন্যায়ে উৎপীড়িত হইয়া শেষ পর্যন্ত সকলে একত্র এই নির্বাচন কার্যটি নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। এই সামন্ত-নায়কদের এবং সামন্ততন্ত্রের কথা তো আগেই একাধিকবার ইঙ্গিত করিয়াছি; ইঁহাদের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা যে কম ছিলনা তাহাও বলিয়াছি। দেশে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র যখন বিদ্যমান তখনই সামন্ত-নায়কদের সংখ্যা অনেক; নৈরাজ্য ও মাৎস্যন্যায়ের পর্বে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র যখন দুর্বল হইয়া বা ভাঙিয়া পড়িয়াছে তখন ইঁহাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়াই গিয়াছে। বস্তুত, দেশ জুড়িয়া ছোট বড় এই সামন্ত-নায়কেরাই তখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ইঁহারা যখন দেশকে বারবার বৈদেশিক শত্রুর হাত হইতে আর বাঁচাইতে পারিলেন না, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে পারিলেন না, তখন একজন রাজা এবং একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা ছাড়া বাঁচিবার আর পথ ছিল না। ইঁহারাই গোপাল-নির্বাচনের নায়ক। যাহা হউক, এই শুভবুদ্ধির ফলে বাংলাদেশ নৈরাজ্যের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা এবং বৈদেশিক শত্রুর কাছে বারবার অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাইল। শুধু বাংলার

অভ্যুদয়
বংশ-পরিচয়
পিতৃভূমি

ইতিহাসে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসেই এই ধরনের শুভ সামাজিক বুদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় চেতনার দৃষ্টান্ত বিরল। পাল-রাজাদের লিপিতে এবং সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিতে এই নির্বাচন-কাহিনীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে কোথাও তাহা যথোচিত কীর্তন ও মর্যাদা লাভ করে নাই। তবে, লোকস্মৃতিতে ইহার গৌরব ও উদ্দীপনা ষোড়শ শতক পর্যন্তও জাগ্রত ছিল, তাহার প্রমাণ তারানাথের বিবরণীতে পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি কোনো সময় গোপালদেব পাল-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং দ্বাদশ শতকের তৃতীয় পাদে গোবিন্দপালের সঙ্গে সঙ্গে এই বংশের বিলয় ঘটে। সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন একটি রাজবংশের রাজত্ব খুব কম দেশের ইতিহাসেই দেখা যায়। গোপালদেবের কুলগৌরব কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না, তেমন দাবিও কোথাও করা হয় নাই। হয়তো তিনিও একজন অন্যতম সামন্ত-নায়ক ছিলেন। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার হরিভদ্রকৃতটীকায় ধর্মপালকে "রাজভটাদিবংশপতিত" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; খালিমপুর-লিপির "ভদ্রাত্মজা" শব্দ কেহ কেহ ধর্মপালের মাতা দেদ্দাদেবীর বিশেষণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই দুই পদের অর্থ লইয়া পণ্ডিত মহলে মতভেদের অন্ত নাই। মোটামুটি চেষ্টাটা হইয়াছে পালবংশের রাজকীয় আভিজাত্য প্রমাণের দিকে। কিন্তু এই দুইটি পদের একটিও নিঃসংশয়ে তেমন কিছু ইঙ্গিত করে না। তৃতীয় বিগ্রহপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে পাল-রাজাদের সূর্যবংশীয় বলা হইয়াছে ; সোড্ঢল কবির উদয়সুন্দরীকথায় পালরাজাদের সূর্যবংশীয় মান্ধাতা পরিবার-সম্ভূত বলা হইয়াছে ; কিন্তু এই সব দাবির মূলে কোনো সত্য আছে কিনা সন্দেহ। সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিতে ধর্মপালকে বলা হইয়াছে "সমুদ্রকুলদীপ" ; তারানাথও ধর্মপালের সঙ্গে সমুদ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত করিয়াছেন ; ঘনরামের ধর্মমঙ্গল-কাব্যেও সমুদ্রের সঙ্গে ধর্মপাল-মহিষীর একটা সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে। সমুদ্রাশ্রয়ী ও জলনিধিদুর্গনির্ভর গৌড়জনদের সঙ্গে অথবা সামুদ্রিক ও সমুদ্রাশ্রয়ী আদি-অষ্ট্রেলীয়-পলিনেশীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলার পাল-বংশের কোনো সম্বন্ধের ইঙ্গিত এই সব কাহিনীর সঙ্গে জড়িত থাকা অসম্ভব নয়। সুপ্রাচীন বাংলাদেশে, বাঙালীর জাতিতত্ত্ব ও ভাষায় এই নরগোষ্ঠীর দানের কথা তো আগে বিস্তৃতভাবেই উল্লেখ করিয়াছি। রামচরিতে এবং তারানাথের ইতিহাসে পাল-রাজাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি উপস্থিত করা হইয়াছে ; এ-দাবি কিছু অস্বাভাবিক নয়, কারণ ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিতে রাজা মাত্রেই ক্ষত্রিয়। ইহার ঐতিহাসিক বর্ণগত ভিত্তি কিছু না-ও থাকিতে পারে। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থে পালবংশকে বলা হইয়াছে "দাসজীবিনঃ" ; আবুল ফজল বলিয়াছেন "কায়স্থ"। যাহা হউক, উপরোক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে এ-তথ্য পরিষ্কার যে, ইহারা উচ্চতর বংশ বা বর্ণসম্ভূত নহেন, এমন কি আর্য-ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও সংস্কারের উত্তরাধিকারের দাবি পরোক্ষেও কোথাও তাঁহারা করেন নাই। সমসাময়িক রাজবংশের ইতিহাসে এই ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল।

সন্ধ্যাকর-নন্দী সুস্পষ্ট বলিতেছেন, পালরাজাদের জনকভূমি বরেন্দ্রীদেশ। ভোজদেবের গোয়ালিওর-লিপিতে পাল-রাজ(ধর্মপাল)কে বলা হইয়াছে বঙ্গপতি। ইহারা যে বাঙালী ছিলেন এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার এতটুকু কারণ নাই। মনে হয়, ইহাদের আদিভূমি বরেন্দ্রভূমি, এবং সেখানেই গোপাল কোনও সামন্ত-নায়ক ছিলেন; রাজা নির্বাচিত হইবার পর তিনি বঙ্গদেশেরও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং বোধ হয় গৌড়েরও। তারানাথ ঠিক এই কথাই বলিতেছেন: পুণ্ড্রবর্দ্ধনের কোনও ক্ষত্রিয়বংশে গোপালের জন্ম, কিন্তু পরে তিন ভঙ্গলের (=বঙ্গল বা বঙ্গালের) রাজা নির্বাচিত হন।

গোপালদেব বরেন্দ্রী ও বঙ্গে রাজা হইয়াই দেশে অন্য যত "কামকারী" বা যথেচ্ছপরায়ণশক্তি বা সামন্ত বা নায়কেরা ছিলেন তাঁহাদের দমন করেন, এবং বোধ হয় সমগ্র বাংলাদেশে আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল বহু সামন্ত-নায়কের সহায়তায় সন্দেহ নাই; এই সামন্ত-নায়কেরাই তো স্বেচ্ছায় তাঁহাকে তাঁহাদের অধিরাজ নির্বাচন করিয়াছিল।

গোপালদেবের পুত্র ধর্মপাল সিংহাসন আরোহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতের আধিপত্য লইয়া গুর্জরপ্রতীহার-রাষ্ট্রকূট-পালবংশে বংশপরম্পরাবিলম্বিত এক তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গেল। এই যুগে উত্তর-ভারতাধিপত্যের প্রতীক ছিল কনৌজ-রাজলক্ষ্মী বা মহোদয়শ্রীর অধিকার। গুর্জরপ্রতীহার-বংশের কেন্দ্রভূমি গুর্জরত্রা ভূমি (রাজপুতনা); রাষ্ট্রকূটেরা চালুক্য বংশের অধিকার লইয়া দাক্ষিণাত্যের অধিপতি; আর, ধর্মপাল গোপালদেবের উত্তরাধিকার লইয়া সমগ্র বাংলাদেশের সর্বময় রাষ্ট্রনায়ক। ধর্মপালের সাম্রাজ্য-লিপ্সা পশ্চিমমুখী, বৎসরাজের পূর্বমুখী। এই সময় উত্তর-ভারতে আর কোনও পরাক্রান্ত রাষ্ট্র ও রাজবংশ না থাকাতে এই রাজচক্রবর্তীদ্বয়ের সংঘর্ষ প্রথম আরম্ভ হইল ধর্মপাল (আ ৭৭০—৮১০) ও প্রতীহাররাজ বৎসরাজের (আ ৭৮৩—৮৪) মধ্যে। ধর্মপাল পরাজিত হইলেন, এবং হয়তো আরও পর্যুদস্ত হইতেন, কিন্তু দক্ষিণ হইতে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব (আ ৭৮০—৭৯৫) একেবারে গাঙ্গেয় উপত্যকায় ঝড়ের মতন আসিয়া পড়িয়া প্রথমে বৎসরাজ এবং পরে ধর্মপাল উভয়কেই পরাজিত করিলেন। বৎসরাজ রাজপুতনার পথহীন মরুভূমিতে পলাইয়া গেলেন; কিন্তু ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যাওয়াতে ধর্মপালের বিশেষ কিছু অসুবিধা আর হইল না। তিনি অবাধে এবং নির্বিবাদে তাঁহার রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন এবং স্বল্পকালের মধ্যেই ভোজ (বর্তমান বেরারের অংশ, প্রাচীন ভোজকটক), মৎস্য (আলওয়ার, এবং জয়পুর-ভরতপুরের অংশ), মদ্র (মধ্য-পঞ্জাব), কুরু (পূর্ব-পঞ্জাব), যদু (বোধ হয় পাঞ্জাবের সিংহপুর, যাদব-রাষ্ট্র), যবন (বোধ হয় পঞ্জাব বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোনো আরব খণ্ডরাষ্ট্র), অবন্তী (বর্তমান মালব), গন্ধার (পশ্চিম-পঞ্জাব) এবং কীর (পঞ্জাবের কাংড়া জেলা) রাজ্য জয় করেন। এই সাম্রাজ্য-বিস্তারচক্রেই তিনি কনৌজ

ধর্মপাল
আ ৭৭০-৮১০

বা মহোদয়শ্রীর অধিপতি ইন্দ্ররাজ(ইন্দ্রায়ুধ)কে পরাজিত করেন, এবং সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন চক্রায়ুধকে। কনৌজে চক্রায়ুধের অভিষেকের সময় উপরোক্ত বিজিত রাজ্যের রাজারা ধর্মপালের নিকট "প্রণতি পরিণত" হন। এই দিগ্বিজয়চক্র উপলক্ষেই তাঁহার সৈন্য-সামন্তরা কেদার, গোকর্ণ ও "গঙ্গা-সমেতাম্বুধি"তে তীর্থপূজাক্রিয়া ইত্যাদি সমাপন করিয়াছিলেন। কেদার (হিমালয়সানুতে গাড়োয়াল জেলায়) এবং গোকর্ণের (নেপাল রাজ্যে বাগমতী নদীর তীরে) উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ধর্মপাল নেপালও জয় করিয়াছিলেন ; স্বয়ম্ভূপুরাণে তো স্পষ্টই বলা হইয়াছে, গৌড়রাজ ধর্মপাল নেপালেরও অধিপতি ছিলেন। ধর্মপালের মুঙ্গের-লিপির একটি শ্লোকে হিমালয়ের সানুদেশ ধরিয়া ধর্মপালের সমরাভিযানের একটু ইঙ্গিতও আছে। কেহ কেহ মনে করেন "গঙ্গাসমেতাম্বুধি"—এই স্থানটিও নেপালেই। হয়তো এই নেপালের অধিকার লইয়াই তিব্বতরাজ মু-তিগ্-ব্ৎসন-পো'র সঙ্গে ধর্মপালের সংঘর্ষ হইয়া থাকিবে, কারণ নেপাল এই সময় তিব্বতের অধীন ছিল। পঞ্চগৌড়াধিপ ধর্মপাল যে উত্তর-ভারতের প্রায় সর্বাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা গুর্জররাষ্ট্রবাসী সোড্ঢল কবির উদয়সুন্দরীকথাতেও (একাদশ শতক) স্বীকৃত হইয়াছে ; এই গ্রন্থে ধর্মপালকে বলা হইয়াছে "উত্তরাপথস্বামী।" যাহা হউক, এই সব বিজিত রাজ্য ধর্মপালের সর্বাধিপত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু, ধর্মপাল ইহাদের তাঁহার গৌড়-বঙ্গ-মগধধৃত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত করেন নাই ; স্ব স্ব রাজ্যে ইহাদের রাজারা স্বাধীন নরপতি রূপেই স্বীকৃত হইতেন, কিন্তু ধর্মপালের বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু, ইতিমধ্যে বৎসরাজ পুত্র দ্বিতীয় নাগভট প্রতীহার-সিংহাসন আরোহণ করিয়াছেন এবং সিন্ধু, অন্ধ্র, কলিঙ্গ ও বিদর্ভ রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পূর্বপরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। প্রথমেই কনৌজ আক্রান্ত হইল এবং চক্রায়ুধ পরাজিত হইয়া ধর্মপালের নিকট পলাইয়া গেলেন। নাগভট পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময় মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরের নিকট এক তুমুল সংগ্রাম হইল। ধর্মপাল পরাজিত হইলেন, কিন্তু এবারও রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দ আসিয়া নাগভটকে একেবারে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করিয়া দিলেন এবং এই পরাক্রান্ততর নরপতির কাছে ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ দুইজনেই স্বেচ্ছায় নতি স্বীকার করিলেন। কিন্তু গোবিন্দ আবার দাক্ষিণাত্যে স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন এবং ধর্মপাল আবার রাহুমুক্ত হইলেন। এই সাময়িক নতি স্বীকার সত্ত্বেও ধর্মপালের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উত্তর-ভারতে তাঁহার সর্বময় আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, এমন কোনো সাক্ষ্য উপস্থিত নাই। তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতীহার-রাষ্ট্র দুই দুইবার পর্যুদস্ত হইয়া শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, আর রাষ্ট্রকূটেরা দুই দুইবার জয়ী হওয়া সত্ত্বেও উত্তর-ভারতে রাজ্যবিস্তারের সচেতন চেষ্টা বোধ হয় করেন নাই। যাহা হউক, ধর্মপাল-পুত্র দেবপালের সিংহাসন আরোহণের কালে রাজ্যে কোথাও কোনো যুদ্ধবিগ্রহ বা অশান্তি কিছু ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

সাম্রাজ্য-বিস্তার

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (আ ৮১০-৮৫০) রাজা হইয়া পিতৃ-আদর্শানুযায়ী পাল-সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। তাহা ছাড়া উপায়ও ছিল না; প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটেরা তখনও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী; আরও নিকটে উৎকল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ (কামরূপ) তখন নিজ নিজ রাজবংশের অধীনে পরাক্রান্ত রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে; দূরে দক্ষিণে পাণ্ড্যরাও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এমন সময়ে স্বীয় রাজ্য ও রাষ্ট্র বজায় রাখিতে হইলেও বাধ্য হইয়া আক্রমণমুখী হওয়া ছাড়া অন্য উপায়ই বা কি? তাহা ছাড়া, উত্তর-ভারতাধিপত্যের আদর্শ তখনও উত্তর-ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে সক্রিয়। মৌর্য ও গুপ্ত-যুগের আদর্শ ছিল সর্বভারতের একরাট্ হওয়া; হর্ষবর্ধন-পরবর্তী রাষ্ট্রীয় আদর্শ "সকলোত্তরপথনাথ" বা "সকলোত্তর পথস্বামী" হওয়া। নবম শতক পর্যন্তও এই আদর্শ উত্তর-ভারতে সক্রিয় ও প্রায় সর্বব্যাপী। এই আদর্শ অনুসরণে দেবপালের সহায়ক হইলেন পর পর তাঁহার দুই প্রধান মন্ত্রী: ব্রাহ্মণ দর্ভপাণি ও তাঁহার পৌত্র কেদারমিশ্র। লিপিমালার সাক্ষ্য এই যে, এই দুই মন্ত্রীর সহায়তায় দেবপাল হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্যন্ত এবং পূর্ব হইতে পশ্চিম সমুদ্রতীর পর্যন্ত সমস্ত উত্তর-ভারত হইতে কর ও প্রণতি আদায় করিয়াছিলেন; হূণ-উৎকল-দ্রবিড়-গুর্জরনাথদের দর্প খর্ব করিয়া তিনি সমুদ্রমেখলা রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন; তাঁহার এক সমরনায়কের (খুল্লতাত ভ্রাতা জয়পাল) সহায়তায় তিনি উৎকল-রাজকে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজকে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজয়ী সমরাভিযান তাঁহাকে উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত লইয়া গিয়াছিল। দেবপাল, দেবপালের মন্ত্রী ও সমরনায়কদের এই দাবি খুব মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। হূণরাষ্ট্র (উত্তরাপথে হিমালয়ের সানুদেশে), কম্বোজ, উৎকল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য ধর্মপালবিজিত সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত; কাজেই দেবপাল কর্তৃক এই সব রাজ্য নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার চেষ্টা স্বাভাবিক। গুর্জররাষ্ট্র ও প্রতীহারদের, এবং প্রতীহারদের সঙ্গে পালদের সংগ্রামের সূচনা ও পরিণতি কতকটা ধর্মপালের সাম্রাজ্যবিস্তার উপলক্ষেই আমরা দেখিয়াছি। নাগভটের সঙ্গে দেবপালের কোনো সংগ্রাম হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; তাঁহার পুত্র রামভদ্রও উল্লেখযোগ্য নরপতি ছিলেন না। কিন্তু রামভদ্রপুত্র ভোজ প্রতীহারদের হৃতগৌরব অনেকটা উদ্ধার করিয়াছিলেন; এবং বোধ হয় ভোজদেবের সঙ্গেই দেবপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সংঘর্ষে ভোজদেব জয়ী হইতে পারেন নাই; কিছুদিন পর রাষ্ট্রকূট-রাজের কাছেও তিনি পরাজিত ও পর্যুদস্ত হন। যে-দ্রবিড়নাথকে দেবপাল পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন, তিনি বোধ হয় রাষ্ট্রকূট-রাজ অমোঘবর্ষ। কেহ কেহ মনে করেন, এই দ্রবিড়নাথ হইতেছেন পাণ্ড্যরাজ শ্রীমার শ্রীবল্লভ, কিন্তু তাহার স্বপক্ষে যুক্তি দুর্বল। যাহা হউক, এই তথ্য সুস্পষ্ট যে, দেবপাল ধর্মপালের

দেবপাল
আ ৮১০—৮৫০

সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত করিয়াছিলেন, এবং হিমালয়ের সানুদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তত বিন্ধ্য পর্য্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত তাঁহার আধিপত্য স্বীকৃত হইত। সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত এক সমরাভিযানের ইঙ্গিত মুঙ্গের-লিপিতেও আছে; ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা কঠিন, রাজ-সভাকবির অত্যুক্তি বলিয়াই মনে হয়। দেবপালের সময়েই পালসাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। আরব-দেশি বণিক ও পর্যটক সুলেমান্ এই সময় (৮৫১) কয়েকবারই ভারতবর্ষে আসা-যাওয়া করিয়াছিলেন; তাঁহার বিবরণীতে দেখা যাইতেছে, পালরাজ গুর্জর-প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে সংগ্রামরত ছিলেন; তাঁহার সৈন্যদলে ৫০,০০০ হাজার হাতী ছিল, এবং সৈন্যদলের সাজসজ্জা ও পোষাক পরিচ্ছদ ধোওয়া, গুছানো ইত্যাদি কাজের জন্যই ১০ হইতে ১৫ হাজার লোক নিযুক্ত ছিল। ধর্মপালের সাম্রাজ্যে যেমন, দেবপালের সময়ও তেমনই বিজিত রাজ্যের রাজারা স্ব স্ব রাষ্ট্রে স্বাধীন বলিয়া গণ্য হইতেন; কেন্দ্রীয় রাজ্য ও রাষ্ট্রের অন্তর্গত তাঁহারা ছিলেন না, যদিও দেবপালের সর্বময় আধিপত্য তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইত।

দেবপালের মৃত্যুর (আ ৮৫০) কিছুদিন পর হইতেই পালবংশের সাম্রাজ্য-গৌরবসূর্য পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। যে সাম্রাজ্য প্রায় শতাব্দীর তিনপাদ ধরিয়া প্রধানত ধর্মপাল ও দেবপালের চেষ্টা ও উদ্যমে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রথম বিগ্রহপাল (আ ৮৫০—৮৫৪) হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বের মধ্যে (আ ৯৬০—৯৮৮) ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

আ ৮৫০—৯৮৮

প্রথম বিগ্রহপাল দেবপালের পুত্র ছিলেন না; দেবপালের সমরনায়ক বাক্‌পাল বোধ হয় ছিলেন তাঁহার পিতা। দেবপালের পুত্র থাকা সত্ত্বেও এই উত্তরাধিকার পরিবর্তন কেন হইয়াছিল বলা কঠিন; তবে ইহার মধ্যে কেহ কেহ পারিবারিক অনৈক্যের হেতু বিদ্যমান বলিয়া মনে করেন। হয়তো পাল-সাম্রাজ্যের শক্তিহীনতা এবং অন্তর্বিরোধও অন্যতম কারণ হইতে পারে। এই অনুমান কতটা ঐতিহাসিক বলা কঠিন, তবে মোটামুটি ইহা যুক্তিসিদ্ধ। বিগ্রহপালের অন্য নাম শূরপাল; তিনি ধর্মনিষ্ঠ ধর্মাচরণরত নৃপতি ছিলেন বলিয়া মনে হয়; পুত্র নারায়ণপালকে সিংহাসন অর্পণ করিয়া তিনি ধর্মাচরণোদ্দেশে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। নারায়ণপাল (আ ৮৫৪—৯০৮) অন্যূন ৫৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সুদীর্ঘ রাজত্বকাল বাংলার গৌরবের হেতু হইতে পারে নাই। সম্ভবত এই সময়ই রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ একবার অঙ্গ-বঙ্গ-মগধে বিজয়ী সমরাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন; উড়িষ্যার শুল্কিরাজ মহারাজাধিরাজ রণস্তম্ভও বোধ হয় এই সময়ই রাঢ়ের কিয়দংশ জয় করেন। প্রতীহাররাজ ভোজদেবও নারায়ণপালের রাজত্বকালেই প্রায় মগধ পর্য্যন্ত সমস্ত পালসাম্রাজ্য অধিকার করেন, এবং কলচুরীরাজ গুণাম্বোধিদেব এবং গুহিলোট্-রাজ দ্বিতীয় গুহিল

সাম্রাজ্যের বিলয়

ভোজদেবের এই বিজয়ের অংশীদার হন। এই সময়ই বোধ হয় ভাহলরাজ প্রথম কোক্কল্লদেব (৮৪০-৮৯০) বঙ্গরাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করেন। ভোজদেবের পুত্র প্রতীহার মহেন্দ্রপাল পাটনা এবং গয়া পার হইয়া একেবারে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের পাহাড়পুর অঞ্চল পর্যন্ত প্রতীহার-সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। মহেন্দ্রপালের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের একটি লিপি পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। মহেন্দ্রপাল বেশি দিন উত্তরবঙ্গ ও বিহার ভোগ করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়; নারায়ণপাল তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে বঙ্গ-বিহার পুনরাধিকার করিয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধে লিপি-প্রমাণ বিদ্যমান। প্রতীহারদের কতকটা খর্ব করা সম্ভব হইলেও রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের নিকট নারায়ণপালকে বোধ হয় কিছুটা আনুগত্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল। দেওলিতে প্রাপ্ত এক শাসনে কৃষ্ণ গৌড়বাসিদের বিনয় শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-মগধে তাঁহার আদেশ মান্য ও স্বীকৃত হইত বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। পিঠাপুরমের এক লিপিতে কৃষ্ণা জেলার বেলনাণ্ডুর এক রাজা বঙ্গ, মগধ এবং গৌড়দের পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিতেছেন; এই রাজা হয়তো দ্বিতীয় কৃষ্ণের সমরাভিযানের সঙ্গে আসিয়া এই সব দেশজয়ে কিছু অংশ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। দেবপালের সময়ে উৎকল ও কামরূপ দেবপালের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু নারায়ণপালের কালে রাজা মাধববর্মা শ্রীনিবাসের নেতৃত্বে (আ ৮৫০) শৈলোদ্ভব বংশ উড়িষ্যায় এবং রাজা হর্জর ও পুত্র বনমালের নেতৃত্বে কামরূপ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে।

নারায়ণ পাল
আ ৮৫৪—৯০৮

নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপাল (আ ৯০৮—৯৪০) এবং পৌত্র দ্বিতীয় গোপালের (আ ৯৪০—৯৬০) রাজত্বকালে পাল-সাম্রাজ্য অন্তত মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় গোপালের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপালের আমলে মগধের অধিকার বোধ হয় পালবংশের করচ্যুত হইয়া থাকিবে। প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটভয় এই সময় আর ছিলনা বটে, কিন্তু উত্তর-ভারতে চন্দেল্ল ও কলচুরী এই দুই রাজবংশ এই সময় প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া ওঠে। চন্দেল্লরাজ যশোবর্মা "লতারূপ গৌড়দের তরবারী স্বরূপ" ছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র ধঙ্গ (আ ৯৫৪—১০০০) রাঢ়া এবং অঙ্গের রাজমহিষীদের কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। কাব্যিক ভাষার আশ্রয় ছাড়িয়া দিলে স্পষ্টই বুঝা যায় এই দুই চন্দেল্ল নরপতি গৌড়, অঙ্গ এবং রাঢ়দেশকে সমরে পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। কলচুরীরাজ প্রথম যুবরাজ (আ দশম শতকের প্রথম পাদ) গৌড়-কর্ণাট-লাট-কাশ্মীর-কলিঙ্গ কামিনীদের লইয়া নাকি কেলি করিয়াছিলেন, অর্থাৎ এই সব দেশে সমরাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণরাজ (আ দশম শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ) বঙ্গালদেশ জয় করিয়াছিলেন। এই সব ক্রমাগত পরাজয় ও সামরিক বিপর্যয় পাল-সাম্রাজ্যের এবং রাষ্ট্রের সামরিক ও রাষ্ট্রীয় দৈন্য সূচিত করে, সন্দেহ নাই। চন্দেল্ল ও কলচুরী লিপিমালায় গৌড়-অঙ্গ-রাঢ়া-বঙ্গালের

পৃথক পৃথক উল্লেখ হইতেও মনে হয় বাংলাদেশেও পালরাজ্য বিভিন্ন জনপদ রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িবার দিকে ঝোঁক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অন্তত রাঢ়া অঞ্চল ও বঙ্গদেশে যে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে এ-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট লিপি-প্রমাণ বিদ্যমান। বস্তুত, বাণগড়-লিপিতে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে পাল-রাজ্য "অনধিকৃতবিলুপ্ত" হইয়া গিয়াছিল।

বাণগড়-লিপির এই উক্তি মিথ্যা নয়। এই সময় উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গে কম্বোজ নাম এক রাজবংশ প্রবল হইয়া উঠে। দিনাজপুর-স্তম্ভলিপিতে এক কম্বোজান্বয় গৌড়পতির উল্লেখ আছে। ইর্দা-তাম্রপট্টে এই "কম্বোজান্বয় গৌড়পতি"দের, তথা "কম্বোজকুলতিলক"দের কয়েকজন রাজার খবর পাওয়া যায়। লিপিটি কম্বোজবংশীয় রাজ্যপাল-ভাগ্যদেবীর পুত্র এবং নারায়ণপালদেবের কনিষ্ঠভ্রাতা পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীজয়পালের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কের, এবং এই লিপি দ্বারা জয়পাল বর্দ্ধমানভুক্তিতে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন।

রাঢ়া-গৌড়ে কম্বোজাধিপত্য

স্পষ্টতই বুঝা যায়, পশ্চিম-বঙ্গের অন্ততঃ কিয়দংশ এবং বোধ হয় উত্তর-বঙ্গেরও কিয়দংশ কম্বোজকুলতিলকদের করায়ত্ত হইয়াছিল। ইঁহাদের রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল প্রিয়ঙ্গু নামক স্থানে; স্থানটি কোথায় এখনও জানা যায় নাই। ইর্দাপট্টকথিত রাজ্যপাল ও পালরাজ রাজ্যপাল এক এবং অভিন্ন কিনা ইহা লইয়া পণ্ডিত মহলে প্রচুর তর্কবিতর্ক আছে। এক হইলে স্বীকার করিতে হয়, রাজ্যপালের পর বাংলায় পালরাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল; এক এবং অভিন্ন না হইলে স্বীকার করিতে হয়, কম্বোজবংশীয় রাজ্যপাল পালরাষ্ট্রের দৈন্য এবং দৌর্বল্যের সুযোগ লইয়া রাঢ়া-গৌড়ে নিজ বংশের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কম্বোজদের আদিভূমি কোথায় তাহা লইয়াও বিতর্কের অন্ত নাই। কেহ কেহ বলেন, ইঁহারা উত্তরপশ্চিম-সীমান্তের কম্বোজদেশাগত; কেহ কেহ বলেন কম্বোজ দেশ তিব্বতে; আবার কাহারো মতে পূর্ব-দক্ষিণ ভারতের কম্বুজ (Cambodia) এই কম্বোজদেশ। পাগ্-সাম্-জোন্-জাং নামক তিব্বতী গ্রন্থে লুসাই পর্বতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এক কম্-পো-ৎস বা কম্বোজ দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কম্-পো-ৎস এবং বাণগড় ও ইর্দালিপির কম্বোজ এক এবং অভিন্ন হওয়া কিছু বিচিত্র নয়!

পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গও এই সময় পাল-বংশের করচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। হরিকেল অঞ্চলে মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব (আ দশম শতকের প্রথমার্ধ) নামে এক বৌদ্ধ রাজার খবর পাওয়া যায় চট্টগ্রামের একটি তাম্র পট্টোলীতে। ইঁহার রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল বর্দ্ধমানপুর; এই বর্দ্ধমানপুরের সঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গের বর্দ্ধমানের কোনো সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। বর্দ্ধমানপুর শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে বোধ হয় কোন স্থান হইবে।

ত্রিপুরা জেলার ভারেল্লা গ্রামে প্রাপ্ত নটেশ শিবের এক প্রস্তর মূর্ত্তির পাদপীঠে লড়হচন্দ্র (আ দশম শতকের শেষার্ধ) নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। বোধ হয়

ত্রিপুরা অঞ্চলেই তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। লড়হচন্দ্র অন্ততঃ ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (আ দশম শতকের তৃতীয় পাদ)।

ঢাকা জেলার রামপাল ও ধুল্লা, ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর এবং কেদারপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত চারটি লিপি হইতে এক চন্দ্র রাজবংশের চারিজন রাজার খবর পাওয়া যাইতেছে— পূর্ণচন্দ্র; পুত্র সুবর্ণচন্দ্র, মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র (পত্নী শ্রীকাঞ্চনা) এবং পুত্র মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র। সুবর্ণচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই বৌদ্ধধর্মাশ্রয়ী। ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও শ্রীচন্দ্র হরিকেলের অধিপতি ছিলেন, এবং চন্দ্রদ্বীপ (বাখরগঞ্জ জেলা) ছিল তাঁহাদের রাষ্ট্রকেন্দ্র। লিপি-প্রমাণ হইতে মনে হয়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চল ইহাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গোবিন্দচন্দ্র নামে আর একজন চন্দ্রান্ত্যনামা রাজার নাম জানা যায় চোলরাজ রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপি হইতে (১০২১)। ইনি বঙ্গালদেশের অধিপতি ছিলেন।

বঙ্গে-বঙ্গালে চন্দ্রাধিপত্য

লড়হচন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের বংশের কোনো সম্বন্ধ ছিল কিনা বলা যায় না; তবে, দশম শতকের প্রথমার্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গের অন্তত কিয়দংশ পালবংশের রাজ্যসীমার বাহিরে ছিল এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। বোধ হয়, চন্দ্রবংশীয় রাজাদের এবং গোবিন্দচন্দ্রকে যথাক্রমে কলচুরীরাজ এবং অন্তত একজন চোলরাজের পরাক্রান্ত সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কলচুরীরাজ কোক্কল একবার বঙ্গরাজের রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন; লক্ষ্মণরাজ একবার বঙ্গালরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কর্ণদেব একবার বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রাচ্যদেশের রাজাকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। চোলরাজ রাজেন্দ্রচোল কর্তৃক রাজা গোবিন্দচন্দ্রের বঙ্গাল দেশ জয় সুবিদিত।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপালের (আ ৯৮৮—১০৩৮) প্রথম ও প্রধান কীর্তি "অনধিকৃতবিলুপ্ত পিতৃরাজ্য" পুনরুদ্ধার। সমস্ত বঙ্গদেশই তো পালরাষ্ট্রের করচ্যুত হইয়া গিয়াছিল, এবং পাল-রাজ্য মগধাঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত হইয়া গিয়াছিল। মহীপাল

সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা

দ্রুত উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গ পুনরুদ্ধার করিলেন। ত্রিপুরা জেলায় তাঁহার তৃতীয় ও চতুর্থ রাজ্যাঙ্কের লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; লিপি দুইটি বীলকীন্দক গ্রামবাসী (দেবিদ্দা থানার বাইলকান্দি গ্রাম?) দুই বণিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি বিষ্ণু ও একটি গণেশমূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ। দিনাজপুর জেলায় বাণগড়ে প্রাপ্ত নবম রাজ্যাঙ্কের আর একটি লিপি তাঁহার উত্তর-বঙ্গাধিকারের প্রমাণ। উত্তর-বিহার বা অঙ্গদেশে মহীপালের লিপি পাওয়া গিয়াছে; মনে হয় মহীপাল এই দেশও পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। মগধ তো পিতৃ-অধিকারে ছিলই; সারনাথে একটি এবং নালন্দায় দুইটি মহীপালের রাজ্যাঙ্কের

লিপিও পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম ও দক্ষিণ-বঙ্গও তিনি পুনরাধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নাই; তবে, রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপির সাক্ষ্যে মনে হয়, পশ্চিম-বঙ্গের অন্তত কিয়দংশে তাঁহার আধিপত্য স্বীকৃত হইত। রাজেন্দ্রচোল গঙ্গা হইতে পুণ্য তীর্থবারি আনিয়া নিজের রাজ্যভূমি পবিত্রকরণোদ্দেশে উত্তর-পূর্বভারতে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন (১০২১—১০২৩)। ওড্ডবিষয় (উড়িষ্যা) এবং কোসলৈ-নাডু (দক্ষিণ-কোশল) জয়ের পর তাঁহার সেনাবাহিনী ধর্মপালকে পরাজিত করিয়া তণ্ডবুত্তি (দণ্ডভুক্তি) অধিকার করেন; রণশূরকে পরাজিত করিয়া তক্কণলাড়ম (দক্ষিণ-রাঢ়) অধিকার করেন; রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পলায়মান করিয়া বিরামবিহীন বৃষ্টিস্নাত বঙ্গালদেশ অধিকার করেন; তুমুল যুদ্ধে মহীপালকে ভীতসন্ত্রস্ত করিয়া নারী, ধনরত্ন এবং পরাক্রান্ত হস্তী অধিকার করেন; মুক্তাপ্রসূ বিস্তৃত সমুদ্রতীরশায়ী উত্তিরলাড়ম্ (উত্তর-রাঢ়) অধিকার করেন। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই সময় দণ্ডভুক্তি, দক্ষিণ-রাঢ এবং বঙ্গালদেশ স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন নরপতির অধীন। কেবল উত্তর-রাঢ় মহীপালের অধীন বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা না হইলে মহীপাল এবং উত্তর-রাঢ় বিজয় লিপিটিতে এইভাবে উল্লিখিত হইত না। যাহাই হউক, রাজেন্দ্রচোলের দিগ্বিজয় সাম্রাজ্যবিস্তার বলিয়া মনে হয় না, উদ্দেশ্য তাহা ছিল না; যে-ভাবেই হউক তাঁহার এই দিগ্বিজয় স্থায়ী হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। রাজত্বের শেষদিকে পুনর্বিজিত সাম্রাজ্যের কিয়দংশ আবার বোধ হয় মহীপালের করচ্যুত হইয়াছিল। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোনো সময়ে কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দেব অঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া গোহ্‌রবা লিপিতে দাবি করা হইয়াছে। ১০৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আহ্‌মদ্ নিয়লতিগিন যখন বারাণসী আক্রমণ করেন, তখন বারাণসী কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দেবের অধীন ছিল।

বহু আয়াসে অনেক বৎসরের অবিরত সংগ্রামের পর মহীপাল শুধু যে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন তাহাই নয়, বিলুপ্ত সাম্রাজ্যেরও অন্তত কিয়দংশের উদ্ধার সাধন করিয়া পাল-বংশের লুপ্ত গৌরবও খানিকটা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। সারনাথে অনেক জীর্ণ বিহার ও মন্দিরের সংস্কার, নূতন বিহার-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধগয়াবিহারের সংস্কার ইত্যাদি সাধনের ফলে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ জগতেও বাংলা দেশ কতকটা তাহার স্থান ফিরিয়া পাইয়াছিল। পুনরুত্থানের চেষ্টা ও আভাসে বাঙালীর দেশ ও রাষ্ট্র আত্মগৌরব এবং প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া পাইয়াছিল; সেই জন্যই বাঙালীর লোকস্মৃতি মহীপালের গানে মহীপালকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে; লোকে আজও 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' ভুলে নাই; মহীপাল-যোগীপাল-ভোগীপালের গান তাঁহাদের কণ্ঠে। রঙ্‌পুর জেলার মাহীগঞ্জ (মহীগঞ্জ), বগুড়া জেলার মহীপুর, দিনাজপুর জেলার মহীসন্তোষ, মুর্শিদাবাদ জেলার মহীপাল, দিনাজপুর জেলার মহীপালদীঘি, মুর্শিদাবাদ জেলার (মহীপালের) সাগরদীঘি প্রভৃতি নগর ও দীর্ঘিকা এখনও

মহীপাল
আ ৯৮৮—১০২৭

এই নৃপতির স্মৃতি বহন করিতেছে। মহীপালের সমগ্র রাজ্যকাল কাটিয়াছিল পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারে, সাম্রাজ্যের হৃত অংশ ও গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় এবং রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনে। বোধ হয়, এই জন্যই তিনি এই সময়ে পঞ্জাবের বাহী রাজারা গজনীর সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে যে সমবেত হিন্দুশক্তিসংঘ গড়িয়া তুলিতেছিলেন, মহীপাল তাহাতে যোগদান করিতে পারেন নাই। সমসাময়িক হিন্দু-শক্তিপুঞ্জ পশ্চিমদিকে সুলতান মামুদের পৌনঃপুনিক আক্রমণে বিব্রত ও বিপর্যস্ত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় মহীপালের পক্ষে হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার অন্তত আংশিকত সম্ভব হইয়াছিল। মহীপালের স্বপক্ষে যুক্তি আরও দেওয়া যাইতে পারে; তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন, স্বাধীন শক্তাক্রান্ত এবং সুশৃঙ্খল একটি রাষ্ট্রের পক্ষেই দুর্দ্ধর্ষ নূতন বৈদেশিক অভিযাত্রীদের বাধা দেওয়া সম্ভব, বিচিত্র ও দুর্বল খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রের সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের পক্ষে নয়। হয়তো এই ভাবিয়াই তিনি তাঁহার রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের দিকে, এক কথায় বৈদেশিক অভিযাত্রীদের বিরুদ্ধে কঠিনতর প্রতিরোধ-প্রাচীর গড়িয়া তুলিবার দিকে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অযৌক্তিক কিছু বলিতেছি না, কিন্তু ইহা যথার্থ বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক দৃষ্টি কিনা এ-সম্বন্ধে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে। মহীপাল বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই যে, একাধিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণেই উত্তর-ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িতেছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রপুঞ্জ একে একে পশ্চিমাগত মুসলিম অভিযাত্রী কর্তৃক পরাজিত ও পর্যুদস্ত হইতেছিল। ভারতের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আদর্শের স্থলে স্থানীয় প্রাদেশিক সচেতনতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখা দিতেছিল; অষ্টম শতকের সূচনা হইতেই ভারতের সমৃদ্ধ বৈদেশিক বাণিজ্যে আরব ও পারসিক বণিকেরা বৃহৎ অংশীদার হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন;

মহীপাল ও সমসাময়িক ভারতবর্ষ

ভারতের রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র ক্রমশ উত্তর-ভারত হইতে দক্ষিণ ভারতে হস্তান্তরিত হইতেছিল; আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আদর্শবাদ ক্রমশ রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের প্রধান সহায়ক উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীগুলির স্বচ্ছ বাস্তব সামাজিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছিল। এই সব কারণ বিস্তৃত তথ্যগত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার স্থান এখানে নয়, তবে মোটামুটি বলা যায়, অষ্টম শতকের সূচনা হইতেই এই সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ সক্রিয় হইতে আরম্ভ করে, এবং ভারতের সমাজে ও রাষ্ট্রে ইহাদের অনিবার্য ফলের সূচনা দেখা দেয়। মহীপাল কিংবা উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের কোনও রাষ্ট্রই এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলিয়া মনে হয়না। রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রেরণা মৌর্য বা গুপ্তসাম্রাজ্য গড়িয়াছিল, সেই আদর্শ সক্রিয় থাকিলে বৈদেশিক অভিযাত্রী প্রতিরোধ অনেকটা সহজ হইত, কিন্তু এই যুগে আর তাহা ছিল না। তবু, পঞ্জাবের বাহী রাজারা সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশের সমগ্র রাষ্ট্রশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটা প্রতিরোধ রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন; ভারতবর্ষের সমসাময়িক ইতিহাসে ভারতীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের ইহাই ছিল ঐতিহাসিক কর্তব্য।

মহীপাল এই সামগ্রিক ঐক্যাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'ন নাই এবং সমসাময়িক ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করেন নাই; স্থানীয় প্রান্তিক আত্মকর্তৃত্বের আদর্শই তাঁহার কাছে বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল, এই ঐতিহাসিক সত্য অস্বীকার করা যায় না। সেই ক্রমবর্ধমান আপদের সম্মুখে ভারতীয় ইতিহাসের সামগ্রিক আদর্শই কর্তব্য, স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের বা পাল-সাম্রাজ্যের আদর্শ নয়। সেই সুবৃহৎ বিপদের সম্মুখে পাল-সাম্রাজ্যের আদর্শ সমগ্র ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক কর্তব্যের কাছে ক্ষুদ্র। তবে, এ-সম্বন্ধে শুধু মহীপালকেই দায়ি করা চলে না, দক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্রকূট ও চোলেরা এবং উত্তর-ভারতেরও দু'একটি রাষ্ট্র সমান দায়ি। রাষ্ট্রকূটেরা তো এই সব বৈদেশিক অভিযাত্রীদের সহায়তাই করিয়াছিলেন। বস্তুত, অষ্টম শতক হইতেই রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্থানীয় প্রান্তিক আত্মকর্তৃত্বের যে আদর্শ বলবত্তর হইতেছিল সেই আদর্শ ই ইহার জন্য দায়ি। অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ তো ছিলই। মহীপাল যোগদান করিলেই যে হিন্দু শক্তিপুঞ্জের চেষ্টা সার্থক হইত, তাহা বলা যায় না; সে-সম্ভাবনা বরং কমই ছিল। কি হইলে কি হইত, এই আলোচনা করিয়া ইতিহাসে লাভ কিছু নাই; কি কারণে কি হইয়াছে এবং কি হয় নাই, তাহাই ইতিহাসে আলোচ্য। তথ্য এই যে, মহীপাল সমবেত শক্তিসংঘে যোগ দেন নাই।

মহীপাল গৌড়তন্ত্রের, তথা পাল-সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারে অনেকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই পুনরুদ্ধার স্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। নারায়ণপালের সময় হইতেই পাল-সাম্রাজ্যের যে ভগ্নদশা আরম্ভ হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময় যে চরম অবনতি দেখা দিয়াছিল, মহীপাল তাহা রোধ করিয়া পূর্ব গৌরব অনেকটা ফিরাইয়া আনিলেন সত্য, কিন্তু মহীপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই রাজ্য ও রাষ্ট্র ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। ভাঙ্গন রোধের চেষ্টা যে কিছু হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু কোনো চেষ্টাই সফল হয় নাই। হওয়া সম্ভব ছিল না। যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণের ইঙ্গিত আগে করিয়াছি তাহা বঙ্গ-বিহারের পক্ষেও সত্য ছিল; স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বাহির ও ভিতর হইতে ক্রমাগতই পালরাজ্য ও রাষ্ট্রকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল, এবং সেই আঘাতে রাজ্য ও রাষ্ট্র ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িল। তাহা ছাড়া আভ্যন্তরিণ অন্যান্য সামাজিক কারণও ছিল, যথাস্থানে তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। এই সব কারণ সম্বন্ধে রাষ্ট্রের সচেতনতা যে খুব বেশি ছিল, মনে হয় না। সেই জন্য রাজ্য ও রাষ্ট্র গঠন এবং রক্ষার চেষ্টার ক্রটি না হইলেও সমাজ-ইতিহাসের অমোঘ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না; ভাঙ্গনের গতি মন্থর হইল বটে কিন্তু তাহা রোধ করা সম্ভব হইল না।

মহীপালের পুত্র নয়পালের (আ ১০৩৮—১০৫৫) রাজত্বকালে বঙ্গ ও গৌড় কলচুরীরাজ কর্ণ বা লক্ষ্মীকর্ণের হস্তে পরাজয়ের অপমান স্বীকার করে; কিন্তু তিব্বতী সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, এই যুদ্ধ জয়-পরাজয়ে মীমাংসিত হয় নাই। দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের

(অতীশ)মধ্যস্থতায় দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটা সন্ধি-শান্তির প্রতিষ্ঠায় এই যুদ্ধ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু, জয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে (আ ১০৫৫—৭০) কর্ণ বোধ হয় দ্বিতীয়বার বাংলা দেশ আক্রমণ করেন এবং অন্তত বীরভূম পর্যন্ত অগ্রসর হন। বীরভূমের পাইকোর গ্রামে একটি প্রস্তরস্তম্ভের উপর কর্ণের একটি লিপি খোদিত আছে। এই দ্বিতীয় আক্রমণের পরিণতিই বোধ হয় তৃতীয় বিগ্রহপাল এবং কর্ণ-কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ। বঙ্গে এই সময় চন্দ্র বা বর্মারা রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং কর্ণ প্রথমবারের আক্রমণে ইহাদেরই একজন রাজাকে পরাজিত করিয়া থাকিবেন।

[illegible]

লক্ষ্মীকর্ণের হাত হইতে উদ্ধার সম্ভব হইলেও পশ্চিম-বঙ্গ বোধ হয় বেশি দিন আর পাল-সাম্রাজ্যভুক্ত থাকে নাই। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষ নামে এক সামন্তরাজা এই সময়ে বর্দ্ধমান অঞ্চলে স্বাধীন স্বতন্ত্র মহারাজাধিরাজরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইহার কেন্দ্র ছিল বর্দ্ধমান জেলার ঢেক্করী নামক স্থানে। পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরা অঞ্চলে এই সময়ে পট্টিকেরা রাজ্য গড়িয়া উঠে; এই রাজ্যের সঙ্গে সমসাময়িক পগানের (ব্রহ্মদেশ) আনাহ্ উরহ্ থা বা অনিরুদ্ধের রাজবংশের কয়েক পুরুষের রাষ্ট্রীয় ও বৈবাহিক সম্বন্ধের বিবরণ জানা যায়। দ্বাদশ শতকে রণবংকমল্ল নামে অন্তত একজন নরপতির নামও আমরা জানি। পূর্ব-বঙ্গের অন্যান্য স্থানে একাদশ শতকের শেষার্ধে এবং দ্বাদশ শতকে চন্দ্রবংশ এবং পরে বর্মণ বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাজেই পূর্ব-বঙ্গ পুনরুদ্ধার পালরাজারা আর করিতেই পারেন নাই।

কর্ণাটাক্রমণ

তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে (আ ১০৫৫—১০৭০) বাংলা দেশে আর এক নূতন বহিঃশত্রুর আক্রমণ দেখা দিল। বিক্রমাঙ্কদেবচরিত-রচয়িতা বিল্হন্ বলিতেছেন, কর্ণাটের চালুক্যরাজ প্রথম সোমেশ্বরের জীবিতকালেই পুত্র (ষষ্ঠ) বিক্রমাদিত্য এক বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন (১০৬৮ আ)। চালুক্য-লিপিতেও এই দিগ্বিজয়ের কিছু আভাস আছে, এবং বাংলায় একাধিক চালুক্যরাজ কর্তৃক একাধিক সমরাভিযানের উল্লেখ আছে। এই সব কর্ণাটদেশিয় সমরাভিযানকে আশ্রয় করিয়াই কিছু কিছু কর্ণাটী ক্ষত্রিয় সামন্ত-পরিবার এবং অন্যান্য কিছু কিছু লোক বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন. এবং সৈন্যাভিযান স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরও তাঁহারা এখানেই থাকিয়া গিয়াছিলেন। বিহার ও বাংলাদেশের সেন-রাজবংশ এবং (পূর্ব)-বঙ্গের বর্মণ রাজবংশ এই সব দক্ষিণী কর্ণাটী-পরিবার হইতেই উদ্ভূত বলিয়া ইতিহাসে বহুদিন স্বীকৃত হইয়াছে। একাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার উপর আর একটি ভিন্-প্রদেশী আক্রমণের সংবাদ জানা যায়। উড়িষ্যার রাজা মহাশিবগুপ্ত যযাতি গৌড়, রাঢ়া এবং বঙ্গে বিজয়ী সমরাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। আর এক উড়িষ্যারাজ উদ্যোতকেশরী, তিনিও একবার গৌড়সৈন্যবিজয়ের দাবি জানাইতেছেন; তাহাও সম্ভবত

এই সময়েই। এই সব ভিন্‌-প্রদেশী আক্রমণের ফল অনুমান করা কঠিন নয়; (পূর্ব)-বঙ্গ তো আগেই করচ্যুত হইয়া গিয়াছিল; জয়পাল-বিগ্রহপালের আমলে পশ্চিম-বঙ্গও তাঁহারা হারাইয়াছিলেন; ক্ষীয়মান পাল-রাজ্য এখন এই সব ভিন্‌-প্রদেশী আক্রমণে প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। মগধেও পাল-রাজাদের মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিতেছিল। জয়পালের সময় হইতেই পরিতোষ এবং তৎপুত্র শূদ্রক নামে দুই সামন্ত গয়া অঞ্চলে প্রধান হইয়া উঠিতেছিলেন, বস্তুত বাহুবলে তাঁহারা গয়া পরিচালন করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহাদের লিপিতে দাবি করা হইয়াছে। শূদ্রক, শূদ্রকের পুত্র বিশ্বরূপ বা বিশ্বাদিত্য এবং তৎপুত্র যক্ষপালের সময় এই বংশ ক্রমশ আরও পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। গৌড়রাজ তো শূদ্রককে নিজে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। তাঁহার পুত্র বিশ্বরূপ নৃপ বা রাজা বলিয়াই কথিত হইয়াছেন। বিহার ও বাংলার পাল-রাজ্যের অবস্থা কল্পনা করা কঠিন নয়। বর্মণ রাজবংশ পূর্ব-বাংলায় স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া তুলিল; কামরূপ-রাজ রত্নপাল গৌড়রাজকে উদ্ধত অস্বীকারে অপমানিত করিতে এতটুকু ভীতিবোধ করিলেন না!

তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র: দ্বিতীয় মহীপাল (আ ১০৭০—১০৭৫), দ্বিতীয় শূরপাল (আ ১০৭৫—৭৭) এবং রামপাল (আঃ ১০৭৭—১১২০)। মহীপাল যখন রাজা হইলেন তখন ঘরে-বাহিরে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। নিজ পরিবারের মধ্যে নানা চক্রান্ত, সামন্তরা বিদ্রোহোন্মুখ। ভ্রাতা রামপাল পারিবারিক চক্রান্তের মূলে ভাবিয়া মহীপাল শূরপাল ও রামপাল দুই ভ্রাতাকেই কারারুদ্ধ করিলেন। কিন্তু এইখানেই বিপদের শান্তি হইল না। বিদ্রোহী সামন্তদের দমনে তিনি কৃতসংকল্প হইলেন, অথচ তাঁহার সৈন্যদল এবং যুদ্ধোপকরণ যথেষ্ট ছিল বলিয়া মনে হয় না। মন্ত্রীবর্গের সুপরামর্শেও তিনি কর্ণপাত করিলেন না। বরেন্দ্রীর কৈবর্ত-সামন্তদের বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া তিনি যুদ্ধে পর্যুদস্ত এবং নিহত হইলেন; কৈবর্ত-নায়ক দিব্য (দিব্বোক, দিবোক) বরেন্দ্রীর অধিকার লাভ করিলেন।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত-কাব্যে এই বিদ্রোহ, মহীপাল হত্যার বিবরণ, এবং রামপাল কর্তৃক বরেন্দ্রীর পুনরুদ্ধার ইত্যাদির সুবিস্তৃত ইতিহাস কাব্যকৃত করা হইয়াছে।

কৈবর্ত-বিদ্রোহ
বরেন্দ্রীতে কৈবর্তাধিপত্য
আ ১০৭৫—১১০০

সন্ধ্যাকর রামপালপুত্র মদনপালের অনুগ্রহভাজন; মহীপালের উপর তিনি যে খুব শ্রদ্ধিত ছিলেন মনে হয় না। তিনি মহীপালকে নিষ্ঠুর এবং দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া কটূক্তিও করিয়াছেন। মহীপাল লোকশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া জনপ্রিয় রামপালকে চক্রান্তকারী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, অথচ রামপাল যথার্থত তাহা ছিলেন না। তাহা ছাড়া তিনি যুদ্ধকামী হইয়া মন্ত্রীবর্গের আদেশ অমান্য করিয়া অনন্ত-সামন্তচক্রের বিরুদ্ধে অপরিমিত সেনাদল লইয়া বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এ-সব সংবাদ সন্ধ্যাকরই দিতেছেন। মহীপালের

প্রকৃতি, চরিত্র এবং রাষ্ট্রবুদ্ধি সম্বন্ধে সন্ধ্যাকরের সাক্ষ্য কতখানি প্রামাণিক বলা কঠিন। অন্য কোনো সাক্ষ্য উপস্থিতও নাই। এই অবস্থায় মহীপালের ভালমন্দ বা কর্তব্যাকর্তব্য বিচার কিছুই চলিতে পারে না; তবে তিনি যে দুর্বল এবং রাষ্ট্রবুদ্ধিবিহীন ছিলেন, এ-সম্বন্ধে বোধ হয় সংশয় নাই। ঘটনাচক্রের পরিণতিই তাহার প্রমাণ।

দিব্য সম্বন্ধেও সন্ধ্যাকরের সাক্ষ্য কতটুকু গ্রাহ্য, বলা কঠিন। পালরাজাদের পারিবারিক শত্রুর প্রতি সন্ধ্যাকর সুবিচার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। রামচরিত পাঠে মনে হয়, দিব্য ছিলেন একজন নায়ক, পালরাষ্ট্রেরই একজন নায়ক-কর্মচারী। কি কারণে তিনি বিদ্রোহপরায়ণ হইয়াছিলেন, আর কোন্ কোন্ সামন্ত তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন, ইত্যাদি কিছুই সন্ধ্যাকর বলেন নাই। অনন্ত সামন্তচক্রের সম্মিলিত বিদ্রোহের তিনি নায়কত্ব করিয়াছিলেন, এমন কোনো প্রমাণও নাই। সন্ধ্যাকর তাঁহাকে বলিয়াছেন 'দস্যু' এবং 'উপধি-ব্রতী' (ছলাকলায় অজুহাতে অন্যায় কৌশলে কার্যোদ্ধারপরায়ণ)। মনে হয়, দিব্য পাল-রাজাদের অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, এবং পালরাষ্ট্রের দুর্বলতার এবং রাজপরিবারে ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ লইয়া তিনি বিদ্রোহপরায়ণ হইয়াছিলেন। অন্তত, তিনি যে কোনো প্রজাবিদ্রোহের নায়কত্ব করিয়াছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ উপস্থিত নাই; সন্ধ্যাকর-নন্দী অন্তত তাহা বলেন নাই, অন্যত্রও তেমন প্রমাণ নাই। সন্ধ্যাকর তো দিব্যকে 'কুৎসিত কৈবর্ত নৃপ' বলিয়াছেন, এই বিদ্রোহকে 'অনীক ধর্ম-বিপ্লব' বলিয়াছেন ('অনীক—অন্যায়, অপবিত্র), এবং এই ডামর-উপপ্লবকে "ভবস্য আপদম্" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সন্ধ্যাকরের সাক্ষ্য যে পক্ষপাতদুষ্ট নয়, এমন অবশ্যই বলা যায় না। যাহাই হউক, বরেন্দ্রীর এই কৈবর্ত-বিদ্রোহে মহীপাল নিহত হইলেন, এবং দিব্য বরেন্দ্রীর অধিকার লাভ করিলেন।

দিব্য
আ ১০৭৫

বরেন্দ্রাধিপ দিব্যকে যুদ্ধে বর্মণ-বংশীয় বঙ্গরাজ জাতবর্মার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কৈবর্ত-রাজ্যের কিছু ক্ষতি হয় নাই বলিয়া মনে হয়। শূরপাল বেশি দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই; রামপাল রাজা হইয়া দিব্যর রাজত্বকালেই বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই; বরং কৈবর্তপক্ষ একাধিকবার রামপালের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। দিব্যর পুত্র রুদোকের আমলেও রামপাল বোধ হয় কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। রুদোকের ভ্রাতা ভীম বরেন্দ্রীর অধিপতি হওয়ার পর সুপ্রতিষ্ঠিত কৈবর্তশক্তি এক নূতন ও পরাক্রান্ততর আকারে দেখা দিল। ভীম জনপ্রিয় নরপতি ছিলেন; তাঁহার স্মৃতি আজও জীবিত। রামপাল শঙ্কিত হইয়া প্রতিবেশী রাজাদের ও পালরাষ্ট্রের অতীত ও বর্তমান, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সামন্তদের দুয়ারে দুয়ারে তাঁহাদের সাহায্য ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিলেন। অপরিমিত ভূমি ও অজস্র অর্থ দান

রামপাল
আ ১০৭৭—১১২০

করিয়া এই সাহায্য ক্রয় করিতে হইল। রামচরিতে এই সব রাজা ও সামন্তদের যে তালিকা দেওয়া আছে তাহা বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে তদানীন্তন বাংলা ও বিহারের রাষ্ট্রতন্ত্র অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রামপালের প্রথম ও প্রধান সহায়ক হইলেন (১) তাঁহার মাতুল রাষ্ট্রকূটবংশীয় সামন্ত মথন (মহন) ও ও তাঁহার মহামাণ্ডলিক দুই পুত্র ও এক মহাপ্রতীহার ভ্রাতুষ্পুত্র; (২) পীঠি ও মগধাধিপতি ভীমযশ; (৩) কোটাটবীর রাজা বীরগুণ; কোটাটবী বিষ্ণুপুরের পূর্বে বর্তমান কোটেশ্বর; (৪) দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ; (৫) বাল-বলভীর অধিপতি বিক্রমরাজ; বাল-বলভী মেদিনীপুরের পশ্চিম-দক্ষিণ সীমান্তে বলিয়া মনে হয়; (৬) অপর-মন্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশূর; অপর-মন্দার পরবর্তী কালের মদারণ বা মন্দারণ-সরকারের পশ্চিমাংশ, বর্তমান হুগলী জেলায়; লক্ষ্মীশূর ছিলেন এই অঞ্চলের সমস্ত আটবিক খণ্ডের সামন্তচক্র-চূড়ামণি; (৭) কুজবটীর রাজা শূরপাল; কুজবটী সাঁওতাল পরগণায়, নয়া-তুম্‌কার ১৪ মাইল উত্তরে; (৮) তৈলকম্প বা বর্তমান তেলকুপির (মানভূম জেলা) অধিপতি রুদ্রশিখর; (৯) উচ্ছালাধিপতি ভাস্কর বা ময়গল সিংহ; উচ্ছাল বর্তমান বীরভূমের জৈন উঝিয়াল পরগণা; (১০) কযঙ্গল-মণ্ডলাধিপতি নরসিংহার্জুন; (১১) সঙ্কট গ্রামের চণ্ডার্জুন; সঙ্কটগ্রাম বল্লালচরিত-গ্রন্থের সংককোট, আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের সকোট, বোধ হয় হুগলী জেলায়; (১২) ঢেক্করীয় (কাটোয়া মহকুমার ঢেকুরী)-রাজ প্রতাপসিংহ; (১৩) নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ; (১৪) কৌশাম্বী-অধিপতি দ্বোরপবর্ধন; কৌশাম্বী রাজসাহীর কুসুম্বা পরগণা, অথবা বগুড়া জেলার তপে কুসুম্বি পরগণা; (১৫) পদুবন্বার সোম; পদুবন্বা পাবনা হইতে পারে, কিন্তু হুগলী জেলার পৌনান পরগণা হওয়াই অধিকতর সম্ভব।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, পদুবন্বা যদি পাবনা হয়, তাহা হইলে পদুবন্বা এবং কৌশাম্বী ছাড়া আর সমস্ত সামন্তরাই দক্ষিণ-বিহার ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের। বুঝিতে পারা যায়, অঙ্গ বা উত্তর-বিহার এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ ছাড়া রামপালের রাজত্বের বিস্তার আর কোথাও ছিল না। কৌশাম্বীর দ্বোরপবর্ধনকে এই তালিকায় দেখিয়া মনে হইতেছে, খাস বরেন্দ্রীতেও রামপাল ২।১ জন সহায়ক সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

এই সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে ক্ষৌণী-নায়ক ভীমের পক্ষে আঁটিয়া ওঠা সম্ভব ছিল না। রামচরিতে রামপাল কর্তৃক বরেন্দ্রীর উদ্ধার-যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

ক্ষৌণী-নায়ক ভীম

এইখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, গঙ্গার উত্তর-তীরে দুই সৈন্যদলে তুমুল যুদ্ধ হয়, এবং ভীম জীবিতাবস্থায় বন্দী হন। ভীমের অগণিত ধনরত্নপূর্ণ রাজকোষ রামপালের সেনাদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। কিন্তু ভীম বন্দী হওয়ার অব্যবহিত পরই ভীমের অন্যতম সুহৃৎ ও সহায়ক হরি পরাজিত ও পর্যুদস্ত কৈবর্ত-সৈন্যদের একত্র করিয়া আবার যুদ্ধে রামপালের পুত্রের সম্মুখীন হন;

কিন্তু অজস্র অর্থদানে কৈবর্তসেনা ও হরিকে বশীভূত করা হয়। ভীম সপরিবারে রামপাল-হস্তে নিহত হন। বরেন্দ্রী এবং কৈবর্ত-রাজকোষ রামপালের করায়ত্ত হইল, করভার-পীড়িত বরেন্দ্রীতে সুখ ও শান্তি ফিরিয়া আসিল। রামাবতী নগরে বরেন্দ্রীর রাষ্ট্রকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

বরেন্দ্রী উদ্ধারের পর রামপাল হৃতরাজ্যের অন্যান্য অংশ উদ্ধারে যত্নবান হইলেন। (পূর্ব)-বঙ্গের এক বর্মণরাজ, বোধহয় হরিবর্মা, নিজ স্বার্থে রামপালের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। রামপালের এক সামন্ত কামরূপ জয় করিয়া রামপালের প্রিয়পাত্র হইলেন। রাঢ়দেশের সামন্তদের সহায়তায় উড়িষ্যারও অন্তত কিয়দংশ জয় তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল; অবশ্য তাহা করিতে গিয়া কলিঙ্গের চোড়গঙ্গ-রাজদের সঙ্গে অন্তত পরোক্ষে কিছু সংঘর্ষে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল। বোধ হয় উৎকলে-কলিঙ্গে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিতে গিয়াই রামপালকে চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গের (আ ১০৭০—১১১৮) আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হয়; বঙ্গ-বঙ্গাল এবং মগধ কুলোত্তুঙ্গকে কর প্রদান করিত এবং কুলোত্তুঙ্গ গঙ্গা হইতে কাবেরী পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগের অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া অন্তত একটা দাবি কুলোত্তুঙ্গের পক্ষ হইতে করা হইয়াছে। এই দাবি কতটুকু ঐতিহাসিক বলা কঠিন।

এই সময় কর্ণাটের লুব্ধদৃষ্টি বরেন্দ্রীর উপর পতিত হয়। বাংলা দেশে কর্ণাটাক্রমণের কথা তো আগেই বলা হইয়াছে। কিন্তু রামচরিতে বরেন্দ্রীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে "অধরিত-কর্ণাটেক্ষণ-লীলা"; এই কর্ণাটেরা কি সেই সুদূর দক্ষিণের কর্ণাটবাসী? বোধ হয় তাহা নয়। ইঁহারা সম্ভবত পশ্চিম-বঙ্গ ও মিথিলার দুই কর্ণাট রাজবংশ। কর্ণাটাগত এক সেন-বংশ ইতিমধ্যেই পশ্চিম-বঙ্গে, এবং আর এক সেন-বংশ মিথিলায় নিজেদের বংশের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আপাতত মিথিলার সেন-বংশীয় রাজা নান্যদেবের (আ ১০৯৭) সঙ্গে রামপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। নান্যদেব বঙ্গ এবং গৌড়ের পরাক্রম খর্ব করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন; সমসাময়িক গৌড়রাজ রামপাল বলিয়াই মনে হয়, এবং বঙ্গরাজ হইতেছেন বিজয়সেন। বিজয়সেনও অবশ্য নান্যদেবকে পরাজয়ের দাবি করিয়াছেন। যাহা হউক, মিথিলা (উত্তর-বিহার) যে রামপালের করচ্যুত হইয়াছিল এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই।

কর্ণাটাভ্যুদয়

কাশী-কান্যকুব্জাধিপতি পরাক্রান্ত গাহড়বাল রাজাদের সঙ্গেও রামপালকে যুঝিতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গাহড়বাল বংশীয় গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র মদনপালের সঙ্গে গৌড়-সৈন্যের সংগ্রামের ইঙ্গিত গাহড়বাল-লিপিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মদনপাল নিশ্চিত জয়লাভ করিয়াছিলেন, এমন বলা যায় না। বরং রামচরিতে এমন ইঙ্গিত আছে যে, বরেন্দ্রী মধ্যদেশের বিক্রম সংযত করিয়া রাখিয়াছিল।

রামপাল বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি কৃতী পুরুষ

ছিলেন, সন্দেহ নাই। নির্বাসনে জীবন আরম্ভ করিয়া বিদ্রোহীদের হাত হইতে পিতৃভূমি বরেন্দ্রী উদ্ধার, বাংলার অধিকাংশের পুনরুদ্ধার, উড়িষ্যা ও কামরূপে আধিপত্য বিস্তার, এবং একাধিক বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও পালরাজ্য ও রাষ্ট্রের সীমা এবং আধিপত্য মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখা, এক জীবনের পক্ষে এত কর্মকীর্তি তাঁহার রাষ্ট্রবুদ্ধি, দৃঢ়চরিত্র এবং অদম্য শৌর্যবীর্যের পরিচায়ক, স্বীকার করিতেই হয়।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় আদর্শ বা সামাজিক ব্যবস্থার সময়োপযোগী পরিবর্তন না হইলে শুধু কোনো রাজা বা সম্রাটের ব্যক্তিগত চরিত্রের গুণ রাজ্য বা রাষ্ট্রকে পরিণাম-বিনষ্টির হাত হইতে বাঁচাইতে পারে না। মহীপালের মতন সম্রাট পারেন নাই, রামপালও পারিলেন না। বিনষ্টিকে তাঁহারা তাঁহাদের শৌর্যে বীর্যে পরাক্রমে কূটবুদ্ধিতে দূরে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে বিচ্ছিন্ন স্থানীয় সংকীর্ণ আত্মসচেতনতা ভারতীয় রাষ্ট্রবুদ্ধিকে এই যুগে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল, মহীপাল বা রামপাল কেহই তাহা দূর করিতে পারেন নাই। এই অন্তরাষ্ট্রীয় আদর্শের এতটুকু পরিবর্তন ভারতবর্ষের কোথাও হয় নাই। বস্তুত, ভারতবর্ষের কোনো রাজা বা রাজবংশই এই যুগে সেদিকে সচেষ্ট হ'ন নাই; বরং একে অন্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া নিজেদের রাজ্যসীমা বাড়াইবার চেষ্টাই কেবল করিয়াছেন। অথচ, অন্যদিকে তখন বৈদেশিক আধিপত্যের ঘন কৃষ্ণমেঘ ভারতের রাষ্ট্রীয় আকাশ ক্রমশ ঢাকিয়া ফেলিতেছিল; মুসলমান অধিকারের সীমা ক্রমশ পূর্বদিকে বিস্তৃত হইতেছিল! রামপাল যখন মাতুল মথনের মৃত্যুশোক সহ্য করিতে না পারিয়া পরিণত বার্ধক্যে গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করেন তখন হয়তো তিনি সার্থক জীবনের পরম পরিতৃপ্তি লইয়াই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু যে স্থানীয় সংকীর্ণ আত্মসচেতনতা মহীপালের চেষ্টাকে সার্থক হইতে দেয় নাই, তাহাই রামপালের চেষ্টাকেও পরিণামে ব্যর্থ করিয়া দিল। ইহার সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ তো ছিলই।

সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর পরে এই বিষাদান্ত পরিণতির কথা বলিবার আগে বঙ্গের বর্মণ-বংশের কথা একটু বলিয়া লইতে হয়। ইহাদের কথা আগেও একাধিক প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। যাদববংশীয় এই বর্মণ রাজারা কলিঙ্গ দেশের সিংহপুর নামক স্থান হইতে একাদশ শতকের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পাদে কোনো সময় পূর্ববঙ্গে আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করেন। বজ্রবর্মাপুত্র জাতবর্মা এই বংশের প্রথম রাজা। জাতবর্মা কলচুরীরাজ কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করেন, এবং অঙ্গ, কামরূপ এবং বরেন্দ্রী-নায়ক দিব্যকে পরাজিত করেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। অঙ্গ এই সময় বোধ হয় রামপালের অধীন ছিল, এবং দিব্য নিশ্চয়ই বরেন্দ্রীর কৈবর্ত-নায়ক। দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর পাল-রাজ্যে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, জাতবর্মা তাহার পূর্ণ সুযোগ লইতে বোধ হয় দ্বিধা বোধ করেন নাই। জাতবর্মার পশ্চাতে কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দেব এবং কর্ণের সহায়তা ছিল, এ-সন্দেহ অমূলক

বঙ্গে বর্মণাধিপত্য আঃ—১০৫০

নয়। জাতবর্মার পর পুত্র মহারাজাধিরাজ হরিবর্মা রাজা হন; বিক্রমপুরে ছিল তাঁহার রাজধানী, এবং তাঁহার সন্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী ছিলেন ভট্ট ভবদেব। এই হরিবর্মা, রামচরিতোক্ত ভীমবন্ধু হরি, এবং রামপাল-শরণাগত বর্মণরাজ এক এবং অভিন্ন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে না করিবার আপাতত কোনো কারণ নাই। হরিবর্মার পর ভ্রাতা শ্যামলবর্মা বঙ্গের রাজা হন; তাঁহার রাষ্ট্রীয় কোনো কীর্তিই জানা নাই, তবে তিনি বাংলার বৈদিক ব্রাহ্মণদের লোকস্মৃতিতে আজও বাঁচিয়া আছেন। কুলজী-গ্রন্থের মতে শ্যামলবর্মার আমলেই বাংলায় বৈদিক ব্রাহ্মণদের আগমন। তাঁহার পুত্র ভোজবর্মা এই বংশের শেষ রাজা; ইঁহারও রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল বিক্রমপুরে, কিন্তু তিনি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত কৌশাম্বী-অষ্টগচ্ছ-খণ্ডলে কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন দেখিয়া মনে হয়, পুণ্ড্রবর্ধনের রাজসাহী-বগুড়া অঞ্চলেও ভোজবর্মার আধিপত্য এক সময় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে অথবা তাঁহার অব্যবহিত পরেই পূর্ব-বঙ্গের বর্মণরাজ্য সেন-রাজবংশের করতলগত হয়।

রামপালের চারিপুত্রের মধ্যে দুই পুত্র বিত্তপাল ও রাজ্যপালের সিংহাসন আরোহণের সৌভাগ্যলাভ ঘটে নাই। অন্য দুই পুত্র কুমারপাল ও মদনপালের মধ্যে কুমারপাল (আ ১১২০—২৫) রাজা হন, তাঁহার পর কুমারপাল-পুত্র তৃতীয় গোপাল (আ ১১২৫—১১৪০) এবং গোপালের পর রামপালের অন্যতম পুত্র মদনপাল (আ ১১৪০—১১৫৫) রাজা হইয়াছিলেন।

নির্বাণ
আ ১১২০—১১৭২

রামচরিত-কাব্যপাঠে মনে হয়, সিংহাসনারোহণের এই ক্রম সম্বন্ধে একটা রহস্য কোথাও ছিল। রামচরিত রামপালকে লইয়াই রচনা, কিন্তু বস্তুত মদনপালের রাজত্ব পর্যন্ত কাব্যটি বিস্তারিত, অথচ রামপালের পর কুমারপাল এবং গোপাল সম্বন্ধে এই কাব্যে প্রায় কিছু বলা হয় নাই বলিলেই চলে। মদনপালে পৌঁছিয়া সন্ধ্যাকর যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন। কোনও বংশগত বা পারিবারিক গোলমালের কল্পনা একেবারে অলীক না-ও হইতে পারে!

যাহা হউক, এই তিন জনের রাজত্বকালেই চারিশত বৎসরের সযত্নলালিত, বাঙালীর গৌরব পালরাজ্য ও রাষ্ট্র ধীরে ধীরে একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। ধর্মপাল-দেবপাল যে-সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, মহীপাল যাহাকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়া ছিলেন, রামপাল যাহাকে শেষবারের জন্য আত্মপ্রত্যয় এবং প্রতিষ্ঠা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, ইঁহারা আর তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। ঘরে এবং বাহিরে স্থানীয় আত্ম-সচেতন একান্ত ব্যক্তিক রাষ্ট্রবুদ্ধি উৎকট হইয়া দেখা দিল; ইহাকে ব্যাহত করিবার মতন শক্তি ও বুদ্ধি লইয়া কোনো মহীপাল বা রামপাল আর সিংহাসন আরোহণ করিলেন না!

কুমারপালের নিজের প্রিয় সেনাপতি বৈদ্যদেব কামরূপে এক বিদ্রোহ দমন করিয়া নিজেই এক স্বতন্ত্র স্বাধীন নরপতিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইলেন। পূর্ব-বঙ্গে ভোজবর্মার

নেতৃত্বে বর্মণরা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইল। দক্ষিণ হইতে কলিঙ্গের গঙ্গবংশীয় রাজারা আরম্য (=বর্তমান আরামবাগ) দুর্গ জয় করিয়া মেদিনীপুরের (মিধুনপুর) ভিতর দিয়া গঙ্গাতীর পর্যন্ত ঠেলিয়া চলিয়া আসিলেন; কুমারপালের রাজত্বকালে সেনাপতি বৈদ্যদেব বোধ হয় সাফল্যের সঙ্গে এই আক্রমণ কতকটা ব্যাহত করিয়াছিলেন, এবং মদনপালও বোধ হয় একবার কলিঙ্গ পর্যন্ত বিজয়াভিযান করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই পাল ও গঙ্গদের সংগ্রামের এবং দক্ষিণের কল্যাণ-চালুক্যদের আক্রমণের সুযোগ লইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে কর্ণাটাগত সেন-রাজবংশ মস্তক উত্তোলন করিল। এই সেন-রাজবংশ ইতিপূর্বেই পূর্ব-বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এইবার তাঁহারা একেবারে গৌড়ের হৃদয়দেশ আক্রমণ করিল। কালিন্দী-নদীর তীরে, বোধ হয় মদনপালের রাজধানীর নিকটেই এক তুমুল যুদ্ধ হইল; এই যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত, কারণ রামচরিতে যেমন মদনপালের জয় দাবি করা হইয়াছে, তেমনই দেওপাড়া-লিপিতে সেন-রাজ বিজয়সেনের পক্ষ হইতেও জয়ের দাবি জানান হইয়াছে।

অন্যদিকে দুর্বলতার সুযোগ লইয়া গাহড়বাল-রাজারাও এই সময় বাংলাদেশে আবার নূতন করিয়া সমরাভিযানে উদ্যত হইলেন। ১১২৪ খ্রীষ্টাব্দের আগেই পাটনা অঞ্চল তাঁহাদের অধিকারে চলিয়া গেল; ১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে গেল মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের অঞ্চল। মদনপালের রাজত্বের অষ্টম বৎসর পর্যন্ত বরেন্দ্রীর অন্তত কিয়দংশ তাঁহার অধিকারে ছিল বলিয়া লিপি-প্রমাণ বিদ্যমান। এইটুকু ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো অংশই তাঁহার অধিকারে ছিল বলিয়া মনে হয় না; তবে বিহারের মধ্য ও পূর্বাঞ্চল তখনও পাল-রাজ্যভুক্ত ছিল। মদনপালের মৃত্যুর দশ বৎসরের মধ্যে তাহাও আর রহিল না, এবং পাল-রাজ্যের শেষচিহ্নও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

মদনপালই পালবংশের শেষ রাজা। তবে তাঁহার পরও গোবিন্দচন্দ্র (আঃ ১১৫৫—১১৬২) নামে একজন পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের নাম পাওয়া যায়। লিপি-প্রমাণ হইতে মনে হয়, গয়া জেলাই ছিল তাঁহার রাজ্যকেন্দ্র; গৌড়রাজ্যের কিয়দংশও হয়তো এক সময় তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

বাংলার ইতিহাসে পালবংশের আধিপত্যের চারিশত বৎসর নানাদিক হইতে গভীর ও ব্যাপক অর্থ বহন করে। বর্তমান বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির গোড়াপত্তন হইয়াছে এই যুগে; এই যুগই প্রথম বৃহত্তর সামাজিক সমীকরণ ও সমন্বয়ের যুগ। এই চারিশত বৎসরের সামাজিক ইঙ্গিতগুলি কতকটা বিস্তৃত ভাবেই নানা অধ্যায়ে বিভিন্ন দিক হইতে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে রাষ্ট্রের ও রাজবৃত্তের দিক্ হইতে ইঙ্গিতগুলি ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত একটু চেষ্টা করা যাইতে পারে।

সামাজিক ইঙ্গিত

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় খ্রীষ্টপরবর্তী ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আদর্শ সর্বভারতীয় একরাটত্ব, সমস্ত ভারতের একচ্ছত্রাধিপত্য।

মাঝে মাঝে এই আদর্শ হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন তাহা হইয়াছে, তখনই ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিদেশির নিকট অনেক লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে, এবং প্রচুর মূল্য দিয়া আবার সেই পুরাতন আদর্শকেই মানিয়া লইতে হইয়াছে। মৌর্য ও গুপ্তরাজবংশ এই আদর্শের প্রতীক। সপ্তম শতকেও এই আদর্শ সক্রিয়, কিন্তু তখন সীমা সংকীর্ণতর হইয়া গিয়াছে, সর্বভারত হইতে সকল-উত্তরাপথে সেই আদর্শ নামিয়া আসিয়াছে; 'সকলোত্তরপথনাথ' হওয়াই এই যুগের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। অষ্টম শতকেও এই আদর্শকে কেন্দ্র করিয়াই প্রতীহার ও পালবংশের সংগ্রাম অক্ষুণ্ণ, এবং তাহাকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টায় দক্ষিণের রাষ্ট্রকূটবংশ সদাজাগ্রত। অন্যদিকে ধীরে ধীরে অন্য একটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছিল; এই আদর্শের অস্তিত্ব যে ছিল না তাহা নয়, তবে সর্বভারতীয় আদর্শের মতন এতটা সক্রিয় কখনো ছিল না।

রাষ্ট্রীয় আদর্শ

এই আদর্শ স্থানীয় ও প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের আদর্শ। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশ এই আদর্শ মাথা তুলিতে আরম্ভ করে; কিন্তু ধর্মপাল-দেবপাল বৎসরাজ-নাগভটের সময়েও উত্তরাপথস্বামীত্বের আদর্শ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু তাহার পর হইতেই স্থানীয় ও প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের আদর্শের জয়জয়কার। এই সময় হইতেই যেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশখণ্ডের ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে এবং এই রাষ্ট্রগুলি নিজেদের প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে সচেষ্ট হইয়া উঠে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দেখা যায়, মোটামুটি অষ্টম শতক বা তাহার কিছু পর হইতে এক একটি বৃহত্তর জনপদরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া মূলগত এক কিন্তু এক একটি বিশিষ্ট লিপি বা অক্ষর রীতি, ভাষা এবং শিল্পাদর্শ গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে তাহাদের এক একটি প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বস্তুত, ভারতবর্ষের, বিশেষত উত্তর-ভারতের, মহারাষ্ট্র ও উড়িষ্যার প্রত্যেকটি প্রাদেশিক লিপি ও ভাষার ভ্রূণ ও জন্মাবস্থা মোটামুটি এই চারিশত বৎসরের মধ্যে। বাংলা লিপি ও ভাষার গোড়া খুঁজিতে হইলে এই চারিশত বৎসরের মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। বাংলার ভৌগোলিক সত্তাও এই যুগেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের অন্যান্য লিপি, ভাষা ও প্রাদেশিক ভৌগোলিক সত্তা সম্বন্ধেও একই উক্তি প্রযোজ্য।

এই লিপি, ভাষা, ভৌগোলিক সত্তা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শকে আশ্রয় করিয়া এক একটি স্থানীয় রাষ্ট্রীয় সত্তাও গড়িয়া উঠে এই যুগেই। বঙ্গ-বিহারে এই রাষ্ট্রীয় সত্তার সূচনা সপ্তম শতকেই দেখা দিয়াছিল, এবং তাহার প্রতীক ছিলেন শশাঙ্ক। কিন্তু পরবর্তী একশত বৎসরের মাৎস্যন্যায়ে এই রাষ্ট্রীয় সত্তাই আহত হইয়াছিল সকলের চেয়ে বেশি। পাল-রাজারা আবার তাহা জাগাইয়া তুলিলেন;

জাতীয় স্বাতন্ত্র্য

বাঙালী নিজস্ব স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র লাভ করিল, এবং চারিশত বৎসর ধরিয়া তাহা ভোগ করিল। শুধু তাহাই নয়, ধর্মপাল-দেবপাল-মহীপালের সাম্রাজ্য বিস্তারের কৃপায় এই রাষ্ট্র

একটা আন্তর্জাতীয় রাষ্ট্রীয় সত্তার স্বাদও কিছুদিনের জন্য পাইয়াছিল। নালন্দা,
এ[illegible] বিক্রমশিলা-ওদন্তপুরী-
সোমপুরের বৌদ্ধ সংঘ ও মহাবিহারগুলিকে আশ্রয় করিয়া আন্তর্জাতিক বৌদ্ধজগতে
বাংলাদেশ ও বাঙালীর রাষ্ট্র একটা গৌরবময় স্থান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই
সকলের সম্মিলিত ফলে বাংলায় এই যুগেই, অর্থাৎ এই প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া একটা
সার্বত্রিক ঐক্যবোধ গড়িয়া ওঠে—ইহাই বাঙালীর স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধের মূলে,
এবং ইহাই বাঙালীর এক-জাতীয়ত্বের ভিত্তি। পাল-যুগের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

এই দানের মূলে পালরাজাদের কৃতিত্ব স্বীকার করিতেই হয়। পালরাজারা ছিলেন বাঙালী, বরেন্দ্রী তাঁহাদের পিতৃভূমি। বংশ-প্রতিষ্ঠায়ও ইহারা পুরাপুরি বাঙালী। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-সমাজের বংশাভিজাত্যের দাবি ইহাদের নাই। রামচরিতে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করা হইয়াছে, কিংবা ক্ষত্রিয় রাজবংশের সঙ্গে তাঁহাদের বিবাহাদি হইত, এজন্য তাঁহাদের ক্ষত্রিয় মনে করা কঠিন। রাজা মাত্রেই তো ক্ষত্রিয়, বিশেষত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রবর্তনের পর। আর, রাজরাজড়ার বৈবাহিক সম্বন্ধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তো রাষ্ট্রীয় কারণেই হইয়া থাকে; তাঁহাদের তো কোনো বর্ণ নাই! আবুল ফজল যে ইহাদের কায়স্থ বলিতেছেন তাহার মূলেও কোন বস্তুভিত্তি আছে কিনা সন্দেহ; তবে তাঁহারা উচ্চতর তিন বর্ণের কেহ নহেন এই সংস্কার লোকস্মৃতিতে ষোড়শ শতকেও বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়। তারানাথ এবং মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকারই বোধ হয় যথার্থ ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটি রাখিয়াছেন। তারানাথ বলিতেছেন, জনৈক বৃক্ষদেবতার ঔরসে ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে গোপালের জন্ম; কাহিনীটি টটেম্-স্মৃতি জড়িত বলিয়া সন্দেহ করিলে অন্যায় বা অনৈতিহাসিক কিছু করা হয় না। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি-বহির্ভূত, আর্য সমাজ-বহির্ভূত সমাজের সংস্কার এই গল্পের মধ্যে বিদ্যমান। গোপাল এই সমাজ, সংস্কার ও সংস্কৃতির লোক। বোধ হয় এই জন্যই মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার পালরাজাদের বলিয়াছেন "দাসজীবিনঃ"। অথচ এই পালরাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, স্মৃতি, সংস্কার ও সংস্কৃতির ধারক ও পোষক, চাতুর্বর্ণের রক্ষক ও সংস্থাপক; লিপিগুলিতে তাহার প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ধর্মে ইহারা বৌদ্ধ, পরম সুগত; ইহারা মহাযানী বৌদ্ধসংঘ ও সম্প্রদায়ের পরম অনুরাগী পোষক; অথচ বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ইহাদের আনুকূল্য ও পোষকতা লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, একাধিক পালরাজা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পূজা এবং যাগযজ্ঞে নিজেরা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, পুরোহিত-সিঞ্চিত শান্তিবারি নিজেদের মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মে ব্রাহ্মণেরা নিয়োজিত হইতেন, মন্ত্রী এবং সেনাপতিও হইতেন, আবার কৈবর্তরাও স্থান পাইতেন না, এমন নয়। এই ভাবে পালবংশকে কেন্দ্র ও আশ্রয় করিয়া বাংলাদেশে প্রথম সামাজিক সমন্বয় সম্ভব হইয়াছিল; একদিনে নয়, চারিশত বৎসর ধরিয়াই

সাংস্কৃতিক
এবং
সামাজিক সমন্বয়

[illegible] বৃত্তি ও আচার, আর্য ও আর্যেতর [illegible] বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, পূজা, শিক্ষা ও আদর্শ, দেবদেবী সমস্তই পালবংশের ক্ষেত্রে ও [illegible] করিয়া পরস্পর আদানপ্রদান করিয়াছে এবং এক মিলন-সমন্বয় সূত্রে গ্রথিত হইয়া একটি বৃহৎ সামাজিক সমন্বয় গড়িয়া তুলিয়াছে। গুপ্ত আমল হইতে আরম্ভ করিয়া আর্য জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উপর যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত বাংলার বুকের উপর দ্রুত প্রবাহিত হইতেছিল, এবং মোটামুটি সপ্তম শতকে যে সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছিল—শশাঙ্ক তো ইহারই প্রতীক—সেই স্রোত ও সংঘর্ষ সমন্বিত হইল এই চারিশত বৎসর ধরিয়া পাল-রাজাদের বৃহৎ ছত্রছায়ায়। এই আর্য সংস্কার ও সংস্কৃতির বাহিরে যে বৃহৎ আর্যেতর সংস্কার ও সংস্কৃতি দেশের অধিকাংশ জুড়িয়া বিরাজ করিতেছিল তাহাও অন্তত কিছুটা যে পাল-রাজছত্রের আশ্রয় লাভ করিয়াছিল তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় পাহাড়পুরের অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকগুলিতে এবং সমসাময়িক ধর্মমত ও সম্প্রদায়গুলিতে। বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মেই এই সময়ই আর্যেতর দেবদেবী, আচার ও সংস্কার ধীরে ধীরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, এবং কিছু কিছু স্বীকৃতিও লাভ করে। এই যুগের দেবদেবীর মূর্তিতত্ত্ব তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, এবং এ-প্রমাণ অনস্বীকার্য। এই সুবৃহৎ সমন্বয় অবশ্যই সংগঠিত হইয়াছিল আর্য ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও সংস্কৃতির আদর্শানুযায়ী: পাল-রাজারাও তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন; ভূমি-ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার, চাতুর্বর্ণের স্বীকৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্বীকৃতি এবং প্রচলন শুধু নয়, সেই ভাষায় কাব্যময় সাহিত্য রচনা এই সমস্তই সেই আদর্শের নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় বহন করে। এই আর্য বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আশ্রয় করিয়াই বাংলাদেশ উত্তরোত্তর উত্তর-ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান ধারার সঙ্গে আত্মীয়তায় যুক্ত হয়। এই সচেতন যোগ সাধন আরম্ভ হইয়াছিল গুপ্ত-আমলেই, কিন্তু পূর্ণরূপ গ্রহণ করিল পাল-আমলে; এবং বাংলাদেশে তাহা এক বৃহত্তর সমন্বয়ের আশ্রয় হইল আর্যেতর এবং মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান-বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় যুক্ত হইয়া। এই সমন্বিত এবং সমীকৃত সংস্কৃতিই বাঙালীর সংস্কৃতির ভিত্তি, এবং ইহাও পাল আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠদান। সমন্বয় এবং সমীকরণের এই রূপ ও প্রকৃতি ভারতের অন্যত্র আর কোথাও দেখা যায় না।

কিন্তু জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং সমন্বয় ও সমীকরণ পালযুগের রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। স্থানীয় প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের রাষ্ট্রীয় আদর্শের কথা বলিয়াছি। এই আদর্শ শুধু যে বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেই সক্রিয় ছিল তাহা নয়, সাম্রাজ্যিক গুপ্ত-আমলের পর হইতে অন্তর্রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও এই আদর্শ ক্রমশ কার্যকরী হইল। ইহা হইতেই সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব, এবং আগেই দেখিয়াছি মোটামুটি ষষ্ঠ শতক হইতে বাংলা দেশেও মহারাজাধিরাজের বৃহত্তর রাজ্যের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত নায়ক ও সামন্ত রাজার রাজ্য ও রাষ্ট্রের বিস্তার। নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে ইহারা প্রায় স্বাধীন

সামন্ততন্ত্র

নরপতির মতনই ব্যবহার করিতেন; শুধু মৌখিকত মহারাজাধিরাজকে মানিয়া চলিতেন মাত্র। পাল-আমলে এই সামন্তপ্রথা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলাদেশেও পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। বস্তুত পালরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভিত্তিই এই সামন্ততন্ত্র, এবং এই সামন্ততন্ত্রই পালরাষ্ট্রের শক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলতাও। বিজিত রাষ্ট্রসমূহ মৌর্য বা গুপ্ত রাষ্ট্রের মত এই আমলে আর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইত না; বস্তুত তাহারা স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই থাকিত, পাল-রাষ্ট্রের সর্বাধিপত্য স্বীকার করিত মাত্র। কিন্তু এই কেন্দ্রীয় অন্তর্রাষ্ট্রেও যে অসংখ্য সামন্ত নরপতি ও নায়ক ছিলেন, পাল-লিপিমালা ও রামচরিতই তাহার প্রমাণ। উভয় ক্ষেত্রেই স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের আদর্শই জয়ী হইয়াছে, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ও রাজবংশ যখন দুর্বল হইত তখন উভয়ই মস্তকোত্তলন করিত। দেবপালের মৃত্যুর পর বিজিত রাষ্ট্র সমূহ স্থানীয় আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াই পালসাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল; মহীপাল সেই সাম্রাজ্যের কতকাংশ জোড়া লাগাইয়াছিলেন, কিন্তু বেশিদিন তাহা স্থায়ী হয় নাই। বিজিত ও অবিজিত রাষ্ট্র এবং অন্তর্রাষ্ট্রের সামন্তবর্গ মহীপালের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। আর, দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে যাঁহারা বিদ্রোহ করিয়াছিলেন তাঁহারা তো অন্তর্রাষ্ট্রেরই অনন্তসামন্তচক্র। আবার, রামপাল যখন বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করিয়া পাল-রাজ্যের লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন তখনও তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন এই সামন্তবর্গ। আবার ইহারাই রামপালের মৃত্যুর পর পালরাজ্য ও রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করিয়া তাহাদের বিলুপ্তির পথে আগাইয়া দিয়াছিলেন। সামন্ত-মহাসামন্ত, মাণ্ডলিক-মহামাণ্ডলিক, মণ্ডলেশ্বর-মহামণ্ডলেশ্বর ইহারা সকলেই ক্ষুদ্র বৃহৎ সামন্ত, এবং অনেক রাজা-মহারাজাও সামন্ত; ইহাদের সাক্ষাৎ পাল-লিপিগুলিতে বরাবরই পাওয়া যায়। রাজন্, রাণক, রাজনক, রাজন্যক ইহারা সকলেই সামন্ত। আর সামন্ততন্ত্র যখন ছিল তখন সামন্ততান্ত্রিক বীরধর্ম এবং সেই ধর্মোদ্ভূত বীরগাথাও প্রচলিত নিশ্চয়ই ছিল। এই বীরধর্মের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায় দেবপালের সামন্ত বলবর্মার (নালন্দা-লিপি) চরিত্রে, রামচরিতে রামপালের সামন্তদের আচরণে, ভীম-সহায়ক হরির আচরণে। আর, বীরগাথার পরিচয় পাওয়া যায় ধর্মপাল-সম্বন্ধীয় গাথায় (খালিমপুর-লিপি), উত্তর-বঙ্গের মহীপালের গানে, যোগীপাল-ভোগীপালের গীতে। সূতেরা (পরবর্তী কালের ভাট-ব্রাহ্মণেরা) যে বীরগাথা গাহিয়া বেড়াইতেন তাহার অন্তত একটি প্রমাণ পাওয়া যায় মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের লিপিটিতে। ঈশ্বরঘোষের বংশের প্রতিষ্ঠাতা ধূর্তঘোষের পুত্র বালঘোষ যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন; তাঁহার পুত্র ধবলঘোষের বীরত্ব ও গৌরব গাথায় গীত হইত। কিন্তু এই বীরধর্ম বা স্বামীধর্ম সম্বন্ধে সবচেয়ে সুন্দর সংবাদ পাওয়া যায় বোধ হয় তৃতীয় গোপালের নিমদীঘি বা মাণ্ডা শাসনে। এই লিপিটির পাঠ নিঃসন্দিগ্ধ নয়। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের পাঠ গ্রহণযোগ্য কিনা, এ-বিষয়ে সন্দেহ পোষণের কারণ বিদ্যমান। এই পাঠ অনুযায়ী মিজং নামে গোপালের এক

সামন্ত বলিতেছেন, "শ্রীমদ্ গোপালদেব স্বেচ্ছায় শরীর ত্যাগ করিয়া স্বর্গত হইয়াছেন এবং তাঁহার পদধূলি মিজং নামে প্রথিত আমি (হায়!) এখনও বাঁচিয়া আছি। পিতৃ আজ্ঞায় (রাজার প্রতি) প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অসীম কৃতজ্ঞতা সম্পন্ন ঐড়দেব সেনশত্রুকে একশত তীক্ষশরদ্বারা পূরিত করিয়া আটজন সহচরসহ রাজার সহিত স্বর্গে গিয়াছেন। যুদ্ধদ্বারা নিজের (জীবিতাবস্থা) অতিক্রম করিয়া চন্দ্রকিরণের মত অমল যশ অর্জন পূর্বক শুভদেবনন্দন (ঐড়দেব) দেবতাগণের মত ত্রিদশসুন্দরীগণের দৃষ্টি লইয়া খেলা করিতেছেন। তাঁহার (ঐড়দেবের) গীতবাদ্যপ্রিয়, ধর্মধর, অমৎসর, গলবস্ত্র, দানশূর সুসংযতবেশ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীমান্ ভাবক যজ্ঞাদি ধর্মকার্য (শ্রাদ্ধ ?) সম্পাদন করেন। শরশল্য দ্বারা পূরিত বহু প্রাণীকে (সৈন্যকে) যে স্থানে দগ্ধ করা হইয়াছিল, সেইস্থানে ভাবকদাসকৃত এই কীর্তি (মন্দির ?) বিরাজ করিতেছে। * * * "—সামন্ততান্ত্রিক স্বামীধর্ম, বীরধর্ম পালনের ইহার চেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে ? ঐড়দেব ও মিজং দুইটি নামই অ-সংস্কৃত, অন্-আর্য ; দুইজনই প্রাচীন বাংলার স্বামীধর্ম ও বীরধর্মের জলন্ত দৃষ্টান্ত। তাহা ছাড়া, সামন্ততান্ত্রিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সতীদাহ প্রথাও পাল-আমলের শেষ দিকে এবং সেন আমলে প্রসার লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণ-গ্রন্থে (২।৮।৩—১০) মৃত স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়া মরিবার জন্ম সমাজ-নায়কেরা বিজ্ঞ নারীদের পুণ্যলোভে প্রলুব্ধ করিয়াছেন। ইহার চেয়ে বীরত্ব নাকি তাঁহাদের আর কিছু নাই ; সহমরণে গেলে নাকি এক পূর্ণ মন্বন্তর স্বামীসঙ্গসুখ ভোগ করা যায় ! বাংলাদেশ একাদশ-দ্বাদশ শতকেই সামন্ততন্ত্রের সব ক'টি লক্ষণ ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যেমন প্রসারিত হইয়াছিল, তেমনই প্রসারিত হইয়াছিল আমলা বা কর্মচারীতন্ত্র। বস্তুত, পাল যুগের লিপিমালায় রাজকর্মচারীদের যে সুদীর্ঘ তালিকা দৃষ্টিগোচর হয় তাহা হইতে এই তথ্য সুস্পষ্ট যে, এই যুগে রাষ্ট্রের বৃহদ্বাহু সমাজের সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বিস্তৃত। বিভিন্ন রাষ্ট্রকর্মের বিচিত্র বিভাগে বিচিত্র কর্মচারী রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে গ্রামের হাট খেয়াঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত। লৌকিক প্রায় সমস্ত ব্যাপারই রাষ্ট্রশাসনের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত এমন কি পারলৌকিক ধর্মাচরণ পর্যন্ত। লিপিগুলিতে এই সব বিভিন্ন বিভাগের বিচিত্র কর্মচারীর সুদীর্ঘ তালিকা দেওয়ার পরও যখন তাহা শেষ হয় নাই তখন "অন্যাংশ্চাকীর্তিতান্" বলিয়া বাকি সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। একটা বৃহৎ আমলাতন্ত্র যে পাল-যুগে গড়িয়া উঠিয়াছিল এই সব সাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ। প্রধান প্রধান কর্মচারী, যেমন মন্ত্রী, সেনাপতি ইত্যাদির হাতে ক্ষমতাও প্রচুর কেন্দ্রীকৃত হইত অত্যন্ত স্বাভাবিক উপায়েই। এই সব কর্মচারীরাও কখনো কখনো সুযোগ পাইলে রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতিকূল আচরণ করিতেন না, এমন নয়। দিব্য তো একজন উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন বলিয়াই মনে হয় ; আর, বৈদ্যদেব তো কুমারপালের সৈনাপতিই ছিলেন। পাল-যুগে

আমলাতন্ত্র

সামন্ত ও আমলাতন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা রাষ্ট্রবিন্যাস অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে।

এই সামন্ততন্ত্র ও আমলাতন্ত্র অকারণে গড়িয়া উঠে নাই। এই আমলে বাংলাদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের খবর একেবারেই পাওয়া যাইতেছে না। তাম্রলিপ্তি মৃত; নূতন কোনো বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া খবর নাই। বিহার-বাংলার সঙ্গে সুমাত্রা-যবদ্বীপ-ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি পূর্বদক্ষিণ-এশিয়ার দেশ ও দ্বীপগুলির যোগাযোগ অব্যাহত; নালন্দায় প্রাপ্ত শৈলেন্দ্রবংশীয় বালপুত্রদেবের লিপিই তাহার অন্যতম প্রমাণ। এই সব দ্বীপ ও দেশগুলির ইতিহাসেও এই যোগাযোগের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু একটি প্রমাণও ব্যবসা-বাণিজ্যিক যোগাযোগের দিকে ইঙ্গিত করে বলিয়া মনে হয় না, সবই যেন ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয়। তবে আন্তর্দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত; লিপিগুলিতে বণিক-ব্যবসায়ী ইত্যাদির সংবাদ অপ্রতুল নয় (দ্রষ্টব্য—ব্যবসা বাণিজ্য ও শ্রেণীবিন্যাস প্রসঙ্গ)। নানা প্রকার কারু এবং চারুশিল্পের সংবাদও পাওয়া যাইতেছে, এবং শিল্পীদের গোষ্ঠী যে ছিল তাহার অন্তত একটি প্রমাণ আছে। জনৈক শিল্পীগোষ্ঠীচূড়ামণি তো একজন সামন্ত বা উচ্চরাজপদও (রাণক) লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে হয় রাষ্ট্রে বা সমাজে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীর প্রাধান্য খুব ছিল না (দ্রষ্টব্য—শিল্প-প্রসঙ্গ)। তাহা ছাড়া, বর্ণ ব্রাহ্মণ্য-সমাজে তাঁহারা উচ্চস্থান অধিকার করিতেন বলিয়া মনে হয় না (দ্রষ্টব্য—বর্ণবিন্যাস অধ্যায়)। রৌপ্যমুদ্রা প্রচলনের খবর যদি বা পাওয়া যাইতেছে স্বর্ণমুদ্রা একেবারে নাই (দ্রষ্টব্য—মুদ্রা-প্রসঙ্গ)। এই সব সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি রাষ্ট্রে ও সমাজে খুব ছিল না। অথচ অন্যদিকে সমাজে ভূমি ও কৃষিনির্ভরতা ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে তাহার প্রমাণ প্রচুর। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, রাজপাদোপজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী (মহত্তর, কুটুম্ব প্রভৃতি) ইত্যাদি সকলেই তো ভূমিনির্ভর। তাহা ছাড়া, ক্ষেত্রকর, কৃষক, কর্ষকেরা বারবার লিপিগুলিতে উল্লিখিত হইতেছেন দেখিয়া এ-অনুমান করা চলে যে, সমাজে তাঁহাদের স্বীকৃতি বাড়িয়াছে। প্রধানত ভূমি-নির্ভর সমাজে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কতকটা স্বাভাবিক। ভূমিই যে-সমাজে জীবিকার প্রধান উপায়, এবং ভূমির উপর ব্যক্তিগত ভোগাধিকার যেখানে স্বীকৃত, সেখানে সামন্ততান্ত্রিক ভূম্যধিকারগত সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়।

সমাজের কৃষি-নির্ভরতা

এই একান্ত ভূমি-নির্ভরতার ছবি পালযুগের রাজকর্মচারীদের তালিকাটি দেখিলেও চোখে পড়ে। আশ্চর্য এই, সুদীর্ঘ তালিকাটির মধ্যে নাকাধ্যক্ষ (নৌকাধ্যক্ষ-নাবাধ্যক্ষ), শৌল্কিক (যিনি শুল্ক আদায় করেন) এবং তরিক (পারাপার-কর্তা) ছাড়া আর একটি পদও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এবং এই তিনটি পদও যে একান্তই ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত তাহাও বলা চলে না। অন্যদিকে সামরিক ও শাসনসংক্রান্ত কর্মচারী ছাড়া অধিকাংশ রাজপদ ভূমি ও কৃষিসম্পর্কিত।

বাংলার সেন-রাজবংশ "দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র" এবং "ব্রহ্মক্ষত্রিয়"; "কর্ণাট-ক্ষত্রিয়" বলিয়াও তাঁহারা আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ইহাদের পূর্বপুরুষ বীরসেনকে চন্দ্রবংশীয় এবং পুরাণ-কীর্তিত বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেন দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট-লক্ষ্মীর লুণ্ঠনকারীদের হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া একটি উক্তিও সেন-লিপিতে দেখা যায়। ইহার পর সেন-রাজাদের পূর্বপুরুষ যে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটদেশ হইতে আসিয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ করা চলে না। কর্ণাটাগত চন্দ্রবংশীয় কোনো সেন-পরিবার রাঢ়াভূমিতে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন; সেই পরিবারে সামন্তসেনের জন্ম হয়। সামন্তসেনের বাল্য এবং যৌবন বোধ হয় কাটিয়াছিল কর্ণাটে, দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া কিছু সুখ্যাতিও তিনি অর্জন করিয়া থাকিবেন; পরে বৃদ্ধ বয়সে রাঢ়দেশে আসিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া গঙ্গাতীরে আশ্রমবাসে দিন কাটাইয়াছিলেন।

সেনোদ্ভব

ব্রহ্ম-ক্ষত্রি বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেন-পরিবারের পূর্বপুরুষরা আগে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণদের আচার-সংস্কার এবং জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করেন। সামন্তসেন নিজে ব্রহ্মবাদী ছিলেন; তাহা ছাড়া সেন-রাজারা যে একসময় বৈদিক যাগ-যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহার কিছু আভাসও সেন-লিপিগুলিতে আছে। ভারতবর্ষের অন্যত্রও ৪।৫টি ব্রহ্মক্ষত্রিয় রাজবংশের খবর জানা যায়।

এই ব্রহ্মক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় বা কর্ণাট-ক্ষত্রিয় সেন-পরিবার কি করিয়া কখন বাংলা দেশে আসিয়াছিলেন, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। পালরাজাদের সৈন্যদলে (এবং বোধহয়, আমলাতন্ত্রেও) অনেক ভিন্‌প্রদেশী—খস-মালব-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট—লোক নিযুক্ত হইতেন; কর্ণাটীরাও তাহা হইতে বাদ পড়েন নাই। কোনো সেনবংশীয় কর্ণাটী রাজ-রাজকর্মচারী হয়তো ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়া আপন সামন্তত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন, এবং পরে পালবংশের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকিবেন। অথবা, দক্ষিণাগত কোনো সমরাভিযানের সঙ্গেও এই কর্ণাটী সেন-পরিবারের বাংলা-দেশে আসা বিচিত্র নয়। কর্ণাটী চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য একবার উত্তর-ভারতে সমরাভিযানে আসিয়াছিলেন, এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গৌড় মগধ, নেপাল প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন (১১২১, ১১২৪) তাঁহারই এক সামন্ত আর একবার কলিঙ্গ, বঙ্গ, গুর্জর, মালব প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন (১১২২-২৩)। কর্ণাটী চালুক্যবংশেরই রাজা তৃতীয় সোমেশ্বর (১১২৭-৩৮) ও তাঁহার পুত্র সোম বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, নেপাল, অন্ধ্র, গৌড় ও

বংশপরিচয়
অনুমান
পিতৃভূমি

দ্রাবিড় দেশে বিজয়ী সমরাভিযানের দাবি করিয়াছেন। বস্তুত, এই বংশের রাজা প্রথম সোমেশ্বর কর্তৃক পরমাররাজ প্রথম ভোজ এবং কলচুরীরাজ কর্ণের পরাজয়ের পর হইতেই উত্তর-ভারতে কর্ণাটী প্রতাপ প্রবাহের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই সব বিচিত্র কর্ণাটী সমরপ্রবাহের সঙ্গেই কর্ণাটী সেন-বংশ বাংলায় আসিয়া থাকিবেন। বস্তুত, বাংলাদেশে যখন সামন্ত সেনপুত্র হেমন্তসেন এবং তৎপুত্র বিজয়সেন ধীরে ধীরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তখন মিথিলা ও নেপালে আর একটি কর্ণাটী সেনবংশও ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিতেছিল; এই বংশই নান্যদেবের বংশ। এই সময়ই কান্যকুব্জ-বারাণসীতে গাহড়বাল রাজবংশও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন; ইহারাও কর্ণাটাগত বলিয়া কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, এই প্রত্যেকটি রাজবংশই গোঁড়া পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার এবং সংস্কৃতি আশ্রয়ী।

সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে সামন্ত-চক্রের বিদ্রোহের এবং ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ লইয়া রাঢ়দেশ অঞ্চলে কিছু স্থানীয় সামন্তাধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না, তবে তাঁহার পুত্র পৌত্রদের লিপিতে তিনি মহারাজাধিরাজ আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন।

হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন (আ ১০৯৫-১১৫৮) শূর-পরিবারের কন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোলের পূর্বভারতে সমরাভিযানের সময় এক রণশূর দক্ষিণ-রাঢ়ের রাজা ছিলেন; আর এক শূর-নরপতি লক্ষ্মীশূরের খবর পাওয়া যায় রামচরিতে; তিনি অপর-মন্দারের (হুগলী জেলার পশ্চিমাঞ্চল) সামন্ত নৃপতি ছিলেন এবং ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রামপালকে সাহায্য করিয়াছিলেন। আর এক শূর-রাজ আদিশূর বাংলার লোকস্মৃতিতে আজও বাঁচিয়া আছেন; কুলজী-গ্রন্থের মতে আদিশূরের নাম বাংলার কৌলিন্যপ্রথার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শূর-পরিবারে এই বিবাহ রাঢ়দেশে বিজয়সেনের প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করিয়া থাকিবে। কিন্তু তিনি কি করিয়া রাঢ়দেশের অন্যান্য সামন্তদের জয় করিয়াছিলেন, কি করিয়া বর্মণদের পরাজিত করিয়া পূর্ব-বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং পাল-বংশের প্রভুত্ব হইতে উত্তর-বঙ্গ কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। দেওপাড়া-লিপিতে তাঁহার হস্তে গৌড়, কামরূপ এবং কলিঙ্গরাজ এবং বীর, নান্য, রাঘব এবং বর্দ্ধন নামে কয়েকজন সামন্ত-নরপতির পরাজয়ের দাবি করা হইয়াছে। বর্ধন রামচরিতোক্ত কৌশাম্বীর (বগুড়া বা রাজসাহী জেলার) নরপতি দ্বোরপবর্দ্ধন; বীর কোটাটবীর নরপতি বীরগুণ হওয়া অসম্ভব নয়। ইহারা দুইজনই ছিলেন বরেন্দ্রীযুদ্ধে রামপালের সহায়ক। রাঘব সম্ভবত কলিঙ্গ নরপতি অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গের (১১৫৬-১১৭০) দ্বিতীয় পুত্র। নান্য মিথিলার কর্ণাট-বংশীয় সেন-রাজ নান্যদেব বলিয়াই মনে হয়। আর, যে-গৌড়পতিকে বিজয়সেন পরাজয়ের দাবি করিয়াছেন, তিনি মদনপাল হওয়াই সম্ভব।

বিজয়সেন
আ ১০৯৫-১১৫৮

গৌড়-জয় অর্থ বরেন্দ্রী-জয়, কারণ গৌড়েশ্বর পাল-রাজাদের আধিপত্য মদনপালের সময়ে বাংলাদেশে বরেন্দ্রীর বাহিরে আর কোথাও ছিল না। বিজয়সেন প্রদ্যুম্নেশ্বরের একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন; রাজসাহী সহরের ৭।৮ মাইল পশ্চিমে পদুমসহর দীঘির পাড়ে এই মন্দিরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ এখনও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। লক্ষ্মণসেনের আগে গৌড়বিজয় বিজয়সেন বা তৎপুত্র বল্লালের ভাগ্যে সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ ইঁহাদের নিজেদের লিপিতে ইঁহারা গৌড়েশ্বর উপাধি দাবি করেন নাই। লক্ষ্মণসেনই সর্বপ্রথম এই উপাধি-অলঙ্কার ধারণ করিয়াছেন, এবং তাহাও তাঁহার রাজত্বের শেষদিকে। বিজয়সেন বর্মণবংশীয় রাজাদের হাত হইতে (পূর্ব)-বঙ্গও কাড়িয়া লইয়াছিলেন; রাজকীয় লিপিই তাহার অকাট্য সাক্ষ্য। বস্তুত, সেন-বংশের গোড়াকার দিকে সমস্ত লিপিরই উৎস "বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে"; এই বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারেই বিজয়সেন-মহিষী মহাযজ্ঞ তুলাপুরুষ মহাদান অনুষ্ঠান করেন। বিজয়সেনের কলিঙ্গ ও কামরূপ-জয়ের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ কঠিন; তাঁহার পৌত্র লক্ষ্মণসেনও এই দুই দেশে বিজয়ী সমরাভিযান প্রেরণের দাবি করিয়াছেন।

যাহাই হউক, সুদীর্ঘকাল রাজত্ব এবং রামপাল-পরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভগ্নদশার সুযোগ লইয়া পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ বিজয়সেনই বাংলায় সেনবংশের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পরস্পর ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও বিবদমান সামন্ত নরপতিদের অন্ধ রাষ্ট্রবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন ও ক্লিষ্ট বাংলাদেশ পরাক্রান্ত রাজবংশ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় শান্তি ও স্বস্তি লাভ করিল বটে; কিন্তু এ-কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই রাষ্ট্র ও রাজবংশ বাংলার ও বাঙালীর নয়। কবি উমাপতি-ধর কিংবা শ্রীহর্ষ বিজয়সেনের, কিংবা পরবর্তী সভাকবিরা সেন-রাজাদের স্তুতি ও চাটুবাদে যতই উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকুন না কেন—রাষ্ট্র বা রাজপ্রসাদপুষ্ট কবিরা তো তাহা হইয়াই থাকেন—সমসাময়িক বাঙালী জনসাধারণ এই রাজবংশকে আপনার জন বলিয়া মনে করিয়াছিল, এ-কথা মনে করা কঠিন। গোপাল বাঙালী ছিলেন, পাল-বংশের পিতৃভূমি বাংলাদেশ; সেই হিসাবে পাল-রাজারা যতটা বাঙালী জনসাধারণের হৃদয়ের নিকটবর্তী ছিলেন, সেন-রাজারা তাহা হইতে পারেন নাই। তারানাথের আমলে যে-ভাবে গোপাল-নির্বাচনের কাহিনী লোকস্মৃতিতে বিধৃত ছিল, ধর্মপালের যশ যে-ভাবে দোকানে চত্বরে জনসাধারণের কণ্ঠে গীত হইত, মহীপাল-যোগীপাল-ভোগীপালের গানের স্মৃতি যে-ভাবে বাঙালী জনসাধারণ আজও ধারণ করে, বহুদিন পর্যন্ত লোকে যে-ভাবে 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' গাহিত, বল্লালসেন ছাড়া সেন-রাজাদের কাহারও সে-সৌভাগ্য হয় নাই; এই তথ্যের ঐতিহাসিক ইঙ্গিত অবহেলার জিনিস নয়। সেন-রাজাদের মহিমা যাহা যতটুকু গীত হইয়াছে তাহা সভাকবিদের কণ্ঠে; যেটুকু তাঁহাদের স্মৃতি আজও জাগরূক, তাহা ব্রাহ্মণ্যস্মৃতিশাসিত সমাজের উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে মাত্র; এ-তথ্যও ঐতিহাসিকদের বিচারের বস্তু। গোপাল বা ধর্মপাল-দেবপাল-মহীপালের সঙ্গে বিজয়-বল্লাল-লক্ষ্মণের তুলনা নিরর্থক

সেনরাজবংশ-কথার সামাজিক অর্থ

এবং অনৈতিহাসিক। পালবংশকে বাঙালী ভালবাসিয়াছিল, এবং তাঁহাদের গৌরবকে নিজেদের জাতীয় গৌরব বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল—বাংলাদেশে তাহার প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বল্লাল ব্যতীত সেন-রাজাদের একজনের সম্বন্ধেও একথা বলা চলে কি না সন্দেহ। একটি লোকগীতিও সেন-রাজাদের কাহারও নামে রচিত হয় নাই; বাংলা সাহিত্যে লোকস্মৃতিতে সেন-রাজারা বাঁচিয়া নাই।

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন (আ ১১৫৮-১১৭৯) একবার গৌড় আক্রমণ ও জয় করিয়াছিলেন, বোধহয় গোবিন্দপালের আমলে। বল্লালের অদ্ভুতসাগর-গ্রন্থে এই গৌড়-বিজয়ের একটু ইঙ্গিত আছে। বল্লাল-চরিত গ্রন্থে তাঁহার মগধ ও মিথিলায় বিজয়ী সমরাভিযানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়; কিন্তু এই দুই শতক পরবর্তী গ্রন্থের সাক্ষ্য কতখানি প্রামাণিক বলা কঠিন। তবে, মিথিলা অধিকার একেবারে অমূলক না-ও হইতে পারে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে বল্লালের সময় বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্রী এবং মিথিলা সেনরাজ্যভুক্ত ছিল; আর একটি ছিল বাগড়ী (সুন্দরবন-মেদিনীপুর অঞ্চল)। বল্লাল কর্ণাট-চালুক্যরাজ দ্বিতীয় জগদেকমল্লের কন্যা রামদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অদ্ভুতসাগর-গ্রন্থ সমাপনের (আরম্ভ শকাব্দ ১০৯০) আগেই বল্লালসেন পুত্র লক্ষ্মণসেনের স্কন্ধে রাজ্যভার এবং গ্রন্থ-সমাপন ভার অর্পণ করিয়া সপত্নীক গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে (ত্রিবেণীতে?) নিরঞ্জরপুরে গমন করেন। ইহার অর্থ হয়তো তিনি সপত্নীক গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে নিরঞ্জরপুর নামক স্থানে বানপ্রস্থে গিয়াছিলেন, অথবা গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে দুইজনেই জলে ঝাঁপ দিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

বল্লালসেন
আ ১১৫৮-১১৭৯

লক্ষ্মণসেন যখন সেন-সিংহাসন আরোহণ করিলেন তখন তিনি প্রায় ষাট বৎসরের পরিণত প্রৌঢ়। পিতামহ বিজয়সেনের আমলেই গৌড়-কলিঙ্গ-কামরূপের রণক্ষেত্রে তিনি শৌর্য-বীর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়; তাঁহার রাজত্বকালে এই তিনটি দেশই যে সেন-রাজ্যভুক্ত হয়, এ-সম্বন্ধে নিঃসংশয় লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। তাঁহার পুত্রদের লিপিতে বলা হইয়াছে লক্ষ্মণসেন পুরী, বারাণসী ও প্রয়াগে বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন। পুরী-জয়ের ইঙ্গিত তো কলিঙ্গ-জয়ের মধ্যেই পাইতেছি। কাশী-জয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ লক্ষ্মণসেনের নিজের লিপিতেই আছে। পশ্চিমে তাঁহার রাজত্ব প্রয়াগ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। শেষ পাল-রাজ গোবিন্দপালের পর মগধাঞ্চল গাহড়বাল-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল; বিজয়সেন এই অঞ্চল সেন-রাজ্যভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে-চেষ্টা খুব সার্থক হয় নাই। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দেও বুদ্ধগয়া অঞ্চল গাহড়বালদের অধিকারে ছিল বলিয়া লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। কাশীও গাহড়বালদের অধীনেই ছিল, এবং যে-কাশীরাজকে লক্ষ্মণসেন পরাজয়ের দাবি করিয়াছেন তিনি নিশ্চয়ই গাহড়বাল-রাজ জয়চন্দ্র। লক্ষ্মণসেন প্রয়াগ পর্যন্ত দেশ গাহড়বালদের করচ্যুত করিয়াছিলেন কিনা বলা কঠিন; তবে, মুসলমান-বিজয় পর্যন্ত

লক্ষ্মণসেন
আ ১১৭৯-১২০৫

গয়া অঞ্চল যে লক্ষ্মণসেনের আধিপত্যের অন্তর্গত ছিল অশোকচল্লের দুইটি লিপিই তাহার প্রমাণ। বারাণসী-প্রয়াগেও হয়তো একবার তিনি বিজয়ী সমরাভিযান করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্মণসেনের মগধাধিকার এবং প্রয়াগ পর্যন্ত সমরাভিযান গাহড়বালশক্তিকে দুর্বল করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই রাজ্যই ছিল ক্রমাগ্রসরমান মুসলমানদের বিরুদ্ধে শেষ প্রতিরোধ-প্রাচীর ; সেই প্রাচীরকে দুর্বল করিয়া লক্ষ্মণসেন রাষ্ট্র ও সমরবুদ্ধির কতটুকু পরিচয় দিয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের প্রশ্ন অনিবার্য। এ-তথ্য সুবিদিত যে, মুহম্মদ বক্তিয়ার খিল্‌জি প্রায় বিনা বাধায় সমস্ত বিহার ও বাংলা জয় করিয়াছিলেন ; গাহড়বাল রাজশক্তির প্রতিরোধ-প্রাচীর ভাঙিয়া পড়ার পর আর কোনো বাধাই তাঁহার সম্মুখে উত্তোলিত হয় নাই। যে অস্ত্র ও সৈন্যবল কামরূপ-কাশী-কলিঙ্গ জয় করিয়াছিল সেই অস্ত্র ও সৈন্যবল কোথায় আত্মগোপন করিয়াছিল ?

যাহা হউক, লক্ষণসেন যে-রাজ্য ও রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেই রাজ্য ও রাষ্ট্র ভিতর হইতে আপনি দুর্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িতে আরম্ভ হইল। স্থানীয় আত্ম-কর্তৃত্বের যে-ব্যাধি পাল-রাষ্ট্রকে ভিতর হইতে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল, সেন-রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই ব্যাধিরই এক রাষ্ট্রীয় রূপ সামন্ততন্ত্র।

সুন্দরবন অঞ্চলে (পূর্ব-খাটিকা) এক পরমমহেশ্বর মহামাণ্ডলিকের পুত্র মহারাজাধিরাজ

শ্রীডোম্মনপাল

শ্রীডোম্মনপাল প্রধান হইয়া উঠিয়া স্বাধীন রাজ্যখণ্ড প্রতিষ্ঠা করিলেন (১১৯৬)।

এই সময়ই বোধ হয় অথবা অব্যবহিত পরই ত্রিপুরা অঞ্চলে পট্টিকেরা-রাজ্য আবার কতকটা প্রাধান্য লাভ করে, এবং রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব নামে এক নরপতি সেখানে স্বাতন্ত্র্য

রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব

ঘোষণা করেন (১২০৪-১২২০)। বর্তমান কুমিল্লা সহরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে ময়নামতী পাহাড় অঞ্চলেই ছিল বোধ হয় তাঁহার রাজধানী। প্রাচীন পট্টিকেরা, ব্রহ্মদেশীয় ইতিকথার পটিকর-পটেইকর, আদি ব্রিটিশযুগের পাটিকেরা-পাইটকেরা পরগণা এবং বর্তমান পাইটকারা-পাটিকেরা এক এবং অভিন্ন।

মেঘনার পূর্বতীরে আর একটি নূতন স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজবংশও এই সময়ই গড়িয়া উঠিল। এই বংশ দেববংশ নামে (দেবান্বয়গ্রামণী) ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

দেববংশ

দ্বাদশ শতকের শেষে বা ত্রয়োদশ শতকের গোড়াতেই পুরুষোত্তমদেবের পুত্র মধুমথন বা মধুসূদনদেব প্রথম স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া রাজা আখ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র বাসুদেব ; বাসুদেবের পুত্র দামোদরদেবই এই বংশের পরাক্রান্ত নরপতি (১২৩১-১২৪৩)। "অরিরাজ চানূর-মাধব-সকল-ভূপতিচক্রবর্তী" দামোদর বর্তমান ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রামে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধে লিপি-প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে এই বংশের আর এক রাজা দশরথদেব

তাঁহার রাজ্য আরও বিস্তৃত করিয়াছিলেন, এবং বিক্রমপুরে রাষ্ট্রকেন্দ্র গড়িয়া ঢাকা অঞ্চলও রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে-কথা পরে বলিতেছি।

গুপ্তবংশ

বাংলার বাহিরে, গুপ্ত-উপান্তনামা এক গুপ্ত-বংশ মুঙ্গের অঞ্চলে সেনবংশের মহামাণ্ডলিক সামন্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহাদের রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল মুঙ্গের জেলার লখীসরাইর নিকট জয়নগর (প্রাচীন জয়পুর) নামক স্থানে। এই বংশের রাজা "পরমমাহেশ্বর বৃষভধ্বজ...পরমেশ্বর" কৃষ্ণগুপ্ত ও তাঁহার পুত্র সংগ্রামগুপ্ত স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছিলেন লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালেই।

অনৈক্য ও বৈষম্যমূলক স্থানীয় আত্মকর্তৃত্ব ব্যাধির এই সব দুর্লক্ষণ যখন ধীরে ধীরে রাষ্ট্রকে ভিতর হইতে দুর্বল করিতেছিল, তখন অন্যদিকে পশ্চিম হইতে ক্রমাগ্রসরমান মুসলমান রাজশক্তি পূর্বদিকে লুব্ধ বাহু বাড়াইয়া দিতেছিল। কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দীন্‌ তখন দিল্লীর তক্তে আসীন। উত্তর-ভারতের হিন্দুরাষ্ট্রশক্তি তখন একে একে সকলেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; রাষ্ট্রীয় শান্তি ও শৃঙ্খলা বলিতে বিশেষ কিছু নাই। স্থানীয় রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হিন্দু ও তুরুষ্ক সামন্তদের করকবলে, কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রান্ত শত্রুকে ঠেকাইয়া রাখিবার শক্তি কাহারও নাই। এই ধরনের বিশৃঙ্খল রাষ্ট্রীয় অবস্থায় মুসলমান অভিযাত্রীর রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রতাপকে আশ্রয় করিয়া সেনাপতিদের সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি খুঁজিয়া বেড়াইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়।

এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাগ্যান্বেষীদের মধ্যে তুর্ক জাতীয় যুদ্ধব্যবসায়ী মুহম্মদ বখ্‌ত্‌-ইয়ার খিল্‌জী অন্যতম। দিল্লীর তক্ত তাঁহাকে বিহার ও বাংলাদেশ জয় করিবার জন্য আদেশ করে নাই; বখ্‌ত্‌-ইয়ার স্বেচ্ছায় তাঁহার সৈন্যদল লইয়া বিহারে-বাংলায় ভাগ্যান্বেষণে অগ্রসর হইলেন। বখ্‌ত্‌-ইয়ার কর্তৃক বিহার-বাংলা জয়ের কাহিনী লক্ষ্মণসেনের পক্ষ হইতে কেহ লিখিয়া রাখে নাই। সভাকবি শরণ অবশ্য লক্ষ্মণসেন কর্তৃক একবার এক ম্লেচ্ছরাজের পরাজয়ের কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন; হইতে পারে এই ম্লেচ্ছরাজ বখ্‌ত্‌-ইয়ার। অথবা এমনও হইতে পারে, বখ্‌ত্‌-ইয়ারের বঙ্গবিজয়ের পর লক্ষ্মণসেন যখন বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন তখন লখ্‌নৌতি বা লক্ষ্মণাবতীর কোনো সুলতানের সঙ্গে সেন-রাজের সংঘর্ষ হইয়া থাকিতে পারে; কবি শরণ সেন-রাজ কর্তৃক সেই যুদ্ধজয়েরই ইঙ্গিত করিয়া থাকিবেন। শরণ-রচিত শ্লোকটি উদ্ধার করিতেছি। এই শ্লোকে ম্লেচ্ছবিনাশ ছাড়া লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য দেশ জয়ের ইঙ্গিতও আছে।

বখ্‌ত্‌-ইয়ারের বঙ্গ-বিহার জয় ১২০১ খ্রীষ্টাব্দ

> ক্রুকেণাদ্ গৌড়লক্ষ্মীং জয়তি বিজয়তে কেলিমাত্রাৎ কলিঙ্গান্
> চেতশ্চেদিক্ষিতীশোত্তপতি বিতপতে পূর্ববদ্ দুর্জনেষু।
> ম্লেচ্ছান্ম্লেচ্ছান্ বিনাশং নয়তি বিনয়তে কামরূপাভিমানং
> কাশীভতুঃ প্রকাশং হরতি বিহরতে বুদ্ধি'বো মাগধস্ত।

লক্ষ্মণসেন কর্তৃক গৌড়, কলিঙ্গ, চেদি, কামরূপ, কাশী ও মগধে যুদ্ধজয়ের কথা লক্ষ্মণসেনের লিপি-সাক্ষ্যে এবং অন্যতম সভাকবি উমাপতি-ধরের বিচ্ছিন্ন দুইটি শ্লোকেও পাওয়া যায়; কাজেই তাঁহার ম্লেচ্ছ-বিনাশের কথা অস্বীকার করার কোনো কারণ নাই। ইঁহারা—শরণ বা উমাপতি-ধর—লক্ষ্মণসেনের নাম করিতেছেন না সত্য, তবে যেহেতু তাঁহারা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন এবং যে-সব বিজয়কীর্তির উল্লেখ তাঁহারা করিতেছেন সেগুলি লক্ষ্মণসেনের সঙ্গেই যুক্ত সেই হেতু এ-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের কোনো অবসর নাই। কিন্তু, উমাপতি-ধর যে-শ্লোকে লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে ম্লেচ্ছ সংঘর্ষের ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেই শ্লোকেই তিনি ম্লেচ্ছ রাজার সাধুবাদও করিয়াছেন এবং তাহা প্রায় হাস্যকর স্তুতিবাক্যে!

> সাধু ম্লেচ্ছ নরেন্দ্র সাধু ভবতো মাতৈব বীরপ্রসূঃ
> নীচেনাপি ভবদ্বিধেন বসুধা সুক্ষত্রিয়া বর্ততে।
> দেবে কুপ্যতি যস্য বৈরিপরিষন্নারায়ণে পুরঃ
> শস্ত্রং শস্ত্রমিতি স্ফুরন্তি রসনাপত্রান্তরালে গিরঃ॥
>
> ম্লেচ্ছরাজ! সাধু, সাধু! আপনার মাতাই (যথার্থ) বীরপ্রসবিনী;
> নীচ (বংশোদ্ভব) হইলেও আপনার মত লোকের জন্যই বসুধা এখনও
> সুক্ষত্রিয় আছে; (যেহেতু) নারায়ণসদৃশ দেব (লক্ষ্মণসেন) যখন সম্মুখ
> (যুদ্ধে) শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিতেছিলেন তখন আপনার রসনারূপ
> পত্রান্তরাল হইতে শস্ত্র, শস্ত্র, এই বাক্য নির্গত হইতেছিল।

পর পর তিনটি রাজার রাজসভাকবি, বৃদ্ধ না হউন অন্তত প্রৌঢ় উমাপতি-ধর কি বখ্‌ত্‌-ইয়ার কর্তৃক নবদ্বীপজয়ের পর সেন-রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া নিজের ভক্তি ও স্তুতি অর্পণ করিবার পাত্র পরিবর্তন করিয়াছিলেন, এবং ম্লেচ্ছরাজকেই সেই পাত্র বলিয়া নির্বাচন করিয়াছিলেন! সভাকবি সভাকবিই থাকিয়া গিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেন-রাষ্ট্র, সেন-রাজসভা, সেই সভার অলঙ্কার কবি ও পণ্ডিত, এবং সমসাময়িক কাল ও সমাজের উপর ইহা যে কত বড় কটাক্ষ, উমাপতি-ধর কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন?

যাহাই হউক, লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে ম্লেচ্ছদের (তুরুস্কদের) একটা সংঘর্ষ হইয়াছিল, এবং সে-সংঘর্ষে সেন-রাজ জয়ী হইয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; তবে তাহা নবদ্বীপ জয়ের আগে না পরে, ঐতিহাসিক গবেষণার বর্তমান অবস্থায় তাহা বলা কঠিন। আমার মনে হয়, নবদ্বীপ জয়ের অব্যবহিত পরে।

নবদ্বীপ-জয় সম্বন্ধে মুসলমান অভিযাত্রীদের পক্ষে এ-বিষয়ে বিস্তৃত সাক্ষ্য উপস্থিত, এবং এই সাক্ষ্য দিতেছেন ঘটনার প্রায় ৫০ পঞ্চাশ বৎসর পর দিল্লীর ভূতপূর্ব প্রধান কাজী মৌলানা মিন্‌হাজ-উদ্‌-দীন। তিনি লখ্‌নৌতিতে দুই বৎসর কাটাইয়াছিলেন এবং সেখানে দুইটি বৃদ্ধ সুপ্রাচীন সৈন্যের মুখে বখ্‌ত্‌-ইয়ারের বিহার-বিজয় কাহিনী এবং অন্যান্য "বিশ্বস্ত" লোকের মুখে বঙ্গ-বিজয় কাহিনী শুনিয়াছিলেন। তিনি এই দুই দেশ বিজয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম জানা প্রয়োজন। বখ্‌ত্‌-ইয়ারের

আক্রমণের সময় সেনরাজ লক্ষ্মণসেন (রায় লখ্‌মনিয়া) নুদীয়া (নদীয়া—নবদ্বীপ) রাজধানীতে বাস করিতেছিলেন।

বর্তমান চুনারের ১১ মাইল পূর্বে ভুইলি গ্রাম; এই গ্রামই ছিল বখ্‌ত্‌-ইয়ারের জায়গীরের কেন্দ্রভূমি। গাহড়বার-সামন্তরাজদের পরাভূত করিয়া বখ্‌ত্‌-ইয়ার মূনের ও বিহার অঞ্চলের নানা জায়গায় লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং তাহারই লোভে প্রচুর খিল্‌জি ও তুর্কী দস্যুব্রতী তাঁহার সামন্তদণ্ডের চারদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। উত্তর-বিহারে মিথিলাকে আশ্রয় করিয়া তখন হিন্দু কর্ণাটক রাজবংশের আধিপত্য; কনৌজের সিংহাসনে তখনও জয়চন্দ্রপুত্র হরিশ্চন্দ্র আসীন; রোহ্‌তস্‌ অঞ্চলের হিন্দু মহানায়কেরা তখনও নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছেন; বিহারে শোননদীর তীরবর্তী অঞ্চলে নবনেরাপত্তনের সামন্তদের আধিপত্য বিদ্যমান। এই সব হিন্দুরাজশক্তিকে উৎখাত করা বা দেশব্যাপী বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা বখ্‌ত্‌-ইয়ারের উদ্দেশ্য ছিল না। কাজেই রাজশক্তি যেখানে শিথিল বা প্রায় অনুপস্থিত, সেই সব স্থান লুণ্ঠন ও অধিকার করাই হইল তাঁহার উদ্দেশ্য। বৎসর দুই এই ভাবে কাটাইবার পর বখ্‌ত্‌-ইয়ার হঠাৎ একদিন হিসার-ই-বিহার বা বিহার-দুর্গ আক্রমণ এবং অধিকার করিয়া বসিলেন এবং তাহার অধিবাসীদের প্রায় সকলকেই হত্যা করিলেন, প্রচুর ধনরত্ন লুটিয়া লইলেন এবং প্রচুর গ্রন্থ পোড়াইলেন (১১৯৯)। বস্তুত, যে দুর্গ-নগরটি তিনি অধিকার করিলেন তাহা দুর্গই নয়, এক বিরাট বৌদ্ধ-বিহার, এবং এই বিহারই প্রখ্যাত ঔদণ্ড বা ওদণ্ডপুর বিহার; যে-অধিবাসীদের তিনি হত্যা করিলেন তাঁহারা সকলেই মুণ্ডিতশির বৌদ্ধ ভিক্ষু। এই বিহার হইতেই বর্তমান বিহার জনপদের নামকরণ। এই জনপদে এক সময় বৌদ্ধবিহারও ছিল অনেকগুলি।

ওদণ্ডপুর-বিহার ধ্বংসের প্রায় এক বৎসর পর দ্বিতীয়বার বখ্‌ত্‌-ইয়ার বিহারে সমরাভিযানে আসেন এবং নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন (১২০০ খ্রী)। প্রসিদ্ধ কাশ্মীরী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও আচার্য শাক্যশ্রীভদ্র এই সময় মগধে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন; তিনি দেখিয়াছিলেন ওদণ্ডপুরী ও বিক্রমশীলা বিহার তখন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; তিনি নিজেও তুর্কীদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন জগদ্দলবিহারে।

যাহাই হউক, ইতিমধ্যে বিহার-ধ্বংস ও মগধাধিকারের সংবাদ নদীয়ায় রায় লখ্‌মনিয়ার এবং তাহার কর্মচারীদের কর্ণগোচর হয়। রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, মন্ত্রীবর্গ এবং জ্যোতিষীরা তখন লক্ষ্মণসেনকে পরামর্শ দিলেন, তুর্কী অভিযাত্রীকে বাধা দিয়া কাজ নাই, দেশ পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত, কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে এই দেশ তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবে! খোঁজ লইয়া জানা গেল, তুর্কী অভিযাত্রীটির চেহারা একেবারে শাস্ত্রের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে! রায় লখ্‌মনিয়া মন্ত্রী ও জ্যোতিষীবর্গের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না; অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও বণিকেরা পূর্ববঙ্গে, আসামে ও অন্যান্য স্থানে

পলাইয়া গেলেন; রায় লখ্‌মনিয়া পলাইলেন না। ইহার (মগধ-জয়ের) পর বৎসরই (১২০১) বখ্‌ত্‌-ইয়ার একদল সৈন্য গঠন করিয়া বিহার-সরিফ হইতে গয়া ও ঝাড়খণ্ড জনপদের ভিতর দিয়া নদীয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য রহিল পশ্চাতে। একদিন বেলা দ্বিপ্রহরে তিনি নিজে আঠার জন অশ্বারোহী সৈন্যমাত্র লইয়া ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিয়া একেবারে রাজপ্রাসাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন; অশ্ব-বিক্রেতা মনে করিয়া কোথাও কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না। প্রাসাদের ভিতরে ঢুকিয়াই বখ্‌ত্‌-ইয়ার ও তাঁহার সঙ্গীরা তরবারী উন্মুক্ত করিয়া লোকের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দ্বিপ্রহর, রায় লখমনিয়া ভোজনে বসিয়াছেন; এমন সময় প্রাসাদের দরজা এবং নগরের মধ্যস্থল হইতে তুমুল আর্তনাদ ও কোলাহল উত্থিত হইল। ততক্ষণ বখ্‌ত্‌-ইয়ারের বাকী সৈন্যদলের একটি বৃহৎ অংশ নগরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং বোধ হয় নগর অবরুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। ব্যাপার যে কি তাহা রায় লখ্‌মনিয়া বুঝিবার আগেই বখ্‌ত্‌-ইয়ার রাজপ্রাসাদে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন; অনেক লোক তাঁহার তরবারীর আঘাতে প্রাণও দিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া রায় লখ্‌মনিয়া প্রাসাদের পশ্চাত্‌দ্বার দিয়া নগ্নপদে সংকনাট এবং বংগ্‌ অভিমুখে পলাইয়া গেলেন। সমস্ত সৈন্যদল আসিয়া যখন নদীয়া এবং তাহার পার্শ্ববর্তী সমস্ত স্থান অধিকার করিল, বখ্‌ত্‌-ইয়ার তখন সেইখানে (প্রাসাদে?) শিবির স্থাপন করিলেন। রায় লখ্‌মনিয়া (পূর্ব)-বঙ্গে আরও কিছুকাল রাজত্ব করিবার পর লোকান্তর গমন করেন। মিনহাজের তবকাত্‌-ই-নাসিরী রচনার কালেও (১২৬০'র পরও) রায় লখ্‌মনিয়ার বংশধরেরা (পূর্ব)-বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। রায় লখ্‌মনিয়ার প্রাসাদ ও নগর অধিকারের পর বখ্‌ত্‌-ইয়ার কয়েকদিন ধরিয়া নদীয়া বিধ্বস্ত করিয়া গৌড়-লখনৌতিতে গিয়া নিজ শাসনকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। ইহার পর তিনি মহোবায় গিয়া কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কয়েক বৎসর পর (১২০৬) তিনি তিব্বত-জয়ের জন্য দশহাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া এক সমরাভিযানে গিয়াছিলেন; মিন্‌হাজ এই অভিযানের বিবরণও রাখিয়া গিয়াছেন। বখ্‌ত্‌-ইয়ার তিব্বত পর্যন্ত অগ্রসরই হইতে পারেন নাই; মধ্যপথেই নানাভাবে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। মিন্‌হাজ কথিত তিব্বতাভিযানের একটু পরোক্ষ সমর্থন বোধ হয় পাওয়া যায় কামরূপের একটি লিপিতে। লিপিটি গৌহাটির নিকটে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে কানাইবরশীবোয়া নামক স্থানে একটি পাষাণগাত্রে খোদিত; ইহার পাঠ এইরূপ: "শাকে ১১২৭ [২৭ মার্চ, ১২০৬ আনুমানিক] শাকে তুরগযুগ্মেশে মধুমাস ত্রয়োদশে। কামরূপং সমাগত্য তুরুষ্কাঃ ক্ষয়মাযযুঃ॥" এমনও হইতে পারে তুরুষ্কগণ কর্তৃক তিব্বত ও কামরূপাভিযান দুই পৃথক অভিযান।

ইহাই বখ্‌ত্‌-ইয়ারের অষ্টাদশ অশ্বারোহী সৈন্য কর্তৃক বিহার, গৌড় ও বরেন্দ্রী বিজয়ের প্রায় ঔপন্যাসিক কাহিনী। প্রথমত, মিন্‌হাজ পঞ্চাশ বৎসর পর যাঁহাদের মুখ

হইতে শুনিয়া এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের স্মৃতিশক্তি এবং বিশ্বস্ততা কতটুকু নির্ভরযোগ্য বলা কঠিন। দ্বিতীয়ত, বিহার-নগর ধ্বংস করিবার পর, দিল্লী হইতে বখ্‌ত্‌-ইয়ারের ঘুরিয়া আসিয়া সেই দেশ অধিকারের ভিতর লক্ষ্মণসেন সময় যথেষ্ট পাইয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে কি লক্ষ্মণসেন নিজ রাজ্য রক্ষার কোনও ব্যবস্থাই করেন নাই? মগধ-জয়ের পরও এক বৎসর না হউক, অন্তত কিছু সময় তো সেন-রাষ্ট্র নিশ্চয়ই পাইয়াছিল; সেই সময়ের মধ্যেও কি লক্ষ্মণসেন শত্রু-প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থাই করেন নাই? যে অস্ত্র ও সৈন্যবল, যে শৌর্য-বীর্য কাশী-কলিঙ্গ-কামরূপ জয় করিয়াছিল তাহারা কোথায় আত্মগোপন করিয়াছিল? মগধরাজ্যের পশ্চিম সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া নদীয়া পর্যন্ত কোথাও কি লক্ষ্মণসেন নিজের রাজ্য ও রাষ্ট্ররক্ষার জন্য কোনো প্রতিরোধ দান করেন নাই? নদীয়ার রাজপ্রাসাদ রক্ষারও কি কোনো ব্যবস্থাই ছিল না? এ-সব অতৃপ্ত সহজ ও স্বাভাবিক প্রশ্নের কোনও উত্তরই মিন্‌হাজের বিবরণীতে নাই। তৃতীয়ত, মিন্‌হাজ অলৌকিক গালগল্পেও আস্থা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; লক্ষ্মণসেনের জন্মকাহিনীই তাহার প্রমাণ। বিহার-বঙ্গবিজয় কাহিনীতেও এই ধরনের প্রচলিত গালগল্প কিছু ঢুকিয়া পড়ে নাই, এ-কথাই বা কি করিয়া বলা যাইবে?

মিন্‌হাজ-বিবরণের সামাজিক পটভূমি

মিন্‌হাজ-বিবরণ রচনার এক শতকের মধ্যে ইসমী নামে এক ঐতিহাসিক ফুতুহ্‌-উস্‌-সালাতিন্ নামক গ্রন্থে নদীয়া-অধিকারের আর একটি বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। মিন্‌হাজ ও ইসমীর বিবরণ দুইটির বঙ্গানুবাদ পাশাপাশি উদ্ধার করা যাইতে পারে।

> মিন্‌হাজ বলিতেছেন, "ইহার পর (মগধ অধিকারের) দ্বিতীয় বৎসরে বখ্‌ত্‌-ইয়ার তাঁহার সৈন্যগঠন করিয়া বিহার (বিহার-সরিফ) হইতে যাত্রা করিলেন; এবং সহসা নদীয়ায় প্রবেশ করিলেন, এত সহসা এবং দ্রুত যে, তাঁহার অশ্বারোহীদের ভিতর ১৮ জন ছাড়া আর কেহ তাঁহার সঙ্গে তাল রাখিতে পারিল না; বাকী সকলে পিছন পিছন অগ্রসর হইতে লাগিল। নগরের দ্বারে পৌঁছিয়া তিনি কাহারও উপর কোনো অত্যাচার করিলেন না বরং নীরবে এবং বিনীতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কেহই সন্দেহও করিতে পারিল না যে ইনিই বখ্‌ত্‌-ইয়ার; বরং সকলেই ভাবিল, এই আগন্তুকেরা বোধহয় ব্যবসায়ী এবং মহার্ঘ অশ্ববিক্রয় উদ্দেশ্যেই ইহাদের আগমন। বখ্‌ত্‌-ইয়ার রাজপ্রাসাদের দ্বারে আসিয়াই কোষ হইতে তরবারী উন্মুক্ত করিলেন, এবং বিধর্মীদের হত্যা সুরু করিয়া দিলেন। তখন দ্বিপ্রহর; রায় লখ্‌মনিয়া ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় সহসা রাজপ্রাসাদের দ্বার হইতে এবং নগরের কেন্দ্রস্থল হইতে তুমুল আর্তনাদ উত্থিত হইল। (লক্ষ্মণসেন) ব্যাপার কি বুঝিবার আগেই বখ্‌ত্‌-ইয়ার প্রাসাদের ভিতর এবং অন্তঃপুরে ঢুকিয়া পড়িলেন, এবং নরহত্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন। রায় তখন নগ্নপদে প্রাসাদের পশ্চাত্‌দ্বার দিয়া পলাইয়া গেলেন।...

ইসমীও বলিতেছেন, বখ্‌ত্‌-ইয়ার অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশেই নদীয়ায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি লক্ষ্মণসেনকে সংবাদ পাঠাইলেন, প্রাসাদের বাহিরে আসিয়া তাঁহাদের আনীত তাতার-অশ্ব, চীনা বস্ত্রসম্ভার এবং অন্যান্য মূল্যবান্

দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিবার জন্য। রায় যখন কারখানে (অশ্বদের বিশ্রামস্থল) আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বখ্‌ত্‌-ইয়ার তাঁহাকে বহুমূল্য এক উপঢৌকন দান করিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অনুচরদের ইঙ্গিত করিলেন হিন্দুদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে। তুর্কী সৈন্তেরা তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল; হিন্দু রক্ষী সৈন্তেরা অতর্কিত আক্রমণ ঠেকাইতে না পারিয়া পরাভূত হইল, কিন্তু তাঁহাদের একদল রায় লখ্‌মনিয়াকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া স্থির বিক্রমে আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিল এবং তুর্কী সৈন্তদের মনে ত্রাস সঞ্চার করিল···। অবশেষে যখন দুর্দ্ধর্ষ খিল্‌জি অশ্বারোহীরা ঝড়ের মতন ছুটিয়া আসিয়া কয়েকজন হিন্দু-সওয়ারকে হত্যা করিল, তখন রায় লখ্‌মনিয়া বখ্‌ত্‌-ইয়ারের হাতে বন্দী হইলেন।

উপরোক্ত দুই বিবরণেই এবং সমসাময়িক ইতিহাসে কয়েকটি তথ্য পরিষ্কার। প্রথমত, আক্রমণটা ঘটিয়াছিল বেলা দ্বিপ্রহরে যখন প্রাতঃসভা শেষ করিয়া সভাসদ্‌, কর্মচারী ও রক্ষী সৈন্তেরা সকলেই যে যাঁহার ঘরে ফিরিয়া গিয়া স্নানাহার ও বিশ্রামে রত। দ্বিতীয়ত, ১৯ জন অশ্বারোহী তুর্কী সেনাকে কেহই আক্রমণকারী বলিয়া মনে করে নাই, অশ্ব-বিক্রেতা মনে করিয়াই রক্ষীরা তাঁহাদের কেহ বাধা দেয় নাই। তৃতীয়ত, সহসা অতর্কিত অবিশ্বস্ত আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য কেহ প্রস্তুতও ছিল না। চতুর্থত, প্রথম ১৯ জনের (বখ্‌ত্‌-ইয়ার ও ১৮ জন তুর্কী অশ্বারোহী) পক্ষেই প্রাসাদ ও নগরাধিকার সম্ভব হইত না, যদি না পশ্চাতের বৃহত্তর তুর্কী ও খিল্‌জি অশ্বারোহী সেনাদল ততক্ষণে নগরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া চারিধারে আক্রমণ ও লুণ্ঠন সুরু করিয়া দিত। পঞ্চমত, নবদ্বীপ সেন-রাজাদের রাজধানী ছিল না, ছিল গঙ্গাতীরবর্তী একটি তীর্থস্থান এবং সেখানে একেবারে গঙ্গার কূল ঘেঁষিয়া ছিল রাজার প্রাসাদ। এই প্রাসাদ সুদৃঢ় অট্টালিকা নয়, তদানীন্তন বাংলার রুচি ও অভ্যাসানুযায়ী কাঠ ও বাঁশের তৈরী সমৃদ্ধ বাংলা-বাড়ি। নবদ্বীপ দুর্গও নয়, একটি তীর্থ-নগর মাত্র এবং নগর-প্রাচীর বা দ্বার বলিতে বাঁশ ও কাঠের তৈরী বেড়া ও দরজা ছাড়া আর কিছু নয়। মুঘল-প্রাসাদ বা দুর্গ-নগর বলিতে যাহা বুঝায় নবদ্বীপে তাহার কিছুই ছিল না, এ-তথ্য অনুমানে কিছুমাত্র বাধা নাই। ষষ্ঠত, বিদেশি অশ্ববিক্রেতার আসা-যাওয়া নগরে নিশ্চয়ই ছিল; সুতরাং অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে ১৯ জন অশ্বারোহীর আগমন কাহারও মনে কোনো সন্দেহের উদ্রেক করে নাই। সপ্তমত, প্রাচ্য ইতিহাসে স্বল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সেনা কর্তৃক অতর্কিত আক্রমণে কোনো নগরাধিকার একেবারে অজ্ঞাত নয় এবং নিছক কল্পনার সৃষ্টিও নয়।

এ-সব অবস্থার প্রেক্ষাপটে বখ্‌ত্‌-ইয়ারের নবদ্বীপাধিকার কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না, কিংবা তাহাতে তদানীন্তন বাঙালীর ভীরুতাও কিছু প্রমাণিত হয় না। আলোচিত সাক্ষ্যে স্পষ্টই বুঝা যায়, নবদ্বীপে শত্রু-আক্রমণের কোনো প্রতিরোধ-ব্যবস্থাই ছিল না। রাজমহলের নিকটে, বোধ হয় তেলিয়াগড়ে, কোথাও ছিল দক্ষিণ-বিহার হইতে বাংলায় প্রবেশের পথ; সেখানে প্রতিরোধের কী ব্যবস্থা ছিল বা না ছিল, জানিবার উপায়

নাই। থাকিলেও বখ্ত্-ইয়ারের পক্ষে যে তাহা যথেষ্ট বাধা রচনা করিতে পারে নাই তাহা তো পরিষ্কার! আর ঝাড়খণ্ডের দুর্ভেদ্য জঙ্গল ও দুর্গমপথ অতিক্রম করিয়া কোনো দুঃসাহসী শত্রুসৈন্য যে বীরভূমের পথে বাংলায় আসিয়া প্রবেশ করিবে, সেন-রাজ ও রাষ্ট্র বোধ হয় তেমন আশঙ্কাও করেন নাই।

যাহা হউক, মোটামুটিভাবে মিন্হাজ ও ইসমীর বিবরণের সত্যতা অস্বীকার করা চলে না। বখ্ত্-ইয়ার তথা বিদেশি শক্তির কাছে নবদ্বীপ তথা সেনরাষ্ট্র ও বাঙালীর পরাজয়ের কারণ আরও গভীর, আরও অর্থবহ, এবং তাহা সমগ্র উত্তর-ভারতের সমসাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। ইস্লামধর্মী আরব, তুর্কী, খিল্জি প্রভৃতি বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে উত্তর-ভারত তো কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সমানেই যুঝিতেছিল, সাহস ও বীর্যের পরিচয়, দেশাত্মবোধের পরিচয়ও কম দেয় নাই; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিল তিল করিয়া এইসব বৈদেশিক আক্রমণকারীদের প্রভুত্বও স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছিল—নানা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে, সামরিক শক্তির অভাবে নয়। ভারতীয় পদাতিক, হস্তীসৈন্য ও স্বল্পসংখ্যক মাত্র অশ্বসৈন্যনির্ভর সামরিক শক্তি অপেক্ষা আরব-খিল্জি-তুর্কীদের দ্রুত ও সুকৌশলী ঘোড়সওয়ারী সেনাদল অধিক কার্যকরী ছিল, সন্দেহ নাই। তবু, এই সব কারণ ছাড়া, সমসাময়িক বাংলাদেশে যে মনোবৃত্তি এই বৈদেশিক পরাভবের হেতু তাহাও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। উত্তর-ভারত তো একটু একটু করিয়া ইতিপূর্বেই দিল্লীর তক্তের অধীন হইয়া গিয়াছিল; সাহ্ব্-উদ্-দীন ঘোরী কর্তৃক গাহড়বালরাজ জয়চন্দ্রের পরাজয়ের (১১৯৪) পর পূর্বদিকের একমাত্র পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্য ও রাষ্ট্র ছিল লক্ষ্মণসেনের। এই রাজ্যেরই কিয়দংশ যখন অধিকৃত হইয়া গেল, বিহার ধ্বংস হইল, অর্থ লুণ্ঠিত হইল, প্রাণ বিসর্জিত হইল তখন জনসাধারণের আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়া কিছু বিচিত্র নয়। এই আতঙ্কেই দেশের লোক (পূর্ব)-বঙ্গে, কামরূপে পলাইয়া গিয়াছিল, এমন কি নবদ্বীপও প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, মিন্হাজের এই ইঙ্গিত মিথ্যা না-ও হইতে পারে। সাধারণ যুক্তিতে এইরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক, বিশেষত ব্রাহ্মণ ও বণিকদের পক্ষে। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও অনেক ব্রাহ্মণের দল যে এই সময় নানাদিকে পলাইয়া গিয়াছিলেন, এ-সাক্ষ্য তো বৌদ্ধ লামা তারনাথও রাখিয়া গিয়াছেন। জনসাধারণের প্রতিরোধের মনোবৃত্তি যে ছিল না, এবং গড়িয়া তুলিতে চেষ্টাও কেহ করে নাই, এ-তথ্য একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রীবর্গ যে লক্ষ্মণসেনকে যুদ্ধ না করিয়া দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, রাষ্ট্রেরও প্রতিরোধ-ইচ্ছা বিশেষ ছিল না, ভাগ্যনির্ভর পরাজয়ী মনোবৃত্তি রাষ্ট্রকেও গ্রাস করিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীদের জ্যোতিষ-গণনা ও শাস্ত্রের দোহাইয়ের যে-ইঙ্গিত মিন্হাজ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও অস্বীকার করিবার কারণ দেখিতেছি না। লক্ষ্মণসেনের জন্মকাহিনী অলৌকিক, অবিশ্বাস্য, এমন কি হাস্যকর, সন্দেহ নাই; কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও জ্যোতিষে সমসাময়িক জনসাধারণের

অত্যধিক বিশ্বাসই সূচিত করে। নিঃসন্দিগ্ধ ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা এই তথ্য সমর্থিত। এই যুগের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের—ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ প্রভৃতি সকলেরই পাণ্ডিত্যখ্যাতি স্মৃতি ও জ্যোতিষনির্ভর। আর, যে-সব সুবিস্তৃত ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকাণ্ডের উল্লেখ, বিভিন্ন তিথি-নক্ষত্রে স্নান, পূজা, উপবাস, হোম, যাগযজ্ঞ ইত্যাদির দর্শন সেন-আমলের লিপিগুলিতে পাওয়া যায়, তাহা তো সমস্তই জ্যোতিষনির্ভর। রাজ-পরিবার, মন্ত্রী-সেনাপতি ইত্যাদিরা, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতেরা এবং উচ্চতর বর্ণের লোকেরা যে স্মৃতি ও জ্যোতিষ ছাড়া জীবন-চর্চায় আর কোনো নির্দেশ মানিতেন, সেন-আমলের লিপি ও সুবিপুল সংস্কৃত-সাহিত্য পড়িলে তাহা মনে হয় না। আর, রাজারা স্বয়ং জ্যোতিষচর্চা করিতেছেন, বল্লাল ও লক্ষ্মণসেন দু'জনই জ্যোতিষের গ্রন্থ লিখিতেছেন এমন তথ্যও রাজবৃত্তের ইতিহাসে সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই, সেই সংকটময় মুহূর্তে মিন্‌হাজ্ জ্যোতিষীদের উক্তি ও আচরণ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা একেবারে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইতেছে না; কিছু অত্যুক্তি হয়তো থাকিতে পারে! তৃতীয়ত, যদি মানিয়া লওয়া যায় যে (এবং তাহা করিতে কিছু বাধা দেখা যাইতেছে না), লক্ষ্মণসেন বিহারে, বাংলার পথে এবং নবদ্বীপে শত্রু প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হয়, এই বাধা যথেষ্ট ছিল না, এবং সংঘর্ষের পশ্চাতে সৈন্যদলের চিত্তশক্তি ও প্রতিরোধ-কামনা খুব প্রবল ছিল না। মিন্‌হাজ্ বখ্‌ত্-ইয়ারের তিব্বতাভিযানের ব্যর্থতা এবং লাঞ্ছনার কথা গোপন করেন নাই; প্রতিরোধ প্রবল এবং সংঘর্ষ সঙ্কটময় হইলে এক্ষেত্রেও মিন্‌হাজ অন্তত তাহার উল্লেখ করিতেন। সংবাদ-দাতা নিজাম্-উদ্-দীন ও সাম্‌স্-উদ্-দীন এই সংঘর্ষের উল্লেখের ভিতর দিয়াই নিজেদের শৌর্য-বীর্যের কথা ভাল ব্যক্ত করিতে পারিতেন, অথচ তাহা করেন নাই। তাহা ছাড়া, বিহার-ধ্বংসের যে বিবরণ তারনাথ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচরণও খুব প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করা যায় না। আচরণ দেখিয়া মনে হয়, ইহারা গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সেন-রাজবংশ ও রাষ্ট্রের প্রতি খুব প্রসন্ন ছিলেন না! অন্য কারণ কিছু থাকাও বিচিত্র নয়। নবদ্বীপেও প্রতিরোধ ব্যবস্থা হয়তো কিছু হইয়াছিল, কিন্তু বখ্‌ত্-ইয়ারের বুদ্ধি ও আক্রমণ কৌশল তাহা সহজেই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আসল ব্যাপার এই যে, যেখানে জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত ও পলায়মান, উপদেষ্টা ও মন্ত্রীবর্গ পরাজয়ী মনোবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং জ্যোতিষ যেখানে রাষ্ট্রবুদ্ধির নিয়ামক সেখানে সৈন্যদলের ও জনসাধারণের প্রতিরোধ দুর্বল হইতে বাধ্য। সেই জন্যই কোনো প্রতিরোধই হয়তো যথেষ্ট কার্যকরী হয় নাই। মিন্‌হাজের বিবরণী পড়িয়া যে মনে হয়, বখ্‌ত্-ইয়ার একেবারে বিনা বাধায় বিহার ও বাংলাদেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহা এই কারণেই। বস্তুত, লক্ষ্মণসেনের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রযন্ত্র নানা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে ভিতর হইতে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল; গাহড়বালদের প্রতিরোধ-প্রাচীর যতদিন বজায় ছিল ততদিন নিশ্চিন্ত হইয়া

কলিঙ্গ-কামরূপ-কাশী জয় লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার সৈন্যদের পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার হয় নাই ; কিন্তু সে-প্রাচীর যখন ভাঙ্গিয়া পড়িল তখন দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান অভিযাত্রীদের ঠেকাইয়া রাখিবার মতন ইচ্ছা বা শক্তি রাষ্ট্রযন্ত্রের ছিল না। ব্রাহ্মণ, বণিক, উপদেষ্টা, জ্যোতিষী ও মন্ত্রীবর্গের আচরণই তাহার প্রমাণ।

চারদিকে যখন এই আতঙ্ক ও পরাজয়-মনোবৃত্তির আচ্ছন্নতা তখন বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের নিজের আচরণ সত্যই প্রশংসনীয় এবং যথার্থ রাজকীয় মর্যাদাবোধের পরিচয়। শত্রু অগ্রসরমান জানিয়া এবং উপদেষ্টা ও মন্ত্রীবর্গের পরামর্শে বিচলিত হইয়া তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করেন নাই। শেষ পর্য্যন্ত তিনি স্বীয় পদে ও কর্তব্যে অবিচল ছিলেন। তারপর যখন প্রায় সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, পায়ের নীচ হইতে মাটি খসিয়া পড়িল, শত্রুসৈন্য অতর্কিতে এবং অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ ও অধিকার করিল, তখন তাঁহার পলায়ন ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। লক্ষ্মণসেন কাপুরুষ ছিলেন না, তিনি হতভাগ্য! সমাজ-ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে, ইতিহাস-চক্রের জটিল ও অমোঘ আবর্তনে বাংলার ইতিহাস শতাব্দী ধরিয়া যে অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, লক্ষ্মণসেন তাহার শেষ অধ্যায় মাত্র! তাঁহার ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্য বা অন্যান্য গুণাবলী তাঁহাকে কিংবা বাংলাদেশকে সেই পরিণতির হাত হইতে বাঁচাইতে পারে নাই; পারা সম্ভব ছিল না। লক্ষ্মণসেনের ব্যক্তিগত পরাক্রম ও অন্যান্য গুণাবলীর সাক্ষ্য তো মিন্‌হাজ নিজেও দিয়াছেন: 'রায় লখ্‌মনিয়া মহৎ রাজা (great Rae) ছিলেন; হিন্দুস্থানে তাঁহার মত সম্মানিত রাজা আর কেহ ছিল না। তাঁহার হাত কাহারও উপর কোনো অত্যাচারে অবিচারে অগ্রসর হইত না। এক লক্ষ কড়ির কমে তিনি কাহাকেও কিছু দান করিতেন না।'

লক্ষ্মণসেনের আচরণ

নদীয়া বা নবদ্বীপ আক্রমণ ও অধিকার ঠিক কবে হইয়াছিল তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বিতণ্ডার অন্ত নাই। মোটামুটি মনে হয় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ বা তাহার কিছু পরে (১২০১ খ্রী) এই ঘটনার সংঘটন কাল। শেক শুভোদয়া-গ্রন্থে এই ঘটনার তারিখ দেওয়া হইতেছে ১১২৪—১২০২ খ্রীষ্টাব্দ, এবং এই তারিখ পাগ-সাম-জোন-জাং নামক তিব্বতী গ্রন্থদ্বারা সমর্থিত।

নদীয়া-নুদীয়া-নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণসেন (পূর্ব)-বঙ্গে গিয়াছিলেন এবং সেখানে অত্যল্পকাল রাজত্ব করিয়া পরলোকগমন করেন (১২০৬?), মিন্‌হাজ একথা বলিতেছেন। সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের সাক্ষ্যে মনে হয় লক্ষ্মণসেন ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দেও জীবিত এবং রাজত্ব করিতেছিলেন। বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে নির্গত লক্ষ্মণসেনের লিপিগুলির মধ্যে ভাওয়াল ও মাধাইনগর লিপি দুইটি তুর্কী-বিজয়ের পরবর্ত্তী হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। কবি উমাপতি-ধরও একটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে লক্ষ্মণসেন কর্তৃক এক ম্লেচ্ছরাজ জয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন। ম্লেচ্ছ-বিনাশ প্রসঙ্গে কবি শরণেরও একটি শ্লোক আগে উদ্ধার করিয়াছি। হইতে পারে, বঙ্গে বিক্রমপুরে

বিশ্বরূপসেন
কেশবসেন

গিয়া অধিষ্ঠিত হইবার পর মুসলমান সৈন্যের সঙ্গে কোথাও কোনো সংঘর্ষ তাঁহার হইয়া থাকিবে। এই অনুমানের কারণ এই যে, লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের লিপিতেও যবনদের সঙ্গে তাঁহাদের সংঘর্ষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গৌড় ও বরেন্দ্রীর মুসলমান নরপতি ও সেনানায়কেরা কেহ কেহ হয়তো পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গের সেন-রাজ্যের বাকী অংশও অধিকার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় এক শতাব্দীকাল সে-চেষ্টা সার্থক হয় নাই। প্রধান কারণ, নদনদীবহুল পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক সংস্থান, সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, লক্ষ্মণসেন, বিশ্বরূপ ও কেশব তিনজনই এই সব সংঘর্ষে জয়ী হইয়াছিলেন, লিপিগুলিতে যেন তাহারই ইঙ্গিত।

লিপি-প্রমাণ হইতে এ-তথ্য নিঃসংশয় যে, লক্ষ্মণসেনের বংশ বঙ্গে আরও অর্দ্ধ শতাব্দী কালের উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের রাজ্য পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গে বিস্তৃত ছিল। মিন্‌হাজ বলিতেছেন, তাঁহার গ্রন্থরচনা কালেও সেন-রাজারা বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। বিশ্বরূপ ও কেশব দুইজনই লক্ষ্মণসেনের ন্যায় নিজেদের "গৌড়েশ্বর" এবং "পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ" বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। রাজ্যের অধিকাংশই তাঁহাদের করচ্যুত হইয়া গিয়াছিল; একাধিকবার যবনদের সঙ্গে তাঁহাদের সংঘর্ষও হইয়াছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিজেদের রাজকীয় দলিলপত্রে অভ্যস্ত ও চিরাচরিত ধরাবাঁধা ঔপধিক আড়ম্বরের ত্রুটি হয় নাই। হয়তো তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, নিজেদের স্বাধীনতা তখনও অক্ষুণ্ণই আছে, এবং পূর্ববর্ত্তী অনেক ভিন্‌-প্রদেশী রাজবংশ কর্ত্তৃক আক্রমণ ও পরাজয়ের মত এই আক্রমণ এবং পরাজয়ও অধিককাল স্থায়ী হইবে না। বস্তুত, নবদ্বীপ করচ্যুত এবং বখ্‌ত্‌-ইয়ার লখ্‌নৌতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও সেন-রাজারা যেভাবে তাঁহাদের লিপিগুলিতে সর্বপ্রকার ঔপধিক আড়ম্বর এবং চিরাচরিত রীতি ও অভ্যাস বজায় রাখিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় না, এই মুসলমান বিজয়ের যথার্থ ঐতিহাসিক ইঙ্গিত তাঁহারা যথেষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সমসাময়িক সাহিত্যেও এই সঙ্কটময় বৈপ্লবিক যুগের কোনো পরিচয় কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। সমাজের শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণীরা বা জনসাধারণও কি সে ইঙ্গিত ধরিতে পারেন নাই?

বিশ্বরূপ ও কেশব দুইজনই "সগর্গ-যবনান্বয়-প্রলয়-কালরুদ্র" বলিয়া নিজেদের পরিচয়-দান করিয়াছেন। একাধিক মুসলমান সুলতান—গিয়াস-উদ্‌-দীন্‌ (১২১১-১২২৬) মালিক সৈফ্‌-উদ্‌-দীন (১২৩১-৩৩), ইজ্‌-উদ্‌-দীন্‌ বলবন্‌ (১২৫৮) প্রভৃতি—কয়েক বারই বঙ্গ (পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গ) বিজয়ের চেষ্টা করিয়াছেন, মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণী হইতেই তাহা জানা যায়। তবে, সে-চেষ্টা সার্থক হয় নাই। আগেই বলিয়াছি যে, মিন্‌হাজের সাক্ষ্যেই জানা যায় সেন-রাজারা ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দেও বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। বিশ্বরূপ ও কেশবের পরও আরও কয়েকজন সেন-রাজার নাম আবুল ফজলের আইন-ই-আক্‌বরী এবং রাজাবলী-গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে, স্বতন্ত্র ও বিশ্বাসযোগ্য

সাক্ষ্য দ্বারা এই সব রাজার নাম বা কীর্তিকাহিনী সমর্থিত নয়। ইহাদের মধ্যে মাধবসেন এবং শূরসেনের নাম একান্ত অনৈতিহাসিক না-ও হইতে পারে। পঞ্চরক্ষা গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপিতে (১২৮৯ খ্রী) গৌড়েশ্বর, পরমসৌগত পরমরাজাধিরাজ মধুসেন নামে এক নরপতির খবর পাওয়া যায়। বিশ্বরূপের সাহিত্য-পরিষৎ-লিপিতে সূর্যসেন (শূরসেন ?) এবং পুরুষোত্তমসেন নামে দুই রাজকুমারের উল্লেখ আছে। সেন-বংশীয় কোনো কোনো রাজপুত্র-রাজকুমার স্থানীয় সামন্তরাজ রূপেও রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

অবসান

পূর্ব-বঙ্গেও সেনরাষ্ট্র ভিতর হইতে ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। ১২২১ খ্রীষ্টাব্দের আগেই কোনো সময়ে পট্টিকেরা (ত্রিপুরা জেলা) রাজ্যে রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিলেন; লক্ষ্মণসেনের জীবিতাবস্থায়ই বোধ হয় মেঘনার পূর্বতীরে ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রামে এক দেববংশ মাথা তুলিয়াছিল, এ-সব কথা তো আগেই বলিয়াছি। এই তিনটি জেলাই এই রাজবংশের রাজা দামোদরের (১২৩১—১২৪৩) অধিকারভুক্ত ছিল, এ-বিষয়ে লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। কিছুদিন পর, ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দের আগেই, বোধ হয় এই দেববংশেরই অন্যতম রাজা দশরথদেব বর্তমান ঢাকা জেলাও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন, এবং বিক্রমপুরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। দেববংশের আরও দুই একটি লিপি ক্রমশ আবিষ্কৃত হইতেছে। মনে হয়, ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ কোনো রকম করিয়া মুসলমানাধিকারের হাত হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল—কোথাও সেন-বংশীয় রাজাদের নায়কত্বে, কোথাও অন্য কোনো স্থানীয় রাজা বা সামন্তের নায়কত্বে। নদীবহুল জলমগ্ন ভাটি অঞ্চলে মুসলমান অভিযাত্রীরা বহুদিন পর্যন্ত নিজেদের অধিকার বিস্তৃত করিতে পারেন নাই। অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া নবদ্বীপ অধিকার করা যায়, কিন্তু জলপথে অনভ্যস্ত, নৌকাবাহিনী-বিহীন মুসলমান সেনাপতিদের পক্ষে (পূর্ব ও দক্ষিণ)-বঙ্গ বিজয় নিশ্চয়ই খুব সহজ ছিল না। কিন্তু তাহা ক'দিনের জন্য ? ত্রয়োদশ শতকের পর বাংলাদেশের কোথাও আর কোনো স্বাধীন স্বতন্ত্র হিন্দু নরপতির নাম শোনা যাইতেছে না।

সেনায়ন-কাহিনী বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের রাজবংশ এবং রাষ্ট্রসম্বন্ধগত সামাজিক ইঙ্গিত আগেই কিছু কিছু ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে একটু বিস্তৃত করিয়া একটা সামগ্রিক দৃষ্টি লওয়ার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

সামাজিক ইঙ্গিত

সেন-রাজবংশ বাঙালী ছিলেন না, দক্ষিণের কর্ণাট দেশ হইতে এ-দেশে আসিয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া পাল-বংশ এবং পাল-যুগসৃষ্ট বাংলাদেশ ও বাঙালীজাতির আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষণীয় এই যে, এই যুগে আর একটি রাজবংশ (পূর্ব)-বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; এই বর্মণ রাজবংশও কিন্তু অবাঙালী; ইহারাও বিদেশাগত, বোধ হয় কলিঙ্গাগত। পাল-বংশ

মুখ্যত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, সেন-বংশ গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। আর, যে-চন্দ্ররাজবংশকে অধিকারচ্যুত করিয়া বর্মণ-বংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাঁহারাও পালরাজাদের মত পরম সুগত অর্থাৎ বৌদ্ধ, আর বর্মণেরা এবং মেঘনা-অঞ্চলের দেব-বংশের রাজারা সেনদের মতনই গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী। এই দুই তথ্যের মধ্যে এই যুগের সামাজিক ইঙ্গিত অনেকাংশ নিহিত; ইহাদের ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা অবহেলার বস্তু নয়। ক্রমে তাহা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি।

সুদীর্ঘ পালযুগের রাষ্ট্রীয় আদর্শ এই যুগে অপরিবর্তিত; নূতন কোনো রাষ্ট্রীয় আদর্শ এই যুগে গড়িয়া উঠে নাই, রাষ্ট্রযন্ত্রেরও বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নাই। স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য ও আত্মকর্তৃত্বের আদর্শ সমভাবে বিদ্যমান; সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্রমাগ্রসরমান বৈদেশিক মুসলমান-শক্তির নিরন্তর করাঘাতেও রাষ্ট্রীয় আদর্শের কোনো পরিবর্তন হয় নাই; সামগ্রিক ভারতীয় ঐক্যবোধ ও আদর্শ, বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় আদর্শ কিছু গড়িয়া উঠে নাই। সামন্ততন্ত্র সমভাবে সক্রিয়। উত্তরোত্তর ভূমির চাহিদা বাড়িতেছে; পুরোহিত-ব্রাহ্মণেরাও ভূমিসংগ্রহে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন, সমাজ ক্রমশ ভূমিনির্ভর, কৃষিনির্ভর হইয়া উঠিতেছে। অথচ, রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে ক্ষেত্রকর বা কৃষক সম্প্রদায় অবজ্ঞাত। রাজকীয়-ভূমিসংক্রান্ত দলিলপত্রে তাঁহারা ভুলেও উল্লিখিত হইতেছেন না। সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকদেরও কোনো উল্লেখ দেখিতেছি না। অথচ, পালযুগের লিপিমালায় সর্বত্রই কৃষক-কর্ষক-ক্ষেত্রকরদের উল্লেখ তো আছেই, চণ্ডালদের পর্যন্ত উল্লেখ আছে; অর্থাৎ সমাজের কোনো স্তরই তখন রাষ্ট্রের দৃষ্টির বহির্ভূত ছিল না। স্পষ্টই দেখিতেছি, সেন-যুগে রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টি সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে! রাষ্ট্রের আধিপত্যের বিস্তার অর্থাৎ রাজ্যপরিধিও পাল-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই; তাহাও সংকীর্ণই বলা যায়, যদিও লক্ষ্মণসেন প্রায় মহীপালের রাজ্যসীমা উদ্ধার করিয়াছিলেন, তবে স্বল্পকালের জন্য মাত্র। অথচ, অন্যদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রাজ ও সামন্তবংশেরই রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ক্রমবর্দ্ধমান। নূতন নূতন রাজকর্মচারীদের নাম এই যুগে প্রথম শোনা যাইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে ক্রমসংকুচীয়মান নূতন নূতন রাজ্যবিভাগ—খণ্ডল, চতুরক, আবৃত্তি, পাটক ইত্যাদি। ছোট ছোট রাজপদ যেমন বাড়িয়াছে তেমনই বাড়িয়াছে "মহা"-পদের সংখ্যা—মহামন্ত্রী, মহাপুরোহিত, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাপিলুপতি, মহাগণস্থ, মহাধর্মাধ্যক্ষ, ইত্যাদি—"মহা"পদের আর শেষ নাই! কম্বোজরাজ নয়পালের ইর্দা পট্টোলীতে নূতন রাষ্ট্রযন্ত্র বিভাগের নামও শোনা যায়: করণ অর্থাৎ কেরাণী মণ্ডলসহ "অধ্যক্ষবর্গ", সেনাপতিসহ "সৈনিকসংঘমুখ্য", দূতসহ "গূঢ়পুরুষ"বর্গ, এবং আরও কত কি! পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, একদিকে রাষ্ট্রের সমাজদৃষ্টি যত সংকীর্ণ হইতেছে, পরিধি যত সংকীর্ণ হইতেছে, আমলাতন্ত্রের বিস্তার হইতেছে তত বেশী, রাজপাদোপজীবীর

রাষ্ট্রীয় আদর্শ

সংকীর্ণ সামাজিক দৃষ্টি

আমলাতন্ত্রের বিস্তৃতি

সংখ্যা তত বাড়িতেছে, চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তত বিস্তৃত হইতেছে। দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর তালিকা দিয়াও যখন ইহাদের শেষ করা যাইতেছেনা তখন বলা হইতেছে, ইহার পর অন্যান্য অনুল্লিখিত রাজকর্মচারী যাঁহারা রহিলেন তাঁহাদের নাম অর্থশাস্ত্র-গ্রন্থের অধ্যক্ষ-প্রচার অধ্যায়ে লিখিত আছে। আমলাতন্ত্র যে সংখ্যায় ও অধিকার বৃদ্ধিতে স্ফীত ও অতিমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবারও অবকাশ নাই। শুধু তাহাই নয়, রাজার সর্বময় কর্তৃত্বও বাড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় আড়ম্বরও। এই যুগেই দেখিতেছি, তাঁহার নূতন নূতন উপাধি গ্রহণের আতিশয্য। পালযুগের রাজকীয় বিজ্ঞপ্তিতে রাণীর উল্লেখ দেখা যায় না; কিন্তু এখন দেখিতেছি রাজ্ঞী-মহিষীরাও উল্লিখিত হইতেছেন। রাজপরিবারের আভিজাত্য ও দরবারী জৌলুসও বাড়িতেছে, এমন অনুমান করা বোধ হয় অন্যায় নয়! বর্মণ, কম্বোজ ও সেন-বংশ সকলেই তো বিদেশাগত; মাতৃপ্রধান অথবা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের স্মৃতি তাঁহারা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, এমনও হইতে পারে! এইখানেই শেষ নয়; পুরোহিত, মহাপুরোহিত, শান্ত্যাগারিক, শান্ত্যাগারাধিকৃত, শান্তিবারিক, মহাতন্ত্রাধিকৃত প্রভৃতি নূতন নূতন রাজপুরুষ (ইহারা সকলেই ধর্মাচরণ-ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত) রাজসভা জাঁকাইয়া বসিয়া আছেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ রাজপণ্ডিতও আছেন; তিনিও এই যুগে অন্যতম রাজকর্মচারী। আমলাতন্ত্রের এই সুদীর্ঘ ও সর্বব্যাপী বাহু এবং সর্বময় প্রভুত্ব জনসাধারণ কি দৃষ্টিতে দেখিত তাহা জানিবার কোনো উপায় নাই।

রাষ্ট্রযন্ত্রে পৌরোহিত্যের প্রভাব

রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টি-সংকীর্ণতার কথা বলিয়াছি। অন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতেও এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। পূর্বতর যুগের মতন পালযুগের রাষ্ট্রে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীর প্রাধান্য ছিল না, এ-কথা সত্য; কিন্তু সমাজে তাঁহাদের একটা স্থান ছিল, স্বীকৃতি ছিল। সেন-আমলে দেখা যাইতেছে, শিল্পী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকেরা সমাজের নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এ-সম্বন্ধে যে-সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাহার বিস্তৃত বিচারালোচনা বর্ণ-বিন্যাস ও শ্রেণী-বিন্যাস অধ্যায়ে করা হইয়াছে। এই দুই গ্রন্থে বর্ণবিন্যাসের যে-ছবি পাওয়া যায়, যদি তাহা সেন-আমলের সমাজ-বিন্যাসের কিছু ইঙ্গিতও বহন করে তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হয়, অনেক শিল্পী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সংশূদ্র বলিয়াও গণ্য হইতেন না; বর্ণ-বিন্যাসের নিম্নতর স্তরে ছিল তাঁহাদের স্থান।

শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের স্থান

এই দৃষ্টি-সংকীর্ণতা সেন-রাজবংশ ও রাষ্ট্রের উপর কেন আরোপ করিতেছি তাহার কারণ বলিতে হইলে রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। সেন-আমলের রাজকীয় লিপিমালার সাক্ষ্য লইয়াই আরম্ভ করা যাইতে পারে। বর্মণ ও সেন বংশের প্রত্যেকটি লিপিতেই দেখা যায় ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি, সংস্কার ও পূজার্চনার জয়জয়কার; বিভিন্ন তিথি উপলক্ষে তীর্থস্নান, উপবাস; নানাপ্রকারের বৈদিক ও পৌরাণিক যাগযজ্ঞ

হোম ইত্যাদির বিবরণ। এই সব অনুষ্ঠান উপলক্ষে যত ভূমি দান সমস্তই লাভ করিতেছেন ব্রাহ্মণেরা। এই যুগের একটি লিপিতেও এমন প্রমাণ নাই যেখানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কেহ বা কোনো বৌদ্ধ বিহার বা সংঘ কোনো প্রকার রাজানুগ্রহ লাভ করিতেছেন। বাংলাদেশে যত বৌদ্ধমূর্তি ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশ অষ্টম হইতে একাদশ শতকের।

রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ

অল্প কয়েকটি মূর্তিই দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের। পট্টিকেরা রাজ্যের এক রণবঙ্কমল্ল হরিকাল দেব ছাড়া এই যুগে আর কোনো বৌদ্ধ নরপতির খোঁজ পাওয়া কঠিন। মধুসেন পরমসুগত সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি সেন-বংশের রাজা কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; আর, এই ধরণের ২।১ টি দৃষ্টান্তের সাহায্যে রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ ধরাও কঠিন। বর্মণ ও সেন-বংশীয় রাজারা কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব, কেহ সৌর, কিন্তু প্রত্যেকেরই আশ্রয় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও সংস্কার, এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই এই স্মৃতি ও সংস্কার প্রচার ও বিস্তারে সদা উৎসুক। রাজপরিবারের লোকদেরও এ-সম্বন্ধে আগ্রহের সীমা নাই। বৌদ্ধধর্ম এই সময় বিলীন হইয়া গিয়াছিল, সংঘ-বিহার ইত্যাদি ছিল না, একথা বলা চলে না; অথচ রাষ্ট্রের কোনো অনুগ্রহই সেদিকে বর্ষিত হইল না! শুধু যে বর্ষিত হয় নাই, তাহা নয়; বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি একটা বিরোধিতাও বোধহয় আরম্ভ হইয়াছিল, এবং রাষ্ট্রের সমর্থনও এই বিরোধিতার পশ্চাতে ছিল। বর্মনরাজ জাতবর্মার রাজত্বকালেই সম্ভবত বর্মণ-রাষ্ট্রের বঙ্গাল সৈন্যদল

বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণ

সোমপুরের বৌদ্ধ মহাবিহারের অন্তত একাংশ পুড়াইয়া দিয়াছিল; নালন্দার একটি লিপিতে এই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি উল্লিখিত আছে। এই আক্রমণ শুধু কৈবর্তনায়ক দিব্যর বিরুদ্ধেই নয়; বৌদ্ধ ধর্মেরও বিরুদ্ধে। ভট্ট-ভবদেব ছিলেন রাজা হরিবর্মার সন্ধিবিগ্রহিক; তাঁহার পিতামহ আদিদেব ছিলেন বঙ্গরাজের সন্ধিবিগ্রহিক। এই পরিবারের রাষ্ট্রীয় প্রভাব সহজেই অনুমেয়। তাহার উপর ভবদেব নিজে ছিলেন সমসাময়িক কাল এবং সংস্কৃতির একজন প্রধান নায়ক, কুমারিলভট্টের মীমাংসা-বিষয়ক তন্ত্রবার্তিক গ্রন্থের টীকাকার, হোরাশাস্ত্র, মীমাংসা-সিদ্ধান্ত-তন্ত্র-গণিত এবং ফলসংহিতা বিষয়ক গ্রন্থাদির রচয়িতা, কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি বা দশকর্মপদ্ধতি, প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ প্রভৃতি স্মৃতি-বিষয়ক গ্রন্থের লেখক এবং ব্রহ্মবিত্তাবিদ্ পণ্ডিত। এই ভবদেব-ভট্ট অগস্ত্যের মত বৌদ্ধরূপ সমুদ্রকে গণ্ডূষে পান করিয়াছিলেন এবং তিনি পাষণ্ডবৈতণ্ডিকদের যুক্তিতর্কখণ্ডনে দক্ষ ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রশস্তিলিপিতে দাবি করা হইয়াছে। পাষণ্ডবৈতণ্ডিকেরা যে বৌদ্ধ নৈয়ায়িক এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। দেখা যাইতেছে, এই যুগের ব্রাহ্মণ্যধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি বৌদ্ধ দর্শন ও সংস্কৃতির বিরোধী। বর্মণ বংশের রাষ্ট্রে ভবদেব যেমন সামাজিক আদর্শের প্রতিনিধি সেন-রাষ্ট্রে তেমনই হলায়ুধ। এই হলায়ুধও ভবদেবেরই মতন ব্রাহ্মণকুলতিলক এবং তেমনই প্রথমে রাজপণ্ডিত, তারপর লক্ষ্মণসেনের মহামাত্য, এবং সর্বশেষে লক্ষ্মণসেনেরই ধর্মাধিকারী বা

ধর্মাধ্যক্ষ। তাঁহার পিতা ধনঞ্জয়ও ছিলেন রাজকীয় ধর্মাধ্যক্ষ। এই পরিবারেরও রাষ্ট্রীয় প্রভাব অনস্বীকার্য। হলায়ুধের দুই ভাই ঈশান এবং পশুপতি যথাক্রমে আহ্নিক এবং শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে দুইটি পদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন। পশুপতি একখানা পাকযজ্ঞ-গ্রন্থেরও রচয়িতা। আর, হলায়ুধ নিজে তো ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব এবং পণ্ডিতসর্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। সুস্পষ্ট বিরোধিতার ইঙ্গিত ভবদেব ছাড়া আর কাহারও জীবনে পাওয়া যায় না, কিন্তু এ-কথা সত্য যে, এ-যুগের রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ একান্তই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি আশ্রয়ী। দু'টি মাত্র দৃষ্টান্ত আহরণ করা হইল; কিন্তু বস্তুত, বাংলাদেশ আজও যে স্মৃতিশাসনে শাসিত, যে বর্ণবিন্যাসে বিন্যস্ত সেই স্মৃতি ও বর্ণবিন্যাস দুইই এই সেন-বর্মণ যুগের সৃষ্টি। বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া জিতেন্দ্রিয়, বালক, ভবদেব, হলায়ুধ এবং বোধ হয় জীমূতবাহন, ইঁহারা প্রত্যেকেই সেন-বর্মণ আমলের লোক; এবং হারলতা-পিতৃদয়িতা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবহারমাতৃকা-দায়ভাগ-কালবিবেক পর্যন্ত সমস্ত স্মৃতি, ব্যবহার ও মীমাংসা গ্রন্থ এই যুগের রচনা। এই স্মৃতি-ব্যবহার-মীমাংসাই শূলপাণি-রঘুনন্দন কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত হইয়া আজও বাংলার সমাজ শাসন করিতেছে। এই ধর্ম ও সাংস্কৃতিক আদর্শের পশ্চাতে রাষ্ট্রের সক্রিয় পোষকতা ও সমর্থন না থাকিলে একশত-দেড়শত বৎসরের মধ্যে ইহাদের এমন সমৃদ্ধ রূপ কিছুতেই দেখা যাইত না। পোষকতা ও সমর্থন যে ছিল তাহার প্রমাণ বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন স্বয়ং। বল্লাল স্বয়ং আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর এবং আংশিকত অদ্ভুতসাগর এই চারিটি স্মৃতি বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা। দানসাগর তিনি লিখিয়াছিলেন তাঁহার গুরু অনিরুদ্ধের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া। অসম্পূর্ণ অদ্ভুতসাগর সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন লক্ষ্মণসেন স্বয়ং, এবং তাহা পিতৃনির্দেশে।

এই একান্ত ব্রাহ্মণ্য আদর্শের শাসন অন্যদিক দিয়াও কি করিয়া রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার ইঙ্গিত আগেই করিয়াছি। এই যুগের সেন-বর্মণ রাষ্ট্রেই প্রথম দেখা যাইতেছে, পুরোহিত-মহাপুরোহিত, শান্ত্যাগারিক-শান্তিবারিক, তন্ত্রাধিকৃত প্রভৃতিরা রাজকর্মচারী বলিয়া গণ্য হইতেছেন। রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য, ব্রাহ্মণধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং রাষ্ট্র ও রাজবংশ এই সংস্কৃতি বিস্তারে সচেষ্ট, ইহা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমাজ-নিয়ন্ত্রণ রাজার কর্তব্য বলিয়া ভারতবর্ষে বরাবরই স্বীকৃত হইয়াছে; পাল-রাজারাও বর্ণাশ্রম রক্ষণ ও পালন করিয়াছেন; কিন্তু সেন-আমলে রাষ্ট্র ও রাজবংশ যেমন করিয়া দেশের সকলের দৈনন্দিন জীবনের ছোট-খাট ক্রিয়াকর্তব্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ধর্ম ও সমাজগত আচার ও আচরণ, পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এমন সজ্ঞান সচেতন এবং সর্বব্যাপী কর্তৃত্বমূলক চেষ্টা বাংলাদেশে ইহার আগে বা পরে আর কখনো হয় নাই। এই যুগের সর্বপ্রধান চেষ্টাই যেন হইতেছে, বাংলার সমাজকে একেবারে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজা, নূতন করিয়া গড়া, এবং তাহা

একান্ত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-সংস্কৃতির আদর্শানুযায়ী; সেই চেষ্টার পশ্চাতে রাষ্ট্র ও রাজবংশের পরিপূর্ণ সক্রিয় সমর্থন; উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর লোকেরাও তাহার পোষক ও সমর্থক। এই যুগের লিপিমালা এবং ধর্মশাস্ত্র-গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে এ-তথ্য যেন কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। কুলজী গ্রন্থমালার সাক্ষ্য, বাংলার কৌলিন্য প্রথার সাক্ষ্য হয়তো ইতিহাসে প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য নয়; সে-আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি। কিন্তু লোকস্মৃতি ও লোকেতিহাসের যদি কিছুমাত্র ঐতিহাসিক মূল্যও থাকে তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, শ্যামলবর্মা এবং বল্লালসেনের সঙ্গেই বাংলার প্রচলিত বর্ণ-বিন্যাস ও সামাজিক স্তর-বিভাগের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী জড়িত। লোকস্মৃতির নীচে সাধারণত কোথাও একটা কিছু সত্য গোপন থাকে; বর্মণ ও সেন-বংশের সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে যে অকাট্য নিঃসংশয় প্রমাণ সুবিদিত, লোকস্মৃতি এই ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে না। আনন্দভট্টের বল্লালচরিত-গ্রন্থ খুব প্রামাণিক না হইতে পারে—সে-আলোচনাও অন্যত্র করিয়াছি—কিন্তু ইহার সামাজিক ইঙ্গিত একেবারে হয়তো মিথ্যা নয়। বল্লালসেন বণিকদের উপর অত্যাচার এবং সুবর্ণবণিকদের 'পতিত' করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কৈবর্ত, মালাকর, কুম্ভকার ও কর্মকারদের সংশূদ্রস্তরে উন্নীত করিয়াছিলেন বলিয়া এই গ্রন্থে যে-বর্ণনা আছে, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না-ও হইতে পারে, কিন্তু সেন-রাষ্ট্র ও রাজবংশের আমলে এই ভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরনির্ণয় এবং কোন্ স্তরে কোন্ সম্প্রদায়ের স্থান ইত্যাদি নির্দেশ করা হইতেছিল তাহা অস্বীকার করা চলে না। হয়তো তাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রের বা রাজকীয় নির্দেশও কিছু ছিল।

এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল বরেন্দ্রী ও রাঢ়দেশ, এবং পরবর্তীকালে বিক্রমপুর অঞ্চল। কিন্তু বিক্রমপুর বৌদ্ধ সাধনা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রস্থল থাকাতে সেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতাপ রাঢ়-বরেন্দ্রীর মতন এতটা প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই। আর, ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ সাধনার প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত প্রবল ছিল। এ-সম্বন্ধে লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। বোধ হয়, এইজন্যই মৈমনসিংহ-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম-শ্রীহট্ট অঞ্চলে আজও ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির শাসন অপেক্ষাকৃত শিথিল।

সেন ও বর্মণ উভয় বংশই দক্ষিণাগত। এ-তথ্য সুবিদিত যে, আন্ধ্র-সাতবাহন আমল হইতেই দক্ষিণদেশ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির খুব বড় কেন্দ্র। পল্লব, চোল, চালুক্য ইত্যাদি সকল রাজবংশই এই ধর্ম ও সংস্কৃতির পোষক, ধারক ও সমর্থক। বস্তুত, উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারত এই বিষয়ে অধিকতর গোঁড়া, পরিবর্তন-বিবর্তন বিমুখ। শুধু আজই এইরূপ নয়; প্রাচীনকালেও তাহাই ছিল। কলিঙ্গ-কর্ণাট হইতে বর্মণ ও সেনেরা সেই আদর্শ লইয়াই বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন, এবং রাষ্ট্রের বিপুল ও সক্রিয় সমর্থন এবং রাজবংশের মর্যাদার বলে ও সহায়তায় সেই আদর্শ এবং তদনুযায়ী স্মৃতি ও ব্যবহার শাসন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই চেষ্টা

সফল হইয়াছিল। বাধা-বিরোধীতা তখনও হইয়াছিল, পরেও হইয়াছে—বল্লালী সমাজ পদ্ধতি ও শাসন বাংলার সর্বত্র সমভাবে স্বীকৃত ছিল না, এখনও নাই; কিন্তু কোনো বাধাই যথেষ্ট কার্যকরী হয় নাই। আজ পর্যন্ত উচ্চতর বর্ণ ও সমাজ সেই যুগেরই স্মৃতি ও ব্যবহার-শাসন মানিয়া চলিতেছে; নিম্নতর বর্ণেরও তাহাই আদর্শ ও মাপকাঠি।

কিন্তু, সমসাময়িক বাংলাদেশের পক্ষে কি তাহা সার্থক ও কল্যাণকর হইয়াছিল? পরবর্তী ইতিহাসের কথা বলিব না, তাহা এই গ্রন্থের বিষয়ীভূত নহে। কিন্তু সমসাময়িক-কালে ইহার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত নির্ধারণ ঐতিহাসিকের কর্তব্য।

আগের পর্বে দেখিয়াছি, পাল-যুগের সামাজিক আদর্শ ছিল বৃহত্তর সামাজিক সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণ। ইতিহাসের চক্রাবর্তে বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের যে-স্রোত বাংলাদেশে প্রবাহিত হইতেছিল সেই স্রোতকে ব্রাহ্মণেতর ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোতের সঙ্গে মিলাইয়া মিশাইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই কাঠামো ও আদর্শানুযায়ী একটি বৃহত্তর সামাজিক সমন্বয় গড়িয়া তোলাই ছিল পাল-চন্দ্র পর্বের সাধনা। সমসাময়িক সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজবংশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ তাহাই ছিল। গুপ্ত আমল হইতে আরম্ভ করিয়াই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশে সুস্পষ্ট এবং ক্রমবর্ধমান; তখন হইতেই না হউক, অন্তত সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতিই বলবত্তর; কখনো তাহা অস্বীকৃত হয় নাই। বৌদ্ধ খড়্গ বা পাল বা চন্দ্র রাজারাও তাহা করেন নাই, বরং তাঁহারা সেই আদর্শই মানিয়া লইয়াছেন, ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করিয়াছেন, পুরোহিত অর্চিত শান্তিবারি মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মন্দির স্থাপন করিয়াছেন, চাতুর্বর্ণ্য সমাজ রক্ষা ও পালন করিয়াছেন, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ পাঠ শুনিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, পাল-যুগে ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ দেবদেবীদের মধ্যেও একটা বৃহৎ সমন্বয়-স্বাঙ্গীকরণপ্রক্রিয়া চলিতেছিল; বৌদ্ধ ও শৈব তন্ত্রধর্ম ও চিন্তা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের একটি বৃহৎ সমন্বয় সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতেছিল; বৌদ্ধেরা অসংখ্য ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন; আর্যেতর, ব্রাহ্মণেতর সংস্কৃতির দেবদেবীদের পংক্তিভুক্ত করিতেছিলেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মণেরাও বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণেতর, আর্যেতর দেবদেবীদের কিছু কিছু মানিয়া লইতেছিলেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই সমন্বয়-স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়া সমভাবে চলিতেছিল। বর্ণ-বিন্যাস ও সামাজিক স্তরভেদের ব্যাপারেও তাহা দৃষ্টিগোচর। পাল-আমলে চণ্ডাল পর্যন্ত সকল শ্রেণী ও বর্ণের লোকেরাই রাষ্ট্রের দৃষ্টিভূত; সেন-আমলে শুধু উচ্চতর বর্ণের লোকেরাই রাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আছেন। এমন কি রাষ্ট্রযন্ত্রেও ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের প্রাধান্য। পাল-রাজারা চাতুর্বর্ণ্য সমাজ রক্ষা ও ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু সেন ও বর্মণ রাজারা ইচ্ছামত এবং স্মৃতি-নির্দেশমত চতুর্বর্ণের বিভিন্ন স্তর ঢালিয়া সাজিয়াছেন। বস্তুত, পাল আমলের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণের আদর্শ এই যুগে যেন একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল; সেই আদর্শের স্থানে সবলে ও সোৎসাহে তাঁহারা এক নূতন

আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—এই আদর্শ স্মৃতি-শাসিত বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির আদর্শ, সর্বপ্রকার যুগোপযোগী সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণ-বিরোধী আদর্শ।

কুলজী-গ্রন্থধৃত লোকস্মৃতির যদি কিছু মাত্র মূল্যও থাকে, বল্লাল-চরিত প্রয়োক্ত কাহিনীর পশ্চাতে যদি কোনো সত্য থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, সেন ও বর্মণ আমলে পালযুগগঠিত বাংলার সমাজ ও বাঙালী জাতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ,ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়া হইয়াছিল। এই গড়ার মূলে কোনো সমন্বয় বা স্বাঙ্গীকরণের আদর্শ সক্রিয় ছিল না। বর্ণ-বিন্যাসের দিক হইতে দেখিলে দেখা যাইবে, সমাজ বিভিন্ন স্তরে স্তরে বিভক্ত; প্রত্যেকটি স্তর সুনির্দিষ্ট সীমায় সীমীত; এক স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের মিলন ও আদান-প্রদানের বাধা প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য, অনতিক্রম্য। মাঝে মাঝে ক্বচিৎ যেখানে মিলন ও আদান-প্রদান হইতেছে সেখানে স্মৃতি-শাসনের ব্যতিক্রম হইতেছে, এবং এই ব্যতিক্রম গুলিও সুনির্দিষ্ট নিয়মে নিয়মিত। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের বর্ণ-বিন্যাস ও তাহার যুক্তি, এই যুগের অসংখ্য স্মৃতি-গ্রন্থাদির বিবরণ ও যুক্তি পাঠ করিলে সমাজের এই স্তরভেদ কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। সর্বোচ্চ বর্ণ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যদি বা উত্তর সংকর বা সৎশূদ্রদের খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে আদান-প্রদানের পথ খানিকটা উন্মুক্ত ছিল, মধ্যম সঙ্কর ও অন্ত্যজদের সঙ্গে একেবারেই ছিল না। এক স্তরের সঙ্গে আর এক স্তরের, কিংবা একই স্তরের মধ্যে এক শাখার সঙ্গে আর এক শাখার বৈবাহিক আদান-প্রদান একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। এক একটি স্তরের মধ্যেও আবার নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ উপস্তর; এবং সেখানেও বিভিন্ন বিচিত্র উপস্তরের মধ্যে বিচিত্র বাধা-নিষেধের প্রাচীর। এ-সব সাক্ষ্য কুলজী গ্রন্থমালা বা বল্লালচরিতের নয়, এই যুগেরই স্মৃতি-গ্রন্থাদির, লিপিমালার এবং এই যুগেরই প্রতিফলন যে-সব গ্রন্থে পড়িয়াছে অর্থাৎ বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের সাক্ষ্য। এবং, তাহা অস্বীকার করা কঠিন। শেষোক্ত পুরাণ দু'টিতে দেখা যাইবে, ব্রাহ্মণদের মধ্যেই বিভিন্ন স্তর। এই সমস্ত তথ্যই বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে; এখানে রাষ্ট্র ও রাজবৃত্ত ব্যাপারে তাহার ইঙ্গিত উল্লেখ করিতেছি মাত্র। এ-যুক্তি স্বীকার্য যে, সেন-বর্মণ আমলে এই সব স্তরভেদ ও বিভিন্ন স্তর-উপস্তরের মধ্যে বিধি-নিষেধের প্রাচীর পরবর্তীকালের মত এত সুনির্দিষ্ট, এত কঠোর হয়তো হইয়া উঠে নাই; কিন্তু রাষ্ট্র ও উচ্চতর বর্ণগুলির সামাজিক আদর্শ যে তাহাই ছিল এবং সেই আদর্শই তাঁহারা সবলে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নাই। সেন-বর্মণ যুগের লিপিমালা এবং স্মৃতিগ্রন্থমালাই তাহার অকাট্য প্রমাণ। সমাজের এই স্তরভেদ এবং স্তরে স্তরে আদান-প্রদানের বিচিত্র বিধিনিষেধ নবগঠিত বাংলার সমাজ ও বাঙালী জাতিকে দুর্বল ও পঙ্গু করে নাই, তাহা কে বলিবে? পরবর্তী কালে যে করিয়াছে তাহা তো অনস্বীকার্য, কিন্তু বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির সেই শৈশবে এই ভেদবুদ্ধি ও বিভেদাদর্শ নবজাত শিশুকে বিভ্রান্ত করে নাই, কে বলিবে?

বর্ণ-বিন্যাসের ক্ষেত্রে যেমন শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রেও তাহাই। কৃষক-ক্ষেত্রকর হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্যজ চণ্ডাল পর্যন্ত লোকেরা তো রাষ্ট্রের দৃষ্টির অন্তর্ভুক্তই ছিল না; আর, ব্রাহ্মণেরা যে রাষ্ট্রে ক্রমশ আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন, ধর্মানুষ্ঠানের কর্তারা যে ক্রমশ রাজপাদপোজীবী হইতেছিলেন, তাহা তো আগেই বলিয়াছি। ভবদেব-ভট্টের মতন একজন পণ্ডিত ও রাষ্ট্রনায়ক ব্রাহ্মণদের কৃষিকার্য সমর্থন করিয়াছেন; লিপিমালায় প্রমাণ পাইতেছি ব্রাহ্মণেরা রাষ্ট্রকার্যে, সামরিক ও অন্যান্য ব্যাপারে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত আছেন, অথচ ভবদেবই ব্রাহ্মণদের পক্ষে অন্য প্রায় সকল বৃত্তিই নিষিদ্ধ বলিয়া বলিতেছেন, এমন কি অব্রাহ্মণকে শিক্ষাদান, এবং অব্রাহ্মণের যাগযজ্ঞ-পূজা-অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য পর্যন্ত। শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভেদের সৃষ্টি, ভেদবুদ্ধি সৃষ্টির প্রমাণ ইহার চেয়ে আর কি থাকিতে পারে! ব্রাহ্মণদের পক্ষে চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা, চিত্রবিদ্যার চর্চাও নিষিদ্ধ ছিল! যাঁহারা তাহা করিতেন তাঁহারা 'পতিত' হইতেন। জ্যোতির্বিদ্যার চর্চাও নিষিদ্ধ ছিল; দেবল ব্রাহ্মণরা তো এই জন্যই 'পতিত' হইয়াছিলেন। অথচ, ভবদেব-ভট্ট, বল্লালসেন প্রভৃতিরা স্বয়ং এবং আরও অনেক সমসাময়িক প্রধান প্রধান পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ জ্যোতিষ, ফলসংহিতা, হোরাশাস্ত্র ইত্যাদির চর্চা করিতেন। তাঁহারা তো 'পতিত' হন নাই! ব্রাহ্মণেতর বর্ণের পৌরোহিত্য যাঁহারা করিতেন তাঁহারা ঐ সব নিম্ন বর্ণের বর্ণভুক্ত হইতেন! শ্রেণী-ভেদবুদ্ধির আর কি প্রমাণ প্রয়োজন? এই সব সাক্ষ্য সমস্তই সমসাময়িক। ইহার উপর বল্লাল-চরিতের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, বল্লালের সেনরাষ্ট্র কোনো না কোনো কারণে বণিকদের সমর্থন হারাইয়াছিল, এবং তাহারই ফলে সমাজে সুবর্ণবণিকদের 'পতিত' হইতে হইয়াছিল। সেক-শুভোদয়ার একটি গল্পে দেখিতেছি, লক্ষ্মণসেনের এক শ্যালক, রাণী বল্লভার এক ভ্রাতা কুমারদত্ত, এক বণিক্-বধূর উপর পাশবিক অত্যাচার করিতে গিয়াছিল। বণিকবধূ মাধবী যে শেষ পর্যন্ত রাজসভায় সুবিচার পাইয়াছিলেন তাহা শুধু তেজস্বী ব্রাহ্মণ সভাকবি ও পণ্ডিত গোবর্ধন আচার্যের জন্য। নহিলে রাজসভায় মন্ত্রী, রাজমহিষী ও স্বয়ং রাজার যে আচরণ এই গল্পের মধ্যে প্রকাশ তাহা সেন-রাজসভার পক্ষে খুব প্রশংসনীয় নয়! বল্লালসেন যে মালাকর, কর্মকার, কুম্ভকার এবং কৈবর্তদের উন্নীত করিয়াছিলেন, এইখানেও তো শ্রেণীগত ভেদবুদ্ধির প্রমাণ সুস্পষ্ট। বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণেও দেখিতেছি, অনেকগুলি সমৃদ্ধ ও অর্থশালী শিল্পী ও বণিক সম্প্রদায় মধ্যম সঙ্কর ও অসৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত এবং স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিকদের স্থান এই পর্যায়ে। বৌদ্ধ ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরা যে সেন-রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, তাহার ইঙ্গিত তো তারনাথের বিবরণীতেও খানিকটা পাওয়া যাইতেছে। তাঁহাদের দোষও দেওয়া যায় না; সেন-বর্মণ রাষ্ট্র তো তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধিত ও সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল না; আর, রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শও বৌদ্ধস্বার্থ বিরোধী ছিল। বর্ণভেদবুদ্ধি এবং এই শ্রেণীভেদবুদ্ধি একত্র জড়িত হইয়া নবগঠিত বাংলাদেশ ও জাতিকে, সেন-রাষ্ট্রকে ভিতর হইতে দুর্বল করিয়া দেয় নাই,

এ-কথাই বা কে বলিবে? সামন্ততন্ত্র এবং অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত আমলাতন্ত্র-বিকৃত সেন-বর্মণরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আদর্শে ভেদবুদ্ধির দুর্বলতা, স্থানীয় আত্ম-কর্তৃত্বের দুর্বলতা তো ছিলই; তাহার উপর বর্ণ ও শ্রেণীগত এই ভেদবুদ্ধি, সমাজাদর্শগত ভেদবুদ্ধি বৈদেশিক আক্রমণকে প্রশ্রয় দেয় নাই, সহজ করিয়া দেয় নাই, তাহা কে বলিবে? বিহার-ধ্বংসের কথা শুনিয়াই নবদ্বীপের প্রায় সমস্ত লোক ভয়ে আতঙ্কে পলাইয়া গিয়াছিল, রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান উপদেষ্টা ও মন্ত্রীবর্গ লক্ষ্মণসেনকে পলায়নের পরামর্শ দিয়াছিলেন, রাজ-জ্যোতিষীরা লক্ষ্মণসেনকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন, সমসাময়িক সামাজিক আদর্শ ও বিন্যাসের দিক হইতে দেখিলে মিন্‌হাজ্‌-উদ্‌-দীনের এই সব উক্তি একেবারে মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। বণিকেরা বিরোধীতা করেন নাই, তাহাই বা কে বলিবে? অন্তত তাঁহারাও নিজেদের কর্তব্য ফেলিয়া দিয়া পলাইয়াছিলেন, মিন্‌হাজ বলিয়াছেন। এই সব সর্বব্যাপী ভেদবুদ্ধির আচ্ছন্নতার মধ্যে লক্ষ্মণসেনের কিংবা তাঁহার পুত্রদের ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্য, বা সৈন্যদলের প্রতিরোধ কতটুকু কার্যকরী হইতে পারে?

শুধু তো এইখানেই শেষ নয়। আর্যেতর ধর্মের আচারানুষ্ঠান এবং তন্ত্রধর্মের বিকৃতি এই সময় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্ম ও সমাজকেই স্পর্শ করিয়াছিল, এবং উভয় ধর্মেরই আচারানুষ্ঠানকে নানাপ্রকার যৌনাতিশয্যে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছিল। বোধ হয়, তাহারই ফলে সমাজে, বিশেষভাবে উচ্চ বর্ণ ও শ্রেণীগুলিতে নানাপ্রকারের কাম ও যৌনবিলাস দেখা দিয়াছিল। সেন-বর্মণ যুগের স্মৃতি ও কাব্যগ্রন্থাদি, লিপিমালা এবং ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণগুলি পাঠ করিলে এ-সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। বস্তুত, যৌন আচার-ব্যবহারে কোনোপ্রকার শ্লীলতা জ্ঞান এই সময় সমাজে ছিল বলিয়াই মনে হয় না। নাগর-সমাজে প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীতে ব্যক্তিগত উপভোগের জন্য দাসী রাখা নিয়মের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। জীমূতবাহন এবং টীকাকার মহেশ্বরের সাক্ষ্য এ-সম্বন্ধে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। আর, সেন-আমলেই বোধ হয় দেবদাসী প্রথা বাংলা দেশে বিস্তৃতি লাভ করে। বাংলাদেশে এই প্রথা কল্যাণকর হয় নাই। এই প্রথা ক্রমশ যৌনাতিশয্যের দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাজরাজড়া হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর সমৃদ্ধ লোকেরা এই প্রথার আশ্রয়ে তাঁহাদের কাম-বাসনার চরিতার্থতা খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধেও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বিজয়সেন ও ভট্ট ভবদেব দুইজনই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মমন্দিরে শত শত দেবদাসী উৎসর্গ করিবার গৌরব দাবি করিয়াছেন! সুহ্মদেশে আর এক সেনরাজ (বোধ হয়, লক্ষ্মণসেন)-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে দেবদাসীর (বার-রামা) উল্লেখ ধোয়ী কবির পবনদূত-কাব্যে পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিতেও দেববারবনিতার উল্লেখ সুস্পষ্ট! হয়তো পালযুগেই এই প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল—রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থে কমলা-নর্তকীর কাহিনী প্রাসঙ্গিক; কিন্তু সেন-আমলে ইহার বিস্তৃতি ও সমসাময়িক কবিকণ্ঠে এই সব বাররামা-বারবনিতাদের উচ্ছ্বাসময়

নির্লজ্জ স্তুতিগান অনস্বীকার্য। ধোয়ী এবং ভবদেব-প্রশস্তির কবি এই বারবনিতাদের উপর কবিকল্পনার অজস্র মধুময় বাণী বর্ষণ করিয়াছেন। সেন-বর্মণরা বোধ হয় দক্ষিণদেশ হইতে এই দেবদাসী প্রথার প্রবাহ নূতন করিয়া বাংলাদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। সমসাময়িক বাংলার নাগর-সমাজের যুবক-যুবতীদের যে কামলীলার বিবরণ ধোয়ী কবির পবনদূতে পাওয়া যায় তাহাও খুব প্রশংসনীয় নয়, অথচ কবি তাহাকে সাধারণ সমাজ-জীবনের অঙ্গ বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে গৌড়-বঙ্গের রাজান্তঃপুরের কামচাতুর্যলীলার এবং নির্লজ্জ কামক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন (তৃতীয়-চতুর্থ শতক), এবং বৃহস্পতিও বলিয়াছেন যে, প্রাচ্যদেশের দ্বিজবর্ণেরা মেয়েরা যৌনব্যাপারে দুর্নীতিপরায়ণ। কিন্তু সমাজ তখনকার সেই সওদাগরী ধনতন্ত্র এবং সুগঠিত কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্রের আমলে এত দুর্বল ছিল না, ভেদবুদ্ধি এত প্রবল ছিল না, এবং এই সব দুর্নীতি দ্বিজবর্ণ, রাজান্তঃপুর এবং অভিজাতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে নাই। পাল-আমলের শেষের দিক হইতেই তাহা দেখা দিল এবং সেন-আমলে সমগ্র সমাজদেহকে তাহা কলুষিত করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ শূদ্র নারীকে বিবাহ করিতে পারিত না, কিন্তু শূদ্র নারীর সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্বন্ধে তাহার বিশেষ কোনো বাধা ছিলনা, নামমাত্র শাস্তিতেই সে-অপরাধ কাটিয়া যাইত—ইহাই সমসাময়িক বাংলার স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান! বিলাস ও আড়ম্বরাতিশয্যও এই সময় নাগর-সমাজকে গ্রাস করিয়াছিল। সন্ধ্যাকর-নন্দী রামাবতী এবং ধোয়ী কবি বিজয়পুরের যে-বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে এ-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। এই যুগের প্রস্তরশিল্পেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পল্লবিত বাক্য, ভাবোচ্ছ্বাসবিলাসময় কল্পনা, আড়ম্বরময় অতিশয়োক্তি, অলঙ্কার-প্রাচুর্য এবং লালসবিলাসময়, শৃঙ্গাররসাবিষ্ট দৃষ্টি তো এই যুগেরই সাহিত্য ও শিল্পের বৈশিষ্ট্য! সম্ভোক্ত যৌনাতিশয্য ও কামবিলাস জনসাধারণের ধর্মানুষ্ঠানগুলিকেও স্পর্শ করিয়াছিল। শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় দশমী তিথিতে শাবরোৎসব নামে একটি নৃত্যগীতোৎসব প্রচলিত ছিল; গ্রামে নগরে এই উৎসবে নরনারীর দল কর্দমলিপ্ত এবং বৃক্ষপত্রমাত্র পরিহিত ও অর্ধউলঙ্গ হইয়া নানাপ্রকার যৌনক্রিয়াগত অঙ্গভঙ্গী করিয়া এবং তদ্বিষয়ক গান গাহিয়া উন্মত্ত নৃত্যে মাতিত—তাহা না করিলে নাকি দেবী ভগবতী ক্রুদ্ধা হইতেন, সমসাময়িক কালবিবেক-গ্রন্থ এবং প্রায় সমসাময়িক বা কিছু পরবর্তী কালিকাপুরাণে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে এই সম্বন্ধে একটু বিধিনিষেধের বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহা শক্তি-উপাসক বা উপাসিকার পক্ষে প্রযোজ্য নয়। তাঁহারা এইরূপ করিলে নাকি দেবীর সুখ উৎপাদিত হইত! যৌন অধোগতির প্রমাণ ইহার চেয়ে বেশী আর কি হইতে পারে! বসন্তে হোলক (হোলী) এবং চৈত্র মাসে কাম-মহোৎসবেও প্রায় অনুরূপ অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। কালবিবেক-গ্রন্থে বলা হইয়াছে, কামমহোৎসবে নানাপ্রকার যৌন অঙ্গভঙ্গী এবং সুওল্লিতোক্তি করিয়া নৃত্যগীত করিলে কামদেবতা প্রীত হন, এবং তাহার ফলে ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হয়! ইহাই বুঝি ছিল সমসাময়িক কালের বিবেক!

এইখানেও শেষ নয়। সেন-রাজসভায় কবি ও পণ্ডিতের সমাদর ছিল খুব। বিজয়-বল্লাল-লক্ষ্মণ-কেশবের রাজসভা অনেক কবিরাই অলঙ্কৃত করিতেন; আর বল্লাল, লক্ষ্মণ, এবং তাঁহার একপুত্র তো নিজেরাও ছিলেন কবি ও পণ্ডিত। বস্তুত, সেন-আমল বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণযুগ। এই ক্ষেত্রেও সেন-রাজাদের সামাজিক আদর্শ সক্রিয়। কিন্তু, এই সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যও সমসাময়িক ঐশ্বর্য-বিলাস এবং কামবাসনার আতিশয্য দ্বারা স্পৃষ্ট। জয়দেব স্বয়ং বলিতেছেন, ত্রুটিবিহীন শৃংগার কাব্য রচনায় গোবর্ধন কবির তুলনা ছিল না। আর্যা সপ্তশতীই তাহার সাক্ষ্য। আর, জয়দেবের গীতগোবিন্দও তো এক হিসাবে শৃংগার কাব্যই; কামবাসনার কাব্যোচ্ছ্বাসময় কল্পনাই তো এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য। ষোড়শ শতকে সন্ত কবি নাভাজী দাস তাঁহার ভক্তমাল-গ্রন্থে এই কাব্যকে বলিয়াছেন কোকশাস্ত্র (কামশাস্ত্র) এবং শৃংগার রসের আগার। বস্তুত, এই যুগের সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য এবং কবিতাগুলি ঐশ্বর্যবিলাসে এবং যৌনকামবাসনায় মদির এবং মধুর। রাজসভায় বসিয়া রাজা ও পাত্রমিত্রসভাসদ সকলে এই সব মদির-মধুর কাব্য উপভোগ করিতেন। এই পরিবেশ ও আবেষ্টনীর সঙ্গে দেববারবনিতা ও দেবদাসীদের যে উচ্ছ্বাসময় স্তব সমসাময়িক কবিরা করিয়াছেন তাহার কোথাও কোনো অমিল নাই। এই মদিরমাধুর্য এবং বিলাসলালসময় ভাবকল্পনা কি রাজসভার বাহিরেও বিস্তার লাভ করে নাই, বৃহত্তর সমাজদেহের নাড়ীতে প্রবেশ করে নাই? এই প্রসঙ্গে সভাকবি উমাপতি-ধরের ম্লেচ্ছ রাজার সাধুবাদ সম্বন্ধে যে-শ্লোকটি আগে উদ্ধার করিয়াছি তাহার সামাজিক ইঙ্গিত, এবং সেক-শুভোদয়া কথিত কুমারদত্ত-মাধবী কাহিনী আবার স্মরণ করা যাইতে পারে। সেন-রাজসভার চরিত্র ও আবহাওয়া তাহা হইতেও কতকটা বুঝা যায়। সেক-শুভোদয়ায় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসেনের রাজসভার অন্যতম অলঙ্কার, কবি, স্মার্ত পণ্ডিত, বাল্যে রাজপণ্ডিত, যৌবনে মহামন্ত্রী এবং প্রৌঢ়াবস্থায় মহাধর্মাধ্যক্ষ, রাজার সর্বোত্তম আবাল্য সুহৃৎ হলায়ুধ মিশ্র শেখ্ জালাল্-উদ্-দীন তব্রিজির খুব পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ-তথ্য যদি সত্য হয়, সেক-শুভোদয়ার সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, সেনরাষ্ট্র ও সেন-রাজসভার চরিত্র বলিয়া কিছু ছিল না! সভাকবি উমাপতি-ধর এবং মহাধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ মিশ্র এই চরিত্রহীনতার দুইটি দৃষ্টান্ত মাত্র! পৃথিবীর সর্বত্রই তো রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির এই একই চিত্র—প্রাচীন গ্রীসে, রোমে, অষ্টাদশ শতকের প্যারিসে, অষ্টাদশ শতকের কৃষ্ণনগরে, উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের কলিকাতায়। সে-চিত্র সামাজিক দুর্নীতির, চারিত্রিক অবনতির, মেরুদণ্ডবিহীন ব্যক্তিত্বের, কামপরায়ণ বিলাসলীলার, শৃংগাররসাবিষ্ট, অলংকারবহুল, মদিরমধুর শিল্প ও সাহিত্যের, তরল রুচি ও দেহগত বিলাসের, অতিমাত্রায় ভেদ-বৈষম্যের, ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত বিশ্বাসঘাতকতার। একাদশ-দ্বাদশ শতকের রামাবতী, বিজয়পুর, নবদ্বীপেও সেই একই ছবি দেখিতেছি!

উত্তর-পূর্ব ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থাটাও এই ফাঁকে একটু দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে। বখ্‌ত্‌-ইয়ার কর্তৃক বিহার-লুণ্ঠনের মিন্‌হাজ্‌-কথিত কাহিনী তো আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে বৌদ্ধ লামা তারনাথও কিছু বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। তারনাথের বর্ণনা জনশ্রুতিনির্ভর, কাজেই তাঁহার সব উক্তি বিশ্বাসযোগ্য হয়তো নয়। তবু, সামাজিক তথ্যের খানিকটা ইঙ্গিত এই বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। তারনাথ বলিতেছেন, চন্দ্রবংশীয় (?) লবসেনের বংশধরেরা (তারানাথ কর্ণাটাগত ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেন-বংশের খবর নিশ্চয়ই জানিতেন না) আশী বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মগধে এই সময় তীর্থিক (ব্রাহ্মণ্য) ধর্ম ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছিল, এবং তাজিক(ইস্‌লাম্‌)ধর্ম বিশ্বাসী অনেক লোকের উদয় হইতেছিল। ইহার পর গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থিত অন্তর্বেদীতে তুরুষ্করাজ 'চন্দ্র' (মূল তুরুষ্ক-নামের তিব্বতী অনুবাদ হওয়া বিচিত্র নয়; তিব্বতী পণ্ডিতেরা তো নামও অনুবাদ করিতেন) আবির্ভূত হন। তিনি অনেক সংবাদবাহী ভিক্ষুদের মধ্যবর্তিতায় বাংলা ও তাহার পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুরুষ্ক রাজাদের নিজের দলভুক্ত করিয়া মগধ লুণ্ঠন করিতে থাকেন, এবং অনেক বৌদ্ধ আচার্যকে হত্যা করিয়া ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলা বিহার ধ্বংস করেন। এই সব ও অন্যান্য বৌদ্ধবিহারের অনেক পণ্ডিত নানাদিকে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন, এবং তাহার ফলে মগধে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়।

তারনাথের বিবরণী হইতে মনে হয়, একদল বৌদ্ধ ভিক্ষু মুহম্মদ বখ্‌ত্‌-ইয়ারের গুপ্তচরের কাজ করিয়াছিলেন, এবং বাংলার সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ ও তারনাথের বিবরণ একত্র মিলাইয়া দেখিলে মনে হয়, বিহার-বাংলারই একদল লোক বিভীষণ-বাহিনীর কাজ করিয়াছিল। মগধে তখন পরিপূর্ণ নৈরাজ্য, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অবস্থাটা যে অচিরেই কি হইবে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছিল। তাহা না হইলে, বিক্রমশিলা-বিহারের প্রধান মন্ত্রাচার্য রত্নরক্ষিত যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, দুই বৎসরের মধ্যেই তাজিকেরা মগধের দুইটি বিহার ধ্বংস করিবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর কোনো অর্থই হয় না। মিন্‌হাজ্‌ও লক্ষ্মণসেনের রাজ-জ্যোতিষীদের মুখে যে-ভবিষ্যদ্বাণীর ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহার অর্থও এই যে, সকলেই অবস্থাটা জানিত, এবং তুরুষ্ক জাতীয় মুসলমান শত্রুরাই যে আক্রমণ-কর্তা তাহাও জানিত। অথচ, প্রতিরোধের ব্যবস্থা তেমন কিছু হইয়াছিল, বলা যায় না। সাহাব্‌-উদ্‌-দীন্‌ ঘোরী দুইবার পরাজিত হইয়া তৃতীয় বারের চেষ্টায় পঞ্জাব অধিকার করিয়াছিলেন, এবং তাহাও রাজমহিষীর বিশ্বাসঘাতকতায়। পরেও হিন্দুরাষ্ট্রশক্তিপুঞ্জ মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে কোনো সামগ্রিক প্রতিরোধ রচনা করিতে পারেন নাই। গজনীর মামুদের সকল আক্রমণের পর হইতে উত্তর-ভারতের অনেক স্থানেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান বসতিকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গাহড়বাল রাজ্যেও বোধ হয় এই ধরনের ছোট ছোট তুরুষ্ক কেন্দ্র ছিল। জয়চন্দ্রের পিতামহ গাহড়বাল-রাজ গোবিন্দচন্দ্রের লিপিতে তুরুষ্কদণ্ড নামে একপ্রকার

করের উল্লেখ আছে; এই সব কর বোধ হয় আদায় করা হইত গাহড়বাল রাজ্যান্তর্গত তুরুষ্ক-বাসিন্দাদের নিকট হইতে। মুহম্মদ বখ্‌ত্‌-ইয়ারের আক্রমণের আগেই উত্তর-ভারতের বিহার পর্যন্ত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুরুষ্ক-কেন্দ্র কিছু কিছু গড়িয়া উঠিয়াছিল তারনাথের বিবরণ হইতেও তাহার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কি এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুরুষ্ক কেন্দ্রের সঙ্গেই বখ্‌ত্‌-ইয়ারের যোগসাধন করিয়া দিয়াছিলেন? উত্তর-পূর্ব ভারতের এই উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা কি লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার উপদেষ্টা ও মন্ত্রীবর্গ জানিতেন না? বোধ হয় জানিতেন, কিন্তু প্রতিকারের অর্থাৎ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এই নিম্নগামী প্রবাহকে রোধ করিবার মতন সাহস ও শক্তি, বুদ্ধি ও চরিত্র, দৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি কাহারও ছিল না—না সেন-রাজসভায়, না বৃহত্তর সমাজে। সকলেই যেন অনিবার্য গড্ডালিকা প্রবাহে গা' ভাসাইয়া দিয়াছিলেন!

একদিকে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ যখন মুসলমানদের করতলগত, উত্তর-পাশ্চেয় ভারতে অর্থাৎ বর্তমান যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে যখন রাষ্ট্রীয় অবস্থা প্রায় নৈরাজ্য বলিলেই চলে, তখন বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজ ভেদবুদ্ধিদ্বারা আচ্ছন্ন, স্তরে উপস্তরে দুর্লঙ্ঘ্য সীমায় বিভক্ত; রাজসভা চরিত্র ও আত্মশক্তিহীন; ধর্ম ও সমাজ বিলাসলালসায় ও যৌনাতিশয্যে পীড়িত; শিল্প ও সাহিত্য বস্তুসম্বন্ধবিচ্যুত ভাবকল্পনার জগতে পল্লবিত বাক্য, উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তি, আলঙ্কারিক আতিশয্য এবং দেহগত লীলাবিলাসে ভারগ্রস্ত ও মদির; জনসাধারণের দেহমন বৌদ্ধ বজ্রযান-সহজযান প্রভৃতির এবং তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য-ডাকিনী-যোগিনীদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড তুকতাকে পঙ্গু; উচ্চতর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে আড়ষ্ট! রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির চিত্র সম্পূর্ণ; উভয়ই চরিত্রে ও আত্মশক্তিতে দুর্বল ও দৈন্যপীড়িত। এই দুর্বল ও দৈন্যপীড়িত রাষ্ট্র ও সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এবং সমাজ-প্রকৃতির নিয়মে পরবর্তীকালে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া দেশ তাহার মূল্য দিয়া যাইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়! বখ্‌ত্‌-ইয়ারের নবদ্বীপ-জয় এবং এক শত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়, ভাগ্যের পরিহাসও নয়—রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির দুর্নিবার্য পরিণাম!

মুসলমান অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্বের ভারতীয় বুদ্ধি ও সংস্কৃতির অবস্থার কথা বলিতে গিয়া প্রসিদ্ধ উর্দুভাষী মুসলমান কবি হালি বলিয়াছেন:

"ইধর্ হিন্দ্ মেঁ হরতরফ অন্ধেরা।
কি থা গিয়ান গুণকা লড়াইয়াঁসে ভরা।"

বাস্তবিকই হিন্দুস্থানে তখন চারিদিকে অন্ধকার!!

সংস্কৃতি

একাদশ অধ্যায়

দৈনন্দিন জীবন

১

দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন, আমাদের প্রতিদিনের অশন-বসন, বিলাস-ব্যসন, চলন-বলন, আমোদ উৎসব, খেলাধূলা প্রভৃতি যে আমাদের মনন ও কল্পনা, অভ্যাস ও সংস্কারকে ব্যক্ত করে, অর্থাৎ এ-গুলি যে আমাদের মানস-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে, এ-সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন নয়। কিন্তু কোনো দেশকালবদ্ধ নরনারীর মনন-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি শুধু ধর্মকর্ম-শিল্পকলা-জ্ঞানবিজ্ঞানেই আবদ্ধ নয়, এবং ইহাদের মধ্যে শেষও নয়; জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ও ব্যবহারে, শীলাচরণ ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনচর্যার মধ্যেও তাহা ব্যক্ত হয়। চর্চা যেমন সংস্কৃতির লক্ষণ, চর্যা বা আচরণও তাহাই; বরং এক হিসাবে চর্যা বা আচরণই চর্চাকে সার্থকতা দান করে, এবং উভয়ে মিলিয়া সংস্কৃতি গড়িয়া তোলে। চর্যার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। জীবনের এমন কোনো দিক বা ক্ষেত্র নাই যেখানে মানুষ মনন-কল্পনা বা ধ্যান-ধারণালব্ধ গভীর সত্য ও সৌন্দর্যকে জীবনের আচরণে ফুটাইয়া তুলিতে না পারে। দৈনন্দিন জীবনাচরণের ভিতর দিয়া এই সত্য ও সৌন্দর্যকে প্রকাশ করাই তো সংস্কৃতির মৌলিক বিকাশ। দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক দিকটায় এই আচরণ যতটুকু প্রকাশ পায় তাহার সবটুকুই সেই হেতু মানুষের মানস-সংস্কৃতিরই পরিচয়, এবং বোধ হয় তাহার মৌলিক পরিচয়ও বটে।

যুক্তি

প্রাচীন বাংলার মানস-সংস্কৃতির কথা বলিতে বসিয়া সেইজন্য দৈনন্দিন জীবনচর্যার কথাই সর্বাগ্রে বলিতেছি। কিন্তু, এই দৈনন্দিন জীবনের চলমান জীবন্তরূপ ফুটাইয়া তুলিবার উপায় তথ্যগত ইতিহাস-রচনায় নাই। সেই চলমান মানবপ্রবাহের জীবন্তরূপ সমসাময়িক কোনো সাহিত্যে কেহ ধরিয়া রাখেন নাই; অন্তত তেমন উপাদান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। তবু, তথ্যগত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া আধুনিক সাহিত্য-রচয়িতারা সেদিকে কিছু কিছু সার্থক চেষ্টা করিয়াছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস শশাঙ্ক ও ধর্মপাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বেণের মেয়ে সে-চেষ্টার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু ঔপন্যাসিকের যে সুবিধা ঐতিহাসিকের তাহা নাই। কাজেই সে-চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। আমি এই অধ্যায়ে দৈনন্দিন জীবনচর্যার যে-সব দিক ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সংবাদ বর্তমান শুধু সেই সব দিক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করিতেছি। কালক্রমানুযায়ী সবিস্তারে বলিবার মত যথেষ্ট উপাদান আমাদের নাই;

আহার-বিহার, বসন-ভূষণ, খেলাধূলা, আমোদ-উৎসব প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য শুধু বর্তমান। বিশেষ ভাবে এ-সব সংবাদ বহন করিবার জন্য কোনো গ্রন্থ সমসাময়িক কালে কেহ রচনা করেন নাই; অন্তত এ-যাবৎ আমরা জানিনা। এমন কাব্য বা কাহিনীও কিছু নাই যেখানে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুসংবদ্ধ এবং সমগ্র পরিচয় কিছু পাওয়া যায়। স্পষ্টতই, যে-সব তথ্য আমরা পাইতেছি তাহা সমস্তই প্রায় পরোক্ষ, অর্থাৎ অন্য প্রসঙ্গের আশ্রয়ে যতটুকু উল্লিখিত ততটুকুই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি, আমাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক দৈনন্দিন জীবনের মূল অষ্ট্রিক ও দ্রবিড় ভাষাভাষী আদি কৌমসমাজের মধ্যে। সেই হেতু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাচীনতম আভাস এই দুই ভাষার এমন সব শব্দের মধ্যে পাওয়া যাইবে যে-সব শব্দ ও শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তু আজও আমাদের মধ্যে কোনো না কোনো রূপে বর্তমান। এই ধরনের কিছু কিছু শব্দের আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে। আমাদের আহার-বিহার, বসন-ভূষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত এই সুদীর্ঘ শব্দেতিহাসের মধ্যে পাওয়া যাইবে। এই হিসাবে এই শব্দগুলিই আমাদের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উপাদান এবং নির্ভরযোগ্য উপাদানও বটে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন-সাহিত্যেও কিছু পরোক্ষ উপাদান পাওয়া যায়, কিন্তু দুই একটি বিষয়ে ছাড়া এই সব উপাদান কতটা বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র জাতীয় গ্রন্থেও কিছু কিছু সংবাদ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; শেষোক্ত গ্রন্থটির সংবাদ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর, বিশেষ ভাবে বিলাস-ব্যসন ও কামচর্চা সম্বন্ধে, এবং বাংলার নাগর-সভ্যতার প্রথম নির্ভরযোগ্য জীবনতথ্য এই গ্রন্থেই জানা যায়। এই দুইটি গ্রন্থ ছাড়া গুপ্তপূর্ব ও গুপ্ত-পর্বের বাংলার দৈনন্দিন জীবনের কোনো খবর আর কোথাও দেখিতেছি না।

উপাদান

গুপ্ত-পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত অসংখ্য লিপিমালায় আমাদের আহার্য ও পরিধেয়, বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরে সাংসারিক জীবনের মান, সাংসারিক আদর্শ সম্বন্ধে টুক্‌রা-টাক্‌রো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংবাদ একেবারে দুর্লভ নয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় সমসাময়িক প্রস্তর ও ধাতব দেবদেবীর মূর্তিগুলিতে এবং পোড়ামাটির অসংখ্য ফলকে, বিশেষভাবে শেষোক্ত উপাদান সমূহে। দেবদেবীর মূর্তিগুলি প্রায় সমস্তই প্রতিমা-লক্ষণ শাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত; সেইহেতু দেবদেবীদের বেশভূষা, অলংকরণ, দেহসজ্জা প্রভৃতিতে জীবনের যে-চিত্র দৃষ্টিগোচর তাহা কতকটা আদর্শগত, ভাবমূলক ও প্রথাবদ্ধ মনন-কল্পনা দ্বারা রঞ্জিত ও প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু পাহাড়পুরের অথবা ময়নামতীর বিহার-মন্দির-গাত্রের অগণিত পোড়ামাটির ফলকগুলি সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলে না। এই ফলকগুলিতে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা তাহার অকৃত্রিম সারল্য ও বস্তুময়তায় প্রতিফলিত; যে-সব দিক সম্বন্ধে অন্যত্র কোনো সংবাদই প্রায় পাওয়া যায় না, লোকায়ত জীবনের সে-সবদিকের নানা ছোট বড় তথ্য একমাত্র

ইহাদের মধ্যেই দীপ্যমান। ফলকগুলির লোকায়ত শিল্পই সমসাময়িক লোকায়ত জীবনের ইঙ্গিত আমাদের দুয়ারে বহন করিয়া আনিয়াছে। গ্রাম্য কৃষিজীবী সমাজের জীবনযাত্রার এমন সুস্পষ্ট ছবি আর কোথাও পাইবার উপায় নাই।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের কিছু কিছু খবর বাংলার সুদীর্ঘ লিপিমালায়ও পাওয়া যায়। আহার-বিহার, বসন-ভূষণ এবং গ্রাম্য ও নগর-জীবন সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন তথ্য ইহাদের মধ্য হইতে আহরণ করা হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু সে-সব তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা কবি-কল্পনায়, নানা আলংকারিক অত্যুক্তিতে আচ্ছন্ন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো বহু অভ্যস্ত এবং সুপরিচিত রীতিপালন মাত্র, হয়তো যথার্থ বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ শিথিল, অথবা একেবারেই নাই। বসন-ভূষণ এবং সাধারণ সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য অসংখ্য প্রস্তর ও ধাতব প্রতিমা-প্রমাণ হইতেও আহরণ করা সম্ভব, কিন্তু সে-সব তথ্য দৈনন্দিন ব্যবহারিক সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে কতটা প্রযোজ্য নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন।

সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং বিস্তৃত খবর পাওয়া যায় সমসাময়িক সংস্কৃত ও প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যে। বাংলার সুবিস্তৃত স্মৃতি-সাহিত্য, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, চর্যাগীতিমালা, দোহাকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত-ধৃত কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন শ্লোক, প্রাকৃতপৈঙ্গলের কিছু কিছু শ্লোক, রামচরিত ও পবনদূতের মতন কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে সমসাময়িক বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের নানা তথ্য নানা উপলক্ষে ধরা পড়িয়াছে। কোনো সুসংবদ্ধ নিয়মিত বিবরণ কিছু নাই, কোনো বিশেষ দিক সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ চিত্রও নাই; তবু এই সব গ্রন্থের ইতস্তত উল্লিখিত তথ্যাদি একত্র করিলে মোটামুটি একটা ছবি ধরিতে পারা হয়তো খুব কঠিন নয়। সন্তোক্ত সমস্ত গ্রন্থেরই দেশকাল মোটামুটি সুনির্ধারিত, অর্থাৎ ইহাদের অধিকাংশই বাংলাদেশে, এবং দশম হইতে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে রচিত। শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার বাঙালীত্ব সর্বজনগ্রাহ্য নয়। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এই গ্রন্থ নয়, তবে নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার বাঙালীত্বের যে-সব যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে নৈষধচরিতের বিবরণ বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। বিবাহ ও আহার-বিহার সম্বন্ধে কিছু কিছু রীতি-নিয়ম, কোনো কোনো তথ্য যেন বাংলাদেশ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। ভারতের অন্যত্র এ-সবের প্রচলন থাকিলেও শ্রীহর্ষ যে-ভাবে বর্ণনা দিতেছেন তাহাতে তো মনে হয়, তিনি বাঙালী হউন বা না হউন, এমন দেশখণ্ডের কথাই তিনি বলিতেছেন যেখানে এই সব রীতি, আচার, অভ্যাস ও সংস্কারের বহুল প্রচার বিদ্যমান, এবং সেই দেশখণ্ড হইতেছে বাংলাদেশ।

অন্যান্য অধ্যায়ের মত এ-অধ্যায়ে কালপর্বানুযায়ী তথ্য সন্নিবেশ করিয়া ধারাবাহিক একটা বর্ণনা দাঁড় করানো কঠিন; তথ্যই অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন এবং তাহাও

অধিকাংশই দশম শতকপরবর্তী কালের ; কিছু কিছু অবশ্য পূর্ববর্তী কালেরও সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ববর্তী বা পরবর্তীই হোক, এই অধ্যায়ের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র মোটামুটিভাবে প্রাচীন বাংলা সম্বন্ধে প্রযোজ্য, একথা বলিলে অন্যায় বলা হয় না। সুদীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া গ্রাম্য জীবনযাত্রার এমন পরিবর্তন কিছু হয় নাই।

২

মধ্যযুগীয় সুবিস্তৃত বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর আহার্য ও পানীয় সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় এবং তাহার মধ্যে রুচি ও রসনার যে সূক্ষ্ম বোধ সুস্পষ্ট, রন্ধনকলার যে সূক্ষ্ম ও জটিল পরিচয় বিদ্যমান, আদিপর্বের সংক্ষিপ্ত উপাদানের মধ্যে কোথাও সে-পরিচয় ধরা পড়ে নাই। এ-পর্বে জীবনের এই দিকটায় বাঙালীর বুদ্ধি ও কল্পনা প্রসারিত হয় নাই, প্রমাণের অভাবে সে-কথা জোর করিয়া বলা যায় না, তবে সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুপস্থিত, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। সমস্ত সংবাদই পরোক্ষ এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

ইতিহাসের উষাকাল হইতেই ধান্য যে-দেশের প্রথম ও প্রধান উৎপন্ন বস্তু, সে-দেশে প্রধান খাদ্যই হইবে ভাত তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। ভাত-ভক্ষণের এই অভ্যাস ও সংস্কার অষ্ট্রিক্ ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান।

আহার-বিহার

উচ্চকোটির লোক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম কোটির লোক পর্যন্ত সকলেরই প্রধান ভোজ্যবস্তু ভাত, এবং 'হাড়িত ভাত নাহি, নিতি আবেশী', ইহাই বাঙালী জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ! ভাত রাঁধার প্রক্রিয়ার তারতম্য তো ছিলই, কিন্তু তাহার সাক্ষ্যপ্রমাণ নাই বলিলেই চলে। উচ্চকোটির বিবাহভোজে যে-অন্ন পরিবেশন করা হইত সে-অন্নের কিছু বিবরণ নৈষধচরিতে দময়ন্তীর বিবাহভোজের বর্ণনায় পাওয়া যায়। গরম ধূমায়িত ভাত ঘৃত সহযোগে ভক্ষণ করাটাই ছিল বোধ হয় সাধারণ রীতি। প্রাকৃতপৈঙ্গল-গ্রন্থেও (চতুর্দশ শতকের শেষাশেষি ?) প্রাকৃত বাঙালীর আহার্য দেখিতেছি কলাপাতায়, 'ওগ্‌গরা ভত্তা গাইক ঘিত্তা', গো-ঘৃত সহকারে সফেন গরম ভাত। নৈষধচরিতের বর্ণনা বিস্তৃততর : পরিবেশিত অন্ন হইতে ধূম উঠিতেছে, তাহার প্রত্যেকটি কণা অভগ্ন, একটি হইতে আর একটি বিচ্ছিন্ন (ঝর্‌ঝরে ভাত), সে-অন্ন সুসিদ্ধ, সুস্বাদু ও শুভ্রবর্ণ, সরু এবং সৌরভময় (১৬।৬৮)। দুগ্ধ ও অন্নপক্ক পায়সও উচ্চকোটির লোকদের এবং সামাজিক ভোজে অন্যতম প্রিয় ভক্ষ্য ছিল (১৬।৭০)।

ভাত সাধারণত খাওয়া হইত শাক ও অন্যান্য ব্যঞ্জন সহযোগে। দরিদ্র এবং গ্রাম্য লোকদের প্রধান উপাদানই ছিল বোধ হয় শাক ও অন্যান্য সব্জী তরকারী। ডাল

প্রাকৃত বাঙালীর খাদ্য

খাওয়ার কোনো উল্লেখই কিন্তু কোথাও দেখিতেছি না। উৎপন্ন দ্রব্যাদির সুদীর্ঘ তালিকায়ও ডালের বা কোনো কলাইর উল্লেখ কোথাও যেন নাই। নানা শাকের মধ্যে নালিতা (পাট) শাকের উল্লেখ প্রাকৃত

পৈঙ্গলে দেখিতেছি। বস্তুত, এই গ্রন্থের প্রাকৃত বাঙালীর খাদ্য-তালিকাটি উল্লেখ যোগ্য :

ওগ্‌গরা ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুদ্ধ সজুত্তা
মোইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা দিজ্জই কান্তা খা(ই) পুনবন্তা।

কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল এবং নালিতা শাক যে-স্ত্রী নিত্য পরিবেশন করিতে পারেন তাঁহার স্বামী পুণ্যবান, এ-সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি! কিন্তু সামাজিক ভোজে, বিশেষত বিবাহভোজে বরযাত্রীরা শাকসব্জীর তরকারী পছন্দ করিতেন না। দময়ন্তীর বিবাহভোজে সবুজবর্ণ পাত্রে ভাত-তরকারী পরিবেশন করা হইয়াছিল; বরযাত্রীরা মনে করিলেন বুঝি বা শাকায় পরিবেশন করা হইয়াছে; একটু বিরক্তির ভাবই প্রকাশ করিলেন দেখিয়া কন্যাপক্ষীয়েরা বলিলেন, আপনাদের শাক পরিবেশন করা হয় নাই, পাত্রটির বর্ণ সবুজ বলিয়াই অন্নব্যঞ্জন সবুজ দেখাইতেছে। এই বিবাহভোজে যে-সব ব্যঞ্জন পরিবেশন করা হইয়াছিল তাহাতে দেখা যাইতেছে, ব্যঞ্জন তরকারী প্রভৃতির বাহুল্য সেই যুগেও উচ্চকোটির বাঙ্গালী সমাজে যথেষ্টই ছিল, এবং এত বেশি আয়োজন হইত যে, লোকেরা সব খাইয়া, এমন কি গণনাও করিয়া উঠিতে পারিত না। এই ধরনের বৃহৎ ভোজে সামাজিক অপচয়ের কথা ই-ৎসিঙ্‌ও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কবি শ্রীহর্ষের কালে এবং আজও দেখিতেছি, বাংলা দেশে তাহা অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। যে-সব ব্যঞ্জনাদি এই বিবাহভোজে পরিবেশিত হইয়াছিল তাহা তালিকাগত করা যাইতে পারে; দই ও রাই সরিষার প্রস্তুত শ্বেতবর্ণ কিন্তু বেশ ঝালযুক্ত কোনো ব্যঞ্জন (খাইতে খাইতে লোকদের মাথা ঝাঁকিতে এবং তালু চাপড়াইতে হইয়াছিল); হরিণ, ছাগ এবং পক্ষী মাংসের নানা রকমের ব্যঞ্জন; মাংসের নয় কিন্তু দৃশ্যত মাংসোপম, বিবিধ উপাদানযুক্ত কোনো ব্যঞ্জন; মাছের ব্যঞ্জন এবং অন্যান্য আরো নানা প্রকারের সুগন্ধি ও প্রচুর মসলাযুক্ত ব্যঞ্জনাদি, নানা প্রকারের সুমিষ্ট পিষ্টক এবং দই ইত্যাদি। পানীয় পরিবেশিত হইয়াছিল কর্পূরমিশ্রিত সুগন্ধি জল। ভোজের পর দেওয়া হইয়াছিল নানা মসলাযুক্ত পানের খিলি। অবান্তর হইলেও একটি অনুমানগত তথ্যের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে। সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলিতে এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-ভারতে লোকায়ত স্তরে পান পরিবেশনের রীতি হইতেছে পান, সুপারী এবং অন্যান্য মসলা পৃথক পৃথক ভাবে সাজাইয়া দেওয়া। পূজা-পার্বণেও তাহাই প্রচলিত রীতি; আদিবাসী কৌমসমাজের রীতিও তাহাই। পান খিলি করিয়া পরিবেশন করা বোধ হয় পরবর্তী আর্য-ভারতীয় রীতি এবং উচ্চকোটি লোকস্তরে ক্রমশ সেই রীতিই প্রবর্তিত হয়। বৌদ্ধ গান ও দোহায় দেখিতেছি পানের সঙ্গে মসলা হিসাবে কর্পূর ব্যবহার করা হইত।

বিবাহভোজ

দই, পায়স, ক্ষীর প্রভৃতি দুগ্ধজাত নানাপ্রকারের খাদ্যের উল্লেখ একাধিক ক্ষেত্রে

পাইতেছি। এ-গুলি চিরকালই বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। ভবদেব-ভট্টের প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ-গ্রন্থে নানাপ্রকারের দুগ্ধপান সম্বন্ধে কিছু কিছু বিধিনিষেধ আছে, কিন্তু তাহা সমস্তই স্বাস্থ্যগত কারণে।

মাংসের মধ্যে হরিণের মাংস খুবই প্রিয় ছিল, বিশেষ ভাবে শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি শীকারজীবী লোকদের মধ্যে এবং সমাজের অভিজাত স্তরে। ছাগ মাংসও বহুল প্রচলিত ছিল সমাজের সকল স্তরেই। কোনো কোনো প্রান্তে ও লোকস্তরে, বিশেষভাবে আদিবাসী কৌমে বোধ হয় শুক্‌নো মাংস খাওয়াও প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভবদেব-ভট্ট কোনো কারণেই এবং কোনো অবস্থাতেই শুক্‌নো মাংস খাওয়া অনুমোদন করেন নাই, বরং নিষিদ্ধই বলিয়াছেন। কিন্তু মাছই হোক আর মাংসই হোক্, অথবা নিরামিষই হোক্, বাঙ্গালীর রান্নার প্রক্রিয়া যে ছিল জটিল এবং নানা উপাদানবহুল তাহা নৈষধচরিতের ভোজের বিবরণেই সুস্পষ্ট।

বারিবহুল, নদনদী-খালবিল বহুল, প্রশান্ত-সভ্যতাপ্রভাবিত এবং আদি-অষ্ট্রেলীয়মূল বাংলায় মৎস্য অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তু রূপে পরিগণিত হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, পূর্বদক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ ও প্রশান্ত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিদের আহার্য তালিকার দিকে তাকাইলেই বুঝা যায়, বাংলাদেশ এই হিসাবে কোন্ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সর্বত্রই এই তালিকায় ভাত ও মাছই প্রধান খাদ্যবস্তু। বাংলাদেশের এই মৎস্যপ্রীতি আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি কোনোদিনই প্রীতির চক্ষে দেখিত না, আজও দেখে না; অবজ্ঞার দৃষ্টিটাই বরং সুস্পষ্ট। মাংসের প্রতিও বাঙ্গালীর বিরাগ কোনোদিনই ছিলনা, কিন্তু আর্য-ভারতে ছিল; বিশেষভাবে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক হইতেই খাদ্যের জন্য প্রাণীহত্যার প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্মে, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে তো বটেই, একটা নৈতিক আপত্তি ক্রমশ দানা বাঁধিতেছিল এবং আর্য-ব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষ ক্রমশ নিরামিষ আহার্যের প্রতিই পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিল। বাংলাদেশেও এই প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু, চিরাচরিত এবং বহু অভ্যস্ত প্রথার বিরুদ্ধে তাহা যথেষ্ট কার্যকরী হইতে পারে নাই। বাংলার অন্যতম প্রথম ও প্রধান স্মৃতিকার ভট্ট ভবদেব সুদীর্ঘ যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিয়া বাঙালীর এই অভ্যাস সমর্থন করিয়াছেন। মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-ব্যাস-ছাগলের প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিকারদের মতামত উদ্ধার করিয়া ভবদেব বলিতেছেন, ইহাদের নিষেধবাক্য তো শুধু চতুর্দশী তিথি বা এই ধরনের বিশেষ বিশেষ বার বা তিথি উপলক্ষে প্রযোজ্য, কাজেই মাছ বা মাংস খাওয়ায় কোনো দোষ স্পর্শেনা। বস্তুত, মাংস ও মৎস্য আহার বাংলাদেশে এত সুপ্রচলিত ও গভীরাভ্যস্ত যে, এই সমর্থন ছাড়া ভবদেবের আর কোনো উপায় ছিল না। বাংলার অন্যতম স্মৃতিকার শ্রীনাথাচার্যও তাহাই করিয়াছেন; বিষ্ণুপুরাণ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কয়েকটি পর্বদিবস ছাড়া আর কোনো

মৎস্য ও মাংস আহার

দিনেই মৎস্য বা মাংস আহার গর্হিত কাজ কিছু নয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে রোহিত, শফর (পুঁটি বা শফরী মাছ), সকুল (সোল) এবং শ্বেতবর্ণ ও আঁশযুক্ত অন্যান্য মৎস্য ব্রাহ্মণদের ভক্ষ্য। প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল বা চর্বির তালিকা দিতে গিয়া জীমূতবাহন ইল্লিস (ইলিস বা ইল্‌সা) মাছের তৈলের উল্লেখ ও বহুল ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন। মনে হয়, আজিকার দিনের মত প্রাচীনকালেও ইলিস মাছ বাঙালীর অন্যতম প্রিয় খাদ্য ছিল এবং ইলিশের তৈল নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত। সব মাছ কিন্তু ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য ছিল না; যে সব মাছ গর্তে কাদায় বাস করে, যাহাদের মুখ ও মাথা সাপের মত (যেমন, বাণ মাছ), কদাকৃতি যাহাদের চেহারা, যাহাদের আঁস নাই সে-সব মাছ ব্রাহ্মণের পক্ষে খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পচা ও শুকনো মাছ খাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু টীকাসর্বস্ব-গ্রন্থের লেখক সর্বানন্দ বলিতেছেন, বঙ্গালদেশের লোকেরা সিহুলী বা শুকনো মাছ খাইতে ভালবাসিত (যত্র বঙ্গালবচ্চারণাং প্রীতিঃ)। এখনও তো তাহাই। শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, সারস-বক, হাঁস, দাত্যূহ পক্ষী, উট, গরু, শূকর প্রভৃতির মাংস একেবারেই ছিল অভক্ষ্য, অন্তত ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাসিত সমাজে। তবে, সন্দেহ নাই, নিম্নতর সমাজস্তরে এবং আদিবাসী কৌমের লোকদের মধ্যে আজিকার মতই শামুক, কাঁকড়া, মোরগ প্রভৃতির মাংস, নানাপ্রকারের আঁস ছাড়া মাছ, সর্পাকৃতি বাণ মাছ, গর্তকাদাবাসী নানাপ্রকারের অকুলীন মৎস্য, নানাপ্রকারের পক্ষীমাংস সমস্তই ভক্ষ্য ছিল। পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে গোধা, শশক, সজারু এবং কচ্ছপ খাওয়ার খুব বাধানিষেধ কাহারো পক্ষে কিছু ছিল না, এ-কথা ভবদেব নিজেই বলিতেছেন তাঁহার প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-গ্রন্থে। বাঙ্গালীর মৎস্য প্রীতির পরিচয় পাহাড়পুর এবং ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে কিছু কিছু পাওয়া যায়; মাছ কোটা এবং ঝুড়িতে ভরিয়া মাছ হাটে লইয়া যাওয়ার দু'টি অতি বাস্তবচিত্র কয়েকটি ফলকেই উৎকীর্ণ। শবর পুরুষ হরিণ শীকার করিয়া কাঁধে ফেলিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেছে সে-চিত্রও বিদ্যমান। শবর, পুলিন্দ, নিষাদ জাতীয় ব্যাধদের প্রধান বৃত্তিই তো ছিল হরিণ ও অন্যান্য পশুপক্ষী শীকার। হরিণ-শীকারের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে একাধিক চর্যাগীতে। একটি গীতে চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত ভীত সন্ত্রস্ত হরিণের যে বর্ণনা আছে অবান্তর হইলেও তাহা উদ্ধারের লোভ সংবরণ করা কঠিন।

হরিণ শীকার ও হরিণ মাংস আহার

তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলয় না জাণী॥
হরিণী বোলঅ সুন হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো॥
তরংগতে হরিণার খুর ন দীসই।
ভুসুকু ভণই মূঢ় হিঅহি ন পইসই॥

(ভয়ে) হরিণ তৃণ ছোঁয় না, জল খায় না ; হরিণ জানেনা হরিণীর ঠিকানা। হরিণী (আসিয়া) বলে, শোন হরিণ, এ-বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইয়া (চলিয়া) যাও। তীরগতিতে ধাবমান হরিণের খুর দেখা যায় না ; ভুসুকু বলেন, মূঢ়ের হৃদয়ে একথা প্রবেশ করে না।

জালের সাহায্যেও হরিণ ধরা হইত, এই ধরনের ইঙ্গিত আছে ভুসুকুরই আর একটি গীতিতে। তরঙ্গসংকুল মাঝনদীতে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিবার ইঙ্গিতও আছে একটি চর্যাগীতে। কাহ্নুপাদ বলিতেছেন,

> তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।
> মাঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ ॥
> পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়ুয়াল।
> বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মায়াজাল ॥

যে-সব উদ্ভিদ্ তরকারী আজও আমরা ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই, যেমন বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গে, কাঁকরুল, কচু (কন্দ) প্রভৃতি আদি-অষ্ট্রেলীয় অষ্ট্রিক্ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দান। এ-সব তরকারী বাঙালী খুব সুপ্রাচীন কাল হইতেই ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে এই অনুমান অনৈতিহাসিক নয়। পরবর্তী কালে, বিশেষভাবে মধ্যযুগে, পর্তুগীজদের চেষ্টায় এবং অন্যান্য নানাসূত্রে নানা তরকারী, যেমন আলু, আমাদের খাদ্যের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আদিপর্বে তাহাদের অস্তিত্ব ছিলনা। নানাপ্রকারের শাক খাওয়ার অভ্যাসও বাঙ্গালীর সুপ্রাচীন।

তরকারী

ফলের মধ্যে কলা, তাল, আম, কাঁঠাল, নারিকেল ও ইক্ষুর উল্লেখই পাইতেছি বারবার। আম ও কাঁঠালের উল্লেখ তো লিপিমালায় সুপ্রচুর। কলা আদি-অষ্ট্রেলীয় অষ্ট্রিক্ ভাষাভাষী লোকদের দান ; প্রাচীন বাংলার চিত্রে ও ভাস্কর্যে কদলীভারাবনত কলাগাছের বাস্তব চিত্র সুপ্রচুর। পূজা, বিবাহ, মঙ্গলযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কলাগাছের ব্যবহার সমসাময়িক সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইক্ষুর রস আজিকার মত তখনও পানীয় হিসাবে সমাদৃত ছিল ; ইক্ষু রস জাল দিয়া একপ্রকার গুড় (এবং বোধ হয় শর্করাখণ্ড জাতীয় একপ্রকার 'খণ্ড' চিনিও) প্রস্তুত হইত। হেমন্তে নূতন গুড়ের গন্ধে আমোদিত বাংলার গ্রামের বর্ণনা সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে দীপ্যমান। অন্যত্র এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছি। তেঁতুলের উল্লেখ আছে একটি চর্যাগীতিতে।

কলা

কালবিবেক ও কৃত্যতত্ত্বার্ণব-গ্রন্থে আশ্বিন মাসে কোজাগর পূর্ণিমা রাত্রে আত্মীয় বান্ধবদের চিপিটক বা চিড়া এবং নারিকেলের প্রস্তুত নানাপ্রকারের সন্দেশে পরিতৃপ্ত করিতে হইত, এবং সমস্ত রাত বিনিদ্র কাটিত পাশা খেলায়। খৈ-মুড়ি (লাজ) খাওয়ার রীতিও বোধ হয় তখন হইতেই প্রচলিত ছিল ; খৈ বা লাজ যে অজ্ঞাত ছিলনা তাহার প্রমাণ বিবাহোৎসবে সুপ্রচুর খৈ-বর্ষণের বর্ণনায় এবং লাজহোমের অনুষ্ঠানে।

দুধ, নারিকেলের জল, ইক্ষুরস, তালরস ছাড়া মদ্য জাতীয় নানাপ্রকারের পানীয় প্রাচীন বাংলায় সুপ্রচলিত ছিল। গুড় হইতে প্রস্তুত সর্বপ্রকার গৌড়ীয় মদ্যের খ্যাতি ছিল সর্বভারতব্যাপী। ভাত, গম, গুড়, মধু, ইক্ষু ও তালরস প্রভৃতি গাঁজাইয়া নানাপ্রকারের মদ্য প্রস্তুত হইত। ভবদেব-ভট্ট তাঁহার প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-গ্রন্থে নানাপ্রকার মদ্য-পানীয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজ ও দ্বিজেতর সকলের পক্ষেই মদ্যপান নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাঁহার এই স্মৃতি-নির্দেশ কতটা মানিয়া চলিত, বলা কঠিন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখিতেছি, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কালে স্বর্ণ, মদ্য, রক্ত, মৎস্য ও মাংস উপাচারে এবং নরবলি সহকারে ব্রাহ্মণের পক্ষে শিবপূজা নিষিদ্ধ। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, শিবপূজা পক্ষে এই নিষেধ প্রযোজ্য হইলেও শক্তিপূজায় এই সব উপাচার ও নরবলি নিষিদ্ধ ছিলনা, আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ কাল ছাড়া অন্য সময়ে কোনো পূজায়ই তেমন নিষেধ কিছু ছিলনা। চর্যাগীতির একাধিক গীতিতে যে-ভাবে শৌণ্ডিকালয় বা শুঁড়িখানার উল্লেখ পাইতেছি, মনে হয়, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ভিতর মদ্যপান খুব গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত না। শৌণ্ডিকালয়ে বসিয়া শৌণ্ডিক বা শুঁড়ির স্ত্রী মদ্য বিক্রয় করিতেন, এবং ক্রেতারা সেইখানে বসিয়াই তাহা পান করিতেন। শুঁড়িখানার দরজায় বোধ হয় একটা কিছু চিহ্ন আঁকা থাকিত, এবং মদ্যাভিলাষীরা সেই চিহ্ন দেখিয়াই গন্তব্য স্থানটি চিনিয়া লইতেন! এক জাতীয় গাছের সরু বাকল (অন্যমতে, শিকড়) শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া তাহা দ্বারা মদ চোলাই করা হইত। বেলের খোলা করিয়া মদ্য পানের উল্লেখ আছে সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে; চর্যাগীতিতে দেখিতেছি, মদ্য ঢালা হইত ঘড়ায় ঘড়ায়। বিরুবাপাদ বলিতেছেন,

পানীয়
মদ্যপান

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅন বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥
* * *
দশমী দুআরত চিহ্ন দেখিআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ॥
চউশটি ঘড়িয়ে দেল পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা॥
এক সে ঘড়লী সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল॥

এক শুঁড়িনী দুই ঘরে সান্ধে (ঢোকে), সে চিকণ বাকল দ্বারা বারুণী (মদ) বাঁধে। শুঁড়ির ঘরের চিহ্ন (আছে) দুয়ারেই। সেই চিহ্ন দেখিয়া গ্রাহক নিজেই চলিয়া আসে। চৌষট্টি ঘড়ায় মদ ঢালা হইয়াছে; গ্রাহক যে ঘরে ঢুকিল তাহার আর সাড়াশব্দ কিছু নাই (মদের নেশায় এমনই বিভোর)। সরু নালে একটি ঘড়ায় মদ ঢালা হইতেছে—বিরুপা সাবধান করিতেছেন, সরু নল দিয়া চাল স্থির করিয়া বারুণী ঢাল।

আগেই বলিয়াছি, প্রাচীন বাঙালীর খাদ্য তালিকায় ডালের উল্লেখ কোথাও

দেখিতেছি না। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। বাংলা, আসাম ও ওড়িষ্যায় যত ডাল আজও ব্যবহৃত হয়—এ-ব্যবহার ক্রমশ বাড়িতেছে সমাজের সকল স্তরেই—তাহার খুব স্বল্পাংশই এই তিন প্রদেশে জন্মায়। পূর্বেও তাহাই ছিল; বোধ হয় উৎপাদন আরও কম ছিল। পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ায়, প্রশান্ত মহাসাগরের দেশ ও দ্বীপগুলিতে আজও ডালের ব্যবহার অত্যন্ত কম, নাই বলিলেই চলে। সেই জন্য ডালের চাষও নাই। বাংলা দেশের কোনো কোনো জেলায়, যেমন বরিশালে ও ফরিদপুরে, উচ্চকোটি লোকস্তরে বহু ক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ ও আমিষ ব্যঞ্জনাদি খাওয়ার পর সর্বশেষে ডাল খাওয়ার রীতি প্রচলিত। আর, নিম্নকোটি স্তরে বাংলার সর্বত্রই আজও অনেকে ডাল ব্যবহারই করেন না; প্রাচীন কালে বোধ হয় একেবারেই করিতেন না। আর সুলভ মৎস্যভোজীর পক্ষে তাহার প্রয়োজনও ছিল কম। বস্তুত, ডালের চাষ ও ডাল খাওয়ার রীতিটা বোধ হয় আর্য-ভারতের দান, এবং তাহা মধ্যযুগে।

প্রাচীন বাঙালী কি ডাল খাইত না?

এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, সুপ্রাচীন কাল হইতেই মৎস্যভোজী বাঙালীর আহার্য অবাঙালীদের রুচি ও রসনায় খুব শ্রদ্ধেয় ও প্রীতিকর ছিলনা; আজও নয়। তীর্থংকর মহাবীর যখন ধর্মপ্রচারোদ্দেশে শিষ্যদল লইয়া পথহীন রাঢ় ও বজ্রভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলেন তখন তাঁহাদের অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছিল। সন্দেহ নাই যে, সেই আদিবাসী কৌম-সমাজের মৎস্য ও শীকার মাংস ভক্ষণ, সমসাময়িক সাধারণ বাঙালীর উদ্ভিজ্জ ব্যঞ্জনাদি, এবং তাহাদের আদিম রন্ধন প্রণালী ভিন্ প্রদেশী জৈন আচার্যদের নিরামিষ রুচি ও রসনার অশ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিল। সে-অশ্রদ্ধা আজও বিদ্যমান!

রাজা-মহারাজ-সামন্ত-মহাসামন্ত প্রভৃতিদের প্রধান বিহারই ছিল শীকার বা মৃগয়া। আর, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি অরণ্যচারী কোমদের শীকারই ছিল প্রধান উপজীব্য ও বিহার দুইই। ইহাদের কিছু কিছু শীকারচিত্র পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ফলকগুলিতে দেখা যায়। এই ফলকগুলিতেই দেখিতেছি, কুস্তী বা মল্লযুদ্ধ এবং নানাপ্রকারের দুঃসাধ্য শারীর ক্রিয়া ছিল নিম্নকোটির লোকদের অন্যতম বিহার। পবনদূতে নারীদের জলক্রীড়া এবং উদ্যান-রচনার উল্লেখ আছে; এই দুইটিই বোধ হয় ছিল তাঁহাদের প্রধান শারীর-ক্রিয়া। দ্যূত বা পাশাখেলা এবং দাবা খেলার প্রচলন ছিল খুব বেশি। পাশা খেলাটা তো বিবাহোৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হইত। দাবা খেলার প্রচলন যে বাংলাদেশে কবে হইয়াছিল, বলা কঠিন; তবে চর্যাগীতিতে 'ঠাকুর' (অর্থাৎ 'রাজা'), 'মন্ত্রী', 'গজবর', এবং 'বড়ে', এই চারি গুটি, খেলার 'দান' এবং ছকের চৌষট্টি কোঠার বা ঘরের উল্লেখ এমন সহজভাবে পাইতেছি যে মনে হয়, দশম-একাদশ শতকের আগেই এই খেলা বাংলাদেশে সুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। কাহ্নুপাদ বলিতেছেন,

শীকার ও অন্যান্য শারীর-ক্রিয়া

গৃহক্রীড়া

করুণা পিহাড়ি খেলহু নঅবল।
সদ্গুরু-বোহেঁ জিতেল ভববল॥
ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।
উআরি উএসেঁ কাহ্ন নিঅড় জিনউর॥
পহিলেঁ তোড়িয়া বড়িআ মারিউ।
গঅবরেঁ তোড়িআ পাঞ্চজনা ঘালিউ।
মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা।
অবশ করিআ ভববল জিতা॥
ভণই কাহ্ন অম্হে ভাল দান দেহুঁ।
চউষট্‌ঠি কোঠা গুনিয়া লেহু।

করুণার পিড়িতে নববল (দাবা) খেলি, সদ্গুরুবোধে ভববল জিতিলাম। দুই নষ্ট হইল, ঠাকুরকে (রাজাকে) দিওনা; উপকারীর উপদেশে কাহ্নর নিকটে জিনপুর। প্রথমে বড়িয়া তুড়িয়া মারিলাম (অর্থাৎ, প্রথমেই হইল বড়ের চাল); তারপর গজবর (হাতী) তুলিয়া পাঁচজনকে ঘায়েল করিলাম। মন্ত্রীকে দিয়া ঠাকুরকে (রাজাকে) প্রতিনিবৃত্ত করিলাম (ঠেকাইলাম); অবশ করিয়া ভববল জিতিলাম। কাহ্ন বলে, দান আমি ভালই দিই, চৌষট্টি কোঠা গুনিয়া লই।

নিম্নকোটি স্তরে এবং নারীদের মধ্যে কড়ির সাহায্যে নানাপ্রকার খেলা, যথা, গুঁটি বা ঘুটিখেলা, বাঘবন্দী, ষোলঘর, দশপঁচিশ, আড়াইঘর, প্রভৃতি তখন হইতেই সুপ্রচলিত ছিল, এমন অনুমানে কিছু মাত্র বাধা নাই। সাংস্কৃতিক জনতত্ত্বের অনুসন্ধানে বহুদিন ধরা পড়িয়াছে যে, এই সমস্ত খেলা সমগ্র পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরবক্ষ দেশ ও দ্বীপগুলির সুপ্রাচীন কৌমসমাজের একেবারে মৌলিক গৃহক্রীড়া।

সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব-গ্রন্থ হইতে জানা যায়, 'অড্ঢ' বা 'আঢ' অর্থাৎ বাজি রাখিয়া তখনকার দিনের লোকেরা জুয়া খেলিতেও অভ্যস্ত ছিল। লোকেরা বাজি রাখিয়া ভেড়া ও মুরগীর লড়াই খেলিত ও খেলাইত।

সমতটেশ্বর শ্রীধারণ-রাতের কৈলান-লিপিতে বলা হইয়াছে, সতত হস্তী ও অশ্বক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকার ফলে শ্রীধারণের দেহ ছিল পেশীসমৃদ্ধ এবং সুদর্শন (গজতুরগ-সতত-পীড়ন-ক্রমোচিতশ্রম বলিততনুবিভাগ-রম্যদর্শন)। রাজ-পরিবারে এবং অভিজাতবর্গের পুরুষদের মধ্যে হস্তী ও অশ্বক্রীড়া সুপ্রচলিত ছিল, সন্দেহ নাই।

নৃত্যগীত বাদ্যের প্রচলন ও প্রসার সম্বন্ধে প্রমাণ সুপ্রচুর। রামচরিত, পবনদূত প্রভৃতি কাব্যে, নানা লিপিতে, সদুক্তিকর্ণামৃতের প্রকীর্ণ শ্লোকে, চর্যাগীতি ও দোহাকোষের নানা জায়গায় নানাসূত্রে নৃত্যগীতবাদ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় উচ্চ ও নিম্নকোটি উভয় স্তরেই এই দুই বিদ্যা ও ব্যসনের সমাদর ছিল যথেষ্ট। বাররামা ও দেব-দাসীদের সকলকেই নৃত্যগীতবাদ্যপটীয়সী হইতে হইত। তাঁহারা যে নানা কলানিপুণা ছিলেন,

এ-কথার ইঙ্গিত সেন-লিপিতে এবং পবনদূতেও আছে। রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থে দেখিতেছি, পুণ্ড্রবর্ধনের কার্তিকেয় মন্দিরে যে নৃত্যগীত হইত তাহা ভরতের নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী, এবং এই নৃত্যগীতমুগ্ধ জয়ন্ত স্বয়ং ভরতানুমোদিত নৃত্যগীত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে এবং অসংখ্য ধাতব ও প্রস্তরমূর্তিতে নানা ভঙ্গিতে নৃত্যপর পুরুষ ও নারীর প্রতিকৃতি সুপ্রচুর। বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত উভয় পুরাণেই নট পৃথক বর্ণহিসাবেই উল্লিখিত হইয়াছেন, সমাজের নিম্নতর স্তরে। এখনও বাঙালী সমাজের নিম্নস্তরে এক ধরনের গায়কগায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়, গান গাহিয়া এবং নাচিয়াই যাঁহারা জীবিকা নির্বাহ করেন; ইহারাই বোধ হয় উপরোক্ত পুরাণ দুইটির নটবর্ণ। কিন্তু উচ্চকোটির কেহ কেহও বোধ হয় নটনটীর বৃত্তি গ্রহণ করিতেন। জয়দেব-গৃহিণী পদ্মাবতী প্রাক্‌বিবাহ-জীবনে কুশলী নটী ছিলেন এবং সঙ্গীতে তাঁহার খুব প্রসিদ্ধি ছিল। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ফলকগুলিতে, কোনো কোনো প্রস্তরচিত্রে নানা প্রকারের বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, যেমন, কাঁশর, করতাল, ঢাক, বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, মৃৎভাণ্ড প্রভৃতি। রামচরিতে দেখিতেছি, বরেন্দ্রীতে বিশেষ এক ধরনের মুরজ (মৃদঙ্গ) বাদ্য প্রচলিত ছিল; বাংলার অন্যত্র বোধ হয় অন্য প্রকারের মুরজের প্রচলন ছিল। সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে আছে, তুম্বীবীণার উল্লেখ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ বিবরণ পাইতেছি চর্যাগীতিতে—কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত উভয়েরই, নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের এবং বোধ হয় গীতাভিনয়েরও। নিম্নশ্রেণীর নটনটীদের কথা আগেই বলিয়াছি। চর্যাগীতিতে দেখিতেছি, ডোম্বীরা সাধারণত খুব নৃত্যগীতপরায়ণা হইতেন।

নৃত্যগীতবাদ্য ও অভিনয়

এক সো পদ্ম চৌষঠী পাখুড়ী।
তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।
একটি পদ্ম, তাহার চৌষট্টি পাপড়ী; তাহাতে চড়িয়া নাচে ডোম্বী।

লাউ-এর খোলা আর বাঁশের ডাঁট বা দণ্ডে তন্ত্রী (তার) লাগাইয়া বীণা জাতীয় এক প্রকার যন্ত্র ইহারা প্রস্তুত করিতেন, আর গান গাহিয়া গাহিয়া গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অনহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তিধনি বিলসই রুণা॥
* * *
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই॥

সূর্য লাউ-এ শশী লাগিল তন্ত্রী, অনাহত দণ্ড—সব এক করিয়া দিল অবধূতী। অলো সখি, হেরুক-বীণা বাজিতেছে; শোন্‌, তন্ত্রীধ্বনি কি সকরুণ বাজিতেছে! * * * বজ্রাচার্য নাচিতেছে, দেবী গাহিতেছে—এই ভাবে বুদ্ধনাটক সুসম্পন্ন হয়।

বুদ্ধ-নাটকের উল্লেখ লক্ষ্য করিবার মতন। নৃত্য এবং গীতের সাহায্যে এক ধরনের নাট্যাভিনয় বোধ হয় প্রাচীন বাংলায় সুপ্রচলিত ছিল, এবং এই নাচ-গানের ভিতর দিয়াই বোধ হয় কোনো বিশেষ ঘটনাকে (এই ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনীকে ?) রূপদান করা হইত।

অবান্তর হইলেও এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা চলে যে, নৃত্যগীতপরায়ণা ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ডোম্বী ও অন্যান্য তথাকথিত নীচ জাতীয়া রমণীদের সামাজিক নীতিবন্ধন কিছুটা চঞ্চল ও শিথিল হইত, এবং সেই হেতু তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে উচ্চকোটির পুরুষদেরও মনোহরণে সমর্থ হইতেন। তাহা ছাড়া জাতি ও শ্রেণীসংস্কারমুক্ত সহজযানী ও কাপালিকদের যোগের সঙ্গিনী হইতেও কোনো বাধা তাঁহাদের বা যোগীদের কাহারও হইত না।

কইসণি হালো ডোম্বী তোহেরি ভাভরী আলী।
অন্তে কুলিণজন মাঝে কাবালী॥
*   *   *
কেহো কেহো তোহেরে বিরুআ বোলই।
বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই॥
কাহ্নে গায় তু কামচণ্ডালী।
ডোম্বীত আগলি নাহি ছিনালী॥

হালো ডোম্বী, কিরূপ (আশ্চর্য) তোর চাতুরী! তোর (এক) অন্তে কুলীনজন, (আর) মধ্যে কাপালী। কেহ কেহ তোকে বলে বিরূপ (তাহাদের প্রতি), (কিন্তু) বিদ্বজ্জন তোকে কণ্ঠ হইতে ছাড়েনা। কাহ্নু গায়, তুই কামচণ্ডালী, ডোম্বীর চেয়ে বেশি ছিনালী (আর) কেহ নাই।

লোকায়ত সমাজে এবং সামাজিক ও ধর্মগত উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে, নানা ক্রিয়াকর্মে নৃত্যগীতের প্রমাণ সমসাময়িক শিল্প-সাহিত্যে সুস্পষ্ট। চর্যাগীতির একটি গীতে সমসাময়িক বিবাহযাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বর্ণনা আছে এবং সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি বাদ্য যন্ত্রেরও উল্লেখ আছে। কাহ্নুপাদ বলিতেছেন,

ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা।
মনপবন বেণি করণ্ডকশালা॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণতু ধাম॥

ভব ও নির্বাণ হইল পটহ মাদল ; মনপবন দুই করণ্ডক শালা। জয় জয় দুন্দুভি শব্দ উচ্ছলিত করিয়া কাহ্ন চলিল ডোম্বীকে বিবাহ করিতে। ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া জন্ম খাইলাম, কিন্তু যৌতুকে (লাভ) করিলাম অনুত্তরধাম (অর্থাৎ, নীচু জাতের ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া জাত্, কুল গেল বটে, কিন্তু ভাল যৌতুক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই ক্ষতি যেন সব পূরণ হইয়া গিয়াছে, এই ভাব)।

তখনকার দিনেও বাংলাদেশে বিবাহ ব্যাপারে বরপক্ষ যৌতুক লাভ করিত, এবং যৌতুকের লোভে নীচকুল হইতে কন্যাগ্রহণেও খুব আপত্তি ছিল না, অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটিও এই গীতে বিদ্যমান।

বিবাহ-যৌতুক

সাধারণ লোকেরা স্থলপথে পদব্রজে এবং জলপথে ভেলা বা ডিঙ্গা এবং নৌকাযোগেই যাতায়াত করিত। ভেলা, ডিঙ্গা-ডিঙ্গী-ডোঙ্গা, প্রত্যেকটি শব্দই অষ্ট্রিক্ ভাষার দান, এবং মনে হয়, আদিমতম কাল হইতেই ইহাদের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। নৌকার ব্যবহার, নৌ-বন্দর, নৌ-ঘাট, নৌবাণিজ্য, নৌদণ্ডক প্রভৃতির কথা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে আগেই বলিয়াছি ; কিন্তু নৌকার সঙ্গে বাঙালী জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগের কথা ধরা পড়িয়াছে চর্যাগীতিতে। রূপকছলে নৌকা, নৌকার হাল, গুণ, কেড়ুয়াল, পুলিন্দা, খোল, চক্র বা চাকা, খুঁটি, কাছি, সেঁউতি, পাল প্রভৃতি এমন সহজ-ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে যে, মনে হয়, এই যানটির সঙ্গে বাঙালীর হৃদয়ের একটি গভীর যোগ ছিল। নৌকায় খেয়া-পারাপারের ইঙ্গিতও আছে। পারের মাশুল আদায় হইত কড়িতে (কবড়ী) বা বোড়িতে। খেয়া-পারাপারের কাজ অনেক সময় নিম্নশ্রেণীর নারীরাও করিতেন। চর্যাগীতির একটি গীতিতে দেখিতেছি পাটনীর কাজটি করিতেছেন জনৈকা ডোম্বী।

যানবাহন

নৌযান

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাই।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই ॥
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্গুরু পাঅপত্র জাইব পুনু জিনউরা ॥
পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তে মাঙ্গে পিঠত কচ্ছী বান্ধী।
গঅণ খোলেঁ সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধী ॥
* * *
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করই।
জো রথে চড়িলা বাহবা ন জাই কুলে কুলে বুলই ॥

গঙ্গা আর যমুনার মাঝে বহিতেছে নৌকা ; মাতঙ্গ কন্যা ডোম্বী তাহাতে জলে ডুবিয়া ডুবিয়া লীলায় পার করিতেছে। বাহ গো ডোম্বী, বাহিয়া চল, পথেই দেরি হইয়া যাইতেছে ; সদ্গুরু পাদপদ্মে যাইব জিনপুর। পাঁচটি দাঁড় পড়িতেছে পথে, পিঠে কাছি বাঁধ ; সেঁউতিতে জল সেচ, জল যেন সন্ধিতে প্রবেশ না করিতে পারে। * * * কড়িও লয় না, বুড়িও লয় না, স্বেচ্ছায় করে পার ; যাহারা রথে চড়িল, নৌকা বাওয়া জানিলনা, তাহারা শুধু কূলে কূলে ঘুরিয়া ফিরিল।

সরহপাদের একটি গীতে আছে,

> কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেড়ুআল।
> সদ্‌গুরু-বঅণে ধর পতিবাল॥
> চীঅ থির করি ধরহুরে নাই।
> আন উপায়ে পার ণ জাই॥
> নৌবাহী নৌকা টানঅ গুণে।
> মেলি মেল সহজে জাউ ণ আণে॥
> বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ।
> ভব উলোলে সব বি বোলিআ॥
> কূল লই খর সোঁন্তে উজাঅ।
> সরহ ভণই গঅণে সমাঅ॥

কায় (হইতেছে) নৌকা, খাঁটি মন (হইল তাহার) দাঁড়; সদ্‌গুরু বচনে হাল ধর। চিত্ত স্থির করিয়া নৌকা ধর; অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না। নৌবাহী নৌকা টানে গুণে; সহজে গিয়া মিলিত হও, অন্য (পথে) যাইও না। পথে (আছে) ভয়, বলবান দস্যু; ভব উল্লোলে (তরঙ্গে) সবই টলমল। কূল ধরিয়া খরস্রোতে উজাইয়া যায়; সরহ বলে, গগনে গিয়া প্রবেশ করে।

অন্যত্র কম্বলপাদ বলিতেছেন,

> খুণ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
> বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি॥
> মাঙ্গত চড়্‌হিলে চউদিস চাহঅ।
> কেড়ুআল নাহি কেঁকি বাহবকে পারঅ॥

খুঁটি (গোজ) উপড়াইয়া কাছি খুলিয়া দাও; হে কামলি (পূর্ব-বাংলায় মাঝি প্রভৃতি দিন-মজুরদের আজও বলে কাম্‌লা বা কামুলা), সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া নৌকা বাহিয়া চল। পথ চড়িয়া (মাঝনদীতে আসিয়া) চারিদিকে চাহিয়া দেখ; দাঁড় না থাকিলে কে বাহিতে পারে?

নদ-নদী-খাল-বিলের বাংলাদেশে নৌকা ও নদীকে কেন্দ্র করিয়া অধ্যাত্ম-জীবনের রূপ-রূপক গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়।

> ভবনই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
> দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী॥

ভবনদী গভীর, গভীর বেগে বহিয়া চলে; দুইতীরে কাদা, মাঝে ঠাঁই নাই।

এ-ছবি তো একান্তই বাংলার নদনদীগুলির—দুই তীর পলিমাটির কাদায় ভরা; আর নদীর গভীর গম্ভীর বেগ, সেও তো গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা-লৌহিত্যেরই। সরহপাদের একটি গীতে আছে,

> বাম দাহিন জো খাল-বিখলা।
> সরহ ভণই বাপা উজুবাট ভইলা॥

(পথে) বামে দক্ষিণে অনেক খাল-বিখাল; সরহ বলেন, সোজা পথ ধরিয়া চল (অর্থাৎ, খাল-বিখালের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িও না, সোজা চলিয়া যাও)।

এই ছবিও তো একান্তই বাংলাদেশের। এত খাল-বিখালই বা আর কোথায়! শান্তিপাদের একটি গীতে আছে,

কূলে কূলে মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল ভিণ একুবাকু ণ ভূলহ রাজপথ কন্ধারা॥
মাআ মোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা॥
সুনাপান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এস অট মহাসিদ্ধি সিজ্ঝই উজুবাট জাঅন্তে॥
বামদাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট ণ গুমা খড়তড়ি ণ হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ॥

হে মূঢ়, কূলে কূলে ঘুরিয়া ফিরিও না; সংসারের (মাঝখানে রহিয়াছে) সহজ পথ। সম্মুখে পড়িয়া আছে যে সমুদ্র, তাহার অন্ত যদি না বুঝা যায়, থই যদি না পাওয়া যায়, সম্মুখে যদি কোনো নৌকা বা ভেলা দেখা না যায়, তবে অভিজ্ঞ পথিক যাঁহারা তাঁহাদের নিকট হইতে পথের দিশা জানিয়া লও। শূন্য প্রান্তরে যদি পথের ঠিকানা না মেলে, তবু ভ্রান্তির পথে আগাইয়া যাওয়া উচিত নয়। সোজা সহজ পথ ধরিয়া গেলেই মিলিবে অষ্টমহাসিদ্ধি। খেলা করিতে করিতে বাম ও দক্ষিণ পথ ছাড়িয়া (মাঝপথে) চলিতে হইবে। এই সহজপথে ঘাট-ঝোপ কিছু নাই, খাখাবিয় কিছু নাই; চোখ বুজিয়া এই পথে চলা যায়।

স্থলপথে গ্রাম হইতে দূরে গ্রামান্তরে বা নগরে যাইবার লোকায়ত যান ছিল গো-রথ বা গরুর গাড়ী। মহিষের গাড়ীর উল্লেখ দেখিতেছি না; কিন্তু নৈষধচরিতের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, বাঙালী প্রাচীন কালে মহিষের দধি ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে দেখিতেছি, প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্রের রাজাদের চতুরশ্ববাহিত রথ ছিল। অশ্ববাহিত যান উচ্চকোটির লোকেরা ব্যবহার করিতেন, সন্দেহ করিবার কারণ নাই। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলিতেছেন, যুদ্ধে গঙ্গারাষ্ট্রের সৈন্যবলের মধ্যে প্রধান বলই ছিল হস্তীবল। অসংখ্য লিপিতেও হস্তীসৈন্যের উল্লেখ সুপ্রচুর। সুপ্রাচীন কাল হইতেই পূর্বভারতে হস্তী অন্যতম প্রধান বাহন বলিয়াও গণ্য হইত। এই পূর্ব-ভারতেই, বিশেষভাবে বাংলাদেশে ও কামরূপে, হাতী ধরা ও হাতীর চিকিৎসা ইত্যাদি সম্বন্ধে একটি বিশেষ শাস্ত্রই গড়িয়া উঠিয়াছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তো বলেন, হস্তী-আয়ুর্বেদ বাংলার অন্যতম প্রধান গৌরব। রাজ-রাজড়া, সামন্ত-মহাসামন্তরা, বড় বড় ভূম্যধিকারীরা হাতীতে চড়িয়াও যাতায়াত করিতেন, সন্দেহ নাই। চর্যাগীতি ও দোহাকোষে হাতীর রূপক আশ্রয় অনেকগুলি গীত স্থান পাইয়াছে এবং

গো-যান

হস্তী ও অশ্বযান

রূপকগুলি এমন, মনে হয়, এই প্রাণীটির সঙ্গে বাঙালীর প্রাণের গভীর পরিচয় ছিল। খেদা পাতিয়া আজিকার দিনে যেমন করিয়া হাতী ধরা হয় তখনও তেমন করিয়াই হাতী এবং হাতীশিশু (করভ) ধরা হইত। বন্য হাতী সুদৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। চর্যাগীতিতে কাহ্নুপাদের একটি গীত আছে,

> এবং কার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ।
> বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ ॥
> কাহ্ন বিলসঅ আসব মাতা।
> সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥

কিন্তু বন্যহাতী কোনো বাধা বন্ধনই মানিত না, সমস্ত শিকল খুঁটি ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া পদ্মবনে গিয়া প্রবেশ করিত। পাগলা হাতীর বর্ণনা মহীধরপাদের একটি গানেও আছে।

> মাতেল চীঅ গএন্দা ধাবই।
> নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই ॥
> পাপ পুণ্ণ বেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠানা।
> গঅন টাকলি লাগিরে চিত্ত পইঠি নিবানা ॥

আমার মত্ত চিত্তগজেন্দ্র ধাবিত হইতেছে; নিরন্তর গগনে সকল কিছু ঘোলাইয়া যাইতেছে। পাপ ও পুণ্য উভয়েই শিকল ছিঁড়িয়া এবং সকল খাম্বা মাড়াইয়া গগন-শিখরে গিয়া পৌঁছিয়া সে একেবারে শান্ত হইয়াছে।

উত্তর ও পূর্ব-বাংলার পার্বত্য নদীর তীরে হাতীরা ঘুরিয়া বেড়াইত যথেচ্ছ ভাবে। সরহপাদ বলিতেছেন,

> মুক্কউ চিত্তগএন্দ করু এথ বিঅপ্প ণ পুচ্ছ।
> গঅন গিরীণইজল পিএউ তিহঁ তড় বসউ সইচ্ছ ॥

চিত্ত গজেন্দ্রকে মুক্ত কর; এ-বিষয়ে আর কোনো বিকল্প জিজ্ঞাসা করিও না। গগন গিরির নদী জল সে পান করুক, তাহার তটে স্বইচ্ছায় সে বাস করুক।

হাতী ধরিবার আগে সারিগান গাহিয়া হাতীর মনকে বশ করিতে হইত। বীণাপাদের একটি গানে আছে,

> আলি কালি বেণি সারি সুনিআ।
> গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ

গরুর গাড়ীর চেহারা এখনও যেরূপ প্রাচীনকালেও তাহাই ছিল; বাংলা ও ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন প্রস্তর ও মৃৎফলকই তাহার প্রমাণ। বরযাত্রায়ও গরুর গাড়ী ব্যবহার করা হইত, চর্যাগীতির একটি গীতে এইরূপ ইঙ্গিত আছে। পাহাড়পুরের একটি মৃৎফলকে সুসজ্জিত অশ্বের একটি চিত্র আছে; এই ধরনের সজ্জিত অশ্বে চড়িয়াই সঙ্গতি সম্পন্ন লোকেরা যাতায়াত করিতেন।

পাল্কীর ব্যবহারও ছিল বলিয়াই মনে হয়। কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপিতে দেখিতেছি,

একটু প্রচ্ছন্ন ভাবে হস্তীদন্তনির্মিত বাহদণ্ডযুক্ত পাকীর উল্লেখ। বল্লালসেন নাকি তাঁহার শত্রুদের রাজলক্ষ্মীদিগকে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, এই ধরনের পাকী চড়াইয়া।

রামচরিত ও পবনদূতে রামাবতী ও বিজয়পুরের বর্ণনা এবং বাণগড়, রামপাল, মহাস্থান, দেওপাড়া প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয়, সমৃদ্ধ নগরবাসীরা ইটকাঠের তৈরী ক্ষুদ্র বৃহৎ হর্ম্যে বাস করিতেন; রাজপ্রাসাদও তৈরী হইত ইটকাঠেই। কিন্তু এই সব ভবনের আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। গ্রামে

ঘরবাড়ী

ইটকাঠের বাড়ী বড় একটা ছিল বলিয়া মনে হয় না; কোনো গ্রাম-বর্ণনাতেই সেরূপ কোনো উল্লেখ দেখিতেছি না। দরিদ্র নিম্নকোটির লোকেরা ত বটেই, এমন কি সম্পন্ন মহত্তর-কুটুম্ব-গৃহস্থরাও সাধারণত মাটি, খড়, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদির তৈরী বাড়ীতে বাস করিতেন; মৃৎফলকের সাক্ষ্যে মনে হয়, চাল হইত খড়ের, বাঁশের চাঁচারি বুনিয়া তৈরী হইত বেড়া, আর খুঁটি হইত বাঁশের বা কাঠের। চর্যাগীতিতে বাঁশের চাঁচারী দিয়া বেড়া বাঁধিবার কথা আছে (চারিপাসে ছাইলারে দিয়া চঞ্চালী)। মাটির দেয়ালও ছিল; রাঢ়াঞ্চলে ও উত্তর-বঙ্গে মাটির দেয়াল; পূর্বাঞ্চলে চাঁচারীর বেড়া। প্রস্তর ও মৃৎফলকের চিত্র এবং পাণ্ডুলিপি-চিত্র হইতে মনে হয়, আজিকার মতন তখনও বাঁশের বা কাঠের খুঁটির উপর ধনুকাকৃতি বা দুই তিন স্তরে পিরামিডাকৃতির চাল বা ছাউনি তৈরী হইত। একান্ত গরীব গৃহস্থ ও সমাজ-শ্রমিকেরা কুঁড়েঘরে বাস করিতেন। সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে এই ধরণের কুঁড়েঘরের একটি বাস্তব বর্ণনা আছে; 'প্রচুর পয়সি' প্রাচ্য দেশে এবং বৃষ্টিবহুল বাংলাদেশে বর্ষায় দরিদ্র গৃহস্থের জীর্ণ-গৃহের দুর্দশার এমন বস্তুনির্ভর অথচ কাব্যময় বর্ণনা বিরল। কবি যার ছবি আঁকিয়াছেন,

চলৎ কাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণ সঞ্চয়ম্।
গণ্ডুপদার্থিমণ্ডূকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম॥

কাঠের খুঁটি নড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে, চালের খড় উড়িয়া যাইতেছে; কেঁচোর সন্ধানে নিরত ব্যাঙের দ্বারা আমার জীর্ণ গৃহ আকীর্ণ।

নদ-নদী-খাল-বিখালের বাংলাদেশে এ-পাড়া হইতে ও-পাড়া যাইতে আজিকার মত তখনও সাঁকোর প্রয়োজন ছিলই; এবং এই কারণেই বাঁশ কিংবা কাঠের সাঁকোর সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়ও ছিল প্রাচীন কাল হইতেই। চর্যাগীতির একটি গীতে বলা হইয়াছে, পারগামী লোক যাহাতে নির্ভয়ে পারাপার করিতে পারে সেজন্য চাটিলপাদ বেশ একটি দৃঢ় সাঁকো প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। বড় গাছ চিঁড়িয়া সাঁকোর পাট জোড়া দেওয়া হইত এবং টাঙ্গিদ্বারা ইহাকে শক্ত করা হইত।

ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামী লোঅ নিভর তরই॥
ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ
অদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ॥

গৃহের আসবাবপত্রের মধ্যে নানা জিনিসের উল্লেখ চর্যাগীতি, রামচরিত, পবনদূত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে, এবং তাহাদের প্রতিকৃতি প্রস্তর ও মৃৎফলকে দেখিতেছি। সমৃদ্ধ, বিত্তবান্ লোকেরা সোনা ও রূপার তৈরী থালা-বাসন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু গ্রামবাসী সাধারণ গৃহস্থেরা কাঁসার এবং দরিদ্র লোকেরা সাধারণত মাটির ভোজন ও পানপাত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। বাংলার নানা প্রত্নস্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে অসংখ্য মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুক্‌রা প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃৎফলকে এবং নানা প্রস্তরফলকে মাটীর খেলনা, ফুলদানী, খাট, নানা আকৃতির কলস, বাটি, পান ও ভোজনপাত্র, মাটির জালা, লোটা, দোয়াত, দীপাধার, ঘড়া, জলচৌকী, পুস্তকাধার প্রভৃতির প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এ-সব তৈজসপত্রের বহুল প্রচলন ছিল, সন্দেহ নাই। নানা সুদৃশ্য মণ্ডনালংকারযুক্ত এবং স্বর্ণনির্মিত বিচিত্র আসবাবপত্রের কথা রামচরিতে উল্লিখিত আছে। এ-সব তৈজসপত্র সমৃদ্ধ লোকদের আয়ত্ত ছিল, সন্দেহ নাই। তবকাত্-ই-নাসীরী-গ্রন্থে আছে, লক্ষ্মণসেনের রাজপ্রসাদে সোনা ও রূপার ভোজনপাত্র ব্যবহৃত হইত। কেশবসেনের ইদিলপুর লিপিতে লোহার জলপাত্রের উল্লেখ আছে।

তৈজসপত্র

৩

পূর্বের এক অধ্যায়ে দেশ-পরিচয় প্রসঙ্গে আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকপ্রকৃতির কথা বলিয়াছি। এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিব না। শুধু কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার দশোপদেশ-গ্রন্থে কাশ্মীর-প্রবাসী গৌড়ীয় বিদ্যার্থীদের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি একটু সবিস্তারে। দশম একাদশ শতকে প্রচুর গৌড়ীয় বিদ্যার্থী কাশ্মীরে যাইতেন বিদ্যালাভের জন্য। ক্ষেমেন্দ্র বলিতেছেন, ইহাদের প্রকৃতি ও ব্যবহার ছিল রূঢ় এবং অমার্জিত। ইহারা ছিলেন অত্যন্ত ছুঁৎমার্গী; ইহাদের দেহ ক্ষীণ, কঙ্কালমাত্র সার, এবং একটু ধাক্কা লাগিলেই ভাঙ্গিয়া পড়িবেন, এই আশংকায় সকলেই ইহাদের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। কিন্তু কিছুদিন প্রবাস-যাপনের পরই কাশ্মীরের জল-হাওয়ায় ইহারা বেশ মেদ ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেন। 'ওঙ্কার' ও 'স্বস্তি' উচ্চারণ যদিও ছিল ইহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কর্ম, তবু, পাতঞ্জলভাষ্য, তর্ক, মীমাংসা সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহাদের পড়া চাই (বোধ হয়, কাশ্মীরী মানদণ্ডে বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ যথেষ্ট শুদ্ধ ও মার্জিত ছিলনা; ইহাই সম্ভবত ক্ষেমেন্দ্রের বক্রোক্তির কারণ)। ক্ষেমেন্দ্র আরও বলিতেছেন, গৌড়ীয় বিদ্যার্থীরা ধীরে ধীরে পথ চলেন এবং থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাদের দর্পিত মাথাটি এদিক সেদিক দোলান! হাঁটিবার সময় তাঁহার ময়ূরপঙ্খী জুতায় মচ্‌মচ্ শব্দ হয়; মাঝে মাঝে

বসন-ভূষণ
বিলাস-ব্যসন

তিনি তাঁহার সুবেশ সুবিন্যস্ত চেহারাটার দিকে তাকাইয়া দেখেন। তাঁহার ক্ষীণ কটিতে লাল কটিবন্ধ। তাঁহার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিবার জন্য ভিক্ষুক এবং অন্যান্য পরাশ্রয়ী লোকেরা তাঁহার তোষামোদ করিয়া গান গায় ও ছড়া বাঁধে। কৃষ্ণ বর্ণ ও শ্বেতদন্তপংক্তিতে তাঁহাকে দেখায় যেন বানরটি। তাঁহার দুই কর্ণলতিকায় তিন তিনটি করিয়া স্বর্ণ কর্ণভূষণ, হাতে যষ্টি, দেখিয়া মনে হয় যেন সাক্ষাৎ কুবের। স্বল্পমাত্র অজুহাতেই তিনি রোষে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন; সাধারণ একটু কলহেই ক্ষিপ্ত হইয়া ছুরিকাঘাতে নিজের সহ-আবাসিকের পেট চিঁড়িয়া দিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন না। গর্ব করিয়া তিনি নিজের পরিচয় দেন ঠক্কুর বা ঠাকুর বলিয়া এবং কম দাম দিয়া বেশি জিনিষ দাবি করিয়া দোকানদারদের উত্যক্ত করেন।

কাশ্মীরে গৌড়ীয় বিদ্যার্থী

বিদেশে বাঙালী বিদ্যার্থীর বসনভূষণ সম্বন্ধে আংশিক পরিচয় এই কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার বিস্তৃত পরিচয় লইতে হইলে বাংলাদেশের সমসাময়িক সাহিত্য-গ্রন্থের এবং প্রত্নবস্তুর মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই সব সাক্ষ্য হইতে বসনভূষণের মোটামুটি একটা ছবি দাঁড় করানো কঠিন নয়।

গ্রন্থারম্ভে এক অধ্যায়ে বলিয়াছি, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সেলাই করা বস্ত্র পরিধানের রীতি আদিমকালে ছিলনা; সেলাইবিহীন একবস্ত্র পরাটাই ছিল পুরারীতি। সেলাই করা জামা বা গাত্রাবরণ মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে পরবর্তী কালে আমদানী করা হইয়াছিল; কিন্তু অধোবাসের ক্ষেত্রে বাঙালী অথবা তামিল অথবা গুজ্‌রাতী মারাঠীরা ধুতি পরিত্যাগ করিয়া ঢিলা বা চুড়িদার পা'জামা গ্রহণ করেন নাই। পুরুষের অধোবাস যেমন ধুতি, মেয়েদের তেমনই শাড়ী। ধুতি ও শাড়ীই ছিল প্রাচীন বাঙালীর সাধারণ পরিধেয়, তবে একটু সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের ভিতর ভদ্র বেশ ছিল উত্তরবাসরূপে আর এক খণ্ড সেলাইবিহীন বস্ত্রের ব্যবহার, যাহা ছিল পুরুষদের ক্ষেত্রে উত্তরীয়, নারীদের ক্ষেত্রে ওড়না। ওড়নাই প্রয়োজন মত অবগুণ্ঠনের কাজ করিত। দরিদ্র ও সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ নারীদের এক বস্ত্র পরাটাই ছিল রীতি, এবং সেই বস্ত্রাঞ্চল টানিয়াই হইত অবগুণ্ঠন।

বসন ও পরিধানভঙ্গি

আজকাল আমরা যেমন পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত ঝুলাইয়া কোঁচা দিয়া কাপড় পরি, প্রাচীন কালের বাঙালী তাহা করিতেন না। তখনকার ধুতি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনেক ছিল ছোট; হাঁটুর নীচে নামাইয়া কাপড় পরা ছিল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম; সাধারণত হাঁটুর উপর পর্যন্তই ছিল কাপড়ের প্রস্থ। ধুতির মাঝখানটা কোমরে জড়াইয়া দুই প্রান্ত টানিয়া পশ্চাদ্দিকে কচ্ছ বা কাছা। ঠিক নাভির নীচেই দুই তিন প্যাঁচের একটি কটিবন্ধের সাহায্যে কাপড়টিকে কোমরে আটকানো; কটিবন্ধের গাঁটটি ঠিক নাভির নীচেই দুল্যমান। কেহ কেহ ধুতির একটি প্রান্ত পেছনের দিকে টানিয়া কাছা দিতেন, অন্য প্রান্তটি তাঁজ

করিয়া সম্মুখ দিকে কোঁচার মত ঝুলাইয়া দিতেন। নারীদের শাড়ী পরিবার ধরনও প্রায় একই রকম, তবে শাড়ী ধুতির মত এত খাটো নয়, পায়ের কব্জি পর্যন্ত ঝুলানো, এবং বসন-প্রান্ত পশ্চাদ্দিকে টানিয়া কচ্ছে রূপান্তরিতও নয়। আজিকার দিনের বাঙালী নারীরা যে-ভাবে কোমরে এক বা একাধিক প্যাঁচ দিয়া অধোবাস রচনা করেন প্রাচীন পদ্ধতিও তদনুরূপ, তবে আজিকার মতন প্রাচীন বাঙালী নারী শাড়ীর সাহায্যে উত্তরবাস রচনা করিয়া দেহ আবৃত করিতেন না; তাঁহাদের উত্তর-দেহাংশ অনাবৃত রাখাই ছিল সাধারণ নিয়ম। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বোধ হয় সঙ্গতিসম্পন্ন উচ্চকোটি স্তরে এবং নগরে—হয়তো কতকটা মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রেরণায়—কেহ কেহ উত্তরী বা ওড়নার সাহায্যে উত্তরার্ধের কিছু অংশ ঢাকিয়া রাখিতেন, বা স্তনযুগলকে রক্ষা করিতেন চোলি বা স্তনপট্টের সাহায্যে। কেহ কেহ আবার উত্তরবাস রূপে সেলাই করা 'বডিস্' জাতীয় এক প্রকার জামার সাহায্যে স্তননিম্ন ও বাহু-উর্দ্ধ পর্যন্ত দেহাংশ ঢাকিয়া রাখিতেন। সন্দেহ নাই, এই জাতীয় উত্তরবাসের ব্যবহার নগর ও উচ্চকোটি স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। নারীর সদ্যোক্ত উত্তরবাস ও তাহার শাড়ী এবং পুরুষের ধুতি প্রভৃতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে—সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি-চিত্রের সাক্ষ্যে এ-তথ্য সুস্পষ্ট—নানাপ্রকার লতাপাতা, ফুল এবং জ্যামিতিক নক্‌সাদ্বারা মুদ্রিত হইত। এই ধরনের নক্‌সা-মুদ্রিত বস্ত্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিচয় আরম্ভ হয় খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে, এবং সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র ও গুজরাত্ ছিল গোড়ার দিকে এই বস্ত্র-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। পরে ভারতবর্ষের অন্যত্রও ক্রমশ তাহা ছড়াইয়া পড়ে। এই নক্‌সা-মুদ্রিত বস্ত্রের ইতিহাসের মধ্যে ভারত-ইরাণ-মধ্যএশিয়ার ঘনিষ্ঠ শিল্প ও অলংকরণগত সম্বন্ধের ইতিহাস লুক্কায়িত। কিন্তু সে-কথা এ-ক্ষেত্রে অবান্তর। যাহাই হউক, নারীদের দেহের উত্তরার্ধ অনাবৃত রাখার ঐতিহ্য শুধু প্রাচীন বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন নয়; বস্তুত, সমগ্র প্রাচীন আদি অষ্ট্রেলীয়-পলিনেশিয়-মেলানেশিয় নরগোষ্ঠীর মধ্যে ইহাই ছিল প্রচলিত নিয়ম। বলিদ্বীপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অন্যান্য কয়েকটি দ্বীপে সেই অভ্যাস ও ঐতিহ্যের অবশেষ এখনও বিদ্যমান।

সভা-সমিতি এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা ছিল। জীমূতবাহন দায়ভাগ-গ্রন্থে সভা-সমিতির জন্য পৃথক পোষাকের কথা বলিয়াছেন। নর্তকী নারীরা পরিতেন পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত বিলম্বিত আঁটসাঁট পা'জামা; দেহের উত্তরার্ধে কাঁধের উপর দিয়া ঝুলাইয়া দিতেন একটি দীর্ঘ ওড়না; নৃত্যের গতিতে ওড়নার প্রান্ত উড়িত লীলায়িত ভঙ্গিতে। সন্ন্যাসী-তপস্বীরা এবং একান্ত দরিদ্র সমাজ-শ্রমিকেরা পরিতেন ল্যাঙোটি। সৈনিক ও মল্লবীরেরা পরিতেন উরু পর্যন্ত লম্বিত খাটো আঁট পা'জামা; সাধারণ মজুররাও বোধ হয় কখনো কখনো এই ধরনের পোষাক পরিতেন; অন্তত পাহাড়পুরের ফলকচিত্রের সাক্ষ্য তাহাই। শিশুদের পরিধেয় ছিল হয় হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত ধুতি না হয় আঁট

পা'জামা, আর কটিতলে জড়ানো ধটি; তাহাদের কণ্ঠে দুল্যমান এক বা একাধিক পাটা বা পদক-সম্বলিত সূত্রহার।

আজিকার মত প্রাচীন কালেও বাঙালীর মস্তকাবরণ কিছু ছিল না। নানা কৌশলে সুবিন্যস্ত কেশই ছিল তাহাদের শিরোভূষণ। পুরুষেরাও লম্বা বাবড়ীর মতন চুল রাখিতেন; কুঞ্চিত থোকায় থোকায় তাহা কাঁধের উপর ঝুলিত; কাহারও কাহারও আবার উপরে একটি প্যাঁচানো ঝুঁটি; কপালের উপর দুল্যমান কুঞ্চিত কেশদাম বস্ত্রখণ্ডদ্বারা ফিতার মতন করিয়া বাঁধা। নারীদেরও লম্বমান কেশগুচ্ছ ঘাড়ের উপর খোপা করিয়া বাঁধা; কাহারও কাহারও বা মাথার পশ্চাদ্দিকে এলানো। সন্ন্যাসী-তপস্বীদের লম্বা জটা দুই ধাপে মাথার উপরে জড়ানো। শিশুদের চুল তিনটি 'কাকপক্ষ' গুচ্ছে মাথার উপরে বাঁধা।

কেশবিন্যাস

ময়নামতি ও পাহাড়পুরের মৃৎফলক-সাক্ষ্যে মনে হয়, যোদ্ধারা পাদুকা ব্যবহার করিতেন; প্রহরী দ্বারবানেরাও করিতেন; এবং সে-পাদুকা চামড়ার দ্বারা তৈরি হইত এমন ভাবে যাহাতে পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে। ব্যাদিতমুখ সেই জুতা ছিল ফিতাবিহীন। সাধারণ লোকেরা বোধ হয় কোনো চর্মপাদুকা ব্যবহার করিতেন না, যদিও কর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি ও পিতৃদয়িত-গ্রন্থে পুরুষদের পক্ষে কাষ্ঠ এবং চর্মপাদুকা উভয়ের ব্যবহারেরই ইঙ্গিত বর্তমান। সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের মধ্যেও কাষ্ঠ-পাদুকার চলন খুব বেশি ছিল। বাঁশের লাঠি এবং ছাতা ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। মৃৎ ও প্রস্তর ফলকে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে ছত্র ব্যবহারের সাক্ষ্য সুপ্রচুর; লাঠির সাক্ষ্য স্বল্প হইলেও বিদ্যমান। প্রহরী, দ্বারবান্, মল্লবীরেরা সকলেই সুদীর্ঘ বাঁশের লাঠি ব্যবহার করিতেন।

পাদুকা

সধবা নারীরা কপালে পরিতেন কাজলের টিপ্ এবং সীমন্তে সিঁদুরের রেখা; পায়ে পরিতেন লাক্ষারস অলক্তক, ঠোঁটে সিঁদুর; দেহ ও মুখমণ্ডল প্রসাধনে ব্যবহার করিতেন চন্দনের গুঁড়া ও চন্দন পঙ্ক, মৃগনাভি, জাফ্রান প্রভৃতি। বাৎস্যায়ন বলিতেছেন, গৌড়ীয় পুরুষেরা হস্তশোভী ও চিত্তগ্রাহী লম্বা লম্বা নখ রাখিতেন এবং সেই নখে রং লাগাইতেন, বোধ হয় যুবতীদের মনোরঞ্জনের জন্য। নারীরাও নখে রং লাগাইতেন কি-না, এ-বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাইতেছেনা। তবে চোখে যে কাজল তাঁহারা লাগাইতেন, তাহার ইঙ্গিত আছে দামোদর-দেবের চট্টগ্রাম-লিপিতে। প্রসাধন-ক্রিয়ায় কর্পূর-ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে মদনপালের মনহলি-লিপিতে, এবং রং ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে নারায়ণপালের ভাগলপুর লিপিতে। ঠোঁটে লাক্ষারস (অলক্তরাগ) এবং খোপায় ফুল গুঁজিয়া দেওয়া যে তরুণীদের বিলাস-প্রসাধনের অঙ্গ, এ-কথা সমসাময়িক বাঙালী কবি লক্ষ্মীধরও বলিয়াছেন। বিধবা হইবার সঙ্গে সঙ্গে সীমন্তের সিঁদুর যাইত ঘুচিয়া, এ-কথার ইঙ্গিত পাইতেছি দেবপালের নালন্দা-লিপিতে, মদনপালের মনহলি-লিপিতে, বল্লালসেনের অদ্ভুত-সাগর-গ্রন্থে, গোবর্ধনাচার্যের নিম্নোক্ত শ্লোকে।

বক্ষনতাম্বোংশুকাঃ চিকুর কলাপস্য মুক্তমানস্ত।
সিন্দূরিত সীমন্তচ্ছলেন হৃদয়ং বিদীর্ণমেব ॥

নারীরা গলায় ফুলের মালা পরিতেন এবং মাথার খোঁপায় ফুল গুঁজিতেন, এ-সাক্ষ্য দিতেছে নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপি এবং কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপি। নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতে আছে, বুকের বসন স্থানচ্যুত হইয়া পড়াতে লজ্জায় আনতনয়না নারী কথঞ্চিৎ লজ্জা নিবারণ করিতেছেন তাঁহার গলার ফুলের মালাদ্বারা বক্ষ ঢাকিয়া। বলা বাহুল্য, এ-চিত্র নাগর-সমাজের উচ্চকোটি স্তরের। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদ-লিপি এবং সমসাময়িক অন্যান্য লিপির সাক্ষ্য একত্র করিলে মনে হয়, এই সমাজস্তরের নারীরা, বিশেষভাবে বিবাহিতা নারীরা প্রতি সন্ধ্যায় নদী বা দীঘিতে অবগাহনান্তর প্রসাধনে-অলংকারে সজ্জিত শোভিত হইয়া আনন্দ ও ঔজ্জ্বল্যের প্রতিমা হইয়া বিরাজ করিতেন। বক্ষযুগলে কর্পূর ও মৃগনাভি রচনার সংবাদ পাওয়া যায় বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে। রাজা-মহারাজ-সামন্ত-মহাসামন্ত এবং রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন নাগর-পরিবারের নারীরা বেশভূষা, প্রসাধন, অলংকার ইত্যাদিতে উত্তরাপথের আদর্শ ই মানিয়া চলিতেন; অন্তত সদ্যোক্ত বিবরণ হইতে তো তাহাই মনে হয়। রাজমহিষীরা তো ভারতবর্ষের নানা জায়গা হইতেই আসিতেন, আর নাগর-সমাজে রাজপরিবারের আদর্শ টাই সাধারণত সক্রিয় হয়। নগরবাসিনী বঙ্গবিলাসিনীদের বেশভূষার একটি সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত অজ্ঞাতনামা জনৈক কবির এই শ্লোকটিতে:

প্রসাধন

বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়োঃ কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রীর্
মালাগর্ভঃ সুরভি মসৃণৈর্গন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ।
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং
বেশঃ কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গবারাঙ্গনানাম্ ॥

দেহে সূক্ষ্মবসন, ভুজবন্ধে সুবর্ণ অঙ্গদ (তাগা); গন্ধতৈলসিক্ত মসৃণ কেশদাম মাথার উপরে শিখণ্ড বা চূড়ার মত করিয়া বাঁধা, তাহাতে আবার ফুলের মালা জড়ানো; কানে নবশশিকলার মতন নির্মল তালপত্রের কর্ণাভরণ—বঙ্গবারাঙ্গনাদের এই বেশ কাহার না মন হরণ করে।

চন্দ্রকলার মত কোমল কচি তালপাতার কর্ণভূষণের কথা পবনদূত-রচয়িতা ধোয়ীও বলিয়াছেন; 'রসময় সুহ্মদেশে' নূতন চন্দ্রকলার মত কোমল তালীপত্র ব্রাহ্মণ-মহিলাদের কর্ণাভরণ হইবার দাবি করিয়া থাকে:

[রসময় সুহ্মদেশঃ] শ্রোত্রাভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালিপত্রং নবশশিকলা কোমলং যত্র যাতি।

রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচ্যজনপদবাসীদের প্রসাধনের বর্ণনা দিতে গিয়া শুধু গৌড়-রমণীর বেশ-প্রসাধনের বর্ণনাই করিয়াছেন; বোধ হয় ইহাই ছিল মানদণ্ড।

আর্দ্রার্দ্রচন্দন কুচার্পিত সূত্রহারঃ
সীমন্তচুম্বিসিচয়ঃ স্ফুটবাহুমূলঃ।
দূর্বাপ্রকাণ্ড রুচিরাস্বগুরূপভোগাদ্
গৌড়াঙ্গনাসু চিরমেষ চকাস্তু বেষঃ॥

বক্ষে আর্দ্র চন্দন, গলায় সূতার হার, সীমন্ত পর্যন্ত আনত শিরোবসন, অনাবৃত বাহুমূল, অঙ্গে অগুরু-প্রসাধন, অঙ্গবর্ণ যেন 'দূর্বাপ্রকাণ্ড রুচির', অর্থাৎ দূর্বাদলের মত শ্যাম—ইহাই হইতেছে গৌড়াঙ্গনাদের বেষ।

একদিকে এই নগরবাসিনীদের চিত্র, অন্যদিকে সরল স্বভাবসুন্দর পল্লীবাসিনী নারীর চিত্রও আছে। পল্লী অঞ্চলের লোকেরা নগরবাসিনী বিলাসিনীদের বেশভূষা চালচলন পছন্দ করিত না। কবি গোবর্ধনাচার্য বলিতেছেন,

নগর ও পল্লীবাসিনী

ঋজুনা নিধেহি চরণৌ পরিহর সখি নিখিলনাগরাচারম্।
ইহ ডাকিনীতি পল্লীপতিঃ কটাক্ষেঽপি দণ্ডয়তি॥

সখি, সোজা পা ফেলিয়া চল, নাগরাচার সব ছাড়। একটু কটাক্ষপাত করিলেও এখানে পল্লীপতি (গ্রামপতি) ডাকিনী বলিয়া দণ্ড দেন।

পল্লী-সুন্দরীদের প্রসাধন-অলংকরণের কথা বলিয়াছেন কবি চন্দ্রচন্দ্র:

ভালে কজ্জলবিন্দুরিন্দুকিরণস্পর্ধী মৃণালাঙ্কুরো
দোর্বল্লীষু শলাটুকেলিকলোত্তংসশ্চ কর্ণাতিথিঃ
ধম্মিল্লস্তিলপল্লবাভিষবণস্নিগ্ধ স্বভাবাদয়ং
পান্থান্ মন্থরয়ত্যনাগরবধূবর্গস্য বেশগ্রহঃ॥

কপালে কাজলের টিপ, হাতে ইন্দুকিরণস্পর্ধী শাদা পদ্মমৃণালের বালা, কানে কচি কাঁঠাফুলের কর্ণাভরণ, স্নিগ্ধকেশ কবরীতে তিলপল্লব—অনাগর (অর্থাৎ, পল্লীবাসী) বধূদের এই বেশ স্বভাবতই পথিকদের গতি মন্থর করিয়া আনে।

সাধারণ পল্লী ও নগরবাসী দরিদ্র গৃহস্থ মেয়েরা গৃহকর্মাদি তো করিতেনই, মাঠে-ঘাটেও তাঁহাদের খাটিতে হইত সংসারজীবন নির্বাহের জন্য, হাটবাজারেও যাইতে হইত, সওদা কেনাবেচা করিতে হইত, আবার স্বামীপুত্রকন্যাপরিজনদের পরিচর্যাও করিতে হইত। এইরূপ কর্মব্যস্ত মেয়েদের একটি সুন্দর বস্তুময়, কাব্যময় চিত্র আঁকিয়াছেন কবি শরণ। তাঁহারা যে একবস্ত্র পরিহিতা সে-কথাও শরণের এই শ্লোকটিতে জানা যায়। অন্যত্র অন্য প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছি; এখানে শুধু একটি মর্মানুবাদ রাখিলাম।

এই যে হাটের কাজ শেষ করিয়া ধাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে পৌরাঙ্গনারা, তাহাদের দৃষ্টি সন্ধ্যাসূর্যের মত (অরুণবর্ণ)। দ্রুত ধাইয়া চলিবার জন্য তাহাদের স্কন্ধ হইতে বস্ত্রাঞ্চল স্খলিত হইয়া পড়িতেছে বারবার, আর তাহাই বারবার তাহারা তুলিয়া দিতে চাহিতেছে। ঘরের চাষী সেই সকালবেলা মাঠে কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে, এখন তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময়,—এই কথা ভাবিয়া মেয়েরা লাফাইয়া লাফাইয়া ছুটিয়া পথ সংক্ষেপ করিয়া আসিতেছে, আর ব্যস্ত হইয়া হাটে কেনাবেচার দাম আঙুলে গুনিতেছে।

বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে নানা প্রকার ক্ষৌমবস্ত্রের একটু ইঙ্গিত আছে; তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপিতে পড়িতেছি, রত্নদ্যুতিখচিত অংশুক বস্ত্রের কথা। সূক্ষ্ম কার্পাস ও রেশম বস্ত্রের কথা তো নানাসূত্রেই পাওয়া যাইতেছে। ইহা কিছু আশ্চর্যও নয়। বাংলাদেশ যে নানাপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরে সুবিখ্যাত ছিল, এ-কথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও গ্রীক্ পেরিপ্লাস-গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া আরব বণিক সুলেমান (নবম শতক), ভিনিসিয় মার্কো পোলো (ত্রয়োদশ শতক), চীন পরিব্রাজক মা-হুয়ান (পঞ্চদশ শতক) পর্যন্ত সকলেই বলিয়া গিয়াছেন। বস্তুত, অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল। চতুর্দশ শতকে তীরভুক্তি বা তিরহুতবাসী কবি-শেখরাচার্য জ্যোতিরীশ্বর নানাপ্রকারের পট্টাম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের মেঘ-উদুম্বর, গঙ্গাসাগর, গাঙ্গোর, লক্ষ্মীবিলাস, দ্বারবাসিনী, এবং শিল্হটী পট্টাম্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। এ-গুলি বোধ হয় সমস্তই অলংকৃত পট্টবস্ত্র; কারণ ইহার পরই জ্যোতিরীশ্বর বলিতেছেন নির্ভূষণ বঙ্গাল বস্ত্রের কথা। কিন্তু 'ক্ষৌম' বা 'কৌষেয়', 'দুকূল' বা 'পত্রোর্ণ' বস্ত্র, অলংকৃত পট্টবস্ত্র বা কার্পাস বস্ত্র যাহাই হউক, সাধারণ দরিদ্র লোকদের এ-সব বস্ত্র পরিবার সুযোগ ও সংগতি কিছুই ছিল না; তাহাদের ভাগ্যে জুটিত মোটা নির্ভূষণ কার্পাস বস্ত্র মাত্র, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা ছিন্ন ও জীর্ণ। অন্তত কবি বার এবং আরও একজন অজ্ঞাতনামা কবি বাঙালীর দারিদ্র্যের যে ছবি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অন্যতম প্রধান উপকরণ 'স্ফুটিত' জীর্ণ বস্ত্র। এই দুইটি শ্লোকই সদুক্তিকর্ণামৃত হইতে এই গ্রন্থেরই অন্যত্র অন্য প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছি; বাহুল্যভয়ে এখানে শুধু তাহার উল্লেখ রাখিয়া যাইতেছি মাত্র। সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র শুধু মেয়েরাই বোধ হয় পরিতেন; অনেকে নিজেরাই যে সে কাপড়ের সূতা কাটিয়া পাকাইয়া লইতেন, বিশেষভাবে নির্ধন ব্রাহ্মণগৃহের নারীরা, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কবি শুভাংকের নিম্নোদ্ধৃত রাজপ্রশস্তি শ্লোকটিতে।

> কার্পাসাস্থি প্রচরনিচিতা নির্ধনশ্রোত্রিয়াণাং
> যেষাং বাত্যা প্রবিততকুটীপ্রাঙ্গণান্তা বভূবুঃ।
> তৎসৌধানাং পরিসরভুবি ত্বৎপ্রাসাদাদিদানীং
> ক্রীড়াযুদ্ধচ্ছিদুরযুবতীহারমুক্তাঃ পতন্তি॥

> যে-সব দরিদ্র শ্রোত্রিয়দিগের বাটিকাহত কুটীরের প্রাঙ্গণ কার্পাস বীজের দ্বারা আকীর্ণ ছিল, (হে মহারাজ), এখন তোমার কৃপায় সেখানকার সৌধাবলীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যুবতীদের ক্রীড়াযুদ্ধে ছিন্নহারের মুক্তাসমূহ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

সমসাময়িক সাহিত্য ও প্রত্নবস্তুর সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয়, প্রাচীন বাঙালী নারী ও পুরুষ এমন কতকগুলি অলংকার ব্যবহার করিতেন যাহা উভয় ক্ষেত্রেই এক। কর্ণকুণ্ডল ও কর্ণাঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়ক, কণ্ঠহার, বলয়, কেয়ূর, মেখলা, ইত্যাদি নরনারী নির্বিশেষে ব্যবহৃত হইত। নারীরা, সম্ভবত বিবাহিত নারীরা, বিশেষভাবে ব্যবহার করিতেন শঙ্খবলয়। মুক্তাখচিত হারের কথা, মহানীলরত্নাক্ষমালার কথা, বিজয়সেনের নৈহাটি-লিপিতে

পাইতেছি এবং দেওপাড়া-প্রশস্তিতেই শুনিতেছি, রাজবাড়ীর ভৃত্যের স্ত্রীরাও নাকি হার, কর্ণাঙ্গুরী, মালা, মল এবং স্বর্ণবলয় ইত্যাদি পরিতেন, মূল্যবান্ পাথরের তৈরী ফুল ইত্যাদিও ব্যবহার করিতেন। মুক্তাখচিত হার পরিতেন রাজ-পরিবারের মেয়েরা (নৈহাটি-লিপি)। রামচরিতে পড়া যায়, হীরাখচিত নানা সুন্দর অলঙ্কার এবং রত্নখচিত ঘুঙুরের কথা, মুক্তা, মরকত, নীলকান্তমণি, চুণী প্রভৃতি রত্নাদি ব্যবহারের কথা। আর সোনা ও রূপার গহনা তো ছিলই। বলা বাহুল্য, এই সব অলংকরণ-বিলাস ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থদের নাগালের বাহিরে; বড় জোর শঙ্খবলয়, কচি তালপাতার কর্ণাভরণ, এবং ফুলের মালাতেই তাঁহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। দেওপাড়া-প্রশস্তিতে কবি উমাপতি-ধর বলিতেছেন, পল্লীবাসী নির্ধন ব্রাহ্মণ রমণীরা রাজার কৃপায় নগরে আসিয়া বহুবিভবশালিনী হইলেও তাঁহার মুক্তা ও কার্পাসবীজে, মরকত ও শাকপাতায়, রূপা ও লাউফুলে, রত্ন ও পাকা ডালিমের বীজে, সোনা ও কুমড়া ফুলে পার্থক্য যে কি তাহা জানিতেন না!

অলংকরণ

উচ্চকোটিস্তরে বিবাহোপলক্ষে কন্যাকে কি ভাবে সজ্জিত ও অলংকৃত করা হইত, তাহার কিছু বর্ণনা আছে নৈষধচরিতে। প্রসঙ্গত উৎসব-সজ্জার কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। প্রথমেই কুলাচার অনুসারে সধবা ও পুত্রবতী গৃহিণীরা মঙ্গলগীত গাহিতে গাহিতে কন্যাকে স্নান করাইতেন এবং পরে শুভ্র পট্টবস্ত্র পরাইতেন। তারপর সখীরা দময়ন্তীকে কপালে পরাইলেন মনঃশিলার তিলক, সোনার টীপ্, কাজল আঁকিয়া দিলেন চোখে, কর্ণযুগলে পরাইলেন দুইটি মণিকুণ্ডল, ঠোঁটে আল্‌তা, কণ্ঠে সাতলহর মুক্তার মালা, দুই হাতে শঙ্খ ও স্বর্ণবলয়, চরণে আল্‌তা। বিবাহের মাঙ্গলিকানুষ্ঠানে অভ্যস্তা অন্তঃপুরিকারা স্ত্রী-আচারগুলি পালন করিতেন, আর পুরুষেরা ও ব্রাহ্মণেরা বেদোক্ত স্মৃত্যুক্ত কার্য গুলি সম্পাদন করিতেন। বিবাহ-স্থানে আলপনা আঁকা হইত এবং কাজটি করিতেন মেয়েরা। শিল্পীরা নানাপ্রকার রঞ্জিত কাপড় দিয়া তৈরী ফুলে নগরের পথ-ঘাট সাজাইতেন, বাড়ীর দেয়ালে নানা ছবি আঁকিতেন। নানা প্রকার বাদ্যের মধ্যে বাঁশি, বীণা, করতাল, মৃদঙ্গ ছিল প্রধান। বরযাত্রাকালে নগরীর নারীরা বরকে দেখিবার জন্য রাজপথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেন। মঙ্গলানুষ্ঠান উপলক্ষে গৃহতোরণের দুইপাশে কদলীস্তম্ভ রোপণ করা হইত; বাসর ঘরে (কৌতুকগৃহে) আজিকার মতন তখনও চুরী করিয়া চুপি দেওয়া এবং আড়ি-পাতা হইত (সকৌতুকাগারমগাত্ পুরন্ধ্রিভিঃ সহস্র রন্ধ্রোকৃতমীক্ষিতুংততঃ। অধাত্ সহস্রাক্ষতনুভ্রমিত্রতাং অধিষ্ঠিতং যত্ খলু জিষ্ণুনামুনা।।); এবং বরকন্যার গাঁটছড়াও বাঁধা হইত। বরযাত্রীদের পরিচর্যা এবং ভোজনে পরিবেশন করিতেন পুরনারীরা এবং তাঁহাদের লইয়া বরযাত্রীরা নানা প্রকার ঠাট্টা-রসিকতা করিতেও ছাড়িতেন না; সে-সব ঠাট্টা ও রসিকতা আজিকার দিনে খুব মার্জিত বলিয়া মনে হইবার কারণ নাই। পুরনারীরাও নানাপ্রকারে বরযাত্রীদের ঠকাইতে চেষ্টা করিতেন, আজও যেমন করা হয়।

নল-দময়ন্তীর বিবাহ বর্ণনা-সাক্ষ্যে মনে হয়, বিবাহের পরও বর ও বরযাত্রীরা বিবাহ-বাড়িতে ৪।৫ দিন বাস করিতেন। সেই কয়েকদিনও বরযাত্রীরা বারসুন্দরী বা বাররামাদের সঙ্গলাভ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না! বস্তুত, সৌখীন উচ্চস্তরে যুবকদের মধ্যে বাররামাসঙ্গ বোধ হয় খুব দোষের বলিয়া গণ্য হইত না।

বসন-ভূষণ-প্রসাধন-অলংকার প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা টুক্‌রাটাক্‌রা খবর নানাদিক হইতে পাওয়া যায়। ভরতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে (আনুমানিক তৃতীয় শতক) বলিতেছেন, "গৌড়ীনামলকপ্রায়ং সশিখাপাশবেণিকম"—অর্থাৎ গৌড়ীয় নারীদের মাথায় কুঞ্চিত কেশ, এবং তাঁহাদের চুলের বেণীর শেষাংশ থাকিত শিখার মত মুক্ত। রাজশেখর (নবম-দশম শতক) তাঁহার কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে অঙ্গ-বঙ্গ-সুহ্ম-ব্রহ্ম-পুণ্ড্র প্রভৃতি প্রাচ্যবাসীদের বেশ (বেষ) বর্ণনা উপলক্ষ্যে গৌড়-নারীর বেশের (বেষের) যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা একটু আগেই উল্লেখ করিয়াছি।

প্রাচীন বাঙালীর দেহবর্ণ কিরূপ ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় ভরত-নাট্যের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি হইতে।

> শকাশ্চ যবনাশ্চৈব পহ্লবা বাহ্লিকাদয়ঃ
> প্রায়েণ গৌরাঃ কর্তব্যা উত্তরাং যে শ্রিতাদিশম্।
> পাঞ্চালাঃ শূরসেনাশ্চ তথা চৈবোড্রমাগধাঃ
> অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাস্তু শ্যামা কার্যাস্তু বর্ণতঃ॥

> (নাটকের) শক-যবন-পহ্‌লব-বাহ্লিক প্রভৃতি যে সব (পাত্রপাত্রী) উত্তর দেশবাসী তাহাদের দেহের বর্ণ করিতে হইবে সাধারণত গৌর; পঞ্চাল, শূরসেন, উড্র, মগধ এবং অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গবাসীদের বর্ণ করিতে হইবে শ্যাম।

রাজশেখরও বলিতেছেন, "তত্র পৌরস্ত্যানাং (প্রাচ্যবাসীদের) শ্যামো বর্ণঃ, দাক্ষিণাত্যানাং কৃষ্ণঃ, পাশ্চাত্যানাং পাণ্ডুঃ, উদীচ্যানাং গৌরঃ, মধ্যদেশ্যানাং কৃষ্ণঃ শ্যামো গৌরশ্চ।" গৌরাঙ্গনাদের দেহও যে শ্যামবর্ণ, রাজশেখরের এই উক্তি আগেই উল্লেখ করিয়াছি; অন্যত্রও তিনি বলিতেছেন,

> শ্যামেষঙ্গেষু গৌড়ীনাং শুভ্রহারৈহারিষু।
> চক্রীকৃত্য ধনুঃ পৌষ্পমনঙ্গো বল্গু বল্গতি॥

এই সব উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, গৌড়বাসীদের তথা প্রাচ্যবাসীদের দেহবর্ণ সাধারণত ছিল শ্যাম, তবে রাজপরিবার এবং অন্যান্য অভিজাত পরিবারের নরনারীদের দেহবর্ণ যে অনেক সময় হইত গৌর, তাহাও রাজশেখর বলিয়াছেন, "বিশেষস্তু পূর্বদেশে রাজপুত্র্যাদীনাং গৌরঃ পাণ্ডুর্বা বর্ণঃ"।

৪

প্রাচীন বাঙালী সমাজের নানা কামবাসনা ও ব্যসনের কথা নানা প্রসঙ্গে বর্তমান ও অন্যান্য অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এখানে সমস্ত সাক্ষ্য একত্র করিয়া সার সংকলন করা অনুচিত হইবেনা। খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতেই বাংলাদেশ স্বল্পাংশে হইলেও উত্তর-ভারতীয় সদাগরী ধনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এবং উত্তর-ভারতের নাগর-সভ্যতার স্পর্শও তাহার অঙ্গে লাগিয়াছিল। বাৎস্যায়নীয় নাগরাদর্শ বাংলার নাগর-সমাজেরও আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। গৌড়ের যুবক-যুবতীদের কামলীলার কথা, তাহাদের বাসনা ও ব্যসনের কথা এবং গৌড়-বঙ্গের রাজান্তঃপুরের মহিলারা যে নির্লজ্জভাবে ব্রাহ্মণ, রাজকর্মচারী ও দাস-ভৃত্যদের সঙ্গে কাম-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেন তাহার বিবরণ বাৎস্যায়নই রাখিয়া গিয়াছেন। সে-বিবরণ পড়িলে মনে হয়, ভিন্-প্রদেশীরা গৌড়-বঙ্গের যুবক-যুবতীদের এই ধরনের কামবাসনা ও ব্যসনকে খুব সুনজরে দেখিতেন না। স্মৃতিকার বৃহস্পতির কয়েকটি শ্লোক দেবলভট্টের স্মৃতিচন্দ্রিকা-গ্রন্থে ও ভট্ট নীলকণ্ঠের ব্যবহার-ময়ূখ-গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহা হইতে জানা যায়, বৃহস্পতি দুই কারণে বাঙালী দ্বিজবর্ণের লোকদের নিন্দা করিয়াছেন; প্রথম কারণ, তাঁহাদের মৎস্য ভক্ষণ; দ্বিতীয় কারণ, তাঁহাদের সমাজের নারীরা দুর্নীতিপরায়ণা! শুধু বাৎস্যায়নের কালেই নয়, তাহার পরেও প্রাচীন বাঙালী বোধ হয় কাম-বাসনায় সংযম অভ্যাসে অভ্যস্ত হয় নাই। ধোয়ীর পবনদূতেও দেখিতেছি, কাম-চরিতার্থতার অবাধলীলা কবি সোৎসাহে এবং সাড়ম্বরে বিবৃত করিয়াছেন। পবনদূত এবং রামচরিত উভয় কাব্যেই, যে-ভাবে সভানন্দিনীদের উচ্ছ্বসিত স্তুতিগান এবং তাহাদের বিলাসলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, নাগর-সমাজের সমৃদ্ধ উচ্চস্তরে ইঁহাদের আকর্ষণ ও প্রভাব স্বল্প ছিল না, এবং ইঁহারা নাগর-সমাজের বিশেষ অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

জীবনচিত্র

বাসনা ও ব্যসন

নাগরাদর্শ

কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপি ও বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদ-লিপিতে আছে, প্রতি সন্ধ্যায় এইসব সভানন্দিনীদের নূপুর-ঝংকারে সভা ও আমোদগৃহগুলি পরিপূরিত হইত। সন্দেহ নাই, রাজসভায় এবং বিত্তবান্ সমাজে এই নন্দিনীদের বিশেষ একটা স্থান ছিল। তাহা ছাড়া নগরে ও গ্রামে বিত্তবান্দের ঘরে দাসী রাখার প্রথা যে প্রায় সর্বব্যাপী ছিল তাহা তো জীমূতবাহনই দায়ভাগ-গ্রন্থে বলিয়াছেন; এবং টীকাকার মহেশ্বর বলিতেছেন, দাসী রাখা হইত শুধু কামচরিতার্থতার জন্য! এই ধরনের দাসী রাখার প্রথা বাংলাদেশে বহুদিন প্রচলিত। বাৎস্যায়নও ইঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই দাসীরা অস্থাবর সম্পত্তির মত যথেচ্ছ ক্রীত ও বিক্রীত হইতেন; দায়ভাগ-গ্রন্থে বলা হইয়াছে, উত্তরাধিকার সূত্রে একাধিক ব্যক্তি যদি একটি মাত্র দাসীর অধিকারী

হন, তাহা হইলে সেই দাসী প্রত্যেকের অংশানুযায়ী পর পর প্রত্যেকের অধিকারে থাকিবেন।

এর উপর ছিল আবার দেবদাসী প্রথা। বাংলাদেশে এই প্রথার প্রথম উল্লেখ অষ্টম শতকে, এবং তাহা কলহনের রাজতরঙ্গিনী-গ্রন্থে নর্তকী কমলা-প্রসঙ্গে। কমলা ছিলেন পুণ্ড্রবর্দ্ধনের কোনো মন্দিরের প্রধানা দেবদাসী, নৃত্যগীতবাদ্যে সুনিপুণা, বিবিধ কলায় কলাবতী। দেবদাসীরা সাধারণত প্রায় সকলেই নানা কলানিপুণা হইতেন; কমলা আবার তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন আরও উচ্চস্তরের। কিন্তু তাহা হইলেও দেবদাসীরা বিত্তবান্ ও প্রভাবশালী সমাজের কামবাসনা পরিপূরণের সঙ্গিনী হইতেন, সন্দেহ নাই, এবং এই হিসাবে বাররামাদের সঙ্গে তাঁহাদের পার্থক্য বিশেষ কিছু ছিলনা। রামচরিত-কাব্যে তো ইহাদের স্পষ্টত দেব-বারবনিতাই বলা হইয়াছে; পবনদূতে বলা হইয়াছে বাররামা। কলহনের সুদীর্ঘ কমলা-কাহিনী প্রসঙ্গে সমসাময়িক বাংলার দেবদাসীদের জীবনযাত্রা এবং সমাজের উচ্চকোটির লোকদের নৈতিক আদর্শ, বাসনা ও ব্যসনের মোটামুটি একটু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পাল-আমলে এই প্রথা খুব বিস্তৃত ছিলনা; পরে দক্ষিণী প্রভাব ও সংস্পর্শের ফলে ক্রমশ দেবদাসী প্রথা দেশে বিস্তার লাভ করে এবং সেন-বর্মণ আমলে দেবদাসীরা সমাজের উচ্চস্তরের মন ও কল্পনা, কামনা ও বাসনাকে একান্ত ভাবে অধিকার করিয়া বসেন। বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তি এবং ভট্টভবদেবের লিপিতে যে-ভাবে ইহাদের বিলাসলাস্য ও সৌন্দর্যলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে এবং প্রশস্তিকারেরা যে-ভাবে ইহাদের উপর কবিকল্পনার সুনির্বাচিত রূপকালংকার বর্ষণ করিয়াছেন তাহাতে এ-সম্বন্ধে সংশয়ের আর কিছু নাই। ধোয়ী কবি ইহাদের আখ্যা দিতেছেন বাররামা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন, ইহাদের দেখিলে মনে হয়, লক্ষ্মী যেন স্বয়ং সুহ্মদেশে অবতীর্ণা হইয়াছেন তাঁহার পতি মুরারীর পাশে। তিনিই ইঙ্গিত করিতেছেন, সেন-বংশীয় রাজাদের পাশে সর্বদা স্বভাবসুন্দরী বারনারীরা অবস্থান করিতেন, মনে হইত যেন মুরারীর পাশে লক্ষ্মী। আর, ভবদেব-ভট্ট বলিতেছেন, বিষ্ণুমন্দিরে উৎসর্গীকৃত শত দেবদাসীরা যেন কামদেবতাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন, তাঁহারা যেন কামাতুর জনের কারাগৃহ, যেন সঙ্গীত, লাস্য এবং সৌন্দর্যের সভামন্দির!

অথচ, অন্যদিকে সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-গ্রন্থাদি পড়িলে মনে হয়, সমাজের নৈতিকাদর্শ উচ্চে তুলিয়া ধরিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি ছিলনা। ব্রাহ্মণ্য লেখকেরা এবং সমাজের নেতারা সকল প্রকার দুর্নীতি এবং সংযমশাসনবিহীন বল্গাহীন কাম-বাসনার বিরুদ্ধে নিজেদের কণ্ঠ ও লেখনী নিয়োগ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ্যাদর্শ

সমসাময়িক লিপিমালা পাঠ করিলে স্বতই মনে হয়, তাঁহারা জনসাধারণের সম্মুখে যে-সব নৈতিকাদর্শ তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন তাহা চিরাচরিত ঔপনিষদিক, পৌরাণিক এবং রামায়ণ-মহাভারতীয় ব্রাহ্মণ্য নৈতিকাদর্শেরই সমষ্টি; সে-আদর্শ পাতিব্রত্যের, শুভ্র শুচিতার,

ধৈর্য ও সংযমের, শ্রী, শীলতা ও ঔদার্যের, দয়া, দান ও ক্ষমার। প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ-গ্রন্থে সর্বপ্রকারের দুর্নীতি, কামাতুরতা, মদ্যাসক্তি, চৌর্য এবং পরনারী ও পরপুরুষগমনের নিন্দা করা হইয়াছে, এবং এই সব অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দণ্ডের এবং প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলন করিতে বলা হইয়াছে সত্য, দান, শুচিতা, দয়া এবং সংযম প্রভৃতি গুণের।

আংশিকত এই ধরনের আদর্শপ্রচারের ফলে, আংশিকত বৃহত্তর পল্লীসমাজের ধনোৎপাদন ব্যবস্থা ও সামাজিক জীবন-বিন্যাসের ফলে সাধারণ ভাবে প্রাচীন বাঙালী জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হইতে পারে নাই। যে-সব বিলাস-ব্যসন ও অসংযত কামনা-বাসনার কথা একটু আগে বলিয়াছি, তাহা সাধারণত নাগর-সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; পল্লীবাসীরা এই সব নাগরাচার পছন্দ করিতেন না, এবং ইহাদের বিরুদ্ধে পল্লীপতিদের দৃষ্টি সদাজাগ্রত ছিল। গোবর্ধনাচার্যের একটি শ্লোকে তাহার আভাস আগেই আমরা পাইয়াছি। বৃহত্তর পল্লীসমাজে জীবনের একটি সরল শান্ত সহজ আদর্শ ছিল সক্রিয়, এবং সমসাময়িক কালের এই আদর্শকে ব্যক্ত করিয়াছেন কবি শুভাংক।

পল্লীর জীবনাদর্শ

বিষয়পতিরলুব্ধ ধেনুভির্ধাম পূতং
কতিচিদভিমতায়াং সীম্নি সীরা বহন্তি।
শিথিলয়তি চ ভার্যা নাতিথেয়ী সপর্যাম
ইতি সুকৃতিমনেন ব্যঞ্জিতং নঃ ফলেন॥

বিষয়পতি (অর্থাৎ, স্থানীয় শাসনকর্তা) লোভহীন, ধেনুদ্বারা গৃহ পবিত্র, নিজ নিজ ক্ষেত্রে উপযুক্ত চাষ হয়, অতিথি-পরিচর্যায় গৃহিণী কখনও ক্লান্ত হন্ না,—এই সব ফল দ্বারা ইহার পুণ্য (বা সুকৃতি) আমাদের নিকট ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

ইহাই ছিল পল্লীবাসী কৃষিনির্ভর প্রাচীন বাঙালী সমাজের মধ্যবিত্ত লোকদের জীবনাদর্শ। এই সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শের ইঙ্গিত প্রাকৃতপৈঙ্গলের দুই একটি পদেও পাওয়া যায়।

পুত্ত পবিত্ত বহুত্ত ধণা ভত্তি কুটুম্বিণি সুদ্ধমণা।
হাক্ক তরাসই ভিচ্চগণা কো কর বব্বর সগ্গমণা॥

পুত্র পবিত্রমনা, প্রচুর ধন, স্ত্রী ও কুটুম্বিনীরা শুদ্ধচিত্তা, হাঁকে ত্রস্ত হয় ভৃত্যগণ—এই সব ছাড়িয়া কোন্ বর্বর স্বর্গে যাইতে চায়।

অন্য একটি পদে আছে:

সের এক জই পাবই ঘিত্তা
মণ্ডা বীস পকাইল নিত্তা॥
টঙ্ক এক জই সিন্ধব পাআ।
জো হউ রঙ্ক সো হউ রাআ॥

এক সের ঘী যদি পাই তবে নিত্য বিশটা মণ্ডা পাকাই; যদি এক টাকায় সৈন্ধব পাওয়া যায় তবে হোক্ সে নিঃস্ব, তবু সে রাজা।

দরিদ্র নিম্নবিত্ত সমাজে বাঙালীর সনাতন দুঃখ কষ্ট লাগিয়াই ছিল; 'হাড়িতে ভাত

নাই, নিত্যই উপবাস, অথচ ব্যাঙের সংসার বাড়িয়াই চলিয়াছে', 'ক্ষুধায় শিশুদের চোখ ও পেট বসিয়া গিয়াছে, তাহাদের দেহ শবের মত শীর্ণ', 'ভাঙা কলসীতে এক ফোঁটা মাত্র জল ধরে', 'পরিধানে জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র, সেলাই করিবার মত সূঁচও নাই ঘরে', 'ভাঙা কুঁড়েঘরের খুঁটি নড়িতেছে, চাল উড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে'—এই সব ছবি সমসাময়িক সাহিত্যে দুর্লভ নয়। নানা প্রসঙ্গে এই ধরনের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়াছি; এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া লাভ নাই।

দারিদ্র্যাভিশাপক্লিষ্ট নিরানন্দ জীবনের একমাত্র আনন্দ বোধ হয় ছিল গ্রামের বিত্তিম সম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়ীর পার্বণ ব্রত, সম্পন্নতর গৃহের পূজা-উৎসব, এবং দরিদ্রতর স্তরের নানা আদিম কৌমগত যৌথ নৃত্য, গীত ও পূজা। এই সব আশ্রয় করিয়াই মাঝে মাঝে তাঁহারা তাঁহাদের দৈনন্দিন দরিদ্র্য দুঃখ মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন।

দশম-একাদশ-শতকের বাঙালীর নানা টুকরাটাকরা জীবনচিত্র কল্পনায় আঁকিয়া তোলা যায় বাঙালী কবিকুলরচিত সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত নানা প্রকীর্ণ শ্লোকগুলি হইতে। বর্ষায় গ্রাম্য কৃষকযুবকের সুখস্বপ্ন আঁকিয়াছেন কবি যোগেশ্বর; হেমন্তে বাংলার গ্রামাঞ্চলের শোভা ও সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা, বাংলার ভাষা, বাংলার ধর্মকর্ম—বিশেষভাবে শিব ও গৌরী কল্পনা—, সাধারণ মানুষের প্রেম, সুখ-দুঃখ, দারিদ্র্য, ঋতুচর্যা, যুদ্ধ, শৌর্য, কীর্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কিছু কিছু বর্তমান গ্রন্থে নানাপ্রসঙ্গে নানা অধ্যায়ে উদ্ধার করিয়াছি; সব উদ্ধার করা সম্ভব নয়। বাংলার জনসাধারণের যে-সব চিত্র এই শ্লোকগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা যে শুধু সুন্দর, বস্তুময় এবং কাব্যময় তাহাই নয়, অন্যত্র, অন্য উপাদান, অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণে তাহা দুর্লভ। কিন্তু, বাঙালী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আজও এই সব সমসাময়িক জীবন-সাক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই!

চর্যাগীতির অনেকগুলি গীতেও বাঙালীর সমসাময়িক গার্হস্থ্য-জীবনের চিত্র দৃষ্টিগোচর। দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব বোধ হয় বেশ ছিল, শক্ত প্রহরীর প্রয়োজন হইত, দরজায় তালা লাগাইতে হইত। কাহ্নুপাদ বলিতেছেন,

সুনবাহ তথতা পহারী।
মোহ ভাণ্ডার লই সঅলা অহারী॥

শূন্য গৃহে তথতা প্রহরী; মোহভাণ্ডার সকলই কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

আর, সরহপাদের দোহায় আছে, "জই পবন-গমন-দুআরে দিঢ় তালা বি দিজ্জই"। ঘরে তালা লাগাইবার ইঙ্গিত চর্যাপদেও আছে (৯নং)। আয়না ব্যবহারের কথাও আছে (৪৯নং)। চুরি-ডাকাতি যে হইত, সন্দেহ কি? একটি গীতে কুক্কুরীপাদ বলিতেছেন,

চর্যাগীতিতে গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র

আঙ্গণ ঘরপণ সুন বিআতী।
কানেট চোরে নিল অধরাতী॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥

> অজন ঘরের কোনেই ; হে অবধূতি, শোনো, কানেট অর্ধরাত্রে চোরে লইয়া গেল ; শ্বশুর পড়িল ঘুমাইয়া, বহুড়ি আছে জাগিয়া, কানেট নিল চোরে, কোথায় গিয়া আবার তাহা মাগিবে। (কানের গহনা কানে পরিয়াই ঘরের বৌ পড়িয়া ছিল ঘুমাইয়া, মাঝরাত্রে চোর আসিয়া গহনাটি চুরি করিয়া লইয়া গেল। শ্বশুর তখনও ঘুমে ; কিন্তু ভয়ে ভয়ে জাগিয়া বসিয়া আছে বৌ। মনে বড় ভয় ও ভাবনা : চোরের ভয় একদিকে, অন্যদিকে গহনাটি চুরি গিয়াছে—লজ্জা ও অর্থদণ্ড দুইই। কার কাছে চাহিলেই বা গহনা আর পাওয়া যাইবে।)

এই গীতটির মধ্যে ঘরের বৌ-এর একটু চঞ্চল চরিত্রের ইঙ্গিতও যে নাই, এমন নয়। ভয় ও লজ্জা কতকটা সেই জন্যও ; শ্বশুর কি বলিবেন, এই ভাবনা ! এই গীতে একটু পরেই আছে, বৌটির এতই ভয় যে, দিনের বেলা কাকের ভয়েই চীৎকার করিয়া ওঠে, অথচ রাত্রি হইলেই কোথায় যে চলিয়া যায় !

> দিবসই বহুড়ি কাগ ডরে ভাঅ।
> রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥

এই পদটিতে অসতী কুলবধূ সম্বন্ধে সর্বভারত-প্রচলিত একটি উক্তির প্রতিধ্বনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

তখনকার দিনেও গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর একত্র বসিয়া খাওয়া নিন্দনীয় ছিল, দেশাচারে অসিদ্ধ ছিল। দোহাকোষে আছে,

> ঘরবই খজ্জই ঘরিণীএহি জঁহি দেসহি অবিআর।

বিবাহে বরপক্ষ কর্তৃক যৌতুক-গ্রহণের কথা আগেই বলিয়াছি। যৌতুকের লোভে অনেকেই নিম্ন জাতের ভিতর হইতে কন্যাগ্রহণেও আপত্তি করিতেন না।

দোহাকোষে একটি অর্থবহ দোহা আছে। পরনারীতে আসক্ত পুরুষদের দোহাকার উপদেশ দিতেছেন,

> নিঅ ঘরে ঘরিণী জাব ণ মজ্জই।
> তাব কি পঞ্চবর বিহারিজ্জই॥
>
> নিজের ঘরে আপন গৃহিণী যে পর্যন্ত না মজেন সে পর্যন্ত কি পঞ্চবর্ণে বিহার করা যায় ?

বঙ্গাল দেশের সঙ্গে বোধ হয় তখনও পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গের বিবাহাদি সম্পর্ক প্রচলিত ছিল না। তাহা ছাড়া, পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গবাসীরা বোধ হয় বঙ্গালবাসীদের খুব প্রীতির চক্ষেও দেখিতেন না। সরহপাদের একটি দোহায় আছে ; বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহর বিণাণা", অর্থাৎ, বঙ্গে (পূর্ব-বঙ্গ হইতে) লইয়াছিস্ স্ত্রী, পরে (তাহার ফলে) ভাগিল তোর বিজ্ঞান (তোর বুদ্ধি গেল খোয়া)। ভুসুকুপাদের একটি গানে আছে, ভুসুকু যেদিন চণ্ডালীকে নিজের গৃহিণী করিলেন সেদিন তিনি যথার্থ বঙ্গালী হইলেন। অর্থ বোধ হয় এই যে, আগে শুধু জন্মে বঙ্গালী ছিলেন, চণ্ডালীকে যোগসঙ্গিনী করায় যথার্থ বঙ্গালী হইলেন।

শবরদের সম্বন্ধে নানা অধ্যায়ে নানা প্রসঙ্গে নানা কথা বলা হইয়াছে। চর্যাগীতির একাধিক গীতে ইহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। ইহারা বাস করিতেন বড় বড় পাহাড়ের সুউচ্চ শিখরচূড়ায় (বরগিরিসিহর উত্তুঙ্গ মুণি সবরেঁ জহি কিঅ বাস—কাহ্নপাদ)। ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে পর্ণশবরীর ধ্যান-প্রসঙ্গে শবরপাদের একটি গীত উদ্ধার করিয়াছি ; এই গীতটিতে শবর-শবরীদের পার্বত্য জীবন-যাত্রার সুন্দর বর্ণনা আছে। জনবসতি হইতে দূরে উচ্চ পর্বতে শবর-শবরীদের বাস ; শবরী গুঞ্জার মালা পরেন গলায়, কটিতে জড়ান ময়ূরের পাখ, কানে পরেন কুণ্ডল। উন্মত্ত শবর নেশার ঝোঁকে শবরীকে যান ভুলিয়া ; তখন শবরী তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া আবার ঘর সামলান। কুঁড়ে ঘরে খাটিয়ার উপর তাঁহাদের সুখশয়ন : সেই খাটিয়ায় নিবিড় তাঁহাদের মিলন। তাম্বূল (পান) আর কর্পূর তাঁহাদের পূর্বরাগের উপাদান। শরধনু লইয়া শীকার তাঁহাদের জীবিকা। এক একদিন শবর রাগ করিয়া অনেকদূরে পাহাড়ের গুহায় চলিয়া যান ; শবরী তখন একা একা তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ান। এই শবরপাদেরই (ইনি কি নিজেই শবর ছিলেন ?) আর একটি গীত আছে শবরদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ; এ-চিত্রটিও সুন্দর ও বস্তুময়।

শবর-শবরী এবং অন্যান্য অন্ত্যজ বর্ণের জীবনযাত্রা

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিয়েঁ কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥

* * *

হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসম সমতুলা।
সুকড় এ সেরে কপাসু ফুটিলা ॥

* * *

কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর-শবরী মাতেলা।
অণুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভোলা ॥
চারিপাসেঁ ছাইলারে দিয়া চঞ্চালী।
তহিঁ তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণ শিআলী ॥

পাহাড়ের উপর প্রায় আকাশের গায়ে শবর-শবরীর বাড়ী ; বাড়ীর চারধারে কার্পাস গাছে ফুল ফুটিয়া আছে। চিনা ধান (কাগনী ধান) পাকিয়াছে, আর শবর-শবরীদের জীবনে উৎসব লাগিয়াছে। চারিদিকে শকুন আর শেয়ালের বড় উপদ্রব ; ইহারা ক্ষেতে পড়িয়া পক্ক শস্য নষ্ট করে ; বাঁশের চাঁচারীর বেড়া দিয়া সেই জন্য চিনা ধানের ক্ষেত রক্ষা করিতে হয়। ইঁদুরের উপদ্রব ও ছিল ; একটি চর্যাগীতে তাহারও ইঙ্গিত আছে।

ডোম, নিষাদ প্রভৃতিরা গ্রামের বাহিরে উঁচু জায়গায় বাস করিতেন ; ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা ইহাদের ছুঁইতেন না। নৌকায় ছিল ইহাদের যাওয়া আসা ; বাঁশের তাঁত, চাঙাড়ি ইত্যাদি তৈরী ও বিক্রয় ছিল ইহাদের বৃত্তি। নলের তৈরী পেটিকা ছাড়িয়া লোকেরা বাঁশের এই সব জিনিষ কিনিত। একাধিক চর্যাগীতে এই সব উক্তির

সাক্ষ্য বিদ্যমান। বাংলাদেশের নানা জায়গায় এই ধরনের নিম্নজাতীয় যাযাবর নরনারী আজও দেখা যায়; নৌকাই ইহাদের বাড়ীঘর, এবং আজও বাঁশের নানা জিনিষ তৈরী করিয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করা ইহাদের ব্যবসা। মৎস্যজীবী, তন্তুবায়, ধুনুরী, সূত্রধর প্রভৃতি বৃত্তির লোকদের সাক্ষাৎও চর্যাগীতিতে পাওয়া যায়, এবং তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তির টুক্‌রাটাক্‌রা ছবিও দৃষ্টিগোচর হয়। অন্যত্র নানাপ্রসঙ্গে সে-সব উল্লেখ করিয়াছি। একটি গীতে সূত্রধর বা ছুতোর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"জো তরু ছেব ভেবউ ন জানই", যে গাছ ছেদন ও ভেদনের কৌশল জানেনা। স্পষ্টতই বোঝা যাইতেছে, এই দুই কর্মেরই একটা বিশেষ কৌশল ছিল যাহা সকলের আয়ত্ত ছিল না।

অন্ত্যজ বর্ণের যাযাবর ডোম-শবর-পুলিন্দ-নিষাদ-বেদে প্রভৃতিদেরই অন্যতম বৃত্তি ছিল সাপ-খেলানো, যাদুবিদ্যার নানা খেলা দেখানো ইত্যাদি। সাপের উপদ্রব খুবই ছিল; মনসা-পূজাই তাহার অন্যতম সাক্ষ্য। রাজসভায় জাঙ্গলিক বা বিষবৈদ্য অন্যতম রাজপুরুষ ছিলেন; জাঙ্গুলী সাপেরই অন্য নাম। সাপের কামড়ে অনেকেই প্রাণ দিতে হইত; সেই জন্য ওঝা বা বিষবৈদ্যদের সমাজে একটা স্থান ছিল; ইহারাই ছিলেন সাপুড়ে। উমাপতি-ধরের একটি শ্লোকে এই সাপ-খেলানোর সুন্দর বর্ণনা আছে।

ক্ষুদ্রাস্তে ভুজগাঃ শিরাংসি নময়ত্যাদায় যেষামিদং
ভ্রাতর্জাঙ্গলিক ত্বদাননমিলন্মন্ত্রানুবিদ্ধং রজঃ।
জীর্ণস্তেষফণী ন যস্য কিমপি ত্বাদৃশগুণীস্রস্তজা-
কীর্ণক্ষ্মাতলধাবনাদপি ভজত্যানম্রভাবং শিরঃ॥

ভাই জাঙ্গলিক (সাপুড়ে), তোমার এই সাপগুলি ছোট ছোট; তোমার মুখের মন্ত্রপড়া ধূলি ইহাদের মাথা নমিত করিয়া দিতেছে। এই ফণাধারী সাপটি বোধ হয় জীর্ণ (অর্থাৎ প্রবীণ বা অভিজ্ঞ), কেননা তোমার মত গুণী দ্বারা পূর্ণ মাটিতে ধাবন করিয়াও ইহার মাথা নম্রভাব হইতেছে না (অর্থাৎ নমিত হইতেছে না)।

গোবর্ধন-আচার্যের একটি শ্লোকে আছে,

কিং পরজীবৌর্ধ্যসি বিস্ময়মধুরাক্ষি গচ্ছ সখি দূরম্।
অহিমধিচত্বরতুরগগ্রাহী খেলয়তু নির্বিঘ্নঃ॥

হে সখি, সাপ খেলা দেখিতে দেখিতে তোমার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া মধুরতর দেখাইতেছে। অতএব, কেন তুমি পরের জীবনকে বিপদাপন্ন করিতেছ? তুমি দূরে সরিয়া যাও, সাপুড়ে প্রাঙ্গণে নির্বিঘ্নে সাপ খেলা দেখাক্।

সর্বানন্দ বলিতেছেন, বেদিয়ারা সাপ-খেলা দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত।

৫

বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে গৌড়ের নারীদের মৃদুভাষিণী, অনুরাগবতী, এবং কোমলাঙ্গী বলিয়া (মৃদুভাষিণ্যোঽনুরাগবত্যো মৃদ্বঙ্গ্যশ্চগৌড়্যঃ) তৃতীয়-চতুর্থ শতকে যে উক্তি করিয়া গিয়াছেন তাহা আজও মোটামুটি সত্য বলিলে ইতিহাসের অপলাপ করা হয় না। কিন্তু বাৎস্যায়নের উক্তির ভিতর প্রাচীন বাঙালী নারীর সমগ্র ছবিটি পাইতেছিনা; সে-চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার উপাদানও অত্যন্ত স্বল্প। এই অধ্যায়ে এবং অন্যত্র প্রাচীন বাঙালী নারীর কোনো কোনো দিক সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে; তাঁহাদের প্রসাধন-অলংকার, বিলাস-ব্যসন সম্বন্ধে স্বল্প যাহা জানা যায়, তাহা বলিয়াছি; সভানন্দিনী-বাররামা-দেবদাসীদের সম্বন্ধে বলিয়াছি; শবরী-ডোম্বীদের জীবন-যাত্রার কিছু কিছু চিত্র ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি; সম্পন্না, দরিদ্রা ও মধ্যবিত্তা নারীদের কথাও যেটুকু পাওয়া যায় বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যে, ততটুকু বলিয়াছি। তবু, আরও যাহা বলিবার বাকী রহিয়া গেল তাহা না বলিলে ঐতিহাসিকের কর্তব্য করা হইবেনা; এই প্রসঙ্গে সে-কর্তব্য পালন করা যাইতে পারে।

নারী সমাজ

গোড়াতেই বলা চলে, বৃহত্তর হিন্দুসমাজের গভীরে—শিক্ষিত নাগর-সমাজের কথা বলিতেছিনা—আজও যে-সব আদর্শ, আচার ও অনুষ্ঠান সক্রিয় প্রাচীন বাঙালী সমাজেও তাহাই ছিল; যে-সব সামাজিক রীতি ও অনুষ্ঠান পল্লী ও নগরবাসী সাধারণ নারীরা দৈনন্দিন জীবনে আজও পালন করিয়া থাকেন, যে-সব সামাজিক বাসনা ও আদর্শ পোষণ করেন, প্রাচীন বাঙালী নারীদের মধ্যেও মোটামুটি তাহাই ছিল সক্রিয়। বাংলার লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যই তাহার প্রমাণ। যে অসবর্ণ বিবাহ আজও বৃহত্তর হিন্দুসমাজে সুপ্রচলিত এবং সুআদৃত নয়, অথচ মাঝে মাঝে তেমন ঘটিয়াও থাকে, এবং সমাজ ক্রমে সেই বিবাহ স্বীকার করিয়াও লয়, প্রাচীন বাংলায়ও অবস্থাটা ঠিক তাহাই ছিল। দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকের বাঙালী রচিত স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে অসবর্ণ বিবাহের কোনো বিধান নাই, সবর্ণে বিবাহই ছিল সাধারণ নিয়ম, কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ যে প্রাচীন বাংলায় একেবারে অপ্রচলিত ছিলনা তাহার প্রমাণ সমতট-রাজ লোকনাথের মাতামহ পারশব কেশব। কেশবের পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ কিন্তু মাতা বোধ হয় ছিলেন শূদ্রকন্যা; কেশবের পারশব পরিচয়ের ইহাই কারণ। কিন্তু তাহাতে কেশবকে সমাজে কিছু হীনতা স্বীকার করিতে হয় নাই, তাঁহার কন্যা গোত্রদেবী বা দৌহিত্র লোকনাথকেও নয়। কিন্তু কেবল সপ্তম শতকেই বোধ হয় নয়, পরেও এই ধরনের অসবর্ণ বিবাহ কিছু কিছু সংঘটিত হইত; নহিলে পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় সুলতান জলাল্‌-উদ্‌-দীন বা যদুর সভাপণ্ডিত ও মন্ত্রী

বাঙালী বৃহস্পতি মিশ্র যে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্ত নিম্নতর বর্ণ হইতে স্ত্রী গ্রহণে কোনো বাধা নাই, এ-বিধান দিবার কোনো প্রয়োজন হইত না।

বাংলার পাল ও সেন-আমলের লিপিগুলি পড়িলে মনে হয় লক্ষ্মীর মত কল্যাণী, বসুধার মত সর্বংসহা, স্বামীব্রতনিরতা নারীত্বই ছিল প্রাচীন বাঙালী নারীর চিত্তাদর্শ; এবং বিশ্বস্তা, সহৃদয়া, বন্ধুসমা এবং স্থৈর্য, শান্তি ও আনন্দের উৎসস্বরূপা স্ত্রী হওয়াই ছিল তাঁহাদের একান্ত কামনা। স্বামীর ইচ্ছাস্বরূপিনী হওয়াই তাঁহাদের বাসনা; এবং শামুক যেমন প্রসব করে মুক্তা তেমনই মুক্তাস্বরূপ বীর ও গুণী পুত্রের প্রসবিনী হওয়াই সকল বাসনার চরম বাসনা। বন্ধ্যা নারীর জীবন কেহই কামনা করিতেন না। লিপির পর লিপিতে এই সব কামনা, বাসনা ও আদর্শ নানা প্রসঙ্গে বারবার ব্যক্ত হইয়াছে। উচ্চকোটি শিক্ষিত সমাজে মাতা ও পত্নীর সম্মান ও মর্যাদা এই জন্যই বেশ উচ্চই ছিল, সন্দেহ নাই। লিপিগুলিতে উভয়েরই সশ্রদ্ধ ও সসম্মান উল্লেখ তাহার সাক্ষ্য; কোনো কোনো রাজকার্যে রাজ্ঞীর অনুমোদন গ্রহণও তাহার অন্যতম সাক্ষ্য।

সমসাময়িক নারীজীবনের আদর্শ ও কামনা লিপিমালায় আরও সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক বিচিত্র নারীচরিত্রের সঙ্গে সমসাময়িক নারীদের তুলনায় এবং প্রাসঙ্গিক উল্লেখের ভিতর দিয়া। ধর্মপালের মাতা দেদ্দদেবীর তুলনা করা হইয়াছে চন্দ্রদেবতার পত্নী রোহিণী, অগ্নিপত্নী স্বাহা, শিবপত্নী সর্বাণী, কুবেরপত্নী ভদ্রা, ইন্দ্রপত্নী পৌলোমী এবং বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীর সঙ্গে। শ্রীচন্দ্রের পত্নী শ্রীকাঞ্চনার তুলনা করা হইয়াছে শচী, গৌরী এবং শ্রীর সঙ্গে। ধবলঘোষের পত্নী সদ্ভাবা তুলিতা হইয়াছেন ভবানী, সীতা এবং বিষ্ণুজায়া পদ্মা, এবং বিজয়সেন-মহিষী বিলাসদেবী লক্ষ্মী এবং গৌরীর সঙ্গে। সমসাময়িক কামরূপ-শাসনাবলীতেও এই ধরনের তুলনাগত উল্লেখ সুপ্রচুর।

মাতার কামনা ছিল শুভ্র নিষ্কলঙ্ক সুদর্শন সন্তানের জননী হওয়া; প্রসবাবস্থায় কামনানুরূপ সন্তান জন্মলাভ করে এই বিশ্বাসও জননীর মধ্যে সক্রিয় ছিল। শ্রীচন্দ্রের রামপাল-লিপিতে সুবর্ণচন্দ্রের নামকরণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর ইঙ্গিত আছে। প্রসূতির স্বাভাবিক প্রবণতানুযায়ী সুবর্ণচন্দ্রের মাতার ইচ্ছা হইয়াছিল শুক্লপক্ষে নবোদিত চন্দ্রের পূর্ণ ব্যাসরেখা দেখিবার; তাঁহার সে-ইচ্ছা পূরণ হওয়ায় তিনি সোনার মত উজ্জ্বল অর্থাৎ সুবর্ণময় একটি চন্দ্র (অর্থাৎ সুবর্ণচন্দ্ররূপ পুত্র) দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশে সাধারণ লোকদের মধ্যে এ-বিশ্বাস আজও সক্রিয় যে, শুক্লপক্ষের গোড়ার দিকে নবোদিত চন্দ্রের পূর্ণ গোলকরেখা প্রত্যক্ষ করিলে প্রসূতি চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ সুন্দর সন্তান প্রসব করেন।

সংক্রান্তি ও একাদশী তিথিতে এবং সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণে তীর্থস্নান, উপবাস এবং দানে অনেক নারীই অভ্যস্তা ছিলেন; রাজান্তঃপুরিকারাও করিতেন। স্বামী ও স্ত্রী

একই সঙ্গে দান-ধ্যান করিতেন, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়; স্ত্রী ও মাতারা একক অনেক মূর্তি ও মন্দির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, দান-ধ্যান করিতেছেন এ-রকম সাক্ষ্যও সুপ্রচুর। রামায়ণ-মহাভারতের কথা প্রাচীন বাংলায় সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত ছিল, এমন কি নারীদের মধ্যেও। মদনপালের মহিষী চিত্রমতিকা দেবী বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারত আনুপূর্বিক পাঠ ও ব্যাখ্যা করাইয়া শুনিয়াছিলেন এবং নীতিপাঠক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাস্বরূপ মদনপাল কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন।

নারীরা বোধ হয় কখনও কখনও সম্পন্ন অভিজাত গৃহে শিশুধাত্রীর কাজও করিতেন। তৃতীয় গোপালদেব শৈশবে ধাত্রীর ক্রোড়ে শুইয়া খেলিয়া মানুষ হইয়াছিলেন, মদনপালের মনহলি লিপিতে এই রকম একটু ইঙ্গিত আছে। জীমূতবাহনের দায়ভাগ-গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, নারীরা প্রয়োজন হইলে সুতা কাটিয়া, তাঁত বুনিয়া অথবা অন্য কোনো শিল্পকর্ম করিয়া স্বামীদের উপার্জনে সাহায্য করিতেন; কখনো কখনো অর্থলোভে প্ররোচিতা হইয়া স্ত্রীরা স্বামীদের শ্রমিকের কাজ করিতে পাঠাইতেন; এ-ব্যাপারে স্ত্রী-রা নিয়োগকর্তাদের নিকট হইতে উৎকোচ-গ্রহণে দ্বিধাবোধ করিতেন না!

একটি মাত্র স্ত্রী গ্রহণই ছিল সমাজের সাধারণ নিয়ম; সাধারণ লোকেরা তাহাই করিতেন। তবে, রাজরাজড়া, সামন্ত-মহাসামন্তদের মধ্যে, অভিজাত সমাজে, সম্পন্ন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ একেবারে অপ্রচলিত ছিল না, এবং সপত্নী-বিদ্বেষও অজ্ঞাত ছিল না। দেবপালের মুঙ্গের-লিপিতে, মহীপালের বাণগড়-লিপিতে সপত্নী বিদ্বেষের ইঙ্গিত আছে; আবার কোনো কোনো লিপিতে স্বামী সমভাবে সকল স্ত্রীকেই ভালবাসিতেছেন, সে-ইঙ্গিত ও আছে (ঘোষরাবা লিপি)। প্রাচীন বাংলার লিপিমালায় বহুবিবাহের দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর; তবে একপত্নীত্বই যে সুখী পরিবারের আদর্শ তাহা স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপিতে।

প্রাচীন বাংলায়ও বৈধব্যজীবন নারীজীবনের চরম অভিশাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রথমই ঘুচিয়া যাইত সীমন্তের সিঁদুর, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত প্রসাধন-অলংকার, সমস্ত সুখ সম্ভোগ পড়িত খসিয়া। সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যত্র যেমন, প্রাচীন বাংলায়ও কন্যা বা স্ত্রী হিসাবে ছাড়া নারীদের ধনসম্পত্তিতে কোনো বিধি বিধানগত ব্যক্তিগত অধিকার বা সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিলনা। কিন্তু স্মৃতিকার জীমূতবাহন বিধান দিতেছেন, স্বামীর অবর্তমানে অপুত্রক বিধবা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকারের দাবি করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে জীমূতবাহন অন্যান্য স্মৃতিকারদের বিরুদ্ধ মতামত সব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা বিধান দিতেছেন যে, বিধবা স্ত্রী শুধু খোরাকপোষাকের দাবি ছাড়া আর কিছু করিতে পারেন না, কিংবা মৃত স্বামীর ভ্রাতা এবং নিকট আত্মীয়বর্গের দাবি বিধবা স্ত্রী-র দাবি অপেক্ষা অধিকতর বিধিসঙ্গত তাঁহাদের বিধান সজোরে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবশ্য একথা বলিয়াছেন,

সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক বা দানে বিধবার কোনো অধিকার নাই, এবং তিনি যদি যথার্থ বৈধব্য জীবন যাপন করেন তবেই স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। বিধবাকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বামীগৃহে স্বামীর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বাস করিতে হইবে, প্রসাধন-অলংকার-বিলাসবিহীন সংযত জীবন যাপন করিতে হইবে, এবং স্বামীর পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থে যে-সব ক্রিয়াকর্মানুষ্ঠানের বিধান আছে তাহা পালন করিতে হইবে। স্বামীগৃহে যদি কোনো পুরুষ আত্মীয় না থাকেন তাহা হইলে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহাকে পিতৃগৃহে আসিয়া বাস করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ-গ্রন্থ মতে বিধবাদের মৎস্য, মাংস প্রভৃতি যে কোনো রূপ উত্তেজক পদার্থভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল; বৃহদ্ধর্মপুরাণের বিধানও তাহাই। বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বিধবাদের উপস্থিতি অমঙ্গলসূচক বলিয়া তখনও পরিগণিত হইত, এবং তাঁহারা সাধারণত উৎসব ও অন্যান্য মঙ্গলানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। স্বামীর চিতায় সহমরণে যাইবার জন্য তখনও ব্রাহ্মণ্যসমাজ বিধবাদের উৎসাহিত করিতেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বলা হইয়াছে, 'যে-স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায় তিনি স্বামীকে গুরু পাপ হইতে উদ্ধার করেন। নারীর পক্ষে ইহার চেয়ে সাহস ও বীরত্বের কাজ আর কিছু নাই; এই সহমরণের ফলেই স্ত্রী স্বর্গে গিয়া পূর্ণ এক মন্বন্তর স্বামীর সঙ্গে সহবাস করিতে পারেন। স্বামীর মৃত্যুর বহু পরেও একান্ত স্বামীগতচিত্ত হইয়া স্বামীর কোনো প্রিয় বস্তুর সঙ্গে এক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া যে বিধবা আত্মাহুতি দিতে পারেন, তিনিও পূর্বোক্তফল প্রাপ্ত হন।' বৃহদ্ধর্মপুরাণের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, সতীদাহ ও সহমরণপ্রথা প্রাচীন বাংলায়, অন্তত আদিপর্বের শেষ দিকে, অজ্ঞাত ছিলনা।

নারীদের যৌনশুচিতা ও সতীত্বের আদর্শ স্মৃতিকারেরা যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই প্রচার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই; সমাজের মোটামুটি আদর্শও তাহাই ছিল, এ-বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ কম। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হয়, বিত্তবান্ নাগর-সমাজে তাহার ব্যতিক্রমও কম ছিল না। আর, পল্লীসমাজের যে-স্তরে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ পুরাপুরি স্বীকৃত ছিল না, আদিম কৌমগত সামাজিক আদর্শ ছিল বলবত্তর, সে-স্তরে যৌনজীবনের আদর্শই ছিল অন্য মাপের, রীতিনীতিও ছিল অন্যতর। হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শদ্বারা তাহার বিচার চলিতে পারেনা। হাড়ি, ডোম, নিষাদ, শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল প্রভৃতিদের বিবাহ ও যৌনজীবনের রীতিনীতি ও আদর্শ কি ছিল, তাহা জানিতে হইলে আজিকার সাঁওতাল, কোল, হো, মুণ্ডা প্রভৃতিদের ভিতর খুঁজিতে হইবে। ব্রাহ্মণ্য আদর্শ দ্বারা শাসিত সমাজেও অনিচ্ছায়, বলপূর্বক ধর্ষিতা নারী তখনকার দিনেও সমাজে পতিত্ বা সমাজচ্যুত বলিয়া গণ্য হইতেন না; বিধিবদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানেই তাঁহার শুদ্ধি হইয়া যাইত—এ-সাক্ষ্য আমরা পাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। হিন্দুসমাজের নিম্নতম স্তরে বিধবা-বিবাহও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

নাগর-সমাজের উচ্চকোটি স্তরের নারীরা লেখাপড়া শিখিতেন বলিয়া মনে হয়;

পবনদূত-কাব্যে নারীদের প্রেমপত্র-রচনার ইঙ্গিত আছে। নানা কলাবিদ্যায় নিপুণতাও তাঁহাদের অর্জন করিতে হইত, বিশেষ ভাবে নৃত্যগীতে। নট গাঙ্গো বা গাঙ্গোকের পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভা সম্বন্ধে সেক-শুভোদয়ায় যে সুন্দর গল্পটি আছে তাহাই এই উক্তির সাক্ষ্য। জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতীও নৃত্যগীতে সুদক্ষা ছিলেন।

বাৎস্যায়নের সাক্ষ্যে মনে হয়, প্রাচীন বাংলার রাজান্তঃপুরের মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরায় খুব অভ্যস্ত ছিলেন না; পর্দার আড়াল হইতে তাঁহারা অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন। অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠনময়ীর জীবনই সমাজের উচ্চকোটি স্তরে সাধারণ নিয়ম ছিল বলিয়া মনে করিবার হেতু বিদ্যমান। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-লিপিতে রাজান্তঃপুরের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপিতে আছে, বল্লাল সেন তাঁহার বিজিত শত্রুর রাজলক্ষ্মীকে জয় করিয়া আনিয়াছিলেন পাল্কীতে বহন করিয়া। মনে হয়, সম্ভ্রান্ত মহিলারা পথে ঘাটে যাতায়াতকালে পথযাত্রীদের দৃষ্টি হইতে নিজেদের আড়াল করিয়াই চলিতেন। কেশবসেন সুপুরুষ ছিলেন; তাঁহার ইদিলপুর লিপিতে দেখিতেছি, তিনি যখন রাজপথে বাহির হইতেন, পৌরসীমন্তিনীরা সৌধশিখরে উঠিয়া তাঁহার রূপ নিরীক্ষণ করিতেন। কিন্তু, পবনদূতে বিজয়পুরের মহিলাদের যে-বর্ণনা পাইতেছি তাহাতে মনে হয়, তাঁহাদের অবগুণ্ঠনের বালাই খুব বেশি ছিলনা। সম্ভ্রান্ত স্তরে যাহাই হউক, সমাজের যে-স্তরে নারীদের হাঠে-মাঠে-ঘাটে খাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত, নানা কাজে কর্মে শারীরিক শ্রম করিতে হইত তাঁহাদের মধ্যে অবগুণ্ঠিত জীবনযাপনের কোনো সুযোগই ছিলনা, প্রয়োজনও ছিলনা, সে-আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাও ছিলনা। মধ্যবিত্ত কুলমহিলারা অবগুণ্ঠন দিতেন; বস্তুত, অবগুণ্ঠন ছিল তাঁহাদের কুলমর্যাদা জ্ঞাপনের অন্যতম অভিজ্ঞান। এই মধ্যবিত্ত কুলমহিলাদের জীবনচর্যার একটি সুন্দর ছবি রাখিয়া গিয়াছেন কবি লক্ষ্মীধর।

> শিরোযদবগুণ্ঠিতং সহজরূঢ়লজ্জানতং
> গতং চ পরিমন্থরং চরণকোটীলগ্নে দৃশৌ।
> বচঃ পরিমিতং চ মন্মধুরমন্দমন্দাক্ষরং
> নিজং তদিয়মঙ্গনা বদতি নূনমুচ্চৈঃ কুলম্ ॥

অবগুণ্ঠিত শির স্বতই লজ্জানত, গমন মন্থর, দৃষ্টি পায়ে নিবদ্ধ, বাক্য পরিমিত এবং মৃদুমধুর—এই সব দ্বারা এই মহিলা যেন উচ্চস্বরে নিজের কুলমর্যাদা প্রকাশ করিতেছেন।

বাংলার কবি উমাপতি-ধর বাঙালী নারীর সুন্দর একটি প্রাকৃত অথচ অনন্যসাধারণ ছবি আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এবং সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ছবিটি উদ্ধার করিয়াই এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করা যাইতে পারে। একবসনা পল্লীবাসিনী বাঙালী নারী বনের মধ্যে ঢুকিয়াছেন ফুল আহরণের জন্য; একটু উঁচুতে নাগালের বাহিরে গাছের ডালে ফুল ফুটিয়া আছে; পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়া

দাঁড়াইয়া বাহু উপরের দিকে তুলিয়া সুন্দরী ফুল পাড়িতেছেন; নাভিমূল বসনমুক্ত, একদিকের স্তন প্রকাশিত। সুন্দর অনবদ্য কাব্যময়তায় উমাপতি-ধর ছবি আঁকিয়াছেন :

দূরোদঞ্চিত বাহুমূলবিলসচ্চীন প্রকাশ স্তনা—
স্তোকব্যক্ত মধ্যলবিকসনাদিমুক্ত নাভিহ্রদা।
আকৃষ্টোজ্ঝিত-পুষ্প মঞ্জরিরজঃ পাতাবরুদ্ধেক্ষণা
চিন্বত্যাঃ কুসুমং ধিনোতি সুদৃশঃ পাদাগ্র-সুস্থা তনুঃ ॥

একাদশ অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—গৌড়লেখমালা

কৃত্যতত্ত্বার্ণব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি, ৪৬৩০ (বাঙালীর ইতিহাস, ১ম খণ্ডে ব্যবহৃত)।

কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি, fol 58 a।

কলহণ—রাজতরঙ্গিনী, ৪।৪২২ ; ৪।৩৩২।

জীমূতবাহন—কালবিবেক, ৩১৯, ৪০৩।

—দায়ভাগ, ed. and trans. by Colebrooke. pp. 7, 105, 148, 149.

—পিতৃদয়িত, ৪ পৃ।

ধোয়ী—পবনদূতম্, ২৮, ৩৩, ৩৬-৩৮, ৪০, ৪২-৪৪ শ্লোক

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য—কামরূপশাসনাবলী

প্রবোধচন্দ্র সেন—বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৩, ৬৫-৮০ পৃ।

বাৎস্যায়ন—কামসূত্রম্ ; ৫।৬।৫৮ ; ৫।৬।৪১ ; ৬।৫।৩৩ ; ৬।৪।৯

বৃহদ্ধর্মপুরাণ - ব্রহ্মখণ্ড, ১০।১৬৬-৭০ ; প্রকৃতিখণ্ড, ৫১।৭৯।

ভবদেব ভট্ট—প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সং। ৪০, ৫৯, ৬৫-৬৯।

ভরতমুনি—নাট্যশাস্ত্র; ২৩।৬৪ ; ২৩।১০৩-৪।

মণীন্দ্রমোহন বসু—চর্যাপদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং।

রাজশেখর—কাব্যমীমাংসা, তৃতীয় অধ্যায়।

রামচরিত—ed. by Majumdar, Basak and Banerji, V. R. S edn. ৩।৫-২৮ ; ৩।২৯-৩১ ;
৩।৩৫-৩৭।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বৌদ্ধগান ও দোহা। ব-সা-প সং।

শশিভূষণ দাসগুপ্ত—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৪।

শ্রীধরদাস—সদুক্তিকর্ণামৃত।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বিশ্বভারতী পত্রিকা (দ্বাদশ অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য)।

শ্রীহর্ষ—নৈষধচরিত, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সং।

✓সুকুমার সেন—প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা। বিশ্বভারতী।

ক্ষেমেন্দ্র—দর্পোপদেশ।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ১৩২৬, ৮৬ পৃ ; ১০৩ পৃ।

Bagchi, Prabodh Chandra—Materials for a critical edition of the Bengali Caryāpadas. Cal. Univ.

Chakravarti, Taponath—Women in the early inscriptions of Bengal, in B. C. Law Vol. Part Two. p. 243 ff.

Dacca University—History of Bengal, Vol. I. Chap. XV. Sec. VII.

Dikshit, K. N.—Excavations at Paharpur, Arch. Sur. of India Memoir No. 55.

I-tsing—A record of the Buddhist religion, trans. by Takakusu. p. 40.

Majumdar, N. G.—Inscriptions of Bengal, vol. III.

Ramachandran, T. N.—Recent archæological discoveries along the Mainamati and Lalmai ranges, in B C Law Vol. Part Two. p. 213 ff.

দ্বাদশ অধ্যায়

ধর্মকর্ম : ধ্যান-ধারণা

১

প্রাচীন বাঙালীর ধর্মকর্মগত জীবনের সুস্পষ্ট একটি চিত্ররচনা দুরূহ। স্বভাবতই ধর্মকর্মগত মানস-জীবন ব্যবহারিক জীবন অপেক্ষা অনেক বেশি জটিল। তাহার উপর, বর্ণ, শ্রেণী ও কোমবিন্যস্ত সমাজে সে-জীবন জটিলতর হইতে বাধ্য। ধর্মকর্ম-ভাবনা ও সংস্কার বর্ণ, শ্রেণী ও কোমভেদে পৃথক; একই কালে একই বিশ্বাস বা একই পূজা ইত্যাদির রূপ সমাজের সকল স্তরে এক নয়, বিভিন্নকালে বিভিন্ন দেশখণ্ডে তো নয়ই। তা ছাড়া, নূতন কোনো বিশ্বাস বা সংস্কার বা পূজানুষ্ঠান ইত্যাদি সমাজে সহসা প্রচার লাভ করেনা; তাহার প্রত্যেকটির পশ্চাতে বহুদিনের ধ্যান ও ধারণা, অভ্যাস ও সংস্কার লুকানো থাকে, এবং সমাজের ভিতরে ও বাহিরে নানা গোষ্ঠী, নানা স্তর, নানা কোমের ভক্তি-বিশ্বাস-পূজাচার প্রভৃতির যোগাযোগের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাসও আত্মগোপন করিয়া থাকে; কালে কালে সেই ইতিহাস বিবর্তিত হইয়া সমসাময়িক কালের রূপ গ্রহণ করে মাত্র, এবং তাহাও একান্তই সমসাময়িক সমাজ-ভাবনা ও চেতনানুযায়ী, সমসাময়িক সামাজিক শ্রেণী ও স্তর বিশেষ অনুযায়ী। কোনো শ্রেণীগত বা কোমগত বিশ্বাস বা সংস্কারই আবার একান্তভাবে সেই শ্রেণী বা কোমের মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকে না; অন্যান্য শ্রেণী ও কোম, স্তর ও উপস্তরের সঙ্গে পরস্পর যোগাযোগের ফলে এবং সেই যোগাযোগের শক্তি ও পরিমাণ অনুযায়ী এক শ্রেণী ও কোমের, স্তর ও অংশের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, অনুষ্ঠান প্রভৃতি অন্য শ্রেণী ও কোমে, স্তর ও অংশে সঞ্চারিত হয়, এবং দ্রুত বা দীর্ঘ মিলন-বিরোধের ভিতর দিয়া অনবরতই নূতন নূতন ধ্যান-ধারণা, ভক্তি-বিশ্বাস, অনুষ্ঠান-উপাচার প্রভৃতি সৃষ্টি লাভ করিতে থাকে। যে-শ্রেণী বা কোমের আত্মিক ও ব্যবহারিক শক্তি বেশি সেই শ্রেণী বা কোমের ধর্মকর্মগত জীবন অধিকতর সক্রিয়, এবং তাহারা যেমন অন্য শ্রেণী ও কোমের ধর্মকর্মগত জীবনকে বেশি প্রভাবান্বিত করে, তেমনই নিজেরাও সে-জীবন দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় দুইই একই সঙ্গে সমান গতিতেই চলে এবং স্থূল লোকচক্ষুর আড়ালে একটা জটিল সমন্বয় সমানেই চলিতে থাকে।

যুক্তি

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই সমন্বয়ের গতি-প্রকৃতি সমাজবিজ্ঞানীর চোখে বহুদিন ধরা

পড়িয়াছে, এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক জনতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলাপ-আলোচনা যত অগ্রসর হইতেছে ততই আমরা স্পষ্ট জানিতেছি যে, আজ আমরা যাকে হিন্দু ধর্মকর্মসাধনা বলিয়া দেখি বা যাহাকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সাধনা বলিয়া জানি তাহা একদিকে আর্য ও অন্যদিকে প্রাক্-আর্য বা অনার্য ধর্মকর্মসাধনার সমন্বিত রূপ মাত্র। অরণ্যচারী হিংস্র উলঙ্গ অর্ধমানবের কোম হইতে আরম্ভ করিয়া কত কোম, কত শ্রেণী, কত স্তর, কত দেশখণ্ডের মানুষের ধর্মকর্মসাধনা যে এই চলমান্ আর্য-ব্রাহ্মণ্য স্রোতপ্রবাহে তাহাদের ক্ষীণ ও বেগবান্ প্রবাহ মিশাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বস্তুত, আর্য-ব্রাহ্মণ্য সাধনায় যথার্থ আর্যপ্রবাহ মূলত ক্ষীণ; ক্রমে ক্রমে কালে কালে নানা বিচিত্র প্রবাহ সে-প্রবাহে সমন্বিত হওয়ার ফলে আজ সে-প্রবাহ প্রশস্ত ও ও বেগবান। সচেতন সক্রিয়তায় সমন্বয়ের এই কাজটির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ নায়কেরা, এ-কথা যেমন সত্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিরোধটাও তাঁহাদের দিক হইতেই দেখা দিয়াছিল, এ-কথাও তেমন সত্য। কিন্তু, প্রাথমিক বিরোধের পর স্বীকৃতি যখন অনিবার্য হইয়া উঠিল তখন সমন্বয়ের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণের নায়কত্ব তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই। অন্য দিকে, প্রাক-আর্য বা অনার্য আদিবাসীরা যে বিনা বাধায় বা বিনা বিরোধে আর্য বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মের আদর্শ বা অনুষ্ঠান ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন বা চলমান প্রবাহে নিজেদের ধারা মিশাইয়াছিলেন, তাহাও নয়। জৈব প্রকৃতিই হইতেছে নিজের বিশ্বাস ও সংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখা; চলমান আর্যপ্রবাহে স্বীকৃতি লাভের পরও বহু বিশ্বাস বহু সংস্কার বহু আচারানুষ্ঠান এই জৈব প্রকৃতির বশেই নিজেদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। কালে কালে ক্রমে ক্রমে তাহার কিছু কিছু চলমান প্রবাহে স্বীকৃতিলাভ করিয়া তাহার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, হয় অবিকৃত না হয় বিবর্তিত রূপে। অবান্তর হইলেও উল্লেখ করা প্রয়োজন, আর্য-অনার্যের এই সমন্বয় ক্রিয়া আজও চলিতেছে; আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্ম আজও লোকায়ত অনার্য ধর্মকর্মের অনেক আচারানুষ্ঠান, দেবদেবী ধীরে ধীরে নিজের কুক্ষিগত করিতেছে, কোথাও তাহাদের চেহারার আমূল পরিবর্তন করিয়া, কোথাও একেবারে অবিকৃত রূপে। বাংলাদেশে মোটামুটি খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে আর্যধর্মের প্রবাহ প্রবলতর হওয়ার সময় হইতেই সদ্যোক্ত সমন্বয় ক্রিয়া চলিতে আরম্ভ করে; মধ্যযুগে এই সমন্বয়-সাধনা সামাজিক চেতনার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং আজও তা চলিতেছে লোকচক্ষুর অগোচরে।

সমন্বয়

বাঙালীর ইতিহাসের আদিপর্বে এই সমন্বয় সাধনার সাক্ষ্য খুব বেশি উপস্থিত নাই, কিন্তু তখনকার দিনের বাঙালী সমাজে ও বাংলা সংস্কৃতিতে এর চেয়ে বড় সত্য কমই আছে। বস্তুত, বাঙালীর ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হইতেছে রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কোমের, এক কথায় বাংলার আদিবাসিদেরই পূজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস। শুধু বাঙালীরই বা বলি কেন,

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোকদের ধর্মকর্ম সম্বন্ধেই এ-কথা সত্য। এ-তথ্য সর্বজনস্বীকৃত যে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারানুষ্ঠান, নানা দেবদেবীর রূপ ও কল্পনা, আহার-বিহারের ছোঁয়াছুঁয়ি অনেক কিছুই আমরা সেই আদিবাসীদের নিকট হইতে আত্মসাৎ করিয়াছি। বিশেষভাবে হিন্দুর জন্মান্তরবাদ, পরলোক সম্বন্ধে ধারণা, প্রেততত্ত্ব, পিতৃতর্পণ, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধাদি সংক্রান্ত অনেক অনুষ্ঠান, আভ্যুদয়িক ইত্যাদি সমস্তই আমাদেরই প্রতিবাসীর এবং আমাদের অনেকেরই রক্তস্রোতে বহমান সেই আদিবাসী রক্তের দান। হিন্দুর ধর্মকর্মের গোড়ায় এ-কথাটা না জানিলে অনেকখানিই অজানা থাকিয়া যায়।

আর্যপূর্ব ও আর্যেতর ধর্ম

বাঙালীর ইতিহাস বলিতে বসিয়া বাংলার কথাই বিশেষভাবে বলি, সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়া লাভ নাই। গ্রন্থারম্ভে এক অধ্যায়ে বলিয়াছি, ভারতীয় আদিবাসিরা, অন্যান্য দেশের অনেক আদিবাসিদের মতো, বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফল, ফুল, পশু, পক্ষী, বিশেষ বিশেষ স্থান ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিত; এখনও খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী, বুনো, শবর ইত্যাদি কোমের লোকেরা তাহাই করিয়া থাকে। বাংলাদেশে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজের মেয়েদের মধ্যে, বিশেষত পাড়াগাঁয়ে, গাছপূজা এখনো বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে তুলসী গাছ, সেঁওড়া গাছ ও বটগাছ। অনেক পূজায় ও ব্রতোৎসবে গাছের একটা ডাল আনিয়া পুঁতিয়া দেওয়া হয়, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মস্বীকৃত দেবদেবীর সঙ্গে সেই গাছটিরও পূজা হয়। আমাদের সমস্ত শুভানুষ্ঠানে যে আম্রপল্লবের ঘটের প্রয়োজন হয়, যে-কলাবৌর পূজা হয়, অনেক ব্রতে যে ধানের ছড়ার প্রয়োজন হয়, এ-সমস্তই সেই আদিবাসিদের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের এবং বিশ্বাস ও ধারণার স্মৃতি বহন করে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, এই সব ধারণা, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান আদিম কৃষি ও গ্রামীণ সমাজের গাছ-পাথর পূজা, প্রজনন শক্তির পূজা, পশুপক্ষীর পূজা প্রভৃতির স্মৃতি বহন করে। বিশেষ বিশেষ ফলমূল সম্বন্ধে আমাদের সমাজে যে সব বিধিনিষেধ প্রচলিত, যে সব ফলমূল—যেমন, শাক, চাল-কুমড়া, কলা ইত্যাদি—আমাদের পূজার্চনায় উৎসর্গ করা হয়, আমাদের মধ্যে যে নবান্ন উৎসব এবং আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান প্রচলিত, আমাদের ঘরের মেয়েরা যে সব ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি করিয়া থাকেন, বস্তুত, আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচারানুষ্ঠানই বাংলার আদিমতম জন ও কোমদের ধর্মবিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। আমাদের নানা আচারানুষ্ঠানে, ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আজও ধান, ধানের গুচ্ছ, ধানদূর্বার আশীর্বাদ, কলা, হলুদ, সুপারি, পান, নারিকেল, সিন্দুর, কলাগাছ, ঘট, ঘটের উপর আঁকা প্রতীক চিহ্ন, নানাপ্রকার আলপনা, গোবর, কড়ি, প্রভৃতি অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। বস্তুত, আমাদের আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে যাহা কিছু শিল্প-সুষমাময় তাহার অনেকখানিই এই আদিবাসিদের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশে, বিশেষভাবে পূর্ব-বাংলায়,

এক বিবাহ-ব্যাপারেই পানখিলি, গাত্রহরিদ্রা, গুটিখেলা, ধান ও কড়ির স্ত্রী আচার, খৈ ছড়ানো, লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপনা, দধিমঙ্গল প্রভৃতি সমস্তই আদিবাসিদের দান বলিয়া অনুমিত। বস্তুত, বিবাহ-ব্যাপারে সম্প্রদান, যজ্ঞ, এবং সপ্তপদী অর্থাৎ মন্ত্র অংশ ছাড়া আর সবটাই অবৈদিক, অস্মার্ত ও অব্রাহ্মণ্য। অন্যান্য অনেক ব্যাপারেও তাই। পূজার্চনার মধ্যে ঘটলক্ষ্মীর পূজা, ষষ্ঠীপূজা, মনসাপূজা, লিঙ্গ-যোনী পূজা, শ্মশান-শিব ও ভৈরবের পূজা, শ্মশান-কালী পূজা প্রভৃতির প্রায় সব বা অধিকাংশই মূলত এই সব আদিবাসিদের ধর্মকর্মানুষ্ঠান হইতেই আমরা গ্রহণ করিয়াছি, অল্পবিস্তর রূপান্তর ও ভাবান্তর ঘটাইয়া।) এই সব আচারানুষ্ঠানের প্রত্যেকটির সুবিস্তৃত বিশ্লেষণ এবং ইহাদের রহস্য উদ্ঘাটন আমাদের সাংস্কৃতিক জনতত্ত্বের আলোচনা-গবেষণার বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়; মাত্র দুই চারিটি আচারানুষ্ঠানের জীবনেতিহাস আমরা জানি, যেমন চড়কপূজা, হোলী, ষষ্ঠীপূজা, চণ্ডী-দুর্গা-কালী প্রভৃতি মাতৃকাতন্ত্রের পূজা, মনসাপূজা, পৌষপার্বণ, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি। আগেও বলিয়াছি, এবং একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, এই সব আচারানুষ্ঠানের অনেকগুলিই মূলত গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের প্রধানতম ও আদিমতম ভয়-বিস্ময়-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকল কথা বলিবার বা আলোচনা-গবেষণার স্থান ও সুযোগ এই গ্রন্থ নয়, উপায়ও নাই; তবু ইঙ্গিতটুকু ধরিয়া না দিলে বাঙালীর ধর্মকর্মানুষ্ঠানের গোড়ার কথাটি, তাহার অন্তর্নিহিত অর্থটি বুঝা যাইবেনা।

২

এই ইঙ্গিত ধরিবার উপাদান-উপকরণ সুপ্রচুর, এবং তাহা বাংলার সর্বত্র পথে ঘাটে, বাঙালীর জীবনচর্যার নানাক্ষেত্রে ইতস্তত ছড়াইয়া আছে। সাংস্কৃতিক জনতত্ত্ব লইয়া যাঁহারা আলোচনা-গবেষণা ইত্যাদি করিয়া থাকেন তাঁহারা এ-সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয়, আমাদের ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের দিক্ হইতে এই সব ইঙ্গিত ফুটাইবার প্রয়োজনীয়তা আজও খুব স্বীকার করেন না। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় জরীপ ও অনুসন্ধান যে-ভাবে হইয়া থাকে, এ-ক্ষেত্রে আজও তাহার সূত্রপাতই হয় নাই। অথচ, বহুদিন আগে বহুভাবে রবীন্দ্রনাথ এ-সম্বন্ধে আমাদের সজাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই প্রেরণায় কিছু কিছু কাজও কেহ কেহ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে-কাজ জন-বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে করা হয় নাই বলিয়া তাহা যথার্থ ফলপ্রসূও হয় নাই।

অথচ, আজিকার দিনে কিংবা আদি ও মধ্যযুগে 'ভদ্র', উচ্চস্তরের বাঙালী জীবনে যে ধর্মকর্মানুষ্ঠানের প্রচলন আমরা দেখি ও যাহাকে আমরা বাঙালীর ধর্মককর্ম-জীবনের বিশিষ্টতম ও প্রধানতম রূপ বলিয়া জানি, অর্থাৎ বিষ্ণু, শিব, সূর্য, দেবী, গণেশ, অসংখ্য বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ও তান্ত্রিক বিচিত্র দেবদেবী লইয়া আমাদের যে ধর্মকর্মের জীবন তাহা একান্তই আর্য ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন-তান্ত্রিক ধর্মকর্মের চন্দনানুলেপনমাত্র এবং

তাহা, সংস্কৃতির গভীরতা ও ব্যপকতার দিক্ হইতে, একান্তই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে ধর্মকর্মময় সাংস্কৃতিক জীবন বাঙালীর গভীরে বিস্তৃত, যে-জীবন নগরের সীমা অতিক্রম করিয়া গ্রামে কুটীরের কোনে, চাষীর মাঠে, গৃহস্থের আঙিনায়, ফসলের ক্ষেতে, গ্রাম্য-সমাজের চণ্ডীমণ্ডপে, বারোয়ারী তলায়, নদীর পাড়ে বটের ছায়ায়, জনহীন শ্মশানে, অন্ধকার অরণ্যে, নৃত্য-সঙ্গীত-পূজা-আরাধনার বিচিত্র আনন্দে, দুঃখ-শোক-মৃত্যুর বিচিত্র লীলায় বিস্তৃত, সেই ধর্মকর্মময় সংস্কৃতি আর্য-মনের, আর্য ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন-তান্ত্রিক ধর্মকর্মের সাধনা ও অনুষ্ঠানের নীচে চাপা পড়িয়া আছে। এই চাপা পড়ার ফলে কোথাও কোথাও তাহা কণ্ঠ ও নিশ্বাসরোধে একেবারে মরিয়া গিয়াছে, তাহার নিষ্প্রাণ কঙ্কাল শুধু বর্তমান; কোথাও কোথাও উপরের স্তরের চক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া এখনও বাঁচিয়া আছে—নিশীথ অন্ধকারে লোকালয় অতিক্রম করিয়া ভয়কম্পিত হৃদয়ে সুদীর্ঘ সঙ্কটময় পথ ধরিয়া নদীর ধারে বা প্রান্তরের সীমান্তে শ্মশানের ধারে গিয়া লোকালয়েরই লোক সেই সংস্কৃতির পাদমূলে একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া তেমনই নিভৃতে গোপনে ফিরিয়া আসে। আবার কোথাও কোথাও নিজেরই প্রাণশক্তির জোরে সে তাহার নিজের একটু স্থান করিয়া লইয়াছে আর্য ধর্মকর্মের একটি প্রান্তে; আবার অন্যত্র হয়তো প্রাণশক্তিরই প্রাবল্যে আর্য ধর্মকর্মের ভাব ও রূপ উভয়ই দিয়াছে বদলাইয়া। এই রুদ্ধ ও মৃত, মরণোন্মুখ অথবা চলমান ধর্মকর্ম স্রোতের সকল চিহ্ন তুলিয়া ধরিবার উপায় এখানে নাই; দুই চারিটি ইঙ্গিত তুলিয়া ধরা চলে মাত্র।

বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের কৃষিজীবনের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন, মাঠে হল চালনার প্রথম দিনে, বীজ ছড়াইবার, শলিধান বুনিবার, ফসল কাটিবার বা ঘরে গোলায় তুলিবার আগে নানা প্রকারের আচারানুষ্ঠান বাংলার নানা জায়গায় আজও প্রচলিত। এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই বিচিত্র শিল্পসুষমায় এবং জীবনের সুসম আনন্দে মণ্ডিত; কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, ইহার একটিতেও সাধারণত কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয়না। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এই সব পূজানুষ্ঠানের অধিকারী। নবান্ন উৎসব বা নূতন গাছের বা নূতন ঋতুর প্রথম ফল ও ফসলকে কেন্দ্র করিয়া যে সব পূজানুষ্ঠান আমাদের মধ্যে প্রচলিত তাহার মূলেও একই চিত্তধর্মের একই বিশিষ্ট প্রকৃতি সক্রিয়। শুধু কৃষিজীবনকে আশ্রয় করিয়াই নয়, শিল্পজীবনেও দেখা যায়, বিশেষ বিশেষ দিনে কামারের হাঁপর, কুমোরের চাকা, তাঁতীর তাঁত, চাষীর লাঙ্গল, ছুতোর-রাজমিস্ত্রীর কারুযন্ত্র প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া এক ধরনের ধর্মকর্মানুষ্ঠান আজও প্রচলিত; তাহারই কিছুটা আর্যীকৃত সংস্কৃতরূপ আমরা বিশ্বকর্মাপূজার মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু মূলত এই ধরনের পূজাচারেও ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কোনো প্রয়োজন হয় না। উৎপাদন-যন্ত্রের এই পূজাচারের সঙ্গে আদিবাসিদের প্রজনন শক্তির পূজাচারের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যাহাই হউক, এই সব গ্রাম্য কৃষি ও কারুজীবনের পূজাচারকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙালীর ধর্মকর্মময় জীবনের অনেক সৃষ্টির আনন্দ ও উদ্যোগ,

শিল্পময় জীবনের অনেক মাধুর্য ও সৌন্দর্য, এই সব আচারানুষ্ঠানের অনেক আবহ ও উপচার আমাদের 'ভদ্র'স্তরের আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে অনুস্যূত হইয়া গিয়াছে।

অনেকে নিশ্চয়ই জানেন, বাংলার পাড়াগাঁয়ে সর্বত্রই গ্রামের বাহিরে জনপদসীমার বাহিরে 'থান' বা 'স্থান' বলিয়া একটা জায়গা নির্দিষ্ট থাকে; কোথাও কোথাও এই 'থান' উন্মুক্ত আকাশের নীচে বা গাছের ছায়ায়; কোথাও কোথাও গ্রামবাসীরা তাহার উপর একটা আচ্ছাদনও গড়িয়া দেয়। এই 'থান' বা স্থানে—সংস্কৃতরূপ দেবস্থান বা দেওথান—মূর্তিরূপী কোনো দেবতা অধিষ্ঠিত কোথাও থাকেন, কোথাও থাকেন না; কিন্তু থাকুন বা না-ই থাকুন, সর্বত্রই তিনি পশু ও পক্ষী বলি গ্রহণ করিয়া থাকেন। গ্রামবাসীরা তাঁহার নামে 'মানৎ' করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ভয়ভক্তি করেন, এবং যথারীতি তাঁহাকে তুষ্ট রাখার চেষ্টাও করেন সকলেই, কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, গ্রামের ভিতরে বা লোকালয়ে তাঁহার কোনো স্থান নাই। 'গ্রাম-দেবতা' সর্বত্র একই নামে বা একই রূপে পরিচিত নহেন; সাম্প্রতিক বাংলায় কোথাও তিনি কালী, কোথাও ভৈরব বা ভৈরবী, কোথাও বনদুর্গা বা চণ্ডী, কোথাও বা অন্য কোনো স্থানীয় নামে পরিচিত। কিন্তু যে নামেই পরিচিত তিনি হউন, পুরুষ বা প্রকৃতি-তন্ত্রেরই হউন, সংশয় নাই যে, সর্বত্রই তিনি প্রাক-আর্য আদিম গ্রামগোষ্ঠীর ভয়-ভক্তির দেবতা। আদিবাসীদের এই সব গ্রাম্য দেবতাদের প্রতি আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি খুব শ্রদ্ধিতচিত্ত ছিল না। ব্রাহ্মণ্য বিধানে গ্রাম্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ; মনু তো বারবার এই সব দেবতার পূজারীদের পতিত্ই বলিয়াছেন। কিন্তু কোনো বিধান, কোনো বিধিনিষেধই ইহাদের পূজা ঠেকাইয়া রাখিতে আজও পারে না, আগেও পারে নাই। ইহাদের কেহ কেহ ক্রমশ ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন, এমনও বিচিত্র নয়। শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানাপ্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডমালিনী শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এই ভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মকর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; দুই চারি ক্ষেত্রে তাহার কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়। পরে তাহা বলিতেছি।

গ্রাম-দেবতা

প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন, গরুড়ধ্বজা, মীনধ্বজা, ইন্দ্রধ্বজা, ময়ূরধ্বজা, কপিধ্বজা প্রভৃতি নানাপ্রকারের ধ্বজাপূজা ও উৎসব এক সময় আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না; ঐতিহাসিক প্রমাণও কিছু কিছু আছে। শক্রধ্বজ বা ইন্দ্রধ্বজের পূজা যে একাদশ শতকের আগে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ তো গোবর্ধন আচার্যই রাখিয়া গিয়াছেন। শক্রোত্থান বা শক্রধ্বজা পূজার কথা জীমূতবাহনের কালবিবেক-গ্রন্থেও পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, হংসধ্বজ প্রভৃতি

ধ্বজা পূজা

নাম প্রাচীন কালের রাজ-রাজড়ার ভিতর একেবারে অপ্রতুল নয়। এক এক কোম বা গোষ্ঠীর এক এক পশু বা পক্ষীলাঞ্ছিত ধ্বজা; সেই ধ্বজার পূজাই বিশেষ গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কোমগত পূজা এবং তাহাই তাঁহাদের পরিচয়; সেই কোমের যিনি নায়ক বিশেষ বিশেষ লাঞ্ছন অনুযায়ী তাঁহার নাম তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, বা হংসধ্বজ। এই ধরনের পশু বা পক্ষীলাঞ্ছিত পতাকার পূজা আদিম পশুপক্ষী হইতেই উদ্ভূত; বহু পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক দেবদেবীর রূপ-কল্পনায় তাহা পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই। প্রমাণ, আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন; দেবীর বাহন সিংহ, কার্তিকের বাহন ময়ূর, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, শিবের বাহন নন্দী, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচক, সরস্বতীর বাহন হংস, ব্রহ্মার বাহন হংস, গঙ্গার বাহন মকর, যমুনার বাহন কূর্ম, সমস্তই সেই আদিম পশুপক্ষী পূজার অবশেষ। আদিম কোমগত পূজার উপর ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের সঙ্গে এই সব পশু-পক্ষীরাও আজও আমাদের পূজা লাভ করে, সন্দেহ কি? দেবদেবীর মূর্তিপূজার সঙ্গে এই সব পশুপক্ষীলাঞ্ছিত ধ্বজাপূজার প্রচলন সুপ্রাচীন। বেদী বা মন্দিরের সম্মুখে স্তম্ভের উপর বা মন্দিরের চূড়ায় উড্ডীয়মান ধ্বজা বা কেতনের পূজা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক বেশনগরের (মান্দাশোর, মধ্যভারত) সেই গরুড়ধ্বজ, তালধ্বজ, মকরকেতন প্রভৃতির পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া আজিকার চড়কপূজা, ধর্মপূজা, অশ্বত্থ ও অন্যান্য বৃক্ষপূজা পর্যন্ত সর্বত্রই বর্তমান। সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়া, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি আদিবাসী কোম এবং বাঙালীর তথাকথিত অন্ত্যজ বা নিম্নস্তরের জনসাধারণের মধ্যে কোনো ধর্মকর্ম ধ্বজা এবং ধ্বজাপূজা ছাড়া অনুষ্ঠিতই হয় না প্রায় বলা চলে। সমস্ত উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত জুড়িয়া ধর্মস্থান বা 'থানে'র সঙ্গে ধ্বজা এবং ধ্বজাপূজার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য।

গাছপূজা, নানা প্রকারের মাতৃতন্ত্রীয় দেবীর পূজা, ক্ষেত্রপালের পূজা, নানা লৌকিক দেবতা-উপদেবতার পূজার কথা আগেই বলিয়াছি। গ্রামের উপান্তে বসতির বাহিরে যে-সব জায়গায় এই সব অনুষ্ঠান হইত এবং এখনও হয় সেই সব পূজাস্থানকে আশ্রয় করিয়া বাংলার নানাজায়গায় নানা-তীর্থস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ধরনের গাছ বা অন্যান্য গ্রাম্য লৌকিক দেবদেবীর পূজার কিছু কিছু বিবরণ বাঙালীর প্রাচীনতম সাহিত্যে বিধৃত হইয়া আছে। বটগাছের পূজা সম্বন্ধে কবি গোবর্দ্ধন-আচার্যের একটি শ্লোক আছে:

গাছপূজা

ত্বয়ি কুগ্রাম বটদ্রুম বৈশ্রবণো বসতু বা লক্ষ্মীঃ।
পামরকুঠারপাতাৎ কাসরশিরসৈব তে রক্ষা॥

হে কুগ্রামের বটগাছ, তোমার মধ্যে বৈশ্রবণের (কুবেরের) অথবা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান থাকুক বা না থাকুক, মূর্খ গ্রাম্য লোকের কুঠারাঘাত হইতে তোমাকে রক্ষা করে শুধু মহিষের শৃঙ্গতাড়না।

সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে গ্রাম্য লৌকিক দেবদেবী পূজার একটি ভাল বিবরণ পাওয়া যায়;

তৈস্তৈর্জীবোপহারৈর্গিরি কুহরশিলা সংশ্রয়ানর্চয়িত্বা
দেবীং কান্তারদুর্গাং রুধিরমুপতরু ক্ষেত্রপালায় দত্ত্বা ।
তুম্বীবীণা বিনোদ ব্যবহৃত সরকাস্বহি জীর্ণে পুরাণীং
হালাং নালক্বকোষেষু্বতি সহচরা বর্বরাঃ শীলয়ন্তি ॥

বর্বর [গ্রাম্যলোকেরা] নানা জীববলি দিয়া পাথরের পূজা করে, রক্ত দিয়া কান্তারদুর্গার পূজা করে, গাছতলায় ক্ষেত্রপালের পূজা করে, এবং দিনের শেষে তাহাদের যুবতী সহচরীদের লইয়া তুম্বীবীণা বাজাইয়া নাচগান করিতে করিতে বেলের খোলায় মদ্যপান করিয়া আনন্দে মত্ত হয় ।

কৃষিকর্ম সংক্রান্ত নানাপ্রকার দেবদেবীর পূজার কথাও আগেই বলিয়াছি। আখমাড়াই ঘরের (বা যন্ত্রের ?) যিনি ছিলেন দেবতা তিনি পণ্ডাসুর (পুণ্ড্রাসুর) নামে খ্যাত, আর পুণ্ড্র বা পুঁড় যে এক প্রকারের আখ তাহা তো অন্য প্রসঙ্গে একাধিকবার বলিয়াছি। উত্তর ও পশ্চিম-বঙ্গে এই পণ্ডাসুরের পূজা এখনও প্রচলিত ; সেখানে তিনি পড়াসর (সংস্কৃতীকরণ, পরাশর) নামে খ্যাত। এঁর পূজার অর্বাচীন একটি মন্ত্র এইরূপ :

পণ্ডাসুর ইহাগচ্ছ ক্ষেত্রপাল শুভপ্রদ ।
পাহি মামিক্ষুযন্ত্রেষু ত্বং তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ ॥
পণ্ডাসুর নমস্তভ্যমিক্ষুবাটি নিবাসিনে ।
যজমান হিতার্থায় গুড়বৃদ্ধিপ্রদায়িনে ॥

ধ্বজা বা কেতনপূজার মত নানাপ্রকারের যাত্রাও বাংলার আদিবাসী কোমগুলির অন্যতম প্রধান উৎসব বলিয়া গণ্য করা হইত। রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি ধর্মোৎসব মূলত তাঁহাদেরই ; পরে ক্রমশ ইহাদের আর্যীকরণ নিষ্পন্ন হইয়াছে। লৌকিক ধর্মোৎসবে এই ধরনের যাত্রা বা সচল নৃত্যগীতসহ সামাজিক ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও প্রাচীন বৌদ্ধ সংযুক্তনিকায়-গ্রন্থে জানা যায়। আর্য ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উচ্চ কোটির লোকেরা বোধ হয় এই ধরনের সমাজোৎসব ও যাত্রা খুব পছন্দ করিতেন না ; সেইজন্যই অশোক সমাজোৎসবের বিরুদ্ধে অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনো রাজকীয় অনুশাসনই লোকায়ত ধর্মের এই লৌকিক প্রকাশকে চাপিয়া রাখিতে পারে নাই ; জনসাধারণের ধর্মোৎসব ক্রমশ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল, এবং তাহারই ফলে রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি ধর্মোৎসবের প্রচলন আজও অব্যাহত। প্রাচীন বাংলাদেশে প্রচলিত স্নানযাত্রা গুলির মধ্যে অগস্ত্যার্ঘ্যযাত্রা (দশহরার স্নান), অষ্টমী স্নানযাত্রা, মাঘীসপ্তমী স্নানযাত্রা প্রভৃতির কথা কালবিবেক-গ্রন্থে জানা যায়।

যাত্রা

যাত্রা, ধ্বজাপূজা প্রভৃতির মত ব্রতোৎসবও বাঙালীর দৈনন্দিন ধর্মজীবনে একটি বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই ব্রতোৎসবের ইতিহাস অতি জটিল ও সুপ্রাচীন, তবে এই ধরনের ধর্মোৎসব যে প্রাক্-বৈদিক আদিবাসি কোমদের সময় হইতেই সুপ্রচলিত ছিল এ-সম্বন্ধে সংশয় বোধ হয় নাই। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যাঁহাদের বলিয়াছে 'ব্রাত্য' বা পতিত

তাঁহারা কি ব্রতধর্ম পালন করিতেন বলিয়াই ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, এবং সেইজন্যই কি আর্যরা তাঁহাদের পতিত বলিয়া গণ্য করিতেন? বোধ হয় তাহাই।* অন্তত সাংস্কৃতিক জনতত্ত্বের আলোচনায় ক্রমশ এই তথ্যই যেন সুস্পষ্ট হইতেছে যে, আমাদের গ্রাম্য-সমাজে, বিশেষভাবে নারীদের ভিতর যে-সব ব্রত আজও প্রচলিত তাহার অধিকাংশই অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য এবং মূলত গুহ্য যাদু ও প্রজনন শক্তির পূজা, যে-পূজা গ্রাম্য কৃষিসমাজের সঙ্গে একান্ত সংপৃক্ত। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসূত্র কোথাও কোনো প্রচলিত ব্রতের কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নাই; আদি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম যে এই ধর্মানুষ্ঠানকে স্বীকার করিত না এ-তথ্য পরিষ্কার। অশোক তো স্পষ্টই বলিয়াছেন, গ্রাম্য লোকায়ত ধর্মের আচারানুষ্ঠান তিনি পছন্দ করিতেন না; বিশেষত নারীদের মধ্যে প্রচলিত নানাপ্রকারের মঙ্গলানুষ্ঠান প্রভৃতি তাঁহার বড়ই অপ্রীতিকর ছিল। তিনি তাঁহাদের আহ্বান করিয়াছিলেন এই সব মঙ্গলানুষ্ঠান ছাড়িয়া তাহারই অনুমোদিত ধর্মমংগলের পথে চলিবার জন্য। নারীসমাজে প্রচলিত এইসব মঙ্গলানুষ্ঠান বলিতে অশোক ব্রতানুষ্ঠানের কথাই বলিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই, আর, সাধারণ মঙ্গলানুষ্ঠান বলিতে মধ্যযুগীয় বাংলার মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ইত্যাদি জাতীয় পুরা-প্রচলিত পূজানুষ্ঠানের ইঙ্গিতই হয়তো করিয়া থাকিবেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুরাণগুলি যখন সংকলিত হইতেছিল তখন, এবং বোধ হয় তাহার কিছুকাল আগে হইতেই ব্রতানুষ্ঠানের প্রতি আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মনোভাবের পরিবর্তন

ব্রতোৎসব

---

* ব্রতের সঙ্গে ব্রাত্যদের সম্বন্ধ কোনো অকাট্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। তবে, এই অনুমান একেবারে অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক না-ও হইতে পারে। ঋগ্বেদীয় আর্যরা ছিলেন যজ্ঞধর্মী; যজ্ঞধর্মী আর্যদের বাহিরে যাঁহারা ব্রতধর্ম পালন করিতেন, ব্রতের গুহ্য যাদুশক্তি বা ম্যাজিকে বিশ্বাস করিতেন তাঁহারাই হয়ত ছিলেন ব্রাত্য। এই ব্রাত্যরা যে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে জড়িত তাহা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য এবং ইহাও লক্ষণীয় যে, ব্রতধর্মের প্রসার বিহার, বাংলা, আসাম এবং উড়িষ্যাতেই সবচেয়ে বেশি। ব্রত কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থই বোধ হয় (বৃ ধাতু + ক্ত) আবৃত করা, সীমা টানিয়া পৃথক করা; নির্বাচন করাই ব্রতের উদ্দেশ্য; বরণ কথাটিরও একই ব্যঞ্জনা। ব্রতানুষ্ঠানে আলপনা দিয়া অথবা বৃত্তাকারে সীমা রেখা টানিয়া দিয়া ব্রতস্থান চিহ্নিত করিয়া লওয়া হয়; এই সীমা রেখা টানা, স্থান নির্বাচন বা চিহ্নিত করার মধ্যে যাদুশক্তির বা ম্যাজিকের বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন। আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে বরণ করার যে স্ত্রী-আচার প্রচলিত—যেমন নূতন বরের মুখের সম্মুখে হাত ও হাতের আঙুল নানা ভঙ্গীতে ঘুরানো; কুলার উপর প্রদীপ ইত্যাদি সাজাইয়া বরের দুই বাহুতে, বুকে কপালে ঠেকানো ও সঙ্গে সঙ্গে বরণের ছড়া উচ্চারণ—তাহার ভিতরও ম্যাজিকেরই অবশেষ আজও লুক্কায়িত। এই বরণের অর্থও অশুভ শক্তির প্রভাব হইতে পৃথক করা, আবৃত করা, নির্বাচন করা। ব্রত এবং বরণের স্ত্রী-আচারগুলি লক্ষ্য করিলেই ইহাদের সমগোত্রীয়তা ধরা পড়িয়া যায়, এবং গোড়ায় যে ইহাদের সঙ্গে ম্যাজিকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল তাহাও পরিষ্কার হইয়া যায়। ব্রত এবং বরণ উভয় অনুষ্ঠানেই শুধু মেয়েদেরই যে অধিকার এ-তথ্যও লক্ষ্যণীয়। এই ম্যাজিক্-বিশ্বাসী ব্রতাচারী লোকেরাই ঋগ্বেদীয় আর্যদের চোখে বোধ হয় ছিলেন ব্রাত্য।

হইতেছিল ; কারণ, এই সব পুরাণে দেখিতেছি, লৌকিক অনেক ব্রতানুষ্ঠান ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুমোদন লাভ করিয়া ঐ ধর্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে এবং ব্রাহ্মণেরা সেই সব অবৈদিক, অস্মার্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যও করিতেছেন। প্রাক-আর্য ও অনার্য নরনারীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সীমায় গৃহীত হইবার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বাংলাদেশে সমস্ত আদি ও মধ্যযুগ ব্যাপিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দীর ভিতর দিয়া বহু অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ব্রতানুষ্ঠান এই ভাবে ক্রমশ ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে ; আজও করিতেছে। যে-সব ব্রত এই ধরনের স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে তাহাদের অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয়, যে-সব করে নাই সে-সব ক্ষেত্রে কোনো পুরোহিতেরই প্রয়োজন হয় না ; গৃহস্থ মেয়েরাই সে সব পূজা নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। আমাদের চোখের সম্মুখেই দেখিতেছি, পঁচিশ বৎসর আগে গ্রামাঞ্চলে যে-সব ব্রতানুষ্ঠানে পুরোহিতের প্রয়োজন হইত না আজ সে-সব ক্ষেত্রে পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই সব ব্রত ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। তবু, আজও যে-সব ব্রত এই স্বীকৃতি-সীমার বাহিরে তাহাদের সংখ্যা কম নয় ; সম্বৎসর ব্যাপিয়া মাসে মাসে এই সব বিচিত্র ব্রতের অনুষ্ঠান আমাদের গ্রাম্য সমাজ-জীবনকে এখনও কতকটা সচল ও সজীব করিয়া রাখিয়াছে, এবং বাঙালীর ধর্মকর্মে এই সব ব্রতানুষ্ঠান খুব বড় একটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। অগণিত এই সব ব্রতের মধ্যে কয়েকটা তালিকাবদ্ধ করিতেছি :

বৈশাখে—পুণ্যপুকুর ব্রত (বারি বর্ষণের জন্য গুহ্য যাদুশক্তির পূজা), শিবপূজা ব্রত (প্রজনন শক্তির পূজা), চম্পা-চন্দন ব্রত (ঐ), পৃথ্বীপূজা ব্রত (ঐ এবং গুহ্য যাদুশক্তির পূজা), গোকাল ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা), অশ্বত্থপট ব্রত (ঐ), হরিচরণ ব্রত (গুহ্য যাদুশক্তির পূজা), মধুসংক্রান্তি ব্রত (ঐ), গুপ্তধন ব্রত (ঐ), ধানগোছানো ব্রত (ঐ), যাচা পান ব্রত (ঐ), তেজোদর্পণ ব্রত (ঐ), ধোয়াধুয়ি ব্রত (ঐ), রণে এয়ো ব্রত (ঐ), দশ পুতুলের ব্রত (ঐ), সন্ধ্যামণি ব্রত (ঐ), বসুন্ধরা ব্রত (বারি বর্ষণের জন্য প্রজনন শক্তির পূজা)।

জ্যৈষ্ঠে—জয়মংগলের ব্রত (প্রজনন শক্তির পূজা)।

ভাদ্রে—ভাদুরি ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত গুহ্য যাদুশক্তির পূজা), তিলকুজারি ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা)।

কার্তিকে—কুলকুলটি ব্রত (গুহ্য যাদুশক্তির পূজা), ইতুপূজা ব্রত (প্রজনন শক্তির পূজা)।

অগ্রহায়ণে—যমপুকুর ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা), সেঁজুতি ব্রত (গুহ্য যাদুশক্তির পূজা), তুষ্‌তুষ্‌লি ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা)।

মাঘে—তারণ ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত শক্তির পূজা), মাঘমণ্ডলব্রত (ঐ)।

ফাল্গুনে—ইতুকুমার ব্রত (ঐ), বসন্ত রায় ও উত্তম ঠাকুর ব্রত (ঐ), সসপাতা ব্রত (ঐ)।

চৈত্রে—নখছুটের ব্রত (গুহ্য যাদুশক্তির পূজা)।

এ-গুলি ছাড়াও বাঙালীর অন্তঃপুরে আরো অনেক ব্রত আছে যাহা মূলত গুহ্য যাদুশক্তি ও প্রজনন শক্তির পূজারূপে আদিবাসি কোমদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তেমন অনেক ব্রত ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া আমাদের শুভকর্ম-পঞ্জিকাতেও স্থান পাইয়া গিয়াছে, যেমন, ষষ্ঠী ব্রত, মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, সুবচনী ব্রত, ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রাচীন বাংলাদেশে প্রচলিত ব্রতের একটি তালিকা প্রাচীন বাংলার স্মৃতিগুলি হইতেই ছাঁকিয়া বাহির করা যায়: সুখরাত্রি ব্রত (কার্তিক মাস), পাষাণ-চতুর্দশী ব্রত (অগ্রহায়ণ), দ্যূত-প্রতিপদ ব্রত (কর্তিকের শুক্ল প্রতিপদ), কোজাগর-পূর্ণিমা ব্রত (আশ্বিনের পূর্ণিমা), ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ব্রত (কার্তিক), আকাশ-প্রদীপ ব্রত (কার্তিক), অক্ষয়-তৃতীয়া ব্রত, অশোকাষ্টমী ব্রত ইত্যাদি। এই সব ক'টি ব্রতের উল্লেখ জীমূতবাহনের কালবিবেক-গ্রন্থে পাওয়া যায়। জন্মাষ্টমী পূজা ও স্নানের কথাও জীমূত-বাহন বলিয়া গিয়াছেন। ইহাদের কতকগুলি ব্রত একান্তই আদিম কৌম সমাজের ব্রতগুলির পরিবর্তিত, পরিমার্জিত রূপ; আবার কতকগুলি আদিম কৌম সমাজের ব্রতের আদর্শ এবং ভাবানুযায়ী নূতন ব্রতের সৃষ্টি। তিথি-নক্ষত্র আশ্রয় করিয়া যে-সব ব্রতোৎসব আছে তাহার মূলে বহিরাগত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের কিছুটা প্রভাব বিদ্যমান, এ-কথা একেবারে অসম্ভব না-ও হইতে পারে। পুরাণগুলির ভিতর হইতেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত ব্রতের একটি তালিকা পাওয়া যায়, যেমন, শিবরাত্রি ব্রত, অখণ্ড দ্বাদশী ব্রত, পূর্ণিমা ব্রত, নক্ষত্র ব্রত, দীপদান ব্রত, ঋতু ব্রত, কৌমুদী ব্রত, মদন বা অনঙ্গ ত্রয়োদশী ব্রত, রম্ভাতৃতীয়া ব্রত, মহানবমী ব্রত, বুধাষ্টমী ব্রত, একাদশী ব্রত, নক্ষত্রপুরুষ ব্রত, আদিত্যশয়ান ব্রত, সৌভাগ্য-শয়ন ব্রত, রসকল্যাণী ব্রত, অঙ্গারক ব্রত, শর্করা ব্রত, অশূন্যশয়ন ব্রত, অনঙ্গদান ব্রত, ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন বাংলায় এই সব ব্রতের কোন্ কোন্টি প্রচলিত ছিল বলিবার কোনো উপায় নাই।

ব্রতোৎসবের বাহিরে বাঙালী সমাজের নিম্নস্তরে অন্তত দুইটি ধর্মানুষ্ঠান আছে যাহার ব্যাপ্তি ও প্রভাব সুবিস্তৃত এবং যাহা মূলত অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য। একটি ধর্মঠাকুরের পূজা ও আর একটি চৈত্র মাসে নীল বা চড়ক পূজা। মালদহ অঞ্চলে যে গম্ভীরার পূজা বা বাংলার অন্যত্র যে শিবের গাজন হয় তাহা এই চড়ক পূজারই বিভিন্নরূপ। শিবের গাজন যেমন, ধর্মঠাকুরেরও তেমনই গাজন আছে এবং এই গাজন-উৎসবের দুইটি প্রধান অঙ্গ, একটি ঘরভরা বা গৃহাভরণ এবং অন্যটি 'কালিকা পাতা' বা 'কালি-কাচ' নৃত্য অর্থাৎ নরমুণ্ড হাতে লইয়া কালি বেশে অর্থাৎ কালির প্রতিবিম্বে নৃত্য।

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও আমরা ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধমতের 'ধর্ম' বলিয়া মনে করিতাম এবং এই পূজার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ খুঁজিয়া বেড়াইতাম। কিন্তু সম্প্রতি নানা গবেষণার ফলে

আমরা জানিয়াছি ধর্মঠাকুর মূলত ছিলেন প্রাক্-আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা; পরে বৈদিক ও পৌরাণিক, দেশি ও বিদেশি নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধর্মঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে। ধর্মঠাকুরের আসল প্রতীক পাদুকাচিহ্ন এবং ধর্ম-পূজার পুরোহিতেরা তাঁহাদের গলায় ঝুলাইয়া রাখেন একখণ্ড পাদুকা বা পাদুকার মালা। আজও ধর্মপূজার প্রধান অধিকারী ডোমেরা, যদিও এখন কৈবর্ত, শুঁড়ি, বাগ্দী, ধোপা প্রভৃতিদের ভিতরও ধর্মপণ্ডিত বা ধর্মপূজার পুরোহিত বিরল নয়। রাঢ়দেশেই ধর্মপূজার প্রচলন ছিল বেশি, এখনও তাহাই; তবে এখন কোথাও কোথাও ধর্মঠাকুর শিব বা বিষ্ণুতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন, সেখানে তিনি ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ছাড়া অন্য কাহারও পূজা গ্রহণ করেন না। স্তূপীকৃত পিষ্টক আর প্রচুর মদ্য দিয়া ("মদ্যের পুষ্করিণী দিব পিঠের জাঙ্গাল") ধর্মঠাকুরের পূজা হইত। মৃতদেহ ও নরমুণ্ড লইয়া ছিল ধর্মের গাজনের নাচ। শূন্যপুরাণে বলা হইয়াছে, ধর্মঠাকুর ছিলেন শূন্যমূর্তি, তিনি 'নিরঞ্জন', 'শূন্যদেহ,' তাঁহার বাহন শাদা পেঁচক বা শাদা কাক। যে-প্রতীকের পূজা করা হইত তাহা কূর্মাকৃতি পাষাণখণ্ড বা পাষাণ-নির্মিত কূর্মবিগ্রহ; তাহার উপর আঁকা থাকিত পাদুকাচিহ্ন। আদিতে যে তিনি প্রাক্-আর্য বা অনার্য দেবতা এ-সম্বন্ধে তাহা হইলে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। পরে তিনি একে একে বৈদিক বরুণ, অশ্বরথ-বাহিত সূর্য, উদীচ্যবেশী অর্থাৎ বুটপরা ঘোড়াচড়া মিহির বা সূর্য, পৌরাণিক কূর্মাবতার ও কল্কি অবতার প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া বর্তমান ধর্মঠাকুরে রূপান্তরিত হইয়া প্রধানত রাঢ় অঞ্চলেই পূজালাভ করিতেছেন। বৃন্দাবন দাসের "মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে" বোধ হয় এই ধর্মঠাকুরেরই পূজা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তো মনে করেন, 'ধর্ম' শব্দটিই বোধ হয় প্রাচীন কোনো অস্ট্রিক্ শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর, এবং বৌদ্ধ ত্রয়ীর মধ্যম শব্দ অর্থাৎ 'ধর্ম' এবং তাহার পূজা মূলত আদিবাসী কোমের ধর্মপূজা হইতেই গৃহীত। রাজা হরিশচন্দ্র এবং 'ধর্ম'রাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধও একই উৎস হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। মহিষবাহন ধর্মরাজ যমও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

ধর্মঠাকুর

ধর্মপূজা সম্বন্ধে যাহা সত্য নীল বা চড়কপূজা সম্বন্ধেও তাহাই। এই চড়কপূজা এখন শিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত। জলভরা একটি পাত্রে প্রতিষ্ঠিত যে-প্রতীকটি এই পূজার কেন্দ্র সেই প্রতীক শিবলিঙ্গ, এবং ইহাই পূজারীদের নিকট 'বুড়া শিব' নামে আখ্যাত। এই পূজার পুরোহিত সাধারণত আচার্য-ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্র, এবং গ্রহবিপ্রেরা যে ব্রাহ্মণ্যস্মৃতি অনুযায়ী পতিত-ব্রাহ্মণ, এ-তথ্য সর্বজনবিদিত। কুমীরের পূজা, জলন্ত অঙ্গারের উপর দোলা, কাঁটা ও ছুরির উপর ঝম্প, বাণফোঁড়া, শিবের বিবাহ ও অগ্নিনৃত্য, চড়কগাছ হইতে দোলা এবং দানো (ভূত) বারাণো বা হাজরা পূজা চড়ক পূজার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ। এই শেষোক্ত 'দানো বারাণো' বা 'হাজরা পূজা'র স্থান সাধারণত শ্মশানে এবং

চড়কপূজা

এই অনুষ্ঠানটির সঙ্গেই পোড়া শোল মাছ এবং তাহার পুনর্জন্মের কাহিনী (মহাভারতের শ্রীবৎসরাজার উপাখ্যান তুলনীয়), চড়কের সং (কলিকাতার জেলেপাড়ার সং তুলনীয়) প্রভৃতি জড়িত। চড়ক-পূজার পূজারীরা আজও আমাদের সমাজে সাধারণত জল অনাচরণীয় স্তরের। সামাজিক জনতত্ত্বের দৃষ্টিতে ধর্ম ও চড়ক-পূজা দুইই আদিম কোম সমাজের ভূতবাদ ও পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রত্যেক কোমের মৃত ব্যক্তিদের পুনর্জন্মের কামনাতেই এই দুই পূজার বাৎসরিক অনুষ্ঠান। তাহা ছাড়া, বাণফোঁড়া এবং দৈহিক যন্ত্রনা-গ্রহণ বা রক্তপাত উদ্দেশ্যে যে-সব অনুষ্ঠান চড়ক-পূজার সঙ্গে জড়িত তাহার মূলে সুপ্রাচীন কোম সমাজের নরবলি প্রথার স্মৃতি বিদ্যমান, এ-সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম। ধর্মপূজার মূলেও তাহাই; এ-ক্ষেত্রেও যে অজশিশুটিকে ধর্মের উদ্দেশ্যে বলিপ্রদান করা হয়, সে-টি প্রাচীন নরবলিরই আর্য-ব্রাহ্মণ্য রূপান্তর। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ-গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, ধর্মপূজার প্রচলন সেন-আমলে, তুর্কী-বিজয়ের আগেই দেখা দিয়াছিল।

ধর্মপূজা ও চড়কের সঙ্গে একই পর্যায়ভুক্ত আমাদের হোলী বা হোলাক ধর্মোৎসব। এই উৎসবটি উত্তর-ভারতের সর্বত্র যেমন বাংলাদেশেও তেমনই সুপ্রচলিত এবং সুআদৃত। হোলাক বা হোলক উৎসবের কথা জীমূতবাহনের দায়ভাগ-গ্রন্থে আছে; দ্বাদশ শতকের আগেই যে এই উৎসব বাংলাদেশে প্রচলিত হইয়াছিল ইহাই তাহার প্রমাণ। এই হোলী উৎসবের বিবর্তন লক্ষণীয়। বাংলাদেশে ফাল্গুনী শুক্লাচতুর্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে হোলীর সঙ্গে যে সব আচারনুষ্ঠান জড়িত সংস্কৃতিগত জনতত্ত্বের দিক হইতে তাহার কিছু কিছু আলোচনা-গবেষণা হইয়াছে; ভারতের অন্যত্র যে-সব জায়গায় হোলীর প্রচলন তাহাও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এ-তথ্য এখন অনেকটা পরিষ্কার যে, আদিতে হোলী ছিল কৃষিসমাজের পূজা; সুশস্য উৎপাদন-কামনায় নরবলি ও যৌনলীলাময় নৃত্যগীত উৎসব ছিল তাহার প্রধান অঙ্গ; তারপরের স্তরে কোনো সময়ে নরবলির স্থান লইল পশুবলি এবং হোমযজ্ঞ ইহার অঙ্গীভূত হইল। কিন্তু হোলীর সঙ্গে প্রধানত যে উৎসবানুষ্ঠানের যোগ তাহা বসন্ত বা মদন বা কামোৎসবের, রাধাকৃষ্ণ-ঝুলনের এবং কোথাও কোথাও মূর্খতম এক রাজাকে লইয়া নানাপ্রকারের ছল-চাতুরী ও তামাসার। তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতক পর্যন্ত উত্তর-ভারতের সর্বত্রই বসন্ত বা মদন বা কাম-মহোৎসব নামে একটি উৎসবের প্রচলন দেখা যায়। বাৎস্যায়নের কামসূত্র (তৃতীয়-চতুর্থ শতক), শ্রীকৃষ্ণের রত্নাবলী (সপ্তম শতক), মালতীমাধব নাটক (অষ্টম শতক), অল্-বেরুণী (একাদশ শতক), জীমূতবাহনের কালবিবেক (দ্বাদশ শতক) এবং রঘুনন্দন (ষোড়শ শতক), সকলেই এই উৎসবের কথা বলিয়াছেন অল্পবিস্তর বর্ণনায়। প্রচুর নৃত্যগীত বাদ্য, জুগুপ্সিত উক্তি, যৌন অঙ্গভঙ্গি এবং ব্যঞ্জনা প্রভৃতি ছিল এই উৎসবের

হোলী বা হোলাক উৎসব

অঙ্গ, এবং পূজাটা হইত মদন ও রতির, চৈত্র মাসে অশোক ফুলের সুপ্রচুর বর্ষণের নীচে। প্রাচীন বাংলা দেশে এই উৎসবের কথা জীমূতবাহনই বলিয়া গিয়াছেন; পরবর্তী সাক্ষ্য দিতেছেন রঘুনন্দন। মনে হয়, ষোড়শ শতকের পর কোনো সময়ে চৈত্রীয় বসন্ত বা মদন বা কামোৎসব ফাল্গুনী হোলী বা হোলক উৎসবের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায় এবং কাম-মহোৎসব অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। বস্তুত, ষোড়শ শতকের পর কাম-মহোৎসবের কোনো উল্লেখ বা প্রচলন কোথাও আর দেখা যায় না। মুসলমান রাজা-ওমরাহ্‌রা এবং হারামের মহিলারা হোলী উৎসবের খুব বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং বোধ হয় তাঁহাদেরই পৃষ্ঠপোষকতার ফলে হোলী ক্রমশ মদনোৎসবকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু হোলীর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের ঝুলন এবং আবীর-কুম্‌কুমের খেলার ইতিহাসের যোগ আবার অন্য পথে। রামগড়-গুহার এক লিপিতে (খ্রীষ্টপূর্ব ২য়-৩য় শতক) এক ঝুলন উৎসবের কথা আমরা প্রথম শুনি। কিন্তু সে-ঝুলন কোনো দেবদেবীর নয়, বোধ হয় নেহাত্‌ই মানুষের ঝুলন। ঝুলনায় মানুষেরা—নরনারী উভয়ই দোলা খাইত, বেশি করিয়া দোলা দিত মানবশিশুকে, তাহাকে আনন্দ দিবার জন্য। হয়তো তাহারই প্রকাশ পরবর্তী সাহিত্যে। বালকৃষ্ণ বা বালগোপালকে দোলাইতেন মাতা যশোদা। তারপরের পর্বে আর শুধু বালগোপাল নহেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যৌবনলীলার সহচরী রাধাও আসিয়া উঠিলেন সেই ঝুলনায়, এবং একাদশ শতকের আগেই কৃষ্ণরাধার ঝুলনলীলা ভারতবর্ষের অন্যতম ধর্মোৎসবে পরিগণিত হইয়া গেল। অল্‌-বেরুণীর সাক্ষ্যে মনে হয়, এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত চৈত্রমাসে; গরুড়-পুরাণ এবং পদ্মপুরাণের সাক্ষ্যও তাহাই। পরবর্তী কোনো সময়ে এই উৎসব ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে আগাইয়া আসে (পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড এবং স্কন্দপুরাণ, উৎকলখণ্ড দ্রষ্টব্য) এবং হোলীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়। ঝুলনায় রাধাকৃষ্ণকে দোলাইয়া তাঁহাদের উপর ফুল, কুমকুম এবং আবীরগোলা জল ছড়ানো হইত এবং তাঁহারাও সহচরীদের উপর ফুল, কুম্‌কুম্ ইত্যাদি ছুঁড়িয়া মারিতেন। হোলীর সঙ্গে পীচ্‌কারী খেলার যোগাযোগ এই ভাবেই। প্রাক-বৈদিক আদিম কৃষিসমাজের বলি ও নৃত্যগীতোৎসব এই ভাবেই বর্তমান হোলীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভারতের নানা জায়গায় এখনও হোলী বা হোলাক উৎসবকে বলা হয় শূদ্রোৎসব; হোলীর আগুন এখনও ভারতের অনেক স্থানে অস্পৃশ্যদের ঘর হইতেই আনিতে হয়।

ভারতবর্ষের সর্বত্রই বর্ষাঋতুতে নারীদের মধ্যে, বিশেষভাবে বিধবা নারীদের ভিতর অম্বুবাচী নামে এক পারণ পালনের রীতি প্রচলিত। এই পারণের তিন দিন বা সাত দিন তাঁহারা কোনো অগ্নিপক্ক খাদ্য গ্রহণ করেন না, মাটি খুঁড়েন না, আগুন জ্বালেন না, রন্ধনাদি করেন না, এমন কিছু করেন না যাহাতে পৃথিবীর, মাতা বসুধার অঙ্গে কোনো আঘাত লাগে। কারণ প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, এই ক'দিন মাতা বসুধার ঋতুপর্ব, এবং যতদিন তিনি ঋতুমতী থাকেন ততদিন

অম্বুবাচীর পারণ

তাঁহার অঙ্গে কোনো আঘাত লাগে, এমন কিছু করিতে নাই। এই বিশ্বাস এবং অম্বুবাচীর পারণ, দুইই আদিম কৌম সমাজের প্রজননশক্তির পূজা এবং তৎসংপৃক্ত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে জড়িত।

বাঙালী হিন্দুর ধর্মকর্মানুষ্ঠানের যে-সব স্তরে ও অংশে আদিবাসী কৌম সমাজের অনার্য অব্রাহ্মণ্য ধ্যান-ধারণা ও উৎসবানুষ্ঠান এখনও সক্রিয় তাহার মাত্র কয়েকটির ইঙ্গিত এ-পর্যন্ত ধরিতে চেষ্টা করিলাম। আর বেশি বলিবার উপায়ও নাই, বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজনও নাই। তবে, এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার আগে এমন দুই চারিটি বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর কথা বলিতেই হয় যাঁহাদের জন্মই হইতেছে এই আদিবাসী কৌম সমাজের ধ্যান-ধারণা এবং অভ্যাস হইতে। এ-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শিব ও শিবলিঙ্গ, দুর্গা, কালী বা করালী, অর্থাৎ মাতৃকাতন্ত্রের দেবী, নারায়ণ-শিলা, গণেশ, ভৈরব, বৌদ্ধ জম্ভল, হারীতি, একজটা, নৈরাত্মা, ভৃকুটি প্রভৃতি দেবদেবীদের কথা উল্লেখ করিতেছি না; কারণ, ভারতীয় মূর্তিতত্ত্বের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারাই জানেন এই সব এবং আরও অনেক দেবদেবীর ইতিহাস অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আদিবাসী কৌম-সমাজের বিশ্বাস ও অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত। আমি শুধু এমন দুই চারিটি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর কথাই এখানে উল্লেখ করিতেছি যাঁহাদের পূজা বিশেষ ভাবে পূর্ব-ভারতেই প্রচলিত এবং যাঁহাদের জন্মেতিহাস সুস্পষ্ট ভাবেই এই কৌম সমাজের ধ্যান, ধারণা ও অভ্যাসগত, অথচ সে-তথ্য, সুস্পষ্ট জ্ঞাত ও স্বীকৃত নয়।

বাংলা, আসাম ও ওড়িষ্যায় মনসাদেবীর পূজা সুপ্রচলিত। এই পূজা এখন যে-ভাবে সাধারণত অনুষ্ঠিত হয় তাহা ঠিক প্রতিমাপূজা নয়, ঘট-মনসা বা পট-মনসার পূজা এবং মধ্যযুগীয় বাংলার মনসামঙ্গলের সঙ্গে এই ঘট-মনসা ও পট-মনসার সম্বন্ধই ঘনিষ্ঠ। ধান্যপূর্ণ মাটির ঘটের উপর সর্পধারিণী বা সর্পালংকরা মনসার ছবি আঁকিয়া তাঁহার পূজা, অথবা শোলা বা কাপড়ের পটের উপর সর্পময়ী বা সর্পধারিণী বা সর্পালংকারা মনসার কাহিনী আঁকিয়া টাঙ্গানো পটের সম্মুখে পূজাই সাধারণ রীতি। কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক-পূর্ব বাংলাদেশে মনসার প্রতিমাপূজা হইত, তাহার কয়েকটি মূর্তি প্রমাণই বিদ্যমান। মনসাদেবী যে কি করিয়া উচ্চতর সামাজিক স্তরে উন্নীত হইলেন তাহার বিস্তৃত পুরাণ-কাহিনী বাংলাদেশে সুবিদিত। সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা-পূজার উদ্ভব, এ-তথ্য নিঃসন্দেহ। পৃথিবী জুড়িয়া আদিবাসী সমাজে কোনো না কোনো রূপে সর্পপূজার প্রচলন ছিলই। বাংলাদেশে যে-সব মনসাদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের ক্রোড়াসীন একটি মানবশিশুর, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ইহাদের প্রত্যেকটিই প্রজনন শক্তির প্রতীক। একটি মূর্তির পাদপীঠে "ভট্টিনী মট্টু বা" লিপি উৎকীর্ণ। এই লিপির

মনসা পূজা

অর্থ কি রাজমহিষী মঞ্জু বা না আর কিছু, বলা কঠিন। মঞ্জু বা কি অস্ট্রিক, না কোনো অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষার শব্দ, তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে এ-তথ্য নিঃসংশয় যে, পাল-আমলের প্রথম পর্বেই মনসাদেবী ব্রাহ্মণ্যধর্মে পূজিতা ও স্বীকৃতা হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। মহাভারত ও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের কাহিনী হইতেই প্রমাণ হয়, মনসাদেবীর প্রাচীন বৈদিক বা পৌরাণিক কোনো ঐতিহ্যই ছিল না; ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্বীকৃত হওয়ার পরও বহুদিন পর্যন্ত তাঁহার রূপ সুনির্দিষ্ট হয় নাই। কোনো কোনো ধ্যানে তাঁহার বাহন হইতেছেন হংস এবং তিনি পুস্তক ও অমৃতকুম্ভধারিণী। বলা বাহুল্য, এই সব উপকরণ সরস্বতীর, এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের একটি ধ্যানে মনসাকে সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্না বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। তেলেগু ও কানাড়ী-ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে 'মঞ্চাম্মা' নামে এক সর্পদেবীর পূজা আজও প্রচলিত এবং আমাদের দেশে মধ্যযুগে মনসাদেবীর যে ধরনের কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে, সেখানেও অম্বাবরু নাম্নী এক সর্পদেবী সম্বন্ধে অনুরূপ কাহিনী সুপ্রচলিত। অসম্ভব নয় যে, দক্ষিণী মঞ্চাম্মাই আমাদের মনসা, এবং অম্বাবরুর কাহিনীই আমাদের মনসাকে আশ্রয় করিয়াছে। ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয়, বাংলাদেশে মনসা-পূজার বহুল প্রচলন হয় দক্ষিণী সেন-বর্মণ রাজাদের আমলেই।

মনসার সঙ্গেই নাম করিতে হয় জঙ্গলবাসী, শবরকুমারীরূপিণী বৌদ্ধ জাঙ্গুলীদেবীর। এই দেবী বীণাবাদয়িত্রী এবং মনসার মত তিনিও সর্পবিষমোচয়িত্রী। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বৈদিক সরস্বতীও অন্যতম রূপে সর্ববিষমোচয়িত্রী এবং সেক্ষেত্রে তিনিও শবর-কন্যা।

জাঙ্গুলী

এই গুণসাম্যের উপর নির্ভর করিয়াই পরবর্তীকালে, মনসাকে যেমন তেমনই জাঙ্গুলীকেও কোথাও কোথাও বৈদিক সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্না বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণ্য মনসা এবং বৌদ্ধ জাঙ্গুলী যে একই দেবী তাহাও বলা হইয়াছে। মনসাদেবীর প্রসারের প্রমাণ কালবিবেক-গ্রন্থে সুস্পষ্ট।

প্রাক্-আর্যব্রাহ্মণ্য শবরদের সঙ্গে আর একটি বজ্রযানী বৌদ্ধ দেবীর সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; ইঁহার নাম পর্ণশবরী। ইনি ব্যাঘ্রচর্ম ও বৃক্ষপত্র পরিহিতা, যৌবনরূপিণী, বজ্রকুণ্ডলধারিণী, এবং পদতলে তিনি অগণিত রোগ ও মারী মাড়াইয়া চলেন। ধ্যানেই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি ডাকিনী, পিশাচী এবং মারীসংহারিকা। সন্দেহ নাই যে,

পর্ণশবরী

আদিতে তিনি শবরদেরই আরাধ্যা দেবী ছিলেন; পরে কালক্রমে যখন আর্যধর্মে স্বীকৃতি লাভ করেন তখন তাঁহার পরিচয় হইল "সর্বশবরানাম ভগবতী", সকল শবরের ভগবতী বা দুর্গা। বজ্রযানী বৌদ্ধসাধনায় শবরদের যে একটা বিশেষ স্থান ছিল, চর্যাগীতির একাধিক গানই তাহার প্রমাণ। একটি মাত্র গান উদ্ধার করিতেছি; পর্ণশবরীর ধ্যান এবং এই গানটির রূপ-কল্পনার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই।

"উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসহি সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মৌউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেহ্মরাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই॥
গুরুবাক্ পুঞ্ছিআ বিন্ধ নিঅমণ বাণে।
একে শর সন্ধানে বিন্ধহ বিন্ধহ পরমাণ বাণে॥
উমত সবরো গরুআ রোষে।
উমত-সিহর-সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কই সে॥"

পূর্ব-ভারতে শবরদের এক সুপ্রাচীন ও সুবিস্তৃত সংস্কৃতির অবশেষ আমাদের জীবন-যাত্রার নানাক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট। পাহাড়পুর মন্দিরের অসংখ্য মাটির ফলকে শবর নরনারীদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ছবি যে-ভাবে উৎকীর্ণ আছে, মনে হয়, জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে তাঁহাদের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। বাংলার নানা স্থানে, যেমন উত্তর-বঙ্গে ও পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গে, এই শবররা কালক্রমে আমাদের হিন্দু সমাজের নিম্নতম স্তরে স্বাঙ্গীকৃত হইয়া গিয়াছে। নীলাচলক্ষেত্র পুরীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথদেবের মন্দির ও তাঁহার পূজার সঙ্গে শবরদের ধর্ম ও পূজানুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা আজ আর অবিদিত নাই। বাংলাদেশেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ঘনিষ্ঠতা ধরা পড়িবে, বিচিত্র কি? কালবিবেক-গ্রন্থ ও পরবর্তী কালিকাপুরাণে শারদীয়া দুর্গাপূজার দশমী তিথিতে শাবরোৎসব নামে এক উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়। এই উৎসবে লোকেরা শবরদের মত নগ্ন অঙ্গে গাছের পাতা জড়াইয়া, সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া তালে-বেতালে পূর্ণ উদ্যমে গান গাহিত, নাচিত এবং ঢাক বাজাইত। যৌনলীলার নানা গান গাওয়া, কাহিনী বলা এবং তদনুরূপ অঙ্গভঙ্গী করাও এই উৎসবের অঙ্গ ছিল। এ-সব না করিলে নাকি দেবী ভগবতী ক্রুদ্ধা হইতেন! বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে এ-সম্বন্ধে একটু বিধিনিষেধ আছে; এই সব অনুষ্ঠানে বিশেষ আপত্তি করা হয় নাই, তবে মা ও বোনদের সম্মুখে এবং শক্তিধর্মে অদীক্ষিত মেয়েদের সম্মুখে পূর্বোক্তরূপ আচরণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

শাবরোৎসব

মনসাদেবীর ক্ষেত্রে যেমন দুই রকমের পূজা (এক, মনসার মূর্তিপূজা এবং আর এক, তাঁহারই চিত্রাঙ্কিত ঘটের পূজা) বাংলার অন্যান্য দুই একটি দেবীমূর্তির ক্ষেত্রেও তাহাই। আমাদের দেশে লক্ষ্মীর পৃথক মূর্তিপূজা খুব সুপ্রচলিত নয়; বিষ্ণু-নারায়ণের শক্তি

হিসাবে তাঁহার যাহা কিছু প্রতিপত্তি, অন্তত প্রাচীন বাংলায় তাহাই ছিল। সাহিত্যে ও শিল্পে নারায়ণের শক্তিরূপিনী এই পৌরাণিক লক্ষ্মীই বন্দিতা হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের লোকধর্মে লক্ষ্মীর আর একটি পরিচয় আমরা জানি এবং তাঁহার পূজা বাঙালী সমাজে নারীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। এই লক্ষ্মী কৃষিসমাজের মানস-কল্পনার সৃষ্টি; শস্যপ্রাচুর্যের এবং সমৃদ্ধির তিনি দেবী। এই লক্ষ্মীর পূজা ঘটলক্ষ্মী বা ধান্যশীর্ষপূর্ণ চিত্রাঙ্কিত ঘটের পূজা, এবং এই পূজাব্রতের সঙ্গে যে-সব ব্রতকথা এবং যে-সব পৌরাণিক কাহিনী জড়িত তাহা একত্র বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে দেরী হয় না যে, লক্ষ্মীর এই লৌকিক মানস-কল্পনাই ক্রমশ পৌরাণিক লক্ষ্মীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, স্তরে স্তরে নানা স্ববিরোধী ধ্যান ও অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কৌম সমাজের ঘটলক্ষ্মীর বা শস্যলক্ষ্মীর যে আদিমতম পূজা বা কল্পনা তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। বাঙালী হিন্দুর ঘরে ঘরে নারীসমাজে সে-পূজা আজও অব্যাহত। আর শারদীয়া পূর্ণিমাতে কোজাগর-লক্ষ্মীর যে-পূজা অনুষ্ঠিত হয় তাহাও আদিতে এই কৌম সমাজেরই পূজা বলিলে অন্যায় হয় না। বস্তুত, দ্বাদশ শতক পর্যন্ত শারদীয়া কোজাগর উৎসবের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর পূজার কোনো সম্পর্কই ছিলনা।

ঘটলক্ষ্মীর পূজা

ষষ্ঠীপূজা সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। ষষ্ঠীদেবীর কোনো মূর্তিপূজার প্রচলন ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নাই; বৌদ্ধ প্রতিমা-শাস্ত্রে এবং ধর্মানুষ্ঠানে ষষ্ঠীদেবীর মানস-কল্পনাই বোধ হয় হারীতীদেবীর রূপ-কল্পনায় বিবর্তিত হইয়াছে। ষষ্ঠীপূজার ব্রতকথা, এবং মহাবস্তু, সর্বাস্তিবাদী বিনয়পিটক, চীনা সূত্রপিটকগ্রন্থের সংযুক্তবস্তুসূত্র ও ক্ষেমেন্দ্রের বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা-গ্রন্থে হারীতীর জন্মকাহিনী অনুসরণ করিলে স্পষ্টতই বুঝা যায়, ষষ্ঠী এবং হারীতীর জন্ম একই মানস-কল্পনায়, এবং দু'য়েরই মূলে প্রজনন শক্তিতে এবং মারীনিবারক যাদু-শক্তিতে বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন। বৌদ্ধ ধর্মাচারে হারীতী দেবীর মূর্তিপূজা সুপ্রচলিত ছিল, কিন্তু ষষ্ঠীপূজার আজও কোনো মূর্তিপূজা নাই এবং শেষোক্ত পূজা এখনও নারী-সমাজেই সীমাবদ্ধ; সন্তান-কামনায় ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় আজ এই পূজা বিবর্তিত। ষষ্ঠী-হারীতীর মারীনিবারক যাদুশক্তির পূজা এখন আশ্রয় করিয়াছে গর্দভবাহিনী শীতলাদেবীকে।

ষষ্ঠীপূজা

(এইখানেই যে প্রাক্-আর্য বাঙালী সমাজের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের বিবরণ শেষ হইল তাহা বলা চলেনা। বরং বলা উচিত, ইহা সূচনা মাত্র। বস্তুত, এ-সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণা এত কম হইয়াছে যে, রেখা রচনা ছাড়া, কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া বিস্তৃত কিছু বলিবার উপায় নাই। তবু, যেটুকু আমরা জানি, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বাঙালী সমাজে নারীদের মধ্যে এবং সাধারণ আর্য-ব্রাহ্মণ্য পূজাচারের মধ্যে যে-সব লৌকিক স্থানীয় অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত তাহা প্রায় সমস্তই প্রাক্-আর্য কৌম-সমাজের দান।

প্রাক্-আর্য কৌম বাঙালী সমাজের ধ্যান-ধারণার কথা আগেই কিছু বলিয়াছি বর্তমান

অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে। ভূতপ্রেতবাদে বিশ্বাস, পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস, প্রজনন শক্তি, যাদুশক্তি প্রভৃতির প্রতীকের উপর দেবত্ব আরোপ এবং তাহাদের শুভ অশুভ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতায় বিশ্বাস প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাদের ধ্যান-ধারণার অন্তর্গত ছিল। আজও সেই সব ধ্যান-ধারণা বাঙালী সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে এবং আমাদের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের অনেক আচার-ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, পিতৃপুরুষের তর্পণ প্রভৃতি ব্যাপারে যে ধ্যান আমাদের মনন-কল্পনায় তাহার মূলে প্রাক্-আর্য কৌমসমাজের বিশ্বাস সক্রিয়, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। শ্রাদ্ধের সঙ্গে জড়িত বৃষকাষ্ঠ ও তাহার বিসর্জন, রান্নার পর কাক ডাকিয়া হবিষ্যান্ন খাওয়ানো, পিণ্ডদান প্রভৃতি সমস্তই আমরা আহরণ করিয়াছি আমাদেরই প্রতিবেশী শবর-পুলিন্দ-কিরাত-সাঁওতাল-মুণ্ডা-কোল-ভীলদের নিকট হইতে। মঙ্গলানুষ্ঠানের প্রারম্ভে আভ্যুদয়িক অনুষ্ঠানে মৃত পূর্বপুরুষদের স্মরণ ও তাঁহাদের পূজাও ইহাদের ধ্যান-ধারণা হইতেই আহৃত। বাংলাদেশের বিবাহানুষ্ঠানে হোম, সম্প্রদান ও সপ্তপদীগমন ছাড়া যে-সব স্ত্রী-আচার, লোকাচার প্রভৃতি প্রচলিত তাহাও মূলত এই কৌম সমাজেরই দান।

প্রাক্-আর্য ধ্যান-ধারণা

এই আদিমতম ধর্মকর্ম ও ধ্যান-ধারণার উপরই বাংলার বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য এবং অবৈদিক বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার।

৩

জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধ ধর্মের পূর্বাভিযানকে আশ্রয় করিয়াই প্রাচীন বাংলায় আর্য-ধর্মকর্মের প্রাথমিক সূচনা ও বিস্তার। এই তিন ধর্মমতই বেদবিরোধী, বেদের অপৌরুষেয়ত্বে অবিশ্বাসী, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটিই মূলত আর্যধর্মাশ্রয়ী, আর্য ধ্যান-ধারণাই ইহাদের জীবনমূল। এই তিন ধর্মের মধ্যে আবার জৈন ও আজীবিক ধর্মের সঙ্গেই কৌম বাঙালীর প্রথম আর্য ধর্ম-পরিচয়।

প্রাক্-গুপ্তপর্বের ধর্মকর্ম ইত্যাদি; আর্যধর্মের বিস্তার

জৈন-পুরাণের ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করিলে বলিতে হয়, মানভূম, সিংভূম, বীরভূম ও বর্দ্ধমান, এই চারিটি স্থান-নাম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বা বর্দ্ধমানের সঙ্গে জড়িত। জৈন-পুরাণ মতে ২৪ জন তীর্থংকরের মধ্যে বিশ জনেরই নির্বাণস্থান হাজারিবাগ জেলার পরেশনাথ বা পার্শ্বনাথ পাহাড়ের সমেত শিখর বা সমাধিশিখরে। আয়ারঙ্গ বা আচারঙ্গ সূত্রকথিত মহাবীর ও তাঁহার শিষ্যবর্গের রাঢ়দেশ (বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমি) পরিভ্রমণ, সেখানকার দুঃখ, দুর্গতি ও লাঞ্ছনাভোগের কথা, এবং তাঁহাদের পশ্চাতে কুকুর লেলাইয়া দিবার গল্প সুবিদিত। এই গল্পেই সুপ্রমাণ যে, প্রাক্-আর্য কৌমসমাজবদ্ধ রাঢ়দেশে আর্যধর্মের প্রসার খুব সহজ হয় নাই; এখানকার খাদ্য, ভাষা, আচার-ব্যবহার আর্যদের

কাছে সব কিছুই ছিল অরুচিকর, এবং স্থানীয় লোকেরাও আর্যধর্মের প্রসার খুব প্রীতির চক্ষে দেখে নাই। যাহাই হোক, যত অপ্রিয়ই হোক্, জৈনধর্মের অগ্রগতিকে ঠেকাইয়া রাখা বেশি দিন সম্ভব হয় নাই। হরিসবেণের বৃহৎকথাকোষ গ্রন্থে (৯৩১ খ্রী) বর্ণিত আছে, মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু প্রখ্যাত জৈনস্থবী ভদ্রবাহু ছিলেন পুণ্ড্রবর্দ্ধনান্তর্গত দেবকোটের এক ব্রাহ্মণের সন্তান; ভদ্রবাহুর শৈশবে চতুর্থ শ্রুতকেবলী গোবর্ধন একবার দেবকোটে বেড়াইতে আসিয়া শিশু ভদ্রবাহুকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং পিতার অনুমতি লইয়া শিশুটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। এই শিশুই কালক্রমে জৈনধর্মে দীক্ষিত হইয়া শ্রুতকেবলী পদে উন্নীত হন। দিব্যাবদানের একটি গল্পে জানা যায়, অশোক একবার পুণ্ড্রবর্ধনের নিগ্রন্থদের (জৈনদের) অপরাধে (ভুল করিয়া ?) পাটলীপুত্রের ১৮,০০০ হাজার আজীবিকদের (চীনা অনুবাদ মতে, নিগ্রন্থপুত্রদের) হত্যা করিয়াছিলেন। এই দুই গ্রন্থের উক্তি প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে বাধা নাই যে, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকেই পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তর-বঙ্গে জৈনধর্মের যথেষ্ট প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধদের অপেক্ষা জৈনরা যে বাংলা দেশ সম্বন্ধে বেশি খবরাখবর রাখিত তাহা জৈন ভগবতী-সূত্রের সাক্ষ্যেই সুপ্রমাণ। ষোড়শ মহাদেশের তালিকায় বৌদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকায়-গ্রন্থে প্রাচ্যদেশের দু'টি মাত্র জনপদের নামোল্লেখ পাইতেছি—অঙ্গ এবং মগধ। জৈন ভগবতী-সূত্রে পাইতেছি তিনটির উল্লেখ—অঙ্গ, বঙ্গ এবং লাঢ় (রাঢ়)। জৈন সূত্র-গ্রন্থগুলিতে বঙ্গের উল্লেখ বারবারই পাওয়া যায়। আরও সুনির্দিষ্ট ও বিশ্বাস্য তথ্য পাওয়া যাইতেছে জৈন কল্পসূত্র-গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তামলিত্তিয়, কোডিবর্ষীয়া, পোংডবর্ধনীয়া এবং (দাসী) খব্বডিয়া নামে জৈন গোদাস গণীয় ভিক্ষুদের চারিটি শাখার উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি শাখার নামকরণ স্থান-নাম হইতে এবং এই স্থান-নামগুলি যথাক্রমে তাম্রলিপ্তি (মেদিনীপুর), কোটিবর্ষ (দিনাজপুর), পুণ্ড্রবর্দ্ধন (বগুড়া) এবং খর্বাট বা কর্বাট (পশ্চিমবঙ্গেরই কোনো স্থান)। জৈনধর্মের বহুল বিস্তৃতি না থাকিলে এতগুলি শাখা বাংলাদেশে কেন্দ্রীকৃত হওয়ার কোনো সুযোগ থাকিত না। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক ও খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের একাধিক লিপিতে এই সব শাখাগুলির উল্লেখ হইতে মনে হয়, গোদাস-গণীয় জৈনদের চারিটি শাখা ততদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতকের (আনুমানিক) মথুরার একটি শিলালিপি হইতে জানা যায়, রারা (রাঢ়দেশ) জনপদের অধিবাসী এক জৈনভিক্ষু মথুরায় একটি জৈনমূর্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

জৈনদের মত এতটা না হোক, আজীবিকেরাও সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে কিছুটা প্রসার প্রতিপত্তি-লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। আজীবিক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মখলিপুত্র গোসাল ও মহাবীর ছিলেন সমসাময়িক (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক) এবং পরস্পর পরম বন্ধু; ভগবতী-গ্রন্থমতে তাঁহারা দুইজনে একসঙ্গে ছয় বৎসর কাটাইয়াছিলেন বজ্রভূমি অন্তর্গত পণিত ভূমিতে। রাঢ়দেশ-পরিব্রজ্যায় আসিয়া মহাবীর এই ধর্ম সম্প্রদায়ের দীর্ঘ

বংশদণ্ডধারী অনেক ভিক্ষুর দেখা পাইয়াছিলেন; তাঁহারাও তখন ধর্মপ্রচারোদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। পাণিনি রাঢ়িদেশে মস্করী সম্প্রদায়ের যে-বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে এই ভিক্ষুবিবরণ বেশ মিলিয়া যায় এবং মনে হয়, তিনি যেন আজীবিকদের কথাই বলিয়াছেন। আর, আজীবিকেরা যে প্রাচ্যদেশে বেশ প্রভাবশালী সম্প্রদায় ছিলেন তাহা তো বিহারের নাগার্জুন ও বরাবর পাহাড়ের গুহাবলী এবং মৌর্যসম্রাট অশোক ও দশরথের একাধিক শিলালিপি-সাক্ষ্যেই সপ্রমাণ। ভগবতী-গ্রন্থের মতে পুণ্ডরাজ মহাপৌম আজীবিকদের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এই পুণ্ড বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে বলিয়া বর্ণিত এবং মহাপৌমের রাজধানীর একশতটি ছিল প্রবেশ তোরণ। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, এই পুণ্ড পাটলীপুত্র, কিন্তু আমার তো মনে হয়, ভগবতী-গ্রন্থকার পুণ্ড বলিতে পুণ্ড্রই বুঝিয়াছেন। দিব্যাবদানে অনেক স্থানেই আজীবিক ও নিগ্রন্থদের মধ্যে তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে; অশোকের সেই ১৮,০০০ হাজার আজীবিক বা নিগ্রন্থপুত্র হত্যার গল্পেও তাহা হয় নাই, এ-কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়না। সম্ভব, দিব্যাবদান রচনা কালে পুণ্ড্রবর্ধনে নিগ্রন্থ জৈনদের এবং আজীবিকদের বহুদিন এক সঙ্গে বসবাসের ফলে এবং তাঁহাদের ধর্মমত, আচারানুষ্ঠান এবং বসনভূষণ অনেকটা এক রকম হওয়ার ফলে বৌদ্ধদের দৃষ্টিতে ইঁহাদের মধ্যে পার্থক্য সত্যই কিছু ছিলনা!

আজীবিক ধর্ম

বৌদ্ধ জনশ্রুতির ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করিলে বলিতে হয়, জৈন ও আজীবিকদের সমসাময়িক কালে বৌদ্ধধর্মও প্রাচীন বাংলায় বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করে। সংযুত্ত নিকায়-গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধদেব একবার সুম্ভভূমি (সুহ্মভূমি?) অন্তর্গত শেতক নগরে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন; অঙ্গুত্তর নিকায়-গ্রন্থে বঙ্গান্তপুত্ত নামে এক বৌদ্ধ আচার্যের উল্লেখ পাইতেছি; বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা-গ্রন্থের অনাথপিণ্ডকসুতা সুমাগধার কাহিনীতে জানা যায় যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং একবার ধর্মপ্রচারোদ্দেশে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়া ছয় মাস বাস করিয়া গিয়াছিলেন। চীনা পরিব্রাজক য়ুয়ান-চোয়াঙ্ও বলিতেছেন, বুদ্ধদেব পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণে আসিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এতগুলি উল্লেখ সত্ত্বেও বুদ্ধদেবের বাংলাদেশে আসা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মনে হয়না; পূর্বদিকে তিনি দক্ষিণ-বিহারের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। দীক্ষাদান সম্পর্কে পালি বিনয়পিটক-গ্রন্থে আর্যাবর্তের পূর্বতম সীমা টানা হইয়াছে কজঙ্গলে, সংস্কৃত বিনয়-গ্রন্থে এই সীমা বিস্তৃত হইয়াছে পুণ্ড্রবর্দ্ধন পর্যন্ত। এই দু'টি সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, বুদ্ধদেব-স্বয়ং বাংলা দেশে আসুন বা না আসুন, মৌর্যসম্রাট অশোকের আগেই বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন বাংলার কোনো কোনো স্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। আর অশোকের বৌদ্ধ ধর্মপ্রচার যে অন্তত কিছুটা বাংলাদেশের চিত্তজয় করিয়াছিল তাহার প্রমাণ তো দিব্যাবদান-গ্রন্থ এবং য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীতেই পাইতেছি। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ বলিতেছেন, অশোকের স্মৃতিবিজড়িত অনেকগুলি স্তূপ তিনি দেখিয়াছিলেন

বৌদ্ধধর্ম

পুণ্ড্রবর্দ্ধনে, সমতটে, কর্ণসুবর্ণে এবং তাম্রলিপ্তিতে। পুণ্ড্রবর্ধন বোধ হয় সুবিস্তৃত অশোক-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তই ছিল; এবং অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল মহাস্থান-শিলাখণ্ড-লিপিতে তো তাহার পাথুরে প্রমাণও বিদ্যমান। এই লিপিতে ছবগ্গীয় বা ষড়বর্গীয় থেরবাদী ভিক্ষুদের উল্লেখ তো আছেই, অত্যায়িক বা আপদকালে তাঁহাদিগকে রাজকীয় কোষাগার এবং শস্যভাণ্ডার হইতে তৈল, ধান, গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রা সাহায্যদানের কথাও আছে। তাঁহারা যে রাষ্ট্রের পোষকতা লাভ করিতেন, সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের একটি পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় সাঁচী স্তূপের দুইটি দানলিপি হইতে; এই লিপি দু'টিতে জানা যায়, পুঞবধন বা পুণ্ড্রবর্ধনবাসী বৌদ্ধধর্মানুরাগী দুইটি ব্যক্তি—একটি মহিলা, নাম ধর্মদত্তা, অপরটি পুরুষ, নাম ঋষিনন্দন—সাঁচী স্তূপের বেষ্টনী ও তোরণ নির্মাণে কিছু দান করিয়াছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে সিংহলরাজ দুটঠগামণি মহাস্তূপ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে বিরাট উৎসব রচনা করিয়াছিলেন সেই উৎসবে আমন্ত্রিত ও আগত থেরবাদী বৌদ্ধদের সুদীর্ঘ তালিকায়, আশ্চর্যের বিষয়, বাংলা দেশের কোনো উল্লেখই নাই। তবে, তিব্বতী জনশ্রুতি মতে নাগার্জুন বাংলা দেশে—বঙ্গাল ও পুণ্ড্রবর্ধনে অনেকগুলি বিহার তৈরী করাইয়াছিলেন। বাংলা দেশে (এক্ষেত্রে বঙ্গে, অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গে) বৌদ্ধধর্ম প্রসারের আরও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ পাইতেছি খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের নাগার্জুনী-কোণ্ডর একটি শিলালিপিতে। সিংহলী থেরবাদী বৌদ্ধদের চেষ্টা ও উৎসাহে ভারতবর্ষের অনেক জনপদ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ করিয়াছিল; এই সব দেশের একটি দীর্ঘ তালিকা এই লিপিটিতে দেওয়া হইয়াছে এবং তালিকাটিতে বঙ্গের উল্লেখ আছে। মহাযান সাহিত্যের মতে বৌদ্ধদের প্রাচীন ষোড়শ মহাস্থবিরের মধ্যে অন্তত একজন ছিলেন বাঙালী, তিনি তাম্রলিপ্তিবাসী স্থবির কালিক। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা কঠিন। মনে হয়, তিনি প্রাক-গুপ্তপর্বের লোক।

প্রাক্-গুপ্ত পর্বে বাংলায় জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধধর্মের প্রসারের অল্পবিস্তর প্রমাণ যদি বা পাওয়া যায়, আর্য বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসারের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ প্রায় কিছুই নাই। বেদ-সংহিতায় বাংলাদেশের তো কোনো উল্লেখই নাই; ঐতরেয় আরণ্যক-গ্রন্থে যদি বা আছে (?) তাহাও নিন্দাচ্ছলে। এমন কি বোধায়নের ধর্মসূত্র রচনাকালেও বাংলাদেশ আর্য-বৈদিক সংস্কৃতি বহির্ভূত। অথচ মিথিলা পর্যন্ত বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার তো উপনিষদ যুগেই হইয়া গিয়াছিল, এবং বাংলাদেশে সেই ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসারের পথে কোনো ভৌগোলিক বাধা ছিলনা। দু'একটি সূত্রগ্রন্থে প্রাচীন বাংলায় বৈদিক সংস্কৃতি আদৃতির একটু পরোক্ষ প্রমাণও পাওয়া যায়; বশিষ্ঠ-ধর্মসূত্রে জানা যায়, এক বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের মতে বৈদিক ধর্মের প্রসার কৃষ্ণসার মৃগের বিচরণ ভূমির সীমা পর্যন্ত —পশ্চিমে সিন্ধু নদী এবং পূর্বদিকে সূর্যোদয় স্থান (অর্থাৎ পূর্বসমুদ্র)। কিন্তু তৎসত্ত্বেও,

সূত্রগ্রন্থ রচনাকালেও বাংলাদেশে বৈদিকধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল এ-কথা বলিবার মত নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কিছুই নাই। বস্তুত, ভাষাগত ও জনগত তথ্যপ্রমাণ হইতে মনে হয়, খ্রীষ্টোত্তর তৃতীয়-চতুর্থ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে আর্য বৈদিক ধর্মের সংস্কৃতির প্রসার কিছু হয় নাই; প্রাক্-আর্যভাষী কৌমজনের বাসভূমি যেমন ছিল এই দেশ তেমনই তাঁহাদের ধ্যান-ধারণা ধর্মকর্মই ছিল এই দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি। কখনও কখনও কোনো কোনো আর্য-বৈদিক নেতা বা সম্প্রদায়ের শুভাগমন হইত কি-না বলা কঠিন, কিন্তু হইলেও তাঁহারা যে খুব সমাদৃত হইতেন এমন মনে হয় না; মহাবীরের গল্প হইতে তাহা অনুমান করা চলে। জৈন-বৌদ্ধ-আজীবিকেরা আর্যধর্ম প্রসারের চেষ্টা কিছু করিয়াছিলেন এবং অল্পবিস্তর সার্থকতাও লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু বৈদিক ধর্মের দিক হইতে সে-চেষ্টা বিশেষ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, সার্থকতা লাভ তো দূরের কথা। বরং বৈদিক ব্রাহ্মণ্য উন্নাসিকতা বাংলাদেশকে বহুদিন অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখিত।

তাহা সত্ত্বেও প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে কোথাও কোথাও আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে স্থানীয় ধ্যান-ধারণার সংঘর্ষের কিছু কিছু ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। হরিবংশ-গ্রন্থে যাদব-কৃষ্ণের সঙ্গে পুণ্ড্র-বাসুদেবের এক সংঘর্ষের কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পৌণ্ড্রক-বাসুদেব কৃষ্ণের বাসুদেবত্বের দাবিতে অবিশ্বাসী ছিলেন; সংঘর্ষে পৌণ্ড্রক পরাস্ত ও নিহত হন। মহাভারতে ভীমের পূর্বাভিযান-প্রসঙ্গে এক পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পরাজয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই পৌণ্ড্রক বাসুদেবই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্বেষী পুণ্ড্র-বাসুদেব। স্বতঃই প্রশ্ন জাগে মনে, বাসুদেব কি পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসী ছিলেন? তাঁহার ধর্মমত ও বিশ্বাস কি ছিল? সে মত্ ও বিশ্বাস কাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল? ঐতিহাসিক গবেষণার বর্তমান অবস্থায় এই জাতীয় কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

বস্তুত, প্রাক্-গুপ্তপর্বের বাংলায় আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয় ও প্রসারের নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণই আমাদের নাই। অবৈদিক ব্রাত্যধর্মের প্রসার ছিল প্রাচ্যদেশে এ-তথ্য সুবিদিত। অথর্ববেদের একটি ব্রাত্যস্তোত্রের ব্যাখ্যায় মনে হয়, ব্রাত্যধর্মের সঙ্গে যোগ-ধর্মের সম্বন্ধ বোধ হয় ছিল ঘনিষ্ঠ এবং এই যোগধর্মের অভ্যাস ও আচরণ প্রাচীন বাংলায়ও হয়তো অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু, যোগধর্মের সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এমন মনে করিবার কারণ নাই; বরং সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কারে পণ্ডিতেরা মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যোগধর্ম প্রাক-বৈদিক, এবং শৈব ও তান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে যোগের সম্বন্ধ ঐতিহাসিক পর্বের।

একটি অর্বাচীন অজ্ঞাতলেখকনাম শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন, শক্তিধর্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল গৌড়ে, প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল মিথিলায়, এখানে সেখানে কিঞ্চিত্ মহারাষ্ট্রে, জীর্ণত্ব প্রাপ্তি গুজরাটে।

তাঁহার ধারণা, বৈদিক ও বেদোত্তর আর্যভূমির প্রত্যন্ত সীমায় যে-সব মাতৃতন্ত্রীয় কৌমজনেরা বাস করিতেন তাঁহাদের মধ্যে গিরিকান্তারময়ী একজাতীয়া নারীশক্তির পূজা প্রচলন ছিল; বিন্ধ্যবাসিনী, শাকম্ভরী, কান্তারী প্রভৃতি নামে পরিচিতা দেবীরা এই নারীশক্তিরই প্রতীক, এবং শক্তিধর্মের অভ্যুদয় ও প্রসার ইহাদের আশ্রয় করিয়াই। চন্দ মহাশয় মনে করেন, বাংলাদেশও পূর্বতম প্রত্যন্ত দেশ হিসাবে এই ধর্মের অংশীদার ছিল। কিন্তু শক্তিধর্মের ধ্যানগত ইতিহাস চন্দ মহাশয়ের এই অনুমানের বিরোধী। শক্তিধর্মের শিব ও শক্তি সাংখ্য-ধ্যানোক্ত পুরুষ ও প্রকৃতিরই নামান্তর মাত্র, এবং এই পুরুষ-প্রকৃতি ধ্যান আর্য-ব্রাহ্মণ্য সৃষ্টি-ধ্যানের মূল রহস্য; সে-রহস্যে পুরুষ ধ্যানের বাহিরে বিশুদ্ধ একক শক্তি বা প্রকৃতির কোনো স্থান নাই। একবার যখন ভারতীয় ধ্যানে পুরুষ-প্রকৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলেন এবং ক্রমশ শিব-শক্তিতে রূপান্তরিত হইলেন তখন কৌম-সমাজের মাতৃকা দেবীরা ধীরে ধীরে আসিয়া শক্তিকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিবেন এবং তাঁহার সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। সেই জন্যই, পরবর্তীকালে আমরা যাহাকে শক্তিধর্ম বলিয়া জানি তাহা প্রাক্-গুপ্তপর্বে বাংলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এ-কথা বলিবার মত কোনো প্রমাণ আমাদের নাই। তবে, কৌম-সমাজের মাতৃকাতন্ত্রের দেবীরা নিশ্চয়ই ছিলেন, এবং শক্তিধর্ম প্রসারের পর তাঁহারা শক্তিরূপিণী বিভিন্ন দেবীর সঙ্গে, বিশেষভাবে দুর্গা, তারা প্রভৃতি দেবীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একও হইয়া গিয়াছিলেন।

৪

বাংলাদেশের সর্বতোভদ্র আর্যীকরণ গভীর ভাবে এবং সার্থক রূপে আরম্ভ হইল গুপ্তপর্বেই। এই আরম্ভ হওয়ার মূলে সর্বভারতীয় ইতিহাসের একটি প্রেরণা সক্রিয়, কিন্তু সবিস্তারে তাহা বলিবার ক্ষেত্র এই গ্রন্থ নয়। শুধু ইঙ্গিতটুকু রাখা চলে মাত্র।

খ্রীষ্ট শতকের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টোত্তর দেড়শত-দুই শত বৎসর ধরিয়া ভূমধ্যীয় যাবনিক এবং মধ্যএশীয় শক-কুষাণ ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রবাহ ভারতীয় প্রবাহে নূতন নূতন ধারা সঞ্চার করিতেছিল। সূচনাতেই এই সব বিচিত্র ধারাগুলিকে সংহত ও সমন্বিত করিয়া মূল প্রবাহের সঙ্গে একই খাতে প্রবাহিত করা সম্ভব হয় নাই; তাহা স্বাভাবিকও নয়। তাহা ছাড়া, গ্রামীণ কৃষি-সভ্যতার ধীর মন্থর জীবনে এই সমন্বয়ের ও সংহতির গতিও ধীর মন্থর হইতে বাধ্য। বৌদ্ধ ধর্মে মহাযান-বাদের উদ্ভব, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধ্যানে অনেক নূতন দেবদেবীর সৃষ্টি ও রূপকল্পনা, ধর্মীয় ও সামাজিক আচারানুষ্ঠানে কিছু কিছু নূতন ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতি এই কালে দেখা দেয়। ইহাদের তরঙ্গাভিঘাত ভারতীয় জীবনের তটে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল সন্দেহ নাই। ভারতীয়

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্ব
আ ৩৫০—৭৫০ খ্রী
বিবর্তন

অর্থনৈতিক জীবনেও এই সময় একটি গুরুতর রূপান্তর দেখা দেয়। প্রথম খ্রীষ্ট শতকের তৃতীয় পাদ হইতেই, ভূমধ্যীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের সঙ্গে রতবর্ষের এক ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। যে-দেশ ছিল প্রধানত ও প্রথমত কৃষিনির্ভর সেই দেশ, রোম সাম্রাজ্যের সকলপ্রান্ত হইতে প্রচুর সোনা আগমের ফলে, ক্রমশ শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভরতায় রূপান্তরিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সর্বত্র সমৃদ্ধ নগর, বন্দর, হাট বাজার ইত্যাদি গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। বিদেশি নানা ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির তরঙ্গাভিঘাত, নানা জাতি ও জনের সংঘাত এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর এই বিবর্তন, এই দুইএ মিলিয়া ভারতীয় জীবন-প্রবাহে এক গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই চাঞ্চল্য শুধু জীবনের উপরের স্তরেই নয়, বরং ইহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিহিত চিন্তার ও কল্পনার গভীরতর স্তরে, জীবনের বিস্তারে। সংহতি ও সমন্বয়ের সজাগ প্রয়াস দেখা দেয় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতেই ; ঐ শতকেই দেখিতেছি সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী 'বিনিবতিত চাতুবণ সকরম' চাতুর্বর্ণ্য সাংকর্ষ নিবারণ করিয়া তদানীন্তন বর্ণ-ব্যবস্থাকে একটা সমন্বিতরূপের মধ্যে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রয়াস জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির নব রূপান্তর ঘটাইতে পারিল শুধু তখনই যখন ভারতবর্ষের এক সুবৃহৎ অংশ গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের রাষ্ট্র-বন্ধনে এবং তাঁহাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাঁধা পড়িল। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনের এই সংহতিই ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সংহতিকে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিল। উপরোক্ত সমন্বয় ও সংহতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান হইতেছে ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, বৌদ্ধ ও জৈন পুরাণ। এ-গুলির সংকলন কাল গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগ।

ভারতীয় ইতিহাসের এই বিস্তৃত ও গভীর বিবর্তনের সঙ্গে সমসাময়িক বাংলার ইতিহাস ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সংহতির মধ্যে ধরা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত সবেগে বাংলা দেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে এবং দেখিতে দেখিতে এই দেশ ক্রমশ নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতির এক প্রত্যন্ত অংশীদার হইয়া উঠে। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বের বাংলার ইতিহাসে এই তথ্য গভীর অর্থবহ।

প্রথমেই চোখে পড়ে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রসার, অথচ প্রাক্-গুপ্তপর্বে তাহার অস্তিত্ব কোথাও সহজে ধরা পড়েনা। একটির পর একটি তাম্রপট্টে দেখিতেছি, বাংলাদেশের নানা জায়গায় ব্রাহ্মণেরা আসিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া যাইতেছেন। ইঁহারা কেহ ঋগ্বেদীয়, কেহ বাজসনেয়ী শাখাধ্যায়ী যজুর্বেদীয়, কেহ বা সামবেদীয় ; কাহারও গোত্র কান্ব বা ভার্গব বা কাশ্যপ, কাহারও ভরদ্বাজ বা অগস্ত্য বা বাৎস্য বা কৌণ্ডিণ্য। ভূমিদান যাহা হইতেছে তাহার অধিকাংশই ব্রাহ্মণদের, এবং দানপুণ্যের অধিকারী হইতেছেন দাতা এবং তাহার পিতামাতা।

বৈদিক ধর্ম

দানের উদ্দেশ্য দেবমন্দির নির্মাণ, মন্দির-সংস্কার, বিগ্রহের নিত্য নিয়মিত সেবা ও পূজার বিচিত্র উপকরণের ব্যয়-সংস্থান, বলি-চরু-সত্র, ধূপ-দীপ-পুষ্প-চন্দন-মধুপর্ক প্রভৃতির সংস্থাপন, অগ্নিহোত্র ও পঞ্চমহাযজ্ঞের (অধ্যাপনা, হোম, তর্পণ, বলি ও অতিথি-পূজা) ব্যয়-সংস্থান ইত্যাদি। একাধিক লিপিতে দেখিতেছি, গ্রামবাসী কোনো গৃহস্থ ভূমি কিনিয়া ব্রাহ্মণদের আহ্বান করিয়া আনিয়া ভূমিদান করিয়া তাঁহাদের গ্রামে বসাইতেছেন। ষষ্ঠ শতকে এই বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবাহ বাংলার পূর্বতম প্রান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছে। ভাস্করবর্মার নিধনপুর লিপিতে দেখি, ভূতিবর্মার রাজত্বকালেই শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড গ্রামে দুই শতেরও উপর ব্রাহ্মণ পরিবার আহ্বান করিয়া আনিয়া বসান হইতেছে। ইহারা কেহ ঋগ্বেদীয় বাহ্বৃচ্য শাখাধ্যায়ী, কেহ বা সামবেদীয় ছান্দোগ্য শাখাধ্যায়ী, আবার কেহ কেহ বা যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী, চারক্য বা তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী ; প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন গোত্র ও প্রবর। সপ্তম শতকের লোকনাথ-পট্টোলীতে দেখিতেছি, সমতট দেশে বর্তমান ত্রিপুরা জেলায় জঙ্গল কাটিয়া নূতন বসতির পত্তন হইতেছে এবং সেই পত্তনে যাঁহাদের বসানো হইতেছে তাঁহারা সকলেই চতুর্বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ। সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই যে, এই পর্বে বাংলার সর্বত্র বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিতেছে।

কিন্তু বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তারাপেক্ষাও লোকায়ত জীবনের দিক হইতে অধিকতর অর্থবহ পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার। ইহারও বিশেষ কিছু অস্তিত্ব প্রাক্-গুপ্ত বাংলায় বিশেষ কিছু দেখিতেছিনা। অথচ, চতুর্থ শতকেই দেখিতেছি, বাংলার পশ্চিমতম প্রান্তে বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের এক গুহার প্রাচীরগাত্রে একটি বিষ্ণুচক্র উৎকীর্ণ, এবং চক্রের নীচেই যাঁহার লিপিটি বিদ্যমান সেই রাজা চন্দ্রবর্মা লিপিতে নিজের পরিচয় দিতেছেন চক্রস্বামীর পূজক বলিয়া। চক্রস্বামী যে বিষ্ণু এবং গুহাটি যে একটি বিষ্ণু মন্দির রূপেই কল্পিত এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধে বগুড়া জেলার বালিগ্রামে এক গোবিন্দস্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠার খবর পাওয়া যাইতেছে।

বৈষ্ণব ধর্ম

বৈগ্রাম-লিপিতে, এবং ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর-বঙ্গে, দুর্গম হিমবচ্ছিখরে শ্বেতবরাহস্বামী ও কোকামুখস্বামী নামে দুই দেবতার দুই মন্দির প্রতিষ্ঠার খবর পাওয়া যাইতেছে ৪নং ও ৫নং দামোদরপুর পট্টোলীতে। গোবিন্দস্বামী বিষ্ণুরই অন্যতম নাম সন্দেহ নাই ; শ্বেতবরাহস্বামীও বরাহ-অবতার বিষ্ণুরই অন্যতম রূপ বলিয়া মনে হয়। কোকামুখস্বামীকে কেহ মনে করেন বিষ্ণুর অন্যতম রূপ, কেহ মনে করেন শিবের। বরাহপুরাণ মতে কোকামুখস্থান-নাম; ইহার অবস্থিতি কৌশিকী ও ত্রিস্রোতার অনতিদূরে হিমালয়ের কোনো অংশে ; স্থানটি বিষ্ণুর পরম প্রিয় এবং এখানকার বিষ্ণু প্রতিমাই শ্রেষ্ঠ। দামোদরপুর-লিপির হিমবচ্ছিখরস্থ কোকামুখস্বামীর মন্দির কি বরাহপুরাণ কথিত এই বিষ্ণু-প্রতিমার মন্দির? শ্বেত বরাহরূপী বিষ্ণু সহজ বোধ্য ; কোকামুখ বিষ্ণু কি কৃষ্ণ বা রক্ত-বরাহরূপী বিষ্ণু? বোধ

হয় তাহাই। যাহাই হউক, ইহার কিছুদিন পরই ত্রিপুরা-জেলার গুণাইঘর-পট্টোলীতে এক প্রত্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের খবর পাইতেছি। প্রত্যুম্নেশ্বরও বিষ্ণুর অন্যতম রূপ। সপ্তম শতকের লোকনাথ-পট্টোলীতে ত্রিপুরা-জেলায় ভগবান অনন্ত-নারায়ণের (অনন্তশয়ান বিষ্ণু) পূজার খবর পাওয়া যাইতেছে। এই সপ্তম শতকেরই কৈলান-পট্টোলীতে দেখিতেছি, শ্রীধারণরাত ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং পুরুষোত্তমের ভক্ত উপাসক; তিনি আবার পরম কারুণিকও ছিলেন এবং শাস্ত্রনিয়ম ছাড়া অযথা প্রাণীবধের বিরোধী ছিলেন। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, পৌরাণিক বিষ্ণুর বিভিন্ন রূপ ও ধ্যানের সঙ্গে সমসাময়িক বাঙালীর পরিচয় ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। কারণ, লিপিগত উল্লেখই তো শুধু নয়, সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিভিন্ন বৈষ্ণব-প্রতিমার সাক্ষ্যও বিদ্যমান। বাংলার সমসাময়িক সাহিত্যে বা পুরাণে বা অন্য কোনো গ্রন্থে পৌরাণিক দেবদেবীদের তত্ত্ব ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা বা বিবরণ জানিবার মতন উপকরণ যখন নাই তখন এই সব প্রতিমা-সাক্ষ্যই বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়গত দেবদেবীদের, এবং পৌরাণিক ধর্মের ধ্যান ও কল্পনার একমাত্র পরিচয়। সৌভাগ্যের বিষয়, প্রাচীন বাংলায় এই ধরনের সাক্ষ্যের অভাব নাই, বিশেষ ভাবে অষ্টম শতক এবং অষ্টম শতকের পর হইতে। গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর যুগেরও অন্তত কয়েকটি বৈষ্ণব প্রতিমার কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। রংপুর জেলায় প্রাপ্ত একাধিক ধাতু নির্মিত বিষ্ণু-মূর্তি ও একটি অনন্তশয়ান বিষ্ণু-মূর্তি, বরিশাল জেলার লক্ষ্মণকাঠির গরুড়-বাহন এবং সপরিবার বিষ্ণু, রাজসাহী জেলার যোগীর সওয়ান গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণু-মূর্তি, মালদহ জেলার হাঁকরাইল গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণু-মূর্তি, ঢাকা জেলার সাভার গ্রামে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ এক বিষ্ণুর প্রতিমা প্রভৃতি সমস্তই এই পর্বের। এই প্রতিমা গুলির রূপ-কল্পনা ও লক্ষণ আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, পৌরাণিক বিষ্ণু তাঁহার নিজস্ব মর্যাদায় এবং সপরিবারে, সমস্ত লক্ষণ ও লাঞ্ছন লইয়া বাংলাদেশে আসিয়া আসন লাভ করিয়া গিয়াছেন গুপ্তপর্বেই।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বের বাংলায় বিষ্ণুর যে কয়েকটি রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় (গোবিন্দস্বামী, কোকামুখস্বামী, শ্বেতবরাহস্বামী, প্রত্যুম্নেশ্বর, অনন্ত-নারায়ণ, পুরুষোত্তম) তাহাদের মধ্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য কিছু নাই। দেবতার নামের সঙ্গে স্বামী নামের যোগ সমসাময়িক ভারতীয় লিপিতে অজ্ঞাত নয় (তুলনীয়, চক্রস্বামী, চিত্রকূটস্বামী, স্বামী মহাসেন, যথাক্রমে বিষ্ণু, বিষ্ণু ও কার্তিক)। পঞ্চরাত্রীয় চতুর্ব্যূহবাদের কোনো আভাসও এই পর্বের লিপিগুলিতে কোথাও দেখিতেছি না। চতুর্ব্যূহের প্রত্যুম্নের সঙ্গে উপরোক্ত প্রত্যুম্নেশ্বরের কোনো সম্বন্ধ আছে বলিয়া তো মনে হয় না। গুপ্ত-পর্বের রাজা-মহারাজেরা নিজেদের পরিচয়ে সাধারণত 'পরমভাগবত' পদটি ব্যবহার করিতেন; মনে হয়, তাঁহারা সকলেই ছিলেন বৈষ্ণব ভাগবতধর্মে দীক্ষিত। আদিতে যাহাই হউক, অন্তত গুপ্ত-পর্বে এই ভাগবতধর্মের সঙ্গে পঞ্চরাত্রীয় ব্যূহবাদের কোনো সম্বন্ধ ছিল না। বস্তুত, এই পর্বের ভাগবতধর্ম

ঋগ্বেদীয় বিষ্ণু, পঞ্চরাত্রীয় নারায়ণ, মথুরা অঞ্চলের সাত্বত-বৃষ্ণিদের বাসুদেব-কৃষ্ণ, পশুপালক আভীর প্রভৃতি কোমের গোপাল ইত্যাদির সমন্বিত একক রূপ বলিয়াই মনে হয়। এই ভাগবদ্ধর্মই গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বে বাংলা দেশে প্রচার লাভ করে এবং পাল-পর্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরমভাগবত্ পরিচয় ছাড়া, এই পর্বের একজন রাজা—সপ্তম শতকের রাতবংশীয় সমতটেশ্বর শ্রীধারণ—আত্মপরিচয় দিতেছেন পুরুষোত্তমের পরমভক্ত পরম বৈষ্ণব রূপে। পুরুষোত্তম তো বিষ্ণুরই অন্যতম নাম ও রূপ।

বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত কৃষ্ণায়ণ ও রামায়ণ-কাহিনী যে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বেই বাংলাদেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় পাহাড়পুর মন্দিরের পোড়া মাটির ও পাথরের ফলকগুলিতে। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ, চাণুর ও মুষ্টিকের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামের মল্লযুদ্ধ, যমালার্জুন অথবা জোড়া অর্জুন বৃক্ষ উৎপাটন, কেশী-রাক্ষসবধ, গোপীলীলা, কৃষ্ণকে লইয়া বাসুদেবের গোকুল গমন, রাখাল বালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরাম, গোকুলে কৃষ্ণের বাল্যজীবনলীলা প্রভৃতি কৃষ্ণায়ণের অনেক গল্প এই ফলকগুলিতে উৎকীর্ণ হইয়াছে, শিল্পীর এবং সমসাময়িক লোকায়ত জীবনের পরম আনন্দে। বলরাম ও দেবী যমুনার স্বতন্ত্র প্রতিকৃতিও বিদ্যমান। একটি ফলকে প্রভামণ্ডলযুক্ত, লাস্যভঙ্গীতে দণ্ডায়মান একজোড়া মিথুনমূর্তি উৎকীর্ণ—দক্ষিণে নারীমূর্তি, বামে নরমূর্তি। কেহ কেহ এই মূর্তি দুইটিকে রাধা-কৃষ্ণের লাস্যরূপ বলিয়া চালাইতে চাহিয়াছেন; কিন্তু এরূপ মনে করিবার সংগত কোনো কারণ নাই। রাধা কল্পনার ঐতিহ্য এত প্রাচীন নয়। কালিদাসের "গোপবেশস্য কৃষ্ণ"-পদ রাধার অস্তিত্বের সূচক এ-কথা বলা কঠিন; এমন কি দ্বাদশ শতকীয় রাজা ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে কৃষ্ণের বিচিত্র মিথুনলীলার উল্লেখ থাকিলেও সে-লীলার সঙ্গে রাধার কোনো সম্বন্ধ দেখিতেছি না। হালের গাথা সপ্তশতীতে রাধার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সে-উল্লেখের প্রাচীনত্ব নিশ্চয় করিয়া নির্ধারণ কঠিন। তবে, জয়দেবের (দ্বাদশ শতক) পূর্বেই কোনো সময়ে, এই বাংলাদেশেই রাধাতত্ত্ব ও রাধার রূপ-কল্পনা সৃষ্টিলাভ করিয়াছিল, এ-সম্বন্ধে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। বস্তুত, বৈষ্ণব ধর্মের রাধা শাক্তধর্মের শক্তিরই বৈষ্ণব রূপান্তর ও নামান্তর মাত্র। শিবের মত কৃষ্ণ বা বিষ্ণুই বৈষ্ণব-ধর্মে পরমপুরুষ, এবং এই পুরুষের প্রকৃতি বা শক্তি হইতেছেন রাধা। এই পৃথিবী বা প্রকৃতি যে বিষ্ণুর শক্তি বা বৈষ্ণবী, এই ধ্যান ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই কতকটা প্রসার লাভ করিয়াছিল; হয়তো এই ধ্যানেরই বিবর্তিত রূপ হইতেছেন রাধা। পাহাড়পুরের যুগলমূর্তি কৃষ্ণ ও রুক্মিণী বা সত্যভামার শিল্পরূপ বলিয়াই মনে হয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, পাহাড়পুরে কৃষ্ণায়ণের এই গল্পগুলি মন্দিরের অলংকরণ-উদ্দেশ্যেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল, পূজার জন্য নহে। রামায়ণের কয়েকটি গল্পের যে প্রতিকৃতি আছে (যেমন, বানরসেনা কর্তৃক সেতু নির্মাণ, বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ ইত্যাদি) সে-সম্বন্ধেও এ-উক্তি প্রযোজ্য। তবে, বোধ হয় সংশয় করা চলেনা

যে, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের লোকায়ত বাঙালী জীবনে কৃষ্ণায়ণ ও রামায়ণের কাহিনী যথেষ্ট প্রসার ও সমাদর লাভ করিয়াছিল, এবং এই কৃষ্ণায়ণ ও রামায়ণ আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণব ধর্মের সীমাও বিস্তৃত হইয়াছিল।

এই পর্বের বাংলায় শৈবধর্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা এতটা কিন্তু দেখা যাইতেছে না, যদিও যে-শৈবধর্মের দেখা পাইতেছি তাহা পুরাপুরি সমৃদ্ধ পৌরাণিক শৈবধর্ম। শিবের বিভিন্ন নাম ও রূপ-কল্পনার সঙ্গে পরিচয় সূচনাতেই ঘটিতেছে, এবং বস্তুলিঙ্গ ও মুখলিঙ্গ, শিবলিঙ্গের এই দুই রূপের পরিচয়ই বাংলা দেশে পাওয়া যাইতেছে। ৪নং দামোদরপুর-লিপিতে দেখিতেছি, পঞ্চম শতকে উত্তর-বঙ্গের এক দুর্গম প্রান্তে লিঙ্গরূপী শিবের পূজা প্রবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় শৈবধর্ম মহাদেব-পাদানুধ্যাত মহারাজ বৈন্যগুপ্তের রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া পূর্ব-বাংলায় বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

শৈবধর্ম

সপ্তম শতকে গৌড়-রাজ শশাঙ্ক ও কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্মা দুইজনই পরম শৈব। শশাঙ্কের মুদ্রায় মহাদেবের এবং নন্দীবৃষের প্রতিকৃতি; তিনি যে শৈব-ধর্মাবলম্বী ছিলেন তাহার পরোক্ষ একটু ইঙ্গিত য়ুয়ান-চোয়াঙও রাখিয়া গিয়াছেন। ষষ্ঠ শতকের সমাচারদেবের মুদ্রায়ও নন্দীবৃষের শৈব-লাঞ্ছন; অনুমান হয় ফরিদপুরের এই প্রাচীন রাজপরিবারটিও শৈব। আশ্রফপুর-পট্টোলীর সাক্ষ্যে মনে হয় খড়্গ-বংশীয় রাজারা বৌদ্ধ হইলেও শৈবধর্মের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল; তাঁহাদের রাজকীয় পট্ট-মুদ্রায়ই বৃষলাঞ্ছন। তাহা ছাড়া রাজা দেবখড়্গের পট্টমহিষী রাণী প্রভাবতী একটি অষ্টধাতুনির্মিত সর্বাণীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এ-তথ্যও সুপরিজ্ঞাত। এই শতকেরই অন্যতম ব্রাহ্মণ নরপতি ভারদ্বাজ গোত্রীয় করণ লোকনাথও বোধ হয় ছিলেন শৈব। রাতবংশীয় রাজারা যে ব্রাহ্মণ ছিলেন এ-সম্বন্ধে তো সন্দেহের অবকাশই নাই, তবে তাঁহারা বোধ হয় ছিলেন পরম বৈষ্ণব। রাণী প্রভাবতী প্রতিষ্ঠিত প্রতিমাটির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে দেবীকে বলা হইয়াছে সর্বাণী বা সর্বের শক্তি, এবং সর্ব হইতেছেন অথর্ববেদীয় রুদ্রদেবতার অষ্টরূপের অন্যতম রূপ। কিন্তু এই সর্বাণী প্রতিমাটির লক্ষণ ও লাঞ্ছন ইত্যাদির সঙ্গে পরবর্তীকালের শারদাতিলক-গ্রন্থবর্ণিত ভদ্রকালী, অম্বিকা, ভদ্র-দুর্গা, ক্ষেমংকরী প্রভৃতি দেবী বা শক্তিমূর্তির কোনো পার্থক্য নাই। নাম যাহাই হউক, সর্বাণী যে শিবেরই শক্তিরূপে কল্পিতা হইয়াছেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এতগুলি রাজা ও রাজবংশের পোষকতায় বাংলাদেশে শৈবধর্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

শৈবধর্মের প্রসার ও প্রতিপত্তির কিছু প্রমাণ পাহাড়পুরের ফলকগুলিতেও পাইতেছি। বস্তুলিঙ্গ ও মুখলিঙ্গরূপী শিব দুইই বিদ্যমান, এবং যে দুইটি ফলকে নিঃসন্দেহে শিবলিঙ্গের প্রতিকৃতি সে দু'টিতেই ব্রহ্মসূত্রের বেষ্টনও সুস্পষ্ট। পাহাড়পুর-মন্দিরের পীঠপ্রাচীরগাত্রের ফলকে কয়েকটি চন্দ্রশেখর-শিবের প্রতিকৃতিও আছে। তৃতীয় নেত্র, ঊর্দ্ধলিঙ্গ, জটামুকুট,

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃষবাহন, ত্রিশূল, অক্ষমালা এবং কমণ্ডলু প্রভৃতি লক্ষণ দেখিলে সন্দেহ করিবার উপায় থাকে না যে, এই ধরনের প্রতিমা হইতেই ক্রমশ পাল ও সেন-পর্বের পূর্ণতর শিব-প্রতিমার উদ্ভব। চব্বিশ-পরগণা জেলার জয়নগরে প্রাপ্ত সপ্তম শতকীয় একটি ধাতব প্রতিমাতেও তৃতীয় নেত্র, বৃষবাহন সমপদস্থানক চন্দ্রশেখর-শিবের লক্ষণ সুস্পষ্ট।

শৈব গাণপত্য ধর্মের প্রসারের কোনো প্রমাণ অন্তত এই পর্বের বাংলাদেশে কিছু দেখা যায়না; কিন্তু গণপতি বা গণেশের প্রতিকৃতি এই পর্বেও সুপ্রচুর। এক পাহাড়পুরেই পাথরের, পোড়ামাটির ও ধাতব কয়েকটি উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান গণেশ-প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে, এবং মূর্তিতত্ত্বের দিক হইতে ইহাদের প্রত্যেকটিই মূল্যবান। ইহাদের মধ্যে একটি নৃত্যপর গণেশের প্রতিমা, এবং এই প্রতিমাটিতে লোকায়ত মনের সরল সরস কৌতুকের শিল্পময় প্রকাশ সুস্পষ্ট। গণেশের যাহা কিছু প্রধান লক্ষণ ও লাঞ্ছন তাহা তো এই প্রতিমাগুলিতে আছেই, কিন্তু একটি উপবিষ্ট গণেশের এক হাতে প্রচুর পত্রসংযুক্ত একটি মূলার লক্ষণও বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

শৈব কার্তিকেয়ের কোনো লিপি-প্রমাণ বা মূর্তি-প্রমাণ এই পর্বে কিছু দেখা যাইতেছে না। তবে, অষ্টম শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে কার্তিকেয়ের এক মন্দিরের উল্লেখ পাইতেছি কহ্লনের রাজতরঙ্গিনীতে। কিন্তু গণেশ বা কার্তিকেয়, বা পরবর্তী বাংলায় ইন্দ্র, অগ্নি, রেবন্ত, বৃহস্পতি, কুবের, গঙ্গা, যমুনা, বা মাতৃকাদেবী প্রভৃতি যাঁহাদের লিপি, মূর্তি বা গ্রন্থ-প্রমাণ বিদ্যমান তাঁহাদের আশ্রয় করিয়া কোনো বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় বাংলাদেশে কখনও গড়িয়া উঠে নাই।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যে সূর্যমূর্তি ও সূর্যপূজার পরিচয় আমরা পাই তাহা একান্তই উদীচ্য দেশ ও উদীচ্য সংস্কৃতির দান; এই দান বহন করিয়া আনিয়াছিলেন ঈরাণী ও শক অভিযাত্রীরা এবং ভারতবর্ষ এই দান হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। বৈদিক সূর্য-ধ্যান-কল্পনার সঙ্গে যেমন এই সূর্যের কোনো যোগ নাই, তেমনই নাই লোকায়ত জীবনের সূর্যধ্যান ও ব্রতাচারের সঙ্গে। এই উদীচ্যদেশী সূর্যের সঙ্গে বাংলাদেশের পরিচয় ঘটে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বেই। রাজসাহী জেলার কুমারপুর ও নিয়ামতপুরে প্রাপ্ত দুইটি সূর্যমূর্তি কুষাণ-পর্বের না হইলেও অন্তত আদি গুপ্ত-পর্বের। বগুড়া জেলার দেওড়া গ্রামে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তিও প্রায় এই যুগেরই। ২৪-পরগণা জেলার কাশীপুর গ্রামের সূর্যমূর্তি এবং ঢাকা চিত্রশালার ক্ষুদ্রাকৃতি ধাতব সূর্যপ্রতিমাও গুপ্ত-পর্বেরই। ইহাদেরই পূর্ণতর বিবর্তিত মূর্তিরূপ দেখিতেছি পাল-সেন-পর্বের অসংখ্য সূর্যমূর্তিতে। মনে হয়, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বেই বাংলাদেশে সৌরধর্ম কিছুটা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং বিশিষ্ট একটি সৌর সম্প্রদায়ও গড়িয়া উঠিয়াছিল।

সৌরধর্ম

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার আদিতম আর্যধর্মই হইতেছে জৈনধর্ম এবং গুপ্ত-পর্বের আগেই বাংলা দেশে, বিশেষভাবে উত্তর-বঙ্গে জৈনধর্ম বিশেষ প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু

গুপ্ত-পর্বে জৈনধর্মের উল্লেখ বা জৈন মূর্তি-প্রমাণ বিশেষ কিছু দেখিতেছি না। একটি মাত্র অভিজ্ঞান পাইতেছি পাহাড়পুর পট্টোলীতে; এই পট্টোলীতে দেখা যাইতেছে, পঞ্চম শতকের বটগোহালীতে (পাহাড়পুর সংলগ্ন বর্তমান গোয়ালভিটা) একটি জৈন-বিহার ছিল; বারাণসীর পঞ্চস্তূপীয় শাখার নিগ্রন্থনাথ আচার্য গুহনন্দীর শিষ্য ও শিষ্যানুশিষ্যবর্গ এই বিহারের অধিবাসী ও অধিকর্তা ছিলেন, এবং তাঁহারা প্রতিবাসী এক ব্রাহ্মণ-দম্পতির নিকট হইতে কিছু ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন, বিহারের অর্হৎদের নিত্য পূজা ও সেবার ফুল-চন্দন-ধূপ ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য।

জৈনধর্ম

অথচ, প্রায় দেড়শত বৎসর পরই (সপ্তম শতকের দ্বিতীয় পাদ) য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ বলিতেছেন, (বৈশালী, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট ও কলিঙ্গে) দিগম্বর নিগ্রন্থ জৈনদের সংখ্যা ছিল সুপ্রচুর। দিগম্বর নিগ্রন্থদের এই সুপ্রাচুর্য ব্যাখ্যা করা কঠিন। বাংলা দেশ এক সময় আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল, এবং এ-তথ্য সুপরিজ্ঞাত যে, বৌদ্ধদের চক্ষে আজীবিকদের সঙ্গে নিগ্রন্থদের অশন-বসন-আচারানুষ্ঠানের পার্থক্য বিশেষ ছিল না। সেই হেতু, দিব্যাবদান-গ্রন্থে দেখিতেছি, নিগ্রন্থ ও আজীবিকদের নির্বিচারে একে অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া তালগোল পাকানো হইয়াছে। য়ুয়ান-চোয়াঙের সময়ে, বোধ হয় তাঁহার আগেই, অন্তত বাংলাদেশে আজীবিকেরা নিগ্রন্থ-সম্প্রদায়ে একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা পুষ্ট করিয়াছিলেন; অথবা দিব্যাবদানের মত য়ুয়ান-চোয়াঙ্ও আজীবিক ও নিগ্রন্থের পার্থক্য ধরিতে না পারিয়া সকলকেই নিগ্রন্থ বলিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্মর্তব্য যে, প্রাচীন বাংলায় আজীবিকদের স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্বের প্রমাণ নাই।

পাল ও সেন-পর্বে নিগ্রন্থ জৈনদের কোনো লিপি-প্রমাণ বা গ্রন্থ-প্রমাণ দেখিতেছি না, যদিও প্রাচীন বাংলার নানা জায়গায় কিছু কিছু জৈন মূর্তি-প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের কথা পরে যথাস্থানে বলিতেছি। নিগ্রন্থ জৈন সম্প্রদায়ের, স্বল্পসংখ্যক হইলেও কিছু লোক নিশ্চয়ই ছিলেন; তাহা না হইলে এই সব মূর্তি-প্রমাণের ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে, মনে হয়, পাল-পর্বের শেষের দিক হইতেই এই সব দিগম্বর নিগ্রন্থরা ক্রমশ সিদ্ধ, কাপালিক, অবধূত প্রভৃতি উলঙ্গ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার না হউক প্রভাব ও প্রতিপত্তি সকলের চেয়ে বেশি। তৃতীয় শতকের শেষপাদে বা চতুর্থ শতকের সূচনাতেই দেখিতেছি চীনা বৌদ্ধ শ্রমণেরা বাংলাদেশে, বিশেষভাবে উত্তর-বঙ্গে যাতায়াত করিতেছেন। ইৎসিঙ্ বলিতেছেন, চীনা শ্রমণদের ব্যবহারের জন্য মহারাজ শ্রীগুপ্ত একটি 'চীন মন্দির' নির্মাণ করাইয়া তাহার সংরক্ষণের জন্য চব্বিশটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন; মন্দিরটি ছিল মৃগস্থাপন (মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো) স্তূপের সন্নিকটেই, এবং নালন্দা হইতে গঙ্গাতীর ধরিয়া

৪০ যোজন দূরে। এই শ্রীগুপ্ত খুব সম্ভব গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ শ্রীগুপ্ত বা গুপ্ত, এবং মৃগস্থাপন স্তূপ বরেন্দ্র বা উত্তর-বঙ্গের কোনো স্থানে। পঞ্চম শতকের গোড়ায় চীনা বৌদ্ধ শ্রমণ ফা-হিয়েন চম্পা হইতে গঙ্গা বাহিয়া বাংলাদেশেও আসিয়াছিলেন এবং তাম্রলিপ্তি বন্দরে দুই বৎসর বৌদ্ধ সূত্র ও বৌদ্ধ প্রতিমাচিত্র নকল করিয়া কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তাম্রলিপ্তিতে অসংখ্য ভিক্ষু-অধ্যুষিত বাইশটি বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং বৌদ্ধ ধর্মের সমৃদ্ধিও ছিল খুব। এই সমৃদ্ধির কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায় সমসাময়িক কয়েকটি বৌদ্ধ মূর্তিতে। পূর্ব-ভারতীয় গুপ্তশৈলীর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন রাজসাহী-জেলার বিহারৈল গ্রামে প্রাপ্ত দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তিটি; এই মূর্তিটি মহাযানী যোগাচারের শিল্পময় রূপ। বগুড়া জেলার মহাস্থানে বলাইধাপ-স্তূপের নিকট প্রাপ্ত ধাতব মঞ্জুশ্রী মূর্তিটিও এই যুগেরই এবং ইহাও মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই প্রমাণ আরও দৃঢ়তর হইতেছে ষষ্ঠ শতকের প্রথম দশকে উৎকীর্ণ মহারাজ বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর-পট্টোলীর সাহায্যে। সামন্ত-মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য ছিল, (১) মহাযানী ভিক্ষু শান্তিদেবের জন্য রুদ্রদত্ত নির্মিত ও আর্য-অবলোকিতেশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত আশ্রম-বিহারের সংরক্ষণ, (২) এই বিহারে শান্তিদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং অবৈবর্তিক মহাযানী ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক স্থাপিত বুদ্ধমূর্তির প্রতিদিন তিনবার ধূপ, গন্ধ, পুষ্প সহকারে পূজার সংস্থান, এবং (৩) ঐ বিহারবাসী ভিক্ষুদের অশন, বসন, শয়ন, আসন এবং চিকিৎসার সংস্থান। এই পট্টোলীতেই খবর পাইতেছি, উক্ত আশ্রম-বিহার প্রতিষ্ঠার আগেই উহার নিকটেই রাজবিহার নামে আর একটি বিহার ছিল; এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা যে কে তাহা বলিবার উপায় নাই। রাজবিহার ছাড়া আরও একটি বৌদ্ধ বিহারের উল্লেখ এই লিপিতে আছে। যাহাই হউক, ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই বাংলার পূর্বতম প্রান্তে ত্রিপুরা-জেলায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গুণাইঘর-লিপিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অথচ, স্মরণ রাখা প্রয়োজন, মহারাজ বৈন্যগুপ্ত নিজে ছিলেন 'মহাদেবপাদানুধ্যাত' অর্থাৎ শৈব। ত্রিপুরা-জেলারই কৈলান-পট্টোলীতে দেখিতেছি, শ্রীধারণরাতের মহাসান্ধিবিগ্রহিক জয়নাথ কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন একটি রত্নত্রয়ে অর্থাৎ বৌদ্ধবিহারে, বিহারস্থ আর্যসংঘের লিখন-পঠন, চীবর এবং আহারাদির সংস্থানের জন্য। অথচ, স্মরণ রাখা প্রয়োজন, শ্রীধারণরাত নিজে ছিলেন পরম বৈষ্ণব।

বৌদ্ধধর্ম

চীনা শ্রমণদের কৃপায় সপ্তম শতকে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য আমাদের আয়ত্তে। এঁদের মধ্যে য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীই সব চেয়ে প্রসিদ্ধ এবং তথ্যবহুল। তিনি বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন আনুমানিক ৬৩৯ খ্রীষ্ট শতকে, এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও সাধনার প্রসিদ্ধ কেন্দ্রগুলি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তি, বাংলার এই কয়টি জনপদ পরিক্রমা করিয়াছিলেন। কজঙ্গলে তিনি

ছ'সাতটি বৌদ্ধ সংঘারাম দেখিয়াছিলেন, এবং তাহাতে প্রায় ছয় শত ভিক্ষু বাস করিতেন। কজঙ্গলের উত্তর অংশে গঙ্গার অনতিদূরে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রতিমাসম্বলিত, নানা কারুকার্যখচিত ইট ও পাথরের তৈরী একটি বৃহৎ মন্দিরের কথাও তিনি বলিয়াছেন। পুণ্ড্রবর্ধনে ছিল বিশটি বিহার এবং মহাযান ও হীনযান উভয়পন্থী তিন হাজারেরও উপর ভিক্ষু এই বিহারগুলিতে বাস করিতেন। সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন বিহারটি ছিল পুণ্ড্রবর্ধন-রাজধানীর তিন মাইল পশ্চিমে এবং তাহার নাম ছিল পো-সি-পো বিহার। এই বিহারে ৭০০ মহাযানী ভিক্ষু এবং পূর্ব-ভারতের বহু জ্ঞানবৃদ্ধ খ্যাতনামা শ্রমণ বাস করিতেন; বিহারের অনতিদূরেই ছিল অবলোকিতেশ্বরের একটি মন্দির। পো-সি-পো বিহার বোধ হয় মহাস্থান-সংলগ্ন ভাসু-বিহার। য়ুয়ান-চোয়াঙ সমতটে দুই হাজার স্থবিরবাদী শ্রমণাধ্যুষিত ত্রিশটি বিহার দেখিয়াছিলেন। যথার্থত ইহারা বোধ হয় ছিলেন মহাযানী। কর্ণসুবর্ণে দশাধিক বিহারে সম্মতীয় শাখার দুই হাজার শ্রমণ বাস করিতেন। সম্মতীয় বৌদ্ধরা ছিলেন সর্বাস্তিবাদী। কর্ণসুবর্ণ-রাজধানীর অনতিদূরে ছিল সুবিখ্যাত লো-টো-মো-চিহ্ বা রক্তমৃত্তিকা বিহার, বহু কৃতী পণ্ডিত শ্রমণ ছিলেন এই বিহারের অধিবাসী। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন, কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রচারিত হইবার আগেই জনৈক দক্ষিণ-ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণের সম্মানার্থে দেশের রাজা কর্তৃক এই বিহার নির্মিত হইয়াছিল। তাম্রলিপ্তিতেও দশাধিক বিহার ছিল এবং এই বিহারগুলিতে, এক হাজারেরও বেশি শ্রমণ বাস করিতেন। অথচ, তাম্রলিপ্তিতে ফা-হিয়েনের কালে বিহার ছিল বাইশটি। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর ই-ৎসিঙ যখন তাম্রলিপ্তি আসেন তখন সেখানে সর্বাস্তিবাদের প্রবল প্রতাপ; য়ুয়ান-চোয়াঙের সময়ও বোধ হয় তাহাই ছিল। য়ুয়ান-চোয়াঙের সাক্ষ্যে মনে হয়, তাঁহার সময়ে অধিকাংশ বাঙালী শ্রমণই ছিলেন হীনযানপন্থী, এক চতুর্থাংশের কিছু উপর ছিলেন মহাযানপন্থী। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আজ আমরা হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে যে-ভাবে পার্থক্য বিচার করিয়া থাকি, য়ুয়ান-চোয়াঙের সময়ে সে-ধরনের বিচার ছিল না। ভারতবর্ষের বহু জায়গার শ্রমণদের কথা বলিতে গিয়া য়ুয়ান-চোয়াঙ তাঁহাদের পরিচয় দিয়াছেন "স্থবিরশাখার মহাযানবাদী" বা Mahayanist of the Sthavira School বলিয়া। এই জন্যই পুণ্ড্রবর্ধনের অধিকাংশ শ্রমণদের তিনি পরিচয় দিয়াছেন হীনযান ও মহাযান উভয় মতাবলম্বী বলিয়া। সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রে বহু ক্ষেত্রে এই দুই মতবাদে আজিকার দিনের মত পার্থক্য কিছুই করা হয় নাই; তাহাদের মতে শ্রাবকযান বা হীনযান মহাযানেরই নিম্নতর স্তর মাত্র। প্রাচীন চীনা ও জাপানী বৌদ্ধদের মত ও তাহাই। আজ পণ্ডিতমহলে এ-তথ্য সুপরিজ্ঞাত যে, বৌদ্ধ মহাযানপন্থী সর্বাস্তিবাদী, ধর্মগুপ্তবাদী, মহাসাংঘিকবাদী প্রভৃতি শ্রমণেরা যথার্থত হীনযানবাদের বিনয়-শাসন মানিয়া চলিতেন। খুব সম্ভব. এই অর্থেই য়ুয়ান-চোয়াঙ্ "স্থবিরশাখার মহাযানবাদী" পদটি ব্যবহার করিয়াছেন, এবং হীনযান এবং মহাযান উভয়

মতাবলম্বী বলিতেও তাহাই বুঝিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পর ই-ৎসিঙ্ বলিতেছেন, পূর্ব-ভারতে মহাসাংঘিক, স্থবিরবাদী, সম্মতীয়বাদী এবং সর্বাস্তিবাদী এই চারি বর্গের বৌদ্ধরাই অন্যান্য শাখার বৌদ্ধদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করিতেন। কিন্তু, মহাযানী বৌদ্ধরা ছাড়া অন্য কোন শাখাপন্থী বৌদ্ধ ছিলেন, এমন প্রমাণ নাই; অন্তত তাম্রলিপ্তিতে ছিলেন না। সপ্তম শতকের তাম্রলিপ্তিতে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে আরও কিছু চীনা সাক্ষ্য বিদ্যমান। তা-চে'ং-টেং নামে এক বৌদ্ধ শ্রমণ সুদীর্ঘ বারো বৎসর তাম্রলিপ্তিতে বসিয়া সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন; চীনদেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি নিদান-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছিলেন। তও-লিন নামে আর এক বৌদ্ধ শ্রমণ এই তাম্রলিপ্তিতেই সর্বাস্তিবাদে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিন বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। ই-ৎসিঙ্ তাম্রলিপ্তি আসিয়াছিলেন ৬৭৩ খ্রীষ্ট শতকে; পো-লো-হো বা বরাহ (?)-বিহারে উপরোক্ত তা-চে'ং-টেং'র সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তিনিও তাম্রলিপ্তিতে কিছুকাল বাস করিয়া সংস্কৃত ও শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং নাগার্জুন-বোধিসত্ত্ব-সুহৃল্লেখ নামে অন্তত একটি সংস্কৃত গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। বরাহ-বিহারে তখন রাহুলমিত্র নামে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক এক শ্রমণ বাস করিতেন; তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ছিল অসীম। পো-লো-হো বা বরাহ-বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনযাত্রার একটি ছবি ই-ৎসিঙ্ রাখিয়া গিয়াছেন। কঠোর নিয়ম-সংযমে তাঁহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত ছিল; সংসার-জীবন তাঁহারা পরিহার করিয়া চলিতেন এবং জীবহত্যার পাপ হইতে তাঁহারা মুক্ত ছিলেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর দেখা হইলে তাঁহারা উভয়েই অত্যন্ত সংযত ও বিনয়-সম্মত আচরণ করিতেন। ভিক্ষুণীরা যখনই বাহিরে যাইতেন অন্তত দুই জন একসঙ্গে যাইতেন; কোনো গৃহস্থ-উপাসকের বাড়ী যাইবার প্রয়োজন হইলে অন্যূন চারজন একত্র যাইতেন। একবার একজন শ্রমণের একটি বালকের হাত দিয়া এক গৃহস্থ-উপাসকের স্ত্রীকে কিছু চাল পাঠাইয়াছিলেন। এই ব্যাপারটি যখন সংঘের গোচরীভূত হইল তখন শ্রমণেরটি এত লজ্জিত হইলেন যে, চিরতরে সেই বিহার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই বিহারেরই ভিক্ষু রাহুলমিত্র মুখোমুখি কখনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলিতেন না, মাতা ও ভগিনী ছাড়া। তাঁহারাও যখন দেখা করিতে আসিতেন, সাক্ষাৎকারটা হইত তাঁহার ঘরের বাহিরে!

অথচ, ইহার তিন শত সাড়ে তিন শত বৎসর পরই বৌদ্ধ সংঘে-বিহারে—এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মানুষ্ঠানেও—যে নৈতিক অনাচার এবং যৌন জীবনে যে শিথিলতা দেখা দিয়াছিল তাহার আভাসমাত্রও এই পর্বে কোথাও দেখা যাইতেছে না।

এই ই-ৎসিঙ্ই সংবাদ দিতেছেন, ৬৪৪ খ্রীষ্ট শতকে য়ুয়ান্-চোয়াঙের ভারত ত্যাগ এবং ৬৭৩ খ্রীষ্ট শতকে ই-ৎসিঙের ভারত আগমন, এই দুই তারিখের মধ্যে বহু চীনা পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে ৫৬ জনের উল্লেখ ই-ৎসিঙ্ নিজেই করিয়াছেন।

এই ৫৬ জনের মধ্যে প্রসিদ্ধতম হইতেছেন সেঙ্-চি। সেঙ্-চি সমতটে আসিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই প্রবাসের বিবরণও রাখিয়া গিয়াছেন। সপ্তম শতকের প্রথম পাদে শশাঙ্ক যখন গৌড় ও কর্ণসুবর্ণের রাজা তখন সমতটে ছিল এক ব্রাহ্মণ-বংশের রাজত্ব; সেই রাজবংশে নালন্দার প্রধানাচার্য স্বনামখ্যাত মহাপণ্ডিত শীলভদ্রের জন্ম। শীলভদ্রের কথা পরে আর এক অধ্যায়ে বলিবার সুযোগ হইবে; আপাতত এ-কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শীলভদ্রই ছিলেন নালন্দায় য়ুয়ান-চোয়াঙের গুরু। শীলভদ্রের এক ভ্রাতুষ্পুত্র বোধিভদ্র নালন্দার অন্যতম আচার্য ছিলেন। যাহাই হউক, শশাঙ্কের সময়ে যে-সমতটে ছিল ব্রাহ্মণ রাজবংশের রাজত্ব, সেই সমতটেই প্রায় ৫০ বৎসর পর সেঙ্-চি আসিয়া দেখিলেন এক বৌদ্ধ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। রাজবংশের পরিবর্তন হইয়াছিল, না পুরাতন রাজবংশের সমসাময়িক প্রতিনিধি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বলা কঠিন। যাহা হউক, সেঙ্-চি বলিতেছেন, সিংহাসনাসীন রাজার নাম ছিল রাজভট। ঐতিহাসিকেরা অনেকেই মনে করেন, এই রাজভট আর খড়্গবংশীয় তৃতীয় রাজা দেবখড়্গপুত্র রাজরাজ বা রাজরাজভট্ট একই ব্যক্তি। যাহাই হউক, সেঙ্-চি বলেন, রাজভট ছিলেন পরমোপাসক এবং ত্রিরত্নের প্রতি ভক্তিমান; তিনি প্রত্যহ বুদ্ধের এক লক্ষ মৃন্ময় মূর্তি গড়াইতেন, মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রের এক লক্ষ শ্লোক পাঠ করিতেন এবং এক লক্ষ সদ্যচয়িত ফুলে পূজা করিতেন। দানধ্যানও ছিল তাঁহার প্রচুর। মাঝে মাঝে তিনি বুদ্ধের সম্মানার্থে শোভাযাত্রা বাহির করিতেন; সম্মুখে থাকিত অবলোকিতেশ্বরের এক প্রতিমা, পশ্চাতে সারি সারি চলিতেন ভিক্ষু ও উপাসকেরা এবং সকলের পশ্চাতে চলিতেন রাজা। সমতটের রাজধানীতে তখন চার হাজার ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তির দিক হইতে সেঙ্-চি'র সমতট য়ুয়ান-চোয়াঙের সমতট অপেক্ষা সমৃদ্ধতর, এবং মহাযানের প্রভাব উত্তরোত্তর আধিকতর সক্রিয়। তাহার কারণও আছে। এইমাত্র যে খড়্গ-রাজবংশের কথা বলিলাম, এই বংশের রাজত্ব ছিল বঙ্গ এবং সমতটে; এবং লিপি-সাক্ষ্যে জানা যায়, এই বংশের সকল রাজাই ছিলেন বৌদ্ধ, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই ছিলেন বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের পরম পৃষ্ঠপোষক।

এই শতকেরই রাতবংশীয় রাজা শ্রীধারণের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দেখিতেছি, সমতটের পরমবৈষ্ণব রাজা শ্রীধারণের মহাসন্ধিবিগ্রহাধিকারী বৌদ্ধ জয়নাথ তথাগত, ত্রিরত্ন এবং ব্রাহ্মণার্যগণের পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্তনের জন্য কিছু ভূমি দান করিতেছেন। সমতটে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তির ইহাও আর একটি প্রমাণ।

চীনা শ্রমণদের বিবরণ পড়িলে মনে হয়, বাংলার অন্যত্র কি হইতেছিল বলা যায় না, অন্তত তাম্রলিপ্তিতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তি ক্রমশ হ্রাস পাইতেছিল। ফা-হিয়েনের কালে তাম্রলিপ্তিতে বিহার ছিল বাইশটি; য়ুয়ান-চোয়াঙের সময় দশটি; ই-ৎসিঙের কালে মাত্র পাঁচ-ছয়টি। বোধ হয়, বাংলার অন্যত্রও তাহাই হইতেছিল একমাত্র সমতট ছাড়া।

মহারাজ বৈন্যগুপ্তের সময় হইতেই সমতটে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার লক্ষ্য করা যায়। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ যেখানে দেখিয়াছিলেন ত্রিশটি বিহার ও মাত্র দুই হাজার শ্রমণ, সেঙ্-চি'র কালে সেখানে শ্রমণের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল চার হাজার। সমতটে বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের এই বর্ধমান প্রতিপত্তির প্রধান কারণ মহাযানী বৌদ্ধ খড়্গ-বংশীয় রাজাদের সক্রিয় পোষকতা ও সমর্থন। এই খড়্গ-বংশ ছাড়া পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের বাংলাদেশে আর কোনো রাজবংশই বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। সমতটে মহাযানের প্রতিপত্তি বৈন্যগুপ্তর সময় হইতেই এবং সে-প্রতিপত্তি ত্রয়োদশ শতকের রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ কেন যে তৎকালীন সমতটীয় ভিক্ষুদের স্থবিরবাদী বলিয়াছেন, বুঝিতে পারা কঠিন। খুব সম্ভব স্থবিরবাদী বলিতে তিনি স্থবির-বিনয়াশ্রয়ী মহাযানী বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

আগে দেখিয়াছি, বৌদ্ধ জয়নাথ পরমবৈষ্ণব রাজা শ্রীধারণের অন্যতম প্রধান রাজকর্মচারী; তিনি ভূমিদান বৌদ্ধসংঘে যেমন করিতেছেন, ব্রাহ্মণদেরও তেমনই। য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীতেও দেখিতেছি, বৌদ্ধ শ্রমণ ও গৃহস্থোপাসক এবং ব্রাহ্মণ্য দেবপূজক সকলেই একই সঙ্গে বাস করিতেছেন নির্বিবাদে। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ হয়তো শশাঙ্কের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু বলিতেছেন, শশাঙ্ক ছিলেন নিদারুণ বৌদ্ধ বিদ্বেষী এবং তিনি বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদসাধনেও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কি কি অপকর্ম করিয়াছিলেন তাহার একটি নাতিবৃহৎ তালিকাও দিয়াছেন। য়ুয়ান-চোয়াঙের এই বিবরণের পরিণতির—অর্থাৎ দুরারোগ্য চর্মরোগে শশাঙ্কের মৃত্যুকাহিনীর—একটু ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থেও আছে; এবং খুব আশ্চর্যের বিষয়, মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণকুলপঞ্জীতেও আছে। বৌদ্ধবিদ্বেষী শশাঙ্কের প্রতি বৌদ্ধ লেখকদের বিরাগ স্বাভাবিক, কিন্তু বহুযুগ পরবর্তী ব্রাহ্মণ্যকুলপঞ্জীতে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া একটু আশ্চর্য বই কি? য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণের বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি (যেমন, ২৮৪-২৮৬ পৃ); এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণ অতিরঞ্জিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়, গালগল্পের ভেজালও যথেষ্ট এবং শৈব-ব্রাহ্মণ্য রাজার প্রতি, বিশেষত যে-রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধনের শত্রু তাঁহার প্রতি, বিরাগ থাকাও কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু তাঁহার বিবরণ সর্বথা মিথ্যা এবং শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষ কিছু ছিল না, এ-কথা বলিয়া শশাঙ্কের কলঙ্কমুক্তির চেষ্টাও আধুনিক ব্রাহ্মণ্য-মানসের অসার্থক প্রয়াস। এ-প্রশ্ন সত্য যে, শশাঙ্ক যদি যথার্থই বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই য়ুয়ান-চোয়াঙ্ শশাঙ্কেরই রাজধানী কর্ণসুবর্ণে (এবং বাংলা-বিহারের অন্যত্র) এত গুলি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বিহার দেখিলেন কিরূপে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বিবেচনা প্রয়োজন যে, যে-কেহ এক জীবনে উচ্ছেদের যত চেষ্টাই করুন না তাঁহার পক্ষে এতদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিস্তৃত একটি ধর্মের

বিভিন্ন ধর্মের মিলন ও সংঘাত

এবং সেই ধর্মাবলম্বী লোকদের সম্পূর্ণ নির্মূল, এমন কি খুব বেশি ক্ষতি করাও সম্ভব নয়। ঔরংজীবও তাহা পারেন নাই; তাই বলিয়া ঔরংজীবের ধর্মান্ধতা ও হিন্দুবিদ্বেষ একেবারে ছিলনা, এ-কথা কি জোর করিয়া বলা যায়? য়ুয়ান-চোয়াঙ্‌ শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষের যে ক'টি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বৌদ্ধবিদ্বেষ অনস্বীকার্য, কিন্তু তাহা দ্বিগুণিত হইলেও একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সুবিস্তৃত ধর্মের উচ্ছেদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কাজেই য়ুয়ান-চোয়াঙের সময়ে বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধ অবস্থা শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষের বিপক্ষ যুক্তি বলিয়া উপস্থিত করা যায় না। এমন কি, ভারতীয় কোনো রাজা বা রাজবংশের পক্ষে পরধর্মবিদ্বেষী হওয়া অস্বাভাবিক, এ-যুক্তিও অত্যন্ত আদর্শবাদী যুক্তি এবং বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি নয়। অন্য কাল এবং ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তের বা দেশখণ্ডের দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়া লাভ নাই; প্রাচীন কালের বাংলা দেশের কথাই বলি। বঙ্গাল-দেশের সৈন্য-সামন্তরা কি সোমপুর মহাবিহারে আগুন লাগায় নাই? বর্মণ রাজবংশের জনৈক প্রধান রাজকর্মচারী ভট্ট-ভবদেব কি বৌদ্ধ পাষণ্ড বৈতণ্ডিকদের উপর জাতক্রোধ ছিলেন না? সেন-রাজ বল্লালসেন কি 'নাস্তিক (বৌদ্ধ)দের পদোচ্ছেদের জন্যই কলিযুগে জন্মলাভ' করেন নাই? বস্তুত, শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ অপ্রমাণ করিতে হইলে অন্য যুক্তির প্রয়োজন। বরং, অন্যদিক্‌ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, সমসাময়িক পূর্ব-ভারতে সর্বত্রই নব ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রসার এবং দেবপূজকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। রাজবংশগুলি প্রায় সমস্তই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী; গৌড়-কর্ণসুবর্ণে ব্রাহ্মণ্য রাজবংশ, কামরূপ ও মগধে তাহাই, উড়িষ্যায় ও তাহাই। অথচ বৌদ্ধ ধর্ম বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় ক্রমবিস্তারমান; যে পুষ্যভূতি বংশ ছিল ব্রাহ্মণ্য দেবপূজক সেই বংশের রাজা হর্ষবর্ধনও বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়িয়াছেন। নব ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম যেমন নববলে বলীয়ান হইয়া সীমা ও প্রতিপত্তি বিস্তারে প্রাগ্রসর, বৌদ্ধধর্মও তেমনই যোগাচারে সমৃদ্ধ হইয়া সমান প্রাগ্রসর। এই দুই ধর্মই তখন পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী—জনসাধারণের মধ্যে সীমা ও প্রতিপত্তি বিস্তার উভয়েরই লক্ষ্য। কাজেই এমন অবস্থায় কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ী রাজা বা রাজবংশের পক্ষে অন্য ধর্মের উপর বিদ্বেষী হওয়া কিছু মাত্র অস্বাভাবিক নয়, বিশেষত যে-ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিদ্বেষের কারণ সক্রিয়। বৌদ্ধধর্মের রাজকীয় মুখপাত্র তখন হর্ষবর্ধন, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের শশাঙ্ক; রাষ্ট্রক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং উভয়েই সংগ্রামরত। এই অবস্থায় শশাঙ্কের পক্ষে গয়ার বোধিদ্রুম কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলা, বুদ্ধ-প্রতিমাকে অন্য মন্দিরে স্থানান্তরিত করা, এবং সেই স্থানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা, কুশীনারার এক বিহার হইতে ভিক্ষুদিগকে তাড়াইয়া দিয়া বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা, পাটলিপুত্রে বুদ্ধপদাঙ্কিত একটি প্রস্তরখণ্ডকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা প্রভৃতি কিছুই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু, কোনো ব্যক্তি বিশেষের, এমন কি সমস্ত সম্প্রদায় বিশেষের এই কয়েকটি অপকর্মের ফল একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সুবিস্তৃত ধর্মের শাখাগ্রও স্পর্শ করেনা, মূলোৎপাটন তো দূরের কথা। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের উপর প্রাচীন ও সাম্প্রতিক কালে এ-ধরনের অভিঘাত তো কম হয় নাই, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কতটুকু হইয়াছে?

কিন্তু শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী হউন বা না হউন, জনসাধারণের ধর্মগত আচরণ-ব্যবহারের মধ্যে পরধর্মবিদ্বেষের কোনো প্রমাণ অন্তত এই পর্বে কোথাও কিছু নাই। ইতিহাস আলোচনায় সর্বত্রই সাধারণত দেখা যায়, পরধর্মবিদ্বেষ বা পরমত-অসহিষ্ণুতা শ্রেণীস্বার্থভোগী উচ্চকোটি লোকদের শ্রেণীস্তরেই সৃষ্টিলাভ এবং সেই স্তরেই পুষ্টিলাভ করে এবং তাঁহারাই নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য ক্রমশ তাহা অজ্ঞ নিরক্ষর নিম্নতর লোকস্তরে সংক্রামিত করিতে চেষ্টা করেন। সর্বদাই এ-ধরনের বিদ্বেষের পশ্চাতে সক্রিয় থাকে অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক কোনো স্বার্থ, লাভালাভ বিবেচনা। আমাদের দেশে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল, এমন মনে করিবার কারণ নাই, প্রমাণও নাই। শ্রেণীস্বার্থ বা অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ যেখানে সক্রিয় নয় সেখানে বিদ্বেষের কোনো কারণও নাই। গুপ্ত-বংশ ব্রাহ্মণ্য রাজবংশ; তাঁহারা পরম ভাগবত্। সেই বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুপ্ত চীনা শ্রমণদের জন্য চীনা মন্দির নির্মাণ এবং তাহার সংরক্ষণের জন্য ২৪টি গ্রাম দান করিয়াছিলেন; পঞ্চম শতকে পাহাড়পুর অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণ দম্পতি এক জৈন-বিহারে ভূমিদান করিয়াছিলেন; ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে সামন্ত মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে শৈবধর্মাবলম্বী মহারাজ বৈন্যগুপ্ত ভূমিদান করিয়াছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ বিহারের সেবা, পূজা ইত্যাদির জন্য; প্রসিদ্ধ আচার্য শীলভদ্র ও বোধিভদ্রের জন্মবংশ ছিল ব্রাহ্মণ রাজবংশ; সপ্তম শতকের বৌদ্ধ খড়্গ-বংশীয় রাজা দেবখড়্গের স্ত্রী প্রভাবতী দেবী একটি সর্বাণী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এই শতকেই সমতটের পরম বৈষ্ণব রাজা শ্রীধারণের অন্যতম প্রধান রাজকর্মচারী বৌদ্ধ জয়নাথ একই সঙ্গে বৌদ্ধ রত্নত্রয় এবং ব্রাহ্মণ্য পঞ্চমহাযজ্ঞের জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা পাশাপাশি একই জায়গায় বাস করিতেছেন, একে অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধিত ও অনুরক্ত এবং প্রয়োজন হইলে পোষকতাও করিতেছেন, কোথাও কাহারও ধর্মমতে কিংবা বিশ্বাসে বাধিতেছে না—ইহাই পারস্পর সম্বন্ধের মোটামুটি চিত্র। কিন্তু ব্যতিক্রম একেবারে ছিলনা, এ-কথাও জোর করিয়া বলা যায় না।

বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্মের বিরোধী ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে ছবগ্গীয় বা ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের কথা মহাস্থান-শিলাখণ্ডলিপি হইতেই জানা যায়। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী পুণ্ড্রনগরে ইঁহাদের কিছুটা প্রতিপত্তিও ছিল বলিয়া মনে হয়। ষড়বর্গীয় সম্প্রদায় বুদ্ধপ্রবর্তিত বিনয়-শাসন স্বীকার করিতেন না। কিন্তু পরবর্তী কালের বাংলাদেশে কোথাও কোনো সূত্রেই এই ষড়বর্গীয়দের আর কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না। পরিবর্তে আর একটি ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিতেছে গুপ্তোত্তর পর্বে; এই সম্প্রদায় দেবদত্ত-সম্প্রদায় নামে খ্যাত। ইঁহারা শাক্যমুনির বুদ্ধত্ব স্বীকার করিতেন না, কিন্তু গৌতম-পূর্ববর্তী তিনজন বুদ্ধের পূজা করিতেন। দেবদত্ত-সম্প্রদায়ের ভিক্ষুরা লোকালয় হইতে দূরে বাস করিতেন, জীর্ণ চীবর ছিল তাঁহাদের পরিধেয়, ভিক্ষান্ন ছিল তাঁহাদের একমাত্র ভক্ষ্য এবং কৃচ্ছ্রসাধন ছিল তাঁহাদের সাধনার অঙ্গ। দুগ্ধজাত দ্রব্য তাঁহারা ভক্ষণ করিতেন না। ৪০৫ খ্রীষ্ট শতকে ফা-হিয়েন শ্রাবস্তীতে এই

সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণের দেখা পাইয়াছিলেন। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ কর্ণসুবর্ণে এই সম্প্রদায়ের ভিক্ষুদের তিনটি সংঘারাম দেখিয়াছিলেন; ইহারা দেবদত্তের মত্ অনুসরণ করিয়া দুগ্ধজাত ক্ষীর ভক্ষণ করিতেন না। কিন্তু, য়ুয়ান-চোয়াঙের পর ইহাদের আর কোনো উল্লেখই আর কোথাও দেখিতেছিনা। বোধ হয়, ইহারাও ষড়বর্গীয়দের মতই বৌদ্ধদের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন।

য়ুয়ান-চোয়াঙের কালে বাংলায় নিগ্রর্ন্থ জৈনধর্মের প্রসার ছিল যথেষ্ট, অথচ পরবর্তী কালে এই ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা লিপিমালায় বা সাহিত্যে আর শোনাই যাইতেছে না। কিন্তু পাল-পর্বে কিছু মূর্তি-প্রমাণ বিদ্যমান; স্বল্প সংখ্যক হইলেও পাল-পর্বে জৈন ধর্ম ও সংঘের অস্তিত্ব কিছু ছিল, সন্দেহ নাই। কিছু সংখ্যক জৈন ভিক্ষু ও উপাসক বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের কুক্ষিগত হইয়া থাকিবেন; পাল-পর্বের পর বাকী যাঁহারা রহিলেন তাঁহারাও বোধ হয় পরে ক্রমশ কাপালিক-অবধূতদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিলেন।

৫

সপ্তম শতকের শেষার্দ্ধ ও অষ্টম শতকের একপাদেরও অধিককাল ধরিয়া বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষেত্রে জটিল ও গভীর আবর্ত। স্থানে স্থানে ছোট ছোট রাজবংশের ক্ষণস্থায়ী রাজত্ব, ভিন্ প্রদেশী সমরাভিযান, যুদ্ধ, জয়-পরাজয়, ভোট বা তিব্বত, কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি হিমালয় ক্রোড়স্থিত দেশগুলির সঙ্গে নূতন যোগাযোগ, মাৎস্যন্যায় প্রভৃতির সম্মিলিত ক্রিয়া সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও জটিল ও গভীর আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। আজ সেই আবর্তের আকৃতি-প্রকৃতি বুঝিবার উপায়ও নাই। অথচ, পাল ও চন্দ্র-পর্বের বাংলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের ও শক্তিধর্মের যে তান্ত্রিক বিবর্তন, যে বিভিন্ন গুহ্য রহস্যবাদী দেহবাদী ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি তাহার বীজ বোধ হয় এই আবর্তের ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত।

পাল ও চন্দ্রপর্ব

হর্ষবর্ধনই ভারতেতিহাসের সর্বশেষ "সকলোত্তরপথনাথ"; তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর-ভারতে একরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রায় বিলীন হইয়া গেল, সর্বভারতীয় আদর্শ প্রায় বিদায় লইল। নানা কারণে এক একটি ভৌগোলিক আশ্রয়কে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন রাজবংশ গড়িয়া ওঠার সূচনা হইল, এবং সেই আশ্রয়ের চতুঃসীমার মধ্যে ধীরে ধীরে এক একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, স্থানীয় ভাষা ও লিখনভঙ্গী, স্থানীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠার সূচনা দেখা দিল। ইহার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা দিতে আরম্ভ করিল অষ্টম শতক হইতে। সর্বভারতীয় ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর প্রত্যেক ভৌগোলিক সীমায় এক একটি স্থানীয় ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, এক কথায় স্থানীয় সংস্কৃতি গড়িয়া তোলা ইহাই যেন হইল অষ্টম-শতক পরবর্তী ভারতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিত। সর্বভারতীয় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ক্ষেত্রে বাংলার যে বৈশিষ্ট্য ও দান, তাহা যেন এই সময় হইতেই দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও এ-কথা সমান প্রযোজ্য।

য়ুয়ান-চোয়াঙের সময়েই ভারতবর্ষ জুড়িয়া বৌদ্ধধর্মের অবনতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। ফা-হিয়েন বৌদ্ধধর্মের যে সমৃদ্ধ অবস্থা দেখিয়া গিয়াছিলেন, য়ুয়ান-চোয়াঙ আর তাহা দেখিতে পান নাই; বহু বৌদ্ধ স্তূপ, মন্দির ও সংঘারাম পড়িয়াছিল ভগ্ন দশায়, বহু ছিল পরিত্যক্ত, এমন কি কপিলবাস্তু, কুসিনারা, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী প্রভৃতি বৌদ্ধ তীর্থগুলিরও সেই অতীত সমৃদ্ধি আর ছিলনা। বহু সংখ্যক বৌদ্ধ দেবপূজক ও তীর্থিকদের প্রভাব স্বীকার করিয়া লন। হর্ষবর্ধনের সক্রিয় সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা কনৌজে তথা মধ্যদেশে সদ্ধর্মের কিছু সমৃদ্ধির কারণ হইলেও ভারতের অন্যত্র তাহা এই অবনতির স্রোত ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। সর্বত্রই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতাপ; বাংলা দেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তারনাথ বলিতেছেন, পাল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের অব্যবহিত আগে এবং তাঁহার কালে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত দুরবস্থা; অনেক বৌদ্ধ মন্দির ও বিহার ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায় অথবা তীর্থিকদের দ্বারা অধ্যুষিত, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি ক্রমবর্ধমান। য়ুয়ান-চোয়াঙের সময়েই তো বাংলাদেশে বৌদ্ধদের যেখানে ছিল মাত্র ৭০টি বিহার-সংঘারাম, সেখানে ব্রাহ্মণ্য দেবমন্দিরের সংখ্যা ছিল তিন শত। যাহাই হইক, অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতের অন্যত্র, অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের কোথাও কোথাও বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের অস্তিত্বের সংবাদ ও মূর্তি নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া যায়, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা অতীত ইতিহাসের অর্ধলুপ্ত অবশেষ মাত্র, তাহার সার্থক মূল্য কিছু নাই। বৌদ্ধধর্ম ও সংঘ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতিযোগীতায় টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই। কিন্তু, সুদীর্ঘ তিন চারশত বৎসর ধরিয়া একাধিক বৌদ্ধ রাজবংশের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে পূর্বভারত—বিশেষভাবে বঙ্গ, গৌড়, মগধ—ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয় স্থল হইয়া এই ধর্মের পরমায়ু আরও চার পাঁচ শত বৎসর বাড়াইয়া দিল; এবং তাহারই ফলে মহাযান-যোগাচার বৌদ্ধধর্মের নূতন নূতন রূপ ও ধ্যান প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ আমাদের ঘটিল। এই নূতন নূতন রূপ ও ধ্যান একান্তই পূর্ব-ভারতের, বিশেষভাবে বাংলাদেশের সৃষ্টি।

বৌদ্ধ ধর্মে যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও তেমনই। সর্বভারতীয় ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বাংলা দেশ যাহা পাইয়াছিল এবং এই চারিশত ধরিয়া যাহা পাইতেছিল সে মূলধন তো ছিলই; কিন্তু এই মূলধনের উপর বাংলা দেশ নূতন কিছু কিছু গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাও করিয়াছে, বিশেষ ভাবে বৈষ্ণব ধর্মে এবং শাক্তধর্মে। ক্রমে এ-সব কথা বিস্তৃত ভাবে বলিবার সুযোগ হইবে।

বৈদিক ধর্ম

আর্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূল কথা বৈদিক ধর্ম ও শ্রৌত সংস্কার। কাজেই এই ধর্ম ও সংস্কারের কথাই আগে বলি। এই ধর্ম ও সংস্কারের প্রসার ও প্রতিপত্তির সূচনা গুপ্ত-পর্বেই দেখিয়াছি। পাল-চন্দ্র পর্বে প্রাচীন প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন তো ছিলই, বরং পাল-পর্বের শেষের দিকে এবং সেন-বর্মণ পর্বে তাহা আরও প্রসারিত হইয়াছিল।

পাল-পর্বের অনেকগুলি ভূমিদান পট্টোলীতে দেখিতেছি, যে-সব ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হইতেছে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বেদ-বেদাঙ্গ-মীমাংসা-ব্যাকরণে সুপণ্ডিত এবং বৈদিক যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকর্মে পারদর্শী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেবপালের মুঙ্গের-লিপি, নারায়ণ পালের বাদলস্তম্ভ-লিপি, এবং মহীপালের বাণগড়-লিপির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈদিক হোম, যাগযজ্ঞের কথাও অনেক লিপিতেই আছে। বাদলস্তম্ভ-লিপিতে বৌদ্ধ নরপতি প্রথম বিগ্রহপালের মন্ত্রী কেদারমিশ্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে: "তাঁহার [হোম কুণ্ডোত্থিত] অবক্রভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নিশিখাকে চুম্বন করিয়া দিক্‌চক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত"। কেদারমিশ্র 'চতুর্বিদ্যা পয়োনিধি' পান করিয়াছিলেন অর্থাৎ চারি বেদবিদ্‌ ছিলেন। তাঁহার পিতা দর্ভপাণিও বেদবিদ্‌ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কেদার মিশ্রের পুত্র গুরবমিশ্র নীতি, আগম ও জ্যোতিষে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং বেদার্থচিন্তাপরায়ণ ছিলেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে দেখিতেছি, বরেন্দ্রীর অন্তর্গত ভাবগ্রামের ব্রাহ্মণ ভরতের পুত্র যুধিষ্ঠির সকল পণ্ডিতের অগ্রণী বলিয়া গণ্য হইতেন। তিনি "শাস্ত্রজ্ঞান পরিশুদ্ধবুদ্ধি এবং শ্রোত্রিয়ত্বের সমুজ্জ্বল যশোনিধি" ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের পুত্র ছিলেন দ্বিজাধীশ-পূজ্য শ্রীধর। তীর্থ-ভ্রমণে, বেদাধ্যয়নে, দানাধ্যাপনায়, যজ্ঞানুষ্ঠানে, ব্রতাচরণে সর্বশ্রোত্রীয়শ্রেষ্ঠ শ্রীধর প্রাতঃ, নক্ত, অযাচিত এবং উপবসন করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন, এবং কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডবিৎ পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য সর্বাকার-তপোনিধি এবং শ্রৌতস্মার্তশাস্ত্রের গুপ্তার্থবিৎবাগীশ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মহীপালের বাণগড়-লিপিতে যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতা, মীমাংসা, ব্যাকরণ এবং তর্কশাস্ত্র চর্চার উল্লেখ আছে। বেদ, বেদান্ত, প্রমাণ এবং সামবেদের কৌঠুমশাখার চর্চার উল্লেখ আছে দেবপালের মুঙ্গের-লিপি, বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপি এবং মদনপালের মনহলি-লিপিতে।

বৈদিক ধর্মকর্ম যাগযজ্ঞের এই আবহাওয়া চন্দ্র-পর্বেও সমান সক্রিয়। বিভিন্ন বেদের বিভিন্ন শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদের কথা, বৈদিক হোম-যাগযজ্ঞের কথা একাধিক চন্দ্র-লিপিতে সুস্পষ্ট। বৌদ্ধ চন্দ্র ও কম্বোজ রাষ্ট্রে ঋত্বিক নামে যে-রাজপুরুষটির দেখা মিলিতেছে তিনি তো একান্তই বৈদিক হোম-যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকর্মের কাণ্ডারী বলিয়া মনে হইতেছে। হরিচরিত-গ্রন্থের লেখক চতুর্ভুজ বলিতেছেন, তাঁহার পূর্বপুরুষেরা বরেন্দ্রান্তর্গত করঞ্জগ্রাম ধর্মপালের নিকট হইতে দানস্বরূপ পাইয়াছিলেন; সেই গ্রামের ব্রাহ্মণেরা বেদ, স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এই ধর্মপাল পাল-নরপতি ধর্মপাল হওয়াই সম্ভব।

পাল-চন্দ্র পর্বের কয়েকটি লিপিতেই (খালিমপুর লিপি; দ্বিতীয় গোপালদেবের জজিলপুর-লিপি; প্রথম মহীপালের বাণগড়-লিপি; তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপি; কম্বোজরাজ নয়পালের ইর্দা-লিপি ইত্যাদি) দেখিতেছি, ভারতবর্ষের নানা জায়গা (যেমন লাটদেশ, মধ্যদেশ, ক্রোড়ঞ্জ, মুক্তাবাস্ত প্রভৃতি) বিশেষভাবে মধদেশ হইতে বিভিন্ন গোত্র-প্রবরাশ্রয়ী, বিভিন্ন বৈদিক শাখাধ্যায়ী, বিভিন্ন শ্রৌত সংস্কারানুসারী ব্রাহ্মণেরা বাংলা

দেশে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। ইহাদের আশ্রয় করিয়া এবং এই ভাবেই পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে বৈদিক ধর্মের স্রোত বাংলাদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে; পাল-চন্দ্র-কম্বোজ-পর্বেও এই সব আগন্তুক ব্রাহ্মণদের সমর্থন ও আনুকূল্যের ফলে সেই স্রোত ক্রমশ আরও প্রবল হয়।

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ-পর্বের লিপিমালা পাঠ করিলে এ-তথ্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এই সব লিপির রচনা আগাগোড়া ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প, ভাবকল্পনা এবং উপমালঙ্কার দ্বারা আচ্ছন্ন; ইহাদের রচিত ভাবাকাশ একান্তই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারের আকাশ। মদনপালের মনহলি-লিপিতে ব্রাহ্মণ বটেশ্বর স্বামী-শর্মা কর্তৃক বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারত পাঠের উল্লেখ আছে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণপাঠ বোধ হয় অনেক ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি ছিল এবং তাঁহাদেরই বোধ হয় বলা হইত নীতি-পাঠক। যাহাই হউক, যে ভাবেই হইক, এই পর্বের বাংলা দেশের আকাশে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই বিস্তার; এই পৌরাণিক মহিমাই বৈদিক ধর্ম ও শ্রৌত সংস্কারের মহিমাকে যেন আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল।

পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য জগতের বিস্তার

সমসাময়িক উচ্চকোটির বাঙালীর এবং তাঁহাদের রাষ্ট্র-নায়কদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত এবং শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিতেন পৃথু, ধনঞ্জয়, অম্বরীশ, সগর, নল, যযাতি প্রভৃতি পৌরাণিক বীরেরা (ধর্মপালের বুদ্ধগয়া-লিপি, দেবপালের মুঙ্গের-লিপি, কোটালিপাড়া-লিপি); সত্যযুগের দৈত্যরাজ বলি, ত্রেতাযুগের ভার্গব এবং দ্বাপর যুগের কর্ণের মতন দাতারা (দেবপালের মুঙ্গের-লিপি); দেবরাজ বৃহস্পতির মতন জ্ঞানীরা (বাদলস্তম্ভ-লিপি, বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপি)। অগস্ত্যের এক গণ্ডুষে সমুদ্র পান (বাদলস্তম্ভ-লিপি), পরশুরামের ক্ষত্রিয়াভিযান (বাদলস্তম্ভ-লিপি), রামেশ্বরে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন (দেবপালের মুঙ্গের-লিপি), হুতভুজ ও স্বাহার গল্প, ধনপতি ও ভদ্রার গল্প, বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম এবং ব্রহ্মাপত্নী সরস্বতীর গল্প (খালিমপুর-লিপি) প্রভৃতি এই পর্বের সুপরিচিত ও সুআদৃত পুরাণ ও কাব্যকাহিনী। এই পর্বের ইন্দ্র হইতেছেন দেবরাজ এবং তাঁহার পত্নী পৌলোমী পাতিব্রত্যের আদর্শ (খালিমপুর-লিপি, নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপি ও বাদলস্তম্ভ-লিপি); ইন্দ্রের আর এক নাম পুরন্দর এবং তিনি দৈত্যরাজ বলির নিকট পরাজিত (মুঙ্গের ও ভাগলপুর-লিপি)। পৌরাণিক শিব-কাহিনীও অজ্ঞাত নয়। পতির অপমানে দক্ষযজ্ঞে অপুত্রক সতীর অকালে প্রাণত্যাগ (বাদলস্তম্ভ-লিপি) ও শিবপত্নী উমা বা সর্বাণীর পাতিব্রত্যও সে-কাহিনী হইতে বাদ পড়ে নাই। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে সপ্তাশ্বরথবাহিত সূর্য-দেবতাকে বলা হইয়াছে হরির দক্ষিণ চক্ষু। সমুদ্রগর্ভোত্থিত, শশধর-লাঞ্ছন চন্দ্রের উল্লেখও পাওয়া যাইতেছে; তাঁহাকে কোথাও কোথাও বলা হইয়াছে সীতাংশু, এবং কান্তি ও রোহিণী যে তাঁহার দুই পত্নী, তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ধর্মপালের খালিমপুর-লিপি এবং বাদল স্তম্ভ-লিপিতে চন্দ্রকে বলা হইয়াছে অত্রির বংশধর।

পুরাণ-কথার ঐশ্বর্য সকলের চেয়ে বেশি আশ্রয় করিয়াছে বিষ্ণু-কৃষ্ণ কথাকে। বিষ্ণু এখন আর ভাগবদ্ধর্মের বাসুদেব নহেন, এখন তিনি কৃষ্ণ; এবং শ্রীপতি, ক্ষমাপতি, জনার্দন, হরি, মুরারী প্রভৃতি তাঁহার নাম। এই সব নামের প্রত্যেকটির সঙ্গেই কাব্য ও পুরাণ-কাহিনী জড়িত। হরি-ক্ষমাপতি সমুদ্রগর্ভজাত এবং লক্ষ্মী তাঁহার সাধ্বী পত্নী; লক্ষ্মীর সপত্নী হইতেছেন বসুধরা বা পৃথিবী এবং স্বামী মুরারীর সঙ্গে লক্ষ্মী গরুড়ারূঢ় (খালিমপুর-লিপি, মুঙ্গের-লিপি; ভাগলপুর-লিপি, বাদলস্তম্ভ-লিপি, জয়পালের গয়া নরসিংহ মন্দির-লিপি এবং কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দির-লিপি)। দেবকীগর্ভজাত বালগোপাল কৃষ্ণের যশোদা-ভবনে গমন এবং কৃষ্ণের বাল্যজীবন-কাহিনীও অজ্ঞাত নয় (বাদল স্তম্ভ-লিপি), তবে এই বালকৃষ্ণ যে লক্ষ্মীর পতি এবং বিষ্ণুর অন্যতম অবতার তাহাও একই লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণের অন্যান্য অবতাররূপের (যেমন, কৃষ্ণ, নরসিংহ, পরশুরাম, বামন) সঙ্গেও এই পর্বের পরিচয় ঘনিষ্ঠ।

উপরোক্ত পৌরাণিক দেবদেবীরা এবং তাঁহাদের কাহিনী যে শুধু লিপিমালায় উদ্দিষ্ট ও উল্লিখিত তাহাই নয়; ইহাদের প্রতিমারূপ আশ্রয় করিয়াই নানা ধর্মসম্প্রদায় এবং নানা ধর্মানুষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিচিত্র লক্ষণ ও লাঞ্ছনযুক্ত, বিচিত্র ধ্যান ও কল্পনার, বিচিত্রতর রূপ ও আকৃতির এই সব অগণিত প্রতিমার অবশেষ এখনও বাংলাদেশের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অথবা নানা চিত্রশালায় রক্ষিত। সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত মূর্তিতত্ত্বের বা বিশেষ বিশেষ প্রতিমার রূপ ও লক্ষণের আলোচনার স্থান এই গ্রন্থ নয়। তবু, সাধারণভাবে প্রতিমাগুলির স্বরূপ জানা প্রয়োজন, কারণ প্রত্যেক ধর্মের বিশিষ্ট ধ্যান ও কল্পনা ইহাদের সঙ্গে জড়িত।

ধর্মপালের খালিমপুর-লিপিতে নন্ন-নারায়ণের এক দেউলের (দেবকুলের) উল্লেখ আছে। এই নন্ন-নারায়ণ বোধ হয় নন্দ-নারায়ণেরই অপভ্রংশ, অর্থাৎ এই মন্দিরে যে-দেবতাটির অর্চনা হইত তিনি নন্দদুলাল কৃষ্ণরূপী নারায়ণ। নারায়ণপালের রাজত্বকালে একটি গরুড়স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল বর্তমান দিনাজপুর জেলার একটি গ্রামে; এই স্তম্ভগাত্রেই বাদল-প্রশস্তিটি উৎকীর্ণ, এবং সে-স্তম্ভ এখনও দণ্ডায়মান। খালিমপুর-লিপিতে একটি কাদম্বরী দেবকুলিকা বা সরস্বতী মন্দিরের উল্লেখ আছে। স্থানক অর্থাৎ সমপদ দণ্ডায়মান বিষ্ণুর দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর (শ্রী ও পুষ্টি) অধিষ্ঠান; সেই ভাবে তাঁহাদের

বৈষ্ণবধর্ম

সম্মিলিত পূজা তো হইতই; এই ধরনের প্রতিমা বাংলার নানা অঞ্চল হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু সরস্বতী স্বাধীন স্বতন্ত্র মর্যাদায় পূজিতা হইতেন, খালিমপুর-লিপিই তাহার প্রমাণ। সরস্বতীর স্বাধীন স্বতন্ত্র মূর্তিও কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে; ইহাদের প্রতিমা-লক্ষণ সরস্বতীর সাধারণ লক্ষণ; সরস্বতীর বাহন অন্যত্র যেমন বাংলা দেশেও তাহাই, অর্থাৎ হংস; কিন্তু একটি প্রতিমায় তাঁহার বাহন দেখিতেছি ভেড়া। সরস্বতীর সঙ্গে ভেড়ার সম্বন্ধ অত্যন্ত প্রাচীন এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী

মহাশয় তাহার সুন্দর ব্যাখ্যাও রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলাদেশের কোথাও কোথাও সরস্বতী পূজার দিনে এখনও ভেড়া বলি এবং ভেড়ার লড়াই সুপরিচিত। বাদল গরুড় স্তম্ভের কথা একটু আগেই বলিয়াছি। বিষ্ণু-মন্দিরের সম্মুখে একটি করিয়া গরুড়-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করা ছিল সাধারণ রীতি। স্তম্ভের শীর্ষে থাকিত বদ্ধাঞ্জলিমুদ্রা গরুড়ের একটি মূর্তি। এই ধরণের স্তম্ভশীর্ষ গরুড়-প্রতিমা বাংলাদেশের নানা জায়গায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজসাহী-চিত্রশালায় রক্ষিত এই ধরনের একটি গরুড়-মূর্তি দশম শতকীয় বাংলার ভাস্কর শিল্পের সুন্দর নিদর্শন।

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বের বাংলাদেশে যত প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে বৈষ্ণব পরিবারের মূর্তির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি; এবং পরিবারটিও সুবৃহৎ। পরিবারের প্রধান হইতেছেন বিষ্ণু স্বয়ং; তাঁহার দুই পত্নী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী; কোথাও কোথাও দেবী বসুমতী; নিম্নে বাহন গরুড়; বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ লোকের দুই দ্বারী, জয় এবং বিজয়; বিষ্ণু-কৃষ্ণের দ্বাদশ অবতার; এবং ব্রহ্মা স্বয়ং। এই বৃহৎ পরিবারের প্রত্যেকটি দেবদেবীর বিশেষ বিশেষ ভঙ্গ ও ভঙ্গী, লক্ষণ ও লাঞ্ছন ভারতের অন্যত্র যেমন বাংলাদেশেও মোটামুটি তাহাই; তবু বাংলা দেশ এই যুগের সর্বভারতীয় পৌরাণিক ধ্যান-কল্পনা সমূহের সব কিছুই সমান আদরে ও মর্যাদায় গ্রহণ করে নাই; তাহাদের মধ্যেই কিছু বর্জন-নির্বাচন-সংযোজনও করিয়াছে।

আসন, শয়ান ও (সমপদ) স্থানক, এই তিন ভঙ্গীর বিষ্ণুমূর্ত্তির মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষপাত যেন, অন্তত এই পর্বে, স্থানকমূর্ত্তির উপরই বেশি। বস্তুত, এই পর্বের অধিকাংশ বিষ্ণুমূর্ত্তিই স্থানক অর্থাৎ দণ্ডায়মান মূর্ত্তি; আসন ও শয়ান মূর্ত্তি বাংলাদেশে কমই পাওয়া গিয়াছে। গরুড়াসীন এবং যোগাসীন, সাধারণত এই দুই প্রকারের আসনমূর্ত্তিই এ-যাবৎ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। বরিশাল জেলার লক্ষ্মণকাটি গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা চিত্রশালা) বিষ্ণু, সাগরদীঘির হৃষিকেশ-বিষ্ণু (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চিত্রশালা) প্রভৃতি গরুড়াসীন এবং সাধারণ আসন-বিষ্ণুর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দিনাজপুর জেলার ইটাহার গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ যোগাসন বিষ্ণুর প্রতিকৃতি, সন্দেহ নাই। এই সব ক'টি মূর্ত্তিই এই পর্বের। যোগাসন-বিষ্ণুর আরও একাধিক প্রমাণ বিদ্যমান এবং তাহারাও এই পর্বের বলিয়াই মনে হয়, অন্তত ভাস্কর্য-শৈলীর ইঙ্গিত তাহাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঢাকা-সোনারঙ্গে প্রাপ্ত কাষ্ঠফলকের যোগাসন-বিষ্ণু এবং বোষ্টন-চিত্রশালার ধাতব যোগাসন বিষ্ণুর কথা উল্লেখ করা যায়।

স্থানক-বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলি সাধারণত সপরিবার বিষ্ণু। বিষ্ণু মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান; তাঁহার দক্ষিণে ও বামে, উপরে ও নীচে পরিবারস্থ অন্যান্য দেবদেবী, বাহন, প্রহরী ইত্যাদি। ইহাদের সকলেরই লক্ষণ ও লাঞ্ছন সর্বভারতীয় প্রতিমাশাস্ত্রই অনুসরণ করে। বাংলার বিষ্ণুমূর্ত্তি সাধারণত দুই প্রকরণের। ত্রিবিক্রম প্রকরণের মূর্ত্তিই বেশি, বাসুদেব-প্রকরণের

প্রতিমাও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকরণ-পার্থক্য নির্ভর করে বিষ্ণুর চারি হস্তের শঙ্খচক্রগদাপদ্ম এই চারিটি লক্ষণের সন্নিবেশের উপর। এই চারি লক্ষণের বিভিন্ন রীতির সন্নিবেশ বাংলাদেশের প্রতিমাগুলিতেও দেখা যায়, কিন্তু বাঙালী শিল্পী ও পুরোহিতেরা সর্বত্রই প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্রের এবং পঞ্চরাত্রীয় ব্যূহবাদের এই প্রকরণ-নির্দেশ মানিয়া চলিতেন, নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন। প্রথম মহীপালের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে ত্রিপুরা জেলার বাঘাউড়া গ্রাম বা নিকটবর্তী কোনো স্থানে একটি বিষ্ণুমূর্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হইয়াছে, মূর্তিটি "নারায়ণভট্টারকস্য"। কিন্তু ইহার চারি হস্তের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মের সন্নিবেশ ত্রিবিক্রম-বিষ্ণুর সন্নিবেশানুযায়ী, নারায়ণের নহে। কোনো কোনো মূর্তিতে দেখা যায়, শঙ্খ, চক্র ও গদা যথাক্রমে শঙ্খ-পুরুষ, চক্র-পুরুষ ও গদা-দেবীতে রূপায়িত। এ-ক্ষেত্রেও সর্বভারতীয় প্রতিমা-নির্দেশ সক্রিয়।

বিষ্ণুর অন্যান্য বিচিত্র রূপের মধ্যে অভিচারিক স্থানক-বিষ্ণুর একটি নিদর্শন বাংলা দেশে পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি কালো পাথরের, পাওয়া গিয়াছিল বর্ধমান জেলার চৈতনপুর গ্রামে। লক্ষণ ও লাঞ্ছন মিলাইলে দেখা যায়, প্রতিমাটি দক্ষিণ ভারতীয় প্রতিমা শাস্ত্র বৈখানসাগম-কথিত অভিচারিক স্থানক-বিষ্ণুর প্রতিকৃতি। সাগরদীঘিতে প্রাপ্ত আসন-বিষ্ণু এবং বর্ধমানে প্রাপ্ত (রাজসাহী চিত্রশালা) আর একটি বিষ্ণুমূর্তি উভয়ই শ্রীধর বা হৃষিকেশ-বিষ্ণুর প্রতিমা। রংপুর জেলায় প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিত্রশালা) ধাতুনির্মিত স্থানক-বিষ্ণুর একটি প্রতিমায় বিষ্ণুর বামে যেখানে পুষ্টি বা সরস্বতীর স্থান সেখানে দেখিতেছি দেবী বসুমতীকে। কোনো কোনো বিষ্ণু-প্রতিমার পৃষ্ঠফলকে বিষ্ণুর দশাবতারের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়; দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাঁকুড়া জেলায় প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিত্রশালা) একটি প্রতিমা এবং ঢাকা-চিত্রশালায় রক্ষিত আর একটি প্রতিমার উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজসাহী-চিত্রশালায় বিশহস্ত সমপদস্থানক একটি বিষ্ণুমূর্তি আছে; মূর্তিটি বোধ হয় রূপমণ্ডণ-গ্রন্থোক্ত বিশ্বরূপ-বিষ্ণুর। রংপুরের টেপা-সংগ্রহে একটি চতুর্মুখ বিষ্ণুর প্রতিমা আছে; ইহার সম্মুখের মুখটি মানুষের মুখের অনুরূপ, দক্ষিণে বরাহের, বামে সিংহের, এবং পশ্চাতে ভৈরবের। কলিকাতা-চিত্রশালায় ব্রহ্মা-বিষ্ণুর একটি যুগ্ম-মূর্তি আছে; প্রতিমাটিতে উভয় দেবতারই লক্ষণ ও লাঞ্ছন বিদ্যমান। ব্রহ্মার স্বাধীন স্বতন্ত্র মূর্তিও বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে; এই ব্রহ্মা স্ফীতোদর, চতুর্মুখ, চতুর্হস্ত, ললিতাসনোপবিষ্ট; তাঁহার বাহন হংস। দিনাজপুর-জেলার ঘাটনগরে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) প্রতিমাটি এই ধরনের প্রতিমাগুলির প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে।

সরস্বতীর কথা আগেই বলিয়াছি। লক্ষ্মীরও স্বাধীন স্বতন্ত্র মূর্তি বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে দেবীর গজলক্ষ্মী রূপই প্রধান। কিন্তু বিশুদ্ধ লক্ষ্মী প্রতিমা নাই, এমন নয়। বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) একটি চতুর্হস্ত স্থানক-লক্ষ্মী প্রতিমা একাদশ শতকের তক্ষণ-শিল্পের এবং এই ধরনের প্রতিমার চমৎকার নিদর্শন। এই চিত্রশালারই

একটি দ্বিহস্ত ধাতব লক্ষ্মীর প্রতিমাও আছে। বগুড়ার চতুর্হস্ত লক্ষ্মীর এক হস্তে বাংলাদেশে সুপরিচিত লক্ষ্মীর ঝাঁপিটি লোকায়ত ধর্মের ক্ষীণ একটি প্রতিধ্বনি রূপে বিদ্যমান।

অবতাররূপী বিষ্ণুর প্রতিমা এই পর্বের বাংলা দেশে সুপ্রচুর। প্রস্তর ও ধাতব বিষ্ণুপট্টের পশ্চাদ্ভাগে অথবা প্রস্তর ফলকে বিষ্ণুর দশাবতারের প্রতিকৃতি প্রাচীন বাংলার নানা স্থান হইতেই পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু এই ধরনের সমবেত ও সমন্বিত দশাবতার মূর্তিযুক্ত বিষ্ণুপট্ট পাল-পর্বের কিনা, নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। এই পর্বের বাংলা দেশে বিষ্ণুর দশটি অবতারের মধ্যে প্রধানত বরাহ, নরসিংহ এবং বামন বা ত্রিবিক্রম এই তিনজনই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পূজা লাভ করিতেন। মৎস্য ও পরশুরামাবতারের স্বতন্ত্র মূর্তিও বাংলা দেশে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্য তিনটির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ইঁহারা বোধ হয় লাভ করিতে পারেন নাই। অবতারের মধ্যে সিলিমপুর গ্রামে প্রাপ্ত বরাহমূর্তি, বিক্রমপুরে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা) বরাহমূর্তি, ঢাকা-চিত্রশালার নরসিংহ মূর্তি, জোড়াদেউলে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা) বামন মূর্তি এবং বজ্রযোগিনীর মৎস্যাবতার মূর্তি উল্লেখযোগ্য। অষ্টমাবতার হলধর বা বলরামের যে কয়েকটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ঢাকা জেলার বাঘ্‌ড়া গ্রামে প্রাপ্ত একটি প্রতিমা, পাহাড়পুর-মন্দিরের পীঠ-গাত্রের প্রতিমাটি এবং রাজসাহী-চিত্রশালার একটি প্রতিমাই প্রধান।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম এবং তাহার দেবায়তন বাংলা দেশে ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাহার প্রতিমালক্ষণ ও সাধন সুঅভ্যস্ত। এই পর্বের কয়েকটি বিষ্ণু-প্রতিমায় তাহার প্রভাব অনস্বীকার্য। বরিশাল-জেলার লক্ষণকাটির সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণু-মূর্তির কথা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি। এই প্রতিমার পশ্চাতের দুই হাতের উপর আসীনা শ্রী ও পুষ্টির প্রতিকৃতি এবং মুকুটে চতুর্হস্ত ধ্যানী বুদ্ধপ্রতিম প্রতিমাটি মূর্তিতত্ত্বের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য। উভয় লক্ষণেই মহাযানী বৌদ্ধ প্রতিমার রূপ-কল্পনা নিঃসন্দেহে সক্রিয়। কালন্দরপুরে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুপ্রতিমাতেও শেষোক্ত মহাযানী লক্ষণটি উপস্থিত। পূর্বোক্ত সাগরদীঘির আসন-বিষ্ণু প্রতিমাটিতে শঙ্খ, চক্র ও গদা সনাল পদ্মের উপর স্থিত; এ-ক্ষেত্রেও সমসাময়িক মহাযানী বৌদ্ধ প্রতিমালক্ষণ ও সাধন সক্রিয়, সন্দেহ নাই।

শৈবধর্মেরও লিপি এবং মূর্তিপ্রমাণ সুপ্রচুর, যদিও বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে তাহা তুলনীয় নয়। খালিমপুর-লিপিতে এক চতুর্মুখ মহাদেবের চতুর্মুখ লিঙ্গের (?) প্রতিমা প্রতিষ্ঠার সংবাদ আছে। নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতে রাজা কর্তৃক শিব-ভট্টারক ও তাঁহার পূজক ও সেবক পাশুপতদের উদ্দেশ্যে কিছু ভূমিদানের উল্লেখ দেখা যায়। এই নারায়ণপাল এক সহস্র শিব(?)মন্দির প্রতিষ্ঠার দাবি করিয়াছেন। রামপাল রামাবতীতে শিবের তিনটি মন্দির, একাদশ রুদ্রের একটি মন্দির এবং সূর্য, স্কন্দ ও গণপতির মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। এই পর্বের বাংলার শৈবধর্ম বোধ হয় শিব-শ্রীকণ্ঠ ও তাঁহার শিষ্য লাকুলীশ (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক)-প্রবর্তিত পাশুপত ধর্ম, এবং এ-তথ্য আজ সুবিদিত যে,

উত্তর-ভারতে পাশুপত ধর্মই আদি শৈবধর্ম। প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, আগমান্ত শৈবধর্ম গুপ্ত-পর্বেই পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং পাশুপত ধর্মের ধ্যান-কল্পনার মধ্যেই এই ধর্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা গিয়াছিল। আঠারটি আগম এবং তাহাদের কিছু পরবর্তী কালে রচিত ছয়টি যামল ও ছয়টির অন্যতম ব্রহ্মযামলের পরিশিষ্টরূপী পিঙ্গলামত-গ্রন্থে এই ধর্মের ধ্যান-কল্পনার বিস্তৃত পরিচয় নিবদ্ধ। এই সব গ্রন্থের মতে আর্যাবর্তই শিব-সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র ; কামরূপ, কলিঙ্গ, কঙ্কন, কাঞ্চী, কাবেরী, কোশল ও কাশ্মীর এই ক্ষেত্রের বাহিরে। গৌড়দেশ এই ক্ষেত্রের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকৃত, তবে গৌড়ীয় সাধন-গুরুরা আর্যাবর্তের গুরুদের চেয়ে নিকৃষ্ট এ-কথাও বলা হইয়াছে। সে যাহাই হউক, সন্দেহ নাই যে, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর কালে আর্যাবর্তের পাশুপতধর্মী ব্রাহ্মণ গুরু ও তাঁহাদের শিষ্যবর্গ ক্রমাগতই বাংলা দেশে আসিতেছিলেন এবং তাঁহারাই এই দেশে পাশুপতধর্ম প্রচার করিতেছিলেন।

শৈবধম

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বেও লিঙ্গরূপী শিবের পূজাই সমধিক প্রচলিত এবং এই লিঙ্গ সাধারণত একমুখলিঙ্গ। একমুখলিঙ্গ শিব-প্রতিমা বাংলার নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাদারীগঞ্জ গ্রামে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) প্রতিমাটি এই জাতীয় লিঙ্গের সুন্দর নিদর্শন। চতুর্মুখলিঙ্গও বিরল নয়। মুর্শিদাবাদে প্রাপ্ত (আশুতোষ-চিত্রশালা) ধাতব চতুর্মুখলিঙ্গটি দশম-একাদশ শতকের ভাস্কর-শিল্পের একটি সুউজ্জ্বল নিদর্শন ; ইহার চারিদিকের চারিমুখের একটি মুখ শিবের বিরূপাক্ষ বা অঘোর-রূপের প্রতিকৃতি। নবম শতকের কয়েকটি চতুর্মুখলিঙ্গ উল্লেখযোগ্য ; এই ধরনের লিঙ্গ-প্রতিমার চারিদিকে চারিটি উপবিষ্ট শক্তি-মূর্তি রূপায়িত। লক্ষ্যণীয় যে, এই ধরনের প্রতিমাগুলি সবই উত্তর-বঙ্গের নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ত্রিপুরার উনকোটি শিবলিঙ্গও এই প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে।

শিবের অন্যান্য রূপ-কল্পনার প্রতিকৃতি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে চন্দ্রশেখর, নৃত্যপর, সদাশিব, উমা-মহেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর, এবং কল্যাণ-সুন্দর বা শিব-বিবাহ এই কয়টি সৌম্যমূর্তি শিব-প্রতিমাই প্রধান। রুদ্র রূপ-কল্পনার প্রতিকৃতির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে অঘোররুদ্রের প্রতিমা। পাহাড়পুর-মন্দিরের পীঠ-গাত্রে চন্দ্রশেখর-শিবের একাধিক প্রতিকৃতির কথা আগেই বলিয়াছি। শিবের দ্বিহস্ত ও চতুর্হস্ত ঈশান মূর্তির উভয় রূপই বাংলাদেশে সুপরিচিত ছিল। রাজসাহী জেলার চৌরাকসবা গ্রামে প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিত্রশালা) দ্বিহস্ত প্রতিমা এবং ঐ জেলারই গণেশপুর গ্রামে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) চতুর্হস্ত প্রতিমাটি এই দুই রূপের নিদর্শন। বরিশাল জেলার কাশীপুর গ্রামে একটি চতুর্হস্ত স্থানক-শিব প্রতিমার পূজা এখনও প্রচলিত ; স্থানীয় লোকেরা ইহাকে শিবের বিরূপাক্ষ রূপ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শারদাতিলক-গ্রন্থের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলিয়াছেন, এই রূপটি নীলকণ্ঠ শিবের, বিরূপাক্ষের নয়।

নটরাজ-শিবের প্রতিমা বাংলাদেশে সুপ্রচুর ; কিন্তু বাংলার নটরাজ-রূপকল্পনা যেন দক্ষিণী রূপ-কল্পনাকে অনুসরণ করে নাই। দশ ও দ্বাদশহস্ত এই ধরনের নটরাজ-শিবের প্রতিমা এ-পর্যন্ত বাংলা দেশের বাহিরে আর কোথাও বড় একটা পাওয়া যায় নাই, অথচ বাংলা দেশে নৃত্যমূর্তি-শিবের দ্বিতীয় রূপ-কল্পনা আর কিছু দেখা যায়না। পূর্ব-দক্ষিণ বাংলায় নৃত্যপর-শিবের যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে সবই দশহস্ত এবং তাঁহার লক্ষণ ও লাঞ্ছন-সন্নিবেশ পুরাপুরি মৎস্য-পুরাণের বর্ণনানুযায়ী ; দক্ষিণ-ভারতীয় চতুর্হস্ত নটরাজ শিব-প্রতিমায় শিবের পদতলে যে অপস্মার-পুরুষটিকে দেখা যায় বাংলা দেশে তাঁহার চিহ্নও নাই। এই ধরনের দশহস্ত, মৎস্যপুরাণ-অনুসারী নটরাজ-শিবের মূর্তিগুলির একটির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে মূর্তিটিকে বলা হইয়াছে 'নর্টেশ্বর'। দ্বাদশহস্ত নটরাজ-শিবের যে ক'টি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের হস্তধৃত লক্ষণ ও লাঞ্ছন একটু পৃথক এবং সন্নিবেশও ভিন্ন প্রকারের ; এই ধরনের মূর্তিগুলিতে এক হাতে বীণা, এবং দুই হাতে করতালে নৃত্যের তাল রাখা হইতেছে। শিব যে নৃত্য ও সঙ্গীতরাজ ইহা দেখানই যেন এই প্রতিমাগুলির উদ্দেশ্য।

শিবের সদাশিব-মূর্তিও বাংলা দেশে সুপ্রচুর। রুদ্র-যামল গ্রন্থের মতে শিবের ছয় রূপের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, পরাশিব) মধ্যে একরূপ সদাশিব। সদাশিবের রূপ-কল্পনা মহানির্বাণতন্ত্র, উত্তর-কামিকাগম এবং গরুড় পুরাণ-গ্রন্থে বিধৃত, এবং শেষের দু'টি গ্রন্থ বাংলা দেশে অধিকতর প্রচলিত। বাংলাদেশে যে ক'টি সদাশিব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, প্রতিমা-লক্ষণের দিক হইতে তাঁহারা প্রায় পুরাপুরি এই দু'টি গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী। তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালে এই ধরনের একটি সদাশিব-মূর্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ; মূর্তিটি এখন কলিকাতা-চিত্রশালায় রক্ষিত। দক্ষিণ-ভারতের সদাশিব-মূর্তির সঙ্গে বাংলার সদাশিব-মূর্তির রূপ-কল্পনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। দক্ষিণাগত সেন-বংশীয় রাজারাও ছিলেন সদাশিবের পরমভক্ত। এই সব কারণে কেহ কেহ মনে করেন, কর্ণাটাগত সেনবংশ এবং দক্ষিণাগত সৈন্য-সামন্তরাই সদাশিবের এই রূপ-কল্পনা বাংলাদেশে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, সদাশিব রূপ-কল্পনা একান্তই উত্তর-ভারতীয় আগমান্ত শৈবধর্মের সৃষ্টি। তবে, মনে হয়, উত্তর-ভারতীয় সদাশিব দক্ষিণ-ভারতে যে-রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাই কালক্রমে দক্ষিণাগত রাজবংশ ও সৈন্য-সামন্তরা বাংলাদেশে প্রচার করিয়াছিলেন।

পাল-পর্বের বাংলাদেশে উমা-মহেশ্বরের যুগলমূর্তি রূপ বাঙালীর চিত্তহরণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আজ এই সব মূর্তির অবশেষ বাংলার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ; বস্তুতই ইহাদের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। তন্ত্রপরায়ণ শাক্ত বাঙালীর চিত্তে শিব-উমার আলিঙ্গন-মূর্তি আনন্দ ও সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ রূপ বলিয়া মনে হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। শিবক্রোড়োপবিষ্টা, সুখাসীনা, আলিঙ্গনবদ্ধা, হাস্যানন্দময়ী উমাই তো শিবশক্তির তান্ত্রিক সাধকদের ত্রিপুর-সুন্দরী এবং তাঁহার রূপধ্যানই ধ্যানযোগের শ্রেষ্ঠ ধ্যান।

উমা-মহেশ্বর মূর্তিতে উমা এবং মহেশ্বর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেও উভয়েই পৃথক পৃথক রূপকল্পিত, কিন্তু অর্ধনারীশ্বর কল্পনায় তাঁহারা দুইএ মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছেন; দক্ষিণার্ধে শিব, বামার্ধে উমা। বাংলাদেশে অর্ধনারীশ্বর প্রতিমা সুপ্রচুর নয়, বরং তাহার নিদর্শন কমই পাওয়া গিয়াছে। পুরাপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) প্রতিমাটি এই ধরনের প্রতিমার এবং একাদশ শতাব্দীর বাংলা ভাস্কর্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

শিবের বৈবাহিক বা কল্যাণ-সুন্দর যুগলমূর্তিও বাংলাদেশে (ঢাকা ও বগুড়া জেলা, ব-সা-প চিত্রশালা) কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে; দক্ষিণ-ভারতের সুপরিচিত বৈবাহিক রূপের সঙ্গে ইহাদের সাদৃশ্য স্বল্প। বাংলার প্রতিমাগুলিতে বিবাহ-ব্যাপারে বাঙালীর রীতি ও আচার-পদ্ধতির কয়েকটি সুস্পষ্ট অভিজ্ঞান বিদ্যমান; সপ্তপদী গমন, বরের হাতে কর্ত্রি বহন প্রভৃতি দক্ষিণী প্রতিমাতে দেখা যায়না, কিন্তু বাংলার প্রতিমাগুলিতে এই সব স্থানীয় আচার ও রীতিগুলি রূপায়িত হইয়াছে।

রুদ্র-শিবের বটুক-ভৈরব এবং অঘোর-রুদ্র রূপের সঙ্গেও এই পর্বের বাঙালীর পরিচয় ছিল। অঘোর-রুদ্রের মূর্তিপ্রমাণ বাংলাদেশে খুব বেশি নাই; ঢাকা ও রাজসাহীর চিত্রশালায় দুইটি মূর্তি রক্ষিত আছে মাত্র, এবং দু'টিই এই পর্বের বলিয়া মনে হয়। শৈবাগম অনুসারে রুদ্র-শিবের পঞ্চরূপের (বামদেব, তৎপুরুষ, সদ্যোজাত, অঘোর ও ঈশান পঞ্চব্রহ্ম) মধ্যে অঘোর-রূপ অন্যতম, এবং এই রূপের একটি বিশিষ্ট ভক্ত সম্প্রদায় বোধ হয় পাল-সেন পর্বেই গড়িয়া উঠিয়াছিল; অন্তত কিছু পরবর্তী কালের বাংলায় অঘোর-পন্থী নামে একটি শৈব সম্প্রদায়ের পরিচয় সমসাময়িক সাহিত্যে নিবদ্ধ। বটুক-ভৈরবের কয়েকটি মূর্তিও বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। নগ্ন সর্বাঙ্গ, কাষ্ঠ পাদুকা, কুকুর সঙ্গী, অগ্নি-প্রভা, নরমুণ্ড ও নরমুণ্ডমালা, বিকট হাস্যব্যদিত মুখ প্রভৃতি দেখিলে ভুল করিবার কারণ নাই যে, এই ধরনের প্রতিমা আগমান্ত তান্ত্রিক শৈবধর্মের ধ্যান ও কল্পনার সৃষ্টি।

শিবপুত্র গণপতি এবং কার্তিকেয়ের স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রতিমাও বাংলাদেশে কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। তবে গণপতি বা গণেশের তুলনায় কার্তিকেয়ের প্রসার বোধ হয় তত বেশি ছিল না। এই পর্বে গণেশের সব প্রতিমাই মূষিক-বাহনোপরি নৃত্যপরায়ণ। তাঁহার একটি হাতে একটি ফল; এই ফল সিদ্ধির প্রতীক, এবং গণেশ বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ে, বিশেষ ভাবে বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীতে সিদ্ধফলদাতা বলিয়াই পূজিত ও আদৃত। শৈব গাণপত্য সম্প্রদায়ের অন্তত একটি গণেশ-প্রতিমা বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে, রামপাল গ্রামের ধ্বংসাবশেষ হইতে। মূর্তিটির লক্ষণ ও লাঞ্ছন একান্তই দক্ষিণ-ভারতীয় প্রতিমাশাস্ত্র অনুযায়ী এবং জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, দক্ষিণী কোনো প্রবাসী ভক্তের প্রয়োজনে মূর্তিটির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা। কার্তিকেয়ের স্বতন্ত্র প্রতিমা যে দু'একটি এ-যাবৎ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে উত্তর-বঙ্গের কোনো স্থানে

প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিত্রশালা) ময়ূরবাহনের উপর মহারাজলীলায় উপবিষ্ট কার্তিকেয়ের মূর্তিটি দ্বাদশ শতকীয় ভাস্কর-শিল্পের সুন্দর নিদর্শন।

পার্বত্য ত্রিপুরার উনকোটি এবং রাজসাহী জেলার দেওপাড়া, পালপর্বের এই শৈব তীর্থ দুইটির কথা না বলিয়া পাল-পর্বের শিবায়ন শেষ করা যায় না। পূর্ব-ভারতে বোধ হয় বারাণসীর কোটি তীর্থের পরই ছিল উনকোটির স্থান। বস্তুত, এখনও উনকোটী পাহাড়ের ইতস্তত যত মূর্তির ধ্বংসাবশেষ ছড়াইয়া আছে তাহাতে উনকোটি নামের সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নয়। পাহাড়ের গায়ে একাধিক বৃহদাকৃতি শৈব-প্রতিমা ও প্রতিমার শির এখনও উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। শিব ও গণেশ ছাড়া পরিবার-দেবতাদের মধ্যে হর, গৌরী, হরিহর, নরসিংহ, হনুমান, একমুখ ও চতুর্মুখলিঙ্গ প্রভৃতিও আছেন।

দক্ষিণ-ভারতের চোল রাজাদের দু'টি লিপিপ্রমাণ হইতে বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী শৈবগুরুদের সমসাময়িক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির কতকটা ধারণা করা যায়। একটি লিপিতে জানা যায়, রাজেন্দ্রচোল রাজরাজেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করিয়া সবশিব পণ্ডিত শিবাচার্যকে সেই মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সর্বকালের জন্য তাঁহার আর্যদেশ ও গৌড়দেশবাসী শিষ্য ও শিষ্যানুশিষ্যরাই মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হইবেন, এই নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। ত্রিলোচন শিবাচার্যের সিদ্ধান্তসারবলী-গ্রন্থের একটি টীকায় আরও বলা হইয়াছে যে, রাজেন্দ্রচোল গঙ্গাতীর হইতে শৈব আচার্যদের চোলদেশে লইয়া যাইতেন। পরকেশরীবর্মা রাজাধিরাজ-চোলের একটি লিপিতে জানা যায়, গৌড়দেশান্তর্গত দক্ষিণ-রাঢ়ের শৈবাচার্য উমাপতিদেব বা জ্ঞান-শিবদেবের পূজাপুণ্যের বলেই সিংহলী এক অভিযাত্রী সৈন্যদলকে রাজাধিরাজ যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিনি শিবদেবকে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন; শিবদেব সেই গ্রামলব্ধ আয় তাঁহার আত্মীয়বর্গের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন।

শৈব-ধর্ম ও শৈব-দেবতাদের সঙ্গেই শাক্তধর্ম ও শক্তি দেবী-প্রতিমার কথা বলিতে হয়। দেবীপুরাণে (খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম-অষ্টম শতক) বলা হইয়াছে, রাঢ়া-বরেন্দ্র-কামরূপ-কামাখ্যা-ভোট্টদেশে (তিব্বতের) বামাচারী শাক্তমতে দেবীর পূজা হইত। এই উক্তি সত্য হইলে স্বীকার করিতেই হয়, খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম-অষ্টম শতকের পূর্বেই বাংলাদেশের নানা জায়গায় শক্তিপূজা প্রবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। ইহার কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় গুপ্তোত্তর পর্বে এবং মধ্য-ভারতে রচিত জয়দ্রথ-যামল গ্রন্থে। এই গ্রন্থে ঈশান-কালী, রক্ষা-কালী, বীর্য-কালী, প্রজ্ঞা-কালী প্রভৃতি কালীর নানা রূপের সাধনা বর্ণিত আছে। তাহা ছাড়া ঘোরতারা, যোগিনীচক্র, চক্রেশ্বরী প্রভৃতির উল্লেখও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

শাক্তধর্ম

আর্যাবর্তে শাক্তধর্ম যে গুপ্ত-গুপ্তোত্তর পর্বেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল আগম ও যামল গ্রন্থগুলিই তাহার প্রমাণ। খুব সম্ভব ব্রাহ্মণ্য অন্যান্য ধর্মের স্রোত-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই শক্তিধর্মের স্রোতও বাংলাদেশে প্রবাহিত হইয়াছিল

এবং এই দেশ পরবর্তী শক্তিধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র রূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সব আগম ও যামল গ্রন্থের ধ্যান ও কল্পনাই, অন্তত আংশিকত, পরবর্তী কালে সুবিস্তৃত তন্ত্র সাহিত্যের ও তন্ত্রধর্মের মূলে; এবং এই তন্ত্র-সাহিত্যের প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থই রচিত হইয়াছিল বাংলাদেশে। তন্ত্রধর্মের পরিপূর্ণ ও বিস্তৃত বিকাশও এই দেশেই। দ্বাদশ শতকের আগেকার রচিত কোনো তন্ত্র-গ্রন্থ আজও আমরা জানিনা, এবং পাল-চন্দ্র-কাম্বোজ লিপিমালা অথবা সেন-বর্মণ লিপিমালায়ও কোথাও এই গুহ্য সাধনার নিঃসংশয় কোনো উল্লেখ পাইতেছিনা, এ-কথা সত্য। কিন্তু পাল-পর্বের শাক্ত দেবীদের রূপ-কল্পনায়, এক কথায় শক্তিধর্মের ধ্যান-ধারণায় তান্ত্রিক ব্যঞ্জনা নাই, এ-কথা জোর করিয়া বলা যায় না। জয়পালের গয়া-লিপিতে মহানীল-সরস্বতী নামে যে দেবীটির উল্লেখ আছে তাঁহাকে তো তান্ত্রিক দেবী বলিয়াই মনে হইতেছে। তবু, স্বীকার করিতেই হয় যে, পাল-পর্বের অসংখ্য দেবী মূর্তিতে শাক্তধর্মের যে রূপ-কল্পনার পরিচয় আমরা পাইতেছি তাহা আগম ও যামল-গ্রন্থ-বিধৃত ও ব্যাখ্যাত শৈবধর্ম হইতেই উদ্ভূত, এবং শাক্তধর্মের প্রাক্-তান্ত্রিক রূপ। এ-তথ্য লক্ষ্যণীয় যে, পুরাণকথানুযায়ী সকল দেবীমূর্তিই শিবের সঙ্গে যুক্ত, শিবেরই বিভিন্নরূপিণী শক্তি, কিন্তু তাঁহাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল এবং সেই ভাবেই তাঁহারা পূজিতাও হইতেন। শাক্তধর্ম ও সম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্ব ও মর্যাদা সর্বত্র স্বীকৃত ছিল।

বাংলাদেশে যত দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে চতুর্ভুজা ও দণ্ডায়মানা মূর্তির সংখ্যাই বেশি। কোনো কোনো প্রতিমায় তিনি একক, কোথাও কোথাও তিনি সপরিবারে ও সমণ্ডলে বিদ্যমানা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব উপস্থিত; অন্যত্র গণেশ, কার্তিকেয়, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। বিভিন্ন প্রতিমায় দেবীর চারি হস্তের লক্ষণ বিভিন্ন; পার্শ্ব-দেবতারাও বিভিন্ন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য হইতেছে অধিকাংশ প্রতিমার পাদপীঠে উৎকীর্ণ একটি গোধিকার মূর্তি এবং কোনো কোনো প্রতিমায় দুই পাশে দুইটি কদলীবৃক্ষ। এই দুইটি লক্ষণই লোকায়ত ধর্মের প্রতিধ্বনি হিসাবে বিদ্যমান। গোধিকাটি তো অনিবার্য ভাবে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের চণ্ডী ও কালকেতুর উপাখ্যান এবং কদলীবৃক্ষ দুইটি হয়তো পরবর্তী কালের দুর্গা-প্রতিমার কলা-বউ'র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তবে, কলাগাছ দু'টি আবার বিশুদ্ধ মঙ্গল-সূচক লক্ষণ হওয়াও বিচিত্র নয়। যাহা হউক, এই ধরনের চতুর্ভুজা ও পাদপীঠোপরি দণ্ডায়মানা দেবী মূর্তিগুলিকে কেহ বলিয়াছেন চণ্ডী, কেহ বলিয়াছেন গৌরী-পার্বতী। নাম যাহাই হউক, এই জাতীয় দেবী প্রতিমা বাংলাদেশের নানা জায়গা হইতে সুপ্রচুর আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং মূর্তিতত্ত্বের দিক হইতে তাঁহাদের মর্যাদাও কম নয়। দিনাজপুর জেলায় মঙ্গলবাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত দেবী প্রতিমা, রাজসাহী-চিত্রশালার দ্বিহস্ত একটি প্রতিমা, রাজসাহীর মান্দৈল গ্রামে প্রাপ্ত নবগ্রহের মূর্তি সংযুক্ত সুবৃহৎ একটি প্রতিমা, খুলনা জেলার মহেশ্বরপাশা গ্রামে প্রাপ্ত একটি প্রতিমা, বাঁকুড়া জেলার দেওলি গ্রামের একটি প্রতিমা প্রভৃতি পাল-পর্বের এই ধরনের প্রতিমার বিশিষ্ট নিদর্শন।

দেবীর উপবিষ্ট মূর্তি অপেক্ষাকৃত বিরল। আসীনা দেবীর যে ক'টি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও চার হাত, কাহারও ছয়, কাহারও বিশ; কাহারও পরিচয় সর্বমঙ্গলা, কাহারও অপরাজিতা, কাহারও পার্বতী বা ভুবনেশ্বরী, কাহারও বা মহালক্ষ্মী। হাতের সংখ্যা, হস্তধৃত লক্ষণ ও মুদ্রা, আসন-ভঙ্গী, বাহন, পরিবার-দেবতা প্রভৃতির উপরই এই সব পরিচয়ের নির্ভর। নওগাঁর (রাজসাহী-চিত্রশালা) সর্বমঙ্গলা, নিয়ামৎপুরে প্রাপ্ত অপরাজিতা, যশোহর জেলার শাঁখহাটি গ্রামের ভুবনেশ্বরী, রাজসাহী জেলার সিমলা গ্রামের মহালক্ষ্মী প্রভৃতি পাল-পর্বের এই ধরনের মূর্তির এবং তক্ষণ শিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন। বিক্রমপুরের কাগজীপাড়া গ্রামে লিঙ্গোদ্ভবা চতুর্ভুজা (সম্মুখের দুই হাত ধ্যান-মুদ্রায়, পশ্চাতের দুই হাতে অক্ষমালা ও পুস্তক) একটী দেবী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে; ভট্টশালী মহাশয় বলেন, মূর্তিটি মহামায়া বা ত্রিপুর-ভৈরবীর।

রুদ্র বা উগ্রতন্ত্রের দেবী মূর্তির মধ্যে সুপরিচিতা মহিষমর্দিনী-দুর্গাই প্রধান এবং তাঁহার প্রতিমা ভারতের অন্যান্য প্রান্তের মতো বাংলা দেশেও সুপ্রতুল। বাংলার প্রাচীনতম মহিষমর্দিনী প্রতিমাগুলি অষ্টভুজা বা দশভুজা। ঢাকা জেলার শাক্তগ্রামে একটি দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তির পাদপীঠে "শ্রী-মাসিক-চণ্ডী" এই লিপিটি উৎকীর্ণ আছে; এই মূর্তিটির সঙ্গে মানভূম জেলার দুলমি গ্রামে প্রাপ্ত একটি দশভুজা মহিষমর্দিনীর সাদৃশ্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভবিষ্যপুরাণ-কথিত মহিষমর্দিনীর নবদুর্গা-রূপও বাংলা দেশে অজ্ঞাত ছিল না। দিনাজপুর জেলার পোরষ গ্রামে প্রাপ্ত এই ধরনের একটি নবদুর্গা প্রতিমার মধ্যস্থলে বৃহদাকৃতি মহিষমর্দিনী এবং বাকী চারদিক ঘিরিয়া আটটি ক্ষুদ্রাকৃতি অনুরূপ মূর্তি। মধ্যস্থলের মূর্তিটির আঠারটি হাত, বাকী আটটির প্রত্যেকটির ষোলটি। ভবিষ্যপুরাণে মধ্য মূর্তিটির নামকরণ উগ্রচণ্ডী, অন্যগুলির কাহারও নাম চণ্ডা, কাহারও চণ্ডনায়িকা, কাহারও চণ্ডবতী বা চণ্ডরূপা ইত্যাদি। বারোটি এবং ষোলটি হাতযুক্ত দু'টি মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে দিনাজপুর জেলার কেশবপুর গ্রামে এবং বীরভূম জেলার বক্রেশ্বরে। দিনাজপুর জেলার বেতনা গ্রামে একটি বত্রিশহস্ত চণ্ডিকা মহিষমর্দিনী প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে; প্রধান মূর্তিটির উপরে শিব, গণপতি, সূর্য, বিষ্ণু ও ব্রহ্মার মূর্তি উৎকীর্ণ। বরিশাল জেলার শিকারপুর গ্রামের মন্দিরে এখনও একটি দেবী মূর্তির পূজা হইয়া থাকে; মূর্তিটি শবোপরি দণ্ডায়মান এবং তাঁহার চারহাতে খেটক, খড়্গ, নীলপদ্ম এবং নরমুণ্ডের কঙ্কাল; মাথার উপর ক্ষুদ্রাকৃতি কার্তিকেয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও গণপতি। প্রতিমা-শাস্ত্র মতে মূর্তিটি খুব সম্ভব উগ্রতারার। এই উগ্রতারার মূর্তিটিতে এবং মহিষমর্দিনীর একাধিক প্রতিমায় মধ্যমূর্তির উপরে ক্ষুদ্রাকৃতি পঞ্চমূর্তির সন্নিবেশ নিঃসংশয়ে মহাযানী প্রতিমার পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের সন্নিবেশ স্মরণ করাইয়া দেয়। নবদুর্গা-প্রতিমার কেন্দ্রমূর্তির চারপাশে যে বাকী আটটি ক্ষুদ্রাকৃতি পুনরুক্তি তাহাও অরপচন-মঞ্জুশ্রীর প্রতিমা-বিন্যাসের কথা স্মরণ না করাইয়া পারেনা। এই সব মূর্তি-কল্পনায় মহাযানী-বজ্রযানী প্রভাব অনস্বীকার্য।

এই পর্বের বাংলাদেশে অন্তত দুই তিনটি চতুর্ভুজা ও ষড়ভুজা বাগীশ্বরী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের কাহারও চার হাত কাহারও বা ছয়। বাগীশ্বরী ছাড়া আরও কয়েকটি মাতৃকা মূর্তির সঙ্গে এই পর্বের বাংলার পরিচয় ছিল। মাতৃকা মূর্তি সাতটি: ব্রাহ্মণী, মহেশ্বরী, কৌমারী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, বরাহী ও চামুণ্ডী, এবং ইহারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ব্রাহ্মণ্য দেবতার শক্তিরূপে কল্পিতা। ইহাদের মধ্যে চামুণ্ডা বা চামুণ্ডীই ছিলেন বাঙালীর প্রিয়; এবং তাঁহার সিদ্ধ-যোগেশ্বরী, দন্তুরা, রূপবিদ্যা, ক্ষমা, রুদ্রচর্চিকা, রুদ্রচামুণ্ডা, সিদ্ধচামুণ্ডা প্রভৃতি বিভিন্ন ধ্যান-কল্পনার প্রতিকৃতি বাংলার নানা জায়গা হইতে পাওয়া গিয়াছে। রূপবিদ্যার একটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে দিনাজপুর জেলার বেতনা গ্রামে; দ্বিহস্ত দন্তুরার একটি মূর্তি উদ্ধার করা হইয়াছে বর্ধমান জেলায়, একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম পীঠস্থান অট্টহাস গ্রাম হইতে। রাজসাহী-চিত্রশালায় দন্তুরার আরও কয়েকটি প্রতিমা রক্ষিত আছে। দ্বাদশভুজা সিদ্ধ-যোগেশ্বরীর দণ্ডায়মানা ও নৃত্য-পরায়ণা একাধিক প্রতিমা রক্ষিত আছে ঢাকা-চিত্রশালায়। রাজসাহী-চিত্রশালায় আরও দুইটি মূর্তি আছে; একটির পাদপীঠে উৎকীর্ণ "পিসিতাসনা" (পিশিতাসনা), এবং আর একটির পাদপীঠে "চর্চিকা"। শেষোক্তটিতে দেবী শবাসনের উপর এক বৃক্ষের নীচে উপবিষ্টা; প্রথমোক্তটিতে দেবী গর্দভের উপর আসীনা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ চিত্রশালার একটি চতুর্ভুজা ব্রাহ্মণী মূর্তি (নদীয়া জেলার দেবগ্রামে প্রাপ্ত), রাজসাহী-চিত্রশালার কয়েকটি বরাহী এবং একটি ইন্দ্রাণী প্রতিমা, প্রত্যেকটিই এই পর্বের মাতৃকা মূর্তির সুপরিচিত নিদর্শন। ক্ষমা-চামুণ্ডার একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে যশোহর জেলার অমাদি গ্রামে; রুদ্রচামুণ্ডার এবং সিদ্ধচামুণ্ডার দুইটি প্রতিমার পরিচয় দিতেছেন বীরভূম-বিবরণের লেখক।

মন্দির-দ্বারের দুইপাশে গঙ্গা ও যমুনার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করা তো গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বের স্থাপত্যরীতির অন্যতম লক্ষণ। যমুনার স্বতন্ত্র মূর্তি বাংলাদেশে বড় একটা পাওয়া যায় নাই; কিন্তু মকরবাহিনী গঙ্গার একাধিক মূর্তি বিদ্যমান। রাজসাহী-চিত্রশালার মূর্তি দুইটি সুন্দর। খুলনা জেলার যশোরেশ্বরী মন্দিরে একটি গঙ্গা-মূর্তি আছে। দিনাজপুর জেলার ভদ্রশিলা গ্রামে এখনও একটি গঙ্গা-প্রতিমার পূজা হইয়া থাকে, দক্ষিণা-কালিকা নামে! হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে একটি চতুর্ভুজা গঙ্গামূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

সাম্প্রতিক বাংলায় এমন কি মধ্যযুগীয় বাংলায়ও সূর্য-প্রতিমার স্বাধীন স্বতন্ত্র পূজার প্রমাণ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ গুপ্ত-পর্ব হইতেই উদীচ্যবেশী ঈরাণী ধ্যান-কল্পনার সূর্যপূজা বাংলাদেশে সুপ্রচারিত হইয়াছিল এবং আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত তাহার প্রচার ও প্রসার বাড়িয়াই গিয়াছিল। বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত অসংখ্য সূর্য-প্রতিমাই তাহার প্রমাণ। সেন-পর্বে তো এই ধর্ম রাজবংশের পোষকতাই লাভ করিয়াছিল;

বিশ্বরূপ ও কেশবসেন ছিলেন পরমসৌর। সূর্য-প্রতিমা পূজার এত প্রসারের কারণ বোধ হয়, সূর্যদেব সকল প্রকার রোগের আরোগ্যকর্তা বলিয়া গণ্য হইতেন। দিনাজপুর জেলার বৈরহাট্টা গ্রামে প্রাপ্ত একটি আসীন সূর্য-প্রতিমার (একাদশ-দ্বাদশ শতক) পাদপীঠে সুস্পষ্ট উৎকীর্ণ আছে : "সমস্ত রোগানাম্ হর্তা"। পাল ও সেন-পর্বের সূর্য-প্রতিমায় উদীচ্য-ঈরাণী ধ্যান-কল্পনা অবিচল, কিন্তু সূর্য-দেবতার ধ্যানে ও ব্যাখ্যায় বোধ হয় বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধ্যান-কল্পনা মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল। সেন-লিপিতে সূর্যের যে ব্যাখ্যা আছে তাহাতে দেখিতেছি, তিনি কমলবনের সখা, তিমিরকারাবদ্ধ ত্রিলোকের মুক্তিদাতা, এবং বেদবৃক্ষের আশ্চর্য পক্ষী।

সৌর ধর্ম

পাল-পর্বের সূর্য-প্রতিমা সপরিবারে বিদ্যমান, এবং সমস্ত লক্ষণ ও লাঞ্ছন সুপরিস্ফুট। আসীন সূর্যমূর্তি দুর্লভ ; বৈরহাট্টার উপবিষ্ট প্রতিমাটির কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত সূর্যমূর্তিই স্থানক বা দণ্ডায়মান মূর্তি। লণ্ডন সাউথ-কেনসিংটন-চিত্রশালার সূর্যমূর্তিটি ও ফরিদপুর-কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ চিত্রশালা) একটি সূর্যমূর্তি দ্বিহস্ত দণ্ডায়মান সূর্যমূর্তির বিশিষ্ট উদাহরণ। দিনাজপুর জেলার মহেন্দ্রগ্রামে একটি ষড়ভুজ সূর্যমূর্তি পাওয়া গিয়াছে ; এ-ধরণের মূর্তি দুর্লভ। রাজসাহী জেলার মান্দা গ্রামে একটি ত্রিমুণ্ড, দশহস্ত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটির প্রায় সমস্ত লক্ষণই সূর্যের ; কিন্তু ইঁহার তিনটি মুখ, দশটি হাত, উগ্রমূর্তির পার্শ্ব-দেবতারা এবং কেন্দ্র মূর্তিটির হস্তধৃত আয়ুধগুলি সূর্যের লক্ষণ বলিয়া মনে হইতেছে না। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন, মূর্তিটি মার্তণ্ড-ভৈরবের। বাংলার সমস্ত সূর্যমূর্তিই উদীচ্য পদাবরণ পরিহিত ; কিন্তু মালদহ-চিত্রশালায় দুইটি প্রস্তর ফলকে যে সূর্যমূর্তি উৎকীর্ণ তাঁহাদের কোনো পদাবরণ নাই। এ-ক্ষেত্রে দক্ষিণী প্রতিমা-শাস্ত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য।

পুরাণ-কাহিনী অনুসারে অশ্বারূঢ় এবং পরিজনসহ মৃগয়াবিহারী রেবন্ত দেবতার সঙ্গে সূর্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। এই রেবন্ত-দেবতার কয়েকটি মূর্তি বাংলার নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দিনাজপুর জেলার ঘাটনগরে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) রেবন্ত মূর্তিটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিমাটিতে পরিজনসহ মৃগয়ারত রেবন্ত তো আছেনই, কিন্তু দুইজন দস্যুর প্রতিকৃতিও দেখা যাইতেছে ; একজন বৃক্ষশীর্ষে লুক্কায়িত থাকিয়া রেবন্তকে প্রহারোদ্যত। পাদপীঠে একটি নারী দণ্ডায়মানা ও একটি পুরুষ বঁটিতে মৎস্যকর্তনরতা একটি নারীকে প্রহারে উদ্যত। ফলকটির উপরের দক্ষিণ কোনে একটি বাড়ী এবং তাহার ভিতরে একটি নারী ও পুরুষ। এই ফলকটির সমগ্র রূপ বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, রেবন্ত আদিতে পশুজীবী শিকারী কোমের লোকায়ত দেবতা ছিলেন, এবং লোকায়ত জীবনের সঙ্গেই ছিল তাঁহার সম্বন্ধ। কিন্তু পরবর্তী কালে কোনো সময়ে তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং অশ্বারূঢ় বলিয়া সূর্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবদ্ধ হন।

বাংলাদেশে প্রাপ্ত অসংখ্য নবগ্রহ প্রতিমাগুলিও সৌরধর্মের সঙ্গেই যুক্ত। বাংলার শিল্পে নয়টি গ্রহের প্রতিকৃতি সর্বদাই একত্র পাশাপাশি রূপায়িত হইয়াছে, হয় কোনো মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের উপরে, না হয় কোনো প্রতিমা-ফলকের উর্ধভাগে। ২৪ পরগণা জেলার কঙ্কনদীঘিতে প্রাপ্ত সুন্দর নবগ্রহ-প্রতিমাটি বোধ হয় গ্রহযাগ বা স্বস্ত্যয়নোদ্দেশ্যে স্বাধীন স্বতন্ত্র পূজালাভ করিত। নবগ্রহের কোনো একটি গ্রহের পৃথক স্বতন্ত্র মূর্তি সুদুর্লভ। এ পর্যন্ত যে-দু'টি মূর্তির পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহা পাহাড়পুর মন্দিরের ভিত্তিগাত্রের দুইটি ফলকে; একটি চন্দ্রের ও অপরটি বৃহস্পতির।

বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর সম্প্রদায়ের দেবদেবী ছাড়া আরও নানাপ্রকারের এমন দেবদেবী প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে যাঁহারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধ্যান-কল্পনার সৃষ্টি নহেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইঁহারা লোকায়ত ধর্মেরই সৃষ্টি, কিন্তু পরবর্তী কালে ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মনসার কথা আগেই বলিয়াছি। গঙ্গা-যমুনার রূপ-কল্পনার মূলেও লোকায়ত ধর্মের প্রভাব সক্রিয়। বৌদ্ধ হারিতী এবং ব্রাহ্মণ্য ষষ্ঠী সম্বন্ধেও একই উক্তি প্রযোজ্য। রাজসাহী জেলার ক্ষীরহর গ্রামে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) একটি চতুর্ভুজা উপবিষ্টা দেবী-প্রতিমার ক্রোড়ে একটি শিশু; দেবীর দোল্যমান দক্ষিণ পদটি উর্ধমুখী একটা বিড়ালের উপর স্থাপিত। মূর্তিটি ষষ্ঠী-দেবীর, সন্দেহ নাই, এবং বোধ হয় ইহাই ষষ্ঠীর প্রাচীনতম প্রতিমা। হারিতী দেবীর অন্তত দুইটি প্রতিমার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, একটি ঢাকা-চিত্রশালায় (বিক্রমপুর-পাইকপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত) এবং আর, একটি সুন্দরবনের এক গ্রামে এখনও অন্য নামে পূজা পাইতেছেন। দুইটি মূর্তিরই ক্রোড়ে মানবশিশু এবং চারিহস্তের দুই হস্তে মাছ ও ভাণ্ড। পাল-পর্বের বাংলার অনেকগুলি মনসা-মূর্তি ঢাকা, রাজসাহী ও কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

বাংলার নানাস্থান হইতে এক ধরনের মাতা-পুত্র যুগ্মমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শয্যায় শয়িতা একটি নারীর প্রায় বক্ষলগ্ন হইয়া একটি শিশুপুত্র শয়ান; একাধিক পরিচারিকা শয়িতা নারীর পরিচর্যায় নিযুক্তা। শয্যার একপাশে উপরের দিকে গণেশ, কার্তিকেয়, শিবলিঙ্গ এবং নবগ্রহের মূর্তি উৎকীর্ণ। ভট্টশালী মহাশয় বলিয়াছেন, এই প্রতিমাগুলি শিবের সদ্যোজাত রূপের অভিব্যক্তি। এরূপ মনে করিবার খুব সংগত কারণ কিছু নাই, এবং কেহ কেহ যে বলিয়াছেন, কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত এই ফলকগুলিতে রূপায়িত তাহাই যেন অধিকতর যুক্তিসহ।

ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি দিক্‌পাল দেবতাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র মূর্তিও বাংলা দেশে কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। আদিতে ইঁহারা অনেকেই ছিলেন মর্যাদাসম্পন্ন বৈদিক দেবতা, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ধর্মের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা কমিতে আরম্ভ করে এবং স্বতন্ত্র পূজা প্রায় উঠিয়াই যায়। পাহাড়পুর মন্দিরের ভিত্তি-গাত্রে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ এবং কুবেরের একাধিক প্রতিমা-প্রমাণ বিদ্যমান। বৃষবাহন যম, নরবাহন

নিরঋৃতি, এবং মকরবাহন, ললিতাসনোপবিষ্ট বরুণের তিনটি সুন্দর প্রতিমা রাজসাহী চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। বাংলার নানা জায়গায় হইতেই এই ধরনের দিক্‌পাল-প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৬

পাল-চন্দ্র পর্বের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা অর্থবহ তথ্য এই যে, এই পর্বের প্রত্যেকটি রাজবংশ মহাযানী বৌদ্ধ। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বাংলার অনুরাগ কিছুদিন আগে হইতেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সপ্তম শতকের খড়্গ-বংশীয় রাজারা ছিলেন "সর্বলোকবন্দ্য ত্রৈলোক্যখ্যাতকীর্তি ভগবান সুগত এবং তাঁহার শান্ত, ভববিভবভেদকারী যোগীগণের যোগগম্য ধর্ম এবং অপ্রমেয় বিবিধ গুণসম্পন্ন সত্বের পরম ভক্তিমান উপাসক।" মহাযানী বৌদ্ধ অর্হৎদের বাহন বৃষ ছিল এই বংশের রাজাদের লাঞ্ছন। পাল-রাজারা সকলেই ছিলেন পরম সৌগত। অধিকাংশ পাল-লিপির প্রারম্ভেই যে বন্দনা-শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এইরূপ: "যিনি কারুণ্যরত্ন-প্রমুদিত হৃদয়ে মৈত্রীকে প্রিয়তমা রূপে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি তত্ত্বজ্ঞানতরঙ্গিনীর সুবিমল সলিলধারায় অজ্ঞানপঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন, যিনি কামক অরির পরাক্রমসঞ্জাত আক্রমণ পরাভূত করিয়া শাশ্বতী শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান্ দশবল লোকনাথের জয় হোক।" ধর্মপালের খালিমপুর-লিপির প্রথম শ্লোকেই আছে: "যিনি সর্বজ্ঞতাকেই রাজশ্রীর ন্যায় স্থিরভাবে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বজ্রাসনের (বুদ্ধদেবের) বিপুল-করুণা-প্রতিপালিত বহুমারসেনা-সমাকুল-দিঙ্‌মণ্ডল-বিজয়সাধনকারী দশবল তোমাদিগকে রক্ষা করুন।" দেবপালের নালন্দা ও মুঙ্গের লিপিদ্বয়ের প্রথমেই যে বুদ্ধ-ধ্যান আছে তাহা এইরূপ: "যে সর্বার্থভূমীশ্বর সুগত (বুদ্ধদেব) প্রবল (অধ্যাত্ম) শক্তি সমূহের আবির্ভাব-প্রভাবে ত্রিলোকনিবাসী প্রাণীবর্গের (সুপরিচিত) সিদ্ধিপথ অতিক্রম করিয়া নিবৃতি (নির্বাণলোক) লাভ করিয়াছিলেন, সেই পরপ্রয়োজন-সম্পাদান-স্থিরচেতা সৎপথপ্রবর্তক ভগবান সিদ্ধার্থদেবের সিদ্ধি প্রজাবর্গের সর্বোত্তম সিদ্ধিবিধান করুক।" দশম শতকের পূর্বার্ধে পূর্ব-বঙ্গে মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব নামে এক নরপতির রাজত্বের খবর পাওয়া যায়; তিনিও ছিলেন বৌদ্ধ। এই শতকেরই শেষার্দ্ধে পূর্ব-বঙ্গেই আর একটি বৌদ্ধ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এই চন্দ্র-বংশীয় নৃপতিরাও সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ, পরমসৌগত। পাল-রাজাদের মত ইঁহাদেরও শাসনাবলীতে যুগল মৃগমূর্তি এবং ধর্মচক্র-লাঞ্ছন উৎকীর্ণ। এই বংশের অন্যতম রাজা শ্রীচন্দ্রের পট্টোলী তিনটির প্রত্যেক-টিতেই প্রথম শ্লোকেই বুদ্ধ-বন্দনা: "করুণার একমাত্র আধার, বন্দনার্হ সেই ভগবান জিন (বুদ্ধ) এবং জগতের একমাত্র দীপসদৃশ তাঁহার ধর্ম (উভয়েই) জয়লাভ করুন। সকল মহানুভব ভিক্ষুসংঘই বুদ্ধ ও ধর্মের সেবা করিয়া সংসার (-সাগর) পারে উপস্থিত হন।" এই

পাল-পর্বের বৌদ্ধ ধর্ম ও দেবদেবী

শতকেরই কাম্বোজান্বয় গৌড়পতিরাও ছিলেন পরম সৌগত এবং ইঁহাদেরও রাজকীয় পট্টে মৃগমূর্তিলাঞ্ছিত ধর্মচক্র। বস্তুত, অষ্টম হইতে একাদশ শতক পর্যন্ত বাংলায় বৌদ্ধধর্মের জয়জয়কার এবং তাহার প্রভাব শুধু বাংলা-বিহারেই সীমাবদ্ধ নয়; সমসাময়িক বৌদ্ধ ধর্মের আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা এই সব রাজবংশের সক্রিয় পোষকতার ফলেই।

উপরে যে ধ্যান ও বন্দনা শ্লোকগুলি উদ্ধার করা হইয়াছে তাহা হইতে পূর্ণ বিবর্তিত মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের ধ্যান-কল্পনার রূপ কতকটা ধরিতে পারা কঠিন নয়, কিন্তু এই পর্বের বাংলাদেশে মহাযান ধর্ম ধ্যান-ধারণায় ও আচারানুষ্ঠানে কি রূপ প্রকাশ করিয়াছিল এবং প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি তাহার দৃষ্টি ও মনোভাব কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সে-পরিচয় কতকটা পাওয়া যায় সমসাময়িক বৌদ্ধ রাজাদের সামাজিক ও ধর্মকর্মগত ব্যবহারে, অসংখ্য বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিতে, বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযান-সহজযান প্রভৃতি মতবাদে, সিদ্ধাচার্যদের গানে ও দোহায়, বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থাদিতে।

বৌদ্ধ রাজাদের সামাজিক ব্যবহার

পাল-বংশীয় নরপতিরা অনেকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ্য রাজবংশীয়া রাজকুমারীদের। রাজা কান্তিদেবের পিতা বৌদ্ধ ধনদত্ত বিবাহ করিয়াছিলেন একটি শৈব রাজকুমারীকে; এই রাজপুত্রী রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণে ছিলেন পারংগম। পরম সৌগত কান্তিদেবের এই জননী ছিলেন 'শিবপ্রিয়া'। কাম্বোজান্বয় গৌড়পতি রাজপালের প্রথম পুত্র নারায়ণপাল 'বাসুদেব-পাদাব্জ-পূজা-নিরত মানসঃ,' এবং দ্বিতীয় পুত্র নয়পাল এক পুণ্য নবমী তিথিতে স্নানাদিপূর্বক শঙ্কর-ভট্টারকের, (মহাদেবের) উদ্দেশ্যে তাঁহার বৌদ্ধ পিতামাতার ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য ধর্মচক্রমুদ্রা দ্বারা পট্টীকৃত করিয়া ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। প্রায় আড়াই শত তিন শত বৎসর আগে বৌদ্ধ দেবখড়্গের মহিষী রাণী প্রভাবতী একটি সর্বাণী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পারস্পর সম্বন্ধের ইঙ্গিত এই সব দৃষ্টান্তের মধ্যে পাওয়া যাইবে। পাল-রাজারা তো সকলেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য মূর্তি ও মন্দিরের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; রাজা কর্তৃক ভূমিদান সব তো ইঁহাদেরই উদ্দেশ্যে। ধর্মপাল তাঁহার মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মা-প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ-মন্দিরের জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন; নারায়ণপাল শুধু এক সহস্র দেবায়তন প্রতিষ্ঠার দাবিই করেন নাই, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলসপোতের শিবমন্দিরে পূজা, বলি, চরু, সত্র প্রভৃতির জন্য এবং মন্দিরের পাশুপত-আচার্য-পরিষদের শয়নাসন-ভৈষজ্যের জন্য 'ভগবন্তং শিবভট্টারকমুদ্দিশ্য' ভূমিদানও করিয়াছিলেন। বিষুব-সংক্রান্তি উপলক্ষে মহীপাল গঙ্গাস্নান করিয়া এক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। রামপাল রামাবতী নগরীতে শিবের তিনটি মন্দির, একাদশ রুদ্রের একটি দেউল এবং সূর্য, স্কন্দ ও গণপতির তিনটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মদনপালের মহিষী চিত্রমতিকা বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইবার দক্ষিণাস্বরূপ রাজাকে দিয়া ব্রাহ্মণ বটেশ্বর শর্মাকে কিছু ভূমিদান করাইয়াছিলেন এবং দানকার্য সমাপন করা হইয়াছিল 'বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য'।

সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিতে মদনপালকে বলা হইয়াছে "
বিগ্রহশ্রী"। প্রথম বিগ্রহপাল তাঁহার মন্ত্রী কেদারমিশ্রের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিয়া অনেকবার শ্রদ্ধা সলিলাপ্লুত হৃদয়ে নতশিরে পবিত্র শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রদেবও ভগবান বুদ্ধ-ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া ধর্মচক্রমুদ্রাদ্বারা পট্টীকৃত করিয়া কোটি-হোম-সম্পাদনকারী শান্তিবারিক শ্রীপীতবাসগুপ্ত-শর্মাকে এবং অন্য এক উপলক্ষ্যে অদ্ভুতশান্তি হোম সম্পাদনকারী শান্তিবারিক ব্যাসগঙ্গা-শর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। ধর্মপালের ভ্রাতা বাক্‌পালের মৃত্যুর পর পুত্র জয়পাল যে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা তো ব্রাহ্মণ্যধর্মানুমোদিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বলিয়াই মনে হইতেছে; সেই শ্রাদ্ধে মহাদান লাভ করিয়াছিলেন উমাপতি নামে এক ব্রাহ্মণ। মাতুল মথনের মৃত্যুসংবাদে রামপাল ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধনৈশ্বর্য দান করিয়া গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। ধর্মপালকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া গোপালদেব স্বর্গত পিতৃপুরুষদের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই সব ক্রিয়া-কর্মের পশ্চাতে যে ধ্যান-কল্পনার আকাশ বিস্তৃত তাহা তো ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই আকাশ। ধর্মপাল এবং পরবর্তী আর একজন পালরাজ শাস্ত্রশাসন হইতে বিচলিত বর্ণসমূহকে নিজ নিজ ধর্ম ও বর্ণসীমায় প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া ব্রাহ্মণ্য-সমাজ সংস্কারেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কাম্বোজবংশীয় রাজ্যপাল ছিলেন সৌগত বা বৌদ্ধ, কিন্তু তাঁহার এক পুত্র নারায়ণপাল ছিলেন বাসুদেবভক্ত, এবং আর একপুত্র নয়পাল ছিলেন শৈব।

অথচ, পাল, চন্দ্র ও কাম্বোজ-বংশীয় নরপতিরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একাগ্রচিত্তে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের সেবায় ও প্রভাব-বিস্তারে যে পরম প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম ও ধ্যান-ধারণাকে যে-ভাবে দিগ্বিদিকে প্রসারিত করিয়াছিলেন তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল। ধর্মপালের সময়ে তাঁহারই চেষ্টায় প্রাচীন নালন্দা-মহাবিহারের নূতনতর সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছিল। সোমপুর-মহাবিহারের প্রতিষ্ঠা তাঁহারই সক্রিয় আনুকূল্যে এবং এই মহাবিহারের নামই ছিল শ্রীধর্মপালদেব-মহাবিহার। ধর্মপালেরই আনুকূল্যে ত্রৈকূটক-বিহারের নিভৃতকক্ষে বসিয়া আচার্য হরিভদ্র তাঁহার অভিসময়ালংকারের সুপ্রসিদ্ধ টীকা রচনা করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের কেলুরক-লিপিতে জানা যায়, শৈলেন্দ্ররাজ শ্রীসংগ্রাম-ধনঞ্জয়ের গুরু ছিলেন গৌড়ীয় কুমারঘোষ। এই "গৌড়ীদ্বীপগুরু" ৭৭৮ খ্রীষ্ট শতকে একটি মঞ্জুশ্রী-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন; ধর্মপাল বোধ হয় তখনও গৌড়েশ্বর। অষ্টম শতকের দ্বিতীয় পাদে শৈলেন্দ্রবংশসম্ভূত বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে পাল-সম্রাট দেবপাল ঐ বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। নগরাহারের অধিবাসী ব্রাহ্মণ ইন্দ্রদেবের পুত্র বীরদেব বেদাদি শাস্ত্র পাঠ শেষ করিয়া বৌদ্ধমতের অনুরাগী হইয়া প্রথম কনিষ্ক-বিহারে গমন করেন এবং আচার্য সর্বজ্ঞশান্তির নিকট শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া পরে বুদ্ধগয়ার যশোধর্মপুর বিহারে আসেন। সেইখানে তিনি দেবপালের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মাননা লাভ করেন। দেবপাল তাঁহাকে নালন্দার অন্যতম আচার্যরূপেও নিয়োগ

করিয়াছিলেন। বোধ হয়, দেবপালের রাজত্ব কালেই (৮৫১ খ্রীঃ শঃ) গোমিন্ অবিঘ্নাকর নামে গৌড়ের একজন বৌদ্ধ শিলাহার-রাজ কপর্দিনের রাজত্বে কঙ্কনদেশে গিয়া সেখানে কৃষ্ণগিরি-মহাবিহারের ভিক্ষুদের জন্য একটি বিরাট উপাসনাগৃহ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, এবং ভিক্ষুদের চীবর সংস্থানের জন্য একশত দ্রম্ম দান করিয়াছিলেন। মহীপাল ও জয়পালের কালে বিক্রমশীল ও সোমপুর-মহাবিহার ভারতবর্ষে ও ভারতের বাহিরে জ্ঞানমর্যাদায় বৌদ্ধ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। কাশ্মীর, তিব্বত ও ভারতের অন্যান্য স্থানের বৌদ্ধ শ্রমণ ও অন্যান্য জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরা এই সময়েই এই দুই মহাবিহারে বসিয়া বহু গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অতীশ-দীপঙ্কর, রত্নাকরশান্তি প্রভৃতি আচার্যদের আবির্ভাবও এই সময়েই। ১০২৬ খ্রীষ্ট শতকে পৌ-সি বা কো-লিন-নৈ নামে জনৈক বাঙালী শ্রমণ অনেক সংস্কৃত পুঁথি লইয়া গিয়াছিলেন চীনদেশে। বরেন্দ্রীর জগদ্দল মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা বোধ হয় ছিলেন রামপাল নিজেই।

বস্তুত, এই পর্বের বৌদ্ধ ধর্মের এবং বৌদ্ধ জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বহুখ্যাত বৌদ্ধ মহাবিহার গুলি। এই বিহার গুলির বিস্তৃত সংবাদ তিব্বতী সাহিত্যে এবং কিছু কিছু তথ্য সমসাময়িক লিপিতে বিধৃত। তিব্বতী ঐতিহ্যে বিক্রমশীল-মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা ধর্মপাল। মগধের উত্তরে গঙ্গার তীরবর্তী এবং সীমাপ্রাচীরবদ্ধ এই বিহারে ১০৮টি মন্দির ছিল, ছয়টি ছিল বিদ্যায়তন এবং ১১৪ ছিলেন জ্ঞান ও বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রের আচার্য। তিব্বত হইতে অগণিত বৌদ্ধ জ্ঞানপিপাসুরা আসিতেন এই মহাবিহারে। এখানে যত সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ রচিত হইয়াছিল তাহার তালিকা সুদীর্ঘ। ধর্মপালের অন্য একটি নামই ছিল শ্রীবিক্রমশীলদেব এবং এই নাম হইতে বিহারটির নামকরণ হইয়াছিল শ্রীমদ্ বিক্রমশীলদেব-মহাবিহার। তিব্বতী ঐতিহ্যে ওদন্তপুরী-বিহারও ধর্মপালেরই সৃষ্টি, যদিও তারনাথ বলেন, এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেবপাল। এই বিহার ছিল নালন্দার সন্নিকটেই, বর্তমান বিহার-শরিফের অনতিদূরে।

সোমপুর (পাহাড়পুর)-মহাবিহারের কথা তো আগেই বলিয়াছি। মহাপণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র (অন্য দুই নাম; ভিক্ষু আরণ্যক এবং কালম্বলপাদ) এই বিহারেই বাস করিতেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থ তিব্বতীতে অনূদিত হইয়াছিল; একটি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন (১০০০ খ্রী শ) অদ্বয়বজ্র বা অতুল্যপাদ। আচার্য অতীশ-দীপঙ্করও কিছুকাল এই বিহারে বাস করিয়াছিলেন এবং ভাববিবেকের মধ্যমকরত্নপ্রদীপ নামে একটি গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। সমতটবাসী এবং এই বিহারের আবাসিক, মহাযানী এবং বিনয়পারংগম, বীর্যেন্দ্র নামে জনৈক বৃদ্ধ স্থবির খ্রীষ্ট দশম শতকে বুদ্ধগয়ায় একটি সুবৃহৎ বুদ্ধ-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সোমপুর-মহাবিহারের পরিণতির কিছু উল্লেখ একটি লিপিতে আছে। একাদশ শতকের শেষপাদ বা দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে উৎকীর্ণ, নালন্দায় প্রাপ্ত, 'বিপুল-বিমল-কীর্তি, সজ্জন-আনন্দকন্দ'

বৌদ্ধযতি বিপুলশ্রীমিত্রের একটি প্রশস্তিলিপি হইতে জানা যায়, বিপুলশ্রীমিত্রের পরম গুরুর গুরু করুণাশ্রীমিত্র নামক আচার্য সোমপুর-বিহারে বাস করিতেন, কিন্তু বঙ্গাল-সৈন্যরা আসিয়া সোমপুর অগ্নিদগ্ধ করে এবং সেই আগুনে করুণাশ্রীমিত্র জীবন্ত দগ্ধ হইয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করেন। জগতের অষ্টমহাভয় নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে বিপুলশ্রীমিত্র সোমপুরে এক তারা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং অগ্নিদাহে বিনষ্ট মহাবিহারের সংস্কার সাধন করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সোমপুরের বুদ্ধমূর্তির জন্য বিচিত্র হেমাভরণ দান করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল সোমপুরীতে বশীর মত বাস করিয়াছিলেন।

তারনাথের মতে ধর্মপাল ৫০টি ধর্মবিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যে এই পর্বের বাংলাদেশে আরও অনেকগুলি বৌদ্ধ বিহারের সংবাদ জানা যায়। ত্রৈকূটক বিহার, দেবীকোট-বিহার, পণ্ডিত-বিহার, সন্নগর-বিহার, ফুল্লহরি-বিহার, পট্টিকেরক-বিহার, বিক্রমপুরী-বিহার ও জগদ্দল-মহাবিহার প্রভৃতির সম্বন্ধে সংবাদ তিব্বতী প্রাচীন সাহিত্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ত্রৈকূটক-বিহার বোধ হয় ছিল পশ্চিমবঙ্গে, রাঢ়া দেশের ত্রৈকূটক-দেবালয়ের সন্নিকটেই। দেবীকোট-বিহার নিশ্চয়ই ছিল উত্তর-বঙ্গে, দিনাজপুর জেলার বানগড়ের অদূরবর্তী। আচার্য অদ্বয়বজ্র, উধিলিপা, ভিক্ষুণী মেখলা প্রভৃতি এই বিহারেই বাস করিতেন। পণ্ডিত-বিহার ছিল চট্টগ্রামে। ফুল্লহরি-বিহার ছিল বোধ হয় বিহারে; এই বিহারে অনেক বৌদ্ধ আচার্য বাস করিতেন, এবং তিব্বতী পণ্ডিতদের সঙ্গে একযোগে তাঁহারা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। পট্টিকেরক ও সন্নগর-মহাবিহার দুইই ছিল পূর্ববঙ্গে এবং বোধ হয় উভয়ই ত্রিপুরা জেলায়। ময়নামতী পাহাড়ের উপর পট্টিকেরক-বিহারের ধ্বংসাবশেষ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজা হরিকালদেব রণবঙ্কমল্লের (১২২০ খ্রীষ্ট শতক) লিপিতে দুর্গোত্তারার নামে উৎসর্গীকৃত যে-বিহারের উল্লেখ আছে তাহারও অবস্থান ছিল পট্টিকেরক নগরীতে। বনরত্ন নামে জনৈক বৌদ্ধ আচার্য বাস করিতেন সন্নগর-বিহারে এবং সেইখানে বসিয়া তিনি অনেক তিব্বতী অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরী-বিহার তো বিক্রমপুরেই ছিল; এই বিহারে বসিয়া অবধূতাচার্য কুমারচন্দ্র একটি তান্ত্রিক টীকা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রভূতির কন্যা লীলাবজ্র ও তিব্বতী শ্রমণ পুণ্যধ্বজ ঐ টীকা তিব্বতীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। জগদ্দল-মহাবিহারের কথা আগেও বলিয়াছি। এই মহাবিহার ছিল উত্তর-বঙ্গের বরেন্দ্রীতে এবং বিহারের অধিষ্ঠাতা দেবতা ছিলেন অবলোকিতেশ্বর, অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন মহত্তারা। এই বিহারের কক্ষে কক্ষে বসিয়াই বিভূতচন্দ্র, দানশীল, শুভাকর গুপ্ত, মোক্ষাকরগুপ্ত, ধর্মাকর প্রভৃতি আচার্যরা বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ বিহার-মহাবিহার

এই সব প্রসিদ্ধ মহাবিহার ছাড়া আরও কয়েকটি ছোট ছোট বিহার বাংলা ও বিহারের ইতস্তত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিব্বতী গ্রন্থাদি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হইতে এই

জাতীয় দু'চারিটি বিহারের নামও জানা যায়। পাহাড়পুরের ২৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দীপগঞ্জে হলুদ-বিহার নামে একটি স্তূপ এখনও বর্তমান। পট্টিকেরক নগরীতে আর একটি বিহারের নাম ছিল কনকস্তূপ-বিহার; এই বিহারে আচার্য বিনয়শ্রীমিত্র এবং আরও কয়েক জন কাশ্মীরী ভিক্ষু বাস করিতেন। ইঁহাদেরই অনুরোধে সিদ্ধাচার্য নাড়পাদ বজ্রপাদ-সার-সংগ্রহ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। নাড়পাদের গুরু ছিলেন প্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য তৈলপাদ; তিনি বাস করিতেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের পণ্ডিত-বিহারে। এই বিহার ছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিক জ্ঞান ও সাধনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। বগুড়ার নিকটে শীলবর্ষে একটি বিহারের এবং নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের নিকটে সুবর্ণ-বিহারের ধ্বংসাবশেষও হয়তো এই পর্বেরই বৌদ্ধ সাধনার কেন্দ্র। বালাণ্ডা নামক স্থানে অনুলিখিত একটি অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগারে এখনও রক্ষিত; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বালাণ্ডায় একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। আচার্য প্রজ্ঞাবর্মা ও তাঁহার গুরু বোধিবর্মা তিব্বতী ঐতিহ্যে কাপট্য-নিবাসী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; ইঁহাদের রচিত কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিতও হইয়াছিল। এই 'কাপট্য' কি কোনো বৌদ্ধ বিহারের নাম?

এই সব মহাবিহারে বসিয়া অগণিত খ্যাত ও বিস্মৃতনামা আচার্যরা শতব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে অক্লান্ত জ্ঞান-সাধনা করিয়াছিলেন, অসংখ্য যে-সব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার কিছু আভাস পরবর্তী এক অধ্যায়ে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ধর্মের যে-সাধনা ছিল এই জ্ঞান-সাধনার আশ্রয় তাহার স্বরূপের পরিচয় পাল-চন্দ্র-কাম্বোজ লিপিমালায় ধরিতে পারা যায় না; তাহা বিধৃত হইয়া আছে সদ্যোক্ত গ্রন্থরাজির মধ্যে এবং এই পর্বের অসংখ্য নয়নাভিরাম প্রস্তর ও ধাতব দেবদেবী-মূর্তির অবহেলিত আয়তনে। এই সব গ্রন্থের সংস্কৃত মূল কমই পাওয়া গিয়াছে; অধিকাংশই তিব্বতী অনুবাদ। কিছুই বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিবার কথা নয়; তিব্বতী পণ্ডিতেরা ও ভারতীয় গুরুরা যে-সব গ্রন্থের অনুলিপি ও অনুবাদ তিব্বত, কাশ্মীর, নেপাল, চীন প্রভৃতি দেশে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং মুসলমান অভিযাত্রীদের আগমনে ও বিহারগুলি ধ্বংস হইবার অব্যবহিত আগে যে অল্পসংখ্যক ভিক্ষু আপনাপন স্কন্ধে ঝুলাইয়া যে ক'টি পুঁথি ঝুলিতে বাঁধিয়া নেপালে, তিব্বতে, চীনে, কাশ্মীরে, আসামে, ব্রহ্মদেশে পলাইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন তাহারই কিছু কিছু অংশ শতাব্দী অতিক্রম করিয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই সব গ্রন্থলব্ধ জ্ঞান আজও খুব সুস্পষ্ট নয়। মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের যে বৈপ্লবিক বিবর্তন এবং বিভিন্ন ধারায় তাহার যে বিস্তার এই গ্রন্থরাজির মধ্যে অনুসরণ করা যায় তাহা লইয়া সাম্প্রতিক কালে আলোচনা-গবেষণা কিছু কিছু হইয়াছে এবং বাঙালী পণ্ডিতেরাই তাহা করিয়াছেন। এই আলোচনা-গবেষণার সার-সংগ্রহ ছাড়া এখানে আর কিছু করা সম্ভব নয়।

সম্মতীয়বাদ, সর্বাস্তিবাদ, মহাসাংঘিকবাদ প্রভৃতি লইয়া যে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার সপ্তম শতকীয় বাংলায় য়ুয়ান-চোয়াঙ্, ই ৎসিঙ্ প্রভৃতি চীনা শ্রমণেরা দেখিয়া গিয়াছিলেন,

কিংবা এই পর্বের লিপিমালার পূর্বোক্ত ধ্যান ও বন্দনা শ্লোকে যে-মহাযানাদর্শের পরিচয় আমরা পাই তাহার সঙ্গে অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক এই চারি শত বৎসরের বাংলার বৌদ্ধ ধর্মের সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ ও শিথিল। অষ্টম ও নবম শতকে মহাযান বৌদ্ধধর্মে নূতনতর তান্ত্রিক ধ্যান-কল্পনার স্পর্শ লাগিয়াছিল এবং তাহার ফলে দশম শতক হইতেই বৌদ্ধ ধর্মে গুহ্য সাধনতত্ত্ব, নীতিপদ্ধতি ও পূজাচারের প্রসার দেখা দিয়াছিল। এই গুহ্য সাধনার ধ্যান-কল্পনা কোথা হইতে কি করিয়া মহাযান-দেহে প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তর ঘটাইল এবং বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি করিল, বলা কঠিন; মহাযানের মধ্যে তাহার বীজ সুপ্ত ছিল কিনা তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে আচার্য অসঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, পর্বত-কান্তারবাসী সুবৃহৎ কৌম-সমাজকে বৌদ্ধ ধর্মের সীমার মধ্যে আকর্ষণ করিবার জন্য ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ যোগিনী, ডাকিনী, পিশাচ ও মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবী প্রভৃতিকে অসঙ্গ মহাযান-দেবায়তনে স্থান দান করিয়াছিলেন। নানা গুহ্য মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী (গূঢ়ার্থক অক্ষর) প্রভৃতিও প্রবেশ করিয়াছিল মহাযান ধ্যান-কল্পনায়, পূজাচারে, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে, এবং তাহাও অসঙ্গেরই অনুমোদনে। এই ঐতিহ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য, বলা কঠিন। তবে, বলা বাহুল্য, এই সব গুহ্য, রহস্যময়, গূঢ়ার্থক মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী, বীজ, মণ্ডল প্রভৃতি সমস্তই আদিম কৌম-সমাজের যাদুশক্তিতে বিশ্বাস হইতেই উদ্ভূত। সহজ সমাজতাত্ত্বিক যুক্তিতেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম উভয়েরই ভাব-কল্পনায় ও ধর্মগত আচারানুষ্ঠানে ইহাদের প্রবেশ লাভ কিছু অস্বাভাবিক নয়। উভয়কেই নিজ নিজ প্রভাবের সীমা বিস্তৃত করিবার চেষ্টায় আদিম কৌম-সমাজের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; তাহা ছাড়া উভয় ধর্ম সম্প্রদায়েরই নিম্নতর স্তরগুলিতে যে সুবৃহৎ মানবগোষ্ঠী ক্রমশ আসিয়া ভিড় করিতেছিল তাঁহারা তো ক্রমহ্রস্বায়মান আদিবাসী সমাজেরই জনসাধারণ। তাঁহারা তো নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা দেবদেবী লইয়াই বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আসিয়া আশ্রয় লইতেছিলেন। অন্যদিকে, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও চেষ্টা ছিল নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও ভাব-কল্পনা অনুযায়ী, নিজ নিজ শক্তি ও প্রয়োজনানুযায়ী সদ্যোক্ত আদিম ধর্মবিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, দেবদেবী ইত্যাদির রূপ ও মর্ম কিছু রাখিয়া কিছু ছাড়িয়া, শোধিত ও রূপান্তরিত করিয়া লওয়া। অসঙ্গের সময় হইতেই হয়তো বৌদ্ধধর্মে এই রূপান্তরের সূচনা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাহা হউক বা না হউক, সন্দেহ নাই যে, বাংলা-বিহারের, এক কথায় পূর্ব-ভারতের বৌদ্ধ ধর্মে এই ধরনের রূপান্তরের একটা গতি অষ্টম-নবম শতকেই ধরা পড়িয়াছিল। ইহার মূলে ঐতিহাসিক একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ নিশ্চয়ই ছিল; সে-কারণ এখনও আমরা খুঁজিয়া পাই নাই, এই মাত্র। তবু এই পর্বের বাংলা-বিহারে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মের এই বিরাট বিবর্তনের (যাহাকে সাধারণ কথায় তান্ত্রিক বিবর্তন বলা চলে) কারণ সম্বন্ধে একটু অনুমান বোধ হয় করা চলে।

মহাযানের বিবর্তন

খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতকের মাঝামাঝি হইতেই হিমালয়ক্রোড়স্থিত পার্বত্য-কান্তারময় দেশগুলির সঙ্গে গাঙ্গেয় প্রদেশের প্রথম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, ভোটান প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে মধ্য ও পূর্ব-ভারতের আদান প্রদান বাড়িয়া যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় দৌত্যবিনিময়, সমরাভিযান প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া এই সব পার্বত্য দেশের আদিম সংস্কার ও সংস্কৃতির স্রোত বাংলা-বিহারে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। তাহার কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণও বিদ্যমান। সপ্তম শতকের পূর্ব-বাংলার খড়্গ-রাজবংশ বোধ হয় এই স্রোতেরই দান। ধর্মপাল ও দেবপালের কালে এই যোগাযোগ আরও বাড়িয়াই গিয়াছিল। পরবর্তী কালে আমরা যাহাকে বলিয়াছি তান্ত্রিক ধর্ম তাহার একটা দিক এই যোগাযোগের ফল হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক হয়তো নয়। তন্ত্রধর্মের প্রসারের ভৌগোলিক লীলাক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে এ-অনুমান একেবারে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।

যাহাই হোক, এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ, যোগাচার ও মধ্যমিক-বাদ প্রভৃতি প্রাচীনতর মহাযানী ধ্যান ও চিন্তা একেবারে বিদায় না লইলেও স্বল্পসংখ্যক পণ্ডিতদের চর্চার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; সর্বাস্তিবাদ বা মহাসাংঘিক-বাদের বিনয়-শাসনের স্থান ও সুযোগ দীক্ষা-গ্রহণের সময় ছাড়া আর কোথাও ছিলনা। বৌদ্ধ জনসাধারণ শূন্যবাদ বা বিজ্ঞানবাদ, যোগাচার বা মধ্যমিকবাদের গভীর পরমার্থিক তত্ত্ব ও সাধনমার্গের বিচিত্র স্তরের কিছুই বুঝিত না, বুঝিতে পারা সহজও ছিল না। তাঁহাদের কাছে যাদুশক্তিমূল মন্ত্র ও মণ্ডল, ধরণী ও বীজ অনেক বেশি সত্য ও সহজ বলিয়া ধরা দিল এবং সেই ক্রমবর্ধমান ধর্ম-সমাজের জন্য এক শ্রেণীর বৌদ্ধ আচার্যরা মহাযানের নূতন ধ্যান-কল্পনা গড়িয়া তুলিবার দিকে মনোনিবেশ করিলেন। মন্ত্রই হইল তাঁহাদের মূল প্রেরণা এবং মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ধারণী ও বীজ। ইঁহাদের রচিত নয়ই মন্ত্র-নয়, ইঁহাদের প্রদর্শিত যান বা পথই মন্ত্র-যান। এই মন্ত্রযানই মহাযানের বিবর্তনের প্রথম স্তর।

মন্ত্রযান

দ্বিতীয় স্তরে বজ্রযান। বজ্রযানের ধ্যান-কল্পনা গভীর ও জটিল। বজ্রযানীদের মতে নির্বাণের পর তিন অবস্থা: শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ। শূন্যতত্ত্বের স্রষ্টিকর্তা নাগার্জুন; তাঁহার মতে দুঃখ, কর্ম, কর্মফল, সংসার সমস্তই শূন্য, শূন্যতার এই পরম জ্ঞানই নির্বাণ। বজ্রযানীরা এই নির্বিকল্প জ্ঞানের নামকরণ করিলেন নিরাত্মা; বলিলেন, জীবের আত্মা নির্বাণ লাভ করিলে এই নিরাত্মাতেই বিলীন হয়। নিরাত্মা কল্পিতা হইলেন দেবীরূপে, এবং বলা হইল, বোধিচিত্ত যখন নিরাত্মার আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া নিরাত্মাতেই বিলীন হন তখনই উৎপত্তি হয় মহাসুখের। বোধিচিত্তের অর্থ হইতেছে চিত্তের এক বিশেষ বৃত্তি বা অবস্থা যাহাতে সম্যক জ্ঞান বা বোধিলাভের সংকল্প বর্তমান। বজ্রযানীরা বলেন, মৈথুনযোগে চিত্তের যে পরম আনন্দময় ভাব, যে এককেন্দ্রিক ধ্যান তাহাই বোধিচিত্ত। এই বোধিচিত্তই বজ্র, কারণ কঠোর যোগসাধনার ফলে ইন্দ্রিয়শক্তি

বজ্রযান

সম্পূর্ণ দমিত হইয়া বজ্রের মত দৃঢ় ও কঠিন হয়। বোধিচিত্তের বজ্রভাব লাভ ঘটিলে তবে বোধিজ্ঞান লাভ হয়। চিত্তের এই বজ্রভাবকে আশ্রয় করিয়া সাধনার যে পথ তাহাই বজ্রযান। ইন্দ্রিয়শক্তিকে, কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণ দমিত করিবার কথা এইমাত্র বলা হইল। বজ্রযানীরা বলেন, ইন্দ্রিয় দমন করিতে হইলে আগে সেগুলিকে জাগরিত করিতে হয়; মিথুন সেই জাগরণের উপায়। মিথুনজাত আনন্দকে অর্থাৎ বোধিচিত্তকে স্থায়ী করা যায় মন্ত্রশক্তির সাহায্যে এবং সেই অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়শক্তি দমিত হয়। সাধকের সাধনার শক্তিতে মন্ত্র বা ধ্যান অর্থাৎ তাহার ধ্বনি রূপমূর্তি লাভ করে; এই রূপমূর্তিরাই বিভিন্ন দেবদেবী। মিথুনাবস্থার আনন্দোদ্ভূত বিভিন্ন দেবদেবী সাধকের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে নিজ নিজ স্থানে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়া এক একটি মণ্ডল সৃষ্টি করেন। এই মণ্ডলের নিঃশব্দ ধ্যান করিতে করিতেই বোধিচিত্ত স্থায়ী ও স্থির হইয়া বজ্রের মত কঠিন হয় এবং ক্রমে বোধিজ্ঞান লাভ ঘটে। বলা বাহুল্য, অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই বজ্রযানের এই সমস্ত সাধন-পদ্ধতিটাই অত্যন্ত গুহ্য, এবং যে-ভাষায় ও শব্দে এই পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হয় তাহাও গুহ্য। গুরুদীক্ষিত সাধক ছাড়া সে-শব্দ ও ভাষার গূঢ়ার্থ আর কেহ বুঝিতে পারেন না, এবং গুরুর নির্দেশ ও উপদেশ ছাড়া আর কাহারও পক্ষে এই সাধন-পদ্ধতি অনুসরণ করাও প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। বজ্রযানে গুরু অপরিহার্য। বজ্রযানে প্রজ্ঞার সার যে বোধিচিত্ত, ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের ভাষায় তাহাই শক্তি।

বজ্রযান গুহ্য সাধনারই সূক্ষ্মতর স্তর সহজযান নামে খ্যাত। বজ্রযানে মন্ত্রের মূর্তি রূপের ছড়াছড়ি, সুতরাং তাহার দেবায়তনও সুপ্রশস্ত; মন্ত্র-মুদ্রা-পূজা-আচার-অনুষ্ঠানে বজ্রযানের সাধনমার্গ আকীর্ণ। সহজযানে দেবদেবীর স্বীকৃতি যেমন নাই, তেমনই নাই মন্ত্র-মুদ্রা-পূজা-আচার-অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি। সহজযানীরা বলেন, কাঠ, মাটি বা পাথরের তৈরী দেবদেবীর কাছে প্রণত হওয়া বৃথা। বাহ্যানুষ্ঠানের কোনো মূল্যই তাঁহাদের কাছে ছিল না। ব্রাহ্মণদের নিন্দা তো তাঁহারা করিতেনই; যে-সব বৌদ্ধ মন্ত্রজপ, পূজার্চনা, কৃচ্ছ্রসাধন, প্রব্রজ্যা ইত্যাদি করিতেন তাঁহাদেরও নিন্দা করিতেন। বলিতেন, সিদ্ধিলাভ, বৌদ্ধত্বলাভ তাঁহাদের ঘটেনা। সহজযানী সিদ্ধাচার্যদের ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ দোহাকোষের অনেকগুলি দোহায় স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিতেছি।

সহজযান

কিং তো দীবেঁ কিং তো নিবেজ্জঁ
কিং তো কিজ্জই মন্তহ সেব্বঁ।
কিং তো তিথ তপোবন জাই
মোক্‌খ কি লব্‌ভই পানী হ্নাই॥

কি (হইবে) তোর দীপে, কি (হইবে) তোর নৈবেদ্যে, কি করা হইবে তোর মন্ত্রের সেবায়, কি তোর (হইবে) তীর্থ-তপোবনে যাইয়া। জলে নাহিলেই কি মোক্ষলাভ হয়?

এস জপহোমে মণ্ডল কম্মে
অনুদিন আচ্ছসি বাহিউ-ধম্মে।
তো বিনু তরুণি নিরন্তর ণেহে
বোধি কি লব্ভই প্রণ বি দেহেঁ॥

এই জপ-হোম-মণ্ডল কর্ম লইয়া অনুদিন বাহ্যধর্মে (লিপ্ত) আছিস্। তোর নিরন্তর স্নেহ বিনা, হে তরুণি. এই দেহে কি বোধিলাভ হয়?

সহজযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গূঢ় সাধন-পদ্ধতি ও ধ্যান-ধারণার সূক্ষ্ম গভীর পরিচয় দোহা কোষের দোহা এবং চর্যাগীতির গীতগুলিতে বিধৃত হইয়া আছে। সহজযানীরা বলেন, বোধি বা পরমজ্ঞান লাভের খবর অন্য সাধারণ লোকের তো দূরের কথা, বুদ্ধদেবও জানিতেন না—বুদ্ধোঽপি ন তথা বেত্তি যথায়মিতরো নরঃ। ঐতিহাসিক বা লৌকিক বুদ্ধের স্থানই বা কোথায়? সকলেই তো বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী এবং এই বুদ্ধত্বের অধিষ্ঠান দেহের মধ্যে—দেহস্থিতং বুদ্ধত্বং; দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই। কোথায় কতদূরে গেল শূন্যতাবাদ, কতদূরে সরিয়া গেল বিজ্ঞানবাদ! জাগিয়া রহিল শুধু দেহবাদ, শুধু কায়াসাধন। সহজিয়াদের মতে শূন্যতা হইল প্রকৃতি, করুণা হইল পুরুষ; শূন্যতা ও করুণা অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে, অর্থাৎ নারী ও নরের মিথুন-মিলনযোগে বোধিচিত্তের যে পরমানন্দময় অবস্থার সৃষ্টি লাভ হয় তাহাই মহাসুখ। এই মহাসুখই ধ্রুবসত্য; এই ধ্রুবসত্যের উপলব্ধি ঘটিলে ইন্দ্রিয়গ্রাম বিলুপ্ত হইয়া যায়, সংসারজ্ঞান তিরোহিত হয়, আত্মপরভেদ লোপ পায়, সংস্কার বিনষ্ট হয়। ইহাই সহজ অবস্থা। রাজা হরিকালদেব রণবঙ্কমল্লের ত্রয়োদশ শতকীয় একটি লিপিতে দেখিতেছি, জনৈক প্রধান রাজকর্মচারী পট্টিকেরক নগরীতে সহজধর্মকর্মে লিপ্ত ছিলেন।

বজ্রযানেরই অপর আর এক সাধনপন্থার নাম কালচক্রযান। কালচক্রযানীদের মতে শূন্যতা ও কালচক্র এক এবং অভিন্ন। ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ লইয়া অবিরাম প্রবহমান কাল-স্রোত চক্রাকারে ঘূর্ণ্যমান। এই কালচক্র সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ; এই কালচক্রই আদিবুদ্ধ ও সকল বুদ্ধের জন্মদাতা। কালচক্র প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হইয়া এই জন্মদান কার্যটি সম্পন্ন করেন। কালচক্রযানীদের উদ্দেশ্যই হইতেছে কালচক্রের এই অবিরাম গতিকে নিরস্ত করা অর্থাৎ নিজদেরকে সেই কাল-প্রভাবের উর্ধে উন্নীত করা। কিন্তু কালকে নিরস্ত করা যায় কিরূপে? কালের গতির লক্ষণ হইতেছে একের পর এক কার্যের মালা; কার্যপরম্পরা অর্থাৎ গতির বিবর্তন দেখিয়াই আমরা কালের ধারণায় উপনীত হই। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই কার্যপরম্পরা মূলত প্রাণক্রিয়ার পরম্পরা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই, প্রাণক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই কালকে নিরস্ত করা যায়। কালচক্রযানীরা বলেন, যোগসাধনার বলে দেহাভ্যন্তরস্থ নাড়ী ও নাড়ীকেন্দ্র গুলিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই, পঞ্চবায়ুকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই প্রাণক্রিয়া নিরুদ্ধ করা যায়, এবং তাহাতেই কাল নিরস্ত হয়। কাল নিরস্ত করাই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে কালচক্র-যানীদের সাধন-পদ্ধতিতে তিথি, বার, নক্ষত্র, রাশি, যোগ প্রভৃতি একটা বড় স্থান অধিকার

কালচক্রযান

করিয়া থাকিবে ইহা কিছু বিচিত্র নয়! এই জন্যই কালচক্রযানীদের মধ্যে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রচলন ছিল খুব বেশি। তিব্বতী ঐতিহ্যানুসারে কালচক্রযানের উদ্ভব ভারতবর্ষের বাহিরে সম্ভল নামক কোনো স্থানে; পাল-পর্বের কোনো সময়ে নাকি তাহা বাংলাদেশে প্রবেশ লাভ করে। প্রসিদ্ধ কালচক্রযানী অভয়াকরগুপ্ত এই মতবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ছিলেন রামপালের সমসাময়িক।

বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান সকলেরই নির্ভর যোগ-সাধনার উপর। বলা বাহুল্য, ইহাদের সকলেরই মূল যোগাচার ও মধ্যমিক দর্শনে। এই তিন যান একই ধ্যান-কল্পনা হইতে উদ্ভূত এবং ব্যবহারিক সাধনার ক্ষেত্রে এই তিন যানের মধ্যে পার্থক্যও খুব বেশি ছিল না। ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম সীমারেখা টানা বস্তুতই কঠিন। একই সিদ্ধাচার্য একাধিক যানের উপর পুস্তক রচনা করিয়াছেন, এমন প্রমাণও দুর্লভ নয়। এই তিন যানের উদ্ভব যেখানেই হউক, বাংলাদেশেই ইহারা লালিত ও বর্ধিত হইয়াছিল; প্রধানত এই ত্রিযানপন্থী বাঙালী সিদ্ধাচার্যরাই এই বিভিন্ন গুহ্য সাধনার গ্রন্থাদি রচনা ও দেবদেবীর ধ্যান-কল্পনা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বস্তুত, এই তিন যানের ইতিহাসই পাল-চন্দ্র-কাম্বোজ-পর্বের বাংলার বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস।

যে-যোগের উপর এই তিন যানের নির্ভর সেই যোগ হঠযোগ নামে পরিচিত এবং তাহা মানবদেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শারীর জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। শরীরের নাড়ীপ্রবাহ ও তাহাদের উর্ধমুখী গতি, বিভিন্ন নাড়ীর সংযোগ কেন্দ্র, তাহাদের উৎপত্তিস্থল, নাড়ীচক্র প্রভৃতি সমস্তই এই শারীরজ্ঞানের অন্তর্গত। ললনা, রসনা ও অবধূতী এই তিনটিই প্রধান নাড়ীপ্রবাহ; ইহাদের মধ্যে অবধূতীর উর্ধমুখী গতি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত। নাড়ীপ্রবাহের গতিকে সাধক স্বেচ্ছায় চালনা করিতে পারেন এবং সেই চালনার শক্তি অনুযায়ী বোধিচিত্তের ধ্যান-দৃষ্টি উন্মীলিত ও প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রের যোগসাধনায় উপরোক্ত ললনা-রসনা-অবধূতীই ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নাতে বিবর্তিত।

পূর্বেই বলিয়াছি, বজ্রযান সাধন-পদ্ধতিতে গুরু অপরিহার্য। কিন্তু গুরুর পক্ষে শিষ্য নির্বাচন এবং তাহাকে যথার্থ সাধনপন্থায় চালনা করিয়া লইয়া যাওয়া খুব সহজ ছিলনা। সাধনমার্গের কোন্ পথে শিষ্যের স্বাভাবিক প্রবণতা গভীর বিচার করিয়া তাহা স্থির করিতে হইত। এই বিচার-বিশ্লেষণের অভিনব একটি পদ্ধতি তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এই পদ্ধতির নাম ছিল কুলনির্ণয়-পদ্ধতি। ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী, এই পাঁচ রকমের কুল। এই পাঁচটি কুল প্রজ্ঞার পাঁচটি রূপ! যে পঞ্চ স্কন্ধ বা পঞ্চবায়ুর সারোত্তম দ্বারা এই ভৌতিক মানবদেহ গঠিত, ব্যক্তি-বিশেষের দেহে তাহাদের মধ্যে যে স্কন্ধটি অধিকতর সক্রিয়, সেই অনুযায়ী তাহার কুল নির্ণীত হয় এবং তদনুযায়ী সাধনপন্থাও স্থিরীকৃত হয়। বৈষ্ণব পদকর্তা ও সাধক চণ্ডীদাসের রজকী বা রজকিনী বজ্রযান-সহজযান মতে চণ্ডীদাসের কুলেরই সূচক, আর কিছুর নহে।

মহাযান ধর্মের যে বিরাট বিবর্তনের কথা এতক্ষণ বলিলাম এই বিবর্তনের নেতৃত্ব যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সমসাময়িক বৌদ্ধ ঐতিহ্যে তাঁহাদের বলা হইয়াছে সিদ্ধ বা সিদ্ধাচার্য। চৌরাশি জন সিদ্ধাচার্যের সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা বলা কঠিন, তবে ইঁহাদের অনেকেই যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং নবম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ইঁহারা জীবিত ছিলেন সে-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। অনেকে অনেক গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের তিব্বতী অনুবাদ আজও বিদ্যমান। ইঁহাদের মধ্যে সরহপাদ বা সরহবজ্র, নাগার্জুন, লুইপাদ, তিল্লোপাদ, নাড়োপাদ, শবরপাদ, অদ্বয়বজ্র, কাহ্নুপাদ, ভুসুকু, কুক্কুরিপাদ প্রভৃতি সিদ্ধাচার্যেরাই প্রধান। বৌদ্ধ ঐতিহ্যানুযায়ী সরহের বাড়ী ছিল পূর্ব-ভারতের রাজ্ঞী-সহরে, তিনি ছিলেন রত্নপালের সমসাময়িক। উড্ডিয়ানে তাঁহার তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা, এবং আচার্যের পদ অধিকার করিয়াছিলেন নালন্দা-মহাবিহারে। নাগার্জুন ছিলেন সরহপাদের শিষ্য এবং নালন্দায় তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল। তিল্লোপাদের বা তৈলিকপাদের বাড়ী ছিল চট্টগ্রামে, তাঁহার বংশ ব্রাহ্মণ বংশ; তিনি ছিলেন মহীপালের সমসাময়িক এবং পণ্ডিত-বিহারের অধিবাসী। নাড়োপাদ জয়পালের সমসাময়িক ছিলেন, বাড়ী ছিল বরেন্দ্রীতে, এবং প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জেতারির তিনি শিষ্য ছিলেন। নাড়োপাদ প্রথমে ছিলেন ফুল্লহরি-বিহারে; পরে বিক্রমশীল বিহারের অধিবাসী হন। ভসুকুর বাড়ী ছিল বিক্রমপুরে এবং তিনি ছিলেন অতীশ-দীপঙ্করের শিষ্য। লুইপাদও বোধ হয় বাঙালী ছিলেন, যদিও পাগ-সাম্-জোন-জাং-গ্রন্থে তাঁহাকে বলা হইয়াছে 'উড্ডিয়ান-বিনির্গত'। অবধূতপাদ অদ্বয়বজ্র সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। কুক্কুরিপাদ ছিলেন বাংলার এক ব্রাহ্মণ-পরিবার হইতে উদ্ভূত, পরে বৌদ্ধতন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ডাকিনীদের দেশ হইতে মহাযানতন্ত্র উদ্ধার করিয়া আনেন। শবরপাদ ছিলেন সরহপাদের শিষ্য; সিদ্ধপূর্বজীবনে তিনি ছিলেন বঙ্গাল-দেশের পার্বত্যভূমির একজন শবর। ত্যাঙ্গুরে অবশ্য শবরীপাদের বাড়ী যেন ইঙ্গিত করা হইয়াছে মগধে। এই সব সিদ্ধাচার্যদের এবং আরও অনেক বজ্রযান-সহজযান-কালচক্রযানপন্থী পণ্ডিতদের বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে; এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যকুল

বজ্রযান ও কালচক্রযানে ব্যবহারিক ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্ষীণ হইলেও শ্রাবকযান ও মহাযান বৌদ্ধধর্মের কিছু আভাস তবু বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ক্রমশ ধর্মের এই ব্যবহারিক অনুষ্ঠান কমিয়া আসিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে গুহ্য সাধনা বাড়িতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে গুহ্য সাধনাটাই প্রবল ও প্রধান হইয়া দেখা দিল। তাহার উপর, সহজযান আবার লৌকিক বা লোকোত্তর কোনো বুদ্ধকেই স্বীকার করিল না; প্রব্রজ্যা, বিনয়-শাসন, বজ্রযানের দেবদেবী প্রভৃতি সমস্ত কিছুই হইল নিন্দিত ও পরিত্যক্ত। রহিল শুধু কায়াসাধন এবং দেহাশ্রয়ী হঠযোগ। বাংলার ব্রাহ্মণ্য শক্তি-ধর্মেও অনুরূপ এক বিবর্তন ঘটিতেছিল, এবং সেখানেও ক্রমশ শক্তিধর্মের বাহ্য আচারানুষ্ঠান পরিত্যক্ত হইয়া সূক্ষ্ম

পরিণতি

মিথুনযোগের গুহ্য সাধনপন্থাই প্রধান হইয়া উঠিল। উভয় ক্ষেত্রেই অবস্থাটা যখন এক তখন বৌদ্ধ মহাসুখবাদ ও গুহ্য সাধন-পন্থার সঙ্গে শক্তি বা ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক মোক্ষ ও গুহ্য সাধন-পন্থার পার্থক্য আর বিশেষ কিছু রহিল না, দু'য়ের মিলনও খুব সহজ হইয়া উঠিল। এই মিলন পাল-পর্বের শেষের দিকেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং চতুর্দশ শতক নাগাদ পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম একেবারে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শক্তিধর্মের কুক্ষিগত হইয়া গেল।

তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ও শক্তি ধর্ম এবং নব বৌদ্ধ ধর্মের গুহ্য সাধনবাদের একত্র মিলনে শক্তিধর্মের যে সব নূতন রূপ দেখা দিল তাহার মধ্যে কৌলধর্মই প্রধান।

কৌলমার্গ

কৌলধর্মের কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থ কিছুদিন হইল নেপাল রাজকীয় গ্রন্থ-সংগ্রহে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কৌলধর্মীরা বলেন, তাঁহাদের ধর্মের মূল সূত্রগুলি গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের শিক্ষা হইতে পাওয়া। মৎস্যেন্দ্রনাথকে অনেকে চৌরাশি সিদ্ধাচার্যের অন্যতম লুইপাদের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কৌলধর্ম নব বৌদ্ধ গুহ্য সাধনবাদ হইতেই উদ্ভূত, এ-কথা অস্বীকার করা যায়না। তাহা ছাড়া, পূর্বেই দেখিয়াছি, কুল বৌদ্ধ গুহ্য সাধন-পন্থার একটি বিশেষ অঙ্গ; পঞ্চকুল প্রজ্ঞা বা শক্তির পাঁচটি রূপ, তাঁহাদের কর্তা হইতেছেন পঞ্চতথাগত। এই কুলতত্ত্ব যাঁহারা মানিয়া চলেন তাঁহারাই কৌল বা কুলপুত্র। কৌলমার্গীদের মতে কুল হইতেছেন শক্তি, কুলের বিপরীত অকুল হইতেছেন শিব, এবং দেহের অভ্যন্তরে যে শক্তি কুণ্ডলাকারে সুপ্ত তিনি হইতেছেন কুলকুণ্ডলিনী। এই কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া শিবের সঙ্গে পরিপূর্ণ এক করাই কৌলমার্গীর সাধনা।

কৌলমার্গীরা ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম স্বীকার করিতেন; কিন্তু একই গুহ্য সাধনবাদ হইতে উদ্ভূত নাথধর্ম, অবধূত ধর্ম ও সহজিয়া ধর্ম বৌদ্ধ সহজযানীদের মত বর্ণাশ্রমকে একেবারে অস্বীকার করিত। প্রথমোক্ত দুইটি ধর্ম ও সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পাল-পর্বেই জানা যায়; সহজিয়া ধর্মের প্রথম সংবাদ পাওয়া যাইতেছে ত্রয়োদশ শতকে রাজা হরিকাল দেবের একটি লিপিতে। হরিকালদেবের এক প্রধান রাজপুরুষ পট্টিকেরক নগরে সহজ-ধর্মকর্মে লিপ্ত ছিলেন। এই সব ধর্ম ও সম্প্রদায় কখন কি ভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল আজ তাহা বলা কঠিন; সূচনায় এই সব মতবাদের মধ্যে পার্থক্যও কিছু ছিলনা। তবে মনে হয়, দ্বাদশ শতকের মধ্যেই নিজস্ব মতামত ধ্যান-ধারণা লইয়া প্রত্যেকটি ধর্ম ও সম্প্রদায় নিজস্ব সীমারেখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল।

নাথধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। কৌলমার্গীরাও মৎস্যেন্দ্রনাথকে গুরু বলিয়া মানিতেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ ও লুইপাদ যদি এক এবং অভিন্ন হন তাহা হইলে নাথধর্মও সিদ্ধাচার্যদেরই প্রবর্তিত ধর্মের অন্যতম। নাথধর্মীদের গুরুদের মধ্যে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, জালন্ধরীপাদ প্রভৃতি নাথযোগীরা প্রসিদ্ধ। ত্যাঙ্গুর-গ্রন্থ অনুযায়ী মীননাথ ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথের পিতা। তাঁহার অন্য নাম বজ্রপাদ ও অচিন্ত্য। মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন

চন্দ্রদ্বীপের একজন ধীবর। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে পাঁচখানি নেপালে পাওয়া গিয়াছে; তাহারই একখানির নাম কৌলজ্ঞাননির্ণয়। এই গ্রন্থের মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধ বা সিদ্ধামৃত সম্প্রদায়ভুক্ত। মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ ছিলেন ময়নামতীর রাজা গোপীচন্দ্রের (বা বঙ্গাল-দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের) সমসাময়িক। গোপীচাঁদ বা গোপীচন্দ্রের মাতা সিদ্ধ গোরক্ষনাথের শিষ্যা মদনাবতী বা ময়নামতীর যোগশক্তি সম্বন্ধে নানা কাহিনী আজও বাংলাদেশে প্রচলিত। ত্যাঙ্গুরে জালন্ধরীপাদকে বলা হইয়াছে আদিনাথ। এই জালন্ধরীপাদই বোধ হয় রাজা গোপীচাঁদের গুরু হাড়িপা বা হাড়িপাদ; হাড়িপাদ ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্য। নাথপন্থা যে সূচনায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, এ-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। বস্তুত, কোনো কোনো সিদ্ধাচার্যকে নাথপন্থীরা নিজেদের আচার্য বলিয়া স্বীকার করিতেন। নানাপ্রকার যোগে, বিশেষ ভাবে হঠযোগে নাথপন্থীদের প্রসিদ্ধি ছিল। মানুষের যত দুঃখ শোক তাহার হেতু এই অপক্ক দেহ; যোগরূপ অগ্নিদ্বারা এই দেহকে পক্ক করিয়া সিদ্ধদেহ বা দিব্যদেহের অধিকারী হইয়া সিদ্ধি বা শিবত্ব বা অমরত্ব লাভ করাই নাথপন্থার উদ্দেশ্য। উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গে নাথপন্থীদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট; ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক শক্তিধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে নাথধর্ম ও সম্প্রদায় টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই। ক্রমশ ব্রাহ্মণ-সমাজের নিম্নস্তরে কোনো রকমে তাঁহারা নিজের স্থান করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নাথ-যোগীদের জাত্ হইল 'যুগী' (!), বৃত্তি হইল কাপড় বোনা এবং নাথপন্থার শেষ চিহ্ন বাঁচিয়া রহিল শুধু নামের পদবীতে বা অন্ত্যনামে!

নাথধর্ম

অবধূত-মার্গীদের সাধনপন্থাও সিদ্ধাচার্যদের গুহ্য সাধনা হইতে উদ্ভূত। যে তিনটি প্রধান নাড়ীর উপর সিদ্ধাচার্যদের যোগ-সাধন প্রক্রিয়ার নির্ভর, তাহার প্রধানতমটির নাম অবধূতী, এ-কথা আগেই বলিয়াছি। অবধূত-যোগ এই অবধূতী নাড়ীর গতি-প্রকৃতির সম্যক জ্ঞানের উপর নির্ভর করিত। অবধূত-মার্গীরা সকলেই কঠোর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতেন; এ-বিষয়েও প্রাচীনতর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সন্ন্যাসাদর্শের সঙ্গে ইঁহাদের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুদের যে সব ধূতাঙ্গ আচরণ করিবার কথা অবধূতরাও তাহাই করিতেন। এই ধূত বা ধূতাঙ্গ আচরণের জন্যও হয়তো তাঁহাদের নামকরণ হইয়াছিল অবধূত। লোকালয় হইতে দূরে বনের মধ্যে গাছের নীচে তাঁহারা বাস করিতেন, ভিক্ষান্নে জীবন-ধারণ করিতেন, জীর্ণ চীবর পরিধান করিতেন। জৈনদের ধূতাচরণের তালিকাও ঠিক এইরূপ; দেবদত্ত ও আজীবিক সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাহাই করিতেন। বহু শতাব্দী পর অবধূত-মার্গীরা আবার এই সব ধূতসাধন পুনঃপ্রবর্তিত করেন। তাঁহারা বর্ণাশ্রম স্বীকার করিতেন না, শাস্ত্র, তীর্থ, কিছুই মানিতেন না। কোনো বস্তুতেই তাঁহাদের কোনো আসক্তি ছিল না; উন্মাদের মত ছিল তাঁহাদের আচরণ। প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য অদ্বয়বজ্রের আর এক নাম ছিল অবধূতী-পাদ; নিঃসংশয়ে

অবধূত-মার্গ

তিনি অবধূত-মার্গী ছিলেন। চৈতন্য-সহচর নিত্যানন্দও ছিলেন অবধূত; চৈতন্য-ভাগবতে অবধূতদের জীবনাচরণের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে।

সহজিয়া ধর্ম

সহজযানের কথা আগে বলিয়াছি। বলা বাহুল্য, পরবর্তী বাংলার সহজিয়া-ধর্ম সিদ্ধাচার্যদের সহজযান হইতেই উদ্ভূত। মধ্যযুগীয় বাংলার সহজিয়া ধর্মের আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক হইতেছেন বড়ু চণ্ডীদাস। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বৌদ্ধ সহজযানের মূলসূত্রগুলি ধরিতে পারা কঠিন নয়।

বাউল-মার্গ

প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় মনে করেন, বাংলার বাউলরা নাথধর্মী বা অবধূতমার্গী বা সহজিয়াদের চেয়ে অনেক বেশি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধ্যান-কল্পনা ও সাধনপন্থা বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। নাথধর্ম বিলুপ্ত, অবধূতবাদও তাই; বৈষ্ণব ধর্ম ও চিন্তার প্রভাবে পড়িয়া সহজিয়াদের ধ্যান-কল্পনা অনেক গিয়াছে বদলাইয়া; কিন্তু বাউলরা কাহারও প্রভাবে পড়েন নাই, কিংবা শাক্ত প্রকৃতি-পুরুষ কল্পনা বা বৈষ্ণব কৃষ্ণ-রাধা কল্পনা তাঁহাদের নিকট কোনো অর্থই বহন করে না। অথচ, বজ্রযানী-সহজযানীদের নাড়ী, শক্তি প্রভৃতি বাউল ধর্মে অপরিহার্য। সহজযানীদের মত সহজসুখ মহাসুখ ইঁহাদেরও উদ্দেশ্য।

বৌদ্ধ দেবদেবী

বজ্রযানের দেবদেবীর আয়তন বহু বিস্তৃত, এ-কথা আগেই বলিয়াছি। নবম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাঙালী সিদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা যে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার স্বল্পমাত্র অংশই আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাঁহারা বহু দেবদেবীর স্তুতি ও অর্চনা করিয়া এই সব গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বজ্রসত্ত্ব, হেবজ্র, হেরুক, মহামায়া, ত্রৈলোক্যবশংকর, নীলাম্বরধর-বজ্রপাণি, যমারি, কৃষ্ণযমারি, জম্ভল, হয়গ্রীব, সম্বর, চক্রসম্বর, চক্রেশ্বরালী কালি, মহামায়া, বজ্রযোগিনী, সিদ্ধবজ্রযোগিনী, কুরুকুল্লা, বজ্রভৈরব, বজ্রধর, হেবজ্রোদ্ভব কুরুকুল্লা, সিতাতপত্রা-অপরাজিতা, উষ্ণীষ-বিজয়া প্রভৃতিরাই প্রধান। উল্লিখিত সকল দেবদেবীর মূর্তিপ্রমাণ যেমন বাংলাদেশে পাওয়া যায় নাই তেমনই আবার এমন অনেক বজ্রযানী দেবদেবীর প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে যাঁহাদের উল্লেখ এই সব গ্রন্থে দেখিতেছি না। যাহাই হউক যথার্থ বজ্রযানী দেবদেবীদের কথা বলিবার আগে মহাযানী ও সাধারণভাবে বুদ্ধযানী দুই চারিটি মূর্তি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাদের কথা বলিয়া লই।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বের বিহারৈলে (রাজসাহী) প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি এবং মহাস্থানের বলাইধাপ-স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত মঞ্জুশ্রী মূর্তির কথা আগেই বলিয়াছি।

এই পর্বের প্রায় সব বৌদ্ধ-প্রতিমাই মহাযান-বজ্রযান তন্ত্রের, সন্দেহ নাই; তবে সাধারণ বুদ্ধযানী প্রতিমাও কয়েকটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ধরনের প্রতিমার কেন্দ্রে অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া শাক্যসিংহ বা বোধিসত্ত্ব গৌতম বা বুদ্ধ ভূমিস্পর্শ বা ধ্যান বা ধর্মচক্র-প্রবর্তন মুদ্রায় উপবিষ্ট; এবং তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বুদ্ধায়নের (অর্থাৎ বুদ্ধের

জীবনের) প্রধান প্রধান কয়েকটি কাহিনীর প্রতিকৃতি রূপায়িত। খুলনা জেলার শিববাটি গ্রামে ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবিষ্ট একটি বুদ্ধমূর্তি আজো শিবের নামে পূজা পাইতেছেন। ভূমিস্পর্শ-মুদ্রা বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুমের নীচে বজ্রাসনে বসিয়া ধ্যানরত বুদ্ধের উপর মার-সৈন্যের আক্রমণ, বুদ্ধদেব কর্তৃক পৃথিবী মাতাকে সাক্ষীরূপে আহ্বান এবং বোধিলাভের দ্যোতক। বোধিলাভের এই ঘটনাটি ছাড়া মূর্তিটির প্রভাবলীর উপর সিদ্ধার্থ-বোধিসত্ত্বের জন্ম, ধর্মচক্রমুদ্রায় ধর্মচক্র-প্রবর্তন, মহাপরিনির্বাণ, রাজগৃহে অভয়মুদ্রায় নালগিরি বা রত্নপাল নামীয় হস্তীর বশীকরণ, শাংকাস্য নামক স্থানে বরদ-মুদ্রায় ত্রয়স্ত্রিংশ-স্বর্গ হইতে অবতরণ, ব্যাখান-মুদ্রায় শ্রাবস্তীতে অলৌকিক সংঘটন, এবং বৈশালীতে বানর কর্তৃক মধু অর্ঘ্যদান, এই সাতটি ঘটনার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। এই ধরনের বুদ্ধায়ন-স্তবক সম্বলিত প্রতিমা বাংলাদেশে আর পাওয়া যায় নাই। সপ্তোক্ত কাহিনী গুলি ছাড়া আরও কয়েকটি কাহিনীর স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন প্রতিকৃতি সম্বলিত বুদ্ধায়নী প্রতিমাও বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু প্রাচীন বাংলায় এই ধরনের মূর্তির প্রচলন খুব বেশি ছিল বলিয়া মনে হয় না। যতগুলি বুদ্ধমূর্তি বাংলায় পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে অভয়, ব্যাখ্যান, ভূমিস্পর্শ ও ধর্মচক্র-মুদ্রায় উপবিষ্ট প্রতিমাই বেশি। ফরিদপুর জেলার উজানী গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা) একাদশ শতকীয় একটি ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধপ্রতিমার পাদপীঠে বজ্র ও সপ্তরত্ন উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় ; এই দুইটি লক্ষণই যেন গভীর অর্থবহ।

মহাযানী দেবায়তন আদিবুদ্ধ ও তাঁহার শক্তি (?) আদিপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতার ধ্যান-কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ এবং অমোঘসিদ্ধি এই পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধ বা পঞ্চ তথাগত এবং ষষ্ঠ আর একটি দেবতা বজ্রসত্ত্ব এই আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত। ধ্যানীবুদ্ধরা সকলেই যোগরত ; কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক এক জন সক্রিয় বোধিসত্ত্ব এবং এক একজন মানুষীবুদ্ধ বিরাজমান। মহাযানীদের মতে, বর্তমান কাল ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের কাল ; তাঁহার বোধিসত্ত্ব হইতেছেন অবলোকিতেশ্বর-লোকনাথ এবং মানুষীবুদ্ধ হইতেছেন বুদ্ধ গৌতম। অবলোকিতেশ্বর ছাড়া মহাযান দেবায়তনে পঞ্চ বোধিসত্ত্বের মধ্যে আরও দুইটি বোধিসত্ত্বের—মঞ্জুশ্রী এবং মৈত্রেয়ের—প্রতিপত্তি প্রবল। তাঁহাদের প্রত্যেকের এক একটি শক্তি ; এই শক্তিময়ীরা সকলেই তারা নামে খ্যাতা এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি। বোধিসত্ত্বদের সম্বন্ধেও একই উক্তি প্রযোজ্য। বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন তাঁহাদের নাম।

ধ্যানীবুদ্ধদের দুই একটি মূর্তি বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল বিক্রমপুরে, এখন তাহা রাজসাহী-চিত্রশালায়। ঢাকা জেলার সুখবাসপুর গ্রামে একটি লিপি-উৎকীর্ণ দশম-শতকীয় বজ্রধারী বজ্রসত্ত্ব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দুইটি প্রতিমাই উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ধ্যানীবুদ্ধের প্রতিমা খুব সহজলভ্য নয়। আদিবুদ্ধের কোনো প্রতিমাও এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, কিন্তু দুই একটি প্রতিমা

পাওয়া গিয়াছে যাহাদের আদিপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতার প্রতিমা বলা যাইতে পারে; একটি ঢাকা-চিত্রশালায় ও আর একটি রাজসাহী-চিত্রশালায় রক্ষিত। ধর্মশ্রীপাল নামক এক ভিক্ষু বনবাসী (কর্ণাট-দেশ) হইতে উত্তর-বঙ্গে আসিয়া একটি প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ; এই মূর্তিটি এখন কলিকাতা-চিত্রশালায়।

বাংলাদেশে যত মহাযানী-বজ্রযানী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে নানা রূপের অবলোকিতেশ্বর-লোকনাথের প্রতিমাই সবচেয়ে বেশি। প্রতিমা-প্রমাণ হইতে মনে হয়, বৌদ্ধ বাঙালীর তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রিয় দেবতা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের এবং সূর্যের রূপ ও গুণ লইয়া বৌদ্ধ অবলোকিতেশ্বর-লোকনাথ, এবং তাঁহার বিচিত্র রূপ ও গুণাবলী লইয়া অসংখ্য, বিচিত্র তাঁহার প্রতিমারূপ। কিন্তু বাংলাদেশে তাঁহার যত রূপ দেখিতেছি তাহার মধ্যে পদ্মপাণি, সিংহনাদ, ষড়ক্ষরী ও খসর্পণ রূপই প্রধান। আসন ও স্থানক দুই রকমের পদ্মপাণি-মূর্তিই গোচর। চট্টগ্রামের একটি লিপিযুক্ত ধাতব আসন-পদ্মপাণি প্রতিমা, পাহাড়পুর-মন্দিরের একাধিক প্রতিমা, বোষ্টন-চিত্রশালার ললিতাসনোপবিষ্ট একটি প্রতিমা, রাজসাহী-চিত্রশালার তিন-চারিটি প্রতিমা, এবং কলিকাতা-আলিপুরে প্রাপ্ত একটি প্রতিমা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কুষ্ঠব্যাধির আরোগ্যকর্তা সিংহনাদ-লোকেশ্বরের দুইটি মূর্তি আছে রাজসাহী চিত্রশালায় ; একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল বীরভূম জেলায় ; ঢাকা এবং কলিকাতা চিত্রশালায়ও দুই একটী করিয়া সিংহনাদ-আলোকিতেশ্বরের প্রতিমা বিদ্যমান। খসর্পণ-লোকনাথের আনুমানিক একাদশ শতকীয়, সবচেয়ে সুন্দর একটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে ঢাকা জেলার মহাকালী গ্রামে। সপ্তরথ পাদপীঠের উপর ললিতাসনোপবিষ্ট সনালপদ্মধৃত সপরিবার এই দেব-প্রতিমাটি পাল-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ঢাকা, ত্রিপুরা ও রাজসাহী অঞ্চল হইতে এই দেবতার আরও কয়েকটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। খসর্পণ-লোকনাথের আদি রূপ-কল্পনা না হোক্, অন্তত খসর্পণ-লোকনাথ এই নামকরণটি বোধ হয় হইয়াছিল দক্ষিণ-বঙ্গে, চব্বিশ-পরগণা জেলার খসর্পণ নামক স্থান হইতে; অথবা এমন হইতে পারে যে, খসর্পণ-লোকনাথের পূজার সমধিক প্রচলন এই স্থানে ছিল বলিয়াই স্থানটির নাম হইয়াছিল খসর্পণ। মালদহ জেলার রাণীপুর গ্রামে একটি একাদশ শতকীয় ষড়ক্ষরী-লোকশ্বরের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এ-ধরনের মূর্তি অত্যন্ত বিরল। রাজসাহী-চিত্রশালায় আর একটি বিরলরূপ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি রক্ষিত আছে ; মূর্তিতাত্ত্বিকেরা মনে করেন এই রূপটি সুগতিসন্দর্শনরূপী অবলোকিতেশ্বরের। দ্বাদশভুজ লোকনাথ-অবলোকিতেশ্বরের আসন ও স্থানক উভয় রূপের প্রতিমার একাধিক দৃষ্টান্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও রাজসাহী চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ঘিয়াসবাদে প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিত্রশালা) একটি প্রতিমা, রাজসাহী-চিত্রশালায় রক্ষিত একটি প্রতিমা এবং ঢাকা-জেলার সোনারঙ্গে প্রাপ্ত আর একটি প্রতিমা এই অবলোকিতেশ্বর-প্রসঙ্গে আলোচ্য। ঘিয়াসবাদের মূর্তিটি

বিস্তৃত এক সর্পফণাছত্রের নীচে সমপদস্থানক ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান এবং তাঁহার দ্বাদশ হস্তের সাতটিতে গরুড়, মূষিক, লাঙ্গল, শঙ্খ, পুস্তক, বৃষ এবং পাত্র লক্ষণ এবং ইহাদের প্রত্যেকটিই সনাল নীলোৎপলের উপর স্থাপিত; মূর্তিটির কণ্ঠে জানু পর্যন্ত লম্বিত বৈজয়ন্তী বা বনমালা। অন্য দুইটি হাত বিষ্ণুর আয়ুধপুরুষের মত দুইটি মূর্তির উপর স্থাপিত। রাজসাহী-চিত্রশালার মূর্তিটি প্রায় অবিকল এইরূপ, অধিকন্তু ইহার পাদপীঠে অবলোকিতেশ্বরের অনুচর প্রেত সূচীমুখের মূর্তি উৎকীর্ণ। সোনারঙ্গে প্রাপ্ত মূর্তিটিও একই লক্ষণযুক্ত এবং একই প্রকারের; এ-ক্ষেত্রে প্রভাবলীর উপরের অংশটি অক্ষত থাকায় সেখানে দেখিতেছি বোধিসত্ত্ব অমিতাভের মূর্তি উৎকীর্ণ। সন্দেহ নাই যে, এই তিনটি প্রতিমাই অবলোকিতেশ্বরের বিশিষ্ট এক রূপ, এবং দিনাজপুর জেলার সাগরদীঘি গ্রামে প্রাপ্ত ছয়হাতযুক্ত একটি মূর্তিও (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চিত্রশালা) তাহাই। সঙ্গে সঙ্গে এ-তথ্যও অনস্বীকার্য যে, এই প্রত্যেকটি মূর্তিতেই ব্রাহ্মণ্য দেবতা বিষ্ণুর ধ্যান-কল্পনাও সক্রিয়; কয়েকটি লক্ষণই স্থানক বিষ্ণুমূর্তির লক্ষণ। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, এই প্রতিমাগুলিতে ভাগবত বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গে মহাযানী লোকেশ্বরের ধ্যান-কল্পনার একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে।

অবলোকিতেশ্বরের পরই যে-বোধিসত্ত্ব বাঙালীর প্রিয় ছিলেন তিনি ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের অধ্যাত্মপুত্র, জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভার দেবতা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী। মঞ্জুশ্রীরও বিচিত্র রূপ। তাঁহার মঞ্জুবর-রূপের গর্জমান সিংহের উপর ললিতাসনোপবিষ্ট কয়েকটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে; তাহাদের মধ্যে রাজসাহী-চিত্রশালার একটি প্রতিমা অতি সুদর্শন। নাগধৃতপদ্মের উপর বজ্রপর্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট অরপচন-মঞ্জুশ্রীর একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে ঢাকা জেলার জালকুণ্ডি গ্রামে (ঢাকা-চিত্রশালা)। মালদহ জেলায় প্রাপ্ত, অধুনা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-চিত্রশালায় রক্ষিত স্থিরচক্র-মঞ্জুশ্রীর একটি মূর্তিও উল্লেখযোগ্য। যে কোনো রূপের মঞ্জুশ্রী-প্রতিমায় প্রধান লক্ষণ হস্তধৃত পুস্তক ও তরবারী। শক্তি ও বৃষ্টির দেবতা বজ্রপাণির মূর্তি বাংলাদেশে বড় একটা পাওয়া যায় নাই; ত্রিপুরা জেলার শুভপুরে প্রাপ্ত মাত্র একটি মূর্তি-প্রমাণ বিদ্যমান। বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের মূর্তি পাওয়া যায় নাই বলিলেই চলে।

মহাযান-বজ্রযানের আরও যে কয়েকটি নিম্নস্তরের দেবতা বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে জাম্ভল, হেরুক ও হেবজ্রই প্রধান। জাম্ভল ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের সঙ্গে যুক্ত, হেরুক অক্ষোভ্য হইতে উদ্ভূত এবং হেবজ্র স্পষ্টতই তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবতা। জম্ভল ব্রাহ্মণ্য কুবেরের বৌদ্ধ প্রতিরূপ এবং তাঁহার প্রতিমা বাংলা দেশের, বিশেষত পূর্ব ও উত্তর-বাংলার নানা জায়গা হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধন ও ঐশ্বর্যের এই দেবতা যে জনসাধারণের খুব প্রিয় ছিলেন; অসংখ্য মূর্তি-প্রমাণেই তাহা স্পষ্ট। জম্ভলের দক্ষিণ হস্তে বীজপূরক, বাম হস্তে ধনরত্ন উদ্গীরণরত একটি নকুলের গ্রীবাদেশ। জম্ভলের তুলনায় হেরুকের মূর্তি কিন্তু কমই পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপুরা জেলার বড়কামতায়

প্রাপ্ত, মুণ্ডমালা-পরিহিত, বজ্রকপালধৃত নৃত্যপরায়ণ হেরুক মূর্তিটি সুপরিচিত। উত্তর-বাংলায় প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিত্রশালা) একটি হেরুক মূর্তির বিচিত্র লক্ষণ হইতে মূর্তি-তাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন, মূর্তিটি সম্বররূপী হেরুক। শক্তির দৃঢ়ালিঙ্গনবদ্ধ হেবজ্রের মূর্তি একাধিক পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি মূর্তি এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রাপ্ত আর একটি মূর্তি এই ধরনের হেবজ্রের সুন্দর নিদর্শন। শক্তি-বিরহিত হেবজ্রের একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে। বজ্রযানী কৃষ্ণ-যমারীর একটী প্রতিমা রাজসাহী-চিত্রশালায় (বিক্রমপুরে প্রাপ্ত) রক্ষিত। ত্রিমুখ, চতুর্ভুজ, করালদর্শন ত্রৈলোক্যবশংকরের অন্তত একটি মূর্তি বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে ঢাকা জেলার পশ্চিমপাড়া গ্রামে (রাজসাহী-চিত্রশালায়)। মূর্তিটি দেখিলে স্বতই মনে হয়, বৌদ্ধ ত্রৈলোক্যবশংকর এবং ব্রাহ্মণ্য ভৈরব একই ধ্যান-কল্পনার সৃষ্টি।

দেবতাদের কথা শেষ হইল; এইবার মহাযান-বজ্রযান আয়তনের দেবীদের কথা বলা যাইতে পারে। এই দেবীদের মধ্যে তারা সর্বশ্রেষ্ঠা। তারার অনেক রূপভেদ; বিভিন্নরূপ বিভিন্ন ধ্যানীবুদ্ধ হইতে উৎপন্ন। বাংলাদেশে যত প্রকারের তারামূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে খদিরবনী-তারা (খয়ের বনের তারা ?), বজ্র-তারা এবং ভৃকুটী-তারাই প্রধান। খদিরবনী-তারার অপর নাম শ্যাম-তারা; তাঁহার ধ্যানীবুদ্ধ হইতেছেন অমোঘসিদ্ধি; বজ্র-তারার ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভব এবং ভৃকুটী-তারার অমিতাভ। অশোককান্তা (মারীচী) ও একজটাসহ খদিরবনী বা শ্যাম-তারার মূর্তিই সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়াছে। নীলোৎপলধৃতা এই দেবী কখনও উপবিষ্টা, কখনও দণ্ডায়মানা। ঢাকা জেলার সোমপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা) একটি মূর্তি, বগুড়া জেলার গুর্ণাগ্রামে প্রাপ্ত অপর একটি মূর্তি (রাজসাহী-চিত্রশালা) এবং ঢাকা-চিত্রশালার আরও একটি শ্যামতারা-প্রতিমা এই ধরনের প্রতিমার নিদর্শন। ফরিদপুর জেলার মাঝবাড়ী গ্রামে একটি ধাতব বজ্র-তারার মূর্তি পাওয়া গিয়াছে (ঢাকা-চিত্রশালা)। ঢাকা জেলার ভবানীপুর গ্রামে ত্রি-শির, অষ্টহস্ত, বীরাসনোপবিষ্ট, পাদপীঠে গণেশের মূর্তি উৎকীর্ণ এবং মৌলিতে অমিতাভ মূর্তিযুক্ত একটি দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ভট্টশালী-মহাশয় বলিয়াছেন, প্রতিমাটি ভৃকুটী-তারার। কিন্তু এই প্রতিমাটির সঙ্গে ঢাকা-চিত্রশালার আর একটি প্রতিমার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এবং জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, শেষোক্ত প্রতিমাটি পঞ্চরক্ষামণ্ডলভুক্ত দেবী মহাপ্রতিসরার। প্রথমোক্ত প্রতিমাটির বাম দিকে ঝাঁটা ও কুলা হস্তে যে দেবীটি দাঁড়াইয়া আছেন তিনি তো একটি গ্রাম্য দেবী—বোধ হয় শীতলা—বলিয়াই মনে হইতেছেন। ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা) একটি অষ্টভুজা বজ্রযানী দেবী-প্রতিমাকে সিতাতপত্রা বা সিততারা বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অষ্টভুজা সিতাতপত্রার একটি ধাতব মূর্তি ঢাকা-চিত্রশালায়ও আছে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি মাটীর ফলকে উৎকীর্ণ অষ্টভুজা একটি তারা-প্রতিমা, বগুড়ায় প্রাপ্ত (রাজসাহী-

চিত্রশালা) একটি ধাতব তারা-প্রতিমা (সপ্তম-অষ্টম শতক), এবং দিনাজপুর জেলার অগ্রদিগুণে প্রাপ্ত (আশুতোষ-চিত্রশালা) একাদশ-শতকীয় আর একটি প্রতিমা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বজ্রযানী অন্যান্য দেবী মূর্তির মধ্যে মারীচী, পর্ণশবরী, হারীতী এবং চুণ্ডাই প্রধান। ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচন-সম্ভূত মারীচীর কয়েকটি প্রতিমা বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। ত্রিমুখ (বাম মুখ শূকরীর), সপ্তশূকরবাহিত এবং রাহুসারথি, রথে প্রত্যালীঢ়ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা এই দেবীটি ব্রাহ্মণ্য সূর্যেরই বৌদ্ধ প্রতিরূপ। ফরিদপুরের উজানী গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা) মারীচী প্রতিমাটি এই ধরনের মূর্তি এবং পালোত্তরপর্বের ভাস্কর শিল্পের সুন্দর নিদর্শন। পর্ণশবরী তারার অন্যতম অনুচর। ইহার কথা অধ্যায়ারম্ভে বিশদভাবে বলিয়াছি। পর্ণশবরীর ধ্যানীবুদ্ধ বোধ হয় অমোঘসিদ্ধি। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে দুইটি ত্রি-শির, ষড়ভূজা, পর্ণাচ্ছাদন-পরিহিতা পর্ণশবরী প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। ধ্যানে তাঁহাকে বলা হইয়াছে 'পিশাচী'। রাজসাহী জেলার নিয়ামৎপুরে অষ্টাদশভুজা চুণ্ডা দেবীর একটি নবম-শতকীয় প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে (রাজসাহী-চিত্রশালা)। ত্রিপুরা জেলার পট্টিকেরক রাজ্যে চুণ্ডাবর-ভবনে একটি ষোড়শভুজা চুণ্ডাদেবী প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। বজ্রযানী দেবী উষ্ণীষ-বিজয়ার একটি ভগ্ন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বীরভূম জেলায়। হারীতী জম্ভলের শক্তি; তিনি ধনৈশ্বর্যের দেবী এবং ব্রাহ্মণ্য ষষ্ঠীর বৌদ্ধ প্রতিরূপ। ঢাকা ও রাজসাহী-চিত্রশালায় চার পাঁচটি হারীতীর প্রতিমা রক্ষিত আছে।

এই সব অসংখ্য মহাযানী দেবদেবীদের পূজার্চনার জন্য মন্দিরও অবশ্যই অসংখ্য রচিত হইয়াছিল বাংলার নানা জায়গায়। বিভিন্ন বিহারগুলির সঙ্গে সঙ্গেও মন্দির নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু বাংলার কোন্ প্রান্তে কোথায় কোন্ দেবদেবীর মন্দির ছিল, কোথায় কে পূজা পাইতেন আজ আর তাহা বলিবার উপায় নাই। তবে একাদশ শতকের অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার একটি পাণ্ডুলিপিতে বাংলাদেশের কয়েকটি মহাযানী-বজ্রযানী বৌদ্ধ মন্দিরের এবং কোন্ মন্দিরে কাহার পূজা হইত তাহার একটু ইঙ্গিত আছে। তাহা হইতে বুঝা যায়, চন্দ্রদ্বীপে (নিম্নবঙ্গের খুলনা-বরিশাল অঞ্চল) ভগবতী-তারার একটি মন্দির, সমতটে লোকনাথের দুইটি এবং বুদ্ধর্ধি-তারার একটি, পট্টিকেরক রাজ্যে চুণ্ডাবর-ভবনে চুণ্ডা-দেবীর একটি, এবং হরিকেলদেশে লোকনাথের একটি মন্দির ছিল।

এ-পর্যন্ত যত মূর্তি ও মন্দির ইত্যাদির কথা বলিলাম সে-গুলির প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, উত্তর ও পূর্ব-বাংলা (গঙ্গার পূর্বতীর হইতে), বিশেষভাবে রাজসাহী-দিনাজপুর-বগুড়া জেলায় এবং ফরিদপুর-ঢাকা-ত্রিপুরা জেলায় যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বাংলার অন্যত্র কোথাও তেমন নয়। গঙ্গার পশ্চিম তীরে বজ্রযানী-তন্ত্রের প্রতিমা পাওয়া প্রায় যায় নাই বলিলেই চলে, এক বাঁকুড়া-বীরভূমের কিয়দংশ ছাড়া। মনে হয়, মহাযান-বজ্রযান তন্ত্রের প্রসার ও প্রতিপত্তি উত্তর ও পূর্ব-বাংলায় যতটা ছিল ভাগীরথীর

পশ্চিমে ততটা ছিলনা, দক্ষিণ-রাঢ়ে তো নয়ই। প্রায় দশম শতক হইতেই নালন্দার প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধি হ্রাস পাইতে থাকে এবং বিক্রমশীল-সোমপুর প্রভৃতি তাহার স্থান অধিকার করে। বিক্রমশীল-বিহার এবং ফুল্লহরি-বিহার বাংলাদেশে না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু সোমপুর, জগদ্দল এবং দেবীকোট-বিহার ছিল নিঃসংশয়ে উত্তর-বঙ্গে; পণ্ডিত-বিহার, পট্টিকেরক-বিহার ও বিক্রমপুরী-বিহার নিঃসংশয়ে পূর্ব-বঙ্গে। রাঢ়দেশের একটি মাত্র বিহারের নাম পাইতেছি ত্রৈকূটক বিহার, কিন্তু তাহাও নিঃসংশয়ে রাঢ়দেশে কিনা বলা যায়না। সিদ্ধাচার্যদের জন্মস্থান ও আদি পরিবেশ বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায়, তাঁহারা অধিকাংশই উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের লোক। অথচ, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ-রাঢ়ে সর্বত্রই ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রতিমা মিলিতেছে প্রচুর। মনে হয়, এক বাঁকুড়া-বীরভূমের কিয়দংশ ছাড়া রাঢ়ের অন্যত্র বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি তেমন ছিল না। এই তথ্য সমসাময়িক ও মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিক হইতে গভীর অর্থবহ। ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, বাঁকুড়া-বীরভূমের যে-অংশে মহাযান-বজ্রযান সক্রিয় সেই অংশেই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সহজিয়া এবং তান্ত্রিক শক্তিধর্মের প্রসার, প্রভাব ও প্রতিপত্তি।

লিপি-প্রমাণ ও শৈলী-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বৌদ্ধ প্রতিমাগুলির তারিখ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, পাল-পূর্ব যুগের বৌদ্ধ মূর্তি খুব বেশি পাওয়া যায় নাই; যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই—দুই চারিটি বিক্ষিপ্ত মূর্তি ছাড়া—মোটামুটি নবম হইতে একাদশ শতকের, এবং এই তিনশত বৎসরই বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের স্বর্ণযুগ। কিন্তু সংখ্যায় ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রতিমার সঙ্গে বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রতিমার সংখ্যার তুলনাই চলিতে পারেনা, এবং এই ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মধ্যে আবার বিষ্ণু ও সৌর দেবায়তনের মূর্তিই বেশি। মহাযানী-বজ্রযানী দেবদেবীর যে-পরিচয় মূর্তি-প্রমাণের সাহায্যে পাওয়া যায় সে-তুলনায় সমসাময়িক সিদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থমালায় উল্লিখিত দেবদেবীর পরিচয় অনেক বেশি বিস্তৃত। এমন অনেক দেবদেবীর পরিচয় সেখানে পাওয়া যায় যাঁহাদের একটি প্রতিমা-প্রমাণও বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহার কারণ হয়তো এই যে, বজ্রযানীদের সাধনপন্থা ছিল গুহ্য এবং সেই গুহ্যসাধনার ধ্যান-কল্পনায় যে মূর্তি-মণ্ডল রচিত হইত তাঁহাদের সকলেরই মূর্তিরূপ প্রতিমায় রূপায়িত করা প্রয়োজন হইত না।

এইমাত্র বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সংখ্যা ছিল এই পর্বে বৌদ্ধ প্রতিমার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু ধর্মগত ধ্যান-কল্পনায় বোধ হয় মহাযানী-বজ্রযানী প্রভাবই ছিল অধিকতর সক্রিয়; এবং তাহার কারণ বোধ হয় মহাযান-বজ্রযানের সাধন-দর্শন। এই সাধন-দর্শন সমসাময়িক ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে—বৈষ্ণব ও শৈব উভয় ধর্মকেই—গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল।

য়ুয়ান্-চোয়াঙের পর বাংলায় জৈন বা নির্গ্রন্থ ধর্মের অবস্থা জানিবার ও বুঝিবার মত

কোনো গ্রন্থ-প্রমাণ বা লিপি-প্রমাণ উপস্থিত নাই। তবে গুপ্তোত্তর মূর্তি-প্রমাণ কিছু আছে, এবং তাহা সমস্তই পাল-পর্বের। য়ুয়ান্-চোয়াঙের পর হইতেই নিগ্রর্ন্থ ধর্ম যে বাংলাদেশে হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, এই জৈন-প্রতিমাগুলিই তাহার প্রমাণ। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এক সুন্দরবন অঞ্চল হইতেই প্রায় দশ-বারোটি জৈন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে; বাঁকুড়া-বীরভূম অঞ্চল হইতেও কিছু জৈন মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্তিগুলি সাধারণত ঋষভনাথ, আদিনাথ, নেমিনাথ, শান্তিনাথ, এবং পার্শ্বনাথের; পার্শ্বনাথের প্রতিমাই সকলের চেয়ে বেশি। মূর্তিগুলি প্রায় সমস্তই দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের। ইহাদের মধ্যে দিনাজপুর জেলার সুরহোর গ্রামে প্রাপ্ত ঋষভনাথের মূর্তিটি এই ধরনের মূর্তির প্রতিনিধি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। মূর্তিটি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট, বৃক্ষ-লাঞ্ছনটি বিদ্যমান এবং ২৪ জন জৈন তীর্থংকর ঋষভনাথকে শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য উপস্থিত। বসন্তবিলাস-গ্রন্থের দশম সর্গে দেখিতেছি, চালুক্যরাজ বীরধবলের মন্ত্রী বস্তুপাল (১২১৯-১২৩৩ খ্রী) যখন একবার জৈন তীর্থ-পরিক্রমায় বাহির হন তখন তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন লাট, গৌড়, মরু, ধারা, অবন্তি এবং বঙ্গের সংঘপতিগণ। মনে হয়, ত্রয়োদশ শতকেও গৌড়ে এবং বঙ্গে নিগ্রর্ন্থ সংঘের কিছু অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তবে, পাল-পর্বেই তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতেছিল; স্বল্পসংখ্যক মূর্তিই তাহার প্রমাণ।

জৈনধর্ম

মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের দীর্ঘ ও গভীর রূপান্তর বর্ণনা-প্রসঙ্গে সহজযান ধর্ম এবং মহাযানী সিদ্ধাচার্যদের মতামত কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে একটু বিশদতর ভাবে বলা প্রয়োজন, কারণ ইহাদের ধর্মগত ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির মানবিক আবেদনের সঙ্গে মধ্যযুগীয় বাংলা ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতির অন্তত একটি ধারার আত্মীয়তা অত্যন্ত গভীর। সেইজন্য পৃথকভাবে ইহাদের কথা আবার বলিতেছি।

একাদশ-দ্বাদশ শতকের সহজযানী সাহিত্যে, অর্থাৎ চর্যাগীতি ও দোহাকোষের অনেক গান ও শ্লোকে সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মমত ও পথ সম্বন্ধে খবরাখবর যেমন পাওয়া যায়, তেমনই সিদ্ধাচার্যদের স্বকীয় ধর্মমত সম্বন্ধে পাঠকের ধারণাও স্পষ্টতর হয়। আগেই বলিয়াছি, ইহারা বেদ-বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যে বেদ-আগমের কথা বলিয়াছেন তাহা শুধু বেদ বা আগম মাত্র নয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রামাণিক শাস্ত্র মাত্রই ইহাদের দৃষ্টিতে বেদ, আগম প্রভৃতি। বাংলা দেশে যে যথার্থ বেদচর্চা, বৈদিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি খুব বেশি প্রচলিত ছিল না সে-কথা খুব বিশদ ভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। সেন-বর্মণ আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার যখন খুব বেশি, তখনও হলায়ুধ, জীমূতবাহন প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা বেদচর্চার অবহেলা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন; সে-কথা পরে বলিবার সুযোগ হইবে, আগেও বলিয়াছি অন্য প্রসঙ্গে। তবু, উচ্চকোটির বর্ণ-হিন্দুরা বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান কিছু কিছু করাইতেন,

প্রাচীন বাংলার কায়াসাধন সহজযান

বেদপাঠ করাইতেন সন্দেহ নাই, এবং তাহা প্রধানত পশ্চিমাগত ক্রিয়াম্বিত ব্রাহ্মণদেরই সাহায্যে ও প্রেরণায়। ইঁহাদেরই লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধাচার্য সরহপাদ বলিয়াছেন,

বহ্মণো হি ম জানন্ত হি ভেউ।
এবই পড়িঅউ এ চ্চউ বেউ ॥
মট্টী [পাণী কুস লই পড়ন্ত
ঘরহিঁ [বইসী] অগ্‌গি হুণন্তঁ ॥
কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহ হোমেঁ।
অক্‌খি উহাবিঅ কুড়ুএঁ ধুমেঁ ॥

ব্রাহ্মণেরা তো যথার্থ ভেদ জানেনা ; চতুর্বেদ এই ভাবেই পড়া হয়। তাঁহারা মাটি, জল, কুশ লইয়া (মন্ত্র) পড়ে, ঘরে বসিয়া আগুনে আহুতি দেয় ; কার্যবিরহিত (অর্থাৎ ফলহীন) অগ্নিহোমের কটু ধোঁয়ায় চোখ শুধু পীড়িত হয়।

সরহপাদ অন্যত্র বলিতেছেন দণ্ডী সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে,

একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী ভঅবঁবেসেঁ।
বিণুআ হোই অই হংসউএসেঁ ॥
মিচ্ছেহিঁ জগে বাহিঅ ভুল্লে।
ধম্মাধম্ম ণ জানিঅ তুল্লে ॥

একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী প্রভৃতি ভগবানের বেশে (সকলেই) ঘুরিয়া বেড়ায় ; হংসের উপদেশে জ্ঞানী হয়। মিথ্যাই জগৎ ভুলে বহিয়া চলে ; তাহারা ধর্মাধর্ম তুল্যরূপেই জানেনা (অর্থাৎ, ধর্মাধর্মের মূল্য তাহাদের কাছে সমান)।

দোহাকোষে শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রাভিমানী এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবপূজক ব্রাহ্মণদের উল্লেখ সুপ্রচুর, কিন্তু সহজযানী সিদ্ধাচার্যেরা ইঁহাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন না।

জাহের বাণচিহ্ন রুব ণ জানী।
সে কোইসে আগম বেএঁ বখাণী ॥

যাঁহার বর্ণ, চিহ্ন ও রূপ কিছুই জানা যায়না, তাহা আগমে বেদে কিরূপে ব্যাখ্যাত হইবে ?

সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মের ভিতর থেরবাদী, মহাযানী, কালচক্রযানী ও বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম, দিগম্বর জৈনধর্ম, কাপালিকধর্ম, রসসিদ্ধ তথা নাথসিদ্ধ ধর্ম প্রভৃতির কিছু কিছু উল্লেখ চর্যাগীতি ও দোহাকোষে পাওয়া যায়। সহজযানীরা প্রাচীনতর থেরবাদ বা সমসাময়িক বাংলাদেশে সুপ্রচলিত মহাযান ও তদোদ্ভূত অন্যান্য বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও খুব শ্রদ্ধিত ছিলেন না, অন্যান্য ধর্মের প্রতি তো নয়ই। থেরবাদীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

চেল্লু ভিক্‌খু জে থবির-উএসেঁ।
বন্দেহিঅ পব্বজিউ বেসেঁ ॥
কোই সুত্তন্তবক্‌খাণ বইট্‌ঠো।
কোবি চিন্তে কর সোসই দিট্‌ঠো ॥

চেল্ল (চেলা বা সমণের, অর্থাৎ শিক্ষার্থী) এবং ভিক্ষু যাঁহারা স্থবির বা আচার্যের উপদেশে প্রব্রজ্যার বেশ বন্দনা করে (বা গ্রহণ করে) ; কেহ কেহ বসিয়া বসিয়া (শুধু) সূত্রান্ত ব্যাখ্যা করে ; কেহ কেহ বা দেখিয়া দেখিয়া সর্ব ধর্ম চিন্তা করে।

চর্যাগীতিতে মহাযানীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,

সঅল সমাহিঅ কাহি করি অই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরি অই ॥

সরল (ধ্যান) সমাধি দ্বারা কি করিবে? সুখ দুঃখের হাত হইতে তাহাতে মুক্তি পাওয়া যায় না।

মহাযানী-বজ্রযানী-কালচক্রযানী প্রভৃতিদের সম্বন্ধে দোহাকোষে আছে,

অন্ন তহি মহাআণহিঁ ধাবই।
তহিঁ সুত্তন্ত তকসথ হই ॥
কোই মণ্ডলচক্ক ভাবই।
অন্ন চউথতত্ত দীসই ॥

অন্যেরা ধাবিত হইতেছে মহাযানের দিকে, সেখানে আছে সূত্রান্ত ও তর্কশাস্ত্র। কেহ কেহ ভাবিতেছে মণ্ডল ও চক্র; দিশা দিতেছে চতুর্থ তত্ত্বে।

ছবির মতন বর্ণনা পড়িতেছি দোহাকোষে জৈন-সন্ন্যাসীদের; সরহপাদ বলিতেছেন:

দীহণক্‌খ জই মলিণেঁ বেসেঁ।
ণগ্‌গল হোই উপাড়িঅ কেসেঁ ॥
খবণেহি জাণ বিড়ংবিঅ বেসেঁ।
অপ্পণ বাহিঅ মোকখ উবেসেঁ ॥

দীর্ঘনখ যোগী মলিন বেশে নগ্ন হইয়া কেশ উপড়ায়। ক্ষপণকেরা (জৈন-সন্ন্যাসীরা) বিড়ম্বিত বেশে মোক্ষের উদ্দেশ্যে নিজদের বাহিয়া লইয়া চলে।

জই ণগ্‌গা বিঅ হোই মুত্তি তা সুণহ সিআলহ।
লোমুপাড়ণেঁ অথি সিদ্ধি তা জুবই নিতম্বহ ॥
পিচ্ছী গহণে দিঠ্‌ঠ মোক্‌খ [তা মোরহ চমরহ]।
উঞ্ছেঁ ভোঅণেঁ হোই জাণ তা করিহ তুরঙ্গহ ॥

নগ্ন হইলেই যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে কুকুর-শেয়ালেরও হইত; লোম উপড়াইলেই যদি সিদ্ধি আসিত তাহা হইলে যুবতীর নিতম্বেরও সিদ্ধিলাভ ঘটিত; পুচ্ছ গ্রহণেই যদি মোক্ষ দেখা যাইত, তাহা হইলে ময়ূর-চামরেরও মোক্ষ দেখা হইত; উচ্ছিষ্ট ভোজনে যদি জ্ঞান হইত, তাহা হইলে হাতি ঘোড়ারও হইত।

চর্যাগীতিতে সমসাময়িক কাপালিকদের কথাও আছে; ইহাদের সঙ্গে সহজযানী সিদ্ধাচার্যদের একটু আত্মিক যোগও ছিল। সহজিয়ারা কেহ কেহ কাপালী যোগী হইতে চাহিয়াছেন; কাহ্নুপাদ তো নিজকেই কাপালী যোগী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আলো ডোম্বী তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাগ ॥
*　　*　　*
তুলো ডোম্বী হাউ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী ॥

ওলো ডোম্বী, তোর সহিত আমি করিব সঙ্গ ; (সেই জন্য) নিঘৃণ কাহ্ন নগ্ন কাপালী যোগী (হইয়াছে)। * * * তুই (হইয়াছিস্) ডোম্বী, আমি (হইয়াছি) কাপালী ; তোকে অন্তরে (লইয়া) আমি গ্রহণ করিয়াছি হাড়ের মালা।

কাপালী যোগীরা নগ্ন থাকিতেন, হাড়ের মালাও পরিতেন ; অধিকন্তু বীরনাদে ডমরু বাজাইতেন, একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেন, পায়ে বাঁধিতেন ঘণ্টা নূপুর, কানে পরিতেন কুণ্ডল, গায়ে মাখিতেন ছাই ; শ্বাশুরী, ননদ, শালী, মাতা, আত্মীয়-পরিজন সকলকে ত্যাগ করিয়া কাপালী যোগী হইতেন। পুরুষ ও নারী কাহারও কোনো বাধা ছিলনা কাপালী যোগী হইবার পথে। চর্যাগীতিতে কাহ্নুপাদের একটি গীতে এই সব আছে :

নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খট্টে।
অনহা ডমরু বাজই বীরনাদে ॥
কাহ্ন কাপালী যোগী পইঠ অচারে।
দেহ নঅরী বিহরই একাকারেঁ ॥
আলিকালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥
রাগদেষ মোহ লাইঅ ছার।
পরম মোখ লবএ মুক্তহার ॥
মারিঅ সাসু ননন্দ ঘরে শালী।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইল কবালী ॥

প্রাচীন বাংলায় দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকে এক শ্রেণীর সাধক ছিলেন যাঁহারা মৃত্যুর পর মুক্তি লাভে বিশ্বাস করিতেন না, তাঁহারা ছিলেন জীবন্মুক্তির সাধক। রস-রসায়নের সাহায্যে কায়সিদ্ধি লাভ করিয়া এই স্থূল জড়দেহকেই সিদ্ধদেহ এবং সিদ্ধদেহকে দিব্যদেহে রূপান্তরিত করা সম্ভব, এবং তাহা হইলেই শিবত্ব লাভ ঘটে—এই মতে ইঁহারা বিশ্বাস করিতেন। ইঁহাদের বলা হইত রসসিদ্ধ যোগী। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন যে এই রসসিদ্ধ স ম্প্রদায়ই পরবর্তী নাথসিদ্ধ যোগী সম্প্রদায়ের প্রাচীনতর রূপ। যাহা হউক, ইঁহাদের সম্বন্ধেও সহজযানী সিদ্ধাচার্যরা শ্রদ্ধিতচিত্ত ছিলেন না, বরং কঠোর সমালোচনাই করিতেন। সরহপাদ বলিতেছেন,

অহ্মে ণ জাণহু অচিন্ত জোই।
জামমরণভব কইসণ হোই ॥
জইসো জাম মরণ বি তৈইসো।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেসো ॥
জা এথু জাম মরণে বিসঙ্কা।
সো করউ রস রসানেরে কঙ্খা ॥

অচিন্ত্যযোগী আমরা জানিনা জন্ম মরণ সংসার কিরূপে হয়। জন্ম যেমন মরণও তেমনই ; জীবিতে ও মৃতে বিশেষ (কোনো) পার্থক্য নাই। এখানে (এই সংসারে) যাহারা জন্ম-মরণে বিশঙ্কিত (ভীত), তাহারাই রস-রসায়ণের আকাঙ্ক্ষা করুক।

সাধারণ যোগী-সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধেও সহজযানীদের ছিল নিদারুণ অবজ্ঞা। সরহপাদের একটি দোহায় আছে :

> অইরি এহিঁ উদ্ধূলিঅ চ্ছারেঁ।
> সীসসু বাহিঅ এ জড়ভারেঁ॥
> ঘরহী বইসী দীবা জালী।
> কোনহিঁ বইসী ঘণ্টা চালী॥
> অক্‌খি ণিবেসী আসণ বন্ধী।
> কন্নেহিঁ খুসুখুসাই জণ ধন্ধী॥

আর্য যোগীরা ছাই মাখে দেহে, শিরে বহন করে জটাভার; ঘরে বসিয়া দীপ জ্বালে, কোনে বসিয়া ঘণ্টা চালে; চোখ বুঝিয়া আসন বাঁধে, আর কান খুস্‌খুস্‌ করিয়া জনসাধারণকে ধাঁধাঁ লাগায়।

সহজ সমরস, অর্থাৎ সাম্যভাবনা, আর 'খসম' অর্থাৎ আকাশের মত শূন্য চিত্ত, ইহাই সহজযানের আদর্শ। তীর্থ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পূজা, আশ্রম সমস্তই ব্যর্থ। ধ্যানের মধ্যে মোক্ষ নাই, সহজ ছাড়া নির্বাণ নাই, কায়াসাধন ছাড়া পথ নাই। যেখানে মন-পবন সঞ্চারিত হয়না, রবিশশীর প্রবেশ নাই সেইখানেই চিত্তের একমাত্র বিশ্রাম, সহজের মধ্যেই পরমানন্দ। শরীরের মধ্যেই অশরীরীর গুপ্তলীলা—অসরির কোই সরীরহি লুকো। ঘরেও থাকিও না, বনেও যাইওনা—ঘরহি ম থক্কু ম জাহি বণে। আগম, বেদ, পুরাণ সবই বৃথা; নিষ্কলুষ নিস্তরঙ্গ হইতেছে সহজের রূপ, তাহার মধ্যে পাপ-পুণ্যের প্রবেশ নাই। সহজে মন নিশ্চল করিয়া যে সমরসসিদ্ধ হইয়াছে সেই তো একমাত্র সিদ্ধ; তাঁহার জরামরণ দূর হইয়াছে। শূন্য নিরঞ্জনই পরম মহাসুখ, সেখানে না আছে পাপ, না আছে পুণ্য—সুন্ন নিরঞ্জন পরম মহাসুহ তহি পুণ ন পাব। সরহপাদ, কাহ্নপাদ প্রভৃতি আচার্যরা দোহার পর দোহায় এই সব মত্ কীর্তন করিয়াছেন। বৈরাগ্য তাঁহারা সাধন করিতেন না, বলিতেন, বিরাগাপেক্ষা পাপ আর কিছু নাই, সুখ অপেক্ষা পুণ্য কিছু নাই।

উদ্ধৃত গীত ও দোহাগুলি হইতে সহজযানী সাধকদের ধর্মমতের যে আভাস পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণ্য ও অন্যান্য ধর্মের বাহ্য আচারানুষ্ঠানের প্রতি যে অবজ্ঞা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইতে একটি তথ্য সুস্পষ্ট। সে-তথ্যটি এই যে, মধ্যযুগে উত্তর-ভারতে ও বাংলাদেশে যে মানবধর্মী মরমীয়া সাধক-কবিদের সাক্ষাৎ আমরা পাই—বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস হইতে আরম্ভ করিয়া কবীর, দাদু, রজ্জব, তুলসীদাস, সুরদাস, মীরাবাই, হরিদাস প্রভৃতি পর্যন্ত—ইহারা সকলেই ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে একাদশ-দ্বাদশ শতকের এই সহজযানী সাধক কবিদেরই বংশধর। প্রাচীন সহজযানী সাধকেরা এবং মধ্যযুগীয় মরমীয়া সাধকেরা তাঁহাদের ধ্যান-ধারণাগুলি জনসাধারণের কাছে প্রচার করিবার জন্য যে মাধ্যম অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাও এক; সে মাধ্যম হইতেছে গীত ও দোহার মাধ্যম।

পাল-পর্বের অব্যবহিত আগেকার সমতটের খড়্গ বংশ বা চট্টগ্রামের কান্তিদেবের বংশ, পাল-পর্বে পাল, চন্দ্র ও কাম্বোজ রাজবংশ এঁরা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ ; আর সেন-পর্বে সেন, বর্মণ ও দেববংশ এঁরা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রয়ী। এই দুই তথ্যের মধ্যে বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির গভীরতর অর্থ নিহিত। সেন-পর্বে ধর্ম ও সমাজচক্র কোন্‌দিকে ঘুরিতেছে, এই দুই তথ্যের মধ্যে তাহার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। সে-ইঙ্গিত বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে সবিস্তারে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি, এখানে আর পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই। কৌতূহলী পাঠক তাহা এই প্রসঙ্গে পাঠ করিয়া লইবেন। এইখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই পর্বের বাংলার সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী ধর্মই হইতেছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং সেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বেদ ও পুরাণ, শ্রুতি ও স্মৃতিদ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত এবং তন্ত্রদ্বারা স্পৃষ্ট। এই দেড়শত বৎসরের বাংলার আকাশ একান্তই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আকাশ। জৈনধর্মের কোনো চিহ্নমাত্র কোথাও দেখা যাইতেছে না। বজ্রযানী-সহজযানী-কালচক্রযানী বৌদ্ধরা নাই, কিংবা তাঁহাদের ধর্মাচরণানুষ্ঠান তাঁহারা করিতেছেন না, এমন নয়, কিন্তু তাঁহাদের কণ্ঠ ক্ষীণ, শিথিল এবং কোথাও কোথাও নিরুদ্ধপ্রায়। বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি বিরল ; সিদ্ধাচার্যদের খবর কোথাও কোথাও শুনা যাইতেছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাদের গুহ্য সাধনা গুহ্যতর পথ অনুসন্ধান করিতেছে অথবা ব্রাহ্মণ্যধর্মের গুহ্য সাম্প্রদায়িক সাধনায় আত্মগোপন করিতেছে। বৌদ্ধ বিহার ইত্যাদির খবরও দু'চার জায়গায় পাইতেছি, কিন্তু তাঁহাদের সেই অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধি আর নাই। অন্যদিকে বৈদিক যাগযজ্ঞের আকাশ বিস্তৃত হইতেছে, পৌরাণিক দেবদেবী ও বিশেষ বিশেষ তিথি-নক্ষত্রে স্নান-দান-ধ্যান ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতির ভিড় বাড়িতেছে, মধ্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণাভিযান বাড়িতেছে, রাষ্ট্রে ও সমাজে ব্রাহ্মণাধিপত্য বিস্তৃত হইতেছে। কেন হইতেছে, কি ভাবে হইতেছে তাহা পূর্ববর্তী অনেক অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে বর্ণ-বিন্যাস, শ্রেণী-বিন্যাস ও রাজবৃত্ত অধ্যায়ে বারবার বলিয়াছি।

সেন-বর্মণ-দেবপর্ব

যাহা হউক, এই বিবর্তনের সূচনা পাল-বংশের এবং কাম্বোজ-বংশের শেষের দিকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার পৃষ্টপোষক তো সমস্ত বাঙ্গালী বৌদ্ধ-রাজারাই ছিলেন, সে-কথা নয় ; লক্ষ্যণীয় হইল এই যে, বৌদ্ধ রাজার বংশধরেরাও (একাদশ শতকের শেষার্ধ হইতেই) ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় লইতেছেন। সে-সব কথা বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে বলিয়াছি এবং দৃষ্টান্তও উদ্ধার করিয়াছি।

বর্মণ, সেন ও দেব-বংশের ধর্মগত আদর্শের কিছু ইঙ্গিত এখানে রাখা যাইতে পারে। বর্মণ-বংশের রাজারা সকলেই পরমবিষ্ণুভক্ত। এই রাজবংশের যে বংশাবলী ভোজবর্মার

বেলাব-লিপিতে পাওয়া যাইতেছে তাহার গোড়াতেই ঋষি অত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈদিক ও পৌরাণিক নামের ছড়াছড়ি; ইঁহাদেরই বংশে বর্মণ-পরিবারের জন্ম! রাজা সামলবর্মার পুত্র ভোজবর্মা সাবর্ণ গোত্রীয়, ভৃগু-চ্যবন-আপ্নুবান্-ঔর্ব-জমদগ্নি প্রবর, বাজসনেয় চরণ এবং যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখ ব্রাহ্মণ রামদেব-শর্মাকে পুণ্ড্রবর্ধনে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। রামদেব-শর্মার দেবজ্ঞ পূর্বপুরুষেরা মধ্যদেশ হইতে আসিয়া উত্তর-রাঢ়ার সিদ্ধল গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বর্মণ-রাষ্ট্রেরই অন্যতম মন্ত্রী স্মার্ত ভট্ট-ভবদেব অগস্ত্যের মত বৌদ্ধ সমুদ্রকে গ্রাস করিয়াছিলেন এবং পাষণ্ড-বৈতণ্ডিকদের যুক্তিতর্ক খণ্ডনে অতিশয় দক্ষ ছিলেন বলিয়া গর্ব অনুভব করিয়াছেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মবিদ্যাবিদ, সিদ্ধান্ত-তন্ত্র-গণিত-ফল সংহিতায় সুপণ্ডিত, হোরাশাস্ত্রের একটি গ্রন্থের লেখক, কুমারিল-ভট্টের মীমাংসা-গ্রন্থের টীকাকার, স্মৃতিগ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, আগমশাস্ত্র এবং অস্ত্রবেদে সুপণ্ডিত। রাঢ়দেশে তিনি একটি নারায়ণ-মন্দির স্থাপন করিয়া তাহাতে নারায়ণ, অনন্ত এবং নৃসিংহের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভট্ট-ভবদেবের লিপিতে সাবর্ণগোত্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণাধ্যুষিত একশত গ্রামের খবর পাওয়া যাইতেছে। ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে বলা হইয়াছে, মানুষের অজ্ঞতার উলঙ্গতাকে ঢাকিবার একমাত্র উপায় হইতেছে ত্রি-বেদের চর্চা; এই চর্চার প্রসারের জন্য বর্মণ-পরিবারের চেষ্টার সীমা ছিলনা। বর্মণ-রাষ্ট্রে যাহার সূচনা সেন-রাষ্ট্রে তাহার বিস্তার। বস্তুত, বাংলার স্মৃতি ও ব্যবহার-শাসন সেন-পর্বেরই সৃষ্টি। এই যুগে রচিত অসংখ্য স্মৃতি ও ব্যবহার-গ্রন্থাদিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অমোঘ ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ সক্রিয়। বিজয়সেন ও বল্লালসেন উভয়েই ছিলেন পরম-মাহেশ্বর অর্থাৎ শৈব; লক্ষ্মণসেন পরম-বৈষ্ণব, পরম-নারসিংহ; লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও কেশবসেন উভয়েই নারায়ণ এবং সূর্যভক্ত। সেন-বংশের আদিপুরুষ সামন্তসেন শেষ বয়সে গঙ্গাতীরস্থ আশ্রমে বানপ্রস্থে কাটাইয়াছিলেন। এই সব আশ্রম-তপোবন ঋষি-সন্ন্যাসী দ্বারা অধ্যুষিত এবং যজ্ঞাগ্নিসেবিত ঘৃত-ধূপের সুগন্ধে পরিপূরিত থাকিত; সেখানে মৃগশিশুরা তপোবন-নারীদের স্তন্যদুগ্ধ পান করিত এবং শুকপাখীরা সমস্ত বেদ, আবৃত্তি করিত!! সামন্তসেনের পৌত্র বিজয়সেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উপর প্রচুর কৃপাবর্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহারা প্রচুর ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। একবার তাঁহার মহিষী বিলাসদেবী চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষে কনকতুলাপুরুষ অনুষ্ঠানের হোমকার্যের দক্ষিণাস্বরূপ মধ্যদেশাগত, বৎসগোত্রীয়, ভার্গব-চ্যবন-আপ্নুবান-ঔর্ব্য-জামদগ্ন্য প্রবর, ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখার ষড়ঙ্গধ্যায়ী ব্রাহ্মণ উদয়কর দেবশর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। বল্লালসেনের নৈহাটি-লিপি আরম্ভ হইয়াছে অর্ধনারীশ্বরকে বন্দনা করিয়া। তাঁহার মাতা বিলাসদেবী একবার সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাতীরে হেমাশ্বমহাদান অনুষ্ঠানের দক্ষিণাস্বরূপ ভরদ্বাজ গোত্রীয়, ভরদ্বাজ-আঙ্গিরস-বার্হস্পত্য প্রবর, সামবেদীয় কৌঠুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণ শ্রীওবাসু দেবশর্মাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া-লিপির দানগ্রহীতা

হইতেছেন কৌশিক গোত্রীয়, বিশ্বামিত্র-বন্ধুল-কৌশিক প্রবর, যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রঘুদেবশর্মা। এই রাজারই গোবিন্দপুর-পট্টোলীর ভূমিদান-গ্রহীতাও একজন ব্রাহ্মণ, উপাধ্যায় ব্যাসদেব শর্মা বৎসগোত্রীয় এবং কৌঠুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী। সামবেদীয় কৌঠুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী, ভরদ্বাজগোত্রীয় আর এক ব্রাহ্মণ ঈশ্বর দেবশর্মাও কিছু ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন রাজা কর্তৃক হেমাশ্বরথমহাদান যজ্ঞানুষ্ঠানে আচার্য-ক্রিয়ার দক্ষিণাস্বরূপ। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-লিপি হইতে জানা যায়, রাজা তাঁহার মূল অভিষেকের সময় ঐন্দ্রীমহাশান্তি যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে কৌশিক গোত্রীয়, অথর্ববেদীয় পৈপ্পলাদশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞাগ্নির ধূম চারিদিকে এমন বিকীর্ণ হইত যেন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যাইত। তিনি একবার তাঁহার জন্মদিনে দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া একটি গ্রাম বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ঈশ্বর দেবশর্মাকে দান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের আর এক পুত্র বিশ্বরূপ সেন শিবপুরাণোক্ত ভূমিদানের ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় বাৎস্যগোত্রীয় নীতিপাঠক ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপ দেবশর্মাকে কিছু ভূমিদান করয়িাছিলেন। এই রাজারই অন্য আর একটি লিপিতে দেখিতেছি হলায়ুধ নামে বাৎস্যগোত্রীয় যজুর্বেদীয়, কাণ্বশাখাধ্যায়ী জনৈক ব্রাহ্মণ আবল্লিক পণ্ডিত রাজপরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদের নিকট হইতে প্রচুর ভূমিদান লাভ করিতেছেন—উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, চন্দ্রগ্রহণ, উত্থানদ্বাদশী তিথি, জন্মতিথি ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে।

ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলের দেব-বংশের লিপিতেও অনুরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী এবং বিষ্ণুভক্ত। এই বংশের অন্যতম রাজা দামোদর একবার একজন যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ পৃথ্বীধর শর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন।

বস্তুত, এই তিন রাজবংশের সচেতন চেষ্টাই যেন ছিল বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আকাশ বাংলাদেশে বিস্তৃত করা। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-কালিদাস যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য আদর্শের কথা বলিয়াছেন সেই ব্রাহ্মণ্য আদর্শ সমাজ ও ধর্ম জীবনে সঞ্চার করিবার প্রয়াস লিপিগুলিতে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে সুস্পষ্ট। লিপিগুলিতে কনকতুলাপুরুষ মহাদান, ঐন্দ্রীমহাশান্তি, হেমাশ্বমহাদান, হেমাশ্বরথদান প্রভৃতি যাগযজ্ঞ; সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, উত্থানদ্বাদশীতিথি, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি প্রভৃতি উপলক্ষে স্নান, তর্পণ, পূজানুষ্ঠান; শিবপুরাণোক্ত ভূমিদানের ফলাকাঙ্ক্ষা; বিভিন্ন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ প্রভৃতিই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এই যুগের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রতিনিধি হলায়ুধ, সন্দেহ নাই। তাঁহার ব্রাহ্মণসর্বস্ব-গ্রন্থের গোড়াতেই আত্মপ্রশস্তিমূলক কয়েকটি শ্লোক আছে; তাহার অর্থ এইরূপ: "(হলায়ুধের নিজের গৃহে) কোথাও কাঠের (যজ্ঞ) পাত্র (ছড়াইয়া আছে);

কোথাও বা স্বর্ণপাত্র (ইত্যাদি)। কোথাও ইন্দুধবল দুকুলবস্ত্র; কোথাও কৃষ্ণমৃগচর্ম। কোথাও ধূপের (গন্ধময় ধূম); বষট্‌কার ধ্বনিময় আহুতির ধূম। (এই ভাবে তাঁহার গৃহে) অগ্নির এবং (তাঁহার নিজের) কর্মফল যুগপৎ জাগ্রত।" ইহাই ব্রাহ্মণ্য সেন-পর্বের ভাবপরিমণ্ডল; হলায়ুধ গৃহের ভাব-কল্পনাই সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভাব-কল্পনা।

হলায়ুধের ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব হইতে যে শ্লোকটির অনুবাদ উল্লেখ করিলাম তাহার ইঙ্গিত যে ঔপনিষদিক তপোবনাদর্শের দিকে এ-কথা বোধ হয় আর স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সামন্তসেনের বানপ্রস্থ যে আশ্রমে কাটিয়াছিল সে-আশ্রমের আকাশ-পরিবেশও ঔপনিষদিক। কবিকল্পনা সন্দেহ নাই, তবু, যে-দেশের আশ্রমে শুকপাখীরাও বেদ আবৃত্তি করে সে-দেশে বেদের চর্চা ছিল, বৈদিক যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাহা তো সহজেই অনুমেয়।

বৈদিকধর্ম ও সংস্কারের বিস্তার

বর্মণ ও সেন-রাজাদের লিপিগুলিতে সমানেই দেখিতেছি চতুর্বেদের বিভিন্ন শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণেরাই হোমযাগযজ্ঞ ইত্যাদি করাইতেছেন এবং ভূমিদক্ষিণা লাভ করিতেছেন। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ এই চারিবেদই ব্রাহ্মণদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল, এবং ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখার ষড়ঙ্গ, যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখা, সামবেদীয় কৌঠুমশাখা, এবং অথর্ববেদীয় পৈপ্পলাদ শাখার চর্চাই ছিল বেশি, বিশেষভাবে যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখা এবং সামবেদীয় কৌঠুমশাখা। ভট্ট-ভবদেব ছিলেন ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্; ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য-রচয়িতা গুণবিষ্ণুও তো এই যুগেরই লোক। বিজয়সেনের অজস্র কৃপা বর্ষিত হইয়াছিল যাহাদের উপর তাঁহারা তো অনেকেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। দামোদরদেবের নিকট হইতে যে-ব্রাহ্মণ পৃথ্বীধরশর্মা কিছু ভূমিদান গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন যজুর্বেদীয়। এই পর্বে বৈদিক ধর্ম, ক্রিয়াকর্ম, যাগযজ্ঞ, সংস্কার প্রভৃতি যে আরও বিস্তারিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কনকতুলাপুরুষ দান, ঐন্দ্রীমহাশান্তি, হেমাশ্বমহাদান, হেমাশ্বরথদান প্রভৃতি যাগযজ্ঞ তো শ্রৌত-সংস্কারের জয়জয়কারই ঘোষণা করে।

অথচ, হলায়ুধ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন (ব্রাহ্মণসর্বস্ব-গ্রন্থ), রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা যথার্থ বেদবিদ্ ছিলেন না; তাঁহার মতে, ব্রাহ্মণদের বেদচর্চার সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল নাকি উৎকল ও পাশ্চাত্য দেশ সমূহে। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা নাকি বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের রীতিপদ্ধতিও জানিতেন না। হলায়ুধের আগে বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ-ভট্টও তাঁহার পিতৃদয়িতা-গ্রন্থে বাংলাদেশে বেদচর্চার অবহেলা দেখিয়া দুঃখ করিয়াছেন। এই অবস্থারই বোধ হয় দূর প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে কুলজী-গ্রন্থমালা-কথিত পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের বাংলায় আগমন-কাহিনীতে। সেন-বর্মণ পর্বে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কারের ক্রমবর্ধমান প্রসার দেখিয়া মনে হয়, বাহির হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিয়া বেদচর্চা, বৈদিকানুষ্ঠান প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার একটা সচেতন চেষ্টা বোধ হয় হইয়াছিল। অনিরুদ্ধ-ভট্ট ও হলায়ুধ যে-অবস্থাটা দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের ভাল লাগে নাই।

কাজেই, ব্রাহ্মণ্য এবং দক্ষিণাগত সেন-বর্মণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এ-ধরনের একটা চেষ্টা হওয়া কিছু বিচিত্র নয়, অস্বাভাবিকও নয়। বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, সেন-বর্মণ আমলেই বাংলায় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের উদ্ভব দেখা দেয়।

আগেই বলিয়াছি, বাংলার শ্রৌত ও স্মৃতিশাসন এই পর্বেরই সৃষ্টি ; ভট্ট-ভবদেব, জীমূতবাহন, অনিরুদ্ধ-ভট্ট, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, হলায়ুধ প্রভৃতি সকলেই এই পর্বেরই লোক এবং ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বনামখ্যাত শ্রৌত ও স্মৃতিপণ্ডিত। এই পর্বেই বাংলার ব্রাহ্মণ্য জীবন সর্বভারতীয় শ্রৌত ও স্মৃতিবন্ধনে সম্পূর্ণ বাঁধা পড়িল। সদ্যোক্ত শ্রৌত ও স্মৃতি কারদের গ্রন্থে শ্রৌত ও গৃহ্য সংস্কারগুলির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া কঠিন নয়। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমান্তোন্নয়ন, শোষ্যন্তীহোম, জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, নামকরণ, পৌষ্টিককর্ম, অন্নপ্রাশন, নৈমিত্তিক-পুত্র-মূর্দ্ধাভিঘ্রাণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সাবিত্র-চরু-হোম, সমাবর্তন, বিবাহ, শালাকর্ম (গৃহপ্রবেশ) প্রভৃতি দ্বিজবর্ণের যত কিছু সংস্কার প্রত্যেকটি এই সব গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সব সংস্কার পালনের অপরিহার্য অঙ্গ হইতেছে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুশণ্ডিকানুষ্ঠান এবং মহাব্যাহৃতি বা শাট্যায়ন বা সমিধ্ হোম বা অন্য কোন হোমানুষ্ঠান পূর্বক গৃহাগ্নি শোধন বা প্রতিষ্ঠা। এই সব হোমানুষ্ঠান কি করিয়া করিতে হয় তাহার পুংখানুপুংখ বর্ণনাও দেওয়া হইয়াছে। অনিরুদ্ধ-ভট্টের পিতৃদয়িতা ও হারলতা-গ্রন্থে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মেরও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। এই সব বিবরণ ও ব্যাখান পাঠ করিলে বুঝিতে দেরী হয়না যে, শ্রৌত ও স্মার্ত সংস্কার এই পর্বের বাঙালী ব্রাহ্মণ্য সমাজে সুবিস্তার লাভ করিয়াছিল। রাষ্ট্রের সহায়তায় এই বিস্তারের ভার লইয়াছিলেন ব্রাহ্মণেরা।

পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কারের বিস্তার তো পালপর্বেই দেখিয়াছি। এই পর্বে তাহা বর্ধমান। পুরাণ-কাহিনীর পরিচয় এই পর্বের লিপিগুলিতে সমানেই পাওয়া যাইতেছে। বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের কথা শুনিতেছি ভোজবর্মার বেলাব ও লক্ষণসেনের তর্পণদীঘি-শাসনে। বামনাবতারের কথা বলিতে গিয়া বিষ্ণু কি করিয়া দৈত্যরাজ এবং ইন্দ্রজয়ী বলিকে পরাভূত করিয়াছিলেন, বলিরাজার অপরিমেয় ত্যাগের খ্যাতি কতদূর ছিল তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কৃষ্ণের প্রেমলীলা, এবং বিষ্ণুর কৃষ্ণ, নরসিংহ এবং পরশুরামাবতারের কথাও বাদ পড়ে নাই। বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপিতে সূর্যদেব অগস্ত্যের সাহায্যে কি করিয়া বিন্ধ্যকে অবনত করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত আছে। বেলাব-লিপিতে চন্দ্রকে বলা হইয়াছে অত্রির অন্যতম বংশধর। শিব যে অর্ধ-নারীশ্বর এবং শম্ভু, ধূর্জটী ও মহেশ্বর যে তাঁহার অন্য তিনটি নাম এবং কার্তিকেয় ও গণেশ যে তাঁহার দুই পুত্র, এ-কথার উল্লেখ আছে দেওপাড়া, নৈহাটি ও বারাকপুর লিপিতে। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, উত্থানদ্বাদশী তিথি, উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি প্রভৃতি

পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কারের বিস্তৃতি

উপলক্ষে স্নান, তর্পণ ও পূজা, শিবপুরাণোক্ত ভূমিদানের ফলাকাঙ্ক্ষা, দুর্বাতৃণ জলসিক্ত করিয়া দানকার্য সমাপন, নীতিপাঠের অনুষ্ঠান, লিপি-উল্লিখিত এই সব ক্রিয়াকর্ম সমস্তই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের জয়ঘোষণা করে। সুখরাত্রি ব্রত, শক্রোত্থান পূজা, কামমহোৎসব, হোলাক উৎসব, পাষাণ-চতুর্দশী, দ্যূত-প্রতিপদ, কোজাগর-পূর্ণিমা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, আকাশ-প্রদীপ, দীপান্বিতা, জন্মাষ্টমী, অশোকাষ্টমী, অক্ষয়তৃতীয়া, অগস্ত্যার্ঘ্য, মাঘীসপ্তমী স্নান প্রভৃতি পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মানুমোদিত যে-সব ক্রিয়াকর্মের বিস্তৃত উল্লেখ ও বিবরণ এই পর্বের কালবিবেক, দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যেও একই ইঙ্গিত।

এই পর্বের বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়িক ধর্ম ও দেবদেবী সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বলিবার কিছু নাই। পাল-চন্দ্র পর্বে এই সব ধর্ম ও দেবায়তনের যে রূপ ও প্রকৃতি আমরা দেখিয়াছি, এ-পর্বে তাহা আরও বিস্তৃত হইয়াছে এই মাত্র, প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়াছে। কাজেই একই কথা আবার বলিয়া লাভ নাই; যে-সব ক্ষেত্রে নূতন তথ্যের, নূতন রূপ ও প্রকৃতির ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে শুধু তাহারই উল্লেখ করিব।

পাল-পর্বের কোনো কোনো স্থানক বিষ্ণুমূর্তিতে মহাযানী মূর্তি-কল্পনার প্রভাবের কথা আগেই বলিয়াছি। এই পর্বেও তেমন দুই একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুর জেলার সুরোহর গ্রামে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) একটি ত্রিবিক্রম-প্রকরণের বিষ্ণুর স্থানক প্রতিমায় এই মহাযানী প্রভাব সুস্পষ্ট। পাল-পর্বের মহাযানী লোকেশ্বর-বিষ্ণু প্রতিমাগুলির (ঘিয়াসবাদ, সোনারঙ্গ ও সাগরদীঘিতে প্রাপ্ত) মত এ-ক্ষেত্রেও বিষ্ণু একটি নাগের ফণাছত্রের নীচে দণ্ডায়মান; তাঁহার চক্র ও গদা, এবং দুই পার্শ্বের চক্র ও শঙ্খপুরুষ নীলোৎপলের উপরে স্থিত, ফণাছত্রের উপরেই অমিতাভসদৃশ একটি উপবিষ্ট মূর্তি, এবং পাদপীঠে ষড়ভুজ নৃত্যপরায়ণ এক শিব-প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। কালন্দরপুরে প্রাপ্ত একটি স্থানক বিষ্ণুমূর্তিতেও অনুরূপ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর। বিষ্ণুর গরুড়াসন প্রতিমার একটি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে বগুড়া জেলার দেওড়া গ্রামে। কিন্তু বিষ্ণুর লক্ষ্মী-নারায়ণ রূপই বোধ হয় এই পর্বে বৈষ্ণব দেবদেবী রূপ-কল্পনার অন্যতম প্রধান দান। পূর্ব-বাংলা ও উত্তর-বাংলার কোনো কোনো স্থান হইতে লক্ষ্মী-নারায়ণের কয়েকটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে ঢাকা জেলার বাস্তা গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা) একটি এবং দিনাজপুর জেলায় একাইল গ্রামে প্রাপ্ত আর একটি প্রতিমা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুর বাম উরুর উপর উপবিষ্টা লক্ষ্মীকে দেখিলে সহজেই সমসাময়িক শৈব উমা-মহেশ্বরের প্রতিমার কথা মনে পড়ে। লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা ও রূপ-কল্পনার প্রসার দক্ষিণ-ভারতেই ছিল বেশি, এবং খুব সম্ভব সেন-বর্মণ পর্বে দক্ষিণদেশ হইতেই এই পূজা ও রূপ-কল্পনা বাংলাদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কবি ধোয়ী তাঁহার

বৈষ্ণব ধর্ম

পবনদূত-কাব্যে যেন ইঙ্গিত করিয়াছেন, লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন সেন-রাজাদের কুলদেবতা এবং বারবামাদের নৃত্যগীত সহযোগে তাঁহার অর্চনা হইত।

অস্মিন সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সুহ্মে বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ।
পাণৌ লীলাকমলমসকৃৎ যৎসমীপে বহন্ত্যো
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতিসুভগাঃ কুর্বতে বাররামাঃ॥

এই পর্বের কয়েকটি অবতার-মূর্তিও বাংলাদেশের নানা জায়গায় পাওয়া গিয়াছে; ইহাদের মধ্যে বরাহ ও নরসিংহ অবতারই প্রধান। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, লক্ষ্মণসেন নিজের পরিচয় দিতেন পরমনারসিংহ বলিয়া। তিনি ছিলেন পরমবৈষ্ণব। বর্মন-বংশের রাজারা তো সকলেই পরমবৈষ্ণব; দেব-বংশের রাজারাও তাহাই। বিজয়সেন যদিও ছিলেন সদাশিবের ভক্ত, তবু প্রদ্যুম্নেশ্বরের এক মন্দিরে ভূমিদান করিতে তাঁহার বাধে নাই। প্রদ্যুম্নেশ্বর তো হরিহরেরই এক বিশিষ্ট রূপ। বিশ্বরূপ ও কেশবসেন তাঁহাদের রাজপট্ট আরম্ভ করিয়াছিলেন নারায়ণকে আবাহন করিয়া। কামদেবের একাধিক প্রতিমা এ-পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহা উত্তর-বঙ্গ হইতে। তাঁহার হাতে ইক্ষুদণ্ডের ধনু এবং বাণ, মুখে চতুর হাসি, গলায় ফুলের মালা; ত্রিভঙ্গ হইয়া তিনি দণ্ডায়মান। রাজসাহী-চিত্রশালার দুইটি প্রতিমাই বোধ হয় এই পর্বের।

সেন-বর্মণ পর্বের বাংলাদেশ বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসকে দুইটি দিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়; একটি বিষ্ণুর দশাবতারের সমন্বিত ও রীতিবদ্ধ রূপ, আর একটি রাধা-কৃষ্ণের ধ্যান ও রূপ-কল্পনা। বরাহ, বামন ইত্যাদি দুই চারিটি অবতারের নাম গুপ্ত-লিপিমালাতেই দেখা যায়; পুরাণমালায় এবং মহাভারতেও বিষ্ণুর নানা অবতাররূপের পরিচয় বিধৃত। কিন্তু বিধিবদ্ধ সমন্বিত রূপের চেষ্টা বোধ হয় প্রথম দেখিতেছি ভাগবত পুরাণে। এই পুরাণে অবতাররূপের তিনটি তালিকা আছে, একটিতে বিষ্ণুর তেইশটি অবতার, একটিতে বাইশটি, একটিতে ষোলটি; দেখা যাইতেছে, তখনও দশাবতাররূপ সমন্বিত ও বিধিবদ্ধ হয় নাই। পাল-পর্ব ও সেন-পর্বের লিপিমালায়ও কয়েকজন অবতারের খবর পাইতেছি। কিন্তু মধ্যযুগের এবং আজিকার ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র যে দশাবতারের ঐতিহ্য সুপরিচিত, সেই দশাবতারের (মৎস, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি) প্রথম বিধিবদ্ধ সমন্বিত উল্লেখ পাইতেছি কবি জয়দেবের গীত গোবিন্দে। শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থেও অবতার বিষয়ক শ্লোকাবলীর মধ্যে দশাবতারের উল্লেখই প্রধান, এবং তাহার মধ্যে আবার কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধেই ষাটটি শ্লোক। পরবর্তী কালে চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর বাংলায় বিষ্ণু-কৃষ্ণধর্মের যে-রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহার আদি সংস্কৃতিপূত রূপ এই শ্লোকগুলির মধ্যেই নিবদ্ধ, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এ-অনুমানও অনৈতিহাসিক নয় যে, এই শ্লোকাবলীর

অধিকাংশই পরমভাগবত বিষ্ণুকৃষ্ণভক্ত কবি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভায় রচিত ও গীত হইয়াছিল। উপরোক্ত দশাবতারের তালিকা দীর্ঘতর তালিকার সঙ্গে সঙ্গে মহাভারত এবং বিষ্ণুপুরাণেও আছে; কিন্তু এই দুই গ্রন্থেই সংক্ষিপ্ত তালিকাটি দশাবতারের স্বীকৃতির পরবর্তীকালের সংযোজন। শেষোক্ত অবতার দুইটি—বুদ্ধ ও কল্কি—তো বৌদ্ধদের ঐতিহ্য হইতেই গৃহীত।

হরিভক্তি বা স্তুতি সম্বন্ধে সদুক্তিকর্ণামৃতে অনেকগুলি শ্লোক আছে; একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধার করিতেছি, শ্লোকটি অজ্ঞাতনামা কোনো কবির রচনা। ইনি বাঙালী ছিলেন কিনা বলা কঠিন; তবে এই শ্লোকটি, কবি কুলশেখর-রচিত একটি শ্লোক এবং আরও দুই একটি শ্লোকে বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম ও হৃদয়াবেগের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয়, ইহাদের মধ্যে যেন চৈতন্যোত্তর বাংলার একান্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তি ও হৃদয়াবেগ প্রত্যক্ষ করিতেছি।

যানি ত্বচ্চরিতামৃতানি রশনা লেহ্যানি ধন্যাত্মনাং
যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধানুবন্ধোন্মুখাঃ
যা বা ভাবিতবেণুগীত গতয়ো লীলামুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিতয়া বহন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে॥

রাধাকৃষ্ণের ধ্যান-কল্পনাও বোধ হয় এই পর্বের বাংলা দেশেরই সৃষ্টি, এবং কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ-গ্রন্থেই বোধ হয় প্রথম এই ধ্যান-কল্পনার সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত রূপ আমরা দেখিতেছি। হালের সপ্তশতীর একটি শ্লোকে রাধার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার তারিখ সঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ভাসের বালচরিতে, ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও ভাগবত-পুরাণে গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমলীলার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে রাধার উল্লেখ কোথাও নাই। ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতেও শত গোপিনীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিচিত্র লীলার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সেখানেও রাধা নাই। সেন-পর্বের কোনো সময়ে বোধ হয় অন্যতমা গোপিনী রাধা কল্পিতা হইয়া থাকিবেন, এবং খুব সম্ভব তাহা ক্রমবর্ধমান শক্তিধর্মের প্রভাবে। এই শক্তিধর্মের প্রভাব বৈষ্ণবধর্মেও লাগিয়াছিল, সন্দেহ নাই। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বৈষ্ণবের কৃষ্ণ শাক্তের শিব, সাংখ্যের পুরুষ, আরও শিথিল ভাবে বলা যায়, বজ্রযানীর বোধিচিত্ত, সহজযানীর করুণা, কালচক্রযানীর কালচক্র; আর রাধা হইতেছেন শাক্তের শক্তি, সাংখ্যের প্রকৃতি, শিথিল ভাবে বজ্রযানীর নিরাত্মা, সহজযানীর শূন্যতা, কালচক্রযানীর প্রজ্ঞা। সমসাময়িক কালের এই চেতনার স্পর্শ বৈষ্ণবধর্মেও লাগিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। পরবর্তী সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের কৃষ্ণ-রাধা যে পুরুষ-প্রকৃতি ও শিব-শক্তি ধ্যান-কল্পনার এক পরিবারভুক্ত, এ-সম্বন্ধে তো কোনোই সন্দেহ নাই।

সেন-বংশের পারিবারিক দেবতা বোধ হয় ছিলেন সদাশিব। বিজয়সেন শিবের আবাহন করিয়াছিলেন শম্ভু নামে, বল্লালসেন করিয়াছেন ধূর্জটী এবং অর্দ্ধনারীশ্বর নামে।

লক্ষ্মণসেন এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় লিপিতে নারায়ণের আবাহন করিলেও সদাশিবকে শ্রদ্ধা জানাইতে ভোলেন নাই। সেন-বর্মণ লিপিমালায় তন্ত্রোক্ত শিব-শক্তি ধ্যান-কল্পনার পরিচয় কিছু নাই, আগমান্ত শৈব-শাক্ত ধর্মেরও নয়। কিন্তু শেষোক্ত ধর্মের ধ্যান-কল্পনা যে গুপ্তোত্তর এবং পাল-পর্বের বাংলায় সুপ্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তাহার কিছু কিছু প্রমাণ আগেই উল্লেখ করিয়াছি। মধ্যযুগে যে সুবিস্তৃত তন্ত্র-সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেই তন্ত্র-সাহিত্যের কোনো গ্রন্থই বোধ হয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের আগে রচিত হয় নাই; তবে এ-কথা অনস্বীকার্য যে, অধিকাংশ তন্ত্র-গ্রন্থই রচিত হইয়াছিল বাংলাদেশে এবং এই দেশেই তান্ত্রিক ধ্যান-কল্পনার এক সমন্বিত রূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহা ছাড়া, এই সেন-বর্মণ পর্বের লিপিতে ও সমসাময়িক সাহিত্যে আগম ও তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চার কিছু কিছু উল্লেখ বর্তমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভবদেব-ভট্ট দাবি করিয়াছেন, অন্যান্য অনেক শাস্ত্রের সঙ্গে তিনি তন্ত্র ও আগম-শাস্ত্রেও অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। আগমশাস্ত্রের প্রচলন পাল-পর্বেই দেখিতেছি; কেদারমিশ্রের পুত্র মন্ত্রী গুরবমিশ্র আগমশাস্ত্রে পরম ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্ত্রের উল্লেখ এ-ক্ষেত্রে দেখিতেছি না। আগমশাস্ত্রের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং তাহা সর্বভারতীয়; কিন্তু তন্ত্র বলিতে পরবর্তীকালে আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহা বোধ হয় পূর্ব-ভারত, বিশেষভাবে বাংলা দেশেই সৃষ্টি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। আগেই দেখিয়াছি, দেবীপুরাণ মতে বামাচারী দেবী-পূজার প্রচলন ছিল রাঢ়, কামরূপ, কামাখ্যা ও ভোট্টদেশে। তন্ত্রোক্ত দেবদেবীর লিপি-উল্লেখ বোধ হয় দুইটি ক্ষেত্রে আমরা পাইতেছি; একটি নয়পালের গয়ালিপিতে মহানীল-সরস্বতীর আর একটি হরিকালদেবের লিপিতে দুর্গোত্তারা নামে এক দেবীর উল্লেখ। বৌদ্ধ বজ্রযানী-সহজযানী-কালচক্রযানী সাধনার মতই তন্ত্রোক্ত বামা সাধনা একান্ত গুহ্য ব্যক্তিগত সাধনা; সেই জন্যই লিপিমালায় তাহার উল্লেখ বা আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্য প্রতিমাপূজায় তাহার মূর্তি-প্রতীকের প্রমাণ না থাকা কিছু বিচিত্র নয়। তবে, পালপর্বের বৌদ্ধ গুহ্যসাধনা এবং ব্রাহ্মণ্য শক্তি সাধনা একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল এবং উভয়েই তান্ত্রিক ধ্যান-কল্পনার গভীর স্পর্শ লাভ করিয়াছিল এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কোথাও নাই।

শৈবধর্ম ও শাক্তধর্ম

শিবের ঈশানরূপের চতুর্ভুজ ত্রিভঙ্গ একটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে রাজসাহী জেলার গণেশপুর গ্রামে (রাজসাহী-চিত্রশালা)। সাধারণত ঈশানরূপী স্থানক-শিবের যে ধরনের প্রতিমা বাংলাদেশে সুপ্রাপ্য তাহা হইতে এই মূর্তিটি একটু ভিন্ন। কিন্তু এই ভিন্নতা এই পর্বেরই সৃষ্টি কিনা, নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। কিন্তু নৃত্যপর শিবের যে দুই রূপ-কল্পনার প্রতিমা বাংলা দেশে পাওয়া গিয়াছে তাহার একটি নিঃসন্দেহে এই পর্বের সৃষ্টি এবং তাহা দক্ষিণ-ভারতীয় প্রভাবের ফল। পাল-পর্বে একটি রূপের কথা আগেই বলিয়াছি; এই রূপটি

অবিকল মৎস্যপুরাণের ধ্যান-কল্পনানুযায়ী ; এই রূপটি দশভুজ। আর একটি রূপ দ্বাদশভুজ ; দুই ভুজে একটি বীণা ধৃত, দুই ভুজে একটি নাগফণাছত্র এবং দুই ভুজে করতাল লক্ষণ। এই নটরাজ শিব যথার্থ নৃত্যগীতপটু এবং প্রতিমায় তাহাই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে বীণাধরা দাক্ষিণ্যমূর্তি শিবের যে ধ্যান-কল্পনা সুপরিচিত, তাহার সঙ্গে এই প্রতিমাগুলির আত্মীয়তা সুস্পষ্ট।

শিবের সদাশিব রূপ-কল্পনাও বোধ হয় দক্ষিণ-ভারতের দান। বাংলাদেশে সদাশিব মূর্তি নানা জায়গা হইতেই পাওয়া গিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন মূর্তি বোধ হয় তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালের (কলিকাতা-চিত্রশালা)। কিন্তু তৃতীয় গোপালদেবের রাজ্যকালের হইলেও এই রূপ-কল্পনা মোটামুটি সেন-পর্বেরই রচনা এবং তাহাও কতকটা বোধ হয় দক্ষিণ-ভারতীয় প্রভাবে। বাংলার সদাশিব প্রতিমাগুলির সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের সদাশিব রূপ-কল্পনার আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ। সেন-বংশের পারিবারিক দেবতা ছিলেন সদাশিব, এবং তাঁহারা হয়ত উত্তর-ভারতীয় আগমান্ত সদাশিব ধ্যান-কল্পনার দক্ষিণ-ভারতীয় রূপ বাংলাদেশে প্রবর্তিত করিয়া থাকিবেন।

শিবের উমা-মহেশ্বরের মূর্তিও এই পর্বে সুপ্রচুর। তন্ত্রধর্মের কেন্দ্র বাংলাদেশে শিবউরূতে সুখাসীনা, শিবকণ্ঠবিলগ্না উমার এবং মহেশ্বরের যুগল মূর্তির ধ্যান-কল্পনা সমাদৃত হইবে, বিচিত্র কি ! উত্তর-বঙ্গে প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিত্রশালা) উমা-মহেশ্বরের একটি প্রতিমা দ্বাদশ শতকীয় ভাস্কর শিল্পের একটি সুন্দর নিদর্শন।

বাংলাদেশে গাণপত্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রসারের কোনো প্রমাণ এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই ; তবে, ঢাকা জেলায় মুন্সীগঞ্জের একটি পঞ্চমুখ, দশভুজ, গর্জমান সিংহোপরি উপবিষ্ট গণেশের প্রতিমা পূজিত হয়। মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছিল রামপালের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। এই মূর্তিটি বোধ হয় গাণপত্য সম্প্রদায়-কল্পিত ধ্যানানুযায়ী রচিত এবং ইহার রূপ একান্তই দক্ষিণ-ভারতীয় প্রতিমা-শাস্ত্রের অনুমোদিত। প্রতিমাটির প্রভাবলীতে ছয়টি ছোট ছোট মূর্তি রূপায়িত ; এই ছয়টি মূর্তি গাণপত্য সম্প্রদায়ের ছয়টি শাখার প্রতীক।

কার্তিকেয়ের স্বতন্ত্র মূর্তি দুর্লভ ; কিন্তু এই পর্বের একটি স্বতন্ত্র কার্তিকেয় প্রতিমা কলিকাতা-চিত্রশালায় রক্ষিত আছে (উত্তর-বঙ্গে প্রাপ্ত) ; ময়ুর-বাহনের উপর মহারাজ লীলায় কার্তিকেয় উপবিষ্ট, দুই পাশে দেবসেনা ও বল্লী নামে পত্নীদ্বয়। এই প্রতিমাটি দ্বাদশ শতকীয় ভাস্করশিল্পের সুন্দর অভিজ্ঞান।

শক্তি প্রতিমার মধ্যে এই পর্বের কয়েকটি প্রতিমা খুব উল্লেখযোগ্য। উত্তর-বঙ্গে প্রাপ্ত এবং বর্তমানে কলিকাতা-চিত্রশালায় রক্ষিত একটি চতুর্ভুজা দেবীপ্রতিমার এক হাতে পদ্ম, এক হাতে দর্পণ ; তাঁহার দক্ষিণে গণেশ, বামে পদ্মকলিধৃতা একটি নারী ; প্রতিমার পাদপীঠে গোধিকার প্রতিকৃতি। লক্ষণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিতা একটি দেবীপ্রতিমাকে উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হইয়াছে চণ্ডী। দেবী চতুর্ভুজা এবং সিংহবাহিনী। প্রতিমাটিতে

চণ্ডী যে কেন বলা হইয়াছে, বলা কঠিন, কারণ চণ্ডীর যে রূপ-বর্ণনা প্রতিমাশাস্ত্রে সচরাচর দেখা যায় তাহার সঙ্গে এই প্রতিমাটির কোনো মিল নাই। শারদাতিলকতন্ত্রে এই ধরনের প্রতিমার নামকরণ করা হইয়াছে ভুবনেশ্বরী। পাল-পর্বের শক্তি-প্রতিমা প্রসঙ্গে ঢাকা জেলার শক্ত গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা) একটি মহিষমর্দিনী প্রতিমার কথা বলিয়াছি; মূর্তিটি দ্বাদশ শতকীয় শিল্পের নিদর্শন এবং সেই হেতু সেন-পর্বের বলাই সংগত। কিন্তু লক্ষ্যণীয় হইতেছে এই যে, পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিটিতে প্রতিমাটিকে বলা হইয়াছে "শ্রী-মাসিক-চণ্ডী।" এই যুগে সব দেবী মূর্তিকেই কি চণ্ডী বলা হইত? পাল-পর্বে আলোচিত, বাখরগঞ্জ জেলার শিকারপুর গ্রামের উগ্রতারার প্রতিমাটিও বোধ হয় এই পর্বের, এবং তান্ত্রিক শক্তিধর্মের নিদর্শন।

দেবীর চামুণ্ডারূপের দুই চারিটি প্রতিমাও পাওয়া গিয়াছে এই পর্বের বাংলাদেশে। কিন্তু ইহাদের নূতন করিয়া উল্লেখের কিছু নাই।

একাধিকবার বলিয়াছি, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন ছিলেন সূর্যভক্ত, পরমসৌর। সূর্যদেবের পূজা আরও প্রসার লাভ করিয়াছিল এই পর্বে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কুলজীগ্রন্থমালার ঐতিহ্য স্বীকার করিলে মানিতে হয় বাংলাদেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা শশাঙ্কের আমলেই আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু গয়া-জেলার গোবিন্দপুর লিপি এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণের সাক্ষ্য একত্র করিলে মনে হয়, তাঁহাদের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল সেন-বর্মণ পর্বেই। কিন্তু যখনই হউক, এ-তথ্য সুবিদিত যে, শাকদ্বীপী মগ ব্রাহ্মণেরাই উদীচ্যবেশী সূর্য-প্রতিমা ও তাহার পূজা ভারতবর্ষে প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এবং ক্রমশ পূর্ব-ভারতে তাহা প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছিল। এই পর্বের একাধিক সূর্য-প্রতিমা বিদ্যমান, কিন্তু একটি প্রতিমা ছাড়া অন্যগুলি সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। এই ত্রি-শির দশভুজ সূর্য-প্রতিমাটি পাওয়া গিয়াছে রাজসাহী জেলার মান্দা গ্রামে। তিনটি মুখের দুই পাশের দু'টি উগ্ররূপের, এবং দশ হাতের আটটিতে পদ্ম, শক্তি, খট্বাঙ্গ, নীলোৎপল এবং ডমরু। সারদাতিলকতন্ত্র-মতে এই ধরনের সূর্যমূর্তিকে বলা হয় মার্তণ্ড-ভৈরব, অর্থাৎ সূর্য এবং ভৈরবের মিশ্ররূপ। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই উদীচ্যবেশী সূর্য-প্রতিমা ও তাহার পূজা বোধ হয় সেন-বর্মণ পর্বের পর বেশি দিন আর প্রচলিত থাকে নাই; অন্তত মধ্যযুগীয় সুবিস্তৃত সাহিত্যে তাহার পরিচয় কিছু পাইতেছি না। পদ্মোপরি স্থানক ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ সূর্যদেব, দুইপাশে উষা ও প্রত্যূষা নামে দুই স্ত্রী, এবং পায়ের কাছে সম্মুখেই অরুণ-সারথি; রূপ-কল্পনার দিকে হইতে এই প্রতিমার সঙ্গে স্থানক ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ বিষ্ণু, দুই পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী নামে দুই স্ত্রী এবং পায়ের কাছে সম্মুখেই বাহন গরুড়, এই প্রতিমার পার্থক্য কিছু বিশেষ নাই। তাহা ছাড়া, বিষ্ণুর সঙ্গে সূর্যের একটা সুপ্রাচীন বৈদিক সম্পর্ক তো ছিলই। কাজেই, অন্তত বাংলাদেশে বিষ্ণুর পক্ষে সূর্যকে গ্রাস করিয়া ফেলা কিছু কঠিন হয় নাই।

সৌর ধর্ম

অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিমার মধ্যে মনসার কথা আগেই বলিয়াছি। হারিতী ও ষষ্ঠী দেবীর কথাও বলা হইয়াছে। রাজসাহী জেলার মীরপুর গ্রামে একটি এবং বগুড়া জেলার সান্ত গ্রামে একটি ষষ্ঠী-প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে; উভয় ক্ষেত্রেই দেবীর ক্রোড়ে একটি মানবশিশু এবং দোল্যমান দক্ষিণপদের নীচেই একটি মার্জার। দিকপালদের দুই চারিটি প্রতিমার খবরও পাওয়া যায়।

গীতগোবিন্দ-রচয়িতা কবি ও সঙ্গীতকার জয়দেবের বিষ্ণু বা হরিভক্তি বিষয়ক কয়েকটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে উদ্ধার করা হইয়াছে; কবি শরণদেব-রচিত শ্লোকও আছে। কিন্তু জয়দেব শুধু রাধা-মাধব স্তুতিই রচনা করেন নাই; তিনি নিজে একান্তভাবে বৈষ্ণব ছিলেন না, ছিলেন পঞ্চদেবতার উপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ গৃহস্থ। তাঁহার রচিত মহাদেব-স্তুতি বিষয়ক শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত আছে (১।৪।৪)। শিব-গৌরীর বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যে-ধরনের চিত্র ও কল্পনা বিস্তৃত ঠিক সেই ধরনের চিত্র ও কল্পনার সাক্ষাৎ পাইতেছি এক অজ্ঞাতনামা কবি রচিত সদুক্তিকর্ণামৃত-ধৃত নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে :

> ব্রহ্মায়ং—বিষ্ণুরেষ—ত্রিদশপতিরসৌ-লোকোপালাস্তথৈতে
> জামাতা কোঽত্র ? সোঽসৌ ভুজগপরিবৃতো ভস্মরুক্ষঃ কপালী !
> হা বৎসে বঞ্চিতাসীত্যনভিমতবর প্রার্থনাব্রীড়িতাভির্
> দেবীভিঃ শোচ্যমানাপ্যুপচিত পুলকা শ্রেয়সে বোঽস্তু গৌরী ॥

শ্লোকটি পড়িলে মনে হয়, ভারতচন্দ্রের শিব-গৌরীর বিবাহ-বর্ণনা পড়িতেছি। এই অজ্ঞাতনামা কবিটি কি বাঙালী ছিলেন ?

সদুক্তিকর্ণামৃতে কালী সম্বন্ধেও কয়েকটি শ্লোক আছে, এবং ইহাদের কয়েকটি বাঙালী কবি বিরচিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সব শ্লোকে কালীর যে চিত্র বা ধ্যান, তাহা আমাদের মধ্যযুগীয় বা বর্তমান ধ্যান-কল্পনা হইতে পৃথক। মুসলমানাধিকারের পর বাঙালীর কালী ধ্যান-কল্পনায় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে; কি কারণে কি উপায়ে তাহা হইয়াছে তাহা অনুসন্ধানের বস্তু।

উমাপতি-ধরের একটি শ্লোকে কার্তিকের শিশুলীলার বর্ণনা আছে; পিতা শিবের বেশভূষা অনুকরণ করিয়া শিশু কার্তিক খুব কৌতুক অনুভব করিতেছেন। জলচন্দ্র নামে আর একজন কবি (বোধ হয় বাঙালীই হইবেন) অন্য আর একটি শ্লোকে শিশু কার্তিকের একটি ছবি আঁকিয়াছেন; সে-চিত্রে কার্তিক পিতা শিবের জটাজুট লইয়া ক্রীড়ারত।

সদুক্তিকর্ণামৃতের অনেকগুলি শ্লোকে দরিদ্র ভিখারী শিবের গৃহস্থালীর বর্ণনা আছে। এই সব ছবি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এত সুপ্রচুর এবং সাধারণ পল্লীবাসী গৃহস্থ বাঙালীর চিত্তের এত নিকট যে, মনে হয়, ইহাদের রচয়িতারা বুঝি বা বাঙালীই ছিলেন। যাহা হউক, এ-তথ্য নিঃসংশয় যে, এই ধরনের কার্তিক বা শিব-কল্পনার সূচনা মুসলমানাধিকারের আগেই দেখা গিয়াছিল।

গঙ্গাভক্তি বাঙালীর সুপ্রাচীন; সদুক্তিকর্ণামৃতে গঙ্গা সম্বন্ধে অনেকগুলি শ্লোক আছে। তাহার মধ্যে একটি বাঙালী কেবট বা কেওট কবি পপীপের রচনা :

বদ্ধাঞ্জলি নৌমি—কুরু প্রসাদম্, অপূর্বমাতা ভব, দেবি গঙ্গে।
অন্তে বয়ন্তরগতায় মহ্যম অদেহবন্ধায় পয়ঃ প্রযচ্ছ॥

আর একটি বঙ্গালদেশীয় অজ্ঞাতনামা এক কবির রচনা; তিনি নিজের বাণী বা ভাষাকে গঙ্গার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। প্রচুর জল বিশিষ্ট, গভীর, বঙ্কিম, মনোহর এবং কবিদের দ্বারা কীর্তিত বা উপজীবিত গঙ্গায় অবগাহন করিলে (দেহ মন) যেমন পবিত্র হয়, তেমনই ঘনরসময়, গভীর অর্থবহ, ব্যঞ্জনাযুক্ত, মনোহর এবং কবিদের দ্বারা উপজীবিত বঙ্গালবাণী বা ভাষায় অবগাহন করিলে পবিত্র হওয়া যায়। শ্লোকটি অন্যত্র উদ্ধার করিয়াছি, পুনরুক্তিভয়ে এখানে আর করিলাম না।

৮

সেন-বর্মণ পর্বের বাংলায় বৌদ্ধ দেবদেবী প্রতিমাও যে দুই চারিটি পাওয়া যায় নাই, এমন নয়; তবে ইহাদের সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, সেন-বর্মণ পর্বে বৌদ্ধধর্ম ও দেবদেবীর প্রভাব প্রতিপত্তি কমিয়া আসিতেছিল। দুই চারিটি বিহার ছিল, অভয়াকরগুপ্তের মত দুই চারিজন ধর্মাচার্যও ছিলেন; কিন্তু এই সব বিহার ও আচার্যদের সেই প্রভাব-প্রতিপত্তি আর ছিল না। পশ্চিম-বঙ্গের কথা ছাড়িয়া দিলেও, উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গে যেখানে সাড়ে তিন শত বৎসর ধরিয়া সর্বত্র নব বৌদ্ধধর্মের নিঃসংশয় প্রভাব সক্রিয় ছিল সেখানেও দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকীয় বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রতিমা বিরল। বস্তুত, রামপালের পর বৌদ্ধ ধর্মে উৎসাহী কোনো নরপতির নামও বিশেষ শুনা যাইতেছেনা। দুই চারিখানা পুঁথি এখানে ওখানে লেখা হইতেছিল সন্দেহ নাই, যেমন, হরিবর্মার রাজত্বকালে লিখিত দুইখানা পুঁথি কিছুদিন আগে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সাধারণভাবে সেন ও বর্মণ রাজবংশ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের উপর খুব শ্রদ্ধিত ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, এবং প্রত্যক্ষ অত্যাচারে না হউক পরোক্ষ নিন্দায় এবং অশ্রদ্ধায় বৌদ্ধদের উৎপীড়িত করিবার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে বলা হইয়াছে, ত্রয়ী বা তিন বেদবিদ্যাই হইতেছে পুরুষের আবরণ এবং তাহার অভাবে পুরুষেরা নগ্ন। এই উক্তিতে বেদবাহ্য বা বেদবিরোধী বৌদ্ধ, নাথ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের প্রতি যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ তাহা আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে হরিবর্মার মন্ত্রী ভট্ট-ভবদেবকে যখন বলা হইয়াছে "বৌদ্ধাম্ভোনিধি-কুম্ভ-সম্ভব-মুনিঃ" এবং "পাষণ্ডি-বৈতণ্ডিক-প্রজ্ঞা-খণ্ডন-পণ্ডিতঃ"। বেদবাহ্য বৌদ্ধদের পাষণ্ড বলিয়া অভিহিত করা যেন এই পর্ব হইতেই ক্রমশ রীতি হইয়া দাঁড়াইল। বল্লালসেন তাঁহার দানসাগর-

বৌদ্ধধর্মের পরিণতি

গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বলিতেছেন, পাষণ্ড (অর্থাৎ বৌদ্ধ) কর্তৃক প্রক্ষিপ্তদোষে দুষ্ট বলিয়া বিষ্ণু ও শিবপুরাণ দানসাগর-গ্রন্থে উপেক্ষিত হইয়াছে। অন্য আর একটি শ্লোকে তিনি বলিতেছেন, এই একই কারণে দেবীপুরাণও ঐ-গ্রন্থে নিবদ্ধ হয় নাই। এই গ্রন্থেরই উপসংহারে একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে, কলিযুগে বল্লালসেন-নামা, শ্রী ও সরস্বতী পরিবৃত প্রত্যক্ষ নারায়ণের আবির্ভাবই হইয়াছিল ধর্মের অভ্যুদয়ের জন্য এবং নাস্তিকদের (বৌদ্ধদের, নাথপন্থী প্রভৃতিদের) পদোচ্ছেদের জন্য। লক্ষ্মণসেন হয়তো বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট এতটা ছিলেন না। তাঁহার তর্পণদীঘি-শাসনে এক বৌদ্ধ-বিহারের খবর পাওয়া যাইতেছে, এবং তাঁহারই আদেশে বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেব পাণিনি-ব্যাকরণ আশ্রয় করিয়া লঘুবৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাধারণ ভাবে সেন-বর্মণ রাষ্ট্র বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতি প্রান্বিত ছিলেন না, এমন অনুমান কঠিন নয়; বৌদ্ধ দেবদেবীর বিরলতাই অকাট্য যুক্তি।

জীবজগতের বিবর্তনের নিয়ম মানব-সমাজের ইতিহাসেও সক্রিয়। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে একটা সংঘর্ষ যেমন বহু যুগ হইতে চলিতেছিল তেমনই সঙ্গে সঙ্গে নানাস্তরে নানা ক্ষেত্রে নানা উপায়ে একটা সমন্বয়ও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। ইহাই বস্তুর স্ব-ভাব। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ইতিহাসেও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। কিন্তু প্রাচীনতর কালের কিংবা সর্বভারতের কথা এখানে বলিয়া লাভ নাই ; বাংলা দেশের অষ্টম-নবম হইতে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ এই চার পাঁচশত বৎসরের কথাই বলি। পাল-চন্দ্র পর্বে রাষ্ট্রের আনুকূল্যের ফলে এবং নানা সাময়িক ও রাষ্ট্রীয় কারণে মহাযানী-বজ্রযানী-সহজযানী-কালচক্রযানী বৌদ্ধ ধর্মের যথেষ্ট প্রসার ও প্রতিপত্তি দেখা গিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রয়ী লোকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী এবং সেই ধর্মের দেবদেবীদের প্রভাব প্রতিপত্তিও কিছু কম ছিল না। দুই ধর্মের লোকদের সাধারণ লোকায়ত স্তরে ধর্ম লইয়া দ্বন্দ্ব কোলাহল খুব যে ছিল মনে হয় না, কিন্তু উপরের স্তরে ধর্ম ও সংস্কৃতির নায়কদের মধ্যে একদিকে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ যেমন ছিল তেমনই অন্য দিকে একটা সমন্বয়ের সচেতন চেষ্টাও ছিল। নিম্নস্তরে ক্রিয়াকর্মের অবিরাম সাযুজ্য ও সারূপ্য এই সমন্বয়ের কাজটা সহজও করিয়া দিয়াছিল। সদ্যোক্ত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, ধ্যান ও রূপ-কল্পনা উভয় ক্ষেত্রেই ছিল সক্রিয়।

এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান। চীনা শ্রমণ-পরিব্রাজকদের বিবরণীতে, শীলভদ্রের জীবন-কাহিনীতে, তিব্বতী ঐতিহ্যে, ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাসে এই সব প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের নায়কদের তর্কবিতর্কের ইতিহাসই তো প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাস, এক কথায় ভারতীয় ধারণার ইতিহাস। প্রত্যেকেই চেষ্টা করিতেন বিপরীত ধর্মকে আঘাত করিয়া নিজের ধর্মমতটি প্রতিষ্ঠা করিতে এবং সর্বত্রই যে তাহা খুব মার্জিত ভাষায় করা হইত তাহাও নয়। তর্কে পরাজয়ের অর্থই তো ছিল লজ্জা ও অপমান এবং প্রতিপক্ষের মতে ও ধর্মে দীক্ষা। এ-সব তথ্য এত সুবিদিত যে, বিস্তৃত ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন রাখে না। আলোচ্য পর্বের বাংলাদেশের

মাত্র প্রমাণ উদ্ধার করিলেই যথেষ্ট হইবে। সহজযানী সরহপাদ সহজযান মতবাদকে সমর্থন করিতে গিয়া অন্য সকল ধর্মমতকেই কঠোর ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন; বর্ণাশ্রমকে অস্বীকার করিয়াছেন, বেদের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, যাগযজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন কৃচ্ছ্রসাধনকেন্দ্রিক সন্ন্যাসধর্মকে আঘাত করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তিতে মহাযানীরা সূত্রের অর্থ না বুঝিয়া তাহার অপব্যাখ্যা করেন, শ্রমণেরা ভক্তশিষ্যদের ঠকাইয়া জীবিকানির্বাহ করেন, আর জৈনদের মত উলঙ্গ থাকিলেই যদি সিদ্ধিলাভ ঘটে তাহা হইলে শৃগাল-কুকুরও সিদ্ধির অধিকারী। ভট্ট-ভবদেবের কথা তো আগে বলিয়াছি; তিনি তো সমগ্র বৌদ্ধজ্ঞানসমুদ্র অগস্ত্যের মত নিঃশেষে পান করিয়াছিলেন এবং পাষণ্ড-বৈতণ্ডিকদের মত ও যুক্তি খণ্ডনে সিদ্ধ ছিলেন; আর বল্লালসেনের জন্মই তো হইয়াছিল বৌদ্ধ-জৈনদের মত নাস্তিকদের পদোচ্ছেদের জন্য। অন্য দিকে মহাযানী-বজ্রযানী সকল বৌদ্ধরা, নাথপন্থীরা, জৈনেরা সকলেই বেদের নিন্দা করিতেন; সহজযানীরা তো ব্রাহ্মণ্য এবং বজ্রযানী দেবদেবী পূজার কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে করিতেন না, নিন্দা-বিদ্রূপও করিতেন। পাল এবং চন্দ্র রাজাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা সুবিদিত, কিন্তু বৌদ্ধ এমন রাজা বা জননায়ক ছিলেন যাঁহারা ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সমসাময়িক কালের বাতাসে এই ধরনের পারস্পরিক অশ্রদ্ধার বিষ ছড়ানো না থাকিলে কিছুতেই তাহা সম্ভব হইত না। আচার্য করুণাশ্রীমিত্রের শিষ্যানুশিষ্য বিপুলশ্রীমিত্রের নালন্দা-লিপিতে আছে, বিপুলশ্রীমিত্রের যে-কীর্তির দ্বারা বসুমতী অলংকৃতা হইয়াছিলেন সেই কীর্তি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল, (যেন) হরির (উচ্চ) পদ হইতে তাঁহাকে অপসারিত করিবার জন্যই। আর, রণবঙ্কমল্ল-হরিকালদেবের ময়নামতী লিপিতে আছে, হরিকালদেবের শুভ্র যশদ্বারা ত্রিজগত ইতস্তত আক্রান্ত হওয়ায় সহস্রলোচন ইন্দ্র নিজের প্রাসাদ হইতে অবনীতে অবনমিত হইয়াছিলেন।

এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কিছু প্রমাণ এক ধরনের বজ্রযানী দেবদেবী-কল্পনার মধ্যেও আছে। বজ্রযানী প্রসন্নতারা, বজ্রজ্বালানলার্ক, বিদ্যুজ্জ্বালাকরালী প্রভৃতি দেবতার সাধনমন্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতিকে বলা হইয়াছে মার। শিব দশভুজা মারীচীর পদতলে পিষ্ট; তাঁহাকে এবং গৌরীকে একত্র পদদলিত করিতেছেন ত্রৈলোক্যবিজয়। ইন্দ্র অপরাজিতার ছত্রধর; ইন্দ্রানী পরমশ্বদ্বারা অপদস্থ। ইন্দ্র আবার উভয়বরাহাননা-মারীচীর কৃপাপ্রার্থী, তিনি আবার অষ্টভুজা মারীচী, পরমশ্ব ও প্রসন্নতারার পদতলে পিষ্ট। সিদ্ধিদাতা গণেশ অপরাজিতা, পর্ণশবরী এবং মহাপ্রতিসরার পদদলিত। অবলোকিতেশ্বরের অন্যতম রূপ হরিহরিহরিবাহনোদ্ভব-অবলোকিতেশ্বর গরুড়োপরি আসীন বিষ্ণুর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপর জয়ঘোষণা করিয়াছেন। সন্দেহ নাই, ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবদেবীদের কিছুটা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবার জন্যই এরূপ করা হইয়াছিল। তবে, লক্ষণীয় এই যে, সাধনে যাহাই থাকুক, এবং অন্যত্র এই ধরনের রূপ-কল্পনার প্রতিমা-প্রমাণ যাহাই থাকুক,

বাংলায় প্রাপ্ত মূর্তিগুলিতে সে-প্রমাণ নাই বলিলেই চলে; এখানে বজ্রযানী বৌদ্ধরা এতটা সম্মুখ সমরে বোধ হয় সাহসী হন্ নাই। বাংলার পর্ণশবরীর পদতলে গণেশ দলিত হইতেছেন না; বাংলার সম্বরও ব্রহ্মাকে পদতলে পিষ্ট না করিয়া তাঁহাকে হস্তে ধারণ করিয়াছেন। রমাই-পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ অর্বাচীন গ্রন্থ, ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে নির্ভরযোগ্যও নয়; কিন্তু ইহার মূল প্রেরণা যে বৌদ্ধ ধর্মের এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে গণেশ হইতেছেন কাজী, ব্রহ্মা মহম্মদ, বিষ্ণু পয়গম্বর, শিব আদম, নারদ শেখ, এবং ইন্দ্র মওলানা। উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিদ্রূপ, সন্দেহ কি!

কিন্তু দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কথা যদি বলিলাম, মিলন-সমন্বয়ের কথাটাও বলি। আগে, গুপ্ত ও পাল-পর্বে, একাধিক প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, উচ্চকোটির স্তরে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ যাহাই থাকুক লোকায়ত দৈনন্দিন জীবনের স্তরে কিন্তু একটা মিলন-সমন্বয় ধীরে ধীরে চলিতেইছিল। খড়্গ, পাল ও চন্দ্র-বংশের রাজারা তো সজ্ঞানে ও সচেতন ভাবেই এই মিলন-সমন্বয়ের সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের রূপ-কল্পনায়ও তাহা প্রতিফলিত হইতেছিল। বৌদ্ধ দেবায়তনে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীরা যেমন স্থান পাইতেছিলেন তেমনই ব্রাহ্মণ্য আয়তনে বৌদ্ধ দেবদেবীরাও ঢুকিয়া পড়িতেছিলেন। বৌদ্ধ আয়তনের সরস্বতী, বিঘ্নান্তক প্রভৃতি তো স্পষ্টতই ব্রাহ্মণ্য আয়তন হইতে গৃহীত; চর্চিকা ও মহাকাল দুই আয়তনেই বিদ্যমান। যোগাসন এবং লোকেশ্বর-বিষ্ণু ও ধ্যানী-শিব তো ধ্যানীবুদ্ধের আদর্শেই পরিকল্পিত। ব্রাহ্মণ্য বিষ্ণু ও শিবের প্রভামণ্ডলের উপরিভাগে উৎকীর্ণ ক্ষুদ্রাকৃতি দেবমূর্তির পরিকল্পনা একান্তই বৌদ্ধ প্রতিমার ধ্যানীবুদ্ধের রূপ-কল্পনানুযায়ী। বৌদ্ধ তারাদেবী তো ব্রাহ্মণ্য আয়তনে কালী এবং দুর্গারই অন্য নাম। রুদ্রযামল ও ব্রহ্মযামল-গ্রন্থের একটি কাহিনীতে বশিষ্ঠকে আদেশ করা হইয়াছে চীনদেশে গিয়া তারা ও তারাদেবীর সাধনার গুহ্য রহস্য শিখিয়া আসিবার জন্য। নিম্নে সাধনমালা হইতে বৌদ্ধ তারাদেবীর যে স্তোত্রটি উদ্ধার করিতেছি, তাহাতে দেখা যাইবে, তারাদেবী, উমা, পদ্মাবতী এবং বেদমাতা সকলে একই দেবীরূপে কল্পিতা হইয়াছেন। বস্তুত, লোকায়ত স্তরে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কিছু আর ছিল না।

> দেবী ত্বমেব গিরিজা কুশলা ত্বমেব
> পদ্মাবতী ত্বমসি [ত্বং হি চ] বেদমাতা।
> ব্যাপ্তং ত্বয়া ত্রিভুবনে জগদৈকরূপা
> তুভ্যং নমোঽস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ॥
>
> যানত্রয়েষু দশপারমিতেতি গীতা
> বিস্তীর্ণ যানিকজনা করুণাত্মিকেতি।
> প্রজ্ঞাপ্রসন্ন চতুরামৃতপূর্ণধাত্রী
> তুভ্যং নমোঽস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ॥

আনন্দনন্দ বিরসা সহজ স্বভাবা
চক্রত্রয়াদ পরিবর্তিত বিশ্বমাতা।
বিদ্যুৎপ্রভা হৃদয়বর্জিত জ্ঞানগম্যা
ভূত্যাং মনোহন্ত মনসা বপুষা গিরা নঃ॥

কিন্তু, এই মিলন-সমন্বয় সত্ত্বেও ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের দেবায়তন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িতেছিল। নালন্দার বৌদ্ধ বিহারে-মন্দিরে দেখিতেছি শিব, বিষ্ণু, পার্বতী, গণেশ, মনসা প্রভৃতিরা বৌদ্ধ দেবদেবীদের সঙ্গে সঙ্গেই পূজা পাইতেছেন। বাংলার সোমপুর ও অন্যান্য বিহারের অবস্থাও এইরূপই ছিল, এ-অনুমানে কিছু বাধা নাই। ইহার পশ্চাতে সমসাময়িক বৌদ্ধধর্মের ঔদার্য এবং বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমন্বয়-ভাবনা কতকটা সক্রিয় ছিল, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্বীকার করিতে হয়, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীরা ক্রমশ বৌদ্ধ দেবায়তন গ্রাস করিতেছিলেন এবং বৌদ্ধ গৃহী সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিতেছিলেন। সংখ্যা-গণনায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের লোকায়তন চিরকালই অনেক বেশি সমৃদ্ধতর। তাহা ছাড়া, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বাঙ্গীকরণ শক্তিও বৌদ্ধ ধর্মের চেয়ে বরাবরই ছিল বেশি। অন্য দিকে, পাল-আমলের শেষের দিক হইতেই নালন্দা-মহাবিহারের অবস্থা ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল ; জনসাধারণের ভিতর, বিশেষ ভবে উচ্চ ও মধ্যস্তরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাইতেছিল। বিহার ও বাংলাদেশের অন্যান্য বিহারে-সংঘারামেও বোধ হয় তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বিশেষভাবে সেন-বর্মণ আমলে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি রাজকীয় বিরাগ ও উচ্চ ও মধ্য কোটির লোকদের অনুদার দৃষ্টি, এবং অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সক্রিয় পোষকতা, এই দু'য়ের ফলে বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমসংকুচীয়মান অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। সংঘে-বিহারে সিদ্ধাচার্য ও তাঁহাদের ভক্ত-শিষ্য প্রভৃতি যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহাদের সাধন-আরাধনা ক্রমশ গুহ্য হইতে গুহ্যতর পথে বিবর্তিত হইতে লাগিল। গৃহী-শিষ্যরা তাহার গূঢ় গুহ্য রহস্য যে খুব বুঝিতেন, এমন মনে হয় না ; তাঁহাদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক লোক যাঁহারা এই পথ আঁকড়াইয়া রহিলেন তাঁহারা ইহার দেহমার্গী কায়া-সাধনাকে ক্রমশ পঙ্কের মধ্যে টানিয়া নামাইলেন। তাহা ছাড়া, পূজা-প্রতিমা ও অনুষ্ঠানের দিকটায়, অন্তত দৃশ্যত, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ ঘুচিয়া যাইতেছিল। লৌকিক মনের প্রতিমা-তৃষ্ণা মিটাইবার পক্ষে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের কোনো বাধা ছিলনা ; বস্তুত লোকায়ত মনে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিমায় রূপ ও অর্থের পার্থক্য তো ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। তত্ত্বের দিক হইতেও তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও আদর্শ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সাধনা উভয়কেই একই পর্যায়ে আনিয়া দাঁড় করাইতেছিল। কাজেই লোকায়ত সমাজে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাধনার প্রভাব ক্রমশ কমিয়া আসিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়! একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। আজও বাংলাদেশে মেয়েরা মাটীর তৈরী যে শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন তাহার মাথায় একটি মাটীর

গুলি দেওয়া হয়; তাহার নাম বজ্র। বেলাপাতা দিয়া তাহা সরাইয়া দিলে তবে তিনি শিবে পরিণত হইয়া পূজার যোগ্য হন।

অন্য দিকে, সমসাময়িক বৌদ্ধ ধর্ম ও দেবায়তনের প্রতি ব্রাহ্মণ্য জন-সমাজের বিরাগানুরাগ যাহাই থাকুক, বুদ্ধদেবের প্রতি কিন্তু প্রাগ্রসর ব্রাহ্মণ্য চিন্তার প্রীতি ও অনুরাগ ক্রমশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র উত্তর-ভারতেই। বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অন্যতম অবতার বলিয়া স্বীকৃতি লাভ বহুদিন আগেই করিয়াছিলেন; ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়ার প্রকৃতিই এইরূপ। এই স্বীকৃতি ক্রমশ অনুরক্তিতে পরিণত হইতে খুব দেরি হয় নাই। অষ্টম শতকে ব্রাহ্মণ কবি মাঘ তাঁহার শিশুপালবধ-কাব্যে বুদ্ধের প্রতি তাঁহার সপ্রশংস শ্রদ্ধা গোপন করিতে পারেন নাই। মারের সকল ভীতি ও প্রলোভনের মধ্যেও বুদ্ধের অবিকৃত চিত্তই তাঁহার প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল। একাদশ শতকে কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার অবদান-কল্পলতায় বলিতেছেন, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ ও অন্যান্য মুনিশ্রেষ্ঠগণ যে-কামসুখের জন্য বিকৃতচিত্ত হন সেই কামসুখকে যিনি তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিতে পারেন তিনি কাহার বিস্ময়ের পাত্র নহেন? এক সময়ে মৎস্য, বিষ্ণু, অগ্নি প্রভৃতি পুরাণে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাঁহার জন্মই হইয়াছিল অসুরগণকে মোহাবিষ্ট করিয়া দেবমার্গ হইতে তাহাদিগকে ভ্রষ্ট করিবার জন্য! কিন্তু সেদিন বহুদিন বিগত। আজ কিন্তু পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসারে দশাবতার স্তুতিতে বুদ্ধাবতার বেদবিরোধী বলিয়াই তাঁহাকে নমস্কার জানান হইতেছে। 'তুমি পশুহত্যা অবলোকন করিয়া কৃপাযুক্ত হইয়া বুদ্ধশরীর গ্রহণপূর্বক বেদ সকলের নিন্দা করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি যজ্ঞনিন্দা করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার।' বাংলাদেশে কবি জয়দেবের কণ্ঠেও তাহার প্রতিধ্বনিই যেন শুনিতেছি; গীতগোবিন্দের দশাবতার স্তোত্রে পাইতেছি:

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্
কেশবধৃত বুদ্ধ শরীরে জয় জগদীশ হরে।

আর, নৈষধ-রচয়িতা শ্রীহর্ষ যদি বাঙালী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিও সমসাময়িক বাঙালীর মনকেই ব্যক্ত করিতেছেন, যখন তিনি নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছেন মারজয়ী জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধের কথা, তাঁহার ক্ষমাশীলতা ও সৌন্দর্যের কথা। এইভাবে ধীরে ধীরে বেদবিরোধী যজ্ঞবিরোধী বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ্য-ধ্যানের স্বাঙ্গীকৃত হইয়া গেলেন; বৌদ্ধধর্মের তন্ত্রমার্গী সাধনা ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রমার্গী সাধনার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া প্রায় এক হইয়া গেল; বৌদ্ধ দেবায়তন আর ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে প্রতিমার রূপ-কল্পনার পার্থক্য প্রায় আর রহিল না। ইহার পর লোকায়ত সমাজে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম সক্রিয় সচেতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িতে আর দেরি হইল না।

তবু, বিহারে-সংঘারামে একটা বৃহৎ যতিগোষ্ঠী তো ছিলেনই; তাঁহাদের মধ্যে

তখনও স্বধর্মচেতনা সক্রিয়ও ছিল, যদিও সেন-বর্মণ আমলে তাহার পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ। কিন্তু, ইতিহাসের চক্রাবর্তে পড়িয়া তাহাও যেন দেখিতে দেখিতে ধূলায় পড়িল লুটাইয়া। দেখিতে দেখিতে নালন্দা-বিক্রমশীল-ওদন্তপুরীর মহাবিহার তুর্কীসেনার তরবারী ও অশ্বক্ষুরে চূর্ণবিচূর্ণ হইল, হাজার হাজার পুঁথি বিনষ্ট হইল, শত শত শ্রমণ অসিমুখে বিগতপ্রাণ হইলেন। তাহার পর সর্বভুক্ অগ্নি শেষকৃত্য সম্পন্ন করিল। যাঁহারা কোনোমতে প্রাণ বাঁচাইতে পারিলেন তাঁহারা অতিকষ্টে যাহা পারিলেন, যে ক'টি পুঁথি, ক্ষুদ্র মূর্তি ও প্রতিমা ও সূত্রোৎকীর্ণ মাটীর ফলক সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহা ঝুলিতে ভরিয়া পলাইয়া গেলেন তিব্বতে-নেপালে, কামরূপে-ওড়িষ্যায়, আরাকানে-পেগু-পাগানে এবং আরও দূরদেশে। আজ সেই সব গ্রন্থেরই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খণ্ডগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করিয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌছিয়াছে। এ-সব তথ্য সুবিদিত, কাজেই সবিস্তারে বলিয়া লাভ নাই। মিন্‌হাজ, তারনাথ, বুদ্ধগুপ্ত, পাগ-সাম-জোন-জাং-গ্রন্থের সংকলয়িতা সকলেই ইতিহাসের এই আবর্তের অল্পবিস্তর বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। নালন্দা-বিক্রমশীল-ওদন্তপুরীর শ্রমণেরা যাহা করিয়াছিলেন, বিশেষত মগধের বিহারগুলির ধ্বংসলীলার কথা শুনিয়া, বাংলার সোমপুর, জগদ্দল প্রভৃতি বিহারের শ্রমণেরাও তাহাই করিলেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই। সমসাময়িক বাংলার ভাবাকাশ তো এমনিতেই তাঁহাদের প্রতি খুব অনুকূল ছিল না!

ব্রাহ্মণ্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পর সম্বন্ধ

সেন-বর্মণ পর্বে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের যত বিরাগই থাকুক না কেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ ছিল বলিয়া একেবারেই মনে হয় না। বরং এক সাম্প্রদায়িক ধর্মের সঙ্গে আর এক ধর্মের একটা নিরুক্ত অথচ গভীর সহৃদয় চেতনা বোধ হয় এই পর্বে বেশ সক্রিয় ছিল। বস্তুত, ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের দৃষ্টান্ত প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে নাই বলিলেই চলে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও হরি-হরের যুগলমূর্তি এই সহৃদয় চেতনার প্রকাশ বলিয়াই মনে হইতেছে; এবং পাল-চন্দ্র ও সেন-বর্মণ পর্বে এই ধরনের বহু যুগলমূর্তি বিদ্যমান। এই দুই পর্বেই বিষ্ণুমূর্তির প্রাচুর্য অন্য যে কোনো সাম্প্রদায়িক প্রতিমার চেয়ে বেশি এবং বিষ্ণুভক্তরাই যে সংখ্যায় বেশি ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিষ্ণুভক্তের পক্ষেও শিব বা সূর্যপূজার কোনো বাধা ছিল না, অথবা শৈব বা সৌর হইলেই যে কেহ বিষ্ণু আরাধনা করিতেন না, এমনও নয়। উনকোটি এবং দেওপাড়া দুইই পরম শৈবতীর্থ, কিন্তু সেখানেও বিষ্ণু বিদ্যমান, এবং তিনিও শিবের সঙ্গে সঙ্গেই পূজা লাভ করিতেন। কমৌলি-লিপির বৈদ্যদেবের সম্প্রদায়গত পরিচয় পরম-মাহেশ্বর ও পরম-বৈষ্ণব উভয় রূপেই; ডোম্মনপাল পরম-মাহেশ্বর কিন্তু ভগবান নারায়ণকে শ্রদ্ধা জানাইতে তাঁহার কিছুমাত্র দ্বিধা জাগে নাই; লক্ষ্মণসেন পরম-বৈষ্ণব, তিনি, কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন তিনজনই তাঁহাদের লিপি আরম্ভ করিয়াছেন নারায়ণকে প্রণতি

জানাইয়া, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেরই রাজকীয় শীলমোহরে যাঁহার প্রতিমা উৎকীর্ণ তিনি সদাশিব। ইহাদের পূর্বপুরুষেরা সকলেই কিন্তু আবার পরম-শৈব। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন আবার সূর্যভক্তও, এবং সূর্যদেবকে প্রণতি জানাইতে তাঁহারা ভুলেন নাই; বস্তুত দুই জনই আত্মপরিচয় দিতেছেন পরমসৌর বলিয়া। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব সর্বসাধারণ্যে পরিচিত পরম-বৈষ্ণব বলিয়া, কিন্তু যথার্থত তিনি ছিলেন পঞ্চদেবতার উপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ; বস্তুত, জয়দেব যে যোগমার্গী পদও রচনা করিয়াছিলেন আচার্য সুনীতিকুমার সম্প্রতি তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। আচার্য হরপ্রসাদ দেখাইয়াছেন যে, কবি বিদ্যাপতি, বৈষ্ণব মহাজন বলিতে আমরা যে সাম্প্রদায়িক সাধক বুঝি, তাহা মোটেই ছিলেন না, সহজিয়া সাধকও ছিলেন না, তিনি পঞ্চদেবতার উপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং শিবের, গঙ্গার ও উমার উপাসক ছিলেন। গীতগোবিন্দকার জয়দেব সম্বন্ধেও এই কথাই বলা চলে। বস্তুত সাম্প্রদায়িক ধর্মের এই পারস্পর সম্বন্ধই বাংলার ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন পরিবার বৈষ্ণব বা শাক্ত বলিয়া পরিচিত, কিন্তু শাক্ত বা বৈষ্ণব বলিয়াই পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট কেহ নহেন। একই পরিবারে কেহ শাক্ত, কেহ বা বৈষ্ণব, কেহ বা তারার আরাধনায় রত, কেহ বা শিবের, কিন্তু তাহাতে অন্য দেবতার পূজারাধনায় কোনো বাধা নাই। ব্রাহ্মণ্য বাঙালী আজও একই সঙ্গে সমান উৎসাহে ও উদ্দীপনায় বিষ্ণু ও শিব, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, সূর্য ও কার্তিক এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে, অসংগতি কোথাও কিছু আছে বলিয়া মনে করে না। সেন-বর্মণ আমলেও অবস্থাটা প্রায় আজিকার দিনের মতই ছিল; এবং এই সব স্মার্ত, পৌরাণিক দেবদেবীদের সঙ্গে সঙ্গেই আবার সমান প্রচলিত ছিল নানা লৌকিক ব্রত, নানা লৌকিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা।

৯

সেন-রাজবংশের অবশেষ যখন পূর্ববঙ্গে অধিষ্ঠিত তখনও বৌদ্ধ ধর্ম একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। ১২২০ খ্রীষ্ট শতকের পট্টিকের-রাজ্যাধিপ মহারাজ রণবঙ্কমল্ল-হরিকালদেবের রাজত্বকালে তাঁহার সহজধর্মী প্রধানমন্ত্রী দুর্গোত্তারার এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মাধবকরের নিদানের মধুকোষ নামীয় টীকার রচয়িতা বিজয়-রক্ষিতের উপাধি ছিল আরোগ্যশালীয়। আরোগ্যশালী ছিল বুদ্ধদেব এবং অবলোকিতেশ্বরের অন্যতম উপাধি; সেই হিসাবে বিজয়-রক্ষিতের বৌদ্ধ হওয়া বিচিত্র নয়। বিজয়-রক্ষিতের কাল ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ। ইহার কিছুকাল পরই বিশ্রুতকীর্তি গৌড়ীয় কবিভারতী রামচন্দ্রের আবির্ভাব। শ্রুতি, স্মৃতি, আগম, জ্যোতিষ, তর্ক, ব্যাকরণ প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত রামচন্দ্র ক্রমে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন, এবং তাহার

বৌদ্ধধর্মের অবশেষ

ফলে নিগৃহীত ও অপমানিত হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১২৪৫ খ্রীষ্ট শতকের কিছু আগে তিনি সিংহলে চলিয়া যান, এবং সেই খানেই বাকী জীবন যাপন করেন। এই সিংহলে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সাধুতার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, এবং সমসাময়িক সিংহল-রাজ পরাক্রমবাহু তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া বৌদ্ধাগমচক্রবর্তী উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বৃত্তরত্নাকরের একটি টীকা (বৃত্তরত্নাকর-পঞ্জিকা) রচনা করেন। ১২৮৯ খ্রীষ্ট শতকে অনুলিখিত পঞ্চরক্ষার একটি পাণ্ডুলিপিতে গৌড়েশ্বর পরমরাজাধিরাজ মধুসেন নামে এক নরপতির উল্লেখ আছে। এই মধুসেন কোন্ বংশোদ্ভব বা তাঁহার রাজত্ব কোথায় ছিল বলা কঠিন, কিন্তু এ-তথ্য নিঃসংশয় যে, তিনি ছিলেন পরমসৌগত বা বৌদ্ধ। সন্নগর বা বড়নগরীর অধিবাসী মহাপণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর বনরত্নও (১৩৮৪-১৪৬৮) বাঙালী ছিলেন কিনা বলা কঠিন। বনরত্ন নেপালের ললিতপত্তনের গোবিন্দচন্দ্র-মহাবিহারে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছিলেন এবং সেখানে বসিয়া অনেক বৌদ্ধ-তন্ত্রগ্রন্থ, স্তোত্র ও টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন, অনেক গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদও করিয়াছিলেন। বনরত্ন কিছুকাল শ্রীজগুল-মহাবিহারেও ছিলেন। কিন্তু সন্নগর বা শ্রীজগুল যে কোথায় নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন। ১৪৩৬ খ্রীষ্ট শতকে জনৈক সদ্বৌদ্ধ করণ-কায়স্থ ঠক্কুর শ্রীঅমিতাভ বেণুগ্রামে বসিয়া সমসাময়িক বাংলা অক্ষরে (শান্তিদেব রচিত) বোধিচর্যাবতার-পুঁথিটি নকল করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতকেও তাহা হইলে বাংলাদেশে ইতস্তত দুই চারিজন বৌদ্ধ ছিলেন এবং শান্তিদেবের পুঁথির চাহিদাও ছিল! তারনাথ বলিতেছেন, এই শতকেরই দ্বিতীয়পাদে ছগল বা চঙ্গলরাজ নামে জনৈক বাঙালী নরপতি রাণীর প্রভাবে পড়িয়া বৌদ্ধ হইয়া বুদ্ধগয়ার মঠগুলির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। এ-তথ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। এই শতকে যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কিছু লোক নবদ্বীপ অঞ্চলে বাস করিতেন, তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় জনৈক চূড়ামণি দাস লিখিত একখানা চৈতন্য-চরিতে এবং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন, চূড়ামণি-দাসের চৈতন্য-চরিতে নাকি চৈতন্যের জন্ম হওয়ায় বৌদ্ধদেরও উৎফুল্ল হইবার কথা লেখা আছে! কিন্তু বৌদ্ধরা উৎফুল্ল কেন হইয়াছিলেন, জানিনা; বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতের উক্তি সত্য হইলে স্বীকার করিতে হয়, বৌদ্ধদের প্রতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা অত্যন্ত বিদ্বিষ্টই ছিলেন। অবধূত নিত্যানন্দের তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে প্রভু যে সকল বৌদ্ধ দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি 'ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে'। যে চূড়ান্ত অবমাননাটুকু বাকি ছিল এইবার তাহা হইল! লাথি মারা সত্য সত্যই হউক বা না হউক, মনোভাবটা এইরূপই ছিল। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ কালে ত্রিপতি (তিরুপাতি) ও বেঙ্কটগিরিতে যে-সব বৌদ্ধদের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল তাঁহাদের কথা বলিতে গিয়া বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্য-চরিতামৃতে সেই সব বৌদ্ধদের বলিয়াছেন পাষণ্ডী, পাষণ্ডীগণ,

এবং এই গ্রন্থেরই অন্যত্র বৌদ্ধদিগকে শবর, ম্লেচ্ছ ও পুলিন্দদের সঙ্গে এক পর্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ উল্লেখ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের অন্যত্রও আছে। বস্তুত, যুগমনোভাবটাই ছিল এইরূপ। কবি কর্ণপুরও চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধদিগকে পাষণ্ডিণঃ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম-চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বুদ্ধাবতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'ধরিয়া পাষণ্ড মত, নিন্দা করি বেদপথ, বৌদ্ধরূপী লেখে নারায়ণ'। বেশ বুঝা যাইতেছে, পঞ্চদশ শতক নাগাদ বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহ্নই হইয়া গিয়াছিল; দুই চারিজন যাঁহারা তখনও এই ধর্ম আঁকড়াইয়া ছিলেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীরা তাঁহাদের খুব নীচুস্তরের জীব বলিয়াই মনে করিতেন।

বস্তুত, বৌদ্ধ ধর্ম তাহার স্ব-স্বতন্ত্র রূপে আর বাংলাদেশে বাঁচিয়া নাই। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযান-সহজযান বৌদ্ধ ধর্ম যথার্থত বহুদিন বাঁচিয়া ছিল সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মে, নাথপন্থী ধর্মে, অবধূতমার্গীদের ধ্যান-ধারণায় ও অভ্যাসে, কৌলমার্গীদের ধর্মে ও ধ্যান-ধারণায়, এবং আজও বহুলাংশে বাঁচিয়া আছে আউল-বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে। নাথপন্থীরা নিজদের ক্রমে ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক শৈবধর্মে আত্মবিলীন করিয়া দিয়াছেন; সহজিয়া তান্ত্রিক বৈষ্ণবধর্ম আজও কিছু কিছু বাঁচিয়া আছে এখানে সেখানে আনাচে কানাচে, এবং বঙ্গীয় কবিকুলের ধ্যান-কল্পনায়; অবধূতমার্গীদের কিছু কিছু আচরণ বাংলার লোকায়ত সমাজের সন্ন্যাসাচরণের মধ্যে এখনও লক্ষ্য করা যায় (যেমন, চড়কের গাজন-সন্ন্যাসের মধ্যে); কৌলমার্গীরা আত্মবিলীন হইয়াছেন ব্রাহ্মণ্য শাক্তধর্মে।

আর, বৌদ্ধধর্মের কথঞ্চিৎ অবশেষ যে লুকাইয়া আছে বাংলার ও বাঙালীর কিছু কিছু স্থান-নাম ও লোক-নামের মধ্যে, তাহা আচার্য সুনীতিকুমার সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'বুদ্ধ' চলিত বাংলার 'বুদ্ধু'তে রূপান্তরিত এবং 'বুদ্ধু' বলিতে আমরা বোকা বা মূর্খই বুঝি; বাংলা রূপকথার 'বুদ্ধু ভুতুম' আমাদের মনেরই পরিচয়! 'সংঘ' বর্তমান বাংলার 'সাঙ্গাত' বা হিন্দী সংঘত (অর্থ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু) বা সংঘাতী বা সংঘতিতে রূপান্তরিত। 'ধর্ম' কথাটির অর্থরূপান্তর ঘটিয়াছে প্রচুর; কিন্তু বর্তমান বাংলার ধামরাই (ঢাকা জেলা), পাঁচথুপী, বাজাসন, নবাসন, উয়ারী প্রভৃতি স্থান-নাম যথাক্রমে প্রাচীন ধর্মরথ, পঞ্চস্তূপী, বজ্রাসন, নবাসন, উপকারিকা (=সুসজ্জিত অস্থায়ী মণ্ডপ) প্রভৃতি বৌদ্ধ স্মৃতিবহ (বার শব্দটি ফার্সী, অর্থ দেশ, দেয়াল, মণ্ডপ; প্রাচীনতর উয়ারী বা উপকারিকা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বারোয়ারী)। নেড়ানেড়ী কথাটিও ইসলামোত্তর বাংলায় প্রথমত বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদেরই বুঝাইত; আর বৈষ্ণবের 'ভেক' কথাটি এখন আমরা বিদ্রূপার্থে ব্যবহার করিলেও মূলত বৌদ্ধ 'ভিক্ষু' শব্দেরই ভ্রষ্ট রূপ। বাঙালীর পালিত, ধর, রক্ষিত, কর, ভূতি, গুঁই, দাম বা দাঁ, পান বা পাইন প্রভৃতি অন্ত্যনামও বোধ হয় বৌদ্ধস্মৃতিবহ, যেমন চন্দ, চন্দ্র, আদিত্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যস্মৃতিবহ।

আজিকার বাঙালীর হিন্দু ধর্মে তান্ত্রিক ধর্মের টানাপোড়েন কি করিয়া বিস্তৃত

হইয়াছে তাহার কিছু আভাস আগে দিতে চেষ্টা করিয়াছি। বৌদ্ধ বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযান-সহজযান এবং নাথযোগধর্ম, অবধূতমার্গ, কাপালিকমার্গ ও বাউল ধর্মের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কোথায়, তাহারও ইঙ্গিত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ-সম্বন্ধে আচার্য সুনীতিকুমারের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য গভীর অর্থবহ ও ইঙ্গিতময়।

> The present day Tantric leaven in Bengal Hinduism largely came to it *via* the Buddhistic *Kalacakrayana*, the *Vajrayana* and the *Sahajayana* schools of *Tantrayana*. One matter in which there has been a very subtle influence from Tantric Buddhism upon Bengal Brahmanism would seem to be this : the rather exaggerated importance of the *guru* from whom Tantric initiation is received. The Brahmana has his proper Vedic initiation when he is invested with the sacred thread by the *upanayana* rite...theoretically he does not require any other initiation. But, in practice, all good Hindus in Bengal should have a *guru* who will give him the *mantra*...and the *guru* becomes almost as a god to him after his initiation. This mentality has become so throughly ingrained in the Bengali mind... Now, the *guru* has always had an honoured place in Brahman society ; but he was never an object of divine honours in Vedism. Whereas, as we see in Nepal where the Tantric Buddhism as in Bengal of the 10th.—13th. centuries still survives among the Newars, although the strong Saiva or Sakta cult of the Gurkhas has been profoundly modifying it, a Buddhist is known as a *Gu-bhaju* or a 'Guru-worshipper', and a Brahmanical Hindu as a *De-bhaju* or a 'Deva-worshipper'.

আদিপর্বের শেষ অধ্যায়ে সর্বত্র স্মার্ত ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই জয়জয়কার। লোকস্তরে লোকায়ত ধর্মের প্রবাহ সদাবহমান, সন্দেহ নাই ; কিন্তু উচ্চ ও মধ্যকোটি স্তরে, ব্রাহ্মণ্য বর্ণসমাজবদ্ধ স্তরে সুবিস্তৃত পৌরাণিক দেবায়তনের অসংখ্য দেবদেবীদেরই অপ্রতিহত প্রভাব। স্মৃতিশাসিত বর্ণসমাজ সেই প্রভাবকে আরও সংহত ও সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

শেষ কথা

বৈদিক যাগযজ্ঞের এবং ধ্যান-কল্পনার কিছুটা প্রভাব যে নাই, এমন নয়, কিন্তু তাহা একান্তই কতকগুলি ব্রাহ্মণ বংশে সীমাবদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিলীয়মান ; যেটুকু আছে তাহা গোষ্ঠিগত এবং বিহারে-সংঘারামে অথবা ছোট ছোট কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ। তাহার সমস্ত সাধনপন্থাটাই গুহ্য এবং দেহযোগাশ্রয়ী। ব্রাহ্মণ্য শৈব এবং শাক্তধর্মও তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাসাচরণ দ্বারা স্পৃষ্ট। বস্তুত, জ্যোতিষ-আগম-নিগম-তন্ত্রবিধৃত ধ্যান-ধারণা-কল্পনাই এই যুগের প্রধান মানসাশ্রয়। তিথি-গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করিয়া স্নানাহার, বিভিন্ন তিথি-নক্ষত্রোপলক্ষে তীর্থস্থান, দান, পূজা, হোম, যজ্ঞ, ব্রতাচরণ, এই সব তো ছিলই ; তাহারই সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে ছিল নানা

ভয়-বিশ্বাসের লৌকিক দেবদেবীর পূজা, প্রতীকের পূজা, ব্রতোৎসব, পার্বণ, নানা প্রকারের যাত্রা উৎসব, ইত্যাদি। দেবদেবী, ভয়-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানের যেমন বিচিত্র স্তর, ধ্যান-ধারণারও তেমনই বিচিত্র স্তরে। এক প্রান্তে এক এবং অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের ধ্যান, আর এক প্রান্তে গাছ-পাথর-সাপ-কুমীরের ধ্যানে বিশ্বাস; এক প্রান্তে দেহকে অস্বীকার করিয়া তাহাকে নিপীড়িত করিয়া একমাত্র আত্মার শক্তি ও মহিমা প্রচার, আর এক প্রান্তে একান্ত দেহগত সাধনারই জয়জয়কার, দেহযোগের শক্তি ও মহিমা প্রচার, দেহের বাইরে আত্মার কোনো অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার; এক প্রান্তে বেদের অপৌরুষেয়ত্বে এবং অমোঘত্বে বিশ্বাস, আর এক প্রান্তে বেদ-বেদাঙ্গ একেবারে অগ্রাহ্য; এক প্রান্তে সমস্ত পূজাচার, সমস্ত অনুষ্ঠান, সমস্ত তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্র সাধনে অকুণ্ঠ বিশ্বাস, আর এক প্রান্তে একান্ত অস্বীকৃতি ও বিদ্রূপ এবং বস্তুপ্রকৃতির জয় ঘোষণা; এক প্রান্তে বেদ-স্মৃতি-পুরাণ, আর এক প্রান্তে প্রাগৈতিহাসিক আদিম মানবমনের ধ্যান-কল্পনা। মাঝখানে বিচিত্র জীবনোপায় লইয়া বিচিত্রতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর। প্রত্যেকটি স্তরের অসংখ্য লোকের চিত্তে ও আচরণে সদোক্ত ধ্যান ও ধারণা সমূহের বিচিত্র স্তরের অদ্ভূত জটিল তন্তুর লীলা সক্রিয়।

দ্বাদশ অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

অনিরুদ্ধ ভট্ট—পিতৃদয়িতা, ৮ পৃ, ৭৪-৮৫ পৃ; হারলতা, ১১৯-১৯২ পৃ।
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলার ব্রত।
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—গৌড়লেখমালা।
অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সং। Gaekwad Oriental Series.
কালিকা-পুরাণ—বঙ্গবাসী সং।
কৌলজ্ঞাননির্ণয়—প্রবোধচন্দ্র বাগচী সং।
গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ—গোপীনাথ কবিরাজ সং।
জয়দেব—গীতগোবিন্দ, দশাবতার স্তোত্র।
জীমূতবাহন—কালবিবেক; দায়ভাগ; সম্বন্ধবিবেক।
চৈতন্যভাগবত।
দিব্যাবদান; Cowell's edn. xxviii, Vitasokavadana, 427 p.
দোহাকোষ, ১ম খণ্ড।
নলিনীনাথ দাসগুপ্ত—বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম
পদ্মপুরাণ—ক্রিয়াযোগসার, বহরমপুর সং, ৫।৪১৬; ৪।৬৩
পুরাণ—গরুড়, স্কন্দ, ভাগবত, মৎস্য, বিষ্ণু, অগ্নি, ভবিষ্য, বৃহদ্ধর্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত, দেবী
প্রবোধচন্দ্র বাগচী—বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য।
পদ্মনাথ ভট্টাচার্য—কামরূপ শাসনাবলী।
বীরভূম-বিবরণ
বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা—শরৎচন্দ্র দাসের অনুবাদ।
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা—৫৩।৪৪ পৃ; ৩৩।৫৫ পৃ; ২২।৫ পৃ।
ভট্ট-ভবদেব—কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি।
সতীশচন্দ্র মিত্র—যশোহর ও খুলনার ইতিহাস।
সাধনমালা—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সং; Gaekwad Or. Ser., Intro.
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য।
" " শ্রীজয়দেব কবি, ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৫০
সুকুমার সেন—প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী।
" বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড।
শারদাতিলকতন্ত্র।
শরৎচন্দ্র রায়—ভারতবর্ষের মানব ও মানবসমাজ, ব-সা-প-পত্রিকা; ৪৫।৪র্থ সংখ্যা।
যতীন্দ্রমোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড।
রামচরিতম—V. R. S. edn.
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বৌদ্ধগান ও দোহা, মুখবন্ধ।
ক্ষিতিমোহন সেন—প্রবাসী মাসিক পত্রিকা, ১৩২৯, ৭৮৪-৯৫ পৃ।
Asiatic Society of Bengal—Descriptive catalogue of Sans. Mss. in Govt. collection under the care of.........Vol. I, Buddhist Mss.
Barua, B. M.—The Ājivikas, *in* Journ. Dept. Letters. Cal. Univ. Vol. II.
Basu, Nirmalkumar—The spring festival of India, *in* Man in India, VIII, 1927, 112—85 ff.

Bagchi, P. C. *ed.* and trans.—Pre-Aryan and pre-Dravidian in India. C. U.
" " —Le Canon bouddhique in China.
" " —Materials for a critical edition of the Bengali Caryāpadas.
" " —Studies in the Tantras.
Banerji, R. D.—Catalogue of sculptures in the Vangiya Sahitya Parishad.
Banerji, R. D.—Eastern Indian School of mediaeval sculptures.
" J. N.—Development of Hindu Iconography, Vol. I.
Beal, S. *ed*—Si-yu-ki. Buddhist records of the Western World, II.
" " " —The Life of Hiuen Tsang.
Bhattasali, N. K.—Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum.
Bhattacharya, Benoytosh—Buddhist Iconography.
Cambridge University Library—Catalogue of Buddhist Sans. Mss. in the...... Intro.
Chanda, R. P.—Indo-Aryan races. I.
" " —Archaeology and Vaishnava tradition. A. S. I. Memoir.
Chatterjee, S. K.—Indo-Aryan and Hindi.
—Origin and Development of the Bengali Language. Intro.
—Buddhist survivals in Bengal, *in* B. C. Law Vol. I, p. 75 ff.
Chattopadhaya, K. P.—Dharma worship, JASB. Letters. VIII. 1942. p. 99 ff.
" " The Cadak festival in Bengal, JASB. Letters, I. 1935. p. 397 ff.
Chavannes—Religieux Eminents.
Cordier, P.—Catalogue de fonde Tibetain de la Bibliotheque Nationale.
Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III.
Dacca University—History of Bengal, Vol. I, Chaps. XIII and XV.
Das, Sudhirranjan—Folk-religion of Bengal. An unpublished thesis.
Dasgupta, S. B.—Obscure religious cults as background of Bengali literature. C. U.
Dikshit, K. N.—Excavation at Paharpur. A S I Memoir.
Epigraphia Indica—II, p. 108, 380 ; XIII, 133 ; XV, p 137ff ; 140, 307, 311 ; XX, p 23, 61 ; XXI, p 1, 97fl ; 78 ; XXIII, 152, 155 ;
Fa-Hien—A Record of Buddhistic kingdoms. *Tr.* Legge.
Foucher, A.—Etudes sur l' Iconographie Bouddhique de l'Inde.........
Gieger, W. *ed.*—Mahāvamsa, p 193-94.
I-Tsing—A Record of the Buddhist religion. *Tr.* Takakusu.
Indian Antiquary—1910, p. 193 ff.
Indian Historical Quarterly—IV. p. 44 ; VIII, p 523-30 ; VI, 40, 572 ; X, 57 ff, 321.
Indian Culture, I, p 227 ff.
Jaina Sutras—S. B. E. XXII. p. 85, 288.
Journal of the Bihar and Orissa Research Society. 1927. p. 90.
Kern, H.—Mannual of Indian Buddhism.
Majumdar, N. G.—Inscriptions of Bengal, III.
Paul, P. C.—Early history of Bengal, II. Chaps X & XI.
Ramachandran—Maynamati, *in* B. C. Law Vol. II.
Raychaudhuri, H. C.—Early history of the Vaishnava sect.
Saraswati, S. K.—Early sculpture of Bengal.
Sastri, Haraprasad—Discovery of living Buddhism in Bengal.
Sen, Sukumar—Is the cult of Dharma a living relic of Buddhism in Bengal? *in* B. C. Law Vol. I, p. 663 ff.
Sumpa—Pag Sam Jon Zang. *ed* by S. C. Das.
Varendra Research Society—Annual Reports and Memoirs.
Yuan Chwang—Vol. II, *ed.* F. W. Watters.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভাষা-সাহিত্য ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান ঃ শিক্ষা-দীক্ষা

১

প্রাচীন বাংলার, তথা প্রাচীন ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার ইতিহাস সাধারণত আমরা আরম্ভ করিয়া থাকি বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ লইয়া। উপাদানের অভাবে প্রাক্-বৈদিক কাল সম্বন্ধে আজও কিছু বলিবার উপায় নাই। কিন্তু বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদে, এমন কি ধর্মশাস্ত্র-ধর্মসূত্রে এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা প্রতিফলিত, বাংলাদেশ বহুদিন তাহার স্পর্শও পায় নাই। ব্রহ্মাবর্ত ও আর্যাবর্তের হৃদয়দেশ হইতে বহুদূরে, আর্যাবর্তের প্রাচ্য প্রত্যন্তে অবস্থিত এই দেশে আর্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার ঘটিয়াছিল বহু বিলম্বে। কিন্তু তাহারও আগে এ-দেশে গৃহবদ্ধ, পরিবারবদ্ধ, সমাজবদ্ধ জনমানুষ বাস করিত; এবং তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং শিক্ষা-দীক্ষার একটা সংস্কারও ছিল, শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের একটা সংস্কৃতিও ছিল। এই সংস্কার ও সংস্কৃতিকে অনাগত কালের জন্য ধারণ করিয়া রাখে প্রত্যেক জন ও গোষ্ঠীর বিশিষ্ট লিপিবদ্ধ ভাষা। বস্তুত, লিপিবদ্ধ ভাষাই সেই বাহন যাহা এক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কার-সংস্কৃতিকে বহন করিয়া লইয়া যায় ভবিষ্যত যুগের দুয়ারে। কিন্তু সেই প্রাক্-আর্য নরনারীদের ভাষার লিপি কিছু ছিল না, থাকিলেও এ-পর্যন্ত আমাদের জানা নাই; কাজেই তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য আজ আমাদের দুয়ারে আসিয়া পৌঁছে নাই। তবে, তাঁহাদের শিল্প-সাহিত্য-নৃত্যগীতের অর্থাৎ চলমান সংস্কৃতির কিছুটা ধরিতে পারা সম্ভব আদিম কৌমসমাজের যে-সব নরগোষ্ঠী আজও আমাদের মধ্যে বিচরমান তাঁহাদের শিল্প-সাহিত্য-নৃত্যগীতে, এক কথায় তাঁহাদের সামগ্রিক জীবনচর্যায়।

প্রাক্-আর্য প্রাচ্য ভারতীয় নরনারীর ভাষা লইয়া আলোচনা-গবেষণা হইয়াছে প্রচুর, আজও হইতেছে। ভাষাতাত্ত্বিকদের সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত গবেষণার ফলে আজ আমরা জানি, প্রাচ্য ভারতের, তথা বাংলার সর্বপ্রাচীন ভাষা ছিল (যতটুকু নির্ণয় করা যায়) অষ্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষা, এবং সেই ভাষার ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা ছিল মন-খ্মের ভাষা-পরিবারের সঙ্গে; কিছুটা আত্মীয়তা কোল-মুণ্ডা ভাষা-পরিবারের সঙ্গেও ছিল। এই মুণ্ডা-মন্-খ্মের ভাষা-ভিত্তির উপর নূতন পলি রচনা করিয়াছিল দ্রবিড় ভাষা-পরিবারের স্রোত, বিশেষভাবে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে এবং কিছুটা মধ্য বাংলায়ও। পূর্ব ও উত্তর-বাংলায় দ্রবিড় ভাষার পলি বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই,

প্রাক্-আর্য ভাষার কথা

মোটামুটি এ-কথা বলা চলে। পশ্চিম ও মধ্য-বাংলায়ও দ্রবিড় ভাষার প্রভাবের বিস্তৃতি ও গভীরতা কতটা ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় আজও নাই। পূর্ব ও উত্তর-বাংলার প্রাচীনতর মুণ্ডা-মন্‌খ্‌মেরমূল ভাষার উপর তৃতীয় একটি ভাষাস্রোত আপন প্রবাহ মিশাইয়াছিল; সে-ভাষা ভোটব্রহ্ম নরগোষ্ঠীর ভাষা, প্রাচীন কিরাতদের ভাষা। নানা নরগোষ্ঠীকে আশ্রয় করিয়া নানা ভাষার এই জটিল সংমিশ্রণের সূচনা বাংলাদেশে, তথা প্রাচ্য-ভারতে আরম্ভ হইয়াছিল খ্রীষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী আগে হইতেই।

বেদ-ব্রাহ্মণের আর্য ঋষিরা প্রাচ্য-ভারতকে খুব সুনজরে দেখিতেন না, এ-কথা তো আগেই একাধিক প্রসঙ্গে বলিয়াছি। তাহার অন্যতম প্রধান কারণ, প্রাচ্য নরনারীর ভাষা ছিল তাঁহাদের নিকট দুর্বোধ্য, অর্থহীন। অথর্ববেদের ঋষিদের কাছে প্রাচ্যদেশ বহু দূরদেশ; শতপথ-ব্রাহ্মণে এ-দেশের লোকেরা 'আসুর্য' অর্থাৎ অসুরপ্রকৃতি বিশিষ্ট; ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এ-দেশ দস্যুদের দেশ; বৌধায়ন-ধর্মসূত্র রচনাকালেও এ-দেশ অস্পৃশ্যদের দেশ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে প্রাচ্য ভারতে আর্যভাষার প্রসার ঘটিতে আরম্ভ করিল এবং বোধ হয় কিছু কিছু আর্য-সংস্কৃতিরও; তবে, যতটুকু জানা যায়, এই আর্যভাষা ও সংস্কৃতি দীর্ঘমুণ্ড ঋগ্বেদীয় আর্যভাষা ও সংস্কৃতি নয়, হ্রস্বমুণ্ড অ্যালপীয় আর্যদের ভাষা ও সংস্কৃতি—গ্রীয়ার্সন যাঁহাদের বলিয়াছেন 'বহিরার্য'। এই অ্যালপীয় (বা অ্যালপো-দীনারীয়) আর্যরা ছিলেন অবৈদিক এবং সেই হেতু 'অযজ্ঞ্য' অর্থাৎ যজ্ঞধর্মবিরোধী। অথর্ববেদের এবং পাণিনি-ব্যাকরণের সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, প্রাচ্য-ভারতীয় ব্রাত্যদের ভাষা আর্যপরিবারের হইলেও সে-ভাষা ঋগ্বেদীয় আর্যভাষা হইতে পৃথক এবং তাহার 'প্রাকৃত'-লক্ষণ সুস্পষ্ট। এ-তথ্য লক্ষ্যণীয় যে, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী এবং অন্যান্য বীরগাথা যাঁহারা গাহিয়া বেড়াইতেন তাঁহাদের বলা হয় 'সূত' এবং 'মাগধ' এবং বাজসনেয়ী-সংহিতায় মগধের লোকদের বলা হইয়াছে 'তীক্ষ্ণ বা উচ্চস্বর বিশিষ্ট' (অতিক্রুষ্টায় মাগধম্)। যাহাই হউক, এ-পর্যন্ত যে সাক্ষ্য-প্রমাণ আমাদের গোচর তাহাতে অনুমান করা চলে ভারতের পূর্বাঞ্চলের আর্যভাষা উত্তর-ভারতীয় আর্যভাষা হইতে ছিল পৃথক, এবং তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও কিছু কিছু ছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী পাণিনি সেই জন্যই তাঁহার ব্যাকরণে বিশেষভাবে প্রাচ্য 'সংস্কৃত' ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গির বিশেষ উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন, এবং প্রাচ্য বৈয়াকরণিকদের বিশিষ্ট মতামত উল্লেখ করিতেও ভুলেন নাই! প্রসঙ্গত এ-কথা বলা উচিত, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে গৌড় এবং গণপাঠে বঙ্গের উল্লেখ আছে। এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, পাণিনি উদীচ্য বা উত্তরাখণ্ডের ভাষাকেই আর্যভাষার মাপকাঠি বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রাচ্য ভাষার বিচারও সেই ভাবেই করিয়াছেন। কৌষীতকি-ব্রাহ্মণেও সুস্পষ্ট বলা হইয়াছে, 'উদীচ্যখণ্ডের ভাষাই শুদ্ধ ও মার্জিততর; লোকেরা সেইজন্যই ভাষা শিখিবার জন্য উত্তরে গিয়া থাকে, এবং সেখান হইতে যিনি আসেন তাঁহার ভাষা শুনিতে ভালবাসে।' উত্তর ও মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গে প্রাচ্য-ভারতের ভাষার

পার্থক্য পতঞ্জলিরও দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, পূর্বাঞ্চলের লোকেরা বিশেষ অর্থে কতকগুলি অদ্ভুত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে, এবং 'র' স্থানে 'ল' ব্যবহার করা তাহাদের ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ; সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ-কথাও বলিয়াছেন যে, এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য 'আসুর' বা অসুর নরগোষ্ঠীর। আমরা জানি, 'র' স্থানে 'ল' ব্যবহার পরবর্তী মাগধী প্রাকৃতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ; এবং আচার্য লেভি প্রমাণ করিয়াছেন, এই বৈশিষ্ট্য মুণ্ডা-মনখ্‌মের ভাষা পরিবারের। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে, (আর্যদের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে) অসুরদের ভাষা ছিল 'র' ও 'ল' কার বহুল, অব্যক্ত অস্পষ্ট, নিষ্ঠুর (রূঢ়) ইত্যাদি। আগেই দেখিয়াছি, শতপথ-ব্রাহ্মণে প্রাচ্য-ভারতের লোকদের বলা হইয়াছে 'আসুর্য' এবং পতঞ্জলি যখন 'র' স্থানে 'ল'-বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন 'আসুর', তখন বুঝিতে দেরি হয় না যে, বাংলা ও প্রাচ্যখণ্ডের প্রাক্‌-আর্য আদিভাষা ছিল মুণ্ডা-মন্‌খ্‌মের পরিবারের ভাষা, এবং তাহারই প্রভাব পড়িয়া অবৈদিক আর্যভাষার যে-সব বিশিষ্ট লক্ষণ গড়িয়া উঠিয়াছিল তন্মধ্যে 'র'—'ল' রূপান্তর একটি। হয়তো আরও ছিল, কিন্তু পতঞ্জলি তাহাদের উল্লেখ করেন নাই। তিনি যে বিশেষ বিশেষ অর্থে কতকগুলি অদ্ভুত ক্রিয়াপদের ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন, তাহাও যে 'অসুর' ভাষার প্রভাবে নয়, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না।

পাণিনি প্রাচ্যখণ্ডের বৈয়াকরণিকদের বিশিষ্ট মতামতের কথা বলিয়াছেন। এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, এই সব বৈয়াকরণিকদের মতামত যথেষ্ট শক্তি ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছিল ; নহিলে পাণিনি তাহা উল্লেখ করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতেন না। কিন্তু সাহিত্য রচিত ও গ্রথিত না হইলে ব্যাকরণ রচিত হয় না, রচনার প্রয়োজনও হয় না ; বৈয়াকরণিকদের বিশিষ্ট মতামত ও গড়িয়া উঠে না। সুতরাং অনুমান করা চলে, প্রাচ্য অ-বৈদিক আর্যভাষায় কিছু কিছু সাহিত্য রচিতও গ্রথিত হইয়াছিল, ভাষার রীতি-পদ্ধতি লইয়া আলোচনা-গবেষণাও হইয়াছিল ; কিন্তু কি ছিল সেই সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের রূপ ও প্রকৃতি তাহা বলিবার মত কোনো উপাদানই আমাদের হাতে নাই।

অবৈদিক প্রাচ্য আর্যভাষা ও সংস্কৃতির পদানুসরণ করিয়া ক্রমশ উত্তর ও মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা প্রাচ্যদেশে বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করিল ; এবং প্রাচ্য প্রাকৃত ও উত্তর ও মধ্য-ভারতীয় সংস্কৃতের স্রোত বাংলাদেশে সবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল খ্রীষ্টীয় শতকের কিছু আগে হইতেই, বোধ হয়, মৌর্য-আমল হইতে—গোড়ার দিকে বাংলার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে এবং পরে ক্রমশ পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলেও। এই স্রোতের বাহক হইলেন মধ্য-ভারতীয় নানাধর্মী যতি-সন্ন্যাসীরা, বণিক-সার্থবাহরা, সৈনিক-রাজপুরুষেরা। প্রাক্‌-আর্য ও অনার্য নরনারীরা ক্রমশ বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আশ্রয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির নিকট মাথা নুয়াইতে বাধ্য হইলেন ; উত্তর-বাংলা (এবং সম্ভবত পশ্চিম-বাংলাও) মৌর্য-সাম্রাজ্যান্তর্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসার প্রতিপত্তি

বিস্তার আরও সহজ হইয়া গেল। মহাস্থানের ব্রাহ্মী লিপিখণ্ডই সমসাময়িক বাংলায় প্রচলিত আর্যভাষার একমাত্র অভিজ্ঞান।

> "... -নেন সবগীয় [t] নং [গলদনস] দুমদিন [-মহা-] মাতে সুলখিতে পুডনগলতে এ [ত] ং [নি] বহিপয়িসতি। সংবগীয়ানং [চ দি] নে [তথা] [ধা] নিয়ং নিবহিসতি। দ [ং] গ [t] তিয়া [f] য়া [f] য় [t] ক [t] দ [বা-] [তিয়ায়ি] কসি। সুঅতিয়ায়িক [সি] পি গংডি [কেহি] [ধানিয়ি] কেহি এস কোঠাগালে কোসং [ভয়-] [নীয়ে]।

বলা বাহুল্য, এই ভাষা প্রাচীন মাগধী বা প্রাচ্য প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত। যাহাই হউক, এই ভাবে প্রাক্-আর্য ও অনার্য ভাষাগুলি আর্যভাষার পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল, এবং বিগত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডে আর্য ভাষা অনার্য ও প্রাক্-আর্য ভাষাকে গ্রাস করিয়া করিয়া অগ্রসর হইতেছে। সে-ক্রিয়া আজও চলিতেছে এবং যতদিন মুণ্ডা-কোল-মন্‌খ্‌মেরু, দ্রবিড় ও ভোট-ব্রহ্ম ভাষা ও বুলিগুলির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি না ঘটিবে ততদিন চলিতেই থাকিবে।

২

মহাস্থান-লিপির কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলায় গুপ্তাধিকার বিস্তৃতির কাল পর্যন্ত আর্য ভাষার রূপ ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল, এবং সে-ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার কিরূপ হইয়াছিল তাহা জানিবার কোনো উপায় নাই। অনুমান করা চলে, আর্য-ভাষার প্রাচ্য মাগধী প্রাকৃত রূপই ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছিল; কিন্তু, এ-কথাও বোধ হয় সত্য যে, পোষাকী ভাষা হিসাবে অর্থাৎ পণ্ডিত-সমাজে এবং রাজকীয় ক্রিয়াকর্মে সেই ভাষা স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। কারণ, পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে যে ক'টি গুপ্তবংশীয় রাজকীয় পট্টোলী আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার একটিরও ভাষা প্রাচ্য প্রাকৃত নয়, মধ্য-ভারতীয় বিশুদ্ধ সংস্কৃত। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের নিকট পোখরণা বা পুষ্করণ গ্রামে প্রাপ্ত চতুর্থ শতকের চন্দ্রবর্মার লিপির ভাষাও সংস্কৃত। লক্ষ্যণীয় এই যে, এই প্রত্যেকটি লিপিই রচিত গদ্যে এবং সাহিত্যরসের কোনো আভাসও এই রচনাগুলিতে নাই। বস্তুত, সপ্তম শতকীয় লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলী বা কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার নিধনপুর পট্টোলীর আগে সমসাময়িক মধ্য-ভারতীয় অলংকারবহুল কাব্যরীতির কোনো পরিচয়ই বাংলাদেশে পাইতেছিনা। মনে হয়, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের আগে বাঙালী পণ্ডিত-সমাজ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণধারার সঙ্গে ভাল করিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করিতেই পারেন নাই। চেষ্টাটা আরম্ভ হইয়াছিল আরও কয়েক শতাব্দী আগে হইতেই, এবং বৌদ্ধ সংঘারাম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেন্দ্রগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ শিক্ষায়তন হইয়া গড়িয়াও উঠিতেছিল।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্ব

নহিলে পঞ্চম শতকে তাম্রলিপ্তিতে বসিয়া অধ্যয়ন ও পুঁথি নকল করিয়া চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ সুদীর্ঘ দুই বৎসর কাটাইতেন না। সপ্তম শতকে যখন য়ুয়ান-চোয়াঙ্ কযঙ্গল, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণসুবর্ণ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন তখন বৌদ্ধ, নিগ্রন্থ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এই সব জনপদের লোকদের জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানচর্চার তিনি ভূয়সী প্রসংশা করিয়াছেন। কযঙ্গলে তখন ছ'সাতটি বৌদ্ধ বিহারে তিন শতের উপর বৌদ্ধ শ্রমণ; পুণ্ড্রবর্ধনের বিশটি বিহারে তিন হাজারের উপর শ্রমণ সংখ্যা, সমতটের ত্রিশটি বিহারে শ্রমণ সংখ্যা দুই হাজারের উপর, কর্ণসুবর্ণের দশটি বিহারে দুই হাজারের উপর এবং তাম্রলিপ্তির দশটি বিহারেও প্রায় একই সংখ্যক শ্রমণের বাস। পুণ্ড্রবর্ধনের পো-সি-পো-(মহাস্থানের সন্নিকটে ভাসু বিহার ?)বিহার এবং কর্ণসুবর্ণের রক্তমৃত্তিকা-(লো-টো-মো-চি)বিহার যে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, য়ুয়ান-চোয়াঙের সাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ। নালন্দার-মহাবিহারের সঙ্গেও ষষ্ঠ-সপ্তম শতকীয় বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, এবং বাংলার শিক্ষার্থী, আচার্য ও রাজবংশ নালন্দা-মহাবিহারের সংবর্ধনের জন্য যে প্রয়াস করিয়াছেন তাহা তুচ্ছ করিবার মত নয়। এই মহাবিহারের মহাচার্য বিশ্রুতকীর্তি শীলভদ্র ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মণ্য রাজবংশের অন্যতম সন্তান, এবং তিনিই ছিলেন য়ুয়ান-চোয়াঙের গুরু। শীলভদ্র ভারতের নানাস্থানে জ্ঞানান্বেষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে নালন্দায় আসিয়া স্থিতিলাভ করেন, এবং আচার্য ধর্মপালকে গুরুত্বে বরণ করিয়া লন। দেখিতে দেখিতে বৌদ্ধ ধর্মের সূক্ষ্ম ও জটিল চিন্তাধারায় তাঁহার গভীর জ্ঞানলাভ ঘটে, এবং তাঁহার জ্ঞান ও জীবনচর্যার খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। শীলভদ্রের যখন মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়স তখন দক্ষিণ-ভারত হইতে এক ব্রাহ্মণ আচার্য নালন্দায় আসেন আচার্য্য ধর্মপালের সঙ্গে বিতর্কের জন্য। ধর্মপাল শীলভদ্রকে আদেশ করিলেন বিচারে প্রবৃত্ত হইতে। শীলভদ্র অচিরেই সেই ব্রাহ্মণ আচার্যকে বিতর্কে পরাভূত করিয়া আপন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিলেন। মগধের রাজা সন্তুষ্ট হইয়া শীলভদ্রকে একটি গ্রামের রাজস্ব পুরস্কার স্বরূপ দিতে চাহিলেন; শীলভদ্র প্রথমে রাজী হন নাই, কিন্তু পরে তাঁহাকে স্বীকৃত হইতে হয়। সেই অর্থ দ্বারা তিনি একটি বিহার নির্মাণ করেন এবং বাৎসরিক রাজস্ব দান করিয়া দেন সেই বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য। কালক্রমে শীলভদ্র নালন্দা-মহাবিহারের মহাচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হন; মহাবিহারে তখন প্রায় ১০,০০০ শ্রমণের বাস। তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র শীলভদ্রই সমস্ত শাস্ত্র ও সূত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিনীত শ্রদ্ধায় মহাবিহারের সকল শ্রমণেরা তাঁহাকে 'সদ্ধর্মের ভাণ্ডার' বলিয়া সম্ভাষণ করিত। শীলভদ্রের নিকট য়ুয়ান-চোয়াঙ্ যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন; য়ুয়ান-চোয়াঙের সঙ্গে সঙ্গে একটি ব্রাহ্মণও সেই অধ্যয়নে যোগদান করিয়াছিলেন। শীলভদ্রের অনুরোধে রাজা শিলাদিত্য হর্ষবর্ধন সেই ব্রাহ্মণকে তিনটি গ্রামের ভূমি-রাজস্ব দান করিয়াছিলেন। শীলভদ্র রচিত অন্তত

একটি গ্রন্থের কথা আমরা জানি; সে-গ্রন্থটি হইতেছে আর্য-বুদ্ধ-ভূমি-ব্যাখ্যান; এই গ্রন্থটি তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

সমসাময়িক তাম্রলিপ্তির শিক্ষাদীক্ষার সংবাদ আরও একাধিক চীনা শ্রমণের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়। তা চে'ং-তেঙ্ নামে এক চীনা শ্রমণ বারো বৎসর তাম্রলিপ্তিতে বসিয়া সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া বৌদ্ধধর্মে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এবং তাহার পর চীনদেশে ফিরিয়া গিয়া সেখানে উল্লঙ্গের নিদানশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাও-লিন নামে আর একজন চীনা শ্রমণ তিন বৎসর তাম্রলিপ্তিতে বসিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন এবং সর্বাস্তিবাদ-নিকায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ই-ৎসিঙ্ তাম্রলিপ্তি আসিয়াছিলেন ৬৭৩ খ্রীষ্ট শতকে; সুবিখ্যাত পো-লো-হো (বরাহ ?)-বিহারে তা চে'ঙ্-টেঙ'র সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তিনি এই বিহারে কিছুকাল কাটাইয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষা এবং শব্দবিদ্যার চর্চা করিয়াছিলেন, এবং নাগার্জুন-বোধিসত্ত্ব-সুহৃল্লেখ নামে অন্তত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। অন্য এক চীনা পরিব্রাজক সেং-চি বলিতেছেন, সমতটের তদানীন্তন রাজা প্রতিদিন মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্রের লক্ষ শ্লোক আবৃত্তি করিতেন।

বৌদ্ধ বিহার-সংঘারামগুলি প্রত্যেকটিই ছিল বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র, এবং য়ুয়ান-চোয়াঙ্ এবং অন্যান্য চীনা-সাক্ষ্যেই সপ্রমাণ যে, এই কেন্দ্রগুলিতে শুধু বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রই শুধু পঠিত হইত তাহা নয়, ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, সাংখ্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলা, মহাযান শাস্ত্র, অষ্টাদশ নিকায়বাদ, যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন দিকও বৌদ্ধ শ্রমণদের অধিতব্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ যে অসংখ্য দেবমন্দিরের কথা বলিয়াছেন, তাহাদের কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মণ-আচার্য-উপাধ্যায় ইত্যাদিও কম ছিলেন না; এবং যে অগণিত দেবপূজকের কথা য়ুয়ান-চোয়াঙ্ বলিয়াছেন, তাঁহারা যে শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রেরই চর্চা করিতেন, এমন মনে করিবার কারণ নাই। নানা পার্থিব, দৈনন্দিন সমস্যাগত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার চর্চাও নিশ্চয়ই তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যাহাই হউক, এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের মধ্যে বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা এবং বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আশ্রয় করিয়া আর্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা বাংলাদেশে প্রোথিতমূল হয় এবং শতাব্দী কালের মধ্যেই ফসল ফলাইতে আরম্ভ করে। সপ্তম শতকের লিপিগুলির অলংকারময় কাব্য-রীতিই তাহার প্রমাণ। এই কাব্যরীতি একান্তই মধ্য-ভারতীয় রচনারীতি ও আদর্শের প্রেরণা ও অনুকরণে সৃষ্ট, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই লিপিগুলি ছাড়া কাব্যসাহিত্য-চর্চার আর কোনো প্রমাণ আমাদের সম্মুখে অনুপস্থিত।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাদিক সম্বন্ধে অনুশীলনের কিছু কিছু পরিচয় এ-পর্বে বিদ্যমান। ব্যাকরণের চর্চায় প্রাচ্য-ভারত, তথা বাংলাদেশে অতি প্রাচীন কালেই প্রসিদ্ধি লাভ

করিয়াছিল ; পাণিনির সাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ। সপ্তম শতকে ই-ৎসিঙ্ যে-সব বিদ্যা অনুশীলন করিবার জন্য তাম্রলিপ্তি আসিয়াছিলেন তাহার মধ্যে শব্দবিদ্যা অন্যতম। প্রাচীন বাংলার এই ব্যাকরণ-প্রসিদ্ধি যাঁহাদের জ্ঞান ও খ্যাতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদের মধ্যে চান্দ্র-ব্যাকরণ পদ্ধতির স্রষ্টা চন্দ্রগোমী অন্যতম। চান্দ্র-ব্যাকরণ ও তাঁহার বৃত্তি বা টীকা চন্দ্রগোমীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই ব্যাকরণ মুখ্যত পাণিনি-অনুসারী, এবং এক সময়ে কাশ্মীর-নেপাল-তিব্বত-সিংহলে ইহার প্রচলনও ছিল প্রচুর, কিন্তু মৌলিকতা এবং নূতন কোনো তত্ত্ব বা রীতির অভাবে এই প্রসার ও প্রসিদ্ধি পরবর্তী কালে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। পাগ্-সাম্-জোন-জাং-গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, চন্দ্রগোমী ছিলেন পতঞ্জলির মহাভাষ্য-রীতিপদ্ধতির বিরোধী। ভর্তৃহরি তাঁহার বাক্যপদীয়-গ্রন্থে জনৈক বৈয়াকরণিক চন্দ্রাচার্যের নাম করিয়াছেন এবং তিনি যে মহাভাষ্য-মতবিরোধী ছিলেন এরূপ ইঙ্গিতও করিয়াছেন ; কলহণও তাঁহার রাজতরঙ্গিনী-গ্রন্থে চন্দ্রাচার্য ও তাঁহার ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বলিতেছেন, চন্দ্রাচার্য মহাভাষ্য-চর্চার পুনঃপ্রচলন করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, বিশেষজ্ঞরা অনেকেই মনে করেন, চন্দ্রগোমী ও চন্দ্রাচার্য একই ব্যক্তি। চন্দ্রগোমিন ও তাঁহার ব্যাকরণের সন-তারিখ লইয়া পণ্ডিতদের ভিতরে মত-বিরোধের অন্ত নাই। তবে মোটামুটি বলা চলে, জয়াদিত্য ও বামনের কাশিকা-গ্রন্থের (পাণিনি-টীকা) আগেই চান্দ্র-ব্যাকরণ রচিত ও সুপ্রচলিত হইয়াছিল; কারণ, এই টীকায় চন্দ্রগোমীর মূল ৩৫টি সূত্র বিনা স্বীকৃতিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ৩৫টি সূত্র পাণিনি-ব্যাকরণে কোথাও নাই। যাহাই হউক, চন্দ্রগোমী সপ্তম শতক বা সপ্তম শতকের আগেই কোনো সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, এ-সম্বন্ধে কোনো সংশয় নাই। চন্দ্রগোমী ছিলেন বৌদ্ধ ; তাঁহার অন্ত্যনাম গোমিন্ (বাংলা বর্তমান গুঁই ?) এবং তদ্রচিত ব্যাকরণের বৃত্তি বা টীকার প্রারম্ভে মঙ্গল-শ্লোকের সর্বজ্ঞ-স্তুতিই তাহার প্রমাণ। তাঁহার জন্মভূমি ছিল বরেন্দ্রীতে ; কিন্তু পাগ-সাম-জোন্-জাং-গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, তিনি পরবর্তী জীবনে কোনো কারণে বরেন্দ্রী হইতে নির্বাসিত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করেন। তিব্বতী ত্যাঙ্গুরে তালিকাবদ্ধ চন্দ্রগোমীর একটি গ্রন্থে তিনি পরিষ্কার 'দ্বৈপ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিব্বতী ঐতিহ্যমতে চন্দ্রগোমী যে শুধু বৈয়াকরণিক ছিলেন, তাহাই নয়। তর্কবিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং ন্যায়সিদ্ধ্যালোক নামে তর্কশাস্ত্রের একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, তিনি বৌদ্ধ তান্ত্রিক বজ্রযান সাধনাগত ৩৬টি গ্রন্থের লেখক ছিলেন, তারা এবং মঞ্জুশ্রীর উপর কয়েকটি সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, লোকানন্দ নামে একটি নাটক এবং শিষ্যের নিকট গুরুর পত্র হিসাবে রচিত শিষ্যলেখধর্ম নামে একটি ক্ষুদ্র কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। লোকানন্দ নাটকটির তিব্বতী অনুবাদ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় নাই ; শিষ্যলেখধর্ম কাব্যটিতে বিভিন্ন ছন্দে ১১৪টি সংস্কৃত শ্লোক ; রচনারীতি দুর্বল ও বহুঅভ্যস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ সংস্কৃত কাব্যানুসারী।

চন্দ্রগোমী ও চান্দ্র-ব্যাকরণ

এই তিব্বতী ঐতিহ্যমতেই চন্দ্রগোমী এক সময় নালন্দা-মহাবিহারে গিয়া আচার্য স্থিরমতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেখানে মাধ্যমিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত চন্দ্রকীর্তির সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তারনাথ বলেন, চন্দ্রগোমীর ব্যাকরণ চন্দ্রকীর্তির শ্লোকবদ্ধ ব্যাকরণ-গ্রন্থ সমন্তভদ্রকে প্রায় বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। চন্দ্রগোমী নালন্দা-মহাবিহারে আচার্য স্থিরমতির নিকট সূত্র ও অভিধর্মপিটক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিষ, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা এবং নানা কলায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আচার্য অশোক তাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষাদান করেন, এবং তিনি তারা ও অবলোকিতেশ্বরের পরম-ভক্ত হন। চন্দ্রগোমী সিংহল ও দক্ষিণ-ভারতে গিয়াছিলেন, এবং দক্ষিণ-ভারতে বসিয়াই নাকি চান্দ্র-ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেম। নালন্দা-মহাবিহারের আচার্যরা গোড়ায় তাঁহার প্রতি খুব শ্রদ্ধিত ছিলেন না; কিন্তু পরে চন্দ্রকীর্তি তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পান এবং তাঁহারই প্রেরণায় ও চেষ্টায় চন্দ্রগোমী ক্রমে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। চন্দ্রগোমী যোগাচারী ছিলেন এবং যোগাচার দর্শন লইয়া বিচারালোচনা করিতেন।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বৈয়াকরণিক চন্দ্রগোমী, তিব্বতী ঐতিহ্যের নৈয়ায়িক চন্দ্রগোমী, এবং একই ঐতিহ্যের বজ্রযানী বৌদ্ধ তান্ত্রিক চন্দ্রগোমী কি একই ব্যক্তি? এ-প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন; তবে বৈয়াকরণিক এবং নৈয়ায়িক চন্দ্রগোমী এক ব্যক্তি হইলেও বজ্রযানী চন্দ্রগোমী একই ব্যক্তি হওয়া প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। খুব সম্ভব, পরবর্তী তিব্বতী ঐতিহ্য প্রাচীনতর চন্দ্রগোমী এবং অর্বাচীন চন্দ্রগোমীকে এক ব্যক্তিতে পরিণত করিয়া দুই জনের জীবন-কাহিনী একত্র মিশাইয়া দিয়াছিল।

এই পর্বে ব্যকরণ ও তর্কশাস্ত্র ছাড়া দর্শনের আলোচনায়ও বাংলা দেশের কিছু প্রসিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছিল। গৌড়পাদকারিকা নামে সুপরিচিত একটি আগম-শাস্ত্রগ্রন্থ এই যুগে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল, এ-তথ্য নিঃসংশয়; তবে ইহার রচয়িতা কে ছিলেন তাহা লইয়া পণ্ডিত মহলে নানা মতামত্ বিদ্যমান। গ্রন্থকারের নাম বা উপাধি ছিল গৌড়পাদ, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে; তিনি গৌড়াচার্য বলিয়াও কারিকায় উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার বাড়ী ছিল গৌড়দেশে, এই অনুমানেও সংশয় কিছু নাই। গৌড়পাদ ছিলেন শুকের শিষ্য এবং আচার্য শংকরের পরমগুরু বা গুরুর গুরু। শংকরাচার্যের শিষ্য সুরেশ্বর তাঁহার নৈষ্কর্মসিদ্ধি নামক গ্রন্থে গৌড়পাদকারিকা হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। শংকরের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে গৌড়পাদের কোনো উল্লেখ নাই, কিন্তু কারিকার উদ্ধৃতি আছে; গ্রন্থকারের ইঙ্গিত আছে 'সম্প্রদায়বিদ' ও 'বেদার্থ-সম্প্রদায়বিদ্-আচার্য' এই পদে।

গৌড়পাদ ও গৌড়পাদ-কারিকা

গৌড়পাদ-কারিকার দার্শনিক মতবাদ প্রাক্-শংকর বৈদান্তিক মত্ ও বৌদ্ধ মাধ্যমিক শূন্যবাদের সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ ও স্বাঙ্গীকরণ। সমগ্র গ্রন্থ ২১৫টি শ্লোকে গ্রথিত (প্রথম ভাগে আগম ২৯টি শ্লোক; দ্বিতীয় ভাগে বৈতথ্য ৩৮টি শ্লোক; তৃতীয় ভাগে অদ্বৈত ৪৮টি শ্লোক; চতুর্থ ভাগে অলাতশান্তি ১০০টি শ্লোক)। শান্তরক্ষিত,

কমলশীল প্রভৃতি পরবর্তী কালের মাধ্যমিক মতবাদী একাধিক বৌদ্ধ আচার্য গৌড়পাদের গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। গৌড়পাদ আরও দুইটি কারিকা রচনা করিয়াছিলেন, একটির নাম সাংখ্য-কারিকা, আর একটির উত্তরগীতা। অল্-বেরুনী জনৈক গৌড়-সন্ন্যাসী রচিত এক সাংখ্য-কারিকার কথা জানিতেন; গৌড়পাদের গ্রন্থ এবং অল্-বেরুনী-উদ্দিষ্ট গ্রন্থ বোধ হয় একই গ্রন্থ।

আর একটি বিদ্যায়ও প্রাচ্য ভারতের এবং বাংলাদেশের কিছু প্রসিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়; সে-বিদ্যার নাম হস্তী-আয়ুর্বেদবিদ্যা। কৌটিল্য ও গ্রীক-ঐতিহাসিকবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া য়ুয়ান-চোয়াঙ পর্যন্ত সকলেই প্রাচ্য দেশকে হস্তীর লীলাভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কৌটিল্য তো হস্তী-চিকিৎসকদের কথাও বলিয়াছেন। কাজেই এ-দেশে হস্তী-চিকিৎসা সম্বন্ধে এক বিশেষ শাস্ত্র গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়।

রোমপাদ-
পালকাপ্য কাহিনী
হস্ত্যায়ুর্বেদ

চম্পার রাজা রোমপাদের সঙ্গে এক ঋষি পালকাপ্য বা পালকাপ্যের সুদীর্ঘ বাক্যালাপ হইয়াছিল হস্তী-চিকিৎসা সম্বন্ধে। গ্রন্থাকারে গ্রথিত এই সুদীর্ঘ কথোপকথনই হস্ত্যায়ুর্বেদ (বা গজ-চিকিৎসা, বা গজবিদ্যা, বা গজবৈদ্য বা গজায়ুর্বেদ) গ্রন্থ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। লৌহিত্য যেখানে হিমালয় হইতে নির্গত হইয়াছে সেইখানে ছিল ঋষি পালকাপ্যের আশ্রম; আর পালকাপ্যের নাকি জন্ম হইয়াছিল কাপ্যগোত্রে, এক ঋষির ঔরসে, হস্তিনীর গর্ভে। আর, রোমপাদ নাকি ছিলেন রামায়ণ-কীর্তিত দশরথের সমসাময়িক! সমস্ত বর্ণনাটিই পৌরাণিক স্বপ্ন-কল্পনার সৃষ্টি, সন্দেহ নাই। পালকাপ্য নামে যথার্থ কোনো পুরুষ ছিলেন কিনা তাহাও সন্দেহজনক; দ্রবিড় ভাষায় পাল অর্থই হস্তী, এবং কপিও এক অর্থে হস্তী! তবে, গ্রন্থটি বিদ্যমান্, এবং দশম-একাদশ শতকের আগেই যে ইহা রচিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ একাধিক। অগ্নিপুরাণের গজ-চিকিৎসা অধ্যায় পালকাপ্য-রোমপাদের কথোপকথনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল, এ-কথা অগ্নিপুরাণই স্বীকার করিতেছেন; এবং অগ্নিপুরাণের শাস্ত্রীয় অংশ দশম শতকের আগেই রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। একাদশ শতকে ক্ষীরস্বামী রচিত অমরকোষ-টীকায় একাধিক বার পালকাপ্যের উদ্ধৃতি আছে। রঘুবংশ কাব্যে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর বর্ণনা-প্রসঙ্গে এক অঙ্গ-রাজার হস্তীশালায় সূত্রকারগণ কর্তৃক হস্তীর-শিক্ষাদানের উল্লেখ আছে। পালকাপ্য এই সূত্রকারদের অন্যতম হওয়া অসম্ভব নয়। যাহাই হউক, এ-তথ্য প্রায় নিঃসংশয় যে, বহু প্রাচীন কাল হইতেই হস্তী-চিকিৎসার একটি ঐতিহ্য প্রাচ্য দেশে বর্তমান ছিল, কিছু গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল, সন্দেই নাই; কিন্তু পালকাপ্যের হস্তী-আয়ুর্বেদ গ্রন্থ যে-ভাবে ও রূপে আমরা পাইয়াছি তাহা এত সুপ্রাচীন কালের নয়, যদিও রোমপাদ-পালকাপ্যের কাহিনীর মূল সুপ্রাচীন হইলেও হইতে পারে। বর্তমান গ্রন্থটি খুব সম্ভব খ্রীষ্টোত্তর ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে, ব্রহ্মপুত্র তীরে কোথাও সংকলিত হইয়াছিল—প্রাচীনতর গ্রন্থাদির উপর নির্ভর করিয়া।

এ-পর্যন্ত যে ক'টি গ্রন্থের উল্লেখ করা হইল তাহার প্রত্যেকটিই জ্ঞান-বিজ্ঞানগত। এই গুলি ছাড়াও আরও অনেক গ্রন্থ এই পর্বে রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু সে-সব গ্রন্থ কালের প্রভাব এড়াইয়া মানুষের স্মৃতিতেও বাঁচিয়া থাকে নাই। নানা শাস্ত্র, নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা যে বাংলাদেশে হইত তাহা তো আগেই দেখিয়াছি, এবং যে-দেশে এই পর্বে চান্দ্র-ব্যাকরণ ও গৌড়পাদকারিকার মত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, সে-দেশে সেই পর্বে অন্য বহু গ্রন্থ রচিত হইয়া ভূমি ও পশ্চাদ্‌পট রচনা করে নাই, এমন হইতে পারে না। চন্দ্রগোমী তো কাব্য ও নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্যরচনার একটা ধারাও প্রবহমান ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার উল্লেখ অথবা অবশেষ কোথাও দেখিতেছিনা।

সাহিত্য-রচনার একটি বেগবান্ প্রবাহ যে বাংলাদেশের পলিভূমির উপর দিয়া বহিয়া যাইত তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় এই পর্বে গৌড়ী রীতির উদ্ভব, বিকাশ ও প্রসিদ্ধির মধ্যে। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে হর্ষচরিত-গ্রন্থের মুখবন্ধে বাণভট্ট সমসাময়িক ভারতবর্ষে প্রচলিত সাহিত্য-রচনারীতি সম্বন্ধে বলিতেছেন,

> শ্লেষপ্রায়মুদীচ্যেষু প্রতীচ্যেষ্বর্থমাত্রকম।
> উৎপ্রেক্ষা দাক্ষিণাত্যেষু গৌড়েষ্বক্ষরডম্বরম্॥
> নবোঽর্থো জাতিরগ্রাম্যা শ্লেষোঽক্লিষ্ট স্ফুটো রসঃ।
> বিকটাক্ষরবন্ধশ্চ কৃৎস্নমেকত্র দুষ্করম॥

উত্তর-ভারতের রচনারীতিতে শ্লেষই (অর্থাৎ শব্দ-ব্যবহারের চাতুর্য) সমধিক, পশ্চিমে কেবল অর্থগৌরব; দক্ষিণে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারের প্রাবল্য (অর্থাৎ, কবিকল্পনার অবাধ সঞ্চরণ) এবং গৌড়জনদের মধ্যে অক্ষর-ডম্বর (অর্থাৎ, মাত্রার আড়ম্বর)। বস্তুত, নূতন অর্থ, অগ্রাম্য জাতি বা রচনাশৈলী, অক্লিষ্ট শ্লেষ, স্ফুটরস এবং বিকটাক্ষরবন্ধ, এই সকল গুণের একত্র সমাবেশ দুষ্কর। বাণভট্ট দুঃখ করিয়াছেন, ভারতবর্ষের কোথাও একই জনপদে সু-কাব্যের এই সমস্ত লক্ষণগুলি একত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; কোথাও শুধু শ্লেষের প্রাধান্য, কোথাও অর্থগৌরবের, কোথাও অক্ষরাড়ম্বরের প্রাবল্য, কোথাও বা শুধু কল্পনার অবাধ সঞ্চরণ। তাঁহার মতে ভাল কাব্যের যাহা লক্ষণ তাহা যে এই তালিকাতেই শেষ হইয়া গেল এমন নয়; এই লক্ষণ গুলি শুধু কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কাজেই গৌড়ীয় কবিদের নিন্দাচ্ছলে বাণভট্ট অক্ষরাড়ম্বরের কথা বলিয়াছেন, এমন মনে করিবার কারণ নাই। অক্ষরাড়ম্বর অর্থ হইতেছে শব্দপ্রয়োগগত ধ্বনি-সমারোহ; এই সাহিত্যিক গুণটিকেই বলা হইয়াছে বিকটাক্ষরবন্ধ (বিকট = উদারতা লক্ষণযুক্ত)।

সপ্তম-অষ্টম শতকে গৌড়-বঙ্গে যে একটি বিশেষ কাব্যরচনা-রীতির প্রবর্তনা হইয়া গিয়াছিল এবং সমস্ত ভারতবর্ষে সেই রীতি সুপরিচিত ও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ আলংকারিক ভামহ ও দণ্ডীর (সপ্তম-অষ্টম-শতক) সাক্ষ্য। এই দুই জনই

গৌড়ীরীতি বা গৌড়মার্গের কথা বলিতেছেন বৈদর্ভরীতির সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ বৈদর্ভী ও গৌড়ী, এই দুই রীতিই যে তখন প্রধান প্রচলিত কাব্যরীতি, তাহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছেন। দণ্ডীর পক্ষপাত ছিল বৈদর্ভী রীতির প্রতি এবং এই রীতিই কাব্যরচনার মানদণ্ড বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তাঁহার মতে এই মানদণ্ডের বিচারে গৌড়ী রীতি 'বিপর্যয়' লক্ষণাক্রান্ত, তাহার রূপ পৃথক প্রকার পৃথক, কিন্তু এই পৃথক রূপ ও রীতি সহজেই 'প্রস্ফুট'। বৈদর্ভী বিশুদ্ধ মার্গপদ্ধতির অনুসারী, গৌড়ী একটু অলংকার ও আড়ম্বরবহুল, পল্লবিত। দণ্ডী পরিষ্কারই বলিতেছেন, গৌড়জনেরা অতি ও উচ্চকথন এবং অলংকার ও আড়ম্বর প্রিয় ; গৌড়ী রীতির প্রধান লক্ষণই হইতেছে 'অর্থ-ডম্বর' এবং 'অলংকার-ডম্বর' অনুপ্রাসপ্রিয়তা এবং বন্ধগৌরব বা রচনার গাঢ়তা। ভামহ কিন্তু বৈদর্ভী রীতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন ; বরং সুপ্রযোজিত গৌড়ী রীতির প্রতি তাঁহার কিছুটা পক্ষপাত সুস্পষ্ট। বৈদর্ভী রীতির প্রধান গুণ ছিল, শ্লেষ, প্রসাদ, মাধুর্য, সৌকুমার্য ইত্যাদি।

গৌড়ী রীতি

বাণভট্ট, ভামহ এবং দণ্ডীর সাক্ষ্যে এ-তথ্য পরিষ্কার যে, গৌড়জনেরা সপ্তম শতকের আগেই সুস্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত একটি বিশিষ্ট কাব্যরীতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং এই রীতি সর্বভারতগ্রাহ্য বৈদর্ভী রীতিমানের পাশেই আপন আসন এতটা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যে, বাণভট্ট, ভামহ বা দণ্ডী কেহই তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। দশম-একাদশ শতকে গৌড়ী রীতির যখন পূর্ণ বিকশিত অবস্থা, যখন আড়ম্বৃত অলংকার এবং পল্লবিত বিস্তৃতির প্রসার আরও বেশি, তখন রাজশেখর (দশম শতক) তাঁহার কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থে গৌড়ী রীতির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোনো উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। বোধ হয়, সেই জন্যই কর্পূরমঞ্জরী-গ্রন্থে বিভিন্ন রীতির তালিকা দিতে গিয়া তিনি গৌড়ী রীতির উল্লেখই করেন নাই, তাহার স্থানে মাগধী রীতির কথা বলিয়াছেন। মাগধী রীতিকে যথার্থত কোনো বিশিষ্ট সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র রীতি রাজশেখর ছাড়া আর কেহ বলেন নাই। একাদশ শতকে ভোজদেব গৌড়ী ও মাগধী, এই দুই রীতির কথাই বলিয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু মাগধীকে বলিয়াছেন খণ্ডরীতি, অর্থাৎ অসম্পূর্ণ, অস্বতন্ত্র, অপ্রস্ফুটিত রীতি। নাটকেও বোধ হয় অন্যান্য প্রাচ্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ একটি বিশিষ্ট রূপ ও রীতির প্রচলন করিয়াছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে চারিটি বিশিষ্ট নাটকীয় রীতির বা প্রবৃত্তির উল্লেখ আছে ; অবন্তী, পঞ্চাল-মধ্যমা, দাক্ষিণাত্যা এবং ওড্র-মাগধী। ওড্র, বঙ্গ, পৌণ্ড্র এবং নেপালে ওড্র-মাগধী প্রবৃত্তি প্রচলিত ছিল।

এই গৌড়ী রীতির (মাগধী রীতি এবং ভরতনাট্যশাস্ত্র কথিত ওড্র-মাগধী প্রবৃত্তিরও বটে) উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসের দিক হইতে গভীর অর্থবহ। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-কথিত 'গৌড়তন্ত্র' কথাটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি হইতেই গৌড়জনেরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে

আরম্ভ করেন ; ঈশানবর্মার হড়াহা-লিপি তাহার প্রথম প্রমাণ। তাহার পর হইতেই গৌড় ধীরে ধীরে নিজস্ব জনপদকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে যত্নবান হয়, এবং শশাঙ্কে আসিয়া একটা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। মালব-স্থানীশ্বর-কনৌজ-উজ্জয়িনী-প্রয়াগ-বারাণসীকেন্দ্রিক মধ্য-ভারতীয় রাষ্ট্রীয় প্রভাব হইতে মুক্ত, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই হইয়া উঠিল গৌড়তন্ত্রের রাষ্ট্রাদর্শ। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এই গৌড়তন্ত্র রূপ লাভ করিল গৌড়ী রীতিতে—সর্বভারতীয়, বৈদর্ভী রীতিকে অস্বীকার করিয়া, তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র রীতির উদ্ভবে ও বিকাশে। সন্দেহ নাই, এই উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছিল গৌড়জনের নিজস্ব প্রতিভা, প্রকৃতি, রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী এবং ইহাদেরই প্রেরণায়, শুধু বিশিষ্ট জনপদসুলভ অহংকৃত স্বতন্ত্রপ্রিয়তা এবং স্বাধিকার প্রমত্ততায় নয়।

৩

পাল-চন্দ্রপর্ব

পাল-বংশ ও পাল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় এবং তাহার দুই এক শতাব্দী আগে হইতেই বাংলাদেশে সংস্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা পরম উৎসাহে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। লোকনাথের ত্রিপুরা-পট্টোলীতে কিংবা ভাস্করবর্মার নিধনপুর-লিপিতে যে অলংকৃত কাব্যরীতির সূচনা দেখা গিয়াছিল সপ্তম শতকে, পাল-বংশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই রীতিরই পরিপূর্ণ বিকাশ ধরা পড়িল। দশম-একাদশ শতকের অগণিত প্রশস্তি-লিপিমালায় সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা ও রচনারীতির যে-সাক্ষ্য উপস্থিত তাহা মধ্য-ভারতীয় প্রশস্তি-কাব্যরীতির ধারানুযায়ী হইলেও একেবারে উপেক্ষা করিবার মত নয়। তাহা ছাড়া, এই লিপিগুলিতে সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা-দীক্ষার যে প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়, ইতিহাসের দিক হইতে তাহা মূল্যহীন নয়। এই লিপিগুলি এবং চতুর্ভুজের হরিচরিত-কাব্য হইতে জানা যায়, বাংলাদেশে যে সকল বিদ্যার চর্চা হইত, বেদ, আগম, নীতি, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, তর্ক, মীমাংসা, বেদান্ত, প্রমাণ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি সমস্তই তাহার অন্তর্গত ছিল। চারি বেদেরই অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত, তবে যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী শাখার প্রসারই ছিল বেশি। এই সব বিচিত্র বিদ্যার চর্চা যে শুধু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জন সমাজেই আবদ্ধ ছিল তাহাই নয় ; মন্ত্রী, সেনানায়ক প্রভৃতি রাজপুরুষেরাও এই সব শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। দর্ভপাণি, কেদারমিশ্র ও গুরবমিশ্রের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা, যোগদেব, বোধিদেব ও বৈদ্যদেবের বিস্তৃত শাস্ত্রানুশীলনের কথা, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত-সমাজে নানা বিদ্যাচর্চার কথা বর্ণ-বিন্যাস ও ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে বলিয়াছি, এখানে আর পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই। এই বিদ্যানুশীলনের

ব্রাহ্মণ্য জ্ঞানবিজ্ঞান-সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি

অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান কি কি ছিল, পাঠক্রম কি ছিল, তাহার বিবরণ বা আভাস পর্যন্ত কিছু পাইতেছি না; তবে, অনুমান হয়, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা নিজদের গৃহে কিংবা বড় বড় মন্দিরকে আশ্রয় করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ চতুষ্পাঠী গড়িয়া তুলিতেন এবং সাধ্যানুযায়ী বিদ্যার্থী সংখ্যা গ্রহণ করিতেন। একজন আচার্যই যে সমস্ত বিদ্যার অধিকারী হইতেন এমন নয়; বিদ্যার্থীরা এক বা একাধিক শাস্ত্রে এক জনের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অন্য শাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য অন্য বিশেষজ্ঞ আচার্যের দুয়ারে উপস্থিত হইতেন। প্রয়োজন হইলে বিদ্যা ও শাস্ত্রাভ্যাসের জন্য বিদ্যার্থীরা ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে গিয়া প্রবাস-জীবনও যাপন করিতেন। ক্ষেমেন্দ্রের দশোপদেশ-গ্রন্থের সাক্ষ্যে মনে হয়, বাঙালী বিদ্যার্থীরা কাশ্মীরে যাইতেন বিদ্যালাভের জন্য, এবং তর্ক, মীমাংসা, পাতঞ্জল-ভাষ্য প্রভৃতির অনুশীলন করিতেন। বাঙালী বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ আচার্যরাও যে আমন্ত্রিত হইয়া বাংলার বাহিরে নানাস্থানে যাইতেন বিদ্যাদান ও ধর্মপ্রচারোদ্দেশে, তাহার নানা প্রমাণ বিদ্যমান। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যাঁহারা করিতেন, রাজা-মহারাজ ও সামন্ত-মহাসামন্তরা, সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁহাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য অর্থদান ভূমিদান ইত্যাদি করিতেন, এমন সাক্ষ্যও যে নাই তাহা নয়। পণ্ডিত, কবি, আচার্য প্রভৃতিদের মাঝে মাঝে তাঁহারা পুরস্কৃতও করিতেন, সে-সাক্ষ্যও বিদ্যমান। লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যে এ-সব সাক্ষ্য বিস্তৃত।

এই পর্বে অর্থাৎ আনুমানিক ৮০০—১১০০র মধ্যে এবং তাহার পরেও বাংলাভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে বাংলা দেশে সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রকারের

ভাষার কথা

প্রাকৃত এবং শৌরসেনী অপভ্রংশ এই তিন রকমের ভাষা প্রচলিত ছিল। শিল্পে ও সাহিত্যে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, দর্শনে ও বিচারে, শিক্ষায় ও দীক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা সকলেই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন; সকলেরই চেষ্টা ছিল প্রাকৃতজনের কথ্যভাষাকে শুদ্ধ ও সংস্কৃত করিয়া ব্যকরণসম্মত করিয়া নিজের বক্তব্যকে প্রকাশ করিবার। এই শুদ্ধ, 'সংস্কৃত', ব্যাকরণসম্মত ভাষাই সংস্কৃত ভাষা। প্রাকৃতের চর্চা বাংলাদেশে বড় একটা হইত না; অন্তত বাংলাদেশে প্রাকৃতে সাহিত্য-রচনার কোনো ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই; তাহার পরিচয়ও নাই। এ-দেশের মহাযানী-বজ্রযানী প্রভৃতি বৌদ্ধরাও যে-ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহাও হয় শুদ্ধ সংস্কৃত না হয় প্রাকৃতাশ্রয়ী মিশ্র সংস্কৃত যাহাকে বলা হয় 'বৌদ্ধ সংস্কৃত'। দশম শতকে গৌড়জনের সাহিত্যরুচির পরিচয় দিতে গিয়া সেইজন্যই কাব্যমীমাংসার লেখক রাজশেখর বলিতেছেন,

গৌড়াদ্যাঃ সংস্কৃতস্থাঃ পরিচিতরুচয় প্রাকৃতে লাটদেশ্যাঃ।

স্পষ্টতই বোঝা যাইতেছে গৌড় ও প্রতিবাসী জনপদগুলিতে সংস্কৃতের চর্চাই ছিল বেশি, প্রাকৃতের তেমন ছিল না। এদেশীয় পণ্ডিতদের সংস্কৃত উচ্চারণের প্রশংসাও রাজশেখর করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাকৃত বাচনভঙ্গি ছিল কুণ্ঠিত।

পঠন্তি সংস্কৃতং সুষ্ঠু কুণ্ঠাঃ প্রাকৃত বাচি তে।
বাণারসীতঃ পূর্বেণ যে কেচিদ্ মগধাদয়ঃ ॥

রাজশেখর বাঙালীর এই কুণ্ঠিত প্রাকৃত উচ্চারণ লইয়া একটু বিদ্রূপই করিয়াছেন। দেবী সরস্বতী গৌড়বাসীর প্রাকৃত উচ্চারণে অতিষ্ঠ হইয়া নিজের অধিকার ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া ব্রহ্মাকে গিয়া বলিলেন হয় গৌড়জনেরা প্রাকৃত ছাড়ুক, না হয় অন্য সরস্বতী হউক।

ব্রহ্মন্ বিজ্ঞাপয়ামি ত্বাং স্বাধিকারজিহাসয়া।
গৌড়স্ত্যজতু বা গাথামন্যা বাঽস্তু সরস্বতী ॥

গৌড়ীয়দের প্রাকৃত উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রাজশেখর বলিয়াছেন, ইহাদের পাঠ অস্পষ্টও নয় অতি স্পষ্টও নয়, রুক্ষও নয় অতি কোমলও নয়, গম্ভীরও নয় অতিতীব্রও নয়।

যাহা হউক, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছাড়া এবং প্রাকৃতের চেয়ে অনেক বেশি প্রচলিত ছিল পশ্চিমা বা শৌরসেনী অপভ্রংশ, যে-ভাষার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা ছিল সমগ্র উত্তর-ভারত ব্যাপিয়া, এবং মহারাষ্ট্র ও সিন্ধু দেশেও। বাংলা দেশের সহজযানী সিদ্ধাচার্যরা এবং ব্রাহ্মণ্য কবিরাও কেহ কেহ শৌরসেনী অপভ্রংশে কিছু কিছু কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন; কাহ্নপাদ, সরহপাদ প্রভৃতি সাধকেরা এই ভাষাতেই তাঁহাদের দোহাগুলি রচনা করিয়াছিলেন, আর পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় মৈথিল কবি বিদ্যাপতি এই শৌরসেনী অপভ্রংশেই তাঁহার কীর্তিলতা কাব্য রচনা করেন।

এই পর্বে লোকায়ত বাঙালী সমাজের লোকভাষা ছিল মাগধী অপভ্রংশের গৌড়-বঙ্গীয় রূপ, যে-রূপ ক্রমশ প্রাচীন বাংলা ভাষায় বিবর্তিত হইতেছিল। এই মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় রূপের সঙ্গে শৌরসেনী অপভ্রংশের খুব বড় একটা পার্থক্য কিছু ছিল না; একটা যিনি বুঝিতেন অন্যটা বুঝিতে তাঁহার খুব বেশি পরিশ্রম করিতে হইত না। আর, এই দুই ভাষাই ছিল খুব সহজবোধ্য এবং নিরক্ষর জনসাধারণের অধিগম্য। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহাদের ধর্মের তত্ত্বকথা লোকায়ত ভাষায় জনসাধারণের চিত্তদুয়ারে পৌঁছাইয়া দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা, এবং কোনো কোনো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, এই দুই ভাষাই বেশি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে মাগধী অপভ্রংশ যখন প্রাচীন বাংলা ভাষায় বিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিল তখন সৃজ্যমান এই নূতন ভাষাকেও বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা সানন্দে ও সাভ্যর্থনায় গ্রহণ করিলেন। প্রাচীন বাংলার চর্যাগীতিগুলিই এই নূতন সৃজ্যমান ভাষার একমাত্র পরিচয়। কিন্তু, এই ভাষা তখনও সূক্ষ্ম ও গভীর ভাব-প্রকাশের বাহন হইয়া উঠিতে পারে নাই; ধর্ম ও তত্ত্বকথা বুঝাইবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই মাত্র ইহার বিস্তার ও গভীরতা। বস্তুত, তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে বাংলাদেশে দুই-তিন শতাব্দী ধরিয়া শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং নূতন বাংলাভাষা লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে মাত্র। শিক্ষিত, বিদগ্ধ, সংস্কৃতিপূতচিত্ত

লোকদের মধ্যে প্রাগ্রসরবুদ্ধি ও গণচেতনাসম্পন্ন মাত্র কিছু কিছু পণ্ডিত ও কবি এই কার্যে ব্রতী হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কিছু সাহিত্যধর্মী বা কবিধর্মী ছিলেন না।

ধর্ম, দর্শন, ব্যাকরণ, অলংকার, ব্যবহার, চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা যখন গ্রন্থাদি লিখিতেন তখন সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনো ভাষার আশ্রয় লওয়ার কথা তাঁহাদের মনেই হইত না। কাজেই এ-পর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহা সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় এবং সেই কারণেই এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার শিক্ষিত, পণ্ডিত ও উচ্চকোটি সমাজেই আবদ্ধ ছিল। বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চা এবং বিশেষভাবে সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য চর্চার প্রাবল্য এর আগের পর্বেই দেখা দিয়াছিল, নহিলে গৌড়ীরীতির উদ্ভব এবং বিকাশই সম্ভব হইত না। এই পর্বে তাহা আরও সমৃদ্ধি, আরও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং বাঙালীর কল্পনোজ্জ্বল প্রতিভা নানা সূক্তি ও শ্লোকে, নানা কাব্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। কালিদাস-ভবভূতি-ভারবি-বাণভট্ট-রাজশেখর পড়িয়া রসগ্রহণের সামর্থ্য না থাকিলে এই পর্বের অগণিত বাঙালী কবির পক্ষে এই সব প্রকীর্ণ শ্লোক ও কাব্য রচনা সম্ভব হইত না। এই অনুমানও বোধ হয় সংগত যে, পণ্ডিত-সমাজের বাহিরে একটি বৃহত্তর সাধারণ সংস্কৃত শিক্ষিত সমাজও ছিল যাহার লোকেরা এই সব শ্লোক ও কাব্য পড়িয়া তাহাদের রস গ্রহণ করিতে পারিত। এই হিসাবে কাব্য ও নাটকের সামাজিক বিস্তার বেশি ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু কথ্যভাষার সাহিত্যিক রূপ অপভ্রংশের সঙ্গে তাহার তুলনা হইতে পারে না। সংস্কৃতে যাঁহারা লিখিতেন, তাঁহাদের মানসিক ও সামাজিক পরিধির মধ্যে বৃহত্তর জনসমাজের স্থান ছিল না, এ-কথা বলিলে অনৈতিহাসিক কিছু বলা হয় না; তবে, তাঁহাদের কাহারও কাহারও রচনায় বৃহত্তর জনসমাজের নানা সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-ভাবনা-কল্পনা বস্তুময় কাব্যময় রূপ লাভ করিয়াছে, এ-কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হয়। যাহাই হউক, এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, সংস্কৃত এখন আর শুধু কোনোপ্রকারে নিজকে ব্যক্ত করিবার ভাষামাত্র নয়; এই পর্বে তাহা মানবজীবনের সূক্ষ্ম ও গভীর ভাবকল্পনা প্রকাশের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু নানা বিদ্যা ও শাস্ত্রে যে পরিমাণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-অনুশীলনের সংবাদ লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যে পাইতেছি, সেই অনুপাতে গ্রন্থ-রচনা ও গ্রন্থ-রচয়িতাদের সংবাদ—বৌদ্ধ সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থের ছাড়া—কমই পাওয়া যাইতেছে, এবং যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহাও সব বাঙালীর এবং বাংলাদেশের রচনা কিনা, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং প্রাচীনতম বাংলায় রচিত বৌদ্ধ-গ্রন্থাদির কথা পরে বলিতেছি। আপাততঃ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থাদির কথা বলা যাইতে পারে।

প্রাচীন বাংলায় বেদ-চর্চা যে খুব বেশি হইত, এমন নয়, তবে উচ্চ পণ্ডিত সমাজে কিছু কিছু নিশ্চয়ই হইত, এবং লিপিমালায়ও এমন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু,

বৈদিক ক্রিয়াকর্ম-যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে এই পর্বে মাত্র একখানা পুঁথির খবর পাইতেছি। কেশব মিশ্রের ছান্দোগ্য-পরিশিষ্ট গ্রন্থের উপর প্রকাশ নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন নারায়ণ নামে জনৈক বেদজ্ঞ পণ্ডিত। নারায়ণের পিতা ছিলেন গোণ, পিতামহের নাম উমাপতি, এবং ইহারা ছিলেন উত্তর-রাঢ়ের অধিবাসী। উমাপতি ছিলেন জয়পালের সমসাময়িক এবং নারায়ণ দেবপালের।

সংস্কৃত গ্রন্থাদি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য

গৌড়পাদ বা গৌড়াচার্যের পর অধ্যাত্ম চিন্তা ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ-রচনা করিয়া সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন ন্যায়কন্দলী-রচয়িতা শ্রীধর-ভট্ট। বেদ, বেদান্ত, দর্শনের চর্চা বাংলাদেশে কম হইত না—লিপি-সাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ—গ্রন্থ-রচনাও কিছু কিছু হইয়া থাকিবে, কিন্তু কালের হাত এড়াইয়া আমাদের কালে আসিয়া সে-সব পৌঁছায় নাই। শ্রীধরের ন্যায়কন্দলী শুধু বাঁচিয়া আছে, এবং তাহা এই পর্বেরই রচনা। ন্যায়কন্দলী ছাড়া শ্রীধর অদ্বয়সিদ্ধি, তত্ত্বপ্রবোধ, তত্ত্বসংবাদিনী এবং সংগ্রহটীকা নামে অন্তত আরও চারখানি বেদান্ত ও মীমাংসাবিষয়ের পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাদের একটিও আজ বাঁচিয়া নাই। প্রশস্তপাদের পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ নামে বৈশেষিক সূত্রের যে ভাষ্য আছে ন্যায়কন্দলী-গ্রন্থ তাহারই টীকা। শ্রীধর-ভট্টই বোধ হয় সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে ন্যায়বৈশেষিক মতের আস্তিক্য ব্যাখ্যা দান করেন, এবং সেই হিসাবেই ন্যায়কন্দলীর সবিশেষ মূল্য। ন্যায়কন্দলী বাংলাদেশে খুব সমাদর লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; খুব পঠিত বা আলোচিতও বোধ হয় হইত না; এই গ্রন্থের একটি টীকাও বাংলাদেশে রচিত হয় নাই। যে দু'টি মূল্যবান টীকার কথা আমরা জানি তাহার একটির রচয়িতা মৈথিলী পণ্ডিত পদ্মনাভ এবং আর একটির পশ্চিম-ভারতীয় জৈনাচার্য রাজশেখর। শ্রীধর-ভট্টের পিতার নাম ছিল বলদেব, মাতার নাম অব্বোকা বা অভ্রোকা; জন্ম দক্ষিণ-রাঢ়ের সুপ্রসিদ্ধ ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রামে, এবং ন্যায়কন্দলী-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ৯১৩ বা ৯১০ শকে, জনৈক "গুণ রত্নাভরণ কায়স্থকুলতিলক" পাণ্ডুদাসের অনুরোধে এবং পৃষ্ঠপোষকতায়।

শ্রীধর-ভট্টের সমসাময়িক ছিলেন লক্ষণাবলী, কিরণাবলী (দুইটিই প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা), কুসুমাঞ্জলি এবং আত্মতত্ত্ববিবেক-গ্রন্থের রচয়িতা উদয়ন। কুলজী-ঐতিহ্য মতে উদয়ন ছিলেন ভাদুরী-গাঞী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ; কিন্তু এই ঐতিহ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। উদয়ন তাঁহার রচনার এক স্থানে বলিয়াছেন, গৌড়মীমাংসক যথার্থ বেদজ্ঞান বিরহিত ছিলেন। এই গৌড়মীমাংসক বলিতে তিনি কি শ্রীধর-ভট্টকে বুঝাইতেছেন, না, গৌড়ীয় মীমাংসা-শাস্ত্রজ্ঞ সকল পণ্ডিতকেই বুঝাইতেছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। উদয়ন বাঙালী হইলে এই উক্তি করিতেন কিনা সন্দেহ। আশ্চর্য এই, আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকে বাঙালী গঙ্গেশ-উপাধ্যায়ও গৌড়মীমাংসক সম্বন্ধে একই উক্তি করিয়াছেন।

বেদান্তদর্শন-চর্চা বাংলাদেশে বোধ হয় খুব বেশি ছিল না; ন্যায়-বৈশেষিক এবং বৌদ্ধ

মাধ্যমিক দর্শনের আদরই ছিল বেশি। কৃষ্ণমিশ্র-রচিত প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আছে, দক্ষিণ-রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণ অহংকার কাশীতে গিয়া সেখানে বেদান্ত-চর্চার বাহুল্য দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন,

প্রত্যক্ষাদি প্রমাসিদ্ধ বিরুদ্ধার্থাববোধিনঃ।
বেদান্তাঃ যদি শাস্ত্রাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে ॥

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা অসিদ্ধ বিরুদ্ধার্থজ্ঞাপক বেদান্ত যদি শাস্ত্র হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধরা কি অপরাধ করিল।

গৌড়নিবাসী এক অভিনন্দ নামীয় লেখকের যোগবাশিষ্ঠ-সংক্ষেপ নামে একটি গ্রন্থের সংবাদ আমরা জানি। নামেই প্রমাণ যে গ্রন্থটি যোগবাশিষ্ঠের সংক্ষিপ্ত সার; সমগ্র বিষয়বস্তু ৬ প্রকরণ এবং ৪৬টি সর্গে বিন্যস্ত। গ্রন্থের শেষে লেখক সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে: "তর্কবাদীশ্বর-সাহিত্যাচার্য-গৌড়মণ্ডলালঙ্কার-শ্রীমৎ···"। অভিনন্দ ন্যায়শাস্ত্র এবং সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

এই পর্বে ব্যাকরণ-রচনায় চন্দ্রগোমীর ধারা রক্ষা করিয়াছেন দুই বৌদ্ধ বৈয়াকরণিক মৈত্রেয়-রক্ষিত এবং জিনেন্দ্রবুদ্ধি। জিনেন্দ্রবুদ্ধি 'বোধিসত্ত্ব-দেশীয়াচার্য' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন; তিনি বিবরণ-পঞ্জিকা (বা 'ন্যাস' নামে পরিচিত) নামে কাশিকার উপর একটি সুবিস্তৃত টীকা রচনা করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়-রক্ষিত জিনেন্দ্রবুদ্ধির বিবরণ-পঞ্জিকার উপর তন্ত্রপ্রদীপ নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন, এবং ভীমসেন-রচিত ধাতুপাঠ অবলম্বন করিয়া ধাতুপ্রদীপ নামে আর একটি ব্যাকরণ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। টীকাসর্বস্ব রচয়িতা সর্বানন্দ, শরণদেব, উজ্জ্বলদত্ত, বৃহস্পতি রায়মুকুট, ভট্টোজি দীক্ষিত প্রভৃতি অনেক ব্যাকরণ ও অভিধানকার মৈত্রেয়-রক্ষিতের তন্ত্রপ্রদীপ গ্রন্থ নিজ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছেন।

ব্যাকরণ ও অভিধান চর্চা

সুভূতিচন্দ্র নামে একজন বৌদ্ধ অভিধানকার কামধেনু নামে অমরকোষের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন; গ্রন্থটি আজ বিলুপ্ত, কিন্তু তাহার তিব্বতী অনুবাদের কথা ত্যাঞ্জুরে তালিকাবদ্ধ করা হইয়াছে। রায়মুকুট ও শরণদেব কয়েকবারই সুভূতিচন্দ্রের মতামত্ উদ্ধার করিয়াছেন; সেই জন্যই অনুমান হয় সুভূতিচন্দ্র বাঙালী হইলেও হইতে পারেন।

এ-পর্বের শ্রেষ্ঠ সর্বভারতীয় রোগনিদানবিদদের অন্যতম চক্রপাণি-দত্ত নিঃসন্দেহে বাঙালী। তাঁহার পিতা নারায়ণ জনৈক গৌড়রাজের পাত্র (রাজকর্মচারী) এবং রসবত্যধিকারী (রন্ধনশালার তত্ত্বাবধায়ক) ছিলেন। চক্রপাণির ষোড়শ শতকীয় বাঙালী টীকাকার শিবদাস-সেন যশোধর বলিতেছেন, এই গৌড়রাজ ছিলেন পালরাজ নয়পাল। চক্রপাণির বংশ লোধ্রবলি কুলীন; শিবদাস-সেন বলিতেছেন, লোধ্রবলি কুলীনরা দত্ত-বংশেরই একটি শাখা, এবং মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যমতে ইহাদের বাড়ী ছিল বীরভূমে। চক্রপাণির একভ্রাতা ভানুও ছিলেন রোগ-নিদান শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক বা অন্তরঙ্গ;

এবং তাঁহার (চক্রপাণির) গুরুর নাম ছিল নরদত্ত। চক্রপাণি-দত্ত চরকের যে টীকা রচনা করিয়াছেন তাহার নাম আয়ুর্বেদ-দীপিকা বা চরক-তাৎপর্য-দীপিকা, এবং তদ্রচিত সুশ্রুত-টীকার নাম ভানুমতী। তাঁহার অন্য দুইটি ক্ষুদ্রতর গ্রন্থের নাম যথাক্রমে শব্দচন্দ্রিকা ও দ্রব্যগুণসংগ্রহ। শব্দচন্দ্রিকা ভেষজ গাছ-গাছড়া এবং আকর দ্রব্যাদির তালিকা, এবং দ্রব্যগুণসংগ্রহ পথ্যাদি-নিরূপণ সংক্রান্ত পুঁথি। কিন্তু চক্রপাণির শ্রেষ্ঠ মৌলিকগ্রন্থ হইতেছে চিকিৎসা-সংগ্রহ; এই গ্রন্থ রুগবিনিশ্চয়-প্রণেতা মাধবের এবং সিদ্ধযোগ-প্রণেতা বৃন্দের আলোচনা-গবেষণার ধারাই অনুসরণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তৎসত্ত্বেও চিকিৎসা-সংগ্রহ ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রন্থ, এবং ধাতবদ্রব্য-প্রকরণে চক্রপাণি যে মৌলিকত্ব দেখাইয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

চিকিৎসা-শাস্ত্র
চক্রপাণিদত্ত
সুরেশ্বর
বঙ্গসেন

পাল-পর্বের শেষ অধ্যায়ে কিংবা তাহার কিছু পরেই আরও দুইজন নিদান-শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের কথা জানা যায়, একজন সুরেশ্বর বা সুরপাল, আর একজন বঙ্গসেন। সুরেশ্বরের পিতামহ দেবগণ চন্দ্ররাজ গোবিন্দচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বা সভা-চিকিৎসক ছিলেন, পিতা ভদ্রেশ্বর ছিলেন 'বঙ্গেশ্বর' রামপালের সভা-চিকিৎসক; আর সুরেশ্বর নিজে ছিলেন ভীমপাল নামে জনৈক নরপতির অন্তরঙ্গ। তদ্রচিত শব্দপ্রদীপ এবং বৃক্ষায়ুর্বেদ দুইই ভেষজ গাছ-গাছড়ার তালিকা ও গুণাগুণবিচার; কিন্তু তাঁহার লোহপদ্ধতি বা লোহসর্বস্ব লোহার ভেষজ ব্যবহার এবং লৌহঘটিত ঔষধাদি প্রস্তুত সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বঙ্গসেনের পিতা ছিলেন কাঞ্জিকবাসী গদাধর, এবং তদ্রচিত গ্রন্থের নাম চিকিৎসা-সার-সংগ্রহ। বঙ্গসেন সুশ্রুতপন্থী কিন্তু মাধব-রচিত রুগ-বিনিশ্চয় গ্রন্থের প্রতি তাঁহার ঋণ সামান্য নয়।

লিপি-সাক্ষ্যে মনে হয়, মীমাংসার চর্চা বাংলাদেশে হইত না এমন নয়; কিন্তু মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র লইয়া এই পর্বে কেহ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কিছু রচনা করিয়াছিলেন, এমন নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছেনা। জিতেন্দ্রিয় ও বালক নামে দুইজন ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতার উল্লেখ ও বচন উদ্ধার করিয়াছেন জীমূতবাহন, শূলপাণি রঘুনন্দন, প্রভৃতি পরবর্তী বাঙালী স্মৃতিকারেরা। কোনো অবাঙালী স্মৃতিকার ইঁহাদের উদ্ধার বা আলোচনা করেন নাই; সেই জন্য, মনে হয়, ইঁহারা দুইজনই ছিলেন বাঙালী, এবং একাদশ শতকের কোনো সময়ে ইঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কাহারও রচনা কালের হাত এড়াইয়া বাঁচিয়া নাই; তবে শুভাশুভ-কাল সম্বন্ধে জিতেন্দ্রিয়ের রচনা উদ্ধার করিয়া জীমূতবাহন তাহার সমালোচনা করিয়াছেন কালবিবেক-গ্রন্থে; ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে জিতেন্দ্রিয়ের বচন উদ্ধার ও সমালোচনা জীমূতবাহন করিয়াছেন দায়ভাগ ও ব্যবহার মাতৃকাগ্রন্থে এবং রঘুনন্দন করিয়াছেন দায়তত্ত্ব-গ্রন্থে। বালক ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকিবেন, কারণ জীমূতবাহন, শূলপাণি ও রঘুনন্দন তিন জনই এই দুই বিষয়ে বালকের মতামত সমালোচনা

ধর্মশাস্ত্র
জিতেন্দ্রিয়, বালক

করিয়াছেন। জীমূতবাহন তো তাঁহার মতামত্‌কে 'বালবচন' বলিয়া বিদ্রূপই করিয়াছেন!

যোগ্লোক নামে ইহাদের চেয়েও প্রাচীনতর ("পুরাতন") একজন স্মৃতিকারের মতামত্‌ আলোচনা করিয়াছেন জীমূতবাহন ও রঘুনন্দন; ইনি শুভাশুভ কাল সম্বন্ধে ব্যবহার সম্বন্ধীয় একটি 'বৃহৎ' ও একটি 'লঘু' গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা প্রভৃতি লইয়া বাঙালী স্মৃতিকারদের যে উৎসাহ পরবর্তী সেন-বর্মণ পর্বে দেখা যাইবে, সে-উৎসাহের সূত্রপাত এই পর্বে এখনও হয় নাই।

এই পর্বে একটি মাত্র জ্যোতিষ-গ্রন্থের খবর আমরা জানি; গ্রন্থটি জনৈক কল্যাণবর্মা রচিত সারাবলী। মল্লিনাথ (শিশুপালবধ টীকা), উৎপল এবং অল্‌-বেরুণী এই তিনজনই সারাবলী হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। কল্যাণবর্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে "ব্যাঘ্রতটীশ্বর" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই ব্যাঘ্রতটী নিঃসন্দেহে খালিমপুর লিপির ব্যাঘ্রতটী।

সাহিত্য
কাব্য
নাটক

এই পর্বের প্রশস্তি-লিপি মালায় সমসাময়িক বাংলার কাব্যসাহিত্যের এবং কাব্যচর্চার মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব প্রশস্তি সাধারণত সভাকবিদেরই রচনা, এবং উপমায়-রূপকে, অনুপ্রাসে-অলংকারে, ছায়ায়-ছবিতে একান্তই মধ্য-ভারতীয়, বস্তুত সর্বভারতীয় কাব্যোতিহ্যের অনুগামী। কোনো মৌলিক কল্পনা বা রীতি বা ভঙ্গি এই প্রশস্তি-রচনাগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দুই চারিটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিলেই বোঝা যাইবে, গতানুগতিক ধারার কাব্যরচনা-শক্তিতে সমসাময়িক বাঙালী কিছু হীন ছিলনা।

সিদ্ধার্থস্য পরার্থ সুস্থিত মতেঃ সন্মার্গমভ্যস্যতঃ
সিদ্ধিঃ সিদ্ধিমনুত্তরাং ভগবতস্তস্য প্রজাসু ক্রিয়াৎ।
যস্ত্রৈধাতুকসত্ত্বসিদ্ধিপদবীরত্যুগ্রবীর্যোদয়াজ্
জিত্বা নির্বৃতিমাসসাদ সুগতঃ সর্বজ্ঞ সর্বভূমীশ্বরঃ॥

যাঁহার মতি পরার্থে সুস্থিত, যিনি সৎমার্গ অভ্যাস করিতেছেন, যিনি অত্যুগ্রবীর্য বলে ত্রিলোকবাসী জীবের সিদ্ধির উপায় জয় করিয়া নির্বৃতি লাভ করিয়াছেন, যিনি সুগত, এবং যিনি সর্বভূমীশ্বর, এমন ভগবান সিদ্ধার্থের সিদ্ধি তাঁহার প্রজাদিগকে অনুত্তর সার্থকতা দান করুক।

(দেবপালদেবের মুঙ্গের ও নালন্দা-লিপির প্রথম শ্লোক)

মৈত্রীং কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ
সম্যক্‌সম্বোধিবিদ্যাসরিদমলজলক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ।
জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ্য শান্তিং
স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোহন্যশ্চ গোপালদেবঃ॥

যিনি কারুণ্যরত্নপ্রমুদিত হৃদয়ে মৈত্রীকে প্রেয়সীরূপে ধারণ করিয়াছেন, যিনি সম্যক্ সম্বোধিবিদ্যারূপ নদীর অমল জলে অজ্ঞান পঙ্ক ক্ষালন করিয়াছেন, যিনি মাররূপ অরির আক্রমণ পরাভূত করিয়া শাশ্বত শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এমন শ্রীমান্ দশবল লোকনাথ এবং গোপালদেব জয়যুক্ত হউন।

(নারায়ণপালদেবের ভাগলপুর-লিপির প্রথম শ্লোক)

বন্দ্যো জিনঃ স ভগবান্ করুণৈকপাত্রং ধর্মোঽপ্যসৌ বিজয়তে জগদেকদীপঃ।
যৎসেবয়া সকল এব মহানুভাবঃ সংসারপারমুপগচ্ছতি ভিক্ষু সঙ্ঘঃ ॥

করুণার একমাত্র পাত্র ভগবান্ জিন বন্দিত হউন; জগতের একমাত্র দীপ ধর্মও জয়যুক্ত হউন; ইঁহাদের সেবায় সকল মহানুভাব ভিক্ষুসংঘ সংসারের পার প্রাপ্ত হয়।

(শ্রীচন্দ্রদেবের রামপাল ও কেদারপুর-লিপির বন্দনা শ্লোক)

বাল্যাৎ প্রভৃত্যহরহর্যদুপাসিতাসি বাগ্‌দেবতে তদধুনা ফলতু প্রসীদ।
বক্ষ্যামি ভট্টভবদেবকুলপ্রশস্তিসূক্তাক্ষরাণি রসনাগ্রমধিশ্রয়েথাঃ।

হে বাগ্‌দেবি, বাল্যকাল হইতে তুমি প্রত্যহ উপাসিতা হইয়াছ, সেই উপাসনা এখন ফলবতী হউক, তুমি প্রসন্না হও। ভট্টভবদেবের কুলপ্রশস্তি সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিব, তুমি রসনাগ্রে অধিষ্ঠিত হও।

(ভট্ট-ভবদেবের ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি; রচয়িতা বাচস্পতি কবি)

ভট্ট গুরবমিশ্রের প্রশস্তি, ভোজবর্মার বেলাব প্রশস্তি, সমস্তই এ-যুগের কাব্য চর্চার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিটির রচয়িতা কবি মনোরথ; এই লিপিটিতে সেকালের নৌযুদ্ধের একটি সুন্দর বর্ণনা আছে:

যস্যানুত্তরবঙ্গসঙ্গর জয়ে নৌবাটহীহীরব—
ত্রস্তৈর্দিক্করিভিশ্চ যন্নচলিতং চেন্নাস্তি তদ্গম্যভূঃ।
কিঞ্চোৎপাতুককেনিপাতপতনপ্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈর্
আকাশে স্থিরতা কৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী ॥

যাঁহার দক্ষিণবঙ্গযুদ্ধজয়ে নৌবাহিনীর হীহী রবে ত্রস্ত হইয়া দিগ্‌গজেরা যে পলায়ন করে নাই তাহার কারণ তাহাদের যাইবার স্থান ছিল না। তাহা ছাড়া, দাঁড়গুলির উৎক্ষেপে উৎক্ষিপ্ত জলকণা যদি আকাশে স্থির হইয়া থাকিত তাহা হইলে চন্দ্রের কলঙ্ক ঢাকা পড়িত।

সংকলয়িতা শার্ঙ্গধর তাঁহার শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি (১৩৬৩ খ্রী শ) নামক গ্রন্থে গৌড়-অভিনন্দ নামে এক কবির দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন; এই দুইটির একটি শ্লোক শ্রীধরদাস তাঁহার সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থেও উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীধরের মতে তাহার রচয়িতা কবি শুভাঙ্গ বা শুভাংক। শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি-গ্রন্থে আরও দুইটি

গৌড় অভিনন্দ

শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে (কবি) অভিনন্দর রচনা বলিয়া; এই অভিনন্দের গৌড় অভিধা অনুপস্থিত। গৌড় অভিধাবিহীন অভিনন্দর ৫টি শ্লোক কবীন্দ্রবচন-গ্রন্থে, ২২টি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে, ৬টি শ্লোক জলহণের সূক্তিমুক্তাবলীতে,

এবং একটি পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অভিনন্দরই দুইটি শ্লোক রামচরিতে উদ্ধার করা হইয়াছে; এবং একাধিক শ্লোকাংশ উজ্জ্বলদত্ত এবং বৃহস্পতি রায়মুকুটও ব্যবহার করিয়াছেন। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়-গ্রন্থে (একাদশ শতক) যে কবি অভিনন্দর উল্লেখ আছে তিনি খুব সম্ভবত এই অভিধাবিহীন অভিনন্দ, কিন্তু ইনি এবং গৌড়-অভিনন্দ একই ব্যক্তি কিনা, নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। গৌড়-অভিনন্দ বাঙালী ছিলেন, তাঁহার অভিধাতেই প্রমাণ। অভিধাবিহীন কবি অভিনন্দের ২২টি শ্লোক বাঙালী শ্রীধরদাস কর্তৃক সংকলিত হইতে দেখিয়া মনে হয়, ইনিও বোধ হয় বাঙালী ছিলেন, এবং তাহা হইলে এই দুই অভিনন্দ এক হইতে কিছু বাধা নাই। গৌড়-অভিনন্দ কাদম্বরী-কথাসার নামেও একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন পদ্যে।

সোঢ্ঢলের উদয়সুন্দরীকথা-গ্রন্থে আর এক সুপ্রসিদ্ধ কবি অভিনন্দর কথা আছে। এই অভিনন্দ এক পাল বংশীয় যুবরাজের সভাকবি ছিলেন এবং রামচরিত নামে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্য হইতে জানা যায়, যুবরাজের বিরুদ ছিল হারবর্ষ এবং তিনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর; তাঁহার পিতার নাম ছিল বিক্রমশীল এবং তিনি স্বয়ং ছিলেন ধর্মপাল-কুল-কৈরব-কাননেন্দু এবং পালকুল-প্রদীপ, পালকুলচন্দ্র। সন্দেহ নাই যে, যুবরাজ হারবর্ষ ছিলেন পালবংশীয়, এবং নৃপতি ধর্মপালের বংশধর। ধর্মপালের অন্য একটি নাম বা বিরুদ ছিল বিক্রমশীল, এ-তথ্য তিব্বতী ঐতিহ্যে সুস্পষ্ট। সুতরাং এই অনুমান অনৈতিহাসিক নয় যে, যুবরাজ হারবর্ষ এবং দেবপাল একই ব্যক্তি। এ-অনুমান সত্য হইলে রামচরিতের কবি অভিনন্দকে বাঙালী বলিতে আপত্তি হইবার কারণ নাই। তাহা ছাড়া, বাংলাদেশে বাঙালী কবি কর্তৃক রচিত এই প্রাচীনতম রামচরিত বা রামায়ণ-কাব্যের একটি স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আছে; তাহা দেবীমাহাত্ম্য কীর্তন, যদিও তাহা হনুমানের মুখে, শ্রীরামচন্দ্রের মুখে নয়।

অভিনন্দ ও রামচরিত

পাল-চন্দ্রপর্বে বাংলা দেশে রামায়ণ-কাহিনী সুপ্রচলিত ছিল, এবং উচ্চকোটিস্তরে রাম-সীতার মূর্তি পূজা প্রচলিত থাকুক বা না থাকুক, অন্তত ইহারা লোকের শ্রদ্ধা এবং পূজা আকর্ষণ করিতেন, সন্দেহ নাই। অভিনন্দ-রচিত রামচরিতই প্রাচীন বাংলার একমাত্র রাম-কাব্য নয়; সন্ধ্যাকর-নন্দী নামে প্রসিদ্ধতর আর একজন কবি রামচরিত নামেই আর একখানা ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক কাব্য বলিতেছি এই অর্থে যে সন্ধ্যাকরের কাব্যটি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক; এক অর্থে রামচন্দ্রের কাহিনী, অপর অর্থে পালরাজ রামপাল এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীদের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে যে কবিপ্রশস্তি আছে তাহা হইতে জানা যায়, সন্ধ্যাকরের পিতার নাম ছিল প্রজাপতি-নন্দী, পিতামহের নাম পিণাক-নন্দী, এবং জন্মভূমি ছিল বরেন্দ্রান্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধনপুরে। প্রজাপতি-নন্দী ছিলেন রামপালের সন্ধিবিগ্রহিক। গ্রন্থ-রচনা আরম্ভ কবে হইয়াছিল বলা কঠিন,

সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিত

তবে কৈবর্ত-বিদ্রোহ এবং দ্বিতীয় মহীপালের হত্যা হইতে আরম্ভ করিয়া মদনপালের রাজত্ব পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাসের বর্ণনা হইতে মনে হয়, মদনপালের রাজত্বকালে গ্রন্থ-রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল। সন্ধ্যাকর-নন্দী সমসাময়িক ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য; সেই হিসাবে তাঁহার কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য; কিন্তু যথার্থ সাহিত্যমূল্য স্বল্প এবং মৌলিকত্বও তেমন কিছু নাই। কাব্যটি সুপ্রসিদ্ধ রাঘবপাণ্ডবীয়-কাব্যের ধারার অনুকরণ এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহার ২২০টি আর্যাশ্লোক শ্লেষচাতুর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সন্ধ্যাকর আত্মপরিচয় দিতেছেন 'কলিকালবাল্মীকি' বলিয়া, এবং তিনি যে শুধু অলংকারবিদ্ সুনিপুণ কবি তাহাই নয়, কুশলী ভাষাবিদ্‌ও, এ-দাবিও করিতেছেন। তাঁহার শেষোক্ত দাবি সার্থক, কারণ, শব্দ ও ভাষার উপর যথেষ্ট দখল না থাকিলে আর্যার মত সুকঠিন ছন্দে এবং মাত্র ২২০টি শ্লোকে একাধারে রামপাল-কথা এবং রামায়ণ-কথা বর্ণনা কিছুতেই সম্ভব হইত না। কিন্তু বাল্মীকির সঙ্গে তুলনা অহংকৃত দাবি, সন্দেহ নাই। অলংকারপ্রিয়তায়, শ্লেষোক্তিতে এবং কাব্যের অন্যান্য লক্ষণে সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিত অষ্টম-নবম-দশম-একাদশ শতকীয় সংস্কৃত কাব্যের সমগোত্রীয়।

অবান্তর হইলেও এ-প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য যে, রঘুপতি রামের পূজা এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা পরবর্তী সেন-বর্মণ পর্বে বোধ হয় বাড়িয়াই গিয়াছিল, এবং হয়তো রামের মূর্তিপূজাও প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ধোয়ী-কবি তাঁহার পবনদূতে যে ভাবে স্বর্ণদী বা ভাগরথীতীরে রঘুকুলগুরু দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন, মনে হয়, মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতের মত বাংলাদেশেও রাম-সীতার পূজা প্রচলিত ছিল। পরে কোনো সময়ে তাহা অপ্রচলিত হইয়া গিয়া থাকিবে।

ক্ষেমীশ্বর চণ্ডকৌশিক

তবে, চণ্ডকৌশিক-প্রণেতা নাট্যকার ক্ষেমীশ্বর বাঙালী হইলেও হইতে পারেন। নাটকটির নান্দী অংশের একটি শ্লোক হইতে জানা যায়, গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল মহীপালের রাজসভায়। এই মহীপাল পাল-রাজ মহীপাল হইতে পারেন, আবার গুর্জর-প্রতীহার-রাজ মহীপাল হইতেও বাধা কিছু নাই। নাটকে বর্ণিত রাজা কর্ণাটক সৈন্যদের পরাভূত করিয়াছিলেন; এই রাজা মহীপাল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু পাল-রাজ মহীপাল যেমন একাধিক কর্ণাটক বাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তেমনই প্রতীহার-রাজ মহীপালকেও রাষ্ট্রকূট-বাহিনীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, এবং এই রাষ্ট্রকূট-বাহিনীকে যদি কর্ণাটক বাহিনী বলা যায় তাহা হইলে খুব অন্যায় কিছু করা হয় না। কিন্তু চণ্ডকৌশিক-নাটকের সর্বপ্রাচীন যে দুইটি পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান (১২৫০ ও ১৩৮৭ খ্রীষ্ট শতকে অনুলিখিত) দুইটিই পাওয়া গিয়াছে নেপালে; সন্দেহ নাই যে, বিহার-বাংলাদেশ হইতেই সেগুলি নেপালে গিয়া থাকিবে। সেইজন্যই মনে হয়, ক্ষেমীশ্বর বাঙালী হউন বা না হউন তাঁহার কর্মক্ষেত্র বোধ হয় ছিল বিহার-বাংলা দেশ, এবং চণ্ডকৌশিক-নাটকের প্রচলনও বেশি ছিল এই দুই দেশেই।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণবর্ণিত বিশ্বামিত্র-হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী লইয়া পঞ্চাঙ্ক চণ্ডকৌশিক নাটক। সমস্ত কাহিনীটি নাটকীয় গুণে দুর্বল, এবং ক্ষেমীশ্বরের কবিকল্পনা ও কাব্য-কৌশলও খুব উচ্চস্তরের নয়। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে সেইজন্য চণ্ডকৌশিকের স্থান খুব গর্বের বস্তু নয়। মহাভারতীয় নল-কাহিনী লইয়া ক্ষেমীশ্বর নৈষধানন্দ নামে আর একটি সপ্তাঙ্ক নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

বরং অলংকারবহুল কাব্য হিসাবে নীতিবর্মার কীচকবধ উল্লেখযোগ্য। মহাভারতীয় বিরাটপর্বের সুপরিচিত কীচকবধ উপাখ্যানটি ১৭৭টি শ্লোকে পাঁচটি সর্গে বর্ণিত, কিন্তু মহাভারতের সবল সারল্য নীতিবর্মার রচনায় অনুপস্থিত। তাহার পরিবর্তে আছে শ্লেষ ও যমকালঙ্কার ব্যবহারের নৈপুণ্য, কবির শব্দ ও বাক্‌ভঙ্গির চাতুর্য। সেইজন্যই পরবর্তী বৈয়াকরণিক-অভিধানিক-আলঙ্কারিকেরা নীতিবর্মার কীচকবধ হইতে প্রয়োজন হইলেই দৃষ্টান্ত আহরণ করিতে কার্পণ্য করেন নাই। ১০৬৯ খ্রীষ্ট শতকে নামি-সাধু নামে জনৈক আলংকারিক রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন; এই টীকায়ই সর্বপ্রথম কীচকবধ হইতে উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হইয়াছে। নীতিবর্মার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কোনো তথ্যই আমাদের জানা নাই, তবে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হয় কলিঙ্গের রাজা ছিলেন না হয় কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন, এই রকমের একটু ইঙ্গিত কাব্যটির প্রথম সর্গেই আছে। কিন্তু বাংলা অক্ষরের পাণ্ডুলিপি ছাড়া আর কোনো অক্ষরে কীচকবধের কোনো পাণ্ডুলিপি এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই; তাছাড়া, কাব্যটির প্রত্যেকটি টীকাকারই বাঙালী। সেই জন্যই মনে হয়, নীতিবর্মার কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশ, এবং কাব্যটির প্রচলনও এই দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল।

নীতিবর্মা কীচকবধ

একাদশ-দ্বাদশ শতকের আদি বঙ্গাক্ষরে লেখা একটি কবিতা-সংগ্রহ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে নেপালে; পুঁথিটি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ, নাম কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়। সংকলয়িতার নাম জানিবার উপায় নাই, তবে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। বইখানি যে বাংলাদেশেই সংকলিত হইয়া পরে অন্যান্য অনেক গ্রন্থের মত নেপালে নীত হইয়াছিল, এই অনুমান অযৌক্তিক নয়। বইটিতে ১১১ জন বিভিন্ন কবি-বিরচিত ৫২৫টি শ্লোক আছে, এবং এই ১১১ জনের মধ্যে কালিদাস, অমরু, ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি সর্বভারতপ্রসিদ্ধ কবিদের রচনা যেমন আছে তেমনই এমন অনেকের রচনা আছে যাঁহাদের বাঙালী বলিয়া মনে করিবার কারণ বিদ্যমান। গৌড়-অভিনন্দ, ডিম্বোক বা হিম্বোক, কুমুদাকর মতি, ধর্মকর, বুদ্ধাকরগুপ্ত, মধুশীল, বাগোক, ললিতোক, বিনয়দেব, ছিত্তপ, বন্দ্য তথাগত, জয়ীক, বিতোক, বিত্তাকা বা বিজ্জাকা, বিনয়দেব, বীর্যমিত্র, বৈদ্যোক, শুভংকর, শ্রীধর-নন্দী, রতিপাল, যোগোক, সিদ্ধোক, সোনোক বা সোন্নোক, হিঙ্গোক, বৈদ্যধন্য, অপরাজিত-রক্ষিত, প্রভৃতি কবিদের এই সব নাম হইতে বুঝিতে

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়

পাওয়া যায়, ইহারা বাঙালী ছিলেন, এবং ইহারা অনেকেই ছিলেন বৌদ্ধ। সংস্কৃত সাহিত্যে এই ধরনের কবিতা-সংগ্রহ বা কবিতা-চয়নিকার ধারার উদ্ভব বোধ হয় এই পর্বের বাংলা দেশেই, এবং কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ই এই জাতীয় সর্বপ্রথম সংকলন-গ্রন্থ। এর পরের পর্বের সদুক্তিকর্ণামৃতের সংকলয়িতাও একজন বাঙালী।

মহাকাব্য, এমন কি ছোট ছোট রসহীন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্য বোধ হয় সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালীর খুব বেশি রুচিকর ছিল না; তাহার বেশি রুচিকর ছিল অপভ্রংশ এবং প্রাকৃত পদ ও ছড়া, ছোট ছোট সংস্কৃত কবিতা, প্রকীর্ণ শ্লোক। এই সব সংস্কৃত শ্লোক ও পদের মধ্যে শুধু যে সমসাময়িক সংস্কৃত কাব্য-রীতির পরিচয়ই আছে তাহাই নয়, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রূপ এবং সমসাময়িক বাঙালীর কল্পনা এবং মানসপ্রকৃতিও সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। দুই একজন মহিলা কবির পরিচয়ও পাইতেছি—ভাবাক বা ভাব-দেবী ও নারায়ণ-লক্ষ্মী।

নবম শতকের মধ্যভাগে কামরূপাধিপতি বনমালবর্মদেবের একটি লিপিতে বোধ হয় সর্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার সুস্পষ্ট আভাস পাইতেছি। ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতেও সে-উল্লেখ সুস্পষ্ট। কিন্তু কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়-গ্রন্থে উদ্ধৃত বাঙালী কবি-রচিত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে এই ব্রজলীলার যে-চিত্র দৃষ্টিগোচর, গীতগোবিন্দের আগে সে-চিত্র আর কোথাও দেখা যায় না। তিনটি শ্লোক এখানে উদ্ধার করিতেছি।

কোঽয়ং দ্বারি হরিঃ প্রযাহ্যুপবনং শাখা মৃগেণাত্র কিং
কৃষ্ণোঽহং দয়িতে বিভেমি সুতরাং কৃষ্ণঃ কথং বানরঃ।
মুগ্ধেঽহং মধুসূদনো ব্রজলতাং তামেব পুষ্পাসবাম্
ইত্থং নির্বচনীকৃতো দয়িতয়া হ্রীণো হরিঃ পাতু বঃ॥

(অজ্ঞাতনাম ; সদুক্তিকর্ণামৃতে এই শ্লোকটি কবি শুভাংকের নামে উদ্ধৃত)

* * *

[শীঘ্রং গচ্ছত] ধেনুদুগ্ধকলশানাদায় গোপ্যো গৃহং
দুগ্ধে বষ্কয়িণীকুলে পুনরিয়ং রাধা শনৈর্যাস্যতি।
ইত্যন্যব্যপদেশ গুপ্তহৃদয়ঃ কুর্বন্ বিবিক্তং ব্রজং
দেবঃ কারণনন্দসূনুরশিবং কৃষ্ণঃ স মুষ্ণাতু বঃ॥ (গোল্লোক)

* * *

ময়ান্বিষ্টো ধূর্তঃ স সখি নিখিলামেব রজনীম্
ইহ স্যাদত্র স্যাদিতি নিপুণমন্যাভিসৃতঃ।
ন দৃষ্টো ভাণ্ডীরে তটভুবি ন গোবর্দ্ধনগিরে-
র্ন কালিন্দ্যাঃ [কূলে] ন নিচুলকুঞ্জে মুররিপুঃ॥ (অজ্ঞাতনাম)

৪

পাল-চন্দ্র পর্বে বাংলা দেশের যথার্থ গৌরব ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তত নয় যত তাহার বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সংস্কৃতি অসংখ্য মহাযানী-বজ্রযানী-মন্ত্রযানী-সহজযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা প্রকাশ করিয়াছিলেন সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত অগণিত গ্রন্থে। মূল গ্রন্থ অধিকাংশই বিলুপ্ত, কিন্তু ইহাদের তিব্বতী অনুবাদ কিছু কিছু বর্তমান এবং তিব্বতী গ্রন্থ-তালিকায় তালিকাবদ্ধ। এই সুদীর্ঘ গ্রন্থমালা তিব্বতী ঐতিহ্যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাহিত্যের (Rgyud) অন্তর্গত এবং বৌদ্ধ সূত্র-সাহিত্য (Mdo) হইতে পৃথক। দেশীয় ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে এই সব বৌদ্ধ আচার্য এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির স্মৃতি একেবারে মুছিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। তিব্বতী গ্রন্থ-তালিকা, তিব্বতী লামা তারনাথের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস, সুম্‌পা রচিত পাগ্-সাম্-জোন্-জাং প্রভৃতি গ্রন্থই এ-সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র উপাদান।

পাল-চন্দ্র পর্ব
বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান
শিক্ষা ও সংস্কৃতি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও তদোদ্ভূত অন্যান্য বৌদ্ধ যান (মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান এবং নাথধর্ম, কৌলধর্ম প্রভৃতি) সম্বন্ধে ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিয়াছি। বলা বাহুল্য, এই সব বিভিন্ন যান ও ধর্মমত্ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; অধিকাংশ গ্রন্থ এখনও অনূদিত ও আলোচিতই হয় নাই। অনুবাদ এবং আলোচনার বাধাও বিস্তর। প্রথমত, যে সংস্কৃত ভাষায় মূল গ্রন্থ সমূহ রচিত হইয়াছিল, সে-সংস্কৃত অত্যন্ত ব্যাকরণদোষদুষ্ট এবং শুদ্ধ সুবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষা-ব্যবহারের কোনো বালাই-ই বৌদ্ধ আচার্যদের ছিলনা। তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেন, বুঝিতে পারিলেই হইল, ছন্দ, ব্যাকরণ, অলংকার, শব্দ বা পদরীতি ইত্যাদি অশুদ্ধ বা অপ্রচলিত হইলেও কিছু ক্ষতি নাই। কালচক্রযানের বিমলপ্রভা নামে একটি টীকায় বলা হইয়াছে, বৌদ্ধ আচার্যরা স্বেচ্ছাপূর্বক সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি-পদ্ধতি, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতি অমান্য করিতেন; যাঁহারা মানিয়া চলিতেন তাঁহাদের বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেন! ঠিক এই কারণেই তিব্বতী অনুবাদও বহুক্ষেত্রে দুর্বোধ্য এবং তাহা হইতে সংস্কৃতে পুনরনুবাদ খুব সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, এই সব প্রত্যেকটি ধর্মই গুরুনির্ভর ধর্ম, গুরু ছাড়া এই ধর্মের গুহ্য সাধন প্রক্রিয়ার রহস্য ভেদ করা অসম্ভব বলিলেই চলে, এবং দীক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া গুরুরা অন্য কাহারও নিকট সে-রহস্য ভেদ ও ব্যাখ্যা করিতেন না। সেই হেতু এই সব ধর্মের বিস্তৃতি দীক্ষিত চক্র বা মণ্ডলের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ; সর্বসাধারণ সেই সীমার মধ্যে প্রবেশ করিতেই পারিত না। গুরুরা দীক্ষিতদের নিকট এবং দীক্ষিতরা পরস্পরের মধ্যে তাঁহাদের গুহ্যসাধনা সম্বন্ধে যে-ভাষায় কথা বলিতেন সে-ভাষাও ছিল গুহ্যভাষা। সে-ভাষার নাম ছিল সন্ধাভাষা (সন্ধিভাষা), যে ভাষা শুধু 'মৌলিক' 'সম্পূর্ণ' 'নিগূঢ়' সত্যের কথা বলে; কিন্তু যত মৌলিক, সম্পূর্ণ এবং

নিগূঢ়ই হোক না কেন সে-ভাষা, অদীক্ষিত জনের কাছে তাহা ছিল দুর্বোধ্য। এ-ভাষায় যাহা 'অভিপ্রায়িক' অর্থাৎ আপাত যে-অর্থ কোনো বাক্যের বা পদের, তাহাই তাহার নিগূঢ় অর্থাৎ মৌলিক, সম্পূর্ণ অর্থ নয়; মৌলিক, সম্পূর্ণ, উদ্দিষ্ট অর্থের দিকে তাহা ইঙ্গিত করে মাত্র। কাজেই, সে-ভাষার মৌলিক উদ্দিষ্ট অর্থ ধরিতে পারা সহজ নয়। তৃতীয়ত, ইহাদের সাধনপন্থা এবং প্রক্রিয়াও ছিল অত্যন্ত গুহ্য। নানা প্রকারের যাদুমন্ত্র, যাদুপ্রক্রিয়া, নানা বিধিবিধান, সাধনমন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল, ধারণী, যোগ, সমাধি প্রভৃতি লইয়া এই বৌদ্ধাচার্যরা এমন একটি রহস্যময় জগৎ গড়িয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র-জগতের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য থাকিলেও সর্বত্র সর্বথা তাহা আমাদের অধিগম্য নয়। সে-জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচিত সাধন-রীতিপদ্ধতি, নীতি ও প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ কমই। গুহ্য রহস্যময় সন্ধাভাষায় বৌদ্ধ আচার্যরা গুহ্যতর সাধন প্রক্রিয়া ও অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন। চতুর্থত, যে-সব ছায়া, রূপক, উপমা, প্রতীক এবং যোগারূঢ় শব্দ আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের সাধন-নীতি ও আদর্শ, রীতি ও প্রক্রিয়া এবং অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা বর্ণিত হইয়াছে, সে-গুলি সমসাময়িক সাধারণ নরনারীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, যৌন-জীবন এবং যৌন-প্রক্রিয়া হইতেই আহৃত, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই জীবন ও প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে তাহারা যে অর্থ ও ইঙ্গিত বহন করে তাহা একান্তই আপাত অর্থ ও ইঙ্গিত, এবং সে অর্থ ও ইঙ্গিত আমাদের বর্তমান রুচি ও সংস্কারকে আঘাত করে। কাজেই স্বচ্ছ ও নির্মোহ বিজ্ঞান-দৃষ্টি লইয়া এই সুবিস্তৃত সাহিত্য অনুশীলন না করিলে পরিচিত ছায়া-উপমা-রূপক-প্রতীকের পশ্চাতে, আপাত অর্থের পশ্চাতে, যে নিগূঢ় অর্থ বিদ্যমান তাহা সহজে ধরা পড়ে না।

মহাযানোদ্ভূত মন্ত্রযান, কালচক্রযান ও বজ্রযানে সীমানির্দিষ্ট পার্থক্য বিশেষ কিছু কখনো ছিল না। একই বৌদ্ধাচার্য বিভিন্ন যান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন, এবং একাধিক যান কর্তৃক গুরু এবং আচার্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। শান্তিদেব, শান্তিরক্ষিত, দীপঙ্কর প্রভৃতি আচার্যরা মহাযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান প্রভৃতি সকল যানেই স্বীকৃত, এবং বজ্রযানী-মন্ত্রযানীরা ইহাদের আপন গুরু বলিয়া দাবিও করিয়াছেন। ঠিক একই কথা বলা চলে সহজযান, নাথধর্ম, কৌলধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে। এই সব ধর্ম মত ও সম্প্রদায় সমস্তই সমসাময়িক, এবং এক সম্প্রদায়ের আচার্যরা অন্য সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃতিও লাভ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বজ্রযান ও মন্ত্রযানের অপেক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠাবান আচার্যরা তো সকলেই সহজযান, নাথধর্ম এবং কৌলধর্মের আদি গুরু বলিয়া স্বীকৃত। সরহ বা সরহপাদ, কৃষ্ণ বা কাহ্নপাদ, শবরপাদ, লুইপাদ-মীননাথ ইহারা প্রত্যেকেই বজ্রযানে যেমন স্বীকৃত, তেমনই সহজযানী-নাথপন্থী-কৌলমার্গী প্রভৃতিরাও ইহাদের আচার্য, বা গুরু, বা প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া দাবি করিয়াছেন। শান্তিদেব, শান্তি বা শান্তরক্ষিত, দীপঙ্কর প্রমুখ আচার্যরা গোড়ায় ছিলেন মহাযানী, পরে ক্রমশ বিবর্তিত হইয়াছিলেন বজ্রযানীরূপে, এবং যেহেতু বজ্রযান মহাযান হইতেই উদ্ভূত এবং তাহারই বিবর্তিত রূপ সেই হেতু ইহার মধ্যে

অস্বাভাবিক বা অনৈতিহাসিক কিছু নাই। তেমনই নাথপন্থী বা কৌলমার্গীদের গুরু লুইপাদ-মীননাথ এবং সহজযানীদের লুইপাদ দুই ব্যক্তি, এমন মনে করিবার কোনো কারণ নাই। বজ্রযানোদ্ভূত এই সব ধর্মমার্গ ও সম্প্রদায় গোড়ায়ই আপনাপন বৈশিষ্ট্য লইয়া সুনির্দিষ্ট সীমায় সীমীত হয় নাই ; সে-সব বৈশিষ্ট্য ক্রমশ পরে গড়িয়া উঠিয়াছে। বরং, সূচনায় ইহাদের একই ছিল ধ্যান ও আদর্শ, একই ছিল ভাব-পরিমণ্ডল, এবং যাঁহারা সেই ধ্যান, আদর্শ ও ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিলেন তাঁহারা পরে প্রত্যেক স্ব-স্বতন্ত্র মত্ ও সম্প্রদায় কর্তৃক গুরু এবং আচার্য বলিয়া স্বীকৃত হইবেন, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তাহা ছাড়া, মন্ত্রযান-বজ্রযান ধর্মের মন্ত্র, মণ্ডল প্রভৃতি বাহ্যানুষ্ঠানের প্রতি সহজযানী সিদ্ধাচার্যদের মনোভাব যত বিরূপই হোক্ না কেন, নাথ ও কৌলধর্মের প্রতি বিরূপ হইবার তেমন কারণ কিছু ছিলনা ; ইহাদের মধ্যে মৌলিক বিরোধ স্বল্পই। ইহাদের মধ্যে, বিশেষভাবে নাথধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়া সমানেই চলিতেছিল। নাথধর্ম ছিল কতকটা লোকায়ত ধর্ম, সহজযানও কতকটা তাই। কাজেই ইহাদের মধ্যে এবং অন্যান্য লোকায়ত ধর্মের সঙ্গে পরস্পর যোগাযোগ কিছুটা ছিলই এবং ছিল বলিয়াই ইহাদের ভিতর হইতে এবং ইহাদেরই ধ্যানাদর্শ লইয়া পরবর্তী বৈষ্ণব সহজিয়া-ধর্ম, শৈব নাথযোগী সম্প্রদায়, আউল-বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায় ও মতামতের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, এখানে আর পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই।

এই সব মহাযানী-কালচক্রযানী-মন্ত্রযানী-বজ্রযানী-সহজযানী আচার্যদের দেশ ও কাল সম্বন্ধে এবং ইহাদের রচিত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা দেশ ছাড়িয়া দূরে অন্যত্র নিজেদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়াছিলেন তাঁহাদের সমস্ত তথ্যই প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিব্বতী গ্রন্থ-তালিকায় অনেকের জন্ম ও কর্মভূমি উল্লিখিত আছে, কিন্তু অনেকের নাইও ; কিন্তু যাঁহাদের আছে তাঁহাদের জন্ম-কর্মভূমির স্থান-নাম সর্বদা এবং সর্বত্র সনাক্ত করা সহজ নয় ; এ-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যাঁহাদের সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ বিদ্যমান এবং সে সব স্থান-নামের সনাক্তকরণ সুনির্ধারিত, তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিঃসংশয়ে বলা চলে, এই সব আচার্যরা অধিকাংশই ছিলেন বাংলা দেশের অধিবাসী, স্বল্পসংখ্যক কয়েকজনের জন্মভূমি ছিল কামরূপ, ওড্রদেশ, বিহার এবং কাশ্মীর। এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই ইহাও বলা চলে যে, এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের লীলাভূমি ছিল প্রাচ্য-ভারত, বিশেষ ভাবে বাংলা দেশ। যে-সব মহাবিহারে বসিয়া বৌদ্ধ আচার্যরা অগণিত গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের ভিতর নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীল ছাড়া অন্য প্রত্যেকটি মহাবিহারই ছিল বাংলা দেশে। সমসাময়িক বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্য সুবৃহৎ কেন্দ্র ছিল জগদ্দল, সোমপুরী, পাণ্ডুভূমি, ত্রৈকূটক, বিক্রমপুরী, দেবীকোট, সন্নগর, ফুল্লহরি, পণ্ডিত, পট্টিকেরক প্রভৃতি বিহারে ; এবং এ-সংবাদও পাইতেছি তিব্বতী বৌদ্ধ গ্রন্থ-তালিকা হইতেই।

এই পর্বের নালন্দা, ওদন্তপুরী এবং বিক্রমশীল মহাবিহারও বাঙালী ও বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় ও সংস্কৃতি সীমার অন্তর্গত। বিক্রমশীলর প্রতিষ্ঠাতাই তো ছিলেন পাল-রাজ ধর্মপাল স্বয়ং এবং ওদন্তপুরী ও নালন্দায় এ-পর্বের বিদ্যার্থী ও আচার্যদের অধিকাংশই বাঙালী। নালন্দা ও ওদন্তপুরীর প্রধান পৃষ্ঠপোষকও বাংলার পাল-বংশ। এই সব বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্যদের স্থিতিকাল সম্বন্ধে নির্দিষ্ট সন-তারিখ নির্ণয় কঠিন হইলেও একেবারে অসম্ভব নয়। কোনো কোনো গ্রন্থ রচনায় তারিখ উল্লিখিত আছে; সেই সব তারিখ, সমসাময়িক বা পূর্বতন আচার্যদের ও রাজা-রাজবংশের উল্লেখের এবং গুরুপরম্পরানির্ধারণের সাহায্যে মোটামুটি ইহাদের কাল-নির্ণয়ের একাধিক চেষ্টা হইয়াছে। তাহার উপর নির্ভর করিয়া বলা চলে, উল্লিখিত বৌদ্ধ আচার্যদের স্থিতিকাল এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থাদির রচনাকাল মোটামুটি অষ্টম শতক হইতে একাদশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। বিশেষ ভাবে পাল-পর্বই যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের উদ্‌ভব, প্রসার ও প্রভাব কাল তাহা তিব্বতী গ্রন্থ-তালিকা, তারনাথের ইতিহাস এবং সুম্‌পার পাগ-সাম্-জোন্-জাঙ্-গ্রন্থের সাক্ষ্যেও সুপ্রমাণিত।

উল্লিখিত বৌদ্ধ আচার্যরা যে শুধু অবলোকিতেশ্বর, তারা, মঞ্জুশ্রী, লোকনাথ, হেরুক, হেবজ্র, প্রভৃতি বিচিত্র দেবদেবীর সাধনমন্ত্র, স্তোত্র, সঙ্গীতি, মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল, যোগ, ধারণী, সমাধি প্রভৃতি লইয়াই গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন তাহাই নয়, যোগ ও দর্শন, হেতুবিদ্যা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও শব্দবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কাজেই, এই সব গ্রন্থের মধ্যেই সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-দীক্ষাও প্রতিফলিত।

বলিয়াছি, এই সব বৌদ্ধ আচার্যরা প্রায় সকলেই ছিলেন বাঙালী, এবং ইঁহাদের কর্মভূমি ছিল পূর্ব-ভারত, প্রধানত প্রাচীন বাংলা দেশ ও বিহার। কিন্তু বাঙালী বলিয়া দাবি করিবার আগে দুইটি স্থান-নাম সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। মহাযান-বজ্রযান-মন্ত্রযান প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া এক সুবিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভব ও প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল; তাহার কিয়দংশ মাত্র তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল বাংলা, বিহার, কাশ্মীর ও তিব্বতের নানা বৌদ্ধ বিহারে। এই অনূদিত গ্রন্থ গুলির একটি তালিকা ত্রয়োদশ শতকে সংকলিত হইয়াছিল তিব্বতে, তিব্বতী লামা বু-তোন কর্তৃক; তালিকা-গ্রন্থটির নাম ত্যাঙ্গুর। এই অনূদিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই কালের প্রভাব এড়াইয়া আজো বাঁচিয়া আছে; মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলিরও কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে নেপালে এবং অন্যত্র। গ্রন্থগুলির অধিকাংশই বজ্রযানী সাধন-সম্পর্কিত, তিব্বতীতে বলা হইয়াছে বৌদ্ধতন্ত্র বা বৃগ্যুদ (Rgyud); কিছু বৌদ্ধ সূত্র সম্বন্ধীয় বা ম্‌দো (Mdo)। যাহা হউক, এই সব গ্রন্থ-লেখকদের কাহারও কাহারও জন্মভূমি ছিল জাহোরে বা সাহোরে এবং উড্ডীয়ানে, এবং লোকায়ত ঐতিহ্যমতে উড্ডীয়ানেই বজ্রযানের উদ্ভব। উড্ডীয়ান যে কোন্ স্থান তাহা লইয়া পণ্ডিত-মহলে প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান। কাহারও মতে উড্ডীয়ান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও হিন্দুকুশের মধ্যবর্তী

উড্ডীয়ান
জাহোর
সাহোর

সোয়াট্ উপত্যকা ; কাহারও মতে পূর্ব-তুর্কীস্থানের কাসগরে, কাহারও মতে বাংলা দেশে, কাহারও মতে বাংলার পূর্ব-সীমান্তে, আবার কাহারও মতে উড়িষ্যায়। এই সব বিভিন্ন মতামতের অরণ্যজাল ভেদ করিয়া সত্য নির্ণয় দুরূহ। তবে একটি তথ্যের দিকে পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়। ত্যাঙ্গুরে সরোহ(বজ্র) বা সরহকে বলা হইয়াছে উড্ডীয়ান-বিনির্গত, কিন্তু পাগ্-সাম্-জোন্-জাং-গ্রন্থে আবার সেই সরহকে বলা হইয়াছে বঙ্গালের অধিবাসী। ত্যাঙ্গুরের এক অংশে যে অবধূতপাদ অদ্বয়বজ্রকে বলা হইয়াছে উড্ডীয়ান্‌বাসী বলিয়া, সেই ত্যাঙ্গুরেরই অন্য অংশে সেই অদ্বয়বজ্রকেই বলা হইয়াছে বাঙালী। পাগ-সাম-জোন্-জাং-গ্রন্থে যে লুইপাদকে বলা হইয়াছে উড্ডীয়ান-বিনির্গত, ত্যাঙ্গুরে সেই লুইপাদকেই বলা হইয়াছে বাংলার অধিবাসী। ত্যাঙ্গুরে যে তৈলিকপাদকে বলা হইয়াছে উড্ডীয়নবাসী, সেই তৈলিকপাদকেই পাগ্-সাম-জোন্-জাং চট্টগ্রামীয় এক ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। আবার, পাগ্-সাম-জোন্-জাং-গ্রন্থে নাগবোধির বাড়ী বলা হইয়াছে বরেন্দ্রের শিবসের গ্রামে ; অথচ নাগবোধি স্বয়ং নিজের বর্ণনা দিয়াছেন উড্ডীয়ান-বিনির্গত বলিয়া। এই সাক্ষ্যের পর উড্ডীয়ান্ যে বাংলা দেশের কোনো স্থান নয় এ-কথা বলিতে একটু দ্বিধা হয় বই কি ?

জাহোর বা সাহোর সম্বন্ধেও একই সংশয়। সাহোরকে কেহ মনে করেন লাহোর, কেহ বলেন পঞ্জাবের মণ্ডি, কেহ মনে করেন বাংলার যশোর বা ঢাকা জেলার সাভার ; আবার কেহ মনে করেন সমগ্র হিন্দুস্থানেরই নাম জাহোর বা সাহোর। পাগ্-সাম-জোন্-জাং-গ্রন্থ একবার শান্তরক্ষিতের পরিচয় দিয়াছেন বাঙালী বলিয়া, আর একবার বলিতেছেন তিনি ছিলেন সাহোরের রাজ-পরিবারের সন্তান। অন্যত্র তিব্বতী ঐতিহ্যে শান্তরক্ষিতকে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে গৌড়ের অধিবাসী। তিব্বতী জনশ্রুতি মতে ধর্মপাল ছিলেন সাহোরের রাজা, এবং আর এক তিব্বতী ঐতিহ্যে বঙ্গালী দীপঙ্কর সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে, তিনি ছিলেন সাহোর-রাজবংশোদ্ভূত। আনুমানিক ১৪০০খ্রীষ্ট শতকে বাঙালী স্মার্ত পণ্ডিত শূলপাণিও আত্মপরিচয় দিয়াছেন সাহুরিয়ান বলিয়া। এই সব সাক্ষ্যে মনে হয় জাহোর বা সাহোরও বাংলাদেশেরই কোনো স্থান।

এই সব বাঙালী বৌদ্ধ আচার্যদের কাল সম্বন্ধেও নিঃসংশয় হওয়া কঠিন। তবু তিব্বতী ঐতিহ্য ও অন্যান্য সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া কিছু কিছু কাল-নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। এই সব প্রচেষ্টা আশ্রয় করিয়া অগণিত বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে স্বল্পমাত্র কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়ার চেষ্টা করা যাইতে পারে—কতকটা আনুমানিক কালক্রমানুযায়ী।

প্রাচীনতম বজ্রযানী বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে শান্তিরক্ষিত অন্যতম। সুম্‌পা-বর্ণিত তিব্বতী ঐতিহ্যমতে শান্তিরক্ষিত ছিলেন জাহোর-রাজবংশের সন্তান। গোপালের রাজত্ব-কালে তাঁহার জন্ম, ধর্মপালের রাজত্বকালে মৃত্যু। শান্তিরক্ষিতের জন্মভূমি বাংলাদেশে হউক

বা না হউক, তাঁহার কর্মভূমি যে ছিল প্রাচ্য-ভারত এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম।

বজ্রযানী তান্ত্রিক ও সিদ্ধাচার্য আচার্য-কুল এবং তাঁহাদের রচনা

ত্যাঞ্জুর গ্রন্থ-তালিকায় দেখা যায়, তিনি অন্তত তিন খানা বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন: অষ্টতথাগতস্তোত্র, বজ্রধর-সঙ্গীত-ভগবত-স্তোত্রটীকা এবং পঞ্চমহোপদেশ। তাঁহার অন্য নাম ছিল আচার্য বোধিসত্ত্ব, এবং সেই নামেও সপ্ততথাগত সম্বন্ধে আরও চারখানি বই লিখিয়াছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যে এই বজ্রযানী বৌদ্ধ আচার্য শান্তিরক্ষিত এবং মহাযানী নৈয়ায়িক ও দার্শনিক শান্তরক্ষিত একই ব্যক্তি। নৈয়ায়িক শান্তরক্ষিত ছিলেন স্বতন্ত্র মধ্যমক মতের অনুগামী এবং নালন্দা-মহাবিহারের অন্যতম আচার্য। তিনি সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বসংগ্রহ, বাদন্যায়বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ এবং মধ্যমকালঙ্কার-কারিকা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক; তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও মনীষা এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য অধ্যাত্ম-চিন্তায় সুগভীর জ্ঞান সদ্যোক্ত তিনটি গ্রন্থে সুপরিস্ফুট। তাঁহার শিষ্য কমলশীল প্রথমোক্ত গ্রন্থটির একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই কমলশীল ছিলেন লুই-পা বা লুইপাদের সমসাময়িক। তিব্বতী ঐতিহ্যমতে শান্তিরক্ষিতের ভগ্নীপতি ছিলেন উড্ডীয়ান বা ওড্ডীয়ানবাসী রাজকুমার পদ্মসম্ভব।

অষ্টম-নবম শতক

তিব্বতী ঐতিহ্যমতে শান্তিরক্ষিতের খ্যাতি ভারতবর্ষের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে (আ অষ্টম শতকের মাঝামাঝি) তিব্বতের রাজা ছিলেন বৌদ্ধধর্মানুরক্ত খ্রি-স্রং-ল্দে-ব্ৎসান, এবং শান্তিরক্ষিত কোনো কার্যব্যপদেশে ছিলেন নেপালে। খ্রি-স্রং-ল্দে-ব্ৎসান কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া শান্তিরক্ষিত গেলেন তিব্বতে, কিন্তু তিব্বত তখন যাদু ও ভূতপ্রেতবাদের এবং নানা গুহ্যসাধনার কেন্দ্র। শান্তরক্ষিতের বৌদ্ধ ধর্মের কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। তিনি ফিরিয়া গেলেন নেপালে; কিন্তু কিছুদিন পরই আবার আমন্ত্রিত হইয়া যাইতে হইল তিব্বত। কিছুদিন পর তাঁহারই নির্দেশে তিব্বত-রাজ পদ্মসম্ভবকেও আমন্ত্রণ করিয়া তিব্বতে লইয়া আসিলেন। তখন শান্তরক্ষিত ও পদ্মসম্ভব দুইজনে মিলিয়া সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তিব্বতে লামা শ্রেণীর সৃষ্টি হইল, এবং কৃতজ্ঞ খ্রি-স্রং-ল্দে-ব্ৎসান মগধের ওদন্তপুরী বিহারের আদর্শে ব্সম্-য়া (Bsam-ya)-বিহার প্রতিষ্ঠা করিলেন, শান্তিরক্ষিত হইলেন সেই বিহারের প্রথম সংঘাচার্য। পদ্মসম্ভব কিছুদিন পর ধর্মপ্রচারোদ্দেশে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। প্রায় তেরো বৎসর প্রচার ও গ্রন্থাদি রচনার পর এক চীনা শ্রমণ তিব্বতে আসিয়া বৌদ্ধ ধর্মের অন্য আর একটি নিকায় প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। শান্তিরক্ষিত সেই শ্রমণের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তর্কে তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া খ্রি-স্রং-ল্দে-ব্ৎসানকে অনুরোধ করিলেন মগধ হইতে কমলশীলকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিবার জন্য। কমলশীল তিব্বতে আসিয়া চীনা শ্রমণকে তর্কযুদ্ধে হারাইয়া শান্তিরক্ষিতের মতবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

শান্তিরক্ষিত-শান্তরক্ষিতের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে যে-সমস্যা সে-সমস্যা বজ্রযানী গ্রন্থের

লেখক তান্ত্রিক শান্তিদেব এবং শিক্ষা-সমুচ্চয় ও বোধিচর্যাবতার-রচয়িতা [illegible] [illegible] আচার্য শান্তিদেব সম্বন্ধেও বিভ্রান্তি বিদ্যমান। তারনাথের মতে মহাযানী শান্তিদেব ছিলেন সৌরাষ্ট্রের রাজপরিবারসম্ভূত। কিছুদিন তিনি রাজা পঞ্চমসিংহের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন; পরে তিনি নালন্দা-বিহারে আসিয়া আচার্য জয়দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পাগ-সাম-জোন্-জাং-গ্রন্থের মতে মহাযানী শান্তিদেবের বাল্যনাম ছিল শান্তিবর্মা, পিতা ছিলেন কল্যাণবর্মা। এই মহাযানী আচার্য খুব সম্ভব সপ্তম-অষ্টম শতকের লোক। ত্যাঞ্জুর-গ্রন্থে বজ্রযানী তান্ত্রিক শান্তিদেবের তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়: শ্রীগুহ্যসমাজ-মহাযোগ-তন্ত্রবলিবিধি, সহজগীতি ও চিত্তচৈতন্য-শমনোপায়। তাঁহার বাড়ী ছিল জাহোরে। সুম্‌পা বলিতেছেন, তান্ত্রিক শান্তিদেবের অন্য নাম ছিল ভুসুকু বা রাউতু। চর্যাগীতি-গ্রন্থের কয়েকটি গীতির রচয়িতা ছিলেন সহজ-সিদ্ধাচার্য জনৈক ভুসুকু; সন্দেহ নাই, এই ভুসুকু ছিলেন বাঙালী। কিন্তু বজ্রযানী তান্ত্রিক শান্তিদেব ও বাঙালী সিদ্ধাচার্য ভুসুকু একই ব্যক্তি কিনা সে-সন্দেহ থাকিয়াই যায়। চর্যাগীতিতে দেখিতেছি, শান্তি-পা বা শান্তিপাদ নামে আর একজন বাঙালী গীত-রচয়িতা সিদ্ধাচার্য ছিলেন। এই শান্তিপাদের অন্য নাম ছিল রত্নাকর-শান্তি এবং ত্যাঞ্জুর গ্রন্থ-তালিকায় দেখিতেছি, তিনি সুখদুঃখদ্বয়-পরিত্যাগদৃষ্টি নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাহা ছাড়া আরও ১৮টি তান্ত্রিক গ্রন্থেরও তিনি ছিলেন লেখক। তারনাথ বলিতেছেন, রত্নাকর-শান্তির বাড়ী ছিল মগধে, বিক্রমশীল-বিহারের তিনি ছিলেন অন্যতম আচার্য, এবং সাত বৎসর তিনি সিংহলে প্রচারকার্যে রত ছিলেন। যাহাই হউক, মহাযানী শান্তিদেব ও বজ্রযানী তান্ত্রিক শান্তিদেব যে দুই ভিন্ন ব্যক্তি এ-সম্বন্ধে বোধ হয় সন্দেহের অবকাশ কম। তবে, তান্ত্রিক শান্তিদেব ও ভুসুক একই ব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন; উভয়েই একাদশ শতকের লোক। চর্যাগীতির শান্তিপাদ ও ত্যাঞ্জুরের রত্নাকরশান্তিও বোধ হয় একই ব্যক্তি।

শান্তিদেব

শান্তিপাদ

সরোরুহবজ্র, কমলশীল, শান্তিরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, ইঁহারা সকলেই প্রায় সমসাময়িক, আনুমানিক অষ্টম শতকের লোক। উড্ডীয়ান-বিনির্গত সরোরুহবজ্রের অন্য নাম ছিল পদ্মবজ্র; তিনি ছিলেন হেবজ্রতন্ত্রের অন্যতম পুরোগামী আচার্য, উড্ডীয়ানবাসী অনঙ্গবজ্রের গুরু এবং ইন্দ্রভূতির পরম গুরু। এই সরোরুহবজ্রকে পরবর্তীকালের সরহ-সরহপাদ বা সরহ-রাহুলভদ্রের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করিবার কোনো কারণ নাই। বস্তুত, ত্যাঞ্জুর, পাগ-সাম-জোন্-জাং, তারনাথ প্রভৃতির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, সরহ নামে একাধিক বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন, এবং তাঁহারা সকলেই কিছু সমসাময়িক ছিলেন না। তারনাথ তো পরিষ্কারই দুই সরহের ইঙ্গিত দিতেছেন, একজন সরহ-রাহুলভদ্র, আর একজন সরহ-শাবরি। ত্যাঞ্জুর-গ্রন্থ তালিকায় অনেকবারই সরহের উল্লেখ আছে এবং তাঁহার-

সরোরুহবজ্র বা পদ্মবজ্র

পরিচয় কখনও মহাচার্য, কখনও মহাব্রাহ্মণ, কখনও মহাযোগী বা যোগীশ্বর, কখনও মহাশবর, কখনও কৃষ্ণবংশধর, কখনও বা উড্ডীয়ান-বিনির্গত। ইহারা প্রত্যেকে এক এবং অভিন্ন কি না, বলা কঠিন; না হওয়াই সম্ভব। তবে দোহাকার এবং বজ্রযানী-সাধন রচয়িতা সিদ্ধাচার্য সরহ-সরহপাদ এবং তারনাথ-কথিত সরহ-রাহুলভদ্র এক এবং অভিন্ন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতেছি না। সুম্‌পা বলিতেছেন, এই সরহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন প্রাচ্য দেশে রজ্ঞী শহরের এক ডাকিনীর গর্ভে এবং জনৈক ব্রাহ্মণের ঔরসে। জনৈক চন্দনপালের রাজত্বকালে তিনি রত্নপাল এবং তাঁহার সভাসদ ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রীদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষাদান করেন। ওডিবিষ বা ওড্রবিষয়ে তিনি মন্ত্রযান শিক্ষা করেন, পরে তিনি মহারাষ্ট্রে গিয়া যোগিনী আচারে সিদ্ধ হন এবং সরহ নামে পরিচিত হন। তিনি কিছুদিন নালন্দায় মহাচার্যও ছিলেন। দীক্ষাদানকালে তিনি দোহাগান করিতেন; বস্তুত ত্যাঙ্গুর-তালিকায় তাঁহার কয়েকটি দোহা ও চর্যাগীতির উল্লেখও আছে। অপভ্রংশ ভাষায় রচিত সংস্কৃত টীকাযুক্ত তদ্রচিত একটি দোহাসংগ্রহ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশও করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, প্রাচীন বাংলায় রচিত চারিটি গানও চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে; এই সব গানের ভণিতায় তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে সরহপাদ। সুম্‌পা-বর্ণিত চন্দনপাল ও রত্নপাল পাল-বংশেরই কেহ হইয়া থাকিবেন, যদিও ইহাদের ঐতিহাসিকত্ব কোনো স্বতন্ত্র সাক্ষ্যে সমর্থিত নয়। সরোরুহবজ্র-পদ্মবজ্র অষ্টম শতকের লোক, কিন্তু সরহ-রাহুলভদ্র বোধ হয় একাদশ শতকের আগেকার লোক নহেন।

সরহপাদ

তারনাথের মতে সরোরুহবজ্রের সমসাময়িক ছিলেন কুক্কুরিপাদ ও কম্বলপাদ বা কম্বলাম্বরপাদ। কুক্কুরিপাদ বাংলার এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, পরে বৌদ্ধ তন্ত্রধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ডাকিনীদের দেশ হইতে মন্ত্রযান ও অন্যান্য তন্ত্র (মহামায়াতন্ত্র ?) উদ্ধার করেন। চুরাশী সিদ্ধার তালিকায় কুক্কুরিপাদের উল্লেখ আছে। তিনিই বোধ হয় তন্ত্র সাধনায় মহামায়া-সাধনের সূচনা করেন। ত্যাঙ্গুর-তালিকায় দেখিতেছি, তিনি অন্তত ছ'খানা তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে কয়েকটি মহামায়া-সাধন সম্পর্কিত। ত্যাঙ্গুরে এক জায়গায় তাঁহাকে গুরুরাজ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কুকুর-পা বা কুকুর-রাজ এবং কুক্কুরিপাদ যদি এক এবং অভিন্ন হন, এবং না হইবার কোনো কারণ নাই, তাহা হইলে ত্যাঙ্গুর-তালিকায় বজ্রযান সাধন সম্পর্কিত আরও আটটি তন্ত্রগ্রন্থ (বজ্রসত্ব, হেরুক, বৈরোচন প্রভৃতি দেবতা সম্বন্ধীয়) তাঁহারই রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। চর্যাগীতি বা চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-গ্রন্থের অন্তত দুইটি প্রাচীন বাংলা গীতি কুক্কুরিপাদের রচনা, ভণিতায় তাহা সুস্পষ্ট বলা আছে।

কুক্কুরিপাদ
কম্বলপাদ

কম্বলপাদ বা কম্বলাম্বরপাদ প্রাচীন বাংলা ভাষায় কম্বল-গীতিকা নামে একটি দোহা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; এবং চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-গ্রন্থের একটি গীতির তিনি ছিলেন লেখক।

উভয়ই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বৌদ্ধ গান ও দোহায় স্থান পাইয়াছে। তিব্বতী ঐতিহ্যানুসারে তিনি হেরুক সাধন সম্বন্ধে অন্তত ছয়খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ইঁহাদের সমসাময়িক (অষ্টম শতকের শেষ, নবম শতকের প্রথমার্ধ) এবং চুরাশী সিদ্ধার অন্যতম ছিলেন শবরীপাদ বা শবরপাদ। সুম্পা বলিতেছেন, তিনি বঙ্গাল দেশের পর্বতবাসী এক ব্যাধ বা শবর ছিলেন। রসায়নাচার্য নাগার্জুন যখন বাংলা দেশে ছিলেন (ইনি প্রথম খ্রীষ্ট শতকীয় শূন্যবাদী নাগার্জুন নহেন) তখন তিনিই শবরপাদ এবং তাঁহার দুই স্ত্রীকে তন্ত্রধর্মে দীক্ষাদান করেন। ত্যাঙ্গুর-তালিকানুযায়ী তিনি প্রায় দশখানা বজ্রযানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-গ্রন্থে শবরীপাদের রচিত দুইখানা বাংলা গান আছে। শবর-শবরীপাদ এবং শবরীশ্বর যদি এক এবং অভিন্ন হন, তাহা হইলে বজ্রযোগিনী সাধন সম্বন্ধেও তিনি আরও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উড্ডীয়ান বা ওড্ডানের রাজা ইন্দ্রভূতি ও তাঁহার ভগিনী বা কন্যা লক্ষ্মীঙ্করা, ইঁহারা দুইজনেই বাংলা দেশে বজ্রযোগিনী-সাধন প্রবর্তন করেন। মহাচার্য ইন্দ্রভূতি সিদ্ধ-বজ্রযোগিনী-সাধন, জ্ঞানসিদ্ধি এবং অন্যান্য আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীঙ্করাও কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িত্রী ছিলেন; তাহার মধ্যে অদ্বয়সিদ্ধি মূল সংস্কৃতে পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক, খুব সম্ভব পূর্বোক্ত শবর বা শবরীপাদই বৌদ্ধ শবর সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য। এই শবর সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান আচার্য ছিলেন অদ্বয়বজ্র; তাঁহার কথা যথাস্থানে বলিতেছি।

শবরীপাদ

সৌর রত্নদ্বীপের (নেপাল অন্তর্গত রত্নদ্বীপ) অন্যতম অধিবাসী এবং পূর্বোক্ত লক্ষ্মীঙ্করার শিষ্য লীলাবজ্র আচার্য-অবধূত-মহাপণ্ডিত কুমারচন্দ্র-রচিত কৃষ্ণযমারীতন্ত্রের টীকা রত্নাবলীর একটি তিব্বতী অনুবাদ করিয়াছিলেন। কুমারচন্দ্র রত্নাবলী টীকাটি রচনা করিয়াছিলেন বিক্রমপুরী-বিহারে বসিয়া; সেই জন্যই অনুমান হয়, কুমারচন্দ্র অষ্টম-নবম শতকীয় জনৈক বাঙালী বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন। তিনি তিনটি তান্ত্রিক পঞ্জিকা বা টীকাও রচনা করিয়াছিলেন।

কুমারচন্দ্র

ধর্মপালের সমসাময়িক বৃদ্ধকায়স্থ টঙ্কদাস বা ডঙ্কদাস পাণ্ডুভূমি-বিহারের অধিবাসী ছিলেন, এবং সেইখানে বসিয়া সুবিশদসম্পুট নামে হেবজ্রতন্ত্রের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

টঙ্কদাস

রসায়নাচার্য নাগার্জুন যখন পুণ্ড্রবর্ধনে রসায়ন ও ধাতু গবেষণায় নিরত তখন তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন জনৈক নাগবোধি। সুম্পা বলিতেছেন, এই নাগবোধির বাড়ী ছিল বরেন্দ্রান্তর্গত শিবসের গ্রামে; যমারিসিদ্ধচক্রসাধন নামে তিনি অন্তত একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন উড্ডীয়ান-বিনির্গত বলিয়া। ত্যাঙ্গুর-তালিকামতে তিনি তেরো খানা তান্ত্রিক গ্রন্থের রচয়িতা।

নাগবোধি

এই পর্যন্ত যে-সব বৌদ্ধ আচার্যদের কথা বলা হইল তাঁহারা সকলেই অনুমানিক অষ্টম-নবম শতকের লোক। ইহার পর বেশ কিছুদিন উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ আচার্য-পণ্ডিতদের সাক্ষাৎ পাইতেছিনা। ইহার কারণ বলা কঠিন; তাহা ছাড়া ইহাদের দেশ সম্বন্ধে যেমন কাল সম্বন্ধেও তেমনই আমাদের তথ্য নিঃসন্দিগ্ধও নয়। বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন ঐতিহ্যে কাল-সংবাদ, আচার্য-পরম্পরা-সংবাদ বিভিন্ন প্রকারের; কাজেই নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবারও উপায় নাই। কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, নবম শতকের মাঝামাঝি হইতে দশম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোনো ঐতিহ্যেই কোনো আচার্যকে স্থাপিত করা সম্ভব হইতেছে না। এই একশত বৎসর বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার স্রোতে কি ভাঁটা পড়িয়াছিল? যাহাই হউক, দশম শতকের তৃতীয় পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত আবার সেই স্রোত সবেগে বহমান, উপস্থিত সাক্ষ্যে এ-কথা স্বীকার করিতেই হয়। দ্বাদশ শতকে সেন-বর্মণ পর্বে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে রাজা ও রাষ্ট্রের পোষকতা আর ছিল না, এবং হয়তো বৌদ্ধ ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় কিছুটা ভাঁটাও পড়িয়াছিল, কিন্তু নিজ নিজ নিভৃত বিহারকক্ষে অথবা আপনাপন গুহ্য সম্প্রদায়ের গুহ্যতর আশ্রয়গুলিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের নিরলস সাধনা অব্যাহতই ছিল। অগণিত সিদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং তাঁহাদের রচিত গান, দোহা এবং সাধনই তাহার প্রমাণ।

আগেই বলিয়াছি বজ্রযানী-মন্ত্রযানী তান্ত্রিক আচার্যদের সঙ্গে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ও নাথগুরুদের গভীরতর ধ্যান ও আদর্শগত পার্থক্য যাহাই থাকুক না কেন, অন্তত সূচনায় এই সব সমসাময়িক ধর্মসম্প্রদায় ও আচার্যদের জীবনাচরণে বা জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় প্রভেদ বিশেষ ছিলনা। বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযানের বাহিরে অথচ কিছুটা ইহাদেরই ভিতর হইতে উদ্ভূত এবং ইহাদের সঙ্গে গভীরভাবে সংপৃক্ত নাথধর্ম, কৌলধর্ম, সহজধর্ম, অবধূতধর্ম প্রভৃতির আচার্যরা প্রায় সকলেই একে অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায় কর্তৃক গুরু ও আচার্য বলিয়া স্বীকৃত ও পূজিত হইয়াছেন। শেষোক্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়গুলির প্রধান প্রধান আচার্য ছিলেন চুরাশী জন, এবং ইহারা তিব্বতী ঐতিহ্যে চুরাশী সিদ্ধা বলিয়া খ্যাত। ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার বজ্রযান সাধনা ও বজ্রযানী দেবদেবী সম্বন্ধে গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন, মহাযানী ন্যায়ের পুঁথিও লিখিয়াছেন। কাজেই ইহাদের একান্ত করিয়া পৃথকভাবে বিবেচনা করিবার যুক্তিসঙ্গত কিছু কারণ নাই। বস্তুত, এই কয় শত বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং বিভিন্ন লোকায়ত ধর্মের নানা মতামত, নানা ধ্যান, নানা প্রক্রিয়ার একটা সুবৃহৎ এবং সুগভীর সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণক্রিয়া সমানেই চলিতেছিল। এই সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণই পাল-চন্দ্রপর্বের বাংলার ইতিহাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেন-বর্মণ পর্বের উচ্চস্তরের সংস্কৃত স্মৃতি-দর্শন-কাব্য প্রভৃতি সাধনার কথা বাদ দিলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যত্র এই সমন্বয়-স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়া খুব বাধা পায় নাই। সেই কারণে,

এই সব মহাযানী-বজ্রযানী বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে যাঁহারা বাঙালী তাঁহাদের কথা এক সঙ্গেই বলিতেছি, কালপরম্পরা যতটা জানা যায় ততটা বজায় রাখিয়া।

প্রসঙ্গত, এ-কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, মহাযান-বজ্রযান প্রভৃতি মতাবলম্বী তান্ত্রিক আচার্যরা যে-সব রচনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশই হয় দর্শন ও যোগসাধন সম্বন্ধীয় অথবা বিভিন্ন দেবদেবীর সাধনা, স্তব ও পূজা বিষয়ক শ্লোকাবলী। শেষোক্ত পর্যায়ের রচনায় যাঁহাদের কবিকল্পনা ও কবিপ্রতিভার কিছু কিছু পরিচয় ধরা পড়িয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে বাঙালী ছিলেন সে-সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম। সংস্কৃত কাব্যের রীতি-প্রকৃতিতেও ইহারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন, মনে হয়। ধর্মাকর-মতি, শবরপাদ, কৃষ্ণপাদ, রত্নাকর, শুভাকর, কুলদত্ত, অদ্বয়বজ্র, ললিত-গুপ্ত, কুমুদাকরমতি, পদ্মাকর, অভয়াকর-গুপ্ত, গুণাকর-গুপ্ত, করুণাচল, কোকদত্ত, অনুপম-রক্ষিত, চিন্তামণি-দত্ত, সুমতি-ভদ্র, মঙ্গল-সেন, অজিত-মিত্র প্রভৃতি যাঁহাদের নাম সাধনমালা-গ্রন্থে পাইতেছি, তাঁহাদের তো বাঙালী বলিয়াই মনে হইতেছে। ইহাদের রচনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং কিছুক্ষণ আগে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ তন্ত্রধর্মে যে স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছি তাহারও দৃষ্টান্ত স্বরূপ জনৈক অজ্ঞাতনামা কবির একটি তারাস্তুতি উদ্ধার করিতেছি। এই ভক্তিরসস্নিগ্ধ স্তবটিতে ব্রাহ্মণ্য দুর্গা ও বেদমাতা সরস্বতী এবং বৌদ্ধ তারা ইতিমধ্যেই কবিকল্পনায় এক এবং অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন।

> দেবী (?) ত্বমেব গিরিজা কুশলা ত্বমেব
> ত্বমসি [ত্বং হি চ] বেদমাতা।
> ব্যাপ্তং ত্বয়া ত্রিভুবনে জগতৈক রূপা (?)
> তুভ্যং নমোঽস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ॥
> যানত্রয়েষু দশ পারমিতেতি গীতা
> বিস্তীর্ণ যানিকজনা জনভূতেতি।
> প্রজ্ঞাপ্রসঙ্গচটুলামৃতপূর্ণধাত্রী
> তুভ্যং নমোঽস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ।
> আনন্দানন্দবিরসা সহজ স্বভাবা
> চক্রত্রয়াদ পরিবর্তিত বিশ্বমাতা।
> বিদ্যুৎপ্রভাহৃদয়বর্জিতজ্ঞানগম্যা
> তুভ্যং নমোঽস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ।

তারনাথ ও সুম্‌পার সাক্ষ্যে মনে হয়, জেতারি নামেও দুইজন বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন। জ্যেষ্ঠ জেতারির বাড়ী ছিল বরেন্দ্রভূমে; তাঁহার পিতা গর্ভপাদ জনৈক সামন্ত সনাতনের সভাসদ ছিলেন। এই জেতারি বিক্রমশীল বিহারের অন্যতম আচার্য এবং শ্রীজ্ঞান-দীপঙ্কর বা অতীশের অন্যতম গুরু ছিলেন। সেই জন্য

দশম—দ্বাদশ শতক

অনুমান হয়, তিনি দশ শতকের শেষার্ধের লোক ছিলেন। হেতুতত্ত্বোপদেশ, ধর্মাধর্মবিনিশ্চয় এবং বালাবতারতর্ক নামে বৌদ্ধ ন্যায়ের এই তিনটি গ্রন্থ বোধ হয় তাঁহারই রচনা। ইহা ছাড়া তিনি আরও দুইখানা সূত্রগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে সুগতমতবিভঙ্গকারিকা অন্যতম; এই গ্রন্থে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন বাঙালী বলিয়া। কনিষ্ঠ জেতারিও ছিলেন বাঙালী, এবং বোধিভাগ্য লাবণ্যবজ্রের গুরু। তিনি এগারো খানা বজ্রযানী-সাধনের রচয়িতা। তাঁহার কাল সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা কঠিন।

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ জেতারি

বাঙালী বৌদ্ধ মহাচার্যদের মধ্যে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অন্য নাম অতীশ) শ্রেষ্ঠতম, এবং দীপঙ্কর-চরিতকথা বাংলাদেশে সুপরিচিত। কাজেই তাঁহার কথা বিস্তৃত করিয়া বলিবার প্রয়োজন কিছু নাই। ত্যাঙ্গুরের তিব্বতী ঐতিহ্যে একাধিক দীপঙ্করস্মৃতি বিধৃত—দীপঙ্কর, দীপঙ্কর-ভদ্র, দীপঙ্কর-রক্ষিত, দীপঙ্কর-চন্দ্র, দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান। নিঃসন্দেহে ইঁহারা সকলে একই ব্যক্তি হইতে পারেন না; তবে ইঁহাদের মধ্যে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান যে বাঙালী ছিলেন এ-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। তাঁহার জন্মভূমি বঙ্গাল-দেশের বিক্রমণিপুরে; আনুমানিক ৯৮০ খ্রীষ্ট বৎসরে গৌড়রাজ-পরিবারে তাঁহার জন্ম; পিতার নাম কল্যাণশ্রী, মাতা প্রভাবতী; তাঁহার নিজের বাল্য নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। যৌবনে তিনি জেতারির শিষ্য ছিলেন; কিছুদিন তিনি পশ্চিম-ভারতের কৃষ্ণগিরি বা কান্হেরী-বিহারে থাকিয়া রাহুল-গুপ্তের নিকট বৌদ্ধ ধ্যানে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন; সেইখানেই তাঁহার নামকরণ হয় গুহ্যজ্ঞানবজ্র। উনিশ বৎসর বয়সে ওদন্তপুরী-বিহারে মহাসংঘিক আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন, এবং সেই সময় তাঁহার নামকরণ হয় দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান। বারো বৎসর পর তিনি ভিক্ষুব্রতী হ'ন এবং আচার্য ধর্মরক্ষিতের নিকট বোধিসত্ত্বব্রতে দীক্ষিত হ'ন। তারপর তিনি আরও বারো বৎসর যাপন করেন সুবর্ণদ্বীপে আচার্য চন্দ্রকীর্তির নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্রপাঠে। সেখান হইতে তাম্রদ্বীপ বা সিংহলের পথে মগধে ফিরিয়া আসেন; এবং কিছুদিন পরই মহীপাল কর্তৃক আহূত হন বিক্রমশীল-মহাবিহারের মহাচার্যপদে। এই বিহারে বাসকালেই তিব্বতের বৌদ্ধ রাজা লাহ্-লামা-যে-শেস্ দূত পাঠাইয়া দীপঙ্করকে সাদর আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন তিব্বত যাইবার জন্য। নির্লোভ নিরহঙ্কার দীপঙ্কর সবিনয়ে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার কিছুদিন পর প্রতিবেশী এক রাজকারাগারে তিব্বত-রাজের প্রাণবিয়োগ ঘটে, কিন্তু তাহার আগে তিনি তাঁহার অবস্থা ও প্রাণের একান্ত অভিপ্রায় জানাইয়া দীপঙ্করের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া যান। লাহ্-লামা যে-শেস্-'ওডের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চান্-চুবের রাজত্বকালে তিব্বতী আচার্য বিনয়ধর (ট্সুল খ্রিম-গ্যাল্বা) সেই পত্র লইয়া দীপঙ্করের উদ্দেশ্যে বিক্রমশীল-বিহারে আসিয়া উপস্থিত হন; এবং কিছুকাল সেখানে যাপনের পর দীপঙ্করের

দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান বা অতীশ

সঙ্গে পরিচয় কিছু ঘনিষ্ট হইলে নিজের মনোবাসনা এবং লাহ্-লামার পত্র তাঁহার গোচর করেন। অবশেষে দীপঙ্কর তিব্বত যাইতে স্বীকৃত হ'ন, কিন্তু তাঁহার হাতে যে সব কাজ ছিল তাহা সারিবার পর। এই সময় আচার্য রত্নাকর ছিলেন বিক্রমশীল-বিহারের অধিনায়ক। বিহারের ভিক্ষুসংঘ তখন নানাপ্রকার নৈতিক ও মানসিক শৈথিল্যে ভারগ্রস্ত, দীপঙ্কর ছাড়া ভিক্ষুদের নৈতিক শাসন অব্যাহত রাখার শক্তি আর কাহারও নাই। মগধ-জনপদের নানা বিহারে-সংঘে দীপঙ্করের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব অপরিসীম। এ-সব বিবেচনা করিয়া রত্নাকর দীপঙ্করকে ছাড়িতে কিছুতেই রাজি হইলেন না। কিন্তু পরে যখন ক্রমশ জানিলেন, দীপঙ্কর বিনয়ধরকে কথা দিয়াছেন এবং তিনি নিজেও যাইতে ইচ্ছুক তখন অনুমতি দেওয়া ছাড়া আর উপায় রহিল না। কিন্তু এই সর্তে যে, তিন বৎসরের ভিতর দীপঙ্কর বিক্রমশীল-বিহারে ফিরিয়া আসিবেন। এই উপলক্ষে তিনি বিনয়ধরের নিকট যে-উক্তি করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য : "অতীশ না থাকিলে ভারতবর্ষ অন্ধকার। বহু বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানের চাবী তাঁহারই হাতে; তাঁহার অনুপস্থিতিতে এই সব প্রতিষ্ঠান শূন্য হইয়া যাইবে। চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, ভারতবর্ষের দুর্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। অসংখ্য তুরুষ্ক সৈন্য ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতেছে; আমি অত্যন্ত চিন্তিত বোধ করিতেছি। তবু, আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি অতীশ ও তোমাদের সঙ্গীদের লইয়া তোমার দেশে ফিরিয়া যাও; সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য অতীশের সেবা ও কর্ম নিয়োজিত হউক।" বিনয়ধর, তিব্বতী পণ্ডিত গ্যা-ট্সন্, পণ্ডিত ভূমিগর্ভ এবং অপরান্তরাজ মহারাজ ভূমিসংঘকে লইয়া দীপঙ্কর তিব্বত যাত্রা করিলেন নেপালের ও হিমালয়ের সুদুর্গম পথে। পথে দুই দুইবার তাঁহারা দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন; গ্যা-ট্সন্ মারা গেলেন; নেপালরাজ অনন্তকীর্তির সঙ্গে দীপঙ্করের সাক্ষাৎকার ঘটিল, এবং অনন্তকীর্তির পুত্র পদ্মপ্রভ দীপঙ্করের নিকট বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিব্বতের পথে তাঁহার সঙ্গী হইলেন। এই সময় বোধ হয়, নেপাল হইতেই তিনি রাজা নয়পালের নিকট একটি লিপি পাঠান। অবশেষে তিব্বতে পৌছিয়া দীপঙ্কর রাজসমারোহে অভ্যর্থিত হইলেন এবং তিব্বতের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইলেন। থো-লিং বিহার হইল তাঁহার কর্মকেন্দ্র। দীপঙ্কর প্রায় তেরো বৎসর কাল তিব্বতে বাস করিয়া ৭১ বৎসর বয়সে আনুমানিক ১০৫৩ খ্রীষ্ট বৎসরে সেইখানেই পরলোক গমন করেন।

সুম্‌পা-রচিত পাগ-সাম-জোন্-জাং-গ্রন্থের মতে দীপঙ্কর বিক্রমশীল ও ওদন্তপুরী উভয় বিহারেরই মহাচার্য ছিলেন; তাঁহার অন্য নাম ছিল জোবো বা প্রভু। বোধ হয় সোমপুরী-বিহারের সঙ্গেও তাঁহার সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠ, এবং সেখানে বসিয়াই তিনি ভাববিবেকের মধ্যমক-রত্ন-প্রদীপ-গ্রন্থের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। ত্যাঞ্জুর-ঐতিহ্যমতে তিনি প্রায় ১৭৫ খানা গ্রন্থ মৌলিক রচনা অথবা অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহাদের অধিকাংশই বজ্রযানী সাধন, কিন্তু কিছু কিছু মহাযানী সূত্রগ্রন্থও ত্যাঞ্জুর-তালিকায় বিদ্যমান।

চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে, মনীষায় ও অধ্যাত্ম-গরিমায় দীপঙ্কর সমসাময়িক বাংলার ও ভারতবর্ষের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। পূর্ব-ভারত ও তিব্বতের মধ্যে যাঁহারা মিলনসেতু রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দীপঙ্করের নাম সর্বাগ্রে এবং সকলের পুরোভাগে স্মর্তব্য। সমসাময়িক অবস্থার দিকে তাকাইয়া রত্নাকর বলিয়াছিলেন, 'দীপঙ্কর-বিহীন ভারতবর্ষ অন্ধকার'; এই উক্তির মধ্যে অত্যুক্তি কিছু নাই; সেই ঘনায়মান মেঘান্ধকারের মধ্যে দীপঙ্করই একমাত্র আলোকরেখা।

জ্ঞানশ্রী-মিত্র

বিক্রমশীল-বিহারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাবান আচার্য ছিলেন জ্ঞানশ্রী-মিত্র; দীপঙ্করের তিব্বত-যাত্রার কিছু আগে বা পরে তিনি এই বিহারে আসিয়া অধিষ্ঠিত হ'ন। তাঁহার বাড়ী ছিল গৌড়ে; গোড়ায় তিনি ছিলেন হীনযানী বৌদ্ধ, পরে মহাযানে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার বৌদ্ধ ন্যায় সম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ কার্যকারণ-ভাবসিদ্ধি চতুর্দশ শতকে আচার্য মাধব-রচিত সর্বদর্শনসংগ্রহে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অভয়াকর-গুপ্ত

অভয়াকর-গুপ্ত নামে একজন বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন রামপালের সমসাময়িক, বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া) ও নালন্দায় তিনি ছিলেন পণ্ডিত, এবং বিক্রমশীল-বিহারের অন্যতম আচার্য। তাঁহার জন্ম হয় ঝারিখণ্ডে, বঙ্গল দেশের এক ক্ষত্রিয়-পরিবারে। তারনাথের মতে অভয়াকর তীর্থিক সম্প্রদায়ের তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, পরে বাংলার বৌদ্ধ তন্ত্রেও পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ত্যাঙ্গুর-ঐতিহ্যমতে তিনি প্রায় বিশ খানা বজ্রযানী গ্রন্থের রচয়িতা, এবং ইহাদের অন্তত চারিখানার মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বিদ্যমান। শ্রীসম্পুটতন্ত্ররাজ-গ্রন্থের তদ্রচিত একটি টীকায় এবং বজ্রযানাপত্তিমঞ্জরী নামে তাঁহার একটি গ্রন্থে তাঁহাকে মগধের লোক বলিয়া পরিচয় দেওয়া আছে।

দিবাকর-চন্দ্র

দিবাকর-চন্দ্র নামে আর একজন আচার্য ছিলেন নয়পালের সমসাময়িক। ত্যাঙ্গুর ঐতিহ্যমতে তিনি হেরুক-সাধন নামে একটি গ্রন্থ এবং আরো দুইটি অনুবাদ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সুম্‌পা বলিতেছেন, দিবাকর-দেবাকরচন্দ্র মৈত্রী-পা'র শিষ্য ছিলেন; দীপঙ্কর তাঁহাকে বিক্রমশীল-বিহার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এক পণ্ডিত শ্রীদিবাকরচন্দ্র পাকবিধি নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ১১০১ খ্রীষ্ট বৎসরে; তিব্বতী ঐতিহ্যে দেবাকর ও দেবাকর-চন্দ্র নামে আরও দুইজন পণ্ডিত গ্রন্থকারের সাক্ষাৎ মেলে। ইহারা সকলেই বোধ হয় এক এবং অভিন্ন।

পূর্বোক্ত জেতারির সমসাময়িক এবং দীপঙ্কর-অতীশের অন্যতম শিক্ষাগুরু রাজাচার্য মহাগুরু রত্নাকরশান্তি অথবা শান্তিপাদ বাঙালী ছিলেন কিনা, নিঃসংশয়ে বলা কঠিন।

তবে মহীপাল-নয়পালেরই সমসাময়িক কুমারবজ্র নিশ্চয়ই ছিলেন বাঙালী। হেরুক-সাধন নামে একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন, এবং দারিকপাদের চক্রসম্বরসাধন-তত্ত্বসংগ্রহ-গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

রামপাল-প্রতিষ্ঠিত জগদ্দল-বিহারের দুইটি স্বনামধন্য পণ্ডিত হইতেছেন দানশীল ও বিভূতিচন্দ্র। বিভূতিচন্দ্র ছিলেন রাজপুত্র; ত্যাঙুর ঐতিহ্যমতে তিনি ছিলেন পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত, আচার্য, উপাধ্যায়; তাঁহার কর্মভূমি ছিল পূর্ব-ভারতের (উত্তর-বঙ্গের) জগদ্দল-বিহার। তিনি একাধারে ছিলেন গ্রন্থকার, টীকাকার, অনুবাদক ও সংশোধক। বিভূতিচন্দ্র কিছুকাল নেপালে ও তিব্বতে বাস করিয়াছিলেন, এবং তিব্বতীতে অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি কয়েক খানি মূল সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, অনেক গ্রন্থের টীকা রচনাও করিয়াছিলেন। লুই-পা'র দুইটি গ্রন্থের এবং অভয়াকরের দুই বা ততোধিক গ্রন্থের অনুবাদ তাঁহারই রচনা।

রত্নাকরশান্তি, কুমারবজ্র
দানশীল, বিভূতিচন্দ্র
বোধিভদ্র, প্রজ্ঞাবর্মা

অভয়াকর-গুপ্ত ও শুভাকর-গুপ্তের খান কয়েক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন আচার্য দানশীল। তাঁহার বাড়ী ছিল ভগল বা বঙ্গল দেশে এবং জগদ্দল-বিহারের তিনি ছিলেন অন্যতম আচার্য। প্রায় ষাটখানা তন্ত্র-গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ তাঁহার রচনা; নিজে তিনি পুস্তকপাঠোপায় নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং নিজেই তিনি তাহার তিব্বতী রূপান্তরও করিয়াছিলেন। শুভাকর ছিলেন অভয়াকরের সমসাময়িক মগধের একজন বৌদ্ধ আচার্য; তিনিও কিছুদিন জগদ্দল-বিহারের অধিবাসী ছিলেন। অভয়াকরশিষ্য এবং রামপালের সমসাময়িক, মগধবাসী শুভাকর-গুপ্ত এবং জগদ্দলের শুভাকরকে এক এবং অভিন্ন মনে না করিবার কোনো কারণ নাই।

প্রজ্ঞাবর্মা নামে একজন বাঙালী কাপট্য-বিহারের অন্যতম আচার্য ছিলেন। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের উপর দুইটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন, ধর্মকীর্তির হেতুবিন্দুপ্রকরণ নামক ন্যায় গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন, এবং উদানবগ্‌গের উপর ধর্মত্রাতের অসমাপ্ত টীকাখানা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। প্রজ্ঞাবর্মার গুরু বোধিভদ্র সোমপুরী-বিহারের অধিবাসী ছিলেন। এই বোধিভদ্র এবং তারনাথ-কথিত বিক্রমশীল-বিহারের আচার্য বোধিভদ্র বোধ হয় এক এবং অভিন্ন। বোধিভদ্র প্রায় আট দশখানা তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু ছিলেন মহামতি।

জগদ্দল-বিহারের আর একজন আচার্য ছিলেন মোক্ষাকর-গুপ্ত। তিনি তর্কভাষা নামে বৌদ্ধ ন্যায়ের উপর একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অপভ্রংশ দোহাকোষের উপর টীকাও বোধ হয় তাঁহারই রচনা।

মোক্ষাকর-গুপ্ত
পুণ্ডরীক

পুণ্ডরীক নামে একজন রাজা আর্যমঞ্জুনামসংগীতি-টীকার উপর বিমলপ্রভা নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। বর্মণ বংশীয় রাজা হরিবর্মাদেবের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে লিখিত এই টীকার একটি পুঁথি নেপালে পাওয়া গিয়াছে। এই পুণ্ডরীক বোধ হয় বাঙালী ছিলেন, কারণ তাঁহার বাড়ী বলা হইয়াছে উড্ডীয়ানে। তাঁহার অন্য আর একটি নাম ছিল জ্ঞানবজ্র।

সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতম সেই লুই-পা বা লুইপাদ খুব সম্ভব রামপালের সমসাময়িক ছিলেন। তারনাথের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া আচার্য লেভি, শহীদুল্লা প্রভৃতিরা লুই-পাকে খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতকের লোক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু লুই-পা রচিত অভিসময়বিভঙ্গ-গ্রন্থের পুষ্পিকায় স্পষ্টতই বলা আছে যে, আচার্য দীপঙ্কর তাঁহাকে এই গ্রন্থ রচনায় বা তিব্বতী অনুবাদে সাহায্য করিয়াছিলেন। ত্যাঙ্গুর-তালিকায় তদ্রচিত কয়েকখানা বজ্রযান-গ্রন্থের উল্লেখ আছে, এবং তিব্বতী ঐতিহ্যমতে তিনিই আদিসিদ্ধ। চর্যাগীতি-গ্রন্থে তাঁহার প্রাচীন বাংলায় রচিত দুইটি দোহা আছে, এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন, লুইপাদ-গীতিকা নামে তাঁহার একখানা পৃথক গ্রন্থই ছিল।

লুই-পা মৎস্যেন্দ্রনাথ

অনেকের মতে তিব্বতী ঐতিহ্যের আদিসিদ্ধ লুই-পাদ এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের আদিসিদ্ধ মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ এক এবং অভিন্ন। এরূপ মনে করিবার কারণও আছে। প্রথমত তিব্বতী ভাষায় লুই-পা'র রূপান্তর মৎস্যোদর বা মৎস্যান্ত্রাদ। দ্বিতীয়ত, তিব্বতী ঐতিহ্যে লুই-পা বাংলা দেশের ধীবর শ্রেণীর লোক; ভারতীয় ঐতিহ্যেও মীননাথ-মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রাচ্য সমুদ্রতীরের চন্দ্রদ্বীপের ধীবরশ্রেণীসম্ভূত। তৃতীয়ত, যোগিনী কৌল-সম্প্রদায়ের যে কয়েকটি সংস্কৃত পুঁথি আমাদের জানা আছে, যেমন কৌলজ্ঞাননির্ণয়, এবং নেপালে প্রাপ্ত আরো ৩।৪ খানা পুঁথি, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই মীননাথ-মৎস্যেন্দ্রনাথকে সেই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; অন্যদিকে তারনাথ বলিতেছেন, লুইপাদই যোগিনী ধর্মমতের স্রষ্টা। বস্তুত, সমস্ত পূর্ব ও উত্তর-বঙ্গ জুড়িয়া এবং কামরূপে হঠযোগ, যোগিনী কৌলধর্ম এবং নাথধর্মকে কেন্দ্র করিয়া যে-সব সম্প্রদায় বহু শতাব্দী ধরিয়া আপনাপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহারা প্রত্যেকেই লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্রনাথকে এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করে এবং নিজ নিজ আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করে। লুইপাদ-মৎস্যেন্দ্রনাথের ধর্মমতই সহজসিদ্ধি নামে খ্যাত। এই সহজসিদ্ধির সঙ্গে একদিকে যেমন বজ্রযান-মন্ত্রযানের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, তেমনই অন্যদিকে কৌলধর্ম, নাথধর্ম প্রভৃতি এই সহজ-সিদ্ধি হইতেই উদ্ভূত। সেইজন্য দেখা যাইবে, এই সব সিদ্ধাচার্যদের অনেকেই বজ্রযানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ নিবিড়। বস্তুত, যোগিনী কৌলের কুল বৌদ্ধ তন্ত্রেরই পঞ্চকুল এবং এই পঞ্চকুল পঞ্চধ্যানী বুদ্ধেরই প্রতীক; আর সহজ সিদ্ধির সহজ এবং বজ্রযানের বজ্র প্রায় একই বস্তুর দুই ভিন্ন নাম মাত্র। তিব্বতী ঐতিহ্যান্তরে কিন্তু মৎস্যান্ত্রাদকে মৎস্যেন্দ্রনাথ হইতে পৃথক বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং মৎস্যেন্দ্র নাথকে মীননাথের সন্তান বা বংশধর বলা হইয়াছে।

মীননাথ-মৎস্যেন্দ্রনাথের অন্যতম পূর্বপুরুষ ছিলেন মীনপাদ; তিনি বোধিচিত্তের উপর একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সহজসিদ্ধি মত নেপালে এবং তিব্বতে সুপ্রচলিত হইয়াছিল এবং উভয় দেশেই তিনি অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পরিগণিত

হইয়াছিলেন। বাংলাদেশে তিনি শিবের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মৎস্যেন্দ্রনাথের নামে প্রচলিত কয়েকখানা সংস্কৃত পুঁথি নেপালে পাওয়া গিয়াছে।

মীননাথ-মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন গোরক্ষনাথ। বাংলাদেশে গোরক্ষনাথ-কথা সুপরিজ্ঞাত। গোরক্ষনাথের রচিত কোনও পুঁথি এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই ; তবে ত্যাঙ্গুর তালিকায় এক গোরক্ষের নামে একটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। হয়তো এই গোরক্ষ এবং গোরক্ষনাথ একই ব্যক্তি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অবশ্য বলিয়াছেন, জ্ঞানকারিকা নামে একটি গ্রন্থ গোরক্ষনাথের নামের সঙ্গে জড়িত। গোরক্ষনাথ-কাহিনী নানা রূপে রূপান্তরিত হইয়া উত্তর-ভারতের সর্বত্র—নেপালে, তিব্বতে, মধ্যদেশে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, পঞ্জাবে—ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্জাবের যোগীরা, বাংলাদেশের নাথযোগীরা, নাথপন্থীরা সকলেই গোরক্ষনাথকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। পরবর্তী কালের গোরক্ষসংহিতা, গোরক্ষসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থে গোরক্ষনাথের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সম্প্রদায়ের মতামত বিধৃত হইয়া আছে। বাংলাদেশে প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী গোরক্ষনাথ রাজা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন।

গোরক্ষনাথ

গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন জালন্ধরীপাদ বা জালন্ধরপাদ। বাংলাদেশে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে গোপীচাঁদের গল্পের হাড়ি-পা এবং জালন্ধরীপাদকে অনেকে এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। তারনাথের মতে জালন্ধরীর শিষ্য ছিলেন কৃষ্ণাচার্য এবং তাঁহার সঙ্গে হাড়ি-পা'র একটা সম্বন্ধও ছিল। তারনাথ এবং সুম্‌পা দুই জনই বলিতেছেন, জালন্ধরীর যথার্থ নাম ছিল সিদ্ধ বালপাদ, কিন্তু নেপাল ও কাশ্মীরের মধ্যবর্তী জালন্ধর নামক স্থানে তিনি কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে জালন্ধরের আচার্য বলিয়াই জানিত। তিনি উড্ডান, নেপাল, অবন্তী এবং চাটিগ্রাম বা চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন ভ্রমণে ; গোপীচন্দ্রের পুত্র বিমলচন্দ্র তখন চট্টগ্রামের রাজা। ত্যাঙ্গুর-তালিকায় এক মহাপণ্ডিত, মহাচার্য জালন্ধর, আচার্য জালন্ধরী বা সিদ্ধাচার্য জালন্ধরী পাদের উল্লেখ আছে ; এই মহাচার্য জালন্ধর বা জালন্ধরীপাদ আর গোপীচাঁদগুরু জালন্ধরী পাদ বোধ হয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। পূর্বোক্ত জালন্ধরের নামে ত্যাঙ্গুর-তালিকায় চারিখানা বজ্রযান-গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

জালন্ধরীপাদ

জালন্ধরীপাদের অন্যতম শিষ্য ছিলেন বিরূ-পা বা বিরূপাদ। তারনাথ বলিতেছেন, এই বিরূ-পা ছিলেন সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম। সুম্‌পার মতে এই বিরূ-পার জন্ম হইয়াছিল ত্রিপুরের (ত্রিপুরা) পূর্বদিকে, এবং দেবপালের রাজত্বকালে। ত্যাঙ্গুর তালিকায় দেখিতেছি, আচার্য-মহাচার্য বিরূ-পা এবং মহাযোগী-যোগীশ্বর বিরূপ প্রায় দশখানা বজ্রযানী পুঁথি, এবং বিরূপ-পদ-চতুরশীতি এবং দোহাকোষ নামে দুইখানা পদ ও দোহাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। চর্যাগীতিতে বিরূপার একটি গীতি স্থান পাইয়াছে, এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বিরূপগীতিকা ও বিরূপবজ্রগীতিকা নামক দুইটি গীতি

বিরূ-পা

গ্রন্থেরও লেখক ছিলেন বিরূপা। বিরূপা মহাসিদ্ধ ডোম্বি-হেরুকের অন্যতম গুরু ছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যমতে ডোম্বি-হেরুক ছিলেন মগধের জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা।

সরহ বা সরহপাদের কথা আগেই সরোরুহবজ্র প্রসঙ্গে বলিয়াছি; এখানে পুনরুল্লেখের আর প্রয়োজন নাই।

তিলপ, তিল্লপ, তিল্লিপা, তিলিপা, তিল্লোপা, তৈলোপ, তোল্লপা, তেলোপা, তিলোপা তৈলিকপাদ বা তেলিযোগী নামে একজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য ছিলেন মহীপালের সমসাময়িক। তিব্বতী ঐতিহ্যে তিনি ছিলেন চুসাটিগাঁও বা চট্টগ্রামের এক ব্রাহ্মণ, পরে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রজ্ঞাবর্মা বা প্রজ্ঞাভদ্র নামে পরিচিত হ'ন। তিনি চারখানা বজ্রযানী গ্রন্থ, একখানা দোহাকোষ, এবং একখানা সহজগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যে আর এক সিদ্ধাচার্য তৈলিকপাদের কথা আছে যাঁহার বাড়ী ছিল ওড্ডানে। এই দুই সিদ্ধাচার্য তৈলিকপাদ এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে না করিবার কোনো কারণ নাই।

তিলো-পা

তৈলিকপাদের প্রধান শিষ্য ছিলেন নারো, নারোপা, নারোৎপা, নাড়োপা, নাড়, নাড়পাড়া প্রভৃতি নামে পরিচিত জনৈক সিদ্ধাচার্য। তাঁহার অন্য দুইটি নাম বা উপাধি ছিল জ্ঞানসিদ্ধি ও যশোভদ্র। নাড়োপা জাতে ছিলেন শুঁড়ি, তাঁহার বাসস্থান ছিল প্রাচ্য-ভারতে সালপুত্র নামক স্থানে, এবং মগধের পশ্চিমে ফুল্লহরি নামক স্থানে (বিহার?) তিনি তন্ত্রাভ্যাস করিতেন। এক তিব্বতী ঐতিহ্যে তিনি ছিলেন প্রাচ্য দেশের রাজা শাক্য শুভশান্তিবর্মার পুত্র; আর এক ঐতিহ্যমতে তিনি ছিলেন জনৈক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের পুত্র, পরে হ'ন এক তীর্থিক (ব্রাহ্মণ) পণ্ডিত, এবং সর্বশেষে যশোধর বা জ্ঞানসিদ্ধি নাম লইয়া বৌদ্ধ ধর্মে সিদ্ধি লাভ করেন। ত্যাঞ্জুরে তাঁহাকে মহাচার্য, মহাযোগী এবং শ্রীমহামুদ্রাচার্য উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। আচার্য জেতারির পশ্চাদগামী হিসাবে তিনি বিক্রমশীল-বিহারের উত্তরদ্বারী পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং বিদায় লইবার সময় আচার্য দীপঙ্করের উপর বিহারের দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া যান। বৌদ্ধ আগমে ছিল তাঁহার পরম পাণ্ডিত্য; হেরুক, হেবজ্র এবং অন্যান্য বজ্রযানী দেবদেবীর উপর তিনি প্রায় দশখানা সাধন গ্রন্থ, সেকোদ্দেশটীকা নামে কালচক্রযানী দীক্ষা সম্বন্ধে অন্তত একখানা গ্রন্থ, দু'খানি বজ্রগীতি, একটি নাড়-পণ্ডিতগীতিকা এবং বজ্রপদসারসংগ্রহ গ্রন্থের উপর একটি পঞ্জিকা বা টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

নাড়ো-পা

লুইপা-মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং গোরক্ষনাথের পরই যে সিদ্ধাচার্যের প্রসিদ্ধি তাঁহার নাম কৃষ্ণ বা কৃষ্ণপাদ বা কাহ্ন-পা বা কাহ্ন-পা। কাহ্ন-পা ছিলেন জালন্ধরীপাদের শিষ্য, এবং নাথপন্থী ও সহজপন্থীদের অন্যতম প্রধান আচার্য। তারনাথ বলিতেছেন, জালন্ধরীশিষ্য কৃষ্ণাচার্যের বাড়ী ছিল পাত্তনগর বা বিত্তানগর; তিব্বতী ঐতিহ্যান্তর মতে কাহ্ন-পা ছিলেন দেবপালের সমসাময়িক জনৈক কায়স্থ, বাসস্থান

কাহ্ন-পা

ছিল সোমপুরী-(বিহার)। সুম্‌পা বলিতেছেন, জালন্ধরশিষ্য কাহ্ন ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশজাত জনৈক তান্ত্রিক আচার্য। তারনাথ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ দুই কৃষ্ণাচার্যের কথা বলিতেছেন; তাঁহার মতে কনিষ্ঠ কৃষ্ণাচার্যই ছিলেন হেবজ্র, শম্বর এবং জামন্তক প্রভৃতি বজ্রযানী দেবতার সাধনগ্রন্থের লেখক এবং দোহা-রচয়িতা; বর্ণে ছিলেন তিনি ব্রাহ্মণ। অন্য আর এক তিব্বতী ঐতিহ্যমতে এক কৃষ্ণ ছিলেন সোমপুরী-বিহারের অধিবাসী। জালন্ধরশিষ্য কাহ্ন-কাহ্নপা-কৃষ্ণাচার্য এক এবং অভিন্ন, সন্দেহ নাই; তিনিই ছিলেন সোমপুরী বা সোমপুরী-বিহারের অধিবাসী, তান্ত্রিক ও বজ্রযানী সাধনগ্রন্থের লেখক এবং দোহা-রচয়িতা, এবং তারনাথ কথিত কনিষ্ঠ কৃষ্ণাচার্য। যাহা হউক, কাহ্ন-কাহ্নপা-কৃষ্ণাচার্য পঞ্চাশ খানারও উপর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; অধিকাংশই বজ্রযান সাধন-সম্পর্কিত। তাহা ছাড়া চর্যাগীতি-গ্রন্থে কাহ্ন-কৃষ্ণাচার্যপাদ-কৃষ্ণপাদের দশখানা গীতি আছে প্রাচীনতম বাংলা ভাষায়, এবং কৃষ্ণাচার্য-রচিত একখানা দোহাকোষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিতাচার্য শ্রীকৃষ্ণপাদ-বিরচিত, গোবিন্দপালের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে লিখিত হেবজ্রপঞ্জিকা নামে একখানা পুঁথি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

বাংলার সিদ্ধাচার্যদের তালিকা সুদীর্ঘ। সকলের কথা কথা বলিবার স্থান নাই; প্রয়োজনও নাই। কয়েকজনের কথা উল্লেখ করিতেছি মাত্র। লুই-পা ও নারো-পা'র এক শিষ্য ছিলেন দারিক বা দারিপাদ; তিব্বতী ঐতিহ্যমতে তাঁহার বাড়ী ছিল সালিপুত্র নামক স্থানে এবং তিনি (পালবংশীয়?) ইন্দ্রপালের সমসাময়িক। ত্যাঞ্জুর-তালিকায় তদ্রচিত বারোখানা বজ্রযানী-গ্রন্থের উল্লেখ আছে; চর্যাগীতিতে একটি গীতিও স্থান পাইয়াছে। লুই-পা'র এক বংশধর ছিলেন কিল-পা বা কিল-পাদ; দোহাচার্যগীতিকাদৃষ্টি নামে তিনি একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিরূ-পা'র এক বংশধর ছিলেন কর্মার বা কর্মরি বা কমরি; তিনি মগধান্তর্গত সালিপুত্রের এক কর্মকার ছিলেন, এবং অন্তত একখানা বজ্রযানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বীণাপাদ বা বীণা-পাও ছিলেন বিরূ-পার অন্যতম বংশধর। তিনি খুব ভাল বীণা বাজাইতেন; গহুরের (গৌড়ের?) এক ক্ষত্রিয় পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। বজ্রডাকিনী এবং গুহ্যসমাজের উপর তিনি অন্তত দু'খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; চর্যাগীতিতে তদ্রচিত একটি গীতি স্থানলাভ করিয়াছে। কৃষ্ণের বা কৃষ্ণপাদের এক বংশধর ছিলেন ধর্মপাদ বা গুণ্ডারীপাদ। ত্যাঞ্জুর-তালিকায় তদ্রচিত বারোখানা গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে এবং চর্যাগীতিতে আছে দু'টি গীত। কম্বলপাদের এক বংশধর ছিলেন কঙ্কণ; চর্যাগীতিতে তদ্রচিত একটি গীত আছে; তাহা ছাড়া চর্যাদোহাকোষগীতিকা নামে তিনি একখানা গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। গর্ভরী-পা বা গর্ভপাদ বা গাম্ভুরসিদ্ধ হেবজ্রের উপর একখানা গ্রন্থ এবং একখানা বজ্রযান টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

দারিক, কিল-পা, কর্মার, বীণা-পা, গুণ্ডারীপাদ, কঙ্কণ, গর্ভপাদ

বজ্রযানী-কালচক্রযানী-মন্ত্রযানী এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক অন্যান্য পন্থার পণ্ডিত ও আচার্যদের যে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ও পরিচয় দেওয়া হইল তাহা হইতে এ-কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই সব আচার্যরা শুধু কেবল বজ্রযানী সাধন, দোহা এবং গীতই শুধু রচনা করিয়াছেন, শুধু তন্ত্রধর্মেরই অনুশীলন করিয়াছেন শত শত গ্রন্থে। এ-ধারণা কতকাংশে সত্য হইলেও সর্বাংশে নয়। এই সব পণ্ডিত ও আচার্যরা মহাযানী ন্যায়শাস্ত্র, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবাদী দর্শন, প্রভৃতির আলোচনাও করিয়াছেন, এবং কিছু কিছু মৌলিক চিন্তার প্রমাণও দিয়াছেন। ধর্মপালের সময় হইতেই সে-চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল।

বাংলাদেশে রচিত মহাযান গ্রন্থাদি

অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার উপর আচার্য হরিভদ্র-রচিত অভিসময়ালঙ্কারাবলোক নামীয় টীকায় হরিভদ্র নাগার্জুন-প্রবর্তিত মধ্যমক চিন্তা ও মৈত্রেয়নাথের যোগাচার-চিন্তার যে সমন্বয় চেষ্টা করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। টীকাখানি লেখা হইয়াছিল ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায়, ত্রৈকূটক-বিহারে। একাদশ শতকের গোড়ায় আচার্য রত্নভদ্র কর্তৃক এই গ্রন্থ তিব্বতীতে অনূদিত হয়। তিব্বতী ঐতিহ্যে জানা যায়, হরিভদ্র এই সুপ্রসিদ্ধ টীকাটি ছাড়া আরও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন মহাযান তত্ত্বাদি সম্বন্ধে; তন্মধ্যে পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকার একটি সংক্ষিপ্তসার, সঞ্চয়টীকাসুবোধিনী, স্ফুটার্থনামক টীকা এবং প্রজ্ঞাপারমিতভাবনাই উল্লেখযোগ্য। আচার্য অসঙ্গ ও বিমুক্তসেনের মতামত্ ও গ্রন্থাদির উপরও তিনি কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন।

হরিভদ্রের প্রধান শিষ্য ছিলেন আচার্য বুদ্ধশ্রীজ্ঞান বা বুদ্ধজ্ঞানপাদ। তিব্বতী জনশ্রুতিমতে তিনি ছিলেন ধর্মপালের সমসাময়িক এবং বিক্রমশীল-মহাবিহারের অধ্যক্ষ; তাঁহার বাড়ী ছিল উড্ডীয়ানে। তিনি মহাযানলক্ষণসমুচ্চয় নামক একখানা মৌলিক গ্রন্থ এবং প্রজ্ঞাপ্রদীপাবলী নামে অভিসময়ালঙ্কারের একটি বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন।

জিনমিত্র নামে আর একজন বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন নরপতি ধর্মপাল, আচার্য দানশীল ও শীলেন্দ্রবোধির সমসাময়িক। শেষোক্ত দুইজন আচার্যের সঙ্গে একযোগে এবং তিব্বত-রাজের অনুরোধে জিনমিত্র একখানি সংস্কৃত-তিব্বতী অভিধান রচনা করিয়াছিলেন; এই তিনজন একযোগে নাগার্জুনের প্রতীত্যসমুৎপাদহৃদয়কারিকা-গ্রন্থখানি তিব্বতীতে অনুবাদও করিয়াছিলেন। জিনমিত্র আর একটি গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন তিব্বতী পণ্ডিত জ্ঞানসেনের সহযোগীতায়; গ্রন্থটির নাম অভিধর্মসমুচ্চয়ব্যাখ্যা।

শান্তরক্ষিতের মধ্যমকালঙ্কার-কারিকা ও তাহার বৃত্তি এবং সত্যদ্বয়বিভঙ্গপঞ্জিকাও মহাযানী গ্রন্থ। দশম শতকের শেষে বা একাদশ শতকের গোড়ায় রত্নাকরশান্তি মৈত্রেয়নাথের অভিসময়ালঙ্কার-গ্রন্থের উপর শুদ্ধিমতী নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তদ্রচিত সারোত্তমা, প্রজ্ঞাপারমিতাভাবনোপদেশ এবং প্রজ্ঞাপারমিতোপদেশ এই তিনখানি গ্রন্থ প্রজ্ঞাপারমিতাতত্ত্বের ব্যাখ্যা। দীপঙ্করগুরু জেতারির বোধিচিত্তোৎপাদসমাদানবিধি এবং বোধিসত্ত্বশিক্ষাক্রম দুইই মহাযানী গ্রন্থ।

তিব্বতী ঐতিহ্য মতে দীপঙ্কর মহাযানের উপর প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে শিক্ষাসমুচ্চয়-অভিসময়, সূত্রার্থসমুচ্চয়োপদেশ, প্রজ্ঞাপারমিতা-পিণ্ডার্থপ্রদীপ, মধ্যমোপদেশ সত্যদ্বয়বার, সংগ্রহগর্ভ, বোধিসত্ত্বমণ্যাবলী, মহাযানপথ-সাধনবর্ণসংগ্রহ এবং বোধিমার্গপ্রদীপ উল্লেখযোগ্য ।

রামপালের রাজত্বকালে অভয়াকর-গুপ্ত যোগাবলী, মর্মকৌমুদী, এবং বোধিপদ্ধতি নামে তিনখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; তিনখানাই মহাযান গ্রন্থ এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কুলদত্ত-রচিত মহাযানের ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাষ্য ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সোমপুর-বিহারবাসী বোধিভদ্রের জ্ঞানসারসমুচ্চয়ও মহাযান-গ্রন্থ, সন্দেহ নাই। জগদ্দলের বিভূতিচন্দ্র শান্তিদেব-রচিত বোধিচর্যাবতারের একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন ; আর একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন দীপঙ্কর স্বয়ং।

এতক্ষণ যে-সব বৌদ্ধ আচার্য ও তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার কথা বলা হইল তাহার কেন্দ্র ছিল বাংলার বৌদ্ধ-বিহারগুলি, এবং তাহাদের সংখ্যা কিছু কম ছিল না।

বাংলার বৌদ্ধ বিহার

জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার বিবৃতি-প্রসঙ্গে এই সব বিহারের কথা কিছু কিছু উল্লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু সমসাময়িক বাংলার সংস্কৃতি-প্রচেষ্টায় ইহাদের দানের পরিমাপ করিতে হইলে সমগ্রভাবে ইহাদের একটু পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

পাল-চন্দ্র পর্বের আগেও বাংলাদেশে বিহার-সংঘারামের কিছু যে অপ্রতুলতা ছিল না তাহার সাক্ষ্য রাজকীয় লিপিমালা, ফা-হিয়েন, য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ ও ই-ৎসিঙের বিবরণ। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর-পট্টে তিন তিনটি বিহারের উল্লেখ আছে—রুদ্রদত্তের আশ্রম-বিহার, রাজবিহার ও জিনসেন-বিহার। ফা-হিয়েনের সময় এক তাম্রলিপ্তিতেই বাইশটি বিহার ছিল এবং বহু স্থবির ও আচার্য সেই সব বিহারে বাস করিতেন। য়ুয়ান্-চোয়াঙের কালে পুণ্ড্রবর্ধনে ছিল বিশটি বিহার, সমতটে ত্রিশটি, তাম্রলিপ্তিতে দশটি, কজঙ্গলে ছয় সাতটি এবং কর্ণসুবর্ণে দশটি। পুণ্ড্রবর্ধন-রাজধানীর প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে ছিল পো-চি-পো বিহার ; সুপ্রশস্ত ও আলোকজ্বল ছিল ইহার অঙ্গন, সুউচ্চ ছিল ইহার মণ্ডপ ও চূড়া। সাত শত মহাযানী শ্রমণ এবং পূর্ব-ভারতের অনেক খ্যাতনামা আচার্যের অধিষ্ঠান ছিল এই সঙ্ঘারাম। মহাস্থান-সমীপবর্তী ভাসু-বিহারের ধ্বংসাবশেষই বোধ হয় য়ুয়ান-চোয়াঙ্-বর্ণিত পো-চি-পো বিহার। কর্ণসুবর্ণের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিহার ছিল লো-টো-মো-চি বা রক্তমৃত্তিকা (রাঙামাটি)-বিহার। এই বিহারেরও কক্ষগুলি ছিল প্রশস্ত এবং সুউচ্চ সৌধগুলি ছিল একাধিক তলযুক্ত। কজঙ্গলের উত্তরাংশে গঙ্গার অনতিদূরে একটি সুউচ্চ সুগঠিত বিহার ছিল ; চারিদিকের দেয়ালে নানা অলংকরণ, নানা দেবদেবীর খোদিত মূর্তি। ই-ৎসিঙের কালে তাম্রলিপ্তির শ্রেষ্ঠ বিহার ছিল পো-লো-হো বা বরাহ-বিহার। এই বিহারের ভিক্ষুদের জীবনযাত্রা, তাঁহাদের দৈনন্দিন নিয়ম-সংযম, খ্যাতি ও সমৃদ্ধি, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পারস্পর সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু বিবরণ ই-ৎসিঙ্ রাখিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত

বিহারের ব্যয়ভার কি ভাবে নির্বাহ হইত ফা-হিয়েন ও ই-ৎসিঙ্ তাহারও কিছু আভাস রাখিয়া গিয়াছেন। ফা-হিয়েন্ বলিতেছেন, 'দেশের রাজা-রাজড়া, নাগরিক ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য বিহার নির্মাণ এবং তাঁহাদের সকল প্রকার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ভূমি, ঘরবাড়ী, উদ্যান, আরাম প্রভৃতি দান করিয়া থাকেন। এক রাজার পর অন্য রাজা সেই উদ্দেশ্যে তাম্রশাসন দান ও পট্টীকৃত করিয়াছেন। সেই জন্য কেহই সে-সব আত্মসাৎ বা বাজেয়াপ্ত করিতে পারে না।' ই-ৎসিঙের বর্ণনাও উল্লেখযোগ্য। 'বুদ্ধ ভিক্ষুদের পক্ষে চাষবাসের কাজ নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন; সেই জন্য তাঁহারা বিহার বা ভিক্ষুসংঘের কৃষিভূমি বিনা করে অন্যকে চাষবাস করিতে দিতেন এবং পরিবর্তে উৎপাদিত শস্যের অংশমাত্র গ্রহণ করিতেন। তাহার ফলে তাঁহারা সাংসারিক চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিতেন, জলসেচনের ফলে প্রাণীহত্যাও তাঁহাদের করিতে হইত না, শীল ও সদাচার পালন করা সহজ হইত। ভিক্ষুদের পরিচ্ছদের ব্যয় সংঘের সাধারণ সম্পত্তি হইতেই বহন করা হইত। বিহারগুলি যে নিষ্কর ভূমি ভোগ করিত সেই ভূমির উৎপাদিত শস্য, বৃক্ষ ও ফল হইতে ভিক্ষু-শ্রমণদের চীবর, অন্তর্বাস, বহির্বাস প্রভৃতি সব কিছুর ব্যয় নির্বাহ হইত। গৃহী ভক্ত ও উপাসকের নিকট হইতে তাঁহারা নানাপ্রকারের দানও গ্রহণ করিতেন; আহার্য গ্রহণেও কাহারও কোনো আপত্তি ছিলনা। আহার্য ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁহারা নির্ভাবনা ছিলেন বলিয়াই সুস্থ স্বচ্ছন্দচিত্তে ধ্যান ও পূজায় (এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায়) তাঁহারা কালাতিপাত করিতে পারিতেন'।

উপরে উল্লিখিত গ্রন্থ-লেখকদের জীবনী এবং গ্রন্থনামগুলি বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, এই সব বিহারের আচার্যরা তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্মশাস্ত্রে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা তো করিতেনই, তাহা ছাড়া মহাযান ন্যায় ও দর্শন, ব্রাহ্মণ্য তীর্থিক শাস্ত্রাদি, ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র, শব্দবিদ্যা, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও হইত। পুঁথি নকল ও অনুবাদ করা, বৌদ্ধ বজ্রযানী-তান্ত্রিক দেবদেবীর ছবি আঁকা (ফা-হিয়েন এই ধরনের ছবি আঁকাও অভ্যাস করিয়াছিলেন তাম্রলিপ্তির বিহারে) প্রভৃতিও বিহারের ভিক্ষুদের অন্যতম অনুশীলনের বিষয় ছিল। প্রত্যেক বিহারের ছোট বড় গ্রন্থাগারও ছিল, এ-অনুমানও খুব অযৌক্তিক নয়; নালন্দা-মহাবিহারের ইতিহাস এবং প্রত্নসাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ।

ই-ৎসিঙের প্রায় সমসাময়িক ত্রিপুরায় আচার্য বন্দ্য সংঘমিত্রের একটি বিহার ছিল, এ-খবর পাওয়া যায় দেবখড়্গের আস্রফপুর লিপিটিতে।

অষ্টম শতকীয় বাংলার প্রসিদ্ধতম বৌদ্ধ বিহার সোমপুরী-মহাবিহার; এই বিহারেরই ধ্বংসাবশেষ লোকলোচনের গোচর হইয়াছে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে। ক্রম-হ্রস্বায়মান সুউচ্চ ত্রিতল মন্দির-বিহার; সর্বতোভদ্র তাহার স্থাপত্যরূপ; উত্তর দিকে সুপ্রশস্ত সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠিয়া গিয়াছে ত্রিতল পর্যন্ত। দ্বিতীয় তলায় মন্দির-প্রকোষ্ঠ; বিহারের অধিষ্ঠাতা দেবতা এই মন্দিরে পূজিত হইতেন। ত্রিতলের উপরে শিখরাকৃতি চূড়া।

মন্দিরের চারিদিকে সুপ্রশস্ত অঙ্গন; প্রত্যেক কোনে একটি করিয়া মণ্ডপ। সর্বতোভদ্র বিহার-মন্দিরের চারিদিকে ভিক্ষুদের বাসকক্ষ, সর্বমুদ্ধ ১৭৭টি। গোড়ায় বোধ হয় এখানে একটি জৈন-বিহার ছিল। অষ্টম শতকের শেষার্ধে ধর্মপাল নরপতির পৃষ্ঠপোষকতায় বিস্তৃত অঙ্গন ব্যাপিয়া সুপ্রশস্ত সুসমৃদ্ধ বিহার-মন্দির গড়িয়া ওঠে। একাদশ শতকের শেষ বা দ্বাদশ শতকের গোড়া পর্যন্ত এই মহাবিহার সমসাময়িক বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-সাধনার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্ররূপে বিরাজমান ছিল। ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ও বর্ধিত বলিয়া বিহারটির অন্যতম নামই ছিল শ্রীধর্মপালদেব-মহাবিহার; পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে মাটির শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে "শ্রীসোমপুরে শ্রীধর্মপালদেব-মহাবিহারে।" কিন্তু তিব্বতী তারনাথ ও সুম্‌পা দুইজনই বলিতেছেন, বিহারটির নির্মাতা দেবপাল; একটু ভুল করিয়াছেন, সন্দেহ কি? সুপ্রসিদ্ধ আচার্য ও মহাপণ্ডিত বোধিভদ্র, আচার্য কালপাদ বা কালমহাপাদ, স্বনামধন্য দীপঙ্কর, স্থবিরবৃদ্ধ বীর্যেন্দ্র আচার্য করুণাশ্রীমিত্র প্রভৃতিরা কোনো না কোনো সময়ে এই মহাবিহারের অধিবাসী ছিলেন। এই বিহারের অন্তেবাসী মহাযানযায়ী বিজয়াচার্য স্থবিরবৃদ্ধ বীর্যেন্দ্র বুদ্ধগয়ায় একটি স্থানক বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আবিষ্কৃত খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের লিপি-উৎকীর্ণ একটি লেখ হইতে জানা যায়, জনৈক শ্রীদশবলগর্ভ সমস্ত জীবের কল্যাণার্থ এই বিহার-চত্বরের কোথাও একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একাদশ শতকের শেষাশেষি বা দ্বাদশ শতকের গোড়ায় সোমপুরের এই বিহারে যতি বিপুলশ্রীমিত্রের পরম গুরুর গুরু যতি করুণাশ্রীমিত্র বাস করিতেন; তখন একদিন বঙ্গাল-সৈন্যদল আসিয়া বিহারে অগ্নিসংযোগ করে; প্রজ্বলমান আলয়ে দেবতার পদাশ্রয় করিয়া করুণাশ্রী পড়িয়া ছিলেন, তবুও সেই গৃহ পরিত্যাগ করেন নাই; সেই ভাবেই অগ্নিদগ্ধ হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। বিপুলশ্রীমিত্র অগ্নিদাহে বিনষ্ট প্রকোষ্ঠগুলির সংস্কার সাধন করেন, বিহার-প্রাঙ্গনে একটি তারা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সোমপুরীর বুদ্ধমূর্তিকে বিচিত্র স্বর্ণাভরণে অলংকৃত করেন। তিনি নিজে বহুকাল বশী সন্ন্যাসীর মত সেই বিহারে যাপন করিয়াছিলেন।

সোমপুরীর পরই বাংলার প্রসিদ্ধ বিহার ছিল জগদ্দল-মহাবিহার। এই বিহারটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল একাদশ শতকের শেষে না হয় দ্বাদশ শতকের গোড়ায় নরপতি রামপালের আনুকুল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায়। রামাবতীতে রামপালের রাজধানীর সন্নিকটেই ছিল বোধ হয় ইহার অবস্থিতি। এই বিহারের অধিষ্ঠাতা দেবতা ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন যথাক্রমে অবলোকিতেশ্বর ও মহত্তারা। জগদ্দলের আয়ু স্বল্পকাল, কিন্তু সেই স্বল্পকালের মধ্যেই সমসাময়িক বৌদ্ধ জগতের সর্বত্র জগদ্দলের প্রতিষ্ঠা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, মোক্ষাকর-গুপ্ত, শুভাকর-গুপ্ত, ধর্মাকর প্রভৃতি মনীষী আচার্যেরা কোনো না কোনো সময়ে এই মহাবিহারের অধিবাসী ছিলেন।

উত্তর-বঙ্গে যেমন সোমপুরী-বিহার ও জগদ্দল-বিহার, পূর্ববঙ্গে তেমনই সুপ্রসিদ্ধ বিহার ছিল বিক্রমপুরী-বিহার, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর-পরগণায়। এই বিক্রমপুরী বিহারও বোধ হয় বিক্রমশীল-ধর্মপালের আনুকূল্যেই প্রতিষ্ঠিত ও লালিত হইয়াছিল। এই বিক্রমপুরী-বিহারই অন্তত কিছুদিনের জন্য অবধূতাচার্য কুমারচন্দ্র এবং লক্ষ্মীঙ্করাশিষ্য লীলাবজ্রের কর্মভূমি ছিল।

ধর্মপালের সমসাময়িক আর একটি বিহার ছিল বাংলাদেশে, কিন্তু কোন্ স্থানে তাহা বলা কঠিন। এই বিহারটির নাম ত্রৈকূটক-বিহার এবং এই বিহারে বসিয়াই আচার্য হরিভদ্র অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার উপর তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ টীকাটি রচনা করিয়াছিলেন। সুম্‌পা রাঢ়দেশের এক ত্রৈকূটক-দেবালয়ের কথা বলিয়াছেন; ত্রৈকূটক-দেবালয় ও ত্রৈকূটক-বিহার এক এবং অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নয়।

চট্টগ্রাম অঞ্চলেও একটি প্রসিদ্ধ বিহার ছিল, তাহার নাম পণ্ডিত-বিহার। এই বিহার ছিল সিদ্ধাচার্য তৈলপাদের কর্মভূমি। বর্তমান ত্রিপুরা-জেলার পট্টিকেরক নামক স্থানে একটি বিহার ছিল, তাহার নাম কনকস্তূপ-বিহার; কাশ্মীরী ভিক্ষু বিনয়শ্রীমিত্র এবং তাঁহার কয়েকজন সহকর্মীর স্মৃতি এই বিহারের সঙ্গে জড়িত। সম্প্রতি ময়নামতী পাহাড়ের উপর যে সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বোধ হয় এই বিহারেরই ধ্বংসাবশেষ। ১২২০ খ্রীষ্ট বৎসরের রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেবের তাম্রপট্টোলীতেও পট্টিকের নগরীতে দুর্গোত্তারার নামে উৎসর্গীকৃত একটি বিহারের উল্লেখ আছে। পট্টিকেরকের কনকস্তূপ-বিহার এবং পট্টিকেরার দুর্গোত্তারা-বিহার একই বিহার কিনা বলা কঠিন। উত্তর-বঙ্গে আর একটি বিহার ছিল, তাহার নাম দেবীকোট-বিহার; আচার্য অদ্বয়বজ্র, ভিক্ষুণী মেখলা প্রভৃতির নাম এই বিহারের সঙ্গে জড়িত। ফুল্লহরি ও সন্নগর-বিহার নামে আরও দুইটি বিহার ছিল প্রাচ্য-ভারতে। ফুল্লহরির অবস্থিতি ছিল উত্তর-বিহারে, বোধ হয় মুঙ্গেরের নিকটে। এই বিহারেও অনেক গ্রন্থ রচিত ও অনূদিত হইয়াছিল। সন্নগর-বিহারও বৌদ্ধ জ্ঞান-সাধনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল, এবং আচার্য বনরত্ন সেই বিহারে বাস করিতেন; কিন্তু ফুল্লহরির মতন এই বিহারটির অবস্থিতিও বোধ হয় ছিল প্রাচীন বাংলাদেশের বাহিরে।

৫

পাল-চন্দ্র-পর্বে প্রধানত সংস্কৃত এবং হয়তো স্বল্পাংশে মাগধী প্রাকৃতের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া যে সুবিপুল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার কিছুটা পরিচয় লইতে চেষ্টা করিয়াছি। এ-কথাও আগে বলিয়াছি, লোকায়ত স্তরে মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় রূপ এবং উত্তর-ভারতের সর্বজনবোধ্য শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রচলনও ছিল যথেষ্ট। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা কেহ কেহ এই শেষোক্ত ভাষায় কিছু কিছু

গান এবং পদ রচনাও করিয়াছেন। মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় গৌড়-বঙ্গীয় রূপের সঙ্গে শৌরসেনী অপভ্রংশের খুব বড় কিছু পার্থক্যও ছিলনা। নবসৃজ্যমান (প্রাচীনতম) বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাগীতিগুলিতে যে-ভাষা আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা সদ্যোক্ত মাগধী অপভ্রংশের গৌড়-বঙ্গীয় রূপেরই সহজ ও স্বাভাবিক বিবর্তন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাবও কিছু কিছু পড়িয়াছে। আর, প্রাচ্যদেশে স্থানীয় লেখক ও জনসাধারণের লেখনীতে ও মুখে মুখে শৌরসেনী অপভ্রংশও অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক উপায়েই কিছু কিছু প্রাচ্য উচ্চারণ ও বানান, বাক্‌ ও পদবিন্যাস-ভঙ্গী স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। এই স্বীকৃতি বাঙালী সিদ্ধাচার্যদের রচিত দোহা এবং পদগুলির মধ্যেই সুস্পষ্ট।

সৃজ্যমান বাংলাভাষা
শৌরসেনী অপভ্রংশ

শিক্ষিত বর্ণসমাজের উচ্চস্তরে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষাকে বাদ দিলে মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় বিবর্তিত রূপই ছিল এই পর্বে রাঢ়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-সমতট-চট্টলের লোকায়ত ভাষা। মূলত এই আর্যভাষায় আর্যেতর অষ্ট্রিক্‌, দ্রবিড় ও ভোটব্রহ্ম ভাষাগোষ্ঠীর নানা স্থানীয় বুলিরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল, শুধু শব্দ ও উচ্চারণ-ভঙ্গীতেই নয়, কিছুটা বাক্‌ভঙ্গী ও পদবিন্যাস রীতিতেও, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সংস্কৃত হইতে মাগধী প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে মাগধী অপভ্রংশের বিবর্তন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কি করিয়া হইতেছিল, এ-তথ্যও আজ আচার্য সুনীতিকুমারের গবেষণার ফলে সুবিদিত।

যাহাই হউক, সুবিস্তৃত আলোচনা-গবেষণার ফলে আজ এই তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত যে, আনুমানিক নবম-দশম শতকে বাংলাদেশে সংস্কৃত ছাড়া আরও দু'টি ভাষা প্রচলিত ছিল, একটি শৌরসেনী অপভ্রংশ, আর একটি মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় বিবর্তিত রূপ যাহাকে বলা যায় প্রাচীনতম বাংলা। একই লেখক এই দুই ভাষায়ই পদ, দোহা ও গীত প্রভৃতি রচনা করিতেন; শ্রোতা ও পাঠকেরাও দুই ভাষাই বুঝিতে পারিতেন। নবম-দশম শতকের আগে এই লোকায়ত ভাষার রূপ কি ছিল আজ আর তাহা জানিবার উপায় নাই; সে-ভাষার নমুনা কোনো সাহিত্যে কেহ ধরিয়া রাখে নাই। পরেও নবসৃজ্যমান যে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার কথা বলিতেছি সে-ভাষায় লিখিত রচনার সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প। সংস্কৃতের মর্যাদা ও প্রভাব শিক্ষিত সমাজে ও উচ্চ বর্ণস্তরে ছিল সর্বব্যাপী; তাঁহারা সকলে সংস্কৃতের চর্চাই করিতেন, এবং মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের কালেও অধিকাংশ পণ্ডিত ও লেখক যখন যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন—জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সাহিত্য-দর্শনে—সাধারণত সংস্কৃতের মাধ্যমেই করিয়াছেন। লোকায়ত ভাষার কৌলিন্য-মর্যাদা তখনও যথেষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এমন কি, পাল-চন্দ্র পর্বে তান্ত্রিক ও বজ্রযানী আচার্যরা যে এক ধরনের প্রাকৃতধর্মী 'বৌদ্ধ সংস্কৃতের' প্রচলন করিয়াছিলেন দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এবং তাঁহারাও বিশুদ্ধ ব্যাকরণসম্মত সংস্কৃত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তবে, এক শ্রেণীর লোকেরা—তাঁহারা সাধারণত ইস্‌লাম প্রভাবে প্রভাবান্বিত—

বাংলাদেশের কোথাও কোথাও বোধ হয় সেই প্রাকৃতধর্মী 'বৌদ্ধ সংস্কৃতের' ধারা বহমান রাখিয়াছিলেন ; শেক-শুভোদয়া-গ্রন্থে সেই ভাষার কিছুটা আভাস ধরিতে পারা কঠিন নয়।

বলিয়াছি, সৃজ্যমান প্রাচীনতম বাংলায় রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প। সাহিত্য বা জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার দিক হইতে তাহার উল্লেখযোগ্য মূল্য না থাকিলেও বাংলাভাষা ও বাঙালীর সংস্কৃতির দিক হইতে লোকায়ত ভাষার এই প্রাচীনতম নমুনাগুলির মূল্য অপরিসীম। ইহার পশ্চাতে বহুদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের বা সমাজের শিক্ষিত উচ্চতর বর্ণস্তরের কোনো সক্রিয় সমর্থন বা সহযোগীতা ছিল না, এবং সংস্কৃত ভাষার মাধ্যম ও উচ্চস্তরের সংস্কৃতির আড়ালে লোকায়ত সংস্কৃতির এই প্রকাশ বহুদিন পর্যন্ত যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে আচার্য হরপ্রসাদ-শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে চারিখানা প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনেন। প্রথমটিতে ছিল বিভিন্ন পদকর্তার রচিত ৪৬॥টি ছোট ছোট গান ; বইটির নাম চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতি। গানগুলির সুবিস্তৃত সংস্কৃত টীকাও গ্রন্থটিতে আছে। বহুদিন পর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় মূল-গ্রন্থের একটি তিব্বতী অনুবাদও নেপালেই আবিষ্কার করেন। তিব্বতী অনুবাদে গীত কিন্তু ৫১টি ; মূল সংখ্যা বোধ হয় ছিল তাহাই। এই গানগুলি প্রত্যেকটিই প্রাচীনতম বাংলায় রচিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুঁথি যথাক্রমে সিদ্ধাচার্য সরহ এবং কাহ্ন-রচিত দু'টি দোহা-সংগ্রহ। তৃতীয়টি ডাকার্ণব বা ডাক-রচিত দোহা-সংগ্রহ। এই শেষোক্ত তিনটি গ্রন্থই শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত এবং সংস্কৃত-টীকাযুক্ত।

চর্যাগীতি

আচার্য সুনীতিকুমার চর্যাগীতিগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন, ইহাদের ভাষা প্রাচীনতম বাংলা-ভাষার লক্ষণাক্রান্ত। শুধু তাহাই নয়, ইহাদের ব্যাকরণরীতি ও বাক্‌ভঙ্গী একান্তই বাংলা, এবং এখনও বাংলা-ভাষায় স্বীকৃত ও প্রচলিত। গীতগুলিতে এমন অনেক প্রবাদ আছে যাহা আজও বাংলাদেশে সুপ্রচলিত ; তাহা ছাড়া, ইহাদের মধ্যে নৌকা, নদনদী প্রভৃতি লইয়া ছবিতে উপমায় যে পারিপার্শ্বিকের চিত্র সুপরিস্ফুট তাহা একান্তই নদীমাতৃক বাংলা দেশের।

৪৬॥০টি চর্যাগীতির ২২জন কবি সকলেই সিদ্ধাচার্য, এবং চুরাশী সিদ্ধার নামের তালিকায় ইহাদের প্রত্যেকেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে, ইহাদের প্রত্যেকের দেশ ও কালনির্ণয় কঠিন। আচার্য সুনীতিকুমার, প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, হরপ্রসাদ-শাস্ত্রী প্রভৃতিরা নানাদিক হইতে কাল-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন ; সাক্ষ্য-প্রমাণ যাহা আছে তাহা কিছুটা পরস্পর বিরোধী, পরিমাণে স্বল্প এবং সর্বত্র সুস্পষ্ট এবং নিঃসংশয়ও নয়। তবে, এক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ছাড়া, আর সকলেই মনে করেন, এই সিদ্ধাচার্য কবিরা মোটামুটি নবম শতক হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। ইহাদের মধ্যে লুই-পা, কাহ্ন-পা, জালন্ধরী-পা বা হাড়ি-পা শবরী-পা, ভুসুকু, তন্ত্রীপাদ প্রভৃতিরাই সমধিক প্রসিদ্ধ, এবং

ইহাদের দেশ ও কাল সম্বন্ধে আগেই বলিয়াছি। মনে হয়, এই গীত-রচয়িতারা সকলেই প্রাচীন বাংলা দেশের অধিবাসী ছিলেন; যাঁহারা তাহা ছিলেন না তাঁহাদেরও অন্তত বাংলা দেশ ও বাঙালীর জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। তবু, এ-তথ্যও একেবারে নিঃসংশয়, এমন বলা চলে না।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক হইতে এই গীতিগুলির মূল্য অপরিমেয়। প্রায় প্রত্যেকটি গীত্ই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, এবং অন্ত্যমিলে বাঁধা; প্রত্যেকটি গীত্ এক একটি বিশেষ বিশেষ রাগে গাওয়া হইত। বাংলা পয়ার বা লাচাড়ী ছন্দ এই গীতিগুলির ছন্দ হইতেই বিবর্তিত; এবং যত গুহ্য অধ্যাত্ম-সাধনার গুহ্যতর তত্ত্বই ইহাদের মধ্যে নিহিত থাকুক না কেন, স্থানে স্থানে এমন পদ দু'চারিটি আছে যাহার ধ্বনি, ব্যঞ্জনা, ও চিত্রগৌরব এক মুহূর্তে মন ও কল্পনাকে অধিকার করে। অথচ, এ-কথাও সত্য যে, সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই গীতিগুলি রচিত হয় নাই, হইয়াছিল বৌদ্ধ সহজ-সাধনার গূঢ় ইঙ্গিত ও তদনুযায়ী জীবনাচরণের (চর্যার) আনন্দকে ব্যক্ত করিবার জন্য। সহজ-সাধনার এই গীতিগুলি কর্তৃক প্রবর্তিত খাতেই পরবর্তীকালের বৈষ্ণব সহজিয়া গান, বৈষ্ণব ও শাক্ত-পদাবলী, আউল-বাউল-মারফতী-মুর্শিদ্যা গানের প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। এই গ্রন্থের নানা স্থানে নানা সূত্রে চর্যাগীতির নানা বিচ্ছিন্ন পদ উদ্ধার করিয়াছি; এখানেও দুই চারিটি উদ্ধার করিতেছি ইহাদের সাহিত্য-মূল্যের কিছুটা আস্বাদ লাভের উদ্দেশ্যে।

উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মৌউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবর ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলি॥

উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বসতি করে শবরী বালিকা; শবরীর পরিধানে ময়ূরের পাখা, গলায় গুঞ্জার মালা। ওগো উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোলে ভুল করিও না, দোহাই তোমার—আমি তোমারই গৃহিণী, নামে সহজ সুন্দরী। নানা তরু মুকুলিত হইল, গগন স্পর্শ করিল ডাল; কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী একেলা শবর এ-বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। তিন ধাতুর খাট পাতিল শবর, মহাসুখে বিছাইল শয্যা; শবর ভুজঙ্গ এবং নৈরাত্মা স্ত্রী—উভয়ে একত্র প্রেমরাত্রি পোহাইল।

তিন না ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলয় ণ জাণী॥
হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।
এ বন ছাড়ি হোহু ভান্তো॥

ভয়ে তৃণ ছোঁয় না হরিণ, না খায় জল; হরিণ জানেনা হরিণীর নিলয়। হরিণী আসিয়া বলে, হরিণ, তুমি শোনো, এ-বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইয়া চলিয়া যাও।

কুলেঁ কুলেঁ মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল ভিণ একুবাকু ণ ভুলহ রাজপথ কন্ধারা ॥
মায়া মোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥
সুনাপান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এষা অটমহাসিদ্ধি সিঝই উজুবাট জায়ন্তে ॥

হে মূঢ়, কূলে কূলে ঘুরিয়া ফিরিও না, সংসারে সহজ পথ পড়িয়া আছে। সম্মুখে যে মায়া-মোহের সমুদ্র তাহার যদি না বোঝা যায় অন্ত, না পাওয়া যায় থই, সম্মুখে যদি না দেখা যায় কোনো ভেলা বা নৌকা, তবে এ-পথের যাঁহারা অভিজ্ঞ পথিক, তাঁহাদের নিকট সন্ধান জানিয়া লও। শূন্য প্রান্তরে যদি না পাও পথের দিশা, তবু ভ্রান্ত হইয়া আগাইয়া যাইও না; সহজ পথে চল, তাহা হইলেই মিলিবে অষ্টমহাসিদ্ধি।

আগেই বলিয়াছি, পশ্চিম ও উত্তর-ভারতীয় শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত হইয়াছিল সরহ ও কাহ্নের দোহাগুলি। এই দোহাগুলিও সহজসিদ্ধির গুহ্যতত্ত্ব ও আচরণ সম্বন্ধীয় এবং ইহাদেরও অর্থ নিরূপণ অত্যন্ত কঠিন, তবে চর্যাগীতি অপেক্ষা সরলতর। ছন্দে ও ধ্বনিগৌরবে দোহাগুলিও খুব সমৃদ্ধ, তবে অদীক্ষিতের পক্ষে ইহাদের সৌন্দর্যের অনেকখানি গুহানিহিত। ঠিক বাংলা ভাষা বা বাংলা সাহিত্য না হইলেও প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যের ধারার সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ নিবিড়; দুইই একই ভাব-মণ্ডলের সৃষ্টি। পরবর্তী কালের বাংলা বৈষ্ণব-পদাবলীর সঙ্গে ব্রজবুলিতে রচিত বৈষ্ণব-পদাবলীর যে-সম্বন্ধ, ভাষা ও ভাব-পরিমণ্ডলের দিক্ হইতে চর্যাগীতির সঙ্গে দোহাকোষের সম্বন্ধ ঠিক তাহাই। প্রাচীন বাংলায় শৌরসেনীর এই প্রভাব উত্তর-ভারতের দান, এবং এ-দান কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেই হয়।

কাহ্ন ও সরহপাদের দোহাকোষ

চর্যাগীতিগুলির পাঠ সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়, গুহ্য অর্থ তাহাকে আরও যেন অস্পষ্ট করিয়া দেয়। সংস্কৃত টীকাটির ভাষা এবং অর্থও দুর্বোধ্য। দোহাকোষ সম্বন্ধেও বক্তব্য একই। চর্যার ভাষায় কোথাও শৌরসেনী অপভ্রংশের এবং কোথাও কোথাও মৈথিলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। ঠিক তেমনই দোহাগুলির অপভ্রংশে কিছু কিছু স্থানীয় বাংলা ও মৈথিলী প্রভাবও ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কাহ্ন ও সরহপাদের ২।৪টি অপভ্রংশ দোহাংশ অন্য প্রসঙ্গে অন্যত্র উদ্ধার করিয়াছি; এখানেও একটি উদ্ধার করিলাম, কতকটা ইহাদের সাহিত্যমূল্যের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য।

পণ্ডিঅ লোঅ খমহ মহ এথু ন কিঅই বিঅপ্প্
জো গুরুবঅণেঁ মই সুঅউ তহি কিং কহমি সুগোপ্প্।
কমল কুলিস বেবি মজ্ঝটিউ জো সো সুরঅ বিলাস
কো তহি রমই ন তিহুঅণে কস্‌স ন পূরই আস ॥

পণ্ডিত লোক, আমাকে ক্ষমা কর; এখানে কিছু বিকল্প করা হইতেছে না; যাহা আমি শুনিয়াছি সুগোপন গুরুবাক্যে তাহা আমি কি করিয়া বলি! কমল এবং কুলিশ এই দুইয়ের মধ্যস্থিত যে সুরতবিলাস তাহাতে ত্রিভুবনে কে না সুখী হয় এবং কাহার না আশা পূর্ণ হয়!

প্রাচীনতম বাংলা ভাষা যেমন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ভাবের ও তত্ত্বের বাহন হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যেও যে সে-ভাষা একেবারে ব্যবহৃত হয় নাই, এমন নয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণ কাহিনীর কয়েকটি নাম যে বিবর্তিত রূপে আমাদের গোচর তাহাদের ভাষাতত্ত্বগত ইঙ্গিত খুব সুস্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়। কৃষ্ণ-কাহ্ন-কানু বা কানাই, রাধিকা-রাহী-রাই, কংস-কাংস, নন্দ-নান্দ, অভিমন্যু-অহিবন্নু বা অহিমন্নু-আইহণ আইমন-আয়ান প্রভৃতি নামের বিবর্তনের মধ্যে অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে অপভ্রংশের মারফৎ প্রাচীন বাংলায় রূপান্তরের মধ্যে বোধ হয় এ-তথ্য লুক্কায়িত যে, কৃষ্ণ-রাধিকার কাহিনী কোনো না কোনো সাহিত্যরূপ আশ্রয় করিয়া কামরূপে ও বাংলা দেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল তুর্কী-বিজয়ের বহু আগেই। এই সাহিত্যরূপের প্রত্যক্ষ প্রমাণও কিছু কিছু আছে, যদিও তাহা সুপ্রচুর নয়। কামরূপরাজ বনমালদেবের একটি লিপিতে, ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়-গ্রন্থের কয়েকটি প্রকীর্ণ শ্লোকে কৃষ্ণের ব্রজলীলার বর্ণনার কথা তো আগেই বলিয়াছি।

কৃষ্ণ-রাধা কাহিনী

তাহা ছাড়া, চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের পৃষ্টপোষকতায় ১০৫১শকে (১১২৯ খ্রীষ্ট বৎসরে) মানসোল্লাস বা অভিলষিতার্থচিন্তামণি নামে একটি সংস্কৃত কোষগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; এই গ্রন্থের গীতবিনোদ অংশে ভারতবর্ষের সমসাময়িক সমস্ত স্থানীয় ভাষায় রচিত কিছু কিছু গানের দৃষ্টান্ত সংকলিত হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রাচীনতম বাংলায় রচিত গানও আছে। এই বাংলা গানগুলির বিষয়বস্তু গোপীদের লইয়া শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা এবং বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার-বর্ণনা। এই গানগুলি বাংলা দেশেই রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই, এবং এই প্রান্ত হইতেই মহারাষ্ট্র-প্রান্তে প্রচারিত হইয়াছিল।

আচার্য সুনীতিকুমার দেখাইয়া দিয়াছেন, জয়দেবের গীতগোবিন্দ-গ্রন্থে এমন কতগুলি পদ বা গান আছে যে-গুলি আগেও সুরে গাওয়া হইত, এখনও হয়। গীতগোবিন্দের ভাষা শব্দ ও ব্যাকরণের দিক হইতে সংস্কৃত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার ছন্দ, রীতি ও ভঙ্গী, ইহার অনুভব, ইহার প্রাণবায়ু সমস্তই যেন লোকায়ত স্থানীয় ভাষায়, সে-ভাষা প্রাচীনতম বাংলাই হোক্ বা বাংলা দেশে প্রচলিত শৌরসেনী অপভ্রংশই হোক্। আর, আগেই বলিয়াছি, এই দুই ভাষায় বিশেষ পার্থক্যও কিছু ছিলনা। এমন কথাও কেহ কেহ বলেন, মূল গীতিগোবিন্দ রচিত হইয়াছিল শৌরসেনী অপভ্রংশে বা প্রাচীনতম বাংলায়, পরে তাহার উপর একটা সংস্কৃত পোষাক পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র! এ-অনুমান সত্য হউক বা না হউক (সত্য বলিয়া মনে করিবার কারণ খুব নাই), একদিকে চর্যাগীতি ও অন্যদিকে গীতগোবিন্দের ধারায়ই পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-পদাবলীর সৃষ্টি।

গীতগোবিন্দের ভাষা

চতুর্দশ শতকের শেষাশেষি প্রাকৃত-পৈঙ্গল নামে অবহট্‌ঠ (অপভ্রষ্ট) বা অপভ্রংশ-ভাষায় রচিত গীতি-কবিতার একটি সংকলন গ্রন্থ রচিত হয়; প্রাকৃত ছন্দের বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতির দৃষ্টান্ত সংকলন করাই ছিল অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থে একাদশ-

চতুর্দশ শতকীয় শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত এমন কয়েকটি পদ আছে যে-গুলির মধ্যে কিছু কিছু বাংলা শব্দ, বাংলা ধরন-ধারন প্রত্যক্ষ গোচর; ভাষার দিক হইতে গীতগোবিন্দের পদগুলির সঙ্গেও কয়েকটি পদের আত্মীয়তা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। এক কথায় ইহাদের আবহ যেন একান্তই বাংলার, এবং খুব সম্ভব এই অপভ্রংশ পদগুলি বাংলাদেশেই রচিত হইয়াছিল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিতেছি। ক্ষুদ্র পরিসরে ঘনীভূত ভাব ও রসের, ধ্বনি ও ছন্দের এমন সুন্দর প্রকাশ প্রাচীন কাব্যে খুব কমই দেখা যায়। আমার ধারণা, প্রাকৃত-পৈঙ্গলের অনেকগুলি শ্লোক ও কবিতায় বাংলাদেশের যেটুকু পরিচয় পাইতেছি তাহা প্রাক্-তুর্কী বাংলার।

প্রাকৃত-পৈঙ্গলের কয়েকটি কবিতা

> কাঅ হউ দুব্বল, তেজ্জি গরাস, খণে খণে জানিঅ অচ্ছ পিসাস।
> কুহুরব তার দুরন্ত বসন্ত, নিদ্দঅ কাম নিদ্দঅ কন্ত॥

দুর্বল হইল কায়, গ্রাস (অর্থাৎ আহার) হইল পরিত্যক্ত, ক্ষণে ক্ষণে (দীর্ঘ) নিঃশ্বাস জানা যাইতেছে; কুহুরব তীব্র, বসন্ত দুরন্ত;—কাম-নির্দয় কি কান্ত নির্দয়, জানিনা।

> সো মহ কন্তা দূর দিগন্তা।
> পাউস আএ চেউ চলাএ॥

সেই আমার কান্ত (গিয়াছে) দূর দিগন্তে; প্রাবৃষ (বর্ষা) আসিতেছে, চঞ্চলিত হইতেছে চিত্ত।

> গজ্জই মেহ কি অম্বর সামর
> ফুল্লই নীব কি বুল্লই ভামর।
> একল জীঅ পরাহিণ অম্মহ
> কীলউ পাউস কীলউ বম্মহ॥

মেঘ গর্জন করিতেছে, অম্বর শ্যামল, নীপ ফুটিয়াছে, ভ্রমর বুলিতেছে; আমার একলা জীবন পরাধীন;—প্রাবৃষ (মেঘ) খেলা করিতেছে, মন্মথও খেলা করিতেছে।

> তরুণ-তরুণি, তবই ধরণি, পবণ বহখরা
> লগ ণহি জল, বড় মরু থল, জনজীবণ হরা।
> দিসই বলই, হিঅঅ দুলই, হমি একলি বহূ
> ঘর ণহি পিঅ, সুণহি পহিঅ, মণ ইচ্ছই কহূ॥

তরুণ সূর্যে ধরণী তপ্ত, বাতাস বহিতেছে খর বেগে, নিকটে নাই জল, জন জীবননাশা বিস্তৃত মরুস্থল (সম্মুখে); ঘরে নাই আমার প্রিয়, আমি একেলা বধূ—শোনো গো পথিক, আমার মন কি চায়।

শুধু প্রেমের কবিতা বা ভক্তিরসের কবিতাই নয়, বীররসের কবিতাও প্রাকৃত-পৈঙ্গলে মিলিতেছে, এবং সেই প্রসঙ্গে বাঙ্গালীর বীরত্বের গৌণ প্রশংসাও আছে। সুকুমার সেন মহাশয় তাহার কিছু কিছু উদ্ধার করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণরাধাকাহিনী, শ্রীরামচন্দ্র

প্রভৃতি লইয়াও দুই চারিটি ছোট ছোট কবিতা আছে। একটি শ্লোকে দেখিতেছি, কয়েকটি বিশিষ্ট মাত্রা-সংস্থানের নামকরণই হইয়াছে বাংলাদেশে পূজিতা চারিজন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবীর নামানুসারে—লক্ষ্মী, গৌরী, চুন্দা ও মহামায়া। আর একটি শ্লোকে শিবজায়া পার্বতীর দারিদ্র্যময় সংসারের গার্হস্থ্যদুঃখ বর্ণনা অত্যন্ত করুণ !

বাল কুমারো ছঅ মুণ্ডধারী, উবাঅহীণা মুই এক্ক ণারী।
অহংণিসং খাই বিসং ভিখারী গঈ ভবিত্তী কিল কা হমারী॥

ছয় মুণ্ডধারী বালকপুত্র আমার ছয়মুখে খায়, আর আমি একা উপায়হীনা নারী!
আমার ভিখারী স্বামী অহর্নিশ কেবল বিষ খায়; কী গতি হইবে আমার।

এই বর্ণনা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে শিবগৃহিণী পার্বতীর গার্হস্থ্য-বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায়; সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থেরও একাধিক প্রকীর্ণ শ্লোকে একই চিত্র সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর। সন্দেহ নাই, এ-চিত্র একান্তই বাঙ্গালীর এবং বাংলার আবহে-পরিবেশে আম্নাত।

শুদ্ধ ও সংযত, স্বচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধ সংসারের সংক্ষিপ্ত বাস্তব বর্ণনাও আছে।

পুত্ত পবিত্ত বহুত্ত ধণা ভত্তি কুটুম্বিণি সুদ্ধমনা।
হাক তরাসই ভিচ্চগণা কো কর বব্বর সগ্গমণা॥

পুত্র পবিত্র; অনেক ধন; ভর্ত্রী অর্থাৎ স্ত্রী এবং কুটুম্বিনীরা শুদ্ধ স্বভাবা;
হাঁকে এস্ত হয় ভৃত্যগণ; (এমন সব রাখিয়া) কোন্ বর্বর স্বর্গে যাইতে চায়।

গীতগোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেব অপভ্রংশ ভাষায়ও গীতি-কবিতা রচনা করিতেন। গুর্জরী ও মারু রাগে গেয় জয়দেবের দুটি গান শিখদের শ্রীগুরুগ্রন্থে বা আদিগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, কিছুটা বিকৃত রূপে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা উদ্ধার করিয়াছেন।

ধর্মাশ্রয়ী বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য গীতি-কবিতা ছাড়া অপভ্রংশে কিছু কিছু প্রেমের কবিতাও যে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল তুর্কী-বিজয়ের আগেই, তাহার পরিচয় তো প্রাকৃত-পৈঙ্গলের কতকগুলি শ্লোকেই দেখা যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে কিছু বাংলা শব্দ, বাংলা বাক্‌ভঙ্গী, বাংলা ধরন-ধারন, সর্বোপরি বাংলার আবহ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। খুব সম্ভব এই ধরনের কবিতাগুলি বাংলাদেশেই রচিত হইয়াছিল, এমন অপভ্রংশে যাহার উপর প্রাচীনতম বাংলা ভাষার প্রভাব অত্যন্ত বেশি।

সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব-গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মদাসের বিদগ্ধমুখমণ্ডল-গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে। সুকুমার সেন মহাশয় দেখাইয়াছেন, এই গ্রন্থের কোনো কোনো শ্লোক ও শ্লোকাংশ প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত; প্রাচীনতম বাংলাভাষারও দু'একটি ছত্র বিদ্যমান।

সুনীতিবাবু দেখাইয়াছেন, শেক-শুভোদয়ার উনবিংশ অধ্যায়ে মধ্যযুগীয় বাংলাভাষায় রচিত একটি প্রেমের কবিতা আছে; কবিতাটি প্রাক্-তুর্কী আমলের রচনা বলিয়াই মনে হয়; পরে শেক-শুভোদয়া রচনাকালে সমসাময়িক ভাষায় রূপান্তরিত করা হইয়াছিল।

ডাক ও খনার নামে যে বচনগুলি বাংলাদেশে আজও প্রচলিত তাহাও বোধ হয়

প্রাক্-তুর্কী আমলের চলতি প্রবাদ সংগ্রহ; কালে কালে তাহাদের ভাষা বদলাইয়া গিয়াছে মাত্র। শুভংকরের নামে প্রচলিত গণিত-আর্যার শ্লোকগুলিতেও যে অপভ্রংশের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান তাহা অঙ্গুলি সংকেতে দেখাইবার প্রয়োজন আজ আর নাই।

লক্ষ্যণীয় এই যে, এই পর্বে প্রাচীনতম বাংলায় এবং অপভ্রংশে রচিত সাহিত্যের অল্পস্বল্প যে-সব দৃষ্টান্ত আমাদের গোচর তাহা সমস্তই গীতি-কবিতা, এবং তাহার অধিকাংশ সুরে-তালে গেয়। বাংলা দেশের এই সুপ্রাচীন গীতিকাব্যের ধারার সঙ্গেই মধ্যযুগীয় বাংলা গীতিকাব্যের প্রবাহ যুক্ত, তাহা বৈষ্ণব-পদাবলীর ধারাই হোক্, আর মঙ্গল-কাব্যের ধারাই হোক্।

মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গল-কাব্যে চাঁদ সদাগর-লখীন্দর-বেহুলা-ধনপতি-লহনা-খুল্লনা-শ্রীমন্ত-কালকেতুর যে-কাহিনীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়, গোপীচাঁদের গানে রাজা গোপীচন্দ্র-লাউসেন-ময়নামতী বা মদনাবতী-অদুনা-পদুনার যে গল্প আমরা পাইতেছি, এই সব গল্প খুব সম্ভব প্রাক্-তুর্কী বাংলার লোকায়ত স্তরে জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, এবং অসম্ভব নয়, কিছু কিছু রচনাও হয়তো হইয়া থাকিবে। তবে, এ-সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। মনসা-মঙ্গলের গল্পে অন্তর্বাণিজ্য ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের যে-ছবি তাহা মধ্যযুগীয় বাংলার ছবি নয়; সে-যুগে বাংলার এই সামুদ্রিক বাণিজ্যসমৃদ্ধি আর ছিল না। মনে হয়, এই চিত্র প্রাচীনতর কালের দূরাগত স্মৃতিমাত্র; তাহারই উপর সমসাময়িক কালের প্রলেপ পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, ব্রাহ্মণ্যধর্মে মনসার প্রতিষ্ঠা নবম-দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকেই; কাহিনীটিতে মনসার যে প্রতাপ দৃষ্টিগোচর তাহা প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে হওয়াই স্বাভাবিক। আর, গোপীচাঁদের গল্পে তো একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় সহজিয়া তান্ত্রিকধর্মের স্রোত সবেগে বহমান।

৬

দ্বাদশ শতকের সেন-বর্মণ পর্ব বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণযুগ। সেন-বর্মণ রাজবংশের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়া ধীরে ধীরে বদলাইতে আরম্ভ করে। এই দুই রাজবংশই বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্মৃতি ও সংস্কারানুযায়ী সমাজ পুনর্গঠনের প্রয়াসী। এই প্রয়াসের স্বাভাবিক প্রকাশ হইবে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পোষকতা, ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিগ্রন্থাদির অধিকতর আলোচনা ও রচনা, ব্রাহ্মণ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকতর প্রচার, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও জীবনাদর্শের অধিকতর প্রসার, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। এই পর্বে বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম ও জীবনাদর্শ অনাদৃত; অন্তত রাষ্ট্রের এবং সমাজের প্রতাপবান এবং সমৃদ্ধ উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর সক্রিয় পোষকতা ইহাদের পশ্চাতে আর নাই। সংঘ-বিহার ইত্যাদি ছিল না, বা এখানে সেখানে বৌদ্ধ ও অন্যান্য অবৈদিক ও অপৌরাণিক

সেন-বর্মণ পর্ব

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বা শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা আর হইত না, তাহা নয়, কিন্তু যাহা যতটুকু হইত তাহার পরিধি সংকুচিত হইয়া গিয়াছিল, সন্দেহ নাই, এবং সমস্ত চর্চা ও চর্যা একান্ত ভাবেই সংকীর্ণ ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া, এই সব বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীগুলির প্রভাব ক্রমশই সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। পাল-বংশের শেষ অধ্যায় হইতেই সমাজ ও সংস্কৃতির এই গতি ধীরে ধীরে ধরা পড়িতেছিল ; সেন-বর্মণ বংশ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেগ বাড়িয়াই গেল। প্রাকৃতধর্মী 'বৌদ্ধ সংস্কৃত', সৃজ্যমান প্রাচীনতম বাংলা এবং শৌরসেনী অপভ্রংশের গৌড়-বঙ্গীয় রূপের চর্চা যাহা ছিল তাহা সাধারণত বৌদ্ধ তান্ত্রিক সমাজের মধ্যেই এবং লোকায়ত স্তরের স্বল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়।

এই পর্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরভ্যুত্থান শুধু যে বাংলাদেশেই আবদ্ধ ছিল তাহা নয়। সমগ্র উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতবর্ষ জুড়িয়াই তখন নূতনতর এক ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টির এবং সৃষ্টির তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে—কাশ্মীরে, কল্যাণে (মহারাষ্ট্র), কলিঙ্গে, কনৌজে, ধারায়, মিথিলায়। এই একই তরঙ্গ বাংলাদেশেও বহিয়া আসে নাই, তাহা কে বলিবে ? কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, এই পর্বের বাংলায় সমস্ত গ্রন্থ-রচনাই তিনটি রাজার রাজত্বকালে—হরিবর্মা, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন ; এবং সমস্ত গ্রন্থই প্রায় হয় জ্যোতিষ-মীমাংসা-ধর্মশাস্ত্র-স্মৃতিশাস্ত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য আচার-আচরণ সম্পর্কিত, অথবা কাব্য-নাটক, এবং সে কাব্য-নাটকও চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী এবং ব্রাহ্মণ্য-ঐতিহ্যে ভরপুর। ব্যাকরণে, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের আলোচনায়, তান্ত্রিক দর্শনে, নূতন সাহিত্যরীতির প্রবর্তন ও প্রচলনে যে-বাংলাদেশ গুপ্তোত্তর ও পালপর্বে প্রায় সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, এই পর্বে সে-সব দিকে কোনো উল্লেখযোগ্য চেষ্টাও যে ছিল এমন নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। এই তথ্যের মধ্যে ইতিহাসের যে-ইঙ্গিত নিহিত তাহা অন্ত প্রসঙ্গে একাধিকবার ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি ; এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আসল কথা, এই পর্বে বাঙালীর মনন ও অন্বেষণের স্রোতে ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছিল, গভীরতর এবং বহুমুখী জ্ঞানসাধনা আর ছিলনা, স্বাধীন চর্চার ক্ষেত্রে স্বকীয়ত্ব প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। একমাত্র কবিকল্পনার ক্ষেত্রে কিছুটা সরস প্রাণপ্রবাহ ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্তও অব্যাহত ছিল, কিন্তু সে-প্রাণেরও বিস্তার বা গভীরতা স্বল্প। গীতগোবিন্দের মত কাব্যও যথার্থত স্বল্পপ্রাণ ; তাহার মাধুর্য আছে শক্তি নাই, সুর আছে তেজ নাই, দাহ আছে দীপ্তি নাই।

গৌড়-মীমাংসক সম্বন্ধে উদয়ন ও গঙ্গেশ-উপাধ্যায় যে উক্তিই করিয়া থাকুন না কেন বাংলাদেশে যে মীমাংসার চর্চা হইত তাহার লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। তাহা ছাড়া অনিরুদ্ধ ও ভবদেব-ভট্ট এই দুইজনই ছিলেন মীমাংসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ; তাঁহারা দুইজনই কুমারিল-ভট্টের

মীমাংসা সম্বন্ধীয় মতামতের সঙ্গে সুপরিচিত। হলায়ুধও বলিতেছেন, বাংলাদেশে বৈদিক শাস্ত্রাদির আলোচনা হইত না বটে, কিন্তু মীমাংসার চর্চা ছিল। কিন্তু তাহা থাকিলেও এই পর্বে রচিত মীমাংসাশাস্ত্রের মাত্র দু'টি গ্রন্থের খবর আমরা জানি। একটি ভবদেব-ভট্ট কৃত তৌতাতিতমততিলক অর্থাৎ তৌতাতিত বা কুমারিল-ভট্টের তন্ত্র-বার্তিক গ্রন্থের টীকা, আর একটি হলায়ুধের মীমাংসাসর্বস্ব। শেষোক্ত গ্রন্থটি বিলুপ্ত; আর, তৌতাতিতমততিলক পূর্বমীমাংসাসূত্রের একাংশের মাত্র টীকা।

মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ্য বিধি-বিধান

এই পর্বে ধর্মশাস্ত্রের প্রসিদ্ধতম লেখক হইতেছেন বালবলভীভুজঙ্গ (বালবলভী নামক নগরের নাগরক), রাঢ়ান্তর্গত সিদ্ধলগ্রামবাসী, সামবেদীয় কৌঠুমশাখাধ্যায়ী, সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ভট্ট-ভবদেব। তাঁহার এক পূর্বপুরুষ জনৈক অনুল্লিখিতনাম গৌড়রাজের নিকট হইতে হস্তিনীভিট্ট নামক গ্রাম শাসনস্বরূপ পাইয়াছিলেন; তাঁহার পিতামহ আদিদের জনৈক বঙ্গরাজের সন্ধিবিগ্রহিক ছিলেন; পিতার নাম ছিল গোবর্ধন; মাতা সাঙ্গোকা ছিলেন জনৈক বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের কন্যা। ভবদেব নিজে বর্মণরাজ হরিবর্মা এবং সম্ভবত তাঁহার পুত্রেরও মহাসন্ধিবিগ্রহিক-মন্ত্রী ছিলেন। শিক্ষিত অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ভবদেব রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বেরও অধিকারী হইয়াছিলেন; ধর্মাচরণোদ্দেশে অনেক দীঘি ও মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার চেয়েও উল্লেখযোগ্য এই যে, সমসাময়িক কালে তাঁহার চেয়ে যুগন্ধর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর কেহ ছিলেন না। তিনি ছিলেন ব্রহ্মাদ্বৈত দর্শনের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা, কুমারিল-ভট্টের মীমাংসা বিষয়ক মতামতের সঙ্গে সুপরিচিত, বৌদ্ধদের পরম শত্রু এবং পাষণ্ড-বৈতণ্ডিকদের তর্কখণ্ডনে পটু, অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, আয়ুর্বেদ-অস্ত্রবেদ-তন্ত্র-গণিত-সিদ্ধান্তে সুদক্ষ, জ্যোতিষে-ফলসংহিতায় দ্বিতীয় বরাহ। বাচস্পতি-রচিত ভবদেব-প্রশস্তিতে বলা হইয়াছে যে, তিনি হোরাশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে এক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং ভট্টোক্ত (অর্থাৎ কুমারিলোক্ত) নীতি অনুসরণ করিয়া এক সহস্র ন্যায়ে মীমাংসা সম্বন্ধীয় আরও একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

ভবদেব-ভট্ট

ভবদেব-রচিত হোরাশাস্ত্রের কোনো পুঁথি আজও পাওয়া যাই নাই। মীমাংসা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থটি পূর্বোক্ত তৌতাতিতমততিলক, সন্দেহ নাই। ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; ব্যবহার, প্রায়শ্চিত্ত এবং আচার সম্বন্ধে অন্তত তিনখানা গ্রন্থের সংবাদ এ-পর্যন্ত জানা গিয়াছে—ব্যবহারতিলক, প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ (বা প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ), এবং ছান্দোগ্যকর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি (বা দশকর্মপদ্ধতি বা সংস্কার-পদ্ধতি বা দশকর্মদীপিকা)। ব্যবহারতিলক-গ্রন্থের কোনো পুঁথি আজও পাওয়া যায় নাই, তবে রঘুনন্দন, মিত্রমিশ্র এবং বর্ধমান প্রভৃতি পরবর্তী স্মৃতিকর্তারা এই গ্রন্থের নানা মতামত উদ্ধার করিয়াছেন তাঁহাদের রচনায়। প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ-গ্রন্থে ভবদেব প্রায় ষাট জন

পূর্বগামীদের মতামত্ উদ্ধার করিয়া ছয় প্রকারের অপরাধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাহিরে প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল; পরবর্তী কালের বেদাচার্য, নারায়ণভট্ট এবং গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতারাও ভবদেবের মতামত উদ্ধার ও আলোচনা করিয়াছেন। ছান্দোগ্য-কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি সামবেদীয় দ্বিজবর্ণের সংস্কার সম্বন্ধীয় গ্রন্থ; গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া ষোলো প্রকারের সংস্কারের আলোচনা এই গ্রন্থে আছে।

ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতাদের মধ্যে ভবদেব-ভট্টের পরেই নাম করিতে হয় পারিভদ্রীয় (পারিভদ্র-কুলজাত; বোধ হয় রাঢ়ীয় পারিহাল বা পারি-গাঞী) মহামহোপাধ্যায় জীমূতবাহনের। তাঁহার বাড়ী ছিল খুব সম্ভব রাঢ়দেশে। জীমূতবাহনের কাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বিস্তর। তিনি রাজা ভোজ এবং গোবিন্দরাজের নাম করিয়াছেন এবং শকাব্দ ১০১৪ – ১০৯২ খ্রীষ্ট বৎসরের উল্লেখ করিয়াছেন; কাজেই তাঁহার কাল একাদশ শতকের আগে হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। অন্যদিকে বাচস্পতি-মিশ্র, শূলপাণি ও রঘুনন্দন তিন জনই জীমূতবাহনের গ্রন্থাদি হইতে মতামত্ উদ্ধার ও আলোচনা করিয়াছেন; কাজেই তাঁহার কাল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের পরেও হইতে পারে না। খুব সম্ভব তিনি দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে জীবিত ছিলেন। জীমূতবাহন অন্তত তিনখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—কালবিবেক, ব্যবহারমাতৃকা এবং দায়ভাগ। কালবিবেক-গ্রন্থ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা পূজানুষ্ঠান, শুভকর্ম, আচার, ধর্মোৎসব প্রভৃতি পালনের শুভাশুভ কাল, সৌরমাস, চান্দ্রমাস প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা। এ-সম্বন্ধে জীমূতবাহন পূর্ববর্তী অসংখ্য লেখকের রচনা উদ্ধার ও আলোচনা করিয়া নিজের মতামত্ ও যুক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ-গ্রন্থ সমসাময়িক কালে প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছিল, এবং রঘুনন্দন, শূলপাণি, বাচস্পতি, গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি সকলেই সশ্রদ্ধভাবে তাঁহার যুক্তি ও মতামত্ উদ্ধার ও স্বীকার করিয়াছেন। ব্যবহারমাতৃকা-গ্রন্থ ব্রাহ্মণ্যাদর্শানুযায়ী বিচারপদ্ধতির আলোচনা; গ্রন্থের পাঁচটি বিভাগ—ব্যবহারমুখ, ভাষাপাদ, উত্তরপাদ, ক্রিয়াপাদ এবং নির্ণয়পাদ। ব্যবহারের সংজ্ঞা, প্রাড বিবাক বা বিচারকের গুণাগুণ ও কর্তব্য, নানা প্রকার ও স্তরের ধর্মাধিকরণ, ধর্মাধিকরণ-সভ্যদের কর্তব্য, বিচারার্থীর আবেদন বা পূর্বপক্ষ, প্রতিভূ বা জামীন, প্রত্যর্থীদের চার প্রকারের উত্তর বা জবাব, প্রমাণ বা ক্রিয়া, মানুষী ও দৈবী নানা প্রকারের সাক্ষ্য, বিচার ও বিচারফল প্রভৃতি সমস্তই পূর্বোক্ত পাচভাগ জুড়িয়া আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থেও জীমূতবাহন পূর্বগামী পণ্ডিতদের প্রচুর বচন ও মতামত্ উদ্ধার ও নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন। জীমূতবাহনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ দায়ভাগ, এবং এই গ্রন্থ আজও মিতাক্ষরা-বহির্ভূত হিন্দুসমাজে দায় বা উত্তরাধিকার, সম্পত্তি-বিভাগ এবং স্ত্রী-ধন সম্পর্কে একতম সুবিখ্যাত ও সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে জীমূতবাহন পূর্বগামী অসংখ্য শাস্ত্রকারদের যুক্তি ও মতামত উদ্ধার করিয়া

জীমূতবাহণ

অগাধ পাণ্ডিত্য এবং প্রখর বুদ্ধির সাহায্যে সে-সব আলোচনা ও খণ্ডন করিয়াছেন। দায়ভাগের টীকাকার অনেক; রঘুনন্দন বারবার তাঁহার গ্রন্থে দায়ভাগের যুক্তি ও মতামত গ্রহণ করিয়াছেন। সন্দেহ নাই, দায়ভাগ সমসাময়িক কালেই যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। বাংলাদেশে তো আজও দায়ভাগ আলোচ্য বিষয়ে একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। জীমূতবাহন যে অদ্ভুত মনীষা ও পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, সুকুশলী নৈয়ায়িক ছিলেন, প্রখর ছিল তাঁহার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব, এ-তথ্য অনস্বীকার্য।

ধর্মাধ্যক্ষ বা ধর্মাধিকরণিক, বরেন্দ্রান্তর্গত চম্পাহট্টীয় মহামহোপাধ্যায় অনিরুদ্ধ, এবং বরেন্দ্রীবাসী বল্লাল-গুরু, বেদ, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রবিদ্ অনিরুদ্ধ একই ব্যক্তি, সন্দেহ নাই। বল্লালসেন ইঁহারই নিকট পুরাণ ও স্মৃতিশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং দানসাগর-গ্রন্থে ইঁহারই সশ্রদ্ধ উল্লেখ বর্তমান। অনিরুদ্ধের হারলতা এবং পিতৃদয়িত উভয়ই সুবিখ্যাত গ্রন্থ। অনিরুদ্ধ বাস করিতেন গঙ্গাতীরে বিহার-পাটকে। কুমারিল-ভট্টের মীমাংসা-সম্বন্ধীয় মতামতের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। হারলতা অশৌচ-সংক্রান্ত নানা বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা। পিতৃদয়িত সামবেদী গোভিল-পন্থীদের শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে নানা ক্রিয়াকর্মের বর্ণনা। আচমন, দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যা, পিতৃতর্পণ, বৈশ্বদেবতর্পণ, পার্বণশ্রাদ্ধ, দানস্তুতি প্রভৃতি কিছুই বাদ পড়ে নাই। রঘুনন্দন এই দুই গ্রন্থেরই বিস্তৃত ব্যবহার করিয়াছেন।

অনিরুদ্ধ

অনিরুদ্ধ-শিষ্য সেন-রাজ বল্লালসেন অন্তত চারখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর এবং অদ্ভুতসাগর। দানসাগরে প্রথম দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে; আচারসাগরের কিছু কিছু উদ্ধৃতি আছে বেদাচার্যের স্মৃতিরত্নাকর এবং বিশ্বেশ্বর-ভট্টের মদনপারিজাত গ্রন্থদ্বয়ে। কিন্তু আচারসাগর ও প্রতিষ্ঠাসাগর গ্রন্থ আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই। দানসাগর রচিত হইয়াছিল গুরু অনিরুদ্ধের শিক্ষার অনুপ্রেরণায়, এ-কথা বল্লালসেন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু রঘুনন্দন বলিতেছেন, গ্রন্থটি অনিরুদ্ধ-ভট্টের নিজের রচনা। গ্রন্থটিতে ৭০টি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের দান, দানপুণ্য, দানের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা, স্থান-কাল-পাত্র, কুদান, নিষিদ্ধদান, দানকরণ এবং দানগ্রহণের রীতি, ক্রম ও পদ্ধতি, ষোড়শ মহাদান, অসংখ্য ক্ষুদ্র দান প্রভৃতি সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা আছে; এ-বিষয়ে অন্যান্য নানা গ্রন্থ এবং সাধারণ সমস্ত পুরাণের উল্লেখও আছে। অদ্ভুতসাগর নানা শুভাশুভলক্ষণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ; তিনটি ভাগে গ্রহতারা, রামধনু, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়, ভূমিকম্প অর্থাৎ আকাশী, বায়বীয় এবং ভৌতিক নানা ইঙ্গিত ও লক্ষণের আলোচনা। অদ্ভুতসাগর বল্লালসেন সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই; এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি সমাপন করিয়াছিলেন পুত্র লক্ষ্মণসেন পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাক্রমে। গ্রন্থটির রচনা আরম্ভ হইয়াছিল ১০৮৯ শকে (১১৬৮ খ্রীষ্ট বৎসরে)।

বল্লালসেন

দামুক-পুত্র গুণবিষ্ণু হয় বাঙালী ছিলেন না হয় মৈথিলী। হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণসর্বস্ব-গ্রন্থে গুণবিষ্ণুর ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য-গ্রন্থ প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন; কাজেই গুণবিষ্ণু হলায়ুধের পূর্বগামী। ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য সামবেদীয় গৃহ্যসূত্রের প্রায় ৪০০ মন্ত্রের সুবিস্তৃত টীকা। আটটি ভাগে গুণবিষ্ণু গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া সমাবর্তন, বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত প্রধান প্রধান সংস্কারগুলির আলোচনা করিয়াছেন; স্নান, সন্ধ্যা, পিতৃতর্পণ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতির আলোচনাও আছে; তাহা ছাড়া পুরুষসূক্তের একটি টীকাও আছে। গুণবিষ্ণু ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণ বা মন্ত্রব্রাহ্মণ-গ্রন্থের একটি টীকা এবং পারস্কর-গৃহ্যসূত্রের একটি টীকাও রচনা করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতকে সায়নাচার্য গুণবিষ্ণুর নাম করেন নাই, কিন্তু ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্য হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি গ্রহণ করিয়াছেন।

গুণবিষ্ণু

প্রথম যৌবনে রাজপণ্ডিত, পরিণত যৌবনে লক্ষ্মণসেনের মহামাত্য, এবং প্রৌঢ়বয়সে লক্ষ্মণসেনেরই ধর্মাধ্যক্ষ বা ধর্মাধিকারী, আবস্থিক, মহাধর্মাধ্যক্ষ (বা মহাধর্মাধিকৃত বা ধর্মাগারাধিকারী) হলায়ুধও ছিলেন এ-যুগের অন্যতম যুগন্ধর পণ্ডিত এবং প্রভাবশালী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। তাঁহার পিতা ধনঞ্জয় ছিলেন বৎস-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, মাতা উজ্জ্বলা। ধনঞ্জয় ছিলেন ধর্মাধ্যক্ষ। হলায়ুধের দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ঈশান ও পশুপতি; ঈশান আহ্নিক-পদ্ধতি নামে একটি গ্রন্থ এবং পশুপতি শ্রাদ্ধপদ্ধতি ও পাকযজ্ঞ নামে দুইখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঈশান এবং পশুপতির তিনটি গ্রন্থই বিলুপ্ত; তবে জনৈক রাজপণ্ডিত পশুপতি-রচিত শুক্লযজুর্বেদীয় কাণ্বশাখানুসারী গৃহ্যানুষ্ঠানাদি সম্পর্কিত দশকর্মপদ্ধতি নামে একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান। ধনঞ্জয়পুত্র পশুপতি এবং রাজপণ্ডিত পশুপতি এক এবং অভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়।

হলায়ুধ

ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব এবং পণ্ডিতসর্বস্ব নামে অন্তত পাঁচখানা গ্রন্থ হলায়ুধ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণসর্বস্ব ছাড়া আর বাকী চারিটি গ্রন্থই বিলুপ্ত। শেষোক্ত দু'টি গ্রন্থের উল্লেখ ও কিছু আলোচনা রঘুনন্দন করিয়াছেন। হলায়ুধ নিজেই বলিতেছেন, রাঢ় এবং বরেন্দ্রের ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ করিতেন না, এবং সেই হেতু বৈদিক ক্রিয়াকর্মের যথাযথ নিয়মও জানিতেন না। সেই জন্যই তিনি ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, প্রধানত শুক্ল-যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদের নিত্যকর্ম ও গৃহ্যসূত্রীয় সংস্কারাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য। বৈদিক মন্ত্রভাষ্য রচনাই এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এবং মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া হলায়ুধ প্রাতকৃত্য, পূজা, অতিথিসেবা, বেদপাঠ, পিতৃতর্পণ, দশসংস্কারাচার প্রভৃতি সমস্তই আলোচনা করিয়াছেন। এই কাজে কাত্যায়নের ছান্দোগ্যপরিশিষ্ট এবং পারস্করের গৃহ্যসূত্র তিনি প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; এবং প্রকাশ্যে ঋণ স্বীকার করিয়াছেন উবট এবং গুণবিষ্ণুর।

আগেই বলিয়াছি, এই পর্বে গভীর মননের কোনো নিদর্শন বাংলাদেশে নাই,

সেই হেতু দর্শনগ্রন্থ রচনার চেষ্টাও নাই। তবে ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থ রচনার কিছুটা চেষ্টা হইয়াছিল, এবং রচয়িতাদের মধ্যে আর কেহ বাঙালী হউন বা না হউন, এক আর্তিহরপুত্র বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দই সকলের মুখোজ্জল করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথা বলিবার আগে বৈয়াকরণিক পুরুষোত্তমদেব এবং কোষকার পুরুষোত্তম সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিতেই হয়। এই দুই পুরুষোত্তম এক এবং অভিন্ন কিনা, নিঃসংশয়ে কিছু বলা কঠিন। ইহাদের দুইজনই বৌদ্ধ ছিলেন, নাম ছিল এক, এবং সমসাময়িককালে জীবিত ছিলেন, শুধু এই সব কারণে দুইজনকে এক এবং অভিন্ন বলা চলে কিনা সন্দেহ। সপ্তদশ শতকে সৃষ্টিধর নামে জনৈক বৈয়াকরণিক পুরুষোত্তমদেব-রচিত ভাষাবৃত্তি-গ্রন্থের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই টীকায় সৃষ্টিধর বলিতেছেন, পুরুষোত্তমদেব রাজা লক্ষ্মণসেনের নির্দেশে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই নির্দেশে ও অনুরোধে পুরুষোত্তম তাঁহার গ্রন্থে বৈদিক ব্যাকরণ আলোচনা করেন নাই। বেদানুরক্ত, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক লক্ষ্মণসেন কেন যে বৈদিক ব্যাকরণসূত্রগুলি বাদ দিতে বলিবেন, তাহা বুঝা কঠিন। তাহা ছাড়া, বৌদ্ধ পুরুষোত্তম বৈদিক ব্যাকরণ বাদ দিতে গিয়া বৌদ্ধরীতিই অনুসরণ করিয়াছেন; বৌদ্ধেরা তো এমনিতেই বৈদিক ব্যাকরণের সূত্র মানিতেন না; তাহার জন্য লক্ষ্মণসেনের অনুরোধের প্রয়োজন হইবে কেন? ১১৫৯ খ্রীষ্ট বৎসরে সর্বানন্দ পুরুষোত্তমের ভাষাবৃত্তির উল্লেখ যদি করিয়াই থাকেন, তবু সন্দেহ থাকিয়াই যায়; কারণ, প্রথমত উল্লেখটাই নির্ভরযোগ্য নয়, দ্বিতীয়ত ১১৫৯-এ লক্ষ্মণসেন হয়তো সিংহাসনই আরোহণ করেন নাই! কাজেই লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে তথা বাংলাদেশের সঙ্গে পুরুষোত্তমের সম্বন্ধ সন্দেহাতীত নয়। পুরুষোত্তমদেব যে একাদশ বা দ্বাদশ শতকের লোক তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

পুরুষোত্তমদেব

কোষকার পুরুষোত্তমের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ত্রিকাণ্ডশেষ বিখ্যাত অমরকোষের সম্পূরক; অমর যাহা বাদ দিয়া গিয়াছেন পুরুষোত্তম তাহাই পূরণ করিয়াছেন। তিনি আরও অন্তত তিন খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—হারাবলি, বর্ণদেশনা ও দ্বিরূপকোষ। হারাবলি ২৭৮টি শ্লোকে সাধারণত অব্যবহৃত প্রতিশব্দ ও সমশব্দের সংগ্রহ। বর্ণদেশনা গদ্যে রচনা; যে-সব শব্দের বানানের রূপ নানা প্রকারের সেই সব শব্দের আলোচনা এই গ্রন্থে আছে, বিশেষভাবে গৌড়ীয় লিপিরূপের জন্য যে-সব বানানে নানা রকমের গোলমাল সেই সব শব্দের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। দ্বিরূপকোষে ৭৫টি শ্লোকে এমন সব শব্দের একটি তালিকা আছে যাহাদের বানানের দুইটি রূপ।

পুরুষোত্তম

একাদশ শতকের শেষভাগে বৈয়াকরণিক ক্ষীরস্বামী তাঁহার অমরকোষের টীকায় অনেকবারই জনৈক গৌড়ীয় বৈয়াকরণিকের উল্লেখ করিয়াছেন, কয়েকবার গৌড়ীয় বৈয়াকরণিক এক গোষ্ঠীর উল্লেখও যেন করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈয়াকরণিকটি যে কে, কিংবা গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরাই বা কাহারা, কিছুই বলিবার উপায় নাই।

আর্তিপুর পুত্র বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের প্রতিষ্ঠার নির্ভর টীকাসর্বস্ব নামক অমরকোষের টীকার উপর। এই গ্রন্থ বাংলার গৌরব, এবং সুপ্রচুর বাংলা দেশি শব্দের সর্বপ্রাচীন সংগ্রহ। বৃহস্পতি রায়মুকুটের পদচন্দ্রিকা (১৪৩১ খ্রীষ্ট বৎসর) নামক অমরকোষের টীকায় টীকাসর্বস্ব হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি আছে; কিন্তু এ-পর্যন্ত টীকাসর্বস্বের একটি পাণ্ডুলিপিও বাংলাদেশে পাওয়া যায় নাই, পাওয়া গিয়াছে দক্ষিণ-ভারতে। সর্বানন্দ নিজেই বলিতেছেন, ১০৮১ শকাব্দে ১১৫৯-৬০ খ্রীষ্ট শতকে তাঁহার গ্রন্থ-রচনা চলিতেছিল।

সর্বানন্দ

লক্ষ্যণীয় এই, এই পর্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনা একান্ত ভাবেই শিক্ষিত উচ্চ বর্ণস্তরে আবদ্ধ। ধর্মশাস্ত্রগুলির দৃষ্টি-পরিধির মধ্যে তো দ্বিজবর্ণ ছাড়া আর কাহারও স্থানই নাই। ব্যাকরণ এবং কোষগ্রন্থগুলিতে মোটামুটি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-দীক্ষারই প্রতিফলন। এই শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা, পাঠক্রম, রীতিপদ্ধতি এই পর্বে কিরূপ ছিল তাহা বলিবার মত উপাদান আমাদের নাই। বৌদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার যে পার্থক্য তাহা তো ছিলই; অর্থাৎ বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল বৌদ্ধ সংঘ ও বিহার এবং সেখানে শিক্ষাটা হইতে সংঘবদ্ধ ভাবে; ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ছিল একক ও ব্যক্তিক এবং সে-শিক্ষার কেন্দ্র ছিল গুরুগৃহ। সেই গৃহে দ্বিজবর্ণ এবং উচ্চতর বর্ণস্তরের শিক্ষার্থী ছাড়া আর কাহারও স্থান ছিল না। তাহা ছাড়া, এই পর্বের গুরুগৃহে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিষয়ও ছিল সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। লিপি-প্রমাণ ও সমসাময়িক সাহিত্যে যে-সব বিষয়ের উল্লেখ পাইতেছি তাহা মীমাংসা, স্মৃতি, গৃহ্যসূত্র, ব্যাকরণ ও ফলসংহিতা-জ্যোতিষেই যেন সীমাবদ্ধ। যে-ন্যায়শাস্ত্রে বাংলা দেশের প্রতিষ্ঠা তাহাও এই পর্বে গড়িয়া ওঠে নাই। শস্ত্রবেদ, আয়ুর্বেদ, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখও কোথাও দেখিতেছি না। দর্শন-শাস্ত্রের গভীর গহনে আত্মস্থ হইবার সাহস তো নাইই। এই সব কারণেই বোধ হয় সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টি-পরিধিই সংকীর্ণ হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল; সৃষ্টির প্রেরণাও ছিল দুর্বল। সমস্ত মনন যেন শুধু টীকা ও টিপ্পনীর বন্ধ্যা বন্ধনে শৃঙ্খলিত!

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই অবস্থায় শিক্ষিত উচ্চ বর্ণস্তরের চিত্ত মুক্তি পাইতে চায় কবি-কল্পনার অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর ক্ষেত্রে। এই পর্বের শিক্ষিত সমাজে তাহাই হইয়াছিল, এবং তাহা প্রধানত রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়া। সেন-রাজারা সকলেই, বিশেষভাবে বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেন পরম বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, নিজেরা কবি ছিলেন এবং কবিজনের সমাদরও করিতেন। কবি ধোয়ী লক্ষ্মণসেনকে বলিয়াছেন বাংলার বিক্রমাদিত্য। তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিতেন অন্তত পাঁচজন সৃষ্টিধর কবি—গোবর্ধন বা গোবর্ধনাচার্য, শরণ, জয়দেব, উমাপতি-ধর এবং কবিরাজ। কবিরাজ বোধ হয় বলা হইত ধোয়ী কবিকে, কারণ জয়দেব ধোয়ীকেই বলিয়াছেন কবি ক্ষমাপতি, এবং ধোয়ী নিজেও তাঁহার পবনদূত-কাব্যে নিজকে ঐ বিশেষণে বিশেষিত এবং কবিরাজ আখ্যায় আখ্যাত

করিয়াছেন। এই পাঁচজন ছাড়াও সমসাময়িক কাব্য সংকলনগ্রন্থ সদুক্তিকর্ণামৃতে আরও অনেক বাঙালী কবির সংবাদ এবং তাঁহাদের কাব্যনিদর্শন পাওয়া যায়। বস্তুত, সংস্কৃত গীতিকাব্যে এই পর্বের বাঙালী কবিদের দান শুধু সংখ্যা-সমৃদ্ধিতেই উল্লেখযোগ্য নয়, কাব্য-সমৃদ্ধিতেও গৌরবের দাবি রাখে। তবু, স্বীকার করিতেই হয়, এ-পর্বের সমস্ত কাব্যই, এমন কি গীতগোবিন্দও ক্ষীণাত্মা ও অল্পপ্রাণ; ইহাদের মাধুর্য আছে শক্তি নাই, সুর আছে তেজ নাই; দাহ আছে দীপ্তি নাই, সহজ সৌন্দর্য আছে, ভাবের ও দৃষ্টির গভীরতা নাই। যে কবি-কল্পনার পশ্চাতে সবল ও গভীর মননের প্রেরণা নাই, বিস্তৃত জীবনের সাধনা নাই তাহার প্রকৃতি সর্বদেশে সর্বকালেই এইরূপ।

সদ্যোক্ত কবিদের কথা বলিবার আগে নৈষধচরিত রচয়িতা শ্রীহর্ষ, বেণীসংহার রচয়িতা ভট্ট-নারায়ণ এবং অনর্ঘরাঘব রচয়িতা মুরারী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া লইতে হয়।

নৈষধচরিত-কাব্য রচয়িতা শ্রীহর্ষ বাঙালী কিনা এই লইয়া পণ্ডিত মহলে প্রচুর বিতণ্ডা বিদ্যমান। বাঙালী কুলপঞ্জিকাকারদের মতে শ্রীহর্ষের পিতার নাম মেধাতিথি বা তিথিমেধা, কিন্তু যথার্থত তাঁহার পিতা ছিলেন শ্রীহীর এবং মাতা ছিলেন মামল্লদেবী। নৈষধ-চরিতের সপ্তম সর্গের ১১০ সংখ্যক শ্লোকে জানা যায়, শ্রীহর্ষ অনুল্লিখিত নাম জনৈক গৌড়রাজ সম্বন্ধে একটি প্রশস্তি-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; ষোড়শ সর্গের ১৩১ সংখ্যক শ্লোকে দেখিতেছি, তাঁহার প্রতিভার সমাদর করিয়াছিলেন কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা; আবার দ্বাবিংশতম সর্গের ২৬ সংখ্যক শ্লোকে জানা যাইতেছে, কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন তাঁহার পৃষ্ঠপোষক। নৈষধ-চরিতের একজন অর্বাচীন টীকাকার বাঙালী গোপীনাথ আচার্য তাহার হর্ষহৃদয় নামীয় টীকায় বলিতেছেন, শ্রীহর্ষের উল্লিখিত বিজয়প্রশস্তি-কাব্যটি সেন-রাজ বিজয়সেন সম্বন্ধে। তেমনই আবার অন্যদিকে চাণ্ডুপণ্ডিত ও অন্যান্য টীকাকারেরা এবং রাজশেখর সুরি তাঁহার প্রবন্ধচিন্তামণি-গ্রন্থে বলিতেছেন, যে-কান্যকুব্জরাজ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁহার নাম জয়চন্দ্র। জয়চন্দ্র যাঁহার পৃষ্ঠপোষক কিংবা কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা যাঁহার অনুরক্ত, বিজয়সেন-সম্বন্ধে প্রশস্তি-রচনায় তাঁহার কোনো বাধা থাকিবার কথা নয়। ইতিহাসগত বাধাও কিছু নাই। কাব্যটি আগাগোড়া গৌড়ী-রীতিতে রচিত; সর্বত্র অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি; শ-ষ-স লইয়া ধ্বনিসাম্য-অর্থবৈষম্যের খেলা, বাঙালী সুলভ দন্ত্য 'ন' এবং মূর্দ্ধ্য 'ণ', বর্গীয় 'ব' এবং অন্তঃস্থ 'ব', বর্গীয় 'জ' এবং অন্তঃস্থ 'য' প্রভৃতির একই মূল্য দান, সামাজিক বিবাহ-ভোজে ভাত এবং মাছ খাওয়া; ব্যঞ্জনে দই ও সরিষার ব্যবহার, দুগ্ধপক্ক বটক (বা বড়া পিঠে) খাওয়া, ভোজে বসিয়া বরযাত্রীদের ব্যবহারের নানা খুঁটিনাটি, বিবাহে উলুলু ধ্বনি, শঙ্খবলয় ও সীমন্তে সিদুঁর ব্যবহার, মঙ্গলানুষ্ঠানে আল্পনা আঁকা, বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলগীত গাওয়া, দরজার দুই ধারে কদলী বৃক্ষরোপণ, বিবাহে গাঁটছড়া বাঁধা, বিবাহ সংক্রান্ত নানা স্ত্রী-আচার, বাসরঘরে চুরি করিয়া দেখা বা আড়ি পাতিয়া শোনা, প্রভৃতি যুক্তি একত্র করিলে শ্রীহর্ষকে বাঙালী বলিয়াই

শ্রীহর্ষ
নৈষধচরিত

তো মনে হয়। টীকাকারেরা সকলেই তাঁহাকে গৌড়ীয় অর্থাৎ বাঙালী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু বাঙালী হইলেও তাহার নৈষধ-চরিত কাব্য লইয়া গর্ব করিবার কিছু নাই। শ্রীহর্ষ দাবি করিয়াছেন 'কবিকুলের অজ্ঞাত অদৃষ্ট পথের তিনি পথিক!' এত বড় দাবি এ-কাব্য সম্বন্ধে করা চলে না। মহাভারতের নল-দময়ন্তীর মধুর কাহিনীটির একাংশ মাত্র নানা অবান্তর বর্ণনায় অলংকৃত করিয়া বাইশটি সুদীর্ঘ সর্গে এমন একটি জটিল মহাকাব্য তিনি রচনা করিয়াছেন যাহা ছন্দ, অলংকার এবং পাণ্ডিত্যের গৌরবে ভারাক্রান্ত, কিন্তু যথার্থ কাব্যমূল্যে দরিদ্র ও দুর্বল। কোনো সূক্ষ্ম উচ্চস্তরের কল্পনা বা গভীর জীবনদর্শন এই কাব্যকে মহিমান্বিত করে নাই। তবু, কেন যে নৈষধচরিত প্রাচীন ভারতের পাঁচটি মহাকাব্যের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহা বলা কঠিন!

নৈষধ-চরিত ছাড়া শ্রীহর্ষ আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহার উল্লেখ নৈষধ-চরিতেই আছে: নবসাহসাংক-চরিত, স্থৈর্যবিচার-প্রকরণ, অর্ণব-বর্ণনা, শিবশক্তিসিদ্ধি, ছিন্দ-প্রশস্তি ও শ্রীবিজয়-প্রশস্তি। খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য নামে দর্শনের উপরও তিনি একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বাঙালীর ঐতিহ্য বেণীসংহার-রচয়িতা শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্ট-নারায়ণকেও বাঙালী বলিয়া দাবি করে; আদিশূর-প্রবর্তিত এবং কনৌজাগত পঞ্চব্রাহ্মণের তিনি নাকি অন্যতম। এ-তথ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। অন্তত ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু নাই। মৌদ্গল্য-গোত্রীয় বর্ধমানাঙ্কপুত্র, অনর্ঘরাঘব-রচয়িতা মুরারী-মিশ্রকেও অনেকে বাঙালী বলিয়া মনে করেন; টীকাকার প্রেমচন্দ্র-তর্কবাগীশ তো তাহাই বলিতেছেন। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে উৎসবাভিনয়ের জন্য অনর্ঘরাঘব রচিত হইয়াছিল।

একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের বাংলাদেশে নাট্য-রচনার যথেষ্ট প্রাচুর্য ছিল বলিয়া মনে হয়। এবং ইহাদের অধিকাংশই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ প্রভৃতির কাহিনী লইয়া রচিত হইয়াছিল। ১৪৩১ খ্রীষ্ট বৎসরের আগে সাগরনন্দী-রচিত ("মুকুটেশ্বর নন্দিবংশ ব্যোমাঙ্গনৈকশশী") নাটকলক্ষণরত্নকোশ-গ্রন্থে বহু বাঙালী নাট্যকারের নাট্যরচনার উল্লেখ আছে। কয়েকটি নাম উল্লেখ করিতেছি:—কীচকভীম, প্রতিজ্ঞাভীম, শর্মিষ্ঠা-পরিণয়, রাধা, সত্যভামা, কেলি-রৈবতক, উষাহরণ, দেবী-মহাদেব, উর্বশী-মর্দন, নলবিজয়, মায়া-মদালসা, উন্মত্ত চন্দ্রগুপ্ত, মায়া-কাপালিক, মায়া-শকুন্ত, মদনিকা-কামুক, জানকী-রাঘব, রামানন্দ, কেকয়ী-ভরত, অযোধ্যা-ভরত, বালিবধ, রামবিক্রম, মারীচ-বঞ্চিতক, ইত্যাদি।

সমসাময়িক বাংলাদেশের কবিমনের সম্পূর্ণ পরিচয় নৈষধ-চরিতে নাই, এমন কি ধোয়ীকবি-রচিত পবনদূতেও নয়। প্রাচীনতম বাংলায় বা শৌরসেনী অপভ্রংশের স্থানীয় রূপে যে স্বল্প কবিতা ও গান এই দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও সে-পরিচয় পাইবার কথা নয়; কারণ এই সব কবিতা ও গান রচিত হইয়াছিল ধর্মের

প্রেরণায়, কাব্যের প্রেরণায় নয়। তাহা ছাড়া, রচয়িতারা সকলেই কিছু শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান লোক ছিলেন না। তাঁহাদের সমাজ-প্রকৃতি ছিল গণতান্ত্রিক এবং প্রাণপ্রবাহ ছিল লোকায়ত, সন্দেহ নাই; কিন্তু মন ও বুদ্ধি শিক্ষাশাসন দ্বারা যথেষ্ট মার্জিত ছিল না, চিত্ত ছিল না কল্পনায় উজ্জ্বল। সেইজন্য কল্পনোজ্জ্বল শিক্ষিত মনের পরিচয় শৌরসেনী অপভ্রংশ বা প্রাচীনতম বাংলা পদগুলিতে বড় একটা পাওয়া যায় না; তাহা পাওয়া যায় বাংলার কবিদের সংস্কৃত ভাষায় কাব্য-রচনার মধ্যে, এবং বিশেষভাবে যে-কাব্য রচিত হইয়াছিল রাজসভার আলোকমালার আড়ালে।

কাব্য ও কবিতা

ব্রাহ্মণ্য পণ্ডিত-সমাজের বাহিরেও কাব্য-সাহিত্যের রসিক একটি শ্রেণী ছিল, এবং পুরা একখানা কাব্য বা প্রকীর্ণ শ্লোক যে সংস্কৃতে রচিত হইত তাহা শুধু পণ্ডিত-সমাজের জন্যই নয়, বরং এই বৃহত্তর রসিক শ্রেণীটিকে উদ্দেশ্য করিয়াই। প্রধানত এই শিক্ষিত রসিক শ্রেণীটির জন্যই বোধ হয় বাংলাদেশে সর্ব প্রথম সরস শ্লোক-সংগ্রহ বা কবিতা-চয়নিকা সংকলন করিবার একটা সজাগ প্রয়াস দেখা দেয়। অন্তত, সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে কয়েকটি কবিতা-সংগ্রহ সুপরিচিত তাহার মধ্যে সর্বপ্রাচীন দু'টি সংগ্রহই বাংলাদেশে বাঙালী সংকলন-কর্তাদ্বারা সংকলিত ও সম্পাদিত —সে দু'টি কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় এবং সদুক্তিকর্ণামৃত। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের কথা আগের পর্বেই বলিয়াছি; বইখানা বোধ হয় একাদশ শতকের শেষ পর্বের সংকলন।

সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থখানা সংকলিত হয় ১২০৬ খ্রীষ্ট বৎসরে (১১২৭ শকাব্দ), বোধ হয় কেশবসেনের রাজত্বকালে। গ্রন্থের পুষ্পিকা শ্লোকে যেন কেশবসেনের নামোল্লেখ আছে। সংকলয়িতা শ্রীধরদাসের পিতা শ্রীবটুদাস লক্ষ্মণসেনের প্রতিরাজ বা লেখক এবং অন্যতম মহাসামন্ত ছিলেন। বটুদাস লক্ষ্মণসেনের 'অনুপম প্রেমের একমাত্র পাত্র' এবং 'সখা' ছিলেন। শ্রীধরদাস নিজে কবি ছিলেন কিনা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু তাঁহার সংকলিত শ্লোক-সংগ্রহ এবং শ্রেণীবিভাগ বিশ্লেষণ করিলে এ-তথ্য অস্বীকার করা যায় না যে, তিনি একজন বিদগ্ধ কাব্যরসিক ও সাহিত্যবোদ্ধা ছিলেন। এই গ্রন্থ পাঁচটি প্রবাহ বা অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক প্রবাহে কয়েকটি করিয়া 'বীচি' বা তরঙ্গ বা শ্রেণী, এবং প্রত্যেক বীচিতে পাঁচটি করিয়া শ্লোক; প্রত্যেক শ্লোকের শেষে সংকলয়িতার নাম দেওয়া আছে; যে-সব ক্ষেত্রে নাম শ্রীধরদাসের অজ্ঞাত ছিল সে-সব ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে 'কস্যচিৎ'। প্রথম অমরবাদের প্রবাহে ৯৫টি বীচিতে নানা দেবতার লীলাবিষয়ক ৪৭৫টি শ্লোক; দ্বিতীয় শৃঙ্গার প্রবাহে ১৭৯টি বীচির ৮৯৫টি শ্লোকে প্রেম, নায়ক-নায়িকা, প্রেমের নানা ভাব ও অবস্থা, বিভিন্ন ঋতু ও প্রকৃতির নানা অবস্থার সরস বর্ণনা; তৃতীয় চাটুপ্রবাহে ৫৪টি বীচির ২৭০টি শ্লোকে রাজার স্তুতি, বীরের বীর্য, যুদ্ধ, সেনা, শত্রু, তূর্যধ্বনি, কীর্তি ইত্যাদির বর্ণনা বা প্রশংসা; চতুর্থ অপদেশ প্রবাহে ৭২টি বীচির ৩৬০টি শ্লোকে দেবতাদের দোষগুণ, পার্থিব সংসার, গাছলতাপাতা, পশুপক্ষী ইত্যাদির

সদুক্তিকর্ণামৃত

বর্ণনা ; এবং পঞ্চম উচ্চাবচ প্রবাহে ৭৪টি বীচির ৩৭০টি শ্লোকে গরু, ঘোড়া, মানুষ, পাখী, দেশ, কবি, স্থান, গুণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে নানা বর্ণনার ছড়াছড়ি। গ্রন্থটিতে সর্বসুদ্ধ ৪৮৫ জন বিভিন্ন কবির রচনার নমুনা আছে ; ইহাদের মধ্যে পাণিনি, ভাস, ভারবি, কালিদাস, ভামহ, অমরু, বাণভট্ট, বিহ্লন, ভর্তৃহরি, মুঞ্জ, রাজশেখর, বাক্‌পতিরাজ, বিশাখদত্ত প্রভৃতি সর্বভারতীয় কবির রচনা যেমন আছে, তেমনই আছে অসংখ্য বাঙালী কবির রচনা। বস্তুত, কবিদের নামের রূপ দেখিয়া মনে হয়, অর্ধেকেরও উপর বোধ হয় শ্রীধর দাসের সমসাময়িক অথবা কিছু আগেকার গৌড়-বঙ্গীয় কবিকুলের রচনা। সুকুমার সেন মহাশয় এই বাঙালী কবিকুলের সুদীর্ঘ নাম-তালিকা চয়ন করিয়াছেন।

সমসাময়িক বাংলাদেশের সাহিত্যিক আবহাওয়ার চমৎকার নিদর্শন এই গৌড়-বঙ্গীয় কবিদের প্রকীর্ণ শ্লোকগুলি। এই আবহাওয়া রাজসভায় রচিত স্তুতি-প্রশস্তিতে বা কাব্যে নাই। জয়দেব যে যুদ্ধ ও বীররসের কবিতা এবং মহাদেবের বন্দনা শ্লোক রচনা করিতেন, গীতগোবিন্দে সে-পরিচয় পাইবার সুযোগ নাই, অথচ সদুক্তিকর্ণামৃতে সে-পরিচয় পাইতেছি। সে-রাজসভায় যে নানা সমস্যাপূরণ লইয়া শ্লোক-রচনার প্রতিযোগীতা খেলা চলিত এ-ইঙ্গিতও পাইতেছি এই গ্রন্থের কিছু প্রকীর্ণ শ্লোকে, এবং এই সব শ্লোকাশ্রয়েই জানিতেছি যে, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন, শরণ ও জয়দেব পাল্লা দিয়া রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করিতেন। জয়দেব-রচিত মহাদেব স্তুতি-বিষয়ক শ্লোকটি দেখিয়া মনে হয়, তিনি শুধু রাধাকৃষ্ণের লাস্যলীলার কবি ছিলেন না, এমন কি আমাদের প্রচলিত ধারণার বৈষ্ণব সাধক-মহাজনও ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিদ্যাপতির মত পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ, এবং তাঁহার জীবনে যুদ্ধ ও বীররসের স্পর্শও লাগিয়াছিল। কবি শরণ বা উমাপতি-ধরও শুধু বিজয়সেন ও লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তি ও স্তুতিশ্লোক লিখিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করেন নাই ; রাজসভার বাহিরে বসিয়া লোকায়ত জীবনের নানা প্রকীর্ণ শ্লোকও রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনের ১১টি, কেশবসেনের ১০টি এবং হলায়ুধেরও ৫টি শ্লোক আছে।

সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের নানা শ্লোক এই গ্রন্থের নানা অধ্যায়ে নানা প্রসঙ্গে উদ্ধার ও ব্যবহার করিয়াছি। এই শ্লোকগুলি নানা দিক দিয়া সমসাময়িক বাংলাদেশের নানা পরিচয় বহন করে ; তাহা ছাড়া, সমসাময়িক সাহিত্যিক আবহাওয়ার স্পর্শও ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। ভবিষ্যত্ বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির কিছু কিছু আভাসও ইহাদের গর্ভেই নিহিত। একটি অজ্ঞাতনামা কবি (খুব সম্ভব বাঙালী) বিবাহকালে গৌরীর বর্ণনা দিতেছেন—

ব্রহ্মায়ং—বিষ্ণুরেষ—ত্রিদশপতিরসৌ—লোকপালাস্তথৈতে ;
জামাতা কোঽত্র ? যোঽসৌ ভুজগপরিবৃতো ভস্মরূক্ষ কপালী।
হা বৎসে ! বঞ্চিতাসীত্যনভিমতবর প্রার্থনাব্রীড়িতাভির্
দেবীভিঃ শোচ্যমানাপ্যুপচিতপুলকা শ্রেয়সে বোঽস্তু গৌরী ॥

এই শ্লোকটিতে পার্বতীর বিবাহের যে-বর্ণনা এবং শিবের প্রতি যে মনোভাব তাহারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ ভাবে ভারতচন্দ্রে। কয়েকটি শ্লোকে দরিদ্র শিবের গৃহস্থালী বর্ণনা, শিশু কার্তিকেয়ের বেশভূষায় শিবের অনুকরণ, শিবের জটাজুট লইয়া খেলার বর্ণনা প্রভৃতি পড়িতে পড়িতে স্বতই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অনুরূপ ছবিগুলি মনে পড়িয়া যায়। এই শ্লোকগুলি তো বাঙালী কবিদেরই রচনা বলিয়া মনে হইতেছে; ভাবাত্মীয়তা একান্তই ঘনিষ্ঠ। কবি কুলশেখরের চারিটি হরিভক্তি সম্বন্ধীয় শ্লোকে এবং অজ্ঞাতনামা কোনো কবির একটি শ্লোকে চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণবের হৃদয়ধ্বনি যেন কানে আসিয়া প্রবেশ করে; সন্দেহ নাই, এই শ্লোক গুলির মধ্যে হরিভক্তির পূর্বাভাস দেখা যাইতেছে—সে যে আসে, আসে, আসে। এই গ্রন্থে জয়দেবের ৩১টি শ্লোক আছে; তন্মধ্যে ৫টি মাত্র গীতগোবিন্দের শ্লোক, কয়েকটি আছে প্রকীর্ণ শ্লোক, দু'একটি লক্ষ্মণসেনের স্তুতি-শ্লোক, বাকী সবগুলিই যুদ্ধ, শৌর্য-বীর্য, তূর্যনিনাদ, সংগ্রাম, কীর্তি প্রভৃতি সম্বন্ধীয়। সন্দেহ হয়, জয়দেব বীররসেরও একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এবং এই শ্লোকগুলি সেই কাব্যের; কিন্তু সে-কাব্য আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই। লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তিমূলক শ্লোকটি এইরূপ:

> লক্ষ্মীকেলি-ভুজঙ্গ। জঙ্গমহরে। সংকল্প কল্পদ্রুম।
> শ্রেয়ঃ সাধকসঙ্গ। সঙ্গরকলা-গাঙ্গেয়। বঙ্গপ্রিয়।
> গৌড়েন্দ্র। প্রতিরাজরাজক। সভালংকার। কারার্পিত—
> প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল। পালক সতাং। দৃষ্টোঽসি, তুষ্টা বয়ম॥

বোধ হয় এই শ্লোকটি কণ্ঠে লইয়াই জয়দেব কেন্দুবিল্ব হইতে নবদ্বীপে আসিয়া লক্ষ্মণসেনের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন! শৃঙ্গার-প্রবাহে উমাপতি-ধরের একটি সুন্দর কাব্যময় শ্লোক আছে; বনবিহার কালে একটি সুন্দরী নারী পায়ের আঙুলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উপরে গাছের ডাল হইতে ফুল পাড়িতেছেন, বাহুমূল ঊর্ধ্বে উত্তোলিত, ঊর্ধপ্রয়াসে স্তন ঈষদোন্মুক্ত, বসন ঈষদ্ব্যোয়ত হইয়া পড়ায় নাভিহ্রদ দেখা যাইতেছে—

> দূরোদঞ্চিত বাহুমূলবিলসৎপীন প্রকাশস্তনা
> তোগব্যায়ত মধ্যলম্বিবসনানির্ভুগ্নাভিহ্রদা।
> আকৃষ্টোজ্ঝিত-পুষ্পমঞ্জরিরজঃ পাতাবরুদ্ধেক্ষণা
> চিরত্যাঃ কুসুমং বিনোতি সুদৃশঃ পাদাগ্রবদ্ধাতনুঃ॥

এই সংকলনে শরণ, উমাপতি-ধর, জয়দেব, গোবর্ধনাচার্য, ধোয়ী-কবিরাজ, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন প্রভৃতিরা তো আছেনই, কিন্তু ইঁহাদের ছাড়া অগণিত গৌড়-বঙ্গীয় কবিদের সাক্ষাৎও পাইতেছি। জলচন্দ্র, যোগেশ্বর, বৈদ্য গঙ্গাধর, সাঙ্গাধর, বেতাল, ব্যাস-কবিরাজ, কেবট, পপীপ, (অনেক) বঙ্গাল, চন্দ্রচন্দ্র, গাঙোক, বিম্বোক, শুভাঙ্ক, অনেক অজ্ঞাতনামা কবি, ইঁহারা সকলেই ছিলেন সমসাময়িক বাংলার কবি, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার খুব কারণ নাই। বটুদাসের প্রশস্তিময় পাঁচটি শ্লোক যে-পাঁচজন কবির রচনা তাঁহারা সকলেই ছিলেন

সমসাময়িক বাঙালী, এ-তথ্যও সন্দেহ করা বোধ হয় চলে না; এই পাঁচজন হইতেছেন মধু, সাঙ্কাধর, বেতাল, উমাপতি-ধর এবং কবিরাজ-ব্যাস।

আর্তিহরপুত্র সর্বানন্দ দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে অমরকোষের যে টীকা রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে বাঙালী কবির রচনা হইতেও কিছু কিছু শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সাহিত্যকল্পতরু, দেবীশতক, বিদগ্ধমুখমণ্ডল, বৃন্দাবনযমক, বাসনামঞ্জরী (শ্রীপোব্যোক-রচিত) প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙালী কবির রচনা বলিয়াই তো মনে হয়। সর্বানন্দ নিজেও ছিলেন কবি, এবং তাঁহার টীকাসর্বস্বের প্রথম শ্লোকেই তিনি যে গোপাল-বন্দনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কবি-প্রতিভা কিছুটা প্রতিফলিত।

বর্হিণ বর্হাপীড়ঃ স্থবিরপয়ো বালবল্লবো গোষ্ঠে।
মেদুরমুদিরশ্যামলরুচিরব্যাদেব গোবিন্দঃ॥

এইবার সেন-রাজসভার পঞ্চরত্ন অর্থাৎ শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি-ধর এবং জয়দেবের কথা একটু বিশদভাবে পৃথক পৃথক করিয়া বলা যাইতে পারে।

শরণ

শরণ বা শরণদেবের ২০টি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে (বা সূক্তিকর্ণামৃতে) উদ্ধার করা হইয়াছে; তন্মধ্যে একটি শ্লোকে শরণ জনৈক সেন-বংশতিলকের রাজত্বে বাসের ইঙ্গিত দান করিয়াছেন; অপর একটি শ্লোকে গৌড়লক্ষ্মী-প্রসঙ্গে চেদি, কলিঙ্গ, কামরূপ এবং ম্লেচ্ছরাজের পরাজয়ের ইঙ্গিত আছে (এই শ্লোকটি রাজবৃত্ত-প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছি)। জয়দেব বলিতেছেন, "শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহ-দ্রুতে"—কবি শরণ দুরূহ ও দ্রুত শ্লোকবন্ধনে শ্লাঘ্য ও প্রশংসনীয়।

ধোয়ী-কবিরাজ

ধোয়ী(বা ধোই, ধোয়ীক, ধূয়ী)-কবিরাজ সম্বন্ধে জয়দেব বলিতেছেন, "বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবি-ক্ষমাপতিঃ"। ধোয়ী সাধারণত পবনদূত-কাব্যের রচয়িতা হিসাবেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কালিদাসের মেঘদূতের আদর্শে যত দূতকাব্য পরবর্তী কালে রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে পবনদূত প্রাচীনতম। মন্দাক্রান্তা ছন্দে ১০৪টি শ্লোকে ধোয়ী সুকৌশলে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক লক্ষ্মণসেনের স্তুতিবাদ করিয়াছেন। লক্ষ্মণসেন নাকি দক্ষিণ-দেশে গিয়াছিলেন; সেখানে কুবলয়বতী নাম্নী এক গন্ধর্ব কন্যা তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা হইয়াছিলেন। দক্ষিণা মলয়বায়ুকে দূত করিয়া বিরহিনী কুবলয়বতী লক্ষ্মণসেনের নিকট প্রেমবার্তা প্রেরণ করিতেছেন, ইহাই পবনদূতের বিষয়বস্তু। কাব্যটির মৌলিকত্ব বিশেষ কিছু নাই, ভাব-গভীরতার পরিচয়ও স্বল্পই, তবে কোনো কোনো শ্লোকের চিত্র-গরিমা এবং কল্পনার মাধুর্য চিত্তকে স্পর্শ করে। ধোয়ী নিজেই বলিতেছেন, পবনদূত ছাড়াও তিনি অন্য একাধিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে-সব কাব্য আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। তবে, সদুক্তিকর্ণামৃতে তাঁহার রচিত ২০টি শ্লোক আছে, এবং জহ্লণের সূক্তিমুক্তাবলীতে দুইটি শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে। এ-গুলি তাঁহার অন্যান্য কাব্যের প্রকীর্ণ শ্লোক হওয়া অসম্ভব নয়।

কবি উমাপতি-ধর বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তির রচয়িতা; বোধ হয় তিনি সেন-রাজসভার অন্যতম সভাকবি ছিলেন। এই প্রশস্তির চারিটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধার করা হইয়াছে। এই সংকলনে উমাপতি-ধরের নামেই আর একটি শ্লোক আছে যাহা লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-পট্টোলীতেও হুবহু একই রূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই কারণে মনে হয়, মাধাইনগর-লিপিটিরও রচয়িতা ছিলেন উমাপতি-ধর। মেরুতুঙ্গ তাঁহার প্রবন্ধচিন্তামণি-গ্রন্থে বলিতেছেন, উমাপতি-ধর লক্ষ্মণসেনের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। মনে হয়, বিজয়সেন হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মণসেন পর্যন্ত তিন পুরুষ ধরিয়া উমাপতি সেন-রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপ ছাড়িয়া পূর্ববঙ্গে পলায়নের পরও উমাপতি-ধর জীবিত ছিলেন এবং বিজয়ী ম্লেচ্ছরাজের সাধুবাদ করিয়া স্তুতিশ্লোকও রচনা করিয়াছিলেন! এই শ্লোকটি রাজবৃত্ত-প্রসঙ্গে উদ্ধার করা হইয়াছে। বৃদ্ধ কবির এই পরিণতির কথা অন্যত্র বলিয়াছি; এখানে আর পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই। সদুক্তিকর্ণামৃতে উমাপতি-ধরের নামে ৯১টি শ্লোক আছে। এই সংকলন গ্রন্থেই আর এক উমাপতির নামেও কয়েকটি শ্লোক আছে; এই উমাপতি জনৈক রাজা চাণক্যচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় চন্দ্রচূড়-চরিত নামে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই দুই উমাপতি এক এবং অভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়। দেওপাড়া-লিপিতে উমাপতি-ধর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, শব্দজ্ঞান ও শব্দার্থবোধ দ্বারা এই কবি পরিশুদ্ধবুদ্ধি ছিলেন; আর জয়দেব বলিতেছেন, উমাপতি-ধরের লেখনীতে বাক্য যেন পল্লবিত হইত (বাচঃ পল্লবয়তি)।

উমাপতি-ধর

গোবর্ধনাচার্য আর্যা-সপ্তশতীর কবি বলিয়াই সর্বভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই শৃঙ্গারকাব্যটি জনৈক সেনকুলতিলক ভূপতির পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হইয়াছিল, এবং এই কাব্যেই খবর পাইতেছি, গোবর্ধনের পিতার নাম ছিল নীলাম্বর; তাঁহার দুই ভ্রাতা ও শিষ্যের নাম ছিল উদয়ন ও বলভদ্র। নীলাম্বর ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং উদয়ন ও বলভদ্র গোবর্ধন-রচিত কাব্যটি রচনার কাজে সাহায্য করিয়াছিলেন। গোবর্ধন যে সুদক্ষ কবি এবং সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা তাঁহার আচার্য উপাধিতেই প্রমাণ; আর্যা ছন্দে রচিত সপ্তশতীর কিঞ্চিদধিক সাতশত শৃঙ্গার শ্লোকও সে-সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কবি হালের সরস ও সহৃদয় এবং সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময় সহজ প্রকাশের সঙ্গে গোবর্ধনাচার্যের সুচতুর এবং কষ্টকল্পিত কাব্যভঙ্গীর আত্মীয়তা সুদূর। তাহা ছাড়া আর্যা ছন্দের স্খলিত গতিও শৃঙ্গার রসের ঘন অনুভূতি বা অর্থগর্ভ ইঙ্গিতকে ফুটাইয়া তুলিবার যথাযোগ্য বাহন নয়। জয়দেব অবশ্য বলিয়াছেন, ত্রুটিবিহীন শৃঙ্গারকাব্য রচনায় গোবর্ধনাচার্যের কোনো তুলনা ছিলনা; কিন্তু ইহাও লক্ষণীয় যে, সদুক্তিকর্ণামৃতের শৃঙ্গারপ্রবাহে বা এই গ্রন্থের অন্যত্র কোথাও আর্যা-সপ্তশতীর একটি শ্লোকও উদ্ধৃত হয় নাই। জনৈক গোবর্ধনের ছয়টি শ্লোক সদুক্তি-তে আছে, কিন্তু ছয়টির একটিও সপ্তশতীর শ্লোক নয়। গোবর্ধনাচার্যের নামে শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে একটি এবং

আচার্য গোবর্ধন

সূক্তিমুক্তাবলীতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত আছে; দু'টিই আর্যাছন্দে রচিত এবং দু'টিই সপ্তশতীর শ্লোক। পদ্যাবলীতে গোবর্ধনাচার্যের নামে চারিটি শ্লোক আছে; তিনটি সপ্তশতীর শ্লোক; চতুর্থটি সপ্তশতীতে নাই, কিন্তু সদুক্তিকর্ণামৃতে আছে জনৈক অজ্ঞাতনামা কবির রচনা হিসাবে। মনে হয়, সংকলয়িতা শ্রীধরদাস আর্যা-সপ্তশতীর খুব অনুরক্ত পাঠক ছিলেন না। বস্তুত, সপ্তশতীর শ্লোকগুলির শৃঙ্গার রস যেন একটু বেশি দেহতাপে তপ্ত!

জয়দেব গীতগোবিন্দ

গীতগোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেব এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, এবং প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবের দিক্ হইতে স্বল্প সংখ্যক সর্বভারতীয় কবিদের মধ্যে অন্যতম। ষোড়শ শতকে সন্ত কবি নাভাজী দাস তাঁহার ভক্তমাল-গ্রন্থে জয়দেবের প্রশস্তি গাহিয়া বলিতেছেন,

জয়দেব কবি নৃপচক্কবৈ, খণ্ড মণ্ডলেশ্বর আণি কবি॥
প্রচুর ভয়ো তিহঁ লোক গীতগোবিন্দ উজাগর।
কোক-কাব্য-নবরস-সরস-শৃঙ্গার-কো আগার॥
অষ্টপদী অভ্যাস করৈ, তিহি বুদ্ধি বঢ়াবৈ।
রাধারমণ প্রসন্ন সুনত হাঁ নিশ্চৈ আবৈ॥
সন্ত-সরোরুহ-খণ্ড-কো পদুমাবতি-সুখ-জনক রবি।
জয়দেব কবি নৃপচক্কবৈ, খণ্ড মণ্ডলেশ্বর আনি কবি॥

কবি জয়দেব হইতেছেন চক্রবর্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড মণ্ডলেশ্বর মাত্র। তিন লোকে গীত-গোবিন্দ প্রচুর ভাবে উজাগর বা উজ্জ্বল হইয়াছে। ইহা একাধারে কোকশাস্ত্র, কাব্য, নবরস ও সরস শৃঙ্গারের আগার স্বরূপ। যে এই গ্রন্থের অষ্টপদী অভ্যাস করে তাঁহার বুদ্ধি বর্ধিত হয়। রাধারমণ প্রসন্ন হইয়া শুনেন এবং নিশ্চয় সেখানে আসিয়া বিরাজিত হ'ন। সন্তরূপ কমলদলের পক্ষে তিনি পদ্মাবতী-সুখ-জনক রবি। কবি জয়দেব চক্রবর্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড মণ্ডলেশ্বর মাত্র।

এই পর্বে এবং পরবর্তী কালেও জয়দেবের কবি-চক্রবর্তীত্বে প্রতিযোগীতার স্পর্দ্ধা রাখেন, সত্যই এমন কেহ নাই। তবে, নাভাজী দাস যে তাঁহাকে কবি-চক্রবর্তী-রাজা বলিতেছেন, তাহা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক মধুর কোমলকান্ত কাব্য গীতগোবিন্দের রচয়িতা হিসাবেই, যথার্থ কবি-প্রতিভার জন্য কিনা তাহা উদ্ধৃত পদগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে না। নাভাজীর উক্তি বৈষ্ণব সন্তের স্বতস্ফূর্ত ভক্তি ও প্রেমে অনুপ্রাণিত, কাব্য ও সাহিত্য বোদ্ধার উক্তি বোধ হয় নয়। বস্তুত, সর্বভারত জুড়িয়া জয়দেবের খ্যাতি যেন একান্তই ভক্ত বৈষ্ণব সাধক কবিরূপে, এবং গীতগোবিন্দ যেন সেই সাধকের দৃষ্টিতে, রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রত্যক্ষ করিবার কামমধুর ভক্তিরসময় উপায়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার উপর শ্রুতিমধুর, শৃঙ্গার-ভাবনাময়, রসাবেশময় গানের রচয়িতা হিসাবে জয়দেবের পক্ষে রসিক বৈষ্ণব-সমাজে এবং জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ সহজেই সম্ভব হইয়াছিল; এবং পরে একবার যখন গীত-গোবিন্দ চৈতন্য এবং চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম মূল প্রেরণা বলিয়া স্বীকৃত

হইল তখন গীতগোবিন্দ হইয়া উঠিল ধর্মগ্রন্থ এবং জয়দেব হইলেন দিব্যোন্মাদ সাধক। অথচ, জয়দেব একান্তই তাহা ছিলেন না, আমাদের প্রচলিত ধারণার ভক্তি ও প্রেমোন্মাদ বৈষ্ণবও ছিলেন না। আমি আগেই বলিয়াছি, তিনি ছিলেন সাধারণ ভাবে পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ; কল্কি এবং মহাদেবও তাঁহার অকুণ্ঠ স্তুতিপূজা লাভ করিয়াছেন, তিনি যোগমার্গ সাধনার উপর কবিতা লিখিয়াছেন, শৌর্য-বীর্য-যুদ্ধ-তুর্য-সংগ্রামের উপরও কাব্য তিনি রচনা করিয়াছেন। সেই জয়দেব গীতগোবিন্দও রচনা করিয়াছিলেন, এবং সন্দেহ নাই, এ-রচনা একান্ত ভাবে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার জন্য, যে-রাজসভায় রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা এবং নানা প্রকারের কামকল্পনা-ভাবনাকে আশ্রয় করিয়া প্রতি সন্ধ্যায় বাররামাদের নৃত্যগীত হইত, এবং নবদ্বীপকৃষ্ণ লক্ষ্মণসেন পাত্রমিত্রদের লইয়া সেই নৃত্যগীত উপভোগ করিতেন। গীত-গোবিন্দ, আর্যা-সপ্তশতীর শৃঙ্গার রসসমৃদ্ধ শ্লোক, পবনদূত সমস্তই সেই রাজসভার বিলাস-লালসময় সংস্কৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত। বাংলা দেশ যখন অর্ধেক মুসলমানদের করতলগত তখনও বিক্রমপুরে কেশবসেনের রাজসভায় একই বৃন্দাবনলীলা অব্যাহত। ধোয়ী, জয়দেব, গোবর্ধনাচার্যের মত প্রতিভাও সেই ইন্ধনে আহুতি দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই; অথচ সেই রাজসভার বাহিরে অন্য রসের কাব্যও তাঁহারা রচনা করিয়াছেন।

আসল কথা, এই পর্বের বাংলাদেশে রাজসভায়, সামন্ত-সভায়, উচ্চতর সম্প্রদায়গুলির বহির্বাটিতে, এক কথায় উচ্চকোটি সমাজের সামাজিক আবহাওয়াটাই এই ধরনের। অন্যত্র সে-ইঙ্গিত ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। সংস্কৃতির কথা বলিতে বসিয়া আরও কয়েকটি তথ্যের ইঙ্গিত অন্বেষণ করা যাইতে পারে। ধোয়ীই হউন আর শ্রীধরদাসই হউন, জয়দেবই হউন আর উমাপতি-ধরই হউন, সকলেই লক্ষ্মণসেনের স্তুতি যখন গাহিয়াছেন তখন অনিবার্যভাবেই যেন তাঁহার তুলনা করিয়াছেন কৃষ্ণের সঙ্গে, এবং সে-কৃষ্ণ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ নহেন, মথুরা বৃন্দাবনের রাধালীলাসহচর কৃষ্ণ। শুধু তাহাই নয়, সর্বত্রই, এমন কি কাশী-কলিঙ্গ-কামরূপের যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁহার সঙ্গে কেলি-লীলা যেন অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত—যেখানে লক্ষণসেন সেখানেই 'কেলি', তাহা রাজকীয় লিপিতেই হোক্, বা কবির স্তুতিতেই হউক। এ-তথ্যের ঐতিহাসিক ইঙ্গিত অবহেলার বস্তু নয়। দ্বিতীয়ত, শ্রীহর্ষের নৈষধ-চরিত বা ধোয়ীর পবনদূত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ বা গোবর্ধনের সপ্তশতী সর্বত্রই যেন শৃঙ্গার রসের প্রাবল্য একটু বেশি, কামলালসময় ভাবনা-কল্পনার দিকে আকর্ষণ প্রবল, রুচি তরল এবং ইন্দ্রিয়বিলাসী। সাহিত্যের এই চিত্র সাধারণ ভাবে সমসাময়িক সমাজের প্রতিফলন, সন্দেহ কি, এবং এই সমাজ রাজসভাপুষ্ট অভিজাত সমাজ। কারণ, এই সমাজের বাহিরে বৃহত্তর যে সমাজ তাহার প্রতিফলনও সমসাময়িক সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে কিছু কিছু আছে; সে-সাহিত্য এমন ভাবে শৃঙ্গার রসে জারিত নয়, এমন কামলালসময় ভাবনা-কল্পনাদ্বারা অভিসিঞ্চিত নয়। তাহার দৃষ্টান্ত সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, এবং সে-সব দৃষ্টান্তের মধ্যে ধোয়ী, জয়দেব,

গোবর্ধন, উমাপতির শ্লোকও নাই, এমন নয়। তৃতীয়ত, এ-যুগের কাব্য-সাহিত্যে ধ্বনিতত্ত্বের প্রভাব আর নাই ; এ-যুগ দণ্ডী-ভামহের যুগ নয়, মম্মট-ভট্টের রসতত্ত্বের যুগ ; রস-ই এ-যুগের কাব্যে প্রধান গুণ বলিয়া কীর্তিত। সেন-রাজসভায় এবং সমসাময়িক অভিজাত স্তরে সেই রসই কামদহনে মন্ত্রের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। গীতগোবিন্দেও কিছুটা পরিমাণে সেই মন্ত্রই পরিবেশিত হইয়াছে, অন্তত শেষতম সর্গে। অর্বাচীন জৈন-গ্রন্থে, লোকস্মৃতিতে লক্ষণসেন সম্বন্ধে যে-সব কাহিনী বিধৃত, রাজকীয় লিপিমালায় এবং সমসাময়িক সভা-সাহিত্যে সেন-রাজসভার এবং উচ্চকোটিস্তরের যে-চিত্র দৃষ্টিগোচর তাহার সঙ্গে গীতগোবিন্দের নৃতগীতলাস্যবিলাসময়, কামভাবনাময় তরল রসের কোথাও কোনো অমিল নাই। রাজসভার সুর ও আবহের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া নৃপতি ও সভাসদ্‌দের রসাবেশনিমীলিত চক্ষুর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জয়দেব গীতগোবিন্দ এবং গোবর্ধন সপ্তশতী রচনা করিয়াছিলেন!

শুধু জয়দেবের গীতগোবিন্দই নয়। প্রায় সমসাময়িক কাল বা কিছু পরবর্তী কালে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণেও ঘন কামনাবাসনাময় আবহের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে আশ্রয় করিয়া একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়-কামনা ও প্রেমভক্তির জয়-ঘোষণার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এ-ক্ষেত্রেও সামাজিক আবহাওয়ার প্রতিফলন অনস্বীকার্য।

কিন্তু পরবর্তী কালে রূপ-গোস্বামীর রসব্যাখ্যায় প্রভাবান্বিত হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ গীতগোবিন্দের মধ্যে নূতন অর্থসন্ধান লাভ করিলেন; গীতগোবিন্দ নূতন মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিল এবং অন্যতম ধর্মগ্রন্থ পর্যায়ে উন্নীত হইল। তাহার আগেই ভক্ত বৈষ্ণবসমাজ এই গ্রন্থকে কিছুটা ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দান করিয়াছিল। প্রধানত তাহারই ফলে সমগ্র উত্তর-ভারত জুড়িয়া গীতগোবিন্দের প্রতিষ্ঠা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অব্যাহত ছিল, সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে তো বটেই, অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেও, বিশেষ ভাবে সেই সব সম্প্রদায়ে যাহাদের প্রধান আশ্রয় ভক্তি ও প্রেম। তাহারই ফলে জয়দেব সহজিয়া সম্প্রদায়েরও আদিগুরু, নব রসিকের অন্যতম রসিক। বল্লভাচারী সম্প্রদায়ও গীতগোবিন্দকে অন্যতম ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। বল্লভাচার্যের পুত্র বিঠ্‌ঠলেশ্বর গীতগোবিন্দের অনুকরণেই তাঁহার শৃঙ্গাররসমণ্ডন-গ্রন্থ রচনা করেন। প্রধানত এই কারণেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে গীতগোবিন্দের চল্লিশখানারও উপর টীকা রচিত হইয়াছে, অনুকরণে দশ বারোখানা কাব্য রচিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন সংকলন-গ্রন্থে বারবার গীতগোবিন্দ হইতে অসংখ্য শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। গীতগোবিন্দের জনপ্রিয়তার ইহার চেয়ে বড় সাক্ষ্য আর কি হইতে পারে? গীতগোবিন্দের অন্যতম প্রাচীন প্রসিদ্ধতম টীকা মেবাড়পতি মহারাণা কুম্ভের নামে প্রচলিত রসিকপ্রিয়া (১৪৩৩-১৪৬৮ খ্রী)। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের একটি ওড়িয়া শিলালেখ হইতে (১৪৯৯) জানা যায়, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের আদেশে ঐ সময় হইতে গীতগোবিন্দের গান ও শ্লোক ছাড়া জগন্নাথ-মন্দিরে অন্য কোনো গান ও শ্লোক গীত হইতে পারিত না।

গীতগোবিন্দের লোকপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ, ইহার পদ বা গীত্‌গুলির ভাষা। এই কাব্যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের ভাষা এবং পরবর্তী ও সমসাময়িক কালের অপভ্রংশ ও ভাষা-কাব্যের ভাষা এক উদ্বাহ্‌-বন্ধনে আবদ্ধ। আখ্যায়িকা বা বর্ণনামূলক অংশ সংস্কৃত কাব্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছে—ভাবে, ভাষায় ও শব্দে; কিন্তু পদ বা গীত্‌গুলির সমস্ত আবহাওয়াটা অপভ্রংশ ও ভাষা কাব্যের; ছন্দ ও মিলও সেই কাব্যেরই। ছন্দ তো পরিষ্কার মাত্রাবৃত্ত, সংস্কৃত কাব্যের অক্ষরবৃত্ত নয়। ছত্রের অন্ত্য এবং আভ্যন্তর অক্ষরের মিলও অপভ্রংশ ও ভাষা-কাব্যের রীতি অনুসরণ করিয়াছে। শ্লোকগুলি একে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন নয়; অন্ত্য মিল এবং ধুয়া মিলিয়া প্রত্যেকটি গীতাংশের একটি সমগ্র রূপ খুব সুস্পষ্ট। এই সমগ্র রূপ একান্তই ভাষা-কাব্যের বৈশিষ্ট্য; সংস্কৃতে এই রূপ অনুপস্থিত। সেই জন্যই মনে হয়, কাব্যের এই রূপ জয়দেব গ্রহণ করিয়াছিলেন লোকায়ত চলিত ভাষা-সাহিত্য হইতে। জয়দেবের কালে সংস্কৃত কাব্য ও নাট্য-সাহিত্যের অবস্থা বদ্ধ জলাশয়ের মতো; জয়দেবই বোধ হয় সর্বপ্রথম সেই সাহিত্যে নূতন স্রোত সঞ্চার করিলেন, লোকায়ত চলিত্‌-সাহিত্যের গান ও গীতিনাট্যের খাত্‌ কাটিয়া। সেই লোকায়ত ভাষা-সাহিত্যে গান ও অভিনয় লইয়া এক ধরনের যাত্রা প্রচলিত ছিল, এবং এই সময়ের সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে তাহার প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট—ভাষা এবং সাহিত্যরূপ উভয়ত। রামকৃষ্ণের গোপালকেলিচন্দ্রিকা, উমাপতি-উপাধ্যায়ের পারিজাত-হরণ, মহানাটক প্রভৃতি সমস্তই এই ভাষা ও সাহিত্যরূপের নিদর্শন; কিন্তু গীতগোবিন্দ ইহাদের সকলের আদিতে।

সমসাময়িক কালে একদিকে সেন-রাজসভা ও উচ্চকোটির সমাজস্তর এবং অন্যদিকে ঘনায়মান অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করিয়া সামাজিক কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন কিনা সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন অনিবার্য হইলেও, জয়দেব যে যুগন্ধর ও সৃষ্টিধর কবি ছিলেন এবং তাঁহার গীতগোবিন্দ যে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। প্রথমত, তাঁহার লেখনীতে সংস্কৃত কাব্যভাষার অপভ্রংশ ও ভাষাধর্মী সদ্যোক্ত রূপান্তর প্রায় বৈপ্লবিক বলিলেও চলে। দ্বিতীয়ত, অলৌকিক দেবকাহিনী ও লৌকিক প্রেমগাথার এরূপ সমন্বয় ইতিপূর্বে ভারতীয় সাহিত্যে আর দেখা যায় নাই; গীতগোবিন্দের এই সমন্বয়ের ধারায়ই পরবর্তী বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলীর উদ্ভব। এই সমন্বয়ই মধ্যযুগের হিন্দু সাংস্কৃতিক নবজাগরণের, মধ্যযুগীয় হিউম্যানিজমের মূলে। অলৌকিক দেববাদের এইরূপ মানবীকরণের ইঙ্গিত বহুলভাবে জয়দেবই প্রথম সূচনা করিলেন। অন্য কবিদের রচিত সদুক্তিকর্ণামৃতের দু'চারিটি প্রকীর্ণ শ্লোকেও সে-ইঙ্গিত কিছু কিছু পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, সন্দেহ নাই, গীতগোবিন্দ একান্তই গীতিকাব্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হয়, লোকায়ত নাট্যাভিনয়ের (যাত্রার?) নাটকীয় লক্ষণও কিছুটা এই কাব্যে বর্তমান, বিশেষত রাধার সখীদের অথবা স্বয়ং রাধা ও কৃষ্ণের কথোপকথনাত্মক গীতাংশে।

বস্তুত, গীতগোবিন্দে বর্ণনা-বিবৃতি, আলাপ বা কথোপকথন, এবং গীত্ এই তিনটি একসঙ্গে একই কাব্য বা সাহিত্যরূপের মধ্যে সমন্বিত। এই রূপও একান্তই অভিনব এবং সংস্কৃত সাহিত্যে অজ্ঞাত। চতুর্থত, কাব্যটির বিষয়বস্তু ধর্মগত, কিন্তু লৌকিক ইন্দ্রিয়-কামনার এমন রসাবেশময় ব্যঞ্জনা সংস্কৃত-সাহিত্যে বিরল; মৌলিক যৌনকামনার এমন অপূর্ব ভক্তিরসময় রূপান্তর মধ্যযুগীয় বাংলার পদাবলী-সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। পঞ্চমত, গীতগোবিন্দ একাধারে পদ-কাব্য (মধুর কোমলকান্ত পদাবলীং) এবং মঙ্গল-কাব্য (শ্রীজয়দেব কবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলম্ উজ্জ্বল-গীতি); এবং এই হিসাবে পরবর্তী বাংলা পদাবলী-সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য এই দুই সাহিত্যধারার আদিতে গীতগোবিন্দের স্থান।

সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে জয়দেবের ৩১টি শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ৫টি মাত্র গীতগোবিন্দ হইতে, এ-কথা আগেই বলিয়াছি। অনুমান হয়, তিনি অন্য এক বা একাধিক কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। জয়দেবের রচিত দুইটি কবিতা শিখদের শ্রীগুরুগ্রন্থ বা গ্রন্থসাহেবে (ষোড়শ শতক) স্থান পাইয়াছে; তন্মধ্যে একটি যোগমার্গের পদ। সদুক্তিকর্ণামৃতে কল্কির উপরও জয়দেব-রচিত একটি পদ আছে।

জয়দেবের পিতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতা রামাদেবী (পাঠান্তরে, বামাদেবী, রাধাদেবী); তাঁহার জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব (অজয়-নদের তীরে কেন্দুঁলি গ্রাম)। স্ত্রীর নাম বোধ হয় ছিল পদ্মাবতী। কবির প্রিয় বন্ধু এবং তাঁহার গানের দোহার বা গায়েন ছিলেন পরাশর। জয়দেবের সম্বন্ধে নানা কাহিনী সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রচলিত; নাভাজী দাসের ভক্তমাল (সপ্তদশ শতক) গ্রন্থে ও চন্দ্রদত্তের ভক্তমালায় কিছু কিছু এই সব কাহিনীর বিবৃতি আছে। কাহিনীগুলির মধ্যে পদ্মাবতীর কাহিনী সুপরিচিত। পদ্মাবতীর পিতার ইচ্ছা ছিল, কন্যাকে দেবদাসীরূপে জগন্নাথ-মন্দিরে সমর্পণ করিবেন, কিন্তু নারায়ণকর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া জয়দেবের সঙ্গে তাহার বিবাহ দেন। 'দেহিপদপল্লবমুদারম্'-সংক্রান্ত আখ্যায়িকাটিও বাংলাদেশে সুপরিচিত। গীতগোবিন্দের দুইটি পদে পত্নী পদ্মাবতীর নামোল্লেখ আছে; এক জায়গায় পাইতেছি "পদ্মাবতী-রমণ-জয়দেব কবি"; অন্য জায়গায় আছে, "পদ্মাবতী-চরণচারণচক্রবর্তী"। জয়দেব গীতগোবিন্দের পদ গাহিতেন এবং পদ্মাবতী সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নাচিতেন, এই জনশ্রুতি ষোড়শ শতকেই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। শেক-শুভোদয়া-গ্রন্থেও জয়দেব-পদ্মাবতী সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। বাংলাদেশের বাহির হইতে জনৈক সঙ্গীতজ্ঞ বুঢ়নমিশ্র সেন-রাজসভায় আসিয়া জয়দেবকে সঙ্গীত প্রতিযোগীতায় আহ্বান করেন; জয়দেবপত্নী পদ্মাবতী তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পদ্মাবতী যে গীতনৃত্যনিপুণা ছিলেন তাহা তাঁহার পিতার দেবদাসীরূপে কন্যাকে সমর্পণের বাসনায়, গীতগোবিন্দের শ্লোকে 'পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী' ও নাভাজী দাসের 'পদ্মাবতীসুখজনকরবি' এই আখ্যায় এবং শেক-শুভোদয়ার এই গল্প হইতেই অনুমান করা যায়।

এই সব সুবিস্তৃত কাব্য-সাহিত্য এবং প্রকীর্ণ শ্লোকাবলী ছাড়াও সেন-বর্মণ রাজসভায় অলঙ্কারবহুল উচ্ছ্বসিত কাব্য-রচনার পরিচয় পাওয়া যায় রাজকীয় লিপিগুলির প্রশস্তি শ্লোকাবলীতে, এবং এই সব শ্লোক প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রাজসভাকবিদের দ্বারা রচিত। ভবদেব-প্রশস্তির কথা আগেই বলিয়াছি: বিজয়সেনের বারাকপুর-প্রশস্তি, বল্লালসেনের নৈহাটি-প্রশস্তি, লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া, গোবিন্দপুর, তর্পণদীঘি-শাসনের প্রশস্তি প্রভৃতি সমস্তই সমসাময়িক কবি-প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

গৌড়লেখমালা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সং।

*নলিনীনাথ দাসগুপ্ত—বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম

* „ „ অপ্রকাশিত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি (শ্রীহর্ষের নৈষধ-চরিত)

*সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং।

*সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—শ্রীজয়দেব কবি, ভারতবর্ষ (মাসিক পত্রিকা), শ্রাবণ, ১৩৫০

* „ „ —সদুক্তিকর্ণামৃত, বিশ্বভারতী (ত্রৈমাসিক) পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫০

*হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বৌদ্ধগান ও দোহা

হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা—২য় খণ্ড, ২০২-২২৬ পৃ।

Aufrecht, T.—Catalogus Catalogorum. Leipzig.

Bagchi, P. C.—Materials for the study of the Bengali Caryāpadas, *in* Journal of the Dept. of Letters, C. U.

" " Dohākosha, *in* the Journal of the Dept. of Letters, XXVIII, C. U.

" " Kaulajñānanirṇaya, Calcutta. 1934.

„ „ Development of religious ideas, Chap. XIII, Sec. I *in* History of Bengal, Vol. I. D. U.

Bhandarkar, R. G.—Report on the search for Sans. Mss. in the Bombay Presidency.

Bhattacharya, D. C.—Pāṇinian studies in Bengal, *in* Sir Asutosh Mookerjee Silver Jubilee Volumes, Vol. III, Orientalia.

Bhattacharya, S. P.—The Gauḍī rīti in theory and practice, *in* Indian Historical Quarterly, 1927, p. 378 ff.

Bose, P. N.—Indian teachers of Buddhist Universities.

Bu-ston—History of Buddhism. Trans. by E. Obermiller.

*Chakravarti, Monomohan—Sanskrit literature in Bengal during the Sena rule, in J. & P. of A. S. Bengal. 1906. *Also see his article in J. A. S. B. 1945, p. 319 ff.

Chatterji, S. K.—The Origin and development of the Bengali language, 2 Vols. C. U.

* " " Rise of vernacular literature, Chap. XII, *in* History of Bengal, Vol. I. D. U.

" " Indo-Aryan and Hindi

*Cordier, P.—Catalogue du fonde Tibetain de la Bibliotheque Nationale. Paris, 1908.

Dasgupta, S. N. and De, S. K.—History of Sanskrit literature, C. U.

*Das, Saratchandra—Indian pandits in the Land of Snow.

*Dasgupta, Nalininath—Articles published *in* Indian Culture, Indian Historical Qly. placed at my disposal.

De, S. K.—Sanskrit Poetics, Vol. I.

" " —Sanskrit literature, Chap. XI, *in* History of Bengal, Vol. I. D. U.

" " —Early history of the Vaishnava faith and movement in Bengal.

" " —Pre-Chaitanya Vaishnavism in Bengal, *in* Festschrieft M. Winternitz.

Eggling. J.—Catalogue of Sanskrit Mss. in the library of the India Office. London.

Grünwedel, A.—Edelsteinmine.

" " —Geschichten d. Mahāsiddhas.

Hœrnle. A. F. R.—Medicine of ancient India.

Inscriptions of Bengal. Vol. III. *ed.* by N. G. Majumdar.

Kaviraja, Gopinath—History and bibliography of Nyāya-Vais'eshika literature.

Keith. A. B.—History of Sanskrit literature.

" " —Sanskrit Drama.

Kavindravachanasamuchchaya—*ed.* by F. W. Thomas.

Kane—History of Dharmas'āstra. Vols I & II.

Majumdar. R. C.—Bengalis outside Bengal. Chap. XVII *in* History of Bengal, Vol. I. D. U.

Mitra. Rajendralal—Sanskrit Buddhist literature of Nepal.

" " Notices of Sanskrit Manuscripts.

Nachrichten von der Kgl. Gesselschaft der Wissenschaft zu Goettingen. Philolog-Histor. Klasse.

*Pal, P. L.—The early history of Bengal, vol. 2.

Padyāvali—*ed.* by S. K. De.

Poussin. L. de la Vallee—Tantrism (Buddhist), *in* Encyclopaedia of Religion and Ethics. XII.

Ray, P. C.—History of Hindu Chemistry. Vol. I. Intro.

*Saduktikarṇāmṛita of Śrīdharadāsa—*ed* by Ramāvatāra Sarma and Haradatta Sarma.

Sastri, Haraprasad—Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. in the Govt. Collection under the care of Asiatic Society of Bengal, Calcutta.

Sankrityāyana, Rahula—*in* Journal Asiatique, CCXXV. 1934, pp. 209 ff.

Shahidullah, M—Les Chants mystique.

*Sumpa MKhan-PO Yese Pal Jor—Pag Sam Jon Zang. *ed.* by Saratchandra Das.

*Tāranāth—Geschichte des Buddhismus in Indien. German trans. by Schiefner.

Vidyabhushan, S. C.—History of Indian Logic.

Winternitz, M.—History of Sanskrit Literature. Vol. II. Eng. trans.

প্রাচীন বাংলার সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ নানা আলোচনা-গবেষণা নানা সাময়িক বৈজ্ঞানিক পত্রিকাদিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। তালিকা দীর্ঘ হইবে আশঙ্কায় আমি যে-গুলি হইতে প্রত্যক্ষভাবে ঋণ গ্রহণ করিয়াছি শুধু সেইগুলিরই উল্লেখ করিলাম। ইহাদের মধ্যে * তারকাচিহ্নিত রচনাগুলি আমি বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়াছি। বস্তুত, এই রচনাগুলি আমার সম্মুখে না থাকিলে এই অধ্যায় রচনা হয়তো সম্ভব হইত না; তবে সাহিত্যিক মতামত, সামাজিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য-নির্দেশ সমস্তই আমার নিজের। তথ্যাদির জন্য আমি সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়দের বিভিন্ন রচনাবলীর নিকট ঋণী।

শিল্পকলা

১

ভাষা-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষায় যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত তাহার পশ্চাতে সচেতন বুদ্ধির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ। কিন্তু সংস্কৃতির এমন প্রকাশও আছে যেখানে বুদ্ধির লীলা সক্রিয় থাকিলেও তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা দেয় না, কিংবা বুদ্ধিই সেখানে একমাত্র নিয়ামক নয়। সংস্কৃতির সেই প্রকাশ ধরা পড়ে চারুকলায় ও সঙ্গীতে, এবং এ-দুয়েরই প্রধান উৎস ও আবেদন মানুষের বোধ,বুদ্ধি ও বোধির ক্ষেত্রে। এ-বিষয়ে ভাষা-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানাপেক্ষা চারুকলা ও সঙ্গীতের আবেদন একদিকে যেমন সূক্ষ্মতর, অন্যদিকে তেমনই প্রত্যক্ষতর এবং পরিধি হিসাবে বিস্তৃততর।

যুক্তি

কিন্তু আদিম লোকায়ত বাঙ্গালীর চারুকলা বা সঙ্গীত সম্বন্ধে উপাদান অভাবে কিছু বলিবার উপায় নাই। সাংস্কৃতিক নরতত্ত্বের গবেষণার কাজও এমন কিছু অগ্রসর হয় নাই যে, সেদিক হইতে কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। চারুকলার কিছু কিছু উপাদান যদিও বা পাওয়া যায়, একেবারে শেষ পর্বের আগে সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনো কথাই বলা যায় না। অথচ, গুহাবাসী অরণ্যচারী মানুষেরও প্রাথমিক সাংস্কৃতিক প্রকাশ তো গানেই। এই গানের ভিতর দিয়াই তো সে তাহার আনন্দবেদনা সুখদুঃখকে ব্যক্ত করে। আদিম কৌম বাঙ্গালীও—রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ-সুহ্ম প্রভৃতি জনপদবাসীরাও তাহাই করিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই সব গানের কি ছিল রাগ-রাগিণী, কি ছিল সুর, তাল, লয়, মান কিছুই আমরা জানি না, কেহ তাহা লিখিয়াও রাখে নাই। পরবর্তী কালে, একেবারে দশম—দ্বাদশ শতকে যে-সব রাগ-রাগিণী, তাল-লয়ের পরিচয় পাইতেছি তাহা তো একান্তই সভ্য সংস্কৃতিপূত চিত্তের প্রকাশ, প্রধানত আর্যমানসের প্রকাশ, যে আর্যমানসে অন্তত কিছুটা পরিমাণে বহির্ভারতীয় সংস্কৃতির স্পর্শও লাগিয়াছে। কিন্তু, তাহাতে কৌম বাঙ্গালীর লোকায়ত সঙ্গীতের প্রভাবও পড়ে নাই, এ-কথাও বলা যায়না, বরং তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণও আছে। সে-সব কথা পরে বলিতেছি। আজিকার দিনেও বাঙালীর বাউল, ভাটিয়াল, ঝুমুর গানে যে সংস্কৃতির প্রকাশ এবং যাহা আজও বিশুদ্ধ মার্গ-সঙ্গীতের পর্যায়ে স্থান লাভ করে নাই, সেই সব গানে কৌম বাঙ্গালীর লোকায়ত সঙ্গীতের ধারাই তো বহমান, এ-কথা কোনো তথ্যগত প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এবং এই লোকায়ত সঙ্গীতকেই রবীন্দ্রনাথ

উপাদান

তাঁহার অসংখ্য গানে উচ্চস্তরের সাঙ্গিতীক মর্যাদা দান করিয়াছেন। আজিকার সাঁওতাল, কোল, হো, মুণ্ডা, শবর, গারো, খাসিয়া, কোচ প্রভৃতিদের মধ্যে যে সব সুর ও তালের গান শোনা যায়, নাচ দেখা যায়, সেই সব সুর ও তাল, নাচের ভঙ্গী-প্রভৃতির মধ্যেও সুপ্রাচীন কৌম বাঙালীর নৃত্যগীতের ধারা বহমান, সে-সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম। গ্রামে নিম্নস্তরের মেয়েদের মধ্যে যে সব গীত ও নৃত্য প্রচলিত, বীরভূমে রায়বেঁশেদের মধ্যে, অন্যান্য জেলার লাঠিয়ালদের মধ্যে যে ধরনের নৃত্য আজও অভ্যস্ত তাহা সমস্তই সেই আদিম ধারার খাতে প্রবাহিত। লোকায়ত সেই সব নাচ ও গান উচ্চস্তরের কৌলিন্য মর্যাদা লাভ করেন নাই বলিয়া তাহাদের কথা কোথাও কীর্তিতও হয় নাই। তবু, সকল উপেক্ষা সহ্য করিয়া, উচ্চকোটি-সংস্কৃতির চাপ সহ্য করিয়া ইহারা আজও বাঁচিয়া আছে, এবং কালে কালে ইহাদের অনেক রূপ ও ভঙ্গী মার্গস্তরে স্বীকৃত এবং গৃহীতও হইয়াছে।

লোকায়ত সঙ্গীত ও নৃত্য

চারুকলার ক্ষেত্রেও এই লোকায়ত সংস্কৃতির ধারা আজও বহমান এবং একই অবস্থার ভিতর দিয়া। আমাদের ব্রত ও অন্যান্য মঙ্গলানুষ্ঠানের আলপনায়, কাঁচা বা পোড়া মাটির তৈরী পুতুল ও খেলেনায়, মনসা বা গাজীর পটচিত্রে, মাটিলেপা বেড়ার উপর অথবা সরা ও ঘরের উপর নানা রঙীন চিত্র ও নক্‌সায়, কাঁথার উপর বিচিত্র সূচীকার্যে, ঝুলানো শিকার পরিকল্পনায়, খুঁটি ও খড়ের তৈরী ধনুকাকৃতি দোচালা, চৌচালা বা আটচালা ঘরে, নানা বাঁশ ও বেতের শিল্পে, এবং আরও নানা প্রকারের গৃহকলায় সেই প্রাচীন লোকায়ত শিল্পের ধারাই বহমান। এ-সব বিষয়ে কিছু দিন যাবৎ আমাদের শিক্ষিত সমাজের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা-গবেষণা আজও আরম্ভ হয় নাই। তবু, স্বীকার করিতে বাধা নাই, এই সব বিচিত্র প্রকাশের ভিতর দিয়াই বহু শতাব্দী ধরিয়া আমাদের কৌম গ্রামীণ লোকায়ত মানস নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু আদিপর্বের লোকায়ত বাঙ্গালীর এই সব রচনার একটি নিদর্শনও আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছায় নাই।

লোকায়ত শিল্প

ইহার অন্যতম কারণ সহজভঙ্গুর উপাদানের ব্যবহার। সাধারণ লোকেরা বসবাসের জন্য ঘরবাড়ী যাহা নির্মাণ করিত তাহা সাধারণত বাঁশ, কাঠ, নল, খাগড়া, খড়,পাতা প্রভৃতির সাহায্যে। কাল জয় করিবার মতন শক্তি ইহাদের ছিল না। রাজপ্রাসাদ গুলিও সাধারণত একই মাল-মসলা দিয়া তৈরী হইত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইটের ব্যবহারও ছিল না এমন নয়; কিন্তু ইটও কালজয়ী নয়, বিশেষত বাংলার উষ্ণ, জলীয় আবহাওয়ায়। ছোট খাট মন্দিরগুলিও বাঁশ-কাঠ-খড়ের চালাঘর ছাড়া কিছু ছিল না; তবে রাজা-রাজড়া এবং সমাজের সমৃদ্ধ শ্রেণীর লোকেরা যে-সব দেবমন্দির, বিহার ইত্যাদি নির্মাণ করাইতেন সেগুলিতে প্রধানত ইট এবং খুব স্বল্প পরিমাণে পাথর—যেমন, দরজায়, জানালায়, খিলানে, সিঁড়িতে, কোণে কোণে—ব্যবহৃত হইত।

ঘরবাড়ীর উপাদান

বাংলাদেশ পাথরের দেশ নয়; কাজেই বহুল পরিমাণে পাথর ব্যবহারের সুযোগই ছিলনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইটের তৈরী মন্দির-বিহার ইত্যাদি ধ্বংস হইয়া মাটির ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে; কতগুলি ভাঙ্গা পাথরের টুকরা, অসংখ্য ভাঙ্গা ইট ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে মাত্র। দু'একটি ক্ষেত্রে মাত্র ইটের তৈরী বিহার, মন্দির অর্ধভগ্ন অবস্থায় কোনো রকমে দাঁড়াইয়া আছে, যেমন, পাহাড়পুরের মন্দির-বিহার, দক্ষিণ-বঙ্গের জটার-দেউল, বরাকরের মন্দির, সাত-দেউলিয়ার মন্দির, বহুলারার মন্দির; তবু যে প্রাচীন বাংলার ছোটবড় মন্দিরগুলির আকৃতি-প্রকৃতির কতকটা ধারণা আমরা করিতে পারি তাহা বিশেষভাবে সম্ভব হইয়াছে পাথরের তৈরী সমসাময়িক দেব-মূর্তির ফলকগুলির এবং রঙে-রেখায় আঁকা কয়েকটি পাণ্ডুলিপি-চিত্রের সহায়তায়। এই ফলক এবং চিত্রগুলিতে সমসাময়িক মন্দিরাদির কিছু কিছু নক্‌সা সহজেই ধরিতে পারা যায়, এবং ইহাদের সাহায্যে অর্ধভগ্ন মন্দির গুলির মৌলিক চেহারাটাও ধরা পড়ে।

মূর্তি-শিল্পে পাথরের তৈরী অর্থাৎ পাথরে খোদাই মূর্তি ইত্যাদি যাহা নির্মিত হইয়াছে তাহারই কিছু কিছু নমুনা আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে নানা খনন ও অনুসন্ধানের ফলে। কিন্তু রাজমহল পাহাড় অথবা ছোটনাগপুরের পাহাড় হইতে পাথর আনাইয়া ভাস্করকে তাহার পারিশ্রমিক দিয়া মূর্তি নির্মাণ করাইবার মত সামর্থ্য খুব বেশি লোকের ছিল না; সম্পন্ন সমৃদ্ধ লোকেরাই তাহা করিতেন এবং তাহাও বিশেষভাবে মন্দিরসজ্জা এবং প্রতিমা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই। সেই জন্যই প্রস্তরভাস্কর্য-নিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই জৈন, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য দেব দেবীর মূর্তি অথবা বিহার-মন্দির সংপৃক্ত অলংকরণ-ফলক, স্থাপত্যাংশ বা ধর্মগত পুরাণ কাহিনীর প্রস্তরীকৃত প্রতিকৃতি, এবং সেই হেতু অল্পবিস্তর প্রতিমা-লক্ষণ শাস্ত্র বা ধ্যান-সাধনের সূত্রদ্বারা নিয়মিত। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব গতিভঙ্গীর এবং লোকায়ত প্রাণ-প্রবাহের পরিচয় সেই হেতু ইহাদের মধ্যে ধরা পড়িবার সুযোগ কম; ব্যক্তি গত সুখ-দুঃখের বা আনন্দ-বেদনার প্রকাশও সেখানে সহসা ধরা পড়েনা। প্রাচীন বাংলার প্রস্তর-ভাস্কর্যে বাঙালী মনের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাহা তাহার সংস্কৃতিপূত চিত্তের সমষ্টিগত গভীরতর ধ্যান-কল্পনার এবং সূক্ষ্মতর দৃষ্টির, যে-দৃষ্টি ও ধ্যান কল্পনার যোগ সর্বভারতীয় দৃষ্টি ও ধ্যান-কল্পনার সঙ্গে। কাঠেও প্রচুর তক্ষণ ও মণ্ডণ কার্য হইত, সন্দেহ নাই, পাথরের চেয়ে বোধ হয় বেশিই হইত, কিন্তু আমাদের হাতে যে কয়েকটি নিদর্শন আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাদের ভিতরও একই ভাস্কর্য-লক্ষণ সুপরিস্ফুট। কাজেই, না প্রস্তরশিল্পে না কাষ্ঠশিল্পে সমসাময়িক লোকায়ত মানসের পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। সেই পরিচয় স্বভাবতই ধরা পড়িবার কথা মৃৎশিল্পে, বিশেষত গঙ্গা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রের পলিবিস্তৃত বাংলাদেশে। নদীর ধারে, পুকুর পারে, মাঠের মধ্যে বসিয়া কাদা লইয়া খেলা, আঁটালো মাটির নরম ঢেলা লইয়া বিচিত্র রূপ গড়া ও ভাঙ্গা, ভাঙ্গা ও গড়া, দৈনন্দিন

তক্ষণ শিল্পে পাথর, কাঠ ও মাটি

জীবনের চলতি মুহূর্তের ক্ষণস্থায়ী কামনা-বাসনার, আনন্দ-বেদনার, বিচিত্র গতি ও স্থিতির নানারূপ—এই মুহূর্তে আছে পরের মুহূর্তে নাই, এমন সব রূপের বাতি জ্বালানো এবং নেভানো, মাটির নরম তাল লইয়া খেলার ইহাই তো প্রকৃতি। কিন্তু, এই সব বিচিত্র রূপের লীলা প্রত্যক্ষ করিবার কোনো উপাদানই আজ আর আমাদের হাতে নাই; মাটিতেই যাহার সৃষ্টি মাটির ধূলায়ই কবে তাহা গিয়াছে মিশিয়া! তবু, এই সব রূপ কালজয়ী, কালাতীত; কালপ্রবাহকে অতিক্রম করিয়া তাহারা আজও আমাদের মধ্যেই বাঁচিয়া আছে—বাঁচিয়া আছে আমাদের ব্রতানুষ্ঠানের মাটির গড়া নানা মূর্তিতে, গ্রামের কুমোরের তৈরী নানা মাটির পুতুল ও খেলেনায়। সেই প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার আমলে সিন্ধুনদীর তীরে বসিয়া সমসাময়িক লোকেরা যে পুতুল তৈরী করিত, বাংলার গ্রামে নদীর ধারে পুকুর পাড়ে বটের ছায়ে বসিয়া বাঙালী শিশু, বাঙালী কুমোর, বাঙালী ব্রতধর্মী নারী আজও তাহাই করে।

কালাতীত মৃৎশিল্প

কিন্তু আর এক ধরনের মাটির শিল্পরূপও লোকেরা গড়িত, গড়া শেষ হইয়া গেলে প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য নয়, বা নেহাতই খেয়াল-খুসীর খেলেনার জন্যও নয়। সেগুলি লোকে ব্যবহার করিত ঘরের কুলুঙ্গি, মঞ্চ, দেয়াল প্রভৃতি সাজাইবার জন্য, আমরা যেমন ছবি দিয়া ঘর সাজাই; আবার সেগুলির সাহায্যে, সুযোগ পাইলে ও প্রয়োজন হইলে, বড় বড় মন্দির, বিহার প্রভৃতির বহিরঙ্গ সজ্জাও হইত। বড় বড় মন্দির-বিহারের সুবিস্তৃত বহির্গাত্র শিল্পরূপে ঢাকিয়া দিবার মত পাথরের প্রাচুর্য বাংলাদেশে ছিল না; কাজেই তখন ডাক পড়িত গ্রামের কুমোর শিল্পীদের। তাহারা তখন আসিয়া স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাঁচের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয়াসে ক্ষুদ্র বৃহৎ মাটির ফলক গড়িয়া চারিদিক ঢাকিয়া দিত জীবনের শোভাযাত্রায়। এই ধরনের অন্তত কিছুটা স্থায়িত্বের প্রশ্ন যেখানে ছিল সেখানে মাটির গড়া এই সব শিল্পফলক, ছোটই হোক আর বড়ই হউক, আগুনে পোড়ানো হইত। এই ধরনের পোড়া মাটির ছোটবড় শিল্প-ফলক বাংলার নানা প্রত্নস্থান হইতে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে—খ্রীষ্টীয় শতকের প্রারম্ভ হইতে একেবারে অষ্টম নবম শতক পর্যন্ত; সুপ্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গিয়াছে পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ হইতে। এই সব পোড়ামাটির ফলকগুলি ঠিক পূর্বোক্ত কালাতীত বা কালজয়ী প্রকৃতির নয়; বরং ইহাদের উপর কালের ছাপ সুস্পষ্ট এবং সমসাময়িক পাথরের তক্ষণ শিল্পের শিল্পরূপ ও ধারার প্রভাবও ইহারা একেবারে এড়াইতে পারে নাই। কিন্তু বিষয়বস্তু এবং লোকায়ত জীবনের প্রাণ-প্রবাহের দিক হইতে ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও প্রচুর। পোড়ামাটির শিল্প সাধারণত দেবদেবীর মূর্তি নয়, কাজেই কোনো শাস্ত্র বা নিয়ম-বন্ধন দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও নয়। ইহাদের বিষয়বস্তু দৈনন্দিন জীবনের চলমান প্রবাহের, লোকায়ত কথা ও কাহিনীর, ক্ষণস্থায়ী জীবন-রূপের; কোনো গভীর ভাব-রহস্যের, কোনো

কালধর্মী মৃৎশিল্প

প্রাচীন বাংলার লোকায়ত চিত্রশিল্পের কোনো নিদর্শনই আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই; অথচ তাহা যে ছিলনা, এমন নয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকীয় বাংলা পটচিত্রের ধারা প্রাচীন কৌম লোকায়ত খাতেই বহিয়া আসিয়াছে, এবং তাহার কিছু কিছু প্রাচীন আভাস ও সাম্প্রতিক গবেষণায় ধরা পড়িয়াছে। ধর্মানুশাসিত উচ্চকোটি-স্তরের যে চিত্র-নিদর্শনের কথা আমরা কিছু কিছু জানি তাহা সমস্তই পুঁথিচিত্র; পুঁথিসজ্জা, পুঁথিবর্ণিত দেবদেবীর মূর্তি-পরিচয়ের জন্যই তাহাদের সৃষ্টি।

২

সঙ্গীত ও নৃত্য

আগেই বলিয়াছি, দশম-একাদশ শতকের আগে নৃত্য ও গীত সম্বন্ধে কিছু বলিবার মত উপাদান আমাদের নাই। কিন্তু দশম-দ্বাদশ শতকীয় চর্যাগীতিগুলিতে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং লোচন-পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিনী-গ্রন্থে এমন সব রাগের ও তালের নামোল্লেখ পাইতেছি যাহাতে মনে হয়, এই সময়ের বহু আগে হইতেই প্রাচীন বাংলাদেশ ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাস্রোতের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং সর্বভারতে অভ্যস্ত ও প্রচলিত অনেক রাগ ও তাল বাংলাদেশেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

চর্যাগীতির পদগুলি যে সুরে তালে গাওয়া হইত তাহা গীতারম্ভে রাগের নামেই প্রমাণ; কিন্তু এ-সব রাগের ঠাট্ বা কাঠামো যে কি ছিল, এখন আর তাহা বলা যায় না। এ-গুলি প্রায় সমসাময়িক লোচন-পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিনীর বা কিছু পরবর্তী কালের শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত-রত্নাকরের (১২১০-১২৪৭) পদ্ধতি অনুযায়ী গাওয়া হইত কিনা, বলা কঠিন। চর্যাগীতির ৫০টি গীত যে-সব রাগে গাওয়া হইত তাহাদের সংখ্যা ১০টি। ১,৬-৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬ এবং ৪৮ নং গীতের রাগ পটমঞ্জরী, এবং বারংবার ব্যবহারে মনে হয়, এই রাগটিই ছিল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়; ২-৩ ও ১৮ নং—গবড়া গউড়া; ৪—অরু; ৫, ২২, ৪১, ৪৭—গুর্জরী, গুঞ্জরী, কাহ্ন-গুর্জরী; ৮—দেবক্রী; ১০, ৩২—দেশাখ; ১৩, ২৭, ৩৭, ৪২—কামোদ; ১৪—ধনসী, ধানশ্রী; ১৫, ৫০—রামক্রী ২১, ২৩, ২৮, ৩৪—বলাড্ডী, বরাড়ী; ২৬, ৪৬—শবরী; ৩০, ৩৫, ৪৪, ৪৫, ৪৯—মল্লারী; ৩৯—মালসী; ৪০—মালসী-গবুড়া; ৪৩—বঙ্গাল; ১২, ১৬, ১৯, ৩৮—ভৈরবী। গবড়াও

চর্যাগীতির রাগ

গউড়া একই রাগ, সন্দেহ নাই, এবং খুব সম্ভব কাব্যে যেমন গৌড়ীরীতি রাগের মধ্যেও তেমনই একটি ছিল গউড়া বা গৌড়ী-রাগ, এবং তাহারই সঙ্গে মালসী বা মালশ্রী (মালব-শ্রী?) মিশাইয়া যে মিশ্র রাগ তাহার নাম মালসী-গবুড়া (৪০)। লোচন-পণ্ডিত কিন্তু এক গৌরী-রাগের নাম করিয়াছেন;

গৌরী কি গৌড়ী রাগ ? গুঞ্জরী গুর্জরী-রাগেরই লিপিকর প্রমাদ, এবং কাহ্ন-গুর্জরী গুর্জর-রাগেরই বিশেষ এক প্রকার মিশ্রিত রূপ ; অসম্ভব নয়, মার্গ গুর্জরীর সঙ্গে দেশী কাহ্ন-রাগ বা সুরের মিশ্রণেই কাহ্ন-গুর্জরীর সৃষ্টি। কাহ্ন বা কৃষ্ণভক্তরা যে ঠাটে গুর্জরী রাগ গাহিতেন তাহাই কি কাহ্নগুর্জরী ? বা মথুরা-বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলার প্রচলিত গুর্জরীরাগই কাহ্নগুর্জরী ? রামক্রী-রাগ নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালের রামকেলি, গীতগোবিন্দের রামকিরী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রামগিরি-রাগ। কিন্তু দেবক্রীর পরবর্তী ভগ্নরূপ দেবকিরী-দেবকেলি বা দেবগিরির উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছিনা। বস্তুত, পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রে বা বিভিন্ন ঘরানায় দেবক্রী-রাগের কোনো স্থান যেন আর নাই। দেশাখ নিঃসন্দেহে গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দেশাগ ; কিন্তু দেশাখ কি দেশাখ্য, অর্থাৎ কোনো দেশী রাগের মার্গীকরণ ? ধানসী, ধানশ্রী পরবর্তী (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) কালের ধানুষী, এবং মল্লারী সুপরিচিত মল্লার। কিন্তু সঙ্গীতেতিহাসের দিক হইতে চর্যাগীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাগ শবরী ও বঙ্গাল-রাগ। শবরী রাগ তো নিঃসন্দেহে শবরদের মধ্যে প্রচলিত রাগ। এই লোকায়ত রাগটির মার্গীকরণ কবে হইয়াছিল বলা কঠিন, তবে ইহার উল্লেখ শুধু চর্যাগীতিতেই পাইতেছি, আগে বা পরে সে-উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছি না। বঙ্গাল রাগও যে কি ধরনের আজ আর তাহা বুঝিবার উপায় নাই, তবে এই রাগটিও যে এক সময় গুর্জরী, মালবশ্রী বা মালসী, শবরী প্রভৃতি রাগের মত স্থানীয় লোকায়ত রাগ ছিল, সন্দেহ নাই। অথচ ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতে বঙ্গাল-রাগ এক সময় সুপরিচিত রাগ ছিল, এবং অষ্টাদশ শতকের রাজস্থানী চিত্রনিদর্শনে বঙ্গাল-রাগের চিত্রও দুর্লভ নয়। পরে কখন কি ভাবে যে এই রাগটি লুপ্ত হইয়া গেল তাহা জানা যাইতেছেনা। বস্তুত, চর্যাগীতির দেবক্রী, গউড়া বা গবুড়া, মালসী-গবুড়া, শবরী, বঙ্গাল, কাহ্নগুর্জরী প্রভৃতি অনেক রাগই আজ বিলুপ্ত। দেশাখ-রাগ তো বোধ হয় আজিকার দেশ-রাগে বিবর্তিত বা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। অরু-রাগ যে কি তাহাও আজ আর বুঝিবার উপায় নাই।

সমসাময়িক সঙ্গীত-পদ্ধতির একটি সংকেত চর্যাগীতে খুব সুস্পষ্ট। এই গীতগুলির মূল পুঁথিতে এবং শাস্ত্রী-মহাশয়ের সংস্করণেও প্রতি পদের প্রত্যেক দুই লাইনের শেষে "ধ্রু" এই শব্দটির উল্লেখ আছে। "ধ্রু" যে ধ্রুবপদের সংকেত ইহাতে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। কয়েকটি পদের সংস্কৃত টীকাতেই 'ধ্রুবপদেন দৃঢ়ীকুর্বন', 'ধ্রুবপদেন চতুর্থানন্দ-মুদ্দীপয়ন্নাহ' ইত্যাদি ব্যাখ্যা বর্তমান ; কিন্তু মূল গীতে দ্বিতীয় পদটিকে বলা হইয়াছে ধ্রুবপদ, অথচ সংস্কৃত টীকায় ধ্রুবপদ বলা হইয়াছে তৃতীয় পদটিকে, এবং তাহাকেই দ্বিতীয় পদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বুঝিতে কিছু অসুবিধা নাই

চর্যাগীতির ধ্রুবপদ

যে, প্রথম পদের পর যে পদ তাহাই ধ্রুবপদ বা বাংলা ধুয়া। তিব্বতী টীকায়ও এই পদটিকে বলা হইয়াছে "ধু পদ"। ইহার অর্থই এই যে, প্রত্যেকটি পদ গাহিবার পরই এই 'ধু' বা ধ্রুবপদটি গাহিতে হইত। এই পদটিই বর্তমান উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতির 'স্থায়ী' পদ।

চর্যাপদগুলির ভাব-বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায় এই ধ্রুবপদটিতেই সহজ-সাধনের সূত্রটি ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সাধককে সতর্ক করা হইয়াছে। সেই জন্যই প্রত্যেক পদ গাহিবার পরে বারবার এই পদটি গাহিবার নির্দেশ ছিল—গায়কের এবং শ্রোতার বুদ্ধি ও দৃষ্টিকে বারবার ঐ দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য। উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতিতে 'স্থায়ী'র কাজও একই; স্থায়ীতেই বিশিষ্ট রাগটির প্রধান স্বর-সন্নিবেশ, এবং এই সন্নিবেশই রাগটির মানসচিত্রের কেন্দ্রবিন্দু। কাজেই বারবার স্থায়ীতে ফিরিয়া আসা প্রয়োজন, শ্রোতার মন ও দৃষ্টিকে ঐদিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদগুলিও রাগে-তালে গাওয়া হইত, এ-তথ্য সুপরিজ্ঞাত। গ্রন্থটির সমস্ত পাণ্ডুলিপিতেই রাগ ও তালের উল্লেখও আছে। এই গানগুলিতে ব্যবহৃত রাগের ও তালের সংখ্যা যথাক্রমে ১১ ও ৫ : মালব-রাগ—রূপকতাল, যতিতাল; গুর্জরী রাগ—নিঃসার তাল, যতিতাল, একতালী; বসন্ত-রাগ—যতিতাল; রামকিরী—যতিতাল; কর্ণাট-রাগ—যতিতাল; দেশাগ-রাগ (দেশাখ)—একতালী; দেশ-বরাড়ী-রাগ—রূপকতাল, অষ্টতালী; বরাড়ী-রাগ—রূপকতাল; গোণ্ডকিরী-রাগ—রূপকতাল; ভৈরবী-রাগ—যতিতাল; বিভাষ-রাগ—একতালী। মালব নিঃসন্দেহে মালবশ্রী-মালসী-মালশ্রী, এবং গোড়ায় ছিল স্থানীয় লোকায়ত গানের রাগ, পরবর্তী কালে মার্গ-সঙ্গীতে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়। গুর্জরী-রাগের কথা চর্যাগীতি-প্রসঙ্গেই বলিয়াছি। বসন্ত-ভৈরবী-বিভাষ প্রভৃতি রাগ তো আজও সুপ্রসিদ্ধ ও সুঅভ্যস্ত। রামকিরী, রামক্রী, রামগিরি একই রাগের বিভিন্ন নামরূপ। বরাড়ী ও দেশাখ (দেশাগ) বা দেশ-রাগের মিশ্রিত রূপ দেশ-বরাড়ী, এরূপ অনুমানে বাধা দেখিতেছি না। রামকিরী-রাগের নামানুসরণে গোণ্ডকিরী খুব সম্ভব প্রাচীনতর গোণ্ডক্রী নামের অপভ্রংশ, এবং মনে হয়, আদিম গোন্দ্ বা গোণ্ড্ জনদের স্থানীয় লোকায়ত গানের রাগ। বাংলাদেশে কর্ণাট-রাগের ব্যবহারের ইঙ্গিত জয়দেবের মত লোচন-পণ্ডিতও দিতেছেন; ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি, আর লোচন-পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিনী রচিত হইয়াছিল বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভকালে, বোধ হয় সেন-রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায়। আর, সেন-বংশীয় রাজারা তো আদিতে কর্ণাট-দেশবাসীই ছিলেন। দক্ষিণী কর্ণাটী সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি ক্ষীণধারার পরিচয় প্রাচীন বাংলাদেশে আছে, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। গীতগোবিন্দের গানের তাল-গুলির মধ্যে অন্তত নিঃসার-তালের কথা পরবর্তী কালে কোথাও শুনিতেছিনা। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বলিতেছেন, "যে-সব ঘরানাতে জয়দেবের গান সংরক্ষিত আছে, সেখানে গীতগোবিন্দের গান শিখিতে গিয়া বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব সঙ্গীতাধ্যাপক মহারাষ্ট্রদেশীয় পণ্ডিত ভীমরাও-শাস্ত্রী তাহার স্বরলিপি ও তালের বাঁট লইয়া আসেন। সেই বাঁট দেখিয়া আচার্য ভাতখণ্ডে বলেন, 'এ কি! এ-সব যে মালাবারের জিনিষ!'"।

গীতগোবিন্দের রাগ ও তাল

বস্তুত, সমসাময়িক বাংলার সঙ্গীত-সাধনায় দক্ষিণী প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। লোচনের রাগতরঙ্গিনী-গ্রন্থেও সে-প্রভাব অনস্বীকার্য। সে-কথা পরে বলিতেছি। হয়তো নৃত্যেও সে-প্রভাব ছিল, বিশেষত দেবদাসী নৃত্যে; এবং সমসাময়িক কালে বাংলাদেশের রাজসভায় ও অভিজাত স্তরে এই নৃত্য, বাররামাদের নৃত্য প্রভৃতি বহুল প্রচলিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে, শিখদের শ্রীগুরু-গ্রন্থে জয়দেবের যে গান দুইটি উদ্ধার করা আছে সে দু'টি যথাক্রমে গুজরী বা গুর্জরী এবং মারু (মরুবাসী মাড়বারীদের স্থানীয় লৌকিক ?)-রাগে গাওয়া হইত।

তুম্বুরুনাটক-গ্রন্থ ও প্রাচ্যরীতি

চর্যাগীতির রাগতালিকা এবং গীতগোবিন্দের রাগ ও তাল-তালিকা বিশ্লেষণ করিলে সহজেই মনে হয়, সমসাময়িক বাংলাদেশে সঙ্গীতচর্চার অপ্রাচুর্য ছিল না, এবং সর্বভারতীয় মার্গসঙ্গীত-প্রবাহের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগও ছিল ঘনিষ্ঠ। সেইজন্যই মনে হয়, সঙ্গীতশাস্ত্র লইয়াও কিছু না কিছু আলোচনা নিশ্চয়ই হইয়া থাকিবে। লোচন-পণ্ডিত রাগতরঙ্গিণী-গ্রন্থে প্রাচীনতর তুম্বুরুনাটক-গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই; তবে মনে হয়, কোনো বিশেষ নাট্যশাস্ত্রসম্পর্কিত গ্রন্থ ছিল এই তুম্বুরু নাটক। লোচন এই গ্রন্থ হইতে কিছু মতামত উদ্ধার করিয়াছেন। একটি উদ্ধৃতিতে আছে:

ইন্দুত্থানং সমারভ্য যাবদ্দুর্গামহোৎসবম্
প্রাতর্গেয়স্তু দেশাখো ললিতঃ পটমঞ্জরী ॥

এই যে শুক্লপক্ষের (দেবীপক্ষে) সূচনা হইতে দুর্গামহোৎসব পর্যন্ত প্রাতঃকালে দেশাখ, ললিত ও পটমঞ্জরী রাগে গান গাওয়া, এ যেন একান্তই বাঙালীর দুর্গাপূজার আগের কয়েকদিনের আগমনী গান, এবং রাগগুলিও সেই দিক হইতে লক্ষ্য করিবার মতন। এই ভাবে দুর্গামহোৎসব তো আর কোথাও হয় না, বা হইত না! সেইজন্যই মনে হয় গ্রন্থকার যিনিই হউন, তিনি প্রাচ্য দেশ, বিশেষভাবে গৌড়-বঙ্গের কথাই যেন বলিতেছেন! সঙ্গীত সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে,

দেশভাষাবিভেদাশ্চ রাগসংখ্যা ন বিদ্যতে।
ন রাগাণাং ন তালানামন্তঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥

দেশভাষা যেমন স্বল্প বিভেদে অনন্ত, তেমনই রাগের সংখ্যাও অনন্ত; রাগ ও তালের অন্ত কোথাও দেখা যায় না। ইহাই প্রাচ্যদেশীয় মত। রক্ষণশীল উৎকট মার্গপন্থীরা আজও এই মত স্বীকার করেন না, আগেও করিতেন বলিয়া মনে হয় না। সঙ্গীতের দিক্ হইতে তুম্বুরুনাটক-গ্রন্থের মতামত অন্য কারণেও উল্লেখযোগ্য। মার্গ-সঙ্গীতের ধারায় বিশেষ বিশেষ রাগ-রাগিণীর জন্য বিশেষ বিশেষ কাল শাস্ত্রানুসারে নির্দিষ্ট। তুম্বুরুনাটকের রচয়িতা এই মত স্বীকার করিতেন না; তাঁহার মতে, রাগের কাল স্থিরীকৃত হয় স্বরবৈচিত্র্যের রঞ্জকতা অনুযায়ী।

যথাকালে সমারব্ধং গীতং ভবতি রঞ্জকম্।
অতঃ স্বরস্ত নিয়মাদ্ রাগেঽপি নিয়মঃ কৃত ॥

নাট্যরঙ্গমঞ্চে বা রাজসভায়ও কালদোষ থাকিতে পারে না (রঙ্গভূমৌ নৃপাজ্ঞায়াং কালদোষো ন বিদ্যতে), কারণ, রঙ্গভূমিতে গান গাহিতে হয় নাটকের প্রকরণ বা কালানুযায়ী এবং রাজসভায় রাজার আজ্ঞায়।

বুদ্ধনাটকের নৃত্যগীত

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে চর্যাগীতিতে বুদ্ধনাটকের কথা। কিন্তু এই নাটকের কি ছিল রূপ এবং নৃত্যগীতের কি ছিল স্থান, কি-ই বা ছিল তাহাদের প্রকৃতি, বলিবার কোনো উপায় নাই। কিন্তু প্রাচীনকালে নৃত্য বা নৃত্ত ছাড়া নাটক ছিল না; কাজেই বুদ্ধনাটকই হউক আর তুম্বুরুনাট্যই হউক, নৃত্য ছিলই, বাদ্যও ছিল এই অনুমানে বাধা নাই। বিশেষত, আলোচ্য চর্যাগীতিটিতেই পাইতেছি, 'নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি দেবী, বুদ্ধনাটক বিসমা হোই'।

প্রাচীন বাংলায় সঙ্গীত-শাস্ত্রালোচনার একমাত্র নিদর্শন যাহা আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা লোচন-পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিনী। এই গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে, লোচন রাগতরঙ্গিনী ছাড়া আরও অন্তত একখানা সঙ্গীত-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাহার নাম ছিল রাগসংগীতসংগ্রহ, কিন্তু সে-গ্রন্থ এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই (এতেষাং প্রপঞ্চস্তু মৎকৃতরাগসংগীতসংগ্রহে অন্বেষ্টব্যঃ)। তাঁহার কালে অন্য পণ্ডিতদের রচিত আরও

লোচনের রাগতরঙ্গিনী

অনেক সঙ্গীতশাস্ত্রের কথা লোচন ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু সে-সব গ্রন্থের একটিও আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বস্তুত, লোচনের রাগতরঙ্গিনী এবং শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত-রত্নাকরের চেয়ে প্রাচীনতর কোনো সঙ্গীত-গ্রন্থের কথাই আমরা জানিনা।

লোচনের রাগতরঙ্গিনী-গ্রন্থে দেশী ভাষার গানের নমুনা হিসাবে মৈথিল অপভ্রংশে রচিত শ্রীবিদ্যাপতির মৈথিলগীতি উদ্ধার করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এই গ্রন্থে অমীর খুসরু (ত্রয়োদশ শতকের শেষ, চতুর্দশ শতকের গোড়ায়) বা তাঁহার কিছু পরে প্রচলিত ইমন্, ফিরদোস্ত্ প্রভৃতি রাগের নাম আছে। সেই হেতু পণ্ডিতেরা অনেকে মনে করেন, লোচন চতুর্দশ শতকের আগের লোক হইতে পারেন না। কিন্তু আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, লোচন-পণ্ডিত বল্লালসেনের আমলের লোক ছিলেন, এবং ১০৮২ শকাব্দ—১১৬০ খ্রীষ্ট বৎসরে বল্লালসেনের রাজত্বের প্রথম বৎসরে লোচন-পণ্ডিত রাগতরঙ্গিণী-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; বিদ্যাপতির গান বা ইমন্ ও ফিরদোস্ত্-রাগের কথা প্রভৃতি পরবর্তী কালে এই গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থের পুষ্পিকা শ্লোকটি সুস্পষ্ট।

ভুজবসুদশমিতশাকে শ্রীমদ্ বল্লালসেনরাজ্যাদৌ।
বর্ষৈকষষ্টিভোগে মুনয়স্ত্বাসন বিশাখায়াম্ ॥

এই হিসাবে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভে ১০৮২ শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছিল। ১০৮২ শক —১১৬০ খ্রীষ্টাব্দ যে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভের কাল তাহা অন্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সাক্ষ্য দ্বারাও সমর্থিত। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেই সব সাক্ষ্যেরও বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

স্বর ও স্বরসংস্থান

গ্রন্থারম্ভেই লোচন স্বরসংস্থান সংজ্ঞার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শুদ্ধ স্বর সাতটি এবং তাহা বাইশটি শ্রুতির মধ্যে যথাস্থানে অধিষ্ঠিত; বিকৃত স্বর হইল শুদ্ধ স্বরের তীব্র বা কোমল রূপ মাত্র; কাজেই শুদ্ধ স্বরেরই দাবী মান্য এবং সাতটি শুদ্ধ স্বরই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবহৃত বিকৃত স্বর হইতেছে কোমল ঋষভ, তীব্রতর গান্ধার, তীব্রতম মধ্যম, কোমল ধৈবত এবং তীব্রতর নিষাদ; বিকৃত স্বরকে তিনি বলিতেছেন কাকলী। পূরবা বা পূরবীতে লোচন নিজে তীব্র ধৈবত ব্যবহার করিয়াছেন। আর যে-সব তালের (চঞ্চৎপুট, চাচপুট ইত্যাদি) কথা তিনি বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ বা অভ্যাস পরবর্তীকালে দেখা যাইতেছে না।

জনক ও জন্য-রাগ

লোচনের মতে প্রাচ্যদেশে প্রচলিত রাগ বারোটি মাত্র; ইহাদের প্রত্যেকটিরই নাম ও লক্ষণও তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। এই বারোটি রাগই [ভৈরবী, গৌরী (গৌড়ী ?), কর্ণাট, কেদার, ইমন্, সারঙ্গ, মেঘ, ধানশ্রী বা ধনাশ্রী, টোড়ী, পূর্বা, মুখারী ও দীপক] জনক-রাগ, এবং এই জনক-রাগ কয়টি হইতেই অন্যান্য অনেক রাগের উৎপত্তি—সে-গুলি হইতেছে জন্য-রাগ, যেমন ভৈরবী হইতে দুইটি, কর্ণাট হইতে কুড়িটি, গৌরী হইতে সাতাশটি, ইমন্ হইতে চারিটি, কেদার হইতে তেরোটি, সারঙ্গ হইতে পাঁচটি, মেঘ হইতে দশটি, ধনাশ্রী বা ধানশ্রী হইতে দুইটি, এবং টোড়ী, পূর্বা, মুখারী ও দীপক এই চারিটির প্রত্যেকটি হইতে এক একটি, এই মোট ৮৬টি জন্য-রাগ। পূরবা বা পূর্বা—পূরবী, সন্দেহ নাই; কিন্তু মুখারী রাগ আজ অপ্রচলিত। এই জন্য-রাগ গুলির লক্ষণ অর্থাৎ আরোহ-অবরোহ সম্বন্ধে লোচন কিছু আলোচনা করেন নাই, অন্যত্র দেখিয়া লইতে বলিয়াছেন।

লোচনের জনক ও জন্য-রাগের প্রকরণটি পড়িলে পরিষ্কার বুঝা যায়, নানা রাগের মিশ্রণে নূতন নূতন রাগ সৃষ্ট হইত; আবার সেই সব মিশ্ররাগের মিশ্রণেও নূতন নূতন সংকর-রাগের উদ্ভব ঘটিত। লোচন তাহা জানিতেন, এবং সেই জন্যই তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকরণ হইল সকল দেশে গুণীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ যত মিশ্র ও সংকর-রাগ তাহাদের নামোল্লেখ এবং তাহাদের জনক-রাগের নির্দেশ।

লোচনের সময়ই বিভিন্ন রাগের ঠাট্-কাঠামো লইয়া কিছু কিছু মতভেদ দেখা দিয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, লোচন মনে করিতেন, ভৈরবীতে শুদ্ধ সপ্তস্বর ব্যবহার করাই সঙ্গত; কিন্তু তখনই কেহ কেহ ভৈরবী-রাগে কোমল ধৈবত ব্যবহার করিতেন। লোচন তাহা পছন্দ করিতেন না, কারণ তাঁহার মতে তাহা অশুদ্ধ এবং যথেষ্ট

টত্তরঙ্গকও নয়। কোন্ কোন্ রাগ কখন গাওয়া হইবে সে-সম্বন্ধেও কিছু কিছু মতভেদ দাড়াইয়া গিয়াছিল; লোচন তাহা আলোচনা করিতে গিয়া তুম্বুরুনাটক-গ্রন্থের মতামত উদ্ধার করিয়া তাহাই সমর্থন করিয়াছেন।

চর্যাগীতি-লোচন-জয়দেবের পর বহুদিন বাংলাদেশে প্রচলিত মার্গবন্ধ রাগ-রাগিণী গুলির পরিচয় আর পাইতেছি না। প্রায় আড়াই-শ' তিন-শ' বৎসর পর বড়ু চণ্ডীদাস-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদগুলি যে-সব রাগে ও তালে গাওয়া হইত তাহার সুবিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপিতেই। তুলনায় সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া রাগগুলির নামোল্লেখ এখানে করিতেছি: কোড়া, কোড়া-দেশাগ, বরাড়ী, দেশ-বরাড়ী, কহ্ন(কহু)-গুজ্জরী(গুর্জরী) বিভাষ, বিভাষ-কহ্ন, বঙ্গাল, বঙ্গাল-বরাড়ী, গুজ্জরী (গুর্জরী), পাহাড়িয়া (নিঃসন্দেহে লোকায়ত রাগ), দেশাগ (দেশাখ), আহের (আহীরী, অর্থাৎ আভীর বা আহীর কৌমের লোকায়ত সঙ্গীতের রাগ?), রামগিরি (রামক্রী—রামকেলী), ধানুষী (ধানশ্রী), মালব (মালবশ্রী—মালশ্রী—মালসী), বেলবলী, কেদার, মল্লার, ভাটিয়ালী (নিঃসন্দেহে লোকায়ত সঙ্গীতের রাগ.), ললিত, মাহারঠা (মহারাষ্ট্র-প্রান্তের স্থানীয় লোকায়ত রাগ?), শৌরী (শৌরসেনী, অর্থাৎ শূরসেন অঞ্চলের স্থানীয় লোকায়ত রাগ?), বসন্ত, ভৈরবী, শ্রী, সিন্ধোড়া (পরবর্তী হিন্দোলা; গোড়ায় কি সিন্ধু-প্রান্তের স্থানীয় লোকায়ত রাগ?); পঠ(পট)মঞ্জরী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদগুলির তাল-মান-লয়ের পরিচয়ও সবিস্তারেই পাইতেছি। তালের মধ্যে যতি, একতাল, অষ্টতাল, রূপক, অঠ্কুক, কুড়ুকুক, লঘুশেখর, ক্রীড়া প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে। রাগের তালিকাটি একটু মনোযোগে বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, বাংলা দেশের উচ্চস্তরের গানে ভারতের নানা প্রান্তের লোকায়ত সঙ্গীতের সুর ইত্যাদি যেমন স্থান লাভ করিতেছিল, তেমনই ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতের সঙ্গেও ক্রমশ লোকায়ত সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। প্রাচীন বাংলাদেশও এই সমন্বয়-ক্রিয়া হইতে বাদ পড়ে নাই, কিংবা উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীত-প্রবাহ হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে নাই; অন্তত দশম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে-সব সাক্ষ্য বিদ্যমান তাহাতে এই তথ্য সুস্পষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাগ ও তাল

বাদ্যযন্ত্রাদির কথা আগে অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি; এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া লাভ নাই। তবে, নৃত্যগীতবাদ্য সম্বন্ধে চর্যাগীতিতে পটমঞ্জরী রাগে গেয় একটি গান আছে; সেটি উদ্ধার করিতেছি।

নৃত্য-গীত-বাদ্য

সুজ লাউ সসি লাগেলী তান্তী
অণহা দাণ্ডী চাকি কিঅত অবধুতী।
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা
সুন-তান্তি-ধনি বিলসই রুণা। ধ্রু।

আলি কালি বেণি সারি সুনিআ
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ।
অবে করহা করহকলে চাপিউ
বতিশ-তান্তি-ধনি সএল বিআপিউ ॥
নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি দেবী
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥

সূর্য লাউ, শশী লাগিল তন্ত্রী, অনাহত দাণ্ডী, অবধূতী হইল চাকী। হে সখি! অনাহত বীণা বাজিতেছে, শূন্য তন্ত্রীর ধ্বনি বিলসিত হইতেছে করুণ সুরে। অ-বর্গ ও ক-বর্গ দুই শোনা যাইতেছে সারিকা (বা সপ্তস্বর)। গজবরের সমরস সন্ধি শোনা হইল। যখন হাতে করতল চাপা হইল তখন বত্রিশ তন্ত্রীর ধ্বনি সকল দিকে বিস্তৃত হইল। বাজিল (হেবজ্র) নাচিতেছেন, দেবী গাহিতেছেন, বুদ্ধনাটক বিসম হইতেছে।

লাউ-এর খোলের সাহায্যে তারের বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন, সপ্তস্বর, সুরের বিলাস, বত্রিশটি তার, সনৃত্য গান সমস্তই এই গীত্‌টিতে সুস্পষ্ট। জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতীও তো স্বামীর গীতগোবিন্দ গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নাচিতেন, এমন জনশ্রুতি বিদ্যমান; এবং সেই জনশ্রুতি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে কোচবিহার-রাজ নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজের সভাকবি রাম-সরস্বতী তাঁহার জয়দেব-কাব্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

জয়দেব মাধবর স্তুতিক বর্ণাবে,
পদ্মাবতী আগত নাচন্ত ভঙ্গিভাবে।…
কৃষ্ণর গীতক জয়দেবে নিগদতি,
রূপক তালর চেবে পদ্মাবতী ॥

নৃত্যের নানা লোকায়ত রূপের পরিচয় পাওয়া যায় পাহাড়পুর এবং ময়নামতীতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকগুলিতে; আর উচ্চকোটি-লোকসমাজে যে ধরনের নৃত্য প্রচলিত ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় সমসাময়িক প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ নৃত্যপর ও নৃত্যপরা নানা দেবদেবী, অপ্‌সরা, গন্ধর্ব-নারী, মন্দির-নর্তকী প্রভৃতিদের নৃত্যের গতিতে ও ভঙ্গিমায়।

৩

তক্ষণ-শিল্প
প্রাথমিক বিকাশ ও
ক্লাসিক্যাল পর্ব

পাথরে বা কাঠে তক্ষণ-শিল্পের যে-সব দৃষ্টান্ত বাংলার মাঠে-ঘাটে গাছের তলায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, নানা চিত্রশালায় সংগৃহীত, কিছু আদরে, বেশির ভাগ অজ্ঞতায়, অনাদরে এবং অবহেলায়, তাহার প্রায় অধিকাংশই এক সময় ছিল কোনো না কোনো মন্দির বা বিহারের অংশ—গর্ভগৃহের দেবদেবী, প্রাচীর-গাত্র, কুলুঙ্গি বা দরজার অলংকরণ। এ-ধরনের বিহার ও মন্দিরের কথা যে পরিমাণে সমসাময়িক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, সাহিত্য ও লিপিমালায়

পাঠ করা যায় সেই পরিমাণে ইহাদের সাক্ষাৎ আজ আর পাওয়া যায় না; বহুদিন আগেই সে-সব মাটির ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে। পাথর বা পোড়ামাটি বলিয়া তক্ষণ-শিল্পের নিদর্শনগুলি ইতস্তত পড়িয়া আছে মাত্র, ভগ্ন বা অল্পবিস্তর অক্ষত অবস্থায়। কাজেই, স্বাভাবিক ও মৌলিক উদ্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে আজ আর ইহাদের সাক্ষাৎ পাইবার উপায় নাই, এবং সেই হেতু ইহাদের যথার্থ শিল্পরূপও আর আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়। ব্যক্তিগত সংগ্রহে বা সাধারণ চিত্রশালায় ইহাদের পরিপূর্ণ রসোপলব্ধি, এমন কি রূপবোধও কিছুতেই সম্ভব নয়; এ-ভাবে, এ-পরিবেশে দেখিবার জন্য বা আমাদের জ্ঞানের কৌতূহল বা চিত্তের রূপতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্য ইহাদের সৃষ্টি হয় নাই, হইয়াছিল একটা বিশেষ প্রেরণায়, বিশেষ পরিবেশে বিশিষ্ট একটা উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য। সে-প্রেরণা ধর্মবোধগত—আমাদের প্রচলিত অর্থে নন্দনবোধগত নয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বোধগত আনন্দের জন্য নয়; সে-পরিবেশ বিশিষ্ট সমাজের ও সম্প্রদায়ের সামগ্রিক ঐক্য ও মিলন-বোধগত, কারণ, পূজামন্দির বা তীর্থস্থানগুলিই ছিল সেই ঐক্য ও মিলনের কেন্দ্র, এবং সেই উদ্দেশ্য হইতেছে সমাজ ও সম্প্রদায়গত ধর্ম ও ঐক্যবোধে ব্যক্তি ও সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা, সচেতন করা। এই প্রেরণা, পরিবেশ বা উদ্দেশ্য কিছুই আজ আর উপস্থিত নাই; কাজেই সাম্প্রতিক মানুষের পক্ষে ইহাদের যথার্থ মূল্য ও আবেদনের পরিমাপ করা অত্যন্ত কঠিন। তবু, সবিনয়ে একথা স্বীকার করা ভাল যে, যে-শৈলী ও রীতি-বিবর্তনের দিক হইতে বা নন্দনবোধের দিক হইতে আমরা সাধারণত ইহাদের মূল্যবিচার করিয়া থাকি তাহাই ইহাদের সর্বাঙ্গীন পরিচয় নয়, এমন কি প্রধান পরিচয়ও নয়। শিল্প সম্বন্ধে এই একান্ত রূপগত ও ইন্দ্রিয়গত দৃষ্টি একেবারেই সাম্প্রতিক কালের, এবং ভারতীয় চিন্তাধারা ও ঐতিহ্যানুযায়ী অবান্তর। সে-ধারা ও ঐতিহ্যে রূপসৃষ্টি উদ্দেশ্য সাধনের একাধিক উপায়ের মধ্যে একটি উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য কখনও নয়।

তাহা ছাড়া, ঘরে বসিয়া বা চিত্রশালায় ঘুরিয়া আমরা ইহাদের যে-রূপ প্রত্যক্ষ করি তাহা ইহাদের উদ্দিষ্ট রূপও তো নয়। যে-মূর্তির পূজা হইত তাহা থাকিত গর্ভগৃহের অন্ধকারে বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত; তাহার উপর পড়িত প্রদীপের ক্ষীণ আলো। সেই প্রায়ান্ধকারে স্তিমিত আলোর জ্যোতির মধ্যে ভক্ত ও পূজারীর সম্মুখে দেবতা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেন—নিবাত নিষ্কম্প শিখার পেলব আলোয় প্রস্তরীভূত দেহে ধীরে ধীরে প্রাণের স্পর্শ লাগিত, দেহের রেখা ও ভঙ্গী ধূপের ধোঁয়ার মধ্যে ধরা-অধরার দোলায় দুলিত। তাহারই ভিতর দেবতার মুখমণ্ডল থাকিত স্থির ও অচঞ্চল। শিল্পীর এই তথ্য অজানা ছিল না; এবং সেই অনুযায়ীই তিনি পূজাবেদীর উদ্দিষ্ট মূর্তির রূপ-কল্পনা করিতেন, এবং কল্পনা ও ধ্যানানুযায়ী পাথরে সেই রূপ ফুটাইয়া তুলিতেন, যে-রূপ কালজয়ী, যে-রূপ মানুষের মৌলিক ভাবনা-কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর, যে-সব মূর্তি ও অলংকরণ থাকিত মন্দিরের বাহিরে প্রাচীর-গাত্রে তাহাদের রূপ-কল্পনা অন্য প্রকারের, অন্য দৃষ্টির;

কারণ, তাহাদের উপর পড়িত সারাদিনের সূর্যের আলো, কখনো রক্তিমাভায়, কখনো ছায়ায়, কখনো প্রদীপ্ত কিরণবাণে। সেখানে নিত্য সংসারের অফুরন্ত লীলা; দেবতা-মানুষ-পশুপক্ষী-গাছপালা সকলে মিলিয়া অনন্তকাল ধরিয়া যে-জীবনলীলায় মাতিয়াছে তাহারই গতিময় ভঙ্গিমা, ছন্দিত ছবি। তাহার উপর কালাতীত জীবনের স্বাক্ষর যেমন সুস্পষ্ট তেমনই সুস্পষ্ট কালধৃত জীবনের হস্তাবলেপ। কোনোটাই উপেক্ষার বস্তু নয়। অথচ, ঘরে বা চিত্রশালায় ইহাদের সেই উদ্দিষ্টরূপ ধরা পড়িবার উপায় একেবারেই নাই, এমন কি সাম্প্রতিক কালের চেতনা-কল্পনার মধ্যেও তাহা নাই। ধর্মগত ও সামাজিক, স্থানগত ও কালগত, অর্থ ও উদ্দেশগত সমস্ত পরিবেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া আজ ইহাদের মূল্য শুধু আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, হয় ইহাদের নন্দনত্ব গুণে, না হয় প্রতিমা-লক্ষণের অভিজ্ঞানে। অথচ, সেই নন্দনত্বও সবটুকু আমাদের চোখে ধরা পড়িতেছে না!

সাধারণ ভাবে এই কয়েকটি কথা মনে রাখিয়া প্রাচীন বাংলার তক্ষণ-শিল্পালোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই উষ্ণ, জলীয়, বৃষ্টিস্নাত, নদীবিধৌত বাংলাদেশে সুপ্রাচীন নিদর্শন যে পাওয়া যাইতেছে না, তাহা কিছু অস্বাভাবিক নয়; অন্যান্য কারণের ইঙ্গিত আগেই দিয়াছি। খ্রীষ্টোত্তর ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের আগেকার নিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে, সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এ-ক্ষেত্রেও তাহা স্বল্পই। স্বল্পতার প্রধান কারণ, দেশের মাটি ও জলবায়ু, পাথরের অপ্রাচুর্য, যথাযথ খননাবিষ্কারের অভাব, কিন্তু সর্বোপরি যে-কারণ ছিল সক্রিয় তাহা ঐতিহাসিক। প্রাচীন বাংলাদেশে আর্য-সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ স্পর্শ খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের আগে ভাল করিয়া লাগেই নাই, এবং সেই সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল মধ্যদেশের সঙ্গে যোগাযোগও খুব ঘনিষ্ঠ হইয়া ওঠে নাই। তাহার আগে আদিম কোম-সন্নিবিষ্ট রাঢ়-পুণ্ড্র-সুহ্ম-বঙ্গ প্রভৃতি জনপদ নিজদের সমাজ-সংস্থা, নিজদের শিল্প ও সংস্কৃতি, নিজদের জীবনযাত্রা লইয়া ভারতবর্ষের এক ধারে পড়িয়াছিল—আর্যমনের অবজ্ঞা ও অজ্ঞতায়। মাঝে মাঝে আর্যীকরণের এবং ভারতবর্ষের সামগ্রিক জীবনধারার স্রোতের মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা যে হয় নাই, এমন নয়; কিন্তু আদিম কৌম মনের স্বাভাবিক প্রবণতাই ছিল সে-স্রোতকে যতটা সম্ভব ঠেকাইয়া রাখা। এই সব কৌম নরনারীর নিজদের শিল্প কিছু ছিল না, এমন নয়; কিন্তু আগেই বলিয়াছি সে-সব শিল্পের উপাদান উপকরণ ছিল ক্ষীণ জীবী—মাটী, খড়, বাঁশ, বড় জোর কাঠ। কাজেই সে-সব নিদর্শন কালের ও প্রকৃতির হাত এড়াইয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই, যদিও তাহাদের ঐতিহ্য ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্য আজও অব্যাহত। ভারতবর্ষে আমরা পাথর-কুঁদিতে শিখিয়াছি মাত্র মৌর্য-আমলে বা তাহার কিছু আগে; কিন্তু সেই শিক্ষা বাংলাদেশে আসিয়া পৌঁছিতে এবং বহুল প্রচলিত হইতে আরও কয়েক শত বৎসর লাগিয়াছিল। গুপ্ত-পর্বের আগে কিছু কিছু নিদর্শন বাংলা দেশের নানা জায়গায় পাওয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার বেশির ভাগই পোড়ামাটির অথবা ছোট ছোট টুকরো পাথরের, এবং সেই হেতু এক জায়গা হইতে অন্য

জায়গায় সহজেই বহন করিয়া লইয়া যাইবার মত। কাজেই জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই যে, এই নিদর্শনগুলি বাংলার বাহির হইতে—মধ্যদেশ হইতে—সমসাময়িক শিল্পী-ব্যবসায়ী-বণিক প্রভৃতিরা বহন করিয়া লইয়া আসেন নাই। অন্তত, ইহাদের মধ্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য কিছু নাই, বরং সমসাময়িক কালের মধ্য-ভারতীয় শিল্পশৈলীর প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। বস্তুত, সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এ-ক্ষেত্রেও তেমনই, এই নিদর্শনগুলিই বাংলাদেশে মধ্য-ভারতীয় আর্য-সভ্যতা বিস্তৃতির প্রথম পদচিহ্ন।

শুঙ্গ ও কুষাণ শিল্পের ধারা

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক পর্যন্ত সমগ্র গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা ও মধ্য-ভারত জুড়িয়া পোড়ামাটির এক ধরনের শিল্পশৈলী প্রচলিত ছিল। পাটলীপুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মথুরা পর্যন্ত নানা জায়গায়—বসার, রাজঘাট, কৌশাম্বী বা কোসাম, এলাহাবাদ, ভিটা, বক্সার, পাটলীপুত্র ও তাহার উপকণ্ঠ, মথুরা প্রভৃতি স্থানে অল্পবিস্তর পরিমাণে এই শিল্পশৈলীর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই যৌবনসমৃদ্ধ নরনারী মূর্তি, বিশেষভাবে নারীমূর্তি, কিছু কিছু শিশুমূর্তিও আছে, কিছু কিছু আছে শুধু শিশু ও নরনারীমুণ্ড। অনেকগুলি মুণ্ডের আকৃতি ও মুখাবয়বে, কেশবিন্যাসে এবং মস্তকাভরণে সমসাময়িক যাবনিক (গ্রীক ও রোম্যান্) বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। কোনো কোনোটিতে যে ব্যক্তিগত অর্থাৎ প্রাতিকৃতিক বৈশিষ্ট্যও নাই এমন নয়। সন্দেহ নাই যে, সমসাময়িক কালে শিল্পীদের চোখের সম্মুখে এই সব বিদেশীদের যাতায়াত এবং বসবাস ছিল। তাহা ছাড়া, মাটী দ্বারা প্রতিকৃতি রচনার প্রচলনও নিঃসন্দেহে ছিল। এই ধরনের নরনারী মূর্তি ছাড়া নানা চলিত কথা ও কাহিনীর রূপায়নও অজ্ঞাত ছিল না; কৌশাম্বী, মথুরা এবং অন্যান্য স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে এই ধরনের কাহিনী-বর্ণনাগত ফলকও অনেক পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশে পোখরণা (বাকুড়া জেলা), তমলুক, মহাস্থান প্রভৃতি প্রত্নভূমি হইতে যে কয়েকটি পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গিয়াছে তাহা ঠিক এই জাতীয় বর্ণনাগত ফলক নহে, বরং তাহাদের আত্মীয়তা পূর্বোক্ত যৌবনগর্বিতা, অলংকারভারগ্রস্তা, আত্মসচেতনা নারীমূর্তিগুলির সঙ্গে। ইহাদের সর্বাঙ্গে স্থূল অথচ বিচিত্র আয়তন ও আকৃতির অলঙ্কার; কেশভার সুপ্রচুর এবং নানা আকারে ও ভঙ্গীতে সেই কেশের বিন্যাস; যৌন ও যৌবনলক্ষণ আয়ত ও উচ্চারিত; স্থিতি ও গতিভঙ্গী সচেতন, বসন স্থূল অথচ সমৃদ্ধ এবং সমসাময়িক রুচি অনুযায়ী সুবিন্যস্ত। এই নারীমূর্তিগুলি উত্তর-ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশেষ একটা স্তরের প্রতীক। রুচি, সংস্কৃতি ও অভ্যাসের দিক হইতে আদিম কৌম-মানসের স্থূলত্ব ইহাদের এখনও ঘুচে নাই, অথচ ইহারা যে-সমাজের প্রতিনিধি সেই সমাজের আর্থিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক পরিবেশ ইহাদিগকে দেহগত যৌবন ও সৌন্দর্য, আলংকারিক ঐশ্বর্য এবং যৌন আবেদন সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছে। এই দুয়ের অর্থাৎ একদিকে রুচির ও অভ্যাসের স্থূলত্ব; অন্যদিকে দেহ ও অর্থগত সমৃদ্ধির সচেতনতার সহজ সংঘাত ও সমন্বয় দুইই

এই মূর্তিগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট। সন্দেহ নাই যে, এই বৈশিষ্ট্য গ্রাম্য কৌম-সমাজের কখনও হইতে পারেনা—সে-সমাজের সহজ সারল্য ও নিরলঙ্কার সৌন্দর্য ইহাদের মধ্যে কোথাও নাই। এমন কি, বরহুতের প্রস্তর স্তূপ-বেষ্টনীর ফলকগুলির নারীমূর্ত্তির মধ্যে বসনভূষণের প্রাচুর্য এবং সমৃদ্ধ কেশবিন্যাস সত্ত্বেও যে সলজ্জ আড়ষ্টতা, যে নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব, যে ভীত মন্থরতার আভাস বর্তমান, এই নারীমূর্তিগুলি সেই স্তর বহুদিন পার হইয়া আসিয়াছে; সেই মানস আর ইহাদের মধ্যে বর্তমান নাই। সেই জন্যই, বহিরাবয়ব বা বসনভূষণ-ভঙ্গিমার দিক হইতে শুঙ্গ আমলের বলিয়া মনে হইলেও বস্তুত ইহারা আরও কিছু পরবর্তী কালের, যে-কালে সমাজের, অন্তত সমাজের একটা বিশিষ্ট স্তরের অর্থসমৃদ্ধি বাড়িয়াছে, প্রাথমিক লজ্জা-ভয়-আড়ষ্টতা কাটিয়া গিয়াছে, সচেতন নগর-সভ্যতা কিছুটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সেই বিশেষ স্তরের নারীরা দেহগত ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে, এবং বৃহত্তর সমাজের নানা দেশি-বিদেশি আদান-প্রদানের সম্মুখীন হইয়াছে বা হইতেছে। অথচ, কি রুচি, কি শিল্পরীতি বা ভঙ্গী কোনো দিক হইতেই ইহাদের স্থূলত্ব তখনও ঘুচে নাই। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে যে নাগর-জীবনের আভাস আমরা পাইতেছি সেই সূক্ষ্ম, সুরুচিসম্পন্ন, সচেতন ও বাণিজ্য সমৃদ্ধ অভিজাত নাগর-সমাজ এখনও গড়িয়া উঠে নাই, কিন্তু তাহার সূচনা কেবল দেখা দিতেছে, অর্থাৎ স্থূল কৌম সমাজ ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ ও সচেতন নাগর-সমাজে বিবর্তিত হইতেছে মাত্র। এই অবস্থার, সমাজ-বিবর্তনের এই স্তরের ছবিই ধরা পড়িতেছে পোড়ামাটির এই অসংখ্য ফলক গুলিতে, বিশেষ ভাবে নারীমূর্তি গুলিতে। বাণিজ্য-সমৃদ্ধির প্রেরণায় ক্রমবর্ধমান নগরগুলির গৃহ-সজ্জায় এই সব মৃৎফলক ব্যবহৃত হইত, সন্দেহ কি! এই সামাজিক অবস্থার কিছু কিছু স্বাক্ষর পড়িয়াছে সাঁচী স্তূপের প্রস্তর-তোরণের ফলক গুলিতে, স্বল্পাংশে বুদ্ধগয়ার বেষ্টনীর উপর, কিন্তু আরও উচ্চারিত রূপে মথুরার কয়েকটি প্রস্তর-বেষ্টনীর গাত্রে। কিন্তু, এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রুচিবোধ আরও একটু সূক্ষ্ম ও অভিজাত, মন ও দৃষ্টি আরও সচেতন, এবং কারুকলার আঙ্গিক আরও সুনিপুণ। তবে, সামাজিক বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরের স্থূলতর প্রমাণ হিসাবে মৃৎফলক গুলির সাক্ষ্য অধিকতর প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশে যে-ক'টি এই ধরনের মৃৎফলক পাওয়া গিয়াছে তাহার সঙ্গে কৌশাম্বী-পাটলীপুত্র-বসার প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের ফলকগুলির আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ। কিন্তু সংখ্যায় এত স্বল্প যে, ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া বলা কঠিন, সমাজ-বিবর্তনের সদ্যোক্ত তরঙ্গ এই সময় বাংলাদেশেও আসিয়া লাগিয়াছিল কিনা। কিছুটা স্পর্শ হয়তো লাগিয়া থাকিতেও পারে।

পোড়ামাটির এই ফলকগুলি ছাড়া কতকটা কুষাণ শিল্পশৈলীর স্বল্পায়তন কয়েকটি পাথরের মূর্তিও বাংলা দেশে পাওয়া গিয়াছে। লক্ষ্যণীয় এই যে, সব ক'টিই উত্তর-বঙ্গীয়, এবং কুষাণ শিল্পশৈলীর কেন্দ্র মথুরার স্থানীয় লাল বালি-পাথরে তৈরী নয়। সেই জন্যই এ-অনুমান স্বাভাবিক যে, মূর্তিগুলি রচিত হইয়াছিল সমসাময়িক বাংলা দেশেই। ইহাদের মধ্যে

দুইটি সূর্যমূর্তি, পাওয়া গিয়াছে রাজসাহী জেলার নিয়ামতপুর গ্রামে; একটি বিষ্ণুমূর্তি, প্রাপ্তিস্থান মালদহ্ জেলার হাঁকরাইল গ্রাম। তিনটি মূর্তিরই অঙ্গরচনা ও বিন্যাস, রেখা ও ডৌল, গতি ও গড়ন একই প্রকার। রচনার ও শিল্পদৃষ্টির আপেক্ষিক স্থূলতা সত্ত্বেও মথুরার কুষাণ ও শক (?)-রাজাদের মর্মর প্রতিকৃতিগুলির সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সে-আত্মীয়তা মূর্তি তিনটির অঙ্গরাখার আকৃতি-প্রকৃতি এবং গড়নেও সুস্পষ্ট। অথচ, ইহারা শক-কুষাণ শিল্পীদের রচনা এ-কথা কিছুতেই বলা চলে না; বরং ইহাদের অঙ্গভঙ্গীর আড়ষ্টতা এবং গ্রাম্য অনাড়ম্বর প্রকাশ একান্তই আঞ্চলিক। আসল কথা, মধ্যদেশে উচ্চকোটি স্তরে যখন যে শিল্পশৈলীর প্রসার ও প্রচলন তাহার অন্তত কিছুটা তরঙ্গাভিঘাত স্তিমিত বেগে বাংলাদেশেও আসিয়া লাগিয়াছে। এই মূর্তিগুলিতে তাহারই স্বাক্ষর কতকটা স্থানীয় রূপ ও রুচিদ্বারা প্রভাবিত হইয়া দেখা দিতেছে। বাংলাদেশে কিছু কিছু কুষাণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; এবং মুরুণ্ড কোমের লোকেরা বোধ হয় প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের বাংলাদেশে একেবারে অজ্ঞাত ছিলেন না। কাজেই বাংলার শিল্পের এই পর্বে শক-কুষাণ শিল্পরীতির কিছুটা প্রভাব দেখা যাইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়।

দিনাজপুর জেলার বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত এবং বর্তমানে কলিকাতা আশুতোষ-চিত্রশালায় সংরক্ষিত কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি পোড়ামাটির ফলকে গুপ্তপূর্ব মথুরার, সাধারণ ভাবে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার শিল্পশৈলীর লক্ষণও সুপরিস্ফুট। মথুরার নারীমূর্তিগুলির দেহবিলাসের সচেতনতা ও অভিজাত সংবেদন বাণগড় ফলকের নারীমূর্তিগুলিতে নাই, কিন্তু প্রশস্তমেখলা, পীনপয়োধরা এবং অলংকারবহুলা এই নারীদের অঙ্গবিন্যাস একান্তই সেই মধ্যদেশীয় ধারাই অনুসরণ করিয়াছে, বিশেষভাবে মথুরা অঞ্চলের, এবং এই হিসাবে ইহারা পূর্বোক্ত মহাস্থান-পোখরণা-তাম্রলিপ্তির ফলক-চিত্রিত নারীদেরই বংশধর। তবে বাণগড়ের এই স্বল্পাকৃতি নারীমূর্তিগুলিতে সমসাময়িক ও ভাবীকালের ইঙ্গিতও সমান প্রত্যক্ষ। সে-ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে ইহাদের ঈষদানত পয়োধরের মসৃণ ডৌলে, সুডৌল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, গড়নের আপেক্ষিক মসৃণতায় এবং সৌকুমার্যে। ইহাদের মধ্যে যেন গুপ্ত আমলের রুচি ও রূপাদর্শের দূরাগত ক্ষীণ পদধ্বনি শোনা যাইতেছে।

মথুরার শক-কুষাণ তক্ষণশৈলীর কালগত স্বাভাবিক পরিণতি গুপ্তপর্বের তক্ষণ শৈলীতে। গুপ্ত-শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্র ছিল সারনাথ, কিন্তু প্রভাবের ও ঐতিহ্যের বিস্তৃতি ছিল পূর্বপ্রান্তে তেজপুর হইতে পশ্চিমে গুজরাট-মহারাষ্ট্র পর্যন্ত, এবং কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত। মথুরার ভারী, দৃঢ়, স্থূল, একান্ত ইহগত এবং সূক্ষ্মানুভূতিবিহীন বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বই ক্রমশ গুপ্ত আমলের সূক্ষ্ম, মার্জিত, পেলব, ধ্যানকেন্দ্রিক, যোগগর্ভ বুদ্ধ-বোধিসত্ত্ব মূর্তিতে, বিষ্ণুমূর্তিতে রূপান্তর লাভ করে। এই রূপান্তরের মধ্যে সমগ্র ভারতীয় বুদ্ধি ও কল্পনার, মনন ও সাধনার সুগভীর ও সুবিস্তৃত ইতিহাস বিধৃত; কিন্তু তাহার আলোচনা এ-প্রসঙ্গে অবান্তর। মথুরার বৃহদায়তন মূর্তিগুলি প্রভূত মানবিক দৈহিক

শক্তির দ্যোতক; গুপ্ত-আমলের অর্থাৎ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকীয় সারনাথের বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বের মূর্তিগুলির আপেক্ষিক আয়তন হ্রস্ব, কিন্তু ইহাদের মানবিক রূপ ও ভঙ্গী ধ্যানযোগ এবং স্বচ্ছতর মনন-কল্পনার স্পর্শে এক অতি সূক্ষ্ম সংবেদনময় অপরূপ অধ্যাত্মভাব ও অলৌকিক রসের দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে।

গুপ্ত-পর্বের বৈশিষ্ট্য

সারনাথের প্রভাব পূর্বাঞ্চলে আসামের তেজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এ-কথা আগেই বলিয়াছি। এই প্রভাবের ধারাস্রোত বাংলাদেশের উপর দিয়াই বহিয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু বাংলাদেশে প্রাপ্ত সমসাময়িক মূর্তির সংখ্যা খুব বেশি নয়। বিহারৈল গ্রামে প্রাপ্ত চুনারের বালি-পাথরে রচিত একটি বুদ্ধ-প্রতিমায় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকীয় সারনাথের প্রতিধ্বনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই মূর্তিটির মসৃণ, মার্জিত, রমণীয় ডৌল, সুকুমার অঙ্গ-বিন্যাস ও সৌষ্ঠব, শান্ত সৌম্য ধ্যানগম্ভীর দৃষ্টি এবং রেখা-প্রবাহের ধীর সংযত গতি একান্তই সমসাময়িক মধ্য-গাঙ্গেয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান। গভীর ধ্যানলব্ধ আনন্দের, চরম জ্ঞান ও উপলব্ধির, পরম পরিতৃপ্তির সহজ, সংযত ও মার্জিত প্রকাশই সারনাথ-শৈলীর বৈশিষ্ট্য; এবং এই বৈশিষ্ট্যই সারনাথের বুদ্ধ-প্রতিমাকে বিহারের সুলতানগঞ্জের বুদ্ধ-মূর্তি অপেক্ষা অথবা রাজগীরের মণিয়ার-মঠের দেহ-সচেতন, সুন্দর, পেলব মূর্তিগুলি অপেক্ষা অধিকতর কৌলিন্য দান করিয়াছে। বিহারৈল প্রতিমাটি এই হিসাবে যেন সারনাথ-শৈলীরই একটি স্থানীয় রূপ—একটু কম সূক্ষ্ম, একটু কম পেলব।

সুলতানগঞ্জের ব্রোঞ্জ বুদ্ধ-মূর্তিতে অথবা রাজগীর মণিয়ার-মঠের প্রতিমাগুলিতে সারনাথ শৈলীর যে পূর্বাঞ্চলিক ভাষা প্রত্যক্ষ, সেই ভাষারূপ কতকটা ধরা পড়িয়াছে বগুড়া জেলার দেওড়া গ্রামে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তিটিতে। আনুমানিক ষষ্ঠ শতকীয় এই প্রতিমাটির বলিষ্ঠ ত্রিবলীচিহ্ন, অলংকার-বিরলতা, কাঠামোর দৃঢ় সংযত সারল্য, চক্রাকৃতি প্রভামণ্ডল এবং আস্কন্ধবিলম্বিত তরঙ্গায়িত কেশগুচ্ছ নিঃসন্দেহে মধ্য-গাঙ্গেয় গুপ্ত-ঐতিহ্য ও লক্ষণের দ্যোতক, কিন্তু ইহার মাংসল দেহের কবোষ্ণ সংবেদনের মধ্যে এবং চক্ষুর নিম্নতটে ও নিম্নোষ্ঠের তীরে গাঢ় ছায়ার মধ্যে পূর্বাঞ্চলিক দেহমাধুর্যাবেদনও সমান প্রত্যক্ষ।

সুন্দরবন-কাশীপুরে প্রাপ্ত সূর্য-প্রতিমাটিতেও (আশুতোষ-চিত্রশালা) মার্জিত রসবোধ ও অধ্যাত্ম-চেতনার আভাস দৃষ্টিগোচর। এই প্রতিমাটিতে গুপ্তশৈলীর সদ্যোক্ত পূর্বাঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যতটা ধরা পড়িয়াছে, বাংলায় প্রাপ্ত আর কোনো প্রতিমাতেই এমন সুস্পষ্ট হইয়া তাহা ধরা পড়ে নাই। কালবিচারে কাশীপুরের প্রতিমাটি হয়তো দেওড়ার প্রতিমাপেক্ষা প্রাচীনতর, কিন্তু গঠন-সৌষ্ঠবে কাশীপুর-সূর্য অনেক বেশি মার্জিত, দৃষ্টি ও কল্পনায় গভীরতর, এবং অনুভবে বেশি পেলব ও সংযত। আকৃতি এবং প্রকাশভঙ্গীর দিক হইতেও সাদৃশ্য এবং প্রমাণবোধ অধিকতর সচেতন।

বলাইধাপ স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জধাতু-নির্মিত স্বর্ণপত্রমণ্ডিত মঞ্জুশ্রী-প্রতিমাটিতেও পূর্বাঞ্চলিক আবেগময়তা এবং ডৌল ও গঠনরীতির উষ্ণ সংবেদনশীলতা

সমান প্রত্যক্ষ। সুপূর্ণ মাংসল মুখমণ্ডল, স্থূল নিম্নোষ্ঠ, বঙ্কিমায়িত করাঙ্গুলির ক্রমহ্রস্বায়মান সূক্ষ্মাগ্র এবং সুকুমার দেহ-কাঠামোর মধ্যে সমস্ত অঙ্গের পেলব সচেতনতা যেন দানা বাঁধিয়াছে; দেহ-ডৌলের সঙ্গে বসনের ঘনিষ্ঠতা, অলংকার-বিরলতা, সহজ ও নিরাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গী সমস্তই পূর্বাঞ্চলিক গুপ্ত-শৈলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় আবদ্ধ।

মুর্শিদাবাদ-মালার গ্রামে প্রাপ্ত চক্রপুরুষের একটি মূর্তিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-চিত্রশালা)। এই মূর্তিটির ডৌলে, গড়নে এবং রচনাবিন্যাসে গুপ্ত-শৈলীর পূর্বাঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। তবে, বালিপাথরে গড়া এই প্রতিমাটির গড়নে দেহ-ডৌলের সেই সূক্ষ্মতা ও ভাবব্যঞ্জনা ততটা ধরা পড়ে নাই।

স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকীয় বাংলার তক্ষণ-শিল্পের সাধারণ লক্ষণ ও প্রকৃতি সমসাময়িক উত্তর-গাঙ্গেয় ভারতের শিল্প-লক্ষণ ও প্রকৃতির সঙ্গে ঐক্যসূত্রে গাঁথা। সারনাথ-শৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট ও অনস্বীকার্য, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাঞ্চলিক আবেগ-প্রাধান্য এবং স্থানীয় বৈশিষ্ট্যও সমান প্রত্যক্ষ। এ-তথ্য লক্ষ্যণীয় যে, এই পর্বে গুপ্ত-শৈলীর যে-ক'টি নিদর্শন বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই উত্তর-বঙ্গে বা প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন হইতে। কিন্তু উত্তর-বঙ্গই হোক্ আর সুন্দরবনই হোক্, তেজপুরই হোক্ আর বাঁকুড়াই হোক্, সর্বত্রই মূলগত একটি ধারা প্রত্যক্ষ, এবং সে-ধারা প্রধানত মধ্য-গাঙ্গেয় গুপ্ত-শৈলীর ধারারই স্থানীয় রূপ।

তৃতীয়-চতুর্থ শতকে উত্তর-ভারতীয় মনন ও কল্পনা মথুরা-বুদ্ধগয়ার যে রূপ-প্রচেষ্টায় স্বপ্রকাশ পঞ্চম শতকে সারনাথ-উদয়গিরি-মথুরাতে তাহার পূর্ণ পরিণতি। সূক্ষ্মতম বোধ, গভীরতম ধ্যান ও চরমতম জ্ঞানের এমন সুনিপুণ অঙ্গসৌষ্ঠবময় সুকুশলী প্রকাশ শুধু ভারতীয় শিল্পে কেন, পৃথিবীর তক্ষণ-শিল্পেই বিরল। সমসাময়িক সারনাথ ক্ল্যাসিকাল শিল্পের শিখরচূড়ায় আসীন; ইহার পর এই শিল্পাদর্শ ও রীতিতে অলব্ধ, অনাবিষ্কৃত আর কিছু ছিল না। সব সন্ধান যখন নিরস্ত ও নিঃশেষিত, সুচিরচেষ্টিত সাফল্য যখন আয়ত্ত তখন কিছুকাল কাটে সাফল্যের দীপ্তি ও গরিমার মধ্যে; তারপর দেখা দেয় ক্লান্তি ও অবসাদ, এবং তাহার পরের স্তরেই নিদ্রালু বিবশতা। ষষ্ঠ শতকের শেষার্ধ হইতেই উত্তর-ভারতীয় তক্ষণ-শিল্পে এই বিবশতা দেখা দিতে আরম্ভ করে, এবং সমগ্র সপ্তম শতক জুড়িয়া তাহার আভাস সুস্পষ্ট। অন্যদিকে এই সময়েই আবার নবতর শিল্পপ্রেরণাও ধীরে ধীরে রূপ গ্রহণ করে। এই নবতর রীতি বা আদর্শের প্রেরণা কোন্ মূল, কোন্ উপাদান হইতে সঞ্চারিত হইয়াছিল বলা কঠিন। শতাব্দী-সঞ্চারিত ইতিহাসের নানা আবর্তে, নানা ঘটনা ও আদর্শের সংঘাতে, নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলন-বিরোধের ফলে শিল্পে ও সাহিত্যে নূতন নূতন রীতি ও আদর্শের উদ্ভব ঘটে। এই সব আবর্ত ও সংঘাত, মিলন ও বিরোধের পুংখানুপুংখ সকল কথা আজও আমরা জানিনা, এবং তাহার ফলে আমাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে কি কি রূপান্তর ঘটিয়াছিল তাহাও

বিবর্তন

বলিবার উপায় নাই। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হইতেই মধ্য-এশিয়ার নানা যাযাবর জাতি ভারতবর্ষের বুকে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে—প্রথম তরঙ্গে য়ুয়ে-চি-শক-কুষাণ, দ্বিতীয় তরঙ্গে আভীর (দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক), তৃতীয় তরঙ্গে হূণ (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক)। ইহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ সংস্কৃতির বাহক ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বহুদিন সেই সংস্কৃতির কোনো সুস্পষ্ট সুগভীর স্বাক্ষর ভারতবর্ষে দেখা যায় নাই: বলবত্তর স্থানীয় রীতি ও আদর্শকে অতিক্রম করিয়া তাহা নিজকে ব্যক্ত করিবার সুযোগও বিশেষ পায় নাই, শক্তিও হয়তো ততটা ছিল না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহা যে পুরাতন ভারতীয় রীতি ও আদর্শকে রূপান্তরিত করিতেছিল, অন্তত শিল্পাদর্শের ক্ষেত্রে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, তাহার প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। অষ্টম শতক হইতে ভারতীয় ভাস্কর্যে, প্রাচীরচিত্রে ও অন্যান্য শিল্পে তাহার স্বাক্ষরও ক্রমশ সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ-সব কথা আলোচনার অবসর এ-গ্রন্থ নয়। তাহা ছাড়া, সপ্তম শতক হইতে নেপাল ও ভোটদেশ বা তিব্বতের সঙ্গেও মধ্য ও প্রাচ্য-ভারতের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং প্রাচীন কিরাত বা বোড়ো সংস্কৃতির কিছু কিছু প্রভাবও অষ্টম শতক হইতেই দেখা দিতে আরম্ভ করে। অন্যদিকে আবার এই সপ্তম-অষ্টম শতক হইতেই ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতির অবসাদের ফলে স্থানীয় লোকায়ত সংস্কৃতি উচ্চকোটির সংস্কৃতি ছাপাইয়া নিজকে ব্যক্ত করিবার সুযোগ লাভ করে। এই সব রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবাহের সম্মিলিত প্রভাব ভারতীয় জীবন, মনন ও কল্পনাকে, রাষ্ট্র ও সমাজ-বিন্যাসকে কি ভাবে কতদূর রূপান্তরিত করিয়াছিল তাহা লইয়া আলোচনা-গবেষণা আজও বিশেষ হয় নাই; তবে, সপ্তম-অষ্টম-নবম শতকে উত্তর-ভারতীয় ইতিহাসের যে দিক্ পরিবর্তন এবং সর্বতোভদ্র রূপান্তর সকল ঐতিহাসিকই লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার মূলে এই সব প্রভাব কিছুটা সক্রিয় ছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি! এই রূপান্তরেরই আর এক অর্থ, ক্ল্যাসিক্যাল যুগের অবসান ও মধ্যযুগের সূচনা। কোনো বিশেষ রাষ্ট্রীয় ঘটনা মধ্যযুগের সূচনা করে নাই; কোনো নির্দিষ্ট সন-তারিখও নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির, রাষ্ট্র ও সমাজের যে প্রকৃতি ও আদর্শ দ্বারা মধ্যযুগ চিহ্নিত, জন-সংঘাতের ফলে সেই প্রকৃতি ও আদর্শ কয়েক শতাব্দী ধরিয়াই ভারতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে দেখা দিতেছিল, এবং জৈব নিয়মের বশেই তাহা ধীরে ধীরে লালিত ও বর্ধিত হইতেছিল। উত্তর-ভারতের ইতিহাসে অষ্টম-নবম-দশম শতক সেই লালন-বর্ধনের যুগ।

যাহাই হউক, সদ্যোক্ত রূপান্তরের একেবার সূচনার মুখে অথবা ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শের অবসাদ-কালের (আনুমানিক সপ্তম শতক) কয়েকটি প্রতিমা বাংলাদেশেও পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিনটি ধাতব মূর্তি উল্লেখযোগ্য: একটি দেবখড়্গ-মহিষী প্রভাবতীর লিপি-উৎকীর্ণ অষ্টধাতুনির্মিত সর্বাণী-দেবীমূর্তি, প্রাপ্তিস্থান ত্রিপুরা জেলার দেউলবাড়ী গ্রাম। দ্বিতীয়টি স্বল্পায়তন, প্রায় খেলেনাকৃতি বলিলেই চলে; ইহারও প্রাপ্তিস্থান দেউলবাড়ী

গ্রাম (ঢাকা-চিত্রশালা); শিল্পবিষয় রথোপরি উপবিষ্ট সপ্তাশ্ববাহিত সূর্য। তৃতীয়টি ব্রোঞ্জধাতুনির্মিত একটি দণ্ডায়মান শিবপ্রতিমা; প্রাপ্তিস্থান ২৪-পরগণা-জেলার মণিরহাট গ্রাম (অজিতঘোষ-সংগ্রহ, কলিকাতা)। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকীয় গুপ্ত-তক্ষণশিল্পে প্রতিমারূপের যে রূপান্তর পরবর্তীকালে দেখা দেয় তাহা এই তিনটি নিদর্শনেই সুস্পষ্ট। সর্বাণী মূর্তিটির পরিকল্পনা ও রূপায়ন তো স্পষ্টতই পরবর্তী পাল-শিল্পের পূর্বধ্বনিমাত্র; ইহার ঋজু ও আড়ষ্ট দেহভঙ্গী, এবং কাঠামোর বিন্যাস এ-সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহই রাখে না। স্বল্পায়তন সূর্য-প্রতিমাটি সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। শিবমূর্তিটির গড়ন ও ডৌলে গুপ্ত-বৈশিষ্ট্য এখনও তাহার কিছু স্বাক্ষর রাখিয়াছে, কিন্তু সেই স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম দীপ্তি আর নাই, সেই যোগনিবদ্ধ দৃষ্টি বা ভাবের নৈর্ব্যক্তিক পরিচয়ও আর নাই। গুপ্ত-মূর্তিকলার সুবর্ণযুগ অস্তমিত; পরবর্তী পাল-আমলের নবতর রীতি ও রূপাদর্শের সূচনা যেন দেখা যাইতেছে।

প্রাচ্য-ভারতীয় মূর্তিকলার এই পর্যায়ের কয়েকটি নিদর্শন এবং তাহার প্রভাবযুক্ত কয়েকটি প্রতিমা পাহাড়পুর-মন্দিরের ভিত্তিগাত্রেও দেখা যায়। কিন্তু পাহাড়পুর-মন্দিরের শিল্পকলা আরও নানাদিক হইতে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন বাংলার অন্তত সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীর সাংস্কৃতিক মানসের পূর্ণতর অভিব্যক্তি এই বিহার-মন্দিরের তক্ষণ-রূপায়নে ভাষালাভ করিয়াছে। পাহাড়পুর-শিল্প এই কারণেই বিস্তৃততর আলোচনার দাবি রাখে।

পাহাড়পুরের বৌদ্ধ-বিহার-মন্দির নির্মিত হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে নরপতি ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু তাহার আগেও এখানে বোধ হয় কোনো ব্রাহ্মণ্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং তাহার কিছু কিছু প্রতিমা-নিদর্শনও পরবর্তী বিহার-মন্দিরের ভিত্তিগাত্রসজ্জায় ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। বিহার-মন্দিরটির বিভিন্ন স্তরের চারিদিকের প্রাচীরগাত্র অগণিত মৃৎফলকে ঢাকা; তাহা ছাড়া ভিত্তিগাত্রসজ্জায় উৎকীর্ণ প্রস্তরফলকও প্রচুর ব্যবহার করা হইয়াছে (বর্তমান সংখ্যা ৬৩)। মৃৎফলকগুলির কথা পরে বলিতেছি। প্রস্তরফলকগুলি সম্বন্ধে গোড়ায়ই বলা প্রয়োজন, যে, এই ৬৩টি প্রস্তরফলক সবই এক যুগের যেমন নয় তেমনই নয় একই শিল্পরীতি ও আদর্শের।

পাহাড়পুর মন্দিরের প্রস্তরশিল্পে তিন ধারা

এই প্রস্তর-ফলকগুলির মধ্যে এক ধরনের ফলক দেখিতেছি যাহাদের ভঙ্গী, বিষয়বস্তু ও শিল্পদৃষ্টি একান্তই প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর রূপায়নই তাহাদের উদ্দেশ্য। ভঙ্গী-মর্যাদায়, সৌষ্ঠবে এবং রুচিবোধে ইহারা যে-পরিচয় বহন করে তাহা অবসরপুষ্ট ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রিত সমাজের উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীস্তরের। এই দৃষ্টি ও রীতির স্বাক্ষর পড়িয়াছে কয়েকটি ফলকেই, বিশেষভাবে রাধাকৃষ্ণ(?)-মিথুনমূর্তি, যমুনা, শিব এবং বলরামের অনুকৃতিতে। ইহাদের মধ্যে ষষ্ঠ-সপ্তম শতকীয় পূর্বী গুপ্ত-শিল্পদৃষ্টি ও রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। সেই সুকুমার দেহভঙ্গী, সূক্ষ্ম পেলব গড়ন এবং নমনীয় ডৌলের ঐতিহ্য এখনও বিস্মৃতিতে ঢাকা পড়ে নাই।

নির্মাণকলার কোমল সংবেদনশীল রূপায়ন তো আছেই; তাহা ছাড়া, ইহাদের বসনভূষণের সৌষ্ঠব, গড়ন এবং বিন্যাসেও গুপ্তাদর্শের মার্জিত রুচি ও সূক্ষ্মবোধ প্রত্যক্ষ। কিন্তু তাহার চেয়েও বেশি প্রত্যক্ষ মধ্য-গাঙ্গেয়ভূমির গুপ্তযুগীয় শিল্পদৃষ্টির স্বচ্ছ দীপ্তি এবং তাহারই পূর্বাঞ্চলিক ঐতিহ্যের ভাবালুতা এবং ইন্দ্রিয়পরতা। বস্তুত, রাজগীর-মণিয়ার মঠের মূর্তিগুলির সঙ্গে এবং মহাস্থানে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জধাতুনির্মিত মঞ্জুশ্রীমূর্তির শিল্পদৃষ্টি ও রীতির সঙ্গে এই ফলকগুলির আত্মীয়তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমার বিশ্বাস, এই ফলকগুলি ষষ্ঠ শতকীয়, এবং সমসাময়িক কোনো মন্দির-সজ্জায় ইহারা ব্যবহৃত হইয়াছিল; পরবর্তীকালে পূর্বতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে আহরণ করিয়া অষ্টম শতকীয় পাহাড়পুর বিহার-মন্দিরের ভিত্তিগাত্রসজ্জায় আবার ইহাদের ব্যবহার করা হয়।

এই দৃষ্টিরই স্থূল, রূঢ়, শিথিল, গুরুভার, প্রাকৃত রূপায়ন দেখিতেছি প্রায় ১৫।১৬টি ফলকে। ইহাদেরও বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী, এবং ইহাদের শিল্পরূপও প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত। স্থূল, গুরুভার গড়নই ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দুই একটি মূর্তিতে একটু গতিময়তার আভাস থাকিলেও একটা রূঢ় আড়ষ্টতা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। হ্রস্বদেহ দণ্ডায়মান মূর্তিগুলির দেহভঙ্গীর অনমনীয়তার ফলে মনে হয়, স্থূল পদযুগল যেন দুইটি স্তম্ভের মত একটি গুরুভার দেহকে কোনো মতে পতন হইতে রক্ষা করিয়াছে। গুপ্ত-শৈলীর অপরূপ সূক্ষ্ম রেখাপ্রবাহের এবং স্বচ্ছ নমনীয় ডৌলের কোনো চিহ্ন আর অবশিষ্ট নাই। অর্ধচন্দ্রাকৃতি, প্রশস্ত ও গুরুভার মুখমণ্ডলে দীপ্তি ও ভাব-লাবণ্য যোজনার বিশেষ কোনো লক্ষণ প্রায় অনুপস্থিত। সন্দেহ নাই, এই ফলকগুলি এমন সব শিল্পীর রচনা যাঁহারা প্রতিমা-লক্ষণ জানিতেন, ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুশাসন মানিতেন, কিন্তু তাহাদের অন্তর্নিহিত ভাব ও রসের যথার্থ কোনো বোধ ও বুদ্ধি ছিল না, যাঁহারা গুপ্তশৈলীর মূর্তিকলার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাহার রূপ-ভাবনা এবং আঙ্গিকের উপর কোনো অধিকারই যাঁহাদের ছিল না। খুব সম্ভব এই ফলকগুলির শিল্পীদের পাথর কুঁদার অভিজ্ঞতাও বিশেষ ছিল না, কিন্তু পৃষ্ঠপোষকের আদেশে ও প্রয়োজনানুরোধে এই কার্যে তাঁহাদের ব্রতী হইতে হইয়াছিল। রূপসৃষ্টির আনন্দের কোনো চিহ্নই যেন এই ফলকগুলিতে নাই। কালের দিক হইতে ইহারাও ষষ্ঠ-সপ্তম শতকীয়, এবং লক্ষ্যণীয় এই যে, এই ফলকগুলিতে পরবর্তী পাল-আমলের ফলক রচনা-বিন্যাসের পূর্বাভাস সুস্পষ্ট; কিন্তু ষষ্ঠ-সপ্তম শতকীয় পূর্বী শিল্পরীতির সুচারু ডৌল, সুষ্ঠু গড়ন, বা ভঙ্গীর ব্যঞ্জনা ইহাদের মধ্যে নাই। গুপ্ত-শৈলীর মার্জিত সংস্কৃত রূপের সঙ্গে ইহাদের দূরত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

কিন্তু অষ্টম শতকীয় পাহাড়পুর বিহার-মন্দিরের বিশিষ্ট শিল্পরূপ সদ্যোক্ত এই ধরনের ফলকগুলির মধ্যে নাই। সংখ্যায় ইহাদের চেয়ে বেশি এক ধরনের অনেকগুলি ফলক আছে যাহার বালি-পাথর সাদাটে ধূসর বর্ণের এবং দানাদার দাগবহুল। এই ফলকগুলি সবই একই আয়তনের; ভিত্তি গাত্রের ছক্ বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যায়, ছকের আয়তনানুযায়ী

ফলকগুলির আয়তনও নির্ণীত হইয়াছিল। এই ফলকগুলিতে নানা কাহিনীর রূপায়ন। অনেকগুলিতে কৃষ্ণায়ণের বিচিত্ররূপ; কিন্তু এই কৃষ্ণ একান্তভাবে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুমোদিত কৃষ্ণ নহেন; তাঁহার রূপ যেন একান্তই লোকায়ত জীবনের। কতকগুলিতে রামায়ণ-মহাভারতের নানা গল্পের রূপ, এবং সেই সব গল্পের লোকায়ত জীবনে যাহাদের আবেদন প্রত্যক্ষ। তাহা ছাড়া, দৈনন্দিন লৌকিক জীবনের নানা রূপও অনেকগুলি ফলকে উৎকীর্ণ—নৃত্যপরা নারী, প্রেমচর্যারতা নরনারী, যষ্টিতে হেলান দিয়া দাঁড়ান বিশ্রামরত দ্বারপাল ইত্যাদি। ইহাদের সকলেরই বসন-ভূষণ স্বল্প ও নিরাভরণ; প্রকাশভঙ্গিমায় অন্তর্লোকের কোনো গভীর চিন্তা বা ভাবের অভিব্যক্তি নাই, নাই কোনো মার্জিত রুচি বা বিদগ্ধ গরিমার ব্যঞ্জনা। ইহাদের চালচলন ও মুখাবয়ব স্থূল এবং ক্ষেত্রবিশেষে অমার্জিত; দণ্ডায়মান ভঙ্গী বলিষ্ঠ, কিন্তু আড়ষ্ট। পরিপূর্ণ সুগোল মুখমণ্ডলে, অর্ধচন্দ্রাকৃতি ওষ্ঠে এবং বৃহৎবিস্ফারিত নয়ন যুগলে সহজ সারল্যময় লোকায়ত জীবনের আনন্দোজ্জল হাসির স্বাক্ষর; এই হাসি যেন একান্তই তাহাদের নিজস্ব। কোথাও কোনো সূক্ষ্ম আড়াল রচনা নাই, কোনো কার্পণ্য নাই, সামগ্রিক জীবন যেন ইহাদের রূপায়নে পূর্ণ অভিব্যক্ত। প্রাণের প্রাচুর্য এবং স্বাভাবিক গতিময়তা, সহজ অথচ পরিপূর্ণ ও অপরূপ প্রকাশ-মহিমাই এই ফলকগুলির শিল্পবৈশিষ্ট্য। শিল্পশাস্ত্র এবং প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্রের নিয়ম-বন্ধন হইতে মুক্ত এই শিল্পদৃষ্টি গভীর বস্তুচেতনা বলে প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবন হইতে সমস্ত রস আহরণ করিয়াছে; প্রাত্যহিক জীবনের সুখ দুঃখ, হাসিকান্না, রঙ্গকোলাহলময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং নিশ্ছিদ্র গতিময়তাই এই শিল্পে জীবন সঞ্চার করিয়াছে। সাধারণ মানুষের লৌকিক ঘটনাবলী এবং তাহাদের অভিজ্ঞতাই এই শিল্পের উপজীব্য। আঙ্গিকের দিক হইতে এই শিল্পরূপ যেমন স্থূল, অমার্জিত ও অসম্পূর্ণ, তেমনই মানবিকবোধে গভীর, জীবনের অভিব্যক্তিতে বিস্তারিত এবং শিল্পরসে তাৎপর্যময়।

লোকায়ত শিল্পের আভাস

এই প্রস্তর ফলকগুলির সঙ্গে পূর্বোক্ত অন্য দু'টি শিল্পরূপ ও দৃষ্টির কোথাও কোন মিল্ নাই; কিন্তু প্রাচীরগাত্রের অসংখ্য ও বিচিত্র মৃৎফলকগুলির রূপ ও দৃষ্টির সঙ্গে ইহাদের আত্মীয়তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমসাময়িক শিল্পেতিহাসে পাহাড়পুর বিহার-মন্দিরের প্রাচীর গাত্রের এই ফলকগুলি এক অপরূপ বিস্ময়। শুধু পাহাড়পুরেই নয়, ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ হইতেও ঠিক একই ধরনের অসংখ্য মৃৎফলক সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সন্দেহ নাই, অন্যান্য বৃহদায়তন ও সমসাময়িক প্রাচীন মন্দির-বিহারের প্রাচীরগাত্রও এইভাবে মৃৎফলকের আস্তরণে শোভিত ও অলংকৃত ছিল।

পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃৎফলক-কলার মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ লৌকিক, এবং সাধারণ লোকায়ত কৃষিজীবনের মানস-কল্পনাই ইহাদের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহারা রস আহরণ করিয়াছে লোকায়ত দৈনন্দিন জীবন হইতে; স্থিতি ও গতির বিভিন্ন

অবস্থায় বস্তু ও প্রাণী-জগতের সকল জিনিসকে সহজ আবেগময় দৃষ্টিতে দেখা, এবং বিচিত্র ভাবে ও ভঙ্গীতে সেই দেখাকে অপূর্ব স্বচ্ছন্দ গতিময়তায় এবং নিছক বস্তু-ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করা, ইহাই যেন ছিল এই মৃৎশিল্পীদের শিল্পাদর্শ। এই অসংখ্য ফলকগুলিকে সারি সারি ভাবে সাজাইয়া দেখিলে মনে হয়, লোকায়ত জীবন যেন এক বিচিত্র শোভাযাত্রায় চলিয়াছে, যেন এই মৃৎশিল্পীরা অনুভূতি ও সচেতন বস্তু-অভিজ্ঞতার একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অবিরত আন্দোলিত হইয়াছে, এবং সেই আন্দোলন ফলকগুলির উপর প্রত্যক্ষ। ধর্মগত, উচ্চকোটিস্তরের ঐতিহ্যগত শিল্পের কোনো স্তরে এমন সুবিস্তৃত সামাজিক পরিবেশ, মানবিক কল্পনা ও অনুভূতির এমন বৈচিত্র্য, প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব ঘটনা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে এমন গভীর সংযোগ, এমন স্বতোচ্ছ্বসিত ভঙ্গিমা ও চালচলন, প্রকাশের এমন সজীব ও পরিপাটি ছন্দের পরিচয় সুদুর্লভ! দরিদ্র লোকায়ত জীবনের পোষকতার উপর নির্ভরশীল এই গ্রাম্য মৃৎশিল্পীরা সুলভ আঁটাল মাটি লইয়া আনন্দচ্ছলে যে রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে 'সভ্য', 'ভদ্র' অবসরপুষ্ট জীবনের পরিমিত সৌষ্ঠব বা মার্জিত রুচির পরিচয় বা উচ্চস্তরের ভাবানুভূতি, গভীরতর অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা বা জটিল মননক্রিয়ার পরিচয় আশা করা অন্যায়; কিন্তু মানুষ ও প্রকৃতির বিস্তৃত লীলাক্ষেত্রের ক্ষুদ্রতম বৈশিষ্ট্য সম্পর্ক তাঁহাদের যে গভীর চেতনা এবং জীবন সম্পর্কে তাহাদের যে শ্রদ্ধাশীল অভিনিবেশ এই ফলকগুলিতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না; উচ্চকোটির ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় শিল্পসাধনার যে কোন শ্রেণী বা স্তরে এই ধরনের শিল্পদৃষ্টি দুর্লভ। সমসাময়িক বাংলার লোকায়ত সামাজিক জীবনের যথার্থ বস্তুময় স্পন্দিত পরিচয় এই ফলকগুলিতে যতটা পাওয়া যায়, প্রস্তর-প্রতিমাশিল্পে ততটা কিছুতেই নয়। রাজপ্রাসাদ ও অভিজাত-চক্রের পরিধি হইতে দূরে সাধারণ মানুষের নিত্যকোলাহলময় জীবনধারা কি ভাবে প্রবাহিত হইত, সমসাময়িক ব্যক্তি ও সমাজিক মানসের কি ছিল প্রকৃতি তাহার পরিপূর্ণ অভিজ্ঞান এই মৃৎফলকগুলি।

পাহাড়পুর ও ময়নামতীর লোকায়ত মৃৎশিল্প

সমসাময়িক জীবনের কোনো বস্তুই এই মৃৎশিল্পীদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণকথার নানা গল্প, পঞ্চতন্ত্র ও বৃহৎকথার নানা কাহিনী যেমন এই ফলকগুলিতে দৃষ্টিগোচর, তেমনই দৃষ্টিগোচর প্রত্যন্ত বাংলার নানা আদিবাসী নরনারীর নানা দেহরূপ, নানা অভ্যাস, নানা সংস্কারের চিত্র, কাল্পনিক প্রাণীজগতের বিচিত্র নিদর্শন—গন্ধর্ব, কিন্নরী, অর্ধমানব, অর্ধপশুর লীলাময় কল্পনার ছন্দিত রূপ; সমৃদ্ধ পশু পক্ষী জগতের নানা বিচিত্র নিদর্শন—প্রত্যেকে নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় এবং বিষয়বস্তুর মর্যাদা ও বৈচিত্র্যানুযায়ী রূপায়িত, নানা ভঙ্গিমায় জননী ও শিশু; কুস্তীকসরত ও নানা শারীরক্রিয়ারত মল্লবীর; যষ্টিধৃত দ্বারপাল; কূপে জলাহরণরতা ও জলপাত্রবাহিনী নারী; গৃহপ্রবেশরতা নারী; স্ত্রী ও পুরুষ যোদ্ধা, রথারোহী ধনুর্ধর; দীর্ঘশ্মশ্রু আনতপৃষ্ঠ ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসী ভিক্ষুক; লাঙ্গলবাহী কৃষক;

মৎস্যবাহিনী ও মৎস্যকর্তনরতা নারী ; নৃত্যপরা ও সঙ্গীতরতা নারী ; শিকারবাহী ব্যাধ ; গীতবাদ্যরত পুরুষ ; ধর্মাচরণরত ব্রাহ্মণ ; অস্থিচর্মসার, ল্যাঙ্গোটিমাত্র পরিহিত, স্কন্ধদেশে প্রলম্বিত যষ্টির দুইপ্রান্তে পুঁটুলি ঝুলানো পথিক সন্ন্যাসী বা দরিদ্র ভিক্ষুক ; নানা কৌতুকময় ঘটনা, রূপ ও ভঙ্গিমা ; মোরগের ও ষাঁড়ের লড়াই, প্রভৃতি জীবনের অসংখ্য বিচিত্ররূপ। দেবদেবী মূর্তিও একেবারে অপ্রতুল নয় ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশের কয়েকটি মূর্তি আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আছেন শিব, সেই শিব যে-শিবের লোকায়ত রূপ ও ভঙ্গিমা মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যে এবং লোকায়ত শিল্পে কীর্তিত, এবং আজও সুপরিচিত। বৌদ্ধ দেবদেবী, বিশেষ ভাবে মহাযান-বজ্রযান বর্গের কয়েকটি দেবদেবীও আছেন, যেমন বোধিসত্ব পদ্মপাণি, মঞ্জুশ্রী, তারা। কিন্তু শাস্ত্র-ব্যাখ্যাত দেবদেবীর সংখ্যা প্রায় নগণ্য বলিলেও চলে।

আগেই বলিয়াছি, এই ফলকগুলির গড়নে মার্জিত স্পর্শের, সূক্ষ্ম রুচির বা গভীর ব্যঞ্জনার পরিচয় সামান্যই ; কিন্তু লক্ষ্যণীয় ইহাদের সাবলীল গতিচ্ছন্দ, ইহাদের স্বচ্ছন্দ প্রাণময়তা, জীব ও মানবদেহের গঠন, গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শিল্পীদের সচেতন দৃষ্টি, জড়জগতের এবং দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যক্ষবোধ। এমন অপূর্ব বস্তুময়তাও দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। সন্দেহ করিবার কারণ নাই যে, এই শিল্প একান্তই লৌকিক শিল্প, প্রথাবদ্ধ প্রতিমা-শিল্পের সঙ্গে ইহাদের কোনো যোগ নাই। যে বিহার-মন্দির নৃপতি ও উচ্চতর অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রথাগত ধর্মের নিশ্চিত নিয়ন্ত্রণাধীনতায় রচিত, তাহার প্রাচীর-গাত্রে বিস্তার লাভ করিবার এমন প্রশস্ত সুযোগ সমসাময়িক লৌকিক শিল্প এবং গ্রাম্য শিল্পীরা পাইলেন করিয়া, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মৃৎশিল্প প্রাকৃত স্তরের শিল্প ; প্রাচীন ভারতীয় ধারণায় এই শিল্প অপভ্রংশ পংক্তির শিল্প ; অভিজাত সংস্কৃত স্তরের শিল্পের সঙ্গে একাসনে ইহার স্থান কোথাও নাই— শিল্পশাস্ত্রে যেমন নাই, সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় মন্দির-বিহারেও তেমন নিদর্শনও কোথাও নাই। জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সৃজনক্রিয়ার এই সব নিদর্শন উচ্চকোটি ও সংস্কৃত শিল্পসাধনার নিপুণতর নিদর্শনের পাশে কোথাও দাঁড়াইবার সুযোগ পায় নাই, সে-স্পর্দ্ধাও ছিল না।

এ-কথা অস্বীকার করা চলেনা যে, এই লৌকিক মৃৎশিল্প পূর্বতন যুগেও সুঅভ্যস্ত ছিল, বাংলাদেশে ছিল, সমগ্র গাঙ্গেয়ভূমি জুড়িয়াই ছিল। প্রাকৃত ভাবনা-কল্পনার তাৎক্ষণিক রূপের ভাষাই তো এই মৃৎশিল্প। কিন্তু, মনে হয়, এই শিল্প আজও যেমন তখনও তেমনই গ্রামে গ্রাম্য জনসাধারাণের লোকায়ত জীবনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, এবং তাহাই ছিল সাধারণ নিয়ম। পাহাড়পুর এবং ময়নামতীতে যে এই শিল্পকে দেখিতেছি পুরোভাগে, এবং ইহারই নিদর্শন দেখিতেছি প্রচুরতম, তাহার প্রধান কারণ, বাংলাদেশে পাথরের অভাব এবং প্রাকৃত সংস্কৃতির আপেক্ষিক প্রাবল্য। পাহাড়পুর বা ময়নামতীর মতন সুবৃহৎ বিহার-মন্দিরের সুবিস্তৃত প্রাচীরগাত্র ঢাকিয়া দিবার মত এত পাথর এবং প্রস্তর-তক্ষক

বাংলা দেশে ছিল না। কাজেই ভার পড়িয়াছিল প্রাকৃত শিল্পরূপে অভ্যস্ত লোকায়ত শিল্পীকুলের, এবং তাঁহারা অগণিত মৃৎফলকে (বস্তুতই সংখ্যায় হাজার হাজার) সমস্ত প্রাচীর গাত্র ঢাকিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এমন সুযোগ তাঁহারা সচরাচর পাইতেন বলিয়া মনে হয় না। বস্তুত, অষ্টম-নবম শতকের পর বহুদিন এই লোকায়ত শিল্পের নিদর্শন আর কোথাও দেখিতেছিনা। বহু শতাব্দী পর, বাংলাদেশে যখন কেন্দ্রীয় রাজশক্তি অন্যতর ধর্ম ও সংস্কৃতির পোষক, রাষ্ট্র ও রাজপ্রাসাদের সংস্কৃতিবন্ধন যখন শিথিল, প্রথাগত ও উচ্চকোটির সংস্কৃত ধর্মের শাসন যখন দুর্বল, লোকায়ত ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব যখন কিছুটা প্রসারিত তখন, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত, এই লোকায়ত শিল্পের আপেক্ষিক প্রসার ও প্রতিপত্তি আবার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই সময় এবং ইহার কিছু আগে হইতেই গ্রাম্য কৃষিজীবী জনসাধারণের ভাব ও চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ দেশিয় অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং মঙ্গলকাব্যে, বারমাস্যায়, মহাকাব্যের লৌকিক রূপায়নে, নানা গাথা-গীতিকায়, পদাবলীতে দেশের ও জাতির মর্মবাণী ব্যক্ত হয়। এই লোক-সাহিত্যের সমান্তরালে দেখিতেছি লৌকিক শিল্পেরও বিকাশ। ফরিদপুর, যশোহর বর্ধমান, বীরভূম, চব্বিশ-পরগণা এবং বাংলার অন্যান্য জেলার বহু ইটের তৈরী মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরগাত্রে অগণিত মৃৎফলকের সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য এই কালে আবার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাদের শিল্পদৃষ্টি ও আঙ্গিক কিছুটা ভিন্নতর, কিন্তু লোকায়ত শিল্পের যাহা প্রধান মৌলিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সাবলীল গতিময়তা, স্বচ্ছন্দ প্রাণপ্রবাহ এবং প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন জীবনের সমৃদ্ধ বস্তুময়তা তাহা এই দৃষ্টি এবং আঙ্গিকেও সমান প্রত্যক্ষ। রাজপ্রাসাদ, অভিজাতচক্র এবং পুরোহিতবর্গের শাস্ত্রানুগ শিল্পের স্পর্শবিমুক্ত এই লৌকিক শিল্পের ধারা বহুদিন পর্যন্ত স্বীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

পালপর্বের আগে প্রস্তর-ভাস্কর্যের নিদর্শন যে বাংলাদেশে খুব বেশি নাই, তাহার প্রধান কারণ সুলভ মৃৎশিল্পের প্রসার। নমনীয় মাটির নিজস্ব একটা গুণ ও প্রকৃতি তো আছেই; সহজ দ্রুত অঙ্গুলি ও করতালু চালনার ফলে নানা বিচিত্র দ্রুত ভঙ্গ ও ভঙ্গী সহজেই রূপ গ্রহণ করে, ডৌলের মার্জনা সহজ নয়। এই মাধ্যমে কাজ করার ফলে বাংলার লোকায়ত শিল্পের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আপনি ধরা দিয়াছিল। তারপর যখন এই সব শিল্পীরা মধ্য-ভারতীয় প্রভাবে পড়িয়া পাথরের কাজে হাত দিলেন তখন প্রাথমিক বাধা কতকগুলি দেখা দিবে, তাহা বিচিত্র নয়! কিন্তু এই বাধা সংঘাতের ভিতর দিয়াই সৃষ্টি লাভ করিল নূতন শিল্পরীতি যে-রীতিতে মৃৎশিল্পের গতিময়তা, প্রাণপ্রবাহ এবং মার্জিত ডৌল একদিকে যেমন পাথরে রূপান্তরিত হইল তেমনই পাথরে কাজ করার দরুণ দেহরূপে এবং ভঙ্গীতে দেখা দিল একটা দৃঢ় কাঠিন্য। এই রীতির পরিচয়ও পাহাড়পুরেরই কতকগুলি দেবদেবী মূর্তিতে (কৃষ্ণ, বলরাম, ইন্দ্র, যম, কুবের, গণেশ ইত্যাদি) পাইতেছি; দুই একটি নৃত্যপরা নারী মূর্তিতেও তাহা সুস্পষ্ট। এই রীতি ও ধারাই ক্রমপরিণতি লাভ করিয়া পাল-পর্বের

মধ্যযুগীয় পূর্বী প্রতিমাশৈলীতে বিবর্তিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এর পশ্চাতে ছিল বহুযুগের অভ্যাস ও অনুশীলন।

বাংলা দেশে পাথরে তৈরী নানা পর্বের যে-সব প্রতিমা বা মূর্তি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহার দুই চারিটি ছাড়া কোনোটিতেই কোনো সন-তারিখ উৎকীর্ণ নাই, এমন কি কোনো লেখাও উৎকীর্ণ নাই যাহার সাহায্যে ইহাদের কালনির্ণয় করা চলে। কাজেই গঠন ও রূপ-বিশ্লেষণ ছাড়া ইহাদের কাল-নির্ণয়ের অন্য কোনো উপায় নাই। যেমন সাহিত্যে, শিল্পেও তেমনই নানা সামাজিক ও আদর্শগত কারণে, গঠনরীতিগত কারণে, বিবর্তনগত কারণে, এক এক যুগে এক এক দেশখণ্ডে কতকগুলি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রূপ গ্রহণ করে। সেই জন্য সেই বৈশিষ্ট্যগুলি আশ্রয় করিয়া মূর্তিগুলির কাল-নিরূপণ সহজ হয়।

বাংলার নানা জায়গায় প্রাপ্ত সপ্তম-অষ্টম শতকীয় মূর্তিগুলি (ইহাদের অধিকাংশই অধুনা আশুতোষ-চিত্রশালায় রক্ষিত) বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের প্রায় সবই পূজার্চনার জন্য তৈরী দেবদেবী মূর্তি, এবং ইহাদের নির্মাণ ও রচনা-বিন্যাস একান্তই প্রতিমালক্ষণ-শাস্ত্র দ্বারা মোটামুটি নিয়মিত। পাহাড়পুরে যে দেবদেবীর মূর্তিগুলি দেখিতেছি, এ-গুলি ঠিক অর্চনার জন্য তৈরী দেবদেবী প্রতিমা নয়, বোধ হয় প্রাচীর বা ভিত্তি গাত্র সজ্জার জন্যই ইহাদের রচনা; কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রতিমাশাস্ত্রের নির্দেশ একেবারে অস্বীকৃতও হয় নাই। তবে, প্রাচীর বা ভিত্তিগাত্র সজ্জার জন্য যে মূর্তি রচিত হইত তাহার আর কোনো পৃষ্ঠপট প্রয়োজন হইত না, কিংবা সাধারণত তাহার শিরোভাগের পশ্চাতে কোনো শিরশ্চক্র বা প্রভামণ্ডল থাকিত না। কিন্তু গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিয়মিত অর্চনার জন্য যে-সব দেবদেবীর প্রতিমা রচিত হইত তাহাদের পৃষ্ঠপট ও শিরশ্চক্র দুইই প্রয়োজন হইত, কিছুটা শিল্পের প্রয়োজনে, সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায়, কিছুটা শাস্ত্রনির্দেশে।

সপ্তম-অষ্টম শতকীয় মূর্তি

৪

সপ্তম-অষ্টম-নবম শতকে ভারতেতিহাস ও সংস্কৃতির দিক পরিবর্তন বা রূপান্তরের কথা আগে একবার একটু বলিয়াছি; কি ভাবে ক্ল্যাসিক্যাল-পর্বের অবসান ঘটিয়া মধ্যযুগের আভাস ক্রমশ সুস্পষ্ট হইতে আরম্ভ করিল, তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছি। পাল ও সেন-আমলের (আ ৭৫০—১২৫০ খ্রী) তক্ষণশিল্পের কথা বলিবার আগে সেই ইঙ্গিতটিই অন্যদিক হইতে আরও একটু ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টোত্তর ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পসাধনার বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে একটি মৌলিক ঐক্য সুস্পষ্ট। একটি সর্বভারতীয় সার্বভৌমত্বের আদর্শও এই কয়েক শত বৎসরের রাষ্ট্রীয়

ইতিহাসের পরিমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত ছিল। এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য, স্থানীয় এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও থাকিয়া থাকিয়া সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় এবং সাংস্কৃতিক আদর্শকে কখনও ব্যাহত কখনও সমৃদ্ধ করিয়াছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় বোধ, বুদ্ধি এবং আত্মিক সাধনার কেন্দ্রে একটি সর্বভারতীয় ঐক্য ও মানের, কল্পনা ও মননের, ভাব ও আদর্শের প্রভাব ছিল সচেতন ও সক্রিয়। গুপ্ত-পর্বে কালিদাসের কাব্য, সারনাথের ভাস্কর্য, অজন্তা-গুহার চিত্রাবলী সেই চেতনার চরম অভিব্যক্তি; তাহাই সর্বভারতীয় মানদণ্ড। কিন্তু সপ্তম শতকের শেষার্ধ হইতেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নূতন বাঁক নিতে আরম্ভ করে, শুধু রাষ্ট্রক্ষেত্রেই নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। সর্বভারতীয় আদর্শের চেতনা পরেও আরও কিছুদিন সক্রিয় ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু আঞ্চলিক আদর্শ ও কল্পনা ভারতীয় জীবনের নানাদিকে ক্রমশ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে স্থানীয় ছোট ছোট রাজ্য ও সামন্তরাষ্ট্র মানুষের চেতনাকে অধিকার করিল, এবং এই আঞ্চলিক মনোবৃত্তি সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অনুভূত হইতে দেরী হইল না। উত্তর-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে-সব বিভিন্ন প্রান্তীয় ভাষা ও অক্ষর প্রচলিত তাহার প্রত্যেকটিরই জন্মকাল খ্রীষ্টোত্তর নবম-দশক-একাদশ শতকের মধ্যে; সর্বভারতীয় সংস্কৃত বা প্রাকৃত এবং ব্রাহ্মীলিপি এই শতাব্দীগুলির ভিতরই প্রান্তীয় ভাষা ও অক্ষরে রূপান্তর লাভ করে। এই সময়েই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক স্মৃতিশাস্ত্র রচনার সূত্রপাতও দেখা দেয়; এ-ক্ষেত্রেও সমাজবিন্যাসে আঞ্চলিক মানস প্রত্যক্ষ। শিল্পসাধনার ক্ষেত্রেও এই সময় সর্বভারতীয় মানদণ্ড ছাড়িয়া অথচ সেই মান হইতেই বিবর্তিত হইয়া আঞ্চলিক রূপ ও রীতিকে আশ্রয় করিয়া এক একটি আঞ্চলিক শিল্প-কেন্দ্র গড়িয়া ওঠে। রাষ্ট্রে আঞ্চলিক সামন্তাদর্শ, সমাজে আঞ্চলিক স্মৃত্যাদর্শ ও স্তরভেদ, ভাষা ও অক্ষরে আঞ্চলিক রূপ ও রীতি, শিল্পেও আঞ্চলিক রূপ ও রীতি। সর্বভারতাদর্শ ও বোধের ক্ষেত্রে এই সর্বব্যাপী আঞ্চলিক আদর্শ এবং বোধই ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচক।

তক্ষণশিল্পের দ্বিতীয় পর্ব
*
পূর্বভারতীয় শিল্পের ধারা
*
মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সূচনা

যাহাই হউক, বাংলা দেশে, এবং সমগ্র বঙ্গ-বিহারে, পাল-বংশকে আশ্রয় করিয়াই এই মধ্যযুগীয় লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে, এবং আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এই লক্ষণগুলি ক্রমশ প্রকট হইতে থাকে। কি কি কারণে এই গভীর রূপান্তর সাধিত হইয়াছিল তাহার কিছু আভাস আগে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি; আমাদের আলোচনা-গবেষণার বর্তমান অবস্থায় তাহার চেয়ে বেশি বলিবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া, বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজনও নাই। এই কয়েক শতক (৭৫০—১২৫০) ধরিয়া বাংলায় আচরিত শিল্পকলায় কি কি রূপান্তরের ফলে আসাম-বাংলা-বিহারে অর্থাৎ প্রাচ্য-ভারতে এক নূতন শিল্পরূপ ও রীতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল তাহাই বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য।

পাল-রাজবংশ বৌদ্ধ, কিন্তু রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিও যথেষ্ট অনুরক্ত ছিলেন, এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান দুইই তাঁহাদের পোষকতা লাভ করিত। জনসাধারণের অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ্য বা লোকায়ত ধর্মাশ্রয়ী তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। পাল-পর্বের শিল্পসাধনার পশ্চাতে রাজানুকূল্য কতখানি ছিল বা না ছিল, বলা কঠিন; কিন্তু সমৃদ্ধ বিত্তশালী লোকদের পোষকতা যে ছিল, এবং তাঁহাদের ও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রয়োজনের প্রেরণাও যে সক্রিয় ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। সেন-আমলে রাজবংশ ও অভিজাত-চক্রের দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পরিবর্তন ঘটে। সেন-বংশ ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুরাগী এবং একান্তই ঐ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক; অভিজাত-চক্রও তাহাই। এই আমলের রাজসভাপুষ্ট সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে তাকাইলে মনে হয়, রাজসভা এবং অভিজাতচক্রের সমাজে অলংকরণ ও বিলাস-ব্যসনের আতিশয্য, জাঁকজমক ও আড়ম্বরপ্রিয়তা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। সেন-আমলের তক্ষণ-শিল্পেও একই লক্ষণ দৃষ্টিগোচর; রচনা-বিন্যাসে এবং দেহভঙ্গীতে অতিরিক্ত সংবেদনশীলতার আবেদন, ডৌলে ও গড়নে ইন্দ্রিয়পর ইহমুখীতার আকর্ষণ। সেইজন্যে মনে হয়, এই আমলের তক্ষণ-শিল্পে রাজপ্রাসাদ ও অভিজাত-চক্রের রুচি ও ভাবনাই ছিল একান্তভাবে সক্রিয়।

মধ্যযুগীয় পূর্বা শিল্পের সামাজিক পটভূমি

এই চার-পাঁচ-শ' শতাব্দীর শিল্পের মূল প্রেরণা ছিল বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুমোদিত, উচ্চকোটির ধর্ম-কল্পনা ও ভাবনা, কোনো ব্যক্তি বিশেষের বোধ বা অভিজ্ঞতাসঞ্জাত কল্পনা-ভাবনা নয়, বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের যৌথ সংহত বোধ ও অভিজ্ঞতা জাত ভাবনা-কল্পনা। এই পর্বের বৌদ্ধ, জৈন এবং ব্রাহ্মণ্য প্রত্যেক ধর্মেরই প্রতিমার স্বকীয় শাস্ত্রনির্দিষ্ট রূপ প্রত্যক্ষ, কিন্তু সে-রূপ সাধারণত কোনো ব্যক্তিগত বোধ বা অভিজ্ঞতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তাহা ছাড়া, প্রতিমা-শাস্ত্রের দিক হইতে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিমায় যত পার্থক্যই থাকুক্‌ না কেন, শিল্পের দিক হইতে ইহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্যই নাই; শিল্পরীতি ও আদর্শ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক। এর পর আবার, প্রতিমা-শাস্ত্রের নির্দেশ কোনো ক্ষেত্রেই কোনো ব্যক্তিগত সৌন্দর্য বা অধ্যাত্মবোধ বা অভিজ্ঞতা দ্বারা রূপান্তরিত নয়। সমগ্র ভারতীয় প্রতিমাশিল্প সম্বন্ধেই এ-কথা প্রযোজ্য, এবং সেই হেতুই এই শিল্প অনামী।

মন্দির নির্মাণ ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্মগত পুণ্যার্জনের সৌভাগ্য সকলের ছিল না। যাঁহারা এই ব্যয়ভার বহন করিতে পারিতেন তাঁহারাই কেবল সেই সুযোগ-সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। কাজেই এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, সমসাময়িক কালে জনসাধারণের মধ্যে একটি বিত্তশালী সম্প্রদায় ছিল যাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্মের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন, ধর্মগত পুণ্যার্জনে বিশ্বাস করিতেন।

যাঁহারা প্রতিমা দান ও প্রতিষ্ঠা করিতেন, তাঁহারা পুণ্যার্জনের তৃপ্তি ও আনন্দ

উপভোগেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। প্রতিমা-নির্মাণের রীতি-নিয়ম সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনো ব্যক্তিগত মতামত বা নির্দেশ বা রুচি কিছু ছিল না। শিল্পী চলিত প্রথা ও আদর্শ, শাস্ত্রীয় অনুশাসন এবং শিল্পরীতির সাধারণ ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া মূর্তি গঠন করিতেন। তাহারই চতুঃসীমার মধ্যে শিল্পী ও তাঁহার সহকর্মীদের যাহা কিছু ভাবদৃষ্টি ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়। শাস্ত্রীয় ধ্যানগত কল্পনার সঙ্গে শিল্পীর দৃষ্টি ও ভাবনা, ধ্যান ও কল্পনা সব সময় একাত্ম হইত. তাহা নয়; যখন হইত, তখন যথার্থ শিল্পবস্তু রচিত হইত, যখন তাহা হইত না তখন শুধু প্রতিমাই হইত, শিল্পসৃষ্টি হইত না।

শিল্পীরা ছিলেন সমাজের নিম্নতর স্তরের লোক, এবং সাধারণত সকলেই ছিলেন পেশাগত শ্রেণী, গণ বা নিগমভুক্ত। তাঁহাদের পেশা বা বৃত্তিও সাধারণত নিম্নস্তরের বলিয়াই গণ্য হইত। প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ-গ্রন্থে ভবদেব-ভট্ট একটি-উক্তি উদ্ধৃত করিয়া যে সব নিম্নবর্ণ ও শ্রেণীর স্পৃষ্ট খাদ্য ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ এবং যাঁহাদের বৃত্তি ব্রাহ্মণদের পক্ষে গ্রহণীয় নয় তাহার একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই তালিকায় অন্যান্যদের মধ্যে নট, নর্তক তক্ষক, চিত্রোপজীবী, শিল্পী, রঙ্গোপজীবী. স্বর্ণকার এবং কর্মকারের নাম উল্লিখিত আছে। অবশ্য, বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপিতে বরেন্দ্রভূমির শিল্পীগোষ্ঠীচূড়ামণি এক রাণক শূলপাণির উল্লেখ আছে। মনে হয়, কখনও কখনও শিল্পীদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো রাজদরবারে সম্মানিত পদ অধিকার করিতেন, তবে এ-ধরণের দৃষ্টান্ত বিরল।

তারনাথ এই আমলের দুই জন শিল্পী, ধীমান এবং তাঁহার পুত্র বিটপলোর নাম করিয়াছেন এবং বলিতেছেন, এই পিতা ও পুত্র দুইজনে তক্ষণশিল্প, ধাতব মূর্তিশিল্প এবং চিত্রকলার একটি বিশিষ্ট শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাজকীয় দলিলপত্রে এবং ঐতিহ্যে আর কোনো শিল্পীর নাম বা স্মৃতিমাত্রও রক্ষিত হয় নাই। পাথরের ফলকে ও তাম্রপট্টে লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছেন এমন বহু তক্ষকের নাম জানা যায়; তাঁহাদের কেহ কেহ শিল্পী বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন; কোনো কোনে ক্ষেত্রে পিতা-পিতামহের নামও উল্লিখিত হইয়াছে। মনে হয়, ইঁহারা শুধু লিপিই উৎকীর্ণ করিতেন না, মূর্তি নির্মাণও করিতেন। সিলিমপুর-লিপির শেষ পংক্তিতে লিপি-লেখক ভাস্কর সম্বন্ধে যে-ইঙ্গিত আছে তাহাও এই অনুমানের সমর্থক। 'প্রেমিক যেমন গভীর মনোনিবেশে তাঁহার প্রিয়ার প্রতিকৃতি চিত্রিত করেন, তেমনিই মাগধ-শিল্পী সোমেশ্বরও গভীর অভিনিবেশে এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিয়াছেন।' এখানে কবি সংক্ষেপে এবং প্রায় অননুকরণীয় ভাষায় সোমেশ্বরের শিল্পাদর্শের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন; মনে হয়, সোমেশ্বর সত্যই কৃতী শিল্পস্রষ্টা ছিলেন, শুধু কারুবিদ্ মাত্র ছিলেন না। বাংলার এই আমলের লিপিগুলিতে আর যে-সব শিল্পীর নামোল্লেখ দেখিতেছি তাঁহাদের এখানে একত্র করা যাইতে পারে: ভোগটের পৌত্র শুভটের পুত্র তাতট; সৎ-সমতট নিবাসী শুভদাসের পুত্র মংকদাস; বিমলদাস; সূত্রধার বিষ্ণুভদ্র; বিক্রমাদিত্যের পুত্র শিল্পী মহীধর; মহীধর বা মহীধর-দেবের পুত্র শিল্পী শশীদেব; শিল্পী

কর্ণভদ্র ; শিল্পী তথাগতসার ; এবং ধর্মপ্রপৌত্র মনদাসপৌত্র বৃহস্পতিপুত্র 'বরেন্দ্রকশিল্পী গোষ্ঠীচূড়ামণি' রাণক শূলপাণি।

এই চারি পাঁচ শতাব্দীর বঙ্গীয় শিল্পধারার সামাজিক পোষকতা কাহারা করিতেন এবং প্রেরণা আসিত সমাজের কোন্ স্তর হইতে তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নয়। এই প্রেরণা ও পোষকতার স্তর তালিকাগত করিলে এইরূপ দাঁড়ায় ; (১) রাজপ্রাসাদ, রাজদরবার, সামন্ত-চক্র ও অভিজাত-চক্র ; (২) বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এবং তাঁহাদের ধ্যান-ধারণা, ভাব-কল্পনা ; (৩) বিশিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়ের অনুশাসনাধীন শ্রেণী ও বর্ণস্তর ; এবং (৪) শ্রেণী, গণ বা নিগমভুক্ত শিল্পীকুল। ১নং স্তর সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই। ২নং স্তর স্পষ্টতই ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ বা জৈন পুরোহিত-শাসনের নীতি-নিয়ম, ধ্যান-ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ৩ নং স্তর সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য, তবে, মূর্তি, মন্দির প্রভৃতির পোষকতা যখন ইহারা করিতেন তখন ইহারা স্বভাবতই এমন শ্রেণীস্তরের লোক ছিলেন যে-স্তর বিত্তশালী এবং অপেক্ষাকৃত হ্রস্ববিত্ত বৃহত্তর জনসাধারণেরই একাংশ, কিন্তু সমাজে তাঁহারা বিশেষ সম্মানের পাত্র বলিয়া গণ্য নহেন। এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, এই চারি পাঁচ শতাব্দীর শিল্পে বৃহৎ জনসাধারণের বিশেষ কোনো স্থান নাই ; যাঁহাদের আছে তাঁহারা পুরোহিত শ্রেণীর এবং অল্পবিত্তর বিত্তশালী সমৃদ্ধ শ্রেণীর সংকীর্ণায়তন গোষ্ঠীর লোক ; তাঁহাদেরই সংহত সমন্বিত ঐতিহ্য ভাবকল্পনা এবং চিত্তাদর্শ এই শিল্পে প্রতিফলিত। এই মূর্তিকলা ভাবকল্পনায় সংস্কৃত ও অভিজাত উচ্চকোটির শিল্পকলা, সমসাময়িক সামাজিক-অর্থনৈতিক বিন্যাসের প্রতিপত্তিশীল শ্রেণীর শিল্পকলা। এই কয় শতাব্দীর লোকায়ত শিল্পের স্বাক্ষর যে কি ছিল, কেমন ছিল তাহার রূপ তাহা বলিবার মতন কোনো অভিজ্ঞান আমাদের জানা নাই।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে পাল ও সেন-পর্বের সমস্ত মূর্তিই সূক্ষ্ম অথবা অপেক্ষাকৃত মোটা দানার কষ্টিপাথরে তৈরী ; ধাতব মূর্তি গুলি পিতল অথবা অষ্টধাতুতে গড়া। সোনা এবং রূপার তৈরী দু'একটি মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। কাঠের মূর্তি এবং অলংকরণ রচনাও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না ; ঢাকা-চিত্রশালায় তেমন নিদর্শনও দুই চারিটি সংগৃহীত আছে। কিন্তু পাথরই হোক্ আর কাঠ বা ধাতুই হোক, গঠনরীতির যত পার্থক্যই থাকুক, ভাবকল্পনা ও শিল্পদৃষ্টির, ডৌল ও মণ্ডণের, কাঠামো ও বিন্যাসের কোনো পার্থক্যই এ-যুগে দৃষ্টিগোচর নয়।

পাল ও সেন-পর্বের তক্ষণ-কলার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

এই যুগের প্রায় সমস্ত প্রস্তর ও ধাতব মূর্তিই পৃষ্ঠপটযুক্ত ফলকে উৎকীর্ণ। দুই চারিটি ক্ষেত্রে মাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায়। পাহাড়পুরের প্রস্তর ফলকগুলিতে এবং দেউলবাড়ীর সর্বাণীমূর্তিতে ইতিপূর্বেই পৃষ্ঠপট ব্যবহারের প্রচলন দেখা গিয়াছিল ; অষ্টম-শতকে তাহা পূর্ণরূপ গ্রহণ করে। কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ফলকোৎকীর্ণ মূর্তি ক্রমশ পৃষ্ঠপট-নিরপেক্ষ হইতে থাকে ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও মূর্তিগুলি কখনও একান্তভাবে সমতলবদ্ধদৃষ্টি হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। একেবারে দ্বাদশ শতকের দুই চারিটি প্রতিমায় পূর্ণ

ত্রিভুজায়িত রূপ যেন কিছুটা প্রত্যক্ষ। ফলকের উপর উৎকীর্ণ মূল প্রতিমার শিরোদেশের পশ্চাতে প্রভামণ্ডল; গোড়ার দিকে এই মণ্ডলটি অগ্নিশিখার রূপে সীমান্বিত মাত্র, ক্রমশ তাহা অলংকরণবহুল হইতে হইতে পরিণামে প্রভামণ্ডলের অলংকরণসজ্জার ও বিন্যাসের পারিপাট্য মণ্ডলের অর্থ হরণ করিয়া লয়।

এই প্রতিমাগুলিতে দেবদেবীদের যে নরনারীদেহ রূপায়িত তাহাতে একাধারে পার্থিব এবং দৈবী উভয় ভাব-কল্পনারই অপরূপ সমন্বয়। ইহাই শাস্ত্রীয় বিধান। সাধনমালার বা প্রতিমালক্ষণশাস্ত্রের যে কোনো ধ্যান বা সাধন আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, অধ্যাত্ম নৈর্ব্যক্তিকতা এবং প্রায় ইন্দ্রিয়স্পর্শক্ষম দৈহিক সৌকুমার্য ও সৌন্দর্য দুইই একই সঙ্গে এবং সমভাবে স্বীকৃত। অর্চনার উদ্দেশ্যে যখনই কোনো দেবদেবীর মূর্তি রচিত হইত, তখনই রূপাদর্শ থাকিত রূপযৌবনময় সুকুমার নর বা নারী। নারীদেহের নারীত্বকে ইন্দ্রিয়স্পর্শালু করিবার জন্য যেমন দেবী-প্রতিমার স্তনযুগলকে সুডৌল মাংসল এবং মেখলা ও নিতম্ব দেশকে গুরুভার ও লীলায়িত রূপ দেওয়া হইয়াছে, তেমনই দেবমূর্তিতে নরদেহের প্রশস্ত স্কন্ধের রেখাকে ক্রমশ ক্ষীণায়মান করিয়া সিংহকটিতে রূপায়িত করিয়া পৌরুষের ব্যঞ্জনা প্রকাশ করা হইয়াছে। এ-ক্ষেত্রেও প্রতিমার যৌবনপুষ্ট দেহ, দেহভঙ্গী এবং ভাবাভিব্যক্তিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহীতার সুউচ্চারিত আভাস কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম ভাব-কল্পনা ও অভিব্যক্তির সঙ্গে সুস্পষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহীতার এইরূপ অপরূপ সমন্বয় শিল্পের ক্ষেত্রে সুদুর্লভ। বলা বাহুল্য, ইহার মূলে সক্রিয় ছিল ইন্দ্রিয়ভোগের, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আনন্দ এবং এই আনন্দ ও অভিজ্ঞতার প্রশস্ত অঙ্গন ছিল কামযোগ ও তান্ত্রিকসাধনার জগৎ। কিন্তু, এই প্রত্যক্ষ আনন্দ ও অভিজ্ঞতাকে যখন ধ্যানসূত্রানুযায়ী নৈর্ব্যক্তিক অধ্যাত্ম ভাবনা-কল্পনায় রূপান্তরিত করা হয়, তখন প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ভোগের ইঙ্গিত বা তাৎপর্য আর থাকেনা, শুধু তাহার দূরাগত ধ্বনিটুক থাকে মাত্র। সাধারণত, ধ্যানের সূত্র এবং দূরাগত এই ধ্বনি এই দুয়ের উপরই ছিল শিল্পীদের নির্ভর। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়াভিজ্ঞতাকে যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে নৈর্ব্যক্তিক অধ্যাত্ম-ভাবনায় রূপান্তরের বিভিন্ন প্রয়াসকে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধকগণ বিভিন্ন ধ্যানে ও সাধনে প্রায় কতকগুলি গাণিতিক সূত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। এই এক একটি ধ্যান বা সাধন এক একটি দেবদেবীর বিশিষ্ট রূপকল্পনা; তাহাতে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে বিশিষ্ট দেবদেবীর ও তাঁহার মণ্ডলের, তাঁহাদের রচনা ও বিন্যাসের, তাঁহাদের বিভিন্ন অংশের পরিমিতির, ভঙ্গীর ও রূপের, মাপ ও মানের। শিল্পীরা সাধারণত সকলেই এই সব নির্দেশ নিষ্ঠার সহিত মানিয়া চলিতেন; কিন্তু এই সুবিস্তৃত ও পুংখানুপুংখ অনুশাসনের সীমায় আবদ্ধ থাকিয়াও প্রতিভাবান্ শিল্পী কোনো কোনো ক্ষেত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের রূপসৃষ্টির আদর্শে প্রবুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রশক্তি শিল্পীরাও কেহ কেহ পরে নূতনতর দৃষ্টির কিছু কিছু দিশা লাভও করিয়াছেন। সাধারণত, বাস্তব শারীর-বিজ্ঞানের

প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, ভারতীয় শিল্পের অন্যান্য পর্বে যেমন, এ-পর্বেও তেমনই কোথাও উৎকট হইয়া দেখা দেয় নাই ; কিন্তু অন্যদিকে একই সঙ্গে প্রতিমাগুলির অলংকার ও অলংকরণে যে বাস্তব নিষ্ঠা ও কারুকার্যের যে অপরিমেয় সূক্ষ্মতা দৃষ্টিগোচর, তাহা বিস্ময়কর।

বলিয়াছি, শারীর-বিজ্ঞানের বাস্তবতার প্রতি শিল্পীদের দৃষ্টি কখনো আকৃষ্ট হইত না, কিন্তু বিশিষ্ট মানবদেহের যে বিশেষ ধর্ম, তাহার অন্তর্লীন অভিজ্ঞতার যাহা ব্যঞ্জনা, তাহার সুষ্ঠু সুমিত প্রকাশে কোথাও কোনো ব্যত্যয় ঘটে নাই। সে-প্রকাশ প্রতিমাগুলির বিশিষ্ট ভঙ্গ ও ভঙ্গীতে, বিশেষ চালচলনে, অর্থবহ স্থিতি বা গতিতে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সাধকের ধ্যানদৃষ্টিই সক্রিয়, এবং সেই দৃষ্টি প্রায় গাণিতিক সূত্রাকারে গ্রথিত। পাল ও সেন-পর্বের মূর্তিকলায় যে ভঙ্গ, ভঙ্গী এবং মুদ্রার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহার বীজ উপ্ত হইয়াছিল গুপ্তপর্বের শিল্পকলায় ; কিন্তু প্রাচ্য-ভারতের এই চারি-পাঁচশত বৎসরের শিল্প সেই বীজের সমস্ত ফল-সম্ভাবনাকে একটি একটি করিয়া নিঃশেষ সার্থকতায় পরিপূর্ণতা দান করিয়াছে। দুইটি স্থিতভঙ্গীর উল্লেখ করিতেছি, একটি সমপদস্থান, অপরটি বজ্রপর্যঙ্কাসন। দুইটি ভঙ্গীই উচ্চস্তরের অধ্যাত্ম যোগসাধনা দ্বারা নিয়মিত। বিষম ক্রোধ, চরম প্রলোভন, গভীর দুঃখ ও বিষাদ, পরিপূর্ণ সুখ ও আনন্দ, পরমা শান্তি ও অস্থির চাঞ্চল্য—সব কিছুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সব কিছুর কেন্দ্রে বাস করিয়াও যে অবিচল দৃঢ়তা, এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল বস্তুজগতের মধ্যে শাশ্বত অপরিবর্তনীয়তা তাহা এই দুই ভঙ্গীর মধ্যে ব্যক্ত। অথচ, মূল কেন্দ্র প্রতিমা যেখানে সমপদস্থানক ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান বা বজ্রপর্যঙ্কাসনে আসীন, সেইখানে তাহার আনুসঙ্গিক পার্শ্বদেবতা ও অনুচররূপে নানা লাস্যভঙ্গিমায় যে-সব দেবদেবীমূর্তি খচিত, নৃত্যশীল ভঙ্গিমায় লীলাচ্ছলে নভোমার্গে যে-সব কিন্নরী সঞ্চরমান, পৃষ্ঠপটে রেখা-কল্পনার যে ছন্দিত লীলায়িত ভঙ্গী, তাহাদের মধ্যে সংসারের নিত্য চঞ্চল চলমান রূপ প্রত্যক্ষ। এই নিত্যসঞ্চরমান লীলায়িত রূপের কেন্দ্রে স্থানক বা আসীন যে কোনো অবস্থায় মূল প্রতিমার মুখমণ্ডল ও দেহব্যঞ্জনা স্মিতহাস্যে বিকশিত, স্থির, প্রশান্ত, গম্ভীর, অচঞ্চল, সমাহিত এবং রূপান্তরের অতীত। বারবার বলিতে বাধা নাই, এই ভাবদৃষ্টি যোগের দৃষ্টি। যাহা হউক, নবম-দশম-একাদশ শতকে পার্শ্বদেবতা ও অলংকরণের সঙ্গে মূল মূর্তির একটা ভারসাম্য এবং একটা যুক্তিগত সামঞ্জস্য ছিল। দ্বাদশ শতকে পার্শ্ব-দেবতাদের অস্থির চাঞ্চল্য এবং অলংকরণ-রেখার অশান্ত আবেগ মূল মূর্তির প্রশান্তিকে, তাহার সমাধিকে অতিক্রম ও বিপর্যস্ত করিয়াছে।

অন্যান্য দণ্ডায়মান ভঙ্গীর মধ্যে ঈষৎ আভঙ্গ ও ত্রিভঙ্গ এবং উপবিষ্ট ভঙ্গীর মধ্যে ললিতাসন বা মহারাজলীলাসন উল্লেখযোগ্য। এই সব ভঙ্গ ও ভঙ্গিমায় সহজ আত্মসমাহিত লালিত্য পরিস্ফুট। তাহা ছাড়া, গতিশীল সক্রিয়তা গন্ধর্বকিন্নরীদের নৃত্যময় ও উড্ডীয়মান ভঙ্গীতে প্রত্যক্ষ, এবং বীর্য ও দৃঢ়তা সমান প্রত্যক্ষ বরাহ-বিষ্ণুর এবং অন্যান্য দেবদেবীর আলীঢ় ও প্রত্যালীঢ় ভঙ্গিমায়। এই সব প্রত্যেকটি ভঙ্গ ও ভঙ্গীই শান্ত সমাহিত অভিজ্ঞতা

ও ধ্যানযোগ হইতে সঞ্জাত। শিল্পীর মানসে বরাহ-বিষ্ণু বা সঞ্চরণশীল গন্ধর্বের যে রূপ ধরা দিয়াছে, রেখায় ও ডৌলে খচিত প্রাণবন্ত ভঙ্গী তাহার একদিক মাত্র; যাহা ক্ষণিকের একটি ভঙ্গী প্রকৃতপক্ষে তাহা গভীর ধ্যানের একটি রূপ; এই রূপকে শিল্পে গতিচ্ছন্দে প্রাণপ্রবাহে প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। সেই জন্যই, যে-ভঙ্গীতে বীরত্বের ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট, যেমন মহিষমর্দিনী প্রতিমায় বা বরাহ-বিষ্ণু প্রতিমায়. সে-ভঙ্গীতেও মুখাবয়বে কোনো সমতুল বীরত্বের ব্যঞ্জনা নাই, সে মুখ প্রশান্ত, আনন্দদীপ্ত—বীরত্বের এবং উজ্জীবনের ব্যঞ্জনা শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাসে, দেহভঙ্গীতে। কোন্ দেব বা দেবীর ভাব ও ভঙ্গী কিরূপ হইবে তাহা যে নিয়মিত ছিল ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতা এবং ধ্যানসূত্রদ্বারা তাহাই শুধু নয়, সেই দেব বা দেবীর বিশেষ ভঙ্গী ও বিন্যাসের অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা যে কি তাহাও সাধনসূত্রেই নির্ণীত। সুতরাং বিগ্রহ ও সাধনসূত্র উভয়ই উভয়ের ব্যাখ্যার সহায়ক।

নির্মাণকলার বিবর্তন ৭৫০-১২৫০

ডৌল ও গড়নের বিবর্তনের দিক হইতে অষ্টম শতকীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে এমন প্রতিমার সংখ্যা খুব বেশি নয়। বর্ধমান-বরাকরে প্রাপ্ত দুইটি দেবী প্রতিমা, মানভূম-বোরামে প্রাপ্ত একটি প্রতিমা, এবং দিনাজপুর-কাকদীঘিতে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণু-প্রতিমা, এই চারিটি মূর্তি অষ্টম শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। হ্রস্ব গুরুভার দেহে এবং মুখাবয়বের ভঙ্গীতে সমকালীন মাগধী তক্ষণশৈলীর লক্ষণ সুস্পষ্ট। বিরলালংকার দেহসজ্জা এবং ডৌলের কমনীয়তাও পাল-পর্বের প্রথম পর্যায়ের শিল্পাদর্শ। এই শতকের ধাতব প্রতিমাগুলিতেও একই লক্ষণ দৃষ্টিগোচর।

লিপি-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বাংলার যে-ক'টি প্রতিমাকে নিঃসংশয়ে পাল ও সেন-পর্বের বলিয়া চিহ্নিত করা যায় তাহাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। (প্রথম) মহীপালের রাজ্যাঙ্কের তৃতীয় বৎসরে প্রতিষ্ঠিত এবং ত্রিপুরা জেলার বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুমূর্তি, এই রাজারই চতুর্থ সম্বৎসরে স্থাপিত একটী গণেশ মূর্তি; চন্দ্রবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে রচিত একটি বিষ্ণু ও একটি সূর্য-প্রতিমা; তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালে নির্মিত একটি সদাশিব-মূর্তি এবং লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে রচিত এবং ঢাকার ডালবাজারে প্রাপ্ত একটি চণ্ডী-মূর্তি—এই কয়েকটি লিপি ও তারিখ-চিহ্নিত প্রতিমাই শৈলী-নির্দেশ ব্যাপারে আমাদের নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য বা দিগ্‌দর্শন-সহায়ক। ইহাদের সাহায্যে অল্পবিস্তর নিশ্চয়তায় বাংলার সমসাময়িক শিল্পের গতি নির্দেশ করা সম্ভব; বিহারে আবিষ্কৃত প্রতিষ্ঠা-তারিখযুক্ত প্রতিমার সাহায্যেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। তবে, মনে রাখা দরকার, বিহার ও বাংলার সমসাময়িক নির্মাণশৈলী ঠিক একই ধারা অনুসরণ করে নাই। গুপ্তধারা ও ঐতিহ্য বাংলা অপেক্ষা বিহারে অধিকদিন সক্রিয় ছিল; পূর্ব-ভারতের আঞ্চলিক শৈলীর বিকাশ বাংলায় দেখা দিয়াছিল বিহারের আগে। বস্তুত, অষ্টম শতকের শেষ নবম-শতকের সূচনা হইতেই পূর্বী শিল্পকলা বাংলাদেশে তাহার স্থানীয়

বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল; পরবর্তী তিন শতক ধরিয়া এই শৈলীই বিবর্তনের সাধারণ সূত্র ধরিয়া স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়াছে।

দেবপাল, শূরপাল, নারায়ণপাল এবং গুর্জরপ্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের রাজত্বকালে রচিত কয়েকটি প্রস্তর ও ধাতব প্রতিমা বিহারে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মাংসল দেহরূপে গুপ্ত-ঐতিহ্যের আপেক্ষিক কমনীয় ডৌল সুস্পষ্ট নৈর্ব্যক্তিকতায় প্রকাশিত; মুখের ভাব প্রশান্ত, কিন্তু দেহের মাংসল গড়নে ইন্দ্রিয়স্পর্শালুতার স্বাক্ষর। দেহভঙ্গী কোথাও কোথাও আড়ষ্ট; দেহের বহিরেখা দৃঢ়। এই দৃঢ় রেখাই উদ্বেলিত শক্তিকে সীমার বন্ধনে শক্ত করিয়া বাঁধিয়াছে; রূপায়নে যে শক্তিমত্তার পরিচয় তাহা এইখানেই। এই দৃঢ় বহিরেখার মধ্যে কোমল মাংসলতার আভাস ফুটাইয়া তোলাই নবম শতকীয় শিল্পাদর্শ। খুব কম নিদর্শনেই উন্নত ও গভীর মানস কল্পনার কোনো স্বাক্ষর আছে। ধ্যানের ও উপলব্ধির যাহা কিছু আভাস তাহা শুধু অর্ধনিমীলিত চক্ষু দু'টিতে এবং প্রশান্ত মুখমণ্ডলে; কিন্তু তাহাও প্রায় সবটাই প্রথাগত।

নবম শতক

পৃষ্ঠপটটি সাধারণত শিরোদেশে প্রায় অর্ধগোলাকৃতি; কিন্তু দু' একটি ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ কোনায়িত অগ্রভাগও দৃষ্টিগোচর। সিক্তবসনের মত পরিধেয়ের ভাঁজ দেহডৌলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, এবং ভাঁজগুলি সমান্তরাল তরঙ্গায়িত রেখায় চিহ্নিত। দাঁড়াইবার ভঙ্গী হয় সমপদস্থানক না হয় আভঙ্গ বা ত্রিভঙ্গ; কিন্তু বসিবার ভঙ্গী প্রায় সর্বত্রই ললিতাসন; ভঙ্গীটি আরামের ব্যঞ্জনা বহন করে সত্য, কিন্তু মূর্তির রূপায়নে আরামের ব্যঞ্জনা স্বল্পই ব্যক্ত হইয়াছে। হস্ত, পদ, অঙ্গুলি ইত্যাদির বিন্যাস একান্তই শাস্ত্রনির্দিষ্ট; কিন্তু ইহাদের দেহের অলংকরণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষীণতা অথবা মাংসলতা ব্যক্তিগত রুচিনির্ভর, আর রেখার গতি ও মণ্ডনের দৃঢ়তা বা কমনীয়তা যৌথশিল্প দৃষ্টি ও রীতিনির্ভর। জানুদ্বয় সযত্নে খচিত এবং পদদ্বয়ের গড়নে ডৌলের নমনীয়তাও প্রত্যক্ষ। তরঙ্গায়িত কুঞ্চিত কেশদাম স্কন্ধের দুই পার্শ্বে নিয়মিত ছন্দে দুল্যমান; দুল্যমান্ উত্তরীয়ও দৃঢ় নিয়মিত ছন্দে বাঁধা, উভয় ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দ লীলার আভাস অনুপস্থিত। অলংকারগুলি ভারী এবং কারুকার্যবিহীন; পৃষ্ঠপটে আলংকারিক সাজসজ্জাও অপেক্ষাকৃত স্বল্প, সর্বত্র তাহা মণ্ডিতও নয়, শুধু রেখার আঁচড়ে চিহ্নিত।

দৃঢ়, সুনির্দিষ্ট বহিরেখার মধ্যে মাংসল কমনীয়তার আদর্শ অতিক্রম করিয়া দশম শতকে দৃঢ় শক্তিগর্ভ স্থূল দেহ নির্মাণের আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিল। এই শতকের মানবদেহ কল্পনায় আত্মসচেতন অর্থাৎ সংযত শক্তিমত্তার ব্যঞ্জনা ডৌল ও গড়নের মধ্যে সুস্পষ্ট; সচেতন শক্তির দৃঢ় সংযত প্রবাহ যেন ভিতর হইতে ঠেলিয়া সমগ্র দেহটিকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছে। কোনো কোনো নিদর্শনে কঠোর সংযমে এই প্রবাহোচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে, এবং সে-সংযম এতই কঠোর যে, মনে হয়, দেহের সজীব মাংস যেন পাথরে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, সাধারণ দৃষ্টি ও রীতি ঠিক

দশম শতক

তাহা নয়; বরং দৃঢ় সংবত ডৌলে ও মণ্ডনে সুকুমার মসৃণতার একটি উজ্জ্বল দীপ্তি ও প্রবাহ প্রত্যক্ষ, সমগ্র প্রতিমামণ্ডল ও পৃষ্ঠপটটীর উপর যেন প্রাণের আনন্দ বিচ্ছুরিত, মুখমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সীমান্ত পর্যন্ত শক্তিগর্ভদেহের প্রাণপ্রাচুর্য পরিব্যাপ্ত। এই উদার বিরাট প্রাণময়তাই নবম শতকের কোমল মাংসলতাকে দশম শতকে অপরিমেয় শক্তিমত্তায় রূপান্তরিত করিয়াছে। সমগ্র দশম শতক জুড়িয়া বাংলার তক্ষণশিল্পে এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ, বিশেষভাবে প্রস্তরশিল্পে। দিনাজপুর জেলার সুরোহর গ্রামে প্রাপ্ত ঋষভনাথ-প্রতিমা, ফরিদপুর জেলার উজানী গ্রামে প্রাপ্ত বুদ্ধ-মূর্তি, বগুড়া জেলার সিলিমপুরে প্রাপ্ত বরাহাবতার-মূর্তি এই উক্তির সাক্ষ্য। ক্ষেত্রবিশেষে কোথাও কোথাও দেহের উচ্ছ্বসিত শক্তি কোমল কমনীয় রূপাদর্শের অন্তরালে কিছু ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, এবং রূপায়নে ইন্দ্রিয় গ্রাহীতার আভাসও স্পষ্ট; কিন্তু কোমল কমনীয়তাই হোক্ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহীতাই হোক্, দুইই দৃঢ় সংবত রেখাপ্রবাহ দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত।

অন্যান্য বিষয়ে দশম শতক মোটামুটি নবম-শতকের রূপ ও রীতিকেই বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে। পরিপূর্ণ মুখমণ্ডলের আকৃতি অবিকল এক; দেহ সামান্য দীর্ঘায়ত, কিছু ক্ষীণায়তও বটে, এবং দেহের নমনীয়তা কিছুটা বর্ধমান। তাহার ফলে, দেহের রূপায়নে রেখার প্রয়োগ বাড়িয়াছে; এ-পর্বে ললিতাসন ও অর্ধপর্যঙ্কাসন ভঙ্গী প্রিয়তর। পদযুগলের মণ্ডণ কঠিনতর, ঋজুতর এবং অপেক্ষাকৃত অনমনীয়। পটের বিন্যাস মোটামুটি এক, কিন্তু পটভূমির অলংকরণ সূক্ষ্মতর হইয়াছে এবং অলংকারের কারুকার্যেও পারিপাট্য বাড়িয়াছে। ওষ্ঠ ও নাসিকার, ভ্রু ও চক্ষুদ্বয়ের, বসন ও অলংকারের রেখায় নবম-শতকীয় তীক্ষ্ণতা অন্তর্হিত; রেখা এখন সুমার্জিত এবং ডৌলের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। পৃষ্ঠপটের উপরিভাগ সূক্ষ্মাগ্র এবং ঠিক তাহার নীচেই 'কীর্তিমুখ' অলংকার।

কলিকাতার আশুতোষ-চিত্রশালায় দশম-শতকীয় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মূর্তি আছে। হুগলী জেলায় প্রাপ্ত লোকেশ্বর-প্রতিমা, অগ্রদিগুণে প্রাপ্ত একটি নারীর মুখমণ্ডল, সুন্দরবনে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুপ্রতিমা এবং মহাপরিনির্বাণ বুদ্ধের একটি ফলক। এই প্রতিমা গুলিতে, অল্পবিস্তর ব্যতিক্রম সত্ত্বেও, একই দশম-শতকীয় আদর্শ প্রতিফলিত।

দশম শতক বাংলা প্রতিমাশিল্পের সুবর্ণযুগ। অষ্টম শতকে প্রতিমাশৈলী কেন্দ্রবিচ্যুত, কর্দমশিথিল; নবম শতকেও মাংসল শৈথিল্য বিদ্যমান কিন্তু তাহাকে রেখার সীমানায় বাঁধিবার একটা চেষ্টা প্রত্যক্ষ। দশম শতকে কেন্দ্রচেতনায় সমগ্র দৃষ্টি জাগ্রত, শিথিল মাংসল দেহে শক্তির আবির্ভাব, চারিত্রিক দৃঢ়তা ব্যঞ্জিত।

একাদশ শতকে দৃঢ় শক্তিগর্ভ দেহে লাগিল রসমাধুর্যের স্পর্শ, কিছু সৌষ্ঠবের চেতনা। দেহরূপের ক্ষীণতার দিকেও প্রবণতা গেল বাড়িয়া। প্রথম-মহীপালের রাজ্যাঙ্কের তৃতীয় বৎসরে যে বিষ্ণুমূর্তিটি বাঘাউড়ায় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই সব লক্ষণ বিদ্যমান; এই মূর্তিটিকে পরবর্তী দুই তিন পুরুষের তক্ষণকলার মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে।

দশম শতকে যে গভীর ও প্রশস্ত গঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, এই শতকে তাহা ক্রমশ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইতে চলিয়াছে, এবং ক্ষীণদেহে কোমল পেলব গড়নের রীতি প্রাধান্য লাভ করিতেছে। পদযুগলের ঋজু কাঠিন্য ক্রমবর্ধমান; সাধারণ ভাবে দেহরেখার নমনীয়তাও ক্রমহ্রস্বায়মান। জানুর গড়ন ও মণ্ডনে নবম ও দশম শতকীয় মার্জিত নৈপুণ্য অন্তর্হিত; শুধু একটি গভীর বক্ররেখায় জানু চিহ্নিত। বস্তুত, দেহের ঊর্ধ্বভাগের মনোরম মাধুর্যময় গড়ন এবং প্রশান্ত উদার স্মিত মুখমণ্ডলের সঙ্গে দেহের নিম্নভাগের ঋজু, কঠিন, অনমনীয় গড়নের কোনো তুলনাই হয় না।

একাদশ শতক

অন্যদিকে পৃষ্ঠপটের বৈচিত্র্য ও অলংকার ক্রমবর্ধমান। প্রতিমার অলংকরণ, সহচর দেবদেবীদের অলংকার-বৈচিত্র্য, বিচরমান গন্ধর্ব-কিন্নর, পটের অলংকার ও কারুকার্য ইত্যাদি ক্রমশ প্রতিমাকে অতিক্রম করিয়া অতিমাত্রায় স্বাতন্ত্র্য পরায়ণ। তবু, একাদশ শতকের প্রথমার্ধে প্রতিমা ও পার্শ্বদেবতা, প্রতিমা ও পৃষ্ঠপটের মধ্যে একটা ভারসাম্য বিদ্যমান; শেষার্ধের দিকে মূল প্রতিমার সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য ক্রমবর্ধমান অলংকার প্রাচুর্যে প্রায় চঞ্চলিত। শিল্পীর আনন্দ যেন এই প্রাচুর্যের মধ্যেই উদ্দীপ্ত। দ্বাদশ শতকে কিন্তু এই উদ্দীপ্ত প্রাচুর্যই ক্রমে হইয়া উঠিল শিল্পের বন্ধনরজ্জু।

কেশবিন্যাসে এবং উত্তরীয়ের রেখায় তরঙ্গায়িত ছন্দ, গভীর ত্রিভুজায়িত ভৌলে ও তির্যক বা আলম্ব গভীর রেখায় আলোছায়ার স্পন্দিত লীলা। দেহভঙ্গী যেন ছাঁচে ঢালাই করা, কিন্তু মুখভঙ্গী সংবেদনশীল এবং গড়ন কোমল সুকুমার। মুখাকৃতি যাহাই হউক, চিবুকের রেখাটি সজীব, ওষ্ঠদ্বয় প্রায় গোলাকৃতি, চক্ষুদ্বয় গভীর ও প্রশস্ত। বসন দেহের রেখা ও ভৌলের সঙ্গে একেবারে একাঙ্গীভূত, বস্ত্রাঞ্চল মনোরম তরঙ্গায়িত রেখায় খচিত। ভ্রূ-চিত্রণে কোনো কোনো নিদর্শনে বঙ্কিম রেখাটিকে দুইবার তরঙ্গায়িত করা হইয়াছে, অর্থাৎ ভ্রূ-র প্রান্তসীমায় আবার উপরের দিকে একটু ঢেউ খেলানো হইয়াছে; উদ্দেশ্য যে মাধুর্য ও সংবেদনশীলতার প্রকাশ তাহাতে আর সন্দেহ কি! এই সংবেদনশীল মাধুর্য এবং দীর্ঘায়ত ক্ষীণ, সৌষ্ঠবময় দেহই একাদশ শতকীয় মূর্তিকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অগ্রদিগুণে প্রাপ্ত উমা-মহেশ্বর প্রতিমা, সুন্দরবনের কঙ্কনদীঘির নবগ্রহ ফলক, সুন্দরবনে প্রাপ্ত বীণাবাদিনী সরস্বতী এই বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর।

এই ক্ষীণ দীর্ঘায়ত সৌষ্ঠবমাধুর্যময় দেহের মার্জিত শ্রী দ্বাদশ শতকে অলংকার ও পৃষ্ঠপটের অলংকরণের প্রাচুর্যে শুধু যে ভারগ্রস্তই হইয়া পড়িল তাহাই নয়, নবম-শতকীয় মাংসল শৈথিল্যও পুনরাবর্তিত হইয়া দেহরূপকে ক্রমশ নির্জীব ভারগ্রস্ত জড়তায় মণ্ডিত করিয়া দিল। দেহভৌলের কোমল সজীবতা ও পেলব মাধুর্য ক্রমে বিদায় লইল। এই শতকের মূর্তিনির্মাণ-কলার স্বাক্ষর দেখিতেছি তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালে খচিত রাজীবপুরে প্রাপ্ত সদাশিব-মূর্তিতে এবং লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার ভালবাজারে প্রাপ্ত চণ্ডী-প্রতিমায়।

দ্বাদশ শতক

প্রতিমা, পাদপীঠ, কাঠামো ও পৃষ্ঠপটের বিন্যাস এই শতকে অপরিবর্তিত; দেহকাণ্ডের ক্ষীণ দীর্ঘায়ত ধারাও গোড়ার দিকে অব্যাহত। কিন্তু মুখাবয়বের স্মিত সংবেদনশীলতা আর নাই, তাহার জায়গায় দেখা দিয়াছে অকারণ গাম্ভীর্যের ভার। অলংকরণ ছাড়া মার্জিত ভ্রূ-যুগলের আর যে কোনো উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না; পদযুগল তাহার সমস্ত কমনীয়তা হারাইয়া যেন দুইটি স্তম্ভে পরিণত হইয়াছে। পৃষ্ঠপটের ত্রিকর্ম বা চতুর্কর্ম বিভাগে অসংখ্য গুরুভার পার্শ্বদেবতা, সুপ্রচুর অলংকরণ অথচ সেই অলংকরণ সমগ্র মূর্তির রূপকল্পনার সঙ্গে কোনো অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত নয়, সর্বত্র অকারণ ঘনবিন্যস্ত বাহুল্য; সব মিলিয়া সমগ্র প্রতিমা-পটটিকেই যেন ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রতিমার দৈহিক গঠনে কমনীয়তার কোনো অভাব নাই, কিন্তু সে-কমনীয়তা যেন মদির, অবশ ও নির্জীব; বঙ্কিমায়িত ভঙ্গীর সাক্ষ্যসুপ্রচুর, কিন্তু সে-ভঙ্গীতে লীলায়িত গতির ব্যঞ্জনা নাই। বসনপ্রান্ত ও অঞ্চল তরঙ্গায়িত, গন্ধর্ব ও কোনো কোনো পার্শ্বদেবতার দেহভঙ্গীতে ক্রীড়ালীলার প্রকাশও গোচর; বসনের বহুল রেখাবিন্যাস, পরিধেয় ও কেশ বিন্যাসের অলংকরণ প্রাচুর্য, গভীর আলোছায়ার বৈচিত্র্যখচিত অলংকার ও পটদৃশ্য প্রভৃতি সত্ত্বেও জীবনের স্বতোদৃপ্ত ও সুস্পষ্ট উজ্জ্বল স্বাক্ষর এ-পর্বের মূর্তি-রচনায় অনুপস্থিত। ভোগব্যায়ত সুপূর্ণ ওষ্ঠাধর, ধনুকাকৃতি ভ্রূযুগল এবং সুস্মিত মুখমণ্ডল সত্ত্বেও মুখাবয়ব তীক্ষ্ণ, প্রায় ত্রিকোনাকৃতি ও কঠিন; সমস্ত মুখমণ্ডলে কোনো গভীর আত্মিক ব্যঞ্জনার চিহ্নমাত্র নাই। দশম-একাদশ শতকের মূর্তিকলায় যে ধ্যানগম্ভীর প্রশান্ত শ্রীমণ্ডিত মুখমণ্ডলের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, সে মুখ বিগত; ধ্যানগম্ভীর প্রশান্তির স্থান লইয়াছে গভীর আনন্দ-সম্ভোগের মদির পরিতৃপ্তি। এই সম্ভোগের মদির পরিতৃপ্তির মাধুর্যই লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাঙ্কের তৃতীয় বৎসরে রচিত চণ্ডীর মুখমণ্ডলে। বস্তুত, এই পর্বের প্রতিমা-কলায় সর্বত্র একান্ত ইহগত ভোগবাসনার মদির মাধুর্যের ব্যাপ্তি, দুর্বল কামনার মোহময় বিলাস। তাহা সত্ত্বেও এখানে সেখানে নবতর শিল্পপ্রেরণা ও শিল্পাদর্শের পরিচয় একেবারে নাই, এমন নয়। দুই একটি নিদর্শনে পরিপূর্ণ মণ্ডলায়িত কাঠামোর মধ্যে অমার্জিত অথচ শক্তিগর্ভ শিল্পক্রিয়ার প্রয়াস সুস্পষ্ট, এবং অলংকারবাহুল্য এবং নিখুঁত বিন্যাস সত্ত্বেও এই শিল্পক্রিয়ার মধ্যে একটা সচেতন শক্তি ও মর্যাদা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সজীবতা স্বপ্রকাশ। এই শক্তি, মর্যাদা ও সজীবতা বাংলার প্রতিমাকলাকে চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত হইতে হয়তো বাঁচাইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইল না; সমসাময়িক সামাজিক বাতাবরণে এই শক্তি, মর্যাদা ও সজীবতা কোথাও ছিল না। তাহা থাকিলে এবং অবকাশ পাইলে হয়তো এই শিল্পকলা নব নব অভিজ্ঞতার ও চেতনার আশ্রয়ে নূতন পথ ও আদর্শের সন্ধানলাভ করিতে পারিত। কিন্তু ইসলামের দ্রুত অভিযান সমস্ত আশা-ভরসার পথ মরুঝড়ে ঢাকিয়া দিল।

দ্বাদশ শতকের প্রতিমাকলা প্রধানত সেন-বর্মণ পর্বের শিল্পাদর্শের এবং সমাজাদর্শের অনুপ্রেরণায় রচিত ও লালিত। এই আমলের প্রতিমাগুলিতে যে ইহগত, একান্ত পার্থিব

সুখৈশ্বর্যের ব্যঞ্জনা, সেই একই ব্যঞ্জনা সেন-বর্মণ রাজসভার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। ধর্মগত বিষয়বস্তু সত্ত্বেও শিল্প ও সাহিত্য উভয়ই পার্থিব ভোগচেতনা এবং জৈব কামনা-বাসনা দ্বারা মণ্ডিত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বা গোবর্ধনের সপ্তশতী তো সমসাময়িক শিল্পেরই সাহিত্যিক প্রতিরূপ। সন্দেহ নাই, ইহার মূল ধর্মগত প্রেরণা কিছুটা ছিল, কিন্তু এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ করা চলে না যে, যাহা মূলে ছিল অধ্যাত্মপ্রেরণা তাহা রাজসভার ইহগত ভোগবাসনার স্পর্শে একান্ত ইহগত ভাবনা-কল্পনায় বিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। সূক্ষ্ম কমনীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহীতা বাংলার শিল্পকলার প্রধান আদর্শ বলিয়া আগেও পরিগণিত হইত, কিন্তু সেন-বর্মণ আমলে তাহা একান্ত দেহগত কামনার মদিরমাধুর্যে পর্যবসিত হইল!

এই আমলের প্রতিমাকলার এই ঐহিক সমৃদ্ধির মূলে ভিন্‌প্রদেশী উৎসের প্রভাব থাকা কিছু বিচিত্র নয়। সমসাময়িক দক্ষিণী প্রতিমা-শিল্পেও একই ঐহিক ভোগসমৃদ্ধির এবং গুরুভার অলংকরণের প্রাধান্য। অবশ্য, বাংলার প্রতিমা-কলায় যে কমনীয়তা, সজীবতা ও সংবেদনশীলতা প্রত্যক্ষ দক্ষিণী শিল্পে তাহা নাই; স্মরণ রাখা প্রয়োজন, বাংলার এই কমনীয়, সজীব ও সংবেদনশীল শিল্পাদর্শ পূর্বতন পাল-প্রতিমাকলার উত্তরাধিকার।

নবম হইতে দ্বাদশ শতক এই চারিশত বৎসরে বাংলা দেশে অসংখ্য প্রস্তর ও ধাতব প্রতিমা রচিত হইয়াছিল; তাহার স্বল্পাংশমাত্র আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সাধারণ কয়েকটি মন্তব্য

শিল্পশৈলীর যে ধারাবাহিক বিবর্তনের কথা বলিলাম, প্রত্যেকটি প্রতিমাই যে সেই ধারা অনুসরণ করিয়াছে এমন নয়, ব্যতিক্রমও আছে প্রচুর। তবু, এই ধারাই সাধারণ প্রবহমান ধারা। কাল কালান্তরে প্রবেশ করে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরবর্তী কালের লক্ষণ আগের কালেই আত্মপ্রকাশ করে, আবার কোনো কোনো নিদর্শনে অতীত কালের বৈশিষ্ট্যও সমসাময়িক কালে অমলিন থাকিয়া যায়। বস্তুত, কোনো দুই কালপর্বের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভেদরাখা টানা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, যে কলা গতিশীল তাহাতে একই ভাবাদর্শ বা ভঙ্গিমার পুনরাবৃত্তি আশা করা যায় না; সাধারণ শিল্পাদর্শেও ব্যতিক্রম দেখা যায়। একই যুগে, এমন কি একই রাজার স্বল্পস্থায়ী শাসনকালেও বিচিত্র মুখাবয়ব, বিভিন্ন নির্মাণরীতি, মণ্ডণকৌশল, এমন কি ভিন্নতর সৌন্দর্যবোধের সাক্ষাৎও পাওয়া যায়। কিছুটা কারণ ভৌগোলিক সন্দেহ নাই; স্থানভেদে রুচির ভেদ, রীতির ভেদ, এবং সেই হেতু উত্তর-বঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণ-বঙ্গের, পশ্চিম-বঙ্গের সঙ্গে পূর্ব-বঙ্গের প্রতিমাকলায় কিছুটা রূপ-পার্থক্য অনিবার্য। কিন্তু মোটামুটি মানদণ্ড এক এবং অভিন্ন, সমস্তই একই শিল্পাদর্শের সৃষ্টি। এই চারি শতকের বাংলাদেশে নানা বিভিন্ন জাতি ও জনের বাস, নানা ভিনপ্রদেশী লোকের; কোনো কোনো প্রতিমার মুখাকৃতি ও গঠনে বিশিষ্ট জন-বৈশিষ্ট্যও সেই হেতু প্রত্যক্ষ। কোনো কোনো নিদর্শনে তীক্ষ্ণ মঙ্গোলীয় প্রভাব সুস্পষ্ট; এই ভোট-ব্রহ্ম বা মোঙ্গোলীয় মুখবৈশিষ্ট্যের পশ্চাতে সমসাময়িক ইতিহাসের প্রেরণা সক্রিয়। শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি এবং গঠনরীতিও কিছুটা এই পার্থক্যের মূলে,

সন্দেহ নাই। বাংলার সমসাময়িক লোকায়ত শিল্পও পাশাপাশি বর্তমান ছিল; তাহার সঙ্গে উচ্চকোটি শিল্পাদর্শ ও রীতির একটা যোগাযোগ ছিল, এমনও অসম্ভব নয়, এবং দুইই একে অন্যের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়তো হইয়াছিল। তবু মোটামুটি বলা যায়, উচ্চস্তরের প্রতিমাশিল্প শাস্ত্রবন্ধন হইতে কখনও একেবারে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ১৫৭৭ শকে উৎকীর্ণ একটি পার্বতী-মূর্তি (রাজসাহী-চিত্রশালা) এবং বরিশালে প্রাপ্ত আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের চতুর্ভুজা একটি জগদ্ধাত্রী-প্রতিমায় (আশুতোষ-চিত্রশালা) সমসাময়িক শিল্পের নির্জীব, আনুষ্ঠানিক, প্রতিমালক্ষণ-শাস্ত্রশাসিত শিল্পাদর্শের লক্ষণ সুস্পষ্ট।

এই সুদীর্ঘ চারিশত বৎসরের শিল্পরূপের প্রবাহ গভীর বিরোধী ভাবতরঙ্গে আবর্তিত। এই প্রবাহের গতি কখনও সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়স্পর্শালু মাংসলতার দিকে, কখনও পরোক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক ইন্দ্রিয়ব্যঞ্জনার দিকে; কিন্তু দুইটি গতিই একই শাস্ত্রশাসনদ্বারা নিয়মিত। একটি অপরূপ মানসদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া এই শিল্পকলার বিকাশ; এই মানসদ্বন্দ্বজনিত বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্যই এই চারিশত বৎসরের শিল্পকলার প্রধান লক্ষণ। একদিকে ইহগত, দৈহিক, ইন্দ্রিয়গত কামনা-বাসনার সত্য, অন্যদিকে নৈর্ব্যক্তিক কামনা-বাসনার উপলব্ধির সত্য। একদিকে তান্ত্রিক সাধনার দেহবাদ, যে-সাধনা এই রক্তমাংসের দেহকেই পরমার্থিক ঐশ্বর্যের আকর বলিয়া ধ্যান করে, অন্য দিকে আত্মাধর্মী ব্রাহ্মণ্য সাধনা, যে-সাধনা মানুষের রক্তমাংসে গড়া দেহের অন্তর্নিহিত অপরূপ দেবত্বকে রূপমণ্ডিত করিবার স্পর্ধা রাখে—এই দুই বিরোধী ভাবাদর্শের সংঘাতাবর্তে এই চারি শতকের শিল্পপ্রবাহ আন্দোলিত। এই দুই ভাবাদর্শের সংঘাতের ভিতর দিয়া এই চারি-শতকের প্রতিমা-কলা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে। প্রথম পর্বে দেহের সহজ সরস কমনীয়তা এবং ভঙ্গী, বিরল সাজসজ্জা, অলংকার ও আড়ম্বর; কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক কমনীয়তা ও ভঙ্গী অস্থির ও চঞ্চল হইতে আরম্ভ করে, সাজসজ্জা ও অলংকরণ ক্রমশ বাহুল্যমণ্ডিত হইতে থাকে। সরল ও প্রশান্ত দেহভঙ্গী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ চঞ্চল ও লাস্যময় দেহভঙ্গীতে রূপান্তর দৃঢ় সরল রেখায় অগ্রসরমান। পরিণামে মাত্রাহীন আতিশয্য সমস্ত শিল্পাদর্শকে অবশ, নির্জীব মদিরতায়, পল্লবিত অলংকারাড়ম্বরে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সমসাময়িক সাহিত্যে কামনা-বাসনার আতিশয্য, উচ্ছ্বসিত পল্লবিত বাক্য ও ব্যঞ্জনাবিহীন লাস্যভঙ্গী সমসাময়িক শিল্পেরই প্রতিরূপ এবং দুইই ধ্বংসোন্মুখ ক্ষীয়মাণ সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ঘোষণা। এই ক্ষীয়মাণ সংস্কৃতির উপর যবনিকা টানিয়া দিল ইস্‌লামাভিযান। কিন্তু যবনিকা পতনের পূর্ব মুহূর্তে যে-প্রাণ এই শিল্পদেহে স্পন্দিত হইতেছিল সে-প্রাণ দুর্বল, তাহার শক্তি আর কিছু ছিল না!

৪

প্রাচীন বাংলার কোনো স্থানেই এ-যাবৎ প্রাক্‌পালযুগের চিত্রকলার কোনো নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ফা-হিয়েনের বিবরণীতে একটি ইঙ্গিত আছে যাহাতে মনে হয় খ্রীষ্টোত্তর চতুর্থ শতকে তাম্রলিপ্তিতে (এবং বোধ হয় বাংলার অন্যত্রও) চিত্রশিল্প-রচনার অভ্যাস পরিচিত ও প্রচলিত ছিল। তাহা ছাড়া, সমসাময়িক ভারতবর্ষে অন্যত্র যেমন, বাংলাদেশেও বোধ হয় তেমনই লোকায়ত সংস্কৃতিতে পটচিত্র, ধূলিচিত্র প্রভৃতি অজ্ঞাত ছিল না। তাহারই ধারা প্রবাহমান দেখিতে পাওয়া যায় অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশের জড়ানো পটের ছবিতে, আলপনায়, ফরিদপুর-যশোহর-বীরভূম-মেদিনীপুর-কালিঘাটের বিচ্ছিন্ন পটের নানা চিত্রে। যাহাই হউক, প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র ও সাহিত্য-গ্রন্থাদিতে হইতে জানা যায়, বিহার-মন্দিরের প্রাচীনগাত্র চিত্রশোভিত করার শাস্ত্রীয় নির্দেশ একটা ছিল; কাজেই অনুমান করা কঠিন নয় যে, ভারতের অন্যান্য প্রান্তের মত প্রাচীন বাংলার অনেক বিহার-মন্দিরের প্রাচীরগাত্রই চিত্রদ্বারা শোভিত ছিল। কিন্তু বিহার-মন্দিরই যেখানে ধ্বংসের হাত এড়াইতে পারে নাই সেখানে প্রাচীর-চিত্রের নিদর্শন আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিবার কথা নয়। প্রাচীন পটচিত্র বা ধূলিচিত্রের কোনো নিদর্শনও এ-যাবৎ আমরা জানিনা।

চিত্রকলা
আনুমানিক
১০০০—১২০০
খ্রীষ্ট শতক

বাংলার চিত্রকলার প্রাচীনতম যে-সব নিদর্শন এ-পর্যন্ত জানা গিয়াছে তাহা প্রায় সমস্তই একাদশ ও দ্বাদশ শতকের, এবং প্রত্যেকটিই পাণ্ডুলিপি-চিত্র, অর্থাৎ তালপাতায় বা কাগজে হাতের লেখা পুঁথি অলংকরণোদ্দেশ্যে আঁকা ছবি। স্বভাবতই ছবিগুলি স্বল্পায়তন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বল্পায়তন পাণ্ডুলিপি-চিত্রের যাহা বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সূক্ষ্ম রেখার ধীর অথচ তীক্ষ্ণগতি, সূক্ষ্ম ও ঘন কারুকার্য, বিন্যাসের ঘনত্ব ও গভীর ভাবনা-কল্পনার অনুপস্থিতি প্রভৃতি এই পাণ্ডুলিপি চিত্রগুলিতে নাই। সেই জন্যই ইংরাজিতে miniature বলিতে যাহা আমরা বুঝি, এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলি সেই বস্তু নয়। আয়তন ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলির ভাবনা-কল্পনার আকাশ বিস্তৃত ও গভীর, পরিকল্পনা বৃহৎ, রেখার ডৌল ও বিস্তার দীর্ঘায়ত, রঙের বিন্যাস ও সগুণ প্রশস্তান্বিত। এই দীর্ঘ, প্রশস্ত ও বৃহৎ বিস্তার একান্তই বৃহদায়তন প্রাচীর-চিত্রের। বস্তুত, প্রাচীর-চিত্রের লক্ষণই এই পাণ্ডুলিপি চিত্রগুলির লক্ষণ, প্রাচীর-চিত্রই যেন পাণ্ডুলিপি-পত্রের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে স্বল্পায়তনে অঙ্কিত। সমসাময়িক বাংলার, এক কথায় পূর্ব-ভারতের পাণ্ডুলিপি-চিত্রের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ইহারা আকারে ক্ষুদ্র, চরিত্রে বৃহদায়তন; ক্ষুদ্র চিত্রের বৈশিষ্ট্য ইহাদের মধ্যে অনুপস্থিত।

এ-পর্যন্ত চিত্র-সম্বলিত পাণ্ডুলিপি প্রায় কুড়ি-বাইশখানা পাওয়া গিয়াছে; ইহাদের মধ্যে মাত্র একখানা কাগজের পাতায় লেখা (আশুতোষ-চিত্রশালা), এবং ছবিও কাগজের পাতায় আঁকা—লেখার মাঝখানে সমান্তরালে; অন্য সব ক'টিই তালপাতার পুঁথি। কাগজের পাতার পুঁথিটি বাংলাদেশে কাগজ ব্যবহারের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। এই পাণ্ডুলিপি গুলির অধিকাংশই পাওয়া গিয়াছে নেপালে, কয়েকটি বাংলাদেশে, এবং কয়েকটি বাংলার বাহিরে অন্যত্র, (যেমন, কুলু উপত্যকা-প্রবাসী স্বেতোস্লাভ রোয়েরিক্ মহাশয়ের সংগ্রহের একটি সুবৃহৎ পাণ্ডুলিপি); তবে ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটিই যে দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে পূর্ব-ভারতে, বিশেষ ভাবে বাংলাদেশে লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল, চিত্রশৈলী এবং তারিখ-সম্বলিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপিই তাহার প্রমাণ। এ-পর্যন্ত যে ক'টি চিত্র-সম্বলিত পাণ্ডুলিপির খবর আমরা জানি সে-গুলি এখানে তালিকাগত করা যাইতে পারে।

১-২। পালরাজ মহীপালদেবের রাজত্বের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরে অনুলিখিত ও চিত্রিত অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার দুইটি পাণ্ডুলিপি (কেমব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ১৪৬৪ নং এবং কলিকাতা-রয়্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটির ৪৭১৩ নং পাণ্ডুলিপি)।

চিত্র-সম্বলিত পাণ্ডুলিপির তালিকা

৩। পালরাজ রামপালের শাসনকালের ৩৯তম বৎসরে অনুলিখিত ও চিত্রিত 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতার একটি পাণ্ডুলিপি (এক সময়ে এই পুঁথিটি ব্রেণ্ডেনবুর্গ সাহেবের সংগ্রহে ছিল)।

৪-৫। দুইটি অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতার পাণ্ডুলিপি (রাজসাহী-বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সংগ্রহ); ইহার একটি পাণ্ডুলিপি লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল বর্মণরাজ হরিবর্মার রাজত্বের ১৯তম বৎসরে। অন্যটিতে কোনো তারিখ নাই, তবে চিত্রশৈলী-সাক্ষ্যে মনে হয় দ্বাদশ শতকের কোনো সময়ে এই পাণ্ডুলিপিটি লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল।

৬। কলিকাতা রয়্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটি-গ্রন্থাগারের একটি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পাণ্ডুলিপি (এ-১৫নং); খ্রীষ্টোত্তর ১০৭১ অব্দে লিখিত ও চিত্রিত।

৭-৮। রাজসাহী-বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির গ্রন্থাগারে রক্ষিত কারণ্ডব্যূহ এবং বোধিচর্যাবতারের দুইটি পাণ্ডুলিপি। একটিতেও তারিখ নাই, তবে শৈলী-সাক্ষ্যে মনে হয় দ্বাদশ শতক।

৯। বোষ্টন-চিত্রশালার ২০৫৮৯ নং পাণ্ডুলিপি; পালরাজ (তৃতীয় ?) গোপালদেবের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে লিখিত ও চিত্রিত।

১০। জাপানের সোয়ামুরা পাণ্ডুলিপি। তারিখ নাই, তবে পাল-শিল্পের এবং সমসাময়িক নাগরী অক্ষরের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

১১। লণ্ডন-ব্রিটীশ-ম্যুজিয়ুমের একটি অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতার পাণ্ডুলিপি, পালরাজ (তৃতীয় ?) গোপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত ও চিত্রিত (OR. 6902)।

১২-১৩। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগারে রক্ষিত পঞ্চরক্ষার একটি পাণ্ডুলিপি; এই পাণ্ডুলিপিটি পাল-রাজ নয়পালের চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত ও চিত্রিত। আরও একটি অজ্ঞাতনামা-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি (Add. No. 1643); লিখন ও চিত্রণের তারিখ ১০১৫ খ্রী।

১৪। কলিকাতা রয়্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটি-গ্রন্থাগারে রক্ষিত অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার একটি পাণ্ডুলিপি (৪২০৩ নং); লিখন ও চিত্রণের তারিখ নেপালী সম্বৎ ২৬৮—১১৪৮ খ্রী।

১৫। কলিকাতা রয়্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটি-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ৯৭৮৯ নং পাণ্ডুলিপি; পাল-রাজ গোবিন্দপালের অষ্টাদশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত ও চিত্রিত।

১৬। কলিকাতা অজিত ঘোষ-সংগ্রহের একটি পাণ্ডুলিপি; নাম ও তারিখ অজ্ঞাত; চিত্রশৈলীতে পাল-আমলের পূর্ব-ভারতীয় স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

১৭। কুলু-উপত্যকা-প্রবাসী স্বেতোস্লাভ রোয়েরিক মহাশয়ের সংগ্রহে একশত ছাব্বিশটি চিত্রসহ গণ্ডব্যূহের একটি সুদীর্ঘ পাণ্ডুলিপি। তারিখ অজ্ঞাত; কিন্তু চিত্রশৈলীতে পাল-আমলের পূর্ব-ভারতীয় স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

১৮। কলিকাতা রয়্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত শিবপূজা ও শৈবধর্ম সম্বন্ধীয় একাধিক শৈবগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি; এই পাণ্ডুলিপির কাঠের পাটার ভিতরের দিকে আঁকা দশ-বারোটি ছবি। তারিখ অজ্ঞাত, তবে শৈলীসাক্ষ্যে পাল-পর্বের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

১৯। অক্‌স্‌ফোর্ড বড্‌লেয়ান্‌-গ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি।

এই পাণ্ডুলিপিগুলি ছাড়া আরও দুই চারিখানা চিত্রিত পাণ্ডুলিপি ইতস্তত জ্ঞাত থাকা বিচিত্র নয়। তাহা ছাড়া, মাঝে মাঝে নূতন নূতন চিত্রিত পাণ্ডুলিপির খবরও পাওয়া যায়।

এ-তথ্য পরিষ্কার যে, একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি ছাড়া উপরোক্ত প্রত্যেকটি পাণ্ডুলিপিই বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় এবং প্রায় সকল চিত্রই মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান ধর্মমতসম্মত দেবদেবীর প্রতিকৃতি। একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি শৈবধর্ম সম্পর্কিত এবং উহার চিত্রগুলি লিঙ্গ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রতিরূপ। এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলি ছাড়া তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ স্বল্পায়তন তিনটি রেখাচিত্রের খবরও আমরা জানি; এই রেখাচিত্র তিনটিও একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় চিত্রশিল্পের নিদর্শন হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাদের বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী।

বলিয়াছি, প্রায় সকল চিত্রই মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান ধর্মমতসম্মত দেবদেবীর প্রতিকৃতি। কায়াসাধনের নির্দিষ্ট ধ্যানানুযায়ী বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দেবদেবী, যথা, লোকনাথ, তারা, মহাকাল, অমিতাভ, অবলোকিত, মৈত্রেয়, বজ্রপাণি, আকাশগর্ভ প্রভৃতি ও তাঁহাদের সহচর-সহচরীদের প্রতিমাই পাণ্ডুলিপি-পত্রের সীমার মধ্যে রঙে ও রেখায় রূপায়িত। এই চিত্রগুলির সাহায্যে বজ্রযান-তন্ত্রযান সাধনে বর্ণিত দেবদেবীদের অনেকের পরিচয়

কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য

সহজতর হয়; বিশেষত ইহাদের মধ্যে অনেকে আছেন সমসাময়িক ভাস্কর্যে যাঁহাদের পরিচয় পাওয়া যায় না। কয়েকটি ছবিতে দেখিতেছি, জাতকের কাহিনী বা বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনীও চিত্ররূপ লাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক অভিজাত নায়ক, ধর্মযাজক এবং বিত্তশালী শ্রেণীর লোকদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই এই সব পাণ্ডুলিপি অনুলিখিত ও চিত্রগুলি রূপায়িত হইত। সুতরাং সমসাময়িক ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলার যাহা সামাজিক প্রেরণা ও পরিবেশ, চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তাহাই।

বর্তমানে বাংলা ভাষাভাষী লোকদের যে ভৌগোলিক সীমা, সব পাণ্ডুলিপিই যে সেই সীমার মধ্যেই লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল, এ-কথা জোর করিয়া বলা যায় না। কয়েকটি পাণ্ডুলিপি বিহারে এবং কয়েকটি আবিষ্কৃত হইয়াছে নেপালে; হয়তো লেখা ও আঁকার কাজটাও সেখানেই হইয়া থাকিবে; কিন্তু শৈলী-প্রমাণের দিক হইতে স্বীকার করিতেই হয়, ভৌগোলিক সীমাগত এই পার্থক্য চিত্রশৈলীতে কোনো পার্থক্য রচনা করে নাই। বস্তুত, বাংলা-বিহার-নেপালের সমসাময়িক চিত্রশিল্প একই শিল্পধারার সৃষ্টি বলিলে অনৈতিহাসিক কিছু বলা হয় না। কয়েকটি পাণ্ডুলিপি তো নিঃসংশয়ে বাংলাদেশেই লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল, (যেমন, হরিবর্মার উনবিংশ রাজ্যাঙ্কের পাণ্ডুলিপিটি); ইহাদের চিত্রগুলির সঙ্গে বিহার বা নেপাল বা অন্যত্র আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি-চিত্রের মূলগত পার্থক্য কোথাও কিছু নাই। এই চিত্রশিল্প একান্তই প্রাচ্য-ভারতীয় চিত্রশিল্পধারার সৃষ্টি এবং সে-ধারার কেন্দ্র ছিল পাল-ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বাংলা দেশ, এবং কিয়দংশে বিহার।

বলিয়াছি, এই চিত্রগুলিতে পাণ্ডুলিপি-চিত্রণের বিশেষ স্বতন্ত্র কোনো ভঙ্গীর পরিচয় নাই। চীন, ঈরাণ, মধ্যযুগীয় য়ুরোপ বা মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে স্বল্পায়তন পুঁথিচিত্রের যে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়, তাহার সঙ্গে এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলির কোথাও কোনো মিল্ নাই। বস্তুত, এই চিত্রগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি প্রাচীর-চিত্র; প্রাচীর-চিত্রকেই যেন ধরা হইয়াছে পুঁথিচিত্রের সীমার মধ্যে। আর একটি তথ্যও একটু লক্ষ্যণীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর সঙ্গে চিত্রগুলির বিষয়বস্তুর বিশেষ কোনো যোগ নাই; চিত্রগুলি সাধারণত কোনো না কোনো মন্দিরের অথবা দেবদেবীর অথবা উভয়েরই প্রতিরূপ মাত্র। ইহাদের উদ্দেশ্য পুঁথির শোভাবর্ধন করা, বিষয়বস্তুকে উজ্জ্বল করা নয়।

ছবিগুলিতে যে-সব রং ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার মধ্যে হরিতালের হলুদ, খড়িমাটির সাদা, গাঢ় নীল (অজন্তার পাথরে নীল নয়), প্রদীপের শীষের কালো, সিঁদুর লাল এবং সবুজ। এই সবুজ অজন্তা-চিত্রে ব্যবহৃত ঘন উজ্জ্বল সবুজ নয়; বোধ হয় হলুদ এবং নীলে মিশ্রিত সবুজ। প্রয়োজনানুযায়ী একই রঙের গাঢ়তার তারতম্য আছে, ভিন্ন রঙের ব্যবহারও আছে; সর্বোচ্চ স্তরে সাদা, সর্বনিম্নে কালো। কিন্তু যত বৈচিত্র্যই থাকুক, দেবদেবীর রং সর্বত্রই সাধনসূত্রানুযায়ী নিয়মিত ও নির্ধারিত। সাধারণ ভাবে রঙের বিন্যাস অজন্তা-চিত্রের রীতি ও আদর্শানুযায়ী। অজন্তার মত এ-ক্ষেত্রেও রঙের ব্যবহারে আলোর

আশ্রয় লওয়া হইয়াছে ; বস্তুত, মণ্ডলায়িত ডৌল এই চিত্রগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে, অজন্তার রঙের পরিমিত সঙ্গতির কোনো পরিচয় এই চিত্রগুলিতে নাই। বহিরেখা সর্বদাই কালো অথবা লাল রঙে টানা, এবং ভারতীয় চিত্রের সাধারণ রীতি অনুযায়ী সর্বত্রই বহিরেখাটি টানা হইয়াছে আগে সরু তুলিতে, এবং পরে দেওয়া হইয়াছে ভিতরকার রঙের প্রলেপ স্থূলতর তুলির সাহায্যে।

চিত্র-বিন্যাসের রীতি অনেকটা ভাস্কর্য-বিন্যাসের রীতিই অনুসরণ করিয়াছে। মূল প্রতিমাটি পার্শ্বপ্রতিমাগুলির চেয়ে আকারে বড় এবং সাধারণত অলংকৃত পটভূমি বা দীর্ঘায়ত বা অর্ধগোলাকৃতি প্রভামণ্ডলের পটে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট, অথবা মন্দিরের অলিন্দে স্থাপিত। মূল প্রতিমার দেহকাণ্ডের দুই পাশে এক বা দুই সারিতে, সরল রেখায় বা চক্রাকারে মণ্ডলের অন্যান্য দেবদেবীরা বিন্যস্ত। যে-সব ক্ষেত্রে মূল প্রতিমা কাঠামোর এক পার্শ্বে সে-সব ক্ষেত্রে পার্শ্ব-দেবতারা সারি সারিতে বা অর্ধচক্রাকারে অন্য পার্শ্বে বিন্যস্ত। শূন্যস্থান বড় একটা নাই ; যে-সব স্থানে আছে সেখানে বিচরমান বা উড্ডীয়মান সহচর-সহচরী, লতাপাতা, অলংকার প্রভৃতির সাহায্যে বৈচিত্র্য রূপায়িত।

তারিখ-সম্বলিত পাণ্ডুলিপিগুলির সাহায্যে এই চিত্রগুলির একটা ধারাবাহিক বিচার চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে চিত্রশৈলীর বিবর্তনের কোনো ইতিহাস উদ্ধার করা কঠিন। মোটামুটি ভাবে একাদশ ও দ্বাদশ শতকের এই সৃষ্টি-প্রচেষ্টার মধ্যে শিল্পের যে-রূপ প্রত্যক্ষ তাহা অবিচল ও নির্দিষ্ট ; বিবর্তমান কোনো প্রবাহ ইহাদের মধ্যে ধরা প্রায় যায় না বলিলেই চলে। ছবিগুলি দেখিলে এবং একটু বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, এই চিত্ররীতি ও শৈলী একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের বিবর্তিত রূপ, এবং বহুদিন সুঅভ্যস্ত। এই সুবিস্তৃত দেশের অন্যত্র নানাস্থানে যে শিল্পরূপ ও রীতি প্রাচীর-গাত্রে অথবা পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় বহুদিন সুঅভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, যে রূপ ও রীতি বাঘ-অজন্তা-এলোরার গুহাগাত্রে স্বাক্ষর রচনা করিয়াছে তাহাই প্রাচীন বাংলার এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলিতেও ধরা পড়িয়াছে। ইহারা চলমান ভারতীয় চিত্রশিল্প-প্রবাহেরই একটি অচ্ছেদ্য ধারা এবং সেই ধারারই অন্যতম নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশ। তবে, এ-কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার্য যে, একাদশ-দ্বাদশ শতকে পৌঁছিয়া সে-ধারা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, নূতন স্রোত সঞ্চার আর কিছু দেখা যাইতেছে না, নূতনতর সৃষ্টির সম্ভাবনা কমিয়া আসিয়াছে ; ঐতিহ্যের বাহক হিসাবেই যেন ইহাদের মূল্য !

মহীপালের রাজ্যাঙ্কের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরে লিখিত ও চিত্রিত পাণ্ডুলিপি দুইটির ছবিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে। ষষ্ঠ বৎসরে চিত্রিত ছবিগুলিতে (কলিকাতা রয়্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটি, ৪৭১৩ নং পাণ্ডুলিপি) শিল্পীর দৃষ্টি রঙের ঘন মণ্ডলায়িত ডৌলের প্রতি যতটা সজাগ ঠিক ততটাই সজাগ তরঙ্গায়িত ও প্রবাহমান রেখার ডৌলের দিকে। বহিরেখার সম্পূর্ণ ডৌলের প্রতি সঙ্গতি রাখিয়া অন্যান্য রেখাগুলিকে সূক্ষ্ম বা গভীর করা হইয়াছে। দেহ এবং মুখাবয়বে

চিত্রশৈলী

এখানে প্রয়োজনমত সাদা রঙের সাহায্যে উচ্চতম স্তর দেখান হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে কোথাও কোনো স্বচ্ছ সূক্ষ্ম মণ্ডণ বা ভাব-ব্যঞ্জনার কোনো পরিচয় নাই; মুখ ও দেহভঙ্গী লাবণ্যবিহীন, কঠিন; সমস্ত রূপায়নই একান্ত ভাবে রেখানির্ভর। এই রাজারই পঞ্চম বৎসরে চিত্রিত কেম্‌ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছবিগুলিতে রঙের ঘন মণ্ডণায়িত ডৌলের কোনো চেষ্টা প্রায় নাই বলিলেই চলে, থাকিলেও খুব ক্ষীণ; তুলি টানা হইয়াছে কঠিন সমতলে, উচ্চাবচ বা নতোন্নত ইঙ্গিত রচনার কোনো চেষ্টাই প্রায় করা হয় নাই। প্রতিমার প্রকৃত ভঙ্গী এবং অবস্থান যাহাই হউক না কেন, দেহাবয়ব ও মুখমণ্ডল সর্বদাই কঠিন; শুধু রেখা-প্রবাহের সাহায্যে কিছুটা নমনীয়তার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কিন্তু এই প্রথাবদ্ধ, সমতল এবং তরল রঙের প্রলেপ মণ্ডণায়িত ডৌলসমৃদ্ধ রেখার বিন্যাসকে বিশেষ স্পর্শ করে নাই। বস্তুত, এই পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলির তরল ও সমতল পটভূমিতে মণ্ডণায়িত রেখাপ্রবাহ সত্যই আকর্ষণীয়।

সদ্যোক্ত কেম্‌ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপিচিত্রগুলি সম্বন্ধে যে-কথা বলা হইল, সে-কথা বোষ্টন-চিত্রশালার পাণ্ডুলিপি-চিত্র, সোয়ামুরা পাণ্ডুলিপি-চিত্র, ব্রেণ্ডেনবুর্গ পাণ্ডুলিপি-চিত্র, অজিত ঘোষ-সংগ্রহের পাণ্ডুলিপি-চিত্র এবং রাজসাহী-চিত্রশালার পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলি সম্বন্ধেও বলা চলে, অবশ্য খুবই সাধারণ ভাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ব্রেণ্ডেনবুর্গ-পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ চিত্রে রঙের মণ্ডণ অত্যন্ত ক্ষীণ, প্রলেপ অত্যন্ত তরল। কিন্তু রেখাগুলি পূর্ণ মণ্ডণায়িত, এবং অপরূপ মাধুর্য ও সংবেদনশীলতায় জীবন্ত; বিন্যাসও নিখুঁত। অথচ, এই পাণ্ডুলিপিতেই এমন কতকগুলি ছবি আছে যেখানে রঙের মণ্ডণায়িত ডৌল প্রত্যক্ষ, এবং সঙ্গে সঙ্গে রেখারও ডৌল। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, একই পাণ্ডুলিপির চিত্রমালায় রঙের মণ্ডণায়িত ডৌল এবং ডৌলবিহীন তরল সমতল রঙের প্রলেপ একই সঙ্গে পাশাপাশি বিদ্যমান; উভয় ক্ষেত্রেই তরঙ্গায়িত ও প্রবহমান রেখার সমৃদ্ধ ডৌল উপস্থিত। এই বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট এবং আরো সমৃদ্ধ অভিজ্ঞান দেখা যায় স্বেতোম্লাভ্ রোয়েরিক-সংগ্রহের গণ্ডব্যূহ-পাণ্ডুলিপির অনেকগুলি চিত্রে।

কলিকাতা এসিয়াটিক-সোসাইটির এ-১৫নং পাণ্ডুলিপির চিত্রাবলী তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ এবং উচ্চাঙ্গের। রঙের মণ্ডণায়িত রূপায়ন-রীতি এ-ক্ষেত্রেও উপস্থিত, তবে ক্ষীণ এবং বৈচিত্র্যবিহীন, কিন্তু যতখানি আছে ততখানি সুবিন্যস্ত এবং মনোরম। রেখার মণ্ডণায়িত গতির প্রবহমানতা পরিপূর্ণ অব্যাহত। ভাব-ব্যঞ্জনায় এবং ভঙ্গীর লালিত্যেও এই চিত্রগুলি সমৃদ্ধ।

বস্তুত, প্রবহমান রেখার এই মণ্ডণায়িত গতিই এই ছবিগুলির মেরুদণ্ড। কিন্তু কোনো কোনো পাণ্ডুলিপি-চিত্রে এই রেখাই হইয়া পড়িয়াছে দুর্বল, অনিশ্চিত এবং ভঙ্গুর, যেমন, কেম্‌ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬৪৩ নং পাণ্ডুলিপিতে, কলিকাতা-এসিয়াটিক-সোসাইটির ৪২০৩ নং পাণ্ডুলিপিতে। পূর্ব-ভারতীয় শিল্পাদর্শের এবং রীতির স্বাক্ষর উভয় নিদর্শনেই

উপস্থিত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও রঙের মণ্ডনান্বিত ডৌল এবং রেখার সমৃদ্ধ মণ্ডনান্বিত গতি দুইই স্তিমিত ও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; রেখা তো ভঙ্গুর এবং নির্জীব বলিলেই চলে। প্রতিমার ভঙ্গী কঠিন, বিন্যাস স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন; বস্তুত, একই চিত্রে একটি প্রতিমা আর একটি প্রতিমার সঙ্গে কোনো আত্মিক যোগসূত্রে যেন আবদ্ধ নয়।

ক্লাসিক রীতি ও আদর্শ

কলিকাতা রয়্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটির ৯৭৮৯-এ নং পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলি কালক্রমের দিক্ হইতে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন। শিল্পশৈলীর দিক্ হইতে এই চিত্রগুলিকে বাংলার সমসাময়িক প্রস্তর-প্রতিমাশিল্পের চিত্রিত প্রতিলিপি বলা যাইতে পারে। রেখা ও রঙের মণ্ডনান্বিত ডৌলই এই চিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য, এবং সেই হিসাবে পূর্বতন ব্রেগুেনবুর্গ ও এসিয়াটিক-সোসাইটির এ-১৫নং পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলির সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ।

এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, প্রাচ্য-ভারতীয় এই চিত্রকলা বহিরঙ্গ এবং অন্তর্নিহিত সত্তার দিক্ হইতে সমসাময়িক প্রতিমা-শিল্পের চিত্রিত প্রতিলিপি মাত্র। প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ-প্রতিমায় যেমন, এই যুগের আলোচ্য চিত্রগুলিতেও তেমনই নির্দিষ্ট বঙ্কিম রেখার নিয়ন্ত্রণে মূর্তি মণ্ডনান্বিত; রেখার প্রবহমান তরঙ্গ দেহ-কাঠামো, নাভিবৃত্ত এবং করাঙ্গুলিতে সুস্পষ্ট। পাথরে এবং ধাতুতে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করা হইয়াছে সুদৃঢ় বস্তু-পদার্থের নমনীয় রূপান্তরের সাহায্যে, চিত্রে তাহাই সম্ভব হইয়াছে রঙের মণ্ডনের সাহায্যে। চিত্রের প্রতিমাগুলির মুখাবয়ব ও ভঙ্গী, দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থান ও ভঙ্গী প্রভৃতি একটু যত্নের সঙ্গে বিশ্লেষণ করিলে সহজেই সমসাময়িক প্রস্তর-প্রতিমাশিল্পের সহিত এই চিত্রশিল্পের পারিবারিক সাদৃশ্য ধরা পড়িয়া যায়।

মূলগত আদর্শের দিক হইতে এই চিত্রশিল্প বাঘ-অজন্তা-এলোরা গুহার প্রাচীর-চিত্রৈতিহ্যের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ, এবং এই ঐতিহ্যের আশ্রয়েই রচিত। এই শিল্পাদর্শের দুইটি দিক্; একটি ক্ল্যাসিক্যাল, অপরটি মধ্যযুগীয়। এই নামকরণ দু'টির অর্থ আজ পরিষ্কার এবং সর্বজনগ্রাহ্য। ক্ল্যাসিক আদর্শের প্রধান বৈশিষ্ট্য রং ও রেখার পরিপূর্ণ মণ্ডনান্বিত ডৌলে সমৃদ্ধ রূপায়ন; মধ্যযুগীয় আদর্শের প্রধান নির্ভর তীক্ষ্ণ, ডৌলবিহীন রেখা, এবং তরল সমতল রঙের প্রলেপ। এলোরায় এই দুই আদর্শই পাশাপাশি সক্রিয়; একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় প্রাচ্য-ভারতীয় চিত্রশিল্পেও তাহাই। তাহার ফলে আদর্শ ও রীতির একটা সংমিশ্রণও ঘটিয়াছে। এই সংমিশ্রণের ফলে ক্লাসিক আদর্শের দৈহিক কাঠামোর গভীর, সমাহিত ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ রেখার বিবর্তন ঘটে, এবং অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গান্বিত প্রবাহে বহুরেখার সামঞ্জস্যে যে-সব ভঙ্গী মূর্ত হইত সে-সব ভঙ্গী দৃঢ়, তীক্ষ্ণ ও কঠিন ভঙ্গীতে রূপান্তর লাভ করে।

এলোরার চিত্রে এবং সমসাময়িক রাজপুতানার ভাস্কর্যে রেখানির্ভর পরিকল্পনার প্রথম সূত্রপাত, এবং এই সংমিশ্রণের প্রকাশ দেখা গেল অষ্টম শতকে। কিন্তু মধ্যযুগীয় আদর্শের

সর্বাপেক্ষা ব্যাপক প্রকাশ ধরা পড়ে পশ্চিম-ভারতে, বিশেষ ভাবে গুজরাট-অঞ্চলে, দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতক হইতেই। কিন্তু মধ্যযুগীয় শিল্পাদর্শের এই গতি একান্ত ভাবে পশ্চিম-ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশে সুন্দরবনে ও চট্টগ্রামে দুই তিনটি তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ রেখাচিত্র পাওয়া গিয়াছে। এই চিত্রগুলি একান্তই তীক্ষ্ণ, ডৌলবিহীন রেখানির্ভর এবং রেখার সঙ্গে রেখার যোজনা তীক্ষ্ণ কৌনিক। ইহাদের রেখার চরিত্র এবং বিন্যাসের সঙ্গে এলোরার কোনো কোনো চিত্রের এবং গুজরাটী জৈন পুঁথিচিত্রের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ। একাদশ-দ্বাদশ শতকের ভাস্কর্যেও কোথাও কোথাও এই ধরনের রেখা ও রেখার বিন্যাস দৃষ্টিগোচর, যেমন ওড়িষ্যায় ও মধ্যভারতে, রাজপুতানা ও গুজরাটে। এই নূতনতর শিল্পরীতি ও আদর্শের প্রাচীনতর ইতিহাস যাহাই হউক, এবং যেখানেই ইহার প্রাথমিক উদ্ভব দেখা দিক না কেন, একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকেই ইহা একটি সর্বভারতীয় রীতি ও আদর্শ বলিয়া স্বীকৃত ও অভ্যস্ত হইয়াছিল। অবশ্য সমসাময়িক বাংলার প্রস্তর ও ধাতব ভাস্কর-শিল্পে এই নূতন রীতি ও আদর্শের স্পর্শ কিছু লাগে নাই, কিন্তু সমসাময়িক চিত্রকলার পক্ষে ইহার প্রভাব কাটাইয়া চলা সম্ভব হয় নাই, এবং এই প্রভাব যে শুধু সদ্যোক্ত তাম্রপট্টের রেখাচিত্রগুলিতেই তাহা নয়, পূর্বালোচিত কোনো কোনো পুঁথিচিত্রেও সুস্পষ্ট, বিশেষ ভাবে যে পাণ্ডুলিপিগুলির চিত্রণ ও রচনা নেপালে। পূর্ব-ভারত হইতে এই প্রভাব নেপালে এবং ব্রহ্মদেশেও বিস্তার লাভ করে।

মধ্যযুগীয় রীতি ও আদর্শ

এই মধ্যযুগচিহ্নিত রেখানির্ভর চিত্র-পরিকল্পনা যে-তিনটী তাম্রপট্টোৎকীর্ণ রেখাচিত্রে পূর্ণ পরিণতরূপে দৃষ্টিগোচর, তাহার একটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন আচার্য কুমারস্বামী তাঁহার Portfolio of Indian Art-গ্রন্থে; ইহার প্রতিচিত্রও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার তারিখ আনুমানিক একাদশ শতক। দ্বিতীয়টি রাজা ডোম্মনপালের সুন্দরবন-পট্টোলীর পশ্চাদপটে উৎকীর্ণ; তৃতীয়টি চট্টগ্রাম-জেলার মেহার-গ্রামে প্রাপ্ত দেববংশীয় জনৈক রাজার পট্টোলীর উপরিভাগে উৎকীর্ণ। এই দুইটিরই তারিখ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক এবং দুইটিই অধুনা আশুতোষ-চিত্রশালায় রক্ষিত। উভয় চিত্রেই তীক্ষ্ণ রেখার দ্রুত রূপায়ন, এবং সে-রূপায়নে সজীব প্রবহমানতা অব্যাহত; অবিচ্ছিন্ন গতিও অক্ষুণ্ণ। তবে, বেশ বুঝা যায়, যেখানেই সামান্য সুযোগও পাইয়াছেন শিল্পী সেইখানেই চঞ্চল বঙ্কিম রেখাপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, অকিঞ্চিৎকর বিষয়বস্তুতেও এমন একটা অহেতুক প্রাণময়তা ও রেখাপ্রাচুর্য পরিস্ফুট বিষয়বস্তুর সঙ্গে যাহার কোনো সঙ্গতি দেখা যায় না। বস্তুত, এই রেখা-পরিকল্পনা কোনো গভীর উপলব্ধি বা প্রেরণা হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয় না। সম্ভবত, এই অস্বাভাবিক ও সঙ্গতিবিহীন প্রাচুর্য ও প্রাণময়তার ফলেই পার্শ্ব হইতে খচিত অর্ধাকৃতি অথবা ত্রি-চতুর্থাংশ চিত্রিত মুখমণ্ডলের রেখা চঞ্চুবৎ সুতীক্ষ্ণ নাসিকায় অথবা কৌনিক চিবুকে, তীক্ষ্ণ ধনুকাকৃতি ভ্রূ অথবা দীর্ঘায়ত বঙ্কিম ঊর্ধ্বোষ্ঠে

পরিণতি লাভ করিয়াছে। মনে হয়, শিল্পী যেন তীক্ষ্ণ দ্রুত রেখার বিলাসে প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, কারণ রঙের মণ্ডণায়িত রূপায়ন যেখানে নাই সেখানে শিল্পীর হাতে রেখাই বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন। চঞ্চল ও দীর্ঘায়ত বঙ্কিম রেখা-সৃষ্টির প্রচেষ্টার মধ্যে এই কামনা প্রত্যক্ষ। এমন কি প্রতিমার সম্মুখভঙ্গী চিত্রণের সময়ও মুখমণ্ডলকে সম্পূর্ণ রেখানির্ভর করিয়াই আঁকা হইয়াছে, এবং শিল্পী যেখানেই তীক্ষ্ণ ভাব সঞ্চরণের অবকাশ পাইয়াছেন সেখানেই রেখাগুলিতে ভীষণ চাঞ্চল্য ও পুনরাবৃত্তি দেখা দিয়াছে। মেহারে প্রাপ্ত রেখাচিত্রটিতে অবশ্য অধিকতর শক্তির বিকাশ; তাহার প্রধান কারণ, এই চিত্রটির রেখা-রূপায়ন খানিকটা মণ্ডণায়িত। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও মধ্যযুগীয় শিল্প-রীতি ও আদর্শের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

প্রাচ্য-ভারতীয় এই রীতি ও আদর্শের সঙ্গে সমসাময়িক পশ্চিম-ভারতীয় চিত্রাঙ্কন রীতি ও আদর্শের সাদৃশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তবে, পার্থক্যও সমান প্রত্যক্ষ। পশ্চিম-ভারতীয় অঙ্কনরীতিতে রেখা অত্যন্ত বেশি তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল, কোন্ গুলি প্রায় জ্যামিতিক চিত্রের মত সূক্ষ্ম, ভগ্ন অথবা ভঙ্গুর রেখা একান্ত প্রাণহীন, আবেগহীন। প্রাচ্য-ভারতীয় পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলির কিংবা তাম্রপট্টোৎকীর্ণ রেখাচিত্রগুলির লালিত্যময়, আবেগময় রেখার সংবেদনী ক্ষমতা পশ্চিমী রেখার নাই। পশ্চিমী রেখা কঠিন ও সমতল চিত্রভূমিকে তাহার নির্দিষ্ট বন্ধনীর মধ্যে শুধু আবদ্ধ করিয়া রাখে মাত্র; প্রাচ্য-ভারতের আবেগময় সংবেদনী রেখা বন্ধনীবদ্ধ চিত্রভূমির মণ্ডণায়িত রূপটিকে প্রকাশ করে। রেখা-বিন্যাসের এই ঐতিহ্য শুধু যে নেপালে ও ব্রহ্মদেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহাই নয়, মধ্যযুগের শেষপাদেও এই ঐতিহ্য বাংলা-আসাম-উড়িষ্যায় বাঘ-অজন্তার বিশুদ্ধ আদর্শের পাশাপাশি পূর্ণ গৌরবে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। আধুনিক কালে কলিকাতার কালিঘাটের পটে অজন্তার রেখা-রচনার রীতি ও আদর্শ উজ্জীবিত ছিল বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত; আর মধ্যযুগীয় আদর্শ বলবত্তর ছিল ফরিদপুর-যশোহর-মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-বীরভূমের জড়ানো পটে। এ-ক্ষেত্রেও বাংলার চিত্রকলা কোনো বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা নয়, বরং সমসাময়িক সর্বভারতীয় চিত্ররীতি ও আদর্শের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি অধ্যায় মাত্র।

৫

প্রাচীন বাংলার কুটীর, প্রাসাদ, বিহার, মন্দির প্রভৃতি সম্বন্ধে উপাদানের অভাবে সবিস্তারে কিছু বলিবার উপায় নাই। অথচ, অন্তত পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া লিপিমালায় ও সমসাময়িক সাহিত্যে নানাপ্রকারের সমৃদ্ধ ঘরবাড়ী, রাজপ্রাসাদ, স্তূপ, বিহার, মন্দির প্রভৃতির উল্লেখ ও স্বল্পবিস্তর বিবরণ সুপ্রচুর। পঞ্চম শতকে ফা-হিয়েন এবং সপ্তম শতকে য়ুয়ান্-চোয়াঙ্, বাংলার সর্বত্র অসংখ্য, স্তূপ, বিহার ও দেবমন্দির প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; লিপিমালায় ভূ-ভূষণ,

স্থাপত্য শিল্প

পর্বতশৃঙ্গস্পর্ধী, স্বর্ণকলসশীর্ষ, মেঘবর্ত্মবিরোধী নানা মন্দিরের উল্লেখ বিদ্যমান ; সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি-চিত্রে রঙে ও রেখায় নানা স্তূপ ও মন্দিরের প্রতিচিত্র রূপায়িত ; সমসাময়িক তক্ষণ-ফলকেও নানা আকৃতি-প্রকৃতির গৃহ, স্তূপ ও মন্দিরের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। অথচ, আজ আর এই সব ঘরবাড়ী, বিহার-মন্দিরের কিছুই অবশিষ্ট নাই, মাটির ধূলায় প্রায় সবই গিয়াছে মিশিয়া, অথবা তাহাদের ধ্বংসাবশেষ বনে জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মাত্র দুই চারিটি একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় মন্দির সকল বাধা-বিরোধ-উপেক্ষা তুচ্ছ করিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছে ; দুই চারিটির ধ্বংসাবশেষউদ্ধার ও সংস্কার করা হইয়াছে প্রত্নবিলাসী মনের আনন্দ-বিধান বা ঐতিহাসিকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য।

ধ্বংসের কারণ সহজবোধ্য। কাঠ, বাঁশ বা ইট যাহাই হোক্, এই উষ্ণ জলীয় বৃষ্টিস্নাত পলিমাটির দেশে কিছুই কালের সঙ্গে সংগ্রামে বেশিদিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। বাংলা দেশ পাথরের দেশ নয় ; অধিকাংশ বিহার-মন্দির ইত্যাদি এবং কিছু কিছু সমৃদ্ধ প্রাসাদ ইটে নির্মিত হইত ; কিন্তু ইটও কালজয়ী হইয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। তাহার উপর আবার মানুষের লোভ ও লুণ্ঠনস্পৃহা প্রকৃতির সঙ্গে হাত মিলাইয়া ধ্বংসলীলায় মাতিয়াছে। পরধর্মদ্বেষী বিধর্মীরাও অনেক বিহার মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিয়াছেন। প্রাচীনতম হিন্দু ও বৌদ্ধ-মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার কিছু কিছু অংশ পরবর্তী কালের মসজিদ, চবুতরা, দরবার-গৃহ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। গৌড়-পাণ্ডুয়া, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানের মধ্যযুগীয় প্রত্নাবশেষ একটু মনোযোগে বিশ্লেষণ করিলেই তাহা ধরা পড়িয়া যায়।

সাধারণ স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত এমন কি সমৃদ্ধ লোকেরাও নিজেদের বসবাসের জন্য যে সব ঘরবাড়ী প্রাসাদ ইত্যাদি রচনা করিতেন তাহারও উপাদান ছিল খড়, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি ; পার্থক্য যাহা ছিল তাহা শুধু আয়তন ও অলংকরণের, সমৃদ্ধি ও জটিলতার। উচ্চবিত্ত লোকদের ইট ব্যবহারের সামর্থ্য ছিল না, এমন নয় ; ইটের তৈরী ছোটবড় ঘর বাড়ী নিশ্চয়ই কিছু কিছু ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে যুক্তিটা ছিল এই যে, পঞ্চভূতে রচিত এই নশ্বর ক্ষণস্থায়ী মানবদেহের আশ্রয়ের জন্য সুচিরকালস্থায়ী গৃহের কি-ই-বা প্রয়োজন ; সে-প্রয়োজন যদি কাহারও থাকে তাহা দেবতার, কারণ দেবদেহের তো কোনো বিনাশ নাই, এবং সুচিরস্থায়ী আবাসের প্রয়োজন তো তাঁহারই ! যাহাই হউক, মানুষের বসবাসের জন্য তৈরী গৃহের আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার মত খুব উপাদান আমাদের নাই ; তবে, কিছু কিছু উৎকীর্ণ মৃৎ ও প্রস্তর-ফলকের সাক্ষ্যে কতকটা আভাস ধরিতে পারা কঠিন নয়। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে আজও বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর চতুষ্কোন নক্সার ভিত্তিতে মাটির দেয়াল বা বাঁশের চাঁচারীর বেড়ায় ঘেরা যে-ধরনের ধনুকাকৃতি দোচালা, চৌচালা, আটচালা ঘর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ধরনের বাংলা-ঘর রচনাই ছিল প্রাচীন রীতি। এই আকৃতি-প্রকৃতিই ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে গৌড়ীয় বা

বাংলা রীতি নামে খ্যাত,)এবং তাহাই পরবর্তী কালে মধ্যযুগীয় ভারতীয় স্থাপত্যে বাংলার দান বলিয়া গৃহীত ও স্বীকৃত হইয়াছিল। (এই গঠন ও আকৃতিই অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে 'বাংলো-বাড়ী' নামে ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজে পরিচিতি লাভ করে। এই ধরনের গৌড়ীয় রীতির আবাস-গৃহই গরীবের কুটীর হইতে আরম্ভ করিয়া ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত ছিল; পার্থক্য যাহা ছিল তাহা শুধু সমৃদ্ধি ও অলংকরণের। দ্বিতল-ত্রিতল গৃহও এই রীতিতেই নির্মিত হইত; উপরের চাল বিন্যস্ত হইত ক্রমহ্রস্বায়মান ধনুকাকৃতি রেখায়। কোনো কোনো মন্দিরও ঠিক এই গৌড়ীয় রীতিতেই নির্মিত হইত; বস্তুত, একাধিক প্রস্তর ফলকে এই ধরনের মন্দির উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।)

যাহাই হউক, প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যের সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচনা করিবার মত উপাদান স্বল্পই। ধ্বংসস্তূপে পরিণত বা অর্ধভগ্ন যে দুই চারিটি বিহার-মন্দির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তাহারই ভগ্নাংশগুলি আহরণ করিয়া, এবং মৃৎ ও প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ ও পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠায় চিত্রিত মন্দিরাদির আকৃতি-প্রকৃতির সাক্ষ্য একত্র করিয়া একটি সমগ্র রূপ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, প্রত্নসাক্ষ্য যাহা কিছু আছে তাহা একান্তই বিহার-দেউল ইত্যাদি সম্বন্ধে; স্থাপত্যের অন্যান্য দিক্ সম্বন্ধে বলিবার মত উপাদান একেবারে নাই বলিলেই চলে।

প্রাচীন বাংলার ধর্মগত বাস্তু মোটামুটি তিন শ্রেণীর: স্তূপ, বিহার ও মন্দির। স্তূপ ও বিহার সাধারণভাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সঙ্গে জড়িত, বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে। প্রাচীন বাংলায় জৈন-স্তূপের একটি মাত্র সংশয়িত উল্লেখ জানা যায় এবং জৈন বিহারের একটি মাত্র নিঃসংশয় উল্লেখ। এই বিহারটি ছিল উত্তর-বঙ্গের পাহাড়পুরে; স্তূপটিও বোধ হয় উত্তর-বঙ্গেই; আর সমস্ত স্তূপ এবং বিহারই বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়ে রচিত।

স্তূপ

ধর্মগত স্থাপত্যের কথা বলিতে গেলে স্তূপের কথাই বলিতে হয় সর্বাগ্রে। স্তূপ প্রাক্‌বৌদ্ধ; বৈদিক আমলেও দেহাস্থি প্রোথিত করিবার জন্য শ্মশানের উপর মাটির স্তূপ তৈরী হইত। কিন্তু এই স্থাপত্যরূপকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন বৌদ্ধরাই। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে স্তূপ তিন প্রকারের (১) শারীর ধাতু স্তূপ—এই শ্রেণীর স্তূপে বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার অনুচর ও শিষ্যবর্গের শরীরাবশেষ রক্ষিত ও পূজিত হইত; (২) পরিভোগিক ধাতু স্তূপ—এই শ্রেণীর স্তূপে বুদ্ধদেব কর্তৃক ব্যবহৃত দ্রব্যাদি রক্ষিত ও পূজিত হইত; (৩) নির্দ্দেশিক বা উদ্দেশিক স্তূপ—বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের জীবনেতিহাসের সঙ্গে জড়িত কোনো স্থান বা ঘটনাকে উদ্দেশ্য করিয়া বা তাহাকে নির্দেশ বা চিহ্নিত করিবার জন্য এই শ্রেণীর স্তূপ নির্মিত হইত। পরবর্তী কালে স্তূপ মাত্রই বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়, এবং সেই ভাবেই সমগ্র বৌদ্ধসমাজের পূজা লাভ করে। তাহা ছাড়া, বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলিতে পূজা দিতে আসিয়া নৈবেদ্য বা নিবেদন রূপে ছোট বড় স্তূপ নির্মাণ করিয়া

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও একটা সাধারণ রীতি হইয়া দাঁড়ায়। এই স্তূপগুলিকে বলা হইত নিবেদন-স্তূপ।

কিন্তু যে-শ্রেণীর স্তূপই হোক বা যে উদ্দেশ্যই তাহা রচিত হউক না কেন, আকৃতি-প্রকৃতি ও গঠনপদ্ধতিতে ইহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। একেবারে আদিতে স্তূপ বলিতে গোলাকার একটি বেদীর উপর অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি অণ্ড ছাড়া কিছুই বুঝাইত না। অণ্ডটির ঠিক উপরেই থাকিত হর্মিকা; এই হর্মিকা-বেষ্টনীর মধ্যে একটি ভাণ্ডে রাখা হইত শারীর বা পরিভোগিক ধাতু; পর্বদিবসে ধাতুসহ এই ভাণ্ডটি নীচে নামাইয়া ভক্ত পূজারীদের দেখান হইত, পুরোভাগে রাখিয়া গণযাত্রা করা হইত। এবং যেহেতু ধাতুগর্ভ এই ভাণ্ডটিই ছিল পূজা ও শ্রদ্ধার বস্তু সেই হেতু ইহাকে রৌদ্রবৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য, হর্মিকার ঠিক উপরেই থাকিত একটি ছত্রাবরণ। কালক্রমে ছোটই হোক্ আর বড়ই হোক্, প্রত্যেকটি অঙ্গকে পৃথক পৃথকভাবে লম্বিত করিয়া সমগ্র স্তূপটিকেই লম্বিত, সুউচ্চ করিয়া গড়িয়া তুলিবার দিকে একটা ঝোঁক সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে, এবং তোরণ, বেষ্টনী ও নানা অলংকরণ প্রভৃতি সংযোজিত হইতে আরম্ভ করে। সপ্তম-অষ্টম শতক নাগাদ নিম্ন ও গোলাকৃতি বেদীটি একটি গোল এবং লম্বিত মেধিতে পরিণতি লাভ করে; তাহার উপরকার অণ্ডটিও প্রমাণানুযায়ী ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে। উচ্চতা আরও বাড়াইবার জন্য বেদীর নীচে আবার একটি সুউচ্চ চতুষ্কোন ভিত্‌ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা দিতে আরম্ভ করে; আর হর্মিকার উপর ক্রমহ্রস্বায়মান ছত্রের সংখ্যা একটি দুইটি করিয়া বাড়িতে বাড়িতে সমগ্রতায় একটি সূচ্যগ্র শিখরের আকৃতি লাভ করে। তাহার ফলে স্তূপের প্রাথমিক, অর্থাৎ নিম্নবেদীর উপর অর্ধচন্দ্রাকৃতি অণ্ডের যে স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল; অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে সমান মূল্য পাইয়া অণ্ডের প্রাধান্য নষ্ট হইয়া গেল, এবং স্তূপ আর যথার্থত স্তূপ থাকিল না, বিভিন্ন অঙ্গ মিলিয়া লম্বিত এবং কৌনিক একটি শিখরের আকৃতি ধারণ করিল। বাংলাদেশে যে কয়েকটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে আমরা পরিচিত ইহাদের সমস্তই স্তূপ-স্থাপত্যের বিবর্তনের এই স্তরের, অর্থাৎ একেবারে শেষ স্তরের এবং ইহাদের প্রত্যেকটিই নিবেদন-স্তূপ। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ অবশ্য বলিতেছেন, বাংলাদেশের সর্বত্র তিনি নৃপতি অশোকের পোষকতায় বুদ্ধদেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত অনেকগুলি স্তূপ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এ-তথ্য খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে, খুব সম্ভব বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানা সময়ে উদ্দেশিক স্তূপ বাংলার নানা স্থানে নির্মিত হইয়াছিল নানা জনের পোষকতায়; য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ হয়তো এই সব স্তূপই কিছু কিছু দেখিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আর ইহাদের কিছুই অবশিষ্ট নাই।

সংখ্যায় বা আকৃতি-প্রকৃতির বৈচিত্র্যে সমসাময়িক বিহার-প্রান্তের অসংখ্য নিবেদন-স্তূপ গুলির সঙ্গে বাংলার স্বল্প সংখ্যক নিবেদন-স্তূপের কোনো তুলনাই হয় না। ব্রোঞ্জধাতুতে ঢালাই করা কিংবা পাথর কুঁদিয়া গড়া কয়েকটি স্বল্পায়তন নিবেদন-স্তূপ বাংলার নানাস্থানে

পাওয়া গিয়াছে ; এ-গুলিকে ঠিক স্থাপত্য-নিদর্শন বলা চলেনা, তবু সমসাময়িক বাংলার স্তূপ-স্থাপত্যের আকৃতি-প্রকৃতি বুঝিতে হইলে ইহাদের আলোচনা করিতেই হয়। কয়েকটা ইটের তৈরী অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন স্তূপের ধ্বংসাবশেষও বাংলার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় ; আকৃতি-প্রকৃতির দিক্ হইতে বিহারের সমসাময়িক স্তূপ-স্থাপত্যের সঙ্গে ইহাদের বিশেষ কোনো পার্থক্য কিছু নাই।

ঢাকা জেলার আস্রফপুর-গ্রামে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের একটি স্বল্পায়তন নিবেদন-স্তূপ বোধ হয় বাংলার সর্বপ্রাচীন (আ সপ্তম-শতক) স্তূপ-নিদর্শন। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর এবং চট্টগ্রাম জেলার ঝেওয়ারী গ্রামেও দুইটি ব্রোঞ্জের ক্ষুদ্রাকৃতি নিবেদন-স্তূপ পাওয়া গিয়াছে। এই ধরনের স্তূপের প্রতিকৃতি বাংলার সমসাময়িক প্রস্তরফলকেও উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আকৃতি-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিবার কিছু নাই।

পাথরে কুঁদিয়া তৈরী একটিমাত্র নিবেদন-স্তূপের খবর আমরা জানি ; এই স্তূপটি যোগী-গুফায় প্রতিষ্ঠিত। প্রথম দর্শনে ইহাকে স্তূপ বলিয়াই মনে হয় না। ভিত্, বেদি, মেধি, অণ্ড, হর্মিকা, ছত্রাবলি প্রভৃতি সব কিছুরই গতি এমন উর্ধমুখী যে সমগ্র স্তূপটিকে মনে হয় যেন একটি ক্রমহ্রস্বায়মান গোলাকৃতি স্তম্ভ, এবং স্তম্ভটিরই অংশে অংশে খাঁজ কাটিয়া কাটিয়া স্তূপটির বিভিন্ন অংশের রূপ দেওয়া হইয়াছে। চতুষ্কোন হর্মিকাটি তো যেন একান্তই একটি গোলাকৃতি আমলক-শিলায় পরিণত!

সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি-চিত্রেও কয়েকটি স্তূপের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। কেম্‌ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পাণ্ডুলিপিতে (১০১৫ খ্রী) বরেন্দ্রভূমির মৃগস্থাপন-স্তূপের একটি চিত্র আছে ; সপ্তম শতকে এই স্তূপটির কথাই বোধ হয় ই-ৎসিঙ্ উল্লেখ করিয়াছেন। আর একটি পাণ্ডুলিপি-পত্রে বরেন্দ্রভূমির "তুলাক্ষেত্রে বর্ধমান-স্তূপ"-এর একটি চিত্র আছে। এই বর্ধমান স্থান নাম নয়, খুব সম্ভব জৈন-তীর্থংকর বর্ধমানের নাম, এবং যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই স্তূপটিই প্রাচীন বাংলায় জৈন-স্তূপের একমাত্র জ্ঞাত নিদর্শন। তৃতীয় আর একটি স্তূপের ছবি আছে আর একটি পাণ্ডুলিপিতে। অলংকরণ-সমৃদ্ধির কথা বাদ দিলে আকৃতি-প্রকৃতির দিক হইতে সব ক'টি স্তূপ প্রায় একই প্রকারের। খাঁজকাটা চতুষ্কোন ভিত্, ধাপে ধাপে তৈরী বেদী, পদ্মাকৃতি মেধি, ক্রমহ্রস্বায়মান অণ্ড ও ছত্রাবলী প্রত্যেকটি স্তূপেরই বৈশিষ্ট্য।

রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে, বিশেষভাবে সত্যপীরের ভিটায়, এবং বাঁকুড়া জেলার বহুলারায় খননাবিষ্কারের ফলে ইটের তৈরী কয়েকটি নিবেদন-স্তূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এই ধরনের স্বল্পায়তন নিবেদন-স্তূপগুলি হয় পৃথক পৃথক, না হয় একই ভিতের উপর সারি সারি সাজানো, বা একই ভিতের উপর একটি বৃহত্তর স্তূপের চারদিকে চক্রাকারে ছোট ছোট স্তূপের বিন্যাস। এই ধরনের স্তূপ প্রায় সমস্তই দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকের, এবং ভিত্ ছাড়া ইহাদের আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নাই, অর্থাৎ ইহাদের ভূমি-

নক্‌সা ছাড়া আর কিছু বুঝিবার কোনো সুযোগ নাই। এই ভূমি-নক্‌সা কোনো কোনো ক্ষেত্রে চতুষ্কোন বা গোলাকার, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চতুষ্কোন ভিতের চারদিকে, ঠিক মধ্যখানে একটি একটি করিয়া চতুষ্কোন সংযোজিত; তাহার ফলে সমগ্র ভূমি-নক্‌সাটি একটি ক্রুসের আকার ধারণ করিয়াছে। ভিত্‌গুলি প্রায়ই বেশ উঁচু এবং অনেক নিদর্শনে ক্রমহ্রস্বায়মান স্তরে স্তরে বিভক্ত। ভিতের দেয়ালের গায়ে নানা বুদ্ধমূর্তি। এই রূপ ও বিন্যাসের দিক হইতে, বস্তুত সকল দিক হইতেই সমসাময়িক বিহারের নিবেদন-স্তূপগুলির সঙ্গে ইহাদের কোনোই পার্থক্য নাই। খননাবিষ্কারের ফলে দেখা গিয়াছে, এই স্তূপগুলির গর্ভে অসংখ্য বৌদ্ধসূত্রোৎকীর্ণ মাটীর শীলমোহর রক্ষিত থাকিত। বৌদ্ধ বিশ্বাসানুযায়ী এই সূত্রটিই ধর্মশরীর, এবং দেহাবশেষের পরিবর্তে এই ধর্মশরীরই স্তূপগর্ভে রক্ষা করা নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

স্তূপ-স্থাপত্যে বাংলাদেশ নূতন কোনো বৈশিষ্ট্য রচনা করে নাই বলিয়াই মনে হয়; নূতন সমৃদ্ধির সংযোজনাও নাই; বৃহদাকৃতি স্তূপ-রচনার কোনো চেষ্টাও বোধ হয় ছিল না। বস্তুত নৈবেদ্য বা নিবেদন উদ্দেশ্য ছাড়া, স্ব-স্বতন্ত্র স্থাপত্য নিদর্শন হিসাবে স্তূপ গড়িয়া তুলিবার উল্লেখযোগ্য কোনো চেষ্টাই বোধ হয় প্রাচীন বাংলা বা বিহারে কিছু ছিল না, অন্তত প্রত্নসাক্ষ্যে তেমন প্রমাণ কিছু নাই। স্থাপত্য হিসাবে স্তূপ প্রাচীন বাংলার চিত্ত আকর্ষণ করে নাই, অন্তত যে-সব নিদর্শন আমরা দেখিতেছি তাহাতে সে-প্রমাণ নাই। অথচ, প্রায় সমসাময়িক কালে ব্রহ্মদেশের রাজধানী পাগান-নগরে দেখিতেছি, স্তূপ রচনার কি সমৃদ্ধি, কি ঐশ্বর্য! প্রায় একই ধরনের কিন্তু সুবিস্তৃত ভূমি-নক্‌সার উপর সুউচ্চ ভিত্‌ স্তরে স্তরে ক্রমহ্রস্বায়মান হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে; তাহার উপর সুবৃহৎ সুউচ্চ গোলাকৃতি মেধি, মেধির উপর ঘণ্টাকৃতি অণ্ড, অণ্ডের উপর চতুষ্কোন হর্মিকা, এবং হর্মিকার উপর ক্রমহ্রস্বায়মান ছত্রাবলী। পাগানের স্তূপের বিভিন্ন অঙ্গের রূপ ও বিন্যাস রচনা ও নির্মাণরীতিতে একই যুক্তি অনুসরণ করিয়াছে, অথচ পাগান স্তূপ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে শুধু তাহার বৃহদায়তন দিয়া, কল্পনার বিরাটত্ব দিয়া; বাংলা-বিহারের সমসাময়িক স্তূপ-স্থাপত্যকে যেন খেলেনার বস্তু বলিয়া মনে হয়, শুধু যেন নিয়মরক্ষা! তাহার কারণ সহজবোধ্য। মহাযান-বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে স্তূপের সম্বন্ধ স্বল্পই; তাহা ছাড়া, নিবেদন-স্তূপ তো যথার্থত স্তূপই নয়, স্তূপের মৌলিক উদ্দেশ্যও বহন করে না।

স্তূপের পরই বিহারের কথা বলিতে হয়। স্তূপ যদি ছিল পূজার প্রতীক, শ্রদ্ধার বস্তু, বিহার ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাসস্থল, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার, নিয়মসংযম-পালনের আশ্রয়। আদিম বৌদ্ধ বা জৈন বিহার পাহাড় কুঁদিয়া তৈরী গুহা মাত্র। সাধারণত একই পাহাড়ে যেখানে খানিকটা সমতল ভূমি আছে তাহার তিনদিক ঘিরিয়া সমান অসমান গুহার সারি; সেই পাহাড়েরই অন্যত্র সুবিধানুযায়ী এবং প্রয়োজনানুযায়ী আরও

কয়েকটি গুহা। এই গুহাগুলি ভিক্ষুদের আবাস-স্থল, বৃহত্তর একটি বা দু'টি গুহা সম্মেলন-স্থল বা পূজা-স্থল, সমতল আঙিনাটি সভা-স্থল, এবং সব কিছু লইয়া একটি বিহার। কিন্তু এই ধরনের বিহার-রচনা ঠিক স্থাপত্য নয়, নির্মাণগত কোনো বুদ্ধি বা সৌন্দর্যের কোনো প্রেরণা এ-ক্ষেত্রে সক্রিয় নয়। পাহাড় কুঁদিয়া এই ধরনের বিহার রচনা ছাড়া ইট বা পাথরের ভিত্‌ ও কাঠামোর উপর বাঁশ, কাঠ ইত্যাদির সাহায্যে বিহার-রচনার একটা চেষ্টাও ছিল, এবং সে-ক্ষেত্রে বিন্যাসের একটা যুক্তিও সক্রিয় ছিল। মাঝখানে সুবিস্তৃত অঙ্গন; সেই অঙ্গনের চারিদিক ঘিরিয়া কক্ষশ্রেণী; এক একদিকের কেন্দ্র-কক্ষটি বৃহত্তর; অঙ্গনের এক কোনে কূপ ও স্নানাচমনস্থান; এবং বিহারে ঢুকিবার একটিমাত্র প্রবেশদ্বার।

বিহার

বৌদ্ধ ও জৈন সংঘের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধ বৃহদায়তন বিহারের প্রয়োজন দেখা দেয়, এবং ইটের সাহায্যে সেই বিহার-রচনার সূচনা হয়—সদ্যোক্ত বাঁশ-কাঠে নির্মিত বিহারের বিন্যাস অনুযায়ী। একতল বিহারেও যখন কুলাইল না তখন দ্বিতল, ত্রিতল, এমন কি নবতল পর্যন্ত বিহার নির্মিত হইতে আরম্ভ করিল, এবং গোড়ায় যে বিহার ছিল ভিক্ষুদের আবাসস্থল মাত্র সেই বিহারই হইয়া উঠিল বিরাট জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার, ধর্মকর্ম-সাধনার কেন্দ্র।

প্রাচীন বাংলায়ও এই ধরনের ছোট বড় বিহার ছিল অনেক, এবং ইহাদের কথা আগেই অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এই সব বিহারের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় য়ুয়ান-চোয়াঙ-কথিত পুণ্ড্রবর্ধনের পো-সি-পো বা ভাসু-বিহার এবং কর্ণসুবর্ণের লো-টো-মো-চিহ্ বা রক্তমৃত্তিকা-বিহারের বর্ণনায়। ভাসু-বিহারের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর মহাস্থানের সন্নিকটে বৃহৎ একটি স্তূপে, এবং রক্তমৃত্তিকা-বিহারের ধ্বংসাবশেষ মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটির সন্নিকটে রাক্ষসডাঙ্গার স্তূপে।

খননাবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে অন্তত দুইটী বিহার ছিল। ৪৭৮-৭৯ খ্রীষ্ট তারিখের একটি লিপিতে জানা যায়, এই স্থানের বট-গোহালী বা গোয়াল-ভিটায় আচার্য গুহনন্দীর একটি জৈন-বিহার ছিল, আর অষ্টম শতকের শেষার্ধে যে সোমপুরের শ্রীধর্মপাল-মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পরবর্তী কালে এই বিহারের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দেশে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এ-তথ্য তো সুবিদিত। জৈন-বিহারটির ভূমি-নক্সা ও আকৃতি-প্রকৃতি কি ছিল তাহা জানিবার কোনো উপায় আজ আর নাই। কিন্তু সুবিস্তৃত ধর্মপাল-বিহারটির নক্সা ও আকৃতি-প্রকৃতি দৃষ্টিগোচর। এত বৃহৎ ও সমৃদ্ধ বিহার ভারতবর্ষের আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই; ইহার মহাবিহার নাম যথার্থ এবং সার্থক। বিস্তৃতভাবে এই বিহারের বর্ণনা দিবার স্থান ও সুযোগ নাই, তবু কিছুটা পরিচয় লইতেই হয়।

সোমপুর-বিহার

প্রত্যেক দিকে প্রায় ৯০০ ফিট, এমন একটি সমচতুষ্কোণ জুড়িয়া বিহারটি বিস্তৃত, এবং দৃঢ় সুপ্রশস্ত বহিঃপ্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। এই প্রাচীর ঘেঁষিয়া ভিতরের দিকে সারি সারি প্রায় ১৮০টির উপর কক্ষ; প্রত্যেক দিকের কেন্দ্রের কক্ষটি বৃহত্তর। কক্ষসারির সম্মুখ দিয়া সুপ্রশস্ত বারান্দা লম্বমান হইয়া চলিয়া গিয়াছে চারিদিক ঘিরিয়া; কেন্দ্রের সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দা হইতে নামিলেই সুপ্রশস্ত অঙ্গন, এবং অঙ্গনের একেবারে কেন্দ্রস্থলে সুউচ্চ সুবৃহৎ মন্দির। বারান্দার প্রান্তে সিঁড়ির উপরই স্তম্ভশ্রেণী; এই স্তম্ভশ্রেণী ও কক্ষের দেয়ালের উপর ছাদ। বহিঃপ্রাচীরের প্রশস্ততা এবং স্তম্ভশ্রেণীর ঘন সন্নিবেশ দেখিয়া মনে হয় বিহারটির একাধিক ছিল তল, এবং কেন্দ্রীয় মন্দিরের উচ্চতা ও সমৃদ্ধির সঙ্গে প্রমাণ রক্ষা করিয়া সমগ্র বিহারটির উচ্চতা ও সমৃদ্ধি নিরূপিত হইয়াছিল।

বিহার-মন্দিরে প্রবেশের প্রধান তোরণ ছিল উত্তর দিকে। সমতল ভূমি হইতে সুপ্রশস্ত সোপানশ্রেণী বাহিয়া উপরে উঠিয়া সুবৃহৎ একটি দরজা পার হইলেই সম্মুখে স্তম্ভসমৃদ্ধ সুপ্রশস্ত একটি কক্ষ; সেই কক্ষটি সোজা পার হইয়া গেলে দক্ষিণ দিকের কেন্দ্রে একটি ক্ষুদ্রতর দ্বার; এই দ্বার দিয়া ঢুকিতে হয় আর একটি স্তম্ভযুক্ত ক্ষুদ্রতর কক্ষে। কক্ষটির পরই লম্বমান বারান্দা; এই বারান্দা ধরিয়া চতুর্দিকের কক্ষশ্রেণী সমানে ঘুরিয়া আসা যায়, আর সোপান বাহিয়া নীচে নামিলেই সুপ্রশস্ত অঙ্গন; একেবারে চোখের সম্মুখে সুউচ্চ মন্দিরের সম্মুখ দৃশ্য। প্রবেশের প্রধান তোরণটি ছাড়া উত্তর দিকের প্রায় পূর্বতম প্রান্তে আর একটি ছোট তোরণ। পূর্বদিকের বৃহত্তর কেন্দ্রীয় কক্ষের ভিতর দিয়াও ভিতর-বাহিরে যাওয়া-আসা করিবার আরও একটি খিড়কী-তোরণ বোধ হয় ছিল আবাসিকদের ব্যবহারের জন্য। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যাতায়াতের কোনো পথই ছিল না।

এই চতুঃসংস্থান-সংস্থিত সুবৃহৎ বিহার-মন্দিরটিকে বিপুলশ্রীমিত্রের নালন্দা-লিপিতে বিশেষিত করা হইয়াছে বসুধার একতম নয়নানন্দ বলিয়া। খননাবিষ্কারের ফলে বিহারটির যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর তাহা হইতেও এই বিশেষণ অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না। বলা বাহুল্য, এই সুবৃহৎ বিহার একদিনে নির্মিত হয় নাই, এবং ইহার প্রায় চারি শতাব্দীর সুদীর্ঘ জীবনে একাধিকবার সংস্কার ও সংযোজনের প্রয়োজনও হইয়াছিল। তবু, এ-তথ্য অনস্বীকার্য বলিয়া মনে হয় যে, গোড়া হইতেই এই বিহারের নকসা, বিন্যাস ও আকৃতি-প্রকৃতি যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের বুদ্ধি ও কল্পনায় বিহারটির সামগ্রিক রূপের একটা সুস্পষ্ট ধারণা সক্রিয় ছিল এবং নির্মাণ, সংস্কার ও সংযোজনকালে বা তাহার ফলে সেই রূপটির কোনো ব্যত্যয় ঘটে নাই। তাহা ছাড়া, এ-ও মনে হয়, সামগ্রিক নির্মাণ কার্যটি একটানা একবারেই হইয়াছিল, পরবর্তী কালে সংস্কার প্রয়োজন হইলেও সংযোজনের প্রয়োজন বিশেষ কিছু হয় নাই। সূচনায় বিহারের কক্ষগুলি ভিক্ষুদের বাসগৃহ রূপেই ব্যবহৃত হইত, সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশ কক্ষে সমৃদ্ধ অলংকরণযুক্ত বেদী দেখিয়া মনে

হয়, পরবর্তী কালে আবাসিক ভিক্ষু সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় সেই কক্ষগুলি বোধ হয় পূজাগৃহ রূপেই ব্যবহৃত হইত।

এই সুবৃহৎ বিহার-মন্দিরের ব্যবস্থা-কর্ম পরিচালনার জন্য একটি দপ্তর ছিল, এবং সে দপ্তর-গৃহটি ছিল প্রধান প্রবেশ তোরণের পাশেই। তল হইতে তলে, কক্ষ হইতে কক্ষে, অঙ্গন হইতে অঙ্গনে জল-নিঃসরণের একটি প্রণালী সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া বাহিয়া বিহার-মন্দিরটির সমস্ত জল নিষ্কাশিত করিত বিহার-সীমার ভিতরেই একটি ক্ষুদ্রাকৃতি দীর্ঘিকায়। কক্ষশ্রেণীর মাঝে মাঝে, সুপ্রশস্ত অঙ্গনেও নানা স্থানে ছোট ছোট মন্দির, নিবেদন-স্তূপ, কূপ, স্নানাচমনাগার, অশনস্থান ইত্যাদি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

নালন্দা, শ্রাবস্তি প্রভৃতি স্থানের সুবৃহৎ বিহার-প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে মনে হয়, সোমপুর-বিহারটির সাধারণ নক্সা ও বিন্যাস ছিল প্রায় একই ধরনের, আদর্শ এবং উদ্দেশ্যও ছিল একই। কিন্তু, সন্দেহ নাই, পাহাড়পুরের মতন সুসমৃদ্ধ, সুবৃহৎ ও সুবিন্যস্ত বিহার এ-পর্যন্ত আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই; বোধ হয় ছিলও না, অন্তত প্রত্নসাক্ষ্যে বা লিপি ও সাহিত্য-সাক্ষ্যে তাহা জানা যায় না।

৬

লিপি ও সাহিত্য-সাক্ষ্যে জানা যায়, প্রাচীন বাংলায় মন্দির নির্মিত হইয়াছিল অসংখ্য; কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ শতকের কয়েকটি ভগ্ন, অর্ধভগ্ন মন্দির ছাড়া এই অসংখ্য মন্দিরের কিছুই আর অবশিষ্ট নাই। অথচ ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে মন্দিরেই যাহা কিছু বাংলার বৈশিষ্ট্য। বাংলার মন্দিরই যবদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের বিশিষ্ট মন্দির-স্থাপত্যের মূল প্রেরণা। সমসাময়িক লিপিমালা ও সাহিত্যে প্রাচীন বাংলার কোনো কোনো মন্দিরের সমৃদ্ধির বর্ণনা দৃষ্টিগোচর; কোনো কোনো মন্দিরের আপেক্ষিক প্রসিদ্ধিও ছিল, সন্দেহ নাই; এমন দুই চারিটি মন্দিরের প্রতিকৃতি দেখা যায় সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি-চিত্রে এবং তক্ষণ-ফলকে, যেমন রাঢ়া ও পুণ্ড্রবর্ধনের বুদ্ধ-মন্দির, বরেন্দ্রের তারা-মন্দির, সমতট, বরেন্দ্র, নালেন্দ্র, রাঢ়া এবং দণ্ডভুক্তির লোকনাথ-মন্দির। এই সব মন্দিরের প্রতিকৃতির আকৃতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রাচীন বাংলায় মোটামুটি চারিটি বিভিন্ন শৈলীর মন্দির-নির্মাণরীতি প্রচলিত ছিল। রীতি ও শৈলীর এই বিভিন্নতা ভূমি-নক্সানির্ভর নয়, বস্তুত, প্রত্যেকটি রীতিতেই ভূমি-নক্সার যুক্তি ও বিন্যাস প্রায় একই ধরনের; এই বিভিন্নতা প্রধানত গর্ভগৃহের উপরিভাগ অর্থাৎ ছাদ বা চালের রূপ ও আকৃতিনির্ভর। সদ্যোক্ত চারিটি রীতি তালিকাগত করা যাইতে পারে।

মন্দির-স্থাপত্য

(১) ভদ্র বা পীড় দেউল। এই রীতিতে গর্ভগৃহের চাল ক্রমহ্রস্বায়মান পিরামিডাকৃতি হইয়া ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। ধাপ

বা স্তর সংখ্যায় তিনটি, পাঁচটি বা সাতটি। সর্বোচ্চ এবং ক্ষুদ্রতম স্তরের উপরে আমলক ও চূড়া। এই ভদ্র বা পীড় দেউলই ওড়িশ্যার রেখ বা শিখর-মন্দির সমূহের সম্মুখভাগের জগমোহন বা ভোগমণ্ডপ।

(২) রেখ বা শিখর দেউল। এই রীতিতে গর্ভগৃহের চাল ঈষদ্‌বক্র রেখায় শিখরাকৃতি হইয়া সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। শিখরের উপরিভাগে আমলক ও চূড়া। এই রেখ বা শিখর দেউল উত্তর-ভারতীয় এবং ওড়িশ্যার নাগর পদ্ধতির মন্দিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় যুক্ত।

(৩) স্তূপযুক্ত পীড় বা ভদ্র দেউল। এই ধরনের দেউলে চালের ক্রমহ্রস্বায়মান পিরামিডাকৃতি স্তরের উপরে একটি স্তূপ। স্তূপটির উপর চূড়া।

(৪) শিখরযুক্ত পীড় বা ভদ্র দেউল। এই ধরনের দেউলের চালের ক্রমহ্রস্বায়মান পিরামিডাকৃতি স্তরের উপর একটি শিখর। শিখরের উপর চূড়া।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন এই চার বিভিন্ন রীতির প্রত্যেকটির স্থাপত্য-নিদর্শন আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই; তৃতীয় ও চতুর্থ রীতির মন্দিরের কোনো নিদর্শনই আমরা আজও জানিনা, যদিও ঐ ধরনের মন্দির ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। প্রথমোক্ত রীতির নিদর্শনও জানি, নিঃসংশয়ে তাহা বলা যায় না; তবে, দ্বিতীয় রীতির মন্দিরের কয়েকটি নিদর্শন আজও দৃষ্টিগোচর।

(১) প্রথমোক্ত রীতির, অর্থাৎ, ভদ্র বা পীড় দেউল যে প্রাচীন বাংলায় সুপ্রচুর ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় অগণিত প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ মন্দিরের প্রতিকৃতিগুলিতে। এই রীতির প্রাথমিক রূপটি দেখিতেছি ঢাকা আস্রফপুরে প্রাপ্ত সপ্তম শতকের ব্রোঞ্জনির্মিত একটি ফলকে। চারিটি খাঁচকাটা কাঠের স্তম্ভের উপর ঢালু ক্রমহ্রস্বায়মান দু'টি চাল, তাহার উপর সুন্দর একটি চূড়া। ইহাই এই রীতির মন্দিরের মূল রূপ; এই রূপই ক্রমশ আরও সমৃদ্ধ এবং জটিল হইয়াছে। একটি একটি করিয়া ঢালু চালের সংখ্যা গিয়াছে বাড়িয়া; সর্বোচ্চ চালটির উপর চূড়ার নীচেই গ্রীবাদেশের গোলাকৃতি অণ্ডটি ক্রমশ আমলক-শিলায় বিবর্তিত হইয়াছে, এবং গ্রীবানিম্নের চালটির (ঘাড়চক্রের) চারিকোনে চারিটি ঝম্পসিংহ-মূর্তির অলংকরণ সংযোজিত হইয়াছে। ভূমি-নক্সা সাধারণত চতুষ্কোন রথাকৃতি; প্রত্যেক দিকের বিলম্বিত রেখাটি কেন্দ্রীয় অংশটির সম্মুখ দিকে বাড়াইয়া দিয়া রথের আকৃতি দান করা হইয়াছে। এই ধরনের রথাকৃতি ভূমি-নক্সার উপর দুই বা ততোধিক ঢালু ক্রমহ্রস্বায়মান চালের মন্দির মধ্যযুগের বাংলাদেশেও সুপ্রচলিত রীতি ছিল, সন্দেহ নাই। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের অনেক মৃৎফলকে এই ধরনের মন্দিরের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। প্রায় সমসাময়িক কালের ইষ্টকনির্মিত এই রীতির মন্দিরের একাধিক নিদর্শন (যেমন বাঁকুড়া জেলার এক্তেশ্বর মন্দিরের নন্দীমণ্ডপ) আজও দৃষ্টিগোচর। লোকায়ত বাংলার দ্বিতল বা ত্রিতল খড়ের চালের রূপ হইতেই যে এই রীতির উদ্ভব,

তাহাতে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। যাহাই হউক, প্রাচীনতর রূপের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর একমাত্র প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিকৃতি-চিত্রেই দৃষ্টিগোচর; মন্দিরাবশেষ কিছু নাই বলিলেই চলে। হিলিতে প্রাপ্ত এবং ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত কল্যাণসুন্দর মূর্তির ফলকে, চব্বিশপরগণা-কুলদিয়ার এবং রাজসাহীর-বরিয়ার সূর্যমূর্তির ফলকে, বিক্রমপুরের রত্নসম্ভব-মূর্তির ফলকে, ঢাকা-মধ্যপাড়ার বুদ্ধমূর্তি-ফলকে, বিরোলের উমা-মহেশ্বর প্রতিমা-ফলকে, এবং রাজসাহী-কুমারপুরের একটি সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উৎকীর্ণ প্রতিকৃতিতে এই রীতির মন্দিরের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলি ধরিতে পারা খুব কঠিন নয়।

(২) দ্বিতীয়োক্ত রীতির অর্থাৎ রেখ বা শিখর-দেউলের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন বোধ হয় বর্ধমান-বরাকরের ৪নং মন্দিরটি। এই মন্দিরটি পাথরে তৈরী; নীচু ভিতের উপর গর্ভগৃহটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, এবং গর্ভগৃহের উপর খর্বাকৃতি একটি রেখ বা শিখরের চাল। গোড়া হইতেই শিখরের ক্রমবক্র রেখাটি উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে; শিখরের উপর একটি বৃহৎ আমলক-শিলা। শিখরের পগ-রেখাগুলি সুতীক্ষ্ণ ও সুকঠোর সারল্যে নিয়ন্ত্রিত। স্থাপত্যরূপের দিক হইতে এই মন্দিরটি ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দিরের সমকালীন, অর্থাৎ অষ্টম শতকীয়।

এই রেখ-দেউলের বিবর্তনের পরবর্তী স্তরটি ধরা পড়িয়াছে তিনটি ক্ষুদ্রায়তন নিবেদন-মন্দিরে; এই তিনটির দুইটি পাথরে তৈরী (একটি দিনাজপুরে এবং আর একটি রাজসাহী নিমদীঘিতে প্রাপ্ত), তৃতীয়টি ব্রোঞ্জে গড়া (এবং চট্টগ্রাম জেলার ঝেওয়ারীতে পাওয়া)। আকৃতি-প্রকৃতি এবং বিবর্তনের দিক হইতে এই তিনটিই সমকালীন, সন্দেহ নাই। রেখাকৃতি ভূমি-নক্সার উপর গর্ভগৃহ; গর্ভগৃহের চারদিকে চারিটি ত্রিবলীত তোরণ বা কুলুঙ্গি; চালে ক্রমবক্রাকৃতি শিখর এবং শিখরের শীর্ষে সংকীর্ণ গ্রীবার উপর আমলক। বিবর্তনের এই স্তরেও পগরেখা তীক্ষ্ণ ও সরল, তবে শিখরের অঙ্গে চৈত্য গবাক্ষের অলংকার। পাথরের নিদর্শন দুইটিতে গর্ভগৃহ ও শিখরের মাঝখানে দুই বা তিনস্তরে মণ্ডণান্বিত রেখা, কিন্তু ব্রোঞ্জ-নিদর্শনটিতে তাহা নাই।

বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে প্রায় চারি পাঁচটি ভগ্ন ও অর্ধভগ্ন নিদর্শন বিদ্যমান—বর্ধমানের দেউলিয়া-গ্রামে একটি ইটের তৈরী মন্দির, বাঁকুড়া জেলার বহুলারা-গ্রামের ইটের তৈরী সিদ্ধেশ্বর-মন্দির, বাঁকুড়া জেলার দেহার-গ্রামের পাথরে তৈরী সরেশ্বর ও সল্লেশ্বর-মন্দির, এবং সুন্দরবনের জটার-দেউল। প্রথম চারিটি মন্দিরের অত্যন্ত ভগ্নদশা; পঞ্চম মন্দিরটির এমন সংস্কার-সংরক্ষণ করা হইয়াছে যে, ইহার মূল আকৃতি-প্রকৃতিই গিয়াছে বদলাইয়া। এই মন্দিরগুলির ভূমি-নক্সা, গর্ভগৃহ, শিখর ও অলংকরণ প্রভৃতির বিশ্লেষণ করিলে সহজেই ধরা পড়ে, সদ্যোক্ত শিখরাকৃতি নিবেদন-মন্দিরগুলির সঙ্গে ইহাদের মৌলিক পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই, তবে এই মন্দিরগুলি আয়তনে ও অলংকরণে আরও সমৃদ্ধতর,

আকৃতি-প্রকৃতিতে আরও জটিলতর। মৌলিক পার্থক্যের মধ্যে শুধু দেখিতেছি, শিখরের পগরেখাগুলির তীক্ষ্ণতা মার্জনা করিয়া একটু গোলাকার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে সমগ্র শিখরটিরই আকৃতি হইয়া পড়িয়াছে খানিকটা গোলাকার। তাহা ছাড়া, মূল শিখরের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রাকৃতি শিখরালংকারের সজ্জা সংযোজিত হইয়াছে, এবং প্রবেশ তোরণের দিকে একটি অলিন্দও যোগ করা হইয়াছে। দেউলিয়ার মন্দিরটি বোধ হয় এই পাঁচটির মধ্যে সর্বপ্রাচীন, এবং ইহার কিছুকাল পরেই বহুলারার সিদ্ধেশ্বর-মন্দির। এই দুইটি মন্দিরেই শিখরের পগরেখা গর্ভগৃহের ভূমি পর্যন্ত আলম্বিত, এবং রেখার তীক্ষ্ণতা মার্জিত ও গোলায়িত। বহুলারার সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরটির গর্ভগৃহের বহিঃপ্রাচীরে কুলুঙ্গির অলঙ্কার, এবং শিখরের কেন্দ্রীয় রথটিতে ক্ষুদ্রাকৃতি শিখরালংকার। এই মন্দির দু'টি বোধ হয় দশম-একাদশ শতকীয়। দেহারের সরেশ্বর ও সল্লেশ্বর-মন্দির দুইটির গর্ভগৃহের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নাই; তবে, গর্ভগৃহের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, এই দু'টি মন্দিরও বহুলারার সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরের সমসাময়িক। সুন্দরবনের জটার-দেউলটিও বোধ হয় একই কালের, কিন্তু যুক্তিহীন, জ্ঞানহীন সংস্কার ও সংযোজনার ফলে মন্দিরটির মৌলিক রূপ আজ আর কিছু বুঝিবার উপায় নাই; তবে পুরাতন এবং সংস্কারপূর্ব একটি আলোকচিত্র হইতে মনে হয়, এই দেউলটিও অনেকটা সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরের মতনই ছিল, তবে শেষোক্ত মন্দিরের শিখরের রেখ বোধ হয় ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি বক্র।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় বর্ধমান-বরাকরের ১, ২ ও ৩ নং মন্দির তিনটিকে দ্বাদশ-শতকীয় বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোনো সঙ্গত কারণ নাই; বস্তুত গঠনরীতির দিক হইতে এই তিনটির একটিও পঞ্চদশ-শতকের আগেকার মন্দির বলিয়া মনে হয় না। বর্ধমান গৌরাঙ্গপুরের ঈছাই-ঘোষের দেউলটি সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে; এই মন্দিরটি যেন আরও পরবর্তী। তবে, মধ্যযুগেও যে বাংলাদেশে রেখ বা শিখর-দেউল নির্মিত হইত, বিশেষভাবে পশ্চিম-বাংলায়, এই মন্দিরগুলি তাহার প্রমাণ।

প্রাচীন বাংলার রেখ বা শিখর-দেউলগুলি বিশ্লেষণ করিলে সহজেই ইহাদের সঙ্গে ভুবনেশ্বরের শত্রুঘ্নেশ্বর, পরশুরামেশ্বর, মুক্তেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের সাদৃশ্য ধরা পড়িয়া যায়, এবং কালের দিক হইতে যে ইহারা সমকালীন তাহা বুঝা যায়। স্পষ্টতই ইহারা লিঙ্গরাজ-মন্দিরের পূর্ববর্তী। তাহা ছাড়া, বাংলার মন্দিরগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়ে; ওড়িষ্যার মন্দিরগুলির মত এই মন্দিরগুলির কোনো জগমোহন বা ভোগমণ্ডপ কিছু নাই, আমলক সহ শিখর-শীর্ষ গর্ভগৃহই দেউলের একমাত্র অঙ্গ; অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে জগমোহনের পরিবর্তে সম্মুখ দিকের দেয়ালে একটি অলিন্দের সংযোজন আছে। ওড়িষ্যার লিঙ্গরাজ ও পরবর্তী মন্দিরগুলির ভূমি-নকসায় ও অলংকরণে যে বৈচিত্র্য ও জটিলতা তাহাও বাংলার মন্দিরগুলিতে নাই। বস্তুত, বাংলার মন্দিরগুলি ক্ষুদ্রকায়

হইলেও খুব মার্জিত ও সংযত রুচির পরিচয় বহন করে; চৈত্য-গবাক্ষ ও ক্ষুদ্রায়তন শিখরালংকার ছাড়া এই মন্দিরগুলির বিশেষ আর কোনো অলংকরণ নাই।

(৩) স্তূপশীর্ষ ভদ্র বা পীড়-দেউলের নিদর্শন প্রাচীন বাংলায় খুব বেশি দেখা যায় না। তবে, কেম্‌ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি-চিত্রে নালেন্দ্র নামক স্থানের লোকনাথ-মন্দিরের একটি প্রতিকৃতি আছে। এই প্রতিকৃতিতে এই ধরনের মন্দিরের অন্তত একটি নিদর্শন দৃষ্টিগোচর। চতুষ্কোন গর্ভগৃহের উপর ক্রমহ্রস্বায়মান ঢালু চালের কয়েকটি স্তর, তাহার উপর একটি বৃহদায়তন স্তূপ, এবং প্রত্যেকটি স্তরের চারিটি কোনে কোনে একটি একটি করিয়া ক্ষুদ্রাকৃতি স্তূপের অলংকরণ। ইট বা পাথরের তৈরী এই রীতির কোনো দেউল নির্মাণের কোনো সাক্ষ্য আমাদের সম্মুখে নাই, তবে নির্মিত যে হইত তাহার প্রমাণ এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রটি। ব্রহ্মদেশ-পাগানের অভয়দান এবং পাটোথাম্যা-মন্দির (একাদশ-শতক) দুটির স্থাপত্যরূপ ও রীতির পশ্চাতে যে এই ধরনের মন্দিরের অনুপ্রেরণা বিদ্যমান, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই।

(৪) শিখরশীর্ষ পীড় বা ভদ্র-দেউলেরও নির্মাণ-নিদর্শন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই; তবে একটি পাণ্ডুলিপি-চিত্রে পুণ্ড্রবর্ধনের বুদ্ধ-মন্দিরের যে প্রতিকৃতি আছে, এবং কয়েকটি প্রস্তর-ফলকে যে-ধরনের কয়েকটি মন্দির উৎকীর্ণ আছে তাহাতে অনুমান করা চলে যে, এই শিখরশীর্ষ পীড় বা ভদ্র-দেউলও বাংলাদেশে সুপ্রচলিত ও সুপরিচিত ছিল। এই ধরনের মন্দিরে চতুষ্কোন গর্ভগৃহের উপর স্তরে স্তরে ক্রমহ্রস্বায়মান চাল এবং সর্বোচ্চ চালটির উপর বক্র রেখায় একটি শিখর, শিখরের উপর আমলক-শিলা; এবং বৌদ্ধমন্দির হইলে আমলক-শিলার উপর একটি অতি ক্ষুদ্রকায় স্তূপের প্রতীক। শিখরের আকৃতি কোথাও হ্রস্ব, কোথাও দীর্ঘায়ত। ব্রহ্মদেশের পাগান সহরে একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় থাট্‌বিঞ্‌ঞু; টিহ্‌-লো-মিন্‌হ্‌-লো, শোয়েগু-জ্যি ও অন্যান্য অনেকগুলি মন্দিরের পশ্চাতে প্রাচীন বাংলার এই ধরনের মন্দিরের অনুপ্রেরণা বিদ্যমান।

· · ·

প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর গ্রামে এক বিরাট ধ্বংসস্তূপ উন্মোচন করিয়া একটি বিপুলকায় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। চারিদিকের কক্ষসারি লইয়া সুবিস্তৃত বিহারের ধ্বংসাবশেষ; তাহারই সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গনের কেন্দ্রস্থলে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। মন্দিরের চাল নাই, চূড়া নাই, চারিদিকের প্রাচীর পড়িয়াছে ভাঙিয়া; প্রদক্ষিণ পথ, পূজাকক্ষ, সমস্তই ইটে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; তবু এই বিরাট ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইহার গঠনরেখা ও রীতি ধীরে ধীরে অনুসরণ করিলে ইহার সামগ্রিক আকৃতি-প্রকৃতি ক্রমশ চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে। তখন

পাহাড়পুরের মন্দির

স্বীকার করিতে বাধা থাকেনা, এই মন্দির প্রাচীন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিস্ময়। ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে এই মন্দির পরিবার উজ্জ্বল

এবং রূপে ও রীতিতে তুলনাহীন না হইলেও এই জাতীয় আপাতজ্ঞাত সকল সর্বতোভদ্র মন্দিরের পুরোভাগে ইহার স্থান।

ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্রে 'সর্বতোভদ্র' নামে একশ্রেণীর মন্দিরের উল্লেখ ও পরিচয় আছে। এই ধরনের মন্দির চতুষ্কোন এবং চতুঃশালগৃহ, অর্থাৎ ইহার চারিদিকে চারিটি গর্ভগৃহ, এবং সেই গৃহে প্রবেশের জন্য চারিদিকে চারিটি তোরণ। শাস্ত্রানুযায়ী এই ধরনের মন্দির হইত পঞ্চতল, প্রত্যেক তলের ষোলোটি কোন অর্থাৎ চতুষ্কোনের প্রত্যেকটি বাহু সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া এক এক দিকে চারিটি (চারদিকে ষোলোটি) কোন রচনা, প্রত্যেক তল ঘিরিয়া প্রদক্ষিণ পথ এবং প্রাচীর; সমগ্র মন্দিরটি অলংকৃত হইত অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি শিখর ও চূড়ায়। পাহাড়পুরের সুবিস্তৃত মন্দিরটি এই সর্বতোভদ্র মন্দিরের উজ্জ্বল নিদর্শন। এই ধরনের সর্বতোভদ্র মন্দির ভারতের নানাস্থানে নিশ্চয়ই নির্মিত হইয়াছিল, নহিলে বাস্তুশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ থাকিবার কথা নয়; কিন্তু এক পাহাড়পুর ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোথাও এই ধরনের মন্দির আজ আর দৃষ্টিগোচর নয়, আর কোনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বোধ হয় মন্দির-স্থাপত্যের এই রূপ ও রীতি ভারতবর্ষে বহুল প্রচারিত ও অভ্যস্ত হইতে পারে নাই; তবে এই রূপ ও রীতি যে বহির্ভারতে, অন্তত প্রাচীন যবদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের মনোহরণ করিয়াছিল, এ-সম্বন্ধে সুপ্রচুর সাক্ষ্য বিদ্যমান। ব্রহ্মদেশে প্রাচীন পাগান সহরের চতুঃশাল থাট্‌বিঞ্ঞু বা সর্বজ্ঞ, সোয়েগু-জ্যি, টিহ্-লো-মিন্‌হ্-লো প্রভৃতি মন্দিরের পশ্চাতে এই ধরনের সর্বতোভদ্র মন্দিরের অনুপ্রেরণা ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। যবদ্বীপে প্রাম্বানাম নগরীর প্রাচীন লোরো-জোংরাং মন্দির, শিব-মন্দির প্রভৃতিও একই অনুপ্রেরণায় কল্পিত ও গঠিত। কালের দিক হইতে অষ্টম-শতকীয় পাহাড়পুর-মন্দির ইহাদের সকলের আদিতে।

স্বর্গত কাশীনাথ দীক্ষিত ও শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী মহাশয়দের আলোচনা-গবেষণার ফলে পাহাড়পুর মন্দিরের মৌলিক রূপ, প্রকৃতি ও গঠন আজ ধরিতে পারা সহজ হইয়াছে। এই সুবৃহৎ মন্দির উত্তর-দক্ষিণে ৩৫৬½ ফিট ও পূর্ব-পশ্চিমে ৩১৪¼ ফিট বিস্তৃত। মূলত মন্দিরটির ভূমি-নক্‌সা চতুষ্কোন; প্রত্যেক দিকের বাহু সম্মুখ দিকে একাধিকবার (তিনবার) বিস্তৃত করিয়া অনেকগুলি কোনের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং সমগ্র নক্‌সাটিকে সমান্তরালে প্রসারিত করা হইয়াছে চারিদিকে। মূল চতুষ্কোন নক্‌সাটির সমগ্র ভূমির উপর একটি শূন্যগর্ভ বিরাটকায় চতুষ্কোন স্তম্ভ সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে; ইহারই সর্বোচ্চে স্থাপিত ছিল মন্দিরের শীর্ষ কিন্তু সে-শীর্ষ এবং স্তম্ভটিরও উপরের অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, কাজেই শীর্ষটি কি শিখরাকৃতি ছিল, না ছিল স্তূপাকৃতি তাহা নির্ণয়ের কোনো উপায় আজ আর নাই। শূন্যগর্ভ দৈত্যকায় স্তম্ভটির দেয়াল অতি প্রশস্ত, কারণ চারিদিকের সমান্তরাল প্রসারের চাপ ও ভারের অনেকাংশ এই দেয়ালের উপর; এই চতুসংস্থান-সংস্থিত স্তম্ভটিই সমগ্র মন্দিরটির কেন্দ্র, ইহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রত্যেকটি

ক্রমহ্রস্বায়মান স্তর এবং স্তরোপরি প্রদক্ষিণ পথ ও প্রাচীর, চতুঃশালগৃহ, মণ্ডপ প্রভৃতি সমস্তই কল্পিত ও প্রসারিত। ভিত্তিস্তর বাদ দিলে মন্দিরটির সর্বসুদ্ধ ক'টি ক্রমহ্রস্বায়মান স্তর ছিল, বলা কঠিন। শাস্ত্রানুযায়ী সর্বসুদ্ধ পাঁচটি স্তর বা তল থাকিবার কথা; হয়তো তাহাই ছিল, কিন্তু আপাতত ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে ভিত্তিস্তরসহ মাত্র তিনটি। মন্দিরটি চতুর্মুখী অর্থাৎ সর্বতোভদ্র হওয়া সত্বেও ইহার প্রবেশ-তোরণ উত্তরদিকে। অঙ্গন হইতে সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলেই ভিত্তিস্তরের সমতলে একটি সুপ্রশস্ত চত্বর; এই চত্বর অতিক্রম করিলেই দক্ষিণতম প্রান্তে বেষ্টনী-প্রাচীরের তোরণ ভেদ করিয়া ভিত্তিস্তরের সর্বতোভদ্র প্রদক্ষিণ-পথে প্রবেশ। প্রদক্ষিণ-পথটি ঘুরিয়া চলিয়া গিয়াছে মন্দিরের চারিদিকে, এবং পথটির প্রান্ত বাহিয়া বেষ্টনী-প্রাচীর। এই প্রদক্ষিণ-পথের যে কোনো দিক হইতে সোপানশ্রেণী বাহিয়া হ্রস্বায়িত প্রথম তলে বা স্তরে আরোহণ করা যায়; এই স্তরেও একই প্রকারের প্রদক্ষিণ-পথ, বেষ্টনী-প্রাচীর, তদুপরি এক একদিকে এক একটি করিয়া মণ্ডপ। প্রথম তল হইতে সোপান বাহিয়া দ্বিতীয় তলে আরোহণ করিলেই স্পষ্টত বুঝা যায়, এই তলই সর্বপ্রধান তল, কারণ এই তলই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ, এই তলেই কেন্দ্রস্থিত শূন্যগর্ভ স্তম্ভটির চারিদিকে চারিটি গর্ভগৃহ এবং প্রত্যেক গর্ভগৃহের সম্মুখে এক একটি করিয়া বৃহৎ মণ্ডপ। সন্দেহ নাই, এই চারিটি গর্ভগৃহই ছিল প্রধান দেবগৃহ বা পূজাগৃহ, এবং সম্মুখের মণ্ডপে পূজারীরা নৈবেদ্য ইত্যাদি লইয়া সমবেত হইতেন। মণ্ডপ ও দেবগৃহ দক্ষিণে রাখিয়া চারিদিক ঘিরিয়া প্রদক্ষিণ-পথ এবং বেষ্টনী-প্রাচীর। এই তলের উপরে আর কোনো তল ছিল কিনা এবং সেই তলে কোনো পূজাগৃহ ছিল কিনা, বলা কঠিন; ইহার উপর আর যাহা কিছু ছিল সমস্তই ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই এই মন্দিরের উপরিভাগের আকৃতি-প্রকৃতি কি ছিল তাহা লইয়া কল্পনা-গবেষণা করা চলে, কিন্তু নিঃসংশয়ে কিছু বলা চলে না।

কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন, পাহাড়পুরে বোধ হয় একটি চতুর্মুখ জৈন-মন্দির ছিল, এবং এই চতুর্মুখ জৈন-মন্দিরটিই বোধ হয় ছিল পাহাড়পুর মন্দিরের মূল অনুপ্রেরণা। এ-অনুমান মিথ্যা না-ও হইতে পারে। এই ধরনের চতুর্মুখ বা সর্বতোভদ্র মন্দির ব্রহ্মদেশের প্রাচীন পাগান-নগরীতেও নির্মিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ বিদ্যমান। আনন্দ, সর্ব্বজ্ঞ, টিহ্-লো-মিন্হ্-লো প্রভৃতি মন্দিরেও দেখা যায়, কেন্দ্রে একটি বিরাটকায় চতুষ্কোন স্তম্ভ সোজা উঠিয়া গিয়াছে উপরের দিকে এবং শীর্ষে শিখর বা স্তূপ। এই স্তম্ভটির চারিদিকের চারিমুখে প্রত্যেক তলে চারিটি সুউচ্চ সুবৃহৎ কুলুঙ্গি কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে; প্রত্যেক কুলুঙ্গিতে বুদ্ধ প্রতিমা। প্রত্যেক দিকের তোরণদ্বার হইতে একটি সুদীর্ঘ অলিন্দ-পথ সোজা চলিয়া গিয়াছে প্রতিমার সম্মুখ পর্যন্ত, দুই দিকে সমান্তরালে আরো দুইটি অলিন্দ, এবং এই অলিন্দরেখাশ্রেণী ভেদ করিয়া কেন্দ্রীয় স্তম্ভটির চারদিক ঘিরিয়া একাধিক প্রদক্ষিণ-পথ চলিয়া গিয়াছে। পাহাড়পুর-

মন্দিরের বিন্যাসের সঙ্গে পাগানের এই জাতীয় মন্দিরগুলির বিন্যাসের সমগোত্রীয়তা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। এ-কথা সত্য যে, পাহাড়পুর-মন্দিরের কেন্দ্রীয় স্তম্ভে কোনো কুলুঙ্গি কাটা নাই; কিন্তু তাহার পরিবর্তে চারিদিকের দেয়ালের সম্মুখেই স্থাপনা করা হইয়াছে চারিটি গর্ভগৃহ ও মণ্ডপ। আসল কথা হইল কেন্দ্রীয় স্তম্ভটি এবং তাহাকে ঘিরিয়া চারিদিকের পূজাস্থান ও প্রদক্ষিণ পথ। এই রূপ চতুর্মুখ সর্বতোভদ্র মন্দিরের রূপ, এবং এই রূপই পাহাড়পুরে, পাগানে এবং লোরো-জোংরাংএ দৃষ্টিগোচর।

পোড়ামাটির ইটে, কাদার গাঁথুনীতে পাহাড়পুর-মন্দির তৈরী। বহিঃপ্রাচীরের দেয়ালের স্কন্ধে কিছু কিছু অলংকরণ এবং অগণিত পোড়ামাটির ফলক ছাড়া ঐশ্বর্য প্রচারের আর কোনো চেষ্টা নাই। মহাস্থানের গোকুল এবং গোবিন্দভিটার স্তূপেও কিছু কিছু এই ধরনের অলংকরণ ও মৃৎফলক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুরের ভিত্তিপ্রাচীরগাত্রে প্রস্তরফলক-নিদর্শনও অপ্রচুর নয়। এই সুবৃহৎ মন্দির একদিনে নির্মিত হয় নাই, বলাই বাহুল্য; বহুদিনের অনবসর চেষ্টায় এত বড় মন্দির নির্মাণ সম্ভব। পরবর্তীকালে নানা সময়ে নানা সংযোজনও হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমগ্র মন্দিরটির পরিকল্পনায় ও গঠনে এমন একটি সুসম সংহত সমগ্রতা আছে যে, মনে হয় মন্দিরটি আগাগোড়া একই ভাবনা-কল্পনার সৃষ্টি, এবং মোটামুটি একই সময়ে নির্মিত। খুব সম্ভব, নরপতি ধর্মপালই ইহার পোষক এবং তাঁহারই রাজত্বকালে সোমপুরের এই মন্দির ও বিহার রচিত হইয়াছিল। এই মন্দির ও বিহার প্রাচীন বাংলার গৌরব।

পাহাড়পুর-মন্দিরের সঙ্গে বহির্ভারতের পাগান, লোরো-জোংরাং প্রভৃতি স্থানের কোনো কোনো শ্রেণীর মন্দিরের সমগোত্রীয়তার কথা বলিয়াছি। কিন্তু শুধু পাহাড়পুর মন্দিরই নয়। প্রাচীন বাংলার যে কয়েকটি রূপ ও রীতির মন্দিরের কথা কিছু আগে বলিয়াছি সে-সব রূপ ও রীতির মন্দিরের সঙ্গে বহির্ভারতের বিশেষভাবে ব্রহ্মদেশের এবং যবদ্বীপের অনেক মন্দিরের একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সে-সব মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করিলে প্রাচীন বাংলার মন্দিরগুলির আকৃতি-প্রকৃতিও অনেকটা পরিষ্কার হইতে পারে। যে ক্রমহ্রস্বায়মান ঢালু চালের ভদ্র বা পীড় রীতির মন্দিরের কথা আগে বলিয়াছি, ব্রহ্মদেশে এই রীতি এক সময়ে সুপ্রচলিত ছিল, এবং পরেও সমস্ত মধ্যযুগ জুড়িয়া কাঠে ও ইটে, বেশির ভাগ কাঠে, এই ধরনের পায়াথাট বা প্রাসাদ-মন্দির প্রচুর নির্মিত হইত। পাগানের আনন্দ-মন্দিরের অনেকগুলি প্রস্তরফলকে পঞ্চতলে, সপ্ততলে এই ধরনের মন্দির উৎকীর্ণ আছে। এই পাগানেরই থিদগ-তাইক্ (ত্রিপিটক-)মন্দির ও মিমালউং চ্যাঙ্ মন্দির (একাদশ ও দ্বাদশ শতক) এই ধরনের মন্দিরের সুস্পষ্ট নিদর্শন। ক্ষুদ্রাকৃতি এবং একটি মাত্র পাথরে তৈরী এই ধরনের মন্দির যবদ্বীপের চণ্ডী-পানাতরমের প্রাঙ্গনে দুই চারিটি আজও বিদ্যমান। বলিদ্বীপে ও ব্রহ্মদেশে তো এই ধরনের ভদ্র বা

প্রাচীন বাংলা ও বহির্ভারতের মন্দির

পীড় দেউল আজও নির্মিত হয়, তবে সাধারণত কাঠে। এই ভদ্র বা পীড় শ্রেণীর মন্দির ছাড়া চতুষ্কোন গর্ভগৃহের উপর স্তূপ বা শিখরশীর্ষ ভদ্র বা পীড় দেউল তো প্রাচীন ব্রহ্মদেশের চিত্তই হরণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, এবং তাহা প্রায় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতেই। প্রোম্-হ্মজার ষষ্ঠ-সপ্তম শতকীয় বেবে, লেমে'থ্না, ইয়াহানদা-গু প্রভৃতি মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া পাগানের একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় স্তূপশীর্ষ পাটোথাম্যা ও অভয়দান এবং শিখরশীর্ষ আনন্দ, সর্বজ্ঞ, থিট্সোয়াদা, টিহ্-লো-মিন্হ-লো মন্দির পর্যন্ত সমস্তই এই ধরনের দেউলের সুউজ্জ্বল নিদর্শন। তাহা ছাড়া, হ্মজা ও পাগানের প্রচুর মৃৎ ও প্রস্তর-ফলকে এই ধরনের মন্দিরের উৎকীর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান। যবদ্বীপের স্তূপশীর্ষ চণ্ডী-পাওন মন্দিরও এই রীতিরই অন্যতম নিদর্শন। বলা বাহুল্য, প্রাচীন প্রাচ্যদেশ, বিশেষভাবে প্রাচীন বাংলাদেশই এই সব বহির্ভারতীয় প্রচেষ্টার মূল অনুপ্রেরণা।

উপরোক্ত চারিপ্রকারের মন্দিরশৈলী ছাড়া খননাবিষ্কারের ফলে প্রাচীন বাংলার আরও কয়েকটি এমন মন্দিরের অস্তিত্ব জানা যায় যাহা কোনো শ্রেণী-চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় না। এই মন্দিরগুলির যে কিছু সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, এমন নয়; তবু ইহাদের কথা না বলিলে মন্দির-কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। দিনাজপুর জেলার বৈগ্রামে যে-মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান সে-মন্দিরটি বোধ হয় ৪৪৮-৪৯ খ্রী তারিখের গুপ্ত-পট্টোলীকথিত শিবনন্দী-মন্দির। ভূমি-নক্সা হইতে মনে হয়, ইহার গর্ভগৃহ ছিল চতুষ্কোন এবং চারিদিক ঘিরিয়া ছিল প্রদক্ষিণ-পথ; পশ্চিম দিকে ছিল ইহার প্রবেশ তোরণ। চালের কি যে ছিল রূপ বলিবার কোনো উপায় নাই। গুপ্ত-আমলের এক ধরনের মন্দিরে যে প্রদক্ষিণ-পথযুক্ত চতুষ্কোন গর্ভগৃহ এবং সমতল চালের রীতি প্রচলিত দেখা যায়, এই মন্দিরটি সেই রীতির হওয়া বিচিত্র নয়।

মহাস্থানের আশে পাশেও দুই চারিটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার বৈরাগী-ভিটায় পাল-আমলের দুইটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান; ইহাদের মধ্যে একটির ভূমি-নক্সা যে প্রাচীন বাংলার সুঅভ্যস্ত ও সুপরিচিত প্রসারিত চতুষ্কোন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। মহাস্থানের গোবিন্দ-ভিটায়ও কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর; ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মন্দির গুপ্ত-আমলের হওয়াও অসম্ভব নয়; কিন্তু আজ আর ইহাদের মৌলিক রূপ সম্বন্ধে কিছুই বলিবার উপায় নাই। এই স্থানেরই গোকুল-পল্লীতে সুবৃহৎ মেড়স্তূপে এক সময় একটি অতিকায় মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল; খননাবিষ্কারের ফলে আজ শুধু তাহার ভিত্তিভূমির কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভিত্তিভূমির বিন্যাস ঠিক একটি মাকড়সার জালের মতন করিয়া বোনা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোন কোষকক্ষের সমষ্টি মাত্র। একটু মনোযোগে বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে দেরী হয় না যে, এই কোষকক্ষের জালের পরিকল্পনা শুধু বৃহৎ পরিকল্পনার একটি মন্দিরের ভিত্তি-ভূমিকে দৃঢ় করিয়া গড়িবার জন্য। মন্দিরটির ভূমি-নক্সা শুধু ধরা যায়, আর কিছুই

বিদ্যমান নাই। বহু বাহুবিশিষ্ট এই ভূমি-নক্‌সার বহু কোন, এবং ইহাদের মধ্যে বিধৃত একটি সুবৃহৎ বৃত্ত। এই বৃত্তের চারিপাশ ঘিরিয়া নিরেট চারিটি সুপ্রশস্ত দেয়াল, এবং এই দেয়াল চারিটির উপরই ছিল মন্দিরটির স্থাপনা। দেয়াল এবং বৃত্তের ফাঁক ভরাট করা হইয়াছে সমান্তরালে দেয়ালের পর দেয়াল গাঁথিয়া এবং মাটি ভরাট করিয়া। এ-সমস্তই যে মন্দিরটির ভিত্ সুদৃঢ় করিয়া গড়িবার জন্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সুবৃহৎ মন্দিরের কি যে ছিল আকৃতি-প্রকৃতি তাহা বুঝিবার এতটুকু উপায় আজ আর নাই।

সমসাময়িক ওড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে বা পুরী-কোনারকে, বা মধ্য-ভারতের খাজুরাহোতে, ব্রহ্মদেশের পাগানে বা যবদ্বীপের প্রাম্বানাম-পানাতরমে, কাম্বোজের আঙ্কোর-থোমে বা দক্ষিণ-ভারতের কাঞ্চীপুরে বা অন্যত্র যে সুবিস্তৃত মন্দির-নগরীর কথা আমরা জানি, প্রাচীন বাংলার কোথাও সে ধরনের সুবিস্তৃত মন্দির-নগরীর পরিচয় পাইতেছি না। প্রত্নসাক্ষ্যই হোক্ আর সাহিত্য বা লিপি-সাক্ষ্যই হোক্, সমস্ত সাক্ষ্যেরই ইঙ্গিত যেন বিচ্ছিন্ন দুই চারিটি মন্দিরের দিকে, এবং সে-মন্দিরও খুব বৃহদায়তন নয়। বস্তুত, এক পাহাড়পুর এবং গোকুলের মন্দির দু'টি এবং হয়তো আরও দুই চারিটি ছাড়া বৃহৎকল্পিত, বিস্তৃতায়তন মন্দিরের কথা বড় একটা জানা যায় না, অন্তত প্রত্নসাক্ষ্যে তেমন প্রমাণ নাই। মনে হয়, অধিকাংশ মন্দিরই ছিল স্বল্পায়তন। বস্তুত প্রাচীন বাংলায় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বৃহৎ দুঃসাহসী কল্পনা-ভাবনা, বৃহৎ কর্মশক্তি বা গভীর গঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় খুব বেশি নাই; গ্রাম্য কৃষিনির্ভর জীবনে সে-সুযোগও ছিল স্বল্পই। স্থাপত্যেই শুধু নয়, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাঙালী খুব বৃহৎ দুঃসাহসী কল্পনা-ভাবনার দিকে কোথাও অগ্রসর হয় নাই, খুব প্রশস্ত ও গভীর গঠনকর্মে নিজের প্রতিভাকে নিয়োজিত করে নাই। ইহার কারণ দুর্বোধ্য নয়। তাহার কৃষিনির্ভর জীবনের অর্থসম্বল ছিল পরিমিত, চিত্তসমৃদ্ধি ছিল ক্ষীণায়ত, এবং বৃহৎ, গভীর দুঃসাহসী জীবনের গভীর ও ব্যাপক উল্লাসের কোনো গভীর ও প্রশস্ত স্পর্শ সে-জীবনে লাগে নাই। কাজেই শিল্পেও সে-পরিচয় নাই।

চতুর্দশ অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—বাংলার ভাস্কর্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (আশুতোষ চিত্রশালা)।

*ক্ষিতিমোহন সেন—লোচনের রাগতরঙ্গিনী, বিশ্বভারতী পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)।

*প্রবোধচন্দ্র বাগচী—চর্যাগীতি, বিশ্বভারতী পত্রিকা (ত্রৈমাসিক), কার্তিক-পৌষ, ১৩৫২।

Dikshit, K. N.—Evcavations at Paharpur. Arch. Sur. Memoir, 55. 1938.

*Kramrisch, Stella—Pala and Sena Sculptures, *in* Rupam. October, 1929.

" " —Nepalese Paintings, *in* Journ. of the Indian Soc. of Oriental Art. Vol. I.

" " —Indian Terracottas " " Vol. VII.

*Ray, Niharranjan—Chaps. on Sculpture and Painting, *in* History of Bengal, Vol I. Dacca University.

Sarasvati, S. K.—Early Sculpture of Bengal, *in* Journal of the Dept. of Letters, C. U. XXX

" " —Temples of Bengal, *in* Journ. of the Indian. Soc. of Oriental Art, Vol. II.

* „ „ —Chap. on Architecture, *in* History of Bengal. Vol. I, Dacca University

*তারকাচিহ্নিত রচনাগুলি হইতে আমি বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

শেষ কথা

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইতিহাসের ইঙ্গিত

ইতিহাসের যুক্তি দিয়া এই গ্রন্থের সূচনা; সেই যুক্তিকেই বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি পর পর তেরোটি অধ্যায় জুড়িয়া। এই সুবিস্তৃত তথ্যবিবৃতি ও আলোচনার ভিতর হইতে ইতিহাসের কোন্ কোন্ ধারা সরু মোটা রেখায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, নিবরচ্ছিন্ন সমগ্র প্রবাহটির কোথায় কোন্ বাঁক দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এই সুবিস্তৃত কালখণ্ড পরবর্তী কালখণ্ডের জন্য কি কি বস্তু উত্তরাধিকার স্বরূপ রাখিয়া যাইতেছে, ভবিষ্যতের কোন্ নির্দেশ দিয়া যাইতেছে, এক কথায় এই সুবৃহৎ গ্রন্থ ভেদ করিয়া ইতিহাসের কোন্ ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিতেছে, গ্রন্থশেষে একটি অধ্যায়ে তাহার আলোচনা উপস্থিত করা হয়তো অসঙ্গত নয়। এতক্ষণ ছিলাম ঘনবৃক্ষবিন্যস্ত গহন অরণ্যের মধ্যে, এখন দূরে দাঁড়াইয়া বাহির হইতে সমস্ত অরণ্যটির আকৃতি-প্রকৃতি এবং উহার সমগ্র জীবন-প্রবাহের ধারাটি সংক্ষেপে একটু ধরিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এই চেষ্টার উদ্দেশ্য প্রাচীন বাঙালীর জীবন-প্রবাহের উপরিভাগের ছোটবড় তরঙ্গগুলির পরিচয় লওয়া নয়; সে-কাজ তো সুদীর্ঘ গ্রন্থ জুড়িয়াই করিয়াছি। বরং আমার উদ্দেশ্য সেই প্রবাহের গভীরে কোন্ আবর্ত ঘূর্ণ্যমান, কোন অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্রোতের সঞ্চরণ, কোন্ কোন্ শক্তি সক্রিয় তাহা জানা ও বুঝা, সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ ও বস্তুপুঞ্জকে সংহত করিয়া একটি গভীর ও সমগ্র দৃষ্টিতে দেখা, প্রাচীন বাঙালী জীবনের মৌলিক ও গভীর চরিত্রটিকে ধরিতে চেষ্টা করা। এই জানা ও বুঝা, দেখা ও ধরা ঐতিহাসিকের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।

এই গ্রন্থের যুক্তিপর্যায় অনুসরণ করিয়াই একে একে তাহা করা যাইতে পারে। কিন্তু আলোচ্যপ্রসঙ্গে আমি আর কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করিব না, করিবার প্রয়োজনও নাই, কারণ সে-সব সাক্ষ্যপ্রমাণ এই গ্রন্থের পূর্বোক্ত তেরোটি অধ্যায়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। আমার মন্তব্যগুলি প্রায় সমস্তই প্রত্যক্ষভাবে সে-সব সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; তবে কিছু কিছু এমন মন্তব্যও আছে যাহা শুধু সাক্ষ্য-প্রমাণের পরোক্ষ ইঙ্গিত, অথবা যাহা অনুমানসিদ্ধ মাত্র। ইতিহাসে এই ধরনের ইঙ্গিত বা অনুমানের স্থান নাই, এমন বলা চলে না।

১

আজ আমরা যাহাদের বাঙালী বলিয়া জানি তাহারা সকলেই একই নরগোষ্ঠীর লোক নহেন, এ-তথ্য সর্বজনবিদিত ; বিচিত্র নরগোষ্ঠীর লোক লইয়া বৃহত্তর বাঙালী জনের গঠন। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, বাংলাদেশে বহুদিন পর্যন্ত ইহাদের অধিকাংশই ছিল কোমবদ্ধ, গোষ্ঠীবদ্ধ জন, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইহারা একান্ত কৌমজীবনেই অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। এক একটি কোম এক একটি বিশিষ্ট স্থান লইয়া মোটামুটি ভাবে স্ব-স্বতন্ত্রপরায়ণ স্ব-সম্পূর্ণ জীবন যাপন করিত, অন্য কোমের সঙ্গে যোগাযোগ বড় একটা থাকিত না, বিধিনিষেধের বাধাও ছিল নানা প্রকারের। তাহার ফলে এই সব বিচিত্র কোমের মধ্যে বৃহত্তর জনচেতনা বলিয়া কিছু গড়িয়া উঠিবার সুযোগ বিশেষ ছিলনা, সমাজগঠনে তাহার প্রভাব তো দূরের কথা। পরবর্তী কালে সভ্যতা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, নানাপ্রকারের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের ফলে এই সব বিচিত্র কোমের মধ্যে নানাপ্রকারের আদান প্রদান চলিতে থাকে, এবং তাহারই ফলে বৃহত্তর অঞ্চলকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ কোমের একত্র সমবায়ে বৃহত্তর কোমের (বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ, পুণ্ড্রাঃ, সুহ্মাঃ ইত্যাদির) উদ্ভব ঘটে। কিন্তু বৃহত্তর কোম বা এই সব জন গড়িয়া ওঠার পরও কৌমসত্তা ও কৌমস্মৃতি কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে এই কৌমচেতনা পূর্বাপর সর্বত্র সক্রিয় ; সমাজের বর্ণ, বৃত্তি ও শ্রেণী-বিন্যাসে, অর্থ উৎপাদন ও বণ্টনে, গ্রাম ও নগরের বিভিন্ন পল্লীর বিন্যাসে, রাষ্ট্রগত ক্রিয়াকর্মে, এমন কি যুদ্ধবিগ্রহে, ধর্মকর্মে, এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই কৌমচেতনার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল ; ক্ষুদ্র বৃহৎ কোম এবং গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের সমস্ত ভাবনা-কল্পনা, সমস্ত ক্রিয়াকর্ম আবর্তিত হইত। অন্তত, প্রাচীন বাংলার শেষ পর্যন্ত এই কৌমচেতনা সমভাবে বিদ্যমান, এমন কি মধ্যযুগেও। এখনও তাহা নাই এমন বলা চলে না। বস্তুত, বাংলাদেশের ইতিহাসের গভীরে তাকাইয়া যদি বলা যায়, এই কৌমস্মৃতি ও কৌমচেতনা আজও বহমান তাহা হইলে খুব অন্যায় বলা হয় না।

কৌমচেতনা

কৌমস্মৃতি ও কৌমচেতনার সঙ্গে প্রায় অঙ্গাঙ্গী জড়িত আঞ্চলিক স্মৃতি ও আঞ্চলিক চেতনা। রাঢ়াঃ, সুহ্মাঃ, বঙ্গাঃ, গৌড়াঃ, পুণ্ড্রাঃ প্রভৃতি যে-সব জনদের কথা সাহিত্যে ও লিপিমালায় পড়িতেছি, সে-সব জনেরাই তো এক একটি অঞ্চলকে আশ্রয় করিয়া ক্রমশ ক্রমশ রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র বৃহৎ জনপদকে একটি বৃহত্তর প্রান্ত বা দেশখণ্ডে একত্র ও সমন্বিত করিয়া তাহাকে একটা

আঞ্চলিক চেতনা

সমগ্র রূপ দিবার সজাগ চেষ্টা অন্তত শশাঙ্কর সময় হইতেই দেখা দিয়াছিল এই পাল-সম্রাটেরা ও পরবর্তী কালে সেন-রাজারাও এ-সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। পাল-সম্রাটেরা তো বৃহত্তরের স্বপ্নও দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাধারণভাবে প্রান্ত বা দেশের সামগ্রিক ঐক্যচেতনা জনসাধারণের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, অন্তত প্রাচীন বাংলায় তেমন প্রমাণ বিশেষ নাই। পাল ও সেন-বংশের রাজারা যখন গৌড়েশ্বর বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন তখনও সাহিত্যে ও লিপিমালায়, তথা জনসাধারণের চিত্তে যে স্মৃতি ও চেতনা সক্রিয় তাহা বিশিষ্ট জনাশ্রিত বিশেষ বিশেষ জনপদের—রাঢ়ের, পুণ্ড্রের, সুহ্মের, বরেন্দ্রের, বঙ্গের, হরিকেলের, সমতটের। বস্তুত, প্রাচীন বাঙালী নিজেদের আঞ্চলিক জানপদ সত্তাকে বৃহত্তর দেশ বা প্রান্তসত্তায় মিশাইয়া দিতে বা দু'য়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করিতে শেখে নাই। আজও যে তাহা খুব সহজ হইয়াছে, এমন বলা চলে না। বস্তুত স্থানীয় আঞ্চলিক সত্তা ও বৃহত্তর দেশসত্তার বিরোধ শুধু যে বাংলার ইতিহাসেই সক্রিয় এমন নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের বৃহত্তর ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তাহাই, এবং কোনো কোনো ঐতিহাসিক ইতিপূর্বেই তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। একদিকে আমাদের চিন্তানায়ক, ধর্মগুরু এবং রাষ্ট্রবিধাতাদের কেহ কেহ সর্বভারতীয় চেতনাবোধটিকে সদাজাগ্রত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন নানা উপায়ে; অন্যদিকে ইঁহাদেরই অনেকে আবার আমাদের আঞ্চলিক সংকীর্ণ বুদ্ধিটিকে নানাভাবে পরিতুষ্ট ও পরিপোষণ করিয়াছেন। আমাদের ধর্ম ও অধ্যাত্ম-জীবনে একদিকে যেমন ঐক্য ও সাম্যের জয়গান তেমনই অন্যদিকে আবার নানা ভেদ-বৈষম্যের এবং অনৈক্যের সৃষ্টি। যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসে আঞ্চলিক চেতনা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, এবং এই চেতনার ফলেই সেই ইতিহাসে দেশের বা প্রান্তের সামগ্রিক বোধ কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এই আঞ্চলিক চেতনাই শশাঙ্ক বা পাল ও সেন-রাজাদের চেষ্টাকে পরিণামে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল।

পূর্বোক্ত কৌমচেতনা ও সদ্যোক্ত আঞ্চলিক চেতনা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে প্রধানত দুইটি কারণে—একটি কারণ ধনোৎপাদনপদ্ধতিগত, আর একটি রাষ্ট্রবিন্যাসগত।

এই দুই চেতনার পুষ্টির কারণ

প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের একেবারে আদিতে সামাজিক ধনের প্রধান উৎস ছিল শীকার, কৌম কৃষি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্প; দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ মোটামুটি খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত উন্নতপ্রণালীর কৃষি এবং গৃহশিল্প অর্থোৎপাদনের বড় উপায় ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রধানতম উপায় ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। কিন্তু শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ অষ্টম শতক হইতে আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত বাঙালী জীবন একান্তই ভূমি ও কৃষিনির্ভর। মোটামুটি ভাবে বলা চলে, স্বল্প কয়েকটি শতাব্দী ছাড়া

বাংলাদেশের ঐকান্তিক কৃষি ও ভূমি-নির্ভরতা কখনও ঘুচে নাই। ভূমি স্থির ও অবিচল, এবং সেই ভূমিকে আশ্রয় করিয়া যাঁহাদের জীবন ও জীবিকা তাঁহারা ভূমির অঞ্চলটিকে এবং সেই অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীটিকে আঁকড়াইয়া থাকিবেন, উহাদের কেন্দ্র করিয়াই তাঁহাদের ভাবনা-কল্পনা আবর্তিত হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়! অপর পক্ষে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যনির্ভর জীবনে ভূমির প্রতি আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত শিথিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে বণিক, সার্থবাহ, সদাগরদের দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত; তখনকার দিনে এক একবার ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইত দূরদেশে দেশান্তরে; গৃহের, পরিবারের কোম ও গোষ্ঠীর বন্ধন স্বতই হইয়া পড়িত শিথিল, গ্রামের ও অঞ্চলের বন্ধন হইত শিথিলতর। কিন্তু গ্রাম্য কৃষিনির্ভর জীবনে হইত তাহার বিপরীত। কাজেই সেই জীবনে পরিবারের, কোমের ও অঞ্চলের চেতনার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবার কোনো সুযোগ সম্ভাবনাই ছিল না; বরং তাহা আরও লালিত ও পুষ্ট হইবার সুযোগই ছিল বেশি।

ভূমিনির্ভর কৃষিজীবন

রাষ্ট্রবিন্যাসের ক্ষেত্রে কৌমতন্ত্র ধীরে ধীরে রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হইয়াছিল, এ-কথা রাষ্ট্রবিন্যাস অধ্যায়ে বলিয়াছি। কিন্তু এই বিবর্তন বাংলাদেশের সর্বত্র একই সময়ে একই সঙ্গে হয় নাই। পরাক্রমশালী রাজবংশের প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি কোম ও জন ধীরে ধীরে রাজতন্ত্রের সীমার মধ্যে আসিয়া স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু রাজতন্ত্র গড়িয়া ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের প্রায় অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সামন্ততন্ত্রও গড়িয়া উঠিয়াছিল। একটু বিশ্লেষণেই ধরা পড়িবে, এই সামন্তরা প্রায় সকলেই এক একজন পৃথক পৃথক এক একটি অঞ্চলের কৌম বা জননায়ক, এবং সেই সেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের লোকদের প্রাথমিক আনুগত্য আঞ্চলিক ও কৌমসামন্ত-নায়কটির প্রতি; দেশের বা প্রান্তের রাজা বা সম্রাট তাহাদের কাছে দূরাগত ধ্বনি মাত্র। বাংলার ইতিহাসের আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিন্যাসের এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাহার ফলে কৌমচেতনা ও আঞ্চলিক চেতনা লালন ও পুষ্টিলাভ করিবে ইহা কিছু বিচিত্র নয়।

২

বলিয়াছি, ইতিহাসের প্রথম পর্বে আদিবাসী জীবন একান্ত কোমবদ্ধ। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব কোম ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র বৃহৎ জনে বিবর্তিত হইতে থাকে। কিন্তু সকল কোমই একই সঙ্গে একই সময়ে সভ্যতার অধিকার লাভ করে নাই; শতাব্দীর পর শতাব্দীতে অতি ধীরে ধীরে এক একটি কোম সভ্যতার অধিকার পাইয়াছে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক একটি স্তর অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। তাহার ফলে বাংলা দেশের সর্বত্র এবং সমগ্র বাঙালী জীবন ব্যাপিয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির একই স্তর বা ক্রম বিস্তৃত নয়;

এমন কি একই সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও নয়—আজও নয়, প্রাচীন কালেও ছিল না। সুবিস্তৃত বাঙালী সমাজের একটি অংশ যখন উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্যে নিরত, আর একটি অংশ হয়তো তখনো কাঠের ফলার লাঙলে বা হাত-খুরপির সাহায্যে পাহাড়ের ঢালু গাত্র ধাপে ধাপে কাটিয়া সেখানে ধানের চাষ করিতেছে; একটি অংশ যখন বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিরত, উচ্চশ্রেণীর ধাতব মুদ্রায় কেনাবেচায় অভ্যস্ত, তখন হয়তো আর একটি অংশে মুদ্রা প্রচলিতই নয়, বিনিময়ে কেনাবেচা চলিতেছে, অথবা খুব বড় জোর কড়ি; একটি অংশে যখন ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের প্রচলন, উচ্চশ্রেণীর মনন ও কল্পনার প্রসার, আর একটি অংশে তখনও ভূতপ্রেতবাদ, যাদুশক্তিতে বিশ্বাস, গাছপূজা, পাথরপূজা প্রভৃতি নিরঙ্কুশ ভাবে চলিতেছে। অথবা, পাশাপাশি বাস করিবার দরুণ, একই সমন্বিত সমাজে বাস করিবার দরুণ একই অংশে একই সঙ্গে উন্নত ও আদিম কৃষি, ধাতব মুদ্রা ও বিনিময়ে কেনা বেচা, স্বর্ণমুদ্রা ও কড়ি, ব্রহ্মবাদ ও ম্যাজিক এমন অব্যাহত ও সহজভাবে চলিতেছে যেন ইহাদের মধ্যে বিরোধ কোথাও কিছু নাই! আজও যেমন প্রাচীন বাংলায়ও তেমনই ছিল, বরং আরও বেশিই ছিল। ইহার কারণ খুব সহজবোধ্য। তবু তাহা একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলা যাইতে পারে, কারণ আমাদের সমাজে এই চেতনা আজও খুব সজাগ নয়।

ইতিহাসের অসম গতি historical lag তাহার কারণ

আজিকার ভারতবর্ষে যে হিন্দুসমাজ ও ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দৃষ্টিগোচর তাহার ইতিহাস অনুসরণ করিলে দেখা যায়, এই সমাজ ও ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন স্তরের প্রাক্-আর্য ও অনার্য, কিছু কিছু বৈদেশিক নরগোষ্ঠীর সমাজ ও ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রাস বা আত্মসাৎ করিয়া করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, আজও তাহার বিরাম নাই। যে প্রাক্-আর্য বা অনার্য কোম যে সভ্যতা বা সংস্কৃতি-স্তরের সেই অনুযায়ী বৃহত্তর হিন্দু-সমাজে তাহার স্থান নির্ণীত হইয়াছে, এবং নানা বিধি-বিধান দ্বারা সেই স্থানটিকে সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা সজ্ঞানে সচেতনভাবে পারিপার্শ্বিকের সুযোগ সুবিধা লইয়া, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ঘটনা ও আবর্তের সাহায্য লইয়া সেই সব বিধি-বিধানকে অগ্রাহ্য করিয়া বৃহত্তর সমাজে স্থান লইতে পারিয়াছে তাহারা ক্রমশ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতেও অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সচরাচর তাহার সুযোগ-সুবিধা খুব বেশি ছিল না; বিধি-বিধানের প্রাচীর ছিল সুদৃঢ়। তাহার ফলে বৃহৎ হিন্দুসমাজ ও ধর্মের, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিতর নানা স্তর, নানা আকৃতি-প্রকৃতি, নানা রূপ, নানা বৈচিত্র্য, কিন্তু সব কিছুই একটা বৃহত্তর সীমার মধ্যে একীকৃত ও বহুলাংশে সমন্বিত।

বাংলাদেশ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলে, বরং আর্যস্থানবহির্ভূত পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ বলিয়া একটু বেশিই বলা চলে। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী জীবনের সর্বত্র ইতিহাসের রথচক্র সমান গতিতে চলে নাই, ভূমিও সমতল নয়। তাহার ফলে আমাদের সমাজের ও জীবনের

নানাস্থানে নানা অসমতা, অসংগতি ; কোথাও গতি একেবারে স্তব্ধ ও নিরস্ত, কোথাও খুব দ্রুত ও চঞ্চল, কোথাও আমরা চলিয়াছি সাম্প্রতিক প্রাগ্রসর পৃথিবীর সঙ্গে সমতালে, কোথাও পড়িয়া আছি প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতার মধ্যে! নানা স্তরের নানা অনুন্নত সমাজাংশকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির একই স্তরে আনিয়া সমতলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইতিহাসের গতিকে সহজ, সুসম ও সরল করিয়া দিবার কোনো বৈপ্লবিক চেষ্টা প্রাচীন বাংলায় হয় নাই, আজ অবধি হয় নাই ; এবং সেই জন্যই আজ ও অবনত বা অনুন্নত বর্ণ, শ্রেণী ও সংস্কৃতি-স্তর আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। ভাল মন্দ'র কথা নয়, ইতিহাসে যাহা ঘটিয়াছে বা ঘটে নাই, তাহাই বলিতেছি।

তবে, অবান্তর হইলেও এ-প্রসঙ্গে একটি কথা বলা উচিত। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, ভারতবর্ষের বাহিরে প্রায় সর্বত্রই সভ্য, সংস্কৃতিপূত মানবগোষ্ঠী চেষ্টা করিয়াছে বৃহৎ অনুন্নত আদিম মানবসমাজকে নানাপ্রকারে শোষণ ও পেষণ করিয়া নিঃশেষ করিতে অথবা একপাশে ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিতে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্যাপকভাবে সে-চেষ্টা কখনও হয় নাই, এ-কথা মোটামুটি নিঃসংশয়ে বলা চলে ; তবে, কখনও কখনও কোথাও কোথাও হয় নাই, অবশ্য এমন বলা যায় না। বাংলাদেশ ভারতের পূর্বপ্রত্যন্ত দেশগুলির অন্যতম, এবং এদেশে আদিবাসী কৌমসমাজের প্রতাপ এবং প্রাবল্যও ছিল বেশি। কাজেই, এদেশে মধ্য-ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনৈতিক বন্ধন কখনও আদিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং সমাজ ও অর্থনৈতিক বন্ধনকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারে নাই, ব্যাপকভাবে সে-চেষ্টাও করে নাই। যত নিম্নেই হোক্, বিধি-বিধানের বাধা-নিষেধের যত সুদৃঢ় প্রাচীর গড়িয়াই হোক্, হিন্দুসমাজ নিজের বৃহৎ সীমার মধ্যে তাহাকে স্থান দিয়াছে, তাহাকে ধারণ ও পোষণ করিয়াছে, এবং তাহার ফলে একটা বৃহৎ সমন্বয়ও গড়িয়া তুলিয়াছে—যত ধীরে ধীরেই হোক্, যত অসম গতিতেই হোক্।

তবু, স্বীকার করিতেই হয়,

> যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে।
> পশ্চাতে ফেলিছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে॥

কবি তো এখানে ইতিহাসের যুক্তির কথাই বলিতেছেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের বৃহৎ মানবগোষ্ঠীকে লইয়া যে বাঙালী-সমাজ, সে-সমাজের নিম্ন ও পশ্চাতের স্তর গুলি যে প্রতি মুহূর্তেই উচ্চতর স্তরকে নিম্নে ও পশ্চাতে টানিতেছে—প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগে টানিয়াছে, আজও টানিতেছে। এই শ্লথ, উপলব্যথিত গতি ইতিহাসের রথকে সম ও দ্রুততালে অগ্রসর হইতে দেয় নাই, সমাজদেহকে পঙ্গু ও রুগ্ন করিয়া রাখিয়াছে।

প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের এই অসম গতি পুষ্ট ও লালিত হইয়াছে প্রাচীন বাঙালীর বর্ণ ও শ্রেণী-বিন্যাসের সহায়তায়। আমাদের প্রাচীন বর্ণ-বিন্যাস বিশ্লেষণ

করিলেই দেখা যাইবে, উহার বিভিন্ন স্তর নির্ণীত হইয়াছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী, বৃত্তির স্তরচেতনা অর্থাৎ উচ্চনীচ ভাবনানুযায়ী। এই স্তরগুলি প্রত্যেকটি নানা বিধি-বিধান, বাধা-নিষেধের বেড়ায় ঘেরা, এবং সে-বেড়া ডিঙাইয়া উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া খুব সহজ নয়। কারণ, তাহার সঙ্গে আবার শ্রেণী-চেতনাও জড়িত। শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারের তারতম্যও আবার নির্ভর করিত এই বর্ণ, বৃত্তি ও শ্রেণী বিন্যাসের উপর। কাজেই একবার যাহার স্থান সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনো একটা বিশেষ স্তরে নির্ণীত হইয়া গিয়াছে, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার স্থান ছাড়িয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই; ইতিহাসও সেখানে স্তব্ধ ও নিরস্ত হইয়া গিয়াছে।

শ্রেণীবিন্যাস-অধ্যায়ে বলিয়াছি, প্রাচীন বাংলায় তথা ভারতবর্ষের সর্বত্রই শ্রেণী-চেতনার চেয়ে বর্ণচেতনা, কৌমচেতনা ছিল প্রবল। আর, শ্রেণীর সঙ্গে তো বর্ণ ও বৃত্তি অঙ্গাঙ্গী জড়িতই ছিল। বর্ণ ও বৃত্তি যেখানে অনেকাংশে জন্মগত সে-ক্ষেত্রে শ্রেণীও কতকাংশে অচল, অনড় হইবে, ইহা তো খুবই স্বাভাবিক। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সক্রিয় বিরোধ এই অনড়, অচল অবস্থাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বর্ণ ও বৃত্তিগত বাধা-নিষেধের প্রাচীর কিছুটা ধ্বসাইতে পারিত, সেই সক্রিয় বিরোধের কোনো প্রমাণ, এমন কি সে-সম্বন্ধে সজ্ঞান চেতনার সাক্ষ্যও প্রাচীন বাংলায় কিছু উপস্থিত নাই। যখন যে-শ্রেণী সামাজিক ধন যে-পরিমাণে বেশি উৎপাদন করিয়াছে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সেই পরিমাণে তাহারা প্রভাব অর্জন ও বিস্তার করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই পরিমাণে তাহারা অগ্রসর হইতে পারে নাই, সে-ক্ষেত্রে তাহারা স্বীকৃতিও লাভ করে নাই। আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব সত্ত্বেও শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও ভাবনা কল্পনার ক্ষেত্রে তাহারা নিম্নে ও পশ্চাতেই থাকিয়া গিয়াছে। কারণ, সেই স্থান তাহাদের বর্ণ ও বৃত্তিদ্বারা নির্দিষ্ট।

বর্ণ, বৃত্তি ও শ্রেণীগত যে-সব বাধা ইতিহাসের গতিকে শ্লথ বা নিরস্ত করিয়াছে সে-সব বাধার প্রাচীর কিছুটা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারিত যদি আমাদের সামাজিক ধনোৎপাদন পদ্ধতির উন্নত পরিবর্তন কিছু ঘটিত। আদিম কৌম জীবন ও সমাজের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল উন্নততর কৃষি ও উন্নততর শিল্পের প্রবর্তনে। তারপর যে বৃহত্তর জীবন ও সমাজের পত্তন হইল তাহারও প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারিত যদি আমাদের প্রাচীন কৃষি ও শিল্পের উন্নততর বিবর্তন কিছু ঘটিত। কিন্তু তাহা ঘটে নাই। মাঝখানে কয়েকটি সুদীর্ঘ শতাব্দী বাংলাদেশ ব্যবসা-বাণিজ্য আশ্রয় করিয়া একটা বৃহত্তর জীবনের আস্বাদন লাভ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিছু বাধাবন্ধন তাহাতে কাটিয়াছিল, ইতিহাসের গতিও কিছুটা বেগ ও প্রেরণা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও ব্যবসা-বাণিজ্য যাঁহারা করিতেন তাঁহারা সাধারণত বৃত্তি ও বর্ণ সীমাকে স্বীকার করিয়াই করিতেন। তাঁহাদের শ্রেণীচেতনা ছিল বর্ণ ও বৃত্তিচেতনার অধীন। কাজেই জীবন ও সমাজের মৌলিক

পরিবর্তন তাহাতে কিছু হয় নাই এবং সমাজ-প্রবাহের এখানে ওখানে নিরুদ্ধ জলাশয়, বদ্ধস্রোত খালবিখাল প্রভৃতি থাকিয়াই গিয়াছে।

৩

প্রাচীন বাঙালীর গ্রামকেন্দ্রিক জীবন ও গ্রামীণ সংস্কৃতি

বাংলার ইতিহাসের আদিপর্বে—এবং শুধু আদিপর্বেই নয়, সমস্ত মধ্যযুগ ব্যাপিয়া এবং বহুলাংশে এখনও—বাঙালী জীবন প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক, এবং বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রামীণ। গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন এবং তাহার সমস্ত ভাবনা-কল্পনা আবর্তিত হইত; কিছুদিন আগে পর্যন্তও ইহাই ছিল আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় কথা। ইহার কারণ বুঝিতে পারা কঠিন নয়।

প্রথম কারণ আমাদের কোমবদ্ধ আদিম জীবনধারা—যে-জীবনে প্রধান জীবনোপায় শীকার ও কৃষি এবং খুব ছোট ছোট গৃহশিল্প, এবং যাহার সমাজ-গঠনের প্রধান আশ্রয় গোষ্ঠী ও পরিবার। স্বভাবতই এই ধরনের জীবন শস্য ফলাইবার মাঠ, নদনদী, খালবিলের জলাশয় এবং অরণ্যকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া ওঠে, এবং এইভাবে গ্রামের পত্তন হয়। কৌমজীবনে পরিবার ও গোষ্ঠীবন্ধন স্বভাবতই প্রবল; এবং যেহেতু আগেই বলিয়াছি, আমাদের মধ্যে কৌমচেতনা আজও সক্রিয়ভাবে বহমান, সেই হেতু বৃহত্তর জনসমাজ গঠিত হওয়ার পরও আমাদের গ্রামকেন্দ্রিক ভাবনা-কল্পনা এবং সমাজবন্ধন কখনও ঘুচে নাই। কারণ, কৌমচেতনার আশ্রয়ই হইতেছে গ্রাম; এক একটি গ্রামকে আশ্রয় করিয়াই তো একটি প্রাচীন গাঞী, গোষ্ঠী, এবং গাঞী ও গোষ্ঠীবদ্ধ বিভিন্ন পরিবার।

কিন্তু এই গ্রামকেন্দ্রিকতার প্রধান কারণ আমাদের সামাজিক ধনোৎপাদন পদ্ধতি। নানা অধ্যায়ে বলিয়াছি, আমাদের প্রধান জীবনোপায়ই ছিল কৃষি এবং ছোট ছোট গৃহশিল্প। কৃষি একান্তই ভূমিনির্ভর। ছোট ছোট গৃহশিল্পে যাঁহারা নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহারাও প্রধানত না হউন আংশিকত কৃষকই, এবং তাঁহারাও সেইজন্যই একান্ত ভূমি-সংলগ্ন জীবনেই অভ্যস্ত ছিলেন। কৃষিভূমি তো সমস্তই গ্রামে; বস্তুত কৃষিভূমিকে আশ্রয় করিয়াই তো গ্রামগুলি গড়িয়া উঠিত। এই ভূমিই আবার গোষ্ঠী ও পরিবার-বন্ধনের আশ্রয়, অথবা একেবারে উল্টাইয়া বলা চলে, এক এক ভূম্যাংশ আশ্রয় করিয়াই এক একটি গোষ্ঠী ও পরিবার; এবং যেহেতু সেই ভূমি অনড়, অচল এবং সেই ভূমিই সকলের জীবিকাশ্রয় সেই হেতু গোষ্ঠী এবং পরিবারও স্থির এবং গোষ্ঠী ও পরিবারবন্ধনও দৃঢ়। তীর্থ পর্যটন, শিক্ষাদীক্ষা আহরণ, ধর্মপ্রচার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে যাইবার কোনো প্রয়োজন কাহারও হইত না; জীবিকা সংগ্রহ হইত গ্রামেই, এবং গ্রামগুলি সাধারণত ছিল স্ব-নির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই ধরনের উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতিতে জীবন

গ্রামকেন্দ্রিক হইবে ইহা কিছু বিচিত্র নয়, এবং যেহেতু জীবন গ্রামকেন্দ্রিক সেই হেতু আমাদের সংস্কৃতিও গ্রামীণ।

একাধিক অধ্যায়ে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, খ্রীষ্টোত্তর প্রথম-দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তত ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত, বিশেষ ভাবে চতুর্থ হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী বাংলাদেশ উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের অন্যান্য প্রান্তের সুবিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান অংশীদার হইয়াছিল এবং তাহার ফলে তাহার ঐকান্তিক কৃষি ও ভূমি-নির্ভরতায় কিছুটা ভাঁটা পড়িয়াছিল। বৃহত্তর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে গ্রাম ছাড়িয়া অন্তত কিছু কিছু লোককে কমবেশি সময়ের জন্য বিদেশে যাপন করিতে হইত; তাহার ফলে তাহাদের গ্রামকেন্দ্রিক গোষ্ঠী ও পরিবারবন্ধনও কিছুটা শিথিল হইয়া পড়িত, সন্দেহ নাই। যুদ্ধবিগ্রহ এবং হয়তো রাজকীয় কাজকর্মের প্রয়োজনেও কিছু কিছু লোককে স্বল্পকালের জন্য হইলেও দেশের বাহিরে যাপন করিতে হইত। তাহার ফলেও কর্ম ও ভাবনা-কল্পনার পরিধি কিছুটা বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং ধীর মন্থর গ্রাম্য জীবনস্রোতে বাহির হইতে কিছু তরঙ্গাভিঘাত লাগিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য গ্রাম্য গৃহশিল্পও নিশ্চয়ই কিছু কিছু বিস্তৃত হইয়া থাকিবে, এবং বৃহত্তর যৌথশিল্পগুলি নগরগুলিতে স্থানান্তরিতও হইয়াছিল। প্রধানত এই সব প্রয়োজনেই, এবং কিছুটা রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রয়োজনে প্রাচীন বাংলায় কিছু কিছু নগরের পত্তন হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণভাবে, বাঙালীর কৃষিনির্ভরতা কখনও একেবারে ঘুচে নাই; বণিক-ব্যবসায়ীরাও দেশ বিদেশ ঘুরিয়া গ্রামেই ফিরিয়া আসিতেন এবং অর্জিত ও সংগৃহীত ধন গ্রামেই ব্যয়িত ও বণ্টিত হইত—পরিবার ও গোষ্ঠীকে আশ্রয় করিয়া। নগরের যৌথশিল্পগুলিরও যোগান যাইত গ্রাম হইতেই এবং সে-অর্থের অন্তত একটা বৃহৎ অংশ গ্রামেই ফিরিয়া আসিত। এই সব কারণে বাংলায় যে-সব নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলিকেও আকৃতি-প্রকৃতিতে বৃহত্তর ও সমৃদ্ধতর গ্রামছাড়া আর কিছু বলা চলে কিনা সন্দেহ। কিন্তু অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলায় এবং উত্তর-ভারতের প্রায় সর্বত্রই বৃহত্তর ব্যবসা-বাণিজ্যস্রোতে ভাঁটা পড়িয়া যায়, এবং বাঙালী জীবন আবার একান্তভাবে কৃষিনির্ভর হইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। তাহার ফলে জীবনে ঐকান্তিক গ্রামকেন্দ্রিকতাও বাড়িয়া যায়, এবং আদিপর্বের শেষের দিকে ও মধ্যযুগে তাহা ক্রমবর্ধমান। বৃহত্তর, সংগ্রামমুখর, উল্লাস-উতরোল জীবনের স্পর্শও সেইজন্যই বাঙালীর গ্রামীণ সংস্কৃতির স্রোতে কোনো বৃহৎ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে নাই, তাহার তটরেখাকে প্রসারিত বা প্রবাহকে গভীর গম্ভীর করিতে পারে নাই। বৃহত্তের, গভীরতার এবং ভাব ও মননসমৃদ্ধির যেটুকু পরিচয় প্রাচীন বাঙালীর সংস্কৃতিতে দৃষ্টিগোচর তাহা সর্বভারতীয় সংস্কৃতি এবং বৃহত্তর শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যগত জীবনোপায়ের দান।

৪

এই গ্রন্থের নানা অধ্যায়ের আলোচনায় সমাজেতিহাসের একটি ইঙ্গিত অত্যন্ত প্রশস্ত ভাবে ধরা পড়িয়াছে। আমার মনে হয়, এই ইঙ্গিতটিই প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ইঙ্গিত। সেই জন্যই এই ইঙ্গিতটিকে সংহত সমগ্রতায় এখানে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিতেছি; এই ইঙ্গিত সামাজিক ধনোৎপাদন ও বণ্টনপদ্ধতিগত, সামাজিক ধনের গতি ও প্রকৃতিগত।

খ্রীষ্টপূর্ব শতকীয় বাংলার আদিম কৌমস্তরে সামাজিক ধনের উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি কি ছিল ও তাহার ক্রমবিবর্তন কি ভাবে হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই; তবে আদিম সমাজের গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী কি হওয়া সম্ভব সে-সম্বন্ধে অনুমান করা খুব কঠিন নয়; এবং তাহা এই গ্রন্থেরই নানা অধ্যায়ে ব্যক্ত করিয়াছি। কাজেই, সেই সুদূর কালসম্বন্ধে অনুমানসিদ্ধ তথ্যের পুনরুক্তি এখানে আর করিতেছিনা। তবু, একথা বলা বোধ হয় প্রাসঙ্গিক যে, মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতক পর্যন্ত গাঙ্গেয় ও প্রাচ্য ভারতবর্ষের প্রধান ধনোৎপাদন উপায় ছিল কৃষি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ও যৌথ গৃহশিল্প এবং কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য। ধন কেন্দ্রীকৃত হইত বড় বড় গৃহপতিদের এবং শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহদের হাতে। জাতকের গল্প ও অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে নানাপ্রমাণ এ-সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত, এবং মনীষী রিচার্ড ফিক্ তাহা খুব ভাল করিয়াই দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের পুরাপুরি সুবিধাটা গাঙ্গেয় ও প্রাচ্য-ভারত অপেক্ষা বেশি পাইত উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য-ভারত। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, পুণ্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্তি, পাটলীপুত্র প্রভৃতি সত্ত্বেও প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দরগুলি ছিল বেশির ভাগই উত্তর-পশ্চিমে, মধ্য-ভারতে এবং বিশেষ ভাবে পশ্চিম-ভারতের সমুদ্রোপকূলে। বস্তুত, সমসাময়িক ভারতবর্ষের সমস্ত বাণিজ্যপথগুলির গতি একান্তই পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমমুখী। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা যতই থাকুক, শ্রেষ্ঠী-সার্থবাহদের কথা যতই পড়া যাক্, প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে বাকী থাকেনা যে, অন্তত গাঙ্গেয় ও প্রাচ্য-ভারতে জীবন ছিল একান্তই কৃষিকেন্দ্রিক। ব্যবসা বাণিজ্য সাধারণত বোধ হয় বিনিময়েই চলিত; চিহ্নাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন যথেষ্ট ছিল, পাওয়াও গিয়াছে প্রচুর, কিন্তু তাহার ভিতর স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা প্রায় দেখিতেছিনা। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, ব্যবসা-বাণিজ্য সত্ত্বেও আধুনিক ধনবিজ্ঞানের ভাষায় আমরা যাহাকে বলি বাণিজ্যসাম্য বা ব্যালেন্স অফ্ ট্রেড্, তাহা ভারতবর্ষের স্বপক্ষে ছিল না, অথবা থাকিলেও স্বর্ণ এবং রৌপ্য (মুদ্রার আকারেই হোক্ আর তালের আকারেই হোক্)

সামাজিক ধন উৎপাদন ও বণ্টন

কেন্দ্রীকৃত হইয়া থাকিত মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, গৃহপতি প্রভৃতি এবং রাষ্ট্রের হাতেই, অর্থাৎ সামাজিক ধন সমাজের সকল স্তরে বণ্টিত হইত না, ছড়াইয়া পড়িবার বেশি উপায় ছিলনা; উদ্বৃত্ত ধনের পরিমাণও বোধ হয় খুব বেশি ছিল না।

বাংলাদেশ গাঙ্গেয় ভারতের অন্যতম পূর্বপ্রত্যন্ত দেশ। পুণ্ড্রবর্ধনের মত বাণিজ্য-নগর এবং তাম্রলিপ্তির মতন বন্দর-নগর তাহার ছিল সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও উত্তর-ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলার এবং তদানীন্তন বাঙালীর স্থান খুব বেশি ছিল বলিয়া মনে হয় না, কারণ বাঙালীর সমাজ তখনও একান্তই কৌমবদ্ধ এবং সর্বভারতীয় সভ্য জীবনের তরঙ্গাভিঘাত তখনও ভাল করিয়া সেই সমাজে লাগেই নাই। বহুদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ ছোট ছোট গৃহশিল্প, শীকার, পশুপালন ও কৃষিলব্ধ জীবনোপায়েই অভ্যস্ত ছিল; কিছু কিছু বহির্দেশী ব্যবসা-বাণিজ্য যাহা ছিল তাহা উত্তর-গাঙ্গেয় ভারতের সঙ্গে তুলনীয় নয়, এমন কি খুব উল্লেখযোগ্যও বোধ হয় নয়।

খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের মাঝামাঝি হইতেই ভারতবর্ষের সর্বত্র এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন আরম্ভ হয়, এবং সামাজিক ধন উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া, জীবনধারণের মান উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে ভারতবর্ষ যথার্থত সোনার ভারতে পরিণতি লাভ করে; এই দুই শতাব্দী জুড়িয়া যথার্থত এবং আক্ষরিক অর্থে ভারতবর্ষে স্বর্ণযুগের বিস্তৃতি। এই বিবর্তন-পরিবর্তনের প্রধান কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি; বস্তুত, এই কয়েক শতক ধরিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমবর্ধমান, এবং এই ব্যবসা-বাণিজ্যই সামাজিক ধনোৎপাদনের প্রধান উপায়। বস্তুত, খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের মাঝামাঝি হইতে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত সুবিস্তৃত রোম-সাম্রাজ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। তাহার আগেও বহুশতাব্দী ধরিয়া পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে জলপথে ভারতবর্ষের একটা বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল, এই দেশগুলিতে ভারতীয় নানা দ্রব্যাদির চাহিদাও ছিল; কিন্তু বাণিজ্যটা প্রধানত ছিল আরব বণিকদের হাতে। কিন্তু মোটামুটি ৫০ খ্রীষ্ট তারিখ হইতে নানা কারণে রোম সাম্রাজ্য এবং ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে এই বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইবার সুযোগ লাভ করে, এবং দেশে ধনাগমের একটি স্বর্ণদ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয়। বস্তুত, এই বাণিজ্য ব্যাপারে সাক্ষাৎভাবে আমাদের দেশ এত লাভবান হইতে আরম্ভ করে, এত রোমক সোনা বহিয়া আসিতে আরম্ভ করে যে, দ্বিতীয় শতকে ঐতিহাসিক প্লিনি অত্যন্ত দুঃখে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যে-ভাবে ভারতবর্ষে সোনা বহিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে এ-ভাবে বেশিদিন চলিলে সমস্ত রোমক সাম্রাজ্য স্বর্ণহীন, রক্তহীন হইয়া পড়িবে! সিন্ধুদেশের সমুদ্রোপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গা-বন্দর ও তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত সমস্ত উপকূল বাহিয়া কুড়িটিরও বেশি ছোট বড় সামুদ্রিক বন্দর, প্রতি বন্দরে বৈদেশিক বাণিজ্যোপনিবেশ। এই সব বন্দর, বিশেষভাবে পশ্চিম-ভারতের ভৃগুকচ্ছ

বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবর্তন ও সামাজিক ধন

সুরাষ্ট্র, কল্যাণ প্রভৃতি বন্দর আশ্রয় করিয়া জাহাজে জাহাজে রোমক সোনার স্রোত বহিয়া আসিত ভারতবর্ষের সর্বত্র। বস্তুত, পশ্চিম-ভারতের এই স্বর্ণদ্বারের অধিকার লইয়াই তো শক-সাতবাহন সংগ্রাম, দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্তের পশ্চিম-ভারত অভিযান, স্কন্দগুপ্তের বিনিদ্র রজনী যাপন। কারণ, এই দ্বার করচ্যুত হওয়ার অর্থই হইতেছে দেশে ধনাগমের একটি প্রশস্ত পথ বন্ধ হওয়া। দক্ষিণ-ভারতের দ্বার ছিল অনেক, কাজেই দুর্ভাবনার কারণ ছিলনা; কিন্তু উত্তর-ভারতের প্রধান পথ ঐ গুজরাটের বন্দরগুলি, আর স্বল্পাংশে গঙ্গা ও তাম্রলিপ্তি বন্দর। এই বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যলব্ধ স্বর্ণই গুপ্ত আমলের স্বর্ণ-যুগের ভিত্তি। এবং এই সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মনন ও কল্পনা, ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলা ও সাহিত্যে ভারতীয় জীবনের যে বিস্তৃতি, বৃহত্তর গভীরতর জীবনের যে আস্বাদন তাহার মূলেও যে বহুলাংশে এই স্বর্ণ বা সামাজিক ধন, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। এই সুবৃহৎ বাণিজ্যই বৃহৎ ও গভীর চেতনা সঞ্চারের মূলে, জীবনধারণের মানকে উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ করিবার মূলে; এই মান উন্নত না হইলে, চেতনা সঞ্চারিত না হইলে সাংস্কৃতিক জীবন উন্নত হয় না।

শুধু এই সামুদ্রিক বাণিজ্যই নয়। বহু প্রাচীন কাল হইতেই উত্তর-পূর্ব চীনের পূর্বতম সমুদ্রোপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য-এশিয়ার মরুভূমি পার হইয়া পামীরের উষ্ট্রপৃষ্ঠ বাহিয়া আফ্‌গানিস্থানের ভিতর দিয়া ঈরাণ-দেশ অতিক্রম করিয়া একেবারে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ আন্তরেশীয় প্রান্তাতিপ্রান্ত পথ সেই পথ দিয়া একটা বৃহৎ বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। প্রথম-চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পশ্চিমাভিযানের ফলে ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম এই পথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং তাহার কিছুদিন পর হইতেই নানা বিদেশী বণিককুলের সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে ভারতবর্ষ ধনাগমের এক নূতন পথ খুঁজিয়া পায়। খ্রীষ্টপূর্ব ও খ্রীষ্টোত্তর প্রথম-দ্বিতীয় শতকে শক-কুষাণ অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে এই পথ বিস্তৃততর এবং বাণিজ্য গভীরতর হয় এবং তাহার ফলে দেশে স্বর্ণপ্রবাহের আর একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়। পঞ্চম শতকে হূণাভিযানের পূর্ব পর্যন্ত এই দ্বার উন্মুক্তই ছিল, কিন্তু হূণেরা মধ্যএশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের এই সম্বন্ধ বিপর্যস্ত করিয়া দেয়।

এই সুবিস্তৃত এবং সুপ্রচুর লাভজনক বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যই প্রত্যক্ষভাবে দেশের শিল্পকে, বিশেষভাবে দেশের বস্ত্র ও গন্ধশিল্পকে, দন্ত ও কাষ্ঠশিল্পকে অগ্রসর করিয়া দেয়, কোনো কোনো কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়াইয়া কৃষিকেও অগ্রসর করে। এই সবের ফলে বাণিজ্যলব্ধ ধন সমাজের নানাস্তরে বণ্টিত হইতে আরম্ভ করে, এবং সাধারণ কৃষক এবং গ্রামবাসী গৃহস্থেরও জীবনের মান অনেকাংশে উন্নত হয়। সাধারণ গৃহস্থের ভাণ্ডারেও স্বর্ণমুদ্রা এই যুগেরই সামাজিক লক্ষণ।

এই সুবিস্তৃত বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, এই কয়েক শতাব্দী জুড়িয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন; বিশেষত তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতেই এই সুবর্ণমুদ্রা

একেবারে নিকষোত্তীর্ণ খাঁটী সুবর্ণমুদ্রা, এবং তাহার ওজন বাড়িতে বাড়িতে প্রথম-কুমার গুপ্তের আমলে একেবারে চরম শিখরে উঠিয়া গিয়াছে; ধাতবমূল্যে, শিল্পমূল্যে, আকৃতি-প্রকৃতিতে এই মুদ্রার সত্যই কোনো তুলনা নাই! এই কয়েক শতকের রৌপ্যমুদ্রা সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। এ-তথ্যও উল্লেখযোগ্য যে, এই সুবর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার নাম যথাক্রমে দীনার ও দ্রম্ম; এবং এই দুইই এই যুগের লাভজনক বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতীক। আর, এই যুগে নগর-সভ্যতার বিস্তার ও সমৃদ্ধ নাগরিক আদর্শের যে-পরিচয় বাৎস্যায়নের কামসূত্রে দেখিতেছি তাহা প্রত্যক্ষভাবে এই সামাজিক ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

উত্তর-ভারতের পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও এই সুবৃহৎ বৈদেশিক, বিশেষভাবে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাংলাদেশ অন্যতম অংশীদার হইয়াছিল, এবং সেই বাণিজ্যলব্ধ সামাজিক ধনের কিছুটা অধিকার লাভ করিয়াছিল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তি বাংলার সমৃদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর; খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের আগে হইতেই এই বন্দরদ্বয়ের কথা নানাসূত্রে শোনা যাইতেছে, আমদানী-রপ্তানীর খবরও পাওয়া যাইতেছে। বাংলাদেশ, বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গ গুপ্তাধিকারে আসিবার পর হইতেই বৃহত্তর ভারতবর্ষের সঙ্গে তাহার যোগসূত্র আরও ঘনিষ্ঠ হয় এবং এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ক্রমশ আরও বাড়িয়াই চলে। বস্তুত, পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে দেখিতেছি উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে গ্রামের সাধারণ গৃহস্থও ভূমি কেনাবেচা করিতেছেন স্বর্ণমুদ্রায়। স্বর্ণমুদ্রাই যে এ-যুগের মুদ্রামান এ-সম্বন্ধে বোধ হয় সন্দেহ করা চলেনা। তাহা ছাড়া, বাংলা দেশের সর্বত্র এই যুগে দেখিতেছি, শাসনাধিকরণ-গুলিতে রাজপাদপোজীবী ছাড়া আর যে তিনজন থাকিতেন তাঁহাদের একজন নগরশ্রেষ্ঠী, একজন প্রথম সার্থবাহ, একজন প্রথম কুলিক, অর্থাৎ প্রত্যেকেই শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিনিধি। সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্র শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যকে কতখানি মূল্য দিত তাহা এই তথ্যে সুস্পষ্ট।

বস্তুত, কিছুটা পরিমাণে কৃষিনির্ভরতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ ও বাংলার এই কয়েক শতকের সমাজ প্রধানত ও প্রথমত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পনির্ভর, অর্থাৎ ধনোৎপাদনের প্রথম ও প্রধান উপায় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি অন্যতর উপায় মাত্র। তাহা ছাড়া, যেহেতু বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাই ছিল বেশি সেই হেতু ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ অর্থ শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহকুল এবং রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকৃত হওয়ার পরও মোটামুটি একটা বৃহৎ অংশ শিল্পীকুলের হাতেও গিয়া পৌঁছিত। অধিকন্তু, গ্রামবাসী গৃহস্থের ভূমি কেনাবেচায় স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন দেখিয়া মনে হয়, গৃহপতি এবং কৃষক সমাজেও উৎপাদিত ধনের কিছু অংশ আসিয়া পড়িত। ইহারই প্রত্যক্ষ ফল জীবনধারণের মানের উন্নতি ও প্রসার এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি।

কিন্তু ৪৭৫ খ্রীষ্ট শতকে বিরাট রোম-সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িল; পূর্ব-পৃথিবীর সঙ্গে তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য বিপর্যস্ত হইয়া গেল। তবু, যতদিন পর্যন্ত মিশর দেশ ও আফ্রিকায়

পূর্ব কূলে কূলে সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল ততদিন তাহাকে আশ্রয় করিয়া বিগত সুদীর্ঘ পাঁচ শতাব্দীর সুবিস্তৃত বাণিজ্যের অবশেষ আরও কিছুদিন বাঁচিয়া রহিল; সে-জৌলুস বা সে-সমৃদ্ধি বহুলাংশে কমিয়া গেল, সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে অন্তর্হিত হইল না। সমস্ত ষষ্ঠ-শতক এবং সপ্তম-শতকের অর্ধাংশ প্রায় এই ভাবেই চলিল; কিন্তু ইতিমধ্যেই মহম্মদ-প্রবর্তিত ইস্‌লামধর্মকে আশ্রয় করিয়া আরবদেশ আবার ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং ৬০৬-৭ খ্রী তারিখের পর একশত বৎসরের মধ্যে স্পেন হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে চীনদেশের উপকূল পর্যন্ত আরব বাণিজ্যতরী ও নৌবাহিনী সমস্ত ভূমধ্য-সাগর, লোহিত-সাগর, ভারত-মহাসাগর এবং প্রশান্ত-মহাসাগর প্রায় ছাইয়া ফেলিল। ৭১০ খ্রীষ্ট শতকে পশ্চিম-ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম আশ্রয় সিন্ধুদেশ চলিয়া গেল আরব বণিকের হাতে, এবং সিন্ধু-গুজরাটের স্বর্ণদ্বার প্রায় বন্ধ হইয়া গেল বলিলেই চলে। রোম-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ফলে ভূমধ্যসাগরীয় ভূখণ্ডে ভারতীয় শিল্প ও গন্ধ দ্রব্যাদির চাহিদাও গেল কমিয়া। অন্যদিকে পূর্ব-ভারতে তাম্রলিপ্তির বন্দরও একাধিক কারণে বন্ধ হইয়া গেল।

এই দুই শত বৎসরের বাণিজ্যিক অবস্থার সদ্যোক্ত বিবর্তন-পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ছাপ পড়িয়াছে সমসাময়িক স্বর্ণমুদ্রার উপর, কারণ, আমি আগেই বলিয়াছি, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্বর্ণ-মুদ্রার উন্নত বা অবনত অবস্থা বা অপ্রচলন আমাদের সমৃদ্ধ বা অবনত বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্যোতক। ইতিহাসের যে-পর্বে বৈদেশিক বাণিজ্য-সমতার লাভ আমাদের পক্ষে, আধুনিক পরিভাষায় আমরা যখন যে পরিমাণে favourable trade balance আহরণ করিয়াছি তখন সেই পরিমাণে আমাদের স্বর্ণমুদ্রা উন্নত ও সমৃদ্ধ, প্রচলন বিস্তৃত; যখন তাহা নাই তখন স্বর্ণমুদ্রাও নাই, অথবা থাকিলেও তাহার নিকষমূল্য, ওজনমূল্য এবং শিল্পমূল্য আপেক্ষিকত কম। রৌপ্যমুদ্রা সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের উত্তর-ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাসে। এই দুই শতক জুড়িয়া মুদ্রার ক্রমাবনতি কিছুতেই ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। প্রথম দেখা যাইবে স্বর্ণমুদ্রার ওজন ও নিকষমূল্য ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে; দ্বিতীয় স্তরে স্বর্ণমুদ্রা নকল ও জাল হইতেছে; তৃতীয় স্তরে রৌপ্যমুদ্রা স্বর্ণমুদ্রাকে হটাইয়া দিতেছে; চতুর্থ স্তরে রৌপ্যমুদ্রা অবনত হইতেছে, পঞ্চম স্তরে রৌপ্যমুদ্রাও অন্তর্হিত। ভারতবর্ষের সর্বত্রই যে একেবারে একই সময়ে বা একেবারে সুনির্দিষ্ট স্তরে স্তরে এইরূপ হইয়াছে তাহা নয়; কোথাও কোথাও হয়তো গচ্ছিত স্বর্ণ বা স্বর্ণমুদ্রা পরবর্তী কালে গলাইয়া নূতন স্বর্ণমুদ্রা চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সে-চেষ্টা বেশিদিন চলে নাই বা পরিণামে সার্থক হয় নাই, বা তাহার ফলে উচ্চ শ্রেণীর ধাতবমুদ্রার যে গতিপ্রকৃতির কথা এইমাত্র বলিলাম তাহার ব্যত্যয় হয় নাই।

ধনসম্বল-অধ্যায়ে বাংলাদেশে মুদ্রার বিবর্তন সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি; এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিব না। সেই বিবরণ-বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট ধরা যায় যে, মুদ্রার

এই ক্রমাবনতির প্রধান ও প্রথম কারণ বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি। সেই অবনতির হেতু একাধিক। সে-সব কারণ এই গ্রন্থেই নানাস্থানে উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছি। ব্যবসা-বাণিজ্যের এই অবনতিতে শিল্প-প্রচেষ্টারও কিছুটা অবনতি ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই, গুণ বা নিপুণতার দিক হইতে না হউক, অন্তত পরিমাণের দিক হইতে। কারণ, বহির্দেশে যে-সব জিনিসের চাহিদা ছিল সে-সব চাহিদা কমিয়া গিয়াছিল; তাহা ছাড়া এই বাণিজ্যে দেশের বণিকদের প্রত্যক্ষ অংশ যখন পরোক্ষ অংশে পরিণত হইয়া গেল তখন সঙ্গে সঙ্গে লাভের পরিমাণ কিছুটা কমিয়া যাইবে ইহা কিছু বিচিত্র নয়। এই সব কারণে সমাজে কৃষি-নির্ভরতা বাড়িয়া যাওয়া খুবই স্বাভাবিক, এবং অষ্টম শতক হইতে দেখা যাইবে গাঙ্গেয় ভারতে, বিশেষভাবে বাংলাদেশে ঐকান্তিক কৃষিনির্ভরতা ক্রমবর্ধমান, এবং আদিপর্বের শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের বাংলাদেশ একান্তই কৃষিনির্ভর, অর্থাৎ কৃষিই ধনোৎপাদনের প্রথম ও প্রধান উপায়, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য অন্যতম উপায় হইলেও তেমন লাভবান নয়, অর্থাৎ বাণিজ্য-সমতা দেশের স্বপক্ষে আর নাই; পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী দ্বীপ ও দেশগুলির সঙ্গে কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও নাই।

ঐকান্তিক ভূমি ও কৃষিনির্ভরতার রূপান্তর

অষ্টম শতকের গোড়া হইতেই পূর্ব ভূমধ্য-সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশান্ত-মহাসাগর পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমগ্র বৈদেশিক সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য আরব ও পারসিক বণিকদের হাতে হস্তান্তরিত হইয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সে-প্রভাব ক্রমবর্ধমান। দক্ষিণ-ভারত বহুদিন পর্যন্ত কতকাংশে হইলেও এই আরব বণিকশক্তির সঙ্গে (এবং পূর্ব-সমুদ্রে চীনা বণিকশক্তির সঙ্গেও) কিছুটা পরিমাণে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া নিজদের বাণিজ্যলব্ধ ধনের ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু উত্তর-ভারতে তাহা সম্ভব হয় নাই, তাহার সমস্ত পথই গিয়াছিল রুদ্ধ হইয়া। এবং তাহার ফলে বাংলাদেশও এই বৃহৎ বাণিজ্যসম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। তবু প্রাচ্যদেশের বাংলা-বিহার পালরাজাদের আমলে একটা সজ্ঞান, সচেতন চেষ্টা করিয়াছিল স্থলপথে হিমালয়শায়ী কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, ভুটান, সিকিম প্রভৃতি দেশের সঙ্গে একটা বাণিজ্য-সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে, এবং কিছুদিনের জন্য অন্তত কিছুটা পরিমাণে সে-চেষ্টা সার্থকও হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই ধরনের একটা চেষ্টা পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ বলিদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ প্রভৃতির সঙ্গেও হইয়াছিল। কিন্তু কোনো চেষ্টাই যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করিয়া এই পর্বের বাংলার ঐকান্তিক কৃষিনির্ভরতা ঘুচাইতে পারে নাই, বরং তাহা ক্রমবর্ধমান হইয়া পাল-আমলের শেষের দিকে এবং সেন-আমলে বাংলাদেশকে একেবারে ভূমিনির্ভর, কৃষিনির্ভর গ্রাম্যসমাজে পরিণত করিয়া দিল! এই পর্বে যে স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, এমন কি কোনো প্রকার ধাতব মুদ্রার সাক্ষাৎই আমরা পাইতেছিনা; ইহার ইঙ্গিত তুচ্ছ করিবার মতন নয়।

এই ঐকান্তিক ভূমি ও কৃষিনির্ভরতা প্রাচীন বাংলার সমাজ-জীবনকে একটা স্বনির্ভর স্বসম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত স্থিতি ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়াছিল, এ-কথা সত্য ; গ্রাম্য জীবনে এক ধরনের বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত সুখশান্তিও রচনা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা সমগ্র জীবনকে বিচিত্র ও গভীর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করিতে পারে নাই, বৃহৎ জনসাধারণের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনমানকে উন্নত করিতে পারে নাই—ইতিহাসের কোনো পর্বে কোনো দেশেই তাহা সম্ভব হয় নাই, হওয়ার কথাও নয়। আমি আগে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, আমাদের কৌম ও আঞ্চলিক চেতনার প্রাচীর যে আজও ভাঙ্গে নাই তাহার অন্যতম কারণ এই একান্ত ভূমিনির্ভর কৃষিনির্ভর জীবন। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিচিত্র ও গভীর সংগ্রামময়, বিচিত্র বহুমুখী অভিজ্ঞতাময় এবং বৃহত্তর মানবজীবনের সঙ্গে সংযোগময় জীবনের যে ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি, যে উল্লাস ও বিক্ষোভ, বৃহতের যে উদ্দীপনা তাহা স্বল্প পরিসর গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর জীবনে সম্ভব নয়। সেখানে জীবনের শান্ত, সংযত, সমতাল ; পরিমিত সুখ ও পারিবারিক বন্ধনের আনন্দ ও বেদনা ; সুবিস্তৃত উদার মাঠ ও দিগন্তের, নদীর ঘাট ও বটের ছায়ার সৌন্দর্য।

যাহাই হউক, বাংলাদেশের আদিপর্বের শেষ অধ্যায় এই ভূমি ও কৃষিনির্ভর সমাজ-জীবনই মধ্যপর্বের হাতে উত্তরাধিকার স্বরূপ রাখিয়া গেল, আর রাখিয়া গেল তাহার প্রাচীনতর পর্বের সমৃদ্ধ শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের সুউচ্চারিত স্মৃতি। সেই স্মৃতি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বহমান। আমাদের প্রাচীন গ্রামবিন্যাস, রাষ্ট্রবিন্যাস, শ্রেণী ও বর্ণবিন্যাস, শিল্প ও সংস্কৃতি, ধর্মকর্ম সমস্তই বহুলাংশে সদ্যোক্ত গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর সমাজ-জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৫

প্রাচীন বাংলার রাজবৃত্ত ও রাষ্ট্র জীবনের ধারার কথা এই গ্রন্থের দু'টি অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই সুবিস্তৃত বিশ্লেষণ হইতে কয়েকটি ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ধরা পড়ে।

সমাজ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে যেমন, পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় জীবনেও তেমনই সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা যোগাযোগ সর্বদাই ছিল, এবং সর্ব ভারতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহার বড় একটা অংশও ছিল। মৌর্য সম্রাটদের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত সে-সম্বন্ধ কখনও ক্ষুন্ন হয় নাই ; বস্তুত, প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধু অবাঙালীর ইতিহাস নয়। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বাংলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস মধ্য-ভারতের বাম বাহু প্রসারণের ইতিহাস, এবং তাহার ফল বাংলার কৌম রাষ্ট্রীয় জীবনে কি পরিবর্তন-বিবর্তন হইতেছে তাহারই ইতিহাস। এই পরিবর্তন-বিবর্তনের কোনো বিবরণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই, তবে প্রান্তের বাহির

হইতে কোনো ক্ষমতাবান্ রাজশক্তি যখন অপরিণত কৌমকেন্দ্রিক খণ্ড খণ্ড সংস্থার দিকে হাত বাড়াইয়া বৃহত্তর পরিধির ভিতর সেগুলিকে টানিয়া লইতে চায় তখন স্বাভাবিক কারণেই কি পরিবর্তন-বিবর্তন ঘটিতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। যাহাই হউক, ষষ্ঠ শতকের শেষ ও সপ্তম শতকের গোড়া হইতেই বাংলাদেশ দুই বাহু বাড়াইয়া উত্তর-ভারতের বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্মুখর স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, এবং ক্রমে ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের সাধারণ রাজনৈতিক জীবনে নিজের একটি বিশিষ্ট স্থান করিয়া লয়। অষ্টম ও নবম শতকের বহুলাংশ জুড়িয়া যে তিনটি প্রধান রাষ্ট্রশক্তি সর্বভারতীয় প্রভুত্ব ও প্রাধান্যের জন্য লড়িয়াছিল তাহার মধ্যে একটির কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশে ও আশ্রয় ছিল পাল-রাজ বংশ। খুব সম্ভব এই সময় কিংবা ইহার কিছু আগে, মাৎস্যন্যায়ের কালে বাংলাদেশ নিজের সন্তানদের ক্রোড়বিচ্যুত করিয়া পাঠাইয়াছিল পঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে নূতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। দশম শতকে বরেন্দ্রভূমির গদাধর রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয়-কৃষ্ণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া দক্ষিণ-ভারতে বেলারি জেলায় একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই শতকে প্রথম-মহীপালের রাজ্য ও রাষ্ট্রশক্তি উত্তর-ভারতের অন্যতম শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। একাদশ শতক হইতে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সম্বন্ধ বাড়িয়া যায়, এবং ক্রমশ বাংলাদেশ দক্ষিণী রাষ্ট্রীয় প্রভাবের কবলে জড়াইয়া পড়ে। তাহারই ফলে সেন-বংশের প্রতিষ্ঠা। যাহাই হউক, একদিকে বাংলার সীমা ডিঙ্গাইয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করা এবং তাহাকে সৃষ্টি ও শক্তি সম্ভাবনায় পূর্ণ করিয়া তোলা যেমন বার বার বাঙালীর পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল, তেমনই জয়-পরাজয়ের ভিতর দিয়া বাংলাদেশ ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যোগরক্ষা করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই। শুধু রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়াই নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধর্ম ও সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়াও বাংলাদেশ নিখিল ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত—কাশ্মীর হইতে সিংহল এবং গুজরাট হইতে কামরূপ পর্যন্ত। ভারতবর্ষের বাহিরে—তিব্বতে, ব্রহ্মদেশে, সুবর্ণদ্বীপে, পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী অন্যান্য দেশ ও দ্বীপগুলিতেও—তাহার যোগাযোগ নানাসূত্রে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কাজেই, প্রান্তীয় দেশ বলিয়া বাংলাদেশ শুধু তাহার পুকুরপাড়ে, বটের ছায়ে, ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিজের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ লইয়া একান্ত আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করিত, এমন মনে করিবারও কারণ নাই।

ভারতবুদ্ধি ও ভারতবর্ষের সঙ্গে সামগ্রিক যোগ

খ্রীষ্টোত্তর তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে ওঠাপড়া ভাঙ্গাগড়ার শেষ নাই। কিন্তু ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়া বাংলাদেশ একটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ ছিল—সে তাহার রাষ্ট্রীয় সত্তার স্বীকৃতি। গুপ্ত-পর্বে যখন এই দেশ উত্তর-ভারতীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত তখনও এই আদর্শ একেবারে বিস্মৃত নয়। কিন্তু

শশাঙ্কর সময় হইতেই এ-সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়িয়া যায়। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থে যখন গৌড়তন্ত্রের কথা পড়িতেছি তখন তাহার মধ্যেও এই সচেতনতার আদর্শই সুপরিস্ফুট। পরবর্তী কালে তো স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তার আদর্শ ক্রমশ আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষত পাল আমলে। এই পর্বেই শুনা যাইতেছে শুধু বাংলার কথা নয়, বৃহদ্বঙ্গের কথা। এই স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তার চেতনাই বাংলার রাষ্ট্রীয় চেতনা। নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব, নানা রাষ্ট্রীয় কলকোলাহল এই চেতনাকে বারবার বিপর্যস্ত করিয়াছে, কিন্তু বারবারই বাংলাদেশ সেই আদর্শকে ফিরিয়া পাইতে চেষ্টাও করিয়াছে। প্রাচীন বাঙালীর এই আদর্শের, তথা রাষ্ট্রীয় সচেতনতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মাৎস্যন্যায়োৎপীড়িত বাঙালীর গোপালদেবকে রাজপদে নির্বাচন। এই ধরনের সচেতনতা এবং রাষ্ট্রীয় শুভবুদ্ধির দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল।

রাষ্ট্রীয় সত্তার স্বাতন্ত্র্য

অথচ এই আদর্শ খণ্ডিতও হইয়াছে বারবার নানা আঞ্চলিক চেতনাসঞ্জাত অনৈক্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে, এবং তাহার ফলে বারবার জাতীয় জীবন বিপন্নও হইয়াছে। এই অনৈক্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বের মূলে যে শক্তি ছিল সক্রিয় তাহা সামন্ততন্ত্রের। বস্তুত আঞ্চলিক সামন্তরাই বাঙালীর অপরিমেয় রাষ্ট্রীয় সম্ভাবনাকে বারবার ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে, এবং বাঙালীকে নেতৃত্ব ও সংঘশক্তিতে স্থায়ীভাবে কখনও সবল ও সমৃদ্ধ হইতে দেয় নাই, দীর্ঘস্থায়ী অখণ্ড রাজ্য এবং রাষ্ট্রও গড়িতে দেয় নাই।

যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙালীর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তার চেতনা যত প্রবলই হউক না কেন, সে-চেতনা তাঁহার সর্বভারতীয় চেতনাকে নিরস্ত করিয়া রাখে নাই; অন্তত শশাঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মপাল-দেবপাল পর্যন্ত ভারতবুদ্ধি অক্ষুন্ন। প্রান্তীয় স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও রাজনৈতিক দৃষ্টিটি ভারতব্যাপী। কিন্তু, পাল-পর্বের দ্বিতীয় পর্যায় হইতেই যেন রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে, নিজের প্রান্তীয় স্বতন্ত্র সত্তা এবং প্রান্তীয় লাভক্ষতিটাই যেন বড় হইয়া দেখা দিতেছে। বৈদেশিক মুসলিম অভিযাত্রীরা যখন সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও পঞ্জাব অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে, উত্তর-ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন হিন্দুরাজশক্তি যখন মুসলিম অভিযাত্রীদের ঠেকাইয়া রাখিবার প্রাণান্তকর সংগ্রামে রত তখন মহীপালের আচরণ, অথবা পরে গাহড়বাল রাজশক্তিকে দুর্বল করিবার মধ্যে লক্ষ্মণসেনের যে-আচরণ তাহাতে তো মনে হয় ভারতবুদ্ধি অপেক্ষা প্রান্তীয় সচেতনতাটাই ছিল প্রবলতর, অন্তত এই পর্বে।

প্রাক্-আর্য নানা কৌম ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা মত, পথ ও অনুষ্ঠান, বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্ম প্রভৃতির নানা আদর্শ ও আচার উচ্চকোটি ও লোকায়ত স্তরের বাঙালী জীবনে প্রচলিত ছিল। ধর্মমত ও পথ লইয়া বাদ-বিসম্বাদ কলহ-কোলাহল ছিলনা এমন বলা যায় না; ধর্মমত বা বিশ্বাস বা বিশেষ কোনো সম্প্রদায়গত আচারানুষ্ঠানের জন্য কেহ কখনো হয়তো রাজার বা রাষ্ট্রের

ধর্ম ও রাষ্ট্র

রোষাকর্ষণও করিয়া থাকিবেন, যদিও প্রাচীনতর কালে তেমন প্রমাণ কিছু নাই। রাজা এবং রাজবংশের লোকেরা যে যাঁহার ইচ্ছা ও বিশ্বাসানুযায়ী এক এক ধর্মের অনুসরণ করিতেন, পোষকতাও করিতেন; হয়তো কখনো কখনো অন্যধর্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া অনিষ্ট সাধনের চেষ্টাও করিয়া থাকিবেন। সব সময়ই যে পরধর্মবিদ্বেষ হেতুই তাহা হইত, এমন বলা যায়না; কখনো কখনো তাহার পশ্চাতে অনুক্ত রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কারণও সক্রিয় থাকিত, সন্দেহ নাই। তৎসত্ত্বেও সাধারণ ভাবে এ-কথা বলা চলে যে, রাজা বা রাজবংশের ব্যক্তিগত ধর্ম যাহাই হউক না কেন, তাহাতে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের নীতি, আদর্শ ও সংস্কার কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই; জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও রাজার বা রাজবংশের ধর্ম দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় নাই। অন্তত পাল-পর্ব পর্যন্ত এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ। সেন-বর্মণ পর্বে খুব সম্ভব এই আদর্শে ব্যত্যয় কিছু ঘটিয়াছিল; এই পর্বের একাধিক রাষ্ট্রনায়ক পরধর্ম সম্বন্ধে যে-ভাষা ব্যবহার ও যে মনোবৃত্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এই সন্দেহ জাগা কিছু বিচিত্র নয়, এবং হয়তো তাহার ফলে রাষ্ট্রে ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে ধর্মগত সংকীর্ণতার কিছুটা স্পর্শ লাগিয়া থাকিবে। তাহার প্রমাণ যে একেবারে নাই, এমন নয়!

বাংলাদেশে, তথা সমগ্র উত্তর-ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রের পতন ও অবসানের প্রধান কারণ ব্যক্তিগত সাহস বা শৌর্যবীর্যের অভাব নয়; সে-কারণ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব এবং সংঘ-শক্তির অভাব, এবং তাহার হেতু একাধিক। কৌমচেতনা, আঞ্চলিক চেতনা, সামন্ততন্ত্র, বর্ণ-বিন্যাসের অসংখ্য স্তরভেদ, সংকীর্ণ স্থানীয় রাষ্ট্রবুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই তাহার মূলে; এ-সব কথা বিস্তৃত ব্যাখ্যার কোনো অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয়ত, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্রাচীন বঙ্গদেশে, তথা ভারতবর্ষে চিরাচরিত চতুরঙ্গবল-রণপদ্ধতির কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজান্দারের অভিযান ও রণপদ্ধতি হইতে যে উন্নততর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল, ভারতবর্ষ তাহা করে নাই। প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া সৈন্যচালনা এবং চতুরঙ্গবলসজ্জা ও ব্যবহারের পদ্ধতি মোটামুটি একই থাকিয়া গিয়াছে; তাহার ফলে দুর্ধর্ষ মুসলিম অভিযাত্রীরা যখন বিদ্যুদ্‌গামী অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া বর্শা ও তরবারী হাতে শ্লথগতি হস্ত্যাশ্বরথপদাতিক বাহিনীর ব্যূহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত তখন সৈন্যাধ্যক্ষ বা সেনাবাহিনীর ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত শৌর্যবীর্য বিশেষ কোনো কাজে লাগিত না, বিপর্যয় ঘটিত অতি সহজেই। তৃতীয়ত, বহুদিন একটি সুপ্রাচীন সমৃদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির এবং সুপ্রতিষ্ঠিত, সুবিন্যস্ত সমাজ ও রাষ্ট্র-বিন্যাসের মধ্যে জীবনযাপনের ফলে ভারতবাসীর দেহমনে এক ধরনের সনাতনী নিশ্চিন্ততা ও ভাগ্যনির্ভরতার ধূসর আকাশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। অন্যদিকে, যে-সব মুসলিম অভিযাত্রীর দল তরঙ্গের পর তরঙ্গে ভারতবর্ষের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল তাহারা বয়সে নবীন, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে প্রায় আদিম বর্বর, মরু

পতন ও অবসানের হেতু

ও পাহাড়ের প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টনে তাহাদের দেহমন দৃঢ় ও কঠোর, খাদ্য ও ধনলুণ্ঠন তাহাদের অন্যতম জীবনোপায়, নূতন জীবনভূমি আবিষ্কারে তাহারা বদ্ধপরিকর, পরধর্মের প্রতি তাহাদের অপরিমেয় বিদ্বেষ, এবং সর্বোপরি তাহারা সংগ্রামোন্মত্ত। দশম হইতে দ্বাদশ শতকে উত্তর-ভারতে যে নিরবসর সংগ্রাম তাহা দুই ভিন্নমুখী, বিপরীত চরিত্রের জীবনপ্রবাহের সংগ্রাম। ভারতবর্ষের জীবনপ্রবাহ অন্যতর প্রবাহকে ঠেকাইতে পারিত যদি তাহার নেতৃত্ব থাকিত, সংঘশক্তি থাকিত, রণপদ্ধতি উন্নততর হইত, রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি দূরপ্রসারী হইত, জাতীয় চরিত্র আত্মশক্তিনির্ভর হইত, সমাজবিন্যাসে ভেদবুদ্ধি না থাকিত, এবং দেহগত বিলাসব্যসনে সমাজ নিরক্ত নির্বীর্য না হইত। এ-সব কথার সবিস্তার আলোচনা রাজবৃত্ত ও অন্যান্য প্রসঙ্গে করিয়াছি; এখানে আর পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই। দ্বাদশ শতকের বাংলাদেশে কোনোপ্রকার প্রতিরোধের মনোবৃত্তি যে ছিল না তাহা সুস্পষ্ট। বিজয়ী যবনবীরের প্রশস্তি গাহিয়া উমাপতি-ধর যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই তাহার একমাত্র প্রমাণ নয়। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ এখন যে-রূপে পাইতেছি তাহা খুব প্রাচীন না হইলেও তাহাতে তুর্কী-বিজয়ের অব্যবহিত পরে বাঙালী হিন্দুর মনোভাবের একটু পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম হৈলা যবনরূপী শিরে পরে কাল টুপী
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান
ব্রহ্ম হৈলা মহম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেগম্বর
মহেশ হইল বাবা আদম
দেখিয়া চণ্ডিকা দেবী তেঁহ হইল হায়া বিবি

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, জাতির মানসক্ষেত্র নানাভাবে আগে হইতেই এই বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। মুসলিম অভিযাত্রীরাই তো কল্কি-অবতার, এবং অশ্বারূঢ় এই অবতারের আগমনের জন্য দূরদৃষ্টিহীন সংকীর্ণবুদ্ধি ভাগ্যনির্ভর ধর্মোপদেষ্টারা আগে হইতেই দেশের লোকের চিত্তভূমি তৈরী করিতেছিলেন। মুসলমানেরা যখন আসিয়া পড়িলেন তখন বিহ্বল বিক্ষিপ্ত জনচিত্তকে বুঝাইতে কষ্ট হইল না যে, ইহাই বিধাতার অমোঘ বিধান, কল্কি-অবতার তো আসিবেনই! দেশের ভিতরে এই অবস্থা; আর, বাহির হইতে অভিযানের পর অভিযানে যাঁহারা আসিতেছিলেন তাঁহাদের কাছেও যে এই অবস্থা একেবারে অজ্ঞাত ছিল, এমন মনে হয় না। সোমনাথ-মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচ্য-ভারতের বিহার ধ্বংস ও লুণ্ঠন যে শুধু রক্তের নেশায় এবং ধনরত্নের লোভেই, হয়তো তাহা নয়; অন্য উদ্দেশ্যও হয়তো ছিল, এবং সে-উদ্দেশ্য জাতির নিগূঢ় চেতনার গভীর স্থানটিতে আঘাত হানিয়া তাহাকে নিরাশ, বিহ্বল ও বিপর্যস্ত করিয়া দেওয়া। সজ্ঞান সচেতন উদ্দেশ্য যে তাহাই ছিল এমন কোনো প্রমাণ নাই; কিন্তু ফলত যে তাহাই হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শেষ পর্যায়ে সামাজিক দৃষ্টি যে সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছিল তাহার প্রমাণ তো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, এবং নানাপ্রসঙ্গে তাহা উল্লেখও করিয়াছি। পাল-পর্বের মাঝামাঝি পর্যন্তও দেখিতেছি বাংলাদেশ আন্তর্দেশিক বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করিয়া এবং কিছুটা ব্যবসা-বাণিজ্যকে আশ্রয় করিয়া দেশবিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিল। তাহার ফলে রাষ্ট্রের দৃষ্টি কখনো একান্তভাবে প্রান্তীয় স্থানীয় সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে পারে নাই, গ্রামের ও নগরের সমাজও একান্তভাবে কূপমণ্ডুকতাকে এবং ঐকান্তিক ভাগ্যনির্ভরতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া, বর্ণ-বিন্যাস ও ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে সবিস্তারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, পাল-পর্বের শেষ পর্যায়ে, বিশেষভাবে সেনবর্মণ-পর্যায়ে মধ্য-ভারতীয় স্মৃতিশাসন এবং দক্ষিণী রক্ষণশীল মনোবৃত্তি ক্রমশ বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়া বাঙালীর সমাজকে স্তরে উপস্তরে ভাগ করিয়া এবং সমাজে পুরোহিত-প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজের ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। তাহার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন উত্তরোত্তর প্রান্তীয় সীমার মধ্যেই নিজের সার্থকতা লাভের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিল। নানাদিক হইতে ব্যাহত হইয়া জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত হইয়া ভাগ্যনির্ভরতা অর্থাৎ জ্যোতিষ এবং নানাপ্রকারের বিধিনিষেধই তাহার প্রধান আশ্রয় হইয়া দাঁড়াইল। দিগ্বিদিকে বিচ্ছুরিত হইবার, নানা কর্মে লিপ্ত হইবার সুযোগ যেখানে নাই, সেখানে জীবন আত্মকেন্দ্রিক হইবে, ভাগ্যনির্ভর হইবে, রক্ষণশীল হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়! বিচিত্র সংগ্রাম, বিচিত্র প্রচেষ্টা, ব্যবসা-বাণিজ্য, দুঃসাহসিক আবিষ্কার-অভিযান, ধ্যান-মনন, অপরিমেয় শক্তি, উদ্যম, বিশ্বাস প্রভৃতি যেখানে নিরস্ত ও নিঃসুযোগ, জীবন যেখানে বিধিবদ্ধ ও গতানুগতিক সেখানে ভাগ্য এবং পরাজয়ী মনোবৃত্তি রাষ্ট্র এবং সমাজের দৃষ্টিকে গ্রাস করিবে, ইহাই তো স্বভাবের নিয়ম। এই ভাগ্যনির্ভরতা এবং জীবনের স্তিমিত গতি প্রধানতম সমর্থন পাইয়াছিল সমসাময়িক সমাজের ঐকান্তিক ভূমি ও কৃষিনির্ভরতা হইতে। দিনের পর দিন রৌদ্রবৃষ্টিঝড়, প্রকৃতির নানা ভ্রূকুটি প্রভৃতির সঙ্গে লড়িয়া যে-কৃষক মাঠে সোনার শস্য ফলায় এবং হঠাৎ যখন একদিন দুইদণ্ডের শিলাবৃষ্টির ফলে সেই সোনার ধান ঝরিয়া যায় মাটিতে মিশিয়া, অথবা অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে যায় ধ্বংস হইয়া, এবং তখন যাহার আশ্রয় করিবার মত অন্য জীবনোপায় কিছু নাই, প্রতিকারের শক্তিও যাহার নাই সে তো ভাগ্যনির্ভর হইবেই, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইবেই। তাহা ছাড়া, কৃষিনির্ভর জীবন তো স্বাভাবিক কারণেই আঞ্চলিক ও রক্ষণশীল, এবং পরিবার-গোষ্ঠী-গ্রাম-প্রান্ত লইয়াই সে-জীবন স্বয়ংসম্পূর্ণ; বৃহত্তর, পরিব্যাপ্ত এবং বৈচিত্র্যময় উন্মুখর জীবনের প্রয়োজনও তাহার কাছে স্বল্প। এই ধরনের জীবনের শান্ত স্নিগ্ধ স্তিমিত সৌন্দর্য-মাধুর্য নিশ্চয়ই আছে, এবং বাহির হইতে শক্তিমান, প্রখর ও প্রবল জীবনস্রোতের আঘাত কিছু না লাগিলে এই জীবনের আয়ু অর্থাৎ স্থায়িত্ব এবং শক্তিও কিছু কম নয়, কিন্তু তেমন আঘাত যখন লাগে

সমাজদৃষ্টির সংকীর্ণতা

তখন বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী ; এবং বিপর্যয়ের ফলে রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজশক্তি দুয়েরই ভিতর ফাটলও অনিবার্য। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে বাঙালী-জীবনের বিপর্যয় এই কারণেই। কিন্তু বিপর্যয় যাহারা ঘটাইল সেই মুসলিম অভিযাত্রীরা সামরিক শক্তিতেই শুধু দুর্ধর্ষ ছিলেন ; তাঁহারা যখন শাসক অর্থাৎ রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়া বসিলেন তখন কিন্তু গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর জীবনে কোনো পরিবর্তন দেখা দিল না, জীবনের নূতন কোনো বিস্তারও ঘটিল না, না রাষ্ট্রে না সমাজে, না শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যে না দুঃসাহসী কোনো আবিষ্কার-অভিযানে, না ধ্যানে না মননে। কাজেই মধ্য-পর্বের সুদীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়িয়া বাঙালীর ভাগ্য বা দৈবনির্ভরতাও ঘুচিল না, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসও ফিরিয়া আসিল না। এ-পর্বেরও রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টি অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু এ-আলোচনা পরবর্তী পর্বের, আদিপর্বের নয়।

৬

নানা সূত্রে নানা অধ্যায়ে বলিয়াছি, আর্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধনের প্রবাহ বাংলা দেশে আসিয়া লাগিয়াছে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে, এবং যখন লাগিয়াছে তখনও খুব সবেগে লাগে নাই। প্রবাহটিও কখনো খুব গভীরতা বা প্রসারতা লাভ করিতে পারে নাই ; সাধারণত বর্ণসমাজের উচ্চতর স্তরে এবং অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত, মার্জিত ও সংস্কৃত সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাহা আবদ্ধ ছিল, বিশেষত আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি। একমাত্র আর্য বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিই সদ্যোক্ত সীমার বাহিরে কিছুটা বিস্তার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা আরও পরবর্তী কালে—সপ্তম-অষ্টম শতকের পর হইতে। তাহা ছাড়া, আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবাহ গঙ্গার পশ্চিম তীর পর্যন্ত, অর্থাৎ মোটামুটি পশ্চিম-বঙ্গে যদি বা কিছুটা বেগবান ছিল, গঙ্গার পূর্ব ও উত্তর-তীরে সে-প্রবাহ ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গিয়াছে, বিস্তৃতি এবং গভীরতা উভয়ত।

ইহার কারণ একাধিক। প্রথমত, বাংলা দেশ প্রত্যন্ত দেশ বলিয়া আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবাহ এত দূরে আসিয়া পৌঁছিতে সময় লাগিয়াছে। দ্বিতীয়ত, বহুদিন পর্যন্ত বাংলা দেশের প্রতি আর্যমানসের একটা উন্নাসিকতা, একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব সক্রিয় ছিল। এদেশে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পরও সে উন্নাসিকতা একদিনে কাটিয়া যায় নাই, ক্রমশ অত্যন্ত ধীরে ধীরে তাহা ঘুচিয়াছে। তাহার কারণ, সংকীর্ণ সীমার মধ্যে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার এবং সেই ধর্ম ও সংস্কৃতির শুচিতা রক্ষার একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা। তৃতীয়ত, বাংলার স্থানীয় আদিম, কৌমবদ্ধ মানব-সমাজও বহুদিন পর্যন্ত আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি খুব শ্রদ্ধিতচিত্ত ছিল না, বরং সক্রিয় বিরোধীতাও করিয়াছে, যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছে সে-স্রোত ঠেকাইয়া রাখিতে। তাহার পর পরাভব যখন অনিবার্য হইয়াছে তখনও সেই মানবসমাজ একেবারে

প্রাচীন বাংলায় আর্যপ্রবাহ ক্ষীণ

স্রোতে গা' ভাসাইয়া দেয় নাই, নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধন পরিত্যাগ করিয়া আর্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধন পুরাপুরি মানিয়া লয় নাই, বরং দিনের পর দিন ধরিয়া বুঝাপড়া করিয়া একটা সমন্বয় গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। মধ্যগাঙ্গেয় ভারত যে-ভাবে আর্য, বিশেষভাবে আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পুরাপুরি মানিয়া লইয়াছে বাংলা দেশ সে-ভাবে তাহা করে নাই। ভারতবর্ষের বুকে যে কয়টি অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির উদ্ভব ও প্রসার লাভ করিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিই মধ্যগাঙ্গেয় ভারতের অর্থাৎ আর্যাবর্তের সীমার বাহিরে। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রভৃতি যে বর্তমানে বিহারের সীমার মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল, এবং পরবর্তী কালে তন্ত্রধর্ম, বজ্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতির উদ্ভবও যে আর্যাবর্তের সীমার বাহিরে, ইতিহাসের এই ইঙ্গিত তুচ্ছ করিবার মতন নয়। বস্তুত, বাংলা দেশ আর্যধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও, ব্রাহ্মণ ও উচ্চতর দুই একটি সম্প্রদায়ের বাহিরে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধন শিথিল, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা কুণ্ঠিত। চতুর্থত, বাংলা দেশে নানা নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে, প্রচুর রক্তমিশ্রণের ফলে এবং নানা ঐতিহাসিক কারণে জাত্‌ভেদ-বর্ণভেদের বৈষম্য আর্যাবর্ত বা দক্ষিণ-ভারতের মতো এত কঠোর হইয়া উঠিতে পারে নাই; বস্তুত বাংলার সমাজবন্ধনে তথাকথিত শূদ্র জাতির লোকদেরই প্রাধান্য। আজও বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যেরা সংখ্যায় স্বল্প। বর্ণবিন্যাসে ও সামাজিক আচার-বিচারে যাহা কিছু কঠোরতা বা আর্য ব্রাহ্মণ্য সনাতনত্বের আদর্শ বাংলায় আজও সক্রিয় তাহা প্রধানত দক্ষিণী সেন-বংশীয় রাজাদের প্রভাবে ও আনুকূল্যে, এবং গৌণত মধ্য-ভারতীয় আর্য ব্রাহ্মণ্যাদর্শের প্রেরণায়।

এই সব কারণে বাঙালীর ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধনে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা মধ্যগাঙ্গেয় ভারত অর্থাৎ আর্য-ভারত হইতে পৃথক। আর্য ভারতবর্ষ সনাতনত্বের আদর্শে স্থির ও অবিচল, সমস্ত আচারানুষ্ঠান, অধ্যাত্ম সাধনা, সমাজ ও পরিবার বন্ধন প্রভৃতি সমস্তই সেখানে শাস্ত্র দ্বারা শাসিত; আর্য ভারত রক্ষণশীল, যাহা সে পাইয়াছে তাহা সে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়। মধ্যগাঙ্গেয় ভারতের মন তাই বহুলাংশে পরিবর্তন বিমুখ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে মধ্যগাঙ্গেয় ভারতের ধর্মে, রাষ্ট্রে বা সমাজে কোনো বৈপ্লবিক আলোড়ন দেখা দেয় নাই, বা দিলেও তাহা সার্থক রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই, ইতিহাসের এ-তথ্য বিস্ময়কর, কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। ইহার প্রধান কারণ, আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সনাতনী ও রক্ষণশীল মনোভাব। বাংলা দেশে হইয়াছে তাহার বিপরীত। মহাযানী বৌদ্ধধর্মের বজ্রযানী-মন্ত্রযানী-কালচক্রযানী ও সহজযানী রূপান্তর; সহজযানে সহজ মানবতার এবং প্রাণধর্মের আবেদন; ব্রাহ্মণ্য শক্তিধর্মের তান্ত্রিক রূপান্তর; বৈষ্ণবধর্মে বিশুদ্ধ ভক্তিরস ও হৃদয়াবেগের সঞ্চার; শিব ও উমার ভাবকল্পনায় পারিবারিক জামাতা-কন্যার রূপ ও আবেগ সঞ্চার; দুর্গা, তারা, ষষ্ঠী, মারীচী, পর্ণশবরী প্রভৃতি মাতৃকাতন্ত্রের দেবীদের প্রতি শ্রদ্ধা, আবেগ ও

সনাতনত্বের প্রতি বাঙালীর বিরাগ

অনুরাগ; শিব ও বিষ্ণুর মতন দেবতাকেও ঘনিষ্ঠ মানব সম্বন্ধে বাঁধিয়া তাঁহাদের প্রতি পারিবারিক আত্মীয়তার এবং মানবী লীলার আবেগ সঞ্চার, তান্ত্রিক কায়াসাধনের প্রতি অনুরাগ এবং সেই সাধনের রীতিপদ্ধতি; শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানচর্চায় বুদ্ধি ও যুক্তি অপেক্ষা প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের প্রাধান্য; বাংলার ব্যবহার-শাস্ত্রে দায়াধিকারের আদর্শ ও ব্যবস্থা; বাংলার পরিবার ও সমাজবন্ধন প্রভৃতি সমস্তই আর্যমানসের দিক হইতে বৈপ্লবিক ও সনাতনত্বের বিরোধী। আবর্তন ও বিপ্লব, দুঃসাহসী সমন্বয়, স্বাঙ্গীকরণ ও সমীকরণ যেন বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য; সনাতনত্বের প্রতি একটা বিরাগ যেন বাংলার ঐতিহ্য ধারায়। ইহার মূল প্রধানত বাঙালীর জনগত ইতিহাসে, কিছুটা তাহার ভৌগোলিক পরিবেশে, তাহার নদনদীর ভাঙ্গাগড়ায়, কিছুটা ইতিহাসের আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে। বাঙালীর বৃত্তি যথার্থত বৈতসী; যে-আদর্শ, যে-ভাবস্রোতের আলোড়ন, ঘটনার যে-তরঙ্গ যখন আসিয়া লাগিয়াছে, বাংলা দেশ তখন বেতস-লতার মত নুইয়া পড়িয়া অনিবার্য বোধে তাহাকে মানিয়া লইয়াছে, এবং ক্রমে নিজের মত করিয়া তাহাকে গড়িয়া লইয়া, নিজের ভাব ও রূপদেহের মধ্যে তাহাকে সমন্বিত ও সমীকৃত করিয়া লইয়া আবার বেতস লতার মতই সোজা হইয়া স্ব-রূপে দাঁড়াইয়াছে। যে দুর্মর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি বেতস গাছের, সেই দুর্মর প্রাণশক্তিই বাঙালীকে বারবার বাঁচাইয়াছে।

সাম্প্রতিক বাংলার বিচিত্র ধর্মকর্মানুষ্ঠানের গভীরে একটু দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, এদেশে দেবতাদের চেয়ে দেবীদের সমাদর ও প্রতিষ্ঠা বেশি; মধ্যযুগেও তাহাই ছিল। প্রাচীন বাংলা সম্বন্ধে এ-কথা হয়তো সমান প্রযোজ্য নয়; কারণ প্রতিমা-সাক্ষ্যে দেখা যায়, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় দেবায়তনে দেবমূর্তির সংখ্যাই বেশি। তবু, মধ্যপর্ব ও সাম্প্রতিক পর্বে দেবীদের যে প্রাধান্য তাহার সূচনা যেন আদিপর্বেই দেখা দিয়াছিল। আদিম কৌম সমাজের মাতৃকাতন্ত্রের দেবীদের প্রাধান্য কৌম সমাজে তো ছিলই; বিচিত্র নামে তাঁহারা নানাস্থানে পূজাও লাভ করিতেন। পরে যখন আর্য-ব্রাহ্মণ্য পুরুষ-প্রকৃতি ধ্যান সুপ্রতিষ্ঠিত হইল তখন সেই মাতৃকাতন্ত্রের দেবীরা প্রকৃতি বা শক্তিরূপিণী বিভিন্ন দেবীর সঙ্গে, বিশেষভাবে দুর্গা ও তারার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেলেন। যাহাই হউক, আদিপর্বের শেষ পর্যায়ে দেখিতেছি দুর্গা, তারা, ষষ্ঠী, হারীতী, মনসা, মারীচী, চুণ্ডা, পর্ণশবরী প্রভৃতি, বিশেষভাবে দুর্গা ও তারা ক্রমশ সমাদৃতা ও সুপ্রতিষ্ঠিতা হইতেছেন, এবং তারার ধ্যানে তাঁহাকে একই সঙ্গে বেদমাতা অর্থাৎ সরস্বতী, গিরিজা অর্থাৎ উমা বা দুর্গা, পদ্মাবতী এবং বিশ্বমাতা বলিয়া আহ্বান করা হইয়াছে। এই ক্রমবর্ধমান মাতৃকাতন্ত্রের প্রাধান্য আদিম মাতৃতান্ত্রিক কৌম সমাজাদর্শের এবং কৌম মানসের পুনর্ঘোষণা, সন্দেহ কি!

বাঙালীর দেবায়তনে দেবীদের প্রাধান্য

প্রাচীন বাংলার প্রতিমা-সাক্ষ্যে দেখা যায়, উমা-মহেশ্বরের যুগল মূর্তিরূপ এবং শিবের বৈবাহিক বা কল্যাণসুন্দর রূপ সমসাময়িক বাঙালীর চিত্তহরণ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া

দুর্গা বা দেবীও নানা রূপ ও নানা নামে পূজা লাভ করিতেছিলেন। শিব-গৌরীর বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যে যে-ধরনের পারিবারিক ও সংসারগত ভাবকল্পনা বিস্তৃত তাহার আভাসও প্রাচীন কালেই পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে একদিকে যেমন সমসাময়িক বাঙালীর হৃদয়াবেগ ও চিত্তের স্পর্শালুতা প্রত্যক্ষগোচর তেমনই অন্যদিকে বাঙালী চিত্তে নারীর প্রাধান্য ও নারীভাবনার প্রসারও সমান প্রত্যক্ষ। আর, বজ্রযান-সহজযান প্রভৃতি ধর্মের কায়াসাধন তো নারী বা শক্তি ছাড়া সম্ভবই নয়। তাহা ছাড়া, রাধাকৃষ্ণের রূপ ও ধ্যান-কল্পনার মধ্যেও এই নারীভাবনা অনিবার্যভাবে সক্রিয়। অর্থাৎ, কোনো দেবতাই যে দেবী ছাড়া সম্পূর্ণ নহেন, নর যে নারী ছাড়া সম্পূর্ণ নহে কেবল তাহাই নয়; সে-ভাবনা তো পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য দেবায়তন-কল্পনার মধ্যেই ছিল, কিন্তু নারীকে শক্তিস্বরূপিনী বলিয়া দেখা ও ভাবা, সৃষ্টিরহস্যের মূল বলিয়া কল্পনা করা—ইহার মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ, সংসারগত ইন্দ্রিয়ালুতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত অনস্বীকার্য, এবং এই ইঙ্গিত প্রাচ্য-ভারতের, বিশেষভাবে বাংলার সৃষ্টি এবং আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দান। কৃষ্ণ-রাধা কল্পনায় রাধা হইতেছেন শিবের শক্তি, বজ্রযানীর নিরাত্মা, সহজযানীর শূন্যতা, কালচক্রযানীর প্রজ্ঞা। এই কৃষ্ণ-রাধার কল্পনা তো একান্তই প্রাচীন বাংলার শেষ পর্যায়ের রচনা। বস্তুত, বাঙালী চিত্তের গভীরে যেন সেই অনার্য আদিম তমসাচ্ছন্ন তন্ত্রসাধনার নিগূঢ় কামনা, তাহার তাড়নাতেই যেন সমস্ত ধর্মমতের গড়ণ। সাংখ্যধ্যান-কথিত পুরুষ-প্রকৃতি কল্পনার এই যে তান্ত্রিক রূপান্তর, সনাতন আর্য মানসে ইহার আবেদন স্বল্প, অথচ বাংলাদেশে এই ভাবনা অত্যন্ত সত্য ও ব্যাপক। গোপন দেহযোগ বা কায়াসাধন, নারীসাধন, শবসাধন, শূন্যধ্যান, দেহতত্ত্বের অভিনব ব্যাখা, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মেরই শাক্ত তান্ত্রিক রূপে ভীষণ ও ভয়াল সাধন-পদ্ধতি প্রভৃতিতে সর্বত্রই অধ্যাত্ম জীবনের একটি বিশেষ ভঙ্গি বর্তমান যাহা আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অনুপস্থিত।

নারী বা মাতৃকাতন্ত্র

প্রাচীন বাঙালীর হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার ইঙ্গিত তাহার প্রতিমা-শিল্পে এবং দেবদেবীর রূপ-কল্পনায় ধরা পড়িয়াছে, এ-কথা অন্যত্র বলিয়াছি, একটু আগেও ইঙ্গিত করিয়াছি। মধ্যযুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে, সহজিয়া সাধনায়, বাউলদের সাধনায় যে বিশুদ্ধ ভক্তিরস ও হৃদয়াবেগের প্রসার, তাহার সূচনা দেখা গিয়াছিল আদি পর্বেই, এবং তাহা শুধু বৌদ্ধ বজ্রযানী-সহজযানীদের মধ্যেই নয়, তান্ত্রিক শক্তি সাধনার মধ্যেই নয়, বৈষ্ণব সাধনায়ও বটে। এই হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতা যে বহুলাংশে আদিম নরগোষ্ঠীর দান তাহা আজিকার সাঁওতাল, শবর, প্রভৃতিদের জীবনযাত্রা, পূজানুষ্ঠান, সামাজিক আচার, স্বপ্নকল্পনা, ভয়-ভাবনার দিকে তাকাইলে আর সন্দেহ থাকেনা। আর্য ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ ও জৈন সাধনাদর্শে কিন্তু এই ঐকান্তিক হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার এতটা স্থান নাই। সেখানে ইন্দ্রিয়-ভাবনা

বাঙালীর হৃদয়াবেগ, প্রাণধর্ম ও ইন্দ্রিয়ালুতা

বস্তুসম্পর্কবিচ্যুত, ভক্তি জ্ঞানানুগ, হৃদয়াবেগ বুদ্ধির অধীন। বস্তুত, বাংলার অধ্যাত্ম সাধনার তীব্র আবেগ ও প্রাণবস্ত গতি সনাতন আর্য ধর্মে অনুপস্থিত।

এই হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতা প্রাচীন বাঙালী জীবনের অন্য দিকেও ধরা পড়িয়াছে। মধ্যযুগে দেখিতেছি, দেবই হউন আর দেবীই হউন, বাঙালী যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছে তাঁহাদের মর্ত্যের ধূলায় নামাইয়া পরিবার-বন্ধনের মধ্যে বাঁধিতে এবং ইহগত সংসার কল্পনার মধ্যে জড়াইতে—হৃদয়াবেগের মধ্যে তাঁহাদের পাইতে ও ভোগ করিতে, দূরে রাখিয়া শুধু পূজা নিবেদন করিতে নয়। এই কামনার সূচনা আদি পর্বেই দেখা যাইতেছে। ষষ্ঠী, মনসা, হারীতী, কৃষ্ণ-যশোদা প্রভৃতির রূপ কল্পনায়ই যে এই ভাবনা অভিব্যক্ত তাহাই নয়; কার্তিকের শিশুলীলা বর্ণনা, পিতা শিবের বেশভূষা অনুকরণ করিয়া শিশু-কার্তিকের কৌতুক, দরিদ্র শিবের গৃহস্থালীর বর্ণনা, নেশাগ্রস্থ শিবের সংসারে উমার দুঃখ এবং জামাতা ও কন্যারূপে শিব ও গৌরীকে সমস্ত হৃদয়াবেগ দিয়া আপন করিয়া বাঁধা, সপরিবারে বিষ্ণু ও শিবকে প্রত্যক্ষ করা প্রভৃতির মধ্যেও একই ভাবনা সক্রিয়।

বাঙালীর দায়াধিকার ও স্ত্রী-ধন

বাংলার ব্যবহার-শাস্ত্রে দায়াধিকারের যে আদর্শ ও ব্যবস্থা, বিশেষ ভাবে স্ত্রী-ধনের যে স্বীকৃতি ও বিধিব্যবস্থা জীমূতবাহনের দায়ভাগ-গ্রন্থে বর্ণিত এবং পরে রঘুনন্দন কর্তৃক ব্যাখাত ও সমর্থিত তাহার পশ্চাতেও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের এবং সেই পরিবার-বন্ধনের স্মৃতি বহমান; আর্য সমাজ ও পরিবার-ব্যবস্থায় দায়ভাগ ব্যবস্থার প্রচলন নাই, সেখানে মিতাক্ষরার রাজত্ব।

৭

মানবতার প্রতি প্রাচীন বাঙালীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ

যে হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার কথা এই মাত্র বলিলাম তাহারই রূপান্তরে পাইতেছি মানবতার প্রতি প্রাচীন বাঙালীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। এই যে দেবদেবীদেরও মাটির ধূলায় নামাইয়া পরিবার-বন্ধনের মধ্যে বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে ইহগত মানবিক আবেগে দেখা ও পাওয়া, ইহার মধ্যে তো উষ্ণ মানবপ্রীতির আভাসই সুস্পষ্ট। সদুক্তিকর্ণামৃত, কবীন্দ্র-বচনসমুচ্চয়, প্রাকৃতপৈঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে বাঙালীকবিকুল রচিত হরিভক্তি, গঙ্গাস্তব, শিবস্তোত্র প্রভৃতি বিষয়ক যে-সব শ্লোক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং যাহাদের দুই একটি এই গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছি তাহাদের বিশুদ্ধ ভক্তিরস ও হৃদয়াবেগ একান্তই মানবিক রসে অভিসিঞ্চিত। এই গ্রন্থের বাঙালী কবি রচিত অসংখ্য প্রকীর্ণ শ্লোকে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের ও আনন্দবেদনার যে সুক্ষ্ম স্পর্শালুবোধ সুস্পষ্ট গোচর, চর্যাগীতির গুহ্য সংকেতময় অধ্যাত্ম পদগুলিতেও সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের নানা মানবীলীলার যে-পরিচয় তাহার মধ্যেও তো একই মানবিক আবেদন সমান প্রত্যক্ষ। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃৎফলকগুলি সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে, এবং কোনো কোনো প্রতিমাফলক সম্বন্ধেও। বাংলার

প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্রশাসিত প্রতিমাশিল্পেও মানবিক ইন্দ্রিয়ালুতা এবং হৃদয়াবেগ যতটা ধরা পড়িয়াছে, এমন যেন আর কোথাও নয়। ধর্মগত এবং শাস্ত্রশাসিত ব্যাপারেও একান্ত মানবিক রসের সঞ্চার, মানবিক আবেগ ও আবেদনের অভিসিঞ্চন প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ভারতের অন্যান্য প্রান্তের সুবিস্তৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের অনেক স্থানে এই ধরনের মানবিক আবেদন প্রত্যক্ষ, বিশেষ ভাবে মহাভারতের নানা কাহিনীতে, ভাস ও কালিদাসের রচনায়। কিন্তু প্রাচীন বাংলার ধর্মকর্মে, শিল্পে ও সাহিত্যে এই মানবিক আবেদন যতটা বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট, সেখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট সুখদুঃখের প্রতিও গভীর অনুরাগ যে-ভাবে ধরা পড়িয়াছে, এমন আর কোথাও নয়। বস্তুত, বাংলার সাধনায় দেবতারা ধরা দিয়াছেন মানুষের বেশে মানুষের মত হইয়া; মানুষের মাপেই যেন দেবতার পরিমাপ। তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থেই নানা স্থানে নানা সূত্রে সংগ্রহ করা হইয়াছে। মানবিকতার প্রতি বাঙালী চিত্তের এই আকর্ষণের আভাস প্রাচীন কালেই নানাদিকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

মানবতার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ উপনিষদ্ধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৈষ্ণব ভাগবদ্ধর্মেও এই শ্রদ্ধা ও অনুরাগের ধারা বহমান। মহাভারতেও তাহাই; সেখানে তো স্পষ্টই বলা হইয়াছে, মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীব আর কেহ নাই। কিন্তু সাধারণ ভাবে ও সামগ্রিক দৃষ্টিতে আর্য ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সাধনায় সর্বশ্রেষ্ঠ জীব এই মানুষের স্থান প্রধানত গৌণ। দেবতা ও শাস্ত্র সেখানে মানুষের প্রায় সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া বিস্তৃত। যাহাই হউক, বাংলাদেশে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এবং বাঙালীর ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনায় মহাভারতের বাণী যেন আবার নূতন করিয়া শোনা গেল, এবং সাধক কবি চণ্ডিদাসের কণ্ঠে তাহা মূর্তিলাভ করিল: 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। কিন্তু চণ্ডিদাস বলিলেন সেই কথাই যাহা ছিল প্রাচীন বাঙালীর চিত্তের গভীরে, তাহার সাধনায়, বিশেষভাবে সহজযানী সিদ্ধাচার্যদের আদর্শ ও ভাবকল্পনায়। এই সিদ্ধাচার্যরা বর্ণ, শ্রেণী, ধর্ম ও আচারনুষ্ঠানের ভেদাভেদের ঊর্ধে মানুষের যে মানব-মহিমা তাহার সুস্পষ্ট ঘোষণা জানাইয়াছেন। বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, আগম কোনো কিছুরই অভ্রান্ততায় ইহারা বিশ্বাস করিতেন না; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মহাযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান, জৈনধর্ম, নাথধর্ম কোনো কিছুতেই ইহাদের শ্রদ্ধা ছিল না; যোগী-সন্ন্যাসীদের প্রতি ছিল ইহাদের নিদারুণ অবজ্ঞা! বৈরাগ্য ইহারা সাধন করিতেন না, বলিতেন বিরাগাপেক্ষা পাপ আর কিছু নাই, সুখ অপেক্ষা পুণ্য নাই। শরীরের মধ্যেই অশরীরীর গুপ্ত লীলা, এই মানবদেহেই মোক্ষের বাস, মানুষই সকল সাধনার পরমাদর্শ, পরমাশ্রয়। ভবিষ্যপুরাণের ব্রাহ্মখণ্ডেও জাত্‌ভেদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ যুক্তি দিয়া জাত্‌-বর্ণের ঊর্ধে মানুষের আপন মহিমারই জয়গান করা হইয়াছে। বজ্রসূচিকোপনিষদেও একই ঘোষণা। দোহাকোষের

টীকায় তো সুস্পষ্টই বলা হইয়াছে, সকল লোকই একজাতি, ইহাই সহজ ভাব। এই জাতি যে মানবজাতি তাহাতে আর সন্দেহ কি!

৮

এই উদার মানবতারই অন্যতম দিক্ হইতেছে প্রাচীন বাঙালীর ঐহিক বস্তুনিষ্ঠা, মানবদেহের প্রতি এবং দেহাশ্রয়ী কায়াসাধনার প্রতি অপরিমেয় অনুরাগ, সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন মুহূর্তের ও পরিবার বন্ধনের প্রতি সুনিবিড় আকর্ষণ, রূপ ও রসের প্রতি তাহার গভীর আসক্তি। সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন মুহূর্তের প্রতি বাঙালীর অনুরাগ ময়নামতী-পাহাড়পুরের মৃৎশিল্পে, সদুক্তিকর্ণামৃত, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় এবং প্রাকৃতপৈঙ্গল-গ্রন্থের নানা বিচ্ছিন্ন শ্লোকে, চর্যাগীতির পদগুলিতে, এবং তাহার লোকায়ত ধর্মকর্মের আচারানুষ্ঠানে বারবার অভিব্যক্ত। এই সুখদুঃখময় জীবনের প্রতি একটা গভীর আসক্তি প্রাচীন বাঙালীর প্রতিমাশিল্পের ও সাহিত্যের ইন্দ্রিয়স্পর্শালুতা এবং হৃদয়াবেগের মধ্যেও ধরা না পড়িয়া পারে নাই। এই আসক্তি ও আবেগ হইতেই আসিয়াছে ঐহিক বস্তুনিষ্ঠা এবং নীরস বৈরাগ্যের প্রতি বিরাগ ও অশ্রদ্ধা। প্রাচীন সাহিত্যের নানা স্থান হইতে এই ইহনিষ্ঠার অনেকগুলি শ্লোকসাক্ষ্য নানাসূত্রে উল্লেখ করিয়াছি। যে-বৈরাগ্য দুঃখের আকর বলিয়া মানব সংসারের প্রতি মানুষের চিত্তকে বিমুখ করিয়া দেয়, মানবজীবনের বিচিত্রলীলাকে মায়া বলিয়া তুচ্ছ করিতে শেখায়, পঞ্চভূতনির্মিত ও পঞ্চেন্দ্রিয়সমৃদ্ধ এই দেহকে ক্লেদকৃমিকীটের আবাস বলিয়া ঘৃণা করিতে এবং দেহকে নানা উপায়ে ক্লিষ্ট ও নির্যাতন করিতে শেখায় সেই নীরস বৈরাগ্যের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ বাঙালীর নাই—আজও নাই, মধ্যযুগেও ছিল না, এবং যতদূর ধরিতে বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীনকালেও ছিল না। যাহার সৃষ্টির ধারা হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার দিকে, নীরস বৈরাগ্যের প্রতি তাহার সেই শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ থাকিতে পারে না। বস্তুত, প্রাচীন বাঙালীর ধর্মসাধনায় এই ধরনের নীরস বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের স্থান যেন কোথাও নাই। বিশুদ্ধ স্থবিরবাদী বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। দিগম্বর জৈনধর্মের কিছু প্রসার এদেশে ছিল, কিন্তু খুবই সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে এবং তাঁহারা কখনও সাধারণ ভাবে বাঙালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। সহজযানী সিদ্ধাচার্যরা তো তাঁহাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপই করিয়াছেন! ব্রাহ্মণ্যধর্মী একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীরাও ছিলেন; তাঁহারাও যে খুব সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। মহাযানী শ্রমণ ও আচার্যদের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা তো নীরস বৈরাগী ছিলেন না, মানব-জীবন ও মানব-সংসারকে অস্বীকারও করিতেন না। নিজেরা সংসার-জীবন যাপন তাঁহারা করিতেন না এ-কথা সত্য, কিন্তু সমস্ত প্রাণী জগতের প্রতি তাঁহাদের করুণা এবং মৈত্রীভাবনা তাঁহাদের জীবন ও ধর্মসাধনাকে একটি অপূর্ব স্নিগ্ধ রসে

বাঙালী চিত্তের নীরস বৈরাগ্যবিমুখতা

সমৃদ্ধ করিয়াছিল। আর, বজ্রযানী, মন্ত্রযানী, কালচক্রযানী এবং সহজযানীদের ধর্মসাধনার ভিত্তিই তো ছিল দেহযোগ বা কায়াসাধনা, এবং তাহার পথ ও উদ্দেশ্যই হইতেছে এই দেহ এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়কুলকে আশ্রয় করিয়া দেহ-ভাবনার উর্ধে উন্নীত হওয়া। নাথধর্ম, কাপালিকধর্ম, অবধূতমার্গ, বাউলমার্গ প্রভৃতি সমস্তই মোটামুটি একই ভাবকল্পনা ও সাধনপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই ইহাদের সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য নীরস, ইহবিমুখ আত্মনিপীড়নের বৈরাগ্য নয়; দেহবন্ধন, ইহবন্ধনের মধ্যেই ইহাদের মোক্ষ বা বৈরাগ্যসাধনা, ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে অতীন্দ্রিয়ের উপলব্ধি, আসক্তির মধ্যেই নিরাসক্তির কামনা—দেহকে, ইহাসক্তিকে অস্বীকার করিয়া নয় কিংবা তাহা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াও নয়। জীবন-রসরসিকের যে পরম বৈরাগ্য সেই রূপ ও রসসমৃদ্ধ বৈরাগ্য, গৃহীমনের পরম বৈরাগ্যই প্রাচীন বাঙালীর চিত্তহরণ করিয়াছিল এবং সেই হেতুই বাংলাদেশে বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযান-সহজযান-নাথধর্ম প্রভৃতির এত প্রসার ও প্রতিপত্তি এবং সেই জন্যই বৈষ্ণব সহজিয়া সাধক কবিদের ধর্ম, আউল-বাউলদের ধর্ম এবং দেহাশ্রিত তন্ত্রধর্মের প্রতি, দেহযোগের প্রতি, ইহযোগের প্রতি বাঙালীর এত অনুরাগ।

বস্তুত, অরূপের ধ্যান এবং বিশুষ্ক জ্ঞানময় অধ্যাত্ম-সাধনার স্থান বাঙালী চিত্তে স্বল্প ও শিথিল। বাঙালী তাঁহার ধ্যানের দেবতাকে পাইতে চাহিয়াছে রূপে ও রসে মণ্ডিত করিয়া; তাঁহার সন্ধান বিশুদ্ধ বিশুষ্ক জ্ঞানের পথে ততটা নয় যতটা রূপের ও রসের পথে, অর্থাৎ বোধ ও অনুভবের পথে। প্রাচীন বাংলার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রতিমা-শিল্পে, যে-সব ধর্মকে বাঙালী হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে সেই সব ধর্মের মধ্যে এবং যে-ভাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহার মধ্যে এই উক্তির প্রমাণ প্রত্যক্ষ। বাঙালীর ভক্তি যে জ্ঞানানুগ নয়, হৃদয়ানুগ, আবেগপ্রধান, তাহা সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে বাঙালী কবির দেবস্তুতি রচনায়, তাহা সদুক্তিকর্ণামৃতেই হউক, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় বা প্রাকৃতপৈঙ্গলেই হোক, রাজকীয় লিপিমালায়ই হোক আর সাধনস্তোত্রেই হোক। আর, প্রাচীন বাংলার প্রতিমাশিল্পের ইন্দ্রিয়ালুতা এবং আবেগবাহুল্য তো একান্ত সুস্পষ্ট। সে-শিল্পসাধনা একান্তই রূপের ও রসের সাধনা। লোকায়ত ধর্মের আচারানুষ্ঠান সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে; সে-ক্ষেত্রে তো অরূপ ও বিশুষ্ক জ্ঞান-সাধনার কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারেনা। আর, মহাযান হইতে বিবর্তিত যত ধর্মমত্‌ ও পথ তাহাদের সব ক'টির সাধনা তো একান্তই রূপ ও রসাশ্রয়ী। এ-তথ্য লক্ষ্যণীয় যে, বিশুদ্ধ মহাযানী বিজ্ঞানবাদ বা মধ্যমক দর্শন বাংলাদেশে বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ্য সাধনার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সেই সব মত্‌ ও পথই চিত্তের নিকটতর করিয়া গ্রহণ করিয়াছে যাহার প্রধান আশ্রয় রূপ ও রস, অর্থাৎ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ভাবকল্পনার ধারা। ঠিক এই কারণেই বেদান্ত চর্চায় এবং বৈদান্তিক সাধনায় প্রাচীন বাঙালীর যেন অরুচি। ইহার অর্থ এ-নয় যে, বেদ-বেদান্তের চর্চা ও সাধনা

অরূপের ধ্যান ও বিশুষ্ক বন্ধ্যা জ্ঞান-সাধনায় বাঙালীর অরুচি

বাংলাদেশে একেবারে ছিল না ; ছিল বই কি, লিপিমালায় কিছু কিছু প্রমাণও আছে ; কিন্তু সে-চর্চা ও সাধনা বাংলাদেশে সমাদৃত হয় নাই, প্রতিষ্ঠাও লাভ করিতে পারে নাই। বেদান্ত ও ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের চর্চায় শুকশিষ্য, শঙ্করাচার্যের পরমগুরু গৌড়পাদ, ন্যায়কন্দলী-রচয়িতা শ্রীধরভট্ট, উদয়ন প্রভৃতি কয়েকজন প্রখ্যাত পণ্ডিত অল্পবিস্তর সর্বভারতীয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু এ-তথ্য লক্ষ্যণীয় যে, গৌড়পাদকারিকা, সাংখ্যকারিকা, বা ন্যায়কন্দলী বাংলাদেশে সমাদর লাভ করে নাই। ন্যায়কন্দলীর মত গ্রন্থের একটি টীকাও যে বাংলাদেশে রচিত হয় নাই, এ-তথ্যের ইঙ্গিত লক্ষ্যণীয়। তাহা ছাড়া, প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আছে, দক্ষিণ-রাঢ়বাসী জনৈক ব্রাহ্মণ কাশীতে গিয়া সেখানে বেদান্ত চর্চার বাহুল্য দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা অসিদ্ধ বিরুদ্ধার্থজ্ঞাপক বেদান্ত যদি শাস্ত্র হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধরা কি অপরাধ করিল! মীমাংসার চর্চাও বাংলাদেশে হইত ; শ্রীধরভট্ট, উদয়ন, অনিরুদ্ধ, ভবদেব-ভট্ট, হলায়ুধ প্রভৃতি নাম তো ভারতপ্রসিদ্ধ। অনিরুদ্ধ ও ভবদেব দুইজনই কুমারিলভট্টের মীমাংসা সম্বন্ধীয় মতামতের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তাহার উপর গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, মীমাংসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বাংলাদেশে বেশি রচিত হয় নাই ; এবং গৌড়মীমাংসক বলিতে উদয়ন শুধু শ্রীধরভট্টকেই চিহ্নিত করিয়া থাকুন আর গৌড়ীয় মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ সকল পণ্ডিতকেই বুঝাইয়া থাকুন, উদয়ন ও গঙ্গেশ উপাধ্যায় যে বলিতেছেন, গৌড়মীমাংসক যথার্থ বেদজ্ঞানবিরহিত ছিলেন, এ-তথ্যের ইঙ্গিত একেবারে নিরর্থক নয়। বস্তুত, শুধু ধর্মসাধনায় নয়, ব্যাপকভাবে অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে বিশুষ্ক, যুক্তিধর্মী বন্ধ্যা জ্ঞানচর্চা বাঙালীর চিত্তকে সমগ্রভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

বেদান্ত চর্চায় বাঙালীর বিরাগ

অথচ, প্রাচীন বাঙালী নিছক জ্ঞানের চর্চা করে নাই, বুদ্ধির অস্ত্রে শান দেয় নাই, এ-কথাও সত্য নয়। মহাযান বৌদ্ধ ন্যায়ের চর্চায় বাংলাদেশ সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিল ; ব্যাকরণ চর্চা, অভিধান চর্চা, চিকিৎসা বিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্র চর্চা ও রচনায় সর্বভারতীয় বিদ্যার ভাণ্ডারে প্রাচীন বাংলাদেশের দান তুচ্ছ করিবার মত নয়। ন্যায়, ব্যবহার ও ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও অভিধান চর্চা তো একান্তই নিছক জ্ঞান ও যুক্তিক্ষমতার চর্চা, এবং সেই ক্ষমতার বলেই প্রাচীন বাঙালীর বুদ্ধি একটা শাণিত দীপ্তিও লাভ করিয়াছিল— যে দীপ্তি ধরা পড়িয়াছে ন্যায়ের তর্কে, ধর্ম ও ব্যবহার শাস্ত্রের যুক্তিতে, ব্যাকরণের ও অভিধানের নূতন ও মৌলিক সূত্র রচনায়। সে-দীপ্তিই দেখিতেছি মধ্যযুগে নব্যন্যায়ের চর্চায় এবং সাধারণভাবে বাঙালীর ন্যায় ও ব্যবহারকুশলতায়। কিন্তু, আসল কথা হইতেছে, বাঙালী তাহার এই বুদ্ধির দীপ্তিকে সৃষ্টিকার্যে নিয়োজিত করে নাই। যেখানে জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়া নবতর গভীরতর জীবন সৃষ্টির আহ্বান সেখানে, অর্থাৎ

বাঙালীর সৃজন প্রতিভার মূল উৎস— শক্তি ও দুর্বলতা

শিল্প ও সাহিত্য-সাধনায়, ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনায় সে মননের উপর নির্ভর করে নাই, বুদ্ধি ও যুক্তির নৌকায় ভর করে নাই; বরং সেখানে সে আশ্রয় করিয়াছে তাহার সহজ প্রাণশক্তি, হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতাকে, এবং ইহাদেরই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বুদ্ধিকে তত উদ্রিক্ত করে না যতটা স্পর্শ করে হৃদয়কে, প্রাণকে। এই প্রাণধর্ম, হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতাই বাঙালীর সৃষ্টি-প্রতিভার মূল; ইহারাই তাহার শক্তি, ইহারাই আবার তাহার দুর্বলতাও।

৯

ভাবকল্পনা ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাচীন বাঙালীর অনুরাগ, আগেই দেখিয়াছি, জীবনের ছোটখাট সুখদুঃখ-আনন্দবেদনার দিকে, দৈনন্দিন সংসারের বিচিত্র লীলার দিকে। সেখানে হৃদয়াবেগ, প্রাণধর্ম ও ইন্দ্রিয়ালুতার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তির রূপক্ষেত্র স্বল্পায়তন। ভারতবর্ষের অন্যত্র—বাঘ, অজন্তা, এলোরায়—বিস্তৃত গুহাপ্রাচীরগাত্রে দীর্ঘায়ত মণ্ডিত রেখায় ও গভীর রঙের মণ্ডিত প্রলেপে শিল্পীর গভীর ও প্রসারিত ভাবকল্পনা ও বুদ্ধি রূপায়িত; দেবদেবী, মানুষ, পশুপক্ষী, নিসর্গ-প্রকৃতি সকলে মিলিয়া সেখানে জীবনের সুগভীর সুবিস্তৃত সমৃদ্ধি। বাঙালী শিল্পী ছবি আঁকিয়াছেন স্বল্পায়তন পুঁথিপত্রের সীমার মধ্যে; সেই ছবিতে কলাকৌশলের কোনো শৈথিল্য বা দুর্বলতা নাই, কিন্তু ভাবকল্পনার কোনো সমৃদ্ধিও নাই, না মননের গভীরতায়, না বিস্তৃতিতে। দেবতা, মানুষ, প্রকৃতি সবই আছে সেই ছবিতে, আবেগ-গভীরতা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির ঐশ্বর্যও কম নয়; কিন্তু সমস্তই যেন স্বল্পতার মধ্যে, সীমিত রূপায়তনের মধ্যে অভিব্যক্ত, জীবনের আবর্তিত বিস্তৃতি ও মননের গভীরতার পরিচয় সেখানে নাই। প্রাচীন বাঙালী মন্দির-বিহার প্রভৃতিও গড়িয়াছে, কিন্তু ভুবনেশ্বর, খাজুরহো বা দক্ষিণ-ভারতের মত প্রসারিত, বিস্তৃতায়তন মন্দির-নগরী গড়ে নাই, এবং বিহার বা মন্দির যাহা গড়িয়াছে, এক পাহাড়পুর এবং অন্য দুই একটি স্থান ছাড়া আর কোথাও সে-মন্দির বা বিহার খুব বৃহদায়তন নয়, আকাশচুম্বীও নয়; অধিকাংশ মন্দিরই ছিল স্বল্পায়তন। বস্তুত, প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বৃহৎ দুঃসাহসী কল্পনা-ভাবনা, বৃহৎ কর্মশক্তি বা গভীর গঠন নৈপুণ্যের পরিচয় বিশেষ নাই। শুধু স্থাপত্যের ক্ষেত্রেই নয়, ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাঙালী খুব বৃহৎ দুঃসাহসী মনন ও কল্পনা-ভাবনার দিকে কোথাও অগ্রসর হয় নাই। সারনাথের বুদ্ধ-প্রতিমায়, মধ্যভারতে উদয়গিরির ভাস্কর্যে, এলিফ্যাণ্টা ও এলোরার ভাস্কর্যে, দক্ষিণ-ভারতের নটরাজ-প্রতিমায় যে গভীর দুঃসাহসী মনন ও ভাবনা-কল্পনার বিস্তার, ভাব ও আয়তন উভয়ত, বাংলার ভাস্কর্যে তাহার পরিচয় কোথাও বিশেষ নাই। কিন্তু, সূক্ষ্ম কমনীয়তা, হৃদয়ের আবেগ এবং ইন্দ্রিয়ালুতার গভীরতায় তাহার তুলনা বিরল; এবং এ-সমস্তই স্বল্পায়তনে, সংকীর্ণ

প্রাচীন বাঙালীর সৃষ্টির ধারায় গভীর মনন, প্রশস্ত ভাবনা-কল্পনার অভাব

ভাবসীমায় সীমীত। মৃৎফলক শিল্পও পরস্পর বিচ্ছিন্ন; দীর্ঘায়ত একটি কাহিনীর রূপায়ন নয়, ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন টুক্‌রা টুক্‌রা জীবনচিত্র পর পর চলিয়াছে প্রাচীরগাত্র জুড়িয়া। বিস্তৃতায়ত গভীর জীবনের পরিচয় সেখানে নাই। মৃৎফলক-শিল্পে হয়তো তাহা সম্ভবও নয়। সে-ক্ষেত্রে শিল্পদৃষ্টির জন্যই বিচ্ছিন্ন ক্ষণিক মুহূর্তের মধ্যে। যাহা হউক, এই স্বল্পায়ত এবং সীমিত সৃষ্টিভাবনার কারণ কি তাহার আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি, এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিব না। সংক্ষেপে শুধু বলা যায়, প্রাচীন বাঙালীর কৃষিনির্ভর জীবনের সমৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা ছিল পরিমিত, চিত্তসমৃদ্ধি ছিল ক্ষীণায়ত, এবং বৃহৎ, গভীর, মননসমৃদ্ধ দুঃসাহসী জীবনের প্রশস্ত কোনো স্পর্শ সে-জীবনে লাগে নাই। কাজেই শিল্পেও সে-পরিচয় নাই।

সৃষ্টিভাবনার এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছে ছোট ছোট গীতি-কবিতার প্রতি প্রাচীন বাঙালীর অনুরাগের মধ্যেও। প্রাচীন বাঙালী কোনো মহাকাব্য রচনা করে নাই, সার্থক, বৃহৎ ও গভীর ভাবকল্পনার কোনো নাটকও নয়। ধোয়ীর পবনদূত ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ তো গীতিকাব্যই; গোবর্ধনের সপ্তশতীও তাহাই। সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিত কিংবা শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতকেও বৃহৎ ও গভীর ভাবনা-কল্পনার কাব্য বলা চলেনা, যদিও ইহাদের পরিসর একেবারে তুচ্ছ করিবার মতন নয়। বস্তুত, বৃহৎপরিসরের কাব্য, এমন কি ছোট ছোট, রসহীন অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, রূপকালঙ্কারবহুল কাব্য বোধ হয় প্রাচীন বাঙালীর খুব রুচিকর ছিলনা; তাহার বেশি রুচিকর ছিল অপভ্রংশ এবং প্রাকৃত গীতির পদ ও ছড়া, যে-ধরনের পদ ও ছড়া আমরা চর্যাপদ, দোহাকোষ, প্রাকৃতপৈঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাই; তাহা ছাড়া ছোট ছোট সংস্কৃত কবিতা, প্রকীর্ণ শ্লোক, গীতি-কবিতার মূল রূপটি অর্থাৎ সংকীর্ণ পরিসরে হৃদয়ের গভীর আবেগ ও প্রাণস্পর্শটি যাহাদের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে, এমন শ্লোক ও খণ্ড কবিতাও বাঙালীর খুব প্রিয় ছিল, যেমন কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় বা সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের পদ ও শ্লোক। বস্তুত, এই ধরনের গীতিকবিতা-সংগ্রহ বা চয়নিকার ধারার উদ্ভব এই বাংলাদেশেই, এবং মধ্যযুগে পদ্যাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বৈষ্ণব মহাজনদের পদসংগ্রহ এই ধারায়ই চলিয়া আসিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, গীতি-কবিতার প্রতি এই অনুরাগই মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যের বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর প্রসার ও সমাদৃতির মূলে। গীতি-কবিতাতেই যেন বাঙালীর প্রতিভা মুক্তি পাইয়াছে, এবং এই গীতি-কবিতাই বাঙালীর চিত্তে আজও সাড়া জাগায়। মহাকাব্যের বিরাট প্রসার ও গভীর আবর্ত যেন তাহার তত রুচিকর নয়। বস্তুত, প্রাচীন বাঙালীর সাহিত্যে কোথাও মননের গভীর গাম্ভীর্য ও ভাবকল্পনার বিরাট প্রসার নাই; তাহার পরিবর্তে আছে প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ালু গভীরতা এবং সীমিত ব্যাপ্তির মধ্যে ভাবানুভূতির তীব্রতা। ইহাই বাঙালীর সৃজন প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

১০

এ-পর্যন্ত যে-সব ইঙ্গিত ধরিতে চেষ্টা করিলাম তাহা বাঙালীর গভীর চরিত্র ও জীবন-দর্শনগত, যে-চরিত্র ও জীবনদর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে বাঙালী-জনের গঠন, ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং ইতিহাসের আবর্তন-বিবর্তনের সম্মিলিত ফলে। এই চরিত্র ও জীবনদর্শন একাধারে প্রাচীন বাঙালীর শক্তি ও দুর্বলতা। তাহার সমাজ ও রাষ্ট্রবিন্যাসে, জীবন ও সংস্কৃতিতে এই শক্তি ও দুর্বলতা উভয়ই প্রতিফলিত, এবং লাভ এবং ক্ষতি দুইই সেই শক্তি ও দুর্বলতা অনুযায়ী।

উত্তরাধিকার

আদিপর্বের বাঙালী যে-উত্তরাধিকার তাহার মধ্যপর্বের বংশধরদের হাতে তুলিয়া দিয়া গেল তাহার মধ্যে প্রধান ও প্রথম উত্তরাধিকার এই চরিত্র ও জীবনদর্শন। মধ্যপর্বে ইতিহাসের আবর্তন-বিবর্তনে এই চরিত্র ও জীবনদর্শনের কোন দিকে কতখানি অদল বদল হইবে সেই আলোচনা আদিপর্বে অবান্তর। কিন্তু এই উত্তরাধিকার লইয়াই মধ্যপর্বের যাত্রারম্ভ, এ-কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

সদ্যোক্ত চরিত্র ও জীবনদর্শন ছাড়া আর যাহা উত্তরাধিকার তাহা এক এক করিয়া তালিকাগত করা যাইতে পারে। ক্ষতির ও ক্ষয়ের অঙ্কের দিকটাই আগে বলি।

মুহম্মদ বখ্‌ত্‌-ইয়ারের সফল নবদ্বীপাভিযানের ফলে গৌড়ে ও রাঢ়ে মুসলিম-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল, সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে এ-তথ্যও নিঃসন্দেহে যে, পূর্ব-বঙ্গে স্বাধীন সেনবংশ আরও প্রায় সার্ধশতাব্দী কালেরও বেশি রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাহা ছাড়া, ত্রিপুরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্বাধীন, এবং গৌড়ে-রাঢ়ে ও দেশের অন্যত্র প্রায় স্বাধীন সামন্ত হিন্দু রাজবংশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আধিপত্য বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কেশবসেন বোধ হয় একাধিকবার যবন-রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধও করিয়া থাকিবেন। কিন্তু যে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা এবং তাহার চেয়েও বড় কথা, বাঙালী ও বাংলাদেশ যে সর্বব্যাপী মহতী বিনষ্টির সম্মুখীন হইয়াছিল সেই পরাধীনতা ও বিনষ্টির হাত হইতে বাঁচিতে হইলে যে চরিত্রবল, যে সমাজশক্তি এবং যে সুদৃঢ় প্রতিরোধ কামনা থাকা প্রয়োজন সমসাময়িক বাঙালীর তাহা ছিলনা। কারণ, দ্বাদশ শতকের বাংলাদেশ পরবর্তী দুই শতকের হাতে যে-সমাজবিন্যাস উত্তরাধিকার স্বরূপ রাখিয়া গেল সেই সমাজ জাত্‌-বর্ণ এবং অর্থনৈতিক শ্রেণী উভয় দিক হইতেই স্তরে স্তরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত; প্রত্যেকটি স্তর ও স্তরাংশ সুদৃঢ় প্রাচীরে নিশ্ছিদ্র করিয়া গাঁথা; এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাতায়াতে প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, এক স্তর অন্য স্তরের প্রতি অবিশ্বাসপরায়ণ, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একের স্বার্থ অন্যের পরিপন্থী।

ক্ষতি ও দুর্বলতার দিক

দ্বিতীয়ত, সে-সমাজের চরিত্র শিথিল। ব্যাপক সামাজিক দুর্নীতির কীট ভিতর হইতে সামাজিক জীবনের সমস্ত শাঁস ও রস শুষিয়া লইয়া তাহাকে ফাঁপা করিয়া দিয়াছিল।

তখন রাষ্ট্রে, ধর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে, দৈনন্দিন জীবনে যৌন অনাচার, নির্লজ্জ কামপরায়ণতা, মেরুদণ্ডবিহীন ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা, রুচিতারল্য এবং অলংকারবাহুল্যের বিস্তার।

তৃতীয়ত, সে-সমাজ একান্তভাবে ভূমি ও কৃষিনির্ভর, এবং সেই হেতু উচ্চস্তরে ছাড়া বৃহত্তর বাঙালী সমাজ সাধারণভাবে দরিদ্র এবং যেহেতু তাহার বিত্তশক্তি পরিমিত সেই হেতু বৃহত্তর সমাজের উদ্ভাবনী শক্তিও দুর্বল, জীবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা শিথিল।

চতুর্থত, সে-সমাজ, বিশেষত তাহার উচ্চতর স্তরগুলি একান্তভাবে ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন। এই আচ্ছন্নতায় দোষ ছিলনা যদি সেই ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টি প্রাগ্রসর সৃষ্টিপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইত। কিন্তু সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টি ধর্মশাস্ত্রের সুদৃঢ় বিধিবিধানে অন্ধ করিয়া বাঁধা, সে-দৃষ্টি রক্ষণশীল এবং চলচ্ছক্তিহীন, অর্থহীন আচারবিচারের মরু-বালিরাশির মধ্যে তাহা পথ হারাইয়াছে। অথচ, সামাজিক নেতৃত্বের বল্গার একটা দিক তাঁহাদেরই হাতে; আর একটা দিক রাজা বা রাষ্ট্রের হাতে এবং সেই রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত প্রভৃতিদেরই প্রাধান্য। যাঁহারা এই সব ধর্মশাস্ত্রের রচয়িতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁহারাই আবার প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী।

পঞ্চমত, সে-সমাজ একান্তই ভাগ্য অর্থাৎ জ্যোতিষনির্ভর; এবং যেহেতু ভাগ্যনির্ভর সেই হেতু সেই সমাজে প্রতিরোধের ইচ্ছা ও শক্তি অত্যন্ত শিথিল, প্রায় নাই বলিলেই চলে। সমসাময়িক বাংলার রাজা ও প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীরা অনেকেই নিজেরা জ্যোতিষ চর্চা করিতেন, দিনক্ষণ না দেখিয়া ঘর ছাড়িয়া এক পা' বাহির হইতেন না; রাজসভায় জ্যোতিষী ও মৌহূর্তিকদের সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল ক্রমবর্ধমান। রাজা ও রাজসভার এবং উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর এই ভাগ্যনির্ভর মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে বৃহত্তর সমাজদেহেও বিস্তারিত হইয়া এবং দেশের সমস্ত সংগ্রাম ও প্রতিরোধকামনার মূলোচ্ছেদ করিয়া দিয়াছিল। মুসলমানাধিপত্যের সূচনা ও বিস্তারকে দেশ ভাগ্যের অমোঘ লিখন বলিয়াই গ্রহণ করিতে শিখিয়াছিল; কাজেই প্রতিরোধ নিরর্থক!

ষষ্ঠত, সে-সমাজে অসংখ্য নরনারী ছিলেন যাঁহাদের ধর্মমত্ ও পথ এবং ধর্মের আচারানুষ্ঠান প্রভৃতি ছিল সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শের পরিপন্থী। এই সব নরনারী এমন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বাধ্য হইয়াই যাঁহাদের জীবনযাত্রা ছিল গোপন; লোকচক্ষুর অন্তরালে রাত্রির অন্ধকারে ছিল তাঁহাদের যত ক্রিয়াকর্ম। গুহ্য গোপন রহস্যময় ছিল বলিয়াই ইঁহারা অনেকের চিত্তকে আকর্ষণও করিতেন। এই ধরনের গুহ্য গোপন গোষ্ঠী সকল দেশে সকল কালেই সমাজশক্তির অন্যতম প্রধান দুর্বলতা, কারণ, যে-শক্তি সমাজের নায়কত্ব করিতেছে তাহাকে দুর্বল করাই ইঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু, এই সব গুহ্য গোপন গোষ্ঠীগুলির যে ধর্মমত্ ও পথ তাহা কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক মুক্তির বাণী বহন করে নাই, কাজেই সামাজিক দিক হইতে এই সব গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের বৈপ্লবিক সক্রিয়তা বিশেষ কিছু ছিল না। তাহা ছাড়া, গুহ্য রহস্যময় গোপনতার আড়ালে এই সব

সম্প্রদায়ের ভিতর ও বাহিরে নানাপ্রকারের অসামাজিক যৌন আচারানুষ্ঠান এবং ধর্মের নামে নানা ব্যভিচারও বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল! তাহাও ভ তর হইতে সমাজকে পঙ্গু ও দুর্বল করিয়া দিয়াছিল, সন্দেহ কি?

সপ্তমত, সে-সমাজের নিম্নতর কৃষিজীবী স্তরগুলি ছিল একান্ত অবজ্ঞাত, হৃতচেতন ও সংকীর্ণ। যে-সব উচ্চতর স্তরের হাতে ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের নায়কত্ব তাহাদের দৃষ্টি-পরিধির মধ্যে এই স্তরগুলির কোনো স্থান ছিল না। স্বভাবতই সেই-জন্য রাষ্ট্র ও সমাজ-নায়কদের প্রতি তাহাদের কোনো বিশ্বাস ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিলনা, সচেতন দায়িত্ববোধও ছিল না। গুহ্য রহস্যময় গোপন ধর্মসম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধেও এ-কথা সমান প্রযোজ্য। কাজেই ইহাদের মধ্যে বিপ্লব-বিদ্রোহের একটা বীজ সুপ্ত থাকিবে ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। হয়তো সুনিহিত সুষুপ্ত এই বীজটি সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে কোনো সচেতনতা ছিল না; জল ঢালিয়া, উত্তাপ সঞ্চার করিয়া সেই বীজ হইতে গাছ জন্মাইয়া ফুল ও ফল ফলাইবার মত সচেতন নেতৃত্ব কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণী গ্রহণও করে নাই; করিলে কি হইত বলা যায় না। বস্তুত, শ্রেণী-হিসাবে শ্রেণীচেতনা ছিলনা বলিয়া নেতৃত্ব দিবার মত শ্রেণী গড়িয়াও উঠে নাই। একটা বৃহৎ, গভীর ও ব্যাপক সামাজিক বিপ্লবের ভূমি পড়িয়াই ছিল; কিন্তু কেহ তাহার সুযোগ গ্রহণ করে নাই। মুসলমানেরা না আসিলে কি ভাবে কি উপায়ে কি হইত, বলিবার উপায় নাই। যাহা অনুকূল অবস্থায় একটা সামাজিক বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করিতে পারিত তাহাই মুসলমানেরা রাষ্ট্রীয় অধিকার পাওয়ার ফলে অন্যতর খাতে বহিতে আরম্ভ করিল। এ-সমস্ত কথাই এই গ্রন্থের যথাস্থানে সবিস্তারে প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে বলিয়াছি; এখানে সংক্ষেপে ইঙ্গিতগুলি ধরিলাম মাত্র।

কিন্তু ক্ষয় ও ক্ষতির কথা যদি বলিলাম, লাভের দিকটার কথাও বলি।

যে গুহ্য রহস্যময় গোপন ধর্মসম্প্রদায়গুলির কথা একটু আগেই বলিয়াছি তাহাদের মধ্যে সমাজের একটা শক্তিও প্রচ্ছন্ন ছিল। সে-শক্তি মানবতার এবং সাম্যভাবনার শক্তি। পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই যে, এই ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে, বিশেষভাবে সহজযানী প্রভৃতি বৌদ্ধ ও নাথসম্প্রদায় প্রভৃতির মধ্যে মানুষে মানুষে বর্ণ ও শ্রেণীগত বিভেদ-ভাবনা প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। তাহা ছাড়া, মানবতার একটা উদার আদর্শও ছিল ইহাদের মধ্যে সক্রিয়। এই উদার সাম্যভাবনা ও মানবতার আদর্শের স্থান সমসাময়িক, অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শতকের ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শ ও সংস্থার মধ্যে কোথাও ছিল না। অথচ, ইহার, অর্থাৎ এই সাম্যভাবনা ও মানবতার আদর্শের উপরই মধ্যযুগীয় বাংলার বৃহত্তম ও গভীরতম ধর্ম ও সমাজ-বিপ্লবের অর্থাৎ চৈতন্যদেব প্রবর্তিত সমাজ ও ধর্মান্দোলনের প্রতিষ্ঠা। বস্তুত, দেশে দেশে যুগে যুগে মুক্ত মানব এই আদর্শের জন্যই সংগ্রাম করিয়াছে, এখনও করিতেছে, ভবিষ্যতেও করিবে। এই আদর্শই মধ্যপর্বের হাতে আদিপর্বের শ্রেষ্ঠতম, মহত্তম উত্তরাধিকার।

দ্বিতীয় উত্তরাধিকার, ভূমিনির্ভর কৃষিনির্ভর সমাজ। ঐকান্তিক ভূমি ও কৃষি-নির্ভরতার দুর্বলতার কথা নানাসূত্রে বলিয়াছি ; কিন্তু তাহার একটা গভীর শক্তিও আছে, এবং সে-শক্তি অনস্বীকার্য। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর সমাজ প্রায় অনড়, অচল ; তাহার জীবনের মূল মাটির গভীরে। সে-সমাজের সংস্কৃতি সম্বন্ধেও একই উক্তি প্রযোজ্য। বিশেষভাবে যে-সমাজে যতদিন পর্যন্ত গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিই ধনোৎপাদনের একমাত্র বা অন্তত প্রধানতম উপায় সেখানে ততদিন পর্যন্ত সেই জীবন ও সংস্কৃতির কোনো পরিবর্তন ঘটানো সহজে সম্ভব নয়—যদি উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তন কিছু না ঘটে, এবং তেমন বিবর্তন প্রাচীন বাংলায় কিছু ঘটে নাই। এই শক্তির বলেই ভারতীয়, তথা বাংলার সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা আজও অক্ষুন্ন, এবং এই শক্তিই জনসাধারণকে রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন, রাজবংশের সৃষ্টি ও বিলয়, যুদ্ধবিগ্রহ, ধর্মের ও সমাজের সংঘাত প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া নিজের দৈনন্দিন জীবনযাপন করিবার ক্ষমতা ও বিশ্বাস যোগাইয়াছে।

লাভ ও শক্তির দিক

তৃতীয় উত্তরাধিকার, শক্তিধর্মের দিকে বাঙালীর ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ। এ-তথ্য লক্ষ্যণীয় যে, আদিপর্বের শেষের দিক হইতেই দুর্গা, কালী ও তারার প্রতিপত্তি বাড়িতেছিল, এবং এই তিন দেবীই যে শক্তির আধার, ঘনায়মান অন্ধকারে ইঁহারাই যে একমাত্র আশা ও ভরসা, এ-বিশ্বাস যেন ক্রমশ বাঙালীচিত্তকে অধিকার করিতেছিল। বস্তুত, এই সময় হইতেই বাংলার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাধনায় তান্ত্রিক শক্তিধর্মের প্রাধান্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার মত যে, মুসলমানাধিকারের কিছুকাল পরই শক্তিসাধক বাঙালীর অন্যতম বেদ কালিকাপুরাণ রচিত হয় এবং শক্তিময়ী কালী বাঙালীর অন্যতম প্রধান উপাস্যা দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হন। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের বাংলার শ্মশানে কালীর উপাসনা করিয়াই বাঙালী ভয়-ভাবনার কিছুটা উর্ধে উঠিতে, চিত্তে একটু সাহস ও শক্তি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই কালীই তাহার চণ্ডী, এবং সমস্ত মধ্যপর্বে চণ্ডীর প্রতাপ দুর্জয় !

চতুর্থ উত্তরাধিকার, সৃজ্যমান বাংলাভাষা। ক্রমবর্ধমান এই ভাষাই একদিক দিয়া ধীরে ধীরে জনসাধারণের মনকে মুক্তি দিতে আরম্ভ করিল। সংস্কৃতের সুদৃঢ় প্রাচীর যখন শিথিল হইল তখন জনসাধারণ আপন ভাষার মাধ্যমেই তাহাদের চিন্তাভাবনা স্বপ্নকল্পনাকে রূপদান করিবার একটা সুযোগ পাইল। বস্তুত, বাংলার ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম দেশের লোক দেশি ভাষায় আপন প্রকাশ খুঁজিয়া পাইল, ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মন ও হৃদয়ের কথা শোনা গেল। মধ্যপর্বের গোড়ায় সেইজন্যই এই ভাষার প্রতি ব্রাহ্মণ এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য সমাজের একটা বিরাগ ও বিরোধীতা সক্রিয় ছিল, এবং সেই কারণেই এই ভাষার প্রতি মুসলমান-রাষ্ট্রশক্তি কিছুটা আকৃষ্টও হইয়াছিল। এই ভাষাই মধ্যপর্বে বাঙালীর অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে বিবর্তিত হইল।

*

ইতিহাসের কথা বলা শেষ হইল। কিন্তু ঐতিহাসিকও তো সামাজিক মানুষ; একটি বিশেষ কালে একটি বিশেষ সমাজ-সংস্থার মধ্যে তাহার বাস। তাহার কাজ পশ্চাতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া 'রাগদ্বেষবহির্ভূত হইয়া ভূতার্থ' বলা। কিন্তু সামাজিক মানুষ হিসাবে সেই ভূতার্থই তাঁহাকে তাঁহার সমসাময়িক সমাজকে দেখিবার ও বুঝিবার যথাযথ দৃষ্টি ও বুদ্ধি দান করে, এবং ভবিষ্যতের সমাজ-সংস্থা কল্পনা করিবার এবং গড়িবার প্রেরণা সঞ্চার করে। আবার, এই দৃষ্টি ও প্রেরণাই তাঁহাকে ভূত অর্থাৎ অতীত এবং ভূতার্থকে বুঝিতে, ধরিতে সাহায্য করে।

বলিয়াছি, মুসলিম-রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বের হিন্দুস্থানের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া প্রসিদ্ধ উর্দুভাষী কবি হালি বলিয়াছিলেন, 'ইধ্‌র হিন্দ্‌মে হরতরফ আন্ধেরা' —এদিকে হিন্দুস্থানে তখন চারিদিকে অন্ধকার'! এ-কথার ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাংলাদেশের পক্ষেও এ-কথা সমান প্রযোজ্য। বস্তুত, এদেশে বৈদেশিক মুসলিম-রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়; দৈবের অভিশাপও নয়; তাহা কার্য-কারণ সম্বন্ধের অনিবার্য শৃঙ্খলায় বাঁধা। তখন দেশের সমসাময়িক সমাজের যে-অবস্থা তাহার মধ্যে একটা বিরাট ও গভীর বিপ্লবাবর্তের নানা ইঙ্গিত নিহিতই ছিল। কিন্তু সজ্ঞান সচেতনতায় সেই ইঙ্গিতকে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাকে সংহত করিয়া বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টায় নিয়োজিত করিবার নেতৃত্ব সমাজের ভিতর হইতে উদ্ভূত হয় নাই। এই ধরনের বিপ্লবাবর্ত আপনা হইতেই ঘটে না; ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকিলেও সময় মত বীজ না ছড়াইলে ফসল ফলে না। এদেশেও হইল তাহাই; সময় বহিয়া গেল, ফসল ফলাইবার কাজে কেহ অগ্রসর হইল না। তাহার দামও দিতে হইল; পঙ্গু ও দুর্বল, ক্ষীণায়ত ও শক্তিহীন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা বাহির হইতে এক একটি ধাক্কায় ধ্বসিয়া ধ্বসিয়া পড়িল এবং সেই সুযোগে বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়া গেল।

ঐতিহাসিকের ভাবনা

সমাজদেহে যতদিন জীবনীশক্তি থাকে ততদিন ভিতর-বাহির হইতে যত আঘাতই লাগুক সমাজ আপন শক্তিতেই তাহাকে প্রতিরোধ করে, প্রত্যাঘাতে তাহাকে ফিরাইয়া দেয়, অথবা জীবনের কোনো ক্ষেত্রে, বা কোনো পর্যায়ে পরাভব মানিলেও অন্য সকল ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে নূতনতর শক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া নিজেকেই শক্তিমান করিয়া তোলে। সমাজেতিহাসের এই যুক্তি প্রায় জৈব জীবনেরই বিবর্তনের যুক্তি। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস এই বিবর্তন-যুক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই যুক্তিতেই ভারতবর্ষ বারবার তাহার রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাকে নূতনতর সমাজশক্তিতে রূপান্তরিত করিয়াছে, সকল আপাতবিরুদ্ধ প্রবাহকে, বিরোধী শক্তিকে সংহত করিয়া নূতন রূপদান করিয়া নিজেকেই সমৃদ্ধ ও শক্তিমান করিয়াছে —সমাজদেহে জড়ের জঞ্জাল স্তূপীকৃত হইতে দেয় নাই।

কিন্তু নানা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে, মানুষের ব্যক্তি, বর্ণ ও শ্রেণী-

স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণায় সমাজদেহ যখন ভিতর হইতে ক্রমশ পঙ্গু ও দুর্বল হইয়া পড়ে তখন ভিতরে ভিতরে জড়ের জঞ্জাল এবং মৃতের আবর্জনা ধীরে ধীরে জমিতে জমিতে পুঞ্জ পুঞ্জ স্তূপে পরিণত হয়; জীবনপ্রবাহ তখন আর স্বচ্ছ সবল থাকে না, মরুবালিরাশির মধ্যে তাহা রুদ্ধ হইয়া যায়, অথবা পঙ্কে পরিণত হয়। সমাজদেহে তখন আর ভিতর-বাহিরের কোনো আঘাতই সহ্য করিবার মতন শক্তি ও বীর্য থাকে না, প্রত্যাঘাত তো দূরের কথা। বিবর্তনের যুক্তিও তখন আর সক্রিয় থাকে না; বস্তুত, দান ও গ্রহণের, সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণের যে-যুক্তি বিবর্তনের গোড়ায়, অর্থাৎ বিবর্তনের যাহা স্বাভাবিক জৈব নিয়ম তাহা পালন করিবার মত শক্তিই তখন আর সমাজদেহে থাকে না।

সমাজের এই অবস্থাই বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করে; বস্তুত, ইহাই বিপ্লবের ইঙ্গিত। কিন্তু ইঙ্গিত থাকিলেই, ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলেই বিপ্লব ঘটে না; সেই ইঙ্গিত দেখিবার ও বুঝিবার মত বুদ্ধি ও বোধ থাকা প্রয়োজন, ক্ষেত্রে ফসল ফলাইবার মত প্রতিভা ও কর্মশক্তি, সংহতি ও সংঘশক্তি থাকা প্রয়োজন। নহিলে ইঙ্গিত ইঙ্গিতই থাকিয়া যায়, সময় বহিয়া যায় বিপ্লব ঘটেনা। এমন অবস্থায় বাহির হইতে ঝড় আসিয়া যখন বুকের উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে তখন আর তাহাকে ঠেকানো যায়না, এক মুহূর্তে সমস্ত ধূলিসাৎ হইয়া পড়ে; বিপ্লবের ইঙ্গিত অন্যতর, নূতনতর ইঙ্গিতে বিবর্তিত হইয়া যায়; ক্ষেত্রের চেহারাই একেবারে বদলাইয়া যায়, একেবারে নূতন সমস্যা দেখা দেয়। আর, বাহির হইতে ঝড় না লাগিলে, যথাসময়ে বিপ্লব না ঘটাইলে, পঙ্গু ও দুর্বল, ক্ষীয়মান সমাজদেহ আপনা হইতেই ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং একদিন জৈব নিয়মেই মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে। তখন আবার ভ্রূণাবস্থা হইতে অর্থাৎ প্রায় আদিম অবস্থা হইতে নূতন সমাজদেহের উদ্ভব ঘটে। উভয় ক্ষেত্রেই দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ ধরিয়া পরবর্তী কালকে তাহার মূল্য দিয়া যাইতে হয়।

বাংলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের গভীরে নানা দিক হইতে দেখিলে মনে হয়, বোধ হয় সেই মূল্যই আজও আমার দিতেছি, এবং পূর্ণ মূল্য না দিয়া অগ্রসর হইবার উপায়ও বোধ হয় নাই।

॥ ১৫ অগষ্ট, ১৯৪৯ ॥

পরিশিষ্ট

লিপিমালা-সূচী

প্রাচীন বাংলার যে-সব প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত লিপি এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা এইখানে তালিকাগত করিতে চেষ্টা করিলাম। গ্রন্থ এবং গ্রন্থাংশ ছাপা হইয়া যাওয়ার পর আরও দুই চারিটি লিপি প্রকাশিত হইয়াছে, নূতন দুই চারিটি আবিষ্কৃতও হইয়াছে। তাহাও এই তালিকায় স্থান পাইয়াছে, এবং সেই সব লিপিবদ্ধ নূতন সংবাদও এই তালিকাসূত্রে উপস্থিত করা হইতেছে।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতক (আনুমানিক)

মহাস্থান-শিলালিপি (খণ্ডিত)—Epigraphia Indica, vol. XXI. p. 83.; Indian Historical Qly., vol. X. p. 58.

নোয়াখালি সিলুয়া-শিলালিপি—Ann. Report of the Arch. Survey of India.

খ্রীষ্টোত্তর চতুর্থ শতক (আনুমানিক)

চন্দ্রবর্মার শুশুনিয়া-শিলালিপি—Epigraphia Indica, vol. XIII. p. 133.

পঞ্চম শতক

(প্রথম) কুমারগুপ্তের ধনাইদহ-তাম্রশাসন (গুপ্ত সং ১১৩ = ৪৩২-৩৩ খ্রী)—Epigraphia Indica, vol. XVII. p. 345.

(প্রথম) কুমারগুপ্তের কলাইকুড়ি-তাম্রশাসন (গুপ্ত সং ১২০ = ৪৩৯-৪০ খ্রী)—বঙ্গশ্রী মাসিক-পত্র, বৈশাখ, ১৩৫০, ৪১৫-২১ পৃ।

(প্রথম) কুমারগুপ্তের ১নং দামোদরপুর-তাম্রশাসন (গুপ্ত সং ১২৪ = ৪৪৩-৪৪ খ্রী)—Epigraphia Indica, vol. XV. p. 129.

" " ২নং দামোদরপুর-তাম্রশাসন (গুপ্ত সং ১২৯ = ৪৪৮-৪৯ খ্রী)—Epigraphia Indica, vol. XV. p. 128., vol. XVII. p. 193.

(প্রথম) কুমারগুপ্তের বৈগ্রাম-তাম্রশাসন (গুপ্ত সং ১২৮ = ৪৪৭-৪৮ খ্রী)—Epigraphia Indica, vol. XXI. p. 78.

বুধগুপ্তের ৩নং দামোদরপুর-তাম্রশাসন (তারিখ অংশ ভগ্ন)—Epigraphia Indica, vol. XV. p. 134 ff.

" " ৪নং দামোদরপুর-তাম্রশাসন (তারিখ অংশ ভগ্ন)—Epigraphia Indica, vol. XV. p. 129.

বুধগুপ্তের পাহাড়পুর-তাম্রশাসন (গুপ্ত সং ১৫৯ = ৪৭৮-৭৯ খ্রী)—Epigraphia Indica vol. XX. p. 61.; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ৩৯ খণ্ড, ১৪৩ পৃ।

বুধগুপ্তের নালন্দা-শীলমোহর—Memoirs of the Arch. Survey of India, No. 66, p. 64, pl. VIII a.

ষষ্ঠ শতক

গুণাইঘর-তাম্রশাসন (গুপ্ত সং ১৮৮ = ৫০৭-৮ খ্রী)—Indian Historical Qly. vol. VI. p. 40.

বৈন্যগুপ্তের নালন্দা-শীলমোহর—Ann. Report of the Arch. Survey of India, 1930-34. p. 230.

...গুপ্তের ৫নং দামোদরপুর-তাম্রশাসন (গুপ্ত সং ১৯৩ = ৫১২-১৩ খ্রী)—Epigraphia Indica, vol. XV. p. 141., vol. XVII. p. 193.

১নং ধর্মাদিত্যের কোটালিপাড়া-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩)—Indian Antiquary, vol. XXXIX, p. 193.

২নং „ „ „ —Indian Antiquary, vol. XXXIX, p. 193.

গোপচন্দ্রের মল্লসারুল-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩)—Epigraphia Indica, vol. XXIII. p. 155.

গোপচন্দ্রের কোটালিপাড়া-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৮)—Indian Antiquary, vol. XXIII. p. 155.

সমাচারদেবের ঘুগ্রাহাটি-তাম্রশাসন—Journal of the Royal Asiatic Soc. of Bengal, N. S. vol. VI, p. 429. ; vol. VII. p. 289., p. 476 ; vol. X, p. 425 ; Epigrahia Indica, vol. XVIII. p. 74. Ann. Report of the Arch. Survey of India, 1907-08, p. 256 ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1912, p. 710.

সমাচারদেবের কুর্পালা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৭)—অপ্রকাশিত।

সপ্তম শতক

শশাঙ্কের রোহ্‌টাসগড়-শীলমোহর—Corpus Inscriptionum Indicarum, vol. III. p. 284.

শশাঙ্কের মহারাজা মহাসামন্ত (দ্বিতীয়) মাধবরাজের গঞ্জাম-তাম্রশাসন—Epigraphia Indica, vol. VI. p. 143.

শশাঙ্কের ১নং মেদিনীপুর-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৯)—মাধবী মাসিক-পত্র, আষাঢ়, ১৩৪৫, ৩-৬ পৃ ; Journal of the Royal Asiatic Soc. of Bengal, Letters, Vol. XI, 1945, p. 1.

শশাঙ্কের ২নং মেদিনীপুর-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৮)—মাধবী মাসিক-পত্র, আষাঢ়,

১৩৪৫, ৩-৬ ; Journal of the Royal Asiatic Soc. of Bengal, Letters, Vol. XI, 1945, p, 1.

ভাস্করবর্মার নিধনপুর-তাম্রশাসন—Epigraphia Indica, vol. XII. p. 65. ; vol. XIX. p. 115. ; কামরূপ-শাসনাবলী, ১ পৃ।

লোকনাথের ত্রিপুরা-তাম্রশাসন—Epigraphia Indica, vol. XV. p. 301.

শ্রীধারণরাতের কৈলান-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৮৮)—ভারতবর্ষ মাসিক-পত্র, বৈশাখ, ১৩৫৩, ৩৬৯-৭৪ পৃ ; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ৫৩ খণ্ড, ৩-৪ সংখ্যা, ৪১-৫৪ পৃ ; Indian Historical Qly., p. 221.

জয়নাগের বপ্পঘোষবাট বা মল্লিয়-তাম্রশাসন—Epigraphia Indica, vol. XVIII, p. 60. ; Annals of the Bhandarkar Oriental Research Inst. vol. XIX, p. 81.

সপ্তম—অষ্টম শতক

শৈলবংশীয় জয়বর্ধনের রঘোলি-তাম্রশাসন—Epigraphia Indica, vol. IX. p. 41.

দেবখড়্গের ১নং আস্রফপুর-তাম্রশাসন—Memoirs of the Asiatic Soc. of Bengal, no. I. p. 85.

দেবখড়্গের ২নং আস্রফপুর-তাম্রশাসন— „ „ „ „

দেবখড়্গ-মহিষী প্রভাবতীর শর্বাণী-প্রতিমা-লিপি—Epigraphia Indica, vol. XVII. p. 357.

অষ্টম শতক

ধর্মপালের বুদ্ধগয়া-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ২৬)—Journal of the Royal Asiatic Soc. of Bengal, N. S. vol. IV. p. 101 ; গৌড়লেখমালা, ২৯ পৃ।

„ খালিমপুর তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩২)—Epigraphia Indica, vol. p. 243 ; গৌড়লেখমালা, ৯ পৃ।

„ নালন্দা-তাম্রশাসন—Epigraphia India, vol. XXIII. p. 290.

নবম শতক

দেবপালের কুর্কিহার মূর্তি-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৯)—Journal of the Bihar and Orissa Research Soc., vol. XXVI. p. 251.

„ হিল্‌সা মূর্তি-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ২৫)—Journal of the Bihar and Orissa Reeearch Soc., Vol. X. p. 33 ; Indian Antiquary, 1928. p.

153 ; Journal of the Royal Asiatic Soc. of Bengal, Letters, vol. IV. p. 390.

দেবপালের মুঙ্গের-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩৩)—Epigraphia Indica, vol. XVIII, p. 304 ; গৌড়লেখমালা, ৩৩ পৃ।

„ নালন্দা-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩৫ বা ৩৯)—Epigraphia Indica, Vol. XVII, p. 318 ; Journal of the Royal Asiatic Soc. of Bengal, Letters, vol. VII. p. 251 ; Varendra Research Soc. Monograph no. 1.

„ ঘোষরাবা-প্রস্তরলিপি—Indian Antiquary, vol. XVII, p. 307 ; গৌড়লেখমালা, ৪৫ পৃ।

„ ধাতুপ্রতিমা-লিপি—Annual Report of the Arch Survey of India, 1927-28, p. 139.

প্রথম শূরপাল বা বিগ্রহপালের দুইটি বুদ্ধপ্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৩)—Journal of the Asiatic Soc. of Bengal, N. S. vol. IV. p. 108 ; Memoirs of the Asiatic Soc. of Bengal, no. 5, p. 57 ; Journal of the Royal Asiatic Soc. of Bengal, Letters, vol. p. 390.

জয়পালের সারনাথ-লিপি—Annual Report of the Arch. Survey of India, 1907-08, p. 75.

নারায়ণপালের গয়া মন্দির-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৭)—Memoirs of the Asiatic of. Bengal, no. p. 60.

„ ইণ্ডিয়ান মুজিয়ম লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৭)— „ „ p. 61-62.

„ ভাগলপুর-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৭)—Indian Antiquary, vol. XV. p. 304 ; গৌড়লেখমালা, ৫৫ পৃ।

„ বিহার প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৫৪)—Indian Antiquary, vol. XLVII, p. 110 ; সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ১৩২৮, ১৬৯পৃ।

„ বাদল গরুড়স্তম্ভ-লিপি—Epigraphica Indica, vol. II, p. 100 ; গৌড়লেখমালা, ৭০২পৃ।

প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের ব্রিটিশ মুজিয়ম-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ২)—Memoirs of the Asiatic Soc. of Bengal, No. 5, p. 64.

„ মহেন্দ্রপালের বিহার বুদ্ধপ্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৪)—Ann. Report of the Arch. Survey of India, 1923-24, p. 102.

প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের পাহাড়পুর-স্তম্ভলিপি (রাজাঙ্ক ৫)—Memoirs of the Arch. Survey of India, no. 55, p. 75.

" মহেন্দ্রপালের রামগয়া দশাবতার-লিপি (রাজাঙ্ক ৮) Memoirs of the Asiatic Soc. of Bengal, no. 5, p. 64.

" মহেন্দ্রপালের ব্রিটিশ ম্যুজিয়ম-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ?)—Memoirs of the Asiatic Soc. of Bengal, no. 5, p. 64 ; Nach. Gottingen, 1904, pp. 210-11.

" মহেন্দ্রপালের গুণরিয়া-লিপি (রাজাঙ্ক ৯)—Memoirs of the Asiatic Soc. of Bengal, no. 5, p. 64, Journal of the Asiatic Soc. of Bengal, vol. XVI. p. 278.

" মহেন্দ্রপালের বিহার-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৯ বা ১৯ ; অধুনা নির্ণোঝ) — —Memoirs of the Asiatic Soc. of Bengal, no. 5, p 64.

দশম শতক

রাজ্যপালের নালন্দা-স্তম্ভলিপি (রাজ্যাঙ্ক ২৪)—Indian Antiquary, vol. XLVII, p. 111.

" কুর্কিহার প্রতিমা-লিপি (" ২৮)—Journal of the Bihar and Orissa Research Soc., vol. XXVI. p. 246.

" " " " (রাজ্যাঙ্ক ৩১)— " " p. 250.

" " " " (রাজ্যাঙ্ক ৩১ অথবা ৩২) – " " p. 247.

" " " " (" ৩২) " " " p. 248.

(দ্বিতীয়) গোপালের নালন্দা প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ১)—Journal of the Asiatic Soc. of Bengal, N. S. vol. IV. p. 105 ; গৌড়লেখমালা, ৮৬২পৃ।

" জাজিলপাড়া-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৬)—ভারতবর্ষ মাসিক-পত্র, ১ম খণ্ড, ১৩৪৪, ২৬৪ পৃ।

বুদ্ধগয়া বুদ্ধপ্রতিমা-লিপি—Journal of the Asiatic Soc. of Bengal, no. vol. IV. p. 105 ; গৌড়লেখমালা, ৮৮ পৃ।

(দ্বিতীয়) বিগ্রহপালের কুর্কিহার প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ২ বা ৩)—Journal of the Bihar and Orissa Research Soc. vol. XXVI. p. 37, 240.

" " মৃৎফলক-লিপি— " " p. 37,

" " দুইটি কুর্কিহার প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ২৯)— " p. 36-37 ; 239-40

(প্রথম) মহীপালের সারনাথ-লিপি (বিক্রম সং ১০৮৩)—*Indian Antiquary, vol.* XIV. p. 139 ; Annual Report of the Arch. Survey of India, 1903-4, p. 222 ; Journal of the Asiatic Soc. of Bengal, 1906 ; p. 445 ; গৌড়লেখমালা, ১০৪ পৃ।

" মহীপালের বাঘাউরা প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৩)—Epigraphia Indica, vol. XVII. p. 355.

" মহীপালের নারায়ণপুর প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৪)।

" মহীপালের বাণগড়-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৯)—Journal of the Asiatic Soc. of Bengal, vol. LXI. p. 77 ; Epigraphia Indica, vol. XIV. p. 324 ; গৌড়লেখমালা, ৯১ পৃ।

" মহীপালের নালন্দা-প্রস্তরলিপি (রাজ্যাঙ্ক ১১)—Journal of the Asiatic Soc. of Bengal, N. S. vol. IV. p. 106 ; গৌড়লেখমালা, ১০১ পৃ।

" মহীপালের বুদ্ধগয়া-প্রতিমালিপি (রাজ্যাঙ্ক ১১)—Memoirs the Asiatic Soc. of Bengal, no. 5, p. 75.

" মহীপালের কুর্কিহার-প্রতিমালিপি (রাজ্যাঙ্ক ২১ বা ৩১)—Journal of the Bihar and Orissa Research Soc., vol. XXVI. p. 245.

" মহীপালের বেলওয়া তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ২২)—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৫৪, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ৪১-৫৬ পৃ।

এই লিপিদত্ত ভূমির অবস্থিতি ছিল পঞ্চনগরী বিষয়ে, পুণ্ড্রিকামণ্ডলে, এবং ফাণিত বীথীতে। লিপি নির্গত হইয়াছিল শ্রীসাহসগণ্ডনগর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে। পঞ্চনগরীর অবশেষ এখনও পাঁচবিবি নামের মধ্যে বিদ্যমান। ভূমি মাপের নূতন প্রমাণের উল্লেখও আছে এই লিপিতে —দশোত্তর শতদ্বয়প্রমাণ, নবতত্তুত্তরচতুঃশত প্রমাণ, একপঞ্চাশদুত্তর শত-প্রমাণ। এই প্রমাণ কিসের প্রমাণ? বেলওয়া (প্রাচীন বেল্লাবা) গ্রাম এবং তাহার চতুষ্পার্শে নানা প্রত্নচিহ্ন এখনও বিদ্যমান। লিপিতে উল্লিখিত গণেশ্বর কি গণেশ্বর-মন্দির? অনেকগুলি দীঘির উল্লেখও লিপিটিতে আছে। এই লিপির দূতক ছিলেন মন্ত্রী লক্ষ্মীধর ; শিল্পী ছিলেন পোষলীগ্রামাগত চন্দ্রাদিত্যের পুত্র শ্রীপুণ্যাদিত্য। শিল্পী মহীধর ও শিল্পী শশিদেবও ছিলেন পোষলী গ্রামাগত। এইসব তথ্য সমস্তই নূতন এবং গ্রন্থের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত।

" মহীপালের দুইটি ইমাদপুর-প্রতিমালিপি (রাজ্যাঙ্ক ৪৮)—Indian

Antiquary, vol. XIV, p. 165 ; Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Letters, vol. VII. p. 218. সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই প্রতিমালিপি দুইটির তারিখ পাঠ করিয়াছেন ১৪৮ (নেওয়ারী সংবৎ)=১০২৮ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম প্রতিমাটি বলরাম-একানংশা-কৃষ্ণবাসুদেবের ; দ্বিতীয়টি গণেশ ও বীরভদ্রপার্শ্ব কৌমারী-ব্রাহ্মণী-বৈষ্ণবী এই মাতৃকাত্রয়ের। দ্বাদশ অধ্যায়ের যথাস্থানে এই তথ্যের সংযোজন প্রয়োজন।

(প্রথম) মহীপালের জেত্রবন বুদ্ধপ্রতিমা-লিপি—Cunningham's Arch. Survey Reports, vol. VII. p. 39 ; vol. , p. 123.

কুঞ্জরঘটাবর্ষের বাণগড়-স্তম্ভলিপি—Journal f the Asiatic Soc. of Bengal, N. S. vol VII. p. 619 ; Memoirs of the Asiatic Soc. of Bengal, no. 5. p. 68 ; বঙ্গবাণী মাসিক-পত্র, ১৩৩০, ২৪৯ পৃ।

কাম্বোজরাজ জয়পালের ইর্দা-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৩)—Epigraphia Indica, vol. XXII. p. 150 ; vol. XXIV. p. 43.

লহয়চন্দ্রের ভারেল্লা-প্রতিমালিপি (রাজ্যাঙ্ক ১৮)—Epigraphia Indica, vol. XVII, p. 349.

একাদশ শতক

শ্রীচন্দ্রের রামপাল-তাম্রশাসন—সাহিত্য মাসিক-পত্র, ১৩২০ ; Epigraphia Indica, vol. XII. p. 136 ; Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 1.

শ্রীচন্দ্রের কেদারপুর-তাম্রশাসন—Epigraphia Indica, vol. II. p. 188 ; Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 10.

শ্রীচন্দ্রের ধুলিয়া বা ধুল্লা-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩৫)—Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 165.

শ্রীচন্দ্রের ইদিলপুর-তাম্রশাসন—Dacca Review, October, 1912 ; Epigraphia Indica, vol. XVII. p. 189 ; Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 166.

শ্রীচন্দ্রের মদনপুর-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৪৪)—ভারতবর্ষ মাসিক-পত্র, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩।

গোবিন্দচন্দ্রের কুলকুড়ি সূর্যমূর্তি-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ১২)।

„ বেতকা বাসুদেবমূর্তি-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ২৩)।

নয়পালের গয়া নরসিংহ-মন্দিরলিপি (রাজ্যাঙ্ক ১৫)—Memoirs of the Asiatic Soc. of Bengal, no. 5, p. 78.

নয়পালের গয়া কৃষ্ণদ্বারিকা-মন্দিরলিপি—Journal of the Asiatic Soc, of Bengal, vol. LXIX. p. 190 ; গৌড়লেখমালা, ১১০ পৃ।

(তৃতীয়) বিগ্রহপালের গয়া অক্ষয়বট মন্দির-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৫)—Memoirs of the Asiatic Soc. of Bengal. no. 5, p. 81.

„ বিগ্রহপালের আমগাছি-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১২)——Epigraphia Indica, vol. XV. p. 293 ; গৌড়লেখমালা, ১২১ পৃ ; Memoirs of the Asiatic Soc. of Bengal, no. 5, p. 80.

„ বিগ্রহপালের বিহার বুদ্ধপ্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ১৩)—Memoirs of the Asiatic Soc. of Bengal, no. 5, p. 112.

(তৃতীয়) বিগ্রহপালের বেলওয়া (বেল্লাবা) তাম্রশাসন—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫৫। এই লিপি নির্গত হইয়াছিল বিলাসপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে ; শিল্পী ছিলেন সিল্পিড়ীগ্রামাগত হরদেবপুত্র পৃথ্বীদিত্য ; দূতক ছিলেন ত্রিলোচন। এই লিপিতেই লিপির প্রাপ্তিস্থান বেল্লাবা বা বেলওয়া গ্রামের উল্লেখ আছে।

রামপালের তেত্রবন প্রতিমালিপি (রাজ্যাঙ্ক ৩)—Journal of the Asiatic Soc. of Bengal, N. S. vol. IV. p. 109 ; Memoirs of the Asiatic Soc. of Bengal, no. 5, p. 93 ; Journal of the Royal Asiatic Soc. of Bengal, Letters, vol. IV. p. 390.

রামপালের চণ্ডীমৌ প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৪২)—Memoirs of the Asiatic Soc of Bengal, no. 5, p. 93-94.

বৈদ্যদেবের কমৌলি-তাম্রশাসন (কুমারপালের রাজ্যাঙ্ক ৪)—Epigraphia Indica, vol. II. p. 350 ; গৌড়লেখমালা, ১২৭ পৃ।

পরমসৌগত ভবদেবের (আনন্দদেবের পুত্র) ময়নামতী-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ২)—অপ্রকাশিত।

ভোজবর্মার বেলাব-তাম্রশাসন—Epigraphia Indica, vol. XII. p. 37 ; Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 14.

সামলবর্মার (খণ্ডিত) বজ্রযোগিনী-তাম্রশাসন—ভারতবর্ষ মাসিকপত্র, কার্তিক, ৬৭৪ পৃ।

হরিবর্মার সামন্তসার-তাম্রশাসন—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ২১৫ পৃ ; ভারতবর্ষ মাসিক-পত্র, মাঘ, ১৩৪৪, ১৬৯ পৃ।

ভবদেব-ভট্টের ভুবনেশ্বর-প্রশস্তিলিপি—Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 25.

দ্বাদশ শতক

(তৃতীয়) গোপালের নিমদীঘি বা মান্দা-লিপি—Memoirs of the Asiatic Soc. of Bengal, no. 5 p. 102; Indian Historical Qly. vol. XVII. p. 207; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ১৯ খণ্ড, ১৫৫ পৃ।

„ গোপালের রাজীবপুর প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ১৪ ?)—Indian Historical Qly. vol. XVII. p. 217; Ann. Report of the Arch. Survey of India, 1936-37, p. 130-33; Journal of the Royal Asiatic Soc. of Bengal, Letters, vol. VII. p. 216.

„ গোপালের মন্দুক গণেশ-প্রতিমালিপি—অপ্রকাশিত।

মদনপালের বিহার-প্রতিমালিপি (রাজ্যাঙ্ক ৩)—Cunningham's Arch. Survey Reports. vol. III. p. 124. no. 16.

মদনপালের মনহলি-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৮)—Journal of the Asiatic Soc. of Bengal, vol. LXXIX, Part I, p. 68; গৌড়লেখমালা, ১৪৭ পৃ।

মদনপালের জয়নগর-প্রতিমালিপি (রাজ্যাঙ্ক ১৪)—Cunningham's Arch. Survey Reports, vol. III. p. 125; Journal of the Royal Asiatic Soc. of Bengal, Letters, vol. VII. p. 216.

গোবিন্দপালের গয়া-শিলালিপি (১২৩২ বিক্রম সং গতরাজ্যে চতুর্দশ সম্বৎসরে)—Memoirs of the Asiatic Soc. of Bengal, no. 5, p. 108.

গোবিন্দপালের দ্বিতীয় একটি প্রস্তরলিপি—অপ্রকাশিত। Cunningham's Arch. Survey Reports, vol. XV. p. 155.

বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিলিপি—Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 42

„ বারাকপুর-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৬২)— „

বল্লালসেনের নৈহাটি-তাম্রশাসন— „ p. 68

লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ২)— „ p. 92

„ তর্পণদীঘি „ „ — „ p. 99

„ সুন্দরবন বকুলতলা „ (রাজ্যাঙ্ক ২ বা ৩)— „ p. 169

„ আনুলিয়া „ (রাজ্যাঙ্ক ৩)— „ p. 81

„ ঢাকা প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৩)— „ p. 116

„ শক্তিপুর-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩ বা ৬)—Epigraphia Indica vol. XXI, p. 211; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ৭১ খণ্ড, ২১৬ পৃ।

ডোম্মনপালের সুন্দরবন-তাম্রশাসন (১১১৮ শক = ১১৯৬ খ্রী)—Indian Historical Qly. vol. X. p. 321.

ত্রয়োদশ শতক

লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ২৭)—Epigraphia Indica, vol. XXVI, p. 1.

" মাধাইনগর-তাম্রশাসন—Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 106

বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৪) " " p. 132

" মধ্যপাড়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৪) " p. 140

কেশবসেনের ইদিলপুর-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩) " " p. 118

কানাই বড়শীবোয়া-শিলালিপি—কামরূপ-শাসনাবলী, ভূমিকা।

দামোদর-দেবের মেহার-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৪ ; ১১৫৬ শক)—Epigraphia Indica, vol. XXVII.

দেব-বংশীয় জনৈক রাজার ত্রিপুরা-তাম্রশাসন (১১৫৮ শক)—অপ্রকাশিত।

দামোদর-দেবের চট্টগ্রাম-তাম্রশাসন (১১৬৫ শক)—Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 158.

দশরথ-দেবের আদাবাড়ী-তাম্রশাসন—Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 181 ; ভারতবর্ষ মাসিক-পত্র, পৌষ, ১৩৩২।

দশরথ-দেবের ত্রিপুরা-তাম্রশাসন—অপ্রকাশিত।

কেশবদেবের ভাটেরা-তাম্রশাসন (তারিখ অস্পষ্ট ও অনির্ধারিত)—Proceedings of the Asiatic Soc. of Bengal, 1880. p. 141 ; Epigraphia Indica, vol. XIX. p. 277.

ঈশানদেবের ভাটেরা-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৭)—Proceedings of the Asiatic Soc. of Bengal, 1880. p. 141.

রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকালদেবের ময়নামতী-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৭)—Indian Historical Qly. vol. IX, p. 282.

পীঠীপতি আচার্য জয়সেনের জানিবিঘা-লিপি (লক্ষ্মণসেনস্য অতীতরাজ্যে ৮৩)—Journal of the Bihar and Orissa Research Soc. vol. IV. p. 278 ; p. 266 ; Indian Antiquary, vol. XLVIII. p. 43.

পীঠীপতি আচার্য বুদ্ধসেনের নামোল্লিখিত বুদ্ধগয়া-লিপি—Indian Antiquary, vol. XLVIII p. 44.

নাম-সূচী

ক

খ

গ

ঘ-ছ

জ-ঝ

ট-চ

ত-থ

প

ব

য

ল

শ

হ

A-Z

সংশোধন ও সংযোজন

প্রুফ্ সংশোধনের ত্রুটি ও অনবধানতার ফলে কিছু কিছু বর্ণাশুদ্ধি থাকিয়া গিয়াছে। এই ধরনের ভুল পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিকর, সন্দেহ নাই; কিন্তু তালিকা দীর্ঘ হইবে আশংকায় সে-সব ভুল সংশোধনের চেষ্টা এখানে করিতেছি না। পাঠকেরা সহজেই সে-সব ভুল ধরিতে ও সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। ইঁটকাঠ, শুক্রচার্য, ভাগরথী, ছোটনাগপূর, বৃক্তি, ছত্রবাস, আয়ুধ, অভ্যুদয়, কেবর্ত, কৌঠমশাখা, অর্ণশাস্ত্র প্রভৃতি মুদ্রাকরপ্রমাদজনিত ভুল যে যথাক্রমে ইটকাঠ, শুক্রাচার্য, ভাগীরথী, ছোটনাগপুর, যুক্তি, ছত্রাবাস, আয়ুধ, অভ্যুদয়, কৈবর্ত, কৌঠুমশাখা, অর্থশাস্ত্র হওয়া উচিত তাহা অঙ্গুলিনির্দেশে না দেখাইলেও চলিতে পারে। কিন্তু, বুদ্ধিজীবি, কৃষিজীবি, ধর্মজীবি, কালিঘাট প্রভৃতির মত ভুলও কোথাও কোথাও ছাপা হইয়া গিয়াছে; বলা বাহুল্য, শুদ্ধ পাঠ সর্বত্রই হইবে বুদ্ধিজীবী, কৃষিজীবী, ধর্মজীবী, কালীঘাট ইত্যাদি। এই ধরনের বানান ভুল শুদ্ধি-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতেছি না। ছেদ চিহ্নের (দাঁড়ি, কমা প্রভৃতি) ভুলও কিছু কিছু রহিয়া গেল।

বর্ণাশুদ্ধি ছাড়া অন্য প্রকারের মুদ্রণত্রুটিও রহিয়া গিয়াছে, যেমন ঐতিহাসিক নামের ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, সুবৃহৎ এই গ্রন্থের কোনো কোনো স্থানে কোনো কোনো নাম একটু বিকৃতরূপে ছাপা হইয়া গিয়াছে, যেমন, তারনাথ নামটি ছাপা হইয়াছে তারানাথ রূপে; যশোবর্মা, চন্দ্রবর্মা, সিংহবর্মা, নাথশর্মা প্রভৃতি সংস্কৃত বর্মণ বা শর্মণান্ত নাম কোথাও কোথাও ছাপা হইয়া গিয়াছে যথাক্রমে যশোবর্মণ, চন্দ্রবর্মণ, সিংহবর্মণ, নাথশর্মণ প্রভৃতি রূপে; বপ্পঘোষবাট, ব্যবহারমাতৃকা, শারদাতিলক, খর্বট-কর্বট, বীথী, মানসোল্লাস, তাম্রলিপ্তি, পিতৃদয়িতা দু-এক ক্ষেত্রে ছাপা হইয়াছে বপ্যঘোষবাট, ব্যবহারমাত্রিকা, সারদাতিলক, খর্বাট-কর্বাট, বীথি, মানসোল্লোস, তাম্রলিপি, পিতৃদয়িত রূপে; দেশোপদেশ, লক্ষ্মণসেন, সোহিঞ্জরী হইয়া গিয়াছে দশোপদেশ, লক্ষণসেন, সোহিথতরী; মংখদাস, হলাবর্ত, মল্লসারুল প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে মংকদাস বা সংখদাস, খলাবর্ত, মগ্নসারুল, ইত্যাদি। নামস্থচীতে এই ধরনের যত নাম অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে সমস্তই সংশোধিত রূপান্তরেই করা হইল; ঐ সূচীর পাঠই শুদ্ধ পাঠ। কাজেই এই ধরনের ভুলও বর্তমান তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতেছি না।

পালি ও সংস্কৃত ভাষায় একই শব্দের রূপের এবং বানানের যে পার্থক্য তাহাও অনবধানতাবশত সর্বত্র সমভাবে রক্ষিত হয় নাই; যেখানে হওয়া উচিত মহাবংস সেখানে ছাপা হইয়াছে মহাবংশ; হওয়া উচিত মহানিদ্দেস, ছাপা হইয়াছে মহানিদ্দেশ, ইত্যাদি। নাম-সূচীতে এই ধরনের ভুলও যতটা চোখে পড়িয়াছে ততটা সংশোধন করিয়াছি।

তাহা ছাড়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই শব্দ বা নামের দুই রকম বানানও ছাপা হইয়াছে; সর্বত্র তাহা ভুল হয়তো নয়, কিন্তু এই বৈষম্যও থাকা উচিত ছিলনা। সেগুলিও সংশোধন-তালিকাভুক্ত করিতেছি না; কারণ, তাহা এমন কিছু মারাত্মকও নয়।

যে-সব ছাপার বা বানানের ভুল মারাত্মক, কিংবা এমন ভুল যাহার ফলে অর্থই যায় বদলাইয়া, এবং তথ্যগত এমন ভুল যাহার ফলে ব্যাখ্যাই হইয়া যায় বিপরীত, শুধু সেই ধরনের ভুলগুলিই বর্তমান তালিকাভুক্ত করিতেছি, এবং যতটা আপাতত আমার চোখে পড়িয়াছে ততটাই।

গ্রন্থ এবং গ্রন্থাংশ ছাপা হইয়া যাওয়ার পর কিছু কিছু নূতন তথ্য বা নূতন ব্যাখ্যা যাহা জানা গিয়াছে, এমন তথ্য যাহা রচনাকালে বাদ পড়িয়া গিয়াছিল তাহাও এই তালিকাভুক্ত করিলাম।

প্রথম অধ্যায়

পৃ	২২	লাইন	২৮	একাদশ অধ্যায় স্থলে দ্বাদশ অধ্যায় পড়িতে হইবে।
„	২৩	„	৫	„ „ „ „
„	„	„	১১	দ্বাদশ অধ্যায় „ চতুর্দশ অধ্যায় „
„	„	„	১৯	„ „ „ „
„	২৪	„	৭	চতুর্দশ অধ্যায় „ একাদশ অধ্যায় „

তৃতীয় অধ্যায়

পৃ	৯২	লাইন	২৪	পুষ্পস্নান পূজার ফুল স্থলে পুষ্প স্নানপূজার ফুল পড়িতে হইবে।
„	৯৩	„	১০	বাকিবাজার নিমাই তীর্থ „ বাকিবাজার, (ডাইনে) নিমাই তীর্থ পড়িতে হইবে।
„	৯৩	„	১১	বৈদ্যবাটি), চাণক, মাহেশ, খড়দহ, স্থলে বৈদ্যবাটি ?) চাণক, মাহেশ, (বামে) খড়দহ পড়িতে হইবে।
„	„	„	১২	একাদশ শতক স্থলে দ্বাদশ শতক পড়িতে হইবে।
„	„	„	১৩	তারপর কালিঘাট স্থলে তারপর (বামে) কালীঘাট পড়িতে হইবে।
„	৯৪	„	২০	১০২৫ „ ১১৭৫ পড়িতে হইবে।
„	১০০	„	৪-১২	কাহারো কাহারো মতে ইব্‌ন্ বতুতার Chhadkawan গঙ্গা যমুনা-সরস্বতী সঙ্গমে ত্রিবেণীর সমীপবর্তী সপ্তগ্রাম। কিন্তু ইব্‌ন্ বতুতার বিবরণীর পূর্বাপর সামঞ্জস্য বিবেচনা করিলে Chhadkawan চট্টগ্রাম হওয়াই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। Yuleও সেই ইঙ্গিতই করিয়াছেন।

"	১০৬	"	৭	ফারনানডিজ্-কথিত শ্রীপুর ঢাকা জেলায় ইচ্ছামতী-তীরের যাত্রাপুর-শ্রীপুর; খুলনা জেলার সীমান্তের ইচ্ছামতী-তীরের টাকী-শ্রীপুর নহে।
"	১৩৭	"	৩১-৩২	দিগ্বিজয়-প্রকাশ গ্রন্থটি সম্প্রতি ঊনবিংশ শতকে রচিত একটি অর্বাচীন গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।
"	১৪২	"	১৩	লাইনটি যেখানে শেষ হইয়াছে তাহার পর "অথবা, সং শুধু সমতটের একটি বিশেষণ মাত্র", এই বাক্যটি বসিবে।
"	১৪৫	"	১২	সিলিমপুর স্থলে সিলিমপুর শিলালিপি পড়িতে হইবে।
"	১৪৭	"	২৫	দিগ্বিজয়-প্রকাশ গ্রন্থটি অর্বাচীন; ঊনবিংশ শতকে রচিত।

চতুর্থ অধ্যায়

পৃ	১৯২	লাইন	২৪	দ্রপ্সে)	স্থলে	দ্রপ্সে?)	পড়িতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পৃ	২৭৬	লাইন	২	কোষকার	"	কোষগ্রন্থ	"
"	২৮২	"	১	অভাব	"	প্রভাব	"
"	২৯৮	"	১৮র পর নূতন অনুচ্ছেদ			৮ নং আরম্ভ হইবে।	
"	৩০৮	"	২১	ধীবরের মাহিষ্যের	স্থলে	ধীবরের, মাহিষ্যের	পড়িতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

পৃ	৩৭৫	"	২১-২২	মহাবিহার আগুন	স্থলে	মহাবিহারের একাংশ আগুন	পড়িতে হইবে।

নবম অধ্যায়

পৃ	৪০৯	লাইন	৩০	পাটলীপুত্রের	স্থলে	কনৌজের	পড়িতে হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

পৃ	৫৮৬	লাইন	২৯	শ্রীকৃষ্ণের	স্থলে	শ্রীহর্ষের	পড়িতে হইবে।
"	৫৮৯	"	১৮	সর্ববিষমোচয়িত্রী	"	সর্পবিষমোচয়িত্রী	"
"	৬৩৬	"	১১	মধ্যমিক	"	মাধ্যমিক	"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পৃ	৭১১	লাইন	২৫	৩৭ বৎসর	স্থলে	৭৩ বৎসর	পড়িতে হইবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

পৃ	৮০১	লাইন	৭	৯৭৮৯ নং	স্থলে	৯৯৮৯	পড়িতে হইবে।
"	৮০৫	"	৫	"	"	"	"

২৮

২৯

১নং মানচিত্র
বাংলার নদনদী

২নং মানচিত্র
জাও ড্য ব্যারোস-কৃত (১৫৫০) বাংলার ভূমি ও নদনদী নক্সা
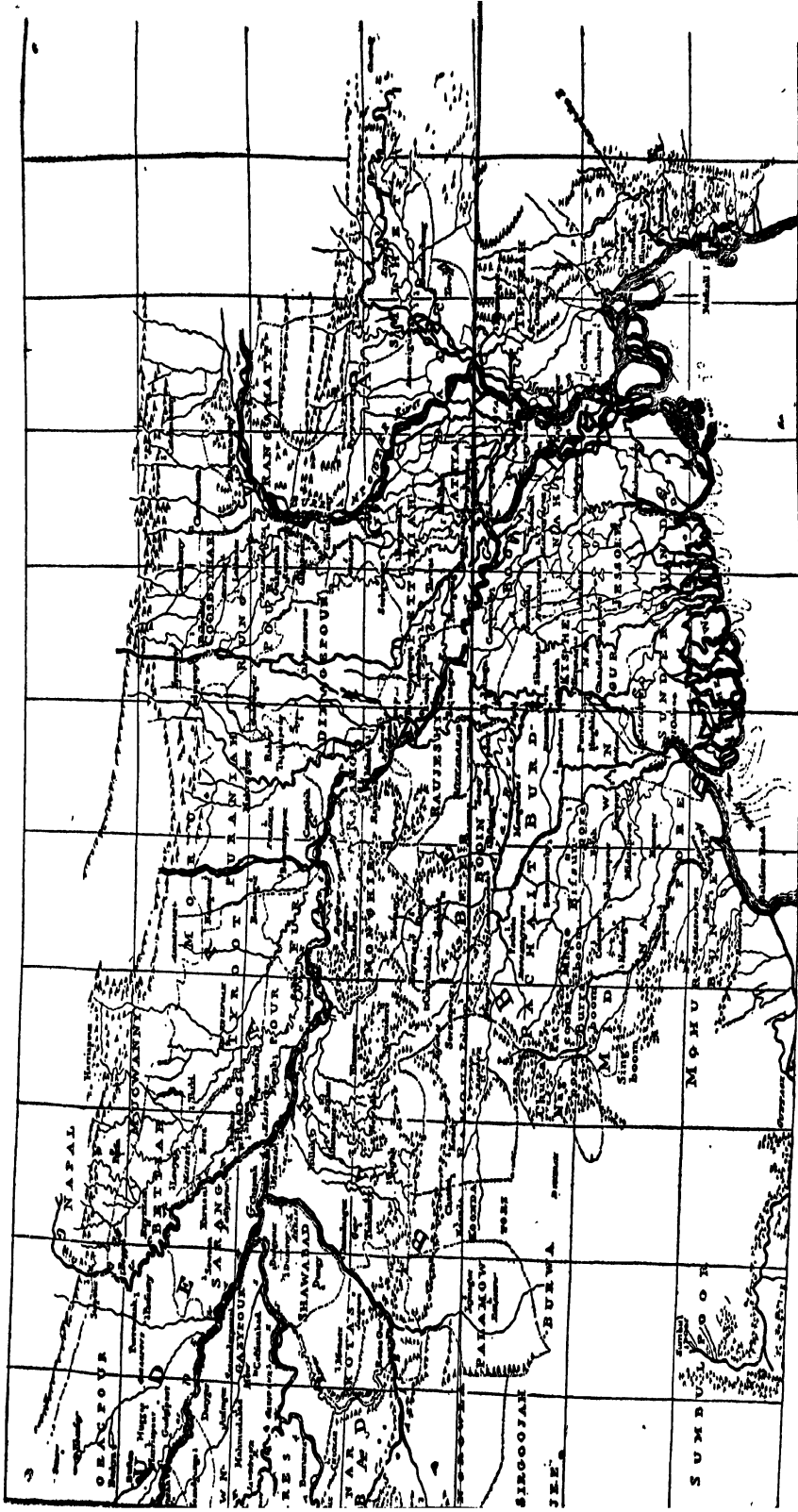
বাঙালীর ইতিহাস

৪নং মানচিত্র

রেনেল-কৃত (১৭৬৪-৭৬) বাংলার ভূমি ও নদনদী নক্সা
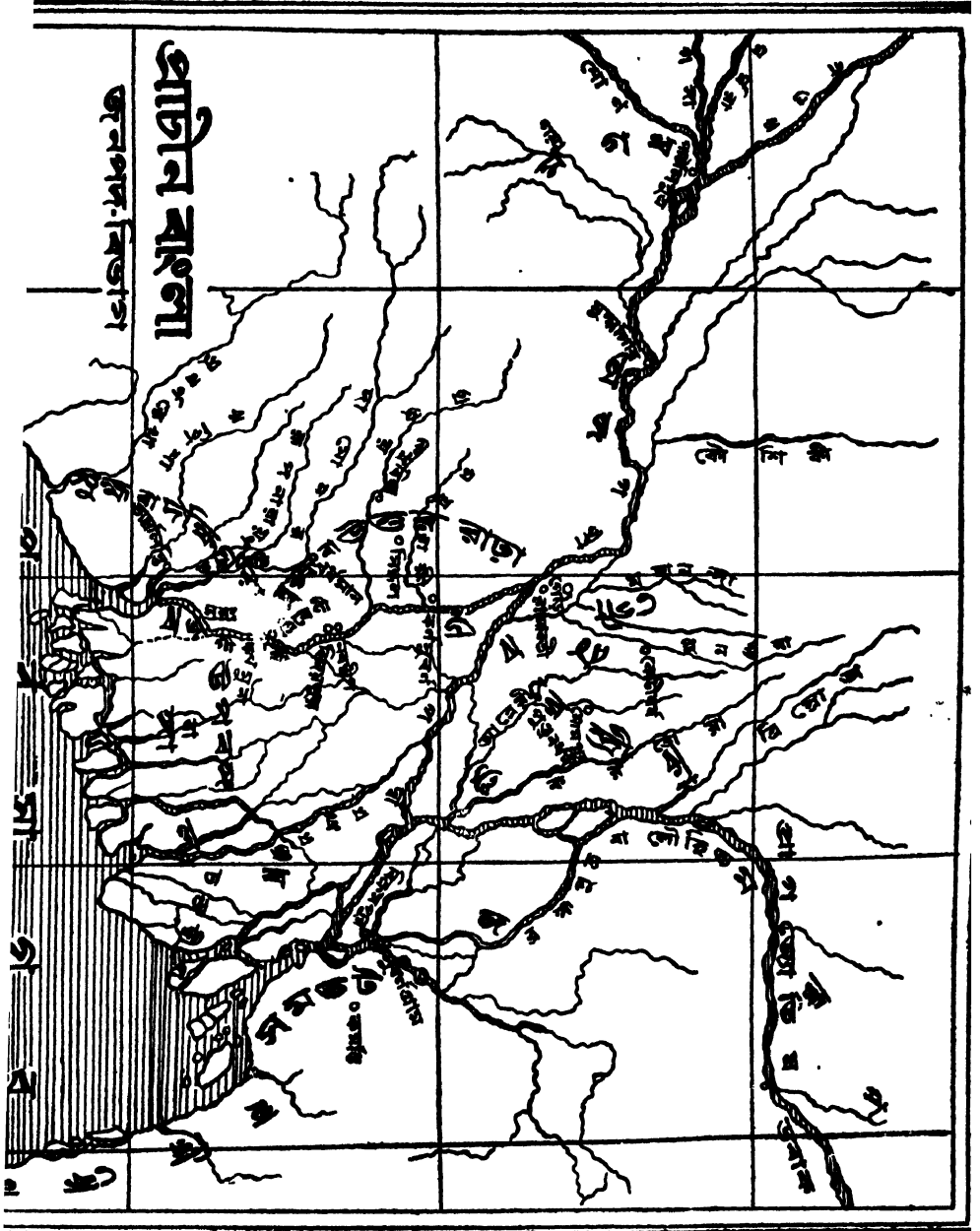
৫নং মানচিত্র

প্রাচীন বাংলার জনপদ বিভাগ

৬নং মানচিত্র

প্রাচীন রাঢ়-দেশ